১৯৭০ সাল শুরু হল।

এ-বছর ভারতের জাতীয় জীবন এক ক্রান্তিকালের সম্মুখীন।

গোটা পৃথিবীর পক্ষেও এ-এক ঐতিহাসিক বছর। এই গ্রহের যেখানে সূর্যের আলো পৌঁছয়, সেখানেই লেনিন জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হবে।

ভারতবর্ষেও তার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।

লেনিন উৎসবের অর্থই হলঃ এ-দেশের গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার মহান লক্ষ্যে অবিচল থাকার জন্য সংগ্রাম করা।

লেনিন উৎসবের অর্থই হলঃ সমাজতন্ত্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং আন্তর্জাতিক মানবতার পক্ষে নতুন করে শপথ গ্রহণ।

আমার স্থির বিশ্বাস,
হিংসা দিয়ে চিরস্থায়ী কোনো কিছু
গড়া যায় না।
সে-যাহোক, বলশেভিক আদর্শের পশ্চাতে
সর্বস্ব উৎসর্গীকৃত অসংখ্য নর-নারীর
পবিত্রতম আত্মত্যাগ
প্রশ্নাতীত।
লেনিনের মহাপ্রাণতার স্পর্শ-পূত
সে-আদর্শ
ব্যর্থ হবার নয়।
তাঁদের আত্মত্যাগের মহান দৃষ্টান্ত
চিরকাল প্রোজ্জ্বল থাকবে
এবং যত দিন যাবে
তত দ্রুত
সেই আদর্শ পরিশুদ্ধ হয়ে উঠবে।

মো. ক. গান্ধী

ইয়ং ইণ্ডিয়া ॥ নভেম্বর ১৫, ১৯২৮

লেনিনের কাছে ভারতের মুক্তি ছিল বিশ্বমুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে একটি ঐতিহাসিক দিকচিহ্ন। গান্ধীজীও ভারতের স্বাধীনতা চেয়েছিলেন। মুক্তি-আন্দোলনে দুজনে ছিলেন দুই বিপরীত পথের পথিক। তবু, 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'র পৃষ্ঠায় লেনিন সম্পর্কে গান্ধীজী তাঁর শ্রদ্ধার অমোঘ স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

পরিচয়
বর্ষ ৩৯ । সংখ্যা ৬-৭
পৌষ-মাঘ ১৩৭৬

সূচিপত্র

প্রচ্ছদপট : বিশ্বরঞ্জন দে

সম্পাদক

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । তরুণ সান্যাল

পরিচয় প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত ।

মনীষার কয়েকটি বই

রূপনারায়ানের কূলে

গোপাল হালদার

প্রবীণ সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক কর্মীর আত্মোপলব্ধির কাহিনী বিচিত্র অভিজ্ঞতামণ্ডিত জীবনের স্মৃতিকথায় বিধৃত।

মূল্য : ছয় টাকা

বসন্তবাহার ও অন্যান্য গল্প

আনা সেগার্স, ভিলি ব্রেডাল প্রভৃতি ফ্যাসিস্টবিরোধী গণতান্ত্রিক জার্মান লেখকদের গল্প সংগ্রহ।

মূল্য : তিন টাকা

কলিযুগের গল্প

সোমনাথ লাহিড়ী

রাজনৈতিক সংগ্রামের খড়্গপানিরূপে সোমনাথ লাহিড়ীকে সবাই জানে। 'কলিযুগের গল্প'-এ সোমনাথ লাহিড়ীর আর-এক পরিচয় কথাসাহিত্যিকরূপে। সে-পরিচয়ও সামান্য নয়, তার সাক্ষ্য সংকলনটির একাধিক সংস্করণ।

মূল্য : ছয় টাকা

মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা-১২

পরিচয়
বর্ষ ৩৯ । সংখ্যা ৬
পৌষ । ১৩৭৬

Oct. 23. 1926

HOTEL IMPERIAL
WIEN

Dear Dr Lesny

I am confined to my bed, ill and tired. My doctor thinks that I shall have my release in the beginning of the next week when I shall try to visit Budapest where the people are so eagerly waiting for me. The memory of my welcome in Prague will always remain in my heart and my love for your people I shall carry with me to India.

I have just finished reading the

Letters from England by your great author Capek; they are brilliantly suggestive and full of originality.

Kindly send me a list of the books that you have undertaken to send to our library in Santiniketan. For I have to send a notice beforehand to Prabhat Kumar Mukerji, our librarian informing him about the number and names of them.

With kindest regards to yourself and your wife

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

HOTEL IMPERIAL
WIEN

Oct, 23. 1926

Dear Dr Lesny,

I am confined to my bed, ill and tired. My doctor thinks that I shall have my release in the beginning of the next week when I shall try to visit Budapest where the people are so eagerly waiting for me. The memory of my welcome in Prague will always remain in my heart and my love for your people I shall carry with me to India.

I have just finished reading the Letters from England by your great author Capek, they are brilliantly suggestive and full of originality,

Kindly send me a list of the books that you have undertaken to send to our library in Santiniketan. For I have to send a notice beforehand to Prabhat Kumar Mukerji, our librarian informing him about the number and names of them.

With kindest regards to yourself and your wife.

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[অধ্যাপক লেজ্‌নির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগের কথা নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। তাঁকে লেখা কবির বেশ কিছু চিঠি নানা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। আমরা জানি বন্ধুবর দুশান্‌ জবাভিতেলের উদ্যোগেই সেটা সম্ভব হয়েছে। তবে ওপরের চিঠিটি কি করে যে দুশানের গবেষকশোভন শ্যেনদৃষ্টি এড়িয়ে এতাবৎ অপ্রকাশিত রয়ে গেছে তা সত্যই একটি আশ্চর্য ব্যাপার। চিঠিটা পাওয়া গেল প্রাগের 'ওরিয়েণ্টাল ইনস্টিটিউট'-এর গবেষক ডঃ মিলোস্লাভ ক্রাসা ও ডঃ জঁ মারেকের কাছ থেকে। তাঁর ও আমাদেরও ইচ্ছা ছিল দুশান্‌কে দিয়েই চিঠিটির সঙ্গের এই 'নোট'টি লেখানো। কিন্তু দুশান্‌ বেশ কয়েক মাস এখানে থাকার পর কিছুদিন হলো কলকাতা ছেড়ে দেশে ফিরে যাওয়ায় সে ইচ্ছা পূরণ করা গেল না। তবে আশা করব 'পরিচয়'-এর পুরনো সুহৃদ হিসেবে তিনি পরে হয়তো এই চিঠিটি সম্পর্কে বা রবীন্দ্রনাথ-লেজ্‌নি প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য পাঠিয়ে আমাদের নতুন তথ্যের সন্ধান দেবেন।

ডঃ ক্রাসা, ডঃ মারেক্‌ ও চেকোস্লোভাক 'ওরিয়েণ্টাল ইনস্টিটিউট'-এর কাছে 'পরিচয়' এই চিঠির জন্য বিশেষভাবেই কৃতজ্ঞ। —চিন্মোহন সেহানবীশ]

... ...

শ্রীচিন্মোহন সেহানবীশ সম্প্রতি প্রাগে (চেকোস্লোভাকিয়া) 'ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট রিভিয়ু' পত্রিকার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত 'লেনিন ও সমকাল' শীর্ষক একটি আলোচনা সভায় যোগ দিতে গিয়েছিলেন। প্রাগে তিনি রবীন্দ্রনাথের অমূল্য চিঠিখানির সন্ধান পান এবং 'পরিচয়' পত্রিকার জন্য সংগ্রহ করে আনেন। আমরা প্রাগের 'ওরিয়েণ্টাল ইনস্টিটিউট', ডঃ ক্রাসা, ডঃ মারেক্‌ ও শ্রীসেহানবীশকে এই বিশেষ সহায়তার জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

—সম্পাদক।

ইলিয়া এহ্‌রেনবুর্গ : স্মৃতিতর্পণ

অরুণা হালদার

জীবনের রৌদ্রদাহ, অপরাহ্ণ অন্তরে, অম্বরে—
গাঢ় যন্ত্রণার শেষ ; দিগ্‌দিগন্তে বিদ্যুৎ ডম্বরে
আশঙ্কা ঘনায়, রাত্রি তবু অবসান, ভোর হয়—
মানুষ আশায় বাঁচে, কাঁদে হাসে আর কথা কয়।
অর্থহীন দ্বি-অর্থক—কতবার ফুটো নৌকো সেঁচে
অন্তহীন জল পার হয়—প্রলয়ের পরে বেঁচে
উঠেও বা ঘাসের অঙ্কুর। যুঁই ঝরায়েছে পাতা
এবারের মতো—মাটির মলিন-মসী—ছেঁড়া কাঁথা,
রোগের জর্জর খেদ, পাবে কি পাবেনা পরিণতি
উর্বরা পলির প্রাণে—কে জানে! এ-বুকজোড়া ক্ষতি
ঘর ভাঙা ক্ষতি মিলে দিনরাত্রি হাত ধরাধরি
পথে দাঁড়ায়েছ এসে—তবু বাঁচি যদি নাই মরি।

শরতের নীলাকাশে শুভ্র বিচ্ছুরিত সূর্যালোক—
আছো তো তুমিও প্রেম? বলি, তবে তাই সত্য হোক।

কাগজে কিছুকাল পূর্বে দেখেছিলাম ইলিয়া এহ্‌রেনবুর্গের মৃত্যুর সংবাদ (আগস্ট ৩০, ১৯৬৭)। মনে পড়ল তাঁকে দেখার ও পরিচয় পাবার সুযোগ ঘটেছিল। দেখার পূর্বে পড়েছিলাম তাঁর 'ঝড়' (Storm); আর বিশেষ কালের পরিপ্রেক্ষিতে লেখা তাঁর উপন্যাস 'বরফ গলার দিনগুলি' (Thaw)। সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে ভাবতে চেষ্টা করেছি, সাহিত্যিকের শক্তি শুধু মনীষায় বা সৃজনী-সাহিত্যেই অভিব্যক্ত হয় না—সময়ে সময়ে তা হয়ে ওঠে যুগোপযোগী ঘোষণা। উদ্দেশ্যমূলক রচনা না-হলেও সে-রচনা একটি না-একটি উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়—পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্, আর—ধর্ম সংস্থাপনার্থায় তো নিশ্চয়ই। এই ঘোষণা বারম্বার ইলিয়া এহ্‌রেনবুর্গের রচনায় তত্তৎকাল পরিপ্রেক্ষিতে দেখা গিয়েছে। এই বিশেষ কারণেই সর্বকালের সার্বজনীন মানবতার উদ্‌গাতারূপে

ইলিয়া এহ্‌রেনবুর্গকে দেখতে পাই। তাঁর ভূমিকা একাধিকবার রাশিয়ার রাষ্ট্রবিপ্লবকালে, তথা বিপ্লবোত্তর কালে, পরিলক্ষিত হয়েছে।

আমার এইরূপ মানসিক পটভূমিকায় তাঁকে দেখবার ও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের সুযোগ ঘটেছিল বিগত ১৯৬৪ সালের জানুয়ারি মাসে। জানুয়ারি ১৯৬২—১৯৬৪ জানুয়ারি পর্যন্ত আমার কাটে লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য বিভাগে অধ্যাপনার কাজে। সময়টার বেশির ভাগই লেনিনগ্রাদ শহরে কাটাতে হলেও যাওয়া-আসার পথে এবং বারদুই শান্তিপরিষদের* দুটি আন্তর্জাতিক অধিবেশনে মস্কো যাই। শান্তি পরিষদের সাধারণ সভায় প্রেসিডিয়মে এহ্‌রেনবুর্গও সমাসীন ছিলেন, তাঁকে পৃথক করে দেখার ততখানি সুযোগ হয়নি। সুযোগ হল ফ্রেণ্ডশিপ হাউসে, সাহিত্যকারদের শাখার বিশেষ অধিবেশনের সময়। এহ্‌রেনবুর্গ ১৬ই জুলাই (১৯৬২) সেই শাখা অধিবেশনের মূল সভাপতি ছিলেন। তাঁর ভাষণও শোনার সৌভাগ্য হল। মূল রচনা থেকে তা যথা-নিয়মে তৎক্ষণাৎ ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে কানে আসছিল। তাঁর বক্তব্যের মূল বিষয়টি ছিল সাহিত্যিকের সামাজিক জীবন সম্বন্ধে সচেতন দায়িত্ব ও সেই মনোভাব-প্রণোদিত কার্যধারা। বেশি দীর্ঘকায় নন এহ্‌রেনবুর্গ। য়িহুদী বংশীয় খড়্গনাসা, বদ্ধ ওষ্ঠাধর এবং মুখের ছাঁদ পিয়ার ফলের মতো। মাথায় উস্কোখুস্কো (shaggy) চুল। মোটামুটি বুদ্ধিজীবী সম্বন্ধে যে ভাব আমরা পোষণ করি—তেমনই মুখভাব। তাঁর ওই চুল—যা দিয়ে নাকি তাঁর সুহৃদসমাজেও তাঁর নাম—আর তাঁর কণ্ঠস্বরের ধ্বনিতে আমরা শ্রোতারা পাচ্ছিলাম অভিজ্ঞতালব্ধ প্রত্যয়।

যথাকালে আমার অধ্যাপনার নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত করে গৃহে ফেরার পথে আবার মস্কো এলাম। এখান থেকে গেলাম ইয়োরোপের কতকগুলি দেশ ঘুরে ফিরে দেখে আসার জন্য। জার্মানিতে হুমবোল্ড ইয়ুনিভার্সিটিতে এবং চেকোস্লোভাকিয়ার প্রাহা ইয়ুনিভার্সিটিতে আমার স্বামী (শ্রীগোপাল হালদার) ও আমার বক্তৃতা দেবারও নিমন্ত্রণ ছিল। সুতরাং ১৬ই জানুয়ারি আমরা মস্কো ছেড়ে গেলাম। রেল ভ্রমণে ব্যয় অপেক্ষাকৃত কম, দেশ দেখার সুযোগ অপেক্ষাকৃত বেশি। ইণ্টারন্যাশন্যাল ট্রেনে তাই লণ্ডনের উদ্দেশে রওনা হলাম। ওখান থেকে (মোটরেই বেশিটা) প্যারিস হয়ে লণ্ডনে ফিরে কিছুদিন থেকে আবার রেলেই ফিরলাম মস্কোতেই। এবার থেকে অর্থাৎ মস্কো ফেরার পর ব্যবস্থাটা গেল পাল্টে। যাবার সময় পর্যন্ত আমি ছিলাম ওই

দেশের সাময়িক কর্মী, আমার স্বামী ছিলেন আমার 'অতিথি'। আর ইয়োরোপ ঘুরে আসার পর আমার স্বামী হলেন সোভিয়েত লেখক সংঘের অতিথি। আর, সস্ত্রীক অতিথি। ১৬ই ফেব্রুয়ারি আমরা অপরাহ্ন বেলায় মস্কোতে পৌঁছলাম। সেদিন স্টেশনে প্রতীক্ষমান ছিলেন কয়েকজনা বন্ধু-বান্ধবী। শ্রীভিক্তর রামেসিস এবং শ্রীমতী মরিয়ম সাল্‌গানিক ছিলেন লেখক সংঘের পক্ষ থেকে। তাঁদের সঙ্গেই আমরা এলাম ভারশাভা হোটেলের একটি দ্বিকক্ষবিশিষ্ট স্যুইটে। এখানে চার-পাঁচ দিন থেকে ভারতবর্ষের টিকেট ইত্যাদি কেনা ও অন্যান্য ব্যবস্থা হলে আমরা দেশে ফিরব ঠিক হল। টিকিট পাওয়া গেল ২২শে ফেব্রুয়ারি সকালবেলায়। তার আগে পর্যন্ত সোভিয়েত লেখক সংঘের ব্যবস্থামতো আমরা মস্কোর দর্শনীয় স্থান কিছুকিছু দেখার সুযোগ পেলাম। আমার তো মস্কো প্রায় অদেখাই ছিল এতাবৎ। মানবতার তীর্থ-স্বরূপ লেনিনের সমাধিস্থল, ক্রেমলিন প্রাসাদের ম্যুজিয়ম, সেখানকার লেনিন-বাসকক্ষ ও কয়েকটি সুন্দর সুরক্ষিত চার্চ যা আগে দেখিনি—এবার দেখার সুযোগ ঘটল। আর সে সুযোগ ঘটল সোভিয়েত লেখক সংঘের সুপরিকল্পিত ব্যবস্থাপনায়। প্রায় বেশির ভাগ সঙ্গে থাকতেন শ্রীমতী মরিয়ম (মীরা)—তিনি লেখক সংঘের সদস্যা, তথা কর্মীও।

১৮ই ফেব্রুয়ারি বিকাল বেলায় আমরা বসে আছি—লেখক সংঘের সংলগ্ন 'লবি' বা প্রবেশ হল। কয়জনা পূর্বপরিচিতের দেখা পাওয়া গেল। কয়েক কাপ কফি খাবার পর উঠব উঠব করছি। এমন সময় হঠাৎ পাশের ঘরে তুমুল করতালির শব্দ শুনে উৎকর্ণ হলাম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সেদিক থেকে দ্বার খুলে একটি মাঝারি আকারের ভদ্রলোক স্মিত মুখে বুদ্ধির উজ্জ্বলতা পরিস্ফুট করে এই কক্ষে প্রবেশ করলেন। হাতে তাঁর তখনও কিছু কাগজপত্র। সম্ভবত পাশের ঘরে কোনও অধিবেশন শেষ করে তিনি ফিরে চলেছেন। আমাদের সোফার পাশ দিয়েই তিনি চলে যাচ্ছিলেন। যেতে যেতে একটু যেন থমকে দাঁড়ালেন। আমি জানতাম আমার শাড়ি ওদেশে তখনও খুব সুলভ-দর্শন নয়—অন্তত তা দৃষ্টিআকর্ষণীয়। লোক-সাধারণ যেভাবে আমার শাড়ি পর্যবেক্ষণ করতেন তা কৌতুকাবহ। আর, এহ্‌রেনবুর্গের মতো লোকের চক্ষে আমার ভারতীয় পরিচয় নিশ্চয় শাড়ি থেকে সূচিত হয়ে থাকবে। তিনি হাসিমুখে ঈষৎ নুয়ে অভিবাদন করতেই আমরাও প্রত্যভিবাদনের জন্য উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে হাসিমুখে সম্ভাষণ জানালাম। তিনি একটু এগিয়ে আবার ফিরলেন। ইঙ্গিত করে

মরিয়মকে ডাকলেন। মরিয়ম তাঁর সঙ্গে কথা কয়ে আমাদের কাছে জানতে চাইলেন আমাদের হাতে কিছু সময় আছে কিনা, এহ্‌রেনবুর্গ আমাদের সঙ্গে পরিচয় করতে চান। আমরা সানন্দে সম্মতি জানালে মরিয়ম জানাতে চাইলেন ২০ তারিখের সকালবেলা এহ্‌রেনবুর্গ তাঁর গৃহে আমাদের প্রাতরাশের আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। আমাদের সম্মতির জন্য তিনি অপেক্ষমান দেখে আমরা কৃতজ্ঞতা সহ সম্মতি জানালাম। তিনিও মরিয়মের কাছে কিছু নির্দেশ দিয়ে 'শুভ সায়াহ্ন' (দোব্রে ভেচের) জানিয়ে চলে গেলেন। ফেরার পথে মরিয়মের সঙ্গে আমাদের এই বর্ষীয়ান সুদর্শন সাহিত্যিক সম্বন্ধে আরও কিছু কিছু আলোচনা হল। যা জানতাম তার ওপরে নতুন কিছু জানা হল। মরিয়মও বললেন—তিনি শুধু ফরাসী ভাষাভিজ্ঞ নন, ফরাসী শিষ্টতা ও আলাপন-রীতিতেই তিনি অভ্যস্ত। তাঁর সমগ্র আকৃতির মধ্যে আমরা মার্জিতরুচি শ্রী এবং পশ্চিম ইয়োরোপের একটি বিশিষ্ট বৈদগ্ধ্য বরাবরই প্রত্যক্ষ করেছিলাম। জানতাম তিনি চারুকলার একজন বিদগ্ধ বিশেষজ্ঞ। মরিয়ম একবার ইন্দোনেশিয়া থেকে ফেরার সময় একটি যবদ্বীপীয় মূর্তি প্রায় কোলে করে সযত্নে ধরে আনেন এহ্‌রেনবুর্গকে দেবার জন্য। আমরা প্রশ্ন করলাম সেটা পেয়ে এহ্‌রেনবুর্গ খুশী হয়েছিলেন কিনা। পরিহাস বিদগ্ধা মরিয়ম হেসে জানালেন "আমি কোথায় সমস্ত রাস্তাটা কোলের ছেলের মতো ধরে আনলাম মূর্তিটিকে—তা, তিনি বল্লেন মূর্তিটা নাকি অত্যন্ত কুৎসিত।"

এসব কথা শুনে আমাদের ভাবনা—কাল তবে সাক্ষাৎ করতে যাবার সময় কি নিয়ে যাব এহ্‌রেনবুর্গের জন্য? আমরা তখন দেশাভিমুখী। অর্থসাধ্য প্রায় সংকুচিত। ভারতীয় জিনিসপত্র, উপহার, ব্যবহারের বস্তু ভালোমন্দ মিলিয়ে যা কিছু ছিল তা বিদেশের ও স্বদেশের বন্ধুদের দিয়ে-থুয়ে নিঃশেষ করেছি। অথচ বিদেশের একটি প্রথা আমাদের বড় ভালো লাগত। যখন কারুর বাড়ি কেউ প্রথম যান তখনই হাতে করে কিছু নিয়ে যান উপহার। এই সম্মানিত রুচিমান মনীষীর কাছে রিক্ত হাতে আতিথ্য নিতে যেতে মনও চাইল না। ভেবেচিন্তে অবশেষে মনে হল হয়তো এহ্‌রেনবুর্গ পারীর কিছু জিনিস পেলে খুশী হতে পারেন। দীর্ঘকাল তো তাঁর সেখানেই কেটেছে। আমরা লণ্ডন-পারীর বিমান পথে (skyways) বিমানেই বেশ কিছু সিগারেট কিনেছিলাম। এই পথটিতে ফরাসী সুগন্ধ, ধূমপানের দ্রব্য ও পানীয়ের উপর শুল্ক লাগে না। সুতরাং লোকে যাওয়া-আসার পথে যে পরিমাণ ঐ তিনটি,

বিশেষ করে শেষের ছুটি, বস্তু কেনে—তা প্রায় অপরিমেয়। 'পানীয়' নাম শুনলেই আমার হৃৎকম্প হত—লোকের ধূমপানটা কোনওমতে সহ্য করতাম। সুগন্ধির দাম চড়া হওয়া সত্ত্বেও সেটা কিনলাম। সোভিয়েতে সিগারেট তখন ভালো পাওয়া যেত না। দেখতাম, স্বদেশী বিদেশী আমাদের ওখানকার বন্ধুরা ব্লেড সিগারেট প্রভৃতির জন্য উন্মুখ হয়ে থাকতেন। তাই কিছু সিগারেট ও সুগন্ধি আমরা তখন সঙ্গে এনেছিলাম। এখন ভাবলাম হয়তো এহ্‌রেনবুর্গ পারীর সিগারেট পছন্দ করবেন।

পূর্বকল্পিত ব্যবস্থানুযায়ী ২০শে জানুয়ারি ১৯৬৪ সকালবেলা শ্রীমতী মরিয়মের সঙ্গে আমরা এহ্‌রেনবুর্গের বাড়িতে গেলাম। রৌদ্রে ঝলোমলো শীতের আকাশ, চারিদিকে জমা বরফ—বরফের পোষাক পরা রৌদ্রোজ্জ্বল মস্কোর রূপ অপরূপ। সেই নির্মল করোজ্জ্বল শীতের সকালের হাড়কাঁপানো হাওয়া আর আমার দুঃসহ মনে হত না ইদানীং। বরঞ্চ গত দু-বৎসরের অভিজ্ঞতা নিয়ে আমি যেন ভালো-বেসেই ফেলেছিলাম উত্তর মেরু-ছায়ার শীতঋতুর বৈশিষ্ট্য। তার মধ্যেই আমরা পৌঁছলাম এহ্‌রেনবুর্গের তিনতলার ফ্লাটে। ঘন্টি দেবার পর যিনি হাসিমুখে দরোজা খুলে ঘরে ডেকে নিলেন, তিনিই শ্রীমতী এহ্‌রেনবুর্গ। প্রসন্ন স্মিতমুখ, মর্যাদাময়ী গৃহিণী। শুনলাম তিনি শুধু সহধর্মিনীই নন, এককালে তিনি স্বামীর সহকর্মিনী সেক্রেটারিও ছিলেন।

এবার বসার ঘরে আমরা এসে বসলাম। সোভিয়েতের আর পাঁচটি শিক্ষাজীবীর মতোই সুন্দর রুচিসম্পন্ন সাজানো ছোট ফ্লাট। তবুও তার বৈশিষ্ট্য ছিল। গৃহগাত্রে ছিল অনেক আধুনিক চিত্র—পিকাসোর ছবিও—যা ওদেশে খুব বেশি দেখিনি। আরও ছিল পরিচ্ছন্ন কাবার্ডে সুবিন্যস্ত সুদৃশ্য বেতের ছাউনি দেওয়া আধারে নানান অভিজাত পানীয়। অবশ্যই এগুলি য়ুরোপীয় সমাজের অভিজাত গৃহের বৈশিষ্ট্য। এগুলির পরিবেশন মানেই আতিথেয়তার শিষ্টাচার, আর ঐ বস্তুর সমাদরই হল আতিথ্যগ্রহণের বিহিত রীতি। এহ্‌রেনবুর্গ কিন্তু বার দুই ভারতে এসে গিয়েছেন। ভারতীয়দের বেশির ভাগ এখনও যে ঐরূপ শিষ্টাচারের কায়দায় সহজে অভ্যস্ত নয়, বরঞ্চ তাঁদের রীতি যে অন্যরকম, একথা এহ্‌রেনবুর্গের মতো তীক্ষ্ণধী লোকের না জানার বা না বোঝার কথা নয়। সুতরাং তিনি শিষ্টাচারসম্মত নিয়মরক্ষা করতেই শ্রীমতী মরিয়মের মারফৎ জিজ্ঞাসা করেছিলেন আমরা কোনও পানীয় গ্রহণ করব কিনা। আমরাও বিনীতভাবে জানিয়েছিলাম যে, ঐরূপ পানীয়ের প্রয়োজন

আমাদের নেই। এক্ষেত্রে বলা প্রয়োজন আমি অন্তত বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ বোধ করেছিলাম এহ্‌রেনবুর্গের কাছে। আমার খাদ্যপানীয় বিষয়ে 'গোঁড়ামি' আমার স্বামীও খুব পছন্দ করতেন না। এবং, বিদেশে না গেলে আমিও জানতে পারতাম না যে আমার গোঁড়ামির ভিত্তি কীদৃশ পাকা। সর্বত্রই খাদ্যাখাদ্য বস্তুবিবেক নির্ণয় করে তবে আমার বাঙালি জিহ্বা খেতে পারত। আর, ভোজ্য পরিবেশিত নিমন্ত্রণ টেবলের সুসজ্জিত মণিকেন্দ্রে পানীয় ভরা বোতল দেখলেই ভয়ে বিতৃষ্ণায় আশৈশব রুচির শুচিবায়ুগ্রস্ত মন আমার বিপর্যস্ত হয়ে উঠত। এখানে যে অন্তত সে সমস্যা রইল না এই তো একটা মস্তবড় ব্যাপার।

সস্ত্রীক এহ্‌রেনবুর্গ আমাদের সঙ্গেই কয়েকপাত্র কফি ও প্রাতরাশ গ্রহণ করলেন। প্রাতরাশের ধরন ইংরাজের মতো নয়—রুশীয়ের মতোও নয়। তাহলে সেখানে সসেজ বা কালবাসা থাকতই। টেবলে সাজানো ছিল রুটি চীজ, কয়েক রকমের মিষ্টি কেক ও বিস্কিট ও ঐ সময়কার ফল। আয়োজনের অপ্রয়োজনীয় মহার্ঘতা ছিল না—নিরাড়ম্বর পরিচ্ছন্ন আয়োজন ছিল, ছিল স্মিত শিষ্টাচার ও আন্তরিকতা। শান্ত পরিবেশ, প্রসন্ন হাসিমুখের মধ্য দিয়ে আলাপন সহজ হয়ে উঠল। খাওয়া ও গল্প চলতে লাগল। বুঝলাম এ-শিষ্টাচারও বুনিয়াদীরূপের—পশ্চিম ইয়োরোপ তথা পারীর। খুব আশ্চর্য হবার কথা নয়। কারণ একটা সময় রুশিয়াতে বিদগ্ধ সমাজ বিশেষ যত্ন সহকারে ফরাসী কায়দাই আয়ত্ত করত। আর এহ্‌রেনবুর্গের কথা স্বতন্ত্র। তিনি তো দীর্ঘকাল পারীর অধিবাসীই ছিলেন।

কথা বেশির ভাগ এহ্‌রেনবুর্গ ও আমার স্বামীর মধ্যে হতে লাগল। শ্রীমতী মরিয়ম তা স্বচ্ছন্দ ভাবে অনুবাদ করে দিতে লাগলেন। ওঁরা দুজনাই সদালাপী তথা সাহিত্যিক। বাক্যরসিক বলে আমার খ্যাতি নেই, অতিবড় মিত্রও ঐ সুখ্যাতি আমার করতে পারবেন না—যদিচ কথা বেচেই আমি খেয়ে থাকি। শুনতে ভালো লাগছিল তাঁদের আলোচনা। আমার স্বামী তখন তাঁর রুশ-সাহিত্যের ইতিহাসের খসড়া তৈরি করেছেন। তাই রাশিয়ার, ও সঙ্গে সঙ্গে ভারতের, সাহিত্য-সমীক্ষা ও সাহিত্যের সমস্যা নিয়ে তাঁদের গভীর গম্ভীর সুরের কথাবার্তা চলছিল। (রুশসাহিত্য সম্পর্কে তাঁদের তীক্ষ্ণ স্বাধীন মনের আলোচনা-ফল পরবর্তীকালে আমার স্বামী তাঁর 'রুশ সাহিত্যের রূপরেখা' গ্রন্থে কিছুটা লিপিবদ্ধও করেন)। আমি দেখছিলাম এহ্‌রেনবুর্গের তীক্ষ্ণ খড়্গনাসা, পিয়ার

ফলের গঠনের মুখ আর বুদ্ধিব্যঞ্জক প্রতিভাদীপ্ত ললাট। সিগারেট পেয়ে ভারী খুশী হয়ে তিনি তা আমাদের সামনেই ধরালেন।

আমার সঙ্গেও সামান্য কথাবার্তা হল। তার বেশির ভাগই রুশিয়ার শিক্ষা-ব্যবস্থা নিয়ে। আমার কেমন লাগল সে-দেশের ছাত্রছাত্রীদের, এ-সম্বন্ধেও কথা হল। তাঁর কাছেই শুনলাম তিনি যখন প্রথমবার ভারতে আসেন, তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমবার আমার স্বামীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। পর পর দুইবার শান্তি পরিষদের সম্মেলনে তাঁদের সাক্ষাৎ হয়—একথাও তাঁর স্মরণে ছিল (১৯৫৮, ১৯৬২)। দেখতে দেখতে দেড়ঘণ্টার মতো একটি জমাট আড্ডা ঘনীভূত হয়ে উঠল আর শিল্পিজনোচিত ভাবেই তার সমাপ্তি ঘটল।

তখন এহ্‌রেনবুর্গ জানালেন এবার (বেলা সাড়ে এগারোটা) তাঁরা তাঁদের দাচা বা বাগানবাড়িতে যাবেন। পরিচারিকা এসে জানাল সব প্রস্তুত। আমরা উঠে দাঁড়িয়ে এহ্‌রেনবুর্গ দম্পতির কাছে বিদায় গ্রহণ করে এগিয়ে এলাম। তাঁরাও লিফট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেলেন। দরজা খোলাই রইল। আমরা নামতে নামতেই দেখলাম, এহ্‌রেনবুর্গ-পত্নী সযত্ন ও সতর্ক হাতে স্বামীকে তাঁর ভারী শীতের কোটটি পরতে সাহায্য করছেন। পরিশীলিত আলাপনের সুস্থ সুখস্মৃতি নিয়ে আমরা হোটেলে ফিরলাম। শ্রীমতী মরিয়মকে কৃতজ্ঞতা সহ বিদায়-সম্ভাষণ জানালাম। অমন বুদ্ধিমতী ও অনুবাদ-কুশলা মুখপাত্রী না হলে সেদিনের সভা জমত না।

এক-একটি ব্যক্তিত্ব সহজে ভোলা যায় না। এহ্‌রেনবুর্গও সহজে বিস্মৃত হবার মতো নন। সামান্য পরিচয়ও যে অসামান্য হয়ে স্মৃতিতে জেগে থাকতে পারে, তা সত্য। এহ্‌রেনবুর্গ শুধু রুশ সাহিত্যের সুপ্রতিষ্ঠিত লেখক বলেই নয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জর্মননীতির তথা য়িহুদী-বিদ্বেষবিরোধী যোদ্ধা বলেও নয়; এহ্‌রেনবুর্গের মর্যাদাময় ব্যক্তিত্ব দৃঢ়তায় ও মানব মহিমায় বারবার আমাদের স্মরণে উদিত হয়। যখনই তাঁকে মনে পড়েছে, মনে হয়েছে যে বিশ্বের কল্যাণ-কামী বুদ্ধিজীবীরা যেন একগোত্রীয়—যেন তাঁরা দেশকালাতীত বন্ধনে বাঁধা। আরো একটি কথা মনে হয়েছে। বর্ষীয়ান এহ্‌রেনবুর্গ খুব সচেতন (alert) এবং বাস্তবানুগ (Realist)। শেষোক্ত গুণগুলি লেখক সম্প্রদায়ে সব সময়ে পাওয়া যায় না।

দেশে ফেরার পর তাঁকে কিন্তু ভারতীয় জিনিস পাঠাতে মন চাইত। মনটা

খুঁৎ খুঁৎ করত তাঁকে কিছু ভারতীয় জিনিস আসার সময় দিতে পারিনি বলে। ১৯৬৫ সালে এ সুযোগ ঘটল। আমাদের শ্রদ্ধেয় আচার্য অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় রুশিয়া তথা উক্রাইনায় আমন্ত্রিত হয়ে ১৯৬৫ সালে সেখানে গেলেন। উক্রাইনীয় কবি শেভচেংকো মহাশয়ের সার্ধ শত বার্ষিকী স্মৃতি উদযাপনায় তিনি ভারতের পক্ষ থেকে যোগ দিতে যান। তখন তাঁর হাতে ওখানকার বন্ধুবান্ধবদের জন্য ছোটখাটো কিছু উপহার পাঠানোর সুযোগ ঘটেছিল। আমাদের পাঠানো একটি ছোট চন্দন কাঠের বাক্স এহ্‌রেনবুর্গের হাতে পৌঁছেছিল ; তিনি তা পেয়ে খুশী হয়ে যে চিঠি লিখেছিলেন সে চিঠিও আমরা পেয়েছিলাম। সুন্দর হস্তাক্ষরে পরিচ্ছন্ন সুবিন্যস্ত চিন্তায় মার্জিত ফরাসী ভাষায় লেখা পত্র। ইংরাজী ১৯৬৬ সালেও তাঁকে যথারীতি অভিনন্দন পাঠাই। ১৯৬৭ সালে আর সে সুযোগ আসেনি। তৎপূর্বেই এই মনীষীর মৃত্যু ঘটেছে।

রুশ সাহিত্য তথা বিশ্ব সাহিত্যের ক্ষেত্রে এহ্‌রেনবুর্গের তিরোভাব নিশ্চয়ই দুষ্পূরণীয় ক্ষতি। আমি ভারতের একটি সামান্য নারীমাত্র। আমার চোখেও সেই মানুষটির পরিচয় ধরা পড়েছিল একটি পরিণত মেধা, রুচিবিদগ্ধ মনীষীর বৈশিষ্ট্যে। আমার দেশের লোকের পক্ষে তাঁকে স্মরণে রাখা কর্তব্য, একথা স্মরণ করেই এ-লেখা লিখতে বসেছি। এইই আমার স্মৃতিতর্পণ।

এই সঙ্গে আরও একটি কথা মনে আসছে। সেদিনকার সেই রৌদ্রোজ্জ্বল শীতের সকালে এহ্‌রেনবুর্গের গৃহে সুমিত সুস্মিত আতিথ্যে পরিতুষ্টিসাধন করেছিলেন দুই বিদেশীকে এক স্নিগ্ধশ্রী মর্যাদাময়ী নারী। নারী প্রকৃতিও প্রায় সর্বত্রই এক। সেদিনের সেই সকালবেলা শ্রীমতী এহ্‌রেনবুর্গের সঙ্গে কথাবার্তা হতে পারে খুব কম। দাচায় যাবার জন্য তাঁরা তৈরি হচ্ছিলেন। শান্ত অভ্যস্ত হাতে স্বামীর হাতের কাছে জিনিসগুলি তিনি এগিয়ে দিচ্ছিলেন। কথাগুলি স্থিরভাবে শুনছিলেন। মুখের ভাবে মনে হচ্ছিল যে সেসব কথা ও জগতের সঙ্গে তিনিও সুপরিচিত। মূলকথা, খুব সহজ গৃহজীবনের একটি অলক্ষ্য প্রভাব সেই পরিবেশকে সুষমামণ্ডিত করেছিল। সেই পরিপূর্ণতায় তাঁরা দুজনাই বিধৃত ছিলেন। সেই বিদেশিনী নারীর কথাই আজ বারবার মনে আসছে। তাঁর গৃহের সেই পরিপূর্ণ রসের মধ্যে যে ক্ষয় এলো—তার শূন্যতা কি তাঁর জীবনে কখনও শেষ হবে ?

২৩।৯।৬৮

ইলিয়া এহ্‌রেনবুর্গ ঃ শেষ আলাপ

গোপাল হালদার

১

লিফট থেকে পা বাড়াতেই স্বাগত করলেন কর্মব্যস্ত গৃহকর্ত্রী, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই তাঁরা 'দাচা'য় রওনা হচ্ছেন, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত জিনিসপত্র তার মুখর সাক্ষী। আমাদের নমস্কার ও সম্ভাষণ তাই সকৃতজ্ঞ হলেও সসঙ্কোচ। বেশ বিলম্ব হয়েছে ও অপেক্ষিত সময়ও বিগতপ্রায়, যদিও সে অপরাধ আমাদের নয়। আমাদের মুখপাত্রী মীরা সাল্‌গানিক অবশ্য বুদ্ধি ও বিনয় সহযোগে তাও জানিয়ে দিচ্ছিলেন, বুঝলাম। তার আগেই ইলিয়া এহ্‌রেনবুর্গও স্বয়ং এসে গিয়েছেন। অভ্যর্থনা জানালেন—বিলম্বের অভিযোগও চোখে, মুখে যদিও স্মিত হাসি ও সহজাত পরিহাস। বার্ধক্য ইলিয়ার দেহকে অবনত করছে—কিন্তু বিদগ্ধ মনকে স্পর্শ করেনি, চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকেও নয়, কথার শাণিত ধারকেও নয়। অতিথিদের বিলম্বিত আগমনে মনও খুশি হবার কথা নয়। তবু দৃষ্টি যে তির্যক হয়নি,-আর সম্ভাষণ হয়নি বঙ্কিম, তাতেই আশ্বস্ত বোধ করলাম। অবশ্য নিমন্ত্রণ নিজেই তিনি করেছিলেন, গতকাল (১৮।২।৬৪) লেখক সঙ্ঘের ভবনে। ভারতীয় লেখকদের সঙ্গে আলাপে তাঁর আগ্রহ যথেষ্ট জানতাম। আমাদের দোভাষিণী মীরা তাঁর স্নেহের পাত্রী—মীরার বুদ্ধি, কর্মদক্ষতা, নানা ভাষার অধিকার প্রভৃতি গুণ ভারতীয়রাও অনেকেই জানেন। উর্দু ও হিন্দীতে তিনি পারদর্শিনী; আর ভারত এতবার দেখেছেন এবং এত ভারতীয়কে জেনেছেন যে, সম্ভবত আমরা অনেক ভারতীয়ও তাঁর কাছে হার মানবো। আমার স্ত্রী অরুণার তো তিনি সুহৃদ-স্থানীয়া। দেখলাম ইলিয়ারও মীরা আত্মীয়া-স্থানীয়া। কিন্তু মীরা সাল্‌গানিক-এর কথা এখন নয়; যদিও এখনি বলতে হবে, মীরার মতো বুদ্ধিমতী ও ইলিয়ার স্নেহের পাত্রী আমাদের মুখপাত্রী না হলে ইলিয়া এহ্‌রেনবুর্গ এর মুখে সম্বর্ধনা সম্ভবত তখন অম্ল-মধুর হতো—তিনি যে তখন দাচায় যাবার মুখে।

বসবার ঘরের দিকে নিয়ে যেতে যেতে এহ্‌রেনবুর্গ বললেন ফরাসীতে—"চারদিকের প্রাচীরেই বহু চিত্র—ত্যাখো, সব কিন্তু এ্যাবস্ট্রাকট আর্ট।" তারপর সরল আত্মীয়তায় বললেন—"একখানা যামিনী রায়ও আছে।"

বছরখানেক আগে খ্রুশ্চভ ও সোভিয়েত রাজনৈতিক নেতারা 'এ্যাবস্ট্রাকট আর্ট'-এর বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন, পার্টির ফরমান জারি হয়েছে। স্তালিনের মৃত্যুর পরে সোভিয়েত দেশে হাওয়া বদলেছিল—গোঁড়ামি ছাড়তে হবে। এহ্‌রেনবুর্গ নিজেও উৎসাহ বোধ করেন—বরফ গলছে, বসন্ত আসবে। নতুন কবিদের সাহস বাড়ে, শিল্পী ও চিত্রকররাও ভাবলেন—'আমরা চলি সমুখ পানে।' কিন্তু আপত্তি হলো, তর্ক উঠল। নতুন চিত্রকরদের একটা চিত্র প্রদর্শনীতে খ্রুশ্চভ গিয়ে তুড়ে তাঁদের গাল দিলেন। যথানিয়মে হলো লেখক-মণ্ডলীতে ও শিল্পিমণ্ডলীতে বিচারসভা। তাঁদের সিদ্ধান্ত হলো—এসব নতুন কবিরা ও বিমূর্ত শিল্পীরা সমাজতন্ত্রী শিল্পের আদর্শচ্যুত। সেসব তর্কে-আলোচনায় এহ্‌রেনবুর্গ ছিলেন নতুন শিল্প স্রষ্টাদের দলে ; তাঁদের মুরুব্বি। সভায় আলোচনায় তিনি নিজের মত ঘোষণা করেছেন। এবং শেষ অবধিও তা ছাড়েননি। শেষ আলোচনা-সভায় যখন ইভ্‌তেশেংকো প্রভৃতি যুবক কবিদের ও এ্যাবস্ট্রাকট আর্টের শিল্পীদের বিরুদ্ধে মণ্ডলীর রায় ঘোষিত হয় তখন সেখান থেকে তিনি বেরিয়ে আসেন—কর্তাদের সঙ্গে তিনি একমত নন। উপস্থিত উৎসুক শ্রোতাদের প্রশ্নের উত্তরে মন্তব্য করেন, "এ্যাবস্ট্রাকট আর্ট এখানেও গ্রাহ্য হবে—তবে আমি তখন বেঁচে থাকব না।" এসব জানা পুরনো খবর। প্রথম দু-চার মাস তখন রুশ দেশে ফরমান মানার উৎসাহ দেখা গিয়েছিল, দেখেছি। তারপরে তাও একটু থিতিয়ে এসেছে এখন। ফরমান অবশ্য জাহিরই আছে। ইলিয়া এহ্‌রেনবুর্গ সেই কর্তাদেরই শিল্প-নীতির কথা স্মরণ করিয়ে করলেন এই ব্যাঙ্গোক্তি—"সব এ্যাবস্ট্রাকট আর্ট"—আর আমাদের উদ্দেশে জানালেন—"একখানা যামিনী রায়ও আছে এর মধ্যে।"

ঘরের দেয়াল জুড়ে ছবি। অনেক ছবি। শুনেছি, এহ্‌রেনবুর্গের অনেক চিত্রই থাকে 'দাচা'য়, পল্লীবাসে। পৃথিবীর নানা দেশের শিল্পোপকরণে তাঁর আগ্রহ, আর নানা দেশের ফুল, লতা-পাতায়ও। মস্কোর আস্তানায় অত স্থান কোথায় ? তবু তাঁর ফ্লাট ছোট নয়—শয়নকক্ষাদি ছাড়াও সম্ভবত ঘর আছে—টাইপ-রাইটারের শব্দ শুনছিলাম বরাবর—অন্তত আছে এই বৈঠকখানা, মস্কোতে যা প্রায় কারো থাকে না। বাড়িটি পুরনো হলেও, বৈঠকখানা বড় ; প্রশস্ত যতটা তার চেয়ে দীর্ঘ বেশি। আর যতটা বড় তার থেকেও বেশি তাতে নানা সযত্ন-সংগৃহীত জিনিসপত্র, সোফা-সেটি প্রভৃতি, যাতে আড্ডা জমতে পারে, শীতের দেশে ; জিনিসপত্রের ঘেঁষাঘেঁষি তাতে মনে লাগে না। শিল্পোপকরণই বেশি—ছোট-

খাটো কিছু ভাস্কর্য, আর প্রাচীর জুড়ে ছবির পরে ছবি। প্রথম যুদ্ধের পূর্বে ইলিয়া এহ্‌রেনবুর্গ ছিলেন প্যারিসে, জার-সাম্রাজ্য থেকে নির্বাসিত পলাতক। সাংবাদিকতায় দিন গুজরানো ছিল দুর্ভার, প্রায় অসম্ভব, প্যারিসের শিল্পী-এলেকার কাফে রেস্তোঁরার অভুক্ত, অভাব পীড়িত, কফিজীবী অপরিচিত বিদেশী বুদ্ধিজীবীদের একজন, শিল্পিগোষ্ঠীর বন্ধু।—পিকাসো, মেন্দেলস্টার্ন প্রভৃতি সেসব বন্ধুরাই পরে ইউরোপের শিল্প-সংস্কৃতির ইতিহাসে বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছেন—এ্যাবস্ট্রাকট আর্ট কেন, আধুনিক কালের সকল শিল্পকলার কেউ বা তাঁরা মৃত অগ্রদূত, কেউ এখনো (পিকাসোর মতো) জীবিত শিল্পগুরু। এসব সকলেই পড়েছেন এহ্‌রেনবুর্গের পরম উপাদেয় স্মৃতিকথায়। আমিও পড়েছি। কিন্তু সাধ্য কি তখন তা মনে করি, তাঁদের শিল্পকর্ম খুঁটিয়ে দেখি। দেয়ালজোড়া ছবি আর ছবি—অনেকই যা 'বিমূর্ত'। কিন্তু সব তা নয়—অন্তত সবই রূপময়, আর আমার চোখে অপরূপ। রূপের পশরা সামনে—কিন্তু সামনে ইলিয়া এহ্‌রেনবুর্গও—এ্যাবস্ট্রাকট আর্ট নয়, একটা জীবন্ত মানুষ। রূপবান না হোন, রূপ-রসিক, আর বাক্য রসিক—ফরাসী বৈদগ্ধ্যে ও ফরাসী ব্যঙ্গোক্তিতে প্রায় 'রুশিয়ার ফরাসী সন্তান'। তাঁর সঙ্গে কথা বলতেই তো আসা; তাঁকে না দেখে তাঁর ঘরের ছবি দেখা সুবুদ্ধির কাজও নয়।

২.

"কী পানীয় তোমার অভিপ্রেত?"—প্রাঞ্জল ইংরাজিতে ফরাসী প্রশ্নটি অনুবাদ করে দিলেন মীরা—দু-ভাষাতেই তাঁর অধিকার স্বচ্ছন্দ। পানীয়ের প্রশ্নে বরাবরই বিব্রত বোধ করি। আমার স্ত্রীর মদের নামেই যেমন ঘৃণা তেমন ভয়। "দু-চোখে দেখতে পারি না।"—অত কুসংস্কার আমার নেই। কিন্তু মদ্যে আমার আকর্ষণ নেই। রুশ ভোদকা আমার বিবেচনায় তরলানল মাত্র। আর সুপ্রচলিত কনিয়াকও আমার কাছে বিস্বাদ। ফরাসী শ্যাম্পেন খানিকটা উপাদেয়। খুব উঁচু মানের জর্জীয় বা উক্রেনীয় বা আর্মানী সুরাও তদ্রূপ। কিন্তু শ্যাম্পেন জাতীয় ওয়াইন পরম সুস্বাদু, বেশ উপাদেয়, পেলে আমি তা আস্বাদন করি। এক্ষেত্রে তার অভাব হতো না—এহ্‌রেনবুর্গ ফরাসী বৈদগ্ধ্যে ও আতিথেয়তাতেই বেশি অভ্যস্ত। তবু অন্যত্র যেমন তেমনি এ-ক্ষেত্রেও মার্জনা চাইলাম—"আপনি তো আমাদের ভারতীয়দের জানেন, বিশেষ করে বাঙালিদের। আমরা কড়া

পানীয়ের পক্ষপাতী নই। চা, কফি, আর গ্রীষ্মে সরবৎ—এই আমাদের নিয়ম।" কফিরই ব্যবস্থা হলো—আমার স্ত্রীর কথায়—উম্যান ডিসপোসেজ। সঙ্গে কেক প্রভৃতি। চমৎকার পেয়ালা-প্লেট। পুরনো দিনের পর্সিলেন, মনে হলো গায়ে প্রাচ্য ধরনের কাজ। কিন্তু ততক্ষণে কথা এগিয়ে চলেছে। এহ্‌রেনবুর্গই সূত্রপাত করলেন—"রুশরা পান করে না—সুরাপান তাদের মধ্যে নেই।" চমকাবার মতো কথা—রুশরা মদ খায় না! এহ্‌রেনবুর্গ বলে চললেন—"পানীয় উপভোগের মতো কালচার আমাদের নেই। মদ গিলে আমরা মত্ত হতে চাই—আপনাকে ভুলতে চাই। আমাদের শিক্ষিত, কালচর্ড্‌দেরও এই দশা।"

অরুণা যোগ করলেন, "হাঁ, উনি বলছিলেন—রুশ দেশের লেখকরা অনেকেই নাকি অত্যন্ত মদ্যাসক্ত ছিলেন, নিজেদের শক্তিও তাতে কেউ কেউ বিনষ্ট করেছেন, আর নিজেদেরও নিঃশেষ করেছেন।"

ভাবলাম, লেরমনতভ থেকে ব্লক—নাম করতে হবে। কিন্তু প্রয়োজন হলো না। এহ্‌রেনবুর্গই বলে চললেন—"তার কারণ বুঝে দেখেছেন? রুশ সমাজটা কেমন ছিল? স্পর্শকাতর মানুষ কেন, একটু বিবেকবান ও ভাবুক মানুষেরই পক্ষে সে সমাজ অসহ্য ছিল। অবস্থাটা পরিবর্তন করতে পারছি না, অবস্থাটা তাই যে করে হোক ভুলতে হবে। আর অবস্থা ভুলতে হলে, যে কোনো উপায়ে হোক নিজেকে ভুলতে হবে। যত কড়া হয় মদ ততই ভালো। রুশ সমাজে মদ্যপানের অর্থ—মন-প্রাণের জ্বালা তাতে ডুবিয়ে দেওয়া যায়। সভ্য সমাজের সুরাপান এরূপ নয়। তারা পানীয় উপভোগ করতে চায়। ভালো সুরাতে চিত্ত মন সজীব সরল হয়, আলাপ-আলোচনা-গোষ্ঠীসুখ জমে ওঠে। মন, রুচি, রসবোধ, চেতনায় উজ্জ্বলতা আনে। রুশিয়ার সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থায় এই সুস্থ আনন্দ ও সামাজিকতা দুর্লভ ছিল। হাঁ, দুর্লভ এখনো—এখনো আমাদের লেখকরা, এমনকি উৎকৃষ্ট বুদ্ধিজীবীরাও, সত্যই সুরাপানে সজীব সরল হতে চান না—মদ গিলে আপনাদের ভুলতে চান।"

আমার ধারণা পুরাতনের জের। জারের আমল তো নেই, এখন সমাজতন্ত্র। সংবেদনশীল মানুষের আজ তাই মন-বুদ্ধি মুক্ত। আপনাকে ভুলে থাকবার তাড়না নেই। হাঁ, পুরাতনের ও-রকম জের টিকে থাকে। তবু বিশেষ করে মত বদলানো সহজ, কিন্তু আহারে পানে মানুষের অভ্যাস বদলাতে দেরি ঘটেই। সমাজতন্ত্র হলেই তো আর সঙ্গে সঙ্গে সে সকল অভ্যাস বদলে যায় না।

এহ্‌রেনবুর্গ কিন্তু সেদিক দিয়ে গেলেন না—"অভ্যাস টিঁকে আছে, শাসন বদলালেও এ-বিষয়ে অবস্থা তত বদলায়নি। একচ্ছত্র ক্ষমতা মন-বুদ্ধির চারদিকে গণ্ডী টেনে রাখতে চায়। যতই বুদ্ধি চিন্তা জাগ্রত হচ্ছে ততই মানুষ অনুভব করছে এই গণ্ডীর দৌরাত্ম্য, খর্বতা, পীড়ন; আর চেনা অভ্যস্ত পথেই চাইছে আবার গণ্ডীর বেড়া থেকে নিষ্কৃতি—মদের স্রোতে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়ে।

"—আলেকসন্দর ফাদেয়েভ ছিল আমার বন্ধু। ভালো উপন্যাস লিখেছিল গোড়ায়—'পরাজয়', '১৯ জন'। তারপর আর তেমন লিখতে পারেনি। খুব নাম ছিল, লেখারও বহুৎ ইনাম। যুদ্ধশেষে প্যারিসের শান্তি কংগ্রেস্থে আমরা এক সঙ্গে যাই। প্যারিসের বন্ধুরা জানাচ্ছে বন্ধুভাবে সোভিয়েতের সম্বন্ধে তাদের নালিশ—লেখকদের ব্যক্তিস্বাধীনতার অভাব, লেখকদের মামুলিপনা ইত্যাদি। ফাদেয়েভ চটে লাল। দাঁড়িয়ে তাদের আচ্ছা আক্রমণ করলে—সমাজতন্ত্রের মহান আদর্শের ও সংস্কৃতির তা জয়গান—ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়া সংস্কৃতি তার বুঝবে কি? আমরা প্যারিস ছাড়লাম। হোটেল থেকে বোতল নিয়ে বসেছিল ফাদেয়েভ, প্লেনেও সারাক্ষণ তাই চলল। মস্কোতে যখন নামলাম তখন ফাদেয়েভকে নামাতে হলো স্ট্রেচারে করে বেহুঁশ, দাঁড়াবার মতো অবস্থাও নেই।

"—দু-জনায় বরাবরের বন্ধুত্ব আমাদের। বহু আলাপ-আলোচনা দু-জনাতে রেস্তোঁরায়; আর তারপরে বাইরে পথে এসেও রুশ কবিতার কথাই চলছে—ফাদেয়েভ আধ ঘণ্টা ধরে একটার পর একটা আবৃত্তি করচে, পাস্তেরনাকের কবিতা-আবৃত্তিতে মশগুল। দু-দিন পরেই যেই বসল লেখক সঙ্ঘের সভা—ফাদেয়েভ তখন সঙ্ঘের কর্তা—মামুলি কটূক্তি ও কড়া ভাষায় ভর্ৎসনা করে চললে পাস্তেরনাক ও নতুন কবিদের—"তাদের কবিতায় মাথামুণ্ডু নেই।" সম্ভবত সভার পরেই আবার ভোদকায় নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছে ফাদেয়েভ।

"—হ্যাঁ, হাওয়া বদলেছে—কিন্তু একেবারে বদলায়নি। আর, সোভিয়েত কর্ণধাররাও কান পাকড়ে থাকতে অভ্যস্ত। কর্তাভজামি আর মামুলিপনাতেই অভ্যস্ত। রুশ সাহিত্যিকরা, শিল্পীরা তাই পিপায় পিপায় মদ না গিললে স্বস্তি পাবে কিসে?"

আলেকসন্দর ফাদেয়েভ মারা গিয়েছেন, সম্ভবত ১৯৫৬তে। পড়েছিলাম তিনি আত্মহত্যা করেছেন, হয়তো শারীরিক অসুস্থ ছিলেন বলে। কিন্তু

সুস্থই বা থাকবেন কি করে? রুশদের কাছেই শুনেছিলাম—মৃত্যুর কারণ অত্যধিক মদ্যপান। বাইরে থেকে যতটা বুঝি, এ-রোগ রুশ লেখকদের ও রুশ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এখনো কম নয়। তবে ওদেশে সুরাপান তো একটা সমাজসম্মত সাধারণ নিয়ম, আতিথেয়তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। প্রাত্যহিক বা উৎসব তো অধিকাংশের পক্ষে সুরাসাগরে সাঁতার কাটা। ক্রুশ্চেভের আমলেই বরং দেখেছি মাতলামির ও মদ্যাসক্তির বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করার চেষ্টা হয়েছে। মিলিশিয়া বা পুলিশের ভয়ও তার সঙ্গে আছে। পথে-ঘাটে মাতালের সংখ্যা আগের থেকে তাই কমেছে। সুরাপান অবৈধ বা নিষিদ্ধ নয়—পাশ্চাত্য দেশে তা অভাবনীয়। সম্ভব তাতে মাত্রা টানার চেষ্টা। অবশ্য তাতে রুশ দেশে মাতালদের কোনো অসুবিধা হয় না। রুশ জনসমাজেও মাতলামিতে তত ঘৃণাবোধ নেই। দেখা যায় একটু লজ্জা ও কৌতুক বোধ। মাতলামিতে ঘৃণাবোধ দেখা দিচ্ছে বরং এহ্‌রেনবুর্গের মতো রুচিবান লোকেদের মধ্যে—ওঁরা সুরার রসিক, জীবনের রসিক। সামাজিক সরস বৈদগ্ধ্যের সমজদার। কিন্তু সুরাপান নীতিবিরুদ্ধ বা গর্হিত, এমন কথা শুনলে ওঁরাও বোধহয় বিরক্ত হবেন বেশি। আর ব্যঙ্গবিদ্রূপে দক্ষ ইলিয়ার হাতে সেই মদ্যপান নিবারণী সভার সদস্যদের নিশ্চয়ই লাঞ্ছনার একশেষ হবে।

কথা হচ্ছিল রুশ সমাজ, সোভিয়েত সমাজ ও শিল্প-সাহিত্য নিয়ে। ইলিয়া এহ্‌রেনবুর্গ সোভিয়েত আদর্শের ও সমাজতন্ত্রের ভক্ত, সোভিয়েত সংস্কৃতিরও সমর্থক, শিল্পোদ্যোগে সোভিয়েত সাফল্যে গর্বিত। যন্ত্রশিল্প সোভিয়েত সংস্কৃতির বনিয়াদ। কিন্তু গৃহ তো শুধু বনিয়াদ নয়। সংস্কৃতির বনিয়াদের উপরে গড়া চাই তেমনি মন বুদ্ধিরও প্রশস্ত আয়তন—উন্নত মানসিক চর্চা, ন্যায়নীতির ব্যবস্থা, বিচার, বিবেক, চৈতন্যের মুক্তি, সাহিত্য ললিতকলায় মুক্তবুদ্ধির ও সৃষ্টিকল্পনার পরীক্ষা নিরীক্ষা নবায়মানতা। সোভিয়েত নেতাদের এসব বিষয়ে যে-দৃষ্টিভঙ্গি, তা তিনি কোনো সময়েই পুরাপুরি গ্রাহ্য করেননি। পূর্বে চুপ করেই তবু থাকতেন। ক্রুশ্চেভের আমল থেকে এই কথাটা মুখেও বলেন—বাঁধা বুলিতে ও মামুলিপনায় চলতে তিনি এখন নারাজ। তাই মুক্তমনের তরুণদের তিনি সমর্থক, উৎসাহদাতা। বলা বাহুল্য তাঁর আজকের আলোচনার মূল লক্ষ্যটাও তাই। সোভিয়েত কর্তাদের কড়াকড়ি তিনি আলগা করতে চান। চান শিল্পীর স্বাধীনতা—অবশ্য শিল্পীর দায়িত্ব বাদ দিয়ে নয়।

৩.

রুশ সাহিত্য সম্বন্ধেই সরাসরি কথা শুরু হলো। মীরার মুখে তিনি পূর্ব-দিনই শুনেছিলেন—আমি বাঙলায় রুশ সাহিত্যের একটা রূপরেখা লিখেছি। এবার সেই কথাতেই তিনি এলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথায় আরম্ভ করেছ, আর কোথায় এসে থেমেছ ?"

তখন পর্যন্ত আমার যা পরিকল্পনা ছিল, তা জানালাম। আমার উদ্দেশ্য—বাঙলা ভাষার পাঠকদের রুশ সাহিত্যের সম্বন্ধে একটু আকৃষ্ট করা, তাই একটি সহজবোধ্য বিবরণে রুশ সাহিত্যের পরিচয়-দান। সেই প্রয়োজন মনে রেখে আমি প্রাচীন (৮০০—১২০০) ও মধ্যযুগের (১২০০—১৭৫০) রুশ সাহিত্যের কথা প্রায় লিখিনি—লোমোনোসভ (১৭১১—১৭৬৭) থেকে আরম্ভ করেছি, আর থেমেছি ১৯১৭তে অক্টোবর বিপ্লবে এসে। বলে নিই—এ-পরিকল্পনা পরে আমি একটু শুধরেছি। প্রাচীন ও মধ্যযুগের রুশ সাহিত্যের কথা পরিমিত আকারে যোগ করেছি—পাঠক সেই ভার যতটা বহন করতে পারে, সেই পরিমাণে। আর ১৯১৭র পরেকার রুশ সাহিত্যের কথাও যোগ করেছি—যত স্বল্পে সম্ভব—ক্রুশ্চেভের বিদায়কাল অবধি। এহ্‌রেনবুর্গের এদিনকার আলোচনাও এদিকে আমাকে কতকটা প্ররোচিত করেছে, তা স্বীকার্য।

এহ্‌রেনবুর্গ বললেন, "তোমার যুগ-বিভাগটা কিরূপ বলো তো—১৯১৭তে থামলে কী হিসেবে ?"

প্রশ্নের সুরেই বুঝলাম এবার সমালোচনা আসছে। তার অর্থ তীক্ষ্ণ মন্তব্য ও বুদ্ধির শাণিত আঘাতও। প্রস্তুত হলাম সহ্য করবার জন্য, আর যথাসম্ভব সহজভাবেই জানালাম আমার পর্ব-বিভাগ—এখানে তার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। এহ্‌রেনবুর্গ তবু ধরলেন, "১৯১৭তে থামলে কী যুক্তিতে ?"

সহজ কথাতেই বললাম, বিপ্লবের যুক্তিতে। রুশ জীবন ১৯১৭র পরে নতুন হয়ে উঠেছে। আরো বড় যুক্তি। সোভিয়েত যুগের রুশ সাহিত্য এত বিশাল যে, আমার বই দ্বিগুণ আকারের হয়ে যেত, অথচ তবু তা বলা হয়ে উঠত না।

এহ্‌রেনবুর্গ বললেন, "কিন্তু ১৯১৭তে আসছ কেন ? অক্টোবর বিপ্লবে তো রুশ সাহিত্যের পর্বশেষ বা পর্বারম্ভ হয়নি। যে-ধারাটা পূর্ব থেকে

চলছিল, সিম্বলিস্টদের পরে—তা দুঃসাহসিক পরীক্ষার ধারা। ১৯১৭র পরে তা আরো প্রবল হয়ে ওঠে। বলতে পারো, ১৯২৭।২৮ পর্যন্ত তা অব্যাহত ছিল। বিপ্লবের সঙ্গে সাহিত্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা বরং বাড়ে। সব পরীক্ষা সমান সার্থক নয়, কিন্তু তখন পরীক্ষার দুর্জয় সাহস ছিল, সৃষ্টির চেষ্টাও তাতে অনেকটা সার্থক হয়েছে। ভেবে দেখলে, তা রুশ সাহিত্যের একটা উল্লেখযোগ্য যুগ।

"সেই সময়ে দেখি নানা সাহিত্যতত্ত্ব ও আন্দোলন—ইমেজিজম, ফিউচারিজম, লেফ-এর দল, প্রোলেটকাল্ট দল, ফর্মালিস্ত, সেরাপিওন ভ্রাতৃমণ্ডলী, কন্‌স্ত্রাকতিভিস্ত গোষ্ঠী ইত্যাদি। লেখকও কত বেরিয়ে এল: এসেনিন, মায়কোভ্‌স্কির মতো কবি; পিল্‌নিয়াক, ওলেসা, ৎসেভায়েভা, তিখনভ্‌, পাস্তেরনাক্ প্রভৃতিও তখনই উঠেছেন। বাবেল, লিওনভ্‌, ফেদিন, কাতায়েভ্‌—এসব ঔপন্যাসিকরাও এসে গিয়েছেন।"

এহ্‌রেনবুর্গ অনেকের নাম করছিলেন। তাঁর নিজেরও লেখা আছে তখনকার—নিজের নাম করলেন না। আমার মতে 'জুলিও জুরেদিতোর দুঃসাহসিক কর্ম'-এ তাঁর বৈশিষ্ট্য ভালো বোঝা যায়। তিনি ভলতেয়রের ভক্ত। তাঁর 'স্মৃতিকথা'ও যুদ্ধকালীন নিবন্ধের মতোই বিশেষ আকর্ষণীয়। আমার বিবেচনায় পরেকার উপন্যাসই বরং ততটা রসোত্তীর্ণ নয়—তা যেন সাংবাদিকের উপন্যাস।

এহ্‌রেনবুর্গ বলছিলেন, এ-যুগটা 'নেপ্‌ যুগ' (১৯২৪-১৯২৭) ছাড়িয়ে ১৯৩২ অবধি চলেছিল। তখন প্ল্যানিং-এর প্রথম যুগ (১৯২৮ থেকে)—শিল্পে উৎসাহ দেখা দিয়েছে, সাহিত্যও তাতে উৎসাহী। কিন্তু উৎসাহ সাহিত্যে তখনো উপদ্রব হয়ে ওঠেনি, লেখা ভালোই চলছে। ঝোঁকটা বোঝা হতে লাগল ১৯৩৪-এ। ১৯৩৩-এ লেখক-সঙ্ঘের সম্মেলন—গোর্কি যাঁর সভাপতি—অবশ্য স্তালিন মন্ত্রণাগুরু। নতুন সাহিত্য-নীতি তাতে প্রণীত হলো—সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা বা 'সোস্যালিস্ট রিয়ালিজম'। ১৯৩৪-এ শুরু হলো সেই নিয়মবাঁধা সাহিত্যের দিন—নীতি 'সোস্যালিস্ট রিয়ালিজম', পরিচালক লেখক-সঙ্ঘ। আরেক যুগ—স্তালিনীয় জবরদস্তি ও মামুলিপনা ক্রমেই চেপে বসতে লাগল। ওদিকে তো নানা জটিলতা, যুদ্ধের ছায়া আসছে ঘনিয়ে। যুদ্ধ পর্যন্ত তো ও-অবস্থাতেই যায়। যুদ্ধের পর্ব তোমরা জানো—সে তো আত্মরক্ষার পর্ব। আর, যুদ্ধের পরে ঝ্‌দানভ্‌-এর কুখ্যাত কড়া শাসন। শিল্প-সাহিত্যই প্রায় নাকচ করবার চেষ্টা।"

৪.

এহ্‌রেনবুর্গের যুগ-বিভাগে আমার সন্দেহ প্রকাশ করা তখন অসম্ভব ছিল, এখনো অসম্ভবই রয়েছে। কারণ, রুশ সাহিত্যের মূল বই পড়া-শোনা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য, অন্য কোনো ভিত্তিতে তার পর্ব-বিভাগ স্থির করা আরো দুঃসাধ্য। অনুবাদ ও যৎসামান্য পড়া-শোনা বুদ্ধি-বিবেচনার জোরে ও-বিষয় নিয়ে তর্ক করা চলে না—বিশেষত এহ্‌রেনবুর্গের মতো সাহিত্যবিদ্‌ লেখকের সঙ্গে। তবে সম্প্রতিকার রুশ বিশ্বকোষও দেখেছি—সোভিয়েত যুগের পর্ব-বিভাগ এখনো তাঁরা কালানুপাতেই করে থাকেন—যথা, বিশের পর্ব, ত্রিশের পর্ব, যুদ্ধের পর্ব, পঞ্চাশের পর্ব, এবং সমসাময়িককাল। ভাবধারা অনুপাতে বোধহয় এখনো সর্বস্বীকৃত পর্ব-বিভাগ গ্রাহ্য হয়নি। সেদিন আমি সবিনয়ে জানালাম আমার কথা—পাঠকের আগ্রহ, বই-এর উদ্দেশ্য, আকার-সীমা, ইত্যাদি। এহ্‌রেনবুর্গ তা বুঝলেন, কিন্তু যেভাবে আলাপ চলল, তাতে মনে হয় তিনি ১৯৩৩।৩৪-এর সময়ে একটা ছেদ টানতে চান। 'সোস্যালিস্ট রিয়ালিজম্'কে সঙ্ঘের সরকারী সাহিত্য-নীতি হিসাবে স্বীকার করা ও প্রয়োগ করাকে একটা পর্বচ্ছেদ ও পর্বারম্ভ বলে চিহ্নিত করা তিনি বিশেষ প্রয়োজন বলে মনে করেন। স্পষ্ট করে কথা হলো না, কিন্তু বুঝতে পারলাম 'সোস্যালিস্ট রিয়ালিজম' কথাটার উপর তাঁর তেমন ভক্তি নেই। অন্তত যেভাবে শব্দটির প্রয়োগ হয়েছে, তাতে তাঁর সম্মতি নেই। সোভিয়েত দেশে কমিউনিস্ট-রাজনৈতিক নেতৃত্বে যে-ঝোঁক যখন প্রবল হয়েছে, লেখক-সঙ্ঘের মারফৎ সাহিত্যে তখন তারই দাপটও বিস্তৃত হতে চেয়েছে। যদিও লেখক-সঙ্ঘ সম্পূর্ণ আত্মকর্তৃত্ববান, তবু কার্যত রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলাই সঙ্ঘের অভ্যাস। নেতৃত্বের মেজাজ ও মর্জি বুঝেই 'সোস্যালিস্ট রিয়ালিজম'-এর তাই ব্যাখ্যা হয়। তাতে আজ আখ-মাতোভা বাতিল হলেন, আবার কাল না হোক পরশু তাঁর অভিনন্দনও হয়। আমরাও এরকম লেখা ও লেখকের ভাগ্যনির্ণয়ের কথা প্রায়ই শুনি।

সাধারণভাবে রুশ সাহিত্যের প্রধান ঐতিহ্য হচ্ছে বাস্তবতার ঐতিহ্য—যথা, 'ক্রিটিক্যাল রিয়ালিজম','সাইকোলজিক্যাল রিয়ালিজম', আর তারপরে 'রিভোল্যুশনারি রিয়ালিজম' এবং এখন 'সোস্যালিস্ট রিয়ালিজম'। অন্যসব 'রিয়ালিজমই' এখন গৌণ। আর 'সোস্যালিস্ট রিয়ালিজম'-এর ছকে না পড়লে সে-লেখা সে-বই নিয়ে বড়ই দুশ্চিন্তা। কিন্তু সৃষ্টিধর্মী শিল্প বা সাহিত্য ছক মেনে চলতে চায় না।

তাই তেমন শিল্প ও সাহিত্য নিয়ে মতবিরোধও বাড়ে। সে-বই পড়ে কেউ বলে তা 'সোস্যালিস্ট রিয়ালিজম'-এর নতুন দিগন্ত উন্মোচন; অন্য কেউ তাতেই দেখে দিগ্‌ভ্রান্তি। এমন মতবিরোধ প্রতিদিনই ঘটছে। তার ওপরে আছে রাজনৈতিক হাওয়া বদল—লেনিনের পরে স্তালিন, স্তালিনের ক্রমবর্ধিত মতান্ধতা ও সার্বভৌম দমননীতি, তারপরে ক্রুশ্চেভ্ (এখন ব্রেজনেভ্)। দেখা যায় সোভিয়েত লেখক-সঙ্ঘ একদিকে যেমন 'সোস্যালিস্ট রিয়ালিজম'-এর নামে সাধারণভাবে রক্ষণশীলতা ও গোঁড়ামিতে অভ্যস্ত, অন্যদিকে ঠিক রাজনৈতিক কারণেই ওই নীতির নামে লেখক সঙ্ঘ ডিগবাজি খেতে পটু। কাজেই বুদ্ধিমান ও বিবেকবান লেখকদের এ-সবে স্বস্তিবোধ করবার কথা নয়। তবে আগে তাঁদের ভয়ে ভয়ে চুপ করে থাকতে হতো; এখন কেউ কেউ বলেন, "লেখক-সঙ্ঘের ওসব মত আমি বিশ্বাস করি না।" আবার, কেউ কেউ এহ্‌রেনবুর্গের মতো আরো স্পষ্ট করেই জানান—এই গোটা পরিণতিতেই অনাস্থা। পরিস্থিতির উদ্ভব—সাহিত্য-ক্ষেত্রের হিসাবে—সেই ১৯৩৩।৩৪-এর লেখক সম্মেলন ও 'সোস্যালিস্ট রিয়ালিজম'-এর মন্ত্র নির্ধারণ থেকেই। আরম্ভ হয় শিল্পে সাহিত্যে স্তালিনিজম-এর যুগ—যা শেষ হয়েও শেষ হচ্ছে না।

৫.

স্তালিনিজম-এর মূল কোথায়—এটি আমার জিজ্ঞাস্য ছিল। এখনো আছে। সন্তুষ্ট হবার মতো উত্তর কোনো রুশ বুদ্ধিজীবীর থেকে পাইনি। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যা তাঁরা বলেন তা জানি—কতকগুলি ঘটনা ও ঘটনার তাৎপর্য তাঁরা বুঝিয়ে বলেন—তাড়াতাড়ি এক দেশে সমাজতন্ত্র গঠনের জবরদস্ত ব্যবস্থা থেকে ট্রটস্কি প্রভৃতিদের নানা বিচ্যুতি, বাইরে হিটলার ও সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্ত, ইত্যাদি। ও-সব কথা মিথ্যা নয়। কিন্তু তা আমাদের সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট করেনি। এহ্‌রেনবুর্গের সঙ্গে এখন যা কথা হতে লাগল, তাতেও সন্তুষ্ট হতে পারিনি। তবে কিছু নতুন তথ্য ও নতুন ধরনের ব্যাখ্যা পেলাম যাতে পরিস্থিতির দু-একটি দিক একটু স্পষ্ট দেখতে পেলাম।

ইলিয়া এহ্‌রেনবুর্গ যা বললেন তার সারসংক্ষেপ এই: "দুর্ভাগ্যক্রমে লেনিন বড় শীঘ্র মারা গেলেন—ডিক্টেটরশিপ অব্ প্রোলেটারিয়েট কীভাবে গড়ে তুলতে হবে তার নীতি-পদ্ধতি তিনি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে উদ্ভাবিত, প্রণীত ও বেশি বিকশিত

করে যেতে পারেননি। বেঁচে থাকলে হয়তো তা সত্যই তিনি বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে বিকশিত করতে পারতেন। সাহস করে যে-লোক 'নেপ্' নীতি গ্রহণ করেছিলেন—কেতাবী কমিউনিস্টদের বাধাকে মানেননি—তিনিই সত্যকার ডিক্টেটরশিপ অব্ দি প্রোলেটারিয়েট-এর বা 'শ্রমিক আধিপত্য'র নীতি ও কার্যক্রম উদ্ভাবনা করতে পারতেন। পার্টি পরিচালনার ব্যাপারে ডিমোক্র্যাটিক সেন্ট্রালিজম বা গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিক শাসনের রীতি-পদ্ধতি প্রণয়ন করে (ভবিষ্যতের জন্য) সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টিকেও তিনি দৃঢ়ভিত্তিক করে যেতে পারতেন। দুর্ভাগ্যক্রমে লেনিন মারা গেলেন—এসব অসম্পূর্ণ রেখে। আরো দুর্ভাগ্যক্রমে বিপ্লবের প্রধান প্রধান নেতারা আরো অনেকেই বড় তাড়াতাড়ি মারা গেলেন—ফ্রুঞ্জে, ওর্জানিকিদ্জে, ঝারঝানস্কি ইত্যাদি। সহজেই পার্টিটা এসে পড়ল স্তালিনের হাতে। শ্রমিক-এক-নেতৃত্বের নামে পার্টিও পথ না-বুঝে হয়ে পড়ল জবরদস্ত পার্টি-নেতার মুখাপেক্ষী। পার্টির ভিতরকার নেতৃত্বের বিরোধ পার্টি সভ্যদের গণতান্ত্রিক চেতনা না-বাড়িয়ে বরং উল্টোদিকে এক-নায়কত্বের পরিপুষ্টির দিকেই সভ্যদের ঠেলে দিল। সোভিয়েত একদেশকেন্দ্রিতায় সোভিয়েত অহমিকাও দেখা দিল। স্তালিনের নীতি-পদ্ধতিই তাই চেপে বসতে পারল, স্তালিনও হয়ে উঠতে লাগলেন—পার্টির নেতা, ত্রাতা, সর্বদর্শী 'অভ্রান্ত গুরু'। ওদিকে এল হিটলারী বিভীষিকা। অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টি প্রথম পার্টি-নীতি হারাতে লাগল, তারপর কর্মপদ্ধতিও খোয়াল। ১৯৩৮।৩৯-এর পরে পার্টি ছিল কি ছিল না, তা গবেষণার বিষয়। পার্টিসদস্য অবশ্যই ছিল লাখে লাখে—কিন্তু তার কেন্দ্রীয় কমিটি প্রায় নিশ্চিহ্ন হলো—সে কমিটির সভা বসত না, তার পলিটব্যুরোরও সেই দশা। স্তালিন তাঁর দু-একজন সাকরেদকে নিয়ে পার্টির নামে হয়ে রইলেন 'শ্রমিক একনায়কত্ব'।"

৬.

লেনিনের তৈয়ারি কমিউনিস্ট পার্টি তাঁর মৃত্যুর ১৫ বছরের মধ্যেই প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেছল কি করে?—আমার এই প্রশ্নের একটা আংশিক উত্তর পেলাম—লেনিনের মৃত্যু, অন্যান্য প্রধান নেতার মৃত্যু, এ-সবের ফলে সমগ্রভাবে পার্টির যথার্থ কমিউনিস্ট চেতনা ও কমিউনিস্ট কর্মকাণ্ড মোটেই পাকা হতে পারেনি। পার্টি শৃঙ্খলার নামে ব্যক্তিপূজাই পাকা হয়ে ওঠে। 'সোভিয়েত দেশপ্রীতি' বা

পেট্রিয়টিজম-এর আড়ালে এক ধরনের জাতীয় অহমিকাও বাড়ে। কিন্তু আমার জিজ্ঞাস্য আরো একটু গভীরতর—রুশ জনগণের মধ্যে যদি পূর্ব থেকে গণতান্ত্রিক চেতনা থাকত, এমন কি, রুশিয়ায় গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া নীতি-পদ্ধতিরও কোনো স্থির ঐতিহ্য থাকত, তা হলে কি অমন একনায়কত্ব ও ব্যক্তিপূজা প্রশ্রয় পেতে পারত ? না, পার্টিটা 'ডিমোক্রাটিক সেণ্ট্রালিজম'-এর প্রথম শর্তটি (ডিমোক্রাটিক) বিস্মৃত হয়ে শুধু সেণ্ট্রালিজম-এর পদতলেই নিজের অস্তিত্ব প্রায় বিসর্জন দিতে পারত ?

ইদানীং অবশ্য এ-প্রশ্নটা আরো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। রুশ ও চীন—যে দুই প্রধান দেশে সমাজতন্ত্রী বিপ্লব সম্ভব হয়েছে, তার একটিতেও গণতান্ত্রিক উদারতার (বুর্জোয়া ডিমোক্রাসির) ঐতিহ্য ছিল না ; আর তার ফলেই এক রকম (জারতন্ত্রী ও চিয়াংকাইশেকী) একনায়কত্ব থেকে অন্য রকম (তথাকথিত শ্রমিকশ্রেণীর) একনায়কত্ব (বা ব্যক্তিপূজা) মেনে নিতে রুশিয়ার ও চীনের জনসাধারণের বাধা হয়নি। বর্তমান কমিউনিস্ট আন্দোলনের অভ্যন্তরীণ সঙ্কটের একটা প্রধান কারণ কি এই নয় ? এ-প্রশ্নটা মনে জাগলেও তখন (১৯৬৪) আমি তা উত্থাপন করিনি। এহ্‌রেনবুর্গ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "স্তালিন সম্বন্ধে তোমাদের দেশে ধারণা কি ?"

আমি বললাম, "আমার মনে হয়, কমিউনিস্টরা কেউ কেউ মনে করে স্তালিনের বিরুদ্ধে যা বলা হচ্ছে তা অসত্য, অন্তত অনেকাংশে অর্ধসত্য। অনেক কমিউনিস্ট অবশ্য তা মনে করে না। সাধারণ মানুষ মনে করে—স্তালিন অন্যায় অনেক করেছেন, তবে রুশিয়ার উন্নতিও তো তখন কম ঘটেনি। কিন্তু আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের মনে একটা সংস্কার আছে—মৃতদের তারা নিন্দা করতে চায় না। বিশেষ করে স্তালিনের মৃতদেহকে কবর থেকে তুলে দিয়ে অন্যত্র কবর দেওয়া, এ-ব্যাপারটা তারা খুবই বিসদৃশ কাজ মনে করে। এর প্রয়োজনই বা কী ছিল ?"

এহ্‌রেনবুর্গের চিন্তা অন্যদিকে বয়ে গেল, "কিন্তু মৃতদেহকে অমন মসলা-মেখে রক্ষা করা কেন ? এতো আমাদের রুশ প্রথা নয়, 'মমি' রক্ষা মিশরীয় রীতি। লেনিনকেও ওভাবে রাখা সেদিক থেকে রুশ-নিয়মের ব্যতিক্রম।"

কথাটা নতুন ধরনের। আমি কিন্তু তর্ক তুললাম, "কীয়েভ্-এ কাতাকুম্বস্ দেখেছি—মৃত্তিকাতলের খুপরিতে তোমাদের সাধুসন্তদের দেহ রক্ষিত আছে, অনেককাল ধরেই তো তা চলছে।"

এহ্‌রেনবুর্গ বললেন, "হাঁ, প্রাচীন মিশরীয় প্রথাটা সেখানকার খ্রীস্টানরা মিশরে গ্রহণ করে, পরে এই বাইজেনটাইন খ্রীষ্ট-মণ্ডলেও তা ব্যাপ্ত করে দেয়। রুশরা কিন্তু মৃতকে সমাধিই দিত।"

আমার মনে হয়, কথাটা ঠিক। 'মমি' রক্ষার বিদ্যা মিশরের উদ্ভাবনা, তাদেরই তা প্রথম অভ্যাস। কিন্তু খ্রীষ্ট-ধর্মের প্রথম যুগ থেকেই যখন পূর্ব ভূমধ্য-অঞ্চলের খ্রীষ্টজগতে এ-রীতি এমন পাকাভাবে চেপে বসেছে, তখন তা রুশ ঐতিহ্য হয়ে যায়নি কি? একটা প্রথা কতদিন চললে 'ঐতিহ্য' বলে গণ্য হয়?"

তখনকার মতো অবশ্য এ-তর্ক চলল না, সময়ও ছিল না। এহ্‌রেনবুর্গের গাড়ি নিচে তৈরি, তাগিদ আসছিল—বেরুতে হবে। আমাদেরও উঠতে হলো। আমি বললাম, "এসব তো হলো, কিন্তু দেশে আমার বন্ধুরা যদি জিজ্ঞাসা করে রুশ শিল্প-সাহিত্যে এখন পরিস্থিতি কী, কী বলব তাদের?"

এহ্‌রেনবুর্গ বললেন, "বলো, নিরাশ হবার কারণ নেই।—সব থেকে বড়ো আশার কথা, আমাদের পাঠকরা এখন নিজেরাই বিচার করছে, নির্দেশ শুনে মত স্থির করে না।"

নিশ্চয়ই আশার কথা।

এহ্‌রেনবুর্গ আমাদের লিফটের কাছে এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, "তোমাদের দেশের পাঠকদের সম্বন্ধে কি বলবে?"

আমি বললাম, "যাই হোক তোমাদের এখানকার মতামত, আমাদের পাঠকরা তোমার লেখা পড়ে—পড়তে চায়। বিশেষ করে পড়ে তোমার 'স্মৃতিকথা'র খণ্ডগুলি। এমনকি ভালো করে ভাষা না-বুঝলেও সেই বই ও মূলও কেউ কেউ কেনে, পড়তে উৎসাহী; আর তাই অনেক বিষয়েই তা থেকে জানে যা চাপা থাকে না। তোমাকে জানাতে পারি তাদের প্রীতিপূর্ণ কৃতজ্ঞতা।"

বিদায় নিয়ে এলাম। এ-বিদায় চিরবিদায়ও। পরদিন আমরা মস্কো ছাড়ি। আর দু-বৎসর পরেই ইলিয়া এহ্‌রেনবুর্গ পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। সে-বিদায়ের পূর্বলেখা সেবার সাক্ষাৎকালে তাঁর মুখে দেখেছিলাম। লিফটের মুখে শেষ দেখেছিলাম—একটু রঙ্গস্নিগ্ধ হাসি। একান্ত রঙ্গের নয়, একটু ব্যঙ্গেরও রেশ ছিল তাতে। জীবনপ্রান্তে পৌঁছে ওই ব্যঙ্গমিশ্রিত রঙ্গের হাসিতেই যেন তিনি পৃথিবীটাকে দেখছিলেন, ভলতেয়রের মতোই বুদ্ধি আর কৌতুক নিয়ে।

বোদল্যারের বিচার

অবন্তীকুমার সান্যাল

বোদল্যারের ফ্লর দ্যু মাল প্রকাশিত হয় ১৮৫৭ সালের এপ্রিল মাসে, কিন্তু প্রকাশক মালাসির গড়িমসিতে জুন মাসের শেষ দিকের আগে বাজারে বেরোয়নি। বইটির নাম ফ্লর দ্যু মাল হলেও, ফ্লর দ্যু মাল মাত্র এক গুচ্ছ কবিতা এবং ওই নামেই সেগুলি ছাপা হয়েছিল ১৮৫৫ সালে রেভ্যু দে দ্যু মঁদ পত্রিকায়। ব্যোদল্যার তাঁর বাছাই কবিতার একটি সংকলন প্রকাশ করতে গিয়ে এগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। বইয়ের নাম প্রথমে দিয়েছিলেন ল্যাঁব, তারপর লেস্‌বিয়েন, সর্বশেষে ফ্লর দ্যু মাল।

দু'বছর আগে যখন ফ্লর দ্যু মাল কবিতা-গুচ্ছ প্রকাশিত হয়েছিল তখনই তীব্র আক্রমণ করেছিলেন ল্য ফিগারো-র কাব্য সমালোচক গুস্তাভ ব্যুরদ্যাঁ। এবারে যখন বই-আকারে আত্মপ্রকাশ করল, তিনি সঙ্গেসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং যে ভাষায় ও ভঙ্গিতে আক্রমণ করলেন তা অভাবিতপূর্ব।

এই আক্রমণের পেছনে প্রেরণা ছিলেন স্বয়ং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। সেই বছরই তাঁর হাতের মুঠো থেকে ফসকে গেছেন ফ্লবের, মাদাম বোভারি অশ্লীলতার অভিযোগ থেকে রেহাই পেয়ে গেছে। তারই পাল্টা নিতে তিনি চাইলেন বোদল্যারকে কাঠগড়ায় তুলতে। ব্যুরদ্যাঁর প্রবন্ধ প্রকাশের সঙ্গেসঙ্গে বোদল্যার আদালতে অভিযুক্ত হলেন।

আদালতে যাবার আগে বোদল্যার ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপের চেষ্টা করলেন। রাষ্ট্রমন্ত্রী ম. ফুর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল, প্রথম চিঠি লিখলেন তাঁকে। তিনি লিখলেন:

> "আমার ইচ্ছা হয়েছিল গোপনে বিচার-বিভাগের মন্ত্রীর কাছে আবেদন করি, কিন্তু ভেবে দেখলাম, সে ধরনের চেষ্টা অভিযোগের প্রায় স্বীকৃতির পর্যায়ে পড়বে, এবং আমি নিজেকে মোটেই দোষী বলে মনে করি না। বরং আমি এমন একখানা বই লেখার জন্য গর্বিত যাতে অশিবের ত্রাস ও আতঙ্ক সুস্পষ্ট।"

মন্ত্রীমহোদয় তাঁর চিঠির উত্তরও দিলেন না। বোদল্যার ঠিক করলেন

আরও উঁচু পর্যায়ে যাবেন। মাদাম বোভারির মামলায় ফ্লবেরের রেহাই পাওয়ার ব্যাপারে সম্রাজ্ঞীর হাত ছিল। তাঁর কাছে পৌঁছবার জন্য বোদল্যার ধরলেন মাদাম সাবাতিয়েকে। কিন্তু কিছুতে কিছু হলো না। মামলার দিন ঠিক হল ১৮৫৭ সালের ২০শে আগস্ট।

মামলা সুরু হওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে বোদল্যার চেষ্টা করলেন ভাবী বিচারকদের সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু তিনি তাঁদের সম্পর্কে বিরূপ ধারণা নিয়ে ফিরলেন, লিখলেন :

> "তাঁরা যে সুন্দরী নন একথা বলবো না, বলবো যে তাঁরা জঘন্য কুৎসিৎ ; তাঁদের আত্মা নিশ্চয়ই তাঁদের মুখেরই প্রতিরূপ।"

বোদল্যার আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য তৈরি হলেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগগুলির অন্যতম ছিল—ধর্মের মর্যাদাহানি। তিনি ঠিক করলেন, ক্যাথলিক জগতের সম্মানিত বার্বে দোর্ভিলিকে দিয়ে এ সম্পর্কে নির্দোষিতার ছাড়পত্র লিখিয়ে নেবেন এবং তা হয়ত কাজে দেবে। বার্বে দোর্ভিলিও সঙ্গে সঙ্গে লিখে দিলেন। অতি অলঙ্কৃত রূপকের ভাষায় তিনি লিখলেন :

> "ম. বোদল্যার বলেননি যে অশিবের ফুলগুলি সুন্দর, এদের মধ্যে শিবের সুগন্ধ আছে, বলেননি যে এগুলি তাঁর মাথার মুকুট, এগুলি দুহাতে তিনি অঞ্জলি করে তুলবেন। এবং এখানেই তাঁর প্রাজ্ঞতা। বরং নামকরণের মধ্য দিয়েই তিনি এদের কলঙ্কিত করেছেন। ·· ···ভয়ঙ্কর ও ভীত কবি চেয়েছেন যে ফুলের ডালি থেকে—যে ফুল নৈবেদ্যের ডালি তিনি গ্রীক পূজারিণীর মতো আতঙ্কে চুল খাড়া-হয়ে-ওঠা মাথায় করে বয়ে নিয়ে চলেছেন—আমরা যেন জুগুপ্সার ঘ্রাণ নিই। এ সত্যিই এক মহান দৃশ্য।"

কিন্তু লেখাটি বেরুল না, ল্য পেই পত্রিকা ছাপতে অস্বীকার করল। বোদল্যার লেখাটি বিচারকদের কাছে পাঠালেন। তাতে ফল হলো এইটুকু যে, তিনি ধর্মীয় নীতিবোধে আঘাত দেবার অভিযোগ থেকে রেহাই পেলেন।

এবারে বোদল্যার সাহায্য চাইলেন বন্ধুদের কাছে, তাঁরা যদি বিচারকদের প্রভাবিত করতে পারেন। স্যাঁৎব্যভ তখন আকাদেমির সদস্য, তিনি কবির পক্ষ সমর্থনে লিখলেন :

> "লামারতিন আকাশকে আশ্রয় করেছিলেন, ভিক্তর উগো আশ্রয় করছিলেন মাটিকে এবং মাটিরও বেশি কিছুকে। লাপার্দ আশ্রয়

> করেছিলেন অরণ্যকে, ম্যুসে আশ্রয় করেছিলেন স্বর্ণোজ্জ্বল উৎসব-সমারোহের আসক্তিকে। অন্যরা আশ্রয় করেছিলেন গৃহকোণ, গ্রামীণ জীবনকে। তেয়োফিল গতিয়ে আশ্রয় করেছিলেন স্পেন এবং তার চড়া রঙকে। বাকী ছিল কী? তাকেই আশ্রয় করেছেন বোদল্যার। তিনি তা করতে বাধ্য হয়েছেন।"

স্যাঁৎ-ব্যভ যুক্তি দেখালেন আল্‌ফ্রে দ্য ম্যুসে অনেক অশালীন কবিতা লিখেছেন, তবু তিনি ফরাসী আকাদেমিতে উন্নীত। তিনি লিখলেন :

> "বই খুলে আমি ম্যুসের সেইসব কবিতা পড়ছি যা বেশ কয়েক পুরুষ মুখস্থ করে এসেছে; এবং দেখছি তা আমি আপনাদের সামনে আবৃত্তি করতে পারবো না। তবু তাঁর কবিতা চলে এসেছে; যুবক-যুবতীদের মধ্যে তাদের পথ করে নিতে দেওয়া হয়েছে, তাদের লেখককে ক্ষমা করা হয়েছে; এরা অন্য কবিতাগুলির সঙ্গে তাঁকে ফরাসী আকাদেমিতে নিয়ে গেছে। আমাদের দুরকম বাটখারা দুরকম মাপ থাকা উচিত নয়।"

গুস্তাভ ফ্লবেরও স্যাঁৎ-ব্যভের মতো যুক্তি দেখালেন। ম্যুসে ছাড়াও তিনি প্রসঙ্গ তুললেন বের্‌াঁজের। তিনি লিখলেন :

> "আমরা সদ্য সদ্য জাতীয় সম্মান দিয়েছি বের্‌াঁজেকে—অশালীন এই বুর্জোয়াকে, এই মহান বহুরূপীকে, যিনি গান গেয়েছেন সুলভ প্রেমের, চিত্রবিচিত্র বেশের।"

এইভাবে বন্ধুবান্ধব ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছ থেকে বোদল্যার যে সাহায্য পেলেন তা মোটেই কাজের হলো না। তিনি এবার উকিলের দ্বারস্থ হলেন। কিন্তু কাব্যে অশালীনতার অভিযোগ প্রসঙ্গে বের্‌াঁজের নজির তিনি কিছুতেই ভুলতে পারলেন না। এক চিঠিতে তিনি প্রশ্ন করলেন : "কাকে আপনারা বেশি পছন্দ করেন—বিষণ্ণ কবিকে, না উচ্ছল লজ্জাহীন কবিকে? অশিবের আতঙ্ককে, না, অতি উচ্ছলতাকে? অনুশোচনাকে, না, ধৃষ্টতাকে?" তিনি লিখলেন যে তাঁর বইয়ের ভয়াবহ নৈতিকতাকে বুঝতে হলে অশিবের ফুলগুলিকে একসঙ্গে দেখতে হবে, এদের আলাদা করে দেখলে বিশেষত্বের বড় অংশই নষ্ট হয়ে যাবে।

বোদল্যার বুঝতে পারলেন যে তিনি যত যুক্তিই দেখান, শিল্পবোধের কাছে যত আবেদনই করুন, বিচারকদের কঠিন মন তাতে গলবে না। তিনি শেষবারের

মতো চেষ্টা করলেন কাঠগড়ায় দাঁড়াবার আগে। রাজপ্রতিভূ এর্নে পিনারের মত যদি পালটায়, তাহলে তিনি বাঁচতে পারেন। কারণ, পিনারই ফ্লবেরকে অভিযুক্ত করেছিলেন এবং এবারও তিনিই বোদল্যারকে অভিযুক্ত করেছেন। বোদল্যার আবার বার্বে দোরভিলির সাহায্য চাইলেন। কিন্তু রাজপ্রতিভূ অটল রইলেন। কবি হিসাবে বোদল্যার-এর প্রতি সহানুভূতি জানালেও তাঁর কয়েকটি কবিতায় কয়েকটি শব্দ এবং চিত্রকল্প সম্পর্কে নির্মম হয়ে রইলেন। তবে তিনি সরকারী ভাবে যে অভিযোগ আনলেন, তা ফ্লবেরের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের চেয়ে অনেক লঘু। "তিনি অভিযোগের পরিসমাপ্তি করলেন এই বলে '···ম. বোদল্যারের মাথা চাই না, চাই সতর্কীকরণ।"

মামলা সুরু হলো।

আসামী পক্ষের উকিল শে দেস্তাঁজ স্যাঁৎ-ব্যভের জোরালো যুক্তিকে এড়িয়ে কেবল ম্যুসে ও বেরাঁজের সঙ্গে তুলনাটাই বড় করে দেখাতে চাইলেন। তিনি ম্যুসের লা বালাদ্ আ লা লুন কবিতার এই স্তবকটি উদ্ধৃত করে শোনালেন:

"একেবারে তপ্ত হয়ে শ্রীমান কিন্তু অভব্যতা সুরু করলেন শ্রীমতীর সঙ্গে, শ্রীমতী সুরু করলেন কান্না। শ্রীমান বললেন, উঃ আমি খেটে মরছি গো, তুমি কাজের কিছুই করছ না; তুমি ঠিকমতো থাকতে পারছ না।"

তারপর বিচারকদের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন: "আমি জিজ্ঞাসা করি, "তুমি ঠিক মতো থাকতে পারছ না"—এই বাক্যটির মধ্যে যে চিত্রকল্প আছে, বোদল্যারের সমস্ত বইয়ের মধ্যে এমন কোনো কিছুই কি তার কাছে যেতে পারে?"

তারপর তিনি উদ্ধৃত করলেন বেরাঁজের লা-গ্রঁমের কবিতা থেকে। উৎসবের সন্ধ্যায় নেশায় রঙীন হয়ে ঠাকুমা নাতনিদের কাছে বলছে:

"কি যে দুঃখ হয় আমার গোলগাল হাত, সুডোল পা আর হারানো সেই দিনগুলোর জন্যে···কী বললে, ঠাকুমা। তুমি লক্ষ্মী মেয়ে ছিলে না?···না, সত্যিই ছিলাম না; আর শুধু পনের বছরেই ছলাকলা কাজে লাগাতে শিখেছিলাম, কারণ, রাতে আমি ঘুমুতাম না···"

কিন্তু শে দেস্তাঁজের সওয়াল হলো খুবই দুর্বল। তিনি যে পথ ধরেছিলেন তা ছিল ভুল। আদালতে দর্শকদের মধ্যে হাজির ছিলেন বার্বে দোর্ভিলি, উকিলের সওয়াল সম্পর্কে তিনি কঠোর মন্তব্য করে গেছেন।

আদালত রায় দিল। বোদল্যার সুনীতি ও সুরুচিকে আঘাত করার

অপরাধে অপরাধী। সোজাকথায় তিনি অশ্লীলতার অপরাধে অপরাধী। তাঁর জরিমানা হল ৩০০ ফ্রাঁ এবং লেস্‌বস্‌ ফাম দাঁনে, লে মেতামরফস্‌ দ্যু ভাঁপির্‌, ল্য লেতে, আ সেল্‌ কি এত্র গেই, লে বিজু—এই ছয়টি কবিতার প্রকাশ ও প্রচার নিষিদ্ধ করা হলো। আক্ষেপ করে বোদল্যার লিখলেন: "যদি আমি নিজে আমি আমার পক্ষ সমর্থন্‌ করতাম তাহলে নিশ্চয়ই মুক্তি পেতাম।"

নিষিদ্ধ কবিতা ছয়টির শব্দ ও অর্থ নিয়ে আদালতে বাদী ও প্রতিবাদীর মধ্যে প্রচুর বাকবিতণ্ডা হয়েছিল। ক্রুদ্ধ প্রতিপক্ষ অশ্লীলতার নিদর্শন হিসাবে উদ্ধৃত করেছিলেন ল্য লেতে কবিতার এই স্তবকটি যার অনুবাদ বুদ্ধদেব বসু করেছেন লিথি নামে:

> "এ-কঠিন তিক্ততারে ডোবাতে, করবো শোষণ
> ধুতুরার নেশায় ভরা গরলের তীব্র ফোঁটায়
> ঐ তোর মোহন স্তনের আগুয়ান দৃপ্ত বোঁটায়—"

অনুবাদ মূল থেকে অতিবিচ্যুত। 'ল্য নেপাঁতে' এবং 'বন সিগুয়্য'-র একসঙ্গে অনুবাদ করা হয়েছে, ধুতুরার নেশায় ভরা গরলের তীব্র ফোঁটা। বুদ্ধদেব 'শারমাঁৎ গর্জ এগুয়্য'-র অনুবাদ করেছেন 'মোহন স্তনের আগুয়ান দৃপ্ত বোঁটা'। 'গর্জ' স্তন নয়, বক্ষোচূড়। ফারুসী 'গর্জ'-এ প্রতিশব্দ 'সাঁ্য' নেই। স্তন শব্দটি ব্যবহারের জন্যই 'বু' অর্থে 'বোঁটা'-র আগমন এবং মিলের খাতিরে 'ফোঁটা'-র প্রয়োগ। ফোঁটায় ফোঁটায় কি শোষণ হয়?

তর্ক উঠেছিল 'নেপাঁতে' শব্দটির অস্পষ্টার্থ নিয়ে। অভিধান দেখে তবে বিচারকরা আশ্বস্ত হয়েছিলেন যে শব্দটি গ্রীক, অর্থ একরকম ফুল, বিষাদের ঘোর কাটাতে ব্যবহৃত এক প্রকার মন্ত্রপূত পানীয় এবং হোমরে এর উল্লেখ আছে।

সবচেয়ে তীব্র আক্রমণ হয়েছিল আ সেল্‌ কি এ ত্র গেই কবিতার তিনটি স্তবকের বিরুদ্ধে, বুদ্ধদেব বসু 'অতিশয় লাস্যময়ী'কে নাম দিয়ে যার অনুবাদ করেছেন। আক্রমণ ছিল মুখ্যত এই লাইন কটির বিরুদ্ধে:

> "হ'তে চাই তোর ফুল তনুর হন্তা
> ক্ষমাশীল স্তনযুগলে আঘাত ক'রে—
> এবং উরুর বিস্মিত অন্তরে
> দীর্ঘ, কঠিন, ক্ষমাহীন এক খন্তা।

*

"ঐ অভিনব, উজ্জ্বলতর ঠোঁটে
সনির্বন্ধ প্রতিহিংসায় ছোটে
আমার তীব্র গরল—..."

অনুবাদে বুদ্ধদেব বসু 'তঁ ফ্ল্যঁ এতোনে'-র বাঙলা করেছেন, 'উরুর বিস্মিত অন্তরে'। এক্ষেত্রে অর্থ আগেরটির চেয়েও স্থূল হয়ে পড়েছে। বোদল্যার "গর্জ" ও 'ফ্ল্যঁ' শব্দ দুটি ব্যবহারে স্থূলতা পরিহার করতে চেয়েছিলেন নিশ্চয়ই লোকরুচি বা আইনের মুখ চেয়ে নয়, সম্পূর্ণ কবিতার প্রয়োজনে। যাই হোক, কবিতার শেষ স্তবকের 'ভেনঁ্যা' বা 'তীব্র গরল' শব্দটির মধ্যে প্রতিপক্ষ বোদল্যারের সিফিলিস রোগের ইঙ্গিত খুঁজেও পেয়েছিলেন। আসলে তিনি 'তীব্র গরল' অর্থে তাঁর বিষণ্ণতা, তাঁর দৌর্মনস্যই বুঝিয়েছেন।

লে মেতামরফস্ দ্যু ভাঁপির কবিতাটিকে অশ্লীল আখ্যা দিয়ে প্রতিপক্ষ বিচারকদের মন বিরূপ করে তোলার চেষ্টায় ছিলেন প্রথম থেকেই। বিশেষ করে এই লাইনটি ছিল আক্রমণের লক্ষ্য, বুদ্ধদেব বসু 'পিশাচীর রূপান্তর' নামে অনুবাদ করেছেন:

"বক্ষের বিজয়তটে সব কান্না করি প্রতিহত,
বুড়োদের হাসাই, কলমুখর বালকের মতো।"

লেসবস্ এবং ফাম্ দাঁনে কবিতা দুটির প্রসঙ্গে সরকারী অভিযোক্তা সবচেয়ে বেশি অশালীনতার অভিযোগ এনেছিলেন। তিনি বলেছিলেন:

"আপনারা নিজেরা এদুটি বাড়িতে পড়ে নেবেন, পড়ে দেখবেন, এতে আছে 'ত্রিবাদ'-দের চালচলন।"

'ত্রিবাদ'শব্দ প্রয়োগে বোদল্যারের ক্রুদ্ধ উকিল প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছিলেন যে 'ত্রিবাদ' নয় 'ফাম দাঁনে' অর্থাৎ 'অভিশপ্ত নারীরা'—কবি যে অভিধা ব্যবহার করেছেন সেটাই ঠিক। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, কবিতাটি প্রসঙ্গে তিনি সাফোর বেদনাকরুণ কবিতার উল্লেখমাত্রও করেননি।

১৯৬১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ছয়টি কবিতা বাদ দিয়ে বোদল্যার ফ্লর দ্যু মাল-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন এবং তাতে তিনি আরও পঁয়ত্রিশটি নতুন কবিতা যোগ করে দেন। এই সংস্করণের জন্য তিনি ভূমিকার তিন তিনটি খসড়া করেছিলেন, কিন্তু কোনটাই ছাপা হয়নি। তিনটি ভূমিকাই অবশ্য টিকে

আছে এগুলি থেকে বোদল্যারের সেই সময়কার মানসিক চাঞ্চল্য, ক্ষোভ ও অস্থিরতার পরিচয় পাওয়া যায়।

পটপরিবর্তন হলো অবশেষে এক শতাব্দী পরে ১৯৪৯ সালে। ফ্লর দ্যু মাল-এর দণ্ডাজ্ঞা প্রত্যাহারের আবেদন ফরাসী সরকার গ্রহণ করলেন। এডভোকেট জেনারেল দ্যুপুই (সেদিন ছিলেন পিনার) তাঁর সরকারী বক্তব্য শেষ করলেন এই বলে :

"লক্ষ্য হিসাবে বোদল্যার এঁকেছেন মানব-অস্তিত্বের যন্ত্রণার চিত্র, সে চিত্র সমস্ত প্রথাগত স্টাইল থেকে মুক্ত। তাল-লয়-সমন্বিত ধ্বনিময় ভাষায়—যাতে তিনি রাজা, যাতে কৃত্রিমতা নেই, আড়াল নেই, সেইসঙ্গে যাতে আছে তাঁর সমস্ত কলঙ্ক তাঁর ভয়ঙ্করত্ব তাঁর পদস্খলন, তাঁর দোষ, তাঁর সৌন্দর্যও—এই ভাষায় তিনি প্রত্যেককে তাঁর বাণী পৌঁছে দিতে চেয়েছেন। "যদি বোদল্যারের কোনো কোনো কবিতায় যৌনতার লক্ষণ থেকেও থাকে, কবি কিন্তু অশ্লীল অথবা স্থূল শব্দ পরিহার করেছেন। আমাদের প্র-পিতামহদের স্নায়ুর চেয়ে আমাদের স্নায়ু কম অসহনশীল। আমরা লেডি চ্যাটার্লির প্রেমিক মালির শৌর্যও হজম করেছি।

"সেইদিন থেকে আমাদের উচিত, ফ্রান্সকে যে-লেখকরা সবচেয়ে বেশি সেবা করেছেন তাঁদের এমন একজনের স্মৃতিকে যে-দণ্ড ম্লান করেই চলবে, সেই রাষ্ট্রীয় দণ্ডকে মুছে দেওয়া।"

সরকারী রায়ে এই অভিমতই স্বীকৃত হলো। আরও স্বীকৃত হলো যে বোদল্যারের কবিতা বিশুদ্ধ প্রেরণার ফল, তাঁর কোনো কবিতায় কোনো অশ্লীল অথবা স্থূল শব্দ প্রয়োগ করা হয়নি, ফ্লর দ্যু মাল প্রথম প্রকাশের সময় কাউকে সন্ত্রস্ত করে থাকলেও তা জনমতের অনুমোদন লাভ করেনি এবং তার বিচার ট্রাইবুনালও করেনি।

ধ্রুপদ

গোলাম কুদ্দুস

বর্ষণঋতুর শেষে আবার সোনালী রোদ।
সব ভুলে চেয়ে আছি
শরতের লঘু সাদা মেঘেদের দিকে।
ভুলেছি কি তবু সব কিছু?
শুধু জানি জগতের বাধাবিঘ্ন যত
জীবনের যত ভার গ্লানি
সব কিছু লঘু হ'য়ে ভেসে যাবে উড়ে যাবে
ঠিক এই শরতের মেঘেদের মতো।

মারকাট, মন্ত্রী, মোসায়েব, হোমরাচোমরা, ধামাধরা,
রাষ্ট্র আর রাষ্ট্রের নিশানা—
লোকসভা, রাজ্যসভা, পার্লামেন্ট, সিনেট, কংগ্রেস,
ডিক্টেটর, গণতন্ত্রী,
সজারুর যত কাঁটা আত্মরক্ষাপ্রয়াসসঞ্জাত,
দল, উপদল, নেতা, উপনেতা, মহানেতা, মহা সেনাপতি
হাল্কা হ'য়ে লঘু হ'য়ে ভেসে যাবে, উড়ে যাবে, মিশে-যাবে
ঠিক এই শরতের মেঘেদের মতো।

যত জাতি, যত দেশ, দেশের সীমানা,
শেয়ালের যত গর্তে যত মত, যত পথ,
সেয়ানা শয়তান, আর
যত ধর্ম, যত ভগবান,
খোলস, মুখোস, আর বুজরুকি, চোরাগোপ্তা যত
ভেসে যাবে উড়ে যাবে মিশে যাবে
ঠিক এই শরতের মেঘেদের মতো।

তার আগে হবে কিছু ঝড়,
ভারি ভারি কালো মেঘে গর্জন, ঘর্ষণ,
বিদ্যুৎ-বিক্ষোভ, বজ্রপাত,
প্রলয়ের জটাজালে সর্পিল সংঘাত।
আমি তার সঙ্গী নিরুদ্বেগ
যদি জানি সেই সংঘাতেরই বেগ
ছিঁড়ে ফেলে মেঘ,
আর তারই ফাঁকে ফাঁকে ঝরে নানা দেশে
নির্মল হাস্যের মতো রৌদ্রের কৌতুক।
উদ্বেগের ঘনঘটা বুকে নিয়ে আমি নিরুদ্বেগ
যদি জানি নদীকূলে অপেক্ষিছে শুভ্র স্বপ্নাতুর
কাশগুচ্ছ কামনা-কোমল,
শিউলির ডালে ডালে ফুল ফোটানোর আগে চলেছে মধুর
বধূর অধররাঙা লজ্জিত প্রণয়,
আর আকাশের কোণে লুকিয়ে রয়েছে সঙ্গোপনে
এই সব শরতের লঘু সাদা মেঘ।

যে পারে ভারের বোঝা লঘু ক'রে দিতে
শরতের মেঘেদের মতো,
সেই শুধু মন কেড়ে নেয়।
তার স্পর্শে থেমে যায় অতীতের স্মৃতি-রোমন্থন,
বর্তমান মেলে তার যাদুর পাখনা,
পলকে আলোক তার, সে যে ভবিষ্যৎ,
দৃশ্য থেকে উড়ে যায় অদৃশ্যের কোন স্বপ্নলোকে
ঠিক এই শরতের লঘু সাদা মেঘেদের মতো।

হয়তো আমিই লিখব

কৃষ্ণ ধর

হয়তো আমিই লিখব একালের কথা, কাহিনীর জটে জটে
বাঁধা থাকবে কোনো এক স্তব্ধ স্রোত, কল্লোলও শুনতে পাব
একদিন হয়তো আমরাই।

হয়তো আমিই লিখব অনশন বন্দীদের ঘুমভাঙা গান
ভাঙবে শিকল
ঝনঝন শব্দ তার শুনতে পাব একদিন হয়তো আমরাই।

এ শুধু শব্দ নিয়ে খেলা নয়, তার চেয়ে বেশি কিছু খোঁজা
আমাদের সকলেরই মুখ দেখে মনের ভিতর দেখা মতো
রক্তের ভিতরে আনাগোনা মন্ত্রগুপ্তি মানা
এ সবই আমি লিখব মরচে-পড়া লেখনীকে
আবার শানিত ক'রে হিংস্রতার মুখোমুখি হয়ে।

হয়তো হবেনা কিছুই, শুধু স্মৃতি নিয়ত দগ্ধাবে
নিজেরই অক্ষমতা ব্যঙ্গ করে দেখাবে নিজেকে
হয়তো নিজেই পুরনো বইয়ের পাতা খুঁটে খুঁটে
খুঁজব অতীত দিন, ম্লান সন্ধ্যা ঘিরবে দুচোখ

বাগানের বাসিফুল চেখে চেখে বিরক্তির স্তিমিত নখরে
দাগ কেটে যাব শুধু দালানের ইঁট বালি চুনে।

তবুও ঘৃণার টানে যাবনা জোয়ারে
যেহেতু এ বন্যা শুধু আপতিক ক্রোধাবিষ্ট নয়
রক্তের অমলকথা বহে নিয়ে আনে তারা
বসতবাড়িতে কিংবা ভাঙা ভিতে ঘোরানো সিঁড়িতে
তারপর উঠে যায় পাক খেতে খেতে
শহীদ মিনারে।

তাদেরই কথা লিখব, আজ যদি ফিরে যায়
কাল তারা ফের আসবে কলমের মুখে

হয়তো আমিই হব তার কবি, গল্পকার
শিল্পীর তুলিতে ছবি এঁকে দাঁড়াব সম্মুখে
হয়তো আমিই।

কোকিলের সন্ধানে

শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায়

কোকিল ডাকে না আজকাল, কাক ডাকে।
পোষা খরগোশদের জন্যে কচি ঘাস কিনেছে মল্লিকা
চড়া দামে। রথের মেলায় অল্প দাম দিলে সব পাওয়া যায়
কেবল কোকিল ছাড়া। ঐ দূরে গাছে
কে বেঁধেছে ঘোড়াগুলি, যাবে ওরা তল্পিতল্পা নিয়ে
অরণ্যনিবাসী কিছু কাজল রমণী,
তারা চোখ তুলে মেঘ চিনতে চাইছে আর দেখছে আকাশ
কাক ডাকছে ওদিকে ছপ্পরে
যেখানে সমস্ত দিনরাত্রি ধরে জল ঝরঝর ঝরে যায়
ভাঙা কলে, যেখানে কোকিল যদি নাও ডাকে, কাক ডাক দেয়
কোকিলেরই সন্ধানে আমরা এসেছিলাম রথের মেলায়
কেননা অনেক কাল কাকডাকা ভোর থেকে
সকাল রওনা দিয়ে ক্লান্ত হল বিকেল অবধি।

বিপ্লব

রেখা দত্ত

নিশীথ-প্রদীপ জেলে তোমাকেই খুঁজে ফিরি প্রাণের ভিতরে।
অন্তরের অন্তস্থল থেকে
তোমাকে নিয়ত ডেকে ডেকে
আমি দিশেহারা। এই পৃথিবীর অন্ধকার ঘরে
বারে বারে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে আপন পরিচয়
দিয়েছ। অথচ পরাধীন
আমি আজো। তুমি বরাভয়
ধর্মসংস্থাপন-কল্পে আমার শিয়রে কবে হবে সমাসীন?

সোনমাই গ্রাম

কেদার ভাদুড়ী

সূর্য অস্ত গেলো—
সূর্য উঠল—
এরই ফাঁকে
ভূতে-পাওয়া রাত্রির জমাট অন্ধকার
তৈমুর নাদিরের মিলিত পাহারায়
শক-হুনদল পাঠান মোগলের
চুনমুখে থুতু ছিটিয়ে
কি-এক অব্যক্ত ইশারায়
হৈ হৈ ক'রে নাচল
তারপর বুক পকেটে হোয়াইট হাউসের
পৈশাচিক দলিল বুলেটে মুখ শুঁকিয়ে
ছাগল ভেড়া মোরগ মুর্গিদের সঙ্গে
বুড়ো বুড়ী ছেলে মেয়ে এমন কি
শিশুদের প্রত্যেকটি কপাল তাক ক'রে
এক হ'য়ে গেলো—
সাম্য শান্তি স্বাধীনতার অপর নাম
ষোলই মার্চ উনিশ শো আটষট্টির
সোনমাই গ্রাম।

ভূগোলের টুকরো খবর—ভিয়েতনাম।
পাঁচ শো ষাট—এমন কিছু নয়,
একটি সংখ্যা মাত্র।
মৃত্যুকেও ভাগ করা যায় না,
মৃত্যু অদ্বৈত।
তবু তাদের তাজা নীল রক্ত
মানুষের স্বাধিকারের প্রশ্নে
এক স্বর্গীয় উত্তর—
সোনমাই গ্রাম।

পরিচিত বৃত্তে প্রেম

দীপক রায়চৌধুরী

এখন প্রেমকে চিনি, পরিচিত বৃত্তের স্বকাল,
দ্বিধা-দ্বন্দ্বে অহরহ স্নায়ুর শরীর,
অনুভবে সূচীমুখ সময়ের তীক্ষ্ণ স্পর্শসুখ ;
স্বভাবের অন্তর্গত সব প্রথা দেখ
কৌতুকে নিষ্ঠুর।

প্রত্যেকে ভুগছে, নানা প্রবৃত্তির কল্পিত অসুখ,
পাখির ডানার শব্দ বুকে করে
মুছে যায় নিস্পৃহ বিকেল,
পৃথিবীর মাঠে-ঘাসে অরাজক নৈঃশব্দ্য এখন ;
তারই মাঝে সাবধানে লক্ষ বুকে কেড়ে রাখা
শুধুই উত্তাপ।

সেই সব সেরে-ওঠা কবিতায়, গথিকে-গীর্জায়
বহুকাল ভুলে গেছি,
এখন কেমন সব ভিন্ন ভিন্ন ফলকে উৎকীর্ণ,
সারি সারি স্মৃতির কফিন ;
কিছু তার ধূপ-দীপে, বাসি ফুলে রজনীগন্ধায়
ছিটেফোঁটা হয়তো বা প্রোথিত সত্তায়।

সবরমতী

তরুণ সান্যাল

নদীর বালিতে জ্যোৎস্না শান্ত শাদা, নদীর চিকন জলে ছলছল সময়
এমন বিপুল শূন্য স্নিগ্ধতায়, সবরমতী, আছ শুয়ে কোন স্মৃতি বেদনা বিনত?
আমারও অনেক সুখ মুখ থুবড়ে অমনি বালিতে শুয়ে, ধবল নুড়ির বাঁকে
নরকরোটির পুঞ্জে, কঙ্কালে বলয়ে
আমারও অনেক সাধ অমনি চিকনজলে চূর্ণ ফেন-তরঙ্গের ছুরিতে নিহত।
মধ্যরাতে জলে ওঠে দাউদাউ আকাশ, আর্ত নারীর জঙ্ঘায় তীক্ষ্ণ ধাতব আয়ুধ,
দিনগুলি শকুনের ডানায় শম শম হাওয়া, আরব সমুদ্রে হা হা লোনাস্ফুর
স্ফীতি
আমি শুধু গুনে দিই অন্তরাত্মা, ত্রিশটি রূপার চাকতি এবং শোণিত ধূমে সুদ
নদী, আ রে দূরপ্লাবী মানুষের বেদনার স্রোত, নদী বালি ও প্লাবনে খাঁ খাঁ
হাঁ-মুখে হোঁচট খেয়ে পাতাল-পতনে দ্রুত নিয়ে যাও প্রীতিস্মৃতি,কখন বিস্মৃতি।

তিনি যেন এখানে ছিলেন, তাঁর শীর্ণ দেহে জলে উঠত ভারতবর্ষের অভিমান,
দুঃখ বজ্র হতো—
শূন্য গ্রাম, দগ্ধভাল মাঠে
দিনগুলি দৌড়ে যেত প্রলয় পয়োধি জলে, ইতিহাস দ্রুত নৌকা, নদী ছলাৎচ্ছলে,
তিনি যেন নদীর পাড়ের ভাঙা মসজিদে আজান, উষাউন্মীলনে লোকচলাচলে
শান্ত পথ
এখন চশমায় তাঁর ধুলো, কেউ মুছে দেয় না, ট্যাকের ঘড়িটি থেমে আছে
মৃত আমেদাবাদের হৃদপিণ্ডে, ঐ তিনি
গোলাপবিথার থেকে, তর্পণে নামেন রাজঘাটে

এবং তাঁরই নদী, সবরমতী, আ রে অশ্রুমতী, লজ্জাহীনা নগ্ন ধর্ষণের বিকৃত
স্বরাটে
মানুষের অপমান বহে যাও—যা কেবল অশ্রু স্বেদ রক্তের লবণে তপ্ত জল
সূতাকলে বিষাদপ্রতিমা গাঁথে নক্সিকাঁথা দুঃখের সুতায়
নিহত পুরুষ-নারী আগামী ভারত যেন মৃত শিশু দুজনের মধ্য নিয়ে
নদীর ছলছলে শুয়ে, স্বপ্নের বিভ্রমে নড়ে, কথা কয়
সে-কি তুলে ধরে ঢেউ, আরব সমুদ্রবাহী
মেঘ, মেঘে বিদ্যুতে হিস্মত?

মুক্ত দক্ষিণ ভিয়েতনামের চলচ্চিত্র

পরিমল মুখোপাধ্যায়

রোজকার মতো সেদিন সন্ধ্যায় আড্ডার আসর বসেছিল। তবে অন্যদিনের মতো সেদিন সবাই বক্তা নয়। বলছিলেন একজন, আর বাদবাকিরা চুপচাপ শুনছিলেন। বক্তা বন্ধুমহলে চলচ্চিত্রের একজন কঁনসিয়ার রূপে পরিচিত। সিনেমার কথা উঠলেই তাঁর কাছ থেকে তৎক্ষণাৎ আভাঁগার্দে, বুনুয়েল, নিউ রিয়ালিজম, নুভেলভাগ, আণ্ডারগ্রাউণ্ড মুভী ইত্যাদি পরিচিত-অপরিচিত বিষয়ে ছোটখাট লেকচার শুনতে পাওয়া যায়।

যাই হোক, অবান্তর কথা লিখে পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটানো ঠিক নয়। আসল কথায় ফিরে আসি। বন্ধুটি নয়াদিল্লীর আসন্ন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র-উৎসবে কোন দেশ থেকে কি ছবি আসছে তার ফিরিস্তি দিচ্ছিলেন। যেহেতু তখন কলকাতার কোনো সংবাদপত্রে সে-তালিকা প্রকাশিত হয়নি, তাই অদম্য কৌতূহল নিয়ে সকলে তা শুনছিলেন। দক্ষিণ ভিয়েতনামের নাম উঠতেই একজন অতি-উৎসাহী বন্ধু বলে উঠলেন, "শুনছি দক্ষিণ ভিয়েতনামের বিপ্লবী সরকারের একটি প্রতিনিধিদল ভারতে আসছেন। ওঁরাই কি ছবি আনছেন?" বক্তা একটু হেসে বললেন, "ধুৎ! ওই জঙ্গলে কি আবার ফিল্ম হয় নাকি! নয়াদিল্লীতে সায়গন সরকার ছবি পাঠাচ্ছে।"

কথাগুলো তীরের মতো কানে এসে বিঁধল। এতই বিস্মিত বোধ করলাম যে মুখে কথা জোগাল না, একটা প্রতিবাদ পর্যন্ত করতে পারলাম না। একটু বাদে যখন উত্তেজনার রেশটা মিলিয়ে গেল, তখন 'চলচ্চিত্র পণ্ডিত'-এর এই অজ্ঞতার জন্য দুঃখ বোধ করলাম। ওঁর না জানাই স্বাভাবিক, কারণ লণ্ডন-পারী-নিউইয়র্কের যে-চলচ্চিত্র পত্রিকাগুলিকে ফিল্মের বাইবেল জ্ঞানে ওঁরা আবশ্যিকভাবে পাঠ করেন, সে-পত্রিকায় ভিয়েতনামের জঙ্গলে ছবি তৈরির খবর ছাপা হয় না।

অন্যদিকে আমাদের দেশে একদল 'অতি-বামপন্থী' ভিয়েতনামের যে-চিত্রটি জনসমক্ষে তুলে ধরতে চান, তাতে আছে শুধু যুদ্ধ আর রক্ত। কিন্তু যুদ্ধের মধ্যে, সংগ্রামের মাঝে, অন্য জীবন আছে—সে-জীবন আনন্দের, শিল্পের, সৃষ্টির। আমাদের দুর্ভাগ্য—সে-জীবনের সংবাদ আমরা খুব অল্পই পাই। আর, এখানকার

পত্র-পত্রিকায় তা এত সামান্য ছাপা হয় যে সাধারণ পাঠকের প্রায় চোখেই পড়ে না। তাই ভিয়েতনামের জঙ্গলে ফিল্ম হয় কিনা, সে খবর না জানা হয়তো দুঃখের—কিন্তু দোষণীয় নয়।

১৯৬১ সাল। ভিয়েতনামের ইতিহাস নতুন দিকে মোড় নিচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন সৈন্যদের হাত থেকে মাতৃভূমিকে ছিনিয়ে নেবার জন্য দক্ষিণ ভিয়েতনামের জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের সশস্ত্র অভিযান ক্রমেই অধিকতর সাফল্যমণ্ডিত হচ্ছে। গঠিত হয়েছে 'মুক্ত অঞ্চল'। এই বছরেই মুক্ত অঞ্চলে চলচ্চিত্র শিল্পের সূচনা হয়। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্যেই গভীর জঙ্গলে গড়ে ওঠে 'গিয়াফঙ' বা লিবারেশন স্টুডিও। তারপর যুদ্ধের পরিধি বাড়তে থাকে। যুদ্ধ যত প্রবল আকার ধরে, মার্কিনী আর তাঁবেদার বাহিনীর দল ততই পিছু হটতে থাকে। আর সেই সঙ্গে বিস্তৃতি ঘটে মুক্ত এলাকার। এবং স্বাভাবিক-ভাবে সমৃদ্ধতর হতে থাকে মুক্ত অঞ্চলের চলচ্চিত্র শিল্প। চলচ্চিত্র শিল্পের এই বিকাশকে অব্যাহত রাখার জন্য পরবর্তী সময়ে আরো দুটি স্টুডিও স্থাপন করা হয়। এগুলি হচ্ছে 'সিনেমা অফ দি লিবারেশন আর্মি' ও 'সিনেমা অফ লিবারেশন'।

অক্টোবর বিপ্লবের পর সোভিয়েত রাশিয়ার চলচ্চিত্র শিল্পকে জাতীয়করণ করা হয়। অক্টোবর বিপ্লবের মহান নেতা লেনিন চলচ্চিত্রের ভূমিকা সম্পর্কে সেই সময় বলেছিলেন যে তথ্যচিত্র নির্মাণ দিয়ে কাজ শুরু করা উচিত এবং জনগণকে শিক্ষিত করার কাজে চলচ্চিত্রকে প্রয়োগ করা দরকার। মুক্ত অঞ্চলের চলচ্চিত্র নির্মাতারা লেনিনের নির্দেশ বাস্তবায়িত করেছেন। এখানে নির্মিত হচ্ছে তথ্যচিত্র—যা শুধু ভিয়েতনামের জনগণকেই নয়, সমগ্র বিশ্ববাসীকে ভিয়েতনামের সংগ্রাম সম্পর্কে অবহিত করছে।

মুক্ত অঞ্চলের চলচ্চিত্রকাররা এই নতুন শিল্পমাধ্যমে ধরে রাখছেন ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণকে। এই চিত্রগুলিকে শুধু আজকেরই নয়, আগামী দিনের মানুষও অনুধাবন করবে। এই তথ্যচিত্র ভাবীকালের এক অমূল্য দলিল।

১৯৬৩ সালে মস্কোয় তৃতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ববাসী সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল উৎসবে অংশগ্রহণকারী দেশের তালিকায় একটি নতুন নাম। এটি হচ্ছে 'মুক্ত' দক্ষিণ ভিয়েতনাম। উৎসবে প্রদর্শিত হলো দক্ষিণ ভিয়েতনামের মুক্ত এলাকায় তৈরি কয়েকটি তথ্যচিত্র। এরই একটির নাম 'বীরত্বপূর্ণ দক্ষিণ ভিয়েতনাম'। কলাকৌশলের দিক থেকে এই চিত্রটি

এত উন্নতমানের ছিল যে পাশ্চাত্যের প্রায় সব সমালোচকই উৎসবের আলোচনা প্রসঙ্গে এটির উল্লেখ করেন।

তারপর ১৯৬৪ সালে জাকার্তায় অনুষ্ঠিত এশিয়া-আফ্রিকা চলচ্চিত্র উৎসবে আবার মুক্ত অঞ্চলের চলচ্চিত্রকে দেখা গেল। এই চিত্রটি হচ্ছে 'আমাদের বন্দুক ধরে থাকতে হবে'।

দক্ষিণ ভিয়েতনামে যে-নতুন জীবন শুরু হয়েছে, এই চিত্রে তারই পরিচয় পাওয়া গেল।

সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন ফৌজ আর তাঁবেদার সৈন্যদের হটিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের দুর্বার বাহিনী একের পর এক জনপদ অধিকার করছে। এই মুক্ত এলাকায় জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের নেতৃত্বে শুরু হয়েছে এক নতুন জীবন। সে-জীবনে শোষণকারীদের স্থান নেই। চাষী পেয়েছে জমি। শ্রমিকের হাতে উৎপাদন-ব্যবস্থা। সকলের জন্য আছে চিকিৎসা আর শিক্ষার সুযোগ। এই নতুন জীবন আনন্দের। কিন্তু পররাজ্যলোভী সাম্রাজ্যবাদীর দল চায় এই সুখ-সমৃদ্ধিকে ধ্বংস করতে। তাই জল, স্থল ও শূন্য থেকে তারা মারণাস্ত্র ছাড়ছে। শত্রুকে এক পাও বাড়তে দিতে ভিয়েতনামবাসীরা রাজী নয়। গ্রামের বৃদ্ধ মোড়ল, চাষী রমণী, স্কুলের ছাত্র—সকলেই স্বাধীনতা, শান্তি ও সমৃদ্ধির অতন্দ্র প্রহরী। তাই তাদের বন্দুক ধরে থাকতেই হবে।

পরবর্তী বছরে (১৯৬৫) আবার মস্কোয় চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হলো। সেখানে মুক্ত অঞ্চলের দুটি তথ্যচিত্র 'দক্ষিণ ভিয়েতনাম লড়ছে' ও 'মুক্তিফৌজের সৈন্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ' প্রদর্শিত হয়। এবারে আর শুধু প্রদর্শন নয়, "জঙ্গলের ছবি" পুরস্কার অর্জন করল।

আন্তর্জাতিক বিচারক মণ্ডলীর এই স্বীকৃতি দ্বারা মুক্ত অঞ্চলের চলচ্চিত্রের উন্নতমান স্বীকৃত হলো, দুনিয়ার মানুষ উপলব্ধি করতে পারল মুক্তিসৈনিকেরা শুধু রক্তক্ষয়ী যুদ্ধই করে না, তারা শিল্পসৃষ্টিও করতে জানে।

চলচ্চিত্রের সঙ্গে মুক্ত অঞ্চল থেকে একটি প্রতিনিধিদলও এই উৎসবে যোগ দেন। প্রতিনিধিদলের নেতা লু ফোঙ থান সেখানে মুক্ত অঞ্চলের চলচ্চিত্র শিল্প সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করেন।

এই বিবরণ থেকে জানা যায় যে মুক্ত অঞ্চলে বছরে গড়ে চল্লিশটি করে তথ্যচিত্র নির্মিত হয়ে থাকে। তথ্যচিত্র নির্মাণের জন্য রয়েছে একটি সুসংবদ্ধ সাংগঠনিক ব্যবস্থা। প্রদেশ ও জেলাভিত্তিকভাবে ক্যামেরাম্যানদের দল গঠন

করা হয়েছে। এই দল দু-ভাবে কাজ করেন। প্রথমত এঁরা কেন্দ্রীয় প্রযোজক সংস্থার নির্দেশমতো চিত্র গ্রহণ করেন এবং দ্বিতীয়ত নিজস্ব চিন্তা অনুযায়ী কয়েকটি বিষয়ের চিত্রগ্রহণ করেন। এই সমস্ত চিত্রকে স্টুডিওয় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে সম্পাদনা ও অন্যান্য টেকনিক্যাল কাজ সারা যায়।

তারপর এই সমস্ত চিত্রের প্রিন্ট প্রদর্শনের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়। চিত্র প্রদর্শন যাতে ব্যাপক হয়, তার জন্যও ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিভিন্ন এলাকায় রয়েছে প্রজেকশানিস্ট বা চিত্র প্রদর্শকদের দল। তাঁরা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে এই সমস্ত চিত্র প্রদর্শন করে থাকেন। এঁরা যে শুধু মুক্ত অঞ্চলে নির্মিত তথ্যচিত্রই দেখান তা নয়। উত্তর ভিয়েতনামের ছবি এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের অবিস্মরণীয় ধ্রুপদী চিত্রগুলি সহ বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দেশের ছবিও তাঁরা দেখে থাকেন।

আর-একটি সংবাদ বোধহয় অনেকের কাছেই অবিশ্বাস্য মনে হবে। চলচ্চিত্রের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে শিক্ষাদানের জন্য মুক্তাঞ্চলে একটি ইনস্টিটিউট রয়েছে। ১৯৬৪ সালে এখান থেকে প্রথম শিক্ষার্থীদল পাশ করে বেরোন।

কলকাতায় মুক্ত দক্ষিণ ভিয়েতনামের কিছু চিত্র দেখবার দুর্লভ সুযোগ বর্তমান লেখকের হয়েছিল। এগুলি হলো 'কুচি' 'নিউজ ফ্রম সায়গন' 'উইথ বার্চেট ইন লিবারেটেড এরিয়া'।

'কুচি' একটি গ্রামের নাম। সায়গন থেকে দূরত্ব মাত্র তেরো কিলোমিটার। দক্ষিণ ভিয়েতনামের আর দশটি গ্রামের মতোই সাধারণ এই গ্রামটির একমাত্র বৈশিষ্ট্য হলো এটি একটি 'মুক্ত' গ্রাম। অর্থাৎ তাঁবেদার সায়গন সরকারের বাহিনী হটিয়ে এখানে স্থাপিত হয়েছে জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের শাসন।

সায়গনের নাকের ডগায় এই মুক্ত এলাকা মার্কিন প্রভুদের কাছে অসহ্য হয়ে উঠল। তারা মানচিত্রের বুক থেকে 'কুচি' গ্রামের নাম মুছে ফেলার সঙ্কল্প নিল। আধুনিক মারণাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বিশাল মার্কিনবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ল। অসংখ্য ট্যাঙ্ক গ্রামটিকে ঘিরে ফেলল। আর আকাশ থেকে অতিকায় বোমারু বিমান বিরতিহীন বোমাবর্ষণ করে চলল।

কিন্তু 'কুচি' শঙ্কাহীন মৃত্যুহীন। সেখানকার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা স্বাধীনতার সৈনিক। মাটির গভীরে বাসস্থান বানিয়ে, ফাঁদ পেতে, সাবেকী অস্ত্র নিয়ে 'কুচি'-বাসীরা মার্কিন আক্রমণকে প্রতিহত করল। শুধু তাই নয়, পরাজিত মার্কিনবাহিনীর অস্ত্র পর্যন্ত তারা দখল করে নিল। একবার নয়, বার বার

তিনবার তারা এই আক্রমণকে প্রতিহত করে। সায়গনের অল্প দূরে এই 'কুচি' আজও অপরাজিত।

এই হলো সংক্ষেপে 'কুচি' চিত্রের বিষয়বস্তু। এটি তোলা হয়েছে 'সিনেমা ভেরিতি' রীতিতে। এ-চিত্রের ক্যামেরাম্যানরা রণক্ষেত্রের মধ্য থেকেই যুদ্ধকে চিত্রায়িত করেছেন। অনেক দৃশ্যই দর্শককে স্তম্ভিত করে, ভাবতে হয় সেলুলয়েডের বুকে এ-সব কিভাবে তুলে রাখা গেল! সম্পাদনাও সবিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। নেপথ্যভাষণ রয়েছে, কিন্তু চিত্রের সাবলীলগতি ও চিত্রকল্প ভাষার অভাবকে মিটিয়ে দেয়।

ডকুমেণ্টারি চিত্রের জন্মদাতারূপে আখ্যাত জন গ্রিয়ারসন ডকুমেন্টারি চিত্রের সংজ্ঞা নির্দেশ করেছিলেন "ক্রিয়েটিভ প্রেসেনটেসান অব দি রিয়ালিটি"। 'কুচি' চিত্রে এই সংজ্ঞার প্রতিটি অক্ষর যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। আনন্দের কথা, এই তথ্যচিত্রটি যথাযোগ্য স্বীকৃতি পেয়েছে। পঞ্চম মস্কো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে এটি স্বর্ণপদক লাভ করে।

'নিউজ ফ্রম সায়গন' পনেরো মিনিটের সংবাদচিত্র। মার্কিনদের তাঁবেদার শাসকচক্রের বিরুদ্ধে সায়গনে ছাত্র ও বৌদ্ধদের যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ হয়েছিল, এই চিত্রে সেটাই তুলে ধরা হয়েছে। চিত্রে বিক্ষোভকারীদের উপর মার্কিন সৈন্যের নির্লজ্জ আক্রমণ, দিয়েম-কাই চক্রের অত্যাচার, বৌদ্ধদের আত্মাহুতি প্রভৃতি ঘটনা উপস্থিত করা হয়েছে। শত্রু এলাকায় গিয়ে মুক্তিফ্রণ্টের চিত্র-নির্মাতারা যেভাবে চিত্র তুলেছেন—তা বিস্ময়কর।

মুক্ত অঞ্চলের জীবনের সকল দিকের প্রকাশ ঘটেছে 'উইথ বার্চেট ইন লিবারেটেড এরিয়া' চিত্রে। পশ্চিমের সাংবাদিক বার্চেট গিয়েছিলেন মুক্ত অঞ্চলে সেখানকার জীবনযাত্রা প্রত্যক্ষ করতে। তাঁর সঙ্গ নিয়েছিলেন মুক্ত অঞ্চলের একদল ক্যামেরাম্যান।

গভীর জঙ্গল। সূচীভেদ্য অন্ধকার। অল্প দূর থেকেও মনে হয় সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে এখানে মানুষের পদচিহ্ন পড়েনি। গোপন পথ দিয়ে বার্চেট হাঁটছেন। কি দেখলেন তিনি? হিংস্র জন্তু? না। তিনি দেখলেন গভীর অরণ্যে গুপ্ত মানুষের ভিড়। একদিকে সংবাদপত্রের অফিস। কিছুটা দূরে ওষুধের কারখানা। বিস্ময়ের আরো বাকি ছিল। সেখানে দেখা গেল অস্ত্রের কারখানা। পরাজিত মার্কিন সৈন্যদের ফেলে যাওয়া অস্ত্র আর ভূপাতিত মার্কিন বিমানের টুকরো দিয়ে তৈরি হচ্ছে নতুন ধরনের অস্ত্র। মার্কিন

বৈমানিকের প্যারাস্যুট, মার্কিন সৈন্যদের পোষাক দিয়ে তৈরি হচ্ছে মুক্তি-সেনাদের পোষাক। মুক্ত অঞ্চলে 'মেড ইন ইউ এস এ' চিহ্নিত জিনিসের প্রাচুর্য দেখে পরবর্তীকালে বার্চেট আর বিস্মিত হননি।

এই রকম অসংখ্য ঘটনায় চিত্রটি পরিপূর্ণ। বার্চেট দেখেছেন উচ্চশিক্ষার বিদ্যালয়, শুনেছেন প্রাচ্য ও পশ্চিমের সঙ্গীত, দেখেছেন মুক্তিফৌজ অভিনীত 'হ্যামলেট'; আর প্রত্যক্ষ করেছেন জন্মভূমি থেকে মার্কিন সৈন্যদের বিতাড়ন করতে মুক্তিফৌজের মরণপণ সংগ্রাম। বার্চেট যে-অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন, এ-ছবির দর্শকদেরও সেই অভিজ্ঞতা হবে।

পুনশ্চঃ

নয়াদিল্লীর চতুর্থ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে যোগ দেবার সুযোগ বর্তমান লেখকের হয়েছিল। এই উৎসবে সায়গন সরকার একটি ছবি পাঠিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে উত্তর ভিয়েতনাম বা দক্ষিণ ভিয়েতনামের বিপ্লবী সরকারকে উৎসবে চিত্র পাঠানোর জন্য আমন্ত্রণ করা হয়েছিল কিনা উৎসব কর্তৃপক্ষ তা জানাননি।

যাইহোক, সায়গনের ছবি প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। এই ছবিটির নাম 'রেমিনিসেন্স'। একদা-হারিয়ে-যাওয়া প্রেমিককে ফিরে-পাওয়া নিয়ে ছবির কাহিনী। এই ছবির কয়েকটি সংলাপের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। "আমি মার্কিন সৈন্যকে বিয়ে করতে চাই" (নায়িকার বন্ধুর উক্তি)। "মার্কিন সেনা-অফিসে চাকরির মতো সম্মান নেই" (নায়িকার বর্তমান প্রেমিকের উক্তি)। "আজ সন্ধ্যায় আমেরিকান ক্লাবে নাচতে যাব" (নায়িকার উক্তি)। এ-ছবি দেখার পর যেকোনো দর্শকই বুঝতে পারবেন কেন এদেরকে মার্কিন-তাঁবেদার বলা হয়। এরা যে শয়নে জাগরণে সর্বদাই মার্কিনদের ধ্যান করছে—ছবিটি তার চমৎকার নিদর্শন। এ-ছবির কাহিনীবিন্যাস, দৃশ্যরচনা, অভিনয় ও আলোকচিত্র অত্যন্ত নিম্নস্তরের। চলচ্চিত্র উৎসবে এই রকম নিম্নমানের ছবিকে অন্তর্ভুক্ত করে কর্তৃপক্ষ উৎসবের মানকে এত নিচে কেন নামালেন—তা অবশ্যই দুর্বোধ্য রয়ে গেল।

বুদ্ধিজীবিকা ও বিষের কারবারী

এ. দিম্‌শিৎস

আমাদের বিপক্ষীয়দের সম্পর্কে ক্রমশ বেশি বেশি ও পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান অর্জন আমাদের যুগের তীক্ষ্ণ তত্ত্বগত সংগ্রামের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে, এদের তথাকথিত গণসাহিত্যের ভূমিকা-বিষয়ে ভালো করে একটু নজর দেওয়া। পুঁজিবাদী দেশগুলিতে অগণ্য সংখ্যায় প্রকাশিত ও অসংখ্য সিনেমা ও টেলিভিশনের চিত্ররূপের সাহায্যে পরিবর্ধিত এই "গণসাহিত্য" নির্জলা মিথ্যা, অপপ্রচার ও জনসাধারণকে বিমূঢ় করে তোলার বিশাল যন্ত্রের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।

এদের "তত্ত্ব" অনুযায়ী শিল্প দুই শ্রেণীর হতে পারে। এক, "বাছা বাছা লোকেদের জন্যে শিল্প", অর্থাৎ শাসকশ্রেণীর সেরা অংশ, বুর্জোয়া সমাজের "অন্তঃসার"-দের "পরিমার্জিত" ক্ষয়িষ্ণু শিল্প; এবং, দ্বিতীয়ত, "জনতার জন্যে শিল্প", অর্থাৎ সাহিত্যের বকলমে দুর্নীতিগ্রস্ত হাতুড়েদের লেখা স্থূল বাজে রচনা বা প্রচারধর্মী "পণ্যদ্রব্য"। কিন্তু এ-"তত্ত্ব" নিছক লোকনিন্দা ছাড়া কিছু নয়।

জার্মানির সোশ্যালিস্ট ইউনিটি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অধীনস্থ ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল সায়ান্সেস-এর জনৈক জার্মান বিজ্ঞানী ক্লাউস জিয়েবৃমান রচিত 'নভেলস অন দি কনভেয়র' (পরিবহন-চক্রস্থিত উপন্যাস সমূহ) নামের বইটি একটি মৌল গ্রন্থ। এটি এ-বছরই জার্মান গণতান্ত্রিক রিপাবলিক থেকে প্রকাশিত হয়েছে। পুঁজিবাদী দেশসমূহের "গণসাহিত্য"-র অনুধাবন যে কত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে আমাদের তত্ত্বগত সংগ্রামে তা যে কত প্রয়োজনীয়—এই বইয়ে তা সুস্পষ্টরূপে বিবৃত। "গণসাহিত্য"-র যে ঘোলাটে বেনো জল জার্মান ফেডারেল রিপাবলিকের বইয়ের বাজার এবং সিনেমা ও টেলিভিশনের পর্দাকে প্লাবিত করছে, তা পশ্চিম জার্মানির প্রতি-ক্রিয়াশীল চক্রের কর্মনীতির এক অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ মাত্র।

জার্মান ফেডারেল রিপাবলিকেই এই 'নোঙরা সাহিত্য', ভাড়াটে লেখা, আধা-অশ্লীল রচনা, রোমহর্ষক ও নর্দমার উপন্যাস সম্পর্কে প্রচুর লিখিত আলোচনা হয়েছে, কেননা ওদেশে সত্যিকার 'বেলে লেত্‌র' নামের যোগ্য সাহিত্যের তুলনায় পূর্বোক্ত ধাঁচের রচনার সংখ্যা ও প্রভাব ব্যাপকতর

কখনো কখনো সেখানে এই "গণসাহিত্য"-র বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদের কণ্ঠস্বরও আমরা শুনতে পাই। যেমন, জাকব মাদের 'কুয়েরবিস্‌কার্ন' পত্রিকায় তিক্তভাবে লিখেছেন যে "গণসাহিত্য"-র এই ঢেউ নব্য ফাশিস্ত মতিগতি বৃদ্ধির একটা লক্ষণ মাত্র। তবে ক্লাউস জিয়েরমান তাঁর বইয়ে নর্দমার এই নোঙরা, এই "বিকল্প" সাহিত্য সম্পর্কে সামাজিক দিক থেকে যে রকম পূর্ণাঙ্গ, কঠোর এবং বিধ্বংসী সমালোচনা উপস্থাপিত করেছেন—অপর কোনো সমালোচক তা করতে সমর্থ হননি। "গণসাহিত্য"-র পৃষ্ঠপোষকদের স্বরূপ তিনি এতে উদ্‌ঘাটন করে দেখিয়েছেন। এই পৃষ্ঠপোষকরা হলো এক-চেটিয়া পুঁজির মালিক, গির্জার অধিকর্তা ও রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ। আবার ফৌজী দপ্তরের কর্তাব্যক্তিরা এবং পুলিশ ও গোয়েন্দা দপ্তরের প্রধানরাও এর পৃষ্ঠপোষক। এই সাহিত্যের চলচ্চিত্র-রূপায়ণের অধিকার, প্রকাশন ও পুনর্মুদ্রণ থেকে এরা মুনাফা অর্জন করে। বর্তমানের প্রতিক্রিয়াশীল প্রচার-যন্ত্রের অন্যতম চালক শক্তিই হলো "গণসাহিত্য"। ক্লাউস জিয়েরমানের দৃষ্টিতে এ-সাহিত্য মিথ্যা, শঠতা ও অপপ্রচারের বিশাল, চতুর, সংগঠিত যন্ত্রের অংশবিশেষ। 'মাঝরাতের কিস্‌সা', গোয়েন্দা-কাহিনী, পকেট-বুক, কমিক্‌স এবং কুৎসিৎভাবে লেখা সুপরিচিত গ্রন্থাবলীর অবলম্বিত ভাষ্য, এ-সবই এই সাহিত্যের অঙ্গীভূত।

এ-সব বইয়ের প্রকাশ-সংখ্যা খুবই বেশি। এটুকু বলাই যথেষ্ট যে ১৯৬৫ সালে সারা জার্মান ফেডারেল রিপাবলিকে মোট ৫৭টি প্রকাশক সংস্থা শুধুমাত্র পকেট সংস্করণের বই-ই প্রকাশ করেছে। এইসব বইয়ের মধ্যে আছে প্রধানত মহিলা পাঠিকাদের মনে "ওষুধ" ধরানোর উদ্দেশ্যে লেখা "অভিজাত উপন্যাস", দীন-দরিদ্র নায়ক-নায়িকার সমাজের উচ্চ মঞ্চে আরোহণের যতরকম আষাঢ়ে গপ্পো, ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হিটলারপন্থী সৈন্যদের বীরত্বকাহিনী এবং সরকারের আশীর্বাদপূত গুপ্তচর, গোয়েন্দা, দালাল ও নাশকতার কাজে লিপ্ত নানা ধরনের খুনেদের নিয়ে লেখা গোয়েন্দা-উপন্যাস।

জার্মান ফেডারেল রিপাবলিকের প্রতিক্রিয়াশীল প্রকাশক-সংস্থার ও পত্র-পত্রিকাগুলির "ব্যাপক ফসল" এর চরিত্র নির্ণয় করতে গিয়ে ক্লাউস জিয়েরমান লক্ষ্য করেছেন যে কার্যত এই ফসলের সবটাই কমিউনিজম-বিরোধিতা ও সোভিয়েত-বিরোধিতায় আচ্ছন্ন। অবশ্য "অভিজাত উপন্যাস", হিটলারের পরাজিত সেনাধ্যক্ষ ও অফিসারদের এবং প্রতিশোধ আশঙ্কায় উন্মত্ত প্রাক্তন

নাৎসী রণাঙ্গনের সংবাদদাতাদের বানানো যুদ্ধবিবরণী, কুখ্যাত জেমস বনড-এর মতো অতি-মানবদের বিষয়ে লেখা বই এবং '০০৭ নং গুপ্তচর' সম্পর্কিত আইয়ান ফ্লেমিং-এর ১৫ খানা উপন্যাসের সব কখানাই ঝুড়ি ঝুড়ি ছাপা হয়ে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করছে। তাছাড়া, জেরি কটন ও 'কমিসার এক্স' বিষয়ে ধারাবাহিক উপন্যাসও প্রচুর ছাপা হচ্ছে। তদুপরি এই সব সাহিত্যের চিত্ররূপও হরদম তৈরি হয়ে চলেছে। এই প্রসঙ্গে জিয়েরমান পশ্চিম জার্মানির জনেক বিদ্বজ্জন হেরিবার্ত শ্লিংকার-এর কৌতূহলোদ্দীপক প্রামাণ্য রচনা উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন যে ১৯৬৫ সালের পূর্ববর্তী দশ বছরে ওদেশে যুদ্ধবাদী "মতাদর্শ" এবং মনোভাবকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্যে যেখানে ৫৮৫টি চলচ্চিত্র দেখানো হয়েছে, সে-ক্ষেত্রে মাত্র ৯টি যুদ্ধবিরোধী চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে।

জার্মান ফেডারেল রিপাবলিকে বিশেষ করে কমিউনিস্ট-বিরোধী "এটা কার কর্ম" জাতীয় এবং মেকি তথ্য-সংবলিত হিংস্র চরিত্রের সাহিত্যসৃষ্টিতে উৎসাহ দেওয়া হয়ে থাকে। পশ্চিম জার্মানির গ্রন্থকার ক্লাউস লুড্উইগ লাউ-এর মতে, এ-সব রচনায় প্রধান চরিত্রটি হচ্ছে এমন একজন যে "মানুষ-শিকারী, খুনে, দুর্দান্ত অপরাধী, শয়তানের বাচ্চা আর জাহান্নমে যাওয়া" এক ব্যক্তি। আর ওদেশের "যুদ্ধ-বিষয়ক গল্প-রচনা" হিটলারি প্রচাররীতির সব কটি ধরন-ধারণ রপ্ত করা নিছক বানানো লেখা ছাড়া কিছু নয়। এটুকু বলাই যথেষ্ট যে সাহিত্যের এই বিশেষ ক্ষেত্রে রীতিমতো গুরুত্বপূর্ণ ও প্রিয় লেখকের ভূমিকায় রয়েছে এমন এক ব্যক্তি যে এক কালের কুখ্যাত এক নাৎসী "লেখক" এবং হিটলারের কলমপেষা শকুনদের অন্যতম। এর নাম ই. ই. ডিউইন্গার।

পশ্চিম জার্মানির গ্রন্থকারদের বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে একথা নির্ভয়ে বলা চলে, "গণসাহিত্যের" ক্ষেত্রে যতসব ঝানু রাজনীতিক দুর্বৃত্তদের প্রবেশাধিকার ঘটেছে। সোভিয়েত-বিরোধী তথাকথিত যুদ্ধ ও "রহস্য ফাঁস" করা উপন্যাসের সবচেয়ে পরিচিত লেখকদের অন্যতম হচ্ছে জনেক হাইন্ৎস গুন্থার কন্সালিক। মাত্র এক বছরের মধ্যে ওই লেখকের নামে, সোভিয়েত জনগণের প্রতি পাশবিক বিদ্বেষে পরিপূর্ণ কমপক্ষে তিন বা চারখানা স্থূলকায় "রহস্য-রোমাঞ্চ" মার্কা উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। কন্সালিক আসলে একটা ছদ্মনাম। জিয়েরমানের মতে, অন্তত তিন ব্যক্তি, বলা যেতে পারে একটা

পুরো গোষ্ঠী, ওই নামে অনবরত এই নোঙরা জঞ্জাল স্তূপীকৃত করে তুলছে। এই ভাগ্যান্বেষী মানববিদ্বেষীরা সংবাদপত্র, প্রকাশন সংস্থা, চলচ্চিত্র ও টেলিভিশনের জন্যে হরবখত মালমশলা যুগিয়ে চলেছে।

এই "গণসাহিত্যের ফসল"-এর জনেক লেখকের স্বীকারোক্তি নিম্নরূপ: বয়স ৩৫ বছর, একদা-সাংবাদিক, বর্তমানে "লেখক"-এর পেশায় উন্নতি করতে বদ্ধপরিকর। অল্প সময়ের মধ্যেই লোকটি ছ-টি বিভিন্ন ছদ্মনামে আদিরসাত্মক, গোয়েন্দা, অবাস্তব কল্পনায় পূর্ণ এবং যুদ্ধ-বিষয়ক ৮৪ খানা উপন্যাস বানিয়ে ফেলেছে। কলমধারী এই বেঙ্গাটি সগর্বে ঘোষণা করেছে, "উপন্যাস পিছু ৫৫০ থেকে ৮৫০ মার্ক আমার রোজগার।" অন্যান্য তথাকথিত "লেখক"-দের স্বীকারোক্তিও একই রকম। অর্থাৎ, এক কথায়, হুজুর পয়সা দিচ্ছে আর নফর লিখছে। লিখছে আর লিখছে···

জিয়েরমান তাঁর বইয়ে জার্মান ফেডারেল রিপাবলিকের এই "গণসাহিত্য"-র ছুটি পরিষ্কার মূল ধারা লক্ষ্য করেছেন। প্রথমটি হলো, এর আমেরিকী-করণের পদ্ধতি, এবং দ্বিতীয় ধারা হলো, নব্য নাৎসী ভাবধারাগুলিকে সক্রিয় করে তোলা। "গণসাহিত্যের ফসল" ক্ষেত্রে নব্য নাৎসী ধারাটা হিংস্র-চরিত্রে এবং "গুপ্তচর"-মার্কা গল্পের ব্যাপারে বিশেষ করে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গত যুদ্ধের "ফ্রন্টলাইন সৈন্যদের" বীরপুঙ্গব সাজিয়ে চালানো, "ক্রেমলিনের ষড়যন্ত্র" ফাঁস-করে দেওয়া গোয়েন্দাকে অতি-মানবের মহিমায় দ্যুতিমান করে দেখানো এবং নোঙরা কুৎসা-রটনা—এ-সবই ডিউইন্‌গার-এর মতো ঘাগী হিটলারপন্থী ও আমেরিকী নব্য নাৎসী সকলেরই মস্তিষ্কপ্রসূত রচনার সমান বৈশিষ্ট্য। জিয়েরমান লিখেছেন, কিছু কিছু প্রকাশক সংস্থার প্রায় পুরো প্রকাশন পরিকল্পনাটাই এ-ধরনের "রচনাবলী" প্রকাশের ব্যবস্থামাত্র। এর একটা উদাহরণ, 'পাবেল প্রকাশন সংস্থা'। ১৯৬৬-৬৭ সালে এরা যে ২২ খানা বই প্রকাশ করে, তার মধ্যে ২০ খানাই একেবারে প্রকাশ্য যুদ্ধবাদী উপন্যাস, একটা তো আবার ভিয়েতনামে আমেরিকার যুদ্ধ-প্রচেষ্টাকে জনপ্রিয় করে তোলার প্রয়াসমাত্র। বন্‌-এর ফৌজী দপ্তরে এ-ধরনের বই প্রভূত কাজে লাগে।

প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া "গণসংস্কৃতি"-র স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা মার্কসবাদী সমালোচকদের অবশ্য কর্তব্য। আমাদের তাত্ত্বিক প্রতিপক্ষীয়রা পুঁজিবাদী জগতের জনসাধারণকে ভুল বোঝানোর এবং ভাঁওতা দেওয়ার জন্য ও অন্য যে যে দেশে সম্ভব সেই ভাঁওতাবাজি চালান দেওয়ার সর্বপ্রকার পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকে। তাদের সেই কর্মনীতি ও কৌশলের আসল উদ্দেশ্য ধারাবাহিকভাবে ও গভীরভাবে প্রকাশ করে দেওয়া আমাদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়।

অনুবাদক: মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

ঠাকুর যাবে বিসর্জন

লোকনাথ ভট্টাচার্য

[পাত্র-পাত্রী : নোংরা প্যান্ট ও ছেঁড়া-বুশ-শার্ট-পরা ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের অস্থিচর্মসার বটুকলাল বটব্যাল ওরফে বোঁচা ও তার অন্য তিন অংশ—যারা যথাক্রমে মিহি গলার খোঁচা, একটু ভারী গলার প্যাঁচা এবং বেশ ভারী গলার পেঁচো—এবং দর্শকদের মধ্য থেকে এক সুরূপা সুসজ্জিতা যুবতী। সময় : মঞ্চের উপরে, রবিবারের সকাল ; মঞ্চের বাইরে, দিন বা সন্ধ্যার যে-কোনো সময়। স্থান : মঞ্চের উপরে, কলকাতার কোনো সাধারণ রাস্তা—এক কোণে সাইন বোর্ড দেখা যাচ্ছে, 'নদীয়া মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠান', দোকান বন্ধ। বড় একটা থলে পড়ে আছে রাস্তার উপরে, ভিতরে কিছু আছে বলেই থলেটা ফুলে-ফেঁপে ঢোল হয়ে আছে—পাশেই বাসি গাঁদা ফুলের মালা, অদূরে দাঁড়িয়ে বোঁচা।]

বোঁচা। (দর্শকদের দিকে হাতজোড় করে) হুজুর, আমার মা-বাপ, আকাশ-বাতাস সাক্ষী—উঃ, কী ঘাম বলুন তো—যাকগে, যা বলছিলাম। হুজুর, আপনারা সজ্জন, আমি অকৃতার্থ, অধমের অধম—কাব্য কাকে বলে জানি না, নাটক কাকে বলে জানি না, নিজগুণে মার্জনা করবেন। আমি কিন্তু কথা বলতে জানি—জানেন, ভয়ংকর জানি—আর সেইটেই আমার পেশা। অবশ্য পেশা, হ্যাঁ, পেশাই বলতে পারেন। যদিও রোজগার? হা-হা-হা (হাসি), সেটা একটা প্রশ্ন বটে। রোজগার স্যার দুই নয়া, তিন নয়া, কখনো পাঁচ নয়া, কখনো দশ নয়া, বেশির ভাগই অষ্টরম্ভা (বুড়ো আঙুল দেখানো), হা-হা-হা (হাসি)—যার পকেটে যা থাকে, অর্থাৎ যে-ক'য়েকজন দেয় বা দিতে চায় বা দিতে পারে। আর আমি

সেলাম ঠুকি, এই যেমন আপনাদের ঠুকছি। না স্যার, পেশাটা পেশাই, রোজগারের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই—আমার এই পেটটা দেখছেন তো (পেটে হাত দেওয়া), কী আছে বলুন তো? বায়ু, নির্জলা বায়ু—তবু বেশি নয়, বেশি থাকলে খাসা একটি হৃষ্টপুষ্ট ফুটবল হত। মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল, ওঃ-হোঃ-হো (হাসিতে ফেটে পড়ে), মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল (ধেই ধেই নৃত্য করে)। আর হ্যাঁ, পেটটায় বিনা পয়সার কিছু জলও আছে, কর্পোরেশনের জল, ক-লি-কা-তা-ক-র্পো-রে-শন, মাঝে মাঝে পেচ্ছাব করে বাঁচি। (জিভ কেটে) হুজুর, আমার মা-বাপ, নিজগুণে মার্জনা করেন। শালা বাঞ্চোৎ জীবন, থ্যাক থুঃ (থুথু ফেলা, থলেটার পাশেই)। (সহসা নিচু হয়ে, থলেটাকে উদ্দেশ করে গাঢ় স্বরে) আ-হা-হা, শেষটায় তোর ওপর থুথু ফেললাম—কোথায় পড়েছে রে, কোথায় (খুঁজতে থাকে), জিভ দিয়ে চেটে নেব, ও-থুথু তোর গায়ে লাগতে দেব না। ও, তুই তো কিছুই বলবি না, তোর তো সব বলা শেষ হয়ে গেছে—না-না-না, কিছু মনে করিসনি, সোনা আমার, মানিক আমার, প্রেম আমার, ভাই আমার, বোন আমার। আমার বিয়ে-না-করা সেই বউটা তুই, আমার না-ভাই-থাকা সেই ভাইটি তুই, আমার না-বোন-থাকা সেই বোনটি তুই। বাবা-মা? (ভাবতে বসে) হ্যাঁ, বাবা-মা-টা এককালে ছিল—নইলে এলাম কী করে, এঁ্যা? (কৌতুকের হাসি) তাই থাক, বাবা-মা বলে তোকে না হয় আর নাই ডাকলাম। তবে তারা মরে গেছে, সেই কতকাল আগে, মনেও পড়ে না, এখন হয়তো ভূত-পেত্নী-বেহ্মদত্যি-শাঁকচুন্নী হয়ে কোনো গাছের ডালে ঠ্যাঙ ঝুলিয়ে বসে থাকে—কিন্তু এই দ্যাখ, কী কাণ্ড করে বসে আছিস, কারণ তুইও তো মরে গেছিস। হ্যাঁ রে, তবে কি তুইও একদিন শাঁকচুন্নী হবি, পেত্নী হবি, ভূত হবি, বেহ্মদত্যি হবি, একরত্তি হবি, দুরত্তি হবি, তিনরত্তি হবি··· ঐ ছাখ, কথার মারপ্যাঁচে আবার আমায় পেয়ে বসল। কথার তোড়ে ভেসে যাই, তোকে একবার আদর করতে আরম্ভ করেছি কি রক্ষে নেই। (চিন্তার ভান

করে), কিন্তু হ্যাঁ রে, তোকে ভূতও বলছি, আবার পেত্নীও বলছি, একই সঙ্গে সেটা কী করে সম্ভব ? হয় তুই ভূত, নয় তুই পেত্নী, অর্থাৎ ভূত যদি হতে চাসই একদিন বা হয়ে যাসই একদিন, কিম্বা পেত্নী যদি হতে চাসই একদিন বা হয়ে যাসই একদিন— কিন্তু ভূতও হবি, আবার পেত্নীও হবি, সেটা তো হয় না, হয় কি রে, তুইই বল ? তবে তো তোকে গোড়াতেই হিজড়ে হয়ে জন্মাতে হয়েছিল—হ্যা হ্যা (কৌতুকের হাসি)—না কি সত্যিই হিজড়ে হয়েই জন্মেছিলি ? কই, সেটা তো দেখা হয়নি ? অবশ্য দেখব কী করে, তোকে চিনলামই বা কবে—আজই তো প্রথম দেখা, এখানেই, এই রাস্তার উপরেই, কিন্তু তার আগেই তুই শেষ, কত আদরের রাস্তাটা যেন, হাজার টাকার পালঙ্ক, দুর্দান্ত ঘুমে মুখ গুঁজে পড়েছিলি, মাছি ভন ভন করছে চোখে —বেশ করেছিস, কেল্লা ফতে (সানন্দে চীৎকার), ভবলীলা সাঙ্গ, বৈতরণী পার, শালা বাঞ্চোৎ জীবন, শালা বাঞ্চোৎ জীবন, সেই শালা বাঞ্চোৎ জীবনকে কলা দেখানো। মানে মানে কেটে পড়লি ব্যাটা, যাঃ! তোকে নিয়ে আক্ষেপ নেই, আক্ষেপ এই আমাদের নিয়েই (যেন কাঁদতে বসে)। (হঠাৎ কথা ঘুরিয়ে) কিন্তু ভূত হবি না পেত্নী হবি, পুরুষ ছিলি না মেয়ে ছিলি, সে-মীমাংসাটা করে ফেলি তবে ; এ্যাঁ—কি রে, হাতে পাঁজি, মঙ্গলবার ? (থলেটা আগ্রহে খুলতে যায়, পরে কী ভেবে) থাক, কী হবে দেখে, কারণ তোকে ভূতও হতে আমি দিচ্ছি না, পেত্নীও হতে দিচ্ছি না, আমি ব্যাটা তোকে মোক্ষ পাইয়ে ছাড়ব, আমাকে কি কম পেয়েছিস ? আমি শালা জগতের সেরা পুরুত ডেকে তোর সৎকার করব, মন্ত্র পড়ব, গঙ্গাজল ছেটাব— আর বছর খানেক বাদে গয়ায় গিয়ে তোর পিণ্ডি পর্যন্ত দেব। হ্যাঁঃ, (ভেঙিয়ে ভেঙিয়ে) ভূত হবি, পেত্নী হবি—হওয়াচ্ছি তোমায়! ছাখো শালা এবার কত ধানে কত চাল। (আবার ভাবতে বসে) কিন্তু পুরুত পাচ্ছি কোথায় ? আর তোকে শ্মশানে বহন করে নিয়ে যাবেই বা কে ? কারণ কম-সে-কম চারটে তো বাহন চাই, রীতি-নীতি তো সব পালন করা চাই, বলো-হরি-

হরিবোল বলে পাড়া মাত করে চেঁচানো চাই—এসব করে কে, সে-বাহিনী এখন যোগাড় করি কোথায়? (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে) এই যাঃ, ফ্যাসাদে ফেলল দেখছি। শালা বাঞ্চোৎ এই কলকাতায় সব কিছুর অভাব, (হেসে) শুধু লোকের অভাব নেই, তবু সৎকাজে কোনো শালা এগিয়ে আসবে? (বুড়ো আঙুল দেখিয়ে) একটিও নয়। (দর্শকদের দিকে ইঙ্গিত করে) এই তো এত লোক বসে আছে এখানে, সব এত চুপচাপ কেন, এ্যাঁ? কই, কেউ এগিয়ে আসুন, দেখি, একটি লোকও উঠে দাঁড়ান, দাঁড়ান না! বেশি নয়, এতগুলো মাথার শুধু একটি মাথা, এতগুলো হাতপায়ের শুধু দুটো হাত চারটে পা....(জিভ কেটে, দর্শকদের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ও হাতজোড় করে) দোহাই হুজুর, আমার মা-বাপ, আকাশ-বাতাস সাক্ষী, নিজগুণে মার্জনা করবেন। বালাই ষাট, চারটে পা হতে যাবে কেন, শুধু দুটো পা, এক আর একে দুই, আপনারা যে মানুষ, সেই মহামান্য জীব—আমি অকৃতার্থ, অধমের অধম। (থলেটার দিকে দেখিয়ে) আসলে জানেন, এ-ব্যাটা আমার সব গোলমাল করে দিচ্ছে, এ-ব্যাটার চারটে পা, আমি তাই সকলেরই চারটে পা দেখছি—এমন কি এই আমারও যেন চারটে পা, বুঝলেন, হ্যা-হ্যা-হ্যা (বোকার মতো হাসি)। (গম্ভীর হয়ে) কিন্তু হুজুর, আমার মা-বাপ, হাসি-ঠাট্টাতে সময় চলে যাচ্ছে, আপনাদের মহামূল্য সময়, এদিকে সমস্যাটার তো কোনো সমাধান দেখছি না। কারণ হে ভদ্রমহোদয়গণ, হে ভদ্র-মহিলাগণ, আপনারা জানেন, আমি গলা ফাটিয়ে চীৎকার করতে পারি, বলতে পারি, (চেঁচিয়ে) পুরুত চাই, একজন পুরুত চাই, টিকিওয়ালার দরকার নেই, পৈতে না থাকলেও ক্ষতি নেই, বামুনও যদি না হয় তো না হোকগে—কী দরকার, আমিই না হয় তার নতুন নামকরণ করে দেব, এই ধরুন বলব, আজ এই কাজটির জন্যে, এই কয়েক মুহূর্তের জন্যে, তুমি হয়ে গেছ ভোলানাথ ভট্টাচার্য বা চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী বা গজানন গঙ্গোপাধ্যায় বা প্রমথনাথ পঞ্চতীর্থ বা শশিভূষণ তর্কভূষণ, বন্দ্যোপাধ্যায়-মুখোপাধ্যায়-চট্টোপাধ্যায়, দ্বিবেদী-ত্রিবেদী-চতুর্বেদী, আরো কী-কী আছে জানি

না—এক কথায়, হে ভদ্রোমহোদয়গণ, হে ভদ্রমহিলাগণ, একটা মানুষ, যার এখনো কিছু উত্তাপ অবশিষ্ট আছে, যে এখনো নিজেকে মানুষ বলে মনে করে, যার মধ্যে শ্রদ্ধা-প্রেম-স্নেহের শেষ কিছু বহ্নি এখনো ধুক ধুক করে জ্বলছে....(ভাব পরিবর্তন করে) এঁ্যা, ভূতের মুখে রাম-নাম ? হাসি পাচ্ছে তো আপনাদের ? জানেন, আমারও হাসি পাচ্ছে (অল্প অল্প হাসতে শুরু করে, শেষে হাসিতে ফেটে পড়ে)—শ্রদ্ধা প্রেম স্নেহ, (জিভ কেটে) ছি-ছি-ছি-ছি, এসব কথা কি আমার মুখে শোভা পায় ? বলুন, আপনারাই বলুন। দেখছেন তো আমার এই পেটটা, আমার এই শরীরটা, আমার এই জামা-কাপড় ; আর সেই আমার এত বড় আস্পর্ধা হবে, আমি উচ্চারণ করব মানুষ, আমি উচ্চারণ করব ঈশ্বর, বলব প্রেম, সত্য, শ্রদ্ধা, স্নেহ ? হা-হা-হা (সজোরে হাসি)—না-না স্যার, আমার মুখে ঐ একটি কথাই শোভা পায়, ঐ একটি কথাতেই আমার জন্মগত জীবনগত মৃত্যুগত অধিকার, আর সেই কথাটাই হল আমার একমাত্র সত্য, আমার একমাত্র ঈশ্বর, আমার একমাত্র প্রেম (দর্শকদের দিকে চেয়ে, কৌতুকের ভঙ্গীতে)—কোন কথাটা ? আবার বলব ? বেশ, তবে শুনুন—শালা বাঞ্চোৎ জীবন, শালা বাঞ্চোৎ জীবন, শালা বাঞ্চোৎ জীবন। (আবার গম্ভীর হয়ে) তবু স্যার, ঠাট্টা নয়, শ্রদ্ধার কিছু ভাব নিয়ে কারুর সত্যিই এগিয়ে আসার দরকার, কারুর-না-কারুর, হোক না একটি মানুষই, মাত্র একজন, কারণ সেই একটি লোকও যদি থাকে তো জানবেন এখনো সময় আছে, এখনো আশা আছে, এখনো মানুষকে বাঁচানো যায়। কারণ হে ভদ্রমহোদয়গণ, হে ভদ্রমহিলাগণ, (থলেটার দিকে দেখিয়ে) এই যে-মৃত্যুটা দেখছেন, এটা কিছু কাব্য নয়, এটা কিছু নাটক নয় ; বরং জানবেন সব কাব্যের কী ভীষণ মৃত্যু এটা, সব নাটকের কী শোচনীয় মৃত্যু এটা—তবু এই মৃত্যুটির সঙ্গে জানবেন আমি জড়িত, আপনি জড়িত, আপনারা প্রত্যেকেই জড়িত, (দর্শকদের দিকে আঙুল দেখিয়ে) ঐ দূরে বসে-থাকা ভদ্রমহিলাটির সোনার ফ্রেমের চশমাটা জড়িত। সব শালা জড়িত, সব বাঞ্চোৎ জড়িত—(জিভ কেটে, হাতজোড় করে) মাপ করবেন—সব ভদ্রমহোদয়গণ সব ভদ্র-

মহিলা জড়িত। না-না, মৃতকে বাঁচানো যায় না, তেমন অসম্ভব প্রস্তাবও আমি করছি না—শুধু বলছি, এমন তাচ্ছিল্যের ভাবে অবজ্ঞাটা না হয় নাই করলেন, চোখটা না হয় নাই ফিরিয়ে রইলেন, না হয় একবার আহা-উহু-ই বললেন, যেচে একটু এগিয়ে এলেন, হাতটি বাড়ালেন—(থলের দিকে দেখিয়ে) এই মৃতের সৎকারে। কারণ এই ধূসর শ্বাসরোধকারী সভ্যতার জগতে ভদ্রমহোদয়গণ, হে ভদ্রমহিলাগণ, আজকের এই ভীষণ করাল সুন্দর রক্তরাঙা আকাশের, আগুনের হলকার এই যুগসন্ধিক্ষণে, আসুন, আমরা সকলে মিলে এগোই, একটু আগ্রহ দেখাই, হোক না এতটুকু আগ্রহই, একেবারে আধ ইঞ্চির পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ পুঁচকে আগ্রহই একটা—অন্তত আসুন, (থলেটার দিকে দেখিয়ে) এমন একটা মৃত্যুতে একটু ব্যথিত হই, সত্যিকারেরর ব্যথায়। এবং আমার মতো অপদার্থ কী আপনাদের বলতে পারে বলুন ভদ্রমহোদয়গণ, হে ভদ্রমহিলাগণ, জানেনই তো, সত্যিকারের ব্যথাটা বাদ দিয়ে কাব্য হয় না, নাটক হয় না—আর কাব্য বা নাটক তো শালা-বাঞ্চোৎ, চুলোয় যাক, জীবনটাই আসল—সেই ব্যথাটা বাদ দিলে জীবনটাও হয় না। শুধু হয় না-ই বা কেন, নইলে মনুষ্যত্বের সমূহ বিনাশ। (ভাব পরিবর্তন করে) যাকগে, পুরুত চাই, পুরুত চাই, পুরুত চাই, চেঁচাতে পারি, কিন্তু জানি, কোনো শালা আসবে না। না-না, আপনাদের বলছি না, আপনারা কেন আসবেন, আপনারা তো নাটক দেখতে এসেছেন—কিন্তু অন্য কেউ তো আসতে পারত। (হতাশার ভঙ্গীতে) আসবে না স্যার, আসবে না, পুরুত হবে না, মন্ত্র পড়বে না, গঙ্গাজল ছিটোবে না—আর তা করবে না বলেই যুগসন্ধিক্ষণের এমন একটি অসাধারণ অপরিহার্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান হতে পারবে না। তাই পৃথিবী রসাতলে যাবে—ঐ চলেছে, দেখছেন, ঐ পড়ল বলে অতল গর্তে। (চীৎকার করে) কেল্লা ফতে, কেল্লা ফতে। মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল (ধেই ধেই নৃত্য)। (হঠাৎ গম্ভীর হয়ে) কিন্তু এত সহজে পিছপাও হওয়ার মক্কেল তো আমি নই—আমাকে আপনারা চেনেন না স্যার, আমার নাম বটুকলাল বটব্যাল, ওরফে বোঁচা—খেতে পাই না তো পাই না, রোজগার দুই

নয়া তো দুই নয়া, পাঁচ নয়া তো পাঁচ নয়া, তবু আমি একাই কিছু কম একশো নই। আমার ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, আমি নিধিরাম সর্দার। শালা পুরুত হবে না, আসবে না, নাই এলি—ব্যাটা, যেখানে আছিস, থাক বসে, বসে আঙুল চোষ—আমি তোর থোড়াই তোয়াক্কা করি। পুরুত? আমি হব, এই বোঁচা হবে—নিজেই নিজের নাম দেব—পঞ্চানন পঞ্চতীর্থ কিম্বা বৃন্দাবন বিদ্যাদিগ্‌গজ, তখন? আর পুরুতের সময় তো এখনো ঢের রয়েছে রে বাবা, সেই শ্মশানে দরকার, তার আগে তো নয়। এ-মুহূর্তে যেটা দরকার, সেটা এক নয়, দুই নয়, চার-চারটে বাহকের, কারণ (থলেটাকে দেখিয়ে) এ-ব্যাটাকে তো আগে শ্মশান পর্যন্ত বহন করতে হবে—প্রথামতো, হ্যাঁ বাবা, এসব ব্যাপারে আমি প্রথার বড্ড ভক্ত, মৃতকে সম্মান দিতে হবে—নইলে ভারী আর এমন কী, আমি তো একলাই নিয়ে যেতে পারি। অনায়াসেই। অবশ্য শক্তিতে কুলোবে তো? কারণ ক-ঘণ্টা আগে পেটে শেষ কিছু পড়েছে জানি না—নাই জানলাম। না-না-না, তবু মৃতকে সম্মান দিতে হবে, চারটে বাহকই চাই—(দর্শকের দিকে হাতজোড় করে) হুজুর, আমার মা-বাপ, আকাশ-বাতাস সাক্ষী, আমি অকৃতার্থ, অধমের অধম, এবং আমি একটা লোক, তবু সেই চারটে বাহকই হব একসঙ্গে। কী করে? এই দেখুন না। কিন্তু চারটে নাম তো ঝটপট চাই—না-না, আপনারা কিছু বলবেন না, আমিই নাম ঠিক করে দিচ্ছি; অভিনয় তো আমাকেই করতে হবে, কী বলুন? ধরুন, চারজনের একজন তো আমি নিজেই··· অর্থাৎ বোঁচা। দ্বিতীয়জনের নাম ধরুন····(ভেবে) খোঁচা। তৃতীয়জন ধরুন···· (ভেবে) প্যাঁচা। আর চতুর্থজন ধরুন····(ভেবে) পেঁচো। (স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে) যাক, একটা সমস্যার সমাধান অন্তত হল, চারজনের নাম তাহলে যথাক্রমে বোঁচা, খোঁচা, প্যাঁচা এবং পেঁচো। কেল্লা ফতে (সানন্দে চীৎকার) কেল্লা ফতে (গম্ভীর হয়ে) কিন্তু পার্থক্যটা করছেন কেমন করে আপনারা? খুব সহজ—গলার স্বরে। এই দেখুন, এই-যে আমার স্বাভাবিক গলাটা শুনছেন না, এই গলায় বললে বুঝবেন আমি বলছি, অর্থাৎ বোঁচা বলছে। আর যদি এই গলায় বলি; (মিহি স্বরে) "আমার নাম খোঁচা, হ্যালো-হ্যালো-ওয়ান-টু-

থ্রি-ফোর”—তখন বুঝবেন খেঁাচা বলছে। আবার যখন শুনবেন, (একটু ভারী গলায়) “আমার নাম প্যাঁচা, হ্যালো-হ্যালো-ওয়ান-টু-থ্রি-ফোর”—বলা বাহুল্য, সেটা প্যাঁচা, নির্ঘাৎ প্যাঁচা। এবং সবশেষে যখন শুনবেন, (বেশ ভারী গলায়) “আমার নাম পেঁচো, হ্যালো-হ্যালো-ওয়ান-টু-থ্রি-ফোর”, বুঝবেন পেঁচো বলছে, বুঝবেন তো? হুজুর, আমার মা-বাপ, আকাশ-বাতাস সাক্ষী, এবার আরম্ভ হচ্ছে একদিকে যেমন আপনাদের কল্পনাশক্তির পরীক্ষা, অন্যদিকে তেমনি পরীক্ষা আমার কপালের আর অভিনয়ের হাতযশের। ভুল যদি হয়—হয়তো হবেই, কারণ আমি অকৃতার্থ, অধমের অধম—তো নিজ-গুণে মার্জনা করবেন। তবু ভুলচুক যাতে কম হয়, আরেকবার রিহার্সালটা হয়ে যাক—কী বলেন? এই দেখুন, এটা আমার স্বাভাবিক গলা, এ-গলায় বললে বুঝবেন বোঁচা বলছে, মানে আমি বলছি। আর খেঁাচার গলা? (মিহি স্বরে) “আমার নাম খেঁাচা, ইত্যাদি-ইত্যাদি-ইত্যাদি”। এবার শুনুন প্যাঁচা বলছে, (একটু ভারী গলায়) “আমার নাম প্যাঁচা, ইত্যাদি-ইত্যাদি-ইত্যাদি”। সবশেষে পেঁচোর কণ্ঠস্বর, (বেশ ভারী গলায়) “আমার নাম পেঁচো, ইত্যাদি-ইত্যাদি-ইত্যাদি”। এবার শুরু, এ্যাঁ? রেডি-স্টেডি-গো। (হঠাৎ থেমে, কী ভেবে) ওঃ, দাঁড়ান দাঁড়ান, আপনাদের ধৈর্যকে এতখানি ট্যাক্সো করা কি উচিত হবে? তার চেয়ে বরং একটা সহজ পন্থা বাতলাই, এ্যাঁ? দেখুন, আমিই নিজেকে চারটে লোক করে ফেলছি, সশরীরে। সব ম্যাজিক পারি হুজুর, শুধু একবার দেখাতে দিন (সেলাম ঠোকে)। অতএব আমি তো বোঁচা, আমি তো রয়েছিই, দেখুন আমার থেকেই কী করে বেরিয়ে আসে খেঁাচা-প্যাঁচা-পেঁচো। (চেঁচিয়ে) এই শালা খেঁাচা-প্যাঁচা-পেঁচো, বেরিয়ে আয়, আয় বলছি। (মন্ত্রের মতো) আয়-আয়-আয়-আয়-আয়-আয়-আয়····

[মঞ্চে আলো ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে আসে, ছায়া মূর্তির মতো বোঁচা নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে থাকে। হঠাৎ একেবারে যেন তার মধ্য থেকেই একে একে খেঁাচা-প্যাঁচা-পেঁচো বেরিয়ে আসে লাফ মেরে। সেই অতি অল্প আলোয় মনে হয়, সকলেই যেন হুবহু বোঁচারই মতো

দেখতে—পোষাকও একই। যতক্ষণ এদের সকলকে মঞ্চের উপর দেখা যাবে, আলো খুব ক্ষীণই থাকবে। বোঁচা সহসা সিদ্ধান্ত নেয়, প্রথম কথা বলে।]

বোঁচা। হ্যাঁ রে খোঁচা!

খোঁচা। কী রে বোঁচা!

বোঁচা। হ্যাঁ রে প্যাঁচা!

প্যাঁচা। কী রে বোঁচা!

বোঁচা। হ্যাঁ রে পেঁচো!

পেঁচো। কী রে কেঁচো—এই থুড়ি, কী রে বোঁচা!

বোঁচা। এই শ্লালা, আমায় কেঁচো বললি কেন?

পেঁচো। মাপ করে ফেল ভাই, নামে কী আসে যায়?

বোঁচা। মাপ করলাম। হ্যাঁ রে খোঁচা-প্যাঁচা-পেঁচো, এবার হিসেবনিকেশটা করে ফেলা যাক?

খোঁচা। করে ফেলা যাক।

বোঁচা। আমি দলপতি—মেনে নেওয়া যাক?

প্যাঁচা। মেনে নেওয়া যাক।

বোঁচা। উত্তম, সর্বপ্রথমে তা হলে পজিশনটা ঠিক করে নেওয়া যাক?

পেঁচো। ঠিক করে নেওয়া যাক।

খোঁচা। কিসের পজিশন?

বোঁচা। বা রে, কে কোথায় দাঁড়াবে, সেই পজিশন—মৃতকে বহন করতে হবে না? কারা থাকবে মাথার দিকে, কারা থাকবে পায়ের দিকে?

খোঁচা। কিন্তু আগে একটা খাটিয়া-ফাটিয়া কিছু আসুক, আনো।

বোঁচা। ফচকেমি করবি নে খোঁচা—হ্যাঁ, বলে দিলাম, আমি দলপতি। খালি কথায় কথা বাড়ায়। খাটিয়া এসে যাচ্ছে, কিন্তু তার আগে পজিশনটা ঠিক করে নিতে হবে না? যাকগে শোনো—খোঁচা, তুমি খাটিয়ার ডান পায়া ঘাড়ে করছ, মাথার দিকে।

খোঁচা। আমার আবার বাঁ ঘাড়টা হঠাৎ একটু টনটন করছে ভাই—ডান পায়াটা দিস নে, লক্ষ্মী ভাই, দিস নে।

বোঁচা। চোপরাও শালা, আবার কথার উপর কথা বলছে, একটি থাপ্পড়ে তোমার ঘাড়ের টনটনানি শেষ করে দেব। যা বলছি তাই করবি,

আমি দলপতি না? অর্ডার ইজ অর্ডার। (সহসা ভাব পরিবর্তন করে ও দর্শকদের দিকে হাতজোড় করে) ক্লাস সেভেন পর্যন্ত বিদ্যে হুজুর, তবু ইংরাজীটাও একটু-আধটু বলতে পারি—ভুল যদি হয়, নিজগুণে মার্জনা করবেন। (আবার আগের ভাবে ফিরে গিয়ে) অতএব খোঁচা, তোমার ঘাড়ে ডান পায়া, মাথার দিকে।

খোঁচা। বেশ।

বোঁচা। আমি নিচ্ছি বাঁ পায়া, মাথার দিকেই। আর তুই প্যাঁচা, তুই নিচ্ছিস পেছনের পায়া, বাঁ দিকের।

প্যাঁচা। আমারো ঘাড়টা একটু····

বোঁচা। (চেঁচিয়ে) আবার? অর্ডার ইজ অর্ডার। এবং পেঁচো?

পেঁচো। বল ভাই।

বোঁচা। তোর ঘাড়ে ডান পায়া, পেছনের।

পেঁচো। বেশ।

বোঁচা। ব্যস, পজিশনটা হয়ে গেল, এবার বলো-হরি হরিবোল-এর একটা রিহার্সাল হয়ে যাক। চেঁচিয়ে বল, এই আমার মতো করে, (চেঁচিয়ে) বলো-হরি-হরিবোল।

খোঁচা। বলো-হরি-হরিবোল।

প্যাঁচা। বলো-হরি-হরিবোল।

পেঁচো। বলো-হরি-হরিবোল।

বোঁচা। বাঃ, পার্ফেক্ট। এখন আমাদের কর্মসূচীর দ্বিতীয় আইটেমটা ঝটপট সেরে নেওয়া যাক। হ্যাঁ রে খোঁচা, (থলেটার দিকে দেখিয়ে) এ-ব্যাটার কী নাম দেওয়া যায় বলতো? সনাক্ত করতে হবে তো—পুরুত আসবে, মন্ত্র পড়বে।

খোঁচা। খোঁচাই দিয়ে দে।

বোঁচা। দূর ব্যাটা, সেটা তো তোর নাম হয়ে গেল।

খোঁচা। তাতে আর কী—কারণ দশা তো সমানই, ও না হয়ে আমিও তো হতে পারতাম।

বোঁচা। না-না, তা চলবে না, অন্য নাম চাই। তুই কী বলিস প্যাঁচা?

প্যাঁচা। প্যাঁচাটাই বেশ তো।

বোঁচা। দূর গাধা, সেটাও তো তোর নাম হয়ে যাচ্ছে।

প্যাঁচা : তাতে আর কী, ওর আর আমার একই দশা; ও না হয়ে আমিও হতে পারতাম।

বোঁচা। তোরা তো মহা ঝামেলায় ফেললি দেখছি—না-না-না, অন্য নাম চাই। এই পেঁচো, এবার তুই একটা নাম বল।

পেঁচো। আমি বলি কি, পেঁচো নামটাই সবচেয়ে ভালো।

বোঁচা। (হতাশের ভঙ্গীতে) ওঃ, তুমিও তোমার নামটাই দেবে ?

পেঁচো। তাতে আর কী, ওর দশায় আমি প্রায় পৌঁছে গেলাম বলে, ও না হয়ে আমিও তো হতে পারতাম।

বোঁচা। এ তো একটা অসহ্য অবস্থার সৃষ্টি করলে দেখছি। আচ্ছা বেশ, আমিই নাম ঠিক করে দিচ্ছি। (একটু ভেবে) হ্যাঁ, খোঁচা-প্যাঁচা-পেঁচো, এ-বিষয়ে আমি তোমাদের সঙ্গে একমত, সম্পূর্ণ একমত যে ওর অবস্থাটার সঙ্গে আমাদের অবস্থাটার বিশেষ একটা তারতম্য নেই, অর্থাৎ ওর যা হয়েছে, আমাদেরও সেটা হতে পারত, খুবই হতে পারত—এমন-কি, আজো যে হয়নি, সেইটেই আশ্চর্য। অতএব এমন একটা নাম রাখা যাক, যে-নামটার সঙ্গে আমাদের সকলের নামের মিল আছে—এই ধর····ওঁচা, কেমন লাগে ?

খোঁচা। ওঁচা ? না-না-না-না-না।

প্যাঁচা। না-না-না-না-না।

পেঁচো। না-না-না-না-না।

বোঁচা। (ভেঙিয়ে) কেন না-না-না-না-না ?

খোঁচা। সারাটা জীবন তো ওর ওঁচা ভাবেই কাটল।

প্যাঁচা। এখন মরণের পরেও বেচারাকে ওঁচা বলে অসম্মান করা ? আর সেটা আমরাই করব, আমাদের দশা যখন ওরই মতন ?

পেঁচো। বেচারা মরে গেছে, এখন কিছু সহানুভূতি তো ওর প্রাপ্য, অন্তত আমাদের কাছ থেকে।

বোঁচা। (চিন্তিতের ভাবে) হ্যাঁ, কথাটা ঠিক বটে। বেশ, (ভেবে) তবে মোচা নাম দেওয়া যাক—পছন্দ ?

খোঁচা। পছন্দ।

প্যাঁচা। পছন্দ।

পেঁচো। পছন্দ।

খোঁচা। উত্তম, এখন নামটা দুয়েকবার আউড়ে নেওয়া যাক, যাতে শ্মশানে গিয়ে ভুলে না যাই বা পুরুত ঠাকুরকে অন্য কোনো নাম না দিয়ে বসি। বল খোঁচা, এই আমার মতো করে, (থলেটার দিকে দেখিয়ে) বোঁচা তোর নাম দিল মোচা।

খোঁচা। (থলেটার দিকে দেখিয়ে) খোঁচা তোর নাম দিল মোচা।

প্যাঁচা। (থলেটার দিকে দেখিয়ে) প্যাঁচা তোর নাম দিল মোচা।

পেঁচো। (থলেটার দিকে দেখিয়ে) পেঁচো তোর নাম দিল মোচা।

বোঁচা। উত্তম, অতি উত্তম। আমাদের কর্মসূচী চমৎকার এগোচ্ছে, ঠিক টাইম মতো। এখন খোঁচা-প্যাঁচা-পেঁচো, (থলেটার দিকে দেখিয়ে) এই থলেটায় কী আছে বলে দাও, কী নিয়ে এত কাণ্ড জানিয়ে দাও, (দর্শকদের দেখিয়ে) সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর ধৈর্যের পরীক্ষা শেষ হোক। বল খোঁচা, কী আছে থলেটায় ?

খোঁচা। একটা কুকুরের মৃতদেহ।

বোঁচা। ঠিক ঠিক উত্তর দে। খোঁচাটাকে নিয়ে আর পারি না—আচ্ছা তুই বল প্যাঁচা, মৃতদেহটি কুকুরের না কুকুরছানার ?

প্যাঁচা। ঠিক ছানা নয়, তবে অল্প বয়সী এক কুকুরের।

বোঁচা। কী রঙের ?

প্যাঁচা। (ভেবে) হলদেটে হবে।

বোঁচা। পোষা না রাস্তার ? তুই বল খোঁচা।

খোঁচা। রাস্তার। (হেসে ফেলে) হে-হে, ঠিক এই আমাদের মতো।

বোঁচা। চুপ কর! মরল কেন ?

প্যাঁচা। না খেতে পেয়েই হবে।

পেঁচো। হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয় না খেতে পেয়ে।

খোঁচা। ও-মৃত্যু বাবা ও-ছাড়া হয় না, দেখেই চেনা যায়। (হেসে ফেলে) হে-হে, প্রায় আমাদেরই দশা।

বোঁচা। আবার ? (হেসে) আচ্ছা, আমরা কি শালাকে আগে কখনো দেখেছি ?

খোঁচা। দেখিনি।

বোঁচা। তবে এত সব বলছিস কী করে ?

খোঁচা। (হেসে ফেলে) হে-হে, সহজেই অনুমান করা চলে।

প্যাঁচা। সহজেই করা চলে।

বোঁচা। তো বেশ তো, কিন্তু ওর সৎকার আমরা করতে যাব কেন ?

খোঁচা। কেন করব না ?

বোঁচা। কেন করব ?

পেঁচো। আমরাই তো করব।

বোঁচা। কিন্তু কেন, কেন করব ?

প্যাঁচা। বা রে, আমরা যে ওর জ্ঞাতি-ভাই, ওর সৎকার আমরা না করলে কে করবে ?

খোঁচা। কারণ আমরাও তো খেতে পাই না।

পেঁচো। কারণ, আমরাও তো ঐরকম দুর্বল জীর্ণ হয়ে এ্যানিমিয়ায় ভুগতে ভুগতে, ধুঁকতে ধুঁকতে, মুখ থুবড়ে একদিন থপ করে পড়ে যাব—ঐরকমই রাস্তার ওপর চিৎপটাং, চোখ কপালে, মুখে মাছি ভন ভন, প্রাণ-পাখি খাঁচা ভেঙে উধাও।

বোঁচা। ওঃ-হো-হো (হাসিতে ফেটে পড়ে), কেল্লা ফতে, কেল্লা ফতে।

খোঁচা। আর তখন আমাদেরও সৎকার করবে এই রকমই কোনো জ্ঞাতি-ভাই এসে, যে আমাদেরই মতো খেতে পায় না—ভাই যদি ভাইকে না দেখে····

প্যাঁচা। তো কী করে চলে ?

পেঁচো। কী করে চলে ?

বোঁচা। আচ্ছা বেশ, বুঝলাম, কিন্তু কুকুরটা পড়ে ছিল কোথায় ?

খোঁচা। ঐ তো, রাস্তায়, মোড়ের ঐ আবর্জনার গাদার ওপর।

প্যাঁচা। ঐ ডাবের খোলা, কলাপাতা, মিত্তিরদের গিন্নীর বদহজমের বমি আর কাগজে সযত্নে মোড়া নোঙরা রক্ত-মাখা ন্যাকড়া····

পেঁচো। ওঃ-হো-হো····

বোঁচা। (আনন্দে চেঁচিয়ে) ওঃ-হো-হো, কেল্লা ফতে ··

খোঁচা। আর তারই পাশে খানিকটা দুর্গন্ধ ভিজে-স্যাঁৎসেঁতে খড়ের গাদি, সেটার ওপর শুয়ে শেষ নিদ্রা দেয় ব্যাটা।

প্যাঁচা। তবু একদিন শরতের আকাশকে অভিনন্দন করেছে····

পেঁচো। যেমন আমরাও একদিন করেছি···

খোঁচা। কিঁউ কিঁউ করে ডেকেছে···

প্যাঁচা। যেমন আমরাও একদিন করেছি ··

পেঁচো। লেজ নেড়েছে····

খোঁচা। যেভাবে আমরা এখন হাত নাড়ছি (হাত নাড়ে)····

প্যাঁচা। তবু কিছুতেই কিছু হল না, আর পারল না বেচারা····

পেঁচো। যেমন আমরাও একদিন আর পারব না।

বোঁচা। অথচ এত বড় শহরে খাওয়ার মতো কিছু মিলল না? এত বড় বড় বাড়ি, গগনচুম্বী অট্টালিকা, লেকের ধারে কত ঘাস, কী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রান্তর, এত ফুটপাথ, গাড়ি-ঘোড়া-ট্রাম-মোটর-বাস, নুড়ি-কয়লা-গাছ-পাথর-ইঁট, এগুলোকে কি খাওয়া চলে না, দাঁত দিয়ে চিবনো চলে না?

খোঁচা। চলে না, চলে না, চলে না।

বোঁচা। টাটা নাকি আবার একটা প্রকাণ্ড বাড়ি তুলছে····

খোঁচা। টাটা না বিড়লা····

প্যাঁচা। বিড়লা না ঢনঢনিয়া····

পেঁচো। ঢনঢনিয়া না খনখনিয়া····

বোঁচা। খনখনিয়া না তনমনিয়া····

খোঁচা। তনমনিয়া না তনুমনু ··

প্যাঁচা। তনুমনু না অনু নামক সুন্দরী রমণীর তনু····

পেঁচো। বুকে দুটি····ওঃ-হো····

বোঁচা। পেলে একবার····ওঃ-হো····

খোঁচা। নরম-নরম গরম-গরম····

প্যাঁচা। ধবধবে ফর্সা দুটি থাম ··

পেঁচো। অন্ধকারে জাপটে ধরে হাম···

বোঁচা। (সানন্দে চেঁচিয়ে) কেল্লা ফতে, কেল্লা ফতে। (হঠাৎ দর্শকদের প্রতি, হাতজোড় করে) হুজুর, আমার মা-বাপ, আকাশ-বাতাস সাক্ষী—দেখুন কী কথার থেকে কী কথা এসে পড়ল, মনের ভেতর থেকে কী সব সাপ ব্যাঙ বেরোতে শুরু করেছে হুজুর! হুজুর, আমরা বড় অভাজন, খেতে পাই না, মেয়ে নিয়ে শুতেও পাই না—আমাদের তাই দুটো প্রধান চিন্তা, একটা পেটের, আরেকটা····(জিভ কেটে) ছি-ছি-ছি-ছি-ছি, আপনাদের সামনে এমন কথা কি

উচ্চারণ করা যায়? আমার মা-বাপ, নিজগুণে মার্জনা করবেন। (আগের ভাবে ফিরে গিয়ে) এই শালা খোঁচা-প্যাঁচা-পেঁচো, খবরদার, আর খিস্তি নয়। এবার আমাদের কর্মসূচীর তৃতীয় আইটেমটা, ঝটপট। (চেঁচিয়ে) তৃতীয় আইটেম!

খোঁচা। তৃতীয় আইটেম!

প্যাঁচা। তৃতীয় আইটেম!

পেঁচো। তৃতীয় আইটেম!

বোঁচা। (থলেটার দিকে দেখিয়ে) এবার শালাকে নিয়ে চল শ্মশানে, আর সময় নষ্ট নয়। (হঠাৎ ভেবে) ওঃ, ফুলের মালাটা? দে-দে-দে, ভালো করে জড়িয়ে দে থলেটার ওপর। দাঁড়িয়ে দেখছিস কী বাঁদরগুলো? এই খোঁচা!

[খোঁচা বাসি গাঁদাফুলের মালাটা তুলে নেয়, সযত্নে রাখে থলেটার ওপর।]

প্যাঁচা। কিন্তু খাটিয়া? খাটিয়া তো এল না।

বোঁচা। আসবে। (ধমকের স্বরে) আবার কথা? আমি দলপতি না? আর হ্যাঁ, ব্যাটার মুখেও তো কিছু দিতে হয়।

পেঁচো। কী দিতে হয়?

বোঁচা। এই কিছু খাবার-টাবার?

খোঁচা। কিন্তু শালা মরে গেছে তো, খাবে কী?

বোঁচা। আ-হা-হা, সারা জীবন খেতে পায়নি, এখন এই শেষ যাত্রায় কিছু খাবার অন্তত সঙ্গে যাক, অন্তত মুখে লেগে থাকুক।

খোঁচা। তা বেশ।

প্যাঁচা। উত্তম প্রস্তাব।

পেঁচো। অতি উত্তম।

বোঁচা। (চারদিকে তাকিয়ে) কিন্তু খাবার পাচ্ছি কোথায়?

খোঁচা। পেলে তো নিজেরাই খেতাম।

প্যাঁচা। মনেই নেই, কখন যে শেষ কিছু পেটে পড়েছে।

পেঁচো। (লাফিয়ে উঠে, আনন্দে) হ্যাঁ, মনে পড়েছে, কাল খেয়েছি পুঁইশাকের চচ্চড়ি।

বোঁচা। (হঠাৎ দোকানের সাইনবোর্ডটা দেখে) এই তো একটা দোকান

দেখছি, মিষ্টির দোকান।

খোঁচা। কিন্তু শালা বন্ধ যে।

প্যাঁচা। শালা রোববার যে।

পেঁচো। শালার গভর্নমেন্ট রোববারে সব বন্ধ করে দেয় যে।

বোঁচা। পেছনে দরজা নিশ্চয়ই আছে, লুকিয়ে-চুরিয়ে বিক্রি তো করেই— সব শালা যুধিষ্ঠিরকে জানা আছে।

খোঁচা। কিন্তু আমাদের বিক্রি করবে কেন?

প্যাঁচা। আমাদের তো পয়সা নেই।

পেঁচো। আমাদের যে কিস্যু নেই।

বোঁচা। ছাখ না কী করি, আমায় ফলো কর। আঃ, একটা লাল-ফাল রোমালও যদি থাকত!

প্যাঁচা। রোমাল?

খোঁচা। (জোরে হেসে) হেঃ-হেঃ-হে, আবার রোমাল চায়!

পেঁচো। পরনের কাপড় জোটে না, আবার রোমাল!

বোঁচা। আ-হা-হা, মূর্খ কোথাকার, একটা ঝাণ্ডা-ফাণ্ডার মতো কিছু....অন্তত সেরকম দেখতে....যাকগে, মাথায় বুদ্ধি এসে গেছে। হাঁ-হাঁ-ব্বাবা, আমি বটুকলাল বটব্যাল ওরফে বোঁচা, অত সহজে পিছপা হওয়ার মক্কেল নই। এই শালা খোঁচা-প্যাঁচা-পেঁচো, আমায় ফলো কর।

[বোঁচা দোকানের দিকে এগিয়ে যায়, অন্য তিনজন তাকে অনুসরণ করে। বোঁচা ও তার দেখাদেখি অন্য তিনজন দোকানের বন্ধ দরজায় দমাদম ধাক্কা মারতে থাকে—দরজার একটু অংশ অল্প খোলে, দোকানের কাউকে দেখা যায় না।]

বোঁচা। (চেঁচিয়ে, হাত উঁচিয়ে) লাল সেলাম!

খোঁচা। (একই ভঙ্গীতে) লাল সেলাম!

প্যাঁচা। (একই ভঙ্গীতে) লাল সেলাম!

পেঁচো। (একই ভঙ্গীতে) লাল সেলাম!

বোঁচা। পার্টির ফাণ্ডে কিছু দিন। না-না, পয়সা নয়—আচ্ছা পয়সাও দিন। আর কিছু মিষ্টি দিন।

[খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে একটা হাত বেরোতে দেখা যায়, হাতে একটা মুদ্রা ও কিছু মিষ্টি। মুদ্রাটা বোঁচা পকেটস্থ করে, মিষ্টিটা হাতে নেয়, পরে মঞ্চের মধ্যভাগে আবার ফিরে আসে—অন্য তিনজন তাকে অনুসরণ করে। দোকানের দরজা বন্ধ হয়।]

বোঁচা। একটা রসমুণ্ডি। (হাসি) হোঃ-হোঃ-হো, (চেঁচিয়ে) কেল্লা ফতে।

খোঁচা। কেল্লা ফতে, কেল্লা ফতে।

প্যাঁচা। কেল্লা ফতে।

পেঁচো। কিন্তু রসমুণ্ডি ? কুকুরকে ?

বোঁচা। চোপরাও শালা, কলকাতার কুকুরে সব খায়।

খোঁচা। আমরা সব খাই।

প্যাঁচা। আর, সারা জীবন খেতে পায়নি যে—তার আবার অত বাছবিচার কেন ?

পেঁচো। আমাদের কোনো বাছবিচার নেই।

বোঁচা। (থলের কাছে গিয়ে, থলের ভিতর হাত ঢুকিয়ে) সোনা আমার, মানিক আমার, এই এক কণা মিষ্টি তোর ঠোঁটে লাগিয়ে দিই—এ্যাঁ ? না-না, সবটা দেব না, আমরাও তো একটু একটু খাব।

খোঁচা। হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমরাও তো খাব।

প্যাঁচা। (চোখ মুছতে মুছতে) আমার কিন্তু ভাসানের দুগগাঠাকুর মনে পড়ে যাচ্ছে।

পেঁচো। তোর বাপ বুঝি পূজো করত ?

বোঁচা। তোদের বাড়িতে বুঝি নাটমন্দির ছিল ?

খোঁচা। চোদ্দপুরুষে ছিল ?

প্যাঁচা। না, কলকাতায় কত পূজোতেই তো দেখেছি। পাড়ার মেয়েরা কেঁদে কী গড়াগড়িই না যায়, ঠাকুরের ঠোঁটে নারকেল নাড়ু ছুঁইয়ে দেয়, কেঁদে কেঁদে বলে, আবার আসিস মা !

বোঁচা। (কাঁদো-কাঁদো স্বরে, থলের প্রতি হাত জোড় করে) আবার আসিস মা !

খোঁচা। (একই ভঙ্গীতে) আবার আসিস মা !

প্যাঁচা। (একই ভঙ্গীতে) আবার আসিস মা।

পেঁচো। (একই ভঙ্গীতে) আবার আসিস মা।

[নেপথ্যে দুর্গাপূজার ঢাকীর বাজনা শোনা যায়, কাঠির বোল বলছে, "ঠাকুর থাকবে কতক্ষণ, ঠাকুর যাবে বিসর্জন"। মঞ্চের উপরে চারজন নৃত্য সুরু করে।]

বোঁচা। (নাচতে নাচতে) ঠাকুর থাকবে কতক্ষণ, ঠাকুর যাবে বিসর্জন।

খোঁচা। (নাচতে নাচতে) ঠাকুর থাকবে কতক্ষণ, ঠাকুর যাবে বিসর্জন।

প্যাঁচা। (নাচতে নাচতে) ঠাকুর থাকবে কতক্ষণ, ঠাকুর যাবে বিসর্জন।

পেঁচো। (নাচতে নাচতে) ঠাকুর থাকবে কতক্ষণ, ঠাকুর যাবে বিসর্জন।

বোঁচা। (হঠাৎ নাচ থামিয়ে) এই শালা, এভাবে সময় নষ্ট করলে চলবে? (চেঁচিয়ে) নেক্সট্ আইটেম!

খোঁচা। নেক্সট্ আইটেম!

প্যাঁচা। নেক্সট্ আইটেম!

পেঁচো। নেক্সট্ আইটেম!

বোঁচা। (মুখ কাঁচুমাচু করে) কিন্তু বুঝলি শালা, ইতিমধ্যে বড্ড পেচ্ছাব পেয়ে গেল যে।

খোঁচা। (কাঁদো-কাঁদো স্বরে) আমারও পেয়েছে।

প্যাঁচা। (একই ভাবে) আমারও।

পেঁচো। (একই ভাবে) আমারও।

বোঁচা। তবে করে ফেলি? এইখানেই?

খোঁচা। আবার কি?

প্যাঁচা। শালা কলকাতা কর্পোরেশনের জল কলকাতা কর্পোরেশনকে ফিরিয়ে দিই।

পেঁচো। ঋণ শোধ।

[চারজনে মঞ্চের বিভিন্ন কোণে গিয়ে দর্শকদের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়ায়, প্যান্টের বোতাম খোলার ভঙ্গী করে। হঠাৎ দর্শকদের প্রথম সারি থেকে কোনো যুবতীর কণ্ঠস্বর শোনা যায়।]

যুবতী। (খুব চেঁচিয়ে নয়) রাবিশ!

[বোঁচা ও অন্য তিনজন সঙ্গে সঙ্গে সচকিত হয়ে মুখ ঘোরায়।]

বোঁচা। (দর্শকদের দিকে চেয়ে) কেউ কিছু বলছেন?

যুবতী। (আসনে বসেই, চেঁচিয়ে) বলছি, রাবিশ!

বোঁচা। (একটু থতমত খেয়ে, পরে এগিয়ে এসে ও উল্লাসে চেঁচিয়ে) ওঃ-হো-

হো, কেল্লা ফতে, কেল্লা ফতে। (গম্ভীর হয়ে, যুবতীকে) তো এতই যদি দয়া করলেন, একবার মঞ্চের উপর উঠে আসবেন? আসুন, আসুন না, আপনার বক্তব্যটা বলুন—ভারী চমৎকার জমেছে আজ। এই খোঁচা-প্যাঁচা-পেঁচো, এবার কেটে পড়ো ঝটপট, উধাও হও—হু···স, হুস করে উধাও হও।

[ছায়ামূর্তির মতো একে-একে খোঁচা-প্যাঁচা-পেঁচো সেই অল্প আলোয় উধাও হয়। মঞ্চে আবার আলো ফুটে ওঠে।]

বোঁচা। (যুবতীকে, হাতজোড় করে) কই, আসছেন না তো? আসুন!

[যুবতী দ্বিধান্বিত পদক্ষেপে ওঠে, সিঁড়ি বেয়ে মঞ্চের উপর এসে হাজির হয়। দেখেই বোঝা যায়, ক্রুদ্ধা নাগিনীর মতো সে ভিতরে ভিতরে ফোঁস ফোঁস করছে—অথচ লোকের সামনে বিড়ম্বনার ভাবও স্পষ্ট, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।]

বোঁচা। বাঃ, এই তো চমৎকার হয়েছে। (উপরে মাথা তুলে, মঞ্চের কোণের দিকে তাকিয়ে ও চেঁচিয়ে) আলো, আলো, আরেকটু আলো। কী মশাই, আপনাদের মঞ্চে একবার দাঁড়াতে দিয়েছেন বলে কি মাথা কিনে নিয়েছেন? [প্রখর আলো ফুটে ওঠে মঞ্চে, বিশেষত যুবতীর মুখের উপর পড়ে।] বাঃ, ঠিক এই চেয়েছিলাম, আপনারা পার্ফেক্ট দাদা! (যুবতীর দিকে চেয়ে, বিস্ময়ে) আঃ, মরি মরি, কী সুন্দর দেখতে গো আপনাকে, কী চমৎকার সেজেছেন!

যুবতী। (ঘৃণার সঙ্গে) শাট আপ!

বোঁচা। এত রাগ কেন বলুন তো? কী করেছি?

যুবতী। (রাগে কথা আটকে যায়) আপনার····আপনার লজ্জা করে না?

বোঁচা। (হেসে ফেলে) এই দেখুন, কথাটা বলেই লজ্জা দিলেন। কারণ জানেন, লজ্জাটা একটা প্রকাণ্ড বিলাস, সেটা একমাত্র আপনাদের মতো সুখী ভদ্র ঘরেরই নিজস্ব সম্পত্তি। না-না, লজ্জা করতে যাব আমরা? এত বড় আস্পর্ধা?

যুবতী। অবশ্য আপনার সঙ্গে কথা বলে তো কোনো লাভ নেই, ইউ আর জাস্ট এ নো-বডি, একজন অভিনেতা, এই মাত্র। কথা বলা উচিত নাট্যকারের সঙ্গে, যে-ভদ্রলোক এমন একটা জঘন্য নাটক লিখতে পেরেছেন। আর কথা বলা উচিত প্রযোজকের সঙ্গে, যিনি এমন একটা নাটক মঞ্চে

নামিয়েছেন।

বোঁচা। কেন অযথা সময় নষ্ট করবেন, আপনার মহামূল্য সময়। একটু ধৈর্য ধরে আমার কথাটা শুনবেন? এ-নাটক কেউ লেখেনি, কেউ প্রযোজনাও করেনি। আর আমি কোনো অভিনেতাও নই, অন্তত অভিনেতা বলতে আপনারা যা বুঝে থাকেন। আর জানেন, মঞ্চেও এর আগে কখনো নামিনি—এই প্রথম। বলেইছি তো, আমি বটুকলাল বটব্যাল, ওরফে বোঁচা, আমার চাল নেই, চুলো নেই, রাস্তায় রাস্তায় বক্তৃতা দিয়ে বেড়াই, হাত-পা ছুঁড়ি—লোক জমে যায়, লোক জমানো কিছু শক্ত নয় এই শহরে, আর তা করে যা দু-এক পয়সা পাই, পেট চলে যায়। অবশ্য তাতেও সব সময় চলে না, আসলে অনেক সময়ই চলে না। (যুবতীকে অধীর হতে দেখে) দাঁড়ান দাঁড়ান, শেষ করতে দিন। আজ কী হল জানেন? বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ে গেল। এই-যে থিয়েটারটা দেখছেন না, এরই কোনো কর্তাব্যক্তি সেদিন আমায় রাস্তায় পেয়ে বলে বসলেন, "এই, অমুক দিন অমুক সময় আমাদের মঞ্চে কিছু করবে? যা তোমার খুশি? সব ব্যবস্থা করে দেব।" বুঝতেই পারছেন, কী লোভনীয় প্রস্তাব—কারণ আর কিছু না হোক, পয়সা তো বেশ····

যুবতী। (যেতে চেয়ে) তবে যাই, আমি থিয়েটারের সেই কর্তার সঙ্গেই দেখা করব।

বোঁচা। (বাধা দিয়ে) আ-হা-হা, অত তাড়া কেন, দাঁড়ান না, কথা আছে।

যুবতী। না, আপনার সঙ্গে আমার কোনো কথা নেই, থাকতেই পারে না।

[যুবতী চলে যেতে চায়, মঞ্চের চারপাশে ঘোরে, পালাবার পথ খোঁজে —বোঁচাও কেবলি তার সামনে এসে দাঁড়ায়, বাধা দেয়। শেষে যুবতী যখন সত্যই পালাতে উদ্যত, বোঁচা তার হাতটা ধরে ফেলে, টেনে কাছে আনতে চায়]

বোঁচা। (সানন্দে চেঁচিয়ে) ওঃ-হো-হো, কেল্লা ফতে।

যুবতী। (চেঁচিয়ে) শাট আপ! লীভ মি, ইউ স্কাউণ্ড্রেল! (সজোরে হাত ছাড়িয়ে নেয়, পরে বিহ্বল দৃষ্টিতে দর্শকদের দিকে তাকিয়ে) আর আপনারাই বা কী, চুপ করে বসে উপভোগ করছেন? না কি লজ্জা সরমের মাথা আপনারাও খেয়েছেন? (বোঁচাকে দেখিয়ে) তার

মানে কি এ-লোকটাকে বিশ্বাস করতে আপনারা এখনো প্রস্তুত? দেখছেন না, স্টেজের ওপর একটার পর একটা কী জঘন্য কাণ্ড করে চলেছে, কী জঘন্য সব কথাবার্তা বলছে, শুনে কানে আঙুল দিতে হয়, তবু আপনারা মুখ বুঁজে সব সহ্য করবেন! সত্যিই দেখালেন, বলি-হারি আপনাদের! শেষে নারী হয়ে আমাকে উঠতে হল, কারণ আর বসে থাকতে পারছিলাম না, ধৈর্যের একটা সীমা আছে। তবু আমাকে উঠতে দেখেও আপনারা টুঁ শব্দটি করলেন না।

বোঁচা। (সানন্দে চেঁচিয়ে) কেল্লা ফতে, কেল্লা ফতে।

যুবতী। (বোঁচাকে, চেঁচিয়ে) ইউ শাট আপ! (দর্শকদের প্রতি) আর এখন যখন লোকটা আমায় অপমান করতে উদ্যত, একেবারে শারীরিক ভাবে পর্যন্ত, তখনো কি আপনাদের মধ্যে এমন একজন ভদ্রলোকও নেই যিনি....

বোঁচা। (সানন্দে চেঁচিয়ে) কেল্লা ফতে, কেল্লা ফতে।

যুবতী। (বোঁচাকে দেখিয়ে, দর্শকদের প্রতি) দেখছেন তো, কী রকম লাফাচ্ছে —একটা পশু, মানুষ এ নয়। মানুষ হলে কি এসব কথা উচ্চারণ করতে পারত, এসব কাণ্ড করতে পারত—সব দেখছিলেন শুনছিলেন তো এতক্ষণ বসে বসে।

বোঁচা। (হাতজোড় করে, দর্শকদের প্রতি) হুজুর, আমার মা-বাপ, আকাশ-বাতাস সাক্ষী, এখনো যদি বিশ্বাস না হারিয়ে থাকেন আমার ওপর তো আরেকবার বিশ্বাস করুন—কাউকে অপমান আমি করতে চাই না, (যুবতীকে দেখিয়ে) এঁকে তো নয়ই। তবে ইনি তম্বি করে মঞ্চের ওপর উঠে এসেছেন—অবশ্য আমিই আমন্ত্রণ জানাই—এবং কিছু বলতে চান। তো বলুন না কেন কী কথাটা তাঁর—আমি কান দুটো খাড়া করেই রয়েছি, আপনারাও শুনুন।

[আহ্বানের ভঙ্গীতে বোঁচা যুবতীর দিকে তাকায়—যুবতী রাগে ফোঁস ফোঁস করতে থাকে, দর্শকরা নিস্পন্দ।]

বোঁচা। (যুবতীকে) কী, বলুন। আপনার সব কথা কর্পূরের মতো উবে গেল দেখছি।

যুবতী। কিছু উবে যায়নি। নাটকের নামে আপনি যা করলেন, তা ব্যভিচার, অত্যাচার।

বোঁচা। দেখুন, প্রথমত আমার নাটক শেষ হয়নি, শেষ করতে আপনি দিলেন না, এবং যে-জিনিসটা শেষ হয়নি, তার সম্বন্ধে মতামত দেওয়া চলে কি না আমি জানি না। (যুবতীকে অধীর হতে দেখে) দাঁড়ান, দয়া করে আমার কথাটা শেষ করতে দিন। আচ্ছা, না হয় তর্কের খাতিরে ধরেই নিচ্ছি, আপনার তবু মনে হয়েছে ব্যভিচার, অত্যাচার। কিন্তু এখানে আমার প্রশ্ন, কেন ব্যভিচার, কেন অত্যাচার? যুক্তি দিন।

যুবতী। যুক্তি দিতে আমার ভারী বয়েই গেছে। আপনার সঙ্গে কথা বলতে পর্যন্ত ঘৃণা হয়।

বোঁচা। বাঃ, এ তো ভারী আশ্চর্য, এ তো এক-তরফা যুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে—আমারো তো কিছু বলার থাকতে পারে। না কি আপনিই শুধু যা খুশি বলে যাবেন?

যুবতী। যা খুশি আমি বলছি, না আপনি? (দর্শকদের দেখিয়ে) এই এঁরা সকলে বসে আছেন, সে-বিচার এঁরা করবেন। একটার পর একটা যত অকথ্য অশ্রাব্য গালাগাল আপনি দিয়ে গেলেন, নাটকের নাম করে, স্টেজের ওপর, সেটা হজম করলাম। শুধু তাই নয়, অসভ্য বর্বরের মতো কাণ্ডকারখানা করে চলেছেন, যা ভাবতে পর্যন্ত ঘৃণায় গা রি-রি করে ওঠে, চোখ দিয়ে দেখা তো দূরের কথা। যান, সেসব না হয় ছেড়েই দিলাম—যদিও ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়, কিন্তু সেগুলো নিয়ে বলব কী, মুখে তো আনা যায় না সেসব কথা।

বোঁচা। অর্থাৎ সেইটাই আপনার অভিযোগ, মানে মুখ্য অভিযোগ?

যুবতী। অভিযোগ সব কিছু নিয়েই। এই ধরুন আপনার বক্তব্য বিষয়টাই, যেটা নিয়ে কথা বলা যায়, অন্তত মুখে বাধে না, অন্তত সেটা আপনার অন্যান্য কথাবার্তার মতো অশ্লীল নয়—এই ধরুন, না-খেতে পেয়ে মরার ব্যাপারটাই।

বোঁচা। তবু ভালো, কথাটা আপনার শ্রীমুখে উঠতে পারল, অন্তত এ-কথাটাকে যথেষ্ট অশ্লীল বলে আপনি ভাবেন না। কী ভয়ংকর ভাগ্যি আমাদের।

যুবতী। (অপ্রস্তুতের ভাবে) ঠাট্টা করতে চান করুন, তবু বলবই, না-খেতে পেয়ে কেউ মরে না, জানেন, এ-শহরেও না, ওসব সেন্টিমেন্টালিজম ছাড়ুন। বিশেষত তা নিয়ে নাটক তো হয়ই না, মেরে-কেটে হয়তো পলিটিকাল স্পীচ দেওয়া চলে—তার বেশি নয়।

বোঁচা। (হাতজোড় করে, দর্শকদের প্রতি) হুজুর, আমার মা-বাপ, আকাশ-বাতাস সাক্ষী—নাটক কাকে বলে, তার বিচার আপনারা করবেন। আমি অকৃতার্থ, অধমের অধম। তবে যদি অনুমতি দেন তো এ-মহিলাটিকে বলি, না-খেতে পেয়ে কেউ মরে কি না-মরে, সেটা তর্কাতীত ব্যাপার এবং তা নিয়ে তর্ক করতে আমি প্রস্তুত নই, কারুর সঙ্গেই নই, এমন কি এমন একজন লোভনীয় দেহের সুন্দরী তরুণীর সঙ্গেও নই।

যুবতী। শাট আপ।

বোঁচা। (যুবতীকে, শ্লেষের ভঙ্গীতে) বড্ড শ্লীল আপনি, না? সত্যি, আপনাকে দেখে ঈর্ষা হয়—এ-শহরে বাস করেও এত শ্লীল আপনি রয়ে গেলেন কী করে? যেন অনাঘ্রাত পুষ্প একটি, পবিত্রতার যুঁই ফুল! কিন্তু রাস্তায় বেরোন না? চোখ দিয়ে কিছু দেখেন না, কান দিয়ে কিছু শোনেন না? হাহাকার আর নোংরামি আর মৃত্যু আর অবিচারের শত-সহস্র উন্মুখ উলঙ্গ ঔদ্ধত্য আপনার ঐ কুসুমকোমল লজ্জাবতী লতার শ্লীলতাবোধে সর্বক্ষণ পেচ্ছাব করে দেয় না? আর সেই পেচ্ছাবের শ্বাসরোধকারী গন্ধে আপনার ঐ অত সুন্দর-নাক-মুখ, সব প্রেমিকের স্বপ্নের মতো আপনার ঐ গাল-চোয়াল-চিবুক····

যুবতী। (কানে হাত দিয়ে) উঃ, কী ভয়ংকর নির্যাতন, কী অমানুষিক অপমান! (দর্শকদের দিয়ে চেঁচিয়ে) তবু আপনারা একটা কথাও বলবেন না, একজনও এগিয়ে আসবেন না, আর····আর এই অসভ্য বর্বর লোকটা আমায় অপমান করে চলবে?

বোঁচা। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, হতাশের ভঙ্গীতে) অল রাইট, শুনতে যদি এতই খারাপ লাগে আপনার তো সত্যি কথাটা না হয় নাই বললাম। মুস্কিল জানেন ঐ সত্যি কথাটা নিয়েই—কেউ শুনতে চায় না। না, এ-শহরে আগাগোড়া জীবনটাই অশ্লীল, শুধু এই আমাদের জীবনটাই নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি অশ্লীল আপনাদের জীবন। যাকগে, এসব বললাম, কারণ আপনি তেড়ে-মেড়ে এসেছেন আমাকে গুঁতোতে, আমার নাটককে অশ্লীল বলতে।

যুবতী। (ঘৃণায় মুখ বেঁকিয়ে) অশ্লীল? অশ্লীল বললে কিছুই বলা হয় না, আপনার নাটক নাটক নয়····(একটু থেমে, সহসা জোরের সঙ্গে)

আপনার নাটক নাটকের গর্ভস্রাব।

বোঁচা। (সহসা সচকিত, স্তব্ধ, পরে উল্লাসে) গর্ভস্রাব? হে-হে-হে (হাসিতে ফেটে পড়ে), গর্ভস্রাব। (দর্শকদের প্রতি) শুনলেন তো কথাটা আপনারা? দেখছেন, (যুবতীকে দেখিয়ে) এই ইনিও কিছু কম যান না। (যুবতীকে) বলতে পারলেন তো কথাটা? আপনিও তো অশ্লীল হলেন? পথে আসুন, ও-পথ ছাড়া আর পথ নেই। (চেঁচিয়ে) কেল্লা ফতে, কেল্লা ফতে।

যুবতী। শাট আপ, ইউ রাস্ক্যাল!

বোঁচা। (সহসা যুবতীর দিকে এগিয়ে, আগ্রহের সঙ্গে) জানেন, এতদিন এমনি একটি মেয়ের খোঁজ করে ফিরেছি আমি, যার আপনার মতো এমনই উত্তপ্ত মন, এমনই উত্তপ্ত দেহ, এই রকম উদ্ধত মুখ, দুটি উদ্ধত বুক....(যুবতী কিছু বলতে যায়, তাকে থামিয়ে) কথাটা শুনুন, একটা নাটক করবেন, একটা অন্য নাটক, প্রেমের নাটক? প্রেম দেখুন পেলে কে না চায়....(যুবতী আবার কিছু বলতে চায়, তাকে আবার থামিয়ে, আদেশের সুরে) স্থির হয়ে দাঁড়ান, শুনুন। সব্বাই প্রেম চায়, সব শালা প্রেম চায়, সব বাঞ্চোৎ (যুবতী কানে হাত দেয়) প্রেম চায়—আমিও শালা প্রেম চাই, আমি বাঞ্চোৎ প্রেম চাই, এবং আমি আপনাকে নিয়ে প্রেম করতে চাই, একটু করবেন? অত ভয় পাবেন না, সত্যিকারের প্রেম নয়, শুধু নাটক একটা, একটা অভিনয়—এই দেখুন, (দর্শকদের দেখিয়ে) এতগুলো লোককে ডেকে এনেছি, একটা গল্প ফেঁদেছিলাম, সেটা আপনি শেষ করতে দিলেন না, সেটা আধ-খ্যাঁচড়া হয়ে রইল। সেটা থাকগে, সেটা মরুকগে, (থলেটাকে দেখিয়ে) যেমন করে এই কুকুরটা মরে গেছে। না-না-না, আগের ঐ গল্পটা বলতে আমারও ভালো লাগছিল না, কারণ বিশ্বাস করুন, আমিও ভালো-ভালো কথা বলতে চাই, শরতের সোনার রোদ্দুর, সুস্থ জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা-অভিনিবেশ, প্রেম, এই সবই চাই—কিন্তু সেটা আমাকে চাইতে দিচ্ছে কে, কোন শালা দিচ্ছে? নইলে বলুন তো, ইচ্ছে করে কোন শালা-বাঞ্চোৎ (যুবতী আবার কানে হাত দেয়) খিস্তি করতে চায়? কিন্তু আমার হাত থেকে জয়নগরের মোয়াটা

কারা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে, আমার অন্য অস্ত্র নেই। (আগ্রহের সঙ্গে) তাই বলছি, অবকাশ যখন দিলেনই, আসুন একটা প্রেমের নাটক ফাঁদি—গল্প আমার মনে ঝটপট এসে যায়, ভাববেন না—বলুন, ফাঁদা যাক তবে? আজকের পালাটা ভালো করে সাঙ্গ হোক, (দর্শকদের দেখিয়ে) রসিকজনেরা তৃপ্ত হয়ে ফিরে যান। (খপ করে যুবতীর হাত ধরে, যুবতী চেঁচাতে যায়, তাকে থামিয়ে) চেঁচাবেন না, কোনো দুরভিসন্ধি আমার নেই—আর হাতটা ধরলেই আপনি কিছু অপবিত্র হয়ে যাবেন না, (আদেশের সুরে) বিশ্বাস করুন, আমি আপনার চেয়ে কিছু বেশি অপবিত্র নই। (যুবতীর হাত ধরে থেকে ও উপরে মাথা তুলে মঞ্চের কোণার দিকে তাকিয়ে ও চেঁচিয়ে) আলোটা একটু কমিয়ে দাদা, একটু নীল আমেজ দিন দয়া করে। আর পেছনের সেই পর্দাটা, সেই নিসর্গটা, যেটা আমায় আগে দেখান কিন্তু আমি নিইনি, এবার সেটা আস্তে আস্তে ফেলে দিন—এই 'নদীয়া মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠান' মুছে যাক। [আলো যথারীতি কমে আসে, গাছপালা-নদী অংকিত মনোরম এক পশ্চাৎপট ধীরে ধীরে পড়ে।] (যুবতীর হাত ছেড়ে দিয়ে) বাঃ, বেশ হয়েছে, (আবার মঞ্চের কোণার দিকে তাকিয়ে) এবার সেতারের কিছু মৃদু-মৃদু ঝংকার উঠুক না, আবহাওয়াটা ঘনিয়ে তুলুন। [নেপথ্যে সেতার বেজে ওঠে।] (যুবতীকে) আর জানেন, চান বা না-চান, শুনে ঘৃণায় মুখ কুঞ্চিত করুন বা না-করুন, আপনার সঙ্গে আমার মিলনের একটা অনিবার্য লালকালি-মাখা তারিখ এগিয়ে আসছে, হু-হুঃ শব্দে এগিয়ে আসছে, এই মুহূর্তেই ঐ আরো একটু এগোল, ঐ এগোল আবার—পাচ্ছেন তো সেই পদধ্বনি, বলুন, পাচ্ছেন তো? না কি সুন্দরী, এখনো কান তৈরি হল না আপনার? (উল্লাসে) ওঃ হো-হো, কেল্লা ফতে, কেল্লা ফতে। (যুবতী রাগে কাঁপতে থাকে, কিছু বলতে যায়, তাকে থামিয়ে) শাট আপ, এখন আমি কর্তা, তম্বি করবেন না। (আগ্রহের সঙ্গে) সাদার্ন এভেনিউ-র সেই বাড়িটা দেখেছেন তো? একটা প্রকাণ্ড বাড়ি, একটা অট্টালিকা, আর বাড়িটার চারধারে কী ভীষণ বড় বিস্তৃত বাগান, এককালে সেখানে নিশ্চয়ই কত সুন্দর সুন্দর ফুলের গাছ ছিল, কত লিলি-ডালিয়া-

গোলাপ-হাস্নাহানা ফুটত, লাল-নীল-সবুজ কত রঙের পাখি তাতে উড়ে উড়ে বসত, গান করত পিউ-পিউ-পিউ, আজ সেখানে জঙ্গল, আজ সেখানে সাপের বাস, আজ সেখানে সন্ধ্যের পর গিয়ে দেখবেন কেমন গা ছম ছম করে। আর জানেন, কত ভাস্কর্যের মূর্তি ছড়ানো এদিকে-ওদিকে, আজো সেই বাগানেরই জঙ্গলে; তবে আজ সেই মূর্তিগুলো কালিমাখা, বৃষ্টিতে-রোদ্দুরে নোঙরা, শেওলা-পড়া, হাত-পা ভাঙা; যেমন ঐ সারা বাড়িটাও আজ ভেঙে পড়ছে, ভেঙে পড়ছে ভেঙে পড়ছে ধসে পড়ছে; আর সেই এককালের অত বড় গাড়িবারান্দাটা—তার আজ তো একেবারে ধূলিসাৎ অবস্থা; এদিকে, মেরামত করার কোনো লোকই নেই, সে-বাড়ি সারানোর জন্য কেউ সুরকি দেবে না, কেউ ইঁট দেবে না, কেউ বালি দেবে না, কেউ সিমেণ্ট দেবে না। আর আজ সেখানে কারা থাকে জানেন? (উল্লাসে চেঁচিয়ে) ওঃ-হো-হো, কেল্লা ফতে। আমি থাকি, আর আমার মতন আরো অনেকে থাকে—এর-ওর হাঁড়ি-কুঁড়ি, ছেঁড়া মাদুর, দুর্গন্ধভরা কালো চিটচিটে বালিশ, ছোট ছেলেটার কান্না, ছোট মেয়েটার গু—ওঃ-হো-হো, কেল্লা ফতে। (যুবতী ঘৃণায় মুখ বেঁকায়, চলে যেতে উদ্যত, তাকে থামিয়ে) কোথায় যাচ্ছেন? দাঁড়ান। ঐ সেই বাড়িটা, যেখানে থাকি, সেখানে থাকতে কি আমার ভালো লাগে? একেবারেই লাগে না। কিন্তু আমার ভালো লাগা না-লাগার প্রশ্নটা করি কাকে, কে শুনছে? আর জানেন, শুনেছি আমাদের পিতৃপুরুষের একটা ভিটে ছিল কোথাও, এককালে ধানের গোলায় নাকি ধানও ছিল, বাড়িতে গরু ছিল, ঢেঁকি ছিল, পূজোয় ছেলেমেয়েরা নতুন কাপড় পরত — (চেঁচিয়ে) কোথায় গেল সব? সব জয়নগরের মোয়াগুলো কে ছিনিয়ে নিল? (ধীর স্বরে) দাঁড়ান দাঁড়ান, সবুর করুন, আপনারও সব যাবে, এই সুন্দর শাড়িটা যাবে, ঐ লিপস্টিকটা যাবে, কপালের ঐ শাড়ির সঙ্গে ম্যাচ করা বেগনি টিপটা যাবে। ভাঙনের শব্দটা শুনছেন না, পদধ্বনি শুনলেন না? (হঠাৎ আবেগের সঙ্গে) আর জানেন, এইভাবে এক হওয়ার আগামী এক রাতে হয়তো আমি-আপনি পাশাপাশি শুয়ে

ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখব, ঐরকম কোনো ভাঙা জীর্ণ-দীর্ণ বাড়িতেই—আর সে-রাতে জানেন ঝড়ের কী তুমুল হাওয়া বইবে, আমাদের গা শিরশির করে কাঁপবে, আর আমি তখন আপনাকে জাপটে ধরে আপনার নগ্ন বুকে মুখ গুঁজে একটার পর একটা চুমু খাব। (যুবতী চেঁচিয়ে উঠতে চায়, তাকে থামিয়ে, চেঁচিয়ে) শাট আপ! আজ ভালো লাগছে না, কিন্তু সেদিন ভালো লাগবে। বাজী রেখে বলছি, ভালো লাগবে। আপনিও তখন আমায় জাপটে ধরবেন, একটার পর একটা চুমু খাবেন—(যুবতী আবার কিছু বলতে যায়, তাকে থামিয়ে, চেঁচিয়ে) শাট আপ, আই সে, শাট আপ, সেদিন থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দেব তোমার। (হঠাৎ আক্ষেপের সুরে, যুবতীকেই) না-না-না, ক্ষমা করবেন, এটা কী বললাম? থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দেব? না-না-না, সেদিন যে আপনার সঙ্গে আমার প্রেমের সম্পর্ক, স্বপ্নের সম্পর্ক, সেদিন যে আমরা ভাঙনের পরে গড়ার কল্পনায় মাতব—আমাদের জানলার বাইরেই বিরাট স্বপ্নের একটা আলুলায়িত প্রান্তর থাকবে। সেদিন যে বলতে চাইব, বুক ভরে নিশ্বাস নিয়ে বলতে পারব—শ্রদ্ধা প্রেম স্নেহ, এবং এ-ধরনের আরো কত কথা যা আজ উচ্চারণ করার অধিকার পর্যন্ত আমাদের নেই। (একটু থেমে, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে) তবে সেদিনটা আজো আসেনি, মানছি—(হঠাৎ যুবতীর দিকে ফিরে, গভীর আবেগের সঙ্গে) শুধু, অবকাশ যখন দিয়েছেনই তো হে আমার আগামী দিনের প্রেয়সী, নাটকটা আজ হয়ে যাক, অন্তত রিহার্সাল একটা হোক। বলুন, রাজী?

যুবতী। (রাগে ফোঁস ফোঁস করতে করতে, দর্শকদের প্রতি) ধৃষ্টতাটা দেখলেন আপনারা? এবং মুখ বুজে সব সহ্যও করলেন? (চেঁচিয়ে) রাবিশ!

[যুবতী হঠাৎ বোঁচার দিকে এগিয়ে আসে ও তার গালে ঠাস করে এক চড় মারে। সঙ্গে সঙ্গে, হতভম্ব বোঁচাকে ভাববার সময় না দিয়েই পড়ি-মরি দৌড়তে দৌড়তে সে মঞ্চ থেকে সিঁড়ি বেয়ে নামে ও দর্শকদের সামনে দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে বাইরের দিকে উধাও হয়।]

বোঁচা। (হতভম্বের মতো একটু দাঁড়িয়ে থাকার পর, গালে হাত বুলোতে বুলোতে) খাসা হাতটা কিন্তু, মাইরি, মিষ্টি হাত, আরেকটা মারলে

পারত। পালালি ছুঁড়ী, রণে ভঙ্গ দিলি—পালা, পালা, যতদূর যাবি যা। কিন্তু কতদূর ? হেঃ হেঃ হে (হাসি), কতদূর ? প্রেমকে ফাঁকি দেওয়া যায় না, একদিন তোকে পাকড়াবই। (নিসর্গের পশ্চাৎপটটা দেখিয়ে) এখন এই সুন্দর গাছপালা, নিসর্গ, সেতারের এমন মৃদু মৃদু ঝংকার, [বাজনাটা নেপথ্যে সমানেই বেজে যাচ্ছিল, অস্ফুটভাবে, এখন একটু জোরে শোনা যায়] নীল আলোর আমেজ, এসব কী একটা প্রচণ্ড প্রহসনের মতো পড়ে রইল বলুন তো ? (সহসা দর্শকদের দিকে ফিরে, হাতজোড় করে) হুজুর, আমার মা-বাপ, আকাশ-বাতাস সাক্ষী—আপনারা সজ্জন, গুণীজন, আমি অকৃতার্থ, অধমের অধম। তবু হুজুর, কথা দিচ্ছি, ঐ প্রেমের নাটকটা একদিন করে ছাড়বই, ছাড়বই, ছাড়বই—দিনক্ষণ সব আগে থেকে ঘোষণা করে দেব, যাতে আপনারা আবার আসতে পারেন, পদধূলি দেন। (থলেটাকে দেখিয়ে) মাঝখান থেকে শুধু এ-ব্যাটা পড়ে রইল, এ-ব্যাটার কিছু হল না। (হেসে) আসলে কোনো ব্যাটাই থলের ভেতরে নেই, নাটক, বুঝছেনই তো (এগিয়ে গিয়ে থলেটা উপুড় করে দেয়, কাপড়চোপড়ের একটা বাণ্ডিল বেরিয়ে পড়ে)। (দর্শকদের দিকে ফিরে) তবু ধাপ্পা আপনাদের দিইনি হুজুর, কারণ থলেটা যে-মৃত কুকুরের প্রতীক, সে-কুকুরটা কিন্তু সত্যিই মারা গেছে, এখনো মরে পড়ে আছে রাস্তায়। কোথায় ? একটা আবর্জনার গাদার ওপর—বেরিয়ে যখন যাবেন, একই ফুটপাথে একটু এগোলেই ডান দিকে দেখতে পাবেন। তার সৎকারের প্রশ্নটা ? সে-বিবেচনার ভার আপনারাই নেবেন, কিম্বা না চান তো নেবেন না। এবার হুজুর, আমার মা-বাপ, যদি অনুমতি দেন তো পর্দা ফেলার নির্দেশ দিই, আর কিছুতেই মন লাগছে না। (নেপথ্যের দিকে চেঁচিয়ে) পর্দা !

[নেপথ্য থেকে ঢাকের বাজনা আবার কানে আসে, কাঠির বোল বলছে, "ঠাকুর থাকবে কতক্ষণ ঠাকুর যাবে বিসর্জন"। বোঁচা হঠাৎ সচকিত হয়ে তাকায়।]

বোঁচা। (থলেটার দিকে আঙুল দেখিয়ে ও নাচতে নাচতে) ঠাকুর থাকবে কতক্ষণ ঠাকুর যাবে বিসর্জন, ঠাকুর থাকবে কতক্ষণ ঠাকুর যাবে

বিসর্জন। (হঠাৎ নাচ থামিয়ে ও থলেটার দিকে ইঙ্গিত করে) না-না, এ কী বলছি? ঠাকুর কেন? কুকুর। আজ সব ঠাকুর কুকুর হয়ে গেছে।

[বাজনার সঙ্গে সঙ্গে বোঁচা আবার নাচ শুরু করে ও থলেটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলতে থাকে, "কুকুর থাকবে কতক্ষণ কুকুর যাবে বিসর্জন"। বোঁচা নাচতে থাকে, ধীরে ধীরে যবনিকা পড়ে।]

ইতিহাস সংবাদ

চণ্ডী মণ্ডল

তারাগঞ্জ উচ্চ ইংরাজী স্কুলের ইতিহাসের মাস্টার নিকুঞ্জবিহারী অধিকারী সুদীর্ঘ তিরিশ বছর ছাত্রদের ইতিহাস পড়ানোর পর অবশেষে একদিন ইতিহাসের আসল ইতিহাস আবিষ্কার করলেন—পৃথিবীর অসাধারণ মানুষদের নিয়েই ইতিহাস লেখা হয়, ইতিহাসে এমন একটিও লোকের নাম নেই যে কোনো না কোনো ভাবে সাধারণের অতীত ছিল না; নিতান্ত সাধারণ যে লোক, সে-ও কোনো না কোনো আকস্মিক কারণে বিশেষ বিখ্যাত হয়ে তবেই ইতিহাসে স্থান পায়। নিকুঞ্জবাবু স্থির বিশ্বাসে সিদ্ধান্ত করলেন ইতিহাসে যাদের স্থান হয় না তাদের আসলে কোনো ইতিহাসই থাকে না, তাদের কথা কেউ জানে না; এমনি কত অসংখ্য জীবন অতীতে মিথ্যা হয়ে গেছে, ভবিষ্যতেও কত অসংখ্য জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে, তার সঠিক হিসাবও ইতিহাসে কোনো দিন লেখা থাকবে না।

তারাগঞ্জ শহর থেকে প্রায় তিরিশ মাইল দূরের একটি সাধারণ মফঃস্বল এলাকা। শহরের সঙ্গে সম্পর্ক হাজার তুচ্ছ হলেও দুপুরের আগেই দৈনিক সংবাদপত্র স্কুলে নিয়মিত পৌঁছে যায়। নিকুঞ্জবাবু বিশেষ এক শ্রেণীর খবরে ডুবে যান—ট্রেন দুর্ঘটনায় একশ জনের মৃত্যু হয়েছে, যাত্রীবাহী বিমান বিধ্বস্ত হওয়ায় পঞ্চাশ জনের জীবনহানি হয়েছে, প্রতিবেশী রাজ্যের আকস্মিক আক্রমণে দু-শ গ্রামবাসীর মৃত্যুবরণ, খাদ্যে বিষক্রিয়ার ফলে কুড়ি জনের অকাল মৃত্যু, ইত্যাদি। এমন আরো কত, অসংখ্য, দেশ বিদেশের কত লোকের মৃত্যু হচ্ছে। প্রতিদিন প্রতি ঘণ্টায় প্রতি মিনিটে সেকেণ্ডে সেকেণ্ডে স্বাভাবিক-অস্বাভাবিক কত বিচিত্রভাবে পৃথিবীতে কত মৃত্যু ঘটছে তার সমস্ত খবর নিকুঞ্জবাবু জানেন না, কেউই জানে না, তবে নিকুঞ্জবাবু সমস্ত ভাবতে পারেন, ভাবেন, ভাবেন আর ভাবেন, ভাবতে ভাবতে এক সময় খুব চঞ্চল হয়ে পড়েন—দৈনিক এত লোক মরে যাচ্ছে, এদের প্রায় কারো কথাই ইতিহাসে লেখা হয় না, এত সমস্ত মানুষের জীবন

চিরদিনের মতো পৃথিবী থেকে লোপ পাচ্ছে, ভবিষ্যতে আরো কত—নিকুঞ্জবাবু ভাবতে পারেন না। তাঁর রক্তশূন্য শরীরেও রক্তের উচ্চচাপ হঠাৎ ভীষণ বেড়ে যায়, মাথা ঘুরে যায়, শিরদাঁড়া যন্ত্রণায় দুমড়ে মুচড়ে যেতে থাকে, তিনি মারাত্মক বিপন্ন হয়ে পড়েন। সেই মৃত্যুতুল্য কষ্ট-যন্ত্রণার মধ্যেও তিনি নিজের স্বরূপের মুখোমুখি হতে বাধ্য হন—পৃথিবীতে আমি এতদিন বেঁচে রইলাম, আর আমার মৃত্যুর পর আমি একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে যাব ; সম্পূর্ণ মিথ্যে হয়ে যাব !

সেই গভীর উদ্বেগ-যন্ত্রণা একটু সহনীয় হলে নিকুঞ্জবাবু আবার ভাবেন তাঁর মৃত্যুর পর যদি কিছু লোক তাঁকে মনে রাখে অর্থাৎ যদি তিনি কোনোক্রমে ইতিহাসে স্থান পেয়ে যান তবেই কিনা প্রমাণিত হবে তিনি শ্রীনিকুঞ্জবিহারী অধিকারী পৃথিবীতে জন্মেছিলেন, তিনি এইরকম ছিলেন ; আর তাতেই তাঁর জন্মের জীবনের সার্থকতা।

নিকুঞ্জবাবু নিজের মনেই এ-বিষয়ে অনেক আলোচনা করলেন—প্রশ্ন উঠতেই পারে আমার মৃত্যুর পর আমি পৃথিবীতে মানুষের মনে চিরদিন বা বেশ কিছুদিন বা কিছুদিন বেঁচে থাকলাম কি থাকলাম না—এতে আমার কী তখন এসে যাবে। কিন্তু জীবিতকালে যদি আমি জানি আমি তেমন একজন অতিবিখ্যাত অসাধারণ কোনো লোক হতে পেরেছি, তাহলে আমি বেঁচে থেকেও আমার মৃত্যু-পরবর্তীকালীন অবস্থা নিশ্চয়ই কল্পনা করতে পারব। আমি মহাকালের অন্ধকার অসীম শূন্যে হারিয়ে যাব না। জন্মের জীবনের সেই দুর্লভ সার্থকতার অবশ্যম্ভাবী সম্ভাবনায় তখন আমি সীমাহীন আনন্দে ভরে উঠব। গভীর আত্মতৃপ্তিতে আমি নিজেকে ধন্য ভাবব।

স্কুলের অদূরে গ্রামের এক প্রান্তে নিকুঞ্জবাবুর নোনাধরা দেড়কামরা মাটির ঘর। জীর্ণ টালির চালে ইতস্তত ফাটল ধরেছে। বারো মাস নানা অসুখে ভুগে ভুগে নিকুঞ্জবাবুর ভগ্নস্বাস্থ্য স্ত্রী অর্ধেক রাত পর্যন্ত স্বামীর সঙ্গে সংসারের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনাকালে, তাঁদের বিশেষ করে তাঁর মৃত্যুর পর সংসারের কী গতি হবে প্রশ্ন করলে আতঙ্কে নিকুঞ্জবাবু কপট ঘুমে আত্মগোপন করার চেষ্টা করেন। তখন তাঁর স্ত্রী চীৎকার করে তাঁর মৃত্যু কামনা করেন। নিকুঞ্জবাবুও তাই কামনা করেন, তিনি কিছুই করতে পারলেন না, এবার তাঁর মৃত্যু হোক। নিকুঞ্জবাবুর তিরিশ বছর উত্তীর্ণ বড় ছেলে পড়াশুনা শেষ করে দীর্ঘদিন ধরে চাকরির বৃথা চেষ্টা করার পর এখন লৌকিক-অলৌকিক-শারীরিক-

মানসিক নানা অসুখের শিকারে পরিণত। মেজ ছেলে শৈশব থেকেই পড়াশুনো ভালো লাগে না বলে কিছুই করেনি, এখন যৌবনের খর মধ্যাহ্নে সে গ্রাম্যবীর রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। ছোটছেলে স্কুলের পড়া শেষ করার আগেই গঞ্জের কোনো একটা দোকানে যে কোনো একটা কাজের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করতে বাধ্য হয়েছে। নিকুঞ্জবাবুর ছোট মেয়েটি এখন বিবাহযোগ্য বয়েসে পৌঁছে গেছে। বড় মেয়েটি গ্রামের রীতি অনুযায়ী বিয়ের যে বয়েস তাকে ছাড়িয়ে পাঁচ-ছ বছর এগিয়ে গিয়ে যথার্থই অলক্ষ্মীর মতো হয়ে উঠেছে। পাত্রপক্ষের সোনাদানার লোভ দিন দিন স্বচ্ছন্দে ধাপে ধাপে আরো উঁচুতে উঠছে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় নিকুঞ্জবাবু ক্লান্তিতে হাঁপিয়ে উঠেছিলেন, বিষম উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন—তাহলে মেয়েটার জীবনটা কি শেষ পর্যন্ত ব্যর্থই হয়ে যাবে।

ঠিক এই সময় নিকুঞ্জবাবু হঠাৎ পৃথিবীর অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ ইতিহাস চিন্তা করে মানুষের জীবনের পরিণতির কথা ভেবে আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন—তাঁর জীবনও কি শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হবে। সাধারণের চেয়েও সাধারণ তিনি, জীবিতকালেই তাঁকে অল্প কজন মাত্র চেনে, তাও চেনে কি চেনে না! সুতরাং মৃত্যুর পর ইতিহাসের কৃপা পাবার বিন্দুমাত্র আশা নেই। নিকুঞ্জবাবু অতএব নিজের মধ্যে ডুবে গিয়ে সংসারের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে গেলেন।

স্কুল ছুটির পর যখন সকলে যে যার ঘরে ফিরে যায়, তখন তিনিই শুধু আর ঘরে ফেরেন না, অন্যমনস্কের মতো হাঁটতে হাঁটতে গঞ্জের দিকে এগোতে থাকেন। গঞ্জের পাশ দিয়ে যে নদী সমুদ্রের দিকে বয়ে গেছে, সেই নদীর পাড়ে গৈরিক বালির ওপর এসে বসেন। অদূরে এক একটা ঢেউ আশ্চর্য উচ্ছল ভঙ্গিতে ভাসতে ভাসতে কূলে এসে হঠাৎ ভেঙে যাচ্ছে—বারবার, অবিরাম। চারপাশের বাতাসে ঢেউগুলোর কণ্ঠস্বর মিশে একসময় অদ্ভুত বিষণ্ণ শোকবিলাপের মতো শোনায়। ছোট বড় মাঝারি নানা আকারের পালতোলা নৌকোগুলো দূরে দূরে সজীব প্রাণীদের মতো বয়ে চলেছে, যেন নিরুদ্দেশে চলেছে সকলে। ক্রমশ আকাশে শেষ বিকেলের রঙ ঘনিয়ে আসে। সূর্যও ডুবে যায়। বেগুনে সন্ধ্যার আভাস ছড়িয়ে পড়ে চরাচরে। হঠাৎ ধূ ধূ পরপার থেকে ধোঁয়াটে অন্ধকার হু হু বেগে ছুটে আসতে থাকে, মুহূর্তে আকাশ পৃথিবী সমস্ত অন্ধকারের কবলে চলে যায়। নিকুঞ্জবাবু ভাবনার শেষে পৌঁছতে পারেন না, ক্রমশ আরো ভাবনার আবর্তে জড়িয়ে পড়েন, কিছুতেই আর মুক্তি পান না। যে কোনো সময় তাঁর মৃত্যু হতে পারে, আগে থেকে তিনি তার কিছুই জানতে পারবেন না।

অনেক আগে থেকেই মানুষকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। কিন্তু তিনি এখনও অপরিচিত অতি-সাধারণ থেকে গেলেন। তাঁর অন্তরাত্মা হাহাকার করে ওঠে। অন্ধকারে নিজের চোখে অদৃশ্য আবছায়া দিশাহারা হয়ে তিনি বসে থাকেন। গভীর রহস্যের মতো অস্পষ্ট ছায়াছায়া কোনো এক সম্পূর্ণ অপরিচিত পৃথিবী যেন ধীরে ধীরে অন্ধকারের গর্ভ থেকে ক্রমশ আত্মপ্রকাশ করে, অসংখ্য তারার মিট মিট আলোতে আবছা আকাশ একটা হেঁয়ালির মতো মনে হয়। অন্ধকার নদী এতক্ষণে ধূ ধূ কুয়াশাময় প্রান্তরের মতো ঈষৎ দৃশ্য হয়ে ওঠে। নিকুঞ্জবাবুকে ঘিরে অসংখ্য জোনাকি কাঁপতে কাঁপতে এলোমেলো বাতাসে ভাসতে থাকে। এখনও কি সময় আছে? যদি আবার নতুন করে জীবন শুরু করি? তা আর সম্ভব নয়? মৃত্যুর পর সত্যিই কি পৃথিবীতে আমি থাকব না? তাহলে এখন আমি কী করব? কোনো উত্তরই মেলে না। শুধু রাত্রি গভীরতর, অন্ধকার নিবিড়তর, পৃথিবীর প্রকৃতি জটিলতর হতে থাকে। নিকুঞ্জবাবু সমস্ত মিথ্যা আশা বিসর্জন দিয়ে শুধু অভিজ্ঞতা নিয়ে ঘরে ফিরে যান।

গভীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিকুঞ্জবাবু আরো কিছুদিন জীবন-যাপনের যন্ত্রণাকর দায় বয়ে চললেন। আর প্রতি মুহূর্তে সেই বিশ্বাসকে আরো প্রশ্রয় দিতে লাগলেন, তাঁর আসলে কোনোদিনই কোনো যোগ্যতা ছিল না, আজও নেই, তাই হাজার ইচ্ছা করলেও তিনি আর কোনোমতেই বিখ্যাত কেউ হয়ে সকলের পরিচিত হয়ে উঠতে পারেন না। অথচ সেই ইচ্ছাটা কিছুতেই মরতে চায় না, সারাক্ষণ উদ্বিগ্ন করে, হতাশ করে! জীবনযাত্রা ততই বিরক্তিকর আর বিস্বাদ লাগে। আরো বেঁচে থাকা অহেতুক অপ্রয়োজনীয় মনে হয়। তখন নিজের ওপর ভীষণ বিরক্ত এবং ক্রুদ্ধ হয়ে পড়েন।

মনে সবচেয়ে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া ঘটে স্কুলে, যখন কোনো একটি ক্লাসে পড়াতে যান। ইতিহাস বইখানা হাতে তুলে নিয়েছেন কি তৎক্ষণাৎ ভয়ঙ্কর উদ্বেগ হিংস্র সাপের মতো আক্রমণ করে। তিনি প্রাণপণে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেন, কিন্তু মনের শক্তি সব নষ্ট হয়ে গেছে। তাঁর কথা কেউ কোনোদিন জানবে না, সকলের অজান্তে চিরদিনের মতো তিনি হারিয়ে যাবেন। নিকুঞ্জবাবু ভীষণ চঞ্চল হয়ে পড়েন। অদ্ভুত এক যন্ত্রণার পীড়ায় তাঁর অনুভূতি শিথিল এলোমেলো হয়ে যেতে থাকে, তিনি শূন্যতায় ডুবে যেতে থাকেন। কথা বলার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেন, অস্বাভাবিক ভাবে ঠোঁট দুটো শুধুই

কাঁপতে থাকে। ক্লান্তিতে গোটা শরীরটা ভেঙে পড়তে উদ্যত হয়। শেষপর্যন্ত কোনোমতে টলতে টলতে ক্লাস থেকে বেরিয়ে যেতে পারেন মাত্র।

স্পষ্ট করে কিছু না-বুঝলেও তাঁর সম্পর্কে একটা কিছু অনেকেই অনুমান করল। স্কুল কমিটি যথারীতি বিদায় অভিনন্দন সহযোগে তাঁকে শেষ বিদায় দিলেন। আর সেই সঙ্গে তাঁর শূন্য জায়গায় তাঁরই বড় ছেলেকে আমন্ত্রণ করা হলো।

এরপর যা হওয়া স্বাভাবিক তাই হলো। তিনি ভাবলেন তাঁর আর কোনো কাজ নেই, সংসারেও তিনি একটা বোঝা মাত্র। ভাবলেন, আমার জীবনের পরিণতি যখন আমি জেনেই গেছি তখন কেন আর এই মিথ্যা জীবনকে শুধু শুধু বয়ে নিয়ে চলি!

আরো কয়েকদিন তিনি অপেক্ষা করলেন। দেখলেন, স্কুল থেকে শেষ বিদায়ের পর যে-টাকা তিনি পেয়েছিলেন, সেই টাকায় শেষ পর্যন্ত তাঁর বড় মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল; তাঁর ছোট ছেলে গঞ্জের এক দোকানে একটা কাজ পেয়ে গেল। দেখলেন, তাঁর কথা সকলে কেমন স্বচ্ছন্দে ভুলে গেছে। তিনি যে বেঁচে আছেন, এ-কথা যেন আর কারো মনে নেই। তিনি কি খান, কখন খান, আদৌ কিছু খান কি খান না, ঘুমতে পারেন কিনা, শরীর কেমন, কেন শরীর খারাপ—তাঁর কী হয়েছে—কোনো কথাই তাঁর সম্পর্কে কেউ ভাবে না। যেন সত্যিই তিনি মারা গেছেন আর কি!

তখন রীতিমতো বর্ষাকাল। দ্বীপের মতো নির্জন অন্ধকার স্যাঁৎসেঁতে দাওয়ায় ভিজে সপসপে কাঁথায় শুয়ে শুয়ে চালভাঙা বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে শীতে কুঁকড়ে যেতে যেতে অদ্ভুত এক জ্বরো মানসিকতায় নিকুঞ্জবাবু অনুভব করলেন তিনি যেন এক অজানা দেশের একজন অপরিচিত লোক। এক আশ্চর্য অলৌকিক আত্মদর্শন হলো তাঁর। টালির চালের ওপর টিপ টিপ অবিশ্রান্ত বৃষ্টির শব্দে এক অজানা লোকের কোন এক অপরিচিত কণ্ঠস্বর তিনি সারারাত ধরে শুনলেন, আর এক গভীর প্রেরণায় তাঁর মন একটু একটু করে ভরে উঠতে লাগল। যখন সকাল হলো, বৃষ্টিমুখর ঘনায়মান সন্ধ্যার মতো সকাল, নিকুঞ্জবাবু সকলের অলক্ষ্যে পথে নেমে পড়লেন। পথের জল-কাদা ভেঙে ভিজতে ভিজতে কাঁপতে কাঁপতে তিনি গঞ্জের খেয়াঘাটে এসে পৌঁছলেন। নদী তখন ঘন কুয়াশায় এমন অদৃশ্য যেন পরপার বলে কিছু নেই। এই দুর্যোগে তিনি ছাড়া দ্বিতীয় যাত্রী কেউ নেই। খেয়ারীকে

অনেক সাধ্যসাধনা করে শেষে একা অনেক পারীর ভাড়া দিয়ে নিকুঞ্জবাবু পরপারের উদ্দেশ্যে নৌকায় উঠলেন।

অন্য পারে যখন পৌছলেন তখন আর বৃষ্টি নেই। আকাশ মলিন মেঘমুক্ত। শান্ত রোদে উজ্জ্বল সেই নতুন জনপদ এক নতুন জগতের মতো মনে হলো। কিন্তু এখানে তিনি কাউকে চেনেন না, তাঁকেও কেউ চেনে না। ভাবলেন, তাহলে কাউকে পরিচয় দেওয়া বৃথা।

এখানে তিনি কোথায় এসেছেন তা জানেন না। কোথাও না কোথাও যেতে চেয়েছিলেন, যেতে হতই, তাই এখানে এসেছেন মাত্র।

পথে পথে মাঠে মাঠে আলোতে-অন্ধকারে দিন-রাত্রি নিজের সঙ্গে সারাক্ষণ কথা বলতে বলতে তিনি ইতস্তত ঘুরে ঘুরে বেড়ান। খিদে যখন কিছুতেই আর সহ্য হয় না, কোনো দোকান থেকে যাহোক কিছু খেয়ে নেন। কোনো দোকানের দেখা না-মিললে কিছুই আর খাওয়া হয় না। এক সময় আর খিদেও থাকে না। যখন ক্লান্তিতে খুব অবশ হয়ে পড়েন, কোনো গাছের নিচে বিশ্রাম করেন, ঘুমিয়ে পড়েন। রাত্রি-দিনের বিচার করেন না। তাঁকে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করে না, তিনিও কারো সঙ্গে কথা বলেন না। এক সময় এমন হলো আর কিছুই খেতে ইচ্ছা করে না, খিদে পায় না, ঘুম আসে না, বিশ্রাম করার তাগিদ অনুভব করেন না।

নিজেকে তিনি সম্পূর্ণ ভুলেই যাচ্ছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত একদিন তাঁর বাড়ির কথা মনে পড়ল। নিজেকে তিনি আবার গভীরভাবে ভাবলেন, ভাবলেন আমি যে এইভাবে ঘর থেকে পালিয়ে কোথায় না কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছি এতদিন ধরে, কেন? আমার কী হয়েছিল? কোনো কথাই তাঁর স্পষ্ট মনে পড়ল না। ভাবলেন, এই বুড়ো বয়েসে আমার কী দুর্মতি হয়েছিল, কী হাস্যকর ব্যাপার! এখন যদি ভালোয় ভালোয় আবার ঘরে ফিরে যাই তো এ-যাত্রায় সবদিক রক্ষা হয়। কিন্তু এতদিন আমি কোথায় ছিলাম, কেন এইভাবে আমি উধাও হয়ে গেলাম—বাড়ি পৌছে এইসব প্রশ্নের বিশ্বাসযোগ্য উত্তর দিতেই হবে। নইলে সকলে যে আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে, ভাববে—বুড়ো পাগল হয়ে গেছে, দে আবার বিদায় করে।

আবার নদী পেরিয়ে নিকুঞ্জবাবু গঞ্জের সেই পুরনো খেয়াঘাটে এসে পৌছলেন। তখন সকাল। রোদ গঞ্জের দৃশ্য আকাশ পথঘাট ঘরবাড়ি লোকজন সবই আগের মতো, তবু তাঁর মনে হতে লাগল যেন জীবনে এই

প্রথম তিনি এখানে এসে পৌছলেন। নিজেকে তাঁর বার বার অন্য একজন অপরিচিত লোক মনে হতে লাগল।

তিনি ভীষণ রোগা হয়ে গেছেন। মেরুদণ্ডটা যেন ভেঙে যেতে বসেছে, অসম্ভব কুঁজো হয়ে হাঁটছেন। সাদা রুক্ষ লম্বা চুলগুলো বটগাছের ঝুরির মতো মুখের চারপাশে ঝুলে পড়েছে। দুপাশের দুটো গাল অস্বাভাবিক রকম ভেঙে গিয়ে দুটো গহ্বরের সৃষ্টি হয়েছে। শুকনো কপালটা অসংখ্য ভাঁজে ভাঁজে যেন ফেটে ফেটে গেছে। কোটরস্থিত চোখদুটো পেকে গেছে। জামাকাপড় ইতস্তত ছিঁড়ে গেছে, আর নোংরা যত বেশি হওয়া সম্ভব। নিজের গলার স্বর শুনে নিজেকে যেন তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না। কিন্তু বাড়ির পথ চিনে চলতে তাঁর একটুও ভুল হচ্ছে না।

বাড়ির দরজায় পৌঁছে তিনি সকলকে নাম ধরে ধরে ডাকতে লাগলেন। প্রত্যেকে নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত ছিল, এক সময় সকলেই বেরিয়ে এল। কিন্তু যে-লোকটি এতক্ষণ ধরে তাদের সকলকে নাম ধরে এত ডাকাডাকি করছিল, তাকে তারা কেউই চিনতে পারল না। নিকুঞ্জবাবু খুব অবাক হলেন, বিরক্তও হলেন যথেষ্ট। শেষপর্যন্ত তাঁকে নিজের নাম-পরিচয় ইত্যাদি বলতে হলো! তখন দু-একজন তাঁকে কিছুটা চিনতে পারল, আবার ঠিক চিনতে পারলও না। তিনি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। কোনো প্রতিবাদও করতে পারলেন না। অদ্ভুত দুঃখ যন্ত্রণা আর অভিমানে তাঁর অন্তর কানায় কানায় ভরে গেল। হতাশভাবে আরো কিছুক্ষণ সকলের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর একসময় যেমন নিঃশব্দে এসেছিলেন, তেমনি ফিরে গেলেন। তাঁকে এইভাবে চলে যেতে দেখে সকলে ভাবল : এই লোকটি কখনোই তাদের নিরুদ্দেশ আত্মীয় হতে পারে না, হলে এমন করে নিশ্চয়ই ফিরে চলে যেত না।

পুস্তক-পরিচয়

বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণবপদাবলীর ক্রমবিকাশ। ডঃ সতী ঘোষ। সারস্বত লাইব্রেরী। পাঁচ টাকা

বাঙলা বৈষ্ণব পদাবলী নিয়ে এ-পর্যন্ত যে খুব বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আলোচনার এই বিস্তারের মধ্যে তার মূল প্রবাহটি অনেক ক্ষেত্রেই হারিয়ে গিয়েছে। অথচ মূল প্রবাহটি অনুসরণ করতে না পারলে কেবলমাত্র তার আলোচনার বিস্তারের মধ্য থেকে তার রস এবং তাৎপর্য কিছুতেই উপলব্ধি করা যেতে পারে না। তারপর বিস্তৃত আলোচনা পণ্ডিতের উপভোগ্য; সাধারণ পাঠক এবং ছাত্রসমাজের কাছে তা যেমন অপ্রয়োজনীয় তেমনই অনেক সময় ভীতিপ্রদ। সুতরাং বাঙলা বৈষ্ণব পদাবলীর মূল প্রবাহটির যাতে সন্ধান পাওয়া যায়, যাতে তার মর্ম যথাযথ ব্যাখ্যাও হয়, যাতে এর সূক্ষ্মতম তাৎপর্যটুকু প্রকাশ পায়—এমন একটি গ্রন্থ বহুদিন ধরেই প্রত্যাশিত ছিল। বাঙলা বৈষ্ণব পদাবলীর প্রাচীনতম একটি ধারা নিয়ে যিনি গবেষণা করে যশস্বিনী হয়েছেন, তাঁরই হাত দিয়ে আজ সেই প্রত্যাশাটি পূর্ণ হয়েছে দেখে আমি যারপর নাই আনন্দিত হয়েছি। ডক্টর শ্রীমতী সতী ঘোষ ইতিপূর্বে 'চৈতন্যসমসাময়িক কালের বৈষ্ণব পদাবলী' নামক গ্রন্থ রচনা করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট লাভ করেছিলেন। তার মধ্যে বৈষ্ণব পদাবলীর মূল ভিত্তি নিয়েই তিনি আলোচনা করেছেন; এই বিষয়ে তাঁর সাম্প্রতিক গ্রন্থ বৈষ্ণব পদাবলীর সামগ্রিক ভাব এবং রস-প্রবাহটি অনুসরণ করে রচিত হয়েছে। সুতরাং যে-বিষয়ে তিনি যথার্থ অধিকারিণী, সেই বিষয়েই তিনি এখানে তাঁর গ্রন্থটি রচনা করেছেন, সুতরাং তার প্রামাণিকতা সম্পর্কে পাঠকদিগকে তিনি নিঃসন্দিগ্ধ রাখবার সুযোগ দিয়েছেন।

বৈষ্ণব দর্শনে যাঁরা সুগভীর পণ্ডিত, তাঁরা সাধারণ পাঠক এবং ছাত্র সমাজের কথা ভেবে তাঁদের বই রচনা করেননি, তাঁরা পণ্ডিত এবং ভক্ত সমাজের কথাই ভেবেছেন। কিন্তু ডক্টর শ্রীমতী ঘোষ বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে পাণ্ডিত্য অর্জন করেও সাধারণ পাঠক এবং ছাত্র সমাজের কথা

স্মরণ করেই তাঁর 'বাংলাসাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলীর ক্রমবিকাশ' নামক গ্রন্থটি রচনা করেছেন। সেজন্য তাঁর গ্রন্থখানি অভিনন্দনযোগ্য।

বৈষ্ণব পদাবলীর দুটো দিক আছে ঃ একটি রসের দিক, আর-একটি তত্ত্বের দিক। পণ্ডিতগণ তত্ত্বের দিকটা যত দেখেছেন, রসের দিকটা তত দেখেননি। কিন্তু ডক্টর শ্রীযুক্তা ঘোষের আলোচনায় তত্ত্ব এবং রসের মধ্যে সুন্দর সামঞ্জস্য স্থাপিত হয়েছে; কারণ তিনি সাহিত্যের অধ্যাপিকা বলে রসবিচারের অন্তর্দৃষ্টি তাঁর আছে। সেইজন্য তাঁর এই আলোচনা যথার্থ সার্থকতা লাভ করেছে।

বৈষ্ণব পদাবলী আলোচনার ভাষা রসসিক্ত না হলে তা কদাচ উপভোগ্য হতে পারে না। শ্রীমতী ঘোষের রচনা সাহিত্যরসসিক্ত বলেই তার মধ্যে যতখানি তত্ত্বকথা আছে, তাও পরম উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। সুতরাং সাধারণ পাঠকও এই আলোচনার মধ্যে সহজেই প্রবেশ করতে পারবেন।

কিছুকাল যাবৎ বাঙলা সাহিত্য এবং সংস্কৃতির অমূল্য সম্পদ বৈষ্ণব পদাবলী সম্পর্কে বাঙালি রসিক পাঠকসমাজে আগ্রহের অভাব দেখা যাচ্ছে। যে-বিষয় কয়েকশত বৎসর ধরে বাঙালির ধ্যান ও জ্ঞানের রাজ্য পরিপূর্ণ ভাবে অধিকার করে ছিল, আজ তার প্রতি অবহেলার ভাব দেখলে স্বভাবতই দুঃখ হতে পারে। আমার মনে হয়, সময়োপযোগী গ্রন্থের অভাবই তার কারণ। একদিন এই বিষয় নিয়ে যে-বই লেখা হয়েছিল, আজকের পাঠকদের কাছে তার মূল্য নানা কারণেই অনেক কমে এসেছে। সুতরাং আজকের পাঠকের প্রয়োজনে যুগোপযোগী করে এই বিষয়ে বই না লিখলে এযুগে তা প্রচার লাভ করতে পারে না। শ্রীমতী ঘোষ তাঁর এই গ্রন্থখানি রচনা করে সেই অভাব অনেকখানি পূরণ করেছেন। সে জন্য তিনি আমাদের সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন।

আশুতোষ ভট্টাচার্য

ব্যোমকেশ মুস্তফী। দেবজ্যোতি দাশ। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ। এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা

উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকেই কার্যত বাঙলা সাহিত্যে গবেষণার সূচনা। দীনেশচন্দ্র সেন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী,

যোগেশচন্দ্র রায়, সতীশচন্দ্র রায়, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের পরিশ্রম ও প্রচেষ্টাতে বাঙলা সাহিত্যের গবেষণায় প্রভূত সৃষ্টি সম্ভবপর হয়েছে। সাম্প্রতিককালে যথাযথ তথ্যনির্ভর গবেষণাকর্মে শৈথিল্য তথা অনীহা অসংখ্য লেখককে লালন করায় (যার ব্যতিক্রম যোগেশচন্দ্র বাগল, বিনয় ঘোষ প্রমুখেরা) সৎপাঠক পীড়িত ও শঙ্কিত হন, সন্দেহ নেই ; তৎসত্ত্বেও কতিপয় নিষ্ঠাবান গবেষকের প্রয়াসে আমাদের উৎফুল্ল হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। ।

শ্রীদেবজ্যোতি দাশের 'ব্যোমকেশ মুস্তফী' সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার ১০৩ সংখ্যক গ্রন্থ। নির্ভরযোগ্য জীবনীকোষ হিসেবে সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ পেশ করা নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন। প্রসঙ্গত বলা চলে—তথ্যভিত্তিক জীবনীরচনা যে অতীব আয়াসসাধ্য, সে-সম্পর্কে ব্রজেন্দ্রনাথ ও তাঁর সহকর্মীদের মতো আলোচ্য মালাকারও সবিশেষ সচেতন। উৎসুক পাঠক শুনে আরও খুশী হবেন যে দেবজ্যোতিবাবুর অশেষ আগ্রহেই দীর্ঘকাল পরে সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার প্রকাশন পুনরায় সক্রিয় হবে। অতএব নিঃসন্দেহে তিনি ধন্যবাদার্হ। তাঁর 'ব্যোমকেশ মুস্তফী' পাঠে তাঁকে ব্রজেন্দ্রনাথের সার্থক উত্তরসূরী বলতেও আমার আদৌ আপত্তি নেই। এবং কোনও উচ্চকপালবাদী এমতো তারিফে অনুরাগীর অশোভন উচ্ছ্বাস ঠাওরালেও একজন ভুক্তভোগী সমদর্শী হিসেবে আমি আমার সিদ্ধান্তে স্থিরনিশ্চয়। সর্বোপরি বলা যায়, 'ব্যোমকেশ মুস্তফীর'-র প্রতিটি পৃষ্ঠাই আমার এবংবিধ প্রত্যয়ের পরিস্ফুট প্রতীক।

বাঙলা নাট্যজগতের স্বনামখ্যাত ব্যক্তিত্ব অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফীর সুযোগ্য সন্তান ব্যোমকেশ আমৃত্যু বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সেবায় আপন অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ বিলিয়ে দিয়েছিলেন। এই একনিষ্ঠ ত্যাগের মহিমা যথার্থই দুর্লভ। পরিষদের নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ কর্মে সদাসর্বদা ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও কতিপয় গবেষণামূলক রচনাতেও ব্যোমকেশ নিজেকে নিয়োজিত করেন। যদিচ প্রথাগত বিদ্যাচর্চায় পারদর্শী হওয়া তাঁর পক্ষে আদৌ সম্ভবপর হয়নি। কলকাতা হাইকোর্টের সাধারণ চাকুরিজীবী হিসেবে ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর বিরাগ-ভাজন হওয়া ছিল তাঁর জীবনে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। কারণ, বলা বাহুল্য পরিষদই ছিল তাঁর একমাত্র ধ্যানজ্ঞান। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সংগ্রহে রামেন্দ্রসুন্দরকে লিখিত ব্যোমকেশের যে তিনখানি চিঠি বর্তমান, প্রথম পত্রটির শেষাংশের আলোকচিত্রসমেত সেই চিঠিগুলির অনুলিপি (দেবজ্যোতিবাবুর

পাদটীকাসহ) অনুধাবনে পাঠক পরিষদের সঙ্গে পত্রলেখকের যোগাযোগের যথার্থ স্বরূপটি হৃদয়ঙ্গম করবেন।

উপসংহারে দেবজ্যোতিবাবু লিখেছেন ঃ "ব্যোমকেশ মুস্তফীকে প্রথম শ্রেণীর সৃজনধর্মী লেখক বলিয়া প্রচার করিবার যৌক্তিকতা নাই। সাহিত্যে লেখক হিসাবে তাঁহার অবদান প্রধানতঃ সৃজনধর্মী নয়, ব্যাখ্যান ও বিচারধর্মী। কিন্তু লেখক হিসাবে তাঁহার যে গুরুত্ব, সাহিত্য-আন্দোলনের উদ্যোগী কর্মী হিসাবে গুরুত্ব সে তুলনায় বহুগুণে অধিক। এই শেষোক্ত ভূমিকাই তাঁহাকে বঙ্গসাহিত্যের জগতে দীর্ঘস্মরণীয় করিয়া রাখার পক্ষে যথেষ্ট। নাট্যজগতে অর্ধেন্দুশেখরের অবদানের তুলনায় স্বীকৃতি নিতান্ত সীমাবদ্ধ; ব্যোমকেশের নিঃস্বার্থ ও নিরলস শ্রম বিবেচনা করিলে মনে হয়, সাহিত্যজগৎ বুঝি তাঁহারও মূল্যায়নে কৃপণতা করিয়াছে, তাঁহারও প্রাণদানের ঋণ অনায়াস নিষ্কারুণ্যে বিস্মৃত হইয়াছে, আসরবাহিরে তাঁহার স্মৃতিকে নির্বাসিত করিয়া অযাচিত সেবার অধমর্ণতার দায়মুক্ত হইয়াছে।"

সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়

ভিয়েতনাম। মণীন্দ্র রায়। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। দু-টাকা

ভিয়েতনাম-প্রসঙ্গ বাঙলা দেশের শিল্পী সাহিত্যিকদের যে অল্পবিস্তর নাড়া দিয়েছে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধকে উপলক্ষ করে একাধিক কবিতা-সঙ্কলন, কবি-সম্মেলন, এমন কি সংস্কৃতি-সেবীদের বিক্ষোভ মিছিল পর্যন্ত হয়ে গেছে। এই ধারাবাহিক উদ্যমে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন মণীন্দ্র রায় প্রণীত একটি দীর্ঘ কবিতা, 'ভিয়েতনাম'।

৬০১ পংক্তি বিস্তৃত এই কবিতাটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রতিটি অধ্যায়ে একদিকে যেমন এক এক বক্তব্যের কাব্যরূপ দেয়া হয়েছে, তেমনি, অপর দিকে অধ্যায়গুলি ক্রমানুসারে একটি অপরটির সম্পূরক। একটু মোটা ভাবে বিচার করলে দেখা যায় অধ্যায় ১—ভিয়েতনামের জাগরণ, ২—খণ্ডিত বাঙলা ও ভিয়েতনামের তুলনা, ৩—মুক্তিসেনাদের যুদ্ধ, ৪—ইতিহাসের শিক্ষা, ও ৫— ভিয়েতনামের মুক্তি; এভাবেই কবিতাটির বিবর্তনের বাঁকগুলো জেগে ওঠে।

প্রথম অধ্যায়ে ভিয়েতনামকে উপলক্ষ করে পৃথিবীর সর্বত্র ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী শেকল ছিঁড়ে ফেলার জন্য রক্ত ও চোখের জলের পথে পীড়িত মানুষের বৈপ্লবিক লড়াইয়ের কথা বলা হয়েছে। পড়তে পড়তে মনে হয়, চোখের সামনে যেন একটা মানচিত্র খোলা রয়েছে। এক জায়গায় দাঁড়াতে পারে না, চোখ অবিরাম বা অবিশ্রান্ত ভাবে ছুটে যায় ভারতের প্রায় প্রতিটি প্রদেশ শেষ করে আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা ও অন্যান্য দেশ-মহাদেশের "শত জাতি অধ্যুষিত ভূগোলের পলিতে বা মনে।" এবং স্বভাবতই শেষাংশে কবিকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়, "একটা পথ কেবলি সম্মুখে,/যেন গোটা পৃথিবীরই গতির শপথ—/রাত্রিফাটা আকাশের ঊষার শিখরে/স্বাগত, স্বাধীন,/ভিয়েতনাম, জাগে ভিয়েতনাম।" বেশ একটা সমর্থ পুরুষালি মেজাজ আছে অধ্যায়টিতে, ভূগোল বা বিবৃতি অতিক্রম করে যা কবিতা হয়ে ওঠে।

যথেষ্ট ভালো কাব্যাংশ থাকা সত্ত্বেও কিছু কিছু প্রশ্ন থেকে যায় দ্বিতীয় অধ্যায়টিকে ঘিরে। প্রথমেই উদ্ধার করা যাক এ-জাতীয় কিছু সুঠাম পঙক্তি—

(১) "মনে পড়ে, চম্পা তুমি
সমুদ্রের দূর উপকূলে!
মনে পড়ে, সেদিনের সুবর্ণভূমির
দ্বীপময় ভারতের, শ্যাম-কম্বোজের
বাণিজ্যবায়ুর আনাগোনা।"

(২) "আর তাই নাপামের তরল আগুন
পোড়ায় পুরুষ-হাত, নারীর হৃদয়, আর
কচি-কাঁচা বাছাদের আদরের গাল।
আর তাই ধানক্ষেতে হাঁটুজলে মেয়ে—
পিছনে দাউদাউ গ্রাম, উলঙ্গ বালিকা,
দুচোখে বিশ্বের ঘৃণা, কাঁদে অসহায়।"

এই অংশে কবি খণ্ডিত বাঙলার সঙ্গে ভিয়েতনামের তুলনা ক'রে বেদনার্ত হয়ে বলছেন, "আমি জানি, যন্ত্রণা কি তার!" বিভাজন ছাড়া একটি দেশের সঙ্গে আরেকটি দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, এমন-কি অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের চরিত্রগত কোনো মিল আছে কি? জার্মানির ক্ষেত্রেও কি চাইবেন তিনি এক-দেশতত্ত্বকে সমর্থন করতে? এ-অংশটি ভিয়েতনামের বহু অঞ্চলের ও বীর নায়কদের ব্যাপক নামোল্লেখে অযথা ভারাক্রান্ত।

তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়টিতে ইতিহাসের অমোঘ নিয়ম সার্থক কাব্যভাষা লাভ করেছে। পর পর উন্মুক্ত উজ্জ্বল পঙক্তিগুলি কবির অভীষ্ট লক্ষ্য ভেদ করেছে। বিশ্ববিধানে অত্যাচারের বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থানের যে বিবর্তনশীল রূপ দেশে কালে দেখা যায়, ভিয়েতনামের পটভূমিতে তাকে কবি সার্থকভাবে উপস্থাপিত করেছেন। এ-অধ্যায়ে এক মুহূর্তের জন্য কবি অসতর্ক হননি ও তাঁর মুঠো কবিতার বল্গা থেকে শ্লথ হয়ে যায়নি। এক সর্বব্যাপী মারণাস্ত্রের বিরুদ্ধে ভিয়েতনামের মানুষের অস্তিত্বের প্রশ্নটিকে তিনি যখন তুলে ধরেন—

"তোমার সমুদ্রতীরে, ধানক্ষেতে, পাহাড়ে টিলায়
কোন মূল্যে বেঁচে আছ তুমি ?
তোমার প্রতিটি ঘরে ঘুমন্ত শিশুরা
উড়ন্ত বুলেট ঝাঁঝরা লুটেছে মাটিতে ;
পথে পথে কেঁদেছে জননী।
প্রতিটি সকাল সন্ধ্যা রক্ত ঢেলে তবু
তুমি জয়ধ্বনি।" অথবা আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদের ভগ্ন-পরিণতির দিকে ইঙ্গিত করে কবি যখন বলেন—

"যতো সে পীড়নে হিংস্র
ততো তাকে টানে চোরাবালি—
যতো ডোবে ততো তার আথালি-পাথালি।
চতুর্দিকে টানে কাঁটাতার,
চতুর্দিকে উঁচানো সঙিন,
শুধু হেলিকপ্টারের—
রকেটের—প্লেনের গর্জন,
গ্যালন গ্যালন মদ,
মদিরাক্ষী বারবণিতার
ফ্লোর শো'র উল্লোল হুল্লোড়।
তবু ঠিক ঘাড়ের পিছনে
কে যেন দাঁড়িয়ে—শান্তি নেই ;" তখন সঠিকভাবেই কবির চেতনা ঘটনার নিয়ন্ত্রণ-শক্তির সঙ্গে সাজুয্য খুঁজে পায়। এবং তাই এ হেন বক্তব্য অনায়াসে সত্য হয়ে ওঠে, "ইতিহাস মোড় নেয়,/বোঝে কি তা কালের জহ্লাদ ?"

এই সত্যতার পথ ধরে কবি নির্ভুল ভাবে কবিতাটির অন্তিম অধ্যায়ে এগিয়ে গেছেন। প্রায় স্লোগানের মতো জীবন্ত হয়ে উঠেছে, "কথাটা এগিয়ে চলা ; / বুকে হাঁটা পাহাড়ে খাড়াই। / কথাটা আগুনে নামা ; / সাড়া তোলা মানুষের ঘরে।" ব্যারাকপুরে মঙ্গল পাঁড়ে, সাঁওতাল পরগণায় বিরশা-সিধু, বাঁশের কেল্লার নায়ক তিতুমীর, চট্টলের প্রীতিলতা, তেলেঙ্গানা, কাকদ্বীপ তাই অলঙ্ঘনীয়ভাবে যাত্রী হয় বাস্তিলের অগ্নিভ দিনগুলির, পেত্রোগ্রাদ সাইবেরিয়ার শহীদদের, সাক্কো-ভেনসিত্তি, রোজেনবার্গ দম্পতি, ফুচিক, লুমুম্বা, গুয়েভারার। তাই, "অযুত শহীদ আসে, / পায়ে পায়ে লাখো লাখো বীর ; / সব দেশ মহাদেশ সময়ের শতাব্দী ডিঙিয়ে, / পৃথিবীর গূঢ়তম নাটকের শেষ অঙ্কে আজ / ওরা করে ভিড়।" দুনিয়ার মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে ভিয়েতনামের লড়াইকে সাফল্যমণ্ডিতভাবে মেল-বন্ধনে বেঁধে দিতে পারা 'ভিয়েতনাম'-এর কবি মণীন্দ্র রায়ের পক্ষে কম কৃতিত্বের নয়।

মানুষের মুখ। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। কবিতা গ্রন্থাগার। তিনটাকা

যে সময়কে কিছুটা ভুল বোঝাবুঝির ঝুঁকি নিয়েও চল্লিশের দশক বলা হয়, সেই সময়ে যাঁরা কবিতা লিখতে শুরু করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে গোনা দু-তিন জনের কলম এখনো সমান ধারায় অকৃপণ। নিঃসন্দেহে তাঁদের একজন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

তাঁর প্রণীত সাম্প্রতিকতম কাব্যগ্রন্থ 'মানুষের মুখ'। গ্রন্থের সমস্ত কবিতাই বিগত তিন বছর অর্থাৎ ১৯৬৭-৬৯ সনের মধ্যে লিখিত। তিন বছরের কবিতাগুলিকে তিনটি স্বতন্ত্র পর্যায়ে সাজানো হয়েছে। কাব্যের চতুর্থ অংশটিতে হো-চি-মিনের কয়েকটি কবিতার অনুবাদ করা হয়েছে।

বছর পাঁচ/ছয়েকের মধ্যে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অনেকগুলি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেছেন, কখনো একক ভাবে (সভা ভেঙে গেলে, মুখে যদি রক্ত ওঠে, ভিসা অফিসের সামনে, মহাদেবের দুয়ার ও ওরা যতই চক্ষু রাঙায়), কখনো বা অপর কোনো কবির সঙ্গে (তৃণতরঙ্গ রৌদ্র। রাত্রি শিবরাত্রি—স-অতীন্দ্র মজুমদার এবং হাওয়া দেয়—স-অরুণ ভট্টাচার্য)। এই কাব্যগ্রন্থগুলিতে প্রাক্তন-রীতি কাটিয়ে মুখ্যত আনুষ্ঠানিক কবিতা রচনাতে মনোনিবেশ করেছিলেন কবি। কবি অপেক্ষা প্রগতিশীল সাংবাদিকের ভূমিকাই এসব জায়গায় বেশি

ভাবে পালন করা হয়েছে; বলা বাহুল্য, তার ফলে কবির ক্রোধ ও ঘৃণা এত প্রত্যক্ষ ও স্পষ্টভাবে দেখা দিয়েছিল যে, সেই অনুভব কতখানি কবিতা হয়ে উঠেছিল, তা নিয়ে অনেকের মতো আমারও কিছু স-সঙ্কোচ প্রশ্ন ছিল। তা ছাড়া এত দ্রুত পর পর বই প্রকাশ করে যাওয়া পাঠককুলকে বেশ একটু বিব্রত করে—কারণ তাঁরা তো সেই রন্ধন-শিল্প, সেই ধীর অথচ ঋজু কাব্যিক বিবর্তনের বাঁকটি খুঁজে বের করার জন্য অপেক্ষা করেন, বিশ্রাম চান। এমন সময়, আমাদের একই রকমের আশঙ্কায় অস্থির করে বেরিয়েছে কবির সদ্য প্রণীত 'মানুষের মুখ'।

কিন্তু সুখের বিষয়, বস্তু ও ঘটনার ভিড় ছিঁড়ে বহুদিন বাদে গভীর আন্তরিকতায়, সংবেদন ও সচেতনার সাজুয্যে পরিস্ফুট হয়েছে প্রকৃত কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মুখ। আমাদের অনর্গল কাব্যপাঠের ঔদাসীন্যের উপর প্রায় জায়মান বিস্ময়ের মতো এসে পড়েছে কাব্যগ্রন্থটি।

'৬৭-র কাব্যাংশের উন্মেষ অবশ্য খুব পরিচ্ছন্ন নয়, তবে এখান থেকেই অবিরত কোলাহল ও একজাতীয় একঘেয়ে গুটিকতক শব্দ প্রয়োগের পালা অতিক্রম করে কবির বেরিয়ে আসার প্রচেষ্টা চোখে পড়ে। এই অংশে বীরেনবাবুর প্রিয় ঈশ্বর আছেন; ধর্ম, ব্রাহ্মণ, আশীর্বাদ, রাজা ইত্যাদিও পুরনো রীতি-মাফিক আছে; অবশ্য তাঁর কবিতায় উপরোক্ত বস্তুগুলির সংজ্ঞা সামন্ত-তান্ত্রিক নয়, খানিকটা নিত্য বা সত্যের চেহারা নিয়ে তারা আসে। জানি না, নিম্নোক্ত প্রয়োগগুলোও একালের পাঠকের কাছে ক্লিশে হয়ে এসেছে কি না—

(১) "প্রতিটি রুটির টুকরো, প্রতিটি ধানের শিষ জ্বলে যেন
ফিনকি দেয়া খুনের নিশান।" (গোর্কির জন্য)

(২) "রোদ না উঠতে, ফ্যান দাও!
রোদ চলে গেলে, ফ্যান দাও!" (কয়েকজন ভিক্ষুক)

(৩) "লাল টুকটুক নিশান ছিল
হঠাৎ দেখি শ্বেত কবুতর,
উড়ছে ঊর্ধ্বে, আরও ঊর্ধ্বে
ভুখমিছিলের মাথার উপর।" (লাল টুকটুক নিশান ছিল)

কিন্তু এই অধ্যায়েই কবিতা পরতে পরতে খুলতে আরম্ভ করেছে 'সত্যকাম', 'রাজত্ব' ও বিশেষভাবে 'জেলখানার কবিতা' ১, ২, ৩, ৪-এ। গভীর অর্থবহ

হয়ে কানে বাজে, কবি যখন লেখেন—"সারা দুপুর পাখিগুলি/রোদ পোহায়; সমস্ত রাত পাখিগুলি/শীত তাড়ায়।" শীতার্ত রাতে দুপুরের সঞ্চিত উষ্ণতা বহন করে নিয়ে আসা জীবনের উত্তাপ যেন আমাদের বোধের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে যায়। জেলখানার কবিতাগুলি লেখা হয়েছিল প্রফুল্ল ঘোষ সরকারের বিরুদ্ধে বাঙলার গণতান্ত্রিক মানুষের ব্যাপক আইন-অমান্য আন্দোলনের গৌরবদীপ্ত পটভূমিকায়, স্বয়ং কবি-ও যে-লড়াইয়ের সৈনিক ছিলেন। কবিতাগুলি পড়তে পড়তে আমার খুব মনে পড়ে যায়, অনেকদিন পর, নাজিম হিকমেত-কে। কাটা কাটা, ছোট, সংহত বক্তব্য—বিপুল আলোড়ন আত্মস্থ তন্ময়তায় থিতিয়ে এলে যেভাবে লেখা হতে পারে সার্থক কবিতা। জেলখানার বন্দীদের ঘিরে কবি যে রৌদ্রের উৎসব দেখেছেন, তাকেই এই কবিতাগুলিতে তিনি বর্ণাঢ্য ভাষায় ধরে রেখেছেন। যে-মানসিকতায় সার্থক, ঋজু ভঙ্গীতে লেখা হয়েছে—

"গেট খুলে গেলে আমরা একটু আধটু রোদ পাব
যদিও গেটের বাইরে গেট, পথ হাঁটলে
আবার লোহার দরজা! ডাইনে বাঁয়ে ভয়ঙ্কর অপরাধী,
মিশতে বারণ।....
তবু গেট খুলে যাওয়া ভাল; বাইরে একটু পায়চারি করা যাবে।"
(তিন)

তারই উত্তরণ হয় উন্নততর কাব্যভাষায়—

"কারার আড়ালে জন্মদিন
বাজায় ভোরের শঙ্খ?
তোমার, আমার, পৃথিবীর
সব মানুষের
মুখের ওপর এই ভোর
কাঁপে না কি?

আমরা তো স্বপ্ন দেখি
স্বদেশের প্রতি ঘরে একটি জন্মদিন।" (চার)

'৬৮র কাব্যাংশে কবিতার বিভা ক্রমশ প্রখর হয়ে উঠেছে। এই অংশের শ্রেষ্ঠ কবিতা 'প্যারীর আগুনে দীপ্ত ভুবন রাঙায়' পুরোপুরি উদ্ধার করে দেয়ার লোভ বহুকষ্টে দমন করতে হচ্ছে। এমনই কয়েকটি অনন্য কবিতা 'ক্রুশবিদ্ধ মানুষের ছবি', 'গানের মানুষ,' তিন পংক্তির 'সে', 'বৃষ্টিতে মিলায়,'

'জন্মভূমি' ও 'রাত্রি ক্ষমাহীন'। কেমন অনায়াস অনিবার্য বলে মনে হয় —

(১) "তিমির বিনাশী তুই, জন্মভূমি।
মেলাস বুকের পদ্ম, দিঘির কান্নাকে
শিশুর মুখের রৌদ্রে, শান্ত
উষার আগুনে।" (জন্মভূমি)

(২) "মেলায় এসো শোকহরণ গানের মানুষ, আনো
হীরার মতো রৌদ্র ক্রীতদাসের মুখে।" (গানের মানুষ)

(৩) "আমার ঘরভরতি শুধু ক্রুশের চিহ্ন, করুণাহীন ;
কোথায় আমার রক্তমাখা আলোর ফুল, ক্ষমা ?"
(ক্রুশবিদ্ধ মানুষের ছবি)

'৬৯-এর কবিতার অধ্যায় আরম্ভ হয়েছে 'রক্তাক্ত দক্ষিণা' নামে একটি অনবদ্য, সম্ভবত এই সঙ্কলনের শ্রেষ্ঠ, কবিতা দিয়ে—

"কঠিন সবিতাব্রত, তাই রাত জেগে
কবিতা লিখি না।
অথচ সূর্যের স্তব ছাড়া কবিতার
আজ কোন অর্থ আছে কি না।

ভোরের বৃক্ষের কাছে, সন্ধ্যার নদীকে
প্রশ্ন করি····নিরুত্তর····একমাত্র দ্বিপ্রহর দাবি করে রক্তাক্ত দক্ষিণা।"

বাইরের উত্তাপকে এভাবেই ভিতরে নিয়ে এসে বোধির উজ্জ্বল আনন্দে লেখা হয় কবিতা—যা সত্যিকারের অর্থে কবিতার প্রগতি বা মুক্তিকে বয়ে আনে। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রশংসিত কবিতা 'লেনিন' এই অংশভুক্ত। এ-অধ্যায়ে একটি অত্যন্ত দুর্বল কবিতা আছে, যা ক্ষিপ্ত চীৎকার ছাড়া আর কিছু নয় ; নাম 'দেয়ালের লেখা'। আশা করি, ভারসাম্য সম্পর্কে কবি আরেকটু সচেতন হবেন। গান্ধীজীর প্রতি কবিতাটি বিতর্কমূলক। পাঁচ পঙক্তির কবিতায় গান্ধীজীর সামগ্রিক দর্শনকে বিদ্রূপ করা আমার কাছে দায়িত্বহীন হঠকারিতা বলে মনে হয়েছে।

হো চি মিনের কবিতার অনুবাদগুলি যথাযথ, এর বেশি কিছু বলা সম্ভব নয়। ছাপা খারাপ, যথেষ্ট মুদ্রণ প্রমাদ রয়েছে। গ্রন্থের অঙ্গসজ্জা রীতিমতো দীন। বিশেষ করে আজকাল কতো সুন্দর সেজে গুজে কবিতার বই বেরোয়।

অমিতাভ দাশগুপ্ত

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয় সংহতি সপ্তাহ

২৪শে জানুয়ারি থেকে ৩০শে জানুয়ারি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে, জাতীয় সংহতি সপ্তাহ উদ্‌যাপিত হলো। ৩০শে জানুয়ারি গান্ধীজীর মৃত্যুদিনে 'শহীদ দিবস'-এ সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী একটি উল্লেখযোগ্য ও বর্ণাঢ্য শোভা-যাত্রা বেরোয়। বাঙলাদেশের বহু বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী, বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতি-সেবী ঐ শোভাযাত্রায় অংশ নেন। তা ছাড়া ছাত্রছাত্রীরা ঐ সংহতি সপ্তাহ উদ্‌যাপন ও শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানগুলির উদ্যোগ নিয়েছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীয় সংহতি সংস্থা।

জাতীয় সংহতি সপ্তাহের উদ্‌যাপনে শহীদচিত্রমালা প্রদর্শনী ও আলোচনাচক্র বিশেষ উৎসাহের সৃষ্টি করে। জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের ধর্ম, সম্প্রদায়, শ্রেণী নির্বিশেষে আত্মদানকারী মহান শহীদদের শহীদ চিত্রমালা প্রদর্শনী বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়। ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে হিন্দু-মুসলমান-শিখ প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের মানুষ কেউ কারো থেকে পিছিয়ে থাকেননি। সকল রাজ্যের সকল ভাষা সম্প্রদায় ও ধর্মের মানুষই যে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আত্মদান করেছিলেন—প্রদর্শনীটি দেখতে দেখতে এ-সব কথা মনে পড়ে যায়। সাম্প্রদায়িকতাবাদী, ভাষান্ধ ও সঙ্কীর্ণতাপন্থীদের সমস্ত প্রকার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত জাতীয় সংহতি-বিরোধী গোপন ও প্রকাশ্য প্রচারের বিরুদ্ধে এ-প্রদর্শনী একটি জ্বলন্ত প্রতিবাদের মতো। শহীদ চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী আবেগস্পন্দিত কণ্ঠে শোনালেনঃ মেদিনীপুরের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের বিভিন্ন আন্দোলন পর্যায়ে হিন্দু-মুসলিম কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়েছেন। সত্যাগ্রহ আন্দোলনে হিন্দুদের পাশে মুসলিমদের ছিল ঐকান্তিক সহযোগিতা, সমর্থন ও অংশ গ্রহণ। ২৪শে জানুয়ারি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দিবসে, উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন আলোচনা চক্র উদ্বোধন করলেন। নতুন দৃষ্টিতে ভারতের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস পর্যালোচনার এই প্রচেষ্টাকে তিনি স্বাগত জানালেন।

আলোচনা চক্রের অন্যতম বিষয় ছিল 'ভারতের নব জাগরণ'। তরুণ বুদ্ধিবাদী অধ্যাপক ডঃ প্রদীপ সিংহ উনিশ শতকে কলকাতার সমাজ ও অর্থনৈতিক জীবনের এক তথ্যপূর্ণ বিবরণ দিয়ে বললেন, নবজাগরণের

অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল 'বাজার-অর্থনীতি'। বাবু-কালচার তারই একটি দিক। ডঃ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় নবজাগরণের মধ্যে সনাতন ধর্মকে পুনর্জীবিত করার যে প্রয়াস ছিল—তার সদর্থক ও নঙর্থক দিকগুলি চমৎকারভাবে আলোচনা করেন। 'নন্দন' পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রী সৈয়দ সাহেদুল্লাহ্ নবজাগরণের সামাজিক পটভূমি, বঙ্কিমের ভূমিকা, নবজাগরণের নেতাদের শ্রেণীচরিত্র ও তাঁদের প্রগতিশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল কার্যকলাপ ইত্যাদি বিষয়ে এক চমৎকার বিশ্লেষণমূলক ভাষণ দেন।

সভাপতি ডঃ অমলেশ ত্রিপাঠী তাঁর বক্তব্যে নবজাগরণের বিভিন্ন দিকগুলি সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করে বঙ্কিমের প্রগতিশীল দিকগুলি তুলে ধরেন।

আলোচনার দ্বিতীয় দিনে 'স্বদেশী ও অসহযোগ আন্দোলন' বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অধ্যাপক শান্তিময় রায় স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমি, তার বৈশিষ্ট্য, তার ফলশ্রুতির কথা উল্লেখ করেন। এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করে ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য অসহযোগ আন্দোলনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমির এক তথ্যপূর্ণ ও মনোজ্ঞ বিবরণ দেন। তিনি গান্ধীনেতৃত্বের প্রগতিশীল ভূমিকা ও তার স্ববিরোধিতাগুলি সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেন। আলোচনার মূল সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্য। তিনিও তাঁর অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেন।

তৃতীয় আলোচনার বিষয় ছিল 'অগ্নিযুগ'। এই আলোচনার সভাপতি ছিলেন প্রবীণ বিপ্লবীনেতা শ্রীসতীশ পাকড়াশী। তিনি অগ্নিযুগের আদি থেকে শেষ পর্যন্ত প্রধান প্রধান দলের ভূমিকা, তাঁদের মুক্তিপ্রয়াস, ব্যর্থতার কারণ ও আত্মত্যাগের কথা সবিস্তারে বলেন।

বিপ্লবী শ্রীযুক্তা বীণা দাস 'অগ্নিযুগ'-এর পটভূমি ও এই দুই যুগের মধ্যে সংযোগের সমস্যাবলী এবং বিপ্লবী মহিলাদের ভূমিকার এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেন। এই আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন শ্রীভূপেন রক্ষিতরায়, শহীদ ভগৎ সিং-এর সহকর্মী শ্রীসুরযপ্রকাশ আনন্দ ও শ্রীশান্তিময় রায়। অধ্যাপক গোপাল হালদার বাঙলার সাহিত্যে, সঙ্গীতে, সমাজচিন্তায় অগ্নিযুগের ভূমিকার এক মনোজ্ঞ বিবরণ দেন।

প্রাচীন বিপ্লবী শ্রীনগেন্দ্রশেখর চক্রবর্তী তাঁর অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়ে বলেন যে "আমরা কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের স্বাধীনতার কথা কখনো মনে স্থান দিই নাই। মুসলিমরাও ১৯১০-এর পর থেকে বিভিন্ন প্রদেশে এই

বিপ্লবী প্রয়াসে সমান ভাবে যুক্ত থেকে সমান ত্যাগ স্বীকার করেছেন।" অধ্যাপক শান্তিময় রায় 'অগ্নিযুগ' যে "হিন্দু পুনর্জীবনের যুগ" এই ধরনের ভুল ধারণার নিরসনে কয়েকটি তথ্যপূর্ণ যুক্তি দিয়ে বলেন "এই যুগের" মধ্যেও রাজনৈতিক চিন্তার বিবর্তন ঘটতে বাধ্য এবং তা ঘটেছেও। বঙ্কিম, বিবেকানন্দ ও শাওয়ালীউল্লা থেকে যার আরম্ভ—ম্যাটজিনি, গ্যারিবল্ডী, মাইকেল, কলিন্স, ক্রপটকিন হয়ে মার্কস ও লেনিনের চিন্তার মধ্যে সে-যুগের শেষ। ভগৎ সিং, বরকতুল্লীর চিন্তার মধ্যেই এ-রূপরেখা পরিষ্কার বোঝা যায়।

চতুর্থ আলোচনা হয় জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে ছাত্র, যুবক ও মহিলাদের ভূমিকা প্রসঙ্গে। এই আলোচনার উদ্বোধন করেন অধ্যাপক শ্রীগৌতম চট্টোপাধ্যায়। তিনি ইয়ং বেঙ্গল থেকে শুরু করে আনন্দমোহন, সুশীল সেন, কানাইলাল হয়ে ৪৬ সালের ছাত্র আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেন। শ্রীযুক্তা বিদ্যা মুন্সী এই আলোচনায় মহিলা শাখার অংশগ্রহণকারী হিসেবে স্বর্ণকুমারী থেকে জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী পর্যন্ত বীরাঙ্গনাদের কথা উল্লেখ করেন।

আজাদ হিন্দ বাহিনীর অন্যতম নায়ক ও সুভাষচন্দ্রের সহকর্মী শ্রীদেবনাথ দাস আজাদ হিন্দ বাহিনীর মুক্তিযুদ্ধে হিন্দু-মুসলিম-শিখ এবং খৃষ্টানদের বিপ্লবী ঐক্য ও আত্মত্যাগের বহু দৃষ্টান্ত দেন। এই আলোচনার শেষ বক্তা শ্রীসুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় করাচির নৌবিদ্রোহের অন্যতম অংশগ্রহণকারী ছিলেন। যখন তিনি ১৮ বছরের ছাত্র আনোয়ার হুসেনের অভূতপূর্ব বীরত্বের চিত্র তুলে ধরেন, তখন সভার প্রত্যেকটি শ্রোতার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে। শ্রীব্যানার্জি বলেন "ভারতের মুক্তি আন্দোলন যদি আজাদ হিন্দ বাহিনী, নৌবিদ্রোহ ও ২৯এ জুলাই-এর পথে অগ্রসর হতে পারত, তবে দেশবিভাগ হতো না—বিপ্লবের সিংহদ্বার এক বিরাট সম্ভাবনাময় পথের দিকে খুলে যেত। কিন্তু তা হয়নি। কেন হয়নি, কারা তা হতে দেয় নি?" যখন নৌবিদ্রোহে হিন্দু-মুসলিম-শিখ ও খৃষ্টান নওজোয়ানদের অসামান্য ভ্রাতৃত্ববোধ, সংগ্রামী দৃঢ়তা ও মহান আত্মত্যাগের একটির পর একটি কাহিনীর তিনি বর্ণনা দেন, তখন আলোচনাচক্রের সবার কাছ থেকে তিনি আন্তরিক অভিনন্দন লাভ করেন। সবাই তাঁকে এই মহিমময় কাহিনী প্রত্যেক কলেজে কলেজে ছাত্রদের কাছে পৌঁছে দিতে অনুরোধ করেন।

পঞ্চম দিনে আলোচনা হয় শ্রমিক, কৃষক ও সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার ভূমিকা প্রসঙ্গে। সভাপতি ডঃ সুনীলকুমার সেন এই আলোচনার উদ্বোধন

করতে গিয়ে বৈজ্ঞানিক ও ধর্মনিরপেক্ষ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসকে উপস্থিত করার মহৎ এই প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানান। তিনি উনবিংশ শতাব্দীতে সমাজচিন্তা ও সমাজসংস্থাগুলির সংস্কারের ক্ষেত্রে কৃষক বিক্ষোভ ও বিদ্রোহগুলির অসামান্য অবদানের কথা উল্লেখ করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি পাবনার কৃষকবিদ্রোহের ও বিভাগপূর্ব ভারতে উত্তরবঙ্গে তেভাগা আন্দোলনের কথা উল্লেখ করেন। অন্যতম বক্তা শ্রীধরণী গোস্বামী শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠিত প্রয়াসের এক বিশেষ ধারাকে চিহ্নিত করেন। বলশেভিক বিপ্লবের পর কিভাবে শ্রমিকশ্রেণীর সচেতন সংগঠিত প্রয়াস শেষ পর্যন্ত ৪৬-এর ২৯ এ জুলাই উত্তাল তরঙ্গের সৃষ্টি করে, তিনি সে-ধারার বিবরণ দেন।

অধ্যাপক জ্যোতি ভট্টাচার্য জাতীয় সংহতি আন্দোলনের কয়েকটি সমস্যার কথা উল্লেখ করে শ্রেণীসংগ্রামের দৃষ্টিকোণ থেকে এই আন্দোলনকে সংহত করতে বলেন। শ্রীচিন্মোহন সেহানবীশ সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার প্রথম আরম্ভ ও তার ধারাবাহিক ক্রমবিকাশের এক অসাধারণ তথ্যপূর্ণ বিবরণ দিয়ে ত্রিশোত্তর যুগে ফাসীবিরোধী আন্দোলনের স্রোত জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে কি অস্বাভাবিক সমস্যাসঙ্কুল পথ অতিক্রম করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর যুগের আন্তর্জাতিক ঔপনিবেশিক মুক্তি আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গে সম্মিলিত করেছিল—তার চমৎকার বিবরণ দেন।

আলোচনার শেষ দিনে ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে মুসলিমদের ভূমিকা প্রসঙ্গে আলোচনার উদ্বোধন করে অধ্যাপক শান্তিময় রায় এই ধরনের আলোচনার কৈফিয়ৎ হিসেবে সাম্প্রদায়িকতাবাদী ঐতিহাসিকদের তিনটি ভ্রান্ত তত্ত্বের বিরাট প্রচার ও গভীর প্রভাবের কথা উল্লেখ করেন। সেগুলি হচ্ছে: (১) ভারতবর্ষ ১২০০ সাল থেকে পরাধীন; (২) ভারতে কোনোদিন সাংস্কৃতিক ঐক্য হয়নি; (৩) জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে মুসলিমরা বিশ্বাসঘাতক। বর্তমানকালের সাম্প্রদায়িকতার মনোভাবকে এই তিনটি প্রচারের দ্বারা সজীব রাখা হয়েছে! এই তিনটির মধ্যে শেষোক্তটি সম্পর্কে আলোচনার সময় তিনি সবিস্তারে সকল যুগে মুসলিমদের সংগ্রাম, ত্যাগ, সাহস, বীরত্বের বিভিন্ন উদাহরণ দেন। প্রথম মহাযুদ্ধের মধ্যে বিপ্লবী মুসলিম দলগুলির মুক্তিপ্রয়াসে তিনি সেনাবিদ্রোহের বহু নিদর্শন দেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি গণবিপ্লবী আন্দোলন, সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজ এবং ৪৬-এর পুলিশ, সেনা ও নৌবিদ্রোহে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের মহিমময় মিলনের কথা ব্যক্ত করেন।

এই আলোচনায় অংশগ্রহণকারী স্বরযপ্রকাশ আনন্দ ও ডাঃ এইচ.এল. চোপরা উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে পাঞ্জাবে দিল্লীর দেওবন্ধু মহাবিদ্যালয়ে শত শত মুসলিম যুবকের দুঃসাহসিক সংগ্রামের এক তথ্যপূর্ণ বিবরণ দেন। শেষ বক্তা ছিলেন আবদুর রেজ্জাক খাঁ। জীবনের শেষ প্রান্তে পৌছে সুদীর্ঘ সংগ্রামী জীবনের এক চিত্তাকর্ষক কাহিনী ব্যক্ত করে তিনি আবেগপূর্ণ কণ্ঠে আবেদন করেন—পরস্পরকে জানতে ও বুঝতে হবে।

সভাপতি ডঃ আতাকরিম বার্কের ভাষণের পর আলোচনাচক্রের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এই আলোচনা, শহীদ প্রদর্শনী, পাঁচটি চলচ্চিত্র (মধুসূদন, বাঁশের কেল্লা, ক্ষুদিরাম, ভুলি নাই, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল) ও যাত্রা (বিনয়-বাদল-দীনেশ) প্রভৃতি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রায় বিশ সহস্রাধিক নরনারী যোগদান করেন।

কল্যাণ চৌধুরী

'সবুজ বিপ্লব' বনাম কৃষি বিপ্লব

অধ্যাপক গানার মিরডাল এশিয়ার অনুন্নত দেশগুলির উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টা বিষয়ে আলোচনা করে কয়েক খণ্ডে 'এশিয়ান ড্রামা' নামে গবেষণামূলক একটি বই লিখেছেন। বইটিতে এশিয়ার দারিদ্র্য তথা উন্নয়নভিত্তিক নানা সমস্যার কথা বলা আছে। ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও অত্যন্ত মূল্যবান গবেষণামূলক সৃষ্টিশীল দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত বইটিতে লক্ষ্য করা যায়। ভারতের গ্রাম তাঁর মতে, "যেন এক জটিল অণু, যার বিভিন্ন অংশে চূড়ান্ত টানাপোড়েন চলেছে। অবশ্য এই টানগুলি এমনভাবে ছড়ানো যে একটা ভারসাম্য তার ফলে বজায় রয়ে গেছে। ভাবা যেতে পারে, টানগুলি যদি একটু অন্যভাবে বণ্টিত হয়, অণুটি প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ফেটে যাবে। সম্ভবত নিজের থেকে এমন একটা কিছু ঘটবে না, তবে বাইরে থেকে কোনো শক্ত ধাক্কা এ-বিস্ফোরণ সম্ভবসাধ্য করে তুলবে।"

মিরডালের উক্তির মধ্যে অবশ্যই সত্য রয়ে গেছে। কিন্তু বাইরের ধাক্কাই যে কেবল ভারতের গ্রামঅর্থনীতি ও ভূমিব্যবস্থায় বিস্ফোরণ এনে দেবে এমন কথা বলা অর্ধসত্য মাত্র। আসলে ভারতের ভূমিব্যবস্থার মধ্যেই বিস্ফোরণের উপাদান পরিমাণমূলকভাবে সঞ্চিত হয়ে আছে, এখন গুণগত তাৎপর্যে তা বিস্ফোরণের অপেক্ষায় রয়েছে। অবশ্য গুণগত পরিবর্তনের জন্য বাইরের ধাক্কা

অনুঘটক বা ক্যাটালিস্টের কাজ করতে পারে। ভারতের কৃষিতে সাম্প্রতিক পুঁজিবাদী বিকাশের আঘাত, যার অন্যনাম বহু ঢাক পিটিয়ে 'সবুজ বিপ্লব' বলা হচ্ছে—সেই অনুঘটকের কাজ করতে পারে। এই অতি কথিত 'সবুজ বিপ্লব'-এর কার্যকরী ফল সম্পর্কে বড় মহলেও ভাবনার অন্ত নেই। এমন কি অর্থবান ধনী চাষীদের লক্ষ্য করে শ্রীচ্যবনও বলতে বাধ্য হয়েছেন, "এই 'সবুজ বিপ্লব' যদি সামাজিক ন্যায়বিচারের সঙ্গে সম্পর্কিত না হয়, আমার সন্দেহ হয় এ-সবুজ বিপ্লব আর সবুজ নাও থাকতে পারে।" কৃষিজাত উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে এ-কথা ঠিক যে এ-বছরই এ-দেশে প্রায় নয় কোটি ষাট লক্ষ টন খাদ্যশস্য উৎপাদন হবে। কিন্তু এই উৎপাদন বৃদ্ধি ও তারই সঙ্গে গ্রামে ভূমিবণ্টনের অসমতা এবং শোষণ-বৃদ্ধি সমস্যাকে আরো জটিল করে তুলেছে।

রাষ্ট্রসংঘের সামাজিক উন্নয়নের আর্থনীতিক ও সামাজিক কমিশনের উদ্দেশে লিখিত একটি নোটে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সম্পাদক উ থাণ্ট উন্নয়মান দেশগুলির ভূমিসংস্কার বিষয়ে কিছু সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন। ভারতের 'সবুজ বিপ্লব' সম্পর্কে বিশেষভাবে তাঁর সাবধানবাণী এড়িয়ে যাবার মতো নয়। বেশি ফলনের বীজ ব্যবহার, সার, সেচ ও কীটনাশক ঔষধের বর্ধমান ব্যবহারের ফলে যে উৎপাদন বেড়েছে, তাকে উ থাণ্ট "তৃতীয় বিশ্বে সাম্প্রতিককালের গ্রামদুনিয়ায় সন্দেহাতীতভাবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিকাশ" বলে অভিহিত করেও বলছেন, এই উৎপাদনবৃদ্ধিজনিত 'সবুজ বিপ্লব' বহুবিধ সামাজিক সমস্যাকে একেবারে সামনে এনে ফেলেছে। উ থাণ্ট আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, "এই সবুজ বিপ্লব প্রথমত গ্রাসাচ্ছাদনে টিকে থাকা চাষীর উপকার না করে যে-চাষী ইতিমধ্যেই ব্যবসায়িক ভিত্তিতে উৎপাদন করছে তারই উপকার করবে, এমন-কি ব্যবসায়িক ভিত্তিতে উৎপাদনকারী চাষীদের মধ্যে বড় চাষীরা ছোটদের চেয়ে বেশি উপকৃত হবে···· এ-সম্পর্কে কাগজপত্র পড়ে ধারণা হয় যে সবুজ বিপ্লবের লাভ আপেক্ষিক ভাবে কম লোকজনের ভাগ্যেই জুটেছে।" উ থাণ্ট সম্ভাব্য পরিস্থিতিও খুঁটিয়ে দেখেছেন। লিখেছেন, "ছোট চাষীরা বড় চাষীর কাছে ক্রমশ বাজার থেকে হটে যেতে বাধ্য হবে এবং প্রজাউচ্ছেদ ঘটবে। যতক্ষণ চাহিদা যোগানের চেয়ে বেশি থাকবে, কৃষকরা জোরালো প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হবে না। যে-সব দেশ খাদ্য আমদানীকারী নয় কিন্তু বিদেশে জোরালো চাহিদার দাক্ষিণ্যে কৃষি উৎপাদনের রপ্তানীকারী, তাদের ক্ষেত্রে এমন অবস্থা প্রযোজ্য। কিন্তু কালক্রমে যখন যোগান আর চাহিদার মধ্যে আর ফারাক থাকবে না বরং

ক্রেতার বাজার দেখা দেবে, তখন ছোট চাষীকে বড় চাষীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে হবে।" ফলে ভারতেও এই 'সবুজ বিপ্লব' বড় বড় জমির মালিকের ভাগ্য ফিরিয়ে দেবে। উ থাণ্ট আরো বলছেন যে "পাঞ্জাবে সবুজ বিপ্লবে উপকার হয়েছে বিশ শতাংশেরও কম কৃষি পরিবারের। কর বেড়েছে, জমির দাম ক্রমশ চড়া হয়েছে, খাজনা ক্রমবর্ধমান, ফলে প্রজার অবস্থা ভালো না হয়ে বরং আরো খারাপ হয়েছে।"

ভারতের কৃষিমন্ত্রী শ্রীজগজীবন রামও গত ডিসেম্বরে বোম্বাইয়ে কংগ্রেস অধিবেশনের ভাষণে বলেছেন, "চাষের ক্ষেত্রে অগ্রগমন ঘটেছে। চাষের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় এবং ঋণের ব্যবস্থারও উন্নতি হয়েছে। যারা কয়েকটি টাকার যৎকিঞ্চিতের উপরে টিকে রয়েছে তারা নয়, এতে লাভ হয়েছে সংখ্যালঘু—ধনী ও মধ্য চাষীর। কৃষিজীবী পরিবারগুলির ৪৭ শতাংশ, এক একর করে জমির মালিক, ২২ শতাংশের হাতে এক কণা জমিও নেই। তিন থেকে চার শতাংশ বড় চাষীর হাতেই সব ক্ষমতা। তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিপুল। সরকারী যন্ত্রের সঙ্গে মিলে তারা সিদ্ধান্ত নেয়। সরকারী সংস্থাগুলি যে কৃৎকৌশল, সম্পদ প্রভৃতির সুযোগ দেয়, এরা তার সবটাই কুক্ষিগত করে রাখে। গ্রামের বাকি দরিদ্র অর্ধাংশ আর কাকেই বা যৎকিঞ্চিৎ সুযোগ পাবার জন্যে ধন্যবাদ জানাবে!"

উ থাণ্ট বলছেন সামাজিক সুবিচারের দাবির কথা, বলছেন 'সবুজ বিপ্লব'-এর দাক্ষিণ্যে বিপনন ও জমির মালিকানার কেন্দ্রীভবনের কথা। ভারতের কৃষিমন্ত্রী বলছেন, সরকারী সংস্থাগুলির সহায়তায় কৃষিতে পুঁজিবাদের বিস্তারের কাহিনী। এক কথায় বলা যেতে পারে, ভারতের কৃষিতে এই তথাকথিত 'সবুজ বিপ্লব' ধনীকে ধনী করেছে, দরিদ্রকে আরো দরিদ্র করেছে, গ্রামে শোষণের মাত্রা বাড়িয়েছে এবং গ্রামীণ অর্থনীতির পুরানো ভারসাম্য বদলে দিয়েছে। মিরডালের ভাষায় বলা যেতে পারে, এ-যেন বাইরের ধাক্কা। কিন্তু পুরোটাই কি বাইরের ধাক্কা? বুর্জোয়াশ্রেণীর রাষ্ট্রক্ষমতা প্রয়োগ ভিত্তিক ভারতের কৃষি-অর্থনীতির গত বিশ-বাইশ বছর বিকাশের মধ্যেই কি তার বীজ নিহিত ছিল না?

'সবুজ বিপ্লব-এর' সূত্রপাত হলো কি করে? ১৯৬৫ সালে শ্রী সুব্রাহ্মণ্যমের উদ্যোগে অধিক ফলনের জন্য "উন্নত যন্ত্রপাতি এবং আরও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সহ বিজ্ঞান ও কৃৎকৌশলের সুশৃঙ্খল ব্যবহার" সাপেক্ষ এক 'নতুন রণনীতি' বা স্ট্র্যাটেজির প্রবর্তনা ঘটে। 'অধিক ফলনের বিবিধ কর্মসূচি' প্রয়োগের জন্য

প্রগাঢ় চাষের লক্ষ্যে বেছে নেওয়া কয়েকটি জেলায় এই 'নতুন রণনীতি' চালু করার ব্যবস্থা হলো। শ্রীসুব্রাহ্মণ্যম পূর্বতন খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী এস. কে. পাতিলের কাছ থেকে এই প্রকল্পের উত্তরাধিকার পান। ১৯৬১ সালে শ্রীপাতিল ফোর্ড ফাউণ্ডেশন-এর প্রগাঢ় কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচির (IADP) পাইলট প্রকল্প হিসাবে ১৫টি গম এবং ধান্যউৎপাদন অঞ্চল গ্রহণ করেছিলেন। এই কর্মসূচি সাধারণত 'প্যাকেজ প্রোগ্রাম' নামে পরিচিত। প্যাকেজ প্রোগ্রামের এলাকাগুলি এই নতুন রণনীতির অঞ্চল বলে ১৯৬৫ সালে বিবেচিত হলো। খসড়া চতুর্থ পরিকল্পনায় আরও ছয় কোটি একর জমি এই নয়া নীতির অন্তর্ভুক্ত করা হবে বলে ধরা হয়েছে। বলা হচ্ছে, অতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদনের ৭৫ শতাংশই নাকি আসবে এই ছয় কোটি একর থেকে।

এই 'নয়া রণনীতি' প্রয়োগের প্রথম থেকেই বামপন্থী দলগুলি এ-প্রকল্পের কার্যকারিতা বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। বলেছিলেন, ভূমিব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ব্যতীত বৈজ্ঞানিক কৃৎকৌশল ইত্যাদি জমিতে প্রয়োগ করা হলে তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। উপরন্তু ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য গ্রামাঞ্চলের জীবন অবধারিত-ভাবে সংগ্রামের সূচিমুখে উত্তীর্ণ করে দেবে। এ-সব কথা কমিউনিস্টদের হিস্টিরিয়া বলে উড়িয়ে দেওয়া হলো। শেষে যা ঘটল তাতে রাজশক্তির চোখেও সরষেফুলের ক্ষেত মাঝেমধ্যে ভেসে উঠছে। USAID-র বিশেষজ্ঞ ভারত সরকারের কৃষিমন্ত্রকের উপদেষ্টা শ্রীফ্রান্সিন ফ্রাঙ্কেল IADP বিষয়ে একটি বিবরণী উপস্থিত করলেন। বিবরণী পড়ে বোঝা গেল, ভারতের ভূমি সমস্যার আপাত স্থিতাবস্থার তলায় বারুদ জমে আছে, যে কোনো মুহূর্তে স্ফুলিঙ্গ ডিনামাইট ফাটিয়ে দেবে। আসলে ঐ 'নয়া নীতি' IADP ভারতের সমাজ-অর্থনীতির শিকড় ধরেই টান দিয়েছে, কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়েছে।

ফ্রাঙ্কেল সাহেব ঐ 'নয়া নীতি'র ফলে উদ্ভূত সমাজ-আর্থনীতিক সমস্যা ইত্যাদি পর্যালোচনা করতে চেয়েছিলেন। IADP তো বটেই, বেশি ফলনের বিবিধ কর্মসূচির প্রভাব কতখানি গ্রামভারতের আয়বণ্টনের উপরে, কতটাই বা গ্রামে সামাজিক ও আর্থনীতিক সম্পর্কের উপরে পড়েছে—সেটাই ফ্রাঙ্কেল সাহেব দেখতে চেয়েছিলেন। তিনি IADP জেলাগুলির মধ্যে মাত্র পাঁচটি জেলা তাঁর গবেষণার কাজের জন্য বেছে নেন। জেলাগুলি হলো লুধিয়ানা (পাঞ্জাব) পশ্চিম গোদাবরী (অন্ধ্র) কাঞ্জাভুর (তামিলনাড়ু), পালঘাট (কেরেলা) ও বর্ধমান (পশ্চিম বঙ্গ)।

ঐ গবেষণা থেকে ধরা পড়ল যে, যে-সব অঞ্চলে বেশি ফলনের বীজ, বেশি সার, সেচ ও কীটনাশক ঔষধের ব্যবহার বেড়েছে, সে-সব অঞ্চলেই, বিশেষত গম-উৎপাদন অঞ্চলে, প্রায় সব শ্রেণীর কৃষকদেরই আয় ও উৎপাদন বেড়েছে। তবে ধান্য উৎপাদন অঞ্চলে কৃষি জলবায়ুর অবস্থার বৈগুণ্যে বেশি ফলনের বীজের তেমন উৎসাহব্যঞ্জক ফল পাওয়া যায়নি। তা সত্ত্বেও বলা চলে, ঐ ধান্য অঞ্চলেও সার, কীটঘ্ন ঔষধ এবং অন্যবিধ আধুনিক ব্যবস্থার প্রয়োগের ফলে 'দেশী' ধরনের বীজের উৎপাদনের চেয়ে বেশি উৎপাদন হয়েছে।

কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধিই বড় কথা নয়। উৎপাদন বৃদ্ধিজাত ফল কিভাবে বণ্টিত হয়েছে—সেটাই ভূমি অর্থনীতিতে বিশেষভাবে দেখবার কথা। এই 'নয়ানীতি'র ফল দারুণ অসমভাবে বণ্টিত হয়েছে। লুধিয়ানা জেলায় যেখানে অধিকাংশ চাষীরই ১৫ থেকে ২০ একর বা তারও বেশি জমি আছে, সেখানেও ফসল ও আয়বৃদ্ধির ফল অসমানভাবে বণ্টিত হতে দেখা গেছে। ১০ একর বা তারও চেয়ে কম জমির মালিক চাষীদের নিচুতলার শতকরা ২০ শতাংশের আর্থনীতিক অবস্থা বরং আরো খারাপ হয়েছে। আসলে, এই নতুন নীতির জন্যে প্রয়োজনীয় ছোটখাটো সেচব্যবস্থার মতো কোনো ব্যবস্থায় লগ্নি করা এদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। কেননা, তেমন মূলধনই তাদের আয়ত্তাধীন ছিল না। অন্যদিকে কিন্তু ২৫।৩০ একর বা তারও চেয়ে বেশি জমির মালিকেরা, জমি উন্নয়নের জন্য অনেক বেশি মূলধন লগ্নি বা যন্ত্রব্যবহার করতে পেরেছে। পাঞ্জাব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতরা এটাই আগে থেকে কল্পনা করে নিয়ে গদগদ হচ্ছিলেন। তাঁদের মতে, ছোট চাষীরা 'অযোগ্য চাষী'। তাঁরা চান এঁরা কৃষি থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাক। তাঁরা মনে করেন বড় বড় কৃষিক্ষেত্র, প্রচুর মূলধন লগ্নি, কৃষির যন্ত্রীকরণ—সব কিছু মিললে পাঞ্জাবে দুধ ও মধু বয়ে যাবে। কিন্তু পাঞ্জাবে ভূমি ব্যবস্থাটি কেমন? সরকারী তথ্য অনুযায়ী লুধিয়ানার ৪৬ শতাংশ কৃষকই খাজনা বন্দোবস্তে জমির মালিকের কাছ থেকে জমি নিয়ে থাকে। পাঞ্জাব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাবে লুধিয়ানার আবাদযোগ্য জমির ২৫ শতাংশই এই প্রজারা চাষ করে থাকে। এই প্রজারাই ১০ একরের চেয়ে কম জমির চাষী। বলা যেতে পারে, 'সবুজ বিপ্লব'-এর হাতে হাতে-পয়লা ফল হলো লুধিয়ানার এক তৃতীয়াংশ চাষীর জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাওয়া। একদিকে উচ্ছেদের সম্ভাবনা, অন্যদিকে ইতিমধ্যেই ভূ-স্বামীরা উচ্চহারে খাজনা দাবি করছে। পাঁচ বছর আগে যে-জমির খাজনা ছিল একর পিছু ৩০০—৩৫০ টাকা, তা এখন ৫০০

টাকায় দাঁড়িয়েছে। বর্গা ব্যবস্থারও পরিবর্তন ঘটেছে। ৫০ : ৫০ ভাগ থেকে, এখন মালিক : ভাগচাষীর হার হয়েছে ৭০ : ৩০। বিহার ও উত্তরপ্রদেশে ৮০ শতাংশ চাষী পরিবার আট একরের চেয়েও কম হারে জমি চাষ করে থাকে। সে-অঞ্চলে 'এই ধনী ও দরিদ্রের আপেক্ষিক অবস্থা আরও বিপজ্জনক মেরুপ্রস্থানে চিহ্নিত।

ধান্য চাষ অঞ্চলে ধনীদরিদ্রের এই বৈষম্য আরও বিস্তৃত হতে শুরু করেছে। ফ্রানসিন ফ্রাঙ্কেল পশ্চিম গোদাবরী, থানজাভুর, পালঘাট ও বর্ধমান জেলার তথ্য অনুযায়ী দেখেছেন, "চাষীদের গরিষ্ঠাংশের—ধান্য বলয়ে প্রায় ৭৫ থেকে ৮০ শতাংশ—আর্থনীতিক অবস্থার আপেক্ষিক অবনতি হয়েছে; মৌখিক বন্দোবস্তে নিযুক্ত অরক্ষিত প্রজাদের জীবনযাত্রার মানের নিরঙ্কুশভাবে অবনয়ন ঘটেছে।" বর্ধমান জেলায় অধিকাংশ চাষীরই জমি নেই, কেউ বা তিন একরের চেয়ে কম জমিতে অলাভজনক চাষে নিযুক্ত। বর্তমানে এক তৃতীয়াংশ কৃষি পরিবার সম্পূর্ণই ক্ষেতমজুর পরিবার। বাকি দুই-তৃতীয়াংশ চাষী পরিবারের মধ্যে প্রায় অর্ধেকই বর্গাচাষে নিযুক্ত। একটি সাম্প্রতিক তথ্যে জানা যাচ্ছে যে বর্ধমান জেলার অর্ধেক আবাদযোগ্য জমি বর্গাচাষের অধীন।

'সবুজ বিপ্লব'-এর হিসাব নিকাশ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে বর্গাচাষী বা ভাগচাষীর জমিতে মূলধন লগ্নি করার মতো ক্ষমতা নেই। অর্থাৎ বিক্রয় কৃত পণ্য থেকে এমন উদ্বৃত্ত আসে না, যা দিয়ে স্বল্পস্থায়ী (বীজ, সার) মধ্যস্থায়ী (বলদ কেনা) বা দীর্ঘস্থায়ী (জমি উদ্ধার, সেচ ব্যবস্থা প্রবর্তন, যান্ত্রিক লাঙল ব্যবহার) প্রয়োজন মেটানো যেতে পারে। ভূস্বামী বা স্থানীয় ব্যবসায়ীর কাছে বছরে ৩৬ শতাংশ সুদে কৃষিঋণ করতে তারা বাধ্য হয়। এ-ছাড়া স্থানীয় ধরনের ঋণ—'বাড়ি' বা 'টাকামী' ঘরানার—তো রয়েই গেছে। সম্প্রতিকালে 'বাড়ি' ঋণদাতা ভূস্বামী ব্যবসায়ী বা মহাজন কর্জা ধানের সুদ হিসাবে ধান না নিয়ে, ঋণ দেবার সময় ধানের দর অনুযায়ী সম্ভাব্য ধানের পরিমাণ সুদকে টাকায় হিসেব করে, ধান উঠবার সময় ঋণ দেবার সময়ে ধানের যা দাম ছিল বাজারে চলতি দামে সেই টাকার ধান এবং সুদের টাকার ধান বর্গাচাষীর কাছ থেকে নিতে শুরু করেছে। অর্থাৎ আধাআধি খাজনার আধিয়ার 'বাড়ি'র ধান পরিশোধের নামে ঢাকের দায়ে মনসা বিকিয়ে যাবার মতো অবস্থায় গিয়ে পৌঁছায়। ফ্রাঙ্কেল অবশ্য এই বিশেষ ধরনের ঋণ নিয়ে খুব একটা আলোচনা করেননি। রাসায়নিক সার ইত্যাদি কেনবার মতো

টাকা ভাগচাষীর কাছে উদ্বৃত্ত না থাকারই কথা। ফলে প্যাকেজ কর্মসূচির বা 'নয়া নীতি'র সুযোগ নেওয়া ভাগচাষীর পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। অন্য-দিকে বড় জোতের মালিক এই প্যাকেজ কর্মসূচীতে বেশি লাভ পাওয়ায় বর্গাচাষীকে ক্রমশই দ্রুতহারে উচ্ছেদ করে চলেছে। ফলে ভাগচাষীর হাতে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ক্রমশই হ্রাস পাচ্ছে। বহু ক্ষেত্রে তারা ক্ষেতমজুরে পরিণত হয়েছে। বর্ধমান জেলার ১২ থেকে ২০ একর সেচের অধীন জমির মালিকের IADP ও 'নয়া নীতি'তে লাভ হয়েছে। তাদের উৎপাদনও বেড়েছে, আয়ও বেড়েছে। বর্ধমান জেলায় ধনী-দরিদ্রের মধ্যে মেরুপ্রস্থান লক্ষ্যণীয়ভাবে দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। বর্ধমানের ছবিই একটু রকমফের হয়ে 'সবুজ বিপ্লব'-এর দাক্ষিণ্যে পশ্চিম গোদাবরী, থানজাভুর ও পালঘাটে নজরে পড়ছে। ভাগচাষী কোনো কোনো অঞ্চলে উৎপাদনের ৭০/৭৫ শতাংশ খাজনা হিসাবে ভূস্বামীকে দিতে বাধ্য হচ্ছে।

কেবলমাত্র ভাগচাষী উচ্ছেদই নয়, কোনো কোনো জায়গায় জমির মালিক জমি ডাকাতিও শুরু করেছে। উত্তর প্রদেশের তরাই অঞ্চলের নৈনিতাল, ফিলিবিট, লখিমপুর প্রভৃতি অঞ্চলে লাঠিসোটা ও আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ধনী চাষীরা লেঠেল-ঠ্যাঙাড়ে লাগিয়ে আদিবাসীদের জমি থেকে উচ্ছেদ করে বনে জঙ্গলে ঠেলে দিচ্ছে। বক্সা অঞ্চলের ১১টি গ্রাম থেকে এই জমি ডাকাতেরা প্রায় ১৫,০০০ একর জমি দখল করেছে। নৈনিতাল জেলার কাকারিয়া বাঁধ প্রকল্পের ফলে ২০,০০০ একর জমি বেরিয়েছে, এই জমি ডাকাতেরা তার মধ্যে ২,০০০ একর জমি দখল করে চড়া দরে বিক্রয়ও করছে। তা ছাড়া বড় বড় খামার মালিকেরা (বিড়লা, বাজাজ গোষ্ঠী, পাতিয়ালার মহারাজা) জমি ডাকাতি বাড়িয়ে চলেছে। উত্তর প্রদেশে এই জমি ডাকাতদের মধ্যে সামরিক ও পুলিশ বিভাগের অনেক হোমরা-চোমরাও আছেন ('লিঙ্ক' জানুয়ারি ১৮,১৯৭০)। চাষীর এই যমযন্ত্রণা থেকে মুক্তির জন্য একমাত্র পশ্চিমবঙ্গে এবং কেরলে কিছু করা সম্ভব হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় তিন লক্ষ একর খাস ও বেনাম জমি চাষীরা দখল করেছে। কেরলে অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে ২০ একর জমির সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে ভূমিহীন ও বর্গাচাষীদের মধ্যে ভূমি বণ্টন শুরু হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গেও জমি মালিকানার সর্বোচ্চসীমা (২৫ একর) হ্রাস করার বিষয়ে কথা উঠেছে।

সরকারী হিসাব অনুযায়ী ভারতে ৪০ কোটি ২০ লক্ষ একর আবাদযোগ্য

জমি আছে। যদি ২০ একর মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দেওয়া যায়, তাহলে ৬ কোটি ৩০ লক্ষ একর জমি পাওয়া যেতে পারে। ১৯৬১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী ৫ কোটিরও বেশি ভূমিহীন চাষীকে ২ একর করেও যদি জমি দিতে হয়, প্রয়োজন হবে ১০ কোটি একর। সুতরাং এ-হিসাবে ভূমিহীনকে ভূমি দেওয়া সরকারী হিসাব মতো আকাশকুসুম মাত্র। তাদের মতে ভারতে মাথা পিছু জমি আছে ০·৮২ একর এবং ৫ শতাংশ মানুষ ৩৩ শতাংশ জমির মালিক। তাছাড়া এক-তৃতীয়াংশ ভারতবাসী দারিদ্র্যরেখার নিচে (শহরে ব্যয় ২৪ টাকা, গ্রামে ব্যয় ১৫ টাকা প্রতিমাসে) রয়ে গেছে, এক-পঞ্চমাংশের কিছু বেশি ভারতবাসী চরম দারিদ্র্যের তলায় (মাথা পিছু ব্যয় শহরে ১৮ টাকা, গ্রামে ১৩ টাকা প্রতি মাসে) রয়েছে। সম্প্রতি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড রাজেশ্বর রাও একটি আলোচনায় দেখিয়েছেন, জমির সর্বোচ্চসীমা-আইন সংশোধন ও কার্যকরী করে, বেনামা জমি উদ্ধার করে এই মুহূর্তে ৯ কোটি একর জমি বের করা যায়। তাছাড়া সরকারী জমি পাওয়া যায় আরো ৯ কোটি একর। অরণ্যাঞ্চলের পতিত জমি আছে ২০৮০ কোটি একর। এই ২১ কোটি একর জমি অবিলম্বে বণ্টন করা যেতে পারে।

লোকসভার একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষাতে প্রমাণিত হয়েছে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ও উদ্যোগে জমির লড়াই গত কয়েক বছরে সবচেয়ে বেশি হয়েছে। কমিউনিস্টরাই এই 'ভূমি বিপ্লবের সংগ্রামে' আগ বাড়িয়ে লড়ছেন। কেরল-পশ্চিমবঙ্গে এ-সংগ্রামের কিছুটা সাফল্য হয়েছে। আসামে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি জমি দখলের ডাক দিয়েছেন। বিহারেও কমিউনিস্টরা দরিদ্র চাষীকে নেতৃত্ব দিতে সমর্থ হয়েছেন। রাজস্থানেও নতুন রাজনৈতিক পট উন্মোচনের পালা শুরু হয়েছে। অন্ধ্রে শ্রীকাকুলামে 'কমিউনিস্ট বিপ্লবী'রা, ভ্রান্ত পথে হলেও, জমির মালিকানা পরিবর্তনের মুখ্য বক্তব্যটি সামনে তুলে ধরেছেন। সারা ভারত জুড়ে ভূমিবিপ্লবের আহ্বান এসেছে। এবং এ-বিপ্লব সফল করতে হবে।

'সবুজ বিপ্লব' সত্যই সবুজ কিনা এ-প্রশ্ন সবার মনেই জাগছে। ভারতের কৃষিতে নির্লজ্জ ধনতান্ত্রিক বিকাশ একটাই প্রশ্ন সামনে তুলে আনছে—ভূমিজ উৎপাদন কি মূলধনতান্ত্রিক পথে হবে? না-কি অন্য কোনো পথ বেছে নিতে হবে। ১৯৬৮র ৩১শে মার্চের হিসাবে, জাতীয়করণ-কৃত ১৪টি ব্যাঙ্কের আমানত ছিল ২৭৪৯ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা। অথচ নিজস্ব ফাণ্ড ছিল ৬৩ কোটি ২ লক্ষ টাকার মতো। আদায়ীকৃত মূলধন ছিল মাত্র ২৮ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা।

ভূমিতে উৎপাদনবৃদ্ধির দুটি পথ এখন খোলা। এক দিকে IADP পদ্ধতিতে ধনীকে আরো ধনী করা। দরিদ্র চাষীকে জমি থেকে উচ্ছেদ করা। কিন্তু এই পুঁজিবাদী কৃষির বিকাশের পথও সীমাবদ্ধ। অন্যদিকে চাষীর হাতে জমি দিয়ে, সমবায়-মূলক কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা সহ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ সরবরাহের ব্যবস্থা করে অপুঁজিবাদী বিকাশের দিকে অগ্রসর হওয়া। ভূমিব্যবস্থা পরিবর্তন এখন ভারতবিপ্লবের কর্মসূচি। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক বিপ্লব। বিদেশী আর্থনীতিক চাপের বিরুদ্ধে 'কৃষি বিপ্লব' অন্য অর্থে জাতীয় বিপ্লবের কর্মসূচিরও অন্তর্ভুক্ত। 'সবুজ বিপ্লব' যে-কথাটি ধামাচাপা দিতে চায়, সেই কৃষি বিপ্লব এখন সবচেয়ে জ্বলন্ত প্রশ্ন!

তরুণ সান্যাল

রাসেল আর নেই

রাসেল ছিলেন লেনিনের প্রায় সমবয়সী। লেনিন যখন নতুন জীবন গড়ছিলেন, রাসেল তখন জেলে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যুদ্ধের বিরোধিতা করেছিলেন তিনি। নিথর শান্তিবাদে উৎসর্গিত রাসেল রাজরোষে বন্দী হয়েছিলেন সেদিন। জেল থেকে বেরিয়েই ছুটেছিলেন রুশ দেশে। বৃটিশ শ্রমিকদলের সভ্য রাসেলের এই সফর-প্রতিক্রিয়া ভালো হয়নি। সমাজতন্ত্র তিনিও চান, কিন্তু এতো ধ্বংস, এতো হত্যা, এতো পীড়ন...ইত্যাদি সয়নি তাঁর।

১৯৬৭ সালে প্রকাশিত আত্মজীবনীতে তিনি বলেছিলেন তাঁর জীবনের তিনটি পরিচালিকা শক্তির কথা। অন্তবিহীন ভালোবাসার বাসনা, সীমাহীন জ্ঞানের পিপাসা আর দুর্গত মানুষের প্রতি বেদনার অপার অনুভূতি। স্বভাবতই এমন মানসিকতার এক প্রতিভার কাছে লোভনীয় মনে হয়নি বিপ্লব, গৃহযুদ্ধ, বিদেশী আক্রমণ, দুর্ভিক্ষ তাড়িত সদ্যপ্রসূত একটি সমাজ।

কিন্তু বিশ্বের দরবারে চিরকালই রাসেল বিদ্রোহী। উদার মানবতাবাদী মানুষটিকে "বখাটে নৈরাজ্যবাদী" বিশেষণও পেতে হয়েছে। স্বদেশ তাঁকে সমাদর করেনি, সাম্রাজ্যবাদের জয়জয়াকারের দিনে তিনি গান্ধীর আন্দোলনের সমর্থনে সোচ্চার। ইণ্ডিয়া লীগ-এর সভাপতি। মার্কিন মুলুক তাঁর "চাকরি" খেয়ে তাঁকে সাগরপারে ফেরত পাঠিয়েছে "নৈতিকতা"র কারণে। ফাসীবাদীরা তাঁকে শত্রুর চোখে দেখেছে, কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তিনি আর নিথর শান্তিবাদী নন। জনযুদ্ধের এক প্রধান প্রচারক। অশীতিপর বৃদ্ধ রাসেলকে আবার জেল খাটিয়েছে ব্রিটেন, পরমাণু-অস্ত্র-কেন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযান করার জন্যে।

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রাসেল। যুদ্ধের বিরুদ্ধে তো বটেই। সমাজতন্ত্রও আদর্শ হিসাবে তাঁর প্রিয়। কিন্তু রাজনীতি তাঁর প্রধান জীব্য নয়। বিজ্ঞান, দর্শন, সমাজতত্ত্ব, সাহিত্য—তাঁর কিছু ছোটগল্প এককালে বাঙলাদেশকেও নাড়া দিয়েছিল—অঙ্কশাস্ত্র, যৌনতত্ত্ব, সাংবাদিকতা....সর্বত্রই রাসেলের স্ফুরণ।

এ-যুগের মানুষ সবচেয়ে বেশি করে জানে শান্তির অতন্দ্র সাধক রাসেলকে। একটি হিন্দী চলচ্চিত্রে তাঁকে দেখা গিয়েছিল কিছুদিন আগে। অবাক হয়েছিলাম। পরে জেনেছিলাম তিনি ছবিটিতে থাকতে রাজি হয়েছিলেন, কারণ তাঁকে বোঝানো হয়েছিল, ছবিটি বিশ্বশান্তি বিষয়ক। ছবিটির নামটুকুই

শান্তি। 'আমন'। কিউবার সেই সঙ্কটময় মুহূর্তগুলিতে নিদ্রাহীন রাসেলের আর্তনাদের কাহিনী কে না জানে!

বিপ্লবোত্তর রুশদেশ থেকে ফেরার কিছুদিন পরে চীনে গিয়ে তিনি আবার আহত হয়েছিলেন। ঘোষণা করেছিলেন, স্বাধীনতার তৃষ্ণায় এরা মরিয়া হয়ে ছুটে চলেছে আর-এক সাম্রাজ্যবাদের দিকে—কমিউনিজমের দিকে। সে কতদিন আগের কথা। কিউবার সংকটের দিনে, অভিজ্ঞতায় প্রাজ্ঞতর রাসেল ঘোষণা করেছিলেন তাঁর আর-এক উপলব্ধির কথা। যখন জীবন আর ধ্বংসের মাঝখানের ক্ষীণ রেখাটুকু তাঁর সামনে তিল তিল করে বিলীয়মান, তখন তাঁর প্রত্যয় হয়েছিল—পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে পারে এমন একটিই মাত্র রাষ্ট্র পৃথিবীতে আছে, আছেন একজনই রাষ্ট্রনেতা। সে-রাষ্ট্র "টোট্যালিটেরিয়ান" সোভিয়েত ইউনিয়ন, আর সে-নেতা "কমিউনিস্ট" খ্রুশচভ।

এই প্রাজ্ঞতারই পরিণত ফল ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধে রাসেলের মনপ্রাণ সমর্থন আর সহায়তা। পারমাণবিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে তাঁর আপোষহীন সংগ্রাম। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রতি তাঁর দৃঢ় প্রতিরোধ। রাসেল আর নেই। বিশ্ব তার শান্তির সংগ্রামে সবচেয়ে আগুয়ান এক সেনাপতিকে হারাল। সঙ্গে সঙ্গে বহুমুখী প্রতিভার সেই ক্ল্যাসিকাল যুগটিও বোধ করি শেষ হলো, বার্ট্রাণ্ড রাসেল যার অপরূপ প্রতিনিধি ছিলেন।

জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়

সবিনয় নিবেদন,

শ্রীনারায়ণ চৌধুরী অগ্রহায়ণ ১৩৭৬ 'পরিচয়'-এ 'লেখকদের শ্রেণীবিচার' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। তাতে দেখা যায় তিনি লেখকদের পাঁচ শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। যেমন ১। গতানুগতিক, ঐতিহ্যাশ্রয়ী, রাজনীতিবিমুখ, ২। প্রগতিশীল ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ, ৩। গান্ধীবাদী চিন্তায় অনুপ্রাণিত, ৪। সংবাদপত্র-সেবী ও সংবাদপত্র-সেবিত ৫। জ্ঞানচর্চাকারী গবেষক ও সমালোচক। এভাবে ভাগ করতে যাবার বিপদ অনেকটা সেই কর্ণরোগ বিশেষজ্ঞর মতো, যাঁর কাছে একজন ডান কানটিতে বেদনা নিয়ে দেখাতে গেলে তিনি বললেন যে আমি তো বাঁ কানের বিশেষজ্ঞ, তাই আমি ডান কান সম্পর্কে কিছুই বলতে পারব না।

আমার মনে হয়, লেখকের শ্রেণীবিভাগ করা উচিত অন্য সামাজিক মানুষের শ্রেণীবিভাগ যে-পদ্ধতিতে করা হয় সেই পদ্ধতিতেই। অর্থাৎ ধন উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের শ্রেণীচরিত্র নির্ধারণের ভিত্তিতে। লেখকদের সম্পর্কেও সেই একই কথা। কিন্তু যেহেতু লেখকদের মধ্যে প্রায় সকলেই কৃষক ও মজুর শ্রেণীর বাইরে বিত্তবান ও মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের মাঝ থেকে এসেছেন ও এখনও আসছেন, তাই স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের শ্রেণীচরিত্রও সেই শ্রেণীর।

অবশ্য এ-কথা স্বাভাবিক যে লেখকরা সজাগ ও সংবেদনশীল মনোভাব সম্পন্ন। তাই তাঁদের মধ্যে অনেকেই সমাজসচেতন হয়ে, লেখক হিসেবে তাঁদের সামাজিক কর্তব্য করার মাধ্যমে নিজেদের শ্রেণীচরিত্র ত্যাগ করে, সাধারণ মানুষ —তাঁদের আশা আকাঙ্ক্ষা—ও প্রগতিবাদী আন্দোলনের সঙ্গে নিজেদের লেখার মাধ্যমে নিজেদের যুক্ত করতে চাইছেন। প্রবন্ধলেখক তাঁর শ্রেণীবিভাগে যাঁদের দু-নম্বরে ফেলেছেন, তাঁরাই এঁরা।

লেখকদের রুজি-রোজগার করতে হয়, তার জন্য কেউ সংবাদপত্রে কেউ কেউ স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করেন। আবার কেউ হয়তো অন্য পেশাতেও আছেন। পেশার চাপ, পেশা বা চাকুরীক্ষেত্রে উপরওয়ালাদের চাপ, এই সব অনেক সময়েই তাঁদের লেখাকে প্রভাবান্বিত করে। তার ফলে তাঁদের শ্রেণী-চরিত্র বদলে যেতে পারে। শ্রেণীচরিত্র বদলালে, তাঁদের শ্রেণীবিভাগও বদলে যাবে। এইভাবে বহু লেখকের রূপান্তর ঘটেছে ও ঘটছে।

এ-সম্পর্কে অনেক আলোচনা করা যায়, কিন্তু তা না করে শুধু এই কথা

বলব যে লেখক যদি অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করতেন, তাহলে ভালো হতো।

এ-ছাড়া আলোচনা করব লেখকের আর দুটি বক্তব্য নিয়ে। প্রথমটি হলো লেখক যাঁদের গতানুগতিক, ঐতিহ্যাশ্রয়ী ও রাজনীতিবিমুখ বলেছেন, তাঁদের সম্বন্ধেই আবার বলছেন যে "এঁদের অনেকেরই সাহিত্যপ্রেম নিখাদ এবং যে সাহিত্যের এঁরা পোষকতা করেন সে সাহিত্য দেশের মৃত্তিকার সঙ্গে সংযুক্ত।" কিন্তু লেখক যদি একটু তলিয়ে দেখতেন, তাহলে দেখতে পেতেন—যেসব লেখকদের বেশি রোজগারের আশায় বা কোনো বিশেষ সংবাদপত্রের পোষকতা পাবার জন্য শ্রেণীচরিত্র বদলাতে হচ্ছে, তাঁদের ক্রমশই মৃত্তিকার সঙ্গে যোগ কমে যাচ্ছে। তবে তাঁদের মধ্যে অনেকে লেখক হিসেবে প্রতিভাবান হবার জন্য, মৃত্তিকার সঙ্গে তাঁদের যোগচ্ছিন্নতা এখনও নজরে পড়ছে না।

আর-একটি কথা বলব গান্ধীবাদী লেখকদের সম্বন্ধে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে যেমন গান্ধীবাদের উদ্ভব হয়েছিল, তেমনিই তার প্রভাবে কিছু লেখক গান্ধীদর্শনের প্রবক্তা হয়ে উঠেছেন। লেখক ঠিকই লক্ষ্য করেছেন যে "এঁরা" "স্বতন্ত্র" ও "আত্মাভিমানপুষ্ট"। গান্ধীবাদ আজ 'গান্ধী-বাদী'দের হাতে পড়ে সারা দেশেই খুব শোচনীয় অবস্থায় এসে গেছে। তাই রাজনীতিতে সৎ গান্ধীবাদীর যে-দুরবস্থা, সাহিত্যেও তাই হচ্ছে। তা থেকে বাঁচার চেষ্টাতেই সাহিত্যের গান্ধীবাদীদের স্বতন্ত্র ও আত্মাভিমানপুষ্ট হয়ে ওঠা ছাড়া আর উপায় কি?

জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়

সবিনয় নিবেদন,

ডিসেম্বর সংখ্যা 'পরিচয়'-এ প্রকাশিত শ্রীনারায়ণ চৌধুরীর 'লেখকদের শ্রেণীবিচার' প্রবন্ধটি সম্পর্কে 'পরিচয়'-এর পাঠক হিসেবে আমার কয়েকটি জিজ্ঞাসা নিবেদন করছি। শ্রীচৌধুরী সুপণ্ডিত এবং প্রখ্যাত প্রাবন্ধিক। তাঁর বক্তব্যের যাথার্থ্য সম্পর্কে মতামত প্রকাশের ধৃষ্টতা আমার নেই। কিন্তু পাঠক হিসেবে কয়েকটি প্রশ্ন স্বভাবতই আমার মনে এসেছে। বিশেষত প্রগতি সাহিত্য, জাতীয়তা ও প্রগতিবাদ, প্রগতিশীলতা ও বামপন্থার পারস্পরিক

সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে বেশ কিছু জিজ্ঞাসা আমার মতো অনেক পাঠকের মনেই থাকা স্বাভাবিক। শ্রীচৌধুরীর নিবন্ধটি সে-বিষয়ে আমার মনে আরও কিছু জটিলতা সৃষ্টির সহায়ক হচ্ছে বলেই আমার জিজ্ঞাসাগুলো আপনাদের সামনে উপস্থিত করছি।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সাহিত্যিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের অভাবের প্রতি শ্রীচৌধুরী আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বিষয়টি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তিনি সাহিত্যিক 'গোষ্ঠী' ও 'শ্রেণী'র ভিতর কোনও পার্থক্য আরোপ করেননি। প্রশ্ন থেকে যায়—'গোষ্ঠী' ও 'শ্রেণী' সমার্থক কি না। বিভিন্ন শ্রেণীর লেখক একই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হওয়া বিচিত্র নয়, এবং এর দৃষ্টান্তও বিরল নয়। সম্ভবত এরকম ঘটনার জন্যই এই গোষ্ঠীগুলির পক্ষে পারস্পরিক প্রীতিবিনিময় ভিন্ন অন্য কোনও উদ্দেশ্যে মিলিত হওয়া সম্ভব নয়। লেখকের শ্রেণীবিচারের ভিত্তিই বা কী। এ-প্রসঙ্গে শ্রীচৌধুরী কোনও আলোকপাত করেননি। সমাজের কোন শ্রেণী থেকে লেখক আগত, এ-প্রশ্ন এখন পর্যন্ত অবান্তর। কেননা, এ-পর্যন্ত প্রায় সমস্ত লেখকই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। তিনি সমাজের কোন শ্রেণীর প্রতি সহানুভূতিশীল, বা কোন শ্রেণীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় গভীর এবং ফলত তাঁর সাহিত্যে তা কিভাবে প্রতিফলিত—শ্রেণীবিভাগের এ-রকম একটা মাপকাঠি যদি ধরে নেওয়া যায়—তা হলেও সমস্যার সমাধান হবে না। কেননা, শ্রেণীভিত্তিক আনুগত্য নিয়ে বেশি লেখক এখনো পর্যন্ত সচেতনভাবে কলম ধরেননি। সর্বহারাশ্রেণী বাঙলা সাহিত্যে বিষয় হিসেবে যদিও বহুদিন থেকেই উপস্থিত, কিন্তু সর্বহারার সাহিত্য হিসেবে চিহ্নিত করা যায় এমন সাহিত্যের অস্তিত্ব দুর্লভ এবং সম্ভবত তার অনুকূল পরিবেশ ও পরিপ্রেক্ষিত এখনও সৃষ্টি হয়নি। লেখকের প্রতিভা যদি মানদণ্ড হয়—তা হলেও মূল প্রতিবন্ধক হবে সময়, কেননা সমকালীন সাহিত্যের যথাযথ বিচারে স্বকালের মতামতই চরম নয়। সম্ভবত এখনো পর্যন্ত সাহিত্যিকের গোষ্ঠী বিচারেই আমাদের তৃপ্ত হতে হবে।

কিন্তু শ্রীচৌধুরীর গোষ্ঠীবিচারের পদ্ধতিতে নিরপেক্ষতা সম্পর্কেও সংশয়ের অবকাশ আছে। শ্রীচৌধুরী ঘরোয়া বা আধা-ঘরোয়া সংগঠনের সঙ্গে পত্রিকাভিত্তিক সাহিত্যগোষ্ঠীর তুলনা করেছেন। 'রবিবাসর' 'কবি পরিষদ' ইত্যাদি আসরের সঙ্গে তিনি 'পরিচয়' 'মূল্যায়ন' ইত্যাদি পত্রিকা-ভিত্তিক সাহিত্যগোষ্ঠীকে সমান্তরালে স্থাপন করেছেন। বলা বাহুল্য, এই দু-ধরনের জমায়েতের মধ্যে উদ্দেশ্য, চরিত্র ও ক্রিয়াকর্মের কোনও মৌলিক সহধর্মিতা নেই। এ-কারণেই

প্রথমোক্ত জমায়েতকে আমরা আসর বলে থাকি—গোষ্ঠী বলি না, কেননা এসব মিলনক্ষেত্রের উদ্দেশ্য মূলত পারস্পরিক প্রীতিবিনিময়, অখ্যাতদের পক্ষে বিখ্যাতদের সাহায্য লাভ এবং অবসর বিনোদন। সাহিত্যের কোনও এক বিশেষ মতবাদ বা দৃষ্টিভঙ্গি এঁদের মিলনের যোগসূত্র নয়। বরং 'দেশ' 'বসুমতী' ইত্যাদি অন্যান্য পত্রিকাভিত্তিক গোষ্ঠীর সঙ্গে প্রতিতুলনা অনেক বেশি পরিমাণে সার্থক হতো।

প্রথমোক্ত আসরগুলির চরিত্রচিত্রনেও শ্রীচৌধুরী পরস্পর-বিরোধী বক্তব্য উপস্থিত করেছেন বলে মনে হয়। এদের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—"এই সব সংস্থার সদস্যগণ প্রগতিশীল ভাবধারা সম্বন্ধে বিশেষ মাথা ঘামান না, বরং অন্তরে অন্তরে এই ভাবধারা সম্পর্কে বিলক্ষণ বিরূপতা পোষণ করেন। .... নিপীড়িত শ্রেণীর মানুষের ব্যথা বেদনা এঁদের সাহিত্যে রূপায়িত হয় না বটে, তবে এঁদের সাহিত্যে আবহ, চরিত্র ষোল-আনা স্বদেশী।"

প্রগতিশীলতার বিরোধিতা ও নিপীড়িত মানুষ সম্পর্কে উপেক্ষা—এই কি স্বদেশীয়ানার মূল লক্ষণ বলে শ্রীচৌধুরী মনে করেন? দেশের পনেরো-আনা মানুষকে সাহিত্যে অপাংক্তেয় রেখে 'ষোল-আনা' স্বদেশী সাহিত্য কি করে সম্ভব—তাও ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। এবং শ্রীচৌধুরী যে-দুটি লক্ষণ চিহ্নিত করেছেন—উক্ত আসরগুলির অনেক সদস্যের প্রতিই তা আরোপিত হলে, তাঁদের প্রতি অবিচার করা হবে। ঐ আসরগুলির এমন পৃষ্ঠপোষকও আছেন, যাঁরা নিপীড়িত মানুষের সাহিত্যের পূর্বসূরী হিসেবে স্বীকৃতি-দাবি খুব সঙ্গত ভাবেই উচ্চারণের অধিকারী।

'পরিচয়' গোষ্ঠীর সাহিত্যিকদের সম্পর্কে বিশ্লেষণকালে শ্রীচৌধুরী এমন একটি মতামত ব্যক্ত করেছেন—'পরিচয়'-এর পাঠক হিসেবে যার প্রতিবাদ না করে পারছি না। এঁদের প্রসঙ্গে শ্রীচৌধুরী বলেছেন "তাঁরা প্রগতিশীল ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ নতুন কালের চিন্তাচেতনাকে তাঁদের সৃষ্ট সাহিত্যে রূপ দিতে সচেষ্ট, নতুন আঙ্গিক আর ভাষাশৈলী নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সতত নিযুক্ত, শোষিত ও অবহেলিত শ্রেণীর মানুষদের অভাব-অভিযোগ স্বপ্ন-কামনার রূপায়ণে আন্তরিক যত্নপর, জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সক্রিয় শরিক। এবং এর পরেই তিনি বলেছেন, "নতুন কালের অগ্রসর ভাবধারার সঙ্গে তা'ল রেখে চলতে গিয়ে এঁরা যেন কতক পরিমাণে জাতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে, সাহিত্যের ধারাক্রমাগত উত্তরাধিকারের সঙ্গে যোগসূত্র হারিয়ে ফেলেছেন।" তাহলে শ্রীচৌধুরী কি বলতে চান যে পূর্বোক্ত যে-গুণগুলো তিনি উল্লেখ করেছেন, সেগুলো বাঙলা সাহিত্যের ঐতিহ্যের পরিপন্থী? সংরক্ষণশীলতা, প্রগতিবিরোধিতা ইত্যাদি গুণগুলো বাঙলা সাহিত্যের ঐতিহ্য বলে স্বীকার করতে সম্ভবত শ্রীচৌধুরী নিজেও আপত্তি করবেন।

তাঁর উক্তির সমর্থনে তিনি আঙ্গিকের প্রশ্নটি তুলেছেন—"বিষয়বস্তুর নির্বাচনে এঁদের যে বলিষ্ঠতা, সেই বলিষ্ঠতার অনুরূপ প্রকাশভঙ্গি খুঁজতে গিয়ে এঁরা সচরাচর যে ইডিয়ম ও পরিভাষা ব্যবহার করছেন—তা বাঙলাভাষা ও সাহিত্যের প্রবহমান সংস্কার থেকে কিয়ৎপরিমাণে বিশ্লিষ্ট বলে মনে হয়।"

তাহলে কি 'সংস্কার' ও 'ঐতিহ্য' শব্দ দুটি শ্রীচৌধুরী সমার্থক মনে করেন? আঙ্গিক সম্পর্কে নিরীক্ষা, বিষয় অনুযায়ী আঙ্গিকের বিবর্তন ও নতুন রীতির ইডিয়ম ও শব্দব্যবহার ইত্যাদি লক্ষণগুলিই তো বাঙলা সাহিত্যের ঐতিহ্যানুসারী। সংস্কার ও সংরক্ষণশীলতাকে বাঙলা সাহিত্য কখনোই প্রশ্রয় দেয়নি—এবং সে-ধারার যথাযোগ্য উত্তরসূরী হতে হলে শ্রীচৌধুরী বর্ণিত লক্ষণগুলির অধিকারী অবশ্যই হতে হয়। 'পরিচয়'-এর পাঠক হিসেবে আমি অন্তত আনন্দিত যে শুধুমাত্র লব্ধপ্রতিষ্ঠরাই নন, 'পরিচয়' গোষ্ঠীর অপেক্ষাকৃত তরুণ এবং সর্বকনিষ্ঠ আগন্তুকরাও ঐতিহ্য আত্মীকরণের প্রয়াসে সততার স্বাক্ষর রাখছেন।

শ্রীচৌধুরী বর্ণিত গান্ধীবাদী সাহিত্যিক গোষ্ঠী বাঙলাদেশে আছেন বলে বর্তমান পাঠকের জানা নেই। একজন বা দুজন সাহিত্যিক বিচ্ছিন্নভাবে কোনও মতাদর্শ অনুসারে সাহিত্য চর্চা করলে তাকে গোষ্ঠী আখ্যা দেওয়া সম্ভবত সঙ্গত নয়। ব্যক্তিগত জীবনে কোনও মতবাদের অনুসারী হলেও সৃষ্ট সাহিত্যে তার প্রতিফলন না হলে তাকে কোনও বিশেষ মতবাদী সাহিত্য বলতে আপত্তি থেকে যায়। বাঙলা ভাষায় গান্ধীবাদ নিয়ে চর্চা কিছুটা অবশ্যই হয়েছে। কিন্তু সৃষ্টিশীল সাহিত্যে গান্ধীবাদ বিষয়ী গুরুত্ব নিয়ে উপস্থিত—এ-রকম দৃষ্টান্ত বিরল। এর কারণ-বিশ্লেষণ অবশ্যই সাহিত্য-তাত্ত্বিকের এক্তিয়ার, কিন্তু বাঙলাদেশে গান্ধীবাদী সাহিত্যিক গোষ্ঠীর অনুপস্থিতি সম্ভবত কালের গতিপথের অমোঘ নির্দেশ।

তরুণ সেন

সবিনয় নিবেদন,

ইয়ান টিনবারজেন-এর নাম অর্থনীতিবিদ মহলে সুপরিচিত। 'পরিচয়'-এর অগ্রহায়ণ সংখ্যায় তাঁর সম্বন্ধে যে-সংক্ষিপ্ত অথচ সুলিখিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে তাতে তাঁর "১৯৩৬ সালের জন্ম আর্থনীতিক নীতি" প্রসঙ্গে বলা হয়েছে···· "প্রবন্ধটির অন্যতম বিশিষ্টতা হলো, এই রচনাটিতে কেইনসীয় কর্মসংস্থান ও মূলধনলগ্নি তত্ত্বের অনেকখানি পূর্ব ইঙ্গিত পাওয়া যায়।" অর্থনীতিতে আমার জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ। তবু মনে হয়, উল্লিখিত মন্তব্যটি ঠিক নয়। কেইনস (কীন্স?) এর অনেক আগেই তাঁর কর্মসংস্থান ও মূলধনলগ্নি তত্ত্বের রূপরেখা এঁকেছিলেন। ১৯৩০ সনে প্রকাশিত তাঁর 'ট্রিটিস্ অন মানি' গ্রন্থে এই রূপরেখা অঙ্কিত

হয়। এই প্রসঙ্গে উক্ত গ্রন্থের 'কদলী-কথা' (১ম খণ্ড, পৃঃ ১৭৬) উল্লেখযোগ্য। ১৯৩৬ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে কেইনসের বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ 'জেনারেল থিয়োরী অব এমপ্লয়মেণ্ট, ইনটারেসট এ্যাণ্ড মানি' প্রকাশিত হয়। কাজেই টিনবারজেন-এর উক্ত প্রবন্ধে তাঁর তত্ত্বের পূর্ব ইঙ্গিত থাকার প্রশ্ন উঠতেই পারে না।

সুকুমার মিত্র

সবিনয় নিবেদন,

সোবিয়েৎ সাহিত্যের তুলনায় সোবিয়েৎ চিত্রকলা কি ভাস্কর্যের পরিচয় বহির্বিশ্বে আজও অনালোকিত। অথচ রুশ চারুকলার ইতিহাস অনুজ্জ্বল নয়, যদিও সেই বাইজেনটীয় অধ্যায় থেকে অদ্যাবধি তার ধারা কিছু প্রচ্ছন্ন, বিঘ্নিত এবং জটিল আবর্তে বাহিত।

রুশ চারুকলায় আধুনিকতার সূত্রপাত উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে রুশ ধনতন্ত্রের উন্মেষের প্রাক্‌কালে। তখনই সর্ব প্রথম গীর্জা বা জারের দাক্ষিণ্য ব্যতীত কিছু শিল্পীর সাধন প্রয়াস সম্ভব হল। পৃষ্ঠপোষকতার ভার নিলেন নতুন শিল্পপতিরা। মামেনতফ পত্তন করলেন এক শিল্পী-গ্রাম। শুকিন সংগ্রহ করে আনলেন তৎকালীন য়ুরোপীয় সেরা শিল্পীদের নিদর্শন—মান্‌এ থেকে পিকাসো। প্রায় রাতারাতি রুশ শিল্পের উত্তরণ ঘটল অতীত থেকে সমকালে। গতিবেগের প্রচণ্ডতায় সেদিন রুশ শিল্পের ব্যক্তিত্ব হয়তো ধ্বংস হয়ে যেত, যদিনা থাকত সেকাল-একাল প্রবাহিত, গির্জা বা রাজার শাসন-বহির্ভূত, লোকশিল্পের একটি সুস্থ ধারা। এই অধ্যায়ের শিল্পীদের ছিল আরও একটি ঐশ্বর্য, তাঁদের প্রাক্‌য়ুরোপীয় অতীত। এমন সন্ধিক্ষণে রুশ শিল্পের বর্তমান বলে কিছু না থাকলেও ছিল এই সত্ত্বগত অতীত আর ছিল আসন্ন আলোকিত ভবিষ্যৎ। সেদিনের চরমপন্থী শিল্পীদের লক্ষ্য ছিল কালোপযোগী কোনো সক্ষম প্রকাশরীতির অন্বেষণ। কিউবিজম এই লক্ষ্য ভেদ করায় রুশ শিল্প জগতে একটি নবযুগ সূচিত হয়। শিল্পী রাজ্যের রাজধানী পারী থেকে মসকোতে সাময়িকভাবে স্থানান্তরিত হয়েছিল তারই ফলে।

রুশ শিল্পে কিউবিজম-এর আবির্ভাব বর্ণনা করতে গিয়ে হার্বার্ট রীড আজ বলছেন :

"Cubism marked in its own field the end of precisely that era—the era of capitalism, bourgeoise individuality and utilitarianism."

কাশিমির মালেভিচ ১৯২১ সালেই ঘোষণা করেছিলেন—"কিউবিজমই শিল্পের বৈপ্লবিক রূপ। ১৯১৭ সালের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক জীবনে সংঘটিত বিপ্লবের পূর্বাভাস নিহিত ছিল সেখানেই।"

রুশ শিল্পীদের প্রকৃত বৈপ্লবিক ভূমিকা দেখা যায় ১৯১৩ থেকে ১৯২১-এর অধ্যায়ে। মালেভিচ-এর শুদ্ধবাদ, তাৎলিন বা রোদশেঙ্কোর গঠনবাদ, অপরদিকে কানদিনস্কির স্বাতন্ত্র্যবাদ একযোগে বিপ্লবের বছরটির দিকে এগোতে থাকে। কালে বিপ্লব ডাক দিয়ে আনে কয়েকজন নির্বাসিত শিল্পীকে। তার মধ্যে ছিলেন পেভসনার, ছিলেন নউম গাবো—সেদিনের অন্যতম বিপ্লবী নায়ক। তাঁর ১৯২০ সালের ১৬ই আগস্টের ইস্তাহারটির মর্ম এই ঃ

"Art has its absolute, independent value and a function to perform in society whether capitalistic, socialistic or communistic. Art will always be alive as one of the indispensible expressions of human experience and as an important means of communication."

স্পষ্টতই এই বিপ্লবী শিল্পীরা শিল্পে সমাজ-সচেতনতা স্বীকার করলেও শিল্প-বিষয়ে রাজনৈতিক 'একদেশদর্শিতা'য় নারাজ ছিলেন। শুধুমাত্র কমিউনিস্ট সমাজের জন্যে কোনো শিল্পের ধারণাকে তাঁরা মানতে পারেননি। তথাপি এঁদের 'প্রতিক্রিয়াশীল' আখ্যা দেবার কোনো সঙ্গত কারণ নেই। এরেনবুর্গ প্রায় পঞ্চাশ বছর পর নিজভেস্তনি প্রমুখ আধুনিক শিল্পীদের বিচার প্রসঙ্গে ক্রুশেভকে দুটি দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন—মায়াকভস্কি এবং পিকাসোর দৃষ্টান্ত। এবং বলেছিলেন—পার্টি যে-কথা বলতে চায়, আধুনিক শিল্পীরা রাজনৈতিকভাবে প্রতিক্রিয়াশীল, সেটি অনিবার্য সত্য নয়। (ল মঁদ, ২৮ ডিসেম্বর ১৯৬২)

১৯১৩ থেকে ১৯২১-এর অধ্যায়ের পর্যালোচনায় বোঝা যায় রুশ শিল্পের 'সুসময়' তখনই ছিল। শিল্পগত বৈপ্লবিক অধ্যায় হিসাবে, বিস্তৃত অর্থে, এই কালটিকেই চিহ্নিত করা যায়। সে-কারণে জন বার্জর-এর সম্প্রতি-প্রকাশিত 'আর্ট অ্যাণ্ড রেভল্যুশন' শিরোনামযুক্ত বইটিতে তৎকালীন ইতিহাসটিই প্রাসঙ্গিক ছিল। বার্জর বিপ্লব বলতে শিল্পগত বিপ্লবের কথা ভেবেছিলেন, নতুবা ১৯১৭র রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিপ্লবের অর্ধশতাব্দীর দূরান্তরের কোনো প্রতিভার অবতারণা তিনি করতেন না। আর্নস্ত নিজভেস্তনি সম্প্রতিকালে রাশিয়ায় একটি অন্যতম বিতর্কিত নাম। তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ দিয়ে বার্জর পাঠকদের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। তবে, শিল্পগত বিপ্লব আলোচনায় সুখী করেননি তাঁদের, বরং কিছু বিভ্রান্ত করেছেন। 'পরিচয়' পত্রিকার গত সংখ্যায় (অগ্রহায়ণ ১৩৭৬) প্রকাশিত আলোচনায় তার কিছু সাক্ষ্য আছে।

১৯১৩ থেকে ১৯২১-এর অধ্যায় সম্বন্ধে অবহিত থাকলে, এবং মালেভিচ, কান্দিনস্কি, শাগাল, রোদশেঙ্কো, তাৎলিন, পেভসনার, গাবোর কথা স্মরণ করলে, রুশ পটভূমিতে নিজভেস্তনির আধুনিকতা 'কৃত্রিম' 'উদ্ভট' বা আকস্মিক মনে করার অবকাশ থাকে না। তাই আমার পূর্ববর্তী আলোচক অরুণ

সেনের আতঙ্ককে স্বাভাবিক মনে হয় না। বরং মনে হয়, পাঠ শুরু করার আগেই তিনি বার্জর-এর প্রতি অত্যধিক বিরক্ত ছিলেন, ফলে বইটির ঠিক দ্বিতীয় লাইন থেকেই তিনি স্বাভাবিক অর্থবোধের ক্ষমতা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করেছেন। অরুণ সেনের একটি মোক্ষম অভিযোগ ছিল এই—বার্জর নিজভেস্তনির কাজ স্বচক্ষে দেখেননি। বার্জর নাকি "ভূমিকায় লিখেছেন তিনি শিল্পীর কাজের ফোটোগ্রাফি দেখেই এই গ্রন্থরচনায় উদ্যত হয়েছেন।" প্রকৃতপক্ষে বার্জর তাঁর পাঠকের উদ্দেশে সেখানে লিখেছিলেন—"তাঁকে কেউ এই প্রশ্ন করতে পারেন, "তুমি বলো, আমি পাঠক, শুধু আলোকচিত্রের সাহায্যে, একটিও শিল্পকর্ম চাক্ষুষ না-করে, কোনো ভাস্করের কাজের বিচার কেমন করে করি"।" বার্জর-এর ইংরেজি দুর্বোধ্য নয়। তাছাড়া বার্জর যে আলোকচিত্রী জাঁ মরকে এই উদ্দেশ্যে স্বয়ং মস্কো-সফরে সঙ্গী করেন, সে-সংবাদ ঠিক পরের পৃষ্ঠাতেই ছিল। উপরন্তু তিনি যে স্বচক্ষে না দেখে শিল্প বিচারে নিশ্চিত অভিমত দিতে প্রস্তুত নন, তারও প্রমাণ আছে নিজভেস্তনি কৃত সরকারী প্রকল্পের প্রসঙ্গে বইটির ৭৮ পৃষ্ঠায়। সম্ভবত অরুণ সেন "এক প্রান্তের ভ্রান্তিমুক্তির উত্তেজনায় অপর প্রান্তের ভ্রান্তি"তে আক্রান্ত হয়েছেন, বা হয়তো সংক্রমিত হয়েছেন। তাঁর বিরক্তি এবং ক্ষোভের কারণটি বোঝা যায়। "সোবিয়েৎ বিষয়ে অপদস্থ করার ইচ্ছা" বার্জর মনে-লালন করেন। বার্জর ক্রুশেভ-এর সম্মানহানি ঘটিয়েছেন, অপর দিকে, নিজভেস্তনির মতন শিল্পী—যিনি "প্রতিক্রিয়ার স্বাধীন একদেশ-দর্শিতা"য় অভিযুক্ত, যাঁর শিল্পকর্ম "রূপগত বিপর্যয়" বা "বিকৃতি"তে দুষ্ট, এবং যাঁর "স্নায়ু" ও "নান্দনিক মনের অস্বাচ্ছন্দতা" তাঁরই "জীবনগত কারণে"—তিনি বার্জর-এর প্রশংসার পাত্র হয়েছেন শুধু নয়, বিপ্লবী নায়ক বলে বিবেচিত হয়েছেন।

অরুণ সেনের সঙ্গে আমি এক্ষেত্রে একমত। নিজভেস্তনির বিপ্লবী নায়কত্ব অতিরঞ্জিত এবং তাঁর প্রবন্ধে নাটকীয়তা কিছু প্রকটিত, যদিও "ইতি গজঃ" কৌশলে বার্জর অস্ফুট বলে রেখেছেন একবার—"He is not a purist····not a rebel.।" নিজভেস্তনির কাজে শিল্পগত কোনো বিপ্লবের হদিশ দিতে বার্জর ব্যর্থ হয়েছেন, বরং সেখানে নান্দনিক দুর্বলতা তাঁর নিপুণ দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। অতএব সফল শিল্পী হিসেবেও নিজভেস্তনির বিশেষ দাবি থাকে না। তাঁর নায়কত্ব আরোপিত হয়েছে রুশ সরকারের সঙ্গে নির্ভীক বিতণ্ডায়, তাঁর অনমনীয় মনোভাবে। এখানে কিছু ইতিহাসের কারচুপি আছে। বার্জর উল্লেখ করেননি যে ১৯৬২ সালের ২৪এ এবং ২৬এ ডিসেম্বর, ১৯৬৩ সালের ৭ই মার্চ তারিখে নিজভেস্তনি জনসমক্ষে আত্মসমালোচনা করেন এবং তাঁর এই আত্ম-শোধনে সন্তুষ্ট সরকারী মুখপাত্র ইলিভিচ সভায় স্বীকৃতি দেন—শিল্পী 'নাগরিক সাবালকত্ব' লাভ করেছেন (মিশেল তাতুর বিবৃতি, ল মঁদ, ৯ মার্চ ১৯৬৩)। এ-ঘটনার অব্যবহিত পরে সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ে এবং পাইওনিয়র ভবনে ভাস্কর্যের

ভার তাঁকে দেওয়া হয় (নিউ স্টেটসম্যান, ১৬ আগস্ট ১৯৬৩)। যে-মূল্যের বদলে নিজভেস্তনিকে সরকারী প্রসন্নতা অর্জন করতে হয়েছে, তা অবশ্যই বার্জর-পরিকল্পিত তাঁর নায়কত্বকে নস্যাৎ করে। কিন্তু সেই সঙ্গে বোধহয় অরুণ সেনের দেওয়া বিদ্রোহী নিজভেস্তনির প্রতি সরকারী ঔদার্যের প্রশংসাপত্রটিকেও অনর্থক প্রতিপন্ন করে।

বার্জর বর্ণিত ক্রুশেভ-নিজভেস্তনি সংবাদে পাঠকের মনে হয়, নিজভেস্তনি এবং সমগোত্রীয় শিল্পীদের দুর্দশার মূলে ক্রুশেভ স্বয়ং এবং তাঁর সরকারী নীতি। অথচ তিনি তো উদারপন্থী মানসিকতার একটি প্রতীকের মতো। ১৯৬১তেই ক্রুশেভ 'তারুশার পৃষ্ঠা' প্রকাশের অনুমতি দেন। পরের বছর, নিজভেস্তনি প্রদর্শনীতে ধিকৃত হবার একমাস মাত্র আগে, জনসমক্ষে ইয়েভতুশেঙ্কো এবং সোলঝেনিস্তিন-এর প্রতি তাঁর সমর্থনের কথা ক্রুশেভ ঘোষণা করেন। সোলঝেনিস্তিন-এর উপন্যাসে কিছু সংশোধনের প্রস্তাবের জবাবে তিনি বলেছিলেন, গ্রন্থকারের ভাষ্য বদলের অধিকার অন্য কারো থাকতে পারে না। মনে স্বভাবতই প্রশ্ন আসে, এমন শিল্পনৈতিক-অধিকার-সচেতন মানুষটির নিজভেস্তনির প্রতি বিষোদ্গারের কারণ কী। নিজভেস্তনি উপলক্ষ মাত্র। লক্ষ্য ছিল তাঁর আধুনিক চারুকলা, যার দুর্বোধ্যতার সামনে দাঁড়িয়ে হয়তো অসহায় বোধ করতেন ক্রুশেভ। ক্রুশেভ শিল্প বুঝতেন না। মানুষ বুঝতেন। নিজভেস্তনিকেও ভুল বোঝেননি। কিন্তু আধুনিক শিল্প, বিশেষত বিমূর্ত শিল্প, তাঁর কাছেও 'উদ্ভট' 'কৃত্রিম' 'নিরর্থক'। বার্জর যে-প্রদর্শনীর মঞ্চে ক্রুশেভ-নিজভেস্তনি সংবাদ পরিবেশন করেছেন, সেখানেই ক্রুশেভকে বলতে শোনা যায়ঃ

"When I was in England I reached an understanding with Eden. He showed me a picture by a contemporary abstractionist and asked me how I liked it. I said I didn't nuderstand it. He said he didn't understand either, and asked me what I thought of Picasso. I said I didn't understand Picasso, and Eden said he couldn't understand Picasso eithei."

আধুনিক শিল্প সম্বন্ধে তাঁর তাচ্ছিল্য এই উক্তিতে খুবই স্পষ্ট এবং অকপট। শিল্পবোধের জন্য যে কিছু প্রস্তুতির দরকার আছে, সে-কথা জানতেন না ক্রুশেভ, এবং এই পরমক্ষমতাবান দেশপ্রধানকে হয়তো সাহস করে কোনো শুভার্থীই বুঝিয়ে বলেননি সে-কথা, যেমন একদা পিকাসো বুঝিয়েছিলেন আলেকজান্দার ফাদয়েফকে।

ফাঃ আপনার কোনো কোনো কাজ বুঝতে পারি না। কথাটা সোজাসুজিই বলছি আপনাকে। মাঝেমাঝে এমন সব আকার-আকৃতি বাছেন কেন, লোকে যা বোঝে না?

পিঃ　কমরেড ফাদয়েফ, স্কুলে কি পড়তে শিখিয়েছিল আপনাকে ?

ফাঃ　নিশ্চয় !

পিঃ　কেমন করে ?

ফাঃ　(তীক্ষ্ণ উচ্চ হাস্যে) অ-জ, অজ।

পিঃ　ঠিক এভাবে আমিও শিখেছিলাম, অ-জ, অজ। বাঃ, চমৎকার। আর শিল্প কি করে বুঝতে হয় আপনাকে শেখানো হয়েছিল কি ?

আলেকজান্দার ফাদয়েফ আর-একচোট হেসে প্রসঙ্গান্তরে যান।

বস্তুত কোনো দেশনায়কের শিল্পবোধের অভাব অপরাধ বলে গণ্য হতে পারে না। এমনকি প্লেটোর কল্পনার সেই আকাদমি বা শাসক তৈরির কারখানাতেও শিল্পশিক্ষার স্থান অনুতাপজনক ছিল। ক্রুশেভ-এর কাছে শুধু প্রত্যাশিত ছিল আরও কিছু সহনশীলতা।

আধুনিক শিল্পের আন্দোলনকে সমর্থন করতে গিয়ে একদা এরেনবুর্গ বলেছিলেন—লেনিন শিল্পবিষয়ে নিজের অভিরুচিকে কখনও অন্যের উপর চাপানোর চেষ্টা করেননি, ভিন্নরুচিকে সহ্য করেছেন। অথচ আধুনিক শিল্প, বিশেষত বিমূর্তবাদ, ক্রুশেভ-এর কাছে এতই অসহনীয় যে নিজভেস্তনিকে বলেছেন, তাঁর শিল্পকর্ম মানসিক বিকারের লক্ষণ; থামকা অভিযুক্ত করেছেন তাঁকে সমকামিতার দায়ে। নিজভেস্তনির বিচারে ক্রুশেভ-এর প্রতি নিঃশর্ত সমর্থন হিসেবেই সম্ভবত তাঁর ভাস্কর্যে যৌনশক্তির 'অসংলগ্ন উত্তেজনা' কারো কারো চোখে পড়ার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাচ্ছে। জন বার্জর যদিও তাকে "স্বাভাবিক অনির্বাণ রূপ" বলে অভিহিত করেন এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন—নিজভেস্তনি ইরোটিক শিল্পী নন।

শিল্পবিচারে ক্রুশেভ-এর রায় দুভাবে রুশ চারুকলার অনিষ্টের কারণ হয়েছে। জনতার যে-অংশ তাঁরই মতো শিল্পান্ধ, তাঁদের কাছে রুশনেতার মুখের কথা অন্ধের যষ্টির মতো অবলম্বন। আর দ্বিতীয় বিপদটি আরও প্রত্যক্ষ। ক্রুশেভএর আধুনিক শিল্প সম্বন্ধে অন্ধতা এবং অশ্রদ্ধাকে সুপরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করেছেন কিছু ক্ষমতালোভী স্বার্থসন্ধানী শিল্পী এবং তথাকথিত শিল্পবোদ্ধারা। আকাদমি গোষ্ঠীর প্রভাব তাঁর উপর অবাধ হয়। যে-কয়েকজনের প্ররোচনায় ক্রুশেভ রুশ শিল্প থেকে আধুনিকতাকে নির্বাসিত করতে চাইলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন ভ্লাদিমির সেরভ এবং আলেকজান্দার গেরাসিমভ। সেদিন নিজভেস্তনির প্রদর্শনীতে এঁদের সক্রিয় উপস্থিতির উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁরা ক্রুশেভ-এর কাছেকাছেই ছিলেন এবং নানা মন্তব্যে তাঁর আধুনিকতা-বিরোধী মনোভাবকে জাগিয়ে রাখতে সাহায্য করেন। ঠিক তিনদিন পর, ৪ঠা ডিসেম্বর, সেরভ আকাদমির সভাপতি নির্বাচিত হন অপেক্ষাকৃত মৃদু রক্ষণশীল বরিস উওগন-

সিনকে পরাজিত করে। অনতিবিলম্বে গেরাসিমভও শিল্পী য়ুনিয়নের প্রধান নির্বাচিত হন। গেরাসিমভ-এর আঁকা একটি স্তালিন-প্রতিকৃতি বার্জর তাঁর বইটিতে মুদ্রিত করেছেন। সেরভ এবং গেরাসিমভ স্তালিন আমলের স্মরণীয় নাম। "সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা"র রক্ষক তাঁরা।

অরুণ সেন যখন বলেন, "সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার যান্ত্রিক ব্যাখ্যার বিভ্রান্তিকর জয়যাত্রা প্রথম অবস্থায় অস্বীকার করার উপায় ছিল না"; অথবা যখন তিনি বার্জর-এর "পদস্খলন ঘটেনি" প্রমাণ করতে অদ্বিতীয় যুক্তি দেন যে "বর্জর স্তালিন আমলের শিল্পবিষয়ক অন্ধতায় ইতিহাস রচনা করেন" তখন তিনি বিশ্বাস করেন সেই "বিভ্রান্তিকর জয়যাত্রা"টি তথা শিল্পবিষয়ে স্তালিনযুগের অন্ধতার অবসান হয়েছে ইতিমধ্যে। কিন্তু রূঢ় সত্যটি বোধহয় এই, শিল্প-বিষয়ে স্তালিনী অন্ধতা এখনও অনতিক্রম্য এবং সেই তৃতীয় দশক থেকে একই আধুনিকতা-পরিপন্থী নীতি আবহমান!

একথাটি না বুঝে বা অগ্রাহ্য করে সোবিয়েতে বর্তমান শিল্পের অবস্থাকে প্রশংসা করা কি কিছু বিপজ্জনক নয়?

অথচ ক্রুশেভ-এর শিল্পবিচার নির্বিচারে সমর্থন করতে গেলে গত্যন্তর থাকে না। অরুণ সেনকে তাই রুশ আকাদমির প্রতি সশ্রদ্ধ হতে হয়েছে। রুশ আকাদমি এবং ফরাসী আকাদমির চরিত্র বিশ্লেষণের চেষ্টায় একবার বলেছেন তিনি, "দুই আকাদমির পার্থক্য এইখানেই, ফরাসী আকাদেমির পাশে সর্বদাই থাকে একদল বিদ্রোহী শিল্পী এবং ফরাসীদের তো আছেই বাস্তববাদের ঐতিহ্য।" এই "পাশে" শব্দটির সাহায্যে যদি তিনি 'অন্তর্গত' বুঝিয়ে থাকেন, তাহলে ফরাসী শিল্পের ইতিহাস শুধরে লিখতে হয়। আর যদি শব্দটি 'প্রতিবেশী' কি 'প্রতিদ্বন্দ্বী' বোঝায়, তাহলে ইতিহাস বলে, রুশ আকাদমির পাশেও বিদ্রোহী শিল্পীরা ছিলেন, আছেন।

কিন্তু বিশুদ্ধ বিশ্বাস অবশ্যই যুক্তি-নিরপেক্ষ এবং তর্কাতীত। এ-প্রসঙ্গে অরুণ সেনের শেষ কথাটিই তাঁর প্রবন্ধের শেষ লাইন, "জন বর্জর যাই বলুন বুর্জোয়া দেশের আকাদেমির সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক দেশের আকাদেমির তফাৎ আছেই।" তফাৎটি যথাযথ নির্দেশ করতে তাঁর আলস্যের দরুন জন বার্জর-এর ভ্রান্তিমুক্তি এ-যাত্রা সম্ভব হল না; এবং তাঁদের ধারণারও শুদ্ধি হল না যাঁরা আকাদমি মাত্রকেই দুষ্ট গ্রহবিশেষ মনে করেন, মনে করেন রাজা পিটার যেদিন ফরাসী অনুকরণে রুশ আকাদমির প্রতিষ্ঠা করেন সেইদিন থেকে রুশ শিল্পের চরিত্র—একদা যা ছিল ধর্মনিপীড়িত রাজ-কুক্ষিগত, তৃতীয় হস্তান্তরে আজও তাই—আকাদমি অধিকৃত।

অশোকনাথ মুখোপাধ্যায়

পরিচয়

বৈশাখ ১৩৭৭ সংখ্যা

লেনিন জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে

বর্ধিত কলেবরে ও মূল্যে
প্রকাশিত হবে

✠

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিভিন্ন দিক নিয়ে
সংখ্যাটি বিশিষ্ট মার্কসবাদী লেখক ও চিন্তাবিদদের রচনায়
সমৃদ্ধ ও স্থায়ীমূল্যের অধিকারী হবে

পরিচয়
বর্ষ ৩৯। সংখ্যা ৮
ফাল্গুন ১৩৭৬

সূচিপত্র

প্রচ্ছদপট ঃ বিশ্বরঞ্জন দে

পরিচয় প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

পরিচয়
বর্ষ ৩৯ । সংখ্যা ৮
ফাল্গুন । ১৩৭৬

আর্থনীতিক উন্নয়নের দুই তত্ত্ব ঃ লেনিনবাদী ও পুঁজিবাদী

মঃ আভসেনেভ

জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বর্তমান স্তরে পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত বহু দেশই কোন পথ অনুসরণ করে অগ্রসর হবে এই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। উন্নয়নের দীর্ঘমেয়াদী নীতি অনুসরণের প্রশ্নও তাদের কাছে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। এইসব দেশের নেতারা উপলব্ধি করছেন যে, দীর্ঘমেয়াদী নীতি ছাড়া উন্নয়নের কর্মসূচী কতকগুলি প্রয়োজনীয় প্রকল্পের তালিকা ছাড়া আর কিছুই হবে না। এইসব প্রকল্পের রূপায়ণ কারিগরি ও অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা তাড়াতাড়ি দূর করে দেবে এমন কথা মনে করারও কারণ নেই। সদ্যস্বাধীন দেশগুলি যেসব প্রধান প্রধান সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে, সেগুলির সমাধান নির্ভর করছে মূলত উন্নয়নের পথ বেছে নেওয়ার ওপর। সমস্যাগুলির মধ্যে আছে অর্থনীতিতে অর্থ যোগানের পন্থা, বিদেশী পুঁজির সঙ্গে সম্পর্ক এবং কৃষি-সমস্যা সমাধানের উপায়। কোন পথ বেছে নেওয়া হবে—এই প্রশ্নকে ঘিরে দুটি মতাদর্শের (কমিউনিস্ট ও বুর্জোয়া) লড়াই চলছে। সারা দুনিয়া জুড়ে যে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া চলেছে—সেই পুঁজিবাদ থেকে সমাজবাদে উত্তরণের প্রক্রিয়া এ-লড়াইতে প্রতিফলিত হচ্ছে। কমিউনিস্ট এবং ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির আন্তর্জাতিক সম্মেলনের দলিলে বলা হয়েছে, "জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের

বিরুদ্ধে লড়বার সময় সাম্রাজ্যবাদ একদিকে একগুঁয়েভাবে উপনিবেশবাদের অবশেষকে আঁকড়ে রয়েছে এবং আর-একদিকে নয়া-উপনিবেশবাদী পন্থার মাধ্যমে সদ্য-স্বাধীন দেশগুলিকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি সাধনে বাধা দিতে চেষ্টা করছে।....সাম্রাজ্যবাদ সমাজতন্ত্রের পথে অথবা সমাজতন্ত্রের সম্ভাবনা উন্মুক্ত করে দেয় এমন প্রগতিশীল অ-ধনতান্ত্রিক পথে উন্নয়নে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছে।"

মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা হাতেনাতে প্রমাণ করেছেন যে, সদ্য-স্বাধীন দেশগুলির পক্ষে তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা দূর করার সবচেয়ে সোজা এবং অপেক্ষাকৃত কম যন্ত্রণাদায়ক পথ হলো সমাজতান্ত্রিক পন্থায় উন্নয়ন। এর কারণ হলো এই যে, সমাজতন্ত্রই নিরবচ্ছিন্ন অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতি এবং দ্রুত জাতীয় শ্রীবৃদ্ধি সুনিশ্চিত করে।

উন্নত পুঁজিবাদের স্তর অতিক্রম না করে অনুন্নত দেশগুলির সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সম্ভাবনা সম্পর্কে লেনিনের শিক্ষা হলো মোটামুটি এইরকম :

পুঁজিবাদ যখন আর একমাত্র বিশ্ব-ব্যবস্থা থাকছে না এবং বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উদ্ভব হয়ে যখন তা সংহত হয়[১], তখন সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে অনগ্রসর কোনো কোনো জাতির সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সাহায্যে পুঁজিবাদী স্তর অতিক্রম না করেও প্রাক-পুঁজি সম্পর্ক থেকে সমাজতান্ত্রিক সম্পর্কে উপনীত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

লেনিন এই বিষয়ে অনেক লিখেছেন, তবে এই বিষয়ে তাঁর সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিবৃতি তিনি দেন কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে। তিনি বলেছিলেন :

"....অনগ্রসর যে জাতিগুলি এখন মুক্তির পথে এগিয়ে চলেছে এবং মহাযুদ্ধের পর প্রগতির দিকে যাদের কিছুটা অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়, তাদের অর্থনৈতিক বিকাশে পুঁজিবাদী স্তর অবশ্যম্ভাবী—এই বক্তব্য কি আমরা নির্ভুল মনে করব? আমাদের জবাব হলো—"না"। যদি বিজয়ী বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণী তাদের মধ্যে ধারাবাহিক প্রচারকার্য চালায় এবং সোভিয়েত সরকারগুলি যদি

১। শুধু অর্থনৈতিক নির্দেশগুলি লক্ষ্য করে এটা বিচার করা যায়। এখন দুনিয়ার শিল্পজাত পণ্যের ৪০ শতাংশ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে উৎপাদিত হয়, যদিও তাদের মোট জনসংখ্যা দুনিয়ার মোট জনসংখ্যার ৩৫ শতাংশের মতো।

তাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করে, তাহলে অনগ্রসর জাতিগুলিকে অবশ্যম্ভাবীরূপে উন্নয়নের পুঁজিবাদী স্তর অতিক্রম করতে হবে—একথা ধরে নেওয়া ভুল হবে। ....উন্নত দেশগুলির শ্রমিকশ্রেণীর সহায়তায় অনগ্রসর দেশগুলি পুঁজিবাদী স্তর অতিক্রম না করেই সোভিয়েত ব্যবস্থায় উপনীত হতে পারবে এবং বিকাশের কয়েকটি স্তরের মধ্য দিয়ে কমিউনিজমে পৌছুতে পারবে।"

পরাধীনতার শৃঙ্খল যে-সব জাতি ছিন্ন করেছে, তাদের চেতনার মধ্যে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা যে ক্রমেই গভীর থেকে গভীরতরভাবে প্রবেশ করছে এবং সদ্য-স্বাধীন দেশগুলির বহু নেতাকে সেই ভাবধারা যে প্রভাবিত করছে—তা বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা উপলব্ধি করেছেন। এই জন্যেই তাঁরা এইসব দেশকে সমাজতন্ত্রের অভিমুখী হওয়া থেকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। পুঁজিবাদের প্রশস্তি গেয়ে এবং লেনিনের অ-ধনতান্ত্রিক বিকাশের তত্ত্বের বিরোধিতা করে পশ্চিমী দেশগুলিতে লেখার পরিমাণ ক্রমেই বাড়ছে। এঁরা সর্ববিধ পন্থা অনুসরণ করছেন। "গভীর" তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা থেকে আরম্ভ করে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ভাবধারা, বিশ্ব-কমিউনিস্ট আন্দোলনের দলিলাদি, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির এবং সমাজতন্ত্রের পথাভিমুখী দেশগুলির পরিস্থিতি সম্পর্কিত প্রকৃত তথ্যাদির প্রকাশ্য বিকৃতি ঘটানো—কিছুই বাদ যাচ্ছে না।

পশ্চিমী অর্থনীতিবিদ ও সমাজতত্ত্ববিদরা যুক্তি দেখান নানারকম। কিন্তু তাঁদের সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য থাকে অল্পই। আর এই সিদ্ধান্তগুলি শেষপর্যন্ত দুটি বুনিয়াদী তত্ত্বে পর্যবসিত হয়ঃ সমস্ত, অন্ততপক্ষে অধিকাংশ, সদ্য-স্বাধীন দেশের পক্ষে সমাজতন্ত্র একটা অসম্ভব ব্যাপার এবং সমাজতন্ত্রের "বিকাশলাভের সম্ভাবনাগুলি"র পরিমাণগত নির্দেশক ও জাতিসমূহকে এর জন্য যে "মূল্য" দিতে হবে বলে ধরে নেওয়া হয় তার দিক থেকে বিচার করলে সমাজতন্ত্র "অকার্যকর"! বুর্জোয়া মতাদর্শে আচ্ছন্ন বলে এশিয়া ও আফ্রিকার যেসব অর্থনীতিবিদ ও সমাজতত্ত্ববিদ (সাধারণত এঁরা পশ্চিমী বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলিতে শিক্ষালাভ করছেন) পুঁজিবাদী বিকাশ পছন্দ করেন, তাঁরা এই তত্ত্বগুলি সমর্থন করেন।

উন্নয়নশীল দেশগুলির সমাজতন্ত্রাভিমুখী হওয়া কি সম্ভব ?

উপরের প্রশ্নের জবাবে অধিকাংশ বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ বলবেন "না"। তাঁদের যুক্তিগুলিতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নিম্নলিখিত উল্লেখ থাকবেঃ

সদ্য-স্বাধীন দেশগুলির "অনুপযোগী শ্রেণী কাঠামো" (শ্রমিকশ্রেণীর

অস্তিত্ব নেই অথবা সমাজে অ-শ্রমিক অংশগুলিরই, প্রধানত কৃষককুলের, প্রাধান্য), প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী না থাকায় সোভিয়েত মডেল গ্রহণযোগ্য নয়, বৈষয়িক সম্পদসমূহ পর্যাপ্ত নয়, ইত্যাদি অথবা শেষপর্যন্ত সমাজতন্ত্র গঠনের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব শুধু ইয়োরোপের পক্ষে উপযোগী, এশিয়া ও আফ্রিকার জাতিগুলির কাছে এই তত্ত্ব বিজাতীয় তত্ত্ব। পুঁজিবাদ অতিক্রম না করে উন্নয়নশীল দেশগুলি সমাজতন্ত্রে উপনীত হতে পারে —এই ধারণাকে মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্বের ডকটর এ. মেইসনর "গালগল্প" বলে অভিহিত করেছেন। ঐসব দেশের অধিকাংশ লোক চাষী, এই তথ্যকে ভিত্তি করে তিনি বলেন যে, উন্নত দেশগুলিতেও চাষীরা কখনও সমাজতন্ত্রের জন্যে লড়েনি, কাজেই কেন যে সনাতন সমাজের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ আফ্রিকান চাষীরা সমাজতন্ত্রের জন্য লড়বে তা তিনি ভেবেই পান না।[১] তাঁর বক্তব্যের প্রতিধ্বনি তুলেই প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পি. সিগমুণ্ড বলেন যে, "মার্কসবাদ-লেনিনবাদ হলো ১৯শ শতাব্দী ও ২০শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইয়োরোপের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সৃষ্ট অতিসরলীকৃত মতবাদ"—যা আজকের দিন পর্যন্ত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দাওয়াই-এর মূলে বর্তমান রয়েছে।[২]

মালির মোদিবো কেইতা সরকারের পতনের কারণ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে জে. ভাংগজী (এঁকে 'জুনে আফ্রিক' পত্রিকায় বিশিষ্ট আফ্রিকান অর্থনীতিবিদ বলে অভিহিত করা হয়েছে) বলেন যে, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের নকল করতে গিয়েই মোদিবো কেইতার পতন ঘটেছে। তাঁর সিদ্ধান্ত হলো সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের মতো বৈষয়িক সম্পদ ও জনবল না থাকায় আফ্রিকার দেশগুলি "সোভিয়েত পরীক্ষা-নিরীক্ষা"র পুনরাবৃত্তি করতে পারে না।[৩]

অন্যান্য বুর্জোয়া লেখকরাও প্রায় এইরকম যুক্তি দেখান।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ "খাঁটি ইয়োরোপীয় মতবাদ" এবং এই মতবাদ

১। এ. মেইসনের-লা আফ্রিক, পুত-এল পারতির? প্যারিস, ১৯৬৬, পৃঃ ১০। বলা বাহুল্য এই বক্তব্য যে-কোনো সদ্য-স্বাধীন দেশের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারা যায়।

২। 'দি আইডিওলজিস অব দি ডেভেলপিং নেশনস', নিউইয়র্ক, ১৯৬৪, পৃঃ ৩৭।

৩। 'জুনে আফ্রিক,' ২৭ জুন-২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯, পৃঃ ২৭।

ইয়োরোপের বাইরে প্রযোজ্য নয়, বুর্জোয়াদের এই মত এশিয়ার কয়েকটি দেশ ও কিউবার অভিজ্ঞতায় খণ্ডিত হয়েছে। আরও বড় কথা হলো এই যে, অনগ্রসর দেশগুলি পুঁজিবাদ অতিক্রম না করে সমাজতন্ত্রে উপনীত হতে পারবে না—এই তত্ত্বটিই সম্পূর্ণ ভুল। কারণ, লেনিন যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আভাস দিয়েছেন, এই তত্ত্বে সেগুলি হয় উপেক্ষা করা হয়েছে আর না হয় সেগুলিকে বিকৃত করা হয়েছে। আগের অনগ্রসর যেসব দেশ এখন সমাজতন্ত্রের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে তাদের অর্থনীতিকে সাফল্যের সঙ্গে গড়ে তুলছে, তাদের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়।

বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা ইচ্ছে করেই নিম্নলিখিত দুটি বিষয়কে গুলিয়ে ফেলেছেন : সমাজতন্ত্র গঠনের আশু সম্ভাবনা এবং সমাজতান্ত্রিক অভিমুখীনতা। সমাজতান্ত্রিক অভিমুখীনতা বলতে বোঝায় এমন এক কর্মনীতি যার লক্ষ্য হলো পরে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার অবস্থা সৃষ্টি করা। ঔপনিবেশিক বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করেছে এমন যে-সব দেশ উন্নয়নের জন্য সমাজতন্ত্রের পথ বেছে নিয়েছে বা নেবে, তাদের কারুরই নিশ্চয় এখনই সরাসরি সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সম্ভাবনা নেই (থাকতেও পারে না)। ব্যতিক্রম হিসাবে শুধু উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে এমন সম্ভাবনা থাকতে পারে। তাই, মার্কসবাদীরা নতুন রাষ্ট্রগুলি এখনই সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর ঘটাতে সক্ষম এমন দাবি করেন না। সোভিয়েত রাশিয়ায় পর্যন্ত সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার গোড়ার বছরগুলিতে সরাসরি সমাজতান্ত্রিক প্রকৃতির নয় এমন বহু ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছিল। এইসব ব্যবস্থা শুধুমাত্র পরবর্তীকালে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে তোলার অবস্থা সৃষ্টি করেছিল।

মোঙ্গলীয় জনগণ বিপ্লবের ২০ বছর পরে সমাজতন্ত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করতে শুরু করে। মার্কসবাদী সাহিত্যে যে-প্রক্রিয়াকে উন্নয়নের অ-ধনতান্ত্রিক পথ বলে অভিহিত করা হয়, তার অর্থ ভবিষ্যতে সমাজতন্ত্রের উত্তরণের জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করা। পরে যেসব সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তন ঘটবে—এই পথ আগে থেকেই সেইসব পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জমি তৈরি করে। এই প্রক্রিয়ার সারবস্তু সম্পর্কে বলতে গিয়ে লেনিন "প্রাক-পুঁজিবাদী সম্পর্ক থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের জন্য" কোন কোন মধ্যবর্তী পথ, পন্থা ও হাতিয়ার "দরকার হয়" তা বোঝবার প্রয়োজনের উল্লেখ করেছেন।

সদ্য-স্বাধীন দেশগুলিতে সংগঠনের অভাব এবং কৃষকদের রাজনৈতিক

নিষ্ক্রিয়তার উল্লেখ করে বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা বলেন যে, জনসাধারণের অ-শ্রমিক অংশ "বিপ্লব-বিরোধী" এবং সমাজতান্ত্রিক অভিমুখীনতার পথে অলংঘনীয় বাধা। একথা ঠিক যে, ঐসব দেশের অনেকগুলিতেই কৃষকরা অসংগঠিত এবং নিষ্ক্রিয়। কিন্তু কয়েকটি দেশে স্বাধীনতা-সংগ্রাম চলার কালে কৃষকরা তাদের বিপ্লবী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে। আলজেরিয়া, ভিয়েতনাম এবং আফ্রিকার গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের বহু দেশে স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামে কৃষকরা লড়েছে ও লড়ছে। সম্প্রতি কয়েক বছরের মধ্যে প্রবল কৃষক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছে (১৯৬৩ সনে তুরস্কে এবং ১৯৬৪ সনে ভারতে)। গেরিলা আন্দোলনও চলেছে লাতিন আমেরিকার দেশে দেশে। মস্কোয় আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সম্মেলনের দলিলে বলা হয়েছে যে, কৃষকরা "সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং জাতীয় মুক্তি ও নতুন জাতীয় রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতাকে সংহত করার জন্য সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে।"

সদ্য-স্বাধীন দেশগুলিতে কৃষকদের সম্ভাব্য বৈপ্লবিক শক্তিকে অস্বীকার করে বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা হয় বড় রকম ভুল করছেন, আর না হয় নিজেদের আবার আশ্বস্ত করার চেষ্টা করছেন। কৃষকরা সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা আয়ত্ত করতে অক্ষম, কাজেই অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক সংগঠনকেও বুঝতে অক্ষম—তাঁদের এই অভিমতের সঙ্গে তথ্যের কোনো মিল নেই। লেনিন বলেছিলেন যে, "আধা-সামন্ততান্ত্রিক অধীনতার অবস্থার মধ্যে থাকে এমন কৃষকরা সহজেই সোভিয়েত সংগঠনের চিন্তাধারাকে আয়ত্ত করতে ও তাকে কার্যকর করতে পারে।" অভিজ্ঞতা লেনিনের বক্তব্যের নির্ভুলতা প্রমাণ করেছে। তৃতীয় আন্তর্জাতিকের ২য় কংগ্রেসে লেনিন ঐ কথাগুলি বলেছিলেন। কয়েক মাস পরে সোভিয়েত-সমূহের নিখিল রুশ কংগ্রেসের ৮ম অধিবেশনে বোখরা, আজারবাইজান ও আর্মেনিয়ার সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রসমূহের সংহতি প্রসঙ্গে লেনিন বলেন: "সোভিয়েত সরকারের ধারণা ও নীতিগুলি যে কেবলমাত্র শিল্পোন্নত দেশগুলিতে নয়, কেবলমাত্র যেসব দেশে শ্রমিকশ্রেণীর মতো সামাজিক ভিত্তি আছে সেইসব দেশেই নয়, কৃষককুল যেসব দেশের সামাজিক ভিত্তি সেইসব দেশেও বোধগম্য ও প্রযোজ্য—এই প্রজাতন্ত্রগুলিই তার প্রমাণ। কৃষকদের সোভিয়েতের আইডিয়া জয়যুক্ত হয়েছে।" লেনিনের ধ্যান-ধারণাগুলি মঙ্গোলিয়াও প্রমাণ করেছে। জাতীয় শ্রমিকশ্রেণীর আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত মঙ্গোলিয়ার মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির প্রধান সামাজিক ভিত্তি এবং জনগণের বিপ্লবের চালিকাশক্তি

ছিল কৃষকদের গরীব ও মধ্য স্তর এবং যাযাবর পশুপালকেরা। কাজেই সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে অনগ্রসর কোনো দেশের জনসংখ্যার অ-শ্রমিক অংশগুলির আধিক্য কোনোক্রমেই সমাজতন্ত্রের উত্তরণের জন্য অবস্থা সৃষ্টির পক্ষে অলংঘনীয় বাধা হতে পারে না।

"সোভিয়েত উন্নয়ন মডেল" অধিকাংশ সদ্য-স্বাধীন দেশের পক্ষে গ্রহণের অযোগ্য বলে বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা যে-দাবি করেন, তাও ভিত্তিহীন। তাঁদের বিবৃতি দেখে বোঝা যায় যে—যেসব নির্দিষ্ট পন্থায় সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা হয়েছে, সেইসব নির্দিষ্ট পন্থাকেই তাঁরা "সোভিয়েত মডেল" বলে বোঝেন। যেমন, জাতীয় অর্থনৈতিক অনুপাত, উন্নয়নের অর্থাদির উৎস, ইত্যাদি। কিন্তু কোনো দেশ যদি সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হয়, তাহলে তাকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যাপারে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র যা করেছে তাই করতে হবে এমন কথা মার্কসবাদীরা কখনোই বিশ্বাস করেন না। এটা অসম্ভব, কারণ, সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন পথ অনুসরণ করাই স্বাভাবিক। কোনো দেশের সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সাধারণ নিয়মগুলি ছাড়াও প্রত্যেক দেশের নিজস্ব বিশেষ বিশেষ নিয়ম আছে। সমাজতন্ত্র গঠনের অভিজ্ঞতা থেকে জানা গেছে যে, সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তন সমূহ ঘটানোর নির্দিষ্ট পন্থা ও হারের মধ্যে যথেষ্ট রকম পার্থক্য আছে। যেমন, ছোট ছোট পণ্য উৎপাদনকারীদের সমবায় সমূহে সংগঠিত করা, পুঁজিবাদী সম্পত্তির সমাজতন্ত্রী-করণ, রাষ্ট্র-কাঠামোর বিভিন্ন রূপ, ইত্যাদি। ভবিষ্যতে অন্যান্য দেশ যখন সমাজতন্ত্রের পথ অনুসরণ করবে তখনও এই পার্থক্য থেকে যাবে। তাই, যেসব বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ উন্নয়নের সমাজতান্ত্রিক পথকে "সোভিয়েত মডেলের অন্ধ অনুকরণ" বলে মনে করেন—তাঁদের সম্পর্কে লেনিনের নিম্নলিখিত বিবৃতিটি প্রযোজ্য :

"আমাদের ইয়োরোপীয় বাক্যবাগীশেরা কখনো স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না যে, আরো বিশাল জনসংখ্যা ও সামাজিক অবস্থার বিপুলতর বৈচিত্র্য সমন্বিত প্রাচ্যের দেশগুলিতে পরবর্তীকালে যেসব বিপ্লব ঘটবে—রুশ বিপ্লবের চাইতে নিঃসন্দেহে সেইসব বিপ্লবে আরও বেশি বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যাবে।"

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশে সমাজতন্ত্র গঠনের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতায় উন্নয়নের অ-ধনতান্ত্রিক পথ সম্পর্কে লেনিনের শিক্ষা নির্ভুল প্রমাণিত হয়েছে। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে মধ্য-এশিয়ার প্রজাতন্ত্রসমূহ ও সুদূর উত্তরাঞ্চলের জাতিগুলি

রুশ জনগণের সহায়তায় পুঁজিবাদী স্তর অতিক্রম না করেই সমাজতন্ত্রে উপনীত হয়েছে। মঙ্গোলিয়ার জনগণের প্রজাতন্ত্রও অনুরূপভাবে সমাজতন্ত্রে উপনীত হয়েছে। একথা ঠিক যে, এইসব দেশে এমন সব উপাদান ছিল যেগুলি অধিকাংশ সদ্য-স্বাধীন দেশে নেই। সবচেয়ে বড় কথা হলো এই যে, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের উল্লিখিত অঞ্চলগুলি ও মঙ্গোলিয়া সাম্রাজ্যবাদী প্রভাব থেকে মুক্ত হয়েছিল এবং লেনিনের তত্ত্ব "বিশুদ্ধ রূপে"ই এসব অঞ্চলে কার্যকর হয়। এইসব অঞ্চল যাতে উৎপাদিকা শক্তিসমূহের বিকাশের ও প্রতিষ্ঠিত উৎপাদন-সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমস্তরে অবস্থিত অন্যান্য দেশকে (তুরস্ক ও ইরান) পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে পারে, তার জন্য সোভিয়েত সরকার সর্বতোভাবে ঐসব অঞ্চলকে সাহায্য করেছেন।

বর্তমান পরিস্থিতিতে লেনিনের তত্ত্বের পরিপূরক হিসাবে কাজ করেছে তৃতীয় একটি উপাদান। নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রগুলিকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে রাখবার জন্য উন্নত সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি এখন তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং কখনও কখনও সামরিক ক্ষমতা ব্যবহার করছে। কিন্তু এইরকম অবস্থাতেও কিউবার মতো, বিশেষ করে ভিয়েতনাম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের মতো, দেশগুলির অভিজ্ঞতা উন্নত পুঁজিবাদী স্তর অতিক্রম না করে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সম্ভাবনা সংক্রান্ত লেনিনের তত্ত্ব সপ্রমাণ করেছে। এইসব দেশ পুঁজিবাদী দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়নি এবং কয়েকটি সাম্রাজ্যবাদী দেশের সঙ্গেও এরা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বজায় রেখেছে। যে-সব দেশ উন্নয়নের সমাজতান্ত্রিক পথ বেছে নিয়েছে বহু প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও (যেমন, ভিয়েতনামে দেশবিভাগ, স্বাধীনতালাভের পর যুদ্ধের ফলাফলগুলি দূরীকরণের আবশ্যকতা এবং মার্কিন আগ্রাসন), তারা প্রভূত সাফল্য অর্জন করেছে। আরও বড় কথা হলো এই যে, কিউবা ও ভিয়েতনামের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড বা দুর্লভ প্রাকৃতিক সম্পদ নেই। উৎপাদনের সমাজতান্ত্রিক সম্পর্কের সুবিধা এবং আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী শ্রম-বিভাগ ব্যবস্থা থেকে সরে দাঁড়ানোই হলো তাদের সাফল্যের প্রধান কারণ।

লেনিনের তত্ত্বে পুঁজিবাদী স্তর অতিক্রম না করেও সমাজতন্ত্রে উপনীত হওয়ার সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু এমন দাবি করা হয়নি যে, এই সম্ভাবনা বাস্তবে পরিণত হবেই। বাইরের উপাদানের (সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার অস্তিত্ব উন্নয়নশীল দেশগুলিকে পুঁজিবাদী স্তর পার না হয়ে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের

ব্যাপারে সাহায্য করবে) সঙ্গে সঙ্গে থাকা চাই আভ্যন্তরীণ পরিবেশ। এই পরিবেশ হলো শ্রমজীবী জনগণের রাজনৈতিক তৎপরতা, অ-ধনতান্ত্রিক পথে সমাজতন্ত্রে উপনীত হওয়ার জন্য তাদের সঙ্কল্প এবং সবশেষে, সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে যোগ্য নেতৃত্ব গ্রহণে সক্ষম সংগঠিত সামাজিক শক্তি। তৃতীয় দুনিয়ার অধিকাংশ দেশেই এই পরিবেশ নেই। কিন্তু এই রকম পথের সম্ভাবনার কথা তর্কাতীত, তা সে বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা যত উল্টো কথা বলার চেষ্টাই করুন না কেন।

উন্নয়নের সমাজতান্ত্রিক পথের কার্যকারিতা

আগের ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলি সমাজতান্ত্রিক পথ অনুসরণ করতে পারে এ-কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়ে বহু বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ জোর দিয়ে বলছেন যে এই পথ মোটামুটিভাবে কার্যকর নয়, অথবা অন্ততপক্ষে পুঁজিবাদী ভিত্তিতে উন্নয়নের চাইতে কম কার্যকর। চেজ মানহাটন ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট এবং সমসাময়িক মার্কিন ধনপতিগোষ্ঠীর সবচেয়ে বড়দরের প্রতিনিধিদের অন্যতম ডেভিড রকফেলার পরিষ্কারভাবেই এমন ধরনের কথা বলেন। সদ্য-স্বাধীন দেশগুলির সমস্যা সংক্রান্ত একটি আলোচনা সভায় তিনি এ-সব দেশের উন্নয়নের জন্য বৈদেশিক লগ্নির প্রয়োজনের উল্লেখ করার পর তৃতীয় দুনিয়া ও তার সমস্যা সমূহের সঙ্গে সুপরিচিত বলে কথিত এক বন্ধুর উক্তি উদ্ধৃত করেন। উক্তিটি নিম্নরূপ :

"উন্নয়নশীল দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়নে যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে আমি অনিবার্য শর্ত বলে মনে করেছিলাম, তা কোনো কাজে লাগে না। আসলে, এই বিপ্লব এক ধরনের পুঁজিবাদী বিপ্লব।"[১]

অন্যান্য বহু বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ একই কথা বলেছেন। স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডবলিউ. জোনস উন্নয়নশীল দেশগুলিতে সমাজ-তান্ত্রিক দেশগুলির অভিজ্ঞতা কাজে না লাগানোর জন্য হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। ফরাসী বিশ্বকোষের অন্যতম লেখক গিলবার্ত ব্লাদেঁাও অনুরূপ হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।[২]

১। 'জুনে আফ্রিক', ৮ই অক্টোবর, ১৯৬৭, পৃঃ ১৯

২। 'ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট ইন আফ্রিকা', অক্সফোর্ড, ১৯৬৫, পৃঃ ৪৯; 'এনসাইক্লোপিদি ফ্রাঁসে', ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৯, ৩৬

তাঁদের বক্তব্যের সমর্থনে অধিকাংশ বুর্জোয়া লেখক গিনি ও কিউবার মতো দেশগুলির অর্থনৈতিক বিপত্তির উল্লেখ করে থাকেন। কেউ কেউ আরও অগ্রসর হয়ে সোভিয়েত অর্থনীতির অকার্যকারিতার কথাও বলেন।[১]

যেসব বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ উন্নত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির কার্যকারিতা সম্পর্কে সন্দিহান, তাঁদের সঙ্গে বর্তমান প্রবন্ধের লেখক তর্ক করতে চান না। এই প্রশ্ন নিয়ে বহু প্রবন্ধ লেখা হয়েছে এবং সে-সব প্রবন্ধে সমাজতন্ত্রের সুবিধাগুলি সপ্রমাণ করা হয়েছে। আমি এই প্রবন্ধে উন্নয়নের প্রারম্ভিক স্তরের কার্যকারিতা প্রমাণ করতে চাই। এই স্তরটিকে ওয়াল্ট রোস্টো 'উত্থমের মুহূর্ত" বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু এই স্তরের কার্যকারিতা প্রমাণ করতে হলে আমাদের প্রথমে সামাজিক-অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা দূর করার প্রচেষ্টায় সদ্য-স্বাধীন দেশগুলিকে কি কি কাজ করতে হবে—তা স্থির করতে হবে। এর জন্য আবার দরকার "সামাজিক-অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা" এবং "স্বল্পোন্নত"—এই শব্দগুলির সঠিক সংজ্ঞা নির্ধারণ করা।

আমাদের সাহিত্যে ও বুর্জোয়া সাহিত্যে অনেক নির্ণায়ক আছে যেগুলির সাহায্যে আমরা কোনো দেশ উন্নত কি উন্নয়নশীল তা নির্ধারণ করি। এই সব নির্ণায়কের মধ্যে আছে মাথাপিছু জাতীয় আয়ের পরিমাণ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ব্যবস্থাদির অবস্থা, জনপ্রতি ক্যালরি গ্রহণের পরিমাণ এবং জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে (শিল্প, কৃষি, জনসেবামূলক কাজকর্ম) নিযুক্ত লোকের অনুপাত ইত্যাদি।

উল্লিখিত সমস্ত নির্ণায়ককেই পরিমাণগত শ্রেণীভুক্ত করা যায়। এগুলি গুরুত্বপূর্ণ হলেও একটা দেশকে উন্নত বা উন্নয়নশীল কোন গোষ্ঠীর মধ্যে ফেলা যাবে তা ঠিক করার মতো একটি সম্পূর্ণ ছবি এই নির্ণায়কগুলি তুলে ধরতে পারে না। আমার মতে একটা দেশ স্বল্পোন্নত কিনা তা নির্ধারণ করার ব্যাপারে পরিমাণগত নির্ণায়ক অপেক্ষা গুণগত নির্ণায়কই আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। শুধু পরিমাণগত নির্ণায়কের সাহায্য নিলে তা একটা দেশের উন্নয়নের স্তরের বিকৃত

১। সুবিদিত মার্কিন "সোভিয়েত তত্ত্ববিদ" এ. বার্গসন জোর দিয়ে বলেছেন যে, সোভিয়েত অর্থনীতির অ-কার্যকারিতা "প্রমাণ"-এর জন্য লিখিত তাঁর সর্বশেষ গ্রন্থের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো তৃতীয় দুনিয়ার কাছে সমাজতন্ত্রকে হেয় প্রতিপন্ন করা। এ. বার্গসন রচিত 'প্ল্যানিং এ্যাণ্ড প্রোডাকটিভিটি আণ্ডার সোভিয়েট সোস্যালিজম', নিউ ইয়র্ক, ১৯৬৮, পৃঃ ১৬

ছবি সৃষ্টি করতে পারে। যেমন, কুবাইত জনসংখ্যার মাথাপিছু জাতীয় আয়ের পরিমাণের দিক থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সুইডেন ও সুইজারল্যাণ্ডের মতো দেশগুলিকেও অনেক পিছনে ফেলে দিয়ে পৃথিবীতে প্রথম স্থান অথবা অন্যতম প্রথম স্থান অধিকার করেছে। কয়েকটি উন্নত পুঁজিবাদী দেশে সমাজের মোট উৎপাদনে কৃষিজাত পণ্যেরই প্রাধান্য লাভ করতে দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, নিউজিল্যাণ্ডের নাম করা যায়।

কোনো দেশ স্বল্পোন্নত কিনা তা নির্ধারণ করার দুটি মূল নির্ণায়ক আছে। একটি হলো পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত নয় বা প্রায় যুক্ত নয় (কোনো কোনো পশ্চিমী অর্থনীতিবিদ এই অবস্থাকে "অর্থনীতির নির্গ্রন্থন"[১] বলে অভিহিত করেন) এমন আর্থনৈতিক অংশগুলির অস্তিত্ব। এক্ষেত্রে প্রত্যেকটি অংশ নিজস্ব ভিত্তিতেই ও নিজস্ব ধাঁচেই পুনরুৎপাদন করে চলে। এই অংশগুলি হলো সাধারণত প্রাকৃতিক (চিরাচরিত) ও স্থানীয় পণ্য (শহরের), আর রপ্তানী (সাধারণত বিদেশীদের হাতে)।[২] দ্বিতীয় নির্ণায়ক হলো সামাজিক সম্পর্ক সমূহের, বিশেষ করে উৎপাদন সম্পর্কের, মান্ধাতার আমলের রূপ। মান্ধাতার আমলের উৎপাদন-সম্পর্ক আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা ও উৎপাদন সংগঠনের কাঠামোর মধ্যে চালু উৎপাদিকা শক্তিগুলিকে (যেমন শ্রমশক্তির সম্পদ) সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগাতে দেয় না।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, নিছক অর্থনৈতিক উপাদান ছাড়াও আরও কিছুর সঙ্গে "স্বল্পোন্নয়ন"-এর সম্পর্ক রয়েছে। দূরপ্রসারী অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন ঘটিয়েই একে দূর করা যায়। পুঁজিবাদী পথ অনুসরণ করে কি তা করা যায়? পুঁজিবাদী ধারায় নতুন জাতীয় রাষ্ট্রগুলির উন্নয়নের তিনটি সুনির্দিষ্ট ধরন স্বতন্ত্রভাবে বিবেচনা করা যাক।

প্রথম হলো "চিরায়ত পুঁজিবাদী" পথ। পশ্চিম ইয়োরোপ ও উত্তর আমেরিকা এই পথ অনুসরণ করেছে। এই পথ হলো : ক্ষুদ্রাকার পণ্য-অর্থনীতির স্বাভাবিক ভাঙনের ভিত্তিতে পুঁজিবাদের ক্রমবিকাশ। কোনো কোনো

১। জে. এস. আলবারতিনি—'লে মেকানিজম দ্যু স্যু-দেভেলপমেন্ত', প্যারিস, ১৯৬৭, পৃঃ ৪৫

২। কোনো কোনো স্বল্পোন্নত দেশে (নেপাল, ভূটান এবং অন্যান্য) অর্থনীতির এই অংশ হয় নেই, আর না হয় সামান্য ভূমিকা গ্রহণ করে।

সরকারী ব্যবস্থার ('ক্যাপিটাল'-এর প্রথম খণ্ডের ২৪শ পরিচ্ছেদে মার্কস বর্ণিত ব্যবস্থাগুলির মতো) দ্বারা ক্রমবিকাশ ত্বরান্বিত হয়। এই হলো পুঁজিবাদের স্বতঃস্ফূর্ত উৎপত্তির পথ। তৃতীয় দুনিয়ার সমস্যা সম্পর্কে অন্যতম শীর্ষস্থানীয় বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞ ডব্লিউ. এ. লিউইস বর্তমান শতকের চতুর্থ দশকের মাঝামাঝি এই পথ অনুসরণের পক্ষে বলেছিলেন। মূলত এই পথ অনুসরণের প্রস্তাব করেছেন ওয়াল্ট রোস্টো। ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ এ. এম. ক্যামার্ক এই পথ নিয়ে আলোচনা করেছেন।[১]

এই ধরনের পথ অনুসরণ করা সাধারণভাবে সম্ভব। কারণ, সদ্যস্বাধীন দেশগুলিতে যৌথ সম্পত্তির (যেখানে যেখানে আছে) ভাঙন এবং ক্ষুদ্রাকারে পণ্য উৎপাদনকারীদের মধ্যে স্তরভেদ সত্যিই বেশ তীব্রভাবে অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু তা কার্যকর (আর বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা ঠিক এই কথাই বলছেন) কিনা তা নিশ্চিত করে বলা খুব শক্ত। এই পথ খুব দীর্ঘ। ঔপনিবেশিক পরাধীনতার বন্ধনমুক্ত সদ্যস্বাধীন রাষ্ট্রগুলির চাইতে অনেক ভালো অবস্থায় যেসব দেশ ছিল, সেই সব দেশেরও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমকালীন স্তরে পৌঁছুতে কয়েক শতাব্দী লেগেছে। আসল কথা হলো এই যে, তৃতীয় দুনিয়ার অধিকাংশ দেশের কাছেই এই পথ সর্বতোভাবে রুদ্ধ হয়ে গেছে। অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশগুলি পর্যন্ত "উন্নয়নের স্বতঃস্ফূর্ত পদ্ধতি"কে বাতিল করতে এবং বেশ ব্যাপক আকারে অর্থনীতির রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের উপর নির্ভর করতে বাধ্য হয়েছে। পুঁজিবাদী উন্নয়নের এই ধরনের পথ অনুসরণ করে অর্থনৈতিক দিক থেকে অনগ্রসর দেশগুলি অদূর ভবিষ্যতে তাদের অনগ্রসরতা দূর করতে সমর্থ হবে না। এর কারণ হলো ঃ পুঁজিবাদের আমলে প্রচলিত শ্রমের আন্তর্জাতিক বিভাগ, ব্যক্তিগত লগ্নির জন্য যথেষ্ট উপায়ের অভাব এবং শিল্পভিত্তিক ধনিকশ্রেণীর দুর্বলতা ও কোনো কোনো দেশে এই শ্রেণীর সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি। এ-সবই পুঁজির প্রাথমিক সঞ্চয়ের প্রক্রিয়াকে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক করে তোলে।

নিজেদের অবস্থানের দুর্বলতা বুঝে বহু বুর্জোয়া অথনীতিবিদ "বাইরের উদ্যম"-এর তত্ত্ব খাড়া করেছেন। এই তত্ত্বটি নিম্নলিখিতরূপ ঃ উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির কাঁচামাল ও খাদ্যের প্রয়োজন হয় এবং তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিতে

১। ডব্লিউ.এ. লিউইস—'দি থিয়োরি অব ইকনমিক গ্রোথ', লণ্ডন, ১৯৫৬; এ.এম. ক্যামার্ক—'দি ইকনমিক্স অব আফ্রিকান ডেভেলপমেন্ট', লণ্ডন, ১৯৬৭

এইসব কাঁচামাল ও খাদ্য উৎপন্ন হয়। উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলি এ-সকল জিনিসের উৎপাদন যাতে বৃদ্ধি পায় এমন সব ব্যবস্থা অবলম্বন করে। (তারা তাদের প্রয়োজনীয় পণ্যাদির আমদানি বাড়াবে। এর অর্থ উন্নয়নশীল দেশগুলি আরও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করবে। এর ফলে শেষোক্ত দেশগুলি পুঁজি-সঞ্চয়ের সুযোগ পাবে। তখন এ-সব দেশ রপ্তানী বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পুঁজি লগ্নি করবে এবং এর ফলে সদ্য-স্বাধীন দেশগুলি তাদের পুঁজির প্রয়োজন মেটাবার ব্যাপারে সাহায্য পাবে।) "বাইরের উদ্যম" উন্নয়নশীল দেশগুলির অধিবাসীদের আয় বাড়াবে। এই আয়ের কতকাংশ আভ্যন্তরীণ বাজারের জন্য পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হবে এবং আয় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আভ্যন্তরীণ বাজারের ক্ষমতাও সম্প্রসারিত হবে। এই ধারণার সমর্থকরা বলেন যে, এই "ধারা-প্রতিক্রিয়া"র চূড়ান্ত ফলস্বরূপ ব্যক্তিগত কর্মোদ্যোগের ভিত্তিতে ব্যাপক অর্থনৈতিক জোয়ার দেখা দেবে। এই তত্ত্বে অর্থনীতির আনুষঙ্গিক কাঠামো (রাস্তাঘাট ইত্যাদি তৈরি করা—অঃ) গড়ে তোলার ব্যাপারে এবং কোনো বিশেষ অবস্থায় যেসব ক্ষেত্র ব্যক্তিগত পুঁজির কাছে "অনাকর্ষণীয়" মনে হবে—সেইসব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে লগ্নিকারকের ভূমিকা দেওয়া হয়েছে।

এই তত্ত্বে উন্নয়নশীল দেশগুলির অর্থনীতিতে প্রধানত বৈদেশিক লগ্নির উপরেই জোর দেওয়া হয়েছে। কারণ এটা স্পষ্ট যে, জনসাধারণের বর্তমান আয়ের পরিমাণ যদি দ্বিগুণও হয় (অদূর ভবিষ্যতে তা অসম্ভব), তা হলেও সঞ্চয়ের সমস্যার সমাধান করা যাবে না। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, বিত্তশালী শ্রেণীগুলির আয় কদাচিৎ উৎপাদনে লগ্নি করা হয়। তৃতীয় দুনিয়ার নয়া ধনীরা তাঁদের টাকা বিদেশে পাঠানোই পছন্দ করবেন। দেশের মধ্যে এ-টাকা তাঁরা ব্যবহার করবেন হয় ফাটকাবাজীর জন্য জমিজমা কিনতে, আর না হয় নবাবী করতে।

এখন দেখা যাক উল্লিখিত তত্ত্বটি কতটা কার্যকর। উন্নয়নের এ-পথাভিমুখী দেশগুলির অভিজ্ঞতা থেকে সরাসরি কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

প্রথম, রপ্তানীর ক্ষেত্রে উন্নয়নের অর্থ অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রেও অগ্রগতি—এমন না হতেও পারে। বরঞ্চ, রপ্তানীর ক্ষেত্রে উন্নয়ন অর্থনীতির একটিমাত্র কৃষিজাত পণ্যভিত্তিক প্রকৃতিকে বজায় এমন কি তাকে আরও তীব্র করে তুলতে পারে। এই ধরনের ব্যাপার উন্নয়নশীল দেশগুলিতে

সাধারণত ঘটে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সৌদী আরব এবং কুবাইতের উল্লেখ করা যায়। উভয় দেশেই তৈল আহরণ-শিল্পের অগ্রগতি ব্যাপক অর্থনৈতিক জোয়ারের সৃষ্টি করেনি। দুটি দেশেই রপ্তানীর জন্যই তৈল আহরিত হয়।

রপ্তানীর ক্ষেত্রে অগ্রগতি যদি রপ্তানীর সঙ্গে যুক্ত নয়—অর্থনীতির এমন সব ক্ষেত্রের অগ্রগতিতে কিছুটা সহায়ক হয়ও, তাহলেও শ্রমের বর্তমান আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী বিভাগের আমলে তাকে দেশের সাধারণ অর্থনৈতিক অগ্রগতির নির্ভরযোগ্য ভিত্তি বলে গণ্য করা যায় না। এক্ষেত্রে আফ্রিকার অন্যতম "সমৃদ্ধিশালী" দেশ আইভরি কোস্ট দৃষ্টান্তস্বরূপ। সেখানে প্রায় এক লক্ষ টন "বাড়তি" কফি দুনিয়ার বাজারে বিক্রি করা গেল না বলে পুড়িয়ে ফেলা হলো। আইভরি কোস্টের অর্থনৈতিক "জোয়ারের" অন্যতম ভিত্তি হলো কফি উৎপাদন এবং সম্প্রতিকাল পর্যন্ত কফিই ছিল সে-দেশের মোট অধিবাসীর প্রায় অর্ধাংশের আয়ের প্রধান উৎস। এই অবস্থায় এই বিশেষ পথের অভিমুখী হওয়া কতটা বিপজ্জনক তা সহজেই বুঝতে পারা যায়।

দ্বিতীয়ত, বিদেশী পুঁজির দিকে (রপ্তানীর ক্ষেত্রে যে-পুঁজির প্রাধান্য, সেই পুঁজি সহ) ঝোঁকার ফলে দেখা দেয় বিদেশী লগ্নি থেকে প্রাপ্ত মুনাফার প্রবাহের সমস্যা। এ-কথা স্মরণ রাখা ভালো যে, সম্প্রতি কয়েক বছরে মার্কিন একচেটিয়া পুঁজিপতিরা লাতিন আমেরিকায় তাদের লগ্নিকৃত অর্থের অনেক বেশি পরিমাণ অর্থ মুনাফা ও সুদের আকারে আদায় করে নিয়েছে। অর্থাৎ স্পষ্টতই নতুন পুঁজি-প্রাপ্তির দিকটা এখানে শূন্য।

তৃতীয়ত, ব্যক্তিগত বিদেশী লগ্নি এমন সব ক্ষেত্রে করা হয়—যেসব ক্ষেত্রে মুনাফা পাওয়া যায় সবচেয়ে বেশি। কিন্তু দেশের উন্নয়ন কর্মসূচীতে এইসব ক্ষেত্রের স্থান থাকে না বললেই চলে। প্রকৃতপক্ষে, বেকার সমস্যা সমাধানে কিছুটা সাহায্য করা ছাড়া উন্নয়ন কর্মসূচীর সঙ্গে এদের কোনো সম্পর্কই থাকে না। বেকার সমস্যা অনুন্নত দেশগুলির একটি সাধারণ সমস্যা। বিদেশী কোম্পানিগুলি স্থানীয় অধিবাসীদের নিয়োগ করে কিছুটা পরিমাণে এই সমস্যা সমাধানে সাহায্য করে। আবার উন্নয়নশীল দেশগুলি পুঁজিবাদী দেশগুলির কাছ থেকে যেসব সরকারী ঋণ ও জিনিসপত্র কেনার জন্য টাকা পায়—তা সবসময়েই গ্রহীতা দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা

করে না। সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যয়ের জন্য নির্দিষ্ট থাকায় ১৯৬৬ সনে মার্কিন সরকারের সাহায্যের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ (৩ শত ৪০ কোটি ডলারের মধ্যে প্রায় ১০০ কোটি ডলার) তৃতীয় দুনিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়নে কিছুমাত্র সাহায্য করেনি। এ-ছাড়া মনে রাখতে হবে যে, যেসব দেশ সাহায্য দেয়, তাদের নিছক অর্থনৈতিক সাহায্যও প্রায়শই সেইসব দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের রপ্তানীর ভরতুকি বাবদ দেওয়া টাকা ছাড়া কিছুই নয়।

চতুর্থত, উন্নয়নের এই ধরনের পুঁজিবাদী পথ অনুসরণের ফলে সদ্য-স্বাধীন দেশগুলির শ্রমজীবী জনগণ কার্যত কিছুই পায় না এবং এই কারণে সরকারী কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্দীপনা সৃষ্টি হয় না। এই প্রসঙ্গে প্রগতিশীল ফরাসী সাংবাদিক জে· সুরেত-কানালের বিবৃতি উল্লেখযোগ্য! তিনি সঙ্গতভাবেই লক্ষ্য করেছেন যে, তৈল কোম্পানিসমূহের মুনাফা ধরে ভেনেজুয়েলায় মাথাপিছু আয়বৃদ্ধির যে-হিসাব দেওয়া হয়, জনসাধারণের প্রকৃত আয়ের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কই নেই।

উল্লিখিত তথ্যগুলি থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় যে, যেসব নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র "অগ্রগতির" এ-পথ বেছে নিয়েছে, সেইসব দেশে যদি পুঁজিবাদ বিকাশ লাভ করেও—তা হলেও সেইসব দেশে জাতীয় পুঁজির তথা জাতীয় অর্থনীতির বিকাশলাভের কথা বলা সম্ভব নয় বললেই চলে। অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে যে, এ-ধরনের পুঁজিবাদী পথ বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন ঘটাতে অক্ষম। এ-কাঠামোর আমূল পরিবর্তনই হলো এই সব দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা দূরীকরণের প্রধান শর্ত। প্রচলিত নির্দেশক-গুলি বিচার করলে দেখা যাবে যে, মেকসিকো গতিশীল অর্থনীতি সমন্বিত একটি "গড়-উন্নয়ন"-এর দেশ বলে বিবেচিত হতে পারে। মেকসিকোর মোট উৎপাদনের বার্ষিক বৃদ্ধি হার হলো ছয় শতাংশের বেশি। সমগ্রভাবে তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিকে ধরলে অনুরূপ বিচারে এই হার অনেক বেশি। মেকসিকোর মোট উৎপাদনের ৫৮ শতাংশ হলো শিল্পের ক্ষেত্রে এবং এই শিল্পের ৪০ শতাংশই হলো কাঁচামাল ব্যবহারোপযোগী করার শিল্প (Processing Industry)। অন্যান্য নির্দেশকেরও উল্লেখ করা উচিত। মেকসিকোর প্রধান প্রধান শিল্প পরিচালিত হয় মার্কিন বাজারের দিকে দৃষ্টি রেখে, দেশের বাজারের দিকে নয়। মোট জাতীয় উৎপাদনের মাত্র দশ শতাংশ রাষ্ট্রায়াত্ত শিল্পগুলিতে উৎপন্ন হয়। কিন্তু মেকসিকোর লগ্নিকৃত পুঁজির এক-তৃতীয়াংশ খাটে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে।

বিদেশী একচেটিয়া পুঁজিপতিদের ছত্রছায়ায় "সমৃদ্ধ হয়ে ওঠা" তৃতীয় দুনিয়ার বহু দেশেই মূলত এই হলো পরিস্থিতি। তাইওয়ানের কথা ধরুন। গত ১৬ বছরে তাইওয়ান মার্কিন সাহায্য হিসাবে পেয়েছে ৪ শত কোটি ডলারের মতো। অথবা ধরুন আইভরি কোস্টের কথা। এই দেশটি হলো পুঁজিবাদী আফ্রিকার একটি শো-কেস। এই দেশটির সর্বমোট জাতীয় উৎপাদনের মাথাপিছু পরিমাণের দিক (মূল্যের হিসাবে — অঃ) থেকে আফ্রিকায় অন্যতম প্রথম স্থান (১৯৬৬ সনে ২৬৭ ডলার। এর সঙ্গে তুলনীয়ঃ আলজেরিয়া — ২২১ ডলার, ক্যামেরুন—১৪৯ ডলার, কেনিয়া—১১৯ ডলার এবং উত্তর ভোল্টা —৪৮ ডলার) অধিকার করেছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য টাকা জোগানোর ব্যাপারে যেসব দেশ ব্যক্তিগত বিদেশী লগ্নিকেই প্রধান উৎস বলে মনে করে —এমন যে-কোনো দেশের তুলনাতেও আইভরি কোস্ট এ-ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় দেশগুলির অন্যতম। এসব দেশের প্রত্যেকটির সম্বন্ধেই "উন্নয়ন ব্যতিরেকেই বৃদ্ধি" এই কথা স্বাভাবিক ভাবেই বলা যায়, কারণ এসব দেশের বৃদ্ধি নিছক পরিমাণগত। বাইরের শক্তিসমূহের সমর্থনে এই বৃদ্ধি ঘটে এবং এর ফলে অর্থনীতির স্বতন্ত্র ক্ষেত্রগুলির বিচ্ছিন্নতা দূর করে নিজস্ব ভিত্তিতে পুনরুৎপাদন সুনিশ্চিত করতে সমর্থ কোনো অখণ্ড অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার মতো কাঠামোগত পরিবর্তন সাধিত হয় না।

বলাবাহুল্য মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা বিদেশী বলেই বিদেশী লগ্নিকে বাতিল করে দেয় না। কোনো কোনো অবস্থায় (রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা এবং বিদেশী লগ্নি বিনিয়োগের ক্ষেত্রগুলি সুনির্দিষ্ট সীমার মধ্যে রাখা) বিদেশী লগ্নি নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়নে সার্থক ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা যেসব দাওয়াই বাতলান—স্বভাবতই সেগুলিতে এইসব শর্তের উল্লেখ থাকে না। আর, অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, পুঁজিবাদী পথ অনুসরণকারী দেশগুলির সরকাররা কখনও এসব শর্ত বলবৎ করেন না।

সবশেষে আলোচ্য হলো তাত্ত্বিক দিক থেকে সম্ভব তৃতীয় ধরনের পন্থা। এই পন্থায় "মিশ্র অর্থনীতি"র ভিত্তিতে উন্নয়নের কথা ধরে নেওয়া হয়। "মিশ্র অর্থনীতি" রাষ্ট্রায়ত্ত ও ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ক্ষেত্রগুলিকে যুক্ত করে। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় এই পথে একটা দেশ তার নির্দিষ্ট সম্ভাবনাগুলিকে বেছে নিতে পারে, কিন্তু এই দেশের ভবিষ্যতের পক্ষে এই পথে যথেষ্ট বিপদ থাকে।

সরকারী কর্মসূচি রূপায়ণে বাধা দেওয়া জাতীয় ধনিকশ্রেণীর স্বার্থ হতে পারে এমন কি যদি এতে তাদের আর্থিক সুবিধা হয় তা হলেও। উন্নয়নের এই পন্থা অনুসরণের চেষ্টা এই শতকের চতুর্থ দশকের মাঝামাঝি সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের সরকার করেছিলেন, কিন্তু সরকারী কর্মসূচিতে রেখায়িত অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করায় ধনিকশ্রেণীর স্পষ্ট অনিচ্ছা সরকারকে এই পন্থা ত্যাগ করতে বাধ্য করে।

এছাড়া প্রথম দুটির ন্যায় তৃতীয় ধরনের পন্থাও অর্থনৈতিক পরিবর্তন সাধনে জনগণের সক্রিয় অংশ গ্রহণ সুনিশ্চিত করে না এবং জনগণের অবস্থারও কোনো উন্নতি ঘটায় না।

শুধু পরিমাণগত নির্দেশকগুলি বিশ্লেষণ করলেই পরিষ্কার বোঝা যায় যে, পুঁজিবাদী পন্থা বিশেষভাবে কার্যকর হবে এমন কোনো কারণ নেই। তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির অর্থনৈতিক বৃদ্ধি-হার লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, সম্প্রতি কয়েক বছরে বৃদ্ধি-হার পড়ে যাওয়ার প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই সব দেশের মোট উৎপাদনের বার্ষিক বৃদ্ধি-হার ১৯৫০-৫৫ সনে যেখানে ছিল ৪·৯ শতাংশ, ১৯৬০-৬৬ সনে তা হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৪·৪ শতাংশ। ১৯৬৭ সনে বৃদ্ধি-হার আরও পড়ে গেছে। এ-সময়ের মধ্যে দেশের মোট উৎপাদনের বার্ষিক বৃদ্ধি-হার অধিবাসীদের মাথাপিছু ২·৮ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২ শতাংশ দাঁড়িয়েছে।

উন্নয়ণশীল দেশগুলিতে উন্নয়নের পুঁজিবাদী পথের তিনটি সম্ভাব্য ধরনের কোনোটিই কার্যকর প্রমাণিত হয়নি। পক্ষান্তরে, এ-তিনটি ধরনই প্রমাণ করেছে যে, পুঁজিবাদ এইসব দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি সমাধানে অক্ষম। কমিউনিস্ট এবং ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বলা হয়েছে, "যে-সমস্ত দেশ পুঁজিবাদী পথ অনুসরণ করেছে—তারা তাদের যে-সমস্ত প্রধান প্রধান সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে তার একটিও সমাধান করতে পারেনি।"

উন্নয়নের সমাজতান্ত্রিক পথ অথবা আরও সঠিকভাবে যাকে বলা যায় সমাজতন্ত্রাভিমুখী পথ নিঃসন্দেহে অধিকতর কার্যকর। সমাজতন্ত্রের অভিমুখে পরিচালিত উন্নয়নের কাজ জনসাধারণের ব্যাপক অংশকে অধিকতর সক্রিয় করে তুলতে সাহায্য করে, কারণ জনগণ অনুভব করে যে, তারাই তাদের দেশের মালিক। এই ধরনের উন্নয়নের ফলে দ্রুত সম্পদসমূহ সমাবেশ করা এবং এই

সব সম্পদ নির্ধারক ক্ষেত্রগুলিতে কাজে লাগানো সম্ভব হয়। আর নির্ধারক ক্ষেত্রগুলির অগ্রগতি ধারা-প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, অর্থাৎ অন্যান্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। সবশেষে অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে যে, সমাজ-তান্ত্রিক পথ কৃষিসমস্যার সমাধান করে বর্তমান উৎপাদিকা শক্তিগুলিকে মুক্তি দেয়।

মঙ্গোলিয়ার জনপ্রজাতন্ত্র এবং ভিয়েতনামের গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের অগ্রগতির বিশ্লেষণ সুস্পষ্টভাবে সমাজতান্ত্রিক পথের সুবিধাগুলি দেখিয়ে দেয়। এই দুই দেশে যে-গুরুত্বপূর্ণ কাঠামোগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, তার ফলে একটিমাত্র পণ্যভিত্তিক অর্থনীতিসম্পন্ন অনগ্রসর কৃষিপ্রধান দুটি দেশ বিবিধ পণ্যভিত্তিক অর্থনীতিসম্পন্ন কৃষি ও শিল্পে সমভাবে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। শান্তি-কালীন নির্মাণকার্যের দশ বছরে (১৯৫৫-১৯৬৪) গণতান্ত্রিক ভিয়েতনাম প্রজাতন্ত্রে শিল্পসংস্থার সংখ্যা ৪০ থেকে বেড়ে ১,০১৪ দাঁড়ায়। ধাতু, যন্ত্রনির্মাণ ও রসায়ণ শিল্পের মতো শিল্পসমূহ স্থাপিত হয়েছে। মার্কিন আগ্রাসনের আগে ভিয়েতনামের মোট উৎপাদনের প্রায় ৫০ শতাংশই ছিল শিল্পজাত। মঙ্গোলিয়াতেও মোট উৎপাদনের অর্ধেকেরও বেশি শিল্পজাত। 'তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার কালে (১৯৬১-১৯৬৫) মঙ্গোলিয়ার মোট উৎপাদন বেড়েছিল ৩০ শতাংশ। ১৯৫০ সনের তুলনায় মঙ্গোলিয়ায় শিল্পোৎপাদন ১২ গুণ বৃদ্ধি পায়। গত কয়েক বছরে গড় বার্ষিক বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ১০·৫ শতাংশ। ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৪ এই সাত বছরে ভিয়েতনাম প্রজাতন্ত্রের শিল্পোৎপাদন তিন গুণ বৃদ্ধি পায়। এই সব দেশে শিল্প ও কৃষির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের আয় বেড়েছে এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে।

উন্নয়নশীল দেশগুলির পক্ষে সমাজতন্ত্র অনুপযোগী—এ-কথা প্রমাণের জন্য বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের চেষ্টা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা সাম্রাজ্য-বাদের তাত্ত্বিকদের বহুপ্রচারিত "ত্যাগস্বীকার তত্ত্ব"টিকে উপেক্ষা করতে পারি না। সমাজতান্ত্রিক পথ যদি দ্রুততর অর্থনৈতিক উন্নয়ন সুনিশ্চয় করে, এমন কি কোনো না কোনো স্তরে যদি জনসাধারণের জীবনযাত্রা উন্নতও করে, তবু তার জন্য অন্ততপক্ষে এক বা এমনকি একাধিক পুরুষের মানুষকে "বলি দিতে হবে" — উক্ত তত্ত্বের মূলে আছে এই বক্তব্য। বোর্দো বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষ্ণ আফ্রিকা গবেষণা কেন্দ্রের এ· তোলান্দের মতে "সমাজতন্ত্র গড়ে তুলতে হলে আগে থেকে ধরে নিতে হয় যে, পরবর্তী পুরুষগুলির মানুষের অবস্থার উন্নতির

জন্য ইচ্ছাকৃতভাবেই বহু পুরুষের মানুষকে বলি দিতে হবে।” শিল্পায়ন ও কৃষির যৌথকরণের যুগে “বঞ্চিত ও দুর্গত” সোভিয়েত জনগণের মর্মন্তুদ চিত্র তুলে ধরে তাঁদের বক্তব্যকে জোরদার করে ডব্লিউ. হ্যাটার, এল. শানিরো, সি. ক্লার্ক এবং অন্যান্য মার্কিন অর্থনীতিবিদরা একই মনোভাব প্রকাশ করেছেন।

গবেষণাপ্রসূত এই বক্তব্যের উদ্দেশ্য স্পষ্ট। সদ্যস্বাধীন রাষ্ট্রগুলির জাতিসমূহের উপর সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সাফল্যের প্রভাব হ্রাস করা এবং জীবনযাত্রার মানের দ্রুত উন্নতির সঙ্গে সমাজতন্ত্র গঠনকে মেলানো যায় না এই ধারণা তাদের নেতাদের মনে ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টাই হলো এই বক্তব্যের উদ্দেশ্য। তৃতীয় দুনিয়ার প্রায় সমস্ত নেতাই জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের ব্যবস্থাসমূহ তাঁদের উন্নয়ন কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করায় (প্রধানত ব্যক্তিগত ভোগের বৃদ্ধি) পুঁজিবাদের সমর্থকরা মনে করেন যে তাঁদের যুক্তি একেবারে মোক্ষম। সমাজতন্ত্র যদি ভোগের দ্রুত বৃদ্ধি ঘটাতে না পেরে বরং তা কম বেশি দূর ভবিষ্যৎ পর্যন্ত মুলতবী রাখে, তা হলে সমাজতন্ত্র অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে অনুপযোগী—বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। সমালোচনার সামনে তাঁদের যুক্তি টিকবে না। একথা ঠিক যে, সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার সময় সোভিয়েত জনগণকে বিপুল বাধাবিপত্তি অতিক্রম ও ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। কিন্তু এই বাধাবিপত্তি ও ত্যাগ স্বীকারের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের কোনো সম্পর্ক নেই। আধুনিক অর্থনীতি গড়ে তোলার সময় যে কোনো দেশ প্রয়োজনীয় ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য কিছুকালের নিমিত্ত ব্যক্তিগত ভোগ সীমাবদ্ধ রাখতে বাধ্য হয়। আজ যেসব দেশ অত্যন্ত পুঁজিবাদী দেশ হিসাবে গণ্য, শিল্পায়নের সময় সেই সব দেশের শ্রমজীবী জনগণকে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় অনেক বেশি দুঃখকষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা স্বভাবতই এ-কথা স্মরণ করা পছন্দ করেন না। ব্রিটেনের শিল্পায়নকাল ইংরেজ শ্রমিকদের কী মূল্য দিতে হয়েছিল এবং কিভাবে দিতে হয়েছিল তার বিবরণ সেই সময়কার বহু সরকারী দলিলে সবিস্তারে দেওয়া হয়েছে এবং মার্কস তাঁর ‘ক্যাপিটাল’ গ্রন্থে সেগুলি উদ্ধৃত করেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দুঃখকষ্টের বোঝা বইতে হয়েছে লক্ষ লক্ষ বহিরাগত ও অ-শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীদের। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের শিল্পায়নে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে টাকা জোগানো হয়েছে উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলিকে লুণ্ঠন করে। অবশ্য এই তথ্য নিয়ে আলোচনা আমরা এখানে করছি না।

সদ্য-স্বাধীন জাতিগুলির কল্যাণের জন্য যাঁদের “চোখে ঘুম নেই”, সেই বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা যেসব চক্রের স্বার্থ রক্ষা করছেন—সেই চক্রগুলি যদি বাধা না দিত, তা হলে সোভিয়েত জনগণের বাধাবিপত্তি অনেক কম হত। যেখানে কিছু ছিল না, সেখানে আমাদের জনগণ অর্থনীতি গড়তে শুরু করে।

সামরিক হস্তক্ষেপ, বাণিজ্যে বৈষম্য, অর্থনৈতিক অবরোধ প্রভৃতি ক্রমাগত তাদের চেষ্টায় বাধা দেয়। অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে (যদিও তারা তাদের নতুন অর্থনীতি গড়ে তোলে ঠাণ্ডাযুদ্ধের কালে) যে, আরো স্বাভাবিক অবস্থায় যেসব জাতি সমাজতান্ত্রিক পথ অনুসরণ করে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ও ভ্রাতৃপ্রতিম দেশগুলির সাহায্যের উপর নির্ভর করে, তারা সোভিয়েত জনগণের ভাগ্যে যেসব বাধাবিপত্তি ঘটেছিল তার অনেকগুলিই এড়াতে পারে।

সোভিয়েত জনগণ "ত্যাগস্বীকার" করেছে প্রধানত একটিমাত্র ক্ষেত্রে, ভোগ্যপণ্যের অভাবের জন্য ভোগ্যপণ্যের ক্ষেত্রে। বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা এই তথ্যটিকে উপেক্ষা করে থাকেন। এই ভোগ্যপণ্যের ক্ষেত্রেও যা পাওয়া যেত তা জনসাধারণের সমস্ত অংশের মধ্যে সমভাবে বণ্টন করা হতো, পুঁজিবাদী দেশগুলিতে এমনটি করা হয় না। অন্যান্য যেসব ক্ষেত্র বহুল পরিমাণে জীবন-যাত্রার মান নির্ধারণ করে, সেসব ক্ষেত্রে কোনো "ত্যাগস্বীকার" করতে হয়নি। পক্ষান্তরে, অতি সমৃদ্ধিশালী পুঁজিবাদী দেশগুলির জনসাধারণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের কাছে যেসব সুবিধা পুরোপুরি অপ্রাপ্য ছিল, সোভিয়েত শাসনের একেবারে গোড়ার দিক থেকেই শ্রমজীবী জনগণ সেগুলি ভোগ করছে। দিনে আটঘণ্টা কাজের ব্যবস্থা চালু হয় এবং পরে তা কমিয়ে সাত ঘণ্টা করা হয়। বিনা পয়সায় শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় এবং উন্নত ও অনুন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির অভিশাপ প্রকাশ্য ও গোপন বেকারী স্বল্পকালের মধ্যে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়।

আধুনিক শিল্পপ্রধান পুঁজিবাদী দেশগুলির চাইতে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের "ত্যাগস্বীকার"-এর কাল অনেক কম ছিল। যুদ্ধ বাদ দিলে এই কাল আট বছর (১৯২৯-১৯৩৬) স্থায়ী হয়। উদাহরণস্বরূপে বলা যায় যে, ইংলণ্ডে মোটামুটি কয়েক শতাব্দী একটানা সংগ্রাম চালাবার পর তবে শ্রমিকরা মোটামুটি বাঁচবার মতো জীবনযাত্রার মান আদায় করতে পেরেছিল।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, উন্নয়নশীল দেশগুলির জাতিসমূহের পক্ষে সমাজতান্ত্রিক পথ অসম্ভব বা অসুবিধাজনক—একথা প্রমাণ করার জন্য বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের বাজে উপায় অবলম্বন করতে হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদের তাত্ত্বিকেরা যে-কৌশলই খাটান না কেন, নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রগুলি ও তাদের নেতারা বুঝতে শুরু করেছেন যে যাত্রার তফাৎ থাকলেও লেনিন যে-পথের ইঙ্গিত দিয়েছেন সেই পথই হলো অগ্রগতির সবচেয়ে কার্যকর পথ, বহু দেশের পক্ষে একমাত্র পথ।

অনুবাদক : সুকুমার মিত্র

'ভোপ্রোসি একোনোমিকি' পত্রিকায় ১৯৬৯ সনের ১০ম সংখ্যায় রুশ ভাষায় প্রকাশিত প্রবন্ধের ইংরাজী অনুবাদের সামান্য সংক্ষেপিত বাঙলা অনুবাদ।

লেনিনের জীবনাবসানে ভারতীয় পত্র-পত্রিকাদির প্রতিক্রিয়া

শঙ্কর রায়

"মিত্রশক্তি বরাবর বলশেভিজম এবং ইহার নেতার কলঙ্ক রটনা করিবার চেষ্টা করিয়াছে। লোকের চক্ষে লেনিনকে রক্তপিপাসু নররাক্ষস বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টাও বড় কম হয় নাই। ইহারা লোককে বুঝাইতে চাহিয়াছে যে লেনিন মানব-শত্রু এবং মিত্রশক্তিই একমাত্র মানবমিত্র। কিন্তু এত চেষ্টা করিয়াও এই মহামানবের অনিষ্ট মিত্রশক্তি করিতে পারে নাই। লেনিনের চরিত্রগুণে এবং প্রতিভাশিখায় সকল কলঙ্ক-কথা পুড়িয়া ছাই হইয়া গেছে। লেনিন ছিলেন গরীবদের মানুষ, তাহাদের দুঃখ তিনি নিজের দুঃখের মতো অনুভব করিতেন, একজন মানুষ দুঃখী থাকিবে এবং আর একজন সেই সময় সুখী হইবে, মহাপ্রাণ লেনিন ইহা কল্পনাও করিতে পারিতেন না। পৃথিবীর দুঃখের এবং সুখের বোঝার ভার সকল মানুষকে সমানভাবে বহন করিতে হইবে এই ছিল লেনিনের মত।

"....সোভিয়েট শাসনতন্ত্রের স্রষ্টা, ভাবুক দার্শনিক ও কর্মযোগী লেনিনের দেহাবসান ঘটিয়াছে।....

"....যেমন রাষ্ট্র পরিচালনায় তাঁহার বজ্রের ন্যায় কঠোর মন ছিল, অপর দিকে তেমনই ছিল রুশিয়ার কৃষাণকুলের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি তাঁহার কুসুমকোমল ভরন্ত প্রাণের সহানুভূতি। রুশিয়ার নিপীড়িত কৃষাণকুলের সুপ্ত মনুষ্যত্বকে জাগাইয়া তুলিয়া রুশ জাতিকে নূতন যুগের প্রবর্তক ও চালকরূপে প্রতিষ্ঠিত করাই ইঁহার জীবনের ব্রত ছিল....

"....লেনিনকে বিশেষভাবে জানিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন রুশ ঔপন্যাসিক ম্যাক্সিম গর্কি। গর্কি বলেন যে, 'বর্তমান যুগে লেনিনের মধ্যেই সর্বাপেক্ষা অধিকমাত্রায় মনুষ্যত্ব বিকশিত হইয়াছে। সমস্ত মনুষ্যগুণ তাঁহার মধ্যে যেরূপ প্রস্ফুটিত হইয়াছে এমনটি আর পাওয়া যায় না।'....

"....দেশের স্বার্থই লেনিনের স্বার্থ ছিল—তাঁহার স্বতন্ত্র কোনো স্বার্থ ছিল না। **কতকগুলি ইংরেজ ও আমেরিকান কাগজ লেনিনের সম্বন্ধে কিছু-না-কিছু কুৎসা রটনা না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। তাহাদের কাজই ছিল কিসে বলশেভিজম্‌কে পৃথিবীর কাছে হেয় করা যায়—কিন্তু এত করিয়াও তাহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে।"** (হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়, 'লেনিন', 'আত্মশক্তি' ২ এপ্রিল ১৯২৪। 'প্রবাসী' থেকে পুনর্মুদ্রিত ঃ বড় হরফ আমার)

লেনিনের জীবনাবসানের আগে অন্তত দুবার রয়টার লেনিনকে মৃত বলে ঘোষণা করেছিল। লেনিনের মৃত্যু যখন সত্যই ঘটল, তখন অনেকেই বিশ্বাস করেনি। 'আত্মশক্তি' পত্রিকায় লেখা হলো যে, লণ্ডনে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গিয়েছে—"বিশ্ববিখ্যাত নিকোলাই লেনিন" মারা গিয়েছেন। সে-সময় লেনিনের পরিচিতি ছিল নিকোলাই লেনিন হিসেবে, ছদ্মনামে লেখার প্রথম পর্বে তিনি এই নামই গ্রহণ করেছিলেন।

লেনিন ও বিপ্লবোত্তর সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে বুর্জোয়াচক্র কুৎসা রটনায় কখনো ক্ষান্ত হয়নি। কিন্তু ভারতবর্ষের তৎকালীন পত্র-পত্রিকাদির (অবশ্য 'ইংলিশম্যান,' 'স্টেটসম্যান' প্রভৃতি বাদ দিয়ে) এতে কখনো প্রত্যয় জন্মায়নি, বরং সেগুলি অসত্য প্রমাণ হয়েছে বারেবারেই। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' সম্পাদকীয় স্তম্ভে ২৫ জানুয়ারি ১৯২৪-এ লিখলেন—

"The death of Lenin, which we believe has at last really taken place, removes one of the most outstanding personalities of modern times. Probably no one has been more greatly misrepresented and misunderstood by his contemporaries than this dominating figure of colossal influence in Soviet Russia. After what all has been said and done, when the dust of controversy and the shock of surprise will disappear, and the history of modern world will be impartially written, Lenin will come to be regarded as one of those men who, in spite of his shortcomings, made a most remarkable attempt to reconstruct society on the basis of communism. The experiment was novel but it was calculated, as pointed out by a prominent Bolshevist the other day, to destroy the whole fabric of society based on capitalistic system.

"Vested interests of the world were, therefore, naturally alarmed by this experiment and the whole capitalistic Europe rose against him, but be it said to the credit of this wonderful man, that nothing could daunt him and that by a combination of astounding power of organisation and resourcefulness he made the Red Army, the revolutionary messenger of the new cult of socialism, a formidable power in Europe. It will serve no usefule purpose today to discuss how far his ideal was practicable and how far in the pursuit of this ideal he had to adopt means which was the negation of all human freedom. But suffice it to say that the seeds of revolution which he had left broadcast over the world today shall never be easily destroyed. May the soul of this extraordinary personality rest in peace."

"এখন আমাদের মনে হচ্ছে, অবশেষে সত্যিই লেনিনের মৃত্যু হয়েছে। এই মৃত্যু আধুনিককালের একজন দিকপাল ব্যক্তিকে আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিল। সোভিয়েত রাশিয়ার এই বিপুল প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের মতো আর কাউকে সম্ভবত তাঁরই সমসাময়িকদের কাছে এতখানি অধিকমাত্রায় ভ্রান্তভাবে চিত্রিত ও ব্যাখ্যাত হতে আর দেখা যায়নি। তাঁর সম্পর্কে যা বলা হয়েছে বা করা হয়েছে—সে-সব কিছু অবসিত হবার পর, যখন বিতর্কের ধুলো আর বিস্ময়ের ধাক্কা মিলিয়ে যাবে, যখন নিরপেক্ষভাবে আধুনিক দুনিয়ার ইতিহাস লেখা হবে, লেনিনের সব কিছু ত্রুটি সত্ত্বেও তখন বলা হবে, যাঁরা কমিউনিজমের ভিত্তিতে সমাজ পুনর্গঠন করতে লক্ষণীয় প্রয়াস পেয়েছেন, তিনি তাঁদেরই অন্যতম। জনৈক বিশিষ্ট বলশেভিক সম্প্রতি বলেছেন, মূলধনতন্ত্রের উপরে নির্মিত গোটা সমাজব্যবস্থা চূর্ণ করার সেই পরীক্ষাটি একেবারে নতুন ধরনের, কিন্তু তা গণিতের মতোই গণনাবিধৃত।

"তাই দুনিয়ার কায়েমী স্বার্থ স্বাভাবিক কারণেই এ-পরীক্ষায় সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল, সমস্ত মূলধনতান্ত্রিক ইউরোপ তাঁর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। তবু এই বিস্ময় জাগানো মানুষটির স্বপক্ষে বলতে হবে, কোনো কিছুই তাঁকে দমাতে পারেনি। বিস্ময়কর সাংগঠনিক ক্ষমতা ও সৃজনশীলতার সংমিশ্রণে তিনি রূপ দিলেন ইউরোপের এক মহাশক্তিধর বাহিনী, সমাজতন্ত্রবাদের বিপ্লবী বার্তাবহ লালফৌজকে। তাঁর আদর্শ কতখানি বাস্তবানুগ ছিল কিংবা আদর্শ

সম্পাদনে সমস্ত প্রকার স্বাধীনতা খর্বকারী পন্থা কী তাঁকে নিতে হয়েছিল তা আজ আর ভেবে লাভ নেই। তবে এটুকু বলাই তো যথেষ্ট যে, সারা বিশ্বে তিনি যে-বিপ্লবের বীজ ছড়িয়ে রেখে গেলেন, সে-বীজ সহজে ধ্বংস হবার নয়। এই অসামান্য ব্যক্তিত্বের আত্মা শান্তিলাভ করুক, এই আমাদের কামনা।"

লেনিনের মৃত্যু সকলের কাছে বিশ্বাসযোগ্য ছিল না। কেননা, সচেতন দেশবাসী জানতেন যে, লেনিন-বিরোধী অপপ্রচার ও মিথ্যা রটনা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র-লক্ষণ। প্রথম সম্পাদকীয় লিখলেন 'বম্বে ক্রনিক্‌ল্' (ডেথ রিপোর্টেড/ন্যাশনাল বিল্ডার এণ্ড লীডার কমরেড লেনিন)। তাঁরা লেনিনকে বলেছিলেন, "one of the three greatest living men of the world।" 'ট্রিবিউন' পত্রিকাও প্রথমে মৃত্যুসংবাদ প্রকাশ করেননি। সোভিয়েত সংবাদ সূত্রে সমর্থিত হওয়ার পর ২৯ জানুয়ারি তাঁরা সম্পাদকীয় লিখলেন লেনিন "piloted his country with no small success through a revolution of unprecedented magnitude।" ৩০ জানুয়ারি এস.এ. ডাঙ্গে তৎ সম্পাদিত 'সোশ্যালিস্ট' পত্রিকায় লিখলেন "The world of downtrodden and oppressed wanted him to live, to live for a hundred years, if that could be done, the world of oppressors wanted him to die, the next minute that he was Lenin....He left writing a book on revolution to work out a revolution. And he did it successfully." "(নিপীড়িত ও নিগৃহীতের পৃথিবী চেয়েছিল তিনি বাঁচুন, শতায়ু হোন, যদি তা সম্ভব হয়। অত্যাচারীদের জগৎ চেয়েছিল তিনি মুহূর্তকাল মধ্যে বিগত হোন। তিনি যে লেনিন। বিপ্লব সাধনের উপায় সম্পর্কে তিনি একটি বই লিখে গিয়েছেন। তিনি তা সফলভাবে সম্পন্ন করেও গিয়েছেন।")

সেই সংখ্যাটি ছিল 'সোশ্যালিস্ট' পত্রিকার ২য় বর্ষ ৮ম সংখ্যা। তিনি আরো লিখেছিলেন যে লেনিন "তাঁর অভ্রান্ত দৃষ্টিতে রুশ বিপ্লবের চাবিকাঠি অধিকার করেছিলেন। তিনি সোজাসুজি সৈন্য ও কিষাণদের কাছে আহ্বান জানিয়েছিলেন—এরা কাপুরুষ মধ্যবিত্ত শ্রেণীদের থেকে দূরবর্তী ছিল। তাঁদের ও সর্বহারার উদ্দেশ্য একই—একথা তিনি বোঝালেন। "পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ বিগত হলেন।" ('সোশ্যালিস্ট' পত্রিকাটি ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট আন্দোলনের এক দিকচিহ্ন। স্বয়ং লেনিন এই পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যা পড়েছিলেন।)

লেনিনের জীবনাবসানে বোম্বাই শহরে এক মহতী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বক্তাদের মধ্যে এস. এ. ডাঙ্গে ও শওকত ওসমানী ছিলেন। খবরটি দিল্লীর উর্দু দৈনিক 'হামদর্দ'-এ সেই বছর ২৯ জানুয়ারি প্রকাশিত হয়েছিল। বাঙলাদেশে 'হিন্দুস্তান', 'সুলতান', 'সচিত্র শিশির', 'বঙ্গবাণী', 'জ্যোতি' প্রভৃতি পত্রিকাও লেনিনের মৃত্যুতে শোকজ্ঞাপন করেছিলেন, এমন কি 'আনন্দবাজার পত্রিকা'ও লিখেছিলেন। ইতিপূর্বে একবার প্রকাশ পেল যে, লেনিন আর নেই। বলা বাহুল্য, লেনিনের জীবিতাবস্থায় সেইটি লেনিনের মৃত্যুসম্পর্কিত দ্বিতীয় রয়টারী আবিষ্কার। সে-তারিখটি ছিল ২১. ৭. ১৯২২। 'আনন্দবাজার' লিখলেন এ-সংবাদ সত্যি হলে, বলতে হয় বিশ্বের এক বিরাট ক্ষতি হলো। ঐ দিনই 'নায়ক' পত্রিকা লিখলেন যে, বর্তমান বিশ্বে তাঁর মতো বিদগ্ধ ও প্রতিভাসম্পন্ন দার্শনিক আর কেইবা আছে! কাজেই লেনিনের মৃত্যু বিশ্বাস করা কঠিন। বিশ্বাস হলো যখন তখন এক স্তব্ধতা চতুর্ধারে বিরাজিত। 'দৈনিক বসুমতী' লেনিনকে মহান কীর্তিমান মানুষ বলে অভিহিত করে সম্পাদকীয় লিখলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ প্রতিষ্ঠিত 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকা লিখলেন: "লেনিন ইজ অ্যালাইভ ইন দ্য হার্টস অফ ওয়ার্কার্স" অর্থাৎ মেহনতী মানুষের চিত্তে লেনিন বেঁচে আছেন। ঐ সময়ই অধ্যাপক অতুলচন্দ্র সেন 'বিপ্লব পথে রাশিয়ার রূপান্তর' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। রচনার কাজ লেনিনের জীবিতাবস্থায় শেষ হলেও বইটি প্রকাশ পেতে পেতে ফেব্রুয়ারি মাস চলে এল—তখন লেনিনের সবে মৃত্যু ঘটেছে। অধ্যাপক সেন তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছিলেন যে বুর্জোয়ারা চাইত লেনিনের মৃত্যু হোক। শ্রমিক-কিষাণ দলের শোকমূলক শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনের কথাও তিনি ঘোষণা করেছিলেন।

বাঙলাদেশে সেই সময় 'আত্মশক্তি' পত্রিকা এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। তখন নৈরাজ্যবাদ তথা সন্ত্রাসবাদ উচ্চসীমায়: যুগান্তর-অনুশীলন সংঘাত সেই সময় কমিউনিজমের দিকে প্রবণতাকে অনিবার্য করে তুলেছিল; 'আত্মশক্তি' লেনিন ও বলশেভিকবাদ সম্পর্কে অনেক লেখা পত্রস্থ করেছিল। লেনিনের মৃত্যুর পর 'আত্মশক্তি'তে নাতিদীর্ঘ কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। বস্তুত, বুদ্ধিজীবী ও বিপ্লবী মহলে কমিউনিজমের প্রসারের এক সুমহান দায়িত্বপালন করেছিল 'আত্মশক্তি'—কেননা, ঐ পত্রিকার প্রেরণাস্থল ছিলেন ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন। হিন্দি ও উর্দু পত্রপত্রিকার মধ্যে 'দেশভক্ত', 'উৎস', 'বর্তমান', 'আজ',

'মেদিনা' 'মজতুর' প্রভৃতিতে লেনিন-স্মৃতি চয়ন করা হয়েছিল। 'বর্তমান' পত্রিকা লেনিনকে পীড়িতের ভগবান বলে অভিহিত করেছিল; 'উৎস' বলেছিল লেনিনের হৃদয়ে ভারতবর্ষের একটা স্থান রয়েছে এবং "লেনিনের বিরুদ্ধে প্রচার আসলে ভারতবাসীদের অজ্ঞতার সুযোগ গ্রহণ করা এবং তাঁদের বন্ধনমুক্তিতে বাধা দান করা।" কানপুর থেকে 'মজতুর'-এ একটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে লেনিনকে বেহেশ্‌ত থেকে ভারতবর্ষে নেমে এসে দরিদ্র কৃষকদের রক্ষা করতে এবং তৎকালীন আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার কায়েমী সরকারকে উৎখাত করতে আহ্বান জানানো হয়।

দক্ষিণ ভারতেও 'স্বদেশমিত্রন্' (মাদ্রাজ, ২৫ জানুয়ারি),'সম্পদ অভ্যুদয়' (মহীশূর, ২৫ জানুয়ারি), 'অন্ধ্র পত্রিকা' (মাদ্রাজ, ২৩ জানুয়ারি) প্রভৃতি পত্রিকাতে প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়েছিল। এর মধ্যে 'তামিলনাড়ু' পত্রিকার লেনিন-চয়ন উল্লেখ্য। তার এক স্থানে ছিল "লেনিন মারা গেলেও, তাঁর নীতি যে চিরদিন থাকবে এটা নিশ্চিত।"

লেনিন সম্পর্কে রচনা ও মৌলিক আলোচনা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ছড়ানো ছিটনো অবস্থায় রয়ে গেছে। সেগুলির অধিকাংশই এখন বিস্মৃতির অতল গহ্বরে। এ-সম্পর্কে বিশদ গবেষণার প্রয়োজন। নৈরাজ্যবাদ থেকে সাম্যবাদ এবং সুশৃঙ্খল ও বৈজ্ঞানিক বাস্তববাদী বামপন্থী আন্দোলনের উত্তরণ পর্যায়ের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে জানতে গেলে এইসব পত্রপত্রিকা পঠন-পাঠনের প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

এ-সম্পর্কে দু-তিনটি রচনার উদ্ধৃতি দিচ্ছি। সেকালের একটি বিখ্যাত পত্রিকা 'লেবার কিষাণ গেজেট।' মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত পত্রিকাটি সম্পাদনা করতেন খ্যাতনামা শ্রমিক নেতা ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ এম. সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ার। গেজেটে এক টেলিগ্রাম ছাপা হলো। তাতে হিন্দুস্তান লেবার কিষাণ পার্টি থেকে সমস্ত আঞ্চলিক সংস্থাগুলিকে ৩১ জানুয়ারি অবধি 'লেনিন শোক সপ্তাহ'রূপে পালনের নির্দেশ জারী করা হয়: "Labour Kisan Central Committee requests all its provincial workers' organisations to observe the week ending 31st January as days of mourning for the death of Comrade Nicolai Lenin, Chairman of the Federated Soviet Republic of Russian workers. In his death, the world workers lost their great teacher and redeemer. Headquarters flying black flags halfmast." ("মজুর-কিষাণ কেন্দ্রীয়

কমিটি সমস্ত প্রাদেশিক শ্রমিক সংস্থাকে রুশ শ্রমিকদের সোভিয়েট সাধারণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ারম্যান কমরেড নিকোলাই লেনিনের মৃত্যুতে ৩১ জানুয়ারি অবধি শোকসপ্তাহ পালনের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছে। তাঁর মৃত্যুতে বিশ্বের মেহনতী মানুষেরা তাদের মহান শিক্ষক ও পরিত্রাতাকে হারাল। কেন্দ্রীয় দপ্তরে কৃষ্ণ পতাকা অর্ধনমিত থাকবে।") সেই সঙ্গে একটি শোকলিপি ছাপা হয়, যার প্রণেতা ছিলেন স্বয়ং সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ার, তার বঙ্গানুবাদ (অংশ বিশেষ) এখানে সন্নিবেশিত হলো: "মহান লেনিন চলে গেলেন····পৃথিবী, মেহনতী মানুষের পৃথিবী আজ তার শিক্ষক ও পরিত্রাতার প্রস্থানে নিঃস্বতর····।

"মানুষের দুঃখ মোচনে যেসব সন্তান জন্মেছেন, তাঁদের মধ্যে নিকোলাই লেনিন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর নীতি-অনুসরণ নির্ভর করছে মেহনতী মানুষের উপর।··· নিকোলাই লেনিন দেখেছিলেন যে প্রকৃত "হেতু" বা কারণ স্বল্প সংখ্যক লোকের হাতে বহুজনের শোষণ এবং তাঁর নিজের দেশে এই সামাজিক অন্যায়কে অসম্ভব-এর পর্যায়ে নিয়ে যেতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন, রুশ শ্রমিকেরা আজ বিশ্বের শ্রমিকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুখী। এর মূলে ছিলেন সেই অক্লান্ত কর্মী যাঁর মৃত্যুতে আমরা, তাঁরই কমরেডরা, শোকজ্ঞাপন করছি।" 'লেবার কিষাণ গেজেট'-এর উপরে লেখা থাকত "দুনিয়ার মজদুর এক হও" আর ঠিক পত্রিকার নামের তলায় ছিল 'ভারতে কমিউনিজমের পাক্ষিক পত্রিকা'। এই পত্রিকার ভূমিকা ও কার্যাবলী সম্পর্কে আমরা অনেকেই জানি না। কিন্তু মুক্তি আন্দোলনের সেই পর্বে এই পত্রিকার প্রভাবসৃষ্টিকারী ভূমিকা সম্পর্কে কিছু না জানাটাও অন্যায়।

বাল গঙ্গাধর তিলক ও অন্যরা যখন কারান্তরালে, লেনিন তাঁদের মুক্তির জন্য দাবি জানিয়েছিলেন। অক্টোবর মহাবিপ্লব তখনও সংঘটিত হয়নি। বিপ্লবের তিন মাস পরে কারাবাস শেষ করে 'কেশরী' পত্রিকায় লেনিন সম্পর্কে তিলক এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মধ্যে লেনিনের প্রভাব যে কতদূর বিস্তৃত হয়েছিল, উক্ত প্রবন্ধে তার পরিচয় মেলে। লেনিনের জীবনাবসানে ধুন্ধিরাজ ত্রিম্বক গাদ্রে ২৯ জানুয়ারি এক প্রবন্ধ লেখেন: রুশ বিপ্লবের স্থপতি লেনিন। প্রবন্ধের একাংশ অনুবাদ করে দিচ্ছি: "১৭ থেকে ৪৭—এই তিরিশ বছর লেনিনের জীবন পরিত্যক্ত অবস্থায়, দারিদ্রের মধ্যে, নিজের পার্টির অন্তর্বর্তী সংগ্রামে ও গোপন-প্রকাশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আত্মগোপন অবস্থায় কেটেছিল।

কিন্তু ঐ সংগ্রামসমূহে তিনি অতুলনীয় অধ্যবসায়, প্রতিভা ও শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন।....তিনি আত্মসম্মান অপেক্ষা রুশ জনগণের কথা বেশি চিন্তা করতেন। যখন দেখলেন ভোলগা অঞ্চলের কৃষকেরা দুর্ভিক্ষ কবলিত, তখন পুঁজিবাদীদের সঙ্গে স্বমত গোপন করেই তিনি আপস করেছিলেন। রুশ জনগণের তিনি প্রকৃত শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। এবং যদিও তাঁর শত্রুরা তাঁর বিরুদ্ধে প্রভূত কুৎসা রটিয়েছিল, রুশ জনগণ কিন্তু শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর সম্পর্কে অবিচল আস্থা পোষণ করত।"

লেনিনের মৃত্যু বিশ্বাস করতে ভারতবাসী যেমন সময় নিয়েছিল, তেমনি পরে লেনিন-স্মৃতিচয়ন অবিচ্ছিন্নভাবে পাঁচ মাস ব্যাপী চলেছিল। ভারতের বিপ্লবী কার্যকলাপ তখন দেশে বিদেশে অব্যাহত ছিল। সুদূর ন্যু ইয়র্ক থেকে প্রকাশিত হতো 'ইয়াদেঁ ওয়তন'। তাতে ১ মে ১৯২৪ সালে 'আমাদের যুগের মহান নেতা' শীর্ষক একটি দীর্ঘ নিবন্ধ বেরিয়েছিল। তার মধ্যে লেনিনের শবানুগমনের এক মর্মস্পর্শী বিবরণী সন্নিবেশিত হয়েছিলঃ "প্রচণ্ড তুষারপাতসত্ত্বেও লক্ষ লক্ষ লোক তাঁর অন্ত্যেষ্টিতে যোগ দেয় এবং তিন হাজার নর-নারীকে পদদলিত, মূর্ছিত বা শোকাহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। দেশের প্রত্যেক কোণ থেকে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক-কৃষক তাঁদের সদ্য বিগত নেতার শেষ দেখা পেতে মস্কো শহরে সমবেত হয়েছিলেন। রাশিয়ার ইতিহাসে এত বড় শবযাত্রা কখনো হয়নি।"

ভারতে 'ট্রিবিউন' পত্রিকাও এই শোকযাত্রার বৃত্তান্ত প্রকাশ করেছিল।

এরকম যে কত দৃষ্টান্ত আছে, আমরা তার হিসেব জানি না। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, জাতীয়তাবাদী গণ-আন্দোলনের পর তখন সাম্যবাদী আন্দোলনের উন্মেষকাল। সেই সময় এই ধরনের লেখা বা খবর প্রকাশিত হওয়ার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। গবেষকরা এ-সম্পর্কে যথোচিত গবেষণা করলে আমরা কৃতজ্ঞ হব।

রাজযোটক

বিজনকুমার ঘোষ

হেনাকে পর পর তিন দিন দেখল গোপাল। করিডরে বারান্দায় এবং ঘরের মধ্যে শুধুমাত্র সায়া আর বুকের ওপর সরু ব্রাসিয়ার এঁটে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাড়িতে অন্যান্য লোকজন তো আছেই, দুটো জোয়ান মদ্দ চাকর আছে। একজনের নাকের তলায় সরু গোঁফ এবং অন্যজনের গলা ভাঙতে শুরু করেছে। একদিন কাকীমাকে আহ্নিক করতে দেখে একলা পেয়ে গোপাল বলেছিল, এভাবে ঘুরে না বেড়িয়ে একটা শাড়ি জড়িয়ে নিলেই পারিস। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এসেছিল, তোমরা যে ঘরে আণ্ডারওয়্যার পরে থাকো! আমার বুঝি গরম লাগে না?

গত বছর শ্রাবণ মাসে বিয়ে হয়েছিল গোপালের। লিলিকে নিয়ে পরদিন আসার সময় স্রোতে ট্যাক্সি আটকে গিয়েছিল। আজ রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর দরজা ভেজিয়ে ট্রাঙ্কের তলা থেকে দুখানা বই বের করল গোপাল। একখানা পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক। অন্যটি ডক্টর বামাকান্ত রায়চৌধুরী এম· বি· বি· এস· (ক্যাল·) লিখিত 'সমাজে যৌনতা ও সমস্যা'। বিয়েতে চিত্ত প্রেজেণ্ট করেছিল। আগে এইসব বই পড়বার জন্যে খাড়া রোদে দু-মাইল হেঁটে যেতে পারত। এখন হাতের কাছে পেয়েও থিয়োরিটিক্যাল কচকচি আর ভালো লাগে না। আজ অনেকদিন পর টেবিল ল্যাম্প জেলে 'কুমারী মন' চ্যাপ্টারটা খুলে ধরল। ঘরের গুমোট বাড়াবার জন্যে বাইরে ঝিরঝিরে বৃষ্টি নামল এই সময়। শ্রাবণ মাস। জয়েণ্ট পরিবার। আরো নানা রকম ফাইফরমাস খেটে লিলি শুতে এল। তার আগে মুখে খানিক স্নো পাউডার মাখল। অভ্যেস!

—দেখি কি পড়ছ। ওমা, 'কুমারী মন' কেন?

—বিবাহিত মন বিস্বাদ লাগছে বলে!

—আহা, ঢং! দ্যাখো—ভালো হবে না বলছি।

ইত্যাকার কিছু হাস্য-পরিহাসের পর গোপাল আসল কথাটা পাড়ল। শুনে চোখ বড় বড় করল লিলি।

— এই তোমার বুদ্ধি! এর জন্যে পড়তে হচ্ছে 'কুমারী মন'? তিন-তাতনটে

ছোট বোনের বিয়ে দেখল হেনা। বলি, বয়েস কত হলো। ওরও তো একটা সাধ-আহ্লাদ আছে!

একটু হিসেব করল গোপাল।

—আমার চেয়ে এক বছরের ছোট। তা তেত্রিশ তো বটেই।

—তবে? তোমরা বাইরে বাইরে থাকো, অনেক কিছুই জানো না। যখন তখন বেরিয়ে যায়। ছেলেদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে অনেক রাত্রে ফেরে। গৌরাঙ্গের সামনেই বুকের কাপড় ফেলে দেয়। ছিঃ! ছিঃ! কাকীমা দেখেও দেখেন না। আমরা হলে?

—লেখাপড়াটাও করল না। গোপাল বলে।

—কোনোদিকে মন আছে? ঘরে যতক্ষণ থাকে, এর-তার সঙ্গে ঝগড়া। তারপর রুজ-লিপস্টিক মেখে বর খুঁজতে বেরুনো।

—তা হলেও তো বুঝতাম একটা কাজ করেছে।

—পুরুষ জাত যে, ছিবড়ে করে রেখে চলে যাও। কে বিয়ে করবে? কি আছে শরীরে?

গভীর সমস্যা। বই পড়ে কিছু হবে না। আলো নিভিয়ে বুকের উপর লিলিকে টেনে নিল। বাইরে অঝোর বৃষ্টি, ঘরের বাতাসে ঠাণ্ডার আমেজ। লিলি যদি হেনার মতো দেখতে হতো, আর ওই বয়েস—গোপাল তাহলে পছন্দ করত কি? লিলির বুদ্ধি আছে। এক বছরের মধ্যেই ভূদেব মুখুজ্জের স্নেহধন্য জয়েণ্ট পরিবারের হালচাল বুঝে গেছে। পাড়ায় একবার টি টি পড়ে গিয়েছিল। অনেকেই এক বাস কণ্ডাকটরের সঙ্গে হেনাকে ঘুরতে দেখেছে। গোপালের ওসব বালাই নেই। পরিবারের সম্মান রক্ষার্থে অতি কষ্টে সেই কণ্ডাকটরকে পাকড়াও করে চায়ের দোকানে। নাম সুখময় দে। রোগা লিকলিকে। গোপাল তখন রোজ সকালে একশো ভেজানো ছোলা খেয়ে বুকডন মারত। ওকে দেখেই বেচারা সুখময় ঠক ঠক করে কাঁপতে শুরু করে।

—আমার বোনকে বিয়ে করতে চাও?

—আজ্ঞে, আমরা কায়স্থ। যদি—

—সে প্রশ্ন নয়। ক-টাকা মাইনে পাও?

—আজ্ঞে, সব মিলিয়ে একশো আশি।

—বাড়ি ঘরদোর আছে?

—আজ্ঞে, বাঘা যতীন কলোনিতে। অর্পণপত্র পেয়েছি।

—কে কে আছে ঘরে?

—আজ্ঞে, মা-দুই ভাই-এক বোন।

—ডিউটিতে যাচ্ছেন বুঝি? চা খাবেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—দেখা যাক কি করতে পারি। ওহে, দুটো চা দাও। আর কেক।

কাকীমা বিনা চোখের জলে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে আরম্ভ করে দিলেন—নিজের বোনদের অফিসারের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিস আর আমার মেয়ের বেলায় বাস কণ্ডাকটর? আমি কোথায় যাব গো, আমাকে নিয়ে যাও গো, আমার কেউ নাইরে—

এরপর গোপাল আর এগোয়নি।

মুস্কিল হয়েছে, দুই জ্যেঠতুতো দাদা এবং গোপালের নিজের দাদা—সকলেই ভালো চাকরি করে। কেউ প্ল্যাণ্ট ম্যানেজার, কেউ সুপারভাইজার, কেউ ইঞ্জিনিয়ার—এই ধরনের। ছাত্র ভালো, সরকারী চাকরির দিকে কেউ ঝোঁকেনি। সুতরাং কোম্পানি থেকে কেউ পাঁচশো টাকা বাড়িভাড়া পায়; কেউ মটর গাড়ি; কাউকে রাত দুপুরে ডাকাডাকির জন্যে অফিস থেকে টেলিফোন বসিয়ে দিয়েছে। ছেলে মানুষ করতে হবে, সেই সুবাদে এইসব খ্যাতকীর্তি ভাইয়েরা সকাল সকাল বিয়ে করে নিয়েছে। যুগের হাওয়া অনুযায়ী তারা সকলেই পণপ্রথার বিরোধী। কিন্তু বিষয়-সম্পত্তি প্রচুর, বাপের একমাত্র মেয়ে, ইত্যাদি যোগাযোগগুলি মিলিয়ে নিতে ভোলেনি। তারা ফুরুৎ ফুরুৎ বউ নিয়ে বেরিয়ে যায়। গড়ের মাঠে হাওয়া খায়। কুৎসিত বোনটার কেন বিয়ে হচ্ছে না তা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় কোথায়?

কিন্তু বাড়িতে গোপালের পজিশন সম্পূর্ণ উল্টো। স্কুল ফাইনালে বার দুয়েক ঘায়েল হয়। কিছুদিন পোস্ট অফিসের পিওন হয়েছিল। তখনই চোখ ফোটে; দাদারা ওকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলত, বংশের কুলাঙ্গার! ফলে ঝোঁক চেপে যাওয়ায় প্রাইভেটে বি. এ. পাশ করে। তারপর অনেক ধরাধরি করে সরকারি অফিসের কেরাণীর চাকরি। গরীব, সেইজন্যেই সংসারের সবদিকে নজর। ট্রাম-বাসের পয়সা বাঁচাতে রোজ সাইকেল মেরে খিদিরপুরের অফিসে যায়। খিদিরপুরে মসলাপাতি ডাল ইত্যাদি শস্তা। সাইকেলের রডে একটা বেতের কেরিয়ার লাগিয়ে নিয়েছে। ফেরার পথে মাসকাবারির বাজার নিয়ে আসে।

নিজেই ইলেকট্রিক বিলের টাকা জমা দেয়। হঠাৎ বড়দার ঘরের পাখা বন্ধ হয়ে গেলে মেন সুইচ অফ করে তক্ষুনি সারতে বসে। কেন না, খ্যাতকীর্তি ভাইদের এসব ছাতামাথা কাজে মন দেবার মতো সময় বা রুচি কোনোটাই নেই। হঠাৎ-বিধবা-হওয়া কাকীমা সেটা ভালো করেই জানেন। তাঁর কুৎসিত মেয়ের বিয়ে হলে ওরা হয়তো কিছু থোক টাকা ছুঁড়ে দেবে। কিন্তু আসল কাজটা এগিয়ে নিয়ে যাবে এই ছেলেটাই। গোপালের হয়েছে মুস্কিল। সব কাজে যেমন নাক গলাতে যায়, তেমনি ভুলচুক কিছু হলে বকুনিও মেলে প্রচুর। সেদিন হঠাৎ কান্নাকাটি করায় মনটা খুব দমে গিয়েছিল। কিন্তু খুশী হয়েছিল লিলি—বেশ হয়েছে, যেমন তোমার স্বভাব! বোঝো ঠ্যালা। কেন, হেনা তোমার একার বোন নাকি? কেউ কিছু করবে না, উনি ছুটে ছুটে যাবেন। কিন্তু কাকীমা হঠাৎ দিন কয় হল খাতির শুরু করে দিয়েছেন। গোপালের চেয়ার-টেবিলে জুৎ হয় না। রান্নাঘরে আসন পেতে খেতে বসে। ঠিক তখনি দরজার কাছে এসে দাঁড়াবেন।

—বৌমা মানকচু বাটা আছে, দিয়েছ?

—হ্যাঁ।

—মোচার ঘণ্ট গোপু ভালো খায়। নারকোল নেই ঘরে। তা হোক, বৌমা দাও।

কাকীমা সরে যেতেই গোপাল চোখ দুটোকে জিজ্ঞাসু করে তুলল। দেখে লিলি 'মরে যাই' মার্কা হাসি হাসল।

—হেনার একটা ভালো সম্বন্ধ এসেছে, তাই তোমাকে দরকার হচ্ছে।

—তাই নাকি। কে আনল সম্বন্ধটা?

—যেই আনুক। কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি, তুমি এর মধ্যে যাবে না। মনে নেই সেদিন কাকীমা কি মুখ করলেন। এর পরেও যেতে চাও?

যেতে ঠিকই হয়েছে। অফিস থেকে ফিরেই চায়ের কাপ হাতে কাকীমার ঘরে গেছে। লিলি এখনো ছেলেমানুষ। জয়েন্ট পরিবারে যে টাকা কম দেয় তাকে সব কাজেই ছুটে যেতে হয়। দাদারা পাড়ার চায়ের দোকানে কখনো যায় না। গেলে শুনতে পেত হেনার লেটেস্ট প্রেমিক নিয়ে কি রকম আলোচনা চলে। গোপালের পেশীগুলো তাই শুনে শক্ত হয়ে ওঠে। দৃশ্য তৈরি করার প্রবল ইচ্ছেটা চেপে গিয়ে ভাবে, হেনাকে তাড়াতাড়ি পার করা দরকার।

একটু পরেই শূন্য কাপ হাতে বেরিয়ে আসে গোপাল। কপালে চিন্তাজনিত

কয়েকটি রেখা। সম্বন্ধটা খুবই ভালো। কিছুতেই হাতছাড়া করা যায় না।

চিত্ত ভট্টাচার্য গোপালের ছেলেবেলার বন্ধু। একসঙ্গে ইস্কুলে পড়েছে। একই সঙ্গে ফেল। দু-জনের দু-জায়গায় চাকরি, তাই দেখাসাক্ষাৎ কম হয়। চিত্ত থাকে সানগর রোডে। গোপাল গায়ের ওপর পাঞ্জাবী চড়িয়ে সাইকেল নিয়ে বেরুল। চিত্তরও আলকাতরা প্যাটার্নের তিন বোন ছিল। তিনজনেরই ভালো বিয়ে দিয়েছে। মাথার ওপর বাপ নেই। টাকা পয়সার জোর তো কোনোদিনই ছিল না। কিন্তু চিত্তর আছে স্থঁচের আগার মতো বুদ্ধি।

চিত্ত বাড়িতেই ছিল। গোপাল কাকীমার কাছে শোনা খবরগুলি এক নিঃশ্বাসে বলে গেল। এক ছেলে। বি. এস. সি পাশ। ভালো চাকরি। দুই বোনের আগেই বিয়ে হয়ে গেছে। মধ্যমগ্রামে নিজেদের বাড়ি। বাবা পেন্সন পায়—ইত্যাদি।

সব শুনে চিত্ত বলল, ছেলের বয়স কত বললি?

—বত্রিশ।

—আর হেনার?

—ওখানেই যত গণ্ডগোল। বেশি ছাড়া কম তো নয়ই। তবে বাড় নেই তেমন। কম বলে চালানো যায়।

—বাপ মা কেমন?

—ভালোই। এক পয়সা পণ চায় না। মেয়ে পছন্দ হলে এমনি নিয়ে যাবে। যাকে বলে মডার্ন।

—মডার্নদের নিয়েই তো মুস্কিল।— চিত্ত ফ্যানটা চালিয়ে থুতনিতে হাত রাখল।

—না, একেবারে মডার্ন বলি কি করে! এবার গোপাল থুতনিতে হাত রাখল: কুষ্ঠি দেখতে চেয়েছে। রাজযোটক না হলে চলবে না।

হঠাৎ লাফিয়ে উঠল চিত্ত।

—ইউরেকা। কুষ্ঠি আছে তোদের?

—দেশে থাকতে পিনু আচার্যি তৈরি করে দিয়েছিল। সে কবেকার কথা। কোথায় হারিয়ে গেছে।

—ব্যস, এই তো চাই। নতুন কুষ্ঠি তৈরি করাতে হবে। কাল বিকেল পাঁচটার সময় হাজরা মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকবি।

চিত্তর কথার ঠিক থাকে বরাবর। কিন্তু আজ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ব্যথা হয়ে গেল। কিছুক্ষণ বাসের গা থেকে তিন হাত বেরিয়ে আসা ভিড় দেখল। সিনেমা পত্রিকার স্টলে বম্বের খবর পড়ে নিল বিনা পয়সায়। তবু চিত্তর দেখা নেই। হয়তো ভুলেই গেছে। ভাবতে ভাবতেই চিত্তকে দেখা গেল। মুখে বিগলিত হাসি।

—খুব রেগে গেছিস, তাই না? কি করব বল? অফিস থেকে বেরোতে যাব দেখি গেটের সামনে খাঁ সাহেব দাঁড়িয়ে। পেছনের দরজায় ভাইকে বসিয়ে রেখেছে। লাঠি হাতে ইয়া পালোয়ান।—চিত্ত ফ্যাক ফ্যাক করে হাসতে লাগল। রেগে গিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু খাঁ সাহেবের কথায় খোঁচা খেল, শেষকালে কাবলীওয়ালার কাছ থেকে ধার করা শুরু করলি?

—কি করব। বোনদের বিয়ে দিতেই তো এই হাল। তা আমিও সোজা পাত্তর নই। চারতলার ছাদে উঠে গেলাম। আমাদের অফিসের পাশেই পরিমলের অফিস। মাত্র হাত পাঁচেক ফাঁক। একটা তক্তা ফেলে পগার পার।

—পরিমলের অফিসে দারোয়ান নেই? তোকে যেতে দিল?

—কেন দেবে না? আরো সেলাম করল। পূজোর সময় দু-টাকা বকশিস দিয়ে রেখেছি যে!

গল্প করতে করতে দুই বন্ধু একটা ঘিঞ্জি গলিতে চলে এল। শ্যাওলা ধরা বাড়ির কড়া নাড়তেই একটি নতুন শাড়ী পরা মেয়ে বেরিয়ে এল।

—বাবা আহ্নিক করছেন। আপনারা বসুন।

ছোট ঘর। খান কয়েক টুল। টেবিলে নানা ধরনের জ্যোতিষীর বই। দেওয়ালে হস্তরেখার ফটো। চিত্ত ফিসফিস করে বলল, এ বাড়িতে আমার খুব খাতির। আমি কিভাবে কথা বলি তুই শুধু লক্ষ্য করে যা —।

একটু পরে খড়মের আওয়াজ হতেই গোপাল তাড়াতাড়ি সিগারেট নিভিয়ে এ্যাসট্রেতে ফেলে দিল। মধ্যবয়সী। ভুঁড়ির ওপর ধবধবে পৈতে। বাঘছাল রঙের সিল্কের লুঙ্গি। চিত্তকে দেখে বললেন, এই যে বাবা চিত্ত, এতদিন তোমাকে দেখতে পাইনি। তারপর কি খবর বলো?

চিত্ত কোনোরকম ভনিতার মধ্যে না গিয়ে বলল, ঠাকুরমশাই আমার এই বন্ধুকে এনেছি। এর একটা কুষ্ঠি তৈরি করে দিতে হবে।

—নিশ্চয় নিশ্চয়! ওরে তুনি, বাইরে দু-কাপ চা পাঠিয়ে দে।— গোপালের দিকে ফিরে ঃ কুষ্ঠি আপনার?

—আজ্ঞে না, আমার বোনের।

—বেশ বেশ। নাম, জন্ম-সন দিন-ক্ষণ দিয়ে যান। সাতদিন পর আসবেন। আমার রেট দশ টাকা! তবে চিত্তর সঙ্গে যখন এসেছেন এক টাকা কম দেবেন।— চশমার ভিতর দিয়ে কড়া চোখে তাকিয়ে রইলেন।

চায়ে চুমুক দিয়ে গলা খাঁখারি দিল চিত্ত।

—কিন্তু ঠাকুর মশাই একটু গণ্ডগোল পাকিয়ে দিতে হবে যে। মেয়ের বয়েস বত্রিশ, করতে হবে বাইশ। এ-বাদে আরো কিছু, যাতে রাজযোটক হয়।

—মিথ্যে কথা লিখতে হবে তো?—ঠাকুরমশাই ভুঁড়ি দুলিয়ে হেসে উঠলেন: সেটা আগে বলতে হয়। চার্জ ভাই বেশি লাগবে। ওতে খাটনি অনেক। ছেলের রাশি নক্ষত্র জানা আছে?

গোপাল মাথা নাড়ল।

—তার দরকার নেই। দেবগণ বিপ্রবর্ণ কন্যারাশি পুষ্যানক্ষত্র লাগিয়ে দিলে যে কোনো ছেলের সঙ্গে খেটে যাবে। ঠিক আছে, কিছু এ্যাডভান্স করে যান। দশদিন পরে আসবেন।

গোপাল মাথা চুলকে বলল, কিন্তু ঠাকুরমশাই, ছেলেপক্ষ যদি কুষ্ঠি দেখে ধরে ফেলে আমরা নতুন বানিয়েছি?

—আপনিও যেমন। ঠাকুরমশাই এ ধরনের অজ্ঞতায় যথেষ্ট খুশি হলেন: পুরোনো কাগজ আছে, ডটপেন দিয়ে লিখব, তারপর ঝুলকালি মাখিয়ে দিনকতক খাটের নীচে ফেলে রাখব। আপনার বন্ধুই কত মক্কেল জুটিয়ে এনেছে। অত সহজে ধরা পড়লে আমার এখানে ছুঁচো ডন মারত।

কাজের কথা হয়ে যাওয়ায় চিত্ত অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল।

—আপনার বাড়ি কদ্দূর?

—আর কদ্দূর! অর্ধেক করে ফেলে রেখেছি। টাকা নেই। তুমি আর মক্কেলও আনছ না।

—আনব। কমিশন দিতে হবে।—চিত্ত চোখ পিটপিট করল।

—নিশ্চয় নিশ্চয়। ঠাকুরমশাই রসিকতা ভেবে প্রাণখোলা হাসি হাসলেন: চলো তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। পথেই পড়বে।

গলি থেকে আরেকটা গলিতে ঢুকে টুঁটো বাড়িটা দেখতে পেল গোপাল। দরজা জানালা বসেনি। একজন বিহারী খাটিয়া পেতে শুয়ে আছে। ঠাকুর-মশাইকে দেখে উঠে দাঁড়াল।

—তিন-তলার ভিৎ। আপাতত তিন রুমের প্ল্যান। গোপালের দিকে তাকিয়েঃ বিস্তর খরচ বেড়ে গেছে মশাই। এই দেখুন না, আগে ইঁটের দর ছিল একশো দশ করে, এখন সোয়াশো। এক নম্বরের দাম আরো বেশি। আমি অবশ্য এক নম্বরই দিচ্ছি। বুঝলেন কিনা, যেটুকু করব, কোনো খুঁৎ রাখব না—হেঁ-হেঁ—

গোপাল মাথার উপর তাকাল। চাঁদ উঠেছে। আর কিছুদিন পর ওখানে তিন থাক কংক্রিটের ছাদ উঠবে।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে অনেক কথা হলো।

লিলি বলল, কুষ্ঠি জাল করে বোন-এর বিয়ে দিচ্ছ। ধরা পড়লে মজা টের পাবে, হুঁ—

—বিয়ের পর সব ঠিক হয়ে যাবে দেখো। গোপাল আড়মোড়া ভাঙল।

—ছাই হবে। হেনার মতো মেয়ে করবে ঘর-সংসার! তবেই হয়েছে।

—তা আমরা কি জানি। ওদের বৌ ওরা বুঝবে।

—আহা, আমি ভাবছি সেই ছেলেটার কথা। বি. এস. সি. পাশ করেছিস, কুষ্ঠি-ঠিকুজির ওপর এত ভক্তি কেন রে? দেখে-শুনে একটা বিয়ে করলেই পারিস

—থামো।—গোপাল এবার ধমক দিলঃ ভক্তি-শ্রদ্ধা আছে বলেই তো হেনার একটা হিল্লে হচ্ছে, সে খেয়াল আছে?

বিয়ের পরের দিন শ্বশুর বাড়ি যাবার সময় হেনা প্রচুর চোখের জল ফেলল। দেখে বুক শুকিয়ে গেল গোপালের। ফের চোখের জল ফেলে বাপের বাড়িতেই না ফিরে আসতে হয়।

বৌভাতের দিন ভিড়ের মধ্যে কোনোরকমে লুচি-মাংস খেয়ে চলে এসেছিল। বৎস তারপর আর ওমুখো হয়নি। বাড়ির লোকেরা মাঝে মধ্যেই গেছে। কাকীমাও বার কয়েক। যে-সমস্ত রিপোর্ট আসতে লাগল তা রীতিমতো রোমহর্ষক। গোপালের কিছুতেই যেন বিশ্বাস হতে চায় না। বখে যাওয়া মেয়েটার মধ্যে ঘর-বরের জন্যে যে এত মমতা ছিল তা কে জানত! কাকীমার কাছে ওর পজিশন বেড়ে গেল দারুণ রকম। যখনই ডিউটি দিয়ে ফিরুক, আলাদা উনুনের মোচার ঘণ্ট রেখে দেবেনই। লিলি কাছে নেই। ও মাসখানেকের ছুটিতে বাপের বাড়ি গেছে। না-হলে ডেকে বলত, দেখলে তো বলেছিলাম কি না, বিয়ের পর সব ঠিক হয়ে যাবে।

কাকীমা একদিন বললেন, গোপু তোর কথা হেনা খুব বলছিল। শ্বশুরমশাই বলেন তুই নাকি ভুলেই গেছিস যে তোর একটা বোন ছিল।

কোনো দুঃসংবাদ না আসায় এই চার মাসে গোপালের ভয়ানক সাহস বেড়ে গেছে। অফিসের পর এক শনিবারে সোজা চলে গেল মধ্যমগ্রামে। সবাই খুশী। না খাইয়ে ছাড়লেন না। হেনা ময়দায় ময়াম মাখাতে বসে গেল। গোপাল কোনো কথা খুঁজে না পেয়ে বলল, আপনার শরীর কেমন আছে?

—ভালো নেই বাবা। বাতে কষ্ট পাচ্ছি। তা আমার বৌমার কথা কি বলব! পরশু পাড়ার মেয়েরা সিনেমায় গেল, ওকে কত টানাটানি; বলল, মার শরীর খারাপ, যাব না। আমিও শেষে বললাম, যাও বৌমা। তা কি কথা শোনে!

—অল্পবয়সী বৌমা এনেছি যে! শ্বশুরমশাই গর্বের সঙ্গে গলা খাঁকারি দিলেন: যেমন শেখাবে তেমনি শিখবে। তোমরা বিশ্বাস করো না, কিন্তু শাস্ত্রে রাজযোটক বলে একটা কথা আছেই। কত ভালো ভালো সম্বন্ধ এসেছিল। আমি বলেছি, উঁহু। ও কি বাবা বিষম খেলে কেন! জল খাও, জল খাও—

অনেক রাতে বাড়ি ফিরে জামা-কাপড় না ছেড়ে গোপাল চেয়ারে বসে রইল। গৌরাঙ্গ বার কয়েক ডাকাডাকি করে গেল। মেজবৌদি জানালা দিয়ে উঁকি দিলেন! তারপর কোনোরকমে হাসি চেপে সোজা নিজের ঘরে।

—ওগো ছোট ঠাকুরপোর যেন কি হয়েছে!

—কি হয়েছে?

—সেই থেকে গোঁজ হয়ে বসে ঠিকুজি মুখস্ত করছে: দেবগণ কন্যা রাশি বিপ্রবর্ণ—

খানিক বাদে বড়বৌদিরও ব্যাপারটা নজরে এড়াল না। আধঘুমন্ত স্বামীকে টেনে তুললেন।

—আঃ জ্বালাতন!

—বলি তোমার ভাইটা যে পাগল হয়ে গেল সে-খেয়াল আছে?

—কিসে পাগলটা হল?

—বোঝো ঠ্যালা, তুমি নিজে গিয়ে দেখে এসো গে, জানালা দিয়ে চাঁদের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করছে, এক নম্বর ইঁট এক নম্বর ইঁট—

—বুঝতে পেরেছি।—বড়দা হাই তুললেন: বৌমাকে কালই টেলিগ্রাম করে দাও।

প্রান্তীয় উত্তর বাঙলার মেচ উপজাতি

চারুচন্দ্র সান্যাল

আমার কাজ গ্রামে, জঙ্গলে। যাহাদের বলা হয় তপশীলী ও উপজাতি, আমার যাতায়াত তাহাদেরই কাছে। লোকগুলি অতিথিবৎসল ও ভদ্র। মনে মুখে একই কথা। তাই তাহাদের সাথে মেলামেশায় আছে আনন্দ, পাওয়া যায় স্বচ্ছ প্রাণের স্পর্শ। ইহাদের চালচলন 'বনেদী ঘরের' মতো। এককালে হয়তো বড় ছিল, প্রধান জাতি ছিল, কিন্তু আজ দরিদ্র, অশিক্ষিত ও বর্বর বলিয়া গণ্য। ইংরাজ ছিল বিজেতা, এই সকল অরণ্যবাসীদের তাহারা বলিয়াছে 'জংলী', সেই সংজ্ঞা আমরা আজও দিতেছি। কিন্তু আজ খাঁটি ভারতীয় মনে এদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিষয়ে নূতন ভাবে গবেষণার দিন আসিয়াছে।

এইবার প্রান্তীয় উত্তরবঙ্গে হিমালয়ের পাদদেশে যে-সকল উপজাতি বাস করে তাহাদের মধ্যে মেচ উপজাতিদের বিষয়ে আলোচনা করিব। গত প্রায় কুড়ি বৎসর বিভিন্ন কার্য উপলক্ষে ইহাদের সহিত নিবিড় ভাবে মিশিবার ও তাহাদের গ্রামগুলিতে যাইবার সুযোগ হইয়াছে। অনেক মেচ আমার বন্ধু হইয়াছে। তাই ইহাদের জীবনকথা আলোচনা করিব ইহাদেরই একজন হিতৈষী বন্ধুরূপে। স্বাধীন ভারতে বিজেতা হিসাবে বিজিতদের জীবনী লিখিবার মনোভাবের কোনো অবকাশ নাই।

পশ্চিমবঙ্গের যে অংশ দক্ষিণে গঙ্গা ও উত্তরে হিমালয় পর্বত, সেই অংশটিকে সাধারণ ভাষায় উত্তরবঙ্গ বলা হয়। এই উত্তরবঙ্গের উত্তর প্রান্তে হিমালয়ের নীচে গভীর জঙ্গলে, জঙ্গলের পার্শ্বে উন্মুক্ত প্রান্তরে, অধিকাংশ নদীর তীরে, শহর হইতে অনেক দূরে ইহাদের বাস।

জনগণনার হিসাবে ১৯০১ সনে পশ্চিম বাঙলা অংশে মেচদের সংখ্যা ছিল ২৩,২৪৭ আর ১৯৬১ সনে ১৩,৫৬৮। ১৯০১ সনে জলপাইগুড়ি জেলায় ছিল ২২,৩৫০ জন আর ১৯৬১ সনে মাত্র ১৩,১৭৮ জন। ১৯০১ সনে দারজিলিং জেলায় ছিল ৩৪২ জন, আর ১৯৬১ সনে ২৩৭ জন। কুচবিহার জেলায়

১৯০১ সনে ছিল ৩৭৭৮ জন, আর ১৯৬১ সনে মাত্র ১৫৩ জন। ১৯০১ সন হইতে ১৯৩১ সনের ভিতরে প্রায় ১৮,০০০ মেচ খৃষ্টান হইয়া যায়।

১৯৬১ সনের হিসাবমতো দেখা যায়, মেচেরা সারা পশ্চিম বাঙলা জুড়িয়া আছে। যেমন বাঁকুড়াতে ৫৩, কলিকাতায় ৩, মেদিনীপুরে ২০৮, পশ্চিম দিনাজপুরে ৭৯, জলপাইগুড়িতে ১৩,১৭৮, দারজিলিং-এ ২৩৭ ও কুচবিহারে ১৫৩। দারজিলিং-এ ইহারা বাস করে অধিকাংশই শিলিগুড়ি মহকুমায়। জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ থানায় ২০৯, মালে ৩৭৯, নাগরাকাটায় ১৪১, মাদারীহাটে ৬১৫, কালচিনিতে ৩,০৩০, আলিপুর দুয়ারে ৪,১৪৬ ও কুমারগ্রামে ৪,৪৭১ জন। অর্থাৎ নকশালবাড়িতে মেচী নদীর তীর হইতে আসাম পর্যন্ত ক্রমশ মেচ জন-বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে। কুমারগ্রামের পূর্ব প্রান্তে শঙ্কোশ নদীর ওপারেই আসাম গোয়ালপাড়া। এখানেও ইহারা মেচ নামে পরিচিত কিন্তু আর একটু পূর্বদিকে গেলে ইহারা বোদো নামে খ্যাত। তাই ১৯০১ সনে গোয়ালপাড়ায় মেচ ছিল ৭৩,৭৬০, কিন্তু ১৯৬১ সনে মাত্র ১৪৭। অথচ বোদো সংখ্যা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে ১,৬০,৩৫১তে।

মেচরা প্রধানত মোঙ্গল জাতিভুক্ত। বহু ক্ষত্রিয় রাজার সৈন্যদের শোণিত ইহাদের সাথে মিশিয়াছে। মহাভারতের যুগ হইতে ইংরাজ আমলের পূর্ব পর্যন্ত আসাম বা প্রাগ্‌জ্যোতিষে বহু অভিযান হইয়াছে। ফলে অনিবার্য মিশ্রণ ঘটিয়াছে। তাই ইহাদের মধ্যে কাছারী দল নিজেদের ক্ষত্রিয় বলিয়া দাবি করিতে শুরু করিয়াছে। মনে হয় সম্পূর্ণ বোদো ও মেচ উপজাতিকে ক্ষত্রিয়সম্ভূত ক্ষত্রিয় বলা যাইতে পারে।

মেচ উপজাতির উৎপত্তি লইয়া গল্প ও গবেষণার অন্ত নাই। একটিও বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয় না।

খৃষ্ট-জন্মের বহু বৎসর পূর্বে একদল মোঙ্গল জাতি বর্মার মধ্য দিয়া পাত্‌কই পর্বত অতিক্রম করিয়া উত্তরপূর্ব আসামে উপনীত হয়। ক্রমশ তাহারা আসাম এবং পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের বহুস্থানে ছড়াইয়া যায়। মনে হয় উত্তর-পূর্ব আসাম হইতে প্রধানত তিন দিকে তিন ভাগে এই দল অগ্রসর হইতে থাকে। একদল দক্ষিণে কাছার পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া কাছারী নামে পরিচিত হয়। একদল ব্রহ্মপুত্র নদীর উপকূল দিয়া আসামে প্রবেশ করিয়া বোদো নামে অভিহিত হয় ও এখানেও চারটি খণ্ডে বিভক্ত হইয়া যায়। যথা মেচ, কোচ, রাভা ও গারো। একদল হিমালয়ের সানুদেশ দিয়া পশ্চিম দিকে নেপালের মেচী নদীর তীরে

বসবাস শুরু করে। তাহাদের নাম হয় মেচীয়া বা মেচ। এরাই মেচী নদী অতিক্রম করিয়া দারজিলিং, জলপাইগুড়ি ও কুচবিহারের মধ্য দিয়া পুনরায় আসামের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। এই মেচদলই আমার আলোচ্য বিষয়।

পেমবারটন ১৮৩৮ সনে, হুকার ১৮৫৪ সনে, ড্যালটন ১৮৭২ সনে, হজসন ১৮৮০ সনে, রউনী ১৮৮২ সনে, গেইট ১৮৯১ সনে, সাণ্ডার ১৮৯৫ সনে, গ্রীয়ারসন ১৯০৩ সনে এই মেচ বা বোদো উপজাতির আচার, ব্যবহার, ভাষা প্রভৃতি বিষয়ে বহু গবেষণামূলক পুস্তকাদি লিখিয়া গিয়াছেন। সত্যকথা বলিতে হইলে স্বীকার করিতেই হইবে যে বিজেতা দলের এইসকল পণ্ডিত ব্যক্তিদের অনুগ্রহে আমরা প্রাচীন বাঙলা ও আসামবাসীদের বিষয় জানিতে পারি। দুঃখের বিষয় গত ৬০ বৎসরের ভিতর এই মেচ উপজাতি বিষয়ে নূতন কোনো অনুসন্ধান হয় নাই। প্রায় ১৮ বৎসর পূর্বে শ্রীসুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ইহাদের কিরাত জাতির অংশ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

বর্তমানের অনুসন্ধানের ফলাফল নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি, যদিও মূলসূত্র পূর্বসূরীগণের পদাঙ্ক অনুসরণে হইয়াছে।

দুই

মেচদের গোত্র আছে সাতটি। যথা:—১। সম্প্রমারী বা চম্প্রমারী; ২। ঈশ্বরারি, ইহারা আর্য হিন্দু ব্রাহ্মণ পর্যায়ের; ৩। নারজিনারী, ইহারা ক্ষত্রিয় পর্যায়ভুক্ত; ৪। বসুমাতারী; ৫। বারগোঁও-আরী, ইহারা বৈশ্য সম্প্রদায়ভুক্ত; ৬। মছারী; ৭। হাজোয়ারী, ইহারা শূদ্র পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু বিবাহাদি ব্যাপারে ইহাদের জাতিভেদ নাই। সব গোত্রের মধ্যেই অবাধে বিবাহাদি হয়। কাছারীদের নিকটেই মণিপুরে মেইতী জাতির মধ্যেও সাতটি গোত্র, যথা ১। আংগম্ ২। নিংথৌজা ৩। লুতয়াং ৪। খুমোল ৫। খাবাংঅংবা ৬। মৈরং ও ৭। চেংলোই। অথচ কোচ, রাভা ও গারো রাভাদের এমনি গোত্রভেদ নাই। তাই মনে হয় বোদো বা মেচ তাহাদেরই অন্য সম্প্রদায়গুলি হইতে বিভিন্ন।

মেচ উপজাতির বাসস্থানের নিকটে বিভিন্ন জাতি আসিয়া বসবাস করিয়াছে। চা বাগান সৃষ্টির পরে সাহেব, দক্ষিণ বাঙালি, উরাও, মুণ্ডা, সাঁওতাল প্রভৃতি বহু জাতি ও উপজাতি ডুয়ার্সে আসিয়াছে। কিন্তু এই মেচ উপজাতি এতকাল তাহাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া আসিয়াছে। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত অনেক মেচ বর্ণ হিন্দুদের সহিত বিবাহাদি করিতেছে।

বাঙলা বিভাগের পরে বহু দক্ষিণী হিন্দু বাস্তহারা ইহাদের নিকটেই বসবাস শুরু করিয়াছে। মনে হয় কালক্রমে পুনরায় মিশ্রণ ঘটিবে ও বর্ণ হিন্দুদের আচার ব্যবহার ইহাদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করিবে।

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা অনুযায়ী ইহারা এতকাল অশিক্ষিত ছিল। কিন্তু এখন অনেক মেচ পুরুষ ও বালিকা উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়াছে ও করিতেছে। অনেকে বিশ্ববিত্থালয়ের উচ্চতম ডিগ্রী অধিকার করিয়াছে, কেহ কেহ বিধানসভা ও লোকসভার সদস্য হইয়াছে। গ্রামের একটি প্রাথমিক বিত্থালয়ে মেচ বালক বালিকাদের পাঠে উৎসাহ দেখিয়া মনে হইল এই উপজাতি অল্প দিনেই বেশ শিক্ষিত হইয়া উঠিবে। কিন্তু বর্তমানে শতকরা মাত্র পাঁচজন বিশ্ববিত্থালয় প্রবেশিকা পর্যন্ত শিক্ষা লাভ করিয়াছে।

ইহাদের আচার ব্যবহার অতি সুন্দর। গৃহগুলি অতি পরিষ্কার। বস্ত্রাদি নিজেরাই ধুইয়া পরিষ্কার রাখে। রোজ স্নান করে। অতিথি আসিলে খুশী হয়। স্ত্রীলোকেরা গৃহকর্ত্রী। তাঁহাদের খুব সম্মান। ব্যভিচার একেবারেই নাই। অবিবাহিত ছেলেরা ভিন্ন স্থানে নিদ্রা যায়। অবিবাহিতা কন্যারা মাতার কাছে গৃহমধ্যে কোনো কুটিরে নিদ্রা যায়। মিথ্যা কথা, মিথ্যা আচরণ ছিল অজ্ঞাত। বর্তমানে এই বিষয়ে শিথিলতা দেখা যাইতেছে। শিক্ষিত হইবার সাথে সাথে তাহাদের নাম ও পদবী বর্ণ হিন্দুদের অনুকরণে পরিবর্তিত হইতেছে।

মেচরা প্রধানত চাষী। খুব ভাল চাষী। পূর্বে ছিল 'ঝুম' প্রথা যখন মানুষ ছিল অল্প ও জমি ছিল অফুরন্ত। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে হাল গোরু দিয়া চাষের প্রথা শুরু হইয়া যায়। ধানই ইহাদের প্রধান চাষ। ইহারা পূর্বে তুলার চাষ করিত। প্রধান ক্রেতা ছিল জাপান। এখন এই বাজার নাই, কাজেই তুলা চাষে উৎসাহ নাই। সুপারির চাষে ইহারা ওস্তাদ। প্রায় প্রতি গৃহেই সুপারি বাগান দেখা যায়। অনেকে সুপারি বিক্রয় করিয়া প্রচুর অর্থ আয় করে। বর্তমানে ভুট্টার চাষ শুরু করিয়াছে। তরি-তরকারির চাষও শুরু হইয়াছে।

ধান রোপণের পূর্বে গৃহকর্ত্রী প্রথমে কয়েকটি চারা রোপণ করিবেন তাহার পর অন্য সকলে রোপণ শুরু করিবে। ধান কাটার সময় হইলে গৃহকর্ত্রী প্রথমে একটু ধান কাটিয়া গৃহে আনিবেন, তাহার পর ধান কাটা শুরু হইবে।

প্রতি গৃহেই ছিল এণ্ডির চাষ। গৃহেই পোকা পালন করা হইত, গৃহেই

পোকা হইতে সুতা প্রস্তুত হইত ও গৃহেই বস্ত্র বোনা হইত। তুলা হইতেও সুতা প্রস্তুত ও বয়ন হইত। কুমারগ্রামের এণ্ডি চাদর ছিল বিখ্যাত। সারা দারজিলিং, তরাই ও ডুয়ার্সে মেচরা তাহাদের গৃহজাত বস্ত্রাদি ব্যবহার করিত। ক্রমে কলের সুতা ও বস্ত্রাদি বাজারে আসিল, সস্তায় রেশমের বস্ত্রাদি আসিল, ধীরে ধীরে গৃহশিল্প লোপ পাইতে শুরু করিল। এখনও স্থানে স্থানে এণ্ডির চাষ ও বস্ত্র বয়ন বাঁচিয়া আছে। উৎসাহ দিলে পুনর্জীবন লাভ করিতে পারে।

গৃহশিল্প নষ্ট হইবার সাথে সাথে বহু মেচকে নিকটের চা-বাগানে ও সৈন্য ব্যারাকে দিন মজুরের কাজ করিতে হইতেছে। স্বাধীন লোক পরাধীন হইয়া যাইতেছে। বহু মেচ খেত মজুরের কাজে নিয়োজিত হইতেছে। যাহাদের কোনোদিন ঋণ করিতে হইত না, এখন ঋণজালে জড়াইয়া পড়িতেছে। চাকুরিজীবী শিক্ষিত মেচ তাহাদের বেতনে সংসার চালাইতে পারিতেছে না। একটি বিরাট সমস্যা আসিয়া গিয়াছে।

মেচরা যৌথ সংসারে বাস করিতে পছন্দ করে। পুত্র, বিবাহ করিয়াই পৃথক গৃহে চলিয়া যায় না। পিতা অনেক সময়ে পুত্রদের বিভিন্ন গৃহে বসবাসের অনুমতি দেন। তবুও পিতাই সমগ্র পরিবারে কর্তা। পিতার মৃত্যুর পর পুত্রেরাই তাহার উত্তরাধিকারী হয়। কন্যারা কিছু পায় না। কিন্তু ভগ্নীদের ও বিধবা মাতাকে ভরণপোষণ করা পুত্রদের অবশ্য কর্তব্য। ইহা সামাজিক অলিখিত বিধি, ইহার অন্যথা কখনই সমাজ ক্ষমা করিবে না।

মেচদের দেবতা আছে অনেক। যে কোনও অ-মানুষিক শক্তিকে ইহারা দেবতা জ্ঞানে পূজা করে অর্থাৎ ইহারা প্রকৃতি-শক্তির পূজারী। তাই যে-সকল পার্বত্য নদী বর্ষাকালে প্রচণ্ড রূপ ধারণ করে ইহারা সেই নদীগুলিকে পূজা করে। তিস্তা, জলঢাকা, তোরসা, শঙ্কোশ নদী ইহাদের দেবতা। জঙ্গলে প্রবেশের পূর্বে একটি গাছকে বনদেবী কল্পনা করিয়া পূজা করা হয়। এই দেবী হইতেছেন 'হাগরা মোদোই' অর্থাৎ জঙ্গলে হিংস্র জন্তু হইতে রক্ষা-কারিণী। আর এক বিশিষ্ট দেবতা হইতেছেন মনসা 'সিজ' গাছ। এই গাছ-দেবতার নাম 'বাঠৌ' বা মহাকাল। প্রতিটি মেচগৃহে উঠানের উত্তর-পূর্ব কোণে এই গাছ আছে। ইহাদের ধারণা, গাছ জন্তু ও মানুষের প্রাণ একই। গাছের ও জন্তুর প্রাণ মানুষে সঞ্চারিত হইতে পারে ও মানুষের প্রাণ গাছেও যাইতে পারে। তাই চাষ আবাদের পূর্বে কোনো প্রাণী বধ করিয়া তাহার রক্ত চাষের জমিতে দেওয়া হয়, যেন এই প্রাণীর প্রাণ শস্যবৃক্ষে প্রবেশ করিয়া

তাহাদের সতেজ করিবে এই ধারণায়। বিবাহের সময়ে আতপ চাউল বর ও কনের মস্তকে বর্ষিত হয়। ধান্য রৌদ্রে শুষ্ক করিলে চাউলের প্রাণটি থাকিয়াই যায়, এই প্রাণ বর ও কন্যার জীবন দীর্ঘতর করিবে এইরূপ আশায় ও ধারণায়।

ইহারা লক্ষ্মীর পূজা করে। লক্ষ্মীর নাম 'মাইনো'। উত্তরদিকের কুটিরে ইনি স্থাপিত। এই দেবী 'শক্তি'। মনসা, মহাকাল (শিব) প্রভৃতির পূজা প্রচলিত আছে। মেচরা ধর্মপ্রাণ। প্রতি মাসেই একটি বা ততোধিক দেব-দেবীর পূজা করে। ইহারা মূর্তিপূজা করে না। একটি করিয়া মাটির ঢেলা প্রতি দেবতার প্রতীক। ফুল, পাতা, আতপ চাউল, কলা প্রভৃতি পূজার উপকরণ। প্রতি পূজার প্রধান অঙ্গ হইতেছে পশু-পক্ষী বলি। মুর্গি, হাঁস, পাঁঠা, ছাগল, শূকর সবই বলি হয়। বলিদত্ত পশু-পক্ষীর রক্তটুকু দেবতাকে উৎসর্গ করে; যেমন দুর্গাপূজায় একটি মাটির পাত্রে রক্ত সংগ্রহ করিয়া প্রথম নিবেদন করা হয় দেবীকে।

সামাজিক জীবনের প্রধান আচারগুলি জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যুকেন্দ্রিক।

প্রসূতিকে গৃহের যে কোনও কুটিরে রাখা হয়। কোনো পৃথক কুটির নির্মাণ করা হয় না। গ্রামের কোনো বর্ষিয়সী মহিলা 'দাই'-এর কার্য করেন। কাঁচা বাঁশের ত্বক হইতে নাড়ী কাটিবার ছুরি প্রস্তুত হয়। ইহা দ্বারাই কার্য সম্পাদন হয়। কন্যা হইলে পাঁচ পোঁচ ও পুত্র হইলে সাত পোঁচে নাড়ী কাটা হয়। তারপর শিশু ও প্রসূতিকে উষ্ণ জলে স্নান করান হয়। শিশুর মুখে একটু মধু দেওয়া হয় মাত্র। কোনো উৎসব, কোনো উলু দিবার প্রথা নাই।

বিবাহ হয় পুরুষের কুড়ি ও কন্যার ষোলো বৎসর বয়সে। পিতা-মাতাই ঘটকের (বারি) সাহায্যে ব্যবস্থাদি করে। প্রথমে ঘটক প্রস্তাবিত কন্যার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিবাহের প্রস্তাব হিসাবে তাহার হস্তে একটি টাকা দিবে। ইহার নাম 'গম-থন'। কন্যার পিতা ইহা গ্রহণ করিবে না। বারবার তিনবার এই 'গম-থন' টাকা দিয়া অনুরোধ করা হইবে। তিন বারই টাকা গ্রহণ না করিলে প্রস্তাব বিফল হইল। কিন্তু মুদ্রাটি গ্রহণ করিলে বা ফেরত না দিলে প্রস্তাব গৃহীত হইল। তাহার পর কন্যাপণ, পাত্র-পাত্রী দেখা ও বিবাহের দিন স্থির হইবে। বিবাহের পূর্বদিন বরযাত্রীর দল আসিয়া কন্যাকে লইয়া যাইবে ও বরের গৃহে বিবাহ হইবে, কন্যার গৃহে নয়। হিন্দু মেচদের বিবাহ হয় 'বাঠৌ' অর্থাৎ সিজবৃক্ষের সম্মুখে। ব্রাহ্মণ

মেচদের বিবাহ হয় অগ্নি সাক্ষী করিয়া আর খৃষ্টান মেচদের বিবাহ হয় চার্চে। কিন্তু বিবাহের পদ্ধতি সবক্ষেত্রেই প্রায় একই প্রকার। কন্যার কপালে সিন্দুর দান প্রথা ছিল না। এখন হইতেছে। হাতে শাঁখার বালা ছিল না, এখন হইতেছে। কন্যাপণ স্থলে এখন পাত্রযৌতুক দান প্রথা আসিয়াছে। বিবাহবিচ্ছেদ নাই বলিলেই চলে। বড় ভাই-এর বিধবাকে দেবর বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু ছোট ভাই-এর বিধবাকে বড় ভাই কখনই বিবাহ করিবে না।

এইবার মৃত্যু প্রথা। মেচরা মৃতদাহ করিত না। এখন কেহ কেহ শুরু করিয়াছে। কবর দেওয়াই প্রথা। মৃতের মস্তক থাকিবে দক্ষিণদিকে, পদদ্বয় উত্তরে যাহাতে সহজে মৃত আত্মা কৈলাস পর্বতে যাইতে পারে। তের দিন পরে শ্রাদ্ধ হইবে। সেইদিন প্রত্যেক খাদ্যের কিছু কিছু অংশ লইয়া পুত্র ও গ্রামের গণ্য-মান্য নিমন্ত্রিত কয়েকজন ব্যক্তি শ্মশানে যাইয়া কবরস্থানে খাদ্যদ্রব্যগুলি রাখিয়া মৃত আত্মাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিবে, 'এতকাল তোমার সহিত আমরা আহার বিহার করিয়াছি, আজ হইতে তাহা আর সম্ভব হইবে না।' তুমি এই আহার্য গ্রহণ করিয়া অনন্তে মিশিয়া যাও। ফিরিয়া আসিয়া আর আমাদের বিরক্তি উৎপাদন করিও না।' তাহার পর শ্রাদ্ধবাসরে প্রত্যাবর্তন করিয়া ভোজ পর্ব সম্পন্ন করিবে।

গ্রামের বিচার গ্রামেই হইত। গ্রামের একজন গুণী-জ্ঞানী ব্যক্তিকে গ্রামের লোক 'ফারিয়া' বা মণ্ডল নির্বাচন করিত। এই 'ফারিয়া' একজন গ্রাম্য চৌকিদার 'হাল-মা-জি', একজন পুরোহিত 'দেউলী' ও তাহার সহকারী 'পানখোল'-এর সাহায্যে বিচারাদি করিত। এখন পঞ্চায়েত প্রথা চালু হইয়াছে। তবুও সামাজিক ব্যাপারে পুরাতন প্রথা চলিতেছে।

মেচদের ভাষা ভোট-বর্মা ধর্মী। ঈশ্বর নামে ইহাদের কোনো শব্দ নাই। 'মোদার' শব্দটি গ্রাম্য দেবতাদের বলা হয়। দরজা, জানালা, কড়াই, বাল্তি, আয়না, বাতি, পাইখানা প্রভৃতির কোনো মেচ শব্দ বা কথা নাই। ইহাদের ভাষায় অলিখিত ব্যাকরণও আছে। যেমন ভাল ছেলে 'মজাং গোথো'; আরও ভাল ছেলে 'মজাং সিন্ গোথো'; সবচেয়ে ভাল ছেলে 'বয়-নিস্তাই-সিন্-গোথো'। আবার এক কথায় বলা হয়—বাড়ি-'ন'; উত্তর-'ছা'; দক্ষিণ-'খ্লা'; গাছ-'ফাং'; কাপড়-'সি'; জল-'দৈ' ইত্যাদি। আবার একই কথার উচ্চারণ ভেদে বিভিন্ন অর্থ হয়, যেমন-'ছা' মানে উচ্চ, উপরে, উত্তর দিক। 'খ্লা' শব্দে নীচে, নীচু, দক্ষিণ

দিক। বাঙলায় যেমন তুই, তুমি, আপনি শব্দ আছে মেচদের ভাষাতেও এমনি আছে যেমন 'তোমার নিকট হইতে'—'বি-নি-ফ্রা'; 'আপনার নিকট হইতে'—'বি-থাং-নি-ফ্রা'। আবার গৌরবে বহুবচনও আছে—যেমন 'তুমি'—'নং'; আপনি 'নং-ছরো' বা 'নং-থাং' বা 'নং-ছর্'। এইরকম মৌখিক ভাষাতেও বিভিন্ন ভাবে সম্বোধনের ভাষা আপনা হইতেই গড়িয়া উঠিয়াছে।

একটি প্রশ্ন উঠিয়াছে ইহাদের শিক্ষা পদ্ধতি লইয়া। য়ুরোপ ও ভারতীয় মনীষীদের মতে মাতৃভাষাতেই প্রথম পাঠের ব্যবস্থা করিলে সত্বর সুফল পাওয়া যাইবে। খৃষ্টান পাদ্রীর দল এই দিকে প্রথম দৃষ্টি দিবার ফলে উপজাতি শিক্ষার কার্যে তাহারা এত দ্রুত অগ্রসর হইতে পারিয়াছে ও তাহাদের নিকট এত প্রিয় হইয়াছে। পাদ্রীর দল তাহাদের ভাষা শিখিয়াছে, তাহাদের ভাষায় পুস্তকাদি লিখিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছে। তাহারা রোমান অক্ষরে লিখিয়াছে, আমরা বাঙলা অক্ষরে লিখিব পশ্চিম বাঙলায়, অসমিয়া অক্ষরে আসামে, হিন্দী অক্ষরে বিহারে। ভাষাটি হইবে উপজাতিগণের মাতৃভাষা। এইদিকে দৃষ্টি না দিবার ফলে ভারত সরকারের গত কুড়ি বৎসরের প্রচেষ্টা যেন ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে।

সর্বশেষে মেচদের 'জলকে-চল' গানটি দিয়া প্রবন্ধের ছেদ টানিয়া দিই।

'জোংলাই সিখোলা হাবাব্ জোংলাই সিখোলা,
খুন্‌দুং লুনানৈ সি দানা নৈ
সংসার নি লোইজা খরগৌরা।
ফুংডাউ হাইলাই, নোউনি হাবা মাউনা,
সানজু ফুথিরাও জুংখার।
বেলাছে জাবোলা মিনি বালা বালা
দৈসো লাহিনো ফাংডো
হাবাব্ জোংনি বোই, সিখোলানি সময়াও।'

অর্থাৎ

আমরা যুবতী, সরম লুকোতে
সুতো কাটি, বুনি শাড়ি,
সকালে গেরস্থালি-কাজ সেরে
দুপুরে চরকা ধরি,
বিকেলে সবাই ভরা-যৌবনে
কলসীতে জল ভরি।

এই সঙ্গীতের মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে মেচদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার একটি দিক।

অক্ষরের ট্রেনে উঠলে

মণীন্দ্র রায়

এক একটি জায়গায় যেতে
পায়ে পায়ে, নিশানাবিহীন,
একদিন দেখেছে সেও
দিগন্তের ট্রেনগুলি
সারি সারি অক্ষরের ক্রমাগত বিদ্যুতের মতো
চলে যায় গন্তব্যে স্বাধীন।

আজ সে নিজেই ঐ ট্রেনের ভিতরে
জানালায় ব'সে কী অবাক!—
পরিচিত দৃশ্য যেন নাচে ইন্দ্রজালে;
ছুটন্ত প্রান্তর গাছ ঘরবাড়ি দ্রুত ইতিহাস
কেবলি বদলায়, চলে; মাথার ভিতর
দিগন্তের বৃত্ত ভেঙে আরো দূর দিগন্তের দিকে
সেও তো চলেছে তাই,
একই জন্মে আরেক মানুষ!

আমাকে আমার পথ থেকে

সরিৎ শর্মা

আমাকে আমার পথ থেকে সরিয়ে দিও না
দেখো ঠিক খুঁজে পাব পথ
অন্য নাম নিতে আমায় বোলো না
দেখো এই নামে আমার সব অপচয় ঢেকে যাবে

আমার কিছু বলার আছে, কিছু শোনার
আমার কিছু দেখার আছে, কিছু জানার···

আমি কিছু ঘ্রাণ পাচ্ছি সময়ের…

জীবনের স্পর্শ বড় উপভোগ্য….

আমি জীবনের মোড়টাতেই দাঁড়িয়ে আছি
এর পরের মোড়টাকে লক্ষ্য করব ব'লে ..

এ-পথ দিয়ে সময় অনেকবার চলে গেছে
আমাকে বহু মনীষার আলো আর মানুষের ভালোবাসা
বহু সংগ্রামের সুস্থতা আর চেতনার নির্ভয়তা দিয়ে গেছে
হাতে তুলে….

আমি ভালোবাসা এবং কৃতজ্ঞতায় দু-হাত ভরে গ্রহণ করেছি
অঞ্জলি উপচে প'ড়ে গেছে অক্ষমতায় কিছু
তবু সময় আসবে, সে সব কুড়িয়ে নিয়ে যাবে
আমারই মতো কারুর হাতে তুলে দিতে…

আমি ততক্ষণে পৌঁছে যাব আর-একটা মোড়ে
সেখানে তখন এই সব ঘর-গেরস্থালির কথা বলতে থাকব,
পৃথিবীর এ-পাড়া ও-পাড়ার হার্দ্য বোধির সংলাপ
শব্দের প্রতীতি নিয়ে নন্দিত সুষমায়
স্খলনে পতনে উত্থানে জীবনের সংযত বিচ্ছিন্নতায়

আর দেখব
আমার পথ দাঁড়িয়ে আছে আমার সামনে
মায়ের হাসির মতো—
পৃথিবীর হৃৎপিণ্ডে দোলালাগা সেই হাসির স্বরে
আমি একে একে বিছিয়ে দেবো
সময়ের দেওয়া আমার আনন্দ-বেদনা
আশা নিরাশার
ব্যর্থ সার্থকতা আর সার্থক ব্যর্থতার
সংহত উপহারগুলি।

উদাসীনতার পরিপার্শ্ব থেকে দূরে

(লেনিনের উদ্দেশ্যে নিবেদিত)

শিবশম্ভু পাল

উদাসীনতার পরিপার্শ্বে গড়ে ওঠে
গন্ধহীন রঙচঙে গাছ
চারিদিকে সূক্ষ্মতম কাঁচ
কাঁচের ওপাশে যত কোলাহল, ধুলোমাটি, রক্তপদ্ম ফোটে।

সচেতন দেহলগ্ন জীয়ন্ত স্নায়ুর
যাতায়াত থেমে গেছে পরিব্যাপ্ত সাগরসঙ্গমে
নদী হতে ভুলে গেছে, জমে
নিমীলন, তন্দ্রাঘোর, স্মৃতিভারাতুর।

নির্গন্ধী রঙিন গাছ পেয়েছে আহার অন্তর্লীন
অভিশপ্ত মৃত্তিকায়, চারিদিকে হীনমন্য পরাভব, সূক্ষ্মতম কাঁচ ;
ওদিকে মাদল বাজে, লোকায়ত যূথবদ্ধ নাচ
নিরন্ত স্বাধীন।

সেখানে তোমারই সত্তা প্রকীর্ণ, লেনিন ॥

কেউ না কেউ সঙ্গে থাকেই

রত্নেশ্বর হাজরা

কাউকেই একা পাই না কেউ না কেউ
সঙ্গে থাকেই
জলের সঙ্গে স্রোত হাওয়ার সঙ্গে গতি রোদের সঙ্গে তাপ
এঘর ওঘর এবাড়ি ওবাড়ি
কেউ না থাক
ছায়া থাকে
নিঃশ্বাসের সঙ্গে প্রশ্বাস তাপ বলতে উষ্ণতার মতো—

দেওয়াল সরিয়ে দিলে চার চারটে দিক ঘিরে ধরল
ছাদ সরালাম তো আকাশ নিচু মেঝে উঠল উপরে
পথে নামলে পথই সঙ্গী
পিছনে অতীত সামনে ভবিষ্যৎ

জন্মের কাছে যাই

মৃত্যু তার কাঁধ ছুঁয়ে ঠায় দাঁড়ানো

অন্ধকারের সঙ্গে নক্ষত্রমণ্ডলী সারারাত ছায়াপথে ছায়াপথে

কাউকেই আর একা পাই না—
কেউ না থাক
অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যৎ ভবিষ্যতের সঙ্গে অতীত
আমার সঙ্গে আমি তাপ বলতে উষ্ণতা.
থাকবেই—

এবার সাম্রাজ্য চাই

কমল চক্রবর্তী

বিরষারে তোর ফারসা কুথায়
পথে ঘাটে ইটা পাথর
বন বন বন মেলায় ঘুরে সারা বছর
অবশেষে দেখতে পেলাম
প্যান্টু কামিজ দাতন কাঠি
রাতে শুবার নরম পাটি
সব গিয়েছে
ভালুক মশাই তালুক করে সব লিয়েছে.
ছুখার মায়ের চুলের কাটা
পান্থা খাবার পস্ত বাটা
এসব আজও চুপ মারলে নাকে আসে
মিঠা সুবাস বিয়ান এমন,
কাকড়ী নদী, বালি খুড়লেই

জল-জল-জল সগল ছবি
করমা পরব, মুরগা লড়াই
জলের জন্ম লাঠালাঠি,
কলের গাড়ি এসে কি, বাপ
লালটিন-টা ভেঙ্গে দিয়ে
দাপাই গেল চাষের মাটি ?

চিরঞ্জীব লেনিন

টু হু

লেনিন সমাধি-গৃহে এলাম গর্কিতে। যত কাছাকাছি আসি তীব্র হয় হৃদপিণ্ডে স্পন্দন। মনে হয়, দেখা হবে সঙ্গে তাঁরই, যেন তিনি পায়চারি করছেন। দূর থেকে শুনতে পাব সাদর আহ্বানে তাঁর গলা। শুনতে পাব পায়ের চলার শব্দ কাঠের মেঝেয়। দু-হাত বাড়িয়ে তিনি এগিয়ে আসবেন, আর অন্তরঙ্গ কথা হবে দু-জনায়, দুজন কমিউনিস্টে, মানুষে মানুষে যেন সমানে সমানে। ব্যস্ত তিনি কত কাজে, জানা-অজানায়, আছে কত চিন্তা তাঁর। ধ্বংস যুদ্ধ ঘিরে চতুর্ধার। তবু ভাবছি মনে, অন্তত মিনিট পাঁচ কথা হবে। তিনি তো জানেন আসছি, দূর থেকে। বলবেন, বসুন। বসব তাঁর পাশে। তিনি শুধোবেন ঢের কথা, মৃদু হাসি ফুটে উঠবে ঠোঁটে।

ঐ সারিবদ্ধ শুধু মানুষ মানুষ, অসংখ্য অগণ্য ; তাঁরা নতশির সমাধি-প্রাঙ্গণে, মনে শ্রদ্ধার অঞ্জলি।

এমনি করে বয়ে যায় দিন মাস বছর, বয় নিরবধি প্রবাহে সময়। স্মৃতির সন্তাপ পড়ে থাকে। সমাধি-উদ্যানে রাখা বেঞ্চগুলির কাঠে মাখা লেনিনের দেহের উত্তাপ। এখনি পুরনো এই খুশবাগে হাঁটবেন তিনি, বিশ্রাম নেবেন, আর মানুষের ভবিষ্য ভাববেন। উত্তর পথিকদের জন্যে তিনি অবিরল রচনায় জাগর রইবেন।

জুড়েসমাধি-ভবন ছেয়ে আছে সান্দ্র শান্তি, স্তব্ধতা, কেবল গাইড-নারীর

শ্লথ উচ্চারণে স্তব্ধতায় ঢেউ। লেনিনের স্মৃতিভারে পড়ে থাকা এ-ঘর ও-ঘর ঘুরিয়ে দেখান তিনি। তাঁর সে-স্বরতরঙ্গভঙ্গে ঝলে উঠছে দেশপ্রেম ; স্বদেশের লেনিনসন্ধান, সিদ্ধি বিপ্লবে, ক্রান্তিতে। মানুষের ভবিষ্যৎ জলে উঠল সমুজ্জ্বল, মানুষের পূর্বাকাশে রক্তজবাসঙ্কাশে সুদিন। সে-কণ্ঠে নদীর স্রোত কথা কয়, সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার জয়। আমরা সে-গাইড-নারী কেন্দ্রে রেখে বৃত্তে উপছে পড়ি, কণ্ঠে পৃথিবীর বসন্তউল্লাস, যেন চিরযৌবনের লাবণ্য-বিভাসে কথা কয়। যুগযুগ নির্যাতিত লাঞ্ছিত মানুষ, তারই মুক্তির সন্ধানে-অনাগত ভাবী মানুষের জন্য শান্তির জীবন খুঁজে, লেনিন জুঝলেন, সঙ্গী সাথী বন্ধু, অবশেষে জয়।

লেনিনপ্রয়াণ বর্ষে চার বছরের খোকা হাঁটি হাঁটি পায়ে পায়ে চলেছি জীবনে। সে-জীবন সংগ্রামের, সে-জীবনে দিগন্তে তরুণ জয়সূর্য ডাক দিল, যাত্রা করো যাত্রা করো যাত্রীদল স্বদেশমুক্তির রণাঙ্গনে, শপথসাধনে কিংবা সর্বস্বপাতনে।

আমার জন্মের লগ্নে মা আমার খবর পাননি, এক নবীন দেশের জন্ম হলো। যেখানে মানুষ আর একা নয়, অন্য মানুষের নাম সাথী বলে ডাকে। একে অন্যে সহায়তা দেয়। সে-এক আশ্চর্য দেশ, সে-দেশের সার সত্তা-স্বপ্নগুলি সত্য হয়ে ওঠা। সে-এক অবাক রাজ্য, হাঁটু ভেঙে মাথা কুটে দেবতার পায়ে কেউ অশ্রুতে আকুল হয়ে প্রার্থনায় যাচ্ঞায় সহায়শূন্য নয়।

দৃষ্টি খুলল ফিরল হুঁশ
কর্মঘন নিষ্ঠ মানুষ, কাজকর্মের আলোকপাতে
দেশ ছেয়েছে বিজ়লিজালে
ট্রেন ছুটেছে গতির তালে রাতদিবসে দিবসরাতে
কবিতা ফুটে মালার মতো
লক্ষ হাজার গ্রন্থ কতো লেনিন যেন পূর্ণ তাতে
কারখানাতে চুল্লি জলে

হিরণবরণ-ফসল দোলে তরুণকণ্ঠে সুর হাওয়াতে।
ফুলবাগে ফুল কেমন ফোটে
হাওয়ায় কেমন সুবাস ছোটে, লেনিন ভাবনা পরাগ সাথে।

আধফোটা সব গোলাপ ফুলে
পুষ্পপুঞ্জে শাখায় মূলে লেনিন নামের জয়গাথাতে।
শঙ্কাহরণ যাত্রা পথে
ঝড় ঝাপটায় বিঘ্ন হতে রক্ষী তিনি অভয় হাতে

তিনি তো নায়ক, নেতা কমিউনিস্ট ব্রতী বাহিনীর, তিনি বন্ধু ক্ষুধার্ত পীড়িতদের, তাঁর নামে সৈনিকেরা বিশ্রামে বিমুখ। ঐ চাষী, মেহনতী মানুষের সঙ্ঘবদ্ধ দল সমাগত সমাধি-চত্বরে। উন্মুখ আশায় তাঁরা যেন এই শতকের সতের সালের দীপ্ত দিন। বিশ্বে জয়ী হবে স্বাধীনতা। দুনিয়ার সুশাসন-ভার নেবে মেহনতী মানুষ নিশ্চয়ই।

লেনিন আছেন, লেনিন অন্তরঙ্গে আছেন অন্তঃকরণে
পথের দিশারী শ্রমতরঙ্গভঙ্গে রাঙা ভবিষ্য শরণে
ভেঙে গড়ি তাই বিশ্ব তাঁরই সঙ্গে, চলেছি দৃপ্ত চরণে

সিঁড়ি বেয়ে যেতে ভাবি, আর, লেনিনের অধ্যয়ন ঘরে
চিন্তাকুল, সিঁড়িতে পা তাঁর কিছু চিহ্ন রাখেনি কি ধরে
পারে নাকি কালের প্রহার স্মৃতি মুছে দিতে চরাচরে ?

এই তাঁর হাওয়ায় ছ্বসিত বড় পাঠগৃহ। সারা রাত জেগে বসে ঐ তাঁর লেখার টেবিল। সূর্যালোক ছলকে যায় ঘরের মেঝেয়। সাজানো কেতাব খাতা উন্মন আকুল হয়ে লেনিনের প্রতীক্ষায়। না-ওল্টানো পাতা দোলে দেয়ালের ক্যালেণ্ডারে। তার কিছু ওপরে টাঙানো, দুলছে হাসিমুখ ছবিতে চেখভ।

তারিখ একুশে জানুয়ারি। না-ওল্টানো পাতা ক্যালেণ্ডার।
যুগযুগান্ত ধরে রাখবে তারি অফুরন্ত প্রতিধ্বনিভার
তাঁর মৃত্যু হয়নি তা মানি। চিরযাত্রী, মানুষের সাথী।
চিরঞ্জীব তিনি। তাঁর বাণী; তাঁর দীপ্তি প্রভাত-সম্পাতী।
কত না শতাব্দী যাবে চলে, মানুষের হৃদয় মন্দিরে
কালজয়ী কল্যাণকল্লোলে লেনিন তারকাদীপ্তি শিরে।

জন্ম নেবে এ-গ্রহে যারা ভবিষ্যতে তখন আর
মানব জাতির এমন প্রেমিক মিলবে কি আর তুল্য তাঁর
তিনি আছেন সঙ্গে সবার বিশ্ববাসীর ধ্যান মননে
জীবনপ্রেমিক কালের পথিক, কল্যাণ কাজ সম্পাদনে।

সারা সোভিয়েত ঘুরছি, সারা গ্রীষ্ম। পরিচয় ঘটে জনে জনে। মনে জেগে উঠে শেষে ঢলে পড়ে কত প্রশ্ন, সে-সবেরও বিনিময়, ব্যাখ্যা মেলে। আর, দেখলাম বিস্তৃত বনরাজি নীলা, সীমাহীন দেশ, সমুদ্র, সুনীল হ্রদ, সমতল, উদ্ধত পর্বতশৃঙ্গ, নতুন ও পুরাতন জনপদ। নগর-নগরী। সাইবেরিয়া যেন স্বপ্নপরীস্থান। ঘুরে দেখছি এখানে সেখানে। বাজার, বিপনি, মাঠ, রেড স্কোয়ার, সুদূরতুন্দ্রায়। লেনিন আছেন সব ঠাঁই। ঐ তিনি রয়েছেন শ্রমের কর্মিষ্ঠ হাতে গঠনে যোজনা-কল্পে। ধক ধক ইঞ্জিনে, কিংবা চাকার ঘূর্ণনে। সকলের সঙ্গী তিনি, সকলের অভীপ্সা, বান্ধব, পরিজন। সকলেরই ভাই।

ভেসে ওঠে চোখে মস্কো। শীতার্ত জর্জর সেই দিন।
এখানে ওখানে স্তূপে প্রজ্জলিত অগ্নিশিখা, রাস্তায় রাস্তায়
উদ্দাম নিষ্ঠুর বায়ে শোকগ্রস্ত পতাকা উড্ডীন
অন্তহীন চলেছে মানুষ, শেষের বিদায় দিতে, ধীর পায় পায়।
চলেছে চলেছে, বুকে নিয়ে ফেরে একটুকরো বেদনা অশেষ
শেলবিদ্ধ, কোনো ভাষা বোঝাতে পারে না মাত্র লেশ।

ভাবি না, আমি ভাবি না লেনিন প্রয়াত নাকি মৃত
ভাবি না, তিনি কথা বলায় স্তব্ধ নাকি আজ।
ঐ তো তিনি জীবিত, তিনি জীবনে বিধৃত
জানি রুশের প্রবল শীতে দুটি বাহুর মাঝ
জননী যেন শিশুকে রাখে সুপ্তিস্নেহ মুড়ে
আদর করে বুকের ওমে বালাই থেকে দূরে।

জানুয়ারি। গলায় আলোর মালা নিশীথিনী। তবু আকুল বাতাসে বাজে বাঁশি। মৃদু কণ্ঠে পড়ে শোনাচ্ছেন ক্রুপস্কায়া মর্মন্তুদ কাহিনী 'জীবন তৃষা'।

বাতাসের আক্রমণে মর্মরিত বাইরে বৃক্ষশাখা। জগত উন্মুখ ছিল শুনতে সেদিনের বিবরণ। সে দিন তো অমরতা এসেছিল আমাদের ঘরে, অশুভ মৃত্যুকে চূর্ণ করে, বিঘোষিত জীবনের জয়ে।

যে দিকে চাই লেনিন, ঐ লেনিন
শক্তি তিনি, পথ চলার গতি
চলেছি তাঁরই সঙ্গী, তাঁরই ব্রতী
আনতে চাই আকাঙ্ক্ষিত দিন।

অনুবাদ : গিরিজাপতি ভট্টাচার্য

ভিয়েতনামের এই মহান কবির রচনা আমরা ইতিপূর্বেও প্রকাশ করেছি।

—সম্পাদক

দিগম্বরী ছায়া

আবুবকর সিদ্দিক

পথ বটে। হাজার হাজার মানুষের পায়ে চলা পথ। শুধু মানুষ কেন? কুকুর গরু ছাগল মোষ সাইকেল রিক্সা আলতু ফালতু সবার লাথি খাওয়া তোবড়ানো পথ। তবু পদবী আছে। বনেদী টাউনের রোম-ওঠা ল্যাজের মতো। নামেই ধড়াচূড়া। তলায় তালপাতা। খান বাহাদুর রোড। হাজার হাজার পায়ের ঘায়ে বাহাদুরী যা, তা সব ফেরারী। বুকের মাংস খুবলে-খাবলে খান খান। কোনোমতে ভিমি খেতে খেতে খেয়াঘাট পর্যন্ত এসে জিভ ঝুলিয়ে হাঁপায়। ওপারের পানিতে সবুজ কালো ছায়ার হাতছানি দেখে দাপায়।

হাঁ। শহরের বিগতবিত্ত মধ্যবিত্তরা কুচোকাঁচা চাকরি চটকায়। মাসের শেষে রাত জেগে বৌয়ের সঙ্গে জীবনদর্শনের পাঁশ ঘাঁটে। সকালবেলায় সরলাঙ্ক সরল করে ভিতরে ঢুকোতে না পেরে এ্যাণ্ডাপ্যাণ্ডাগুলোর মাথায় রুলকাঠ ভাঙে। সন্ধ্যের পর রেডিওতে আবদুল আলীমের পল্লীগীতি শুনতে শুনতে হৃদয়পিণ্ডে গোঁত্তা খায়—আহা রে! গেরামে কী শান্তি। এপার দাপায় দূরে বসে ওপারের ছায়া দেখে।

—ধুস্ ছাতা! তার চেয়ে একখান খেয়া যদি পাতাম এই রহম।

নদীর মাঝামাঝি এসে রহম ভাবতে ভাবতে প্রায় সাত্ত্বিক হয়ে উঠল। গাঁয়ে কাতরানি কোন্দল। টাউনে গুলতানি গোল। বাঁচি কোথা? বাড়িতে হরেক হ্যাপা। মা কঁকায় সূতিকায়। দেড় বছর দু-বছর অন্তর অন্তর বিয়োতে বিয়োতেও টিকে আছে। বাপের টেপাটেপির অন্ত নেই। ফাঁক-ফোকর পেলেই রহমের পকেট টেপে। পাঁচটা কী দশটা পয়সা খরচ করে টিপেটুপে। কিছু যদি না পায় হাতের কাছে ত রহমের বিয়েয় পাওয়া ট্রানজিস্টার-এর নাক টেপে একা একা। বৌটা আরেক কিসিম। কোলের বাচ্চার পালো এ্যারারুট মিশ্রি হরলিক্স চুরি করে গালে পোরে। আর, বাচ্চাগুলোর কথা ত ভাবতেই পারে না রহম। ওদের পানে তাকাতে সাহস হয় না। যেন বিদ্রোহের কালো পতাকা এক-একটা। ভবিষ্যতের বাতাসে

বেআইন বীজাণু ছড়াতে উদ্যত। ভাত-কাপড় লেখা-পড়া বায়না কুকম্মো-অকম্মের ঠেকা দেওয়া—বিয়ে-শাদী দেওয়া—এঃ আল্লা! এর চেয়ে প্লাস্টিক কয়েলে পয়সা কম।

কিন্তু বদ মেয়েমানুষটার ন্যাকামো সতেরো আনা—আমার ক্যামন জানি ব'য় অরে। শফীর মা বালোমানুষ, নিয়া রোগ বাদাইছে।

—ওঃ, এর চেয়ে—এর চেয়ে—লে বাবা! কী এর চেয়ে? কিসে যে রেহাই তা আর মাথায় আসে না। এত সহজে যদি মাথায় আসবে, তাহলে ত রহম আলী এতদিন আর সিনেমার কাউণ্টারে টিকিট বেচার নোকরি করত না।

রোজ রাতে বারোটার পর বড়সায়েব এসে ওর গুণে রাখা টাকাগুলো হাতব্যাগে পুরে নিয়ে যায়। ম্যানেজার কানাইবাবু তার পায়ে ঘোরে লটকে লটকে। বাঁধানো দাঁত বের করে ভক্তিরসের গ্যাঁজা জমায় দুই কষে। বড় সায়েব যাবার পর ফিরে এসে দরজা আঁটে। ফাউ পয়সার বখরায় ঘাপ্টি মারে রহমের কাঁধে হাত রেখে।

রহম আলীর আপন মনের গুলতানিতে বৈঠা মারল ধলা মিয়া। পাশ-কাটানো টাবুরে নাও থেকে হাঁক দিলো—ও রহম বাই! কী বই অতিছে হলে?

—বাঘী সেপাই।

—রূপবান আসতিছে বুলে?

উঃ। চদরীর আউশ কত! মাথায় চুল নাই, বগলে বাবরি। সখ দেখে গা জ্বলে রহমের।

গাঁয়ের মাটিতে নেমে ফের রগ চটে। দুই ছেলে মামদোবাজী করছে খেয়াঘাটে। একটা প্রায় ন্যাঙটা। অন্যটার নাক ছড়ে রক্ত বেরোচ্ছে। খেলা ভঙ্গ দেওয়া ছেলের দল খেয়া ফেলকরা যাত্রী রিক্সাওয়ালা সবাই সহানুভূতি-বশে জায়গাটায় বড় করে ফাঁকা রেখে চারপাশে গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। চোদ্দ পুরুষের ডিক্রি পাওয়ার মতো পাছা উঁচিয়ে লাফাচ্ছে। জুয়োড় দিচ্ছে। রাগের মাথায় উর্দু বেরিয়ে গেল মুখ থেকে। বাঘা সেপাইয়ের কুদরত।

—শালা বানচোত কা বাচ্চা। হারামিকা পয়দা।

ধাবড়া হাতের থাপ্পড় খেয়ে দুই সেপাই কাঁদতে কাঁদতে ঘরমুখো।

তারো চেয়ে জ্বালাশালটু বাদামতলার মোড়ে।

পেঁচীর মা তাকে দেখে বিশ হাত দূর থেকে ঘোমটা ঝুলিয়ে কচুবনে নেমে

গিয়ে দাঁড়াল। নাগালের মধ্যে আসতেই তামাক ঘষা দাঁত নাচিয়ে নথ নাড়িয়ে বলল—অ বাপ রহমান। তোমার শরীলডা সুস্ত অইছে ত?

ওঃ হো। সেই মাসখানেক আগে দিনচারেক নাক দিয়ে রক্ত পড়া শুরু হয়েছিল। এখনো তার জের। এ সব দরদের মাথায় চোরাদায় চেপে বসে সজাগ না থাকলে। তাই সাবধানে এককানচি হাসতে হলো রহমকে।

—আমাগো কি আর বিছেনধরা হলি চলে চাচী? প্যাটের টানে খাড়াও অতি অয়, দোড়োতিও অয়।

কথা বলতে বলতে রহম হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছিল। ফস করে বলে ফেলল পেঁচীর মা—তা কী শোনলাম য্যান—মানে ধুত্তোরি ঐ তোমার—রূপবান নাকি আসতিছে তোমাগো টকীর গরে?

—রূপবান? তা তা তুমি চাচী? ওঃ হয় হয়—তা আসবে ত। আসবে। এই ত সামনের শুক্কুরবার।

—আর বাপ বুড়ো অয়ে আলাম পেরায়। কবে জানি ডাক আসে তেনার তরফথ্যে। পেচীর বাপ ত আগেই গেইছে। সেই বিয়ের বছর সেরাজদ্দৌলোর পালা ছাহাইল সাতে নিয়ে……

পেঁচীর মা মধ্যিপথে টাটকা দিনের বেলায় সত্যি নাক ফোঁপাতে লাগল।

—কান্দে না চাচী। জীবনের এ্যাট্টা আউশ জানাইছ। ঠ্যাহে কিসি? যাবা ছ্যামড়িগো সাতে। দেবানি চুহোয়ে।

রূপবান রূপবান রূপবান। গ্রাম টাউন মুল্লুকভর এক রব। ছাও-বুড়ো ভাদ্দুরে কুকুরের মতো খেপে উঠেছে।

ঘরে ফিরে গোসল করে খেতে খেতে বেলা প্রায় পগারপার। বৌটার সারী শরীর। খেপলে অল্পে ফেরে না। ছেলে দুটোকে মারার শোকে রহম আলীর চোখের উপর কুঁদে কুঁদে চিরেট খেয়ে পড়তে লাগল লেঠেলের মতো। অসহ্য হয়ে রহম দুই দাবড়ি কষতেই অমনি লাইন পেয়ে গেল। মাটিতে পড়ে ঘাড় ঘোরাতে ঘোরাতে দাঁতকপাটি ছিরকুটি লাগিয়ে দিল বৌটা। অগত্যা রহম পানি ঢেলে কাদা করে ফেলল উঠোন জামতলা বৌয়ের গা। একটা মাই ভেজাকাপড়ে কাদায় দম মেরে থমথম করছে। বুড়ো বাপজী বারান্দায় বসে কুঁই কুঁই করে তাকাচ্ছে। কোলেরটা এত কাণ্ডেও জাগেনি। লাল মশারির মধ্যে শুয়ে ঘুমের ঘোরে চুক চুক করছে। ছেলে দুটো হিল্লীদিল্লী করে বেড়াচ্ছে। ভাই-বোনগুলো সার দিয়ে দাঁড়িয়ে। বুড়ি মা কুঁততে কুঁততে বেরিয়ে এসে হঠাৎ

বুড়োকে লাগাল ঠ্যাঙানি। আরেক কারবালার বিসমিল্লা। রহম তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে গিয়ে মাথায় তেল ঘষতে লাগল।

খাওয়ার সময় মা পিরিত দেখিয়ে নিজে বসে খাওয়াল। আর সেই ফাঁকে ক্যানক্যান করে লাগিয়ে দিল পাঁচ বছরের শুঁটকি ফুসলোনি—ও আপদ আর কতকাল ঝুলোয়ে রাখবি? ডাক্তার-কবিরেজে তো ঘোড়াও হলো না। এ্যাহন যাগো গলার জেল তারা আ'সে নিয়ে যাক।

বড়লোকের সুন্দরী মেয়ে আনার জন্যে তখন মারই গরজটা বেশি ছিল। তারপর কমলার মৃগীরোগ প্রকাশ হয়ে পড়লে সেই মা উল্টো ফোঁড়ে সুঁই ধরেছেন। শার্টের বোতামের মতো। একটা ছিঁড়লে আরেকটা লাগাও। ম্যাচের কাঠির মতো। একটায় না জ্বলে, আরেকটা ঘষো। আজকালকার সিনেমার কেস্‌সার মতো।

বিকেলের দিকে বদজোড়ার মাথায় টর্চের গাঁট্টা মেরে বই সামনে দিয়ে বসিয়ে বেরিয়ে এলো রহম। আসার সময় বাপ শুয়ে শুয়ে আওয়াজ দিল —বাপ রহম নাকি?

—হ। ক্যান?

—আ'জ নিউজি মোনাম খাঁ কইছে ছাশে আর চা'লির অভাব থাকবে না। এক বছরের মধ্যি সব মিটে যাবানে।

—তয় আর কী! ঐ আরামে থাহো।

—ওরে না রে। চা'ল আসতি লাগিছে চীনিরথ্যে।

—থা'ক। আর কিছু কবা?

—এক প্যাক বগা ছিকারেট আনিস।

এর নাম ঘোড়ারোগ। গাঁশুদ্ধ লোক পাইকেরি উপোষ মারছে। গম ভুট্টা চিবিয়ে পায়খানাটুকু দামী ওষুধের ক্যাপসুলের মতো করে এনেছে। ধারকর্জের টানাটানিতে চামড়া ছোলাছুলি চলছে। এরো মধ্যে ওঁর ছিকারেটটি চাই।

আরো কড়া নেশায় বুরবাকের মতো সুখ পেতে আসে সিনেমাদর্শকগুলো। আপিস-সংসার-দোকান-বাজার-পথ-ঘাট সব এক একটা পাওনাদারের খাটাল। দুঃখের ডাঙশ মেরে মেরে জ্যান্ত রাখে। গুঁতো খেয়ে খানিকটে শস্তা স্বস্তি কেনার জন্যে গুঁতোগুঁতি করে এসে ঢোকে বড়সায়েবের রাঙা গুদোমে। হল থেকে বেরিয়ে এসে ফের গুঁতো না খাওয়া অবধি কেউ নাগর, কেউ আদর্শবাদী,

কেউ যোদ্ধা, কেউ বা আওয়ারা। ঐ সব বানানো সুখের লোভে গাঁ থেকেও লোক ছোটে। নতুন ধান বেচা গেরস্ত পয়লা বিয়ের দম্পতি ডুংগা মার্কা কাপ্তান ছেলে। ওপারের সিনেমা হলের গান ভেসে আসে সন্ধ্যের বাতাসে। টাউনের রেস্তোঁরায় ঝকঝকে আলোয় চা মামলেট বিস্কুট। স্কুল-কলেজ ছুটির পর রাস্তা বেয়ে পরিষ্কার মেয়েছেলেগুলোর ঘরে ফেরা। আরো কত কী। কামুকীর চোখের মতো টাউনের মায়া টানতে থাকে গাঁইয়াদের। খান বাহাদুর রোডের কুচো ইঁট ছিটকে ওঠে তাদের পায়ের সাহসে।

খেয়া নৌকোয় বসে মাথা টিপছিল রহম। রগ লাফাচ্ছে দুপুর থেকে। কানাইবাবুর ধাতানি আছে আজ কপালে। শো শুরু হয়ে গেছে এতক্ষণে। মান্নানই সামলে নিয়েছে মনে হয় সাঁঝের ভীড়। অবশ্য লোক নেই এ-বইটায়।

—কী মেয়া? চিনতি পারো? না চাকরীতি ঢুহে ভুলে গেছ? রহম ঘা খেয়ে খানিকক্ষণ বোকার মতো চেয়ে থাকল। তারপর চমকে উঠে লজ্জায় জড়িয়ে বলল—তওবা তওবা। কী যে কন। বালো আছেন ত?

—হ বাই বালোই আছি। বেহেশতের মতন।

রহম উত্তর দিল না। দেশের এখন দুঃসময়। না খেতে পাওয়াটাকে যার যেমন মর্জি রসিয়ে বিষিয়ে ব্যক্ত করছে।

হঠাৎ চোখ-মুখ সুঁচলো করে আরো কোল ঘেঁষে এলো মহব্বত আলী। কানে কানে বলল—দিছি কা'ল রাতি খতম অরে।

—এ্যা?

—হ মেয়া। ওর হাত চেপে ধরে মহব্বত আলী। চোখে কুলটা খুশির খেমটা-খেউড়।

—খবরদার। কবিনে কোনো ব্যাটারে। নমিজুদ্দিরে দিছি ফতে অরে। রামদাও দে কুচোয়ে বস্তায় ভরে দিছি গাংগে ডুবোয়ে। সাথে আধমণী কলস।

রহমের মুখ সেঁটে গেছে।

—তিন পুরুষির শত্তুরতা। নমিজির চাচারে খুন করিল আমার বাপে। নমিজ কোপাইছে আমার ম্যা'ভাইরে। আমি জন্মের শোধ দিয়ে আইছি নমিজরে। আজ এট্টু বা'স্কোপ ছাহতি অবে।

রহম শুধু টের পেল, তাহলে খেয়ানৌকোও নিরাপদ ঠাঁই নয়। বাঁচার

ঠাঁই নেই। এপারে। ওপারে। মধ্যিখানে। না। কোথাও না। মরবে? সে-মুরোদও নেই। বাপ-মা বৌ-বালবাচ্চা—এতগুলোকে নিয়ে মরার আয়োজন করা—সেও ত এক আমীরী খায়েস।

রাত বারোটার আগে বড়সায়েব এলেন। আঙুলের ডগায় মুক্তি কিমাম চাটতে চাটতে। ছিনাল মেয়েদের মতো ঢলাঢলি করে মিশতে লাগলেন সব পাতি কর্মচারীদের সঙ্গে। কেমন একটা অনভ্যস্ত নার্ভাসনেসে ঘেমে উঠল রহম আলী।

সবাইকে ফান্টা খাইয়ে আরো বিপন্ন করে তুললেন। তারপর নিপুণ ফায়ারম্যানের মতো এক লহমায় সবাইকে ফাঁদ থেকে ছাড়িয়ে নিলেন।

তাঁর প্রথমা কন্যারত্ন। এম· এ. পাশ করে বেকার বসে দামী গয়নার মতো শোভা বাড়াচ্ছিল পিতৃগৃহের। আজ তার বিয়ের সম্বন্ধ পাকাপাকি হয়ে গেল। ছেলে জুট টেকনলজি পড়তে ডাণ্ডী যাচ্ছে। যাবার আগে বড়লোক বাপের শাঁসাল দান কবুল করে যাচ্ছে। কানাইবাবু খুশিতে ফ্যাঁচ করে কেঁদে দিল মাপসই। বড়সায়েব তাকে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

এসেছিল সবার সহযোগিতা চাইতে ওরফে জাঁকটা জানান দিয়ে মন পাতলা করতে।

—আহা! এমন বিনয়গুণ না থাকলে কি আর এত বড়লোক হয়?

—ঠিকই। মিঠে না হলে কড়া হয় কী করে?

হঠাৎ ঠোঁট ফস্কে কথাটা বেরিয়ে গেল রহমের। আর বাড়াবাড়ির সুযোগ না রেখে বাইরে বেরিয়ে এলো।

পথে এসে পা দুটো বেহায়া লোভে ঘুস ঘুস করতে লাগল। যাবে নাকি একটু বড়সায়েবের মেয়ের কাছে? অনেকবারই ত গেছে। নানান অজুহাতে নাসিমা ওকে কাছে এগুবার প্রশ্রয় করে দিয়েছে। কে জানে, রহমের দেওয়া ভ্রুণ বয়ে নিয়ে সে উঠবে কী না বিদেশগামী স্বামীর পাল্কিতে?

শহরের এম· এ. পাশ নাসিমার হাবলা হাবলা বকুনির ছিটেফোঁটা কানের মধ্যে রণ রণ করে ওঠে এখনো—ইস! আপনারা ভিলেজ লাইফ লীড করেন। আপনার উপর খুব জেলাস আমি। জীবনানন্দের রূপসী বাঙলা কী ফাইন!

টাউন থেকে একরাশ গোঁজামিল ভাবনার বোঝায় কুঁজিয়ে ঘরে ফিরল রহম। রাত সাড়ে বারোটার পরে।

খান বাহাদুর রোডের পাশে পাশে ইঁটের স্তূপ। নতুন করে পাকা হবে।

দেড় লাখ টাকার কণ্ট্রাক্ট নিয়েছে তাদের বড়সায়েব হাজী তরীকতুল্লা। লোকে বলছে ভাঙা রাস্তার কপাল খুলল। এবারে একেবারে পাকা রাস্তা, মানে রাজপথ, হয়ে যাবে। হাজী সায়েবের বাস সার্ভিস চলবে। লোকের আর কষ্ট থাকবে না।

রহমের ছেলেপুলেগুলো হাঁটবে পাকা রোডের উপর দিয়ে। ব্যথায় না হাসিতে বোঝা যায় না গোঁফের ডগা চুমড়ে নুয়ে গেল।

পাকা রোড কাঁচা রোড হতে ক বছর আর লাগবে? পাঁচ বছর? সাত বছর? তার বেশি কিছুতেই না। বারকয়েক পাকা বানাবার দায়িত্ব পেলে বাকি মেয়ে দুটোকেও প্রথম জামাইয়ের স্ট্যাণ্ডার্ড মতো পাত্তরের হাতে তুলে দিতে সুবিধে হবে বড় সায়েবের। চাকরীর মালিক বড়সায়েবের কল্যাণচিন্তায় রাস্তা কাবার হয়ে গেল।

ফের সেই খেয়া। ও বেলা যাকে মনে হয়েছিল বাঁচার ঠাঁই। অন্তত দু-পারের কামড়াকামড়ি থেকে। এখন আর কোনো ভিত ঠাহর হলো না সেই ভরসার পাটাতনে বসে।

ভোলাযুগী হালে পেট বাধিয়ে খেয়া বাইছে। সকালে সে-পেটে চিঁড়ে-পানির জাউ কিছু পড়েছে কী না সন্দেহ। হালে শব্দ উঠছে কচাৎ কচাৎ করে। যেন পেটেই শব্দটা হচ্ছে। সে-পেট চোপসানো। ফাঁসানো। হালের সঙ্গে প্যাঁচানো। নেতানো। খোলামেলা নদীর উপর শুকনো খেয়ার কাঠামো আর তার গলায় ভোলাযুগীর হালকামড়ানো শুকনো দেহটা চাঁদের আলোয় জ্বলজ্বল করছে। রহমের বুক ঘুলিয়ে উঠল বমির তাড়নায়।

সন্ধ্যের দিকে এই খেয়ার উপর বসে মহব্বত আলী খুনের খবর জানিয়ে গেছে। বুকের মধ্যে বমি নয়। রক্ত ছলাত ছলাত করছে রহমের। বুকে নয়। নৌকোর গলুইয়ে। ফুটো দিয়ে তেড়ে ওঠা পানি ওলট পালট খাচ্ছে। মহব্বত আলীর রামদাও বেয়ে কত রক্ত ঝরেছে কে জানে?

বেশি বিদ্যের মানুষ নয় বেচারা রহম আলী। আই. এ. পাশ করে অভাবের টানে কলেজ পালিয়ে গো ব্যাক টু ভিলেজ। বেশি জটিল করে বেশিক্ষণ ভাবা তার কুলোয় না।

পাড়ে নেমে সর সর পা চালিয়ে ঘরে ফিরে এলো।

উঠোনে জামগাছের ডালে প্যাঁচা ডাকছিল। হাততালি দিয়ে তাড়িয়ে

দিল সেটাকে। রাতে বৌয়ের মাথা হাতের উপর নিয়ে শুয়ে শুয়ে রহম খোদাতত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞান দান করছিল। এই একটিই তার বগবগানি নির্বিকারে গেলার মতো একেবারে খাস তালুকের অধীন প্রজা।

—আমাগো কষ্ট কি ঘোচবে না?

রহম চোখ বুজে কপালে ভাঁজ বসিয়ে বলে—খোদায় মালুম।

—হয়। খোদাই ত রিজিকদেনেওলা।

—খোদা মউতেরো মালিক।

—আচ্ছা। আমাগো দুঃখু দেহে খোদার পরান পোড়ে না?

—আরে না! খোদার চামড়া পুরু অয়ে গেইছে নালিশ শুনতি শুনতি আর দুঃখু দেখতি দেখতি। সে-চামড়া ভেদ করে এ্যাহন আর পরানডা তামাৎ পৌছায় না কিছু।

—বান্দার জন্যি কি কান্দে না এট্টু? আপন বাচ্চা সব।

—আলো বোগদা। আমাগো খোদা কি বিয়েশাদী অরিছে নাকি হিন্দুগো মতন? বৌ নেই তার ছোয়াল পোয়াল। তার আবার কান্দন চান্দন।

কথা বলতে বলতে রহম ঠ্যাঙ তুলে দিল বৌয়ের গায়ে।

—উহু। আর না।

—বা! কেন?

রহমের হাত টেনে নিয়ে বৌ তলপেটের বাঁ-দিকে আবছা একটা ঢিবির উপর রাখল।

—অ! খালি খালি মা'ইয়েপাহী ডাহে বাড়ির পরে। আমার কষ্টের ভাত গাদাবি একধারদে, আরাকধারদে বিয়েতি থাকবি গণ্ডা গণ্ডা। জান পয়মাল খোদা। কান্ধে আর সয় না।

একটা হাই তুলে পাশ ফিরে শুলো বৌ।

নদীর এপাড়ের গাঁয়ে সবুজ হাতছানি জলছবি তার ন্যাংটো স্বরূপে মূর্তিমান হয়ে উঠতে পেরেছে এতক্ষণে। রাত্তিরের রঙ বলতে একে কালো, তার উপর জ্যোছনার আয়নায় দিগম্বরী ছায়া আরো মোক্ষম নিকষ হয়ে উঠেছে।

এস. ওয়াজেদ আলীর সাহিত্যভাবনা

গুরুদাস ভট্টাচার্য

এস. ওয়াজেদ আলীকে বাঙালি (হিন্দু) পাঠক-পাঠিকা চেনেন একটিমাত্র প্রবন্ধের মাধ্যমে। তার নাম : 'ভারতবর্ষ'।

হয়তো তাঁকে স্বজনও মনে করেন। যেহেতু, মুসলমান হয়েও তিনি হিন্দু-ঐতিহ্যের কালজয়িতার ছবি এঁকেছেন। এতদ্বারা শিক্ষিত হিন্দুর অন্তর-নিহিত সুপ্ত সম্প্রদায়-চেতনা পরিতৃপ্ত হয় কিনা অথবা কতোটা হয়—তার বিচার সমাজ-বিজ্ঞানের এলাকাধীন। সে-আলোচনায় আপাতত যাব না।

অন্যপক্ষে, এই একটিমাত্র নিবন্ধ থেকেই জনাব আলীর মানসিকতার স্পষ্ট ছবি পাওয়া যায়—মধ্যযুগীয় সংস্কারমুক্ত একটি পরিপূর্ণ রেনেশাঁস-ব্যক্তিত্ব। আলিগড় ও ইংলণ্ডে শিক্ষিত এই 'মুসলমান' বুদ্ধিজীবীর যাবতীয় রচনার দুটি লক্ষ্য ছিল : (ক) স্ব-সম্প্রদায়কে গতি ও শক্তিতে উদ্বুদ্ধ করা ; (খ) ইসলাম-সংস্কৃতির ইতিহাস-আদর্শ-শিক্ষাকে, তাদের স্বরূপকে, নিজ সম্প্রদায় এবং ভিন্ন সম্প্রদায়ের সামনে তুলে ধরা। এবং এই দুটি লক্ষ্যেরই কেন্দ্রবিন্দু ছিল : মনুষ্যত্বের অনুশীলন এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়-অধ্যুষিত ভারতে আধুনিক সামবায়িক রাষ্ট্রগঠনের আন্দোলন—পত্রিকাধৃত পূর্ববর্তী নিবন্ধে যার পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছি। (এস. ওয়াজেদ আলী এবং ভারতের হিন্দু-মুসলমান সমস্যা। 'পরিচয়', মাঘ-ফাল্গুন, ১৩৭৫।)

রেনেশাঁস-ব্যক্তিত্ব এস. ওয়াজেদ আলী। একদিকে যেমন যুক্তি-বুদ্ধির সমীপ, অন্যদিকে তেমনি আবেগোচিত রোমান্টিক। জীবনাদর্শকে তিনি বোঝবার ও বোঝাবার চেষ্টা করেছেন বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে ; তাঁর শিল্পাদর্শ রোমান্টিক। উভয় প্রান্তের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া সত্ত্বেও একটা দ্বন্দ্ব থেকেই যায়। তাই দেখা যায়, তাবৎ রোমান্টিকের মেজাজে যুক্তি-আবেগের নিগূঢ় ভারসাম্য সত্ত্বেও উভয়ের দ্বান্দ্বিক ঘাত-প্রতিঘাত নিরন্তর। কিন্তু আশ্চর্য আলীসাহেবের মানসিক পরিমণ্ডল! বিবিধের সমাহারে যে-সমন্বয়ভাবনা তাঁর জীবনদর্শনে,

সেই সামবায়িক আলোকে তাঁর রোমান্টিক মেজাজও বিরোধহীন। সব-কিছুই যেন তাঁর কাছে স্বচ্ছ, সহজ, সমন্বিত, অবিরুদ্ধ এবং অনিরুদ্ধ! মন যেন গড়ানে পাথর—কিছুই বাধে না, কিছুতেই বাধে না! রোমান্টিক হৃদয়-অরণ্যে অপ্রত্যাজিত ব্যতিক্রম!

দুই

বাঙলা গদ্যের বিরলগুণ প্রাবন্ধিকদের অন্যতম এস. ওয়াজেদ আলী বাঙলা জানতেন না।

১৯১৫ সালে হাইকোর্টে আইন-ব্যবসায়ের রুক্ষ ভূমিতে প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর আলাপ ও ক্রমে ঘনিষ্ঠতা। শুধু লেখক নন, সম্পাদকও, সুপ্ত প্রতিভা আবিষ্কারে সিদ্ধহস্ত। তিনি আলীসাহেবকে বাঙলা শেখান; 'সবুজপত্র'-এ আত্মপ্রকাশ করে 'অতীতের বোঝা'। বাঙলা গদ্যের এক শক্তিমান শিল্পীর জন্ম হয়।

বলা বাহুল্য, আলীসাহেবের ভাষায় বীরবলী প্রভাব স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু সে-প্রভাবকে আত্মসাৎ করে তিনি নিজস্ব এক ভঙ্গিতে আত্মস্থ হতে পেরেছিলেন। তাঁর গদ্যে বীরবলী প্যারাডক্স স্মিত রূপ পেয়েছে সহজ সারল্যের স্পর্শ-কাতরতায়। স্বচ্ছতা, স্পষ্টতা, পরিমিতি, যাথার্থ্য, যুক্তিময়তা, তথ্যনিষ্ঠা ও ঋজু প্রকাশভঙ্গি তাঁর গদ্যের গুণ-লক্ষণ। বীরবলী ঢঙের একটি রূপান্তরণ-নিদর্শন: "আমি মুসলমান সমাজের বটে, কিন্তু তারও উপর আমি মানুষ। আমি ভারতবাসী বটে, কিন্তু তারও উপর আমি মানুষ। আমি বাঙালী বটে, কিন্তু তারও উপর আমি মানুষ।"

বাক্যগুলি যেমন অনুশীলিত ভাষার, তেমনি একটি সুস্থ সুরুচিসম্মত পরিশীলিত মানসিকতার নির্ভুল প্রমাণপঞ্জী। বস্তুত, ওয়াজেদ আলীর জীবন ও শিল্প প্রসঙ্গে নিজস্ব আদর্শ, বক্তব্য ও দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এবং তাঁর যাবতীয় রচনাবলী ও তদাশ্রয়ী ভঙ্গী, ভাষারীতি তারই প্রসারিত ব্যক্তরূপ। বীরবল-প্রভাবিত হয়েও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা তাই তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল; যা অধিকাংশ বীরবল-শিষ্যে অনুপস্থিত।

ওয়াজেদ আলী জানতেন, তিনি কী চান, আর কী চান না। সুলভ জনপ্রিয়তায় স্বগত আদর্শকে তরল বা বিকৃত কোনোদিন করেননি। পণ্ডিত ব্যক্তি তিনি, চিন্তাবিদ ও সমাজসচেতন। কিন্তু তাঁর রচনা পাণ্ডিত্যে

ভারাক্রান্ত নয়। হৃদয়সংবাদে ও মননশীলতায় উজ্জ্বল। তাঁর যাবতীয় ভাবনার বেদী : মানবতা। একাধিকবার তিনি বলেছেন : "মানুষ সাহিত্যের জন্য নয়, সাহিত্যই মানুষের জন্য। মানুষের মঙ্গলই হবে সাহিত্যের লক্ষ্য।" এই লক্ষ্যে স্থির থেকে "আমি যে মুসলমান সাহিত্যিকের কল্পনা করি, সে এই জীবন্ত dynamic শ্রেণীর মানুষ হবে। সে বর্তমানকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে না....সে হবে গতিশীল জীবনের মূর্ত একটি প্রতীক।" তাই তাঁর সুহৃৎসম্মত সতর্কবাণী : "উচ্চতম আদর্শ এবং শ্রেষ্ঠতম উপকরণের সাহায্যে বিমল আনন্দের পরিবেশনই সাহিত্যিকের কাজ।....সাহিত্যের সাহায্যে উচ্চতর মানুষ গড়ে তুলতে হলে যেসব সংস্কার, যেসব সামাজিক ব্যবস্থা, যেসব পারিপার্শ্বিক অবস্থা সৎ সাহিত্যের সম্যক বিকাশের প্রতিকূলতা করে, সে-সবের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ করতে হবে, সে-সবের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করতে হবে।"

শেষ উদ্ধৃতির প্রথম বাক্যটি—"সাহিত্যের কাজ আনন্দের পরিবেশন"—অনেকে মেনে নেবেন না, অনেক বিতর্কের ঝড় উঠবে, বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে বাতিলও হয়ে যাবে হয়তো বা। কিন্তু, যদি বলি, দ্বিতীয় উক্তি, দীর্ঘ বাক্যটি, লাল কালিতে আণ্ডারলাইন করে রাখার মতো, তাহলে নিশ্চয়ই কেউ আপত্তি করবেন না। কারণ, এর চেয়ে বড় কর্তব্য সাম্প্রতিক বাঙালি সাহিত্যিকদের আর নেই।

তিন

বিশ্বজগৎ এক মহৎ শিল্প, মানুষের সৃষ্টি তারই প্রতিবিম্ব, এবং কবি দ্বিতীয় প্রজাপতি—গ্রীক নন্দনতত্ত্বে, সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে, ইসলাম দর্শনে এই ভাববাদী তত্ত্বটিকে নানাভাবে ব্যক্ত ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। 'শিল্পী আর মহাশিল্পী' নামক ডায়ালগ বা সংলাপিকায় ওয়াজেদ আলী এই তত্ত্ব থেকেই যাত্রা শুরু করেছেন : "অন্তহীন বিশ্ব! শিল্পী তা থেকে রচনা করেছে ক্ষুদ্রতর এক বিশ্ব।" এই দ্বিতীয় ভুবনের একদিকে সীমা, অন্যদিকে অসীমতা—সেই রাবীন্দ্রিক লীলাবাদের বিচ্ছুরিত প্রতিভাস। এর সঙ্গে লেখক যুক্ত করেছেন আরিসততলীয় 'সম্ভাবনাবাদ' এবং আদর্শবাদ : "যা নেই আর যা থাকা উচিত—এর চেয়ে বড় উদ্দেশ্য আর কি?" মহাশিল্পী ও শিল্পী, দুজনেরই লক্ষ্য : "অসুন্দরকে তাড়িয়ে সুন্দর, অবিদ্যাকে বিদায় দিয়ে বিদ্যা, অশ্রেয়সকে ত্যাগ করে শ্রেয়োবোধ।" শিল্পীর প্রেরণা বিস্ময়, আনন্দ, আত্মচেতনা এবং সার্থকতা "সুন্দরের প্রতিষ্ঠায়"

সৃষ্টির আনন্দ, এবং এই সৃষ্টি 'প্রয়োজনাতীত' নয়, বরং "সমস্ত সৃষ্টিই তো প্রয়োজনের অকাট্য প্রমাণ।" এইখানে আলীসাহেব প্রমথ চৌধুরীর 'সাহিত্যিক আত্মলীলাতত্ত্ব' থেকে অনেক দূরে সরে এসেছেন। এ-প্রয়োজনের তত্ত্ব তিনি পেয়েছেন ইসলাম দর্শনের কাছু থেকে ঃ "ইন্নাজামানো কাদাস্তাদারা কাহিয়াতা ইউমা খালাকাল্লাহোস্‌সামাওয়াতে ওআল আরদে।"

জীবনের সমস্ত কাজ শেষ করে, সমগ্র আরবভূমিতে নবধর্ম প্রতিষ্ঠিত করে, মক্কায় বিদায় হজের সমাবেশে হজরত মোহাম্মদ বললেন ঃ "আল্লা সৃষ্টির প্রথম দিকে—যেদিন তিনি আকাশ ও পৃথিবী রচনা করেছিলেন, সেদিন—বিশ্বকে যে রূপ দিয়েছিলেন, মহাকাল ঘুরেফিরে সেই রূপেই তাকে ফিরিয়ে এনেছে।" [অন্য একটি ভাষণের উপসংহার ঃ] "সাহিত্যিক যদি বলতে পারে যে, ঐ রূপের একটা ক্ষীণ আভাস আমি দেখতে পেয়েছি, আর আমার কলমের সাহায্যে তাকে রূপায়িত করেছি, তাহলেই তার সাধনা সার্থক হবে।"

এক ভুবন ঈশ্বরের রচনা, দ্বিতীয় ভুবন তারই বিম্ব এই প্রত্যয়ভূমি ওয়াজেদ আলীর শিল্পতত্ত্বের। শিল্পী মহাশিল্পীর সন্তান। তুজনেই সৃষ্টি করেন কল্পনার সাহায্যে, অন্তর দিয়ে। তাই, "মানুষকে বারবার এইসব বাইরের জিনিসকে ছেড়ে নিজের অন্তরে ফিরে যেতে হবে" ('সাধনার লক্ষ্য')। কিন্তু তা বলে বাইরের জগৎকে তিনি অবহেলা করেননি। মানস-প্রতিমার পটভূমিকাও যে প্রয়োজন, সে-বিষয়ে তিনি অবহিত ছিলেন। 'পটভূমিকা' নিবন্ধে স্পষ্টতই বলেছেন, পটভূমিকাবিহীন শিল্পসাধনার প্রয়াস ব্যর্থ ঃ "শিল্পের সাধনা হচ্ছে সুরের সাধনা, ঐক্যের সাধনা। পটভূমির সঙ্গে বিষয়বস্তুর ঐক্য, এই হল চিত্রশিল্পের সাধনা। প্রয়াসের সঙ্গে বেষ্টনীর ঐক্য, এই হল জীবন-শিল্পের সাধনা। ভূমার সঙ্গে আত্মার ঐক্য, এই হল তাপসের সাধনা।" অব্যবহিত-ভাবে মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের সামঞ্জস্যতত্ত্ব ঃ ভূমির সঙ্গে ভূমার অবিনাযোগ। এই যোগপথেই রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা এবং জীবনদেবতার মরমীয়া অস্তিত্ব। এবং ওয়ার্ডসওয়ার্থও। তথা রোমাণ্টিক কবিমাত্রেই।

ওয়াজেদ আলীও একইভাবে অনুভব করেছেন ঃ "প্রকৃতি দেবীই হলেন সবের সেরা শিল্পী—শিল্পীদের রাণী।....আর্টের রাণী, আর্টের মন্ত্রের জন্য তাঁর কাছে যাওয়া ছাড়া আমাদের উপায়ান্তর নেই।" বস্তুত, তাঁর কাছে প্রকৃতি শিল্পরচনার অনন্ত পটভূমিকা। কেবল পটভূমিকা নয়, ভূমিকাও বটে। যেহেতু,

মানব প্রকৃতির সন্তান, জীবনে মাতৃকা-প্রভাব অন্তহীন : "আমাদের শিল্প, আমাদের সাহিত্য, আমাদের ধর্ম, আমাদের সভ্যতা তো এই প্রকৃতিরই দান। আমাদের জীবন তো প্রকৃতিরই অন্যতম শিল্প-প্রয়াস মাত্র" ('জীবনে প্রকৃতির প্রভাব')।

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যোগ প্রাক্-আদিম যুগের। তার সংস্পর্শে আজকের মানবমন সুদূরের এক সৌরভের সাক্ষাৎ লাভ করে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় : "এই পৃথিবীটি আমার অনেক দিনকার এবং অনেক জন্মকার ভালোবাসার লোকের মতো আমার কাছে চিরকাল নতুন। আমরা দুজনে একলা মুখোমুখি বসলেই আমাদের সেই বহুকালের পরিচয় যেন অল্পে অল্পে মনে পড়ে" ('ছিন্নপত্র') বা "প্রকৃতি তাহার রূপরস বর্ণগন্ধ লইয়া, মানুষ তাহার বুদ্ধিমন তাহার স্নেহপ্রেম লইয়া আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে—তাহা আমাকে বদ্ধ করিতেছে না, তাহা আমাকে মুক্তই করিতেছে" ('আত্মপরিচয়')। উপলব্ধিটিকে আপন ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন ওয়াজেদ আলী : "সীমাহীন প্রান্তরে মন আপনা থেকেই অসীমের দিকে চলে যায়। অন্তহীন নীলাকাশে কল্পনার তরী যুক্তিতর্কের বহু দূরে এক অনির্বচনীয় অনুভূতির দেশে পৌঁছায়, যেখান থেকে স্বর্গরাজ্যের সোনার তোরণগুলি অতি নিকট বলে মনে হয়" ('পাহাড় ও প্রান্তর') এবং তখন ব্যক্তিহৃদয় নিরাশা-যন্ত্রণা-দুঃস্বপ্ন পেরিয়ে "নিজের কল্পকরোজ্জ্বল খেয়ালের রাজ্যে দিগ্বিজয়ী Alexander এর মতো সদর্পে পদসঞ্চালন করে বেড়াতে থাকে।"

শিল্পসৃষ্টি ব্যাপারে "স্মৃতি সহযোগে চর্বণা"র উল্লেখ করেছেন সংস্কৃত আলঙ্কারিক ; আর করেছেন ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাঁর প্রসিদ্ধ emotion recollected in tranquility-র সূত্রে। যেমন প্রকৃতি-প্রীতিতে, তেমনি স্মৃতি-আশ্রয়ী সৃষ্টি-লীলায় ওয়াজেদ আলী ওয়ার্ডসওয়ার্থ-অনুগামী। তাই তাঁকে বলতে শুনি : "মানুষের জীবনে দু'একটা সোনালী মুহূর্ত আসে, যার স্মৃতি মনের মণিকোঠায় চিরকাল উজ্জ্বল হয়ে থাকে। কবি এবং সাহিত্যিকদের কারবার হল এই সোনালী মুহূর্তগুলি নিয়ে। দেবসভার এই অমৃত নিয়ে। আমি তাই বলি, সত্যিকার যদি কবি হতে চাও, সত্যিকার যদি সাহিত্যিক হতে চাও, আজীবন তাহলে শিশু হয়েই থাকো" ('স্মৃতির ফসল')। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ওয়ার্ডসওয়ার্থ একই কারণে ফেলে-আসা শৈশবের জন্যে আর্ত বিলাপ করেছেন।

কিন্তু শুধু ওয়ার্ডসওয়ার্থ-রবীন্দ্রনাথ নন, উনবিংশ-বিংশ শতকের রোমান্টিক

কবি ও শিল্পচেতনার প্রভাবিত স্বাক্ষর আলীসাহেবের তত্ত্বভাবনায় ওতঃপ্রোত। সৌন্দর্যকে মাঝখানে রেখে তিনি নিকটাত্মীয় করেছেন জীবন ও শিল্পকে, এবং বিনা দ্বিধায় ঘোষণা করেছেন: "সবচেয়ে বড় শিল্প হচ্ছে জীবনশিল্প" ('জীবনে শিল্পের স্থান')। অন্যদিকে অনিবার্যভাবে সেই "the true, the good, the beautiful": "সত্য-শিব-সুন্দরের অনুসন্ধানে দুই ভাবুক-প্রাণের একত্র-অভিযানের নামই হচ্ছে বাক্যালাপ। তার সাফল্যের জন্য দরকার ত্যাগ, ধৈর্য, সংযম এবং সহানুভূতি" ('বাক্যালাপ')।

রোমান্টিক 'জীবনদেবতাবাদ' ওয়াজেদ আলীর গদ্যনিবন্ধে লক্ষ্যগোচর। রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা ও তন্নিষ্ঠ-জগৎ ক্ষণে ক্ষণে রূপান্তরিত হয়েছে বিশ্বদেবতা ও বিশ্বৈক জগতে, আলীসাহেবের অন্তত একটি রচনায় এর কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়—বিপরীতভাবে। রচনাটির নাম 'মসজিদ'। পদকর্তাদের হৃদয়-মন্দির বা বৈষ্ণব সাধকদের "হৃদি-বৃন্দাবন"-এর মতো এখানেও মূল দৃষ্টিটি অধ্যাত্মভাবসিঞ্চিত: "খোদার উপযোগী এক মসজিদ আমিও প্রস্তুত করছি....নিত্য করছি।....আমার এই মসজিদ বিরাজ করে আমার অন্তরে।" তারপরেই যখন তিনি বলেন, "আমার এই মায়ার মসজিদ বিশ্বব্যাপী" এবং "আমার এই যাদুর মসজিদে খোদা আসেন....আমি অন্তরে অন্তরে অনুভব করি.... আমি তখন আমার ক্ষুদ্র আমিত্ব ছেড়ে বিরাট এক কিছুতে মিশে যাই"; তখন তিনি কুরাণ শরীফের বিশ্বজ্ঞান ও ঈশ্বর-অনুভূতির 'তওহিদ' ভাবই প্রকাশ করেন। কিন্তু তার পরেই যখন তিনি এই জাদুর মসজিদের দেবতাকে ভালোবেসে কামনা করেন: "তিনি কি সশরীরে আবির্ভূত হবেন না? তাঁর প্রণয় লাভ করে আমিও কি পিগম্যালিয়নের মতই ধন্য হব না?"—তখন অধ্যাত্মভাবনায় এসে মেশে শিল্পভাবনা, বিশ্বদেব হন জীবনদেবতা।

কারণ, বাহির আর অন্তর—যে-কোনো মসজিদেই খুদাহ-তালার সশরীরে আবির্ভাব-প্রসঙ্গ ইসলাম ধর্মসাধনার অসম্ভব প্রস্তাব। দ্বিতীয়ত, উক্তিটির মধ্যে সুফীভাবের সৌরভ থাকলেও লেখক তদর্থে সুফী নন। তৃতীয়ত, পিগম্যালিয়ন-কাহিনী কালক্রমে শিল্পতত্ত্বের. শিল্পী ও তাঁর সৃষ্টির বহুমুখী সম্বন্ধের প্রতীক-রূপেই ব্যবহৃত। তাই এ-অনুমান সত্য যে, আলীসাহেব অধ্যাত্মচিন্তা থেকে এসেছেন শিল্পচিন্তায়; এবং বস্তুত উভয়ই তাঁর কাছে নিকটাত্মীয়, পরস্পর-ঘনিষ্ঠ। তাই মুহূর্তপূর্বে যে-মসজিদে খোদার নিরাকার আবির্ভাব কল্পনা করেছেন, পরমুহূর্তে সেখানেই দেখেছেন ভেনাসের ভাস্কর-চিত্রের আরোপন।

বিশ্বদেবতা থেকে জীবনদেবতা থেকে পুনশ্চ বিশ্বদেবতা। এই মিশ্রণ প্রক্রিয়া বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ সচেতন ছিলেন। এই রূপান্তরণ বিষয়ে ওয়াজেদ আলী কতটা ওয়াকিবহাল ছিলেন বা আদৌ ছিলেন কিনা, তা বলা শক্ত।

'সোনার তরী'-'চিত্রা'য় জীবনদেবতা রবীন্দ্রনাথকে কেবলই নিয়ে গেছেন জানা থেকে অজানায়, রূপকথা থেকে চুপকথায় (ক্বচিৎ জীবনের মাঝখানে)। আলীসাহেবের রূপবতী সুন্দরী জীবনদেবতাও মধুর হেসে বলেন : "আমায় অনুসরণ কর" ; আবার, পথের শেষে কল্পনার অলকাপুরীতে এই "সুন্দরীই সেই সিংহাসনে উপবিষ্টা।" 'আবেদন'-এর কবি চেয়েছিলেন : "আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর" ; আলীসাহেবের 'ভিক্ষুক'-এর প্রার্থনা : "তোমার রুদ্র মূর্তিটা একবার দেখতে চাই" ; এবং অবশেষে : "স্নেহমাখা দৃষ্টিতে আমার দিকে তুমি চাইলে। তোমার কণ্ঠস্বর মধুর সঙ্গীতের মতো আমার কানে ঝংকৃত হতে লাগলো।"

তাত্ত্বিক-ঐতিহাসিক ওয়াজেদ আলীর মন মুখ্যত যুক্তি ও তথ্যনিষ্ঠ বুদ্ধিদীপ্ত প্রাবন্ধিকের। কিন্তু তাঁর মননশীলতা নিরাবেগ ছিল না। পাণ্ডিত্য ও চিন্তাকে তিনি উপস্থিত করেছেন আকর্ষণীয় রস-রীতিতে। উল্লিখিত 'মসজিদ' রচনাতেই লেখকের আবেগান্বিত মননের সুন্দর পরিচয় আছে। এছাড়াও আরও কয়েকটি নিবন্ধ আছে 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য' গ্রন্থে, যেগুলি শ্রেণী হিসাবে 'রচনাসাহিত্য'। তাঁর বিশ্লেষণাত্মক প্রবন্ধগুলি যেমন প্রমথ চৌধুরীকে স্মরণে আনে, তেমনি রম্য রচনাসাহিত্যগুলি রবীন্দ্রনাথের 'বিচিত্র প্রবন্ধ'র রসাত্মক নিবন্ধগুলির সজাতি। যেমন : "মানুষের মন এমনইভাবে গঠিত যে সীমার বন্ধনে সে আবদ্ধ থাকতে পারে না। সে মন ক্রমাগত অসীমের দিকে যাবার জন্য ছটফট করতে থাকে"—পঙক্তি দুটি মনোযোগী রবীন্দ্রসাহিত্য-পাঠকের কাছে অত্যন্ত পরিচিত বলে মনে হবে।

আলোচ্য গ্রন্থের 'প্রদীপ ও পতঙ্গ' নিবন্ধের বিষয় ও ভঙ্গী বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর অনুসারী হলেও মূল সুরটি রবীন্দ্রনাথের 'পাগল' রচনার অনুগামী। জীবনে জনতা আছে, নির্জনতাও আছে ; জনসমুদ্রে আছে আনন্দ, জনহীনতায় হয়তো শুধুই যন্ত্রণা ; তবু, একাকিত্বেরও প্রয়োজন ও সার্থকতা আছে, তারও আছে অন্তহীন জীবনসাধনা। এই ভাব নিয়ে লেখা 'এভারেস্ট পর্বতের কথা' : "নিজে নির্জনে জীবন কাটাচ্ছি, কিন্তু তোমাদের জীবনকে আনন্দময়, ক্রীড়াময় করে তুলেছি।"

হয়তো রবীন্দ্র-প্রভাবেই, ওয়াজেদ আলীরও জীবন-দর্শন ঃ চলনমন্ত্র। এ-বিষয়ে তাঁর একাধিক সুন্দর রচনা আছে। 'বাংলার প্রকৃতি' নিবন্ধে তিনি বলেছেন ঃ "ছেলেবেলা থেকে প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে নদী কিংবা রাস্তা এ-দুটোর একটাকে আমি খুঁজেছি।" এই খোঁজার মধ্যে যেমন তাঁর সৌন্দর্য-পিপাসু মনের পরিচয় আছে, তেমনি আছে দার্শনিক ভাবনারও স্বাক্ষর। ফলে, এই ভাব নিয়ে লেখা নিবন্ধগুলি একই সঙ্গে কবিত্ব ও চিন্তাশীলতায় মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। যথা, 'নদী' ঃ "বল দেখি গঙ্গে! প্রিয় সম্মেলনে কি তোমার প্রাণের আশা মিটবে? যার জন্য পাহাড় পর্বত নগর প্রান্তর অতিক্রম করে এই সুদূর দেশে এসেছ, তাকে দেখে কি তুমি শান্তি পাবে? না, আবার সেই বিপদসংকুল, আবেগ-উদ্বেগভরা কর্মক্ষেত্রে ফেরবার জন্য অন্তর তোমার কেঁদে উঠবে?" নদী জানে ঃ মিলনে "উদ্যমহীন নিশ্চেষ্টতা", বিচ্ছেদে "উদ্দাম কর্মঠ জীবন"; তাইতো সে মেঘ হয়ে আবার ফিরে যায় উৎসমূলে, পুনশ্চ ছুটে আসে সমুদ্রের অভিসারে। আর লেখক? তিনিও নিত্যপথিক ঃ "গঙ্গে! তোমার প্রাণ ঠিক আমারই মতো!" (তুলনীয় ঃ জগদীশচন্দ্রের 'ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে')।

পরবর্তী রচনাটি 'সমুদ্র', যে-সমুদ্র দেশী-বিদেশী রোমাণ্টিক কবিদের মানসে নব নব ছন্দ ও ছবি ফুটিয়ে তুলেছে। আরম্ভ রাবীন্দ্রিক রীতিতে, বক্তব্য স্বকীয় ঃ "জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর, গতির সঙ্গে জড়তার, স্বাধীন চিন্তার সঙ্গে অন্ধ সংস্কারের যে বিরামহীন দ্বন্দ্ব প্রকৃতির অন্তরতম সত্য, তার অভিব্যক্তি যেমন এই সমুদ্র আর বেলাভূমির অবিশ্রান্ত দ্বন্দ্বের মধ্যে দেখতে পাই, তেমনটি কি প্রকৃতিতে, কি আর্টে আর কোথাও দেখি নি।" পুনরায় উদ্ধৃত করি "গতির সঙ্গে জড়তার, স্বাধীন চিন্তার সঙ্গে অন্ধ সংস্কারের যে বিরামহীন দ্বন্দ্ব" ঃ ধর্মবিশ্বাসী লেখক, তবু অন্ধ সংস্কার নয়, স্বাধীন চিন্তার উপাসক। এইখানেই তাঁর আধুনিকতা।

উল্লিখিত নিবন্ধগুলির প্রকাশভঙ্গীও লক্ষণীয়—কিছুটা নাটকীয়, কিছুটা কাব্যিক, কিছুটা প্রাবন্ধিক, সব মিলিয়ে ব্যক্তিসাক্ষিক রম্যরচনার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। একই ভাববস্তু অবলম্বনে আরও কয়েকটি রচনা এ-বইয়ে আছে, রূপকধর্মী কাহিনীর আকৃতি-প্রকৃতিতে। যেমন, 'চলার শেষ' ঃ গভীর অরণ্যে অতুলনীয় রূপবতী এক নারী; মুগ্ধ লেখক তাঁকে অনুসরণ করে চলতে লাগলেন বিচিত্র লোক পেরিয়ে পেরিয়ে, যার শেষ বিন্দুতে শিল্পী-কামনার মোক্ষধাম অলকা; কিন্তু সে-অলকা বহুৎ দূর অস্তু। আপাতত "অন্তরীক্ষ অতিক্রম করে আমি

সুন্দরীর অনুসরণ করে চললুম।" অন্যত্র, 'ভিক্ষুক'-এও এই চলার কথা প্রেম ও সৌন্দর্যের সন্ধানে, এবং সেখানেও সেই অনির্বচনীয়া সুন্দরী।

গতিশীল জীবন তথা 'চরৈবেতি' তত্ত্ব উপনিষদের; নিত্য চলমান কাফেলার স্মৃতি-অনুষঙ্গ ইসলামী ঐতিহ্যেও। এবং খ্রীষ্টান ভাবনায়ও। পাশাপাশি তিন কবির তিন শ্লোক রাখছি। মহম্মদ ইকবালের 'তারানায়ে মিল্লাত':

"ইকবালকে তারানা / বাঙ্গে দরা হ্যঁায় গোয়া;
হোতা হ্যয় জাদা পায়মা / ফের কারওয়ান হামারা।"

[ইকবালের এই গান—নতুন করে জয়যাত্রার আহ্বান। আমাদের কাফেলা এবার নতুন করে চলতে শুরু করুক।]

টি. এস. এলিঅটের 'জার্নি অফ দ্য ম্যাজাই':

"Then we came to a tavern with vine-leaves over the lintel,
But there was no information and so we continued."

["পৌঁছলেম সরাবখানায়, তার কপাটের মাথায় আঙুরলতা।
কোনো খবরই মিলল না সেখানে,
চললেম আরও আগে।" (রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ)]

রবীন্দ্রনাথের 'সন্ধ্যা ও প্রভাত':

"ওরা পান্থশালা থেকে বেরিয়ে পড়েছে। ওরা পূবের দিকে মুখ করে চলেছে। ওদের কপালে লেগেছে সকালের সোনালী আলো। ওদের জন্যে পথের ধারের জানলায় জানলায় কালো চোখের করুণ কামনা অনিমেষ চেয়ে আছে। রাস্তা ওদের সামনে নিমন্ত্রণের রাঙা চিঠি মেলে ধরল। বলল—এই পান্থশালা আর পথ আর থামা আর চলা।"

'একটি স্বপ্ন' রূপক রচনায় নতুন রীতি ও রসে পরিবেশিত। রবীন্দ্রনাথের 'সন্ধ্যা ও প্রভাত'-এ একদল যখন "বেরিয়ে পড়েছে", আর-একদল তখন "পান্থশালার আঙিনায় কাঁথা বিছিয়েছে"; এবং এলিঅটের 'তীর্থযাত্রী'তে: "যেতে যেতে সন্ধে হল; সময় পেরিয়ে যায় যায়, তখন খুঁজে পেলাম জায়গাটা।" আলীসাহেবের 'একটি স্বপ্ন'-এ: "একদল সেই সরাইখানাতেই রয়ে গেল। অবশিষ্ট আমরা সকলে আবার পথ চলতে লাগলুম।" এমনিভাবে চলতে চলতে আর দলছুট হতে হতে একলা অবশেষে "মণিমুক্তা-রচিত প্রাসাদ-তোরণের সামনে এসে উপস্থিত হলুম।" লেখাটির আর-একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে: কাফেলা এক-এক 'মনজেল' বা স্তর পেরোচ্ছে, আর

লেখক বলছেন : "না, না, ও-রকম করলে চলবে না। চলবার সংকল্প যখন করেছি, তখন চলাই যাক।" এই এক বাক্য, বারবার (অন্তত ছ-বার) ঘুরে ঘুরে এসেছে ধ্রুপদী গানের প্রারম্ভিক ধ্রুবপদের মতো : "না, না, ও-রকম করলে চলবে না। চলবার সংকল্প যখন করেছি, তখন চলাই যাক।"

"I need only a corridor"—একথা তো আধুনিক কবির।

ওয়াজেদ আলী যখন 'বাদলের দিন' প্রবল ধারাবর্ষণে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন, মিলন নয় বিরহের ব্যাকুলতায় সীমাহীন আনন্দ পান, তখন অনুভব করি : তিনি পরিপূর্ণহৃদয় এক রোমান্টিক কবি। কিন্তু কল্পনাকে করতলগত করার অনিন্দ্য বাসনায় যখন তিনি বলে ওঠেন : "আমি নদীতীরের একটি বারান্দা চাই"—এই আশ্চর্য বারান্দা প্রসঙ্গে তখন স্বতই আমাদের মনে আসে, আধুনিক কোনো কবির পঙক্তি।

'একটি স্বপ্ন'-এ গদ্য-কবিতার বিশিষ্ট অবয়ব-নির্মাণ এবং রিফ্রেনের মতো একই বাক্যের পুনঃপুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করার মতো। টি. এস. এলিঅট বা আধুনিক কোনো কোনো কবির কাব্যকলারও তা leit motif। ওয়াজেদ আলীর বুদ্ধি-জীবিত বাসনালোকের কেন্দ্রে স্থিত উদারচরিত কবি-মানুষটিকে চিনে নিতে আর দেরি হয় না। বুঝতে পারি রোমান্টিকতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত হলেও দৃষ্টি তাঁর আধুনিকতার নয়া সীমান্তে প্রসারিত।

পুস্তক-পরিচয়

রাজেন্দ্রলাল মিত্র। ডঃ শিশিরকুমার মিত্র। সারস্বত লাইব্রেরী। তিন টাকা।

উনবিংশ শতাব্দীতে একদিকে যেমন সমাজসংস্কার, ধর্মান্দোলন ও রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটে, তেমনই সেই সঙ্গে জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা, অতীতের ভাষা ও সাহিত্যবিচার এবং ইতিহাসবোধ ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করতে থাকে। কোনো সন্দেহ নেই প্রথম ধারাটি যে-পরিমাণে সরব ও বহু প্রচারিত, শেষোক্ত ধারাটি তার তুলনায় অনেক নিঃশব্দ ও অদৃশ্যভাবে কাজ করেছে। উনবিংশ শতাব্দীর যে-নবজাগরণ সম্বন্ধে বাঙালি মাত্রেই কিছুটা গৌরববোধ করে থাকেন, তার মধ্যে জ্ঞানানুশীলনের নবজন্মকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। অথচ শতাব্দীর ব্যবধানে হিসাবের খাতায় জমা-খরচ মেলাতে গিয়ে দেখি, অনেক আস্ফালন-বক্তৃতা ও আন্দোলনের চেয়ে সুদূরপ্রসারী-প্রভাব রেখে গেছেন সেই লোকচক্ষুর অন্তরালে সাধনারত মুষ্টিমেয় কয়েকজন জ্ঞানব্রতী, যাঁদের প্রাথমিক চেষ্টা-যত্ন সাধনা-অনুশীলনের ফলে ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাস আজ আমরা জানতে পেরেছি—যে-ইতিহাস অনেক সময়েই সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কার্যকারণ ব্যাখ্যায় তাৎপর্যপূর্ণ। উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবিদ্যাচর্চায় ভারতীয়দের মধ্যে পথিকৃৎ হলেন এক বাঙালি—তাঁর নাম রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-৯১)। আরও কিছু পরে ভারতবিদ্যাচর্চায় বাঙালিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—রামদাস সেন (১৮৪৫-৮৭), প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (মৃত্যু ১৯০০), রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৫-৮৬) এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১)। এঁদের অধিকাংশের রচনাবলী বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর একটি ভ্রান্তিপ্রমাদসঙ্কুল ক্ষুদ্র জীবনীগ্রন্থ আছে—অন্যদের পূর্ণাঙ্গ জীবনীগ্রন্থ এখনো লেখা হয়নি; এঁদের রচনাবলীর পর্যালোচনা তো শুরুই হয়নি। এ-অবস্থায় উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ হতে বাধ্য, 'হিউম্যানিজম' শব্দটির যথার্থ তাৎপর্যও ফলে অপরিজ্ঞাত।

ডঃ শিশিরকুমার মিত্রের 'রাজেন্দ্রলাল মিত্র' গ্রন্থটি তাই বহুপ্রত্যাশিত। রাজেন্দ্রলালের জীবনী ও রচনাবলীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় না থাকলেও

রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে রাজেন্দ্রলালের উদ্দেশে যে-শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন, তা থেকে অন্তত তাঁর নামের সঙ্গে সকলেই পরিচিত। বাঙলা সাহিত্যের ছাত্র হয়তো সেই সঙ্গে আরো জানেন, রাজেন্দ্রলাল 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' ও 'রহস্য সন্দর্ভ' পত্রিকা সম্পাদনাকালে বাঙলা সমালোচনা সাহিত্যের সূত্রপাত করেন এবং রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য কবিতা, নাটক ও নৃত্যনাট্যের উৎস রাজেন্দ্রলালের *'The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal'* গ্রন্থখানি। কিন্তু রাজেন্দ্রলালের সর্বাধিক কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে প্রাচীন ভারতের স্থাপত্য-ভাস্কর্যের আলোচনায়, কয়েকটি বিশেষ অধ্যায়ের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস প্রণয়নে এবং সংস্কৃত গ্রন্থ সম্পাদনা ও অনুবাদকর্মে।

ডঃ মিত্র তাঁর গ্রন্থে কয়েকটি পরিচ্ছেদে রাজেন্দ্রলালের জীবনকথা, গবেষণাকর্ম, গ্রন্থপঞ্জী রচনা, গ্রন্থ সম্পাদনা, ঐতিহাসিক বিষয়ে রচনা, বাঙলা সাহিত্য চর্চা, গবেষণা পদ্ধতি এবং সমসাময়িক যুগে ও পরবর্তীকালে রাজেন্দ্রলালের প্রভাবের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দান করেছেন। ভূমিকায় তিনি জানিয়েছেন, ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে শ্রীনগরে অনুষ্ঠিত একটি সর্বভারতীয় পাঠচক্রে *Historians and Historiography in Modern India* পর্যায়ে তিনি রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও তাঁর ইতিহাসচর্চার প্রণালী নিয়ে আলোচনা করেন। বলা বাহুল্য রাজেন্দ্রলালের "চল্লিশ বর্ষব্যাপী সাধনার মূল্যায়ন সহজ নয়, তথাপি ঐ পাঠচক্রের সীমিত পরিবেশে তাঁর গবেষণা প্রণালীর বৈশিষ্ট্যগুলি যথাশক্তি ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা" করেছেন। সেই ইংরেজী প্রবন্ধটির বাঙলা অনুবাদ থেকে বর্তমান গ্রন্থটির জন্ম। বক্তৃতার উদ্দেশ্যে লেখা, ফলে প্রবন্ধের আকার সংক্ষিপ্ত হতে বাধ্য, কিন্তু মাত্র পঁচিশ পৃষ্ঠার মধ্যে রাজেন্দ্রলালের জীবন এবং তাঁর সকল জাতীয় রচনার পরিচয় দিতে যাওয়ার ফলে রচনা কিছুটা আংশিকতাদুষ্ট হতে বাধ্য। লেখকের কাছে আমরা বর্তমান পুস্তিকাটির জন্য কৃতজ্ঞ, কিন্তু আরো খুশী হতুম যদি তিনি পূর্ণাঙ্গ একটি গ্রন্থ রচনার অবকাশ পেতেন। ভারতবিদ্যাচর্চার ইতিহাস পর্যালোচনায় লেখকের যোগ্যতা সন্দেহাতীত; তাঁর কাছ থেকে ভবিষ্যতে রাজেন্দ্রলাল এবং অন্যান্য ভারতবিদ্যা-সাধকদের গবেষণা পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু শুনতে পাব প্রত্যাশা রাখি।

অল্প কথায় সংযত পরিচ্ছন্ন ভাষায় রাজেন্দ্রলালের প্রাথমিক পরিচয় পাঠকের কাছে উপস্থিত করার কাজে ডঃ মিত্র সফল হয়েছেন। গ্রন্থটির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিচ্ছেদ রাজেন্দ্রলালের 'গবেষণা পদ্ধতি' এবং 'সমসাময়িক ও পরবর্তী

কালে রাজেন্দ্রলালের প্রভাব'। রাজেন্দ্রলাল সমগ্র জীবন ইতিহাসচর্চা করলেও কেন ভারতবর্ষের একখানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লেখেননি, তার কারণ লেখক ঠিকই ধরেছেন, "আঞ্চলিক ইতিহাসের সুষ্ঠু রচনা ব্যতীত ভারতীয় কৃষ্টির এ ধরণের সামগ্রিক ইতিহাস প্রণয়নের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। দেশের ঐ সব আঞ্চলিক ইতিহাসের গবেষণালব্ধ ফলগুলি যথাযথ সন্নিবেশিত ও গ্রথিত করেই সমগ্র ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টা সার্থক করা সম্ভব। রাজেন্দ্রলালের ইতিহাসচেতনা একটি বিস্তৃত পটভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।"

কিন্তু ডঃ মিত্র রাজেন্দ্রলালের সামাজিক ইতিহাস রচনা-প্রচেষ্টার বৈশিষ্ট্য বা পদ্ধতির উপর তেমন জোর দেননি। *'Indo Aryans'* গ্রন্থটি সম্বন্ধে আলোচনাও অসম্পূর্ণ। রাজেন্দ্রলালের বিখ্যাত রচনা *'Beef in ancient India'* পরবর্তীকালে একাধিকবার পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হয়েছে (দ্রষ্টব্য, সম্প্রতি মনীষা গ্রন্থালয় প্রকাশিত স্বামী ভূমানন্দের ভূমিকা সম্বলিত সংস্করণ, ১৯৬৭)। ডঃ মিত্র প্রবন্ধটিকে কেন 'প্রাচীন ভারতে নিষিদ্ধ মাংস' নামে অভিহিত করেছেন বোঝা গেল না। গোমাংস যে প্রাচীন ভারতবর্ষে 'নিষিদ্ধ' ছিল না, রাজেন্দ্রলাল তাই তথ্যপ্রমাণ সহযোগে দেখিয়েছেন। সাম্প্রদায়িক বিরোধের পটভূমিকায় বর্তমানে প্রবন্ধটির গুরুত্ব অপরিসীম। অন্যদিকে, সম্প্রতিকালে পরিভাষা সংক্রান্ত বিতর্ক ও বাঙলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার পটভূমিতে রাজেন্দ্রলালের আর-একটি পুস্তিকার তাৎপর্য নিতান্ত কম নয়—*'A Scheme for the rendering of European Scientific Terms into the Vernaculars of India'* (১৮৭৭)। ডঃ মিত্র রচনাটি নিয়ে কোথাও আলোচনা তো করেনইনি, এমন কি গ্রন্থপঞ্জীতে পর্যন্ত পুস্তিকাটিকে স্থান দেননি।

মাত্র পঁচিশ পৃষ্ঠার আলোচনাগ্রন্থে বহু প্রসঙ্গ অনুল্লেখিত থাকার কারণ হয়তো বোঝা যায়, কিন্তু এই অল্প কয়েক পৃষ্ঠার মধ্যে এতগুলি তথ্যগত ভ্রমপ্রমাদের কোনো কারণ ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। বিশেষত লেখক নিজে যেখানে এসিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত এবং ঐতিহাসিকদের পাঠচক্রে প্রবন্ধটি পাঠ করেছেন। গ্রন্থটির শেষে প্রদত্ত রাজেন্দ্রলালের জীবনীপঞ্জী, বংশলতিকা, গ্রন্থপঞ্জী অংশে অসম্পূর্ণতা ছাড়াও অজস্র ভুল চোখে পড়ল। ছাপার ভুলও অসংখ্য। যেমন *'Sanskrit Buddhist Literature in Nepal'* গ্রন্থের মধ্যে লেখক যে সাল-তারিখ ব্যবহার করেছেন, তার সঙ্গে 'ঘটনাপঞ্জী' ও 'গ্রন্থপঞ্জী'র তারিখ মিলছে না ; যেমন রাজেন্দ্রলাল *LL. D.* উপাধি লাভ

করেন ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে, কিন্তু গ্রন্থের মধ্যে বলা হয়েছে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ; গ্রন্থপঞ্জীতে 'ললিত বিস্তর' গ্রন্থের সম্পাদিত সংস্করণের তারিখ ১৮৭৭, গ্রন্থের মধ্যে ১৮৫৩, অথচ প্রকৃত তারিখ ১৮৮১-৮৬ ; *'Antiquities of Orissa'* দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ-সাল ১৮৮০, কিন্তু গ্রন্থমধ্যে দেখি ১৮৮৮ ; 'অষ্টসহস্রিকা'র প্রকাশ সাল গ্রন্থের মধ্যে ১৮৮৮, গ্রন্থপঞ্জীতে ১৮৮৬। অবশ্য খণ্ডাকারে গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হওয়ায় লেখক অনেক সময় প্রথম খণ্ড বা অধ্যায়ের তারিখ ব্যবহার করেছেন, কিন্তু 'চৈতন্য চন্দ্রোদয়' (১৮৫৩ নয়, ১৮৫৪), 'অগ্নিপুরাণ' (১৮৭৩-৭৪ নয়, ১ম খণ্ড ১৮৭৩, ২য় ১৮৭৬, ৩য় ১৮৭৮); 'বায়ু পুরাণ' (১৮৮৬ নয়, ১ম খণ্ড ১৮৮০, ২য় ১৮৮৮) প্রভৃতি সবগুলি গ্রন্থের ক্ষেত্রেই সাল-তারিখ যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। 'সম্পাদিত গ্রন্থাবলী'র মধ্যে *'Lalit Vistara, with an English translation'* নাম দেওয়া হয়েছে, আবার 'ইংরেজী গ্রন্থসমূহ'র তালিকার মধ্যেও *'English translation of Lalita Vistara'*-র উল্লেখ করা হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে ইংরেজী গ্রন্থ হিসাবে *'An Introduction to the Lalita Vistara'*-র নাম থাকা প্রয়োজন, যেটি অনুবাদ থেকে স্বতন্ত্র গ্রন্থ, প্রকাশ সাল ১৮৭৭। 'রহস্য সন্দর্ভ' পত্রিকার প্রকাশ-সাল ১৮৬২ নয়, ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাস। এসিয়াটিক সোসাইটির শতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত ইতিহাসের প্রকাশ সাল ১৮৮৫ নয়, ১৮৮৪। ক্ষুদ্র পুস্তিকাটির মধ্যে তথ্যের ভুল এত বেশি যে তার দীর্ঘতর তালিকা প্রণয়ন ক্লান্তিকর ও নিরর্থক, কিন্তু ঐতিহাসিক রচিত ঐতিহাসিকের জীবনচরিতের যদি এই দশা হয়, তাহলে সাধারণ পাঠক কিছুটা বিমূঢ় বোধ করতে বাধ্য। আশা করি পরবর্তী সংস্করণে লেখক তথ্যাদি সঙ্কলনে যথোপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করবেন।

অলোক রায়

সান্তনু। যজ্ঞেশ্বর রায়। প্রান্তিক। পাঁচ টাকা

দশটি গল্প। শেখর বসু। এই দশক। তিন টাকা

রাতের সূর্যমূর্তি। সুনীল দাশ। মানস প্রকাশনী। আড়াই টাকা

আমরা যখন সত্তরের দশকে সংঘর্ষসঙ্কুল ইতিহাসের একটা সম্ভাবনাময় অবস্থায় এসেছি, তখন ভরসা হয় সাহিত্যে মানবসভ্যতার অস্তিবাচক বক্তব্য ক্রমশ সোচ্চার হবে। ফলে, আমাদের এ-সময়ের উপন্যাসে গল্পে সমাজমানসের

বাঁচার দাবি—খাওয়া-পরা, টিকে থাকা, এক কথায় অস্তিত্ব রক্ষার তরতাজা সমস্যা ও জিজ্ঞাসার, মন ও মননের প্রতিফলন—আমরা প্রত্যাশা করে থাকি। এ-কালের একখানা উপন্যাস বা গল্পগ্রন্থে সমাজমানসকে পেতেই হবে—যেভাবেই হোক, হয় ভীড়ে না হয় একক ব্যক্তিত্বে, কি প্রত্যাশায় কি হতাশায়। সুতরাং প্রাত্যহিকতার পথে আমার এবং পারিপার্শ্বিকের পরিচিত পৃথিবীই তার ভিত্তি। ("The novel gives a familiar relation of such things as pass everyday before our eyes such as may happen to our friend or to our selves") এ-যুগের মানুষ তার বৈচিত্র্য অথবা বৈচিত্র্যহীনতা নিয়ে, তার কর্ম বা সংগ্রাম নিয়ে, মন বা মনন নিয়ে স্বক্ষেত্রে স্বকীয় নিশ্চয়ই, কিন্তু সত্যিই কি সে আমাদের যথার্থ অপরিচিত? কতক্ষণ সে আমাদের দেখার বা অনুভবের বাইরে থাকতে পারে? অন্তত লেখক আমাদের তন্ময় করে তুলবেনই—তাঁর শব্দের জগৎ আমাদের দেখার ও অনুভবের জগৎ হয়ে উঠবেই। ("My task which I am trying to achieve is, by the power of written word, to make you hear, to make you feel —it is, before all, to make you see...")

এ-সব কথা সত্য বা কথঞ্চিৎ সত্য হলেই 'সান্তনু' উপন্যাসের ভূমিকা-লিপির একটা অর্থ থাকে—"সান্তনু এমন একজন নায়ক, যে আমাদের প্রতিদিনকার এই বিস্বাদ বিবর্ণ পৃথিবীর মানুষ নয়, যার জীবনের ঘটনাপঞ্জী বৈচিত্র্যহীন দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে কিছুতে মেলানো যায় না।" সান্তনু না হতে পারে আমাদের প্রতিদিনকার এই বিস্বাদ (কেবল বিস্বাদ কেন?) অথবা বৈচিত্র্যহীন (কেবল বৈচিত্র্যহীনই বা কেন?) দৈনন্দিন জীবনের একজন, হতে পারে সে একক, অনন্য; তবুও তার কথা যখন উপন্যাসে পড়ব, পড়া শেষ করব, তখন সে আর আমাদের অপরিচিত নয়—আমাদেরই একজন—কোনো না কোনো ভাবে—কাজে, ভাবনায় বা সম্ভাবনায়। 'সান্তনু' উপন্যাস 'সেক্সী' কি 'ডিভাইন' (প্রকাশকের নিবেদন) এ-সব প্রশ্ন পূর্বাহ্নে বড় করে তোলার কোনো সার্থকতা দেখি না। বরং তাতে সন্দেহ আরও বেড়ে যেতে পারে যে, যে-মানুষটা আমাদের প্রতিদিনকার পৃথিবীর কেউ নয়, অথচ ইন্দ্রিয় বা অতীন্দ্রিয় জগতে যার ঘোরাফেরা—তাকে সত্যি সত্যিই আমাদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। যৌবনাগমের অপসঙ্গতির উপর সান্তনুকে আমরা প্রথম দেখতে পাই। সে-সান্তনু তো আমাদের অচেনা ছিল না।

এ্যাডোলেসেন্সের কৌতূহল এবং বেদনা, অভিজ্ঞতা এবং রহস্যবোধে সে আমাদের অনেকেরই অতীত এবং বর্তমান। কিন্তু তারপর সান্তনুকে নিয়ে লেখকের যে-অভিযান—একের পর এক রমণ-মিলনের ঘটনাবলী—তা অবিশ্বাস্য এবং আমাদের প্রতিদিনকার পৃথিবীর সঙ্গে তাকে মেলানো যায় না। আর যায় না বলেই সান্তনু শেষপর্যন্ত আমাদের সঙ্গে একাত্মতা (familiar relation) স্থাপন করতে সমর্থ হয়নি। শ্লীলতা-অশ্লীলতার তথাকথিত প্রশ্ন তুলতে চাই না, বিষয়ের বা শিল্পের দাবি থাকলে যৌন মিলনের দৃশ্যও আসতে পারে; কিন্তু জগৎ-সংসারের সর্বপ্রকার স্বাভাবিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে পুনঃপুন হেন মিলনের ব্যাপারগুলো যেমন একঘেয়ে তেমনি বিরক্তকর। লেখক অবশ্য পূর্বেই বলে নিয়েছেন "আমাদের প্রতিদিনকার এই বিস্বাদ বিবর্ণ পৃথিবীর 'মানুষ নয়' " সান্তনু। জানি না কেন আমাদের এই পৃথিবী কেবল বিবর্ণ বা বিস্বাদ। পৃথিবী সম্বন্ধে এমত ধারণা হলে সেখানে উপন্যাস কিভাবে সম্ভব? ("I should almost go so far as to say that without the concept of a normal society the novel is impossible.")

উপন্যাসের পাশাপাশি গল্প, এ-যুগের দুই অপ্রতিহত শিল্প-রূপ। অপ্রতিহত কিন্তু পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, বরং পরিপূরক। ব্যক্তি বা সমাজমানসের একক ভাবনার যেসব ক্ষেত্রে উপন্যাস প্রবেশের পথ পায় না, ছোটগল্প সেখানে অনায়াসে তার পথ করে নেয়। প্রতিটি অণু-পরিমাণ কর্ম বা চিন্তা, ঘটনা বা মুহূর্তও তার বিষয়বস্তু হতে পারে। সে-বিচারে শেখর বসুর রচনাগুলিও গল্প নিশ্চয়ই, যদিও আকারে প্রকারে অভিনব, আমাদের সাধারণ পরিচিত গল্প-ঐতিহ্যে স্থাপিত নয়। ঘটনা বা কাহিনী এখানে নামমাত্র, চরিত্র আছে কি নেই, বিষয়বস্তু ধূসর এবং অস্পষ্ট। তবুও সেগুলি গল্প। মুহূর্তের ভাবনার ফসল 'দশটি গল্প'। আর শিল্প-ভাবনায় শেখর বসু অতি মাত্রায় সাবজেকটিভ হওয়ায় গল্পগুলি অনেকাংশে ব্যক্তিগত রচনার লক্ষণাক্রান্ত। আমাদের চারপাশের বস্তুপুঞ্জও তাঁর রচনায় সাধারণ চেহারায় থাকেনি। ঘরকে ঘর বলে বা মেঝেকে মেঝে বলে চেনা যায় না। "ঘরটা কি রকম যেন! চার পাশের দেওয়াল কোথায়" ইত্যাদি বাক্য দিয়ে 'দশটি গল্প'র প্রথমটা শুরু, এবং শেষ গল্পের এই ভাবে শেষ····"শুধু এই উষ্ণতা, বুক থেকে গলায়, গলার কাছে, শুকনো জিবে, কপালের দু'পাশের শিরায়, চোখের মণিতে— ।" এমনিভাবে সর্বত্র একটা

অস্পষ্ট ধূসর রহস্যবোধ। চরিত্র আসতে আসতে মিলিয়ে যায়, মুহূর্তও জট পাকিয়ে যায় অন্যতর মুহূর্ত-ভাবনায়। বাক্যগঠনেও তিনি নিয়ম ভাঙেন, সিকোয়েন্স মানেন না। যেমন "তক্ষুণি, আমি যে এতকাল ধরে তার খোঁজ করছি, এবার তাহলে, দেখা হলে বলব, লোকটার ও-রকম বিশ্রী চেহারা না হলে কাঁধে হাত দিয়ে—মশাই আপনার হৃদয়, অথচ, প্রচণ্ড খুশীতে টেবিলে ঘুসি লাগাতেই টেবিলের চাইতেও ঠাণ্ডা কর্কশ গলায়

—তাড়াতাড়ি করুন।" ('অথচ')

অভ্যস্ত না হলে ছাপার ভুল আছে মনে হতে পারে। আসলে শেখর বসু ইচ্ছা করেই এ-সব নিয়ম ভেঙেছেন। হয়তো তিনি দেখাতে চান আমাদের মনে কোনো কিছুই ক্রম-পর্যায়ে আসে না। চিন্তা-ভাবনার মেশিনটা বড়ই অস্থির, হঠকারী। এবং সেইজন্য গল্পের গঠন-রীতিতেও তিনি অতি মাত্রায় তির্যক। কোনো ঘটনা, চরিত্র বা পরিবেশকেই স্ব-স্ব দাবিতে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠতে দেননি তিনি। একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য শেখর বসুর ছোটগল্পে দেখা যায়। গল্পের গদ্যরূপে তিনি গীতিকবিতার মন্ময় অন্তর্লীন ভাবকল্পনা বেশ দক্ষতার সঙ্গে প্রয়োগ করেছেন। তাঁর 'দশটি গল্প' এই হেতু বিশিষ্ট, বিশিষ্ট এবং সীমিত। সীমিত এইজন্য যে, এই জাতীয় গল্পের আস্বাদন আবছায়া এবং দূরাশ্রয়ী হয়ে পড়বেই। কবিতার বিষয় হলে যা অবলম্বন হতে পারত, গল্পের বিষয় হয়ে তা নিরালম্ব হয়ে পড়ছে। কবিতা-গল্পে মিলন-সেতু? খুবই সম্ভব। আমাদের দেশেও বলতে গেলে গল্পের উদ্ভবকাল থেকেই আছে। কিন্তু তা প্রায়শ প্রকাশরীতিতে, বিষয়বস্তুতে ক্বচিৎ; সুতরাং সার্থক গল্পকার ঐ বিপজ্জনক ঝোঁক সম্বন্ধে সচেতন থাকেন।

সুনীল দাশের গল্পে কিছু স্বাদ-বৈচিত্র্যের পরিচয় পাওয়া গেল। সুনীলবাবু গল্প বলার প্রচলিত রীতি অনেকাংশে মেনেছেন, অন্তত আমার তা মনে হয়েছে। ঘটনাবিন্যাসে তিনি অধিক পক্ষপাতী, চরিত্রচিত্রণেও অকৃপণ। শেখরবাবু যতটা মুহূর্ত-ভাবনায় আত্মলীন, সুনীলবাবু ততটা নন। তিনি বরং গল্পকথা ছড়িয়ে দিতে চান। 'মৃত ডানার প্রার্থনা'য় তো বটেই, 'জন-গণেশ' বা 'শোক'-এও তার পরিচয় আছে। 'পাখিদের স্বর' পরীক্ষা হিসাবে উত্তম, 'রাতের সূর্যমূর্তি' গল্পটি কিন্তু সংহত হতে পারেনি। 'সমুদ্রের প্রতি'তে অবশ্য তিনি সচেতন এবং সংযমী। সুনীলবাবুর গল্পগুলি কমবেশি আলাদা

করে চেনা যায় এবং যেহেতু বিষয় ও চরিত্রের বিভিন্নতা বর্তমান, সেই হেতুই কিছু স্বাদ-বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। 'শোক' গল্পের বৃদ্ধ রাধানাথ সাধারণ হয়েও তাঁর শোকের চেহারা নিয়ে অসাধারণ। স্ত্রীর মৃত্যুতে অবলম্বনহীন, কাঁদতে না পারার গুমরনো অবরুদ্ধ বেদনা পাঠকমনেও সঞ্চারিত হওয়ার অবকাশ আছে। 'মৃত ডানার প্রার্থনা'য় পিসিমার ট্রেন ধরতে না পারার দৃশ্যও স্বাভাবিক এবং সুন্দর। এ-সময়ের গতির সঙ্গে পেরে ওঠা তাঁর পক্ষে সম্ভব তো নয়ই। "পিসিমা যেন ট্রেন রকেটের দৌড় পাল্লার হিসেবটা তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন।" এ-যুগের দাম্পত্য জীবনও জটিল। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কচ্ছেদ এবং অতঃপর বিদিশা সোমের নিঃসঙ্গতার চিত্র 'পাখিদের স্বর' মনে রাখার মতো গল্প। কিন্তু অন্যত্র কয়েকটি গল্পে আবেগ বেশি প্রাধান্য পাওয়ায় গল্পের বক্তব্য প্রত্যক্ষ হয়ে উঠতে পারেনি। "আমি এমন এক মানুষ, যাকে কোলকাতার দিন শুধু নৈরাশ্য দিয়েছে আর রাত দিয়েছে অনিদ্রা আর যন্ত্রণা" ('রাতের সূর্যমূর্তি') প্রভৃতি বক্তব্য আবেগকে প্রশ্রয় দেওয়ার ফলেই এসেছে। অন্ধকার খাজুরাহো মন্দিরচত্বরে পাহারাদারের অশ্লীল হাসি অনুভব করা যায়, দেখাও যায় না তা নয়, কিন্তু লেখক এমন একাধিকবার দেখেছেন যে, মনে হয় চারপাশের অন্ধকারের কথা তিনি সাময়িকভাবে বিস্মৃত হয়েছিলেন। ঠিক এই একই কারণে 'রাজা' গল্পটির শেষরক্ষা হয়নি। অথচ 'রাজা'র সম্ভাবনা নিশ্চয়ই ছিল।

আশা করব, শেখর বসু বা সুনীল দাশ কেউই থামবেন না; তরুণতর এই গল্পকারদের কাছ থেকে আরও সার্থক ছোটগল্প আমরা পাব।

শচীন বিশ্বাস

'নান্দীকার'-এর নাটক : 'তিন পয়সার পালা'

'তিন পয়সার পালা' ব্রেখ্‌টের নাটক 'থ্রি পেনি অপেরা'র রূপান্তর। স্বভাবতই ব্রেখ্‌টের নাটক থেকে দর্শকের প্রত্যাশা অনেক, কেননা 'এপিক নাটক'-এর ধারণা ও কাঠামো ব্রেখ্‌টেরই বিশিষ্ট কীর্তি; এবং এর লক্ষণ, প্রয়োগ-পদ্ধতি ও সামাজিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য দ্ব্যর্থহীনভাবে তিনি ব্যক্ত করেছেন বিভিন্ন নাটকের ভূমিকায় ও আলোচনাসূত্রে। ফলত ব্রেখ্‌টের নাটকের রূপান্তরের ক্ষেত্রে প্রযোজনার দায়িত্ব অপরিসীম এবং স্বাধীনতা সীমিত—বিশেষত ব্রেখ্‌টীয় মূল ভাবনাগুলো উপস্থাপিত করার সিদ্ধান্ত যদি প্রযোজক নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেন। 'নান্দীকার' গোষ্ঠীর কৃতিত্ব এখানেই যে তাঁরা ব্রেখ্‌টকেই উপস্থিত করেছেন বাঙালি দর্শকের সামনে এবং রূপান্তরে যথাযথ পরিপ্রেক্ষিত সৃষ্টির মাধ্যমে 'তিন পয়সার পালা' একটি সার্থক মৌলিক নাটকও হয়ে উঠেছে।

অপেরা নাটক বস্তুটিই সম্পূর্ণ বিদেশী। নাটকে সঙ্গীতের বহুল ব্যবহার মাত্রেই তা অপেরা নাটক হয়ে ওঠে না, সংলাপের বিকল্প ও পরিপূরক হিসাবে অনেক ক্ষেত্রে সঙ্গীতকেই মূলত ব্যবহার করা হয়। অথচ প্রচলিত অপেরার আধারে বাস্তবতার প্রতিফলন অংশত ক্ষুণ্ণ হতে বাধ্য—এ-তথ্য ব্রেখ্‌টের অজ্ঞাত ছিল না। প্রাচীন অপেরা প্রসঙ্গে তাঁর অভিমত—"A dying man is real. If at the same time he sings, we are translated to the sphere of the irrational." কাজেই আধুনিক অপেরা নাটকে সঙ্গীতের ভূমিকা হবে আরও সুচিন্তিত। সঙ্গীতের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে ব্রেখ্‌টের নির্দেশ—"The music communicates, sets forth the text, takes up a position, gives the attitude." এবং এ-উদ্দেশ্য সম্পন্ন করতে গেলে সংলাপ ও সঙ্গীতের পৃথকীকরণের মাধ্যমে প্রত্যেককেই স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে, একটির কাজ অন্যটিকে দিয়ে করিয়ে নেওয়া নয়। অথচ বিভিন্ন উপাদানগুলি একটি সম্পূর্ণ নাটক তৈরি করবে—একে অপরের উপর অসম্পূর্ণ কার্যভারের দায়িত্ব অর্পণ না করেই। তবেই সম্ভব 'এপিক অপেরা' নাটক সৃষ্টি, যার বিষয় উপস্থাপনা প্রসঙ্গে ব্রেখ্‌ট বলেছেন—"Once the content becomes, technically speaking, an independent component, to which text, music, and setting

adopt attitudes, once illusion is sacrificed to free discussion, and once the spectator, instead of being enabled to have an experience, is forced as it were to cast his vote, then a change has been launched which goes far beyond formal matters and begins for the first time to affect the theatres social function."
(Brecht : Notes on the opera—Fall of the town of Mahoganny.)

এই নির্দেশনামা অনুসরণ করে অপেরা নাটক রচনা যথার্থ দুরূহ কর্ম। যথেষ্ট কৃতিত্বের সঙ্গেই একটি নতুন আঙ্গিকের নাটক রচনার মাধ্যমে শ্রীঅজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যতম পথিকৃতের কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন।

মূল নাটকটির উৎস গে এবং পেপুস্ক প্রযোজিত 'দি বেগারস অপেরা'। ব্রেখ্‌ট এই নাটকটিকে স্থাপন করেছিলেন তাঁর সমকালীন ইউরোপে অবক্ষয়ী সামন্ততন্ত্র ও সদ্যোজাত ধনতন্ত্রের সংঘাতের পরিপ্রেক্ষিতে বিপর্যস্ত মূল্যবোধের উদ্ঘাটনকল্পে। 'তিন পয়সার পালা'র পরিপ্রেক্ষিত ১৮৭৬-এর কলকাতা। মূল নাটকের ম্যাকহীথ এখানে দুর্ধর্ষ ডাকাতসর্দার মহীন্দ্র। ম্যাকহীথের প্রণয়ী পলি উপস্থিত পারুল নামে। ভিক্ষুব্যবসায়ী, বারবণিতা, ভিক্ষুক ইত্যাদি চরিত্র-গুলোও যথাযথভাবে উপস্থিত। মূল নাটকের কয়েকটি চরিত্রের সামান্য পরি-বর্তন করেছেন নাট্যকার—পরিপ্রেক্ষিত অনুযায়ী যা যথাযথ ও শিল্পসম্মত।

মহীন্দ্র, ভিক্ষুব্যবসায়ী, মহীন্দ্রের স্ত্রী পারুল, প্রণয়িনী বারবণিতাকুল, পুলিশের বড়সাহেব বাঘা কেষ্ট—এদের ঘিরেই কাহিনীটি গড়ে উঠেছে, এবং এই চরিত্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের স্বরূপ উন্মোচন মারফৎ অবক্ষয়ী সামন্ত-তন্ত্রের মেকি মূল্যবোধ ও আগ্রাসী ধনতন্ত্রের যুগে পরিবর্তিত নতুন খোলসে শোষণের আবির্ভাব নাট্যকার মূর্ত করে তুলেছেন। ব্রেখ্‌টের নাটকের রূপান্তরে মূল কেন্দ্রবিন্দু থেকে নাট্যকার এক মুহূর্তের জন্যও বিচ্যুত হননি—একথা বলা যায়। বিশেষত নাটকের কয়েকটি সংলাপ তিনি হুবহু উপস্থাপিত করেছেন মূল নাটক থেকে। প্রসঙ্গত পারুলের প্রতি মহীন্দ্রের উক্তি—"এবার ভাবছি ডাকাতি করা ছেড়ে দেব। একটা কারখানা খুলব...." ইত্যাদি অংশ উল্লেখ করা যায়। মঞ্চ পরিকল্পনায়ও 'নান্দীকার' গোষ্ঠী ব্রেখ্‌টকে সম্পূর্ণভাবেই অনুসরণ করেছেন—অন্তত ব্রেখ্‌ট ও কুর্টউইল-এর প্রযোজনায় বার্লিনে ১৯২৮-এর ৩১শে আগস্ট থেকে 'থ্রি পেনী অপেরা'র যে-প্রদর্শনী হয়—তার মঞ্চসজ্জার আলোকচিত্র থেকে একথাই মনে হয়। [John Willet এ-সংক্রান্ত তথ্য ও আলোকচিত্র

প্রকাশ করেছেন।] অথচ সংলাপে মৌলিক নাটকের স্বাদ সম্পূর্ণ উপস্থিত। যথাযথ আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য প্রথম দৃশ্যেই ভিক্ষুব্যবসায়ী যতীন্দ্রের সংলাপে উপমা ও অলংকারের উনিশ শতকী ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। আস্তাবল, থানার লণ্ঠন ইত্যাদির উপস্থাপনাও সুচিন্তিত। চরিত্রগুলির পোষাকপরিচ্ছদ নির্বাচনও যথাযথ।

সঙ্গীতাংশে কোনো বিদেশী যন্ত্র এঁরা ব্যবহার করেননি। গানগুলির সুরারোপ উনিশ শতকী তরজার ঢঙে। গানগুলির রচনায় নাট্যকার কোথাও আধুনিকতার প্রশ্রয় দেননি—ফলে সংলাপের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতি রক্ষা হয়েছে। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নাটকের শেষ দৃশ্যে 'অর্ধেক দেবতা আর অর্ধেক পুলিশ' বেশী বটকেষ্টর আবির্ভাবে মহীন্দ্রের মুক্তি ও বরলাভ। ব্রেখ্‌টের অভিপ্রেত 'Social function'-এর প্রতি সজাগ দৃষ্টিই সম্ভবত এ-পরিকল্পনার মূল প্রেরণা, এবং প্রশংসনীয় এইজন্যে যে দৃশ্যটি উপস্থাপনার নৈপুণ্যে মূল নাটকের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ।

অভিনয়ে দলগত নৈপুণ্যের পরিচয় 'নান্দীকার' গোষ্ঠী তাঁদের পূর্বতন নাটক-গুলিতে উপস্থিত করেছেন। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখেন মহীন্দ্রের ভূমিকায় অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, বটকৃষ্ণের ভূমিকায় রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত এবং যতীন্দ্রের ভূমিকায় অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়। পারুলের ভূমিকায় কেয়া চক্রবর্তীও অসাধারণ নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। এ-কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে যে ব্রেখ্‌টের প্রতিপাদ্য অবক্ষয়ী সামন্তবাদ ও আগ্রাসী ধনতন্ত্রের আপাতমধুর চরিত্রের তাৎপর্য সমকালীন বাস্তবতার সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্পর্কে জড়িত। এ-সময়ে এ-নাটকটি বাঙলার দর্শকের সামনে উপস্থিত করে 'নান্দীকার' গোষ্ঠী সমাজ ও সময়-সচেতন শিল্পবোধের পরিচয় দিয়েছেন। বাঙলার দর্শক নিশ্চয়ই তাদের অভিনন্দিত করবেন। কেননা যথার্থ শিল্পের ও শিল্পীর মর্যাদা এখনও বাঙলাদেশে দুর্লভ নয়—এ-বিশ্বাস আমাদের আছে।

তরুণ সেন

সারা ভারত সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী সম্মিলন

সম্প্রতি এলাহাবাদে সাম্প্রদায়িকতা-প্রতিরোধ সমিতির আহ্বানে সারা ভারত সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী সম্মিলন অনুষ্ঠিত হলো। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য থেকে প্রায় শতাধিক প্রতিনিধি এই সম্মিলনে যোগ দেন। কানপুর, কলকাতা, পাটনা ও আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্র ও অধ্যাপকদের মিলিত প্রতিনিধি-দল এই সম্মিলনে যোগদান করেন। বোম্বাই ও ভূপাল থেকে সমাজসেবীদের একদল প্রতিনিধিও যোগ দেন। তামিলনাদ, কেরালা ও কাশ্মীর থেকে সাংবাদিকেরা এসেছিলেন। তাছাড়া এলাহাবাদের প্রখ্যাত সাংবাদিক শ্রীএন. সি. রায় ও শ্রীসুনীল বসু সেমিনারে যোগদান করেন। রাজনৈতিক দলের নেতাদের মধ্যে যোগ দিয়েছিলেন নব-কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীজগজীবন রাম ও শ্রীশুক্লা। কমিউনিস্ট নেতাদের মধ্যে ছিলেন শ্রীরমেশ সিনহা। পাটনা থেকে পি-এস-পি, কমিউনিস্ট পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) ও বিপ্লবী কমিউনিস্টদের অন্তত দুইজন করে প্রতিনিধি সম্মিলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। সম্মিলনের অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সংখ্যাধিক্য অবশ্য ছিল নব-কংগ্রেসের পরেই নির্দলীয় প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী ও অধ্যাপকদের। মুসলিম সংগঠনগুলির মধ্যে যোগদান করেন জামিয়াৎ উলেমা ও কেরালার মুসলিম লীগের প্রতিনিধিবৃন্দ। শ্রমিকনেতা ছিলেন মাত্র একজন, গয়ার কমরেড হবিবুর রহমান। যে-সব দল সম্মিলনে অংশ গ্রহণ করেননি বা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিরোধিতা করেছেন, তাঁদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় আদি-কংগ্রেস, এস-এস-পি ও বি-কে-ডির। জনসংঘের কথা বলাই বাহুল্য।

এই সম্মিলন উদ্বোধন করলেন ভারতবর্ষের একজন শ্রদ্ধেয়া নারী—শ্রীমতী আয়েষা শেখ। ভারত-পাক যুদ্ধে অমিতসাহসী যোদ্ধা শহীদ মেজর কে-এম-এ শেখের বিধবা পত্নী। তিনি 'বীর চক্র' উপাধির অধিকারী ছিলেন। আবেগকম্পিত কণ্ঠে তিনি যখন তাঁর স্বামীর মহিমময় মৃত্যুবরণ-কাহিনীর পটভূমিকায় আমেদাবাদের মর্মন্তুদ ঘটনার কথা বলছিলেন—সভায় তখন এক নিথর স্তব্ধতা নেমে এসেছিল। তিনি বললেন—"এই দেশের প্রতিটি ধূলিকণা আমার কাছে পবিত্র। এই দেশ বাঁচলে আমরা বাঁচব—এই দেশ ডুবলে আমরা ডুবব…ভারত-পাক যুদ্ধে মুসলিমরা বিশ্বস্ততা প্রমাণ করার জন্য যুদ্ধ করেননি—তাঁরা যুদ্ধ করেছিলেন তাঁদের পবিত্র মাতৃভূমিকে রক্ষা করার জন্য।" সম্মিলনের

প্রধান আহ্বায়িকা শ্রীযুক্তা সুভদ্রা যোশী বললেন—"যারা জাতীয় সংহতি নাশকারী জঘন্য অপরাধে অপরাধী—তাদের সংখ্যা নগণ্য হলেও তারা সুসংগঠিত। অন্যদিকে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন শান্তিকামী মানুষদের কোনো সংহতি নেই। যার ফলে বার বার অন্যায়ের হাতে ন্যায় ধর্ষিতা হচ্ছে। আমাদের মধ্যে সাগ্রহ সহমর্মিতা ও সক্রিয় সহযোগিতাই একমাত্র এই অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে সমর্থ হবে। আমরা তাই এক দুর্বার সর্বাত্মক আন্দোলন গড়ে তুলতে চাই।" তারই রূপায়ণে এই সম্মিলন এক বাস্তব কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য পাঁচটি কমিশনে বিভক্ত হয়ে সুদীর্ঘ আলোচনার পর পাঁচটি রিপোর্ট পেশ করেন। কমিশনগুলি যথাক্রমে (১) জাতীয় সংহতি-নাশক শক্তিসমূহ ঃ সভাপতি—কামিলা তায়েবজী (২) রাজনৈতিক দলসমূহের ভূমিকা ঃ সভাপতি—রমেশ সিনহা (৩, আইন ও প্রশাসন ঃ সভাপতি—ডঃ বিধুভূষণ মালিক (৪) শিক্ষা ও গণসংযোগ ঃ সভাপতি —সীতারাম শরণ (৫) ছাত্র ও যুবকের ভূমিকা ঃ সভাপতি—শান্তিময় রায়। এই রিপোর্টগুলি অল্পবিস্তর সংশোধিত হবার পর সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এই সম্মিলনে একটি সর্বভারতীয় সমন্বয় কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির আহ্বায়ক হয়েছেন—ডি. আর. গোয়েল।

বিভিন্ন কমিশনের আলোচনা থেকে সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী আন্দোলনে কয়েকটি জরুরি সমস্যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে।

প্রথমত অনেকে অভিযোগ করেছেন যে সম্মিলনে শ্রমিক ও কৃষকদের সংগঠিত আন্দোলনের কোনো প্রতিনিধি যোগ দেননি। সত্যিই এই আন্দোলনে শ্রমিক-কৃষকের আত্মঘাতী অবহেলা দুর্বোধ্য। সারা ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় যদি কোনো শ্রেণী সবচেয়ে বিধ্বস্ত হয়ে থাকে তো তা হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণী ও তার জীবিকার সংগ্রাম। ভিলাই, আমেদাবাদ, বরোদা, নারোদা, ইন্দোর, মেঙ্গালোর, রাঁচী, রূঢ়কেল্লা, টিটাগড়, জগদ্দল, তেলেনিপাড়া, শাঁকরাইল, জামশেদপুর, গোরক্ষপুর, মীরাট, সুরসুন্দ, কটক প্রভৃতি একশটা নাম লিখে দেওয়া কিছু কঠিন নয়। শুধু জাতীয় সংহতি পরিষদ বা সরকারের উপর দোষ চাপিয়ে দিয়ে আমরা অশান্ত বিবেককে শান্ত করতে পারি।

বীভৎসতম নারকীয় ঘটনা ঘটছে। সাময়িকভাবে আমরা সবাই সত্যিই দিশেহারা হই, লজ্জিত হই, ম্রিয়মাণ হই, সরকারকে দোষ দেবার যা আছে তাও যান্ত্রিকভাবে দেই—কিন্তু মিলিতভাবে আন্দোলনের কথা কি

আমরা কখনো ভেবেছি না ভাবি! তা না হলে বারবার ঘৃণিত অপরাধ হয়? অথচ কঠোর শাস্তি নেই! কেন নেই? আইন সংশোধনের ব্যাপার আছে? ১৯৬৮ সালের পর দুই বছর চলে গেল। আমেদাবাদের ঘটনার মতো বীভৎস ঘটনাও ঘটল। ঘটল জগদ্দলেও। জগদ্দলে অন্তত একজন শ্রমিকবধূর উপর অত্যাচারের অভিযোগ রয়েছে।

এর জন্য কেন চরম শাস্তি হয় না? আইন বদলাতে হলে—বদলান। আইনের জন্য মানুষ? না, মানুষের জন্য আইন? আসলে আমরা নিজেরা কিছুই করিনি—করার মতো দৃঢ়তাও নেই। তা না হলে শুধু আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মিলনে প্রস্তাব গ্রহণ করা ছাড়া প্রস্তাবের প্রয়োগ সম্পর্কে এই নিদারুণ অনীহা কেন? শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃবৃন্দ—আমেদাবাদে ও জগদ্দলে—শ্রমিকবধূর প্রতি নারকীয় অত্যাচারের বিরুদ্ধে গর্জ্জে উঠছেন না কেন? কেন নিচ্ছেন না এমন সক্রিয় কর্মপন্থা যাতে করে অন্তত এ-জাতীয় অপরাধের জন্য কঠোর শাস্তি বিধান করা হয়। জরুরি অবস্থার জন্য জরুরি ব্যবস্থার প্রয়োজন চাই। শুধু অপরের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে লাভ নেই—আমাদের নিজেদের বিবেককেও বিধৌত করার প্রয়োজন আছে বৈকি। এলাহাবাদের সম্মিলনে শ্রমিক কৃষকের প্রতিনিধিদের অনুপস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতেই এই সমস্যার কথা মনে হলো।

দ্বিতীয়ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দমনে সরকারের ব্যর্থতা (সাম্প্রতিককালে পশ্চিমবঙ্গ বাদে) অনেকবার প্রমাণিত হয়েছে। দাঙ্গাকারীদের প্রতি কঠোর ও দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী শাস্তি প্রয়োগের পক্ষে বাধা কোথায়? সবকিছুই দাঙ্গার পরেই স্বাভাবিক হয়ে যায় কেন? নিষ্কৃতি পেয়ে নরঘাতকগুলি আরও বেশি উৎসাহিত হয়। সাম্প্রদায়িকতার বিষে আমাদের গণতন্ত্র আক্রান্ত। সামাজিক আদর্শ অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। যেসব দেশে বিপ্লব হয়েছে (সোভিয়েত বা চীনের কথা বাদ দিলাম)—ফ্রান্সে বা ইংলণ্ডে—বিপ্লব থেকে উদ্ভূত সামাজিক ও রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি সেখানে যারা চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে, তাদের দমন করার জন্য তাঁরা জরুরি জঙ্গী আইনের আশ্রয় নিয়েছিলেন। আমরাই বা তা কেন নেব না? জাতীয় সংহতির সমস্ত প্রস্তাব শুধু সদিচ্ছায় পর্যবসিত হচ্ছে না কি? যাঁরা এই প্রচেষ্টাকে বামপন্থা থেকে সমালোচনা করেন—তাঁরা একে হাস্যোদ্দীপক সংস্থা বলবার সুযোগ পাচ্ছেন। যাঁরা এই প্রচেষ্টাকে দক্ষিণপন্থা থেকে ঘৃণা করেন—তাঁরা একে অবহেলা করতে সাহস পাচ্ছেন। আর যাঁরা আন্তরিকভাবে একে সংগ্রামের পন্থা হিসেবে দেখেছিলেন, তাঁরা

নিরুৎসাহিত হচ্ছেন। অথচ সরকারের পক্ষে এই দৃঢ়তা কি একান্তই অসম্ভব? বাধাটা কোথায় পরিষ্কার হয়ে যাক। তা না হলে সরকারের আন্তরিকতা সম্পর্কে কর্মীদের মনে সন্দেহ আসা অস্বাভাবিক নয়।

তৃতীয়ত রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে যাঁরা ধর্মনিরপেক্ষতাকে গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অন্যতম অপরিহার্য অঙ্গ বলে মনে করেন—তাঁদের হাবভাব কার্যকলাপ ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী অভিযানে ভূমিকার আন্তরিকতা সম্পর্কেও অনেক কথাই আলোচনার মধ্যে বার বার উঠেছে। এর প্রধান কারণগুলি হচ্ছে—(১) নির্বাচনে জয়লাভের জন্য সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দান (২) শিক্ষাব্যবস্থাকে সাম্প্রদায়িকতা-বিষমুক্ত করা সম্পর্কে অনিচ্ছা বা দীর্ঘসূত্রতা (৩) সম্মিলিতভাবে নিম্নতম কর্মসূচি নিয়ে ব্যাপক প্রচার অভিযান করার অনিচ্ছা। গত ৩রা নভেম্বর দিল্লীতে সর্বদলীয় সভায় এই নীতি গ্রাহ্য হলেও আজ পর্যন্ত কার্যে পরিণত করা সম্ভব হচ্ছে না কেন? অথচ দাঙ্গা একটির পর একটি হয়ে যাচ্ছে। দাঙ্গার বিষ ছড়িয়ে পড়ছে জাতির মানসিকতায়। প্রশ্নটি সহজ—আমরা কি তাহলে সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, না, যাচ্ছি এক-জাতিতত্ত্বের নয়া ফ্যাসিবাদের দিকে। দেখছি নাকি ভারতীয়ত্বে উদ্বুদ্ধ করার (Indianisation) নামে সাম্প্রদায়িকতার আক্রমণ চালাচ্ছে জনসংঘ-পন্থীরা। গণতান্ত্রিক দলগুলির মধ্যে চিন্তার দীনতা, অস্পষ্টতা ও আদর্শ-বাদীসুলভ ঐকান্তিকতার অভাব তো আছেই, তার সঙ্গে অভাব আছে একযোগে মিলেমিশে সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের ইচ্ছার—যে-সংগ্রামের উপর নির্ভর করছে আমাদের গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ।

শান্তিময় রায়

সবার উপরে

চোদ্দটি বড় দেশী ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করায়, পার্লামেন্টের আইনকে সুপ্রিম কোর্ট নাকচ করে দিয়েছিলেন। যেসব খুঁৎ দেখিয়ে আইনকে বেআইনী করা হয়, ভারত সরকার সেইসব ফাঁক মেরে নতুন একটি অর্ডিন্যান্স জারি করেছেন বটে, কিন্তু আইনবিশারদদের ধারণা যে সেই নতুন অর্ডিন্যান্সের ভিত্তিতে রচিত নতুন বিল এনে পাশ করা হলেও সুপ্রিম কোর্টের বিচারের ধোপে সেই আইনও টিকবে না। তাছাড়া সুপ্রিম কোর্টকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে নতুন অর্ডিন্যান্সে ব্যাঙ্ক মালিকদের প্রাপ্য খেসারতের টাকা যেভাবে প্রায় দেড়া করে দেওয়া

হয়েছে, তা অন্যদিকে দেশের মানুষকে ক্ষুব্ধ করেছে। পার্লামেন্টকে চলতে হয় দেশের মানুষের কথায়, তাঁদের ভোটে। সুপ্রিম কোর্টের সেই বালাই নেই। দেশের মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদাকে ব্যক্ত করে পার্লামেন্ট অর্ডিন্যান্সের বাড়তি খেসারতকে খাটো করেও দিতে পারেন। ফলে-আইনটিকে পুনরায় সুপ্রিম কোর্টের কোপে পড়তে হবেই। এরূপ পরিস্থিতির মধ্যেই একটি গুরুতর জাতীয় প্রশ্নের উদ্ভব হয়েছে—কে বড়? পার্লামেন্ট বড় কিংবা সুপ্রিম কোর্ট বড়? পার্লামেন্ট এবং সুপ্রিম কোর্ট, উভয় সংস্থাই ভারতের রাষ্ট্রের দুটি স্তম্ভ। এদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব ভারতের রাষ্ট্রেরই দ্বন্দ্ব। ভারতের সংবিধান রচনার বিশবছর পর ভারতীয় রাষ্ট্রের মধ্যে এই দ্বন্দ্বের আবির্ভাব ভারতের রাজনীতির নতুন মোড় নেবারও সূচনা।

কে বড়, পার্লামেন্ট কিংবা সুপ্রিম কোর্ট—প্রশ্নটি এভাবে সরাসরি হাজির হয়ে পড়লে পার্লামেন্টের সুপ্রিমত্বকে অগ্রাহ্য করে এমন বুকের পাটা কারুর নেই। সেজন্যেই কায়েমী স্বার্থের তল্পিবাহকেরা প্রশ্নটিকে বেঁকিয়ে দুমড়ে বিকৃত করে উপস্থাপনের জন্য আদাজল খেয়ে লেগেছেন। ঐ সব ব্যক্তিরা বলছেন যে, পার্লামেন্টের আইন করার অধিকারকে সুপ্রিম কোর্ট কখনো অস্বীকার করেননি, তবে সেই আইনকে সুপ্রিম কোর্টের বিচারের কষ্টিপাথরে "ন্যায়সঙ্গত" বলে সার্টিফিকেট পেতে হবে। কথাটাকে যতই "তৈলাধার পাত্র কিংবা পাত্রাধার তৈল" করে গুলিয়ে দেবার চেষ্টা করা হোক না কেন, সুপ্রিম কোর্টের শেষ কথা বলার এই অধিকার আসলে তো পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্বকেই অস্বীকার করা। আর সেই অস্বীকৃতির ফলে উদ্ভূত প্রশ্ন এবং তার জটিলতা যেখানে ছিল সেখানেই থেকে যায়।

প্রশ্নটিকে নিয়ে প্রখ্যাতনামা বিচারপতিরাও ভাবিত। নিজেদের পেশা ও কর্তৃত্ব এবং যশ ও অধিকারের উপর ইতিহাসের এমন হামলায় তাঁরা বিচলিত হবেন সেটা খুবই স্বাভাবিক। সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রী এস. আর. দাস এহেন পরিস্থিতির মধ্যে সম্পূর্ণ একটি অভিনব দাওয়াই বাতলিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, পার্লামেন্ট ও সুপ্রিম কোর্টের সম্মুখ-দ্বন্দ্বকে যেমন করে হোক এড়িয়ে যেতে হবে এবং তার উপায় হলো "মানুষের ইচ্ছা"কেই সুপ্রিম বলে গণ্য করা।

রাষ্ট্রের দুই স্তম্ভের দ্বন্দ্বে "মানুষের ইচ্ছা"কে সুপ্রিম করা প্রকৃতপক্ষে একটি বিপ্লবী কথা। বস্তুত সেই বিপ্লবী সমাধান ছাড়া বর্তমান দ্বন্দ্ব থেকে কোনো

মুক্তিও নেই। পার্লামেণ্ট এবং সুপ্রিম কোর্ট—দুটি স্তম্ভই সংবিধানের কেতাবে আটকে গেছে। পার্লামেণ্টের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সুপ্রিম কোর্টকে খাটো করা হবে, তা যদি বা সম্ভব, তবু সম্পত্তির শাশ্বত অধিকার সংক্রান্ত সংবিধানের মৌলিক অধিকারের ধারা পার্লামেণ্টে শতকরা একশ জন সদস্য ভোট দিয়েও বদলাতে বা সংশোধন করতে পারেন না বলে সুপ্রিম কোর্টের অপর একটি রায় এমনভাবে বহাল হয়ে রয়েছে যে, সংবিধানের কোনো কোনো প্রবক্তা নতুন সংবিধান রচনা ছাড়া পরিত্রাণের কোনো বিকল্প পথ খুঁজে পাচ্ছেন না। কেউ কেউ আবার বলছেন যে, নতুন সংবিধান রচনার ডাক দেবার কোনো অধিকারও পার্লামেণ্টের নেই। একমাত্র উপায় হলো সম্পত্তির অধিকার সংক্রান্ত ধারাকে নাকচ করার জন্য জাতীয় রেফারেণ্ডাম বা গণভোট গ্রহণ করা।

ভারতের পার্লামেণ্ট এবং ভারতের বিচার বিভাগকে পরস্পর নির্ভরশীল করেই রচিত যে-সংবিধান, তার মধ্যের বিরোধের মীমাংসা এখন কে করবে? রাষ্ট্রের মধ্যেরই দুই প্রধান স্তম্ভের দ্বন্দ্ব কিভাবে মিটবে? জটিল এই প্রশ্নের জবাবেই বলতে হচ্ছে "সবার উপরে মানুষ সত্য।" মানুষকে সেই শক্তি না দিয়ে রাষ্ট্রেরও মুক্তি নেই।

ভারতের রাষ্ট্রনীতিতে মানুষের শক্তির এই যুগ যেন হেলাফেলায় নষ্ট না হয়।

জ্যোতি দাশগুপ্ত

সাহিত্য আকাদেমী পুরস্কার

সাহিত্য আকাদেমী পুরস্কারের ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। ভারতের বিভিন্ন ভাষায় রচিত শ্রেষ্ঠ রচনাগুলির মধ্যে এবার বাঙলা দেশের দুজন কৃতী লেখকের রচনাকে স্বীকৃতি প্রদান করায় আমরা সত্যিই গর্ব অনুভব করছি। এঁদের একজন স্বনামখ্যাত গবেষক ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, অন্যজন প্রখ্যাত কবি মণীন্দ্র রায়। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর ইংরেজীতে লেখা গ্রন্থ 'অ্যান আর্টিস্ট ইন লাইফ' এবং মণীন্দ্র রায় তাঁর বাঙলা ভাষায় রচিত কাব্যগ্রন্থ 'মোহিনী আড়াল'-এর জন্য সাহিত্য আকাদেমী পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন।

ডঃ রায় ও কবি মণীন্দ্র রায়—দুজনই বহুকাল থেকে 'পরিচয়'-গোষ্ঠীর আপনজন। তাঁদের এই কৃতিত্বে আমরা যেমন সানন্দে অংশগ্রহণ করছি তেমনি

বাঙলার সৎ-শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সকল সংস্কৃতিসেবীর পক্ষ থেকে তাঁদের উভয়েরই উদ্দেশে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

ডঃ নীহাররঞ্জন রায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাত-কীর্তি অধ্যাপক। অধুনা তিনি ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব অ্যাডভান্সড স্টাডিজের অধিকর্তারূপে বহুব্যাপ্ত গবেষণাকার্য পরিচালনা করছেন। তাঁর মনীষার দীপ্তি অনস্বীকার্য। রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত তাঁর ইংরেজী গ্রন্থ সাহিত্য আকাদেমী পুরস্কারে ধন্য হলেও বাঙলাদেশের গবেষক-ছাত্রেরা ডঃ রায়ের বাঙলা ভাষায় রচিত 'রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা' নামক গ্রন্থখানির সঙ্গে দীর্ঘকাল সুপরিচিত। বরং বলা যায়, রবীন্দ্র-সাহিত্য অনুধাবনের জন্য যে অঙ্গুলিমেয় আকরগ্রন্থ আজও সুধী-সমাজে সমাদৃত, ডঃ রায়ের 'রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা' তার মধ্যে অন্যতম। আমার ধারণা, ডঃ রায়ের শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)' নামক সুবিশাল গবেষণাগ্রন্থ। একক মানুষের কী অসাধারণ নিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও পাণ্ডিত্য এই সুবিশাল গ্রন্থের প্রতিটি পৃষ্ঠায় বিধৃত হয়ে আছে, তা ভাবলেও অবাক হতে হয়। সত্যি কথা বলতে কি, ডঃ রায়ের নিরলস গবেষণার ফলেই বাঙলা তথা বাঙালীর ইতিহাসের বহু লুপ্তপ্রায় ছিন্নসূত্র প্রত্নতাত্ত্বিক অসংখ্য সাক্ষ্য-প্রমাণের দ্বারা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এ-দিক থেকে সমগ্র বাঙালী জাতি তাঁর কাছে যথেষ্ট ঋণী। এ-ছাড়া তাঁর আরও অনেক গবেষণাপত্র দেশ-বিদেশে সমাদৃত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাগেশ্বরী অধ্যাপকরূপেও তিনি ছিলেন খ্যাতির শীর্ষ-চূড়ায়। যাহোক, ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের মতো পণ্ডিত-মনীষীকে আমলাতন্ত্র পরিবেষ্টিত দিল্লীর সাহিত্য আকাদেমী-কর্তৃপক্ষ এতদিনে যে সম্মান দেখাতে পারলেন, অবহেলিত বাঙলার পক্ষে নিঃসন্দেহে তা এক সু-সংবাদ!

অবশ্য কবি মণীন্দ্র রায়কে সম্মানিত করে সাহিত্য আকাদেমী এবার যে সুবুদ্ধি ও কর্মতৎপরতার পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। না-কি এও আমলাতন্ত্রের এক বিচিত্র লীলা! ঘটনা যে-ভাবেই ঘটুক তার ফলাফল অন্তত সন্তোষজনক, এ-কথা সানন্দেই স্বীকার্য।

কবি মণীন্দ্র রায় বাঙালী কাব্য-পাঠকের কাছে একটি সুপরিচিত নাম। এই 'পরিচয়'-এর পৃষ্ঠাতেই প্রায় তিরিশ বছর আগে তাঁর কাব্য-সাধনার সূত্রপাত। বিগত তিরিশ বছরে তিনি অজস্র কবিতা লিখেছেন। বলা যায়, চল্লিশের দশকের তাঁর সমসাময়িক কবিদের মধ্যে কবিতার সংখ্যা-প্রাচুর্যে তিনিই বোধহয় অগ্রণী। ১৯৩৯ সাল থেকে এ-পর্যন্ত প্রকাশিত ১৫ খানি মৌলিক কাব্যগ্রন্থ

এরই জ্বলন্ত স্বাক্ষর। কিন্তু শুধু সংখ্যা-প্রাচুর্যে নয়, মণীন্দ্র রায়ের কবিতা গুণগত বৈশিষ্ট্যেও সমুজ্জ্বল। অন্তত চল্লিশের দশকের যাঁরা প্রধান কবি—মণীন্দ্র রায় তাঁদের অন্যতম। তিনি তাঁর এই দীর্ঘ কাব্য-সাধনায় বারংবার নতুন পথ-পরিক্রমায় অগ্রসর হয়েছেন। ফলে, মণীন্দ্র রায়ের কবিতায় বিষয়বৈচিত্র্য এবং আঙ্গিকগত নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষারও অনেক মনোমুগ্ধকর সমাবেশ ঘটেছে। বর্তমান আলোচক মণীন্দ্র রায়ের কাব্য-সাধনা ও তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ইতিপূর্বে কয়েকটি প্রবন্ধে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। ১৩৭৬ সালের শ্রাবণ মাসে 'পরিচয়' পত্রিকার বিশেষ সমালোচনা সংখ্যাতেও আমি মণীন্দ্র রায়ের 'এই জন্ম, জন্মভূমি' কাব্য-গ্রন্থের আলোচনা-প্রসঙ্গে আমার মতামত ব্যক্ত করেছি। সহৃদয় পাঠক সেই নিবন্ধটি পাঠ করলে ইতিহাস-সচেতন, মানবমহিমায় আস্থাবান কবি মণীন্দ্র রায়কে কিঞ্চিৎ অনুধাবন করতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা বিশেষ প্রয়োজন বোধ করছি। যে 'মোহিনী আড়াল' কাব্যগ্রন্থখানি পুরস্কৃত হয়েছে তা একটি দীর্ঘ কবিতা মাত্র। সাম্প্রতিক কালে এই দীর্ঘ কবিতা রচনার ক্ষেত্রেও তিনি বোধহয় অন্যতম পথিকৃৎ। অবশ্য পরবর্তীকালে মণীন্দ্র রায় আরও দীর্ঘ কবিতা উপহার দিয়েছেন তাঁর 'এই জন্ম, জন্মভূমি' কাব্যগ্রন্থে। 'মোহিনী আড়াল' কাব্যগ্রন্থে যার সূচনা, তার সার্থক পরিণতি বোধহয় 'এই জন্ম, জন্মভূমি'তে। অতি সম্প্রতি প্রকাশিত তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'ভিয়েতনাম'-এ এরি অনুরণন লক্ষ্য করেছি। সবচেয়ে বড় কথা, মণীন্দ্র রায় সজীব কবি। সৃষ্টির প্রাচুর্যে এখনও তিনি অক্লান্ত। প্রগতি-সংস্কৃতি আন্দোলনেও তিনি আমাদের বন্ধু-সাথী। তাঁর এই সজীবতা, অক্লান্ত কাব্য-সাধনা এবং কর্মনিষ্ঠা দীর্ঘকাল অব্যাহত থাক, আপনজন রূপে এটাই আমাদের ঐকান্তিক কামনা। আমরা ডঃ নীহাররঞ্জন রায় ও কবি মণীন্দ্র রায়কে পুনর্বার আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

ধনঞ্জয় দাশ

ভারত-সোভিয়েত সাংস্কৃতিক সংঘের সম্মেলন

কটক শহরের সুসজ্জিত স্টেডিয়ামে ৬ই মার্চ থেকে ৮ই মার্চ ভারত-সোভিয়েত সাংস্কৃতিক সংঘের নবম জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। লেনিনের জন্মশতবর্ষে অনুষ্ঠিত ভারত-সোভিয়েত সাংস্কৃতিক সংঘের এই সর্বভারতীয় সম্মেলন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সম্মেলনের উদ্যোক্তা এবং প্রতিনিধিরাও যে এ-বিষয়ে যথেষ্ট

সচেতন ছিলেন তা সম্মেলনের উদ্বোধন দিবসে সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দের বক্তৃতায় যেমন পরিস্ফুট তেমনি পরবর্তী দুই দিনের বিভিন্ন কমিশনের আলোচনায় এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সজীব বিতর্কের মধ্যেও স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

ভারত-সোভিয়েত সাংস্কৃতিক সংঘকে আরও ব্যাপক গণভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে এই দুই মহান দেশের মৈত্রী, আর্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতাকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধির দিকে অগ্রসর করে নিয়ে যেতে না পারলে আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশ যে তার ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌছতে পারবে না, তিন দিনের এই সম্মেলন থেকে পাঁচশতাধিক প্রতিনিধি অন্তত এই সারসত্যটুকু উপলব্ধি করে এসেছেন বলে আমার বিশ্বাস। বিশেষ করে লেনিনের জন্মশত-বর্ষে তাঁর শিক্ষার আলোকে আমরা যাতে আমাদের দেশের অন্ধকার দুহাতে সরিয়ে, সুখী-সমৃদ্ধিশালী, নতুন গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষ গড়ে তুলতে পারি—এই সম্মেলন থেকে 'লেনিন-জন্মশতবর্ষের ঘোষণা'-য় তারই আশ্চর্য সুন্দর এক অভিব্যক্তি ঘটেছে। আমরা 'পরিচয়'-পাঠক তথা বাঙলা দেশের ভারত-সোভিয়েত মৈত্রীর অকৃত্রিম সুহৃদদের জন্য সেই ঐতিহাসিক ঘোষণাটি নিচে প্রকাশ করছি।

লেনিন-জন্মশতবর্ষের ঘোষণা

লেনিন বেঁচে আছেন....
দেশে দেশে যে-সব নর-নারী শান্তি, মানুষে-মানুষে বন্ধুত্ব ও মানব-প্রগতির জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টারত, তাঁদের হৃদয় এবং মনে লেনিন বেঁচে আছেন....

সাম্রাজ্যবাদ এবং নতুন ও পুরনো ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে সমস্ত জাতির মুক্তি-সংগ্রামের মধ্যে লেনিন বেঁচে আছেন....

গণতন্ত্রের জন্য, ক্ষুধা-দারিদ্র্য এবং শোষণের হাত থেকে চিরমুক্তির জন্য মানব-জাতির সকল প্রচেষ্টার মধ্যে লেনিন বেঁচে আছেন....

সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, যার স্থপতি লেনিন, সেই রাষ্ট্রই মানবতার পূজারীদের কাছে লেনিনের সবচেয়ে মূল্যবান অবদান।

যেখানেই মানুষ শান্তির জন্য সংগ্রামরত, সেখানেই তাঁরা জানেন লেনিনের স্বদেশ তাঁদেরই পাশে দাঁড়িয়ে। যেখানেই মানুষ মুক্তির জন্য লড়াই করছেন, সেখানেই তাঁরা জানেন লেনিনের দেশ তাঁদের পাশে আছে।

লেনিনের কাছ থেকে প্রেরণা এসেছিল, আমাদের দেশের স্বাধীনতার সংগ্রাম পেয়েছিল নতুন উদ্দীপনা। অক্টোবর বিপ্লবের যে-অগ্নিশিখা লেনিন প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন, সাম্রাজ্যবাদের শৃংখল ভাঙ্গায় তাই জুগিয়েছিল আমাদের শক্তির উপর আস্থা।

যে-মহামূল্য উপাদানে গঠিত স্তম্ভের উপর শান্তি, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, জাতীয় স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের বিধি-বিধানগুলি প্রতিষ্ঠিত, যার সঙ্গে আমাদের দেশের জনগণ অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ, সেই নীতিগুলি নির্ধারিত করেছিলেন লেনিন।

লেনিন যে-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, সেই রাষ্ট্রের কাছ থেকেই এসেছিল আমাদের স্বাধীনতার জন্য অমূল্য সমর্থন।

লেনিনের দেশ থেকে আজও আসে সেই ঐকান্তিক বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা যা ভারতের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা রক্ষার শক্তিশালী রক্ষাকবচ রূপে কাজ করছে, যা ক্রমবর্ধমানভাবে আমাদের আর্থনীতিক উন্নয়ন এবং আত্মনির্ভরতার পক্ষে অপরিহার্য শক্তিরূপে বিরাজমান।

লেনিনের জন্মশতবর্ষে অনুষ্ঠিত ভারত-সোভিয়েত সাংস্কৃতিক সংঘের এই নবম জাতীয় সম্মেলন—নতুন পৃথিবী গড়ার জন্য সংগ্রামরত মানুষের প্রতিটি রণক্ষেত্র যাঁর পদচিহ্নলাঞ্ছিত, আমাদের যুগের সেই মহামানবের উদ্দেশে সশ্রদ্ধ শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছে।

প্রতিটি মহাদেশে যাঁরা শান্তি, জাতীয় স্বাধীনতা এবং সাম্রাজ্যবাদের অবসানের জন্য কাজ করছেন, লেনিনের জন্মশতবর্ষ সেই সমস্ত শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য দ্বিগুণ প্রচেষ্টায় উদ্বুদ্ধ করছে।

আমাদের দেশে নতুন ভারত গড়ার জন্য অনেক শহীদ সংগ্রামে আত্মবিসর্জন দিয়েছেন। সেই নব ভারত গঠনের জন্য লেনিন জন্মশতবর্ষের বাণী সকল দেশ-প্রেমিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করুক।

সঞ্জয় দাশগুপ্ত

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় স্মরণে

ভাবের গভীরতায়, চিন্তার স্বচ্ছতায় এবং বিশ্লেষণের প্রত্যয়ে ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আমার মনে যে-ভাবমূর্তি সৃষ্টি করেছেন, তা আজীবন মনে থাকবে। তাঁর মধ্যে এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছি, যা আমার মনকে উদ্দীপ্ত করেছে, অনুপ্রাণিত করেছে, চমৎকৃত করেছে।

বরাবর দেখেছি তাঁর মধ্যে চিন্তার অতলস্পর্শী গভীরতা আর সমস্ত প্রতিপাদ্যকে সহস্র খুঁটিনাটির মধ্য দিয়ে বিচার করে দেখবার ক্ষুরধার প্রবণতা। অধ্যাপক হিসাবে ছাত্রদের পক্ষে এমন সহায়ক আদর্শ শিক্ষক-দুর্লভ বললেও চলে। কোনো বিষয়ের কোন তাৎপর্যটি কোন বিশ্লেষণটি সঙ্গত—তা যেন তাঁর নখদর্পণে ছিল। সেইমতো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করে, বিচার করে, সর্ববিধ অর্থ উদ্ধার করে বিষয়টি তিনি তাঁর ছাত্রদের বুঝিয়ে দিতেন। অনায়াসনৈপুণ্যে তিনি যে কোনো দুরূহ বিষয়ের গভীরে নিয়ে যেতে জানতেন। তাঁর অধ্যাপনার মধ্যে বাগ্মিতার ছটা দেখা যেত না, প্রকাশ পেত অনন্যসাধারণ মনস্বিতা এবং উপলব্ধির গভীরতা।

সকল বিষয় তিনি সমান দক্ষতার সঙ্গে পড়িয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক হিসাবে তিনি যখন বিদ্যাপতি পড়িয়েছেন, তখন তাঁর রসিক ও ভাবুক মনের দুর্লভ পরিচয়টি ব্যক্ত হয়েছে; তেমনি যখন তিনি আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, তখনও তাঁর আশ্চর্য রসগ্রাহিতা ও বিশ্লেষণক্ষমতার সমান পরিচয় দিয়েছেন। বিদ্যাপতি তিনি পড়িয়েছেন শিল্পীর ভাবদৃষ্টি ও দার্শনিকের তত্ত্বদৃষ্টির সমন্বয়ে। আধুনিক সাহিত্য পড়িয়েছেন তার নতুন তাৎপর্য উদ্‌ঘাটিত করতে।

তাঁর সাহিত্য-সমালোচনায় শুধুই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পাইনি, পেয়েছি পুরাতনকে পুনঃসৃষ্টির প্রয়াস। তাঁর লেখায় শুধু মনন নেই, রয়েছে মননের সুষমামণ্ডিত প্রকাশ। ভাবের গভীর অতলতায় ডুব দিয়ে যে মণি-রত্ন তিনি সমালোচনা-প্রসঙ্গে উদ্ধার করে দিয়ে গিয়েছেন, তা আমাদের কাছে চিরদিনের সম্পদ হয়েই থাকবে।

মনে-প্রাণে তিনি ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান শিল্পী—সুন্দরের পূজারী। তাই শুধু সাহিত্যে নয়, সঙ্গীতেও ছিল তাঁর গভীর অনুরাগ। তাঁর সাহিত্যকর্মের সঙ্গেই বাঙলার জনসাধারণ পরিচিত। তাঁর সঙ্গীতানুরাগের দিকটি হয়তো

অনেকের কাছেই অপরিজ্ঞাত। ক্লাসিক-গানের তিনি ছিলেন একজন বোদ্ধা এবং বাইরে কোনো আসরে গান না গাইলেও বাড়িতে তিনি গানের চর্চা করেছেন—এ দেখেছি।

আলোচনা সভায় দেখেছি তাঁর তীক্ষ্ণধী মননের প্রকাশ। রাজনীতি, সাহিত্য, সমাজ-সমস্যা, অর্থনীতি—যে-কোনো বিষয়েরই আলোচনা হোক, বিভিন্ন বক্তার ভাষণের পর শ্রীকুমারবাবু যখন বলতে উঠতেন, তখন সেই ভাষণের মধ্যে পেতাম নতুন আলোকপাত, নতুন ব্যাখ্যা। উচ্ছ্বাস নেই, কথার মধ্যে ফুলঝুরি নেই—আছে তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ আর সূক্ষ্ম বিচার। সব সময়েই অকাট্য যুক্তি দিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করতেন। তাঁর বহুবিধ রচনার মধ্যেও এই অলোকসামান্য মননশীলতার পরিচয়টি রয়েছে।

আর-একটি বৈশিষ্ট্য যা তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করেছি, তা হলো মাতৃভাষার প্রতি তাঁর অগাধ ভালোবাসা এবং নিঃশর্ত আনুগত্য। শরীর অশক্ত, মন বিক্ষিপ্ত, কিন্তু তবুও বাঙলা সাহিত্যের কোনো অনুষ্ঠানে ডাক পড়লে তিনি তা উপেক্ষা করতে পারতেন না। নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের ভারতব্যাপী নানা স্থানে অনুষ্ঠিত কোনো অধিবেশনেই বোধকরি তিনি অনুপস্থিত থাকেননি। জয়পুর, আগ্রা, মাদ্রাজের নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলাম। সে-সময়ে তাঁর খুব ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছি এবং বাঙলাভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ যে কত গভীর তা জেনেছি। দেশ বেড়াবার সখে নয়, অথবা সভায় গিয়ে বিশিষ্ট আসনে বসবার স্পৃহায় নয়, পথের এবং শরীরের কষ্ট সহ্য করেও অন্তরের প্রেরণায় তিনি সেইসব অধিবেশনে যোগ দিয়েছেন, আলোচনা করেছেন এবং তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বিচারবুদ্ধি দিয়ে বাঙলা সাহিত্য সম্পর্কে নানা গঠনমূলক পরিকল্পনা ও প্রস্তাব রেখেছেন।

স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি নিবিড় ভালোবাসার পরিচয়ও তাঁর মধ্যে পেয়েছি। দেশের এবং বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণে তিনি যে গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতেন, তা শুনে বিস্মিত হয়ে বহুবার ভেবেছি—এমন করে আমরা তো কখনও বিষয়টিকে চিন্তা করিনি। তাঁর সঙ্গে যে-কোনো বিষয়ে আলোচনার পর তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যখন চলে এসেছি, তখন মনে হয়েছে—যেন আজ অনেক সম্পদ সংগ্রহ করে নিয়ে এলাম।

তাঁর মধ্যে স্বজাতিপ্রীতির পরিচয় পেয়েছি নানা কর্মে—যথা, বহু গণ-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর যুক্ত থাকার মধ্য দিয়ে। শুধু আপন নামটিকে বিভিন্ন

জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত রেখে যশ অর্জনের স্পৃহায় নয়, তাঁর চিন্তা এবং পরিকল্পনা দিয়ে, তাঁর সাহচর্য দিয়ে, অভিমত ও উপদেশ দিয়ে কিসে তাদের, তথা দেশের ও দেশবাসীর উপকার হয় সেই নিঃস্বার্থ চেষ্টাই বরাবর ছিল তাঁর! অনেকের কাছে হয়তো তাঁর কর্মপ্রচেষ্টার এই দিকটি অজ্ঞাত।

নিজেকে প্রচার করবার আসক্তি তাঁর ছিল না কোনোদিনই। তাই তাঁর গুণমুগ্ধ অনুরাগীদের মধ্যে অনেকেই জানতেন না যে তিনি কোন কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। এও তাঁর চরিত্রের একটি অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য।

তিনি যে-সব আসরে গিয়ে বসতেন, যে-সব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাদের কাজ চলবে, আসর বসবে, আলোচনাও হবে—প্রস্তাব এবং পরিকল্পনাও তৈরি হবে, পেশ করা হবে। কিন্তু জ্ঞানের যে-আলোকবর্তিকাটি সেইসব আসরে ও অনুষ্ঠানে অম্লান শিখায় জ্বলত—তা আর দেখা যাবে না—ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রয়াণে এই অনুভূতিটিই মনের মধ্যে সব চেয়ে বেশি করে জাগছে।

কনক বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙালি লোকসংস্কৃতির সেবক, বাউলগানের একনিষ্ঠ সংগ্রাহক ও বিশিষ্ট বিদ্বান উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য পরিণত বয়সে সম্প্রতি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বাঙলাদেশ তাঁর মৃত্যুতে বাঙালি গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির একজন শ্রেষ্ঠ সংগ্রাহক ও গবেষককে হারাল। আমরা তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছি এবং তাঁর অগণিত আত্মীয়পরিজন ও স্বজনবান্ধবদের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করছি।

আন্তর্জাতিক নারীআন্দোলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেত্রী ও বৃটিশ জনজীবনে বিশিষ্ট প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব মনিকা ফেলটনের সম্প্রতি মৃত্যু হয়েছে। আন্তর্জাতিক শান্তি, সৌভ্রাতৃত্ব ও গণতন্ত্রের পক্ষে তিনি নিরলস সংগ্রাম করে গেছেন। নারীমুক্তির মহৎ সংগ্রামের এই মহিয়সী নেত্রীর মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকার্ত।

সম্পাদক পরিচয়

সবিনয় নিবেদন,

পৌষ-মাঘ সংখ্যা পরিচয়ে শ্রদ্ধেয় শ্রীসুকুমার মিত্রের চিঠিখানি পড়লাম। আপাতদৃষ্টিতে শ্রীযুক্ত মিত্রের চিঠিটির বিষয়বস্তুর যাথার্থ সন্দেহ করি না। জন মেনার্ড কেইনস (কেউ কীনস বলেন কেউ বা কেইনস—অবশ্য বিলিতি বইতে দেখেছি Keynes pronouned to rhyme "rains") সত্যই তাঁর 'এ ট্রিটিজ অন মানি'তে অনেক কিছুই নতুন কথা বলেছিলেন। অবশ্য বইখানি বেরোতে না-বেরোতেই কেইনস নতুন পথের সন্ধানে প্রায় বই খানিকে বরবাদ করেও দিয়েছিলেন।

কিন্তু শ্রীযুক্ত মিত্রের উল্লেখিত 'কদলী চক্রের' লগ্নি ও সঞ্চয়ের তত্ত্বটি কি কেইনসেরই আবিষ্কার? 'এ ট্রিটিজ অন মানি'র দ্বাদশ পরিচ্ছেদের (যে পরিচ্ছেদে শ্রীযুক্ত মিত্রের উল্লেখিত উদাহরণটি আছে) সূত্রপাতেই কেইনস তাঁর সঞ্চয় ও লগ্নিতত্ত্বের জন্য লুদভিগ মাইজেস (গ্রন্থটির প্রকাশ কাল ১৯১২), জোসেফ সুমপেটার, ডি. এইচ. রবার্টসন, আববাটি প্রভৃতিকে উত্তমর্ণ মনে করেছেন। স্বয়ং কেইনসও তাঁর ট্রিটিজ-এর বিষয় ভিন্ন মত পোষণ করতেন [When I finished it (A Treatise on Money), I had made some progress towards pushing monetary theory back to becoming a theory of output as a whole.. I failed to deal thoroughly with the effect of changes in the level of output]. আর যদি তাঁর জেনারেল থিয়োরি অব এমপ্লয়মেন্ট, ইন্টারেস্ট, অ্যাণ্ড মানি তত্ত্বের ক্ষেত্রেও একাধিক পূর্বসূরীর নাম উল্লেখ করা যায়, প্রসঙ্গত টমাস ম্যালথস-এর সাধারণ উদ্বৃত্ত (general glut) সহ কার্যকরী চাহিদার তত্ত্ব (অর্থাৎ পূর্ণনিয়োগ রাখতে হলে পরগাছা সমাজের ভোগব্যবস্থা চালু রাখতে হবে) থেকে ক্নুট উইকসেলের স্বাভাবিক সুদের হারের তত্ত্ব (কেইনসের মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতার অনেকাংশে পূর্বসূরী) বহু কিছুই এসে পড়ে। এমন-কি তাঁর বহু আলোচিত নগদ পছন্দের সূত্রসাপেক্ষ সুদের হারের তত্ত্বপ্রসঙ্গেও মঁতেস্কুর কাছে কেইনসের ঋণ স্মর্তব্য (This truth was discerned very precisely by Montesquieu...in respect of the theory of interest it harks back to the doctrines of Montesquieu. Keynes : Preface to the French edition of the General Theory : International Economic Papers,

No 4, pp 68-69)। শ্রীযুক্ত মিত্র যে 'কদলীচক্রের' উল্লেখ করেছেন, তাতেও কেইনস যে নতুন পথ কেটে বেরিয়ে এসেছেন এমন কথাও মনে করা যায়না। কেইনসের মতে, কেবলমাত্র কদলীভোগী ও উৎপাদক কোনও স্বর্গরাজ্যে (Eden) সহসা মিতব্যয় ও সঞ্চয় বাড়ানোর প্রচারের সাফল্য হলে, গড় খরচার সমপরিমান দামে বিক্রেয় কদলী কমদামে বিক্রি হয়ে যাবে। কেননা, কলা জমিয়ে রাখা যায় না, পচে যেতে পারে বলে। ফলে ক্রেতাদের টাকার ক্রয়ক্ষমতা বাড়লো বটে. কিন্তু উদ্যোক্তাদের লোকসানের ফলে মজুর ছাঁটাই শুরু হয়ে যাবে। ফলে দেশের আয় আরও কমবে। পরম্পরায় ছাঁটাই বাড়বে। উৎপাদন কমবে। আয় কমবে। এর ফলে তিনটি অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। (ক) উৎপাদন শূন্যতায় পৌছালো, দেশবাসী না খেয়ে মারা পড়লো। (খ) মিতব্যয়িতার প্রচার বন্ধ হলে বা দারিদ্রের ফলে সঞ্চয়করার অভ্যাসও চলে গেল। (গ) লগ্নির সুযোগ করা গেল যাতে লগ্নির ব্যয় কোন ক্রমেই সঞ্চয়ের চেয়ে কম নয়। সঞ্চয় ও লগ্নির, এই তত্ত্বে একটা কেন্দ্রীয় জায়গায় ফাঁক রয়ে গেছে। অর্থাৎ কি ভাবে একটি অর্থ-নীতি দীর্ঘস্থায়ী মন্দার মধ্যে থেকে যায় তা এতে বোঝা যায় না। ঢেঁকির ওঠাপড়ার মতো সঞ্চয়-লগ্নিতে বিপরীত ভাব এলে, আবার উল্টো দিকে অর্থনীতি ছুটবে। একবার মন্দার দিকে। আরেকবার ফাঁপতির দিকে। অথচ কেইনসের জেনারেল থিয়োরির মূল প্রতিপাদ্য হলো স্বল্পসময়ে মূলধনতান্ত্রিক অর্থনীতি স্বাভাবিকভাবে অপূর্ণকর্মসংস্থানে লগ্নি ও সঞ্চয়ে ভারসাম্য বজায় রাখে। পূর্ণ কর্মসংস্থানের আগেই তারল্যের ফাঁদে অর্থনীতি হোঁচট খেয়ে পড়ে।

একথা ঠিকই যে কেইনস জেনারেল থিয়োরির সপ্তম পরিচ্ছেদে যে সঞ্চয় ও মূলধন লগ্নিরতত্ত্ব দিয়েছেন, তাঁরই মতে তা "...is essentially development of the old" অথচ "the exposition in...Treatise on Money, is of course, very confusing and incomplete in the light of further developements...p. 38"

জেনারেল থিয়োরি লেখবার আগে কেইনস মার্কস-এঙ্গেলস পাঠ করেছিলেন বার্ণার্ড শ-র অনুরোধে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় আর্থনীতিক মন্দার কারণ অন্বেষণে। অবশ্য তাঁদের রচনা কেইর্নস পছন্দ করেন নি। ১৯৩৫ সালে কেইনস শ-কে লিখলেন, ...you have to know that I believe myself to be writing a book on economic theory which will largely revolutionise....the way the world thinks

about economic problems." আর এ-বইখানিতে কয়েকটি ব্যাধির কথা তিনি বললেন, যেমন, ১। মন্দার স্তরে অর্থনীতি অনেকদিন থেকে যেতে পারে, নিজস্ব কোন শক্তিতে তা নাও উঠে দাঁড়াতে পারে; ২। দেশের সম্পদ নির্ভর করে লগ্নির উপরে, সঞ্চয় যদি কাজে না লাগানো যায়, অর্থনীতিতে সঙ্কোচন দেখা দেয়; ৩। লগ্নি ব্যাপারটাও খুবই অনিশ্চিত, লগ্নিবৃদ্ধিজাত মূলধনের লগ্নিকারীদের লাভ কমে যাওয়ায় ও অতি মূলধনের ফলে, লগ্নি থেমে যেতে পারে। কেননা সুদের হার মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতার সমান হয়ে যাবে বলে। লক্ষ্যণীয়, এপ্রসঙ্গে অনেক ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ সহ মার্কসের 'মুনাফার হ্রাসের হার' নিয়মের কথাও মনে হয়। যদিও কেইনস মার্কসের কাছে কৃতজ্ঞতা আদৌ স্বীকার করেন নি। ফলে সমাধান, সরকারী ব্যয়। এর ফলে যদি লগ্নির পরিমাণ বাড়ানো যায়।

টিনবারজেনের গবেষণা প্রবন্ধটিতে বলা বাহুল্য এই লগ্নি, সঙ্কটের স্বরূপ, প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা রয়ে গেছে। একথা ঠিক কেইনসও বিস্তৃতভাবে সে-সব ব্যাপার আলোচনা করেছেন। কিন্তু বহু বিজ্ঞানী তথা অর্থনীতিবিদ তো একই ব্যাপারে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত না থেকেও সমসিদ্ধান্ত নেন। প্রান্তিক আলোচনার ক্ষেত্রে যেমন জেভনস, মেঙ্গার, পারেতো, ভাইজার, ফন থুনেন, দেশ তফাতেও একই প্রায় সিদ্ধান্ত করে গেছেন। তবে টিনবারজেনের প্রবন্ধটিতে আরও লক্ষ্যনীয়, তিনি ভোগ প্রবণতা বিষয়েও আলোচনা করেছেন। প্রসঙ্গত টিনবারজেন-এর সিলেকটেড পেপারের ভূমিকায় সম্পাদকবৃন্দও এ প্রসঙ্গে বলেছেন "In the article "An Economic Policy for 1936" it is not without interest to note that a number of ideas, especially those of the consumption function and its role in the problems of employment policy, anticipated the Keynesian theory." (L. H. Klaseen, L. M. Koyek, H. J. Wittereen)। শ্রীযুক্ত মিত্রকে পুনরায় সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাই।

তরুণ সান্যাল

শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য প্রণীত

সোভিয়েত ঐতিহাসিক মহাকাব্য

একটার পর একটা ঘটনার দৃশ্যপটে অগ্নিগর্ভ কাণ্ডে পৃথিবী আলোড়নকারী রুশিয়ার অকটোবর-বিপ্লবের বীরত্বময় কথা ও কাহিনী 'সোভিয়েত ঐতিহাসিক মহাকাব্য'-এর উপজীব্য। ঘটনার মর্মস্পর্শী মহাকাব্যিক-রূপায়ণ শিল্প-সাহিত্যের ধ্রুপদী-স্বরগ্রামে সাহিত্যজগতে শুধু বিস্ময়ের চমক লাগানো নয়—সেই মহান্ বিপ্লবের কালজয়ী বাণীরূপ বীররসে সৃষ্টি করেছে এ-যুগের সাহিত্য-ইতিহাসে মহাকাব্যকারের সৃষ্টিশীল প্রতিভার স্বাক্ষরবাহী বিস্ময়কর সাহিত্য অবদান। 'অল-ইণ্ডিয়া রেডিও'র পুস্তক-পর্যালোচনা বিভাগে মন্তব্য ঃ

"শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য রচিত 'সোভিয়েত ঐতিহাসিক মহাকাব্য' **মহান্ লেনিনের জন্মশতবার্ষিকী-উপলক্ষে** রচিত। **'সর্গোবন্ধ মহাকাব্য',** সেজন্য কবি পনেরটি সর্গে এই মহাকাব্য রচনা করেছেন। রুশিয়ায় জারতন্ত্রের সমাধি রচনা করে, কেরেনেস্কি ও মেনসেভিকদের পরাজিত করে বলশেভিকতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন লেনিন। পৃথিবীর ইতিহাসে ফরাসী-বিপ্লবের পর এতবড় বিপ্লব আর ঘটেনি। সেই বিপ্লবের আদি-অন্ত-ইতিহাস **এই প্রথম** বাংলা ভাষায় মহাকাব্যের রূপগ্রহণ করল। সেইদিক থেকে কবির এই প্রচেষ্টা সত্যি বিস্ময়কর।"

'যুগান্তর' 'মাসিক বসুমতী' 'রবীন্দ্র-ভারতী পত্রিকা' 'দৈনিক বসুমতী' ইত্যাদি পত্রপত্রিকায় অসামান্য গ্রন্থরূপে আলোচিত ও অভিনন্দিত। **মূল্য ঃ বারো টাকা।**

প্রাপ্তব্য ঃ

মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড

দাশগুপ্ত এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড

গান্ধী-শতাব্দী পুস্তক ভাণ্ডার (রাজভবন)

এবং অন্যান্য বিশিষ্ট পুস্তকবিক্রয়কেন্দ্র

পরিচয়
বর্ষ ৩৯। সংখ্যা ৯
চৈত্র ১৩৭৬

সূচিপত্র

প্রচ্ছদপট : বিশ্বরঞ্জন দে

উপদেশকমণ্ডলী

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য। হিরণকুমার সান্যাল। সুশোভন সরকার
অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র। গোপাল হালদার। বিষ্ণু দে। চিন্মোহন সেহানবীশ।
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। সুভাষ মুখোপাধ্যায়। গোলাম কুদ্দুস

সম্পাদক

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তরুণ সান্যাল

পরিচয় প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

পরিচয়
বর্ষ ৩৯ । সংখ্যা ৯
চৈত্র । ১৩৭৬

অক্টোবরের সেই দিনগুলি

নাদেজদা ক্রুপস্কাইয়া

অক্টোবরে জয়ী হবার মতো শক্তিসমাবেশ ঘটালেন শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি বলশেভিকরা। জুলাই মাসেও এক স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যুত্থান হয়। কিন্তু পার্টি ঠাণ্ডা মাথায় পরিস্থিতি ওজন করে দেখলেন। বুঝলেন, ক্ষমতাদখল করার অভ্যুত্থানের অনুকূলে তখনও পরিস্থিতি অপরিণত। বাস্তব অবস্থা খুঁটিয়ে বিচার করে দেখা গেল: সাধারণভাবে জনগণ তেমন ধারা বিদ্রোহের জন্য তৈরি নয়। ফলে, কেন্দ্রীয় কমিটি ঘটনাবলীর দ্রুত পটপরিবর্তনের রাশ টেনে ধরাই সাব্যস্ত করলেন। রণক্ষেত্রে যারা ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য এক-পা তুলেই আছে, তাদের ঠেকিয়ে রাখা খুবই অসম্ভব ব্যাপার ছিল। তা ছাড়া বলশেভিকরা তাদের ঠেকিয়ে রাখতেও অনিচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু ঐ উদগ্রীব বিপ্লবীদের রাশ টেনে ধরাটাও ছিল দারুণ দায়িত্বের কাজ। বলশেভিকরা জানতেন সময় মতো আঘাত হানাটাই হলো আসলে গুরুত্বপূর্ণ।

এমনি করে ক-মাস গড়িয়ে গেল। পরিস্থিতিরও বদল হলো। লেনিন তখন ফিনল্যাণ্ডে আত্মগোপন করে আছেন। ১২-১৪ সেপ্টেম্বর পার্টির কেন্দ্রীয়, পেট্রগ্রাদ এবং মস্কো কমিটিগুলিকে তিনি ফিনল্যাণ্ড থেকে চিঠি পাঠালেন: "বলশেভিকরা দু-রাজধানীতেই শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে, এবার তারা রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে নিতে পারে এবং

তাদের **নিশ্চিতভাবে** রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে নিতে হবে।" ইলিচ বললেন, এমন মাহেন্দ্রমুহূর্ত বয়ে যেতে দেওয়া চলে না। কেননা পেট্রগ্রাদের সম্ভাব্য আত্মসমর্পণ জয়ের সম্ভাবনাই দুর্বল করে দেবে। বৃটিশ ও জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে আলাদা এক শান্তিচুক্তির তখন আলোচনা চলছে। "জাতিসমূহের কাছে এখন শান্তি প্রস্তাব দেওয়ার অর্থই হলো **বিজয়ী হবার পথ,**" লেনিন লিখলেন।

কেন্দ্রীয় কমিটিকে লেখা একটি চিঠিতে লেনিন বিস্তৃতভাবে ক্ষমতা দখল করার অভ্যুত্থানের উপযুক্ত সময় ও প্রস্তুতির বিষয়ে আলোচনা করেন। "সফল হতে গেলে, চক্রান্ত বা কোনো একটি পার্টির উপরে অভ্যুত্থানকে নির্ভরশীল করা চলবে না, অভ্যুত্থানের সাফল্য নির্ভর করে অগ্রগামী শ্রেণীর উপরে। এটি হলো প্রথম শর্ত। **জনগণের** এক **বিপ্লবী উদ্দীপনের** উপরে অভ্যুত্থান নির্ভর করে থাকে। এ-হলো দ্বিতীয় শর্ত। যখন জনগণের মধ্যে অগ্রগামী বাহিনীর কার্যকলাপ একেবারে তুঙ্গে এবং যখন শত্রুবাহিনীর মধ্যে ও **দুর্বল অর্ধোৎসুক অস্থিরসঙ্কল্প বিপ্লবের বন্ধুদের মধ্যে দোদুল্যমানতাও** চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠেছে—সেই ক্রমবর্ধমান বিপ্লবের ইতিহাসের **বাঁক নেবার** মুহূর্তের উপরে থাকে অভ্যুত্থানের ভিত্তি, এটি হলো তৃতীয় শর্ত।"

ঐ চিঠির শেষদিকে লেনিন বিপ্লবী অভ্যুত্থানের বিষয়ে মার্কসবাদী মত আলোচনা করলেন "বিপ্লবী অভ্যুত্থানকে মার্কসবাদী পন্থায়, অর্থাৎ কোনো শিল্পকর্মের মতো করে দেখতে হলে, আমাদের একটি মুহূর্তও এখন নষ্ট করা চলবে না। একই সময়ে আমাদের এখন দরকার বিপ্লবী বাহিনীগুলির **হেড কোয়ার্টার** সংগঠন, আমাদের সৈন্যবাহিনী বণ্টন, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান-গুলিতে সৈন্যবাহিনীর মধ্যে বিশ্বাসী দলগুলিকে প্রেরণ, আলেকসানদ্রিস্কি থিয়েটার ঘিরে ফেলা, পিতর ও পল দুর্গ দখল, সেনাপতিমণ্ডলী ও সরকারকে গ্রেপ্তার করা এবং অফিসার ক্যাডেটদের ও স্যাভেজ ডিভিসনের বিরুদ্ধে এমন বাহিনী প্রেরণ করা—যারা নগরীর সামরিক গুরুত্বের জায়গাগুলিতে শত্রুসৈন্যদের এগোতে দেবার আগে মৃত্যুবরণ করবে। সশস্ত্র শ্রমিকদের বাহিনীভুক্ত করে শেষ ও মরিয়া যুদ্ধের জন্য ডাক দিতে হবে। টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন এক্সচেঞ্জ অবিলম্বে দখলে আনতে হবে। **আমাদের** বিপ্লবী অভ্যুত্থানের হেড কোয়ার্টার কেন্দ্রীয় টেলিফোন এক্সচেঞ্জে সরিয়ে নিয়ে সব কারখানা, সৈন্যবাহিনী এবং সশস্ত্র লড়াইয়ের কেন্দ্রগুলির সঙ্গে টেলিফোনে তার-সংযোগ সাধন করতে হবে।"

"অবশ্য এসব কথা উদাহরণ দিতেই উল্লেখ করা মাত্র। তবে শুধু এ-কথাটাই বর্তমান মুহূর্তে **ব্যাখ্যা** করতে চাইছি যে, মার্কসবাদের নিকটে অনুগত এবং বিপ্লবের প্রতি অনুগত থাকতে গেলে এখন **বিপ্লবী অভ্যুত্থানকে একটি শিল্পকর্ম হিসাবে না দেখতে শেখা একেবারে অসম্ভব ব্যাপার।**"

ইলিচ ফিনল্যাণ্ডে শঙ্কিত হচ্ছিলেন, পাছে বিপ্লবী অভ্যুত্থানের মাহেন্দ্রলগ্ন বয়ে যায়। সাতই অক্টোবর তিনি পেট্রোগ্রাদ নগর সম্মেলন, কেন্দ্রীয়, মস্কো ও পেট্রোগ্রাদ কমিটি এবং পেট্রোগ্রাদ ও মস্কোর সোভিয়েতগুলির বলশেভিক প্রতিনিধিদের কাছে চিঠি দিলেন। আর, পাছে সময় মতো চিঠি তাঁদের কাছে না পৌঁছয়, সেই আশঙ্কায় ৯ই তারিখে তিনি স্বয়ং পেট্রোগ্রাদে এসে হাজির হলেন। এবং ভাইবোর্গ সাইড অঞ্চলের একটি ফ্ল্যাটে আত্মগোপন করে অভ্যুত্থানের প্রস্তুতির ব্যাপারে নির্দেশ দিতে লাগলেন।

মাসের সেই শেষ দিনগুলি ধরেই তিনি ঐসব প্রস্তুতির কাজে একেবারে ডুবে রইলেন। তাঁর চিন্তার মধ্যে আর তখন অন্য কোনো কিছুই ছিল না। তাঁর উৎসাহ আর বিজয় সম্পর্কে দৃঢ় আস্থা চারপাশের কমরেডদের মধ্যে উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলল।

উত্তরাঞ্চলের সোভিয়েত কংগ্রেসের বলশেভিক প্রতিনিধিদের কাছে ফিনল্যাণ্ড থেকে লেখা তাঁর সর্বশেষ চিঠিটি ছিল অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি লিখলেন...."সশস্ত্র অভ্যুত্থান এক **বিশেষ** আকারের রাজনৈতিক সংগ্রাম, তারও বিশিষ্ট নিয়মকানুন আছে—যেসব বিষয়ে মনোনিবেশ করা প্রয়োজন। কাল মার্কস অতুলনীয় স্বচ্ছতায় সেই সত্যই প্রকাশ করেছেন যখন লিখেছেন '**বিপ্লবী অভ্যুত্থান যুদ্ধের মতোই এক শিল্পকর্ম।**"

"এই শিল্পকর্মের মূল নিয়মগুলি বিষয়ে মার্কস নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নির্দেশ করেছেন ঃ

"(১) বিপ্লবী অভ্যুত্থান **নিয়ে খেলা করো না,** কিন্তু যখন একবার শুরু করবে দৃঢ়ভাবে মনে রেখো **সমস্ত পথটাই** তোমাকে যেতে হবে।

"(২) সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে এবং গুরুত্বপূর্ণ সময়ে **বিপুল উন্নততর শক্তিসমাবেশের** কেন্দ্রীভবন ঘটাতে হবে। তা না করতে পারলে তাদের ভালো প্রস্তুতি ও সংগঠনের সুবিধা-সুযোগ নিয়ে শত্রুবাহিনী বিপ্লবী অভ্যুত্থান-কারীদের ধ্বংস করে দেবে।

"(৩) বিপ্লবী অভ্যুত্থান একবার শুরু হয়ে গেলে, দৃঢ়তম **সঙ্কল্পে** সকল

রকমে, অভ্রান্তভাবে **আক্রমণকারীর** ভূমিকা নিতে হবে, 'আত্মরক্ষামূলকতাই হলো প্রতিটি বিপ্লবী অভ্যুত্থানের মৃত্যু'।

"(৪) শত্রুদের হতচকিত করে তাদের পরাস্ত করার চেষ্টা চালাতে হবে আর যখন শত্রুর শক্তি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ঠিক সেই সময়টাই হলো আক্রমণের মাহেন্দ্রক্ষণ।

"(৫) **দৈনিক**-সাফল্যের জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে, যতটুকুই হোক-না কেন (নগরীর ব্যাপার হলে, ঘণ্টামাফিক সাফল্য) এবং যেকোন মূল্যে **'নৈতিক ভাবে উচ্চতর শক্তিধর** অবস্থা রক্ষা করতে হবে'।

"মার্কস সব বিপ্লবের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের শিক্ষার বিষয়ে বিপ্লবী নীতির শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা দাঁতঁর কথামতো এক কথায় বলেছিলেন *'de l'audace, de l'audace encore de l'audace'* (দুঃসাহস, দুঃসাহস, পুনরায় দুঃসাহস)।

"রুশদেশে এবং ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসে, এসব কথার অর্থ হলো একই সঙ্গে পেট্রগ্রাদে আক্রমণ চালাতে হবে, যতটা সম্ভব আকস্মিক ও দ্রুত। আক্রমণ চালাতে হবে ভেতর ও বাইরে থেকে, শ্রমিকদের বস্তি ও ফিনল্যাণ্ড থেকে, রেভেল ও ক্রনস্টাডট্,—**সমস্ত** নৌ-বাহিনী থেকে, ১৫০০০ বা ২০,০০০ আমাদের 'বুর্জোয়া গার্ড' (ক্যাডেটদের স্কুল), আমাদের 'ভেনদি বাহিনী' (কশাকদের একাংশ)-র চেয়ে **ঢের বেশি বিপুল শক্তির সমাবেশ** ঘটিয়ে এবং ইত্যাদি।

"আমাদের **তিনটি** মূল শক্তি—নৌবহর, শ্রমিকশ্রেণী ও সৈন্যবাহিনীর ইউনিটগুলি—এদের মধ্যে এমনভাবে সমন্বয় ঘটাতে হবে যাতে অভ্রান্তভাবে দখল করা এবং **যে কোনো মূল্যে** দখলে রাখা যায়—(ক) টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, (খ) টেলিগ্রাফ অফিস, (গ) রেলওয়ে স্টেশন, (ঘ) আর সবার উপরে সেতুগুলি।

"**সব চেয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ** ব্যক্তিদের (আমাদের 'চমক বাহিনী' এবং তরুণ শ্রমজীবীরা তো বটেই তাদের সঙ্গে সরেশ নৌ-সেনানীদের) নিয়ে ছোট ছোট জাঠা গড়তে হবে, যাতে সব গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলি দখল করা যায় এবং **প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ আক্রমণে** প্রতিটি অঞ্চলেই **যাতে অংশ গ্রহণ করা যায়,** যেমন উদাহরণ স্বরূপ—

"পেট্রগ্রাদকে ঘিরে ফেলা এবং বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া, নৌ-বাহিনী, শ্রমিকরা এবং সৈন্যবাহিনীর যুক্ত আক্রমণে পেট্রগ্রাদ দখল করা—এ হলো এমন এক কর্তব্য যাতে **নৈপুণ্য** এবং **তিনগুণ দুঃসাহসিকতা প্রয়োজন।**

"সরেশ শ্রমিকদের নিয়ে বাহিনী গড়ে তুলতে হবে, শত্রুর কেন্দ্রগুলিকে (ক্যাডেটদের স্কুল, টেলিগ্রাফ অফিস, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ) আক্রমণ ও ঘিরে ফেলার জন্য। রাইফেল ও বোমা দিয়ে তাদের সশস্ত্র করতে হবে।

"তাদের মন্ত্র হবে '**শত্রুকে পথ ছেড়ে দেবার আগে শেষ ব্যক্তিটির মৃত্যুও কাম্য**"।

"আশা করা যাক, আক্রমণের সিদ্ধান্তই যদি গ্রহণ করা হয়, তা হলে নেতৃবৃন্দ দাঁতঁ ও মার্কসের সিদ্ধান্তগুলি কাজে লাগাবেন।

"রুশদেশের ও বিশ্ববিপ্লবের সাফল্য দুই অথবা তিন দিনের লড়াইয়ের উপরে নির্ভর করছে।

চিঠিটি লেখার তারিখ ২১ অক্টোবর (পুরনো মতে ৮ই)। তার পরের দিনই লেনিন পেট্রগ্রাদে পৌঁছলেন। তার পরের দিনই কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশনে যোগ দিলেন। সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো। জিনোভিয়েভ ও কামেনেভ সমগ্র অভ্যুত্থানের বিরোধিতা করলেন। তাঁরা বললেন, অবিলম্বে কেন্দ্রীয় কমিটির এক বর্ধিত সভা ডাকা হোক। কামেনেভ তো কেন্দ্রীয় কমিটি থেকেই সাড়ম্বরে পদত্যাগ করে বসলেন। লেনিন বললেন, শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে পার্টি এঁদের গুরুতর শাস্তি বিধান করুক।

সুবিধাবাদী ধারাগুলিও পরাস্ত হলো। অভ্যুত্থানের জন্য দ্রুত প্রস্তুতি চলল। ২৬ অক্টোবর (১৩ই) পেট্রগ্রাদ সোভিয়েত-এর এক্সিকিউটিভ কমিটি সামরিক বিপ্লবী কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নিলেন। ২৯ (১৬ই) কেন্দ্রীয় কমিটি পার্টি সংগঠনগুলির সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। ঐ একই দিনে বিপ্লবী সামরিক কেন্দ্র স্থাপিত হলো। সদস্য হলেন কমরেডস স্টালিন, স্ভের্দলভ, দ্ঝারঝিনস্কি, এবং অন্যান্যরা—যাঁরা অভ্যুত্থানে বাস্তব নেতৃত্ব দিতে সক্ষম।

তার পরের দিন পেট্রগ্রাদ সোভিয়েত-এর সকলেই সামরিক বিপ্লবী কমিটি গঠনে সমর্থন জানালেন। এর পাঁচদিন পর রেজিমেণ্টাল কমিটিগুলি একটি সভায় একে পেট্রগ্রাদের সর্বোচ্চ সামরিক সংস্থা বলে মেনে নিলেন। তাঁরা ঠিক করলেন সামরিক হেডকোয়ার্টার-এর নির্দেশ এই কমিটিদ্বারা স্বাক্ষরিত না হলে তা মানা হবে না।

সামরিক বিপ্লবী কমিটি বিভিন্ন সামরিক ইউনিটগুলির জন্য পাঁচই নভেম্বর (২৩ অক্টোবর) কমিসার নিয়োগ শুরু করলেন। তার পরদিনই অস্থায়ী সরকার, কমিটির সদস্যদের আদালতে সোপর্দ করার জন্য হুকুম দিলেন, হুকুম

দিলেন সামরিক কমিসারদের গ্রেপ্তার করার। শীত প্রাসাদে সামরিক বিদ্যালয়ের শিক্ষানবীশ অফিসারদের এনে জমায়েত করা হলো। কিন্তু তখন ঢের দেরি হয়ে গেছে। সৈন্যবাহিনী তখন বলশেভিকদের সমর্থন করছে। শ্রমিকরা চাইছে সোভিয়েতগুলি অবিলম্বে সরকার হাতে নিক। বিপ্লবী সামরিক কমিটি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে তখন কাজ করছেন। বস্তুত কেন্দ্রীয় কমিটির অধিকাংশ সদস্যই এই কমিটির মধ্যে ছিলেন, যেমন, স্টালিন, স্ভের্দলভ, মলতফ, দ্ঝারঝিনস্কি এবং বুবনভ। অভ্যুত্থান প্রস্তুত হচ্ছিল।

৬ই নভেম্বর (২৪ অক্টোবর)। ইলিচ তখনও ভাইবোর্গ সাইডের একটি বাড়িতে গোপনে অবস্থান করছেন। বাড়িটি পার্টি-সদস্যা মার্গারিতা ফোফানোভার (৪২ নং বাসা, ৯২/১ নম্বর বাড়ি, বোলসায়া স্থাম্প্‌সোনিয়েভস্কায়া এবং সারদোবোলস্কায়া রাস্তাছুটির সঙ্গমস্থলে)। অভ্যুত্থানের প্রস্তুতির খবরাখবর তিনি পাচ্ছিলেন। কিন্তু নিজে তো আর কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারছিলেন না। অধৈর্যে তিনি ছটফট করছিলেন। সেদিন মার্গারিতা মারফত আমাকে দিনভর অনেকগুলি চিঠি পাঠালেন উচ্চতর কমিটিকে পৌঁছে দেবার জন্য। বারবার সেই একই কথা। আর দেরি নয়, আর দেরি নয়। সন্ধ্যাবেলায় জনৈক ফিনল্যাণ্ডের কমরেড এ্যইনো রাহজা লেনিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। কলকারখানা ও পার্টি সংগঠনগুলির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। পার্টি সংগঠনগুলির সঙ্গে লেনিনের যোগাযোগ রাখার জন্যই তাঁকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। এ্যইনো জানালেন, রাস্তায় রাস্তায় এখন নতুন নতুন টহলদারী সৈন্য ঘুরছে। খুলে নেওয়া যায়, নেভা নদীর এমন সাঁকোগুলি অস্থায়ী সরকার তুলে নেওয়ার নির্দেশ পাঠিয়েছেন, যাতে নগরী থেকে শ্রমিকাঞ্চল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ব্রিজগুলির প্রহরায় আছে সামরিক বাহিনী। স্পষ্ট বোঝা যায়, বিপ্লবী অভ্যুত্থান শুরু হয়ে গেছে। ইলিচের ইচ্ছা স্টালিন তাঁর সঙ্গে এসে অবিলম্বে সাক্ষাৎ করুন। কিন্তু এ্যইনো বললেন, স্টালিনের পক্ষে এসে পৌঁছনো এখন প্রায় অসম্ভব। অবিলম্বে তো নয়ই। রাস্তায় ট্রাম চলছে না। সম্ভবত স্টালিন তখন স্মোলনিতে সামরিক বিপ্লবী কমিটির অধিবেশনে ব্যস্ত। ইলিচ তৎক্ষণাৎ ঠিক করলেন, এক্ষুনি তাঁকে স্মোলনিতে পৌঁছতে হবে। মার্গারিতার জন্য একটি চিরকুট রেখে গেলেন "যেখানে আমাকে কিছুতেই পাঠাতে চাননি, সেখানেই চললুম। পরে দেখা হবে। ইলিচ।"

সারা রাত ধরে ভাইবোর্গ সাইডের জনগণকে সশস্ত্র করা হলো। দলের

পর দল শ্রমিকরা জেলা কমিটিতে অস্ত্রশস্ত্র ও নির্দেশাবলীর জন্য আসতে লাগল। অনেক রাতে ফনকোভার ফ্ল্যাটে গিয়ে শুনলাম, লেনিন স্মোলেনির দিকে রওনা হয়ে গেছেন। জানতে চাইলাম স্মোলনিতে ভালোভাবে পৌঁছেছেন তো তিনি। আমাদের অঞ্চল থেকে একটি ট্রাক রওনা হচ্ছিল ও-দিকেই। ভাইবোর্গ-এর জেলা সম্পাদক ঝেনিয়া ইয়েগোরোভার সঙ্গে ঐ ট্রাকে উঠলাম। আমার মনে পড়ছে না, ইলিচের সঙ্গে আমার স্মোলনিতে দেখা হলো কিনা। কিংবা ওখানেই তিনি আছেন কিনা তা দেখা বা শোনা। সে যাইহোক, আমাদের মধ্যে কথাবার্তা যে হয়নি সেটা নিশ্চিত। কেন না, তিনি তখন বিপ্লবী অভ্যুত্থানে নির্দেশ দেওয়ার কাজে মগ্ন ছিলেন। তাঁর স্বভাব অনুযায়ী যথারীতি বিস্তৃতভাবে ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে কর্তব্য সম্পাদনে তিনি ডুবে ছিলেন।

স্মোলনিতে তখন আলোর প্লাবন বইছে। মৌচাকে চলেছে যেন কাজের ব্যস্ততা। রেড গার্ড, কলকারখানার প্রতিনিধি ও সৈন্যরা নগরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নির্দেশ নেবার জন্য সেখানে আসছিলেন। অনবরত চলেছে টাইপ-রাইটারের খটখট, টেলিফোনের ক্রিং ক্রিং। আমাদের মেয়েরা টেলিগ্রামের স্তূপের উপরে ঝুঁকে পড়ে কাজ করছে। আর চারতলায় বসেছে সামরিক বিপ্লবী কমিটির নিরবচ্ছিন্ন অধিবেশন। বাইরের স্কোয়ারে সাঁজোয়া গাড়িগুলির ইঞ্জিন চালু রয়েছে। রয়েছে তিন ইঞ্চি হাঁ-মুখের একটি ফিল্ডগান আর যে কোনো সময় ব্যারিকেড তৈরি করার জন্য জ্বালানি কাঠের স্তূপ। দেউরিতে মেসিনগান বসানো। দরজায় দরজায় সান্ত্রী।

বেলা দশটা, ৭ই নভেম্বর (২৫ অক্টোবর)। পেট্রগ্রাদ সোভিয়েত-এর সামরিক বিপ্লবী কমিটি তাঁদের ঘোষণা 'রুশদেশের নাগরিকদের প্রতি' ছাপাখানায় পাঠালেন। ঘোষণায় বলা হয়েছে ঃ

"অস্থায়ী সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছে। রাষ্ট্রশক্তি এখন পেট্রগ্রাদ-এর শ্রমিক ও সৈন্যদের সোভিয়েত-এর ডেপুটিদের মুখপাত্র, পেট্রগ্রাদ-এর প্রোলেতারিয়েত ও সৈন্যবাহিনীর প্রধান বিপ্লবী সামরিক কমিটির হাতে এসেছে।

"যেসব লক্ষ্যগুলির জন্য জনগণ লড়াই করেছে, যথা, অনতিবিলম্বে গণতান্ত্রিক শান্তির উদ্যোগ, ভূ-সম্পত্তির মালিকানার অবলোপ, উৎপাদনে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ এবং সোভিয়েত ক্ষমতার সংস্থাপন—সেই লক্ষ্যস্থল অর্জিত হয়েছে।

"শ্রমিক, সৈনিক এবং কৃষকদের বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক!"

স্পষ্টতই বিপ্লব জয়যুক্ত হয়েছে। কিন্তু সামরিক বিপ্লবী কমিটি ২৫ সকালেও একের পর এক সরকারী সংস্থা দখল ও সেগুলিতে প্রহরী মোতায়েনের কাজে নিরতিশয় ব্যস্ত রইলেন।

বেলা আড়াইটায় পেট্রগ্রাদের শ্রমিক ও সৈন্যদের সোভিয়েত-এর প্রতিনিধিরা একটি সভায় মিলিত হলেন। সভায় আনন্দের ঝড় বয়ে গেল যখন প্রতিনিধিরা শুনলেন অস্থায়ী সরকারের আর কোনো অস্তিত্বই নেই। কয়েকজন মন্ত্রী গ্রেপ্তার হয়েছেন এবং অন্যান্যদের জন্যও তল্লাসি চলেছে। প্রাক্-পার্লামেন্ট (অস্থায়ী সরকারকে উপদেশ দেবার সংস্থা) ভেঙে দেওয়া হয়েছে। রেলওয়ে স্টেশন, পোস্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস এবং স্টেট ব্যাঙ্ক দখলে এসে গিয়েছে। শীতপ্রাসাদে আক্রমণ চলেছে, যদিও এখনও তার পতন ঘটেনি। তবে তার ভাগ্যও আমাদের হাতে। সৈন্যরা অদৃষ্টপূর্ব সাহস দেখাচ্ছেন। সত্যিকারের ক্ষমতা-দখল সম্পূর্ণ রক্তপাতহীনভাবেই সম্পন্ন হয়েছে।

লেনিন হল-এ প্রবেশ করলেন। তুমুল জয়ধ্বনিতে সবাই ফেটে পড়লেন। অধিবেশনে তিনি তাঁর বক্তব্য রাখলেন। বক্তাসুলভ আড়ম্বর বা অলঙ্কার বাহুল্যহীন তাঁর বাচনভঙ্গীতে তিনি বললেন, জয় হয়েছে। তারপর স্বভাবসুলভ রীতিতে চলে এলেন যে-কর্তব্যগুলি অবিলম্বে পালন করতে হবে, সেগুলির কথায়।

তিনি বললেন, রুশদেশের ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূত্রপাত ঘটল। বুর্জোয়াদের বাদ দিয়েই সোভিয়েত সরকার কাজ চালাতে পারবে। একটি ঘোষণায় ভূমির ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটানো হবে। সত্যিকারের শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণে উৎপাদন আনা হবে। এবার সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াই। পুরাতন রাষ্ট্রযন্ত্র চূর্ণ করা হবে। এবং নতুন এক শক্তি, সোভিয়েত সংগঠনসমূহের ক্ষমতা, প্রতিষ্ঠা করা হবে। আমাদের হাতে শক্তি যোগাবার মতো গণসংগঠন আছে। যে কোনো বিরোধিতাকে সে-শক্তি পরাস্ত করতে সক্ষম। এখন অনতিবিলম্বে শান্তি প্রতিষ্ঠাই হলো আশু কর্তব্য। এ-জন্য মূলধনপতিদের পরাস্ত করতে হবে। আন্তর্জাতিক সর্বহারাশ্রেণী ইতিমধ্যেই বিপ্লবী উদ্দীপনা দেখিয়েছেন। তাঁরা আমাদের শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে সহায়তা করবেন।

সোভিয়েত-এর সদস্যরা যেন তাঁর কথাগুলি গিলছিলেন। সত্যিই তো, এক নতুন যুগ ইতিহাসে শুরু হয়ে গিয়েছে। গণসংগঠনগুলি হয়ে উঠেছে অপরাজেয়। জনগণ উঠে দাঁড়িয়েছেন। বুর্জোয়াদের ক্ষমতা ধূলিসাৎ হয়ে

গেছে। এবার আমরা জমিদারের জমি নিয়ে নেবো, কারখানার মালিকদের খর্ব করব, আর সবার চেয়ে বড় কথা, শান্তি আমরা অর্জন করে নেবো। বিশ্ববিপ্লব আমাদেয় সহায়তায় এগিয়ে আসবে। লেনিন তো ঠিক কথাই বলেছেন লেনিনের বক্তৃতা শেষ হলো। বিপুল হর্ষধ্বনি! জয়-জয়কার!

সন্ধ্যা বেলায় সোভিয়েতগুলির দ্বিতীয় কংগ্রেস-এর অধিবেশন বসবার কথা। সোভিয়েত ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা তাঁরাই ঘোষণা করবেন। তাঁরাই অর্জিত বিজয়কে আইনসিদ্ধ করবেন।

প্রতিনিধিরা আসতে শুরু করলেন। তাঁদের সমর্থন পাবার জন্য প্রচার চলল পুরোদমে। শ্রমিকদের শাসনে তো কৃষকদেরও সমর্থন পেতে হবে। সোশালিষ্ট রেভল্যুশনারিদের কৃষকদের মুখপাত্র বলে মনে করা হতো। দক্ষিণ-পন্থী সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিরা ধনী কৃষক কুলাকদের প্রতিনিধিত্ব করতেন। রামপন্থী সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিরা ছোট চাষীদের ভাবাদর্শের প্রতিভূ ছিলেন বটে, কিন্তু বুর্জোয়া আর সর্বহারার মধ্যে পেটি বুর্জোয়াসুলভ তাঁদের দোদুল্যমানতাও ছিল।

সোশালিস্ট-রেভল্যুশনারি দলের পেট্রগ্রাদ কমিটির নেতৃত্বে ছিলেন নাতানশন, স্পিরিদোনোভা ও কামকভ। প্রথম প্রবাসের যুগে ইলিচ নাতানশনকে চিনতেন। সেই ১৯০৪ সালে নাতানশন মার্কসবাদের বেশ কাছাকাছি এসেছিলেন। তাঁর কাছে কেবল মনে হতো, সোশাল ডেমোক্রাটরা চাষীদের ভূমিকাকে বড়োই খাটো করে দেখেন। স্পিরিদোনোভা বেশ জন-প্রিয় ছিলেন। প্রথম বিপ্লবের সময়, ১৯০৬ সালে, মাত্র সতেরো বছর বয়সে তামবভ গুবেরনিয়ায় কৃষক আন্দোলন দমনকারী লুজেনোভস্কিকে তিনি হত্যা করেন। ফলে গ্রেপ্তার হন এবং অমানুষিক অত্যাচারের সম্মুখীন হন। ফেব্রুয়ারি বিপ্লব পর্যন্ত তিনি কঠোর সশ্রম কারাদণ্ডে সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত ছিলেন। পেট্রগ্রাদের বামপন্থী সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিরাও জনগণের বলশেভিক মানসিকতায় প্রভাবিত ছিলেন। অন্যান্যদের চেয়ে বলশেভিকদের প্রতি তাঁদের মনোভাবও বেশ প্রসন্ন ছিল। তাঁরা দেখেছেন, জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্ত করে চাষীর হাতে জমি দেওয়ার ব্যাপারে বলশেভিকরা কি দারুন উৎসাহী। বাম-সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিরা বলতেন জমির মালিকানায় সমানাধিকারের কথা। বলশেভিকরা বলতেন গোটা কৃষিঅর্থনীতিই সমাজতান্ত্রিক পন্থায় পুনর্গঠন করার কথা। ইলিচ মনে করতেন, প্রাথমিক কাজ হলো—অবিলম্বে

জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্তকরণ; তারপর সময়ই দেখিয়ে দেবে কোন পথে পুনর্গঠন চলবে। কি-ভাবে জমির ঘোষণাপত্রটি রচিত হবে, সে-কথাই তিনি তখন ভাবছিলেন।

ফোফানোভার স্মৃতিচিত্রনে একটি চমৎকার অংশ আছে। তিনি লিখছেন ঃ "আমার মনে পড়ছে, লেনিন আমাকে নিখিল রুশ কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতের বুলেটিনগুলি সংগ্রহ করে তাঁকে এনে দিতে বললেন। সেগুলি অবশ্য এনেও দিলাম। কতগুলি সংখ্যা তা আমার মনে নেই। তবে বলতে পারি কাগজপত্তরের এক স্তূপবিশেষ। অর্থাৎ, পড়াশোনা করার এক বিপুল সম্ভার। দুদিন ধরে অনেক রাত পর্যন্ত ভ্লাদিমির ইলিচ ওসব নিয়ে পড়াশোনা করলেন। সকালে বললেন, "বেশ মনে হচ্ছে সব সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিকেই চিনে ফেলেছি। এখন কেবল তাঁদের ক্ষুদে চাষী (মুঝিক) ম্যানডেটটি পড়াই বাকি আছে আজকের জন্যে।" কয়েক ঘণ্টা বাদে তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন। হাতের পত্রিকার খণ্ডটি তিনি খোস মেজাজে হাত দিয়ে চাপড়াচ্ছিলেন। (দেখলাম আগস্ট ১৯-এর বুলেটিন)। "এতক্ষণে বাম-সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিদের সঙ্গে মতৈক্য হলো। ২৪২ জন ডেপুটি যে-ম্যানডেটে সই করেছেন সে-ম্যানডেট তো আর তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবার ব্যাপার নয়। এবার আমরা এর উপরে ভিত্তি করেই ভূমি-আইন রচনা করব। দেখি কি-ভাবে বামপন্থী সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিরা আমাদের সঙ্গে না এসে পারেন।" তিনি আমাকে পত্রিকাখণ্ডটি দেখালেন। কোনো কোনো অংশে নীল পেন্সিলের দাগা বোলানো। বললেন, "এখন আমাদের দিকেও কিছু দরজা খোলা রাখতে হবে যাতে আমাদের পথেই তাঁদের সামাজিকীকরণ নতুন ছাঁচে গড়ে তোলা যায়"।

মার্গারিতা পেশায় ছিলেন কৃষি বিশেষজ্ঞ। তাঁর পেশার জন্যই তাঁকে এমন সব প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হতো। ইলিচ সব সময়েই মার্গারিতার সঙ্গে এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে আগ্রহ দেখাতেন।

এখন প্রশ্ন, বাম-সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিরা কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে যাবেন কি যাবেন না?

দ্বিতীয় নিখিল রুশ সোভিয়েত কংগ্রেস-এর অধিবেশন বসল পঁচিশে তারিখের রাত দশটা পঁয়তাল্লিশে। কংগ্রেস-এর গঠন, সভাপতিমণ্ডলীর নির্বাচন এবং তার ক্ষমতার সংজ্ঞা নির্ধারণ—এ-সবই ছিল সে-রাতের আলোচ্যসূচি। ৬৭০ জন প্রতিনিধির মধ্যে মাত্র ৩০০ জন ছিলেন বলশেভিক।

তারপরই হলো সবচেয়ে বড় গোষ্ঠী ১৯৩ জন প্রতিনিধি নিয়ে সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিরা। মেনশেভিক প্রতিনিধি ছিলেন ৬৮ জন। দক্ষিণপন্থী সোশালিস্ট রেভল্যুশনারি, মেনশেভিক ও বুন্দপন্থীরা সীমার বাইরে চলে গেলেন। 'সোভিয়েতে প্রতিনিধিত্ব করে যে রাজনৈতিক দল ও গ্রুপ' তাদের তুচ্ছ করে বলশেভিকদের সামরিক চক্রান্ত ও ক্ষমতা দখলের প্রতিবাদে বলশেভিকদের উপরে গালিগালাজ বর্ষণ করে একটি বিবৃতি পাঠের পর তাঁরা সভাস্থল পরিত্যাগ করে চলে গেলেন। আন্তর্জাতিকতাবাদী মেনশেভিকদের মধ্যেও কেউ কেউ সভাস্থল ত্যাগ করলেন। বামপন্থী সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিরা সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিদের ১৯৩ জন প্রতিনিধির মধ্যে ১৬৯ জনের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় ছিলেন। সবশুদ্ধ প্রায় পঞ্চাশ জন প্রতিনিধি কংগ্রেস ত্যাগ করে গেলেন। ২৫ তারিখের অধিবেশনে লেনিন যোগ দেননি।

কংগ্রেসের যখন অধিবেশন শুরু হলো, তখন শীতপ্রাসাদের উপরে আক্রমণ চলছে। কেরেনস্কি নাবিকের ছদ্মবেশে আগের দিনই একটি মোটর গাড়িতে প্‌শ্‌কোভ-এ পালিয়েছেন। যদিও তাঁকে গ্রেপ্তার করার জন্য ডাইবেঙ্কো ও ক্রাইলেঙ্কোর নির্দেশ প্‌শ্‌কোভ সামরিক বিপ্লবী কমিটির কাছে ছিল, কিন্তু তাঁরা কেরেনস্কিকে গ্রেপ্তার করলেন না। কেরেনস্কি ছুটলেন মস্কোতে সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলতে। লক্ষ্য, পেট্রগ্রাদে যে-শ্রমিকরা ক্ষমতা দখল করেছে—তাদের আক্রমণ করা। বাকি মন্ত্রীরা কিশকিনের নেতৃত্বে শীতপ্রাসাদে আশ্রয় নিলেন। সমরশিক্ষার্থী ক্যাডেট ও নারী সৈন্যদের 'চমকবাহিনী' শীতপ্রাসাদ রক্ষা করছিল। মেনশেভিক, দক্ষিণপন্থী সোশালিস্ট রেভল্যুশনারি ও বুন্দপন্থীরা পাগলের মতো কংগ্রেসে শীতপ্রাসাদ অবরোধের বিরোধিতা করলেন। আরলিশ্‌ তো ঘোষণাই করলেন যে গোলাবর্ষণ বন্ধ না-হলে নগরীর পৌর প্রতিনিধিদের কয়েকজন প্রাসাদ স্কোয়ারে নিরস্ত্রভাবে যাবেন এবং মৃত্যুর ঝুঁকি নেবেন। কৃষক ডেপুটিদের সোভিয়েতের মেনশেভিক ও সোশালিস্ট রেভল্যুশনারি গ্রুপের কার্যকরী কমিটি পৌর প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগ দেওয়া সাব্যস্ত করলেন। মেনশেভিক ও সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিরা সভাস্থল ত্যাগ করে চলে যাওয়ার পর সকাল ৩-১০ পর্যন্ত সভা স্থগিত রাখা হলো। ঘোষণা করা হলো শীতপ্রাসাদ দখল করা হয়েছে, মন্ত্রীরা গ্রেপ্তার হয়েছেন এবং উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারী ও ক্যাডেটদের নিরস্ত্র করা হয়েছে।

কেরেনস্কি যে-তৃতীয় সাইকেল বাহিনী পেট্রগ্রাদের বিরুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন, তারা বিপ্লবী জনগণের সঙ্গেই যোগ দিয়েছে।

যখন বোঝা গেল বিজয় সুনিশ্চিতভাবে অর্জিত হয়েছে, নিঃসংশয় হওয়া গেল বামপন্থী সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিরা কংগ্রেস বয়কট করছেন না, তখন স্মোলনি ত্যাগ করে লেনিন বাকি রাতটুকু কাছাকাছি পেশকিবাসী বঞ্চ ব্রুয়েভিচদের বাড়ি বিশ্রাম নিতে গেলেন। আগের রাত্রিও তিনি প্রায় একবারও চোখের পাতা এক করেননি। নির্দেশ দিচ্ছিলেন অভ্যুত্থানের। তাঁকে ঘুমোবার জন্য একটি আলাদা ঘর ছেড়ে দেওয়া হলো। কিন্তু সে-রাতও তিনি ঘুমোতে পারলেন না। কাউকে না জাগিয়ে তিনি শয্যা ত্যাগ করে জমির জন্য ঘোষণাপত্র রচনায় বসলেন। ঐ ঘোষণাপত্রটির ব্যাপারে তিনি নানা দিক থেকেই খতিয়ে দেখে তখন সঠিক চিন্তায় এসে পৌঁছেছেন।

২৬ অক্টোবর (৮ই নভেম্বর) তিনি ভূমিসংক্রান্ত প্রশ্ন নিয়ে কংগ্রেসে বক্তব্য রাখলেন। তিনি বললেন, "এখানে কেউ কেউ বলছেন ভূমি-বিষয়ক ঘোষণাপত্র এবং ম্যানডেট সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিরা রচনা করেছেন। তাতে কি হয়েছে? কারা রচনা করেছেন, তাতে এসে যায় কি? গণতান্ত্রিক সরকার রূপে, আমরা যে-সিদ্ধান্ত সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করি, জনগণের সে-সিদ্ধান্তও আমরা তুচ্ছ করতে পারি না। অভিজ্ঞতার অগ্নিপরীক্ষায়, প্রয়োগের ক্ষেত্রে ঘোষণাপত্রটি কাজে লাগিয়ে, স্থানীয়ভাবে এটিকে কার্যকরী করে চাষীরা নিজেরাই বুঝবেন সত্য কোথায় রয়েছে....। অভিজ্ঞতাই হলো সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক, আর অভিজ্ঞতাই বুঝিয়ে দেবে কে ঠিক, আর কেই বা বেঠিক। নতুন রাষ্ট্ররূপের গঠনসংক্রান্ত বিশ্লেষণের ব্যাপারে অভিজ্ঞতাই আমাদের বিপ্লবের সাধারণ প্রবাহে মিলিয়ে দেবে।....আমাদের বিপ্লবের আট মাসে চাষীরা কিছু শিক্ষা লাভ করেছেন, ভূমির তাবৎ সমস্যা তাঁরা নিজেরাই সমাধান করে নিতে চান। সে জন্য এই খসড়া আইনের উপরে যে কোনো সংশোধনীরই আমরা বিরোধী। আমরা এর বিস্তারিত বিবরণ চাই না, আমরা কেবল একটি ডিক্রি রচনা করছি, কাজের জন্য কর্মসূচি রচনা করছি না।"

এইতো পুরোপুরি লেনিন! তুচ্ছ অহঙ্কারের ছিটেফোঁটাও কোথাও নেই। আসল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আদর্শটুকু। কে তা আনলেন, সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। সাধারণ মানুষের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা, বিপ্লবের সঙ্গেই সাপেক্ষ

সৃজনশীল শক্তি সম্পর্কে ধারণা, জনগণ সব কিছুর ঊর্ধ্বে প্রয়োগের ও ঘটনার তাৎপর্যেই আলোড়িত হয় সেই গভীর বোধ, এবং নিশ্চিতভাবে সেই ঘটনাবলী, জীবন নিজেই, তাদের বুঝিয়ে দেবে যে বলশেভিকদের মতবাদই সঠিক। জমির যে-ঘোষণাপত্র লেনিন প্রস্তাবনা করলেন তা গৃহীত হলো। তারপর ষোলো বছর কেটে গেছে (এ-স্মৃতি চিত্রণের রচনাকাল ১৯৩৩, সঃ পঃ) জমিদারি লোপের পর, পুরাতন ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিষয়ক মনোভাব ও অভ্যাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে নতুন ধরণের ব্যবস্থা ধাপে ধাপে গড়ে উঠেছে। বর্তমানে চাষী গেরস্থির অধিকাংশটাই যৌথখামার ভিত্তিক। পুরনো ছোটমাত্রার চাষ আবাদ এবং পুরনো ছোট মালিক সুলভ মনোবৃত্তি অতীতের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির জন্য এক শক্ত ও কঠিন মৌলভূমির পত্তন ঘটেছে।

২৬ তারিখের সন্ধ্যাবেলার অধিবেশনে শান্তি ও জমির ডিক্রিগুলি গ্রহণ করা হলো। এ দুটি ক্ষেত্রে সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিরা একমত হলেন। কিন্তু সরকার গঠনের ব্যাপারটা তেমন সহজ সরল হলো না। যদিও বামপন্থী সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিরা সভা ছেড়ে চলে যাননি—কেননা তাঁরা বুঝেছিলেন এ-কাজ করলে সাধারণভাবে চাষীদের কাছে একেবারে সম্পূর্ণভাবে প্রভাব হারিয়ে ফেলবেন—দক্ষিণপন্থী সোশাল রেভল্যুশনারি ও মেনশেভিকদের আগের দিন বলশেভিক অতিবিপ্লবীয়ানা, ক্ষমতা দখল প্রভৃতি নিয়ে হুল্লোর করে সভাস্থল ছেড়ে যাওয়ায় তাঁরা খুবই চিন্তিত ছিলেন। দক্ষিণপন্থী সোশালিস্ট রেভল্যুশনারি ও অন্যান্যরা সভাস্থল ছেড়ে চলে যাওয়ার পর বাম-সোশালিস্ট রেভল্যুশনারি দলের জনৈক নেতা কামকভ বললেন, তাঁরা সংযুক্ত গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার পক্ষে। এমন একটি সরকার গঠন করার ব্যাপারে তাঁরা বলশেভিক ও যাঁরা কংগ্রেস পরিত্যাগ করে চলে গেছেন তাঁদের মধ্যে আলাপআলোচনার ব্যবস্থা করার জন্য উদ্যোগী হতে রাজি আছেন। বলশেভিকরা এমন সমঝোতায় রাজি ছিলেন। কিন্তু ইলিচ বুঝেছিলেন এসব আলোচনায় কোনো ফলই হবে না। সোভিয়েত শকটে এমন অকেজো বাহনযুথ জুতে দেবার জন্য তো আর বিপ্লব কার্যকরী করা বা জয় অর্জন করা হয়নি যে এমন সরকার গদিতে বসল যারা কিছুতেই একমত হবে না, ফলে যাত্রাই শুরু হবে না। কিন্তু বাম-সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিদের সহযোগিতা পাওয়া সম্ভবপর—ইলিচ এসব কথা ভাবতেন। ২৬ অক্টোবরের কংগ্রেস অধিবেশনের ক-ঘণ্টা আগে বলশেভিকরা বামপন্থী

সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিদের সঙ্গে আলোচনা বৈঠকে মিলিত হলেন। আমার স্মৃতিতে সেই বৈঠকের ঘটনাপুঞ্জ মুদ্রিত হয়ে আছে। একটি লাল টকটকে নরম সোফামণ্ডিত স্মোলনির একটি কক্ষ। ওরকম একটি সোফায় স্পিরিদোনোভা বসে আছেন। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে লেনিন নিচু গলায় সনির্বন্ধভাবে কথা বলছেন। ঐকমতে আসা গেল না। বামপন্থী সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিরা সরকারে আসবেন না। লেনিন প্রস্তাব করলেন, তাহলে কেবল বলশেভিকদের মধ্য থেকেই প্রথম সমাজতন্ত্রী মন্ত্রী নেওয়া হোক।

২৬ তারিখে রাত্রি নটায় অধিবেশন বসল। আমি ঐ অধিবেশনে উপস্থিত ছিলাম। মনে পড়ছে, কেমন সাদামাঠাভাবে লেনিন জমির ঘোষণাপত্রটির উপরে রিপোর্ট পেশ করলেন।

প্রতিনিধিরা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে তাঁর বক্তব্য শুনছিলেন। যখন ঐ ঘোষণা পত্রটি পড়া হচ্ছিল আমার কাছে বসা মধ্যবয়সী চাষী চেহারার জনৈক প্রতি-নিধির মুখের ভাব দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। তাঁর সারা মুখ যেন ভেতরের কোনো আগুনের আঁচে জ্বল জ্বল করছিল।

যুদ্ধক্ষেত্রে অবাধ্যতার জন্য কেরেনস্কি যে মৃত্যুদণ্ড প্রবর্তন করেছিলেন, তা বাতিল করা হলো। শান্তি, জমি ও শ্রমিকদের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের ঘোষণাপত্রগুলি গৃহীত হলো। কেবলমাত্র বলশেভিকদের নিয়ে গঠিত মন্ত্রীমণ্ডলীর নামও ঘোষণা করা হলো। ভ্লাদিমির উলিয়ানভ (লেনিন) হলেন মন্ত্রীমণ্ডলীর সভাপতি। তা ছাড়া অন্যান্য দপ্তরগুলি নিম্নলিখিত ভাবে বণ্টন করা হলো: এ. আই. রাইকভ—স্বরাষ্ট্র ; ভি. পি. মিল্যুতিন—কৃষি ; এ. জি. স্ল্যাপনিকভ—শ্রম ; ভি. এ. ওভসেয়েঙ্কো (অ্যানতোনোভ), এন. ভি. ক্রাইলেঙ্কো ও পি. আই. ডাইবেঙ্কোকে নিয়ে একটি কমিটির অধীনে— স্থল ও নৌবাহিনী ; ভি. পি. নোগিন—শিল্প ও বাণিজ্য ; এ. ভি. লুনাচারস্কি—জনশিক্ষা, আই. আই. স্কভোরৎসোভ (স্তেফানভ)—অর্থ ; এল. ডি. ব্রনস্টাইন (ত্রৎস্কি)—বৈদেশিক বিষয় ; জি. আই. ওপ্পোকভ (লোমোভ)—বিচার ; আই. এ. টিওডোরভিচ—খাদ্য ; এন. পি. আভিলভ (গ্লেবভ)—ডাক ও তার বিভাগ ; এবং জে. ভি. দজুগাশভিলি (স্টালিন)—জাতীয়তা বিষয়ক মন্ত্রকের সভাপতি। রেলওয়ে মন্ত্রকের পদটি খালি রইল।

কমরেড এ্যইনে রাহজা সেদিনের কথা আমাকে বলেছেন। সেদিন তিনি

এক কোণে বসে বলশেভিক প্রতিনিধিদের সম্ভাব্য মন্ত্রীদের নাম নিয়ে আলোচনা শুনছিলেন। প্রস্তাবিত নামা জনৈক কমরেড পিপলস কমিশার (মন্ত্রী)-এর পদপ্রার্থী হতে নারাজ হয়ে বললেন, ও-ধরনের কাজে তাঁর কোনো অভিজ্ঞতাই নেই। লেনিন হেসে ফেললেন। "আমাদের মধ্যে ওরকম অভিজ্ঞতা কার আছে বলে আপনার ধারণা ?"—তিনি জিজ্ঞাসা করলেন। এ-কথা ঠিক এ-ধরনের কাজে কারও কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। কিন্তু লেনিন ইতিমধ্যেই বুঝেছিলেন জনগণের কমিশার এক নতুন ধরনের মন্ত্রী। জনগণের সঙ্গে নিবিড় সংযোগের মধ্য দিয়ে তিনি হবেন তাঁর বিশেষ সরকারী বিভাগের সংগঠনকারী ও নেতা।

অনুবাদ : তরুণ সান্যাল

ভারতের পূর্বাঞ্চলের উপজাতি সমস্যার বিশিষ্টতা

সুনীল সেনগুপ্ত

উপজাতি বা আদিবাসী সমস্যা আজ বহু মহলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ভারতের রাজনৈতিক মঞ্চে অস্থিরতা যতই বেড়ে উঠছে, ততই ভারতীয় সমাজের প্রান্তীয় এই অংশটির গতিবিধি সম্পর্কেও জল্পনা-কল্পনা ও উদ্বেগ বাড়ছে।

নকশালবাড়ি আন্দোলন রাজধানীর ড্রইংরুম রাজনীতির বাইরে যতখানি বাস্তবে প্রসারিত, তা প্রধানত উপজাতি অঞ্চলের কয়েকটি পকেটকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে।

উপজাতি সমস্যা নিয়ে সরকারী তরফেও খানিকটা নাড়াচাড়া পড়েছে। সমাজবিজ্ঞানের গবেষণায় নিয়োজিত কেন্দ্রগুলিতেও এই সমস্যা খানিকটা গুরুত্ব পেতে শুরু করেছে। এবার অন্ধ্রের ওয়াল্টেয়ারে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় কৃষি-অর্থনীতি সম্মেলনে আগামী বৎসরের যে-আলোচ্য বিষয় নির্ধারিত হয়েছে, তার একটি হলো 'উপজাতির মধ্যে কৃষিবিকাশের সমস্যা'।

সম্প্রতি 'উপজাতি' সমস্যা নিয়ে আসামের জোরহাটে দেশের কৃষি-অর্থনীতি গবেষণাকেন্দ্রগুলির একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হলো। বোধহয় উল্লেখযোগ্য যে, এই সেমিনারে আসাম সরকারের প্রতিনিধিরা অংশ গ্রহণ করেছেন তাই নয়, ফোর্ড ফাউণ্ডেশন, রকফেলার ফাউণ্ডেশন এবং মিসোরি বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কিন বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধিরাও সেমিনারের আলোচনায় রীতিমতো উৎসাহী অংশ গ্রহণ করেছেন।

উপজাতি সমস্যার বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার নানা পদ্ধতি বিষয়ক প্রশ্ন ছাড়াও এমন কতকগুলি বিষয় নিয়ে সেমিনারে আলোচনা হয় যা হয়তো 'পরিচয়'-এর পাঠকদের কৌতূহল উদ্দীপ্ত করতে পারে। তার একটি হলো 'ভারতে পূর্বাঞ্চলের উপজাতি সমস্যার বিশিষ্টতা'। এই বিশিষ্টতা প্রমাণ স্বভাবতই দেশের অপরাপর উপজাতির সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনার উপর নির্ভরশীল।

বর্তমান প্রবন্ধের আলোচনা এই বিষয়েই সীমাবদ্ধ থাকছে। বর্তমান আলোচনায় সমস্যার রাজনৈতিক তাৎপর্য সম্পর্কে যে-উল্লেখ রয়েছে, সেমিনারের আলোচনায় বলাবাহুল্য তা উত্থাপিত হয়নি।

ভারতে তপশীলভুক্ত উপজাতি-জনসংখ্যা ১৯৬১র আদমসুমারী অনুসারে ছিল ২,৮৯,৭৯,২৪৯ বা তিন কোটির মতন। সমগ্র জনসংখ্যার হিসাবে এর অনুপাত শতকরা ৮·৭ ভাগ। বা প্রায় এগারো ভাগের এক ভাগ।

সারা দেশের মানচিত্রে যদি উপজাতি-জনসংখ্যার বসতির ধরনটা লক্ষ্য করা যায় তবে দেখা যাবে উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও বিহারের একটা অঞ্চল জুড়ে আদিবাসীদের একটা ঘনবসতি অঞ্চল রয়েছে (সমগ্র রাজ্য-জনসংখ্যার শতকরা ২৪ ভাগ উড়িষ্যায়, ২১ ভাগ মধ্যপ্রদেশে ও ৯ ভাগ বিহারে আদিবাসী জনসংখ্যা)। দ্বিতীয় আরেকটি ঘনবসতি অঞ্চল গুজরাট ও রাজস্থানের সংলগ্ন একটি ক্ষেত্র জুড়ে (রাজ্য জনসংখ্যার শতকরা ১৩ ভাগই গুজরাটে, ১১ ভাগ রাজস্থানে)। তৃতীয় ঘনবসতি ভারতের পূর্বপ্রান্তীয় অঞ্চল জুড়ে (আসামে শতকরা ১৭, নেফায় শতকরা ৮৯, নাগাল্যাণ্ডে শতকরা ৯৩, মণিপুরে শতকরা ৩২, ত্রিপুরায় শতকরা ৩২)।

আদিবাসী বা উপজাতি অনধ্যুষিত বা প্রায়-অনধ্যুষিত অঞ্চলের মধ্যে পড়ে প্রকৃতপক্ষে সমগ্র দক্ষিণাঞ্চল (তামিলনাড়ুতে শতকরা ১, কেরালায় শতকরা ১, মহীশূরে শতকরা ১)। অন্ধ্রের যে-অংশ উড়িষ্যার সংলগ্ন, সেখানে একটি উপজাতি বসতি রয়েছে এবং তাতে অন্ধ্রের উপজাতি-জনসংখ্যার অনুপাত শতকরা ৪এ উঠেছে। অপরদিকে মহারাষ্ট্রের যে-অঞ্চল গুজরাটের ও মধ্যপ্রদেশের সংলগ্ন, সেখানেও একটি উপজাতি ঘনবসতি থাকায় মহারাষ্ট্রের উপজাতি-জনসংখ্যার অনুপাত শতকরা ৬। পশ্চিমবাঙলার যে-অংশ উড়িষ্যা অথবা বিহারের সংলগ্ন (বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বীরভূম), সেখানে এবং যে-অংশ সিকিম-ভূটানের সংলগ্ন—সে-অঞ্চলে উপজাতি-জনসংখ্যার এলাকা রয়েছে এবং এই রাজ্যে উপজাতি-জনসংখ্যার অনুপাত শতকরা ৬, পাঞ্জাবে উপজাতি-জনসংখ্যা শতকরা ১-এরও কম। অপরদিকে পশ্চিম-হিমালয়-অঞ্চল হিমাচল প্রদেশে উপজাতি-জনসংখ্যার অনুপাত শতকরা ৮।

ভারতের উপজাতি-জনসংখ্যার অতএব তিনটি মূল বসতি পাওয়া যাচ্ছে। প্রথমটি পূর্বপ্রান্তীয় অঞ্চল (আসাম, নাগাল্যাণ্ড, নেফা, ত্রিপুরা, মণিপুর)।

দ্বিতীয়টি পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, অন্ধ্র, মধ্যপ্রদেশ-এর পরস্পর সংলগ্ন বিস্তীর্ণ অঞ্চল। তৃতীয়টি রাজস্থান, গুজরাট, মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশের পরস্পর সংলগ্ন অঞ্চল। আরও দুটি অপেক্ষাকৃত ছোট বসতি রয়েছে। একটি দক্ষিণ-উড়িষ্যা ও অন্ধ্রের সংলগ্ন অঞ্চল এবং উত্তর-প্রদেশ, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চল, হিমালয়ের পাদদেশের অঞ্চল।

জনসংখ্যার দিক থেকে পূর্বপ্রান্তীয় অঞ্চলের উপজাতি সংখ্যাই তিনটি মূল অঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে কম—৩২ লক্ষের মতন বা সমগ্র উপজাতির শতকরা ১২ ভাগের মতন। দ্বিতীয় অঞ্চলটিই উপজাতি-জনসংখ্যার প্রধান বসতি—১৮৮ লক্ষের মতন, শতকরা প্রায় ৫৫ ভাগ আদিবাসী এই অঞ্চলে। তৃতীয় অঞ্চলে আছে ৬০ থেকে ৭০ লক্ষের মতন উপজাতি-জনসংখ্যা।

আসামের মূল পার্বত্য উপজাতিগুলির মধ্যে লুসেই, গারো, খাসি, মিকির অন্যতম। তাছাড়া নাগাল্যাণ্ডের নাগা উপজাতি, নেফা অঞ্চলের দাফ্‌লা, আবর, তাগিন, মিসমি, মিরি প্রভৃতি; মণিপুরের থাডো, তানখুল, কাবুই; ত্রিপুরার ত্রিপুরী বা টিপরাই—পূর্বপ্রান্তীয় অঞ্চলের এই উপজাতিগুলি রয়েছে। মধ্য-ভারতীয় অঞ্চলে আছে সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওরাঁও, গোন্দ, খারিয়া, কোন্ধ, খারওয়ার, কোল, ভিল প্রভৃতি উপজাতি। পশ্চিম-অঞ্চলের প্রধান উপজাতি ভিল, মিনা প্রভৃতি।

আসাম, নাগাল্যাণ্ড, নেফা, মণিপুর এবং ত্রিপুরার যে-পার্বত্য উপজাতিগুলির উল্লেখ করা হলো—তার থেকে মধ্যভারত বা পশ্চিম-ভারতীয় উপজাতির কতকগুলি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে—যে-পার্থক্য রাজনৈতিক প্রক্রিয়াতেও প্রতিফলিত হচ্ছে। যদিও ভারতের উপজাতিগুলির বসতির মধ্যে এই মূল সাদৃশ্য পাওয়া যাবে যে, প্রধানত পাহাড়, জঙ্গল ও অপেক্ষাকৃত দুর্গম এবং কৃষিগতভাবে কৃপণ অঞ্চলে এই উপজাতিদের প্রধান বাস (যার জন্য 'হরিজন' শব্দের অনুকরণে 'গিরিজন' শব্দই উপজাতিদের ক্ষেত্রে সম্প্রতি ব্যবহৃত হচ্ছে)। তবু আসামের উপজাতিগুলি মধ্যভারত বা পশ্চিম-ভারতের তুলনায় অনেক বেশি পাহাড় ও দুর্গম অঞ্চলে অধ্যুষিত। ভারতের ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে এই অঞ্চলগুলি অনেক বেশি ভারতের কেন্দ্রীয় সভ্যতা থেকে পৃথক থেকেছে এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভারতশাসন পর্বেও এই উপজাতিগুলি উনবিংশ শতাব্দীতে মাত্র বৃটিশ আধিপত্যে এসেছে। এই কারণে এই উপজাতিগুলি এবং তাদের বিভিন্ন গোষ্ঠী-

গুলি নিজেদের আদিম রাজনৈতিক সংস্থা সমূহের স্বাতন্ত্র্য দীর্ঘকাল বজায় রাখতে পেরেছেন।

দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক জীবনেও দেখা যায় প্রধানত বিরল বসতির ফলেই এই উপজাতিগুলির মধ্যে আজও পর্যন্ত ভূমিবণ্টনের কৌম ব্যবস্থা প্রায় অব্যাহত রয়েছে। জমির ব্যক্তিগত মালিকানা খুব সামান্যই এই উপজাতিগুলির মধ্যে আছে। অপরদিকে চাষ-ব্যবস্থার আদিম রূপ এখনও এই উপজাতিগুলির মধ্যে বিপুল পরিমাণে বর্তমান। চাষের এই আদিম রূপ হলো ঝুম্ চাষ বা জঙ্গম চাষ (Shifting cultivation)—বিস্তীর্ণ পাহাড়ী অঞ্চলে আগুন ধরিয়ে জঙ্গল সাফ করে প্রায় হাতে চাষ করার নাম ঝুম্ চাষ। এক জায়গায় এক বছর চাষের পর আবার নতুন জায়গায় জঙ্গল সাফাই হবে এবং অন্তত পাঁচ বছরের আগে পুরনো জায়গা চাষের যোগ্য উর্বরতা ফিরে পাবে না।

আসামের পার্বত্য উপজাতিগুলির চাষ সম্পর্কিত এক সাম্প্রতিক হিসেবে দেখা যায় যে, পার্বত্য উপজাতিগুলির শতকরা ৫৮ ভাগ এখনও ঝুম্ চাষের উপর নির্ভরশীল।

১৯৬১র আদমসুমারীর হিসাবে দেখা যায়, জীবিকা হিসাবে আসামের উপজাতিগুলির (পার্বত্য ও সমতল সহ) শতকরা ৮৪ ভাগ কৃষি ও শতকরা ৪ ভাগ খেতমজুরির উপর নির্ভরশীল।

নাগাল্যাণ্ডে শতকরা ৯৫ ভাগ কৃষি ও ১ ভাগ খেতমজুরির উপর, মণিপুরে শতকরা ৯২ ভাগ কৃষি ও ১ ভাগ খেতমজুরি এবং ত্রিপুরার শতকরা ৮৬ ভাগ কৃষি ও ৪ ভাগ খেতমজুরির উপর নির্ভরশীল।

এর সঙ্গে যদি পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যার উপজাতিগুলির জীবিকা তুলনা করা যায় তবে দেখা যাবে—কৃষি ও খেতমজুরির অনুপাতটা এই রকম ঃ

	কৃষি	খেতমজুরি	মোটকৃষি
বিহার	৭৮	১০	৮৮
উড়িষ্যা	৬২	২২	৮৪
মধ্যপ্রদেশ	৭২	২০	৯২
পশ্চিমবঙ্গ	৪৯	২৮	৭৭

গুজরাটে এই অনুপাত হলো শতকরা ৫৯ ও ৩১ ; মহারাষ্ট্রে ৫২ ও ৩৮ এবং রাজস্থানে ৮৭ ও ৪।

জীবিকার অনুপাতের এই তুলনামূলক আলোচনায় এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—একমাত্র রাজস্থান (যার বিস্তীর্ণ অঞ্চল উষর) বাদ দিলে সমগ্র মধ্য ও পশ্চিম ভারতের উপজাতিগুলি স্থায়ী চাষ-ব্যবস্থায় এর বিরাট খেতমজুর বাহিনীতে পরিণত হয়েছে এবং কৃষি হিসেবে যে-জীবিকা দেখানো হয়েছে—তারও একটু বিশদ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, কৃষিতে নির্ভরশীল এই জনসংখ্যার এক বড় অংশই ভাগচাষী। পশ্চিমবঙ্গে কৃষি ও খেতমজুরের আওতার বাইরে যে-অংশটা রয়েছে, তার মধ্যে শতকরা ৮ ভাগ খনি, বাগিচা, পাথরকাটা প্রভৃতি জীবিকায় রয়েছে।

মধ্যভারত ও পশ্চিম-ভারতের অ-কৃষি জীবিকার মধ্যে এ-ধরনের বা অনির্দিষ্ট মজুরের সংখ্যা তাৎপর্যপূর্ণ।

অপরদিকে আসাম, নাগাল্যাণ্ড, ত্রিপুরা, মণিপুর অঞ্চলের উপজাতিরা এখনও তাদের উপজাতি স্তরের অর্থনীতির মধ্যে অনেকাংশে রয়ে গেছে যেখানে খেতমজুর বা ভাগচাষের আদৌ অস্তিত্ব নেই। সেখানে কৃষির এক বিপুল অংশ অস্থায়ী ধরনের এবং সেখানে জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার সামান্যই উদ্ভব ঘটেছে, অ-কৃষি জীবিকার অংশও সামান্য।

মধ্য ও পশ্চিম ভারতে যারা ছিল আদিবাসী, তারা অপেক্ষাকৃত উন্নত কৃষিব্যবস্থার ও সভ্যতার চাপে ধীরে ধীরে জমিচ্যুত হয়েছে এবং নিজেদের আদিম অর্থনীতি থেকে ধীরে ধীরে বিচ্যুত হয়ে অপেক্ষাকৃত উন্নততর কৃষি তথা অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে হীন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। এর পাশাপাশি আসাম ও পূর্বাঞ্চলের পার্বত্য উপজাতিগুলির অবস্থা গুণগতভাবে স্বতন্ত্র। উল্লেখযোগ্য, আদিবাসী শব্দটি পূর্বাঞ্চলের উপজাতিগুলি সম্পর্কে আদৌ লাগসই নয়।

সামাজিক দিক থেকে লক্ষ্য করলেও একটা মূল পার্থক্য নজরে পড়বে।

শুধু ভাষাগোষ্ঠী হিসেবে আসামের পার্বত্য উপজাতিগুলি মধ্যভারত বা পশ্চিম-ভারত থেকে যে পৃথক কেবল তাই নয়—ভারতের কৃষিকেন্দ্রিক হিন্দু-সভ্যতা আসামের পার্বত্য উপজাতিগুলির মধ্যে সামান্যই প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল। অপর দিকে ভারতের ইতিহাসের মূল আবর্তের মধ্যে এসে, ব্রাহ্মণ্য সভ্যতার সঙ্গে সংঘর্ষের তাৎপর্যে বহুদিন ধরে মধ্যভারত ও পশ্চিম-ভারতের কোল, ভিল, সাওতাল, মুণ্ডারি প্রভৃতিদের মধ্যে এমন এক প্রক্রিয়া চলেছিল যার ফলে ব্রাহ্মণ্যসাত্র ভ্যতার বহু ছাপ এদের মধ্যে এসেছে। এমন উপজাতিও আছে

যাদের মধ্যে হিন্দুসভ্যতার অনুকরণে জাতিভেদ প্রথাও কিছু পরিমাণে এসেছে। এই প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে বহু উপজাতি হিন্দুসভ্যতার মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে নিম্নবর্ণ জাতে পরিণত হয়েছে। সমাজতত্ত্ববিদেরা ভারতের বর্ণভিত্তিক সমাজ-ব্যবস্থার বিন্যাসের চরিত্র নির্ণয় করতে গিয়ে দেখিয়েছেন যে, উপজাতি ও হিন্দু-সমাজ দুটি ঠিক স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যবস্থা নয়। হিন্দুসমাজের ধারা অনুসরণ করেই উপজাতিগুলির সমাজে এমন প্রান্ততম প্রদেশ খুঁজে পাওয়া যাবে যেখানে বৃহত্তর ব্যবস্থায় বিলুপ্ত হবার অথবা তার থেকে পৃথক থাকার পরস্পর-বিরোধী প্রক্রিয়া সতত চলেছে।

আসাম বা পূর্বাঞ্চলে এ-প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। বস্তুত আসামের সমতল-বাসী হিন্দুসমাজের দিকেও যদি লক্ষ্য করা যায় তবে দেখা যাবে সেখানে বর্ণভেদ-প্রথা আদৌ শিকড় গাড়তে পারেনি। আসামে হিন্দুসমাজে অস্পৃশ্যশ্রেণী বলে কোনো শ্রেণী কোনো কালে ছিল না। বল্লাল সেনী বর্ণভেদ-প্রথা প্রোথিত হবার সঙ্গেই সেখানে শঙ্করদেবের নেতৃত্বে বর্ণভেদ-বিরোধী বৈষ্ণব আন্দোলন প্রসারিত হয়েছে। ত্রিপুরা ও মণিপুর অঞ্চলেও বৈষ্ণব আন্দোলনের প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল।

আসামের পার্বত্য উপজাতিগুলির মধ্যে আরেকটি সামাজিক বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। শুধু গারো, খাসি ও জয়ন্তিয়া উপজাতিগুলি যে মাতৃশাসিত তাই নয়, এই পার্বত্য উপজাতিগুলির মধ্যে নারীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মধ্য বা পশ্চিম ভারতে উপজাতিগুলির মধ্যে হিন্দুসমাজের তুলনায় নারীদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হলেও, হিন্দুসভ্যতার পুরুষপ্রাধান্য এই উপজাতিগুলিকেও প্রভাবান্বিত করেছে ও করছে।

আসামের পার্বত্য উপজাতিগুলির মধ্যে বাইরের সভ্যতার যে-প্রভাব এসেছে, তা প্রধানত গত একশতকে—বৃটিশ আমলে। খৃষ্টান মিশনারিরা দীর্ঘকাল ধরে হিন্দুসভ্যতামুক্ত এই অঞ্চলে কাজ করেছে এবং সারা ভারতে উপজাতি-জনসংখ্যার মধ্যে যে ১৭ লক্ষ লোক (শতকরা ৫·৫ ভাগের মতন) খৃষ্টধর্মাবলম্বী, তার অধিকাংশই পূর্বাঞ্চলের পার্বত্য উপজাতির মধ্যে।

গত ৫০ বছর বা আরও সামান্য কিছু সময়ের মধ্যে প্রধানত মিশনারি প্রভাবে মিজো, খাসি, নাগা, গারো, বিশেষত এই উপজাতিগুলির মধ্যে শিক্ষার বিস্তারও ব্যাপক হয়েছে।

সারা ভারতে এবং বিভিন্ন রাজ্যে উপজাতিগুলির সাক্ষরতার হার এইরূপ ঃ

সামাজিক শ্রেণী অনুসারে বিভিন্ন রাজ্যে সাক্ষরতার হার

	সাধারণ	নিম্নবর্ণশ্রেণী	উপজাতি
সারাভারত	২৮	১০	৯
বিহার	২২	৬	৯
উড়িষ্যা	২৫	১২	৭
মধ্যপ্রদেশ	২০	৮	৫
পশ্চিমবঙ্গ	৩৪	১৪	৭
আসাম	৩৩	২৪	২৪
ত্রিপুরা	২৪	১৩	১০
মণিপুর	৩৬	২২	২৭
নাগাল্যাণ্ড	২০	০	১৫
নেফা	৪৮	০	২৯
রাজস্থান	১৮	৬	৪
গুজরাট	৩৬	২২	১২
মহারাষ্ট্র	৩৫	১৬	৭

লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, পূর্বপ্রান্তের অঞ্চলগুলিতে উপজাতির মধ্যে সাক্ষরতার হার সর্বভারতীয় উপজাতির গড়ের চেয়ে অনেক বেশি। কেবল তাই নয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা সর্বভারতীয় সাধারণ গড়ের সঙ্গেও তুলনীয়। এই উপজাতিগুলির মিজো (লুসেই) দের মধ্যে সাক্ষরতার হার শতকরা ৪৪। খাসি সম্প্রদায়ের মধ্যেও সাক্ষরতার হার দ্রুতবর্ধমান। শুধু শিক্ষার ক্ষেত্রেই নয়, জীবনধারণের মানের ক্ষেত্রেও এই উপজাতিগুলির মধ্যে দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছে।

আসাম কৃষিঅর্থনীতি-গবেষণাকেন্দ্র কয়েকটি খাসি, লুসেই, গারো গ্রামে সমীক্ষা করেছেন। তাতে গৃহস্থালীর জিনিসপত্রের নিম্নলিখিত হিসাব পাওয়া যায়ঃ

উপজাতি গ্রামে গৃহস্থালীর জিনিসপত্রের হিসাব

	(১) লুসেই গ্রাম (হ্‌মুন পুই)	(২) গারো গ্রাম (বানসিজুয়া)	(৩) খাসি গ্রাম (মওত্‌নুম)
পেতলের বাসনপত্র		৬৬	১৫৫
কাঁচের বাসনপত্র		৭+৬২	১১৩
অ্যালুমিনিয়াম বাসনপত্র	৬৮০	—	৪২৫
কাঠের বাক্স	৬৪	—	—
লণ্ঠন	৪৯	৪১	৪০
বেঞ্চ, চেয়ার, টেবিল	৬০	৪৪	৭২
খাট (কাঠের)	৮৪	২৩	৩১
আলমারি	২	২	১০
স্টীল ট্রাঙ্ক	২৫	—	—
সেলাইয়ের কল	১১	—	২
হাতঘড়ি	৮	২	৩
দেওয়ালঘড়ি	—	—	৩
গ্রামোফোন	১	১	—
টর্চ	৩৪	১১	১১
বন্দুক	৮	২	৪
রেডিও	—	২	২
সাইকেল	—	৭	৪

[পরিবার সংখ্যা (১) ৪৪, (২) ২৮, (৩) ৩৫]

ভারতের গ্রামের সঙ্গে যাঁরা সামান্যতম পরিচিত—তারাই এই গৃহস্থালী-জিনিসপত্রের তালিকায় চমৎকৃত হবেন, কেননা এ-ধরনের জিনিসপত্র ভারতের অন্যত্র উপজাতি-পরিবারে কেন সাধারণ গৃহস্থ গ্রামীণ-পরিবারেও সচরাচর মিলবে না। স্বভাবতই উচ্চতর শিক্ষা ও পাশ্চাত্য জীবনের প্রভাবে পার্বত্য উপজাতিগুলির গৃহস্থালীও প্রভূত পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছে।

এছাড়া বিশেষত গত দুই দশকে পূর্বাঞ্চলের পার্বত্য উপজাতিগুলির মধ্যে চাকুরির ঝোঁক বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। যদিও আমরা আগে দেখেছি যে

সামগ্রিক জীবিকার মধ্যে অ-কৃষিক্ষেত্রের জীবিকা এই উপজাতিগুলির মধ্যে খুবই সামান্য (১৯৬১র আদমসুমারি অনুসারে)। কিন্তু আলোচ্য গ্রামসমীক্ষার ভেতর থেকে এবং সাধারণ নজরেও নতুন ঝোঁকটি সুস্পষ্ট।

সমগ্র আয়ের শতকরা অংশ

	লুসেই গ্রাম (হ্মুনপুই)	গারো গ্রাম (বানসিহুরা)	খাসি গ্রাম (মওত্নম)
অ-কৃষি মজুরী ও অন্যান্য জীবিকা	১০·৬	৫·৭	২·৬
মাস মাইনের চাকুরি গ্রামে অর্থপ্রেরণ	৮·০	৭·৩	১৭·৬
গ্রামে অর্থপ্রেরণ		১·৩	—

গত দুই দশকে অর্থাৎ স্বাধীনতা ও দেশবিভাগ পরবর্তী পর্বে এই উপজাতিগুলির মধ্যে দ্রুত পরিবর্তন আসতে শুরু করেছে। দেশবিভাগের ফলে লুসেই, গারো ও খাসি অঞ্চলের সঙ্গে পূর্ব-বাঙলার স্বাভাবিক জীবন ছিন্ন হয়ে ব্যবসায়-বাণিজ্যিক লেনদেনে এক বিপর্যয় আসে। অথচ আসাম বা সমগ্র ভারতের মধ্যে অঙ্গীভূত হয়ে নতুন অর্থনীতি গড়ে ওঠারও কোনো প্রতিশ্রুতি লক্ষ্য করা যায় না। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, উপরন্তু, সমতলবাসী অসমীয়ারা কংগ্রেসের নেতৃত্বে আসামে যে-সীমাবদ্ধ ক্ষমতা পায়—সেই ক্ষমতা পার্বত্য উপজাতিদের বিরুদ্ধেও যেতে থাকে।

আমরা এর আগেই আসামের তথা পূর্বাঞ্চলের পার্বত্য উপজাতিগুলির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছি :

(১) অপেক্ষাকৃত রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য এবং আদিম ক্ষমতা সম্পন্ন সংস্থাগুলির অস্তিত্ব।

(২) অর্থনীতিতে আদিম কৌম লক্ষণ এবং অপেক্ষাকৃতভাবে অর্থনীতিতে কম বহিরাক্রমণ। জঙ্গল ও পাহাড় প্রভৃতি সম্পদে স্বীয় ক্ষমতা রক্ষা।

(৩) সামাজিকভাবে হিন্দুসভ্যতার সঙ্গে সংঘর্ষ বা মিলনের প্রক্রিয়া থেকে মুক্ত থাকা।

তারই পাশাপাশি আমরা সাম্প্রতিক প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করছি :

(১) খৃস্টান মিশনারিদের প্রভাব ও দ্রুত খৃস্টান ধর্মে অন্তর্ভুক্তি

(২) আধুনিক শিক্ষার প্রসার

(৩) জীবনযাত্রার মানে আধুনিকতার প্রভাব

(৪) আধুনিক চাকুরি ও জীবিকাক্ষেত্রে প্রবেশের ঝোঁক

লক্ষণীয়, প্রথম স্তরের প্রধানত প্রথম দুইটি বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে দ্বিতীয় স্তরের বৈশিষ্ট্যগুলির বিরোধ রয়েছে। একদিকে ঝুম্ চাষের মতন আদিম চাষের প্রবল অস্তিত্ব, অপর দিকে আধুনিক শিক্ষার প্রসার বা জীবনযাত্রার মানে আধুনিকতার প্রভাব—এর মধ্যে স্পষ্টতই স্ববিরোধ আছে। এই স্ববিরোধের টানাপোড়েনের ফলে পার্বত্য উপজাতিগুলি যখন ক্রমবর্ধমান শিক্ষা ও জীবনযাত্রার মানের সঙ্গে সঙ্গত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা খুঁজছিল, সেই সময়ই ভারত বিভাগ তার প্রসারের সামান্যতম পথগুলিও রুদ্ধ করে দেয়।

এই পটভূমিকাতেই নাগাবিদ্রোহ, মিজোবিদ্রোহ প্রভৃতি ভারতের সাম্প্রতিক ইতিহাসে বৃহত্তম পার্বত্য উপজাতি বিদ্রোহগুলিকে দেখতে হবে। শুধুমাত্র সীমান্ত অঞ্চল বলেই নয়, এই পার্বত্য উপজাতিগুলির স্বাতন্ত্র্যের বৈশিষ্ট্য সমূহ তাদের এই বিদ্রোহগুলিকে এক 'জাতীয়' বিদ্রোহের ব্যাপ্তি দিয়েছিল। রাজনৈতিক ফলশ্রুতি হিসেবে তাই আমরা নাগাল্যাণ্ড, মেঘালয় প্রভৃতি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক অঞ্চলের আবির্ভাব দেখতে পাচ্ছি। মণিপুর, ত্রিপুরারও রাজনৈতিক মর্যাদায় পরিবর্তন ঘটছে।

রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত করা—এ-ঘটনাকে অপেক্ষাকৃতভাবে স্বতন্ত্র উপজাতিগুলির অগ্রগতির প্রথম ধাপ হিসেবে আমরা দেখতে পারি। রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসন এই মুহূর্তে চাকুরিক্ষেত্রের সুযোগ খানিকটা প্রসারিত করলেও, মূল অর্থনৈতিক উৎপাদনক্ষেত্রে তার বিশেষ কোনো সুরাহা করবে না।

অর্থনৈতিকভাবে অত্যন্ত অলাভজনক ও আদিম চাষ থেকে বেরিয়ে আসা এবং তার পরিবর্তে বিস্তীর্ণ পার্বত্য অঞ্চলে ফল ও তরিতরকারির চাষ বা বাগান-চাষ গড়ে তোলা এই মুহূর্তের প্রয়োজন। সেদিকে যে ঝোঁক রয়েছে তা খাসি-পার্বত্য অঞ্চলের পরিবর্তনের দিকে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে। কিন্তু এর জন্য একদিকে যেমন আসামের সমতল অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগের দ্রুত ব্যবস্থা প্রয়োজন—অপরদিকে তেমনি টিনের প্যাকিং-এ ফল বা ফলের রস তৈরির

ব্যবস্থারও দ্রুত প্রয়োজন যাতে এগুলি বাইরে চালান হতে পারে। এছাড়া জল-বিদ্যুতের যে-প্রচণ্ড সম্ভাবনা এখানে রয়েছে, তার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করে সম্ভাব্য শিল্পপ্রসার ঘটানোর ভেতর দিয়েই পূর্বাঞ্চলীয় উপজাতিগুলির জীবনে নতুন সম্ভাবনা উৎসারিত হতে পারে। অন্যথায়, রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত করে সেক্রেটারিয়েট ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক চাকুরিক্ষেত্রে যে-সাময়িক সুযোগ উপজাতিগুলির অপেক্ষাকৃত উচ্চ শিক্ষিত অংশ পাবে—তাতে অর্থনীতির মূল সমস্যার আদৌ সমাধান হবে না। উপরন্তু, রাজনীতি ও চাকুরিক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে সারা ভারতের প্যাটার্নে একটি সুবিধাবাদী 'এলিট' সৃষ্টি হবে যারা অঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যকে মুষ্টিমেয়ের সুবিধাভোগের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ হিসেবে নিরন্তর ব্যবহার করবে। সীমান্তে রাজনৈতিক স্থায়িত্ব ঘটানোর উদ্দেশ্যও ব্যর্থ হবে।

পরিশেষে পূর্বাঞ্চলের বিশিষ্ট অবস্থায় উপজাতি সমস্যার এই তুলনামূলক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বোধহয় একথা অনুমান করা যায় যে, পূর্বাঞ্চলের মতন মধ্য বা পশ্চিম ভারতে আদিবাসী সমস্যা রাজনৈতিকভাবে স্বায়ত্তশাসিত স্বতন্ত্র অঞ্চলের আন্দোলনের কোনো সংঘবদ্ধ ও শক্তিশালী রূপ (ঝাড়খণ্ড আন্দোলন সত্ত্বেও) অদূর ভবিষ্যতে পাবে না। এখানকার আদিবাসী আন্দোলন প্রধানত ভূমিহীন ক্ষেতমজুর ও ভাগচাষীর আন্দোলন। জমি থেকে উৎখাতের বিরুদ্ধে আন্দোলন তথা ভূমিসংস্কারে বৃহত্তর গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাবার লক্ষণই ইতিমধ্যেই দেখা যাচ্ছে। এই আন্দোলনে আদিবাসীদের নিকটতম শরিক ভারতের নিম্নবর্ণের হিন্দুরা—যারাও প্রধানত ভূমিহীন ক্ষেতমজুর ভাগচাষী ও গরীব চাষীশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এ-ছাড়া বিশিষ্ট সমস্যা হিসেবে মহাজনী শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলনের এক বিরাট অবকাশ রয়েছে। স্বভাবতই আদিবাসী সমাজের অভ্যুত্থান (যার লক্ষণ পশ্চিমবঙ্গে ও অন্যত্র দেখা যাচ্ছে) এই গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে বিরাট শক্তি যোগাবে। সেই শক্তির উৎস আদি-বাসীদের তীর-ধনুক শুধু নয়। সেই শক্তির উৎস আদিবাসী সমাজের সামাজিক ঐক্যের বিরাট ঐতিহ্য এবং ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে সভ্যতর সমাজের হাতে বারংবার মার খাবার যৌথ স্মৃতি, আত্মরক্ষা ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামে অংশগ্রহণ করার মানবিক আবেগ।

সমাজ ও আত্মজিজ্ঞাসা

অসীম রায়

সাম্যবাদ যে যৌবনের এক আশ্চর্য সম্ভাবনাপূর্ণ সমার্থক শব্দ তা ভারতবর্ষের নবলব্ধ স্বাধীনতার পর বিশ বছর আগে যৌবনে পা দিয়ে অনেকের মতো আমাদেরও মনে হয়েছে। ইতিমধ্যে কিছু পরিমাণ সাহিত্যে দীক্ষা ঘটেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎস-উচ্ছ্বসিত সাহিত্যের ঘোলা জলের উজান ঠেলে। আমরা কেউ কেউ রবীন্দ্রনাথের শেষদিকের কবিতা থেকে ইয়েটসের শেষ পর্বে এসেছি, প্রাক্-বিপ্লব রুশ ও উনবিংশ শতাব্দীর দিকপাল ফরাসী ঔপন্যাসিকদের হাত ধরে টমাস মানের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে কেউ। এবং এই বিরাট চিন্তাপর্বের উত্তরাধিকার আপনার ভেবে আমাদের যৌবনের সার্থকতা খুঁজেছি এক নতুন মানবতাবোধে অথবা আরও পরিষ্কার করে বলতে গেলে মার্কসবাদে। যদিও এ-সত্য আমাদের কাছে তখনও যেমন স্পষ্ট ছিল এখনও তেমনি পরিষ্কার যে মার্কস থেকে মাও পর্যন্ত চিন্তানায়কদের সাহিত্য-শিল্প আলোচনা যৎসামান্যই, তবে যেহেতু বিশেষ করে ভারতবর্ষের মতো দুঃস্থ দেশের আপামর জনসাধারণের ভবিতব্যের সঙ্গে মার্কসীয় চিন্তা ও তার সঙ্গে অপরিহার্য সংগ্রাম দিন ও রাত্রির অবিচ্ছিন্নতায় যুক্ত, তাই সাহিত্যের ভবিষ্যতে অনাস্থার কারণ ঘটেনি। বিশ বছর পরেও এ-অনাস্থার কারণ যে শুধু ঘটেনি তা নয়, ইতিমধ্যে বাঙলা সাহিত্যে এক শক্তিশালী কালচারাল এস্টাব্লিশমেন্টের জন্ম এবং এক নিকৃষ্ট বাজারি সাহিত্যের প্রচারে তার অনলস উর্দগ্র চেষ্টায় আমাদের নতুন মানবতা-বোধের প্রত্যয় আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার অপেক্ষা রাখে। সঙ্গে সঙ্গে আজ লেখক ও শিল্পীর পক্ষে কি নতুন ভাবে আত্মানুসন্ধানের প্রয়োজন নেই? দেশে ও বিদেশে মার্কসীয় শিল্পতত্ত্ব ও তার প্রয়োগবিধির যেসব ত্রুটি দেখা গেছে, সেগুলো ধামাচাপা না দিয়ে সে-ত্রুটির পুনরাবৃত্তির পথ থেকে সরে আসা প্রত্যেক সংস্কৃতিকর্মীর এক নতুন দায়। এ-দায় সাহিত্যের ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়েই।

আমাদের কাল দুরন্ত। আধুনিক জ্যোতিষীর অপর নাম রাজনৈতিক

সংবাদদাতার চলতি পথে পা না-বাড়িয়েও সমস্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার চেহারা মাথায় রেখে এ-কালের সংঘর্ষময় ভবিষ্যৎ চোখ এড়ানো মুস্কিল। এই সংঘর্ষের পটভূমিকায় লেখক ও শিল্পীর স্থান কি? তাঁদের ভবিতব্যও যখন ভারতবর্ষের এই ঘনঘটার অংশ, তখন সাম্যবাদী জগতের চালু আপ্তবাক্য যথেষ্ট নয় নিশ্চয়। শুধু জীবিকাবোধ জীবনবোধের সরল সমীকরণ বা বুর্জোয়া সাহিত্য-শিল্প সম্পর্কে নাটকীয় উষ্মার পৌনঃপুনিক উদ্গার কাজ দেয় না। গত বিশটা বছর নানা অভিজ্ঞতায় স্বদেশে বিদেশে লেখক ও শিল্পীদের খুঁটি ধরে নাড়া দিয়েছে। আমরা সেই নাড়া খেয়ে নিজেদের ওলোটপালট করে দেখব এবং এই আত্মানুসন্ধানই হতে পারে আমাদের দুরন্ত কালের সহায়ক—এ-প্রত্যাশা নিশ্চয় অপ্রাসঙ্গিক নয়।

একালের পরিপ্রেক্ষিতে কয়েক রকম ভবিষ্যৎ লেখকের সামনে। যা সহজেই অনুমেয়—আগামী দিনের প্রথম পর্যায়ে চলতি জনপ্রিয়তাকেই যান্ত্রিক ঐতিহ্যবাদের দোহাই দিয়ে নতুন মানসিকতার ভেক পরানো হবে। এই সহজ রাস্তাই খুব স্বাভাবিক। আমাদের দেশেও যেমন কোনো লেখক চীন-ভ্রমণের পরেই চৈনিক প্রীতিতে গদগদ আবার রাজনৈতিক ঘটনার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রবল চীনবিরোধী। এই ভবিতব্য খুব স্বাভাবিক। কারণ লেখকের জীবনবোধের ব্যাপারটাই ফ্যাশান, যেমন সেক্স-ফ্যাশান। আর সমাজতান্ত্রিক পথে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাঁদের উপর ন্যস্ত তাঁদের যথেষ্ট সদিচ্ছা সত্ত্বেও শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে নজর না থাকার সদিচ্ছা কিছু পরিমাণ ফিকে হয়ে যাওয়া প্রায় অবশ্যম্ভাবী। তখন মার্কস-এঙ্গেলসের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কয়েকটা কথার উপর নির্ভর করে তীক্ষ্ণ কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট পলেমিকে আশ্রয় গ্রহণ ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। আর সমাজতান্ত্রিক জয়যাত্রা যে সব সময় বুদ্ধি প্রখর করেছে, হৃদয়ে গভীরতা সঞ্চার করেছে—শুধু তারই নজির নেই; সঙ্গে সঙ্গে আছে নতুন চিন্তাধারা স্বীকার করায় চরম আমলাতান্ত্রিক ঔদাসীন্য, জনগণের গতিময় ব্যঞ্জনাময় সম্ভাবনার থরথর চিত্রকল্পের বদলে স্থান পেয়েছে এক ভোঁতা প্রাণহীন পুতুল এবং তখনই 'বিপ্লবের মধ্যে বিপ্লব'-এর প্রয়োজন ঘটেছে। এ-ঘটনার নজির যত্রতত্র ছড়ানো। যে-কালের ধারায় আমলা পাল্টায় কিন্তু আমলাতান্ত্রিক মনোবৃত্তি নতুন দাপট অর্জন করে, তেমনি প্রবল যান্ত্রিকতাদোষে দুষ্ট এবং মানসিক মেদস্ফীতিতে আক্রান্ত লেখকও ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক দুই দুনিয়াতেই তারিফ কুড়ান। আমাদের দেশেও

যে এই ধরনের নজিরের পুনরাবৃত্তি ঘটবে না তার কোনো নিশ্চয়তা নেই, বরং খোলা চোখে এই ভবিতব্যের স্বাভাবিকতা মেনে নেওয়াই সাবালক মানসিকতার লক্ষণ। লেখক তাঁর আত্মানুসন্ধানের দায়ে সাম্যবাদের দিকে পা বাড়ান, প্রাইজের জন্যে নয়। তাঁর হারাবার কিছু নেই।

আর এক প্রবল সম্ভাবনাও অনস্বীকার্য। সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় যে-নবীন সাংস্কৃতিক এস্টাব্লিশমেণ্ট তৈরি হবে, তার মুখপাত্র রূপে সাহিত্যশিল্পে সার্থকতা অন্বেষণ। এ-পথে যে সার্থকতা নেই এমন নয়, কিন্তু এ-ক্ষেত্রেও যান্ত্রিক চিন্তার চাপে নতুন এক শ্রেণীর আমলার পংক্তি আরও লম্বা করার করুণ ভবিষ্যতও অস্বীকার করা যায় না। রাজনৈতিক কর্মীর পক্ষে শিল্প-সাহিত্যকে কেবল অস্ত্ররূপে চিন্তা করার মানসিকতা যখন উদগ্র, যখন শিল্প-সাহিত্যের পরম্পরা ও তার বিশেষ চাহিদা সম্পর্কে চিন্তা মুলতুবি থাকলেও থাকতে পারে—তখন অস্ত্রের নামে প্রস্তরযুগের অস্ত্রের পর্যায়েও আমরা ফিরে যেতে পারি। একটা ছোট্ট সীমাবদ্ধ লক্ষ্য আর তার ঝটাপট সমাধান—এই ছকে চিন্তা করতে করতে শিল্প-সাহিত্যের আজীবন গভীরতা ও ব্যাপ্তির যে-সংগ্রাম, তা যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য নাও মনে হতে পারে। যা একেবারে প্রত্যক্ষ ঘটনা তার কার্যকারণে না গিয়ে কোনো অখণ্ড মানসিকতার আশ্রয় গ্রহণ না করে তার সযত্ন কিন্তু সঙ্কীর্ণ অনুধাবন মহৎ সাহিত্যের সমগোত্রীয় রূপে চিহ্নিত হতে পারে। এই তীব্র নিপুণ ন্যাচারালিজমের ছবি আমরা পাই বিখ্যাত রুশ ঔপন্যাসিক ইলিয়া এরেনবুর্গের রচনায়। আমাদের ছাত্রাবস্থায় বারেবারেই নতুন মানসিকতার সন্ধানে এরেনবুর্গের দরজায় ধাক্কা দিয়ে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। অত্যন্ত পরিশ্রমী ডকুমেণ্টেশান চরিত্রে রূপায়িত হয়নি। হাজার পাতা ব্যাপী জমিতে চোখের সামনে ঘুরে বেড়িয়েছে মানুষ, কিন্তু অনাত্মীয়ভাবে। প্রাক্‌বিপ্লব রুশ উপন্যাসের যে-মহৎ নিদর্শন জ্বলন্ত নবীন এক বসন্তের মতো বারবার আমাদের ডাক দেয় এবং যে-বসন্তের রূপ আমরা আবার প্রত্যক্ষ করি পরবর্তীকালে আলেক্সি তলস্তয়ে কিংবা শলোকভে—সে-রূপ কোথায়? এরেনবুর্গের মানসিকতার তো কোনো গণ্ডগোল ছিল না। ফাসিস্তবিরোধী বিরাট গৌরবময় যুদ্ধ এবং নবীন মানসিকতার তিনি প্রবক্তা। কিন্তু কেন গ্রন্থ শেষে হাওয়ায় শুকনো পাতার মতো উড়ে যায় তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলো আমাদের মন থেকে?

এরেনবুর্গ আমাদের আলোচ্য, কারণ দেশে দেশে সাহিত্যক্ষেত্রে নবীন

মানসিকতার প্রবক্তা হয়েও তিনি শিল্পের উৎকর্ষতায় আমাদের ধরে রাখতে অসমর্থ। এরেনবুর্গের মতো আমরা আরও কিছু রুশ ঔপন্যাসিকদের দৃষ্টান্ত চোখের সামনে রাখতে পারি। যেমন রুশ-জার্মান যুদ্ধের গৌরবময় কাহিনী অবলম্বনে লেখা বরিস পলেভয়ের উপন্যাস। ন্যাচারালিজমের এইসব দৃষ্টান্তের উল্লেখ নিশ্চয় আমাদের রুশ সাহিত্যবিরোধিতার মিথ্যাভাষণের পথে ঠেলে দেয় না; কারণ সেখানেও শিল্প-সাহিত্যে সামগ্রিক দৃষ্টির নজির আমাদের নিশ্চয় চোখে পড়ে। কিন্তু রিয়ালিজম-ন্যাচারালিজমের দ্বন্দ্বে প্রায়ই দেখা গিয়েছে যে রিয়ালিজমের নামে এক সঙ্কীর্ণ অগভীর জীবনবোধ প্রশ্রয় পেয়েছে। মার্কসীয় শিল্পতত্ত্ব ও তার প্রয়োগে এক বিশেষ সঙ্কটের জন্যেই এ-দৃষ্টান্ত উল্লেখ্য।

আমাদের দুরন্তকালের পরিপ্রেক্ষিতে তৃতীয় সম্ভাবনা হলো লেখকের মৌনে প্রবেশ। এই মৌনে প্রবেশ অসম্ভব আত্মকেন্দ্রিকতার লক্ষণ বলে চিহ্নিত হলেও সীরিয়াস লেখকের কাছে কঠিন বাস্তব। কারণ নিজেকে পুনরাবৃত্তি করে যেমন লাভ নেই, তেমনি নতুন পরিস্থিতির আশু ভয়ঙ্কর রূপ তাঁর সমস্ত সত্তাকে নাড়া নাও দিতে পারে। বিশেষ করে তিনি যদি আকাঙ্ক্ষা রাখেন বৃহত্তর পাঠক-সমাজ তাঁর নিঃসঙ্গ ব্যক্তিগত তীর্থযাত্রায় যোগ দেবেন, তাহলে তাঁর অন্তরের এই স্বাভাবিক চাহিদা নাও মিটতে পারে। তখন তাঁর কাছে তাঁর স্বপ্নের সাম্যবাদ এবং বাস্তবের সাম্যবাদের মধ্যে ফারাক দুস্তর হতে থাকে এবং সেই দুস্তরতা বাড়তে বাড়তে এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়ায় যখন তাঁর অতীত কর্ম ও কল্পনার দিকে তাকিয়ে মৌনে প্রবেশই আত্মকেন্দ্রিকতার লক্ষণ না হয়ে সৎ লেখকের একমাত্র পথ। কারণ তাঁর চোখের সামনে ভাসে সেই সব ধরনের লেখকের জয়যাত্রা যাঁরা দুই দুনিয়াতেই জনপ্রিয়তার বিজয়কেতন ওড়ান। একদিকে প্রবল বাণিজ্যিক মূল্যবোধ আর একদিকে কল্পনাশূন্য আমলাতান্ত্রিক মনোভাবের চাপে তাঁর কাছে লেখকের দুর্গম পথের বদলে কাম্য হয় সাধারণ সুস্থ নাগরিকের কর্মময় প্রাত্যহিকতা। অবশ্য এই স্বাভাবিক পথ থেকে সরে আসা এক ধরনের লক্ষ্যভ্রষ্ট মানসিকতার নজিরও আমাদের চোখে পড়ে। লক্ষ্যভ্রষ্ট লেখক তাঁর শিল্পের দায়ের কথা অস্বীকার করে ছোটেন পশ্চিমের দিকে, ক্ষয়িষ্ণু ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার দিকে; যখন ধনতান্ত্রিক দুনিয়ারই কিছু কিছু ক্ষমতাশালী লেখক ক্ষয়িষ্ণুতার চ্যালেঞ্জরূপে সমাজবাদের দিকে হাত বাড়িয়েছেন।

লেখকের আর এক ভবিষ্যৎ আমাদের মতো সংস্কৃতিকর্মীদের টানে। তা হলো এই সমস্ত ক্ষয়, অন্তর্দ্বন্দ্ব, আমলাসুলভ ঔদাসীন্য, প্রাইজের লোভ, অর্থাৎ

আমাদের দুরন্তকালের জমিতে দাঁড়িয়ে সমস্ত রকম টানাপোড়েন সম্পর্কে সচেতন থেকেও নিজের শিল্পকর্মের তীর্থযাত্রায় অবিচল থাকার সাহস ও আত্মবিশ্বাস। কারণ সত্যিই আমাদের কল্পনায় মহৎ লেখক এক নতুন প্রোলেতারিয়েত যাঁর হারাবার কিছুই নেই এবং যাঁর সামনে সম্ভাবনা অনন্ত। কারণ তাঁর প্রবল নৈর্ব্যক্তিকতায় তিনি সমস্ত রকম প্রত্যক্ষ আন্তরিক অভিজ্ঞতায় তীক্ষ্ণ প্রাতিস্বিক অনুভূতিগুলো বাঁধতে পারেন এক অখণ্ড মালায়, এক গভীর রিয়ালিজমের সমগ্রতায়। কাজেই দুর্গম তাঁর কাছে দুর্গম নয়, দুস্তরতা স্বাভাবিকতারই নামান্তর, জটিলতা সাফল্যের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য এবং কালের বিপুল নাট্যে সমস্ত দ্বন্দ্বই জীবনের রূপক। কাল তাঁর কাছে প্রাণদায়িনী, মৃত্যুসূচকমাত্র নয়। কালের নাট্যে তিনি ছেদ ও অনবচ্ছেদের অন্তহীন লীলার কালহীন চিত্রের দর্শক। কাল হেঁচকায়, কাল আবার বয়ে নিয়ে চলে। লাফ এবং মন্থর হাঁটার এই দ্বৈত ও সমন্বিত ডায়ালেকটিক রূপ তাঁর হৃদয়ে বিধৃত বলেই সমস্ত উপেক্ষা উৎসাহব্যঞ্জক, নিঃসঙ্গ তীর্থযাত্রা আত্মকেন্দ্রিকতার পরিচয় তো নয়ই বরং নতুন মানসিকতার সমৃদ্ধরূপে পৌঁছানোর প্রায় একমাত্র রাস্তা। এভাবে চলতে চলতে আশা করা যায় এ-শতাব্দীর শেষে যখন দ্বন্দ্ব এক সমন্বয়ের রূপ পাবে, পরস্পরের প্রতি ভয় ও অবিশ্বাসের পরিচ্ছেদগুলো পেছনে ফেলে আসা যাবে, তখন শেষোক্ত লেখক ও চিন্তানায়কদের ক্ষেত্রে ঘটবে লেখক-পাঠকের চিরকালের সাযুজ্যআকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতা।

হাঙ্গেরীয় সমালোচক জর্জ লুকাচ প্রায় দুই দশক আগে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ইওরোপীয় রিয়ালিজম সমীক্ষা'র মারফত আমাদের দেশে পরিচিত হন। এই মূল্যবান গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য—কেন রিয়ালিজম নেচারালিজম অপেক্ষা আরও গভীর ও ব্যাপ্ত সমাজচেতনার সমন্বিতরূপের মাধ্যম বলে তা ঔপন্যাসিকের আরাধ্য, কেন জোলা ও বালজাকের তুলনায় খুঁটিনাটির ওপর অপূর্ব দক্ষতা সত্ত্বেও জোলা ক্ষুদ্র এক সীমিত জগতের নায়ক আর বালজাকের সমগ্রতার দিকে দৃষ্টি থাকায় কোনো সিচ্যুয়েশানই বিচ্ছিন্ন চমৎকারিত্বের আলোয় ঝলমলে মাত্র নয়··· তা সমস্ত চরিত্রের অগ্রগতির সঙ্গে অবিভাজ্য। চরিত্র ও ঘটনার এই অবিভাজ্য সমন্বিতরূপের জন্যে হাজার পাতাব্যাপী লক্ষ্যভ্রষ্ট নায়ক-নায়িকারা হেঁটে বেড়ান না পাঠকের চোখের সামনে। আমাদের ক্রমাগত দৃষ্টি আকর্ষণ করতে করতে তাঁরা হন আমাদের হৃদয়ের শিলায় খোদিত।

বালজাক স্তাঁদাল তলস্তয়ের এইটাই সবচেয়ে বড় পরাক্রম তাঁরা প্রত্যক্ষ প্রাত্যহিককে গভীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উষ্ণতায় সঞ্জীবিত করে এক প্রকাণ্ড নৈর্ব্যক্তিক অখণ্ডতা মাঝখানে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পেয়েছেন। উনবিংশ শতাব্দীর ইওরোপীয় উপন্যাসের এ-ঐতিহ্য ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক দুই দুনিয়ার লেখকের ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে প্রযোজ্য। অদ্যাবধি মার্কসীয় শিল্পতত্ত্বে এই মূল প্রতিপাদ্যটি অস্বীকার করা হয়নি বটে, কিন্তু এ-প্রসঙ্গে যথেষ্ট মনোযোগও দেওয়া হয়নি। বরং একথা মনে না হয়ে পারে না যে বালজাকের চেয়ে জোলার প্রতি আকর্ষণ আরও জোরাল।

মনোহারী ও বিক্ষিপ্ত চিত্রণের প্রতি ঝোঁক ছাড়াও আর এক গোড়ার গলদ চোখ এড়িয়ে যায় না। বোধহয় তীক্ষ্ণভাবে বলার ইচ্ছায় আর্টের এক বিশ্লিষ্ট রূপ এঙ্গেলসের 'সুপারস্ট্রাকচার' ব্যাখ্যায় বিধৃত। সমাজ ও রাজনীতি স্ট্রাকচার এবং শিল্প সুপারস্ট্রাকচার। এই ব্যাখ্যা পরবর্তীকালে বহুল পরিমাণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে মার্কসীয় শিল্পতত্ত্ব আলোচনায় এবং রাজনৈতিক কর্মীর মুখে মুখে। আলোচনা প্রসঙ্গে কথাটা শেষপর্যন্ত দাঁড়িয়েছে যে শিল্প মূল কাঠামোর এক বহিরাংশ, যেমন চিত্রবিচিত্র ছাদের আলসে কিংবা চিলেকোঠা অথবা এমন একটি অংশ যা সমস্ত কাঠামোর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত নয়, বড়জোর একটি অলঙ্কার, কাজেই তন্ময় অন্বেষণের উদ্দেশ্য নয়।

শিল্পের এই বিশ্লিষ্ট রূপের মাঝখানে হয়তো তীব্র উজ্জ্বল কবিতা কিংবা প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক চেতনা উদ্বুদ্ধকারী সংক্ষিপ্ত নাটক সম্ভব। কিন্তু শিল্পকর্ম যেখানে গভীরতা ও ব্যাপ্তিতে পাঠকসমাজের মনোযোগ দাবি করে, তা এই বিশ্লিষ্টরূপে পলাতক। শিল্পের সংশ্লিষ্ট রূপেই বস্তুজগৎ ও মানসিকতার প্রবল গুণগত পরিবর্তন ধরা পড়ে। সাহিত্যের শিক্ষা শিল্পের এই সংশ্লিষ্টরূপ। যখনই শিল্প-সাহিত্যকে বিচ্ছিন্নপ্রায় অব্যবহার্য চিলেকোঠা বা এক পোষাকী বৈঠকখানা ভাবা হয়, তখনই শিল্পকর্মের গুরুত্ব অস্বীকৃত। এঙ্গেলসের মূল ব্যাখ্যায় সুপারস্ট্রাক-চারের রূপ হয়তো ঠিক এরকম ছিল না, কিন্তু কালের ধারায় নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বিশেষকরে সংঘর্ষময় কালে শিল্পের বিশ্লিষ্ট চেহারা পায় সৌখীন রূপ, তা যেন এমন এক ধরনের মোগলাই খানা যা স্বাদে গন্ধে অভিনব কিন্তু যার প্রয়োজন কালেভদ্রে, বোধহয় অনাগত ভবিষ্যতে।

সাহিত্যের ইতিহাস আমাদের শেখায় তা সৌখীন ব্যাপার নয়, তা নিঃশ্বাসের মতোই প্রয়োজনীয়। সেইজন্যেই মানবসভ্যতার অগ্রগতিতে তার গুরুত্ব

এতখানি। প্রত্যেক কালের রূপ যেরকমই হোক, মহৎ সাহিত্যিক সব সময় চেষ্টা করেছেন তাঁর কালকে বিধৃত করতে তাঁর রচনায় এমন এক প্রবল নৈর্ব্যক্তিকতায় যা তাঁর শ্রেণীর উর্ধ্বে; যে-কারণে আমাদের বহুপরিচিত রাজতন্ত্র বিশ্বাসী বালজাকে আপাত-বৈপরীত্যের পরম প্রসাদ। এই আপাত-বৈপরীত্য শিল্পে নৈর্ব্যক্তিকতার সাধনা ছাড়া আর কিছু না। লেখক ও শিল্পী একজন 'হোলটাইম ওয়ার্কার' যাঁর অখণ্ড মনোযোগ যেমন সাম্প্রতিকে, প্রত্যক্ষে; তেমনি এই প্রত্যক্ষের মণিমালায় গ্রথিত এক নৈর্ব্যক্তিক মানসিকতায়। কাজেই আগামীকালের সুস্থ সমাজের স্বপ্নেই নয়, বর্তমানের প্রবল প্রত্যক্ষের বাস্তব জমিতেই তাঁর বাস।

প্রায় দুই দশক আগে 'কলমের বদলে বন্দুক' এই রকম স্লোগান অস্পষ্টভাবে আমাদের কাছে পৌঁছেছিল। এ-স্লোগান শিল্পতত্ত্বের মূল ধর্ম অস্বীকার করে তার জোরদার বাচনভঙ্গী সত্ত্বেও। ইয়োরোপের বুকে বসে এই তত্ত্ব অগ্রাহ্য করা খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বা ভারতবর্ষে এ-দাবি মাঝে মাঝে উঠতে বাধ্য। কারণ কলম ও বন্দুকের মাঝখানে এক প্রকাণ্ড বৈপরীত্য গড়ে তোলা অস্বাভাবিক নয়। এক্ষেত্রে ধৈর্য ও সাহসের পরীক্ষায় লেখক ও শিল্পী অনুপ্রেরণা পেতে পারেন ভিয়েতনামের চাষী অথবা মায়েদের কাছ থেকে যাঁরা প্রচণ্ড দুর্যোগেও ধান বোনেন, সন্তান পালন করেন। তাঁদের এই অপরিসীম ধৈর্য ও আত্মবিশ্বাস আমাদের হৃদয়ে আনে মানবসভ্যতার ভবিষ্যতে পরম আস্থা। লেখক ও শিল্পীও ইয়োরোপের অপেক্ষাকৃত শান্ত পটভূমিকায় কাজ করবার আর সুযোগ পাবেন না। দুর্যোগ ও ঘনঘটা তাঁর অপরিহার্য সঙ্গী। সাহিত্য ও শিল্পের গুরু দায়িত্ব তাঁর পক্ষে বহন প্রায় অসম্ভব যদি দেশকালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তিনি আরও ধৈর্যশীল সাহসী না হন। যা ইয়োরোপ আমেরিকায় কিছু পরিমাণ ঘটেছে—অর্থাৎ শিক্ষাজগতে আংশিক আশ্রয়—ভারতবর্ষের মতো অনগ্রসর দেশে তা প্রায় অসম্ভব। কারণ শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামো এমন ভাবে তৈরি যে সেখানে দেশে-বিদেশে পরিবর্তমান পরিস্থিতিতে নতুন মানসিকতা অর্জন করার সাধনার বদলে সঙ্কীর্ণ চাকরিসর্বস্ব মানসিকতা গড়ে তোলাই প্রধান লক্ষ্য। একালের যাঁরা নেতা, অর্থাৎ রাজনৈতিক জগতের লোকজন, শিল্প-সাহিত্য নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই তাঁদের। আমাদের দেশে বিশ বছর আগে সাহিত্যগোষ্ঠী বলে যে-বস্তুটি ছিল, তাও ক্ষীয়মান। থাকবার মধ্যে জাঁকাল কালচারাল এস্টাব্লিশমেন্ট, যেখানে প্রবেশের অর্থ লেখক

ও শিল্পীর আত্মিক মৃত্যু। কারণ সেখানে খাদ্য-সরঞ্জাম অঢেল, ছুরি কাঁটা খানসামা আবহসঙ্গীত অপর্যাপ্ত, কিন্তু খাদ্য নেই। ফলে এক-একটি দশক জুড়ে শুধু সাবালক পাঠকদের ক্রমবর্ধমান অনাহার এবং শেষ পর্যন্ত খাদ্যে অরুচি।

সাহিত্যচিন্তার সঙ্গে অপরিহার্য সমাজচিন্তার এক শক্তিশালী রূপ কয়েক বছর আগে প্রকাশিত কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হার্বার্ট মার্কুসের 'একমাত্রিক মানুষ' আমেরিকা এবং টেকনলজিতে অগ্রসর দেশগুলির এক অনিবর্তনীয় করুণ ভবিষ্যতের মর্মান্তিক চিত্র। এই অসাধারণ অগ্রগতির অর্থ শুধু কায়িক সুখ নয়, এক কঠিন আমলাতান্ত্রিক যূপকাষ্ঠে আত্মবিসর্জন—যেন মেফিস্টোফিলিসের কাছে শেষ পর্যন্ত ফাউস্টের আত্মদান। এই আত্মদান এমন পর্যায়ে যে মার্কুসের মতে বেশির ভাগ মানুষের পক্ষে এই প্রকাণ্ড হৃদয়হীনতা পরিবর্তনের চিন্তাও অপ্রাসঙ্গিক; সমস্ত মৌলিক পরিবর্তন অপ্রাসঙ্গিক যেহেতু পরিবর্তনের প্রবৃত্তি ক্রমশ সঙ্কুচিত এবং শেষ পর্যন্ত অনুপস্থিত; কল্যাণরাষ্ট্র এবং যুদ্ধযাত্রা-সজ্জিত রাষ্ট্রের চেহারাও অঙ্গাঙ্গী, টেলিভিশন-প্রসার এবং ভিয়েতনাম-আক্রমণ যেমন অঙ্গাঙ্গী। খুঁটিয়ে না বললেও রুশদেশ সম্পর্কে তাঁর প্রায় একই বক্তব্য। অর্থাৎ টেকনলজিতে অগ্রসর সমাজতান্ত্রিক দেশ এবং ধনতান্ত্রিক দেশের মূলত একই রূপ। মার্কুসের এ-বক্তব্য কিন্তু আন্তর্জাতিক দুনিয়ার দিকে খোলা চোখে তাকানোর দৃষ্টান্ত নয়। কারণ রুশদেশে শিল্প-সাহিত্য ও অন্যান্য ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক প্রতাপের নজির আমাদের সামনে থাকলেও একথা স্পষ্ট যে অনগ্রসর এবং সামন্ততান্ত্রিক দেশগুলির গত মহাযুদ্ধ-পরবর্তী যে-কটি বৃহত্তর সংগ্রাম চলেছে, সে-সংগ্রামের শরিক রুশদেশ। আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা এবং এশিয়ার দেশবাসীদের পক্ষে আমেরিকার যে-ভয়ঙ্কর সাম্রাজ্যবাদী রূপ এবং বিপরীত শিবিরে রুশদেশের বরাবর অবস্থান—তা কখনোই ভুলবার নয়। এক্ষেত্রে টেকনলজির জয়যাত্রার নামে আমেরিকা ও রুশদেশকে মুড়িমুড়কির বিচারে দেখা দৃষ্টিবিভ্রম ছাড়া কিছু নয়।

অনগ্রসর দেশের বিকল্প ভবিতব্যের সম্ভাবনার কথা অবশ্য মার্কুস-গ্রন্থে অস্বীকৃত নয়। হাজার হাজার মাইল ব্যাপী অনাহার, অর্ধাহার, অন্ধকার ও নগ্নতার পাশে টেকনলজির জয়যাত্রা বিজ্ঞানের পরম পরাজয়। মানুষের এই আত্মিক মৃত্যুর সঙ্গে মনোপলি ক্যাপিটেলের অবিচ্ছেদ্য যোগের কথা মার্কুস প্রায় সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেছেন। বিজ্ঞানের পরম পরাজয়ের জন্যে বিজ্ঞান দায়ী নয়,

তার দুরবস্থার জন্যে দায়ী রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালক, একথা বোঝার জন্যে অসাধারণ চিন্তাশক্তির প্রয়োজন নেই। অনগ্রসর দেশে মাছিমারা কেরানির মতো পাশ্চাত্যের মডেলে টেকনলজির জয়যাত্রা অনুকরণ করার বদলে কিভাবে অগণিত মানুষের হাত এবং সাধারণ যন্ত্রপাতির সমন্বয় ঘটানো যায় তার এক উজ্জ্বল পরীক্ষা চলেছে চীনদেশে। মার্কসের প্রশ্নের সঙ্গে এইসব ঘটনা অবিচ্ছেদ্য, নইলে মার্কস-নির্দেশিত করুণ ভবিষ্যতের কথা মনে রেখে আমাদের কেউ কেউ যন্ত্রবিরোধী সৌখীন কাপটো আশ্রয় নিতে পারেন।

মার্কস বর্ণিত যন্ত্রসভ্যতার করাল রূপ আমাদের ভয়ঙ্কর লাগলেও সে এক অচেনা দেশে ভূত দেখার ভয়। অন্তত ভারতবর্ষের অধিবাসী আমাদের ক্ষেত্রে এ-ভয় মুলতুবী থাকতে পারে। ইতিমধ্যে আশা করা যায় এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার অনগ্রসর দরিদ্র দেশগুলির সঙ্গে তাল রেখে সমাজতন্ত্রের পথে ভারতবর্ষের যাত্রা থাকবে অব্যাহত। সেইজন্যেই মার্কসের গ্রন্থের চেয়েও বলিভিয়ার কারাগারে বন্দী অসমসাহসী ফরাসী সাংবাদিক রেগি দেব্রের গ্রন্থ 'বিপ্লবের মধ্যে বিপ্লব'-এর গুরুত্ব আমাদের কাছে আরও বেশি। দেব্রের এই বইয়ের গুরুত্ব গরিলাযুদ্ধ প্রণালীর ব্যাখ্যায় নয়, যদিও সুনিপুণভাবে উপস্থাপিত সেই ব্যাখ্যা। দেব্রে আমাদের এক নতুন ভূতের ভয় দেখিয়েছেন—সর্ষের মধ্যে সেই ভূতের অবস্থান। তাঁর মতে কমিউনিস্ট পার্টির জয়যাত্রায় বিশেষ করে ক্ষমতালাভের পর সংগঠন ক্রমশ সাধারণ মানুষ থেকে বিযুক্ত এক অ্যাবস্ট্রাক্ট স্বয়ম্ভু রূপ নেয়। তা যতো বিশালতা পায় ততো পরিণতি লাভ করে সুদক্ষ যন্ত্রে, সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক আর সে থাকে না, পতাকা হয় জগদ্দল পাথর। যা ছিল স্পষ্ট দৃঢ়, ঋজুতার ভঙ্গীতে সুঠাম, তার গুণগত পরিবর্তন ঘটে। দেব্রের এই ভয়ের যথেষ্ট ভিত্তি বর্তমান। কাজেই বিপ্লবের মধ্যে বিপ্লবের প্রয়োজন যেমন কমিউনিস্ট পার্টির ক্ষেত্রে তেমনি প্রত্যেক দেশের লেখক ও শিল্পীর পক্ষে এই অন্তর্লীন বিপ্লব অপরিহার্য। আরও পরিষ্কার করে বলতে গেলে লেখক যদি লাল পতাকা স্বপ্ন দেখেন কেবল এক সংঘর্ষের মাথায় এবং বিপ্লবের আগে ও পরের মাঝখানে ভাবেন এক প্রকাণ্ড ফারাক, যেমন ইংরেজ তাড়ানোর প্রসঙ্গে আমাদের দেশে কেউ কেউ ভেবেছিলেন, তাহলে নতুন মানসিকতার জন্ম অন্ধকারেই আবৃত। কারণ লেখক সেইখানেই লেখক যখন তিনি নিজের অভিজ্ঞতায় ক্রমাগত ঠেকে ঠেকে শেখেন এবং অন্যের ঝাল না খেয়ে নিজের অভিজ্ঞতার কথা স্পষ্ট করে বলতে পারেন। এই গভীর

রিয়ালিজমের পথের পথিক বলেই তিনি সৌখীন ছুৎমার্গগামী মানুষ নন, তাঁকে কাঁধ মেলাতেই হয় রাস্তার মানুষের কাঁধের সঙ্গে। সেই রাস্তার মানুষ শুধু মিছিলই করে না, সমাজতন্ত্রের পথে সচেতন এমন কি অচেতন অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নিজস্ব ভাবনা, ধ্যানধারণা আছে তাঁর। পিপ্‌লের নামে মৃতের পূজা, তা যত ঘটা করেই হোক—লেখকের পক্ষে আত্মহত্যার সামিল। কাঠের পুতুলের কারবারী নন লেখক। মানুষ যখন জীবন্ত তখনই সে আকর্ষণীয়, জীবন্ত বিপ্লবও তাঁর স্বপ্ন ও বাস্তব প্রেরণা। কিন্তু মানুষ যদি হয় কাঠের পুতুল এবং বিপ্লব রূপ পায় এক মর্মান্তিক অভিনয়ে শূন্যতার দিকে ধাবমান শক্তিক্ষয়ের তুমুল প্রতিযোগিতায়, তাহলে লেখকের অন্তর্লীন বিপ্লবভাবনা অনিবার্য।

সাহিত্যশিল্প ক্ষেত্রে সংগঠনের জগদ্দলচাপ, 'কলমের বদলে বন্দুক' শ্লোগান, সুপারস্ট্রাকচারের নামে সৌখীন শিল্পভাবনা, ন্যাচারালিজম বা বাস্তবের একান্ত দাসত্ব, এছাড়াও সমাজতান্ত্রিক জগতের শিল্পচিন্তায় আবৃত দৃষ্টি নজরে পড়ে। সেক্স পশ্চিমের দেশগুলোর চালু ব্যবসা নিশ্চয় কিন্তু সেইজন্যেই নরনারীর সম্পর্ক একেবারে কথামালাসুলভ সারল্যে পর্যবসিত নয়। ইয়োরোপ, আমেরিকার কিছু কিছু শক্তিশালী লেখকের লেখায় প্রকাশিত এ-সম্পর্কের বিচিত্র রূপ। ব্যবসাসুলভ মনোবৃত্তিপ্রসূত রূপের প্রকাশ যেমন নিন্দনীয় তেমনি কি প্রশংসনীয় নয় সত্যের তাগিদে লেখা নরনারীর চরিত্র চিত্রণ? পশ্চিমী অবক্ষয়ের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে আমরা কি শেষপর্যন্ত ব্রহ্মচারীর মানসিকতা অর্জনে সচেষ্ট হব? শরীর ও মনের যে-অনুদ্‌ঘাটিত স্তর, যে-পারস্পরিক সম্পর্ক, আবার কখনও কখনও যে-সমান্তরাল যাত্রা—তার অনুসন্ধানে লেখক নিশ্চয় সচেষ্ট হবেন। এক্ষেত্রে জ্যঁ পল সার্তের বক্তব্য—মনের অনেকখানি তো শরীরে অনুপ্রবিষ্ট—উল্লেখ না করেও আমরা মানুষের অন্তর্জগতের খবরসন্ধানী লেখকের কাছে নিশ্চয় কোনো সিধে নাক-বরাবর রাস্তায় প্রত্যাশী নই।

সম্প্রতি তরুণ ইংরেজ কলাসমালোচক ও ঔপন্যাসিক জন বার্জার তাঁর সুলিখিত সুবর্ণিত 'শিল্প ও বিপ্লব' গ্রন্থে শক্তিশালী রুশ ভাস্কর আর্নেস্ট নিজভেৎস্কি-র সাধনা প্রসঙ্গে লুকাচ-নির্দেশিত নেচারালিজম ও রিয়ালিজম ব্যাখ্যা সাহিত্য থেকে ছবি ও ভাস্কর্যে প্রয়োগে প্রয়াসী হয়েছেন। নিজভেৎস্কি অবশ্য ইতিমধ্যেই পশ্চিমী সাংবাদিকদের উৎসাহে পরিচিত হয়েছেন নাটকীয়ভাবে রুশদেশের বাহিরে। তাঁর ক্রুশ্চভের সঙ্গে সাক্ষাৎকার পশ্চিমের বড় বড় কাগজে

ঘোষিত। যাঁদের স্মৃতিশক্তি কিঞ্চিৎ প্রবল তাঁরা নিশ্চয় ভোলেননি গত মহাযুদ্ধ শেষে লণ্ডনে পিকাসোর একজিবিশান দেখে প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলের মন্তব্য, "ইচ্ছে হয় লোকটার পশ্চাদ্দেশে লাথি মারি।" বার্জারের বইখানা আমাদের আরও ভালো লাগত যদি তিনি নিজভেৎস্নির প্রদর্শনীতে ক্রুশচভের চোখা গালমন্দের সঙ্গে সঙ্গে তৎকালীন ইংরেজী কাগজে প্রকাশিত চার্চিলের এই অনির্বচনীয় সাধের প্রসঙ্গে দুই দেশের রাজনৈতিক নেতাদের শিল্পভাবনার মাঝখানে খুঁজে পেতেন গভীর সাদৃশ্য। অনাদৃত অবহেলিত শুধু নয়, রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রবল তাড়নায় তাড়িত এই শক্তিমান রুশ শিল্পীকে তাঁর কাজের জন্যে চুরিচামারি মারফত ব্রোঞ্জ জোগাড় করতে হয় একথা শোনার পর প্রধানমন্ত্রী ক্রুশচভের প্রশ্ন, কেমনভাবে এতদিন ধরে রাষ্ট্রীয় পেষণ তিনি সহ্য করলেন এবং নিজভেৎস্নির উত্তর, "কতগুলো খুব ছোট্ট নরম জীবাণু বর্তমান, গণ্ডারের ক্ষুর গলাতে সক্ষম এমন প্রচণ্ড নোনা জলেও তারা অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সমর্থ।"

লুকাচীয় ব্যাখ্যা অবলম্বনে বার্জার মার্কসীয় শিল্পতত্ত্বের আপেক্ষিক ব্যর্থতার সূত্র খুঁজে পান দুই দৃষ্টিকোণের তফাতে। যা ঘটেছে তা কেবল ভক্তিভরে আরাধনা অথবা ঘটনার দাসত্ব আর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গঠিত এক নৈর্ব্যক্তিক কাঠামে পরিবর্তমান জগতকে নির্ভয়ে ধরার প্রয়াস। তাঁর মতে রিয়ালিজমকে সচরাচর দেখা হয় এক প্রকরণের পর্যায়ে, কোনো কোনো বিষয়বস্তু জনপ্রিয় ও বলিষ্ঠ প্রকাশের বাহনরূপে যা বিশ্বস্তভাবে অথচ ন্যাচারালিজমের চেনাজানা খুঁটিনাটি এড়িয়ে প্রকাশের জন্য সচেষ্ট। বাস্তবের সামগ্রিক চেহারা ধরবার জন্যই যে রিয়ালিজমের পথ, সে-ভাবনা কদাচিৎ।

সম্প্রতি হাঙ্গেরীর চিন্তাজগতে জর্জ লুকাচের সগৌরবে প্রত্যাবর্তন আমাদের অনেকের কাছেই যেন মরা গাঙে চাঁদের আলো। 'নিউ হাঙ্গেরীয়ান কোয়ার্টারলী'তে প্রকাশিত এক দীর্ঘ প্রশ্নোত্তরে তিনি কতগুলো মূল প্রশ্ন রেখেছেন পাঠকের সামনে। যেমন ইতিহাস রচনায় সত্য ভাষণ। লুকাচ বলেন তিনি নিশ্চয় ট্রটস্কি-প্রেমিক নন, কিন্তু ১৯১৭ সালের যে-ইতিহাসে ট্রটস্কির নামগন্ধ নেই সে-ইতিহাস নিশ্চয় বিশ্বাসযোগ্য নয়। সমাজতন্ত্রের যে-উন্নত মূল্যবোধ, তা চিন্তাশীল মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হওয়া চাই, সেটি রাজনৈতিক নেতাদের খেয়ালখুশির ব্যাপার নয়। তাঁর মতে পশ্চিমী বই নিষিদ্ধকরণ সেসব বইয়ের চটক বাড়ায় মাত্র, কারণ যা নিষিদ্ধ তা-ই সচরাচর আকর্ষণীয়। তার বদলে দুই দুনিয়ার মধ্যে তিনি খোলাখুলি সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের কথা বলেন যার

ফলে পাঠক কোনো কবিতা কিংবা গল্পের গুণেই আকৃষ্ট হবেন, দেশের লেবেল দেখে নয়!

লুকাচ বিশ্বাস করেন স্বদেশ ও বিদেশের বিপর্যয়ে আমেরিকান জীবন-বোধের ফানুস ফাটছে। এ-সময়ে সারা দুনিয়ার চিন্তাশীল মানুষের সামনে এক নতুন ও উন্নত জীবনবোধের বিশ্বাসযোগ্য চিত্র তুলে ধরার দায়িত্ব সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার। সেক্ষেত্রে কি লেনিনের 'সাম্রাজ্যবাদ'-এর উপর এক নতুন ভাষ্যের মাধ্যমে আর একবার আমেরিকান অর্থনীতিতে প্রবল সঙ্কটের স্বপ্ন দেখে আমাদের কর্তব্য শেষ করব? লুকাচের মতে এই ধরনের স্বপ্ন দেখা পলিটিকাল ইকনমি নয়, কারণ তা সত্যের বিকৃতি। যদিও সমাজবাদ পশ্চিমী দুনিয়ায় একান্ত নিন্দিত তথাপি যখন কেউ অর্থনৈতিক রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক কারণে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার দিকে হাত বাড়ান তখন তাঁর প্রশ্নের বুদ্ধিগ্রাহ্য জবাবের বদলে যদি আসে আমলাতান্ত্রিক জবাব কিংবা জনৈক ছেঁদো লেখকের বই মডেলস্বরূপ, তবে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে সম্ভ্রম তো অসম্ভব। সাম্প্রতিক হাঙ্গেরীতে শিল্প-সাহিত্য জগতে এক আজব মৈত্রী লুকাচ অবাক হয়ে দেখেন, যান্ত্রিক চিন্তাচ্ছন্ন ডগ্‌মাপন্থী মানুষ এবং বিচারবিবেচনাশূন্য আধুনিকদের মধ্যে। লুকাচ লক্ষ্য করেন পেছন থেকে দড়ি-টানা বর্তমান গণতন্ত্রের যে-চেহারা সে-সম্পর্কে ইয়োরোপ ও আমেরিকার জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান সচেতনতা এবং যত দিন যাবে প্রকৃত গণতন্ত্রের দিকে তাঁরা ঝুঁকতে বাধ্য। এক্ষেত্রে লুকাচের মতে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার নেতৃত্ব খণ্ডিত দুই কারণে। পশ্চিমে অর্থনীতি-ক্ষেত্রে নতুন নতুন কলকাঠি নাড়ানো এবং সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় পরিবর্তনের নামে ওপরে ওপরে জমি নিড়ানোয় প্রকৃত গণতন্ত্রের পথ রুদ্ধ।

আমরা কেন লুকাচ-দেব্রে-বার্জার-সার্ত প্রসঙ্গ তুলছি? কেন আমরা ভাবতে পারি না বাঙলাদেশ মানে বাঙলাদেশ এবং বাঙালি লেখকের আর কোনো ভাবনা নেই? বাঙলাদেশ এই বিশ্বমানসিকতারই অংশ, তার সমস্ত বাঙালিত্ব নিয়েই—একথা যে-বাঙালি লেখক এই পরিবর্তমান বাস্তবের জমিতে আমাদের জীবননাট্যের সমগ্রতা খুঁজবেন তাঁরই ভাবনা। কারণ আমাদের সামনে পথ যত বন্ধুর, আমাদের অভিজ্ঞতার শিক্ষাও তত সমৃদ্ধ। আর বর্তমান ও আগামী দিনের সংঘর্ষময় কালেও যে-বাস্তবের রূপ—তার এক প্রবল ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য। এ-সৌন্দর্য লেখকের কাছে দাবি করে আরও ধৈর্য, আরও সাহস ও সযত্ন অনুশীলন, আরও গভীর সমাজ ও আত্মজিজ্ঞাসা। লেখককে আজ

পৌঁছতে হয় সেই পর্যায়ে যেখানে তিনি প্রায় পৌরাণিক জগতের এক নায়ক অথবা তাঁর অবধারিত প্রায় নিঃসঙ্গ এক তীর্থযাত্রায় মানুষের আশার চিত্রকল্প।

এক্ষেত্রে আরও একটি প্রশ্ন উত্তরের অপেক্ষা রাখে। প্রেরণার বদলে প্রতিবন্ধকের ফিরিস্তি যখন এত লম্বা, এতই অনিশ্চিতিপূর্ণ যখন যাত্রা, তখন লেখক-শিল্পী নেহাত আত্মরক্ষার তাগিদে কেন চোখ ফেরাবেন না এডেন-হংকং প্রসারিত ইঙ্গ-মার্কিন সাংস্কৃতিক ব্যাকওয়াটারের বিস্তৃত ঘোলা জলের দিকে? এর উত্তর কিন্তু পরিষ্কার। লেখক-শিল্পীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার অপেক্ষায় নেই সমস্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পরিস্থিতি। তার গতিপথ এখন প্রায় নির্দিষ্ট—ইংল্যাণ্ডের সৌখীন সমাজতন্ত্রের পথ তা নিশ্চয় নয়। রুশ চীন কিউবা নির্দেশিত সমাজতন্ত্রের পথে বেশির ভাগ মানুষের ভাগ্য বাঁধা পড়েছে একই ভবিতব্যে। বর্তমান দুঃখ-দারিদ্র্য অবসান শেষে ভারতবর্ষেও সমাজতন্ত্রের আওতায় আর্থিক সাম্য প্রতিষ্ঠা অবশ্যম্ভাবী। এই মূল লক্ষ্য যেমন রাস্তার মানুষের, তেমনি লেখক-শিল্পীরও। দেশের এই মূল গতি থেকে বিযুক্ত হওয়ার অর্থ যেমন নিজদেশে পরবাসী হয়ে বাস, তেমনি সে-অবস্থায় সাহিত্য-শিল্পের ভবিষ্যতও সুদূর। লেখক ও শিল্পীর বিশেষ সমস্যা, এই বিস্তৃত দীর্ঘস্থায়ী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামের শরিক হয়েও তাঁর সাধনার পথের দুর্গমতা অবশ্যম্ভাবী। এমন কি আপ্তবাক্যবিলাসী মানুষের কাছে মনেও হতে পারে রাজনৈতিক কর্মী ও লেখকের যাত্রা দুই সমান্তরাল রেখায়। সেই জন্যেই তো লেখকের পক্ষে প্রতীক্ষার রাত এত দীর্ঘ, আত্মপরীক্ষা এত অগ্নিময়।

রচনাটির কোনো কোনো সিদ্ধান্তের সঙ্গে আমরা ভিন্নমত পোষণ করি। এই প্রবন্ধ সম্পর্কে তাই আমরা সুচিন্তিত আলোচনা আহ্বান করছি।　　—সম্পাদক

রাজদ্রোহী ঘোড়া

বল্লভী বক্সী

কোনো সুদূর অতীতের কথা নয়, কোনো ইতিহাসপ্রসিদ্ধ অবিস্মরণীয় ঘোড়ার কাহিনীও নয়। সাধারণ একটি ঘোড়া, যার এমনকি আকৃতিতেও কোনো বৈশিষ্ট্যের দাবি ছিল না। ফুটফুটে সাদা রঙ, বলিষ্ঠ গড়ন, মাঝারি আকৃতির সাধারণ 'দেশী' ঘোড়া। তবে প্রকৃতিতে বৈশিষ্ট্য ছিল বৈকি। ময়মনসিংহ জেলার আদিবাসী মানুষের জীবনসংগ্রামে ঘোড়াটি ছিল সাথী, তাদের ঐক্য ও অগ্রগতির জীবন্ত প্রতীক।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী কাল। স্বাধীনতা অর্জনের দুর্বার উন্মাদনায় পরাধীন ভারত তখন অধীর। সেই সময় এল ভিয়েতনাম দিবস, সাম্রাজ্যবাদের শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে ভিয়েতনামের অজেয় মুক্তিসংগ্রামের সমর্থনে ভারতব্যাপী ছাত্রদের অভিযানের দিন। সেই ডাকে সেদিন ময়মনসিংহ শহরের ছাত্ররাও পথে নেমেছিল। নিরস্ত্র, সুশৃঙ্খল একটি ছাত্রমিছিল, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জলন্ত ঘৃণায় দীপ্ত। তখন বৃটিশ ব্যাস্টিন সাহেব জেলাশাসক। তার হুকুমে এই ছাত্রমিছিলটি ভেঙে দিতে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী ছুটে এল। পথ আটক করে, রাইফেল বাগিয়ে ধরে তারা তৈরি। এদিকে ছাত্রমিছিলও এগিয়ে চলল। ভয়কে উপেক্ষা করে সামনে চলার আহ্বানে তাদের কণ্ঠ মুখরিত। রাইফেল থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি চলল মিছিলের উপর। ছাত্রনেতা অমলেন্দুর বুকের পাঁজর গুঁড়িয়ে দিলো বুলেট। তাঁর নিষ্প্রাণ দেহ লুটিয়ে পড়ল পথের উপর। বুলেটে আহত হলো মিছিলের আরো অনেকে। সদর্পে পুলিশ আহত ছাত্রদের বন্দী করে নিয়ে চলে গেল।

এদিকে ছাত্রহত্যার মর্মান্তিক সংবাদ মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল। রাজপথে ছাত্রদের সঙ্গে জেলার আপামর জনতা রক্তের স্বাক্ষরে মিলিত হলেন। এই নির্মম হত্যার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন তাঁরা। তরুণ শহীদের রক্তাপ্লুত দেহ ঘিরে হাজার হাজার অশ্রুসিক্ত ক্রুদ্ধ মানুষ-জেলা-শহরের পথে পথে সমবেত হলেন। তাঁরা জেলা-কোতোয়ালী অবরোধ করে এই হিংস্র নির্মমতার কৈফিয়ৎ দাবি করলেন। জনতা পুলিশ হাজত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এলেন সমস্ত ছাত্রবন্দীদের।

আন্দোলনের ব্যাপকতায় ভীত বৃটিশ জেলাশাসক জেলাময় একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করল। জেলার সর্বত্র সভা-সমিতি মিছিল বে-আইনী ঘোষিত হলো।

এদিকে ছাব্বিশে জানুয়ারি আসন্ন। ১৯৪৭ সনের স্বাধীনতা-দিবস। এক বৃটিশ আমলার একশো চুয়াল্লিশ ধারার ভয়ে স্বাধীনতা-দিবস প্রতিপালিত হবে না, সেও অসম্ভব। জেলাময় প্রস্তুতি চলল। ব্যাপক গণ-জমায়েতের প্রবল বন্যায় এ-নিষেধাজ্ঞা ভাসিয়ে দিতে হবে।

প্রস্তুতি চলল ময়মনসিংহের পাহাড়-অঞ্চলের আদিবাসী এলাকাতেও। এবার জমায়েত নিজেদের গ্রামের সীমানাতে নয়। ব্যাপক সমাবেশ নিয়ে নিকটবর্তী সুসং শহরে সভা করা ঠিক হলো। সুসং ছিল ছোট্ট একটি শহর। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের তা ছিল এক জবরদস্ত ঘাঁটি।

তারপর নির্দিষ্ট দিনে যথাসময়ে পতাকা-ফেস্টুনে সুসজ্জিত আদিবাসী নারী-পুরুষের তিনটি জাঠা তিনটি এলাকা থেকে এসে মিলিত হলো সুসং শহরের উপকণ্ঠে। যেন প্রবল বর্ষণে পাহাড়ে সঞ্চিত বিপুল জলোচ্ছ্বাস নেমে এল শীর্ণ ঝর্ণার দু-কূল প্লাবিত করে। ত্রিধারার এই মিলনে সমাবেশটি আকারে যেমন হলো বিশাল, প্রকৃতিতেও তেমনি দুর্বার। সহস্র কণ্ঠের বজ্র নিনাদে কম্পিত হলো চারিদিক।

সেই বিশাল জনস্রোতের সামনে সাদা ফুলের মতো একটি সাদা ঘোড়া ভাসছিল। ঘোড়াটি ছিল মুক্তির বিশাল পতাকা বহন করে এই মিছিলের পুরোভাগে। মাথা উঁচু করে সাদা কেশরে দোলন তুলে ঘোড়াটি চলেছে সহস্র কণ্ঠের স্লোগানের তালে তালে পা ফেলে।

মিছিল এগিয়ে চলেছে। সম্মুখে সুসং রাজবাড়ি। প্রবল পরাক্রান্ত সামন্ত-তন্ত্রের অতি বনেদি ও প্রাচীনতম একটি স্তম্ভ।

কথিত আছে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ঈশা খাঁর এক উচ্চ সামরিক কর্মচারী এই অঞ্চলে এসে এই জমিদারির গোড়াপত্তন করেছিলেন। সীমাহীন লাঞ্ছনা আর মাত্রাহীন শোষণ-অত্যাচারে সে-জমিদারির আয়তন কালক্রমে বর্ধিত হয়েছে। বংশপরম্পরায় জমিদারগণ শক্তিশালী হয়েছেন। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কৃপায় সম্মানিত হয়েছেন রাজার খেতাব লাভ করে। আবার রাজা থেকে তাঁরা মহারাজার গৌরবেও গৌরবান্বিত।

গারো পাহাড়ের গভীর অরণ্যে এক কালে এই রাজাদের হাতি ধরার

ব্যবসা ছিল। বনের হাতি ধরে এনে পোষা হাতির সঙ্গে রেখে সেগুলিকে পোষ মানানো হতো। তারপর দেশ-বিদেশে সে-হাতি বিক্রি করে রাজাদের আসত বিস্তর অর্থ আর প্রচুর সম্মান। কিন্তু হাতি ধরার কাজ ছিল যেমন কঠোর শ্রমসাধ্য তেমনি মারাত্মক বিপদসঙ্কুল। হাজং কৃষকদের ধরে এনে এ-কাজ করানো হতো। দিনের পর দিন মাসের পর মাস নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে পরিবার-পরিজন ফেলে হাতি ধরার ফাঁদগুলিতে তাদের বাস করতে বাধ্য করা হতো। সেখানে বাইরে শ্বাপদসঙ্কুল গভীর অরণ্য আর হাতি ধরার ফাঁদগুলিতে লোভী স্বার্থপর বিবেকহীন মালিক। এই দুই নিষ্ঠুর বন্ধনের মধ্যে পঙ্গু জীবনগুলি অভিশপ্তের গ্লানি বহন করত। অবাধ্য হাজংদের শাস্তি দেওয়া হতো রাত্রির অন্ধকারে তাদের তাজা রক্তমাংসে হিংস্র পশুদের মহোৎসবের ব্যবস্থা করে।

হাতি ধরার এ-কাজের বিনিময়ে কোনো পারিশ্রমিকের প্রশ্নই ছিল না। রাজার আইনে এ-কাজের নাম ছিল বাধ্যতামূলক হাতি-বেগার।

উনবিংশ শতকে বাধ্যতামূলক এই হাতি-বেগারের বিরুদ্ধে জেগে উঠল হাজং বিদ্রোহ। মহারাজার নির্মম অত্যাচার ও পৈশাচিক নিপীড়ন চলল গ্রামের পর গ্রামে। শত শত আদিবাসী নারী-পুরুষের রক্তে রঞ্জিত হলো বনভূমির শ্যামল প্রান্তর আর গ্রামের পথঘাট। কিন্তু বিদ্রোহ স্তব্ধ হলো না। দিনে দিনে আরো ব্যাপক, আরো তীব্র হয়েই চলল। সন্ত্রস্ত মহারাজা চক্রান্তের জাল ফেললেন। আপসের প্রস্তাব করে বিদ্রোহী নেতাদের রাজবাড়িতে ডেকে আনলেন। তারপর রাজবাড়িতে মনা সর্দারকে উন্মত্ত হাতির পায়ের তলায় ফেলে পিষে হত্যা করলেন। অমানুষিক নির্যাতনের পর খাদ্য পানীয় বন্ধ করে হত্যা করলেন ধানপাড়ার গয়া মোড়লকে এবং মলা ও গুংলু সরদারকে।

বিংশ শতাব্দীর এই সেদিনও 'টংক' চাষীদের ধরে এনে এই রাজবাড়িতে দিনের পর দিন আটক করে রাখা হতো। বর্বর নির্যাতনে অর্ধমৃত তৃষ্ণার্ত কণ্ঠের মর্মান্তিক আর্তনাদ রাজবাড়ি ঘিরে ভীতি ও আতঙ্কের কুয়াশা রচনা করত। এই রাজবাড়ির লোকলস্কর, হাতি, লাঠিয়াল বুভুক্ষু কৃষকের মুখের অন্ন কেড়ে নিয়ে, জীর্ণ কুটির ভেঙে দিয়ে, ক্ষেতের পাকা ফসল নষ্ট করে, অসহায় মানুষগুলির অন্তরে মহারাজের সীমাহীন 'শৌর্যের' নিষ্ঠুর পরিচয় এঁকে দিত।

শিশুর আর্তনাদ, কৃষক বধূর শতাব্দীব্যাপী চোখের জলের উপর গড়ে

উঠেছে সুসং রাজবাড়ির সীমাহীন বিলাসিতা ও বল্গাহীন ব্যভিচারের এই অনুপম সৌধ।

চিরবঞ্চিত, লাঞ্ছিত, মূক, অসহায় মানুষগুলিই দল বেঁধে এগিয়ে আসছে। মহারাজার পদপ্রান্তে কোনো উপঢৌকন পৌঁছে দিতে নয়। তারা আজ আসছে বিদ্রোহের নিশান ঊর্ধ্বে তুলে। প্রতিবাদের ক্রুদ্ধ গর্জনে মুখর মিছিলের পুরোগামী পতাকাবাহী ঘোড়াটি আজ যেন অন্ধকার যুগের অবসানকারী বর্ণালী প্রভাতী সূর্যের রক্তিম রশ্মির মতো নূতন দিনের বার্তাবাহী।

মিছিল রাজবাড়ির ঠিক সামনে। আক্রমণ হবে··· ? রাজবাড়ির লোকলস্কর এগিয়ে আসবে ? গুলি চালাবে ?

চলুক গুলি। আজ সবাই ভয়ভাবনার শৃঙ্খল মুক্ত। আজ সবাই সঙ্ঘবদ্ধ।

কিন্তু রাজবাড়ি যেন জনমানবশূন্য। রাজপ্রাসাদ যেন অন্ধকার। জানালা-কপাট সবই যে বন্ধ। দৃপ্ত এ-মিছিলের সহস্র কণ্ঠের বজ্র নিনাদে রাজপ্রাসাদের রুদ্ধ বাতায়নগুলি কেবল অসহায় আর্তনাদে বারবার ঝনঝন শব্দে কেঁপে কেঁপে উঠছে।

সুসং মহারাজা আজ সপরিবার পলাতক। আজ মনে পড়ে ঊনবিংশ শতকের হাতি-বেগারের বিরুদ্ধে হাজং বিদ্রোহের সময়ে এমনি আর এক অবিস্মরণীয় কাহিনী। আপসের নামে মহারাজা বিদ্রোহের নেতাদের রাজবাড়িতে ডেকে এনে নির্মমভাবে হত্যা করেছেন। বিদ্রোহ স্তব্ধ করে দেওয়ার কৃতিত্বে তিনি তখন স্বপ্নে বিভোর। পারিষদদল বেষ্টিত মহারাজা তখন দেখছেন বিদ্রোহী হাজংরা কম্পিত হৃদয়ে চোখের জলে করুণা ভিক্ষা করে তাঁর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়েছে। সেই সময় এই নির্মম বঞ্চনার পৈশাচিক দুঃসংবাদ গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে। হাজার হাজার আদিবাসী কৃষক দলবেঁধে দামামা আর মাদল বাজিয়ে, নিজেদের অস্ত্রগুলি শক্ত মুঠিতে তুলে নিয়ে উন্মত্ত ক্রোধে এই রাজবাড়ির দিকেই ছুটে আসছে। বিদ্রোহীদের সে-অভিযান সেদিনও মহারাজের কল্পনাবিলাস কেড়ে নিয়েছিল। ভীত, সন্ত্রস্ত সেদিনের মহারাজাও ঠিক আজকের মতো সপরিবারে রাজপ্রাসাদ ছেড়ে পালিয়েছিলেন। কালের বিচিত্র গতিপথে ঘটনার কি ভয়ঙ্কর সাদৃশ্য নিয়েই ইতিহাস যুগে যুগে হাজির হয়।

মিছিল চলেছে। সম্মুখে সুসং বাজার। এই অঞ্চলের দশ-বারো মাইলের ভিতর এইটিই সবচেয়ে বড় হাট। রাজবাড়ির সিংহদ্বার ছেড়ে খানিকটা ফাঁকা

মাঠ। তারপরই শুরু হয়েছে ছোট-বড় সারি সারি হাটের চাল। মাঝে চওড়া একটি পথ। পথটি সোজা এগিয়ে গেছে দক্ষিণ প্রান্তের সোমেশ্বরীর উঁচু তীর পর্যন্ত। হাটের চালাগুলির শেষে দুই প্রান্তে দেখা যায় মহাজনদের নানা জিনিসপত্রের ছোট-বড় স্থায়ী দোকানপাট। এদের ভিতর কেউ কেউ আছে যারা আদিবাসীদের 'দুঃসময়'-এর মহাজন। তারা সুদের উপর সুদ গুণেছে। বঞ্চনার অপার কৃতিত্বে স্ফীত সৌভাগ্যের ঠিকানা পেয়েছে। ওদের চিনে নিতে কোনো অসুবিধে নেই। আজকের বন্ধ দোকান-পাটগুলিই ওদের চিনিয়ে দিচ্ছে।

বাজারের রাস্তাটি ধরেই মিছিল চলেছে। সহস্র পায়ের সতেজ স্পর্শে পথের ধূলিকণা কুণ্ডলী পাকিয়ে উড়ছে। শীতের পড়ন্ত বেলার একফালি রোদ খণ্ড খণ্ড মেঘের ফাঁকে ধূলির কুণ্ডলী ভেদ করে মিছিলের উপর এসে পড়েছে। নির্যাতিতের এ-অভিযান যেন সোনালী আশীর্বাদ।

সহস্র কণ্ঠের তূর্য নিনাদে চারিদিক কম্পিত করে মিছিল চলেছে। ঐ দূরে চোখে পড়ে বিস্তীর্ণ বালুচরের শেষে শান্ত শীর্ণ সোমেশ্বরীর কালো জলধারা। এই অঞ্চলের আদিবাসী জীবনের চিরসঙ্গী এ-নদী তাদের সর্ব কাজের প্রধান অবলম্বন। সোমেশ্বরীর জলধারার তানে মিশে আছে এই মানুষগুলির চিরকালের ইতিহাস, তাদের সংগ্রামের অমর গাথা। সোমেশ্বরীর শীতল হাওয়ায় মিছিলের পতাকাগুলি বর্ণচ্ছটার লহরী তুলে সশব্দে উড়ছে। যেন এ-এক দিগ্‌জয়ী সেনানীর বিজয় অভিযান।

সামনে সুসং পুলিশ থানা। মিছিল হুঁশিয়ার। সর্তক অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে। বিদেশী সরকারের ১৪৪ ধারার বাধা এ-মিছিল মানেনি। কোনো আঘাতই আজ এ-মিছিলকে রুখতে পারবে না। পারবে না ঐ কণ্ঠ স্তব্ধ করে দিতে।

হাতের মুঠিতে পতাকাগুলি আরো দৃঢ়। কণ্ঠে কণ্ঠে শ্লোগান আরো সোচ্চার। পুলিশের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা যাদের মাথার উপরে, সেই নেতারাই সবার সামনে। থানার ঠিক মুখোমুখি মিছিল দাঁড়িয়ে। বৃটিশের ঘাঁটিকে চ্যালেঞ্জ। সম্মুখযুদ্ধে আহ্বান। চরম উত্তেজনায় মিছিলে চরম অস্থিরতা। অবিস্মরণীয় কয়েকটি মুহূর্ত। দেখতে দেখতে থানার মজবুত লোহার গেটটি উড়ে গেল। তবু থানার ভিতর থেকে কেউ বাধা দিতে এগিয়ে এল না—গুলিও

চলল না। থানার ভিতরে তেমনি নীরবতা, তেমনি নিষ্ক্রিয়তা। দু-তিন জন পুলিশ যেমন রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে ছিল, তেমনি আছে।

শোনা গেল সুসং থানার কর্তারা আজ কেউ থানায় নেই। এ-মিছিলের পদধ্বনি তাদের থানায় থাকার মনোবল কেড়ে নিয়েছে। ভীত সন্ত্রস্ত বাবুরা সব থানা ছেড়ে স্থানীয় সরকারী ডাক্তারবাবুর বাড়িতে আত্মগোপন করেছে।

পুলিশের এই নিষ্ক্রিয়তা মিছিলে হতাশা এনেছে। এ-অভিযান যে বাধা-বিঘ্নহীন এমন অবন্ধুর হবে তা কল্পনাতীত ছিল।

মিছিল অগত্যা এগিয়ে চলল নিকটবর্তী স্কুলের মাঠের দিকে। জাতীয় পতাকা উত্তোলন, পূর্ণ স্বাধীনতার সঙ্কল্প ঘোষণা এবং সংক্ষিপ্ত ভাষণে মিছিল শেষ হলো। বিজয় গর্বে, বিপুল উৎসাহে মিছিল ফিরে চলেছে।

জনপদে প্রতিধ্বনি তখনও ফিরছে। মিছিল চলেছে গারো পাহাড়ের কোলে—নিজেদের গ্রামের দিকে। সম্মুখে দিগন্ত প্রসারিত বিস্তীর্ণ প্রান্তর। প্রান্তরের এপারে সুসং শহর আর ওপারে নীল আকাশে গা-এলিয়ে গারো পাহাড়। আকাশ, পাহাড় আর প্রান্তর....তিনে মিলে এই মানুষগুলির জীবন। তাদের আশা, আকাঙ্ক্ষা, সুখ, সম্পদ, দুঃখ, বেদনা সবই এই তিনে বাঁধা।

আকাশের কালো মেঘ স্বচ্ছ স্ফটিক ধারায় তৃষিত মাটির বুকে আনে স্নিগ্ধতার আমেজ। আর ঐ পাহাড় থেকে উর্বরতা এনে এই প্রান্তরে ঢেলে দেয়। ভিজে মাটির গন্ধে ভরে ওঠে বাতাস। আদিবাসী নারী-পুরুষ সবাই তখন প্রান্তরে ছুটে আসে। অসম্ভব এক কাজের নেশায় মেতে ওঠে সবাই। বর্ষণমুখর আকাশের জলধারার সঙ্গে এই মানুষগুলির তপ্ত ঘাম এক সঙ্গে মিশে ছড়িয়ে পড়ে প্রান্তরের সিক্ত কালো মাটিতে। তাই বর্ষার শেষে এ-প্রান্তরের বুক জুড়ে জেগে ওঠে সাদা সাদা জলের উপর কচি কচি ধানের গাছগুলি।

আস্তে আস্তে শ্যামল শোভায় ডুবে যায় এ-প্রান্তর। যেদিকেই চোখ ধায় কেবল সবুজ আর সবুজ। যেন অসীম এক সবুজ সাগর। গারো পাহাড়ের উত্তুরে দুষ্টু হাওয়া এসে সবুজ সাগরের বুকে ঢেউয়ের দোলা জাগায়। মাতন লাগে আদিবাসী মনের গোপন কোণে।

শূন্য প্রান্তর ভরে যায় চাষীর ঘামে আর শ্রমে বোনা সোনার ফসলে। অপরূপ রূপের মেলা বসে গোটা প্রান্তর জুড়ে। আনন্দের বান ডাকে চারিদিকে।

সেই হিল্লোল ওঠে আদিবাসী পল্লীতে পল্লীতে। সৃষ্টির সার্থকতায় স্রষ্টার যে-আনন্দ। সে-আনন্দ ক্ষণিকের। এই সোনার ফসলের তারা যে শুধু স্রষ্টা। মন ভোলানো এ-রূপের শুধুই শিল্পী। ততক্ষণই তাদের অন্তরে আনন্দের স্থায়িত্ব যতক্ষণ প্রান্তরের বুক জুড়ে সোনার ফসল শোভা পাবে। তারপরে এ-সম্পদে ভাণ্ডার পূর্ণ হবে যত রাজা, মহারাজা, জমিদার, তালুকদার, মহাজনদের। নিশ্চিন্ত বিলাসিতায় ভরে উঠবে সুখ-সম্পদে ভরা তাদের জীবনযাত্রা। কেন না তারা মালিক। আর বঞ্চনায় ভরা ডালা মাথায় তুলে ফিরে যাবে কৃষক তার রিক্ত গৃহকোণে। অভাবের সহস্র দংশনজ্বালায় জর্জরিত তার দুর্বিষহ জীবন চলবে প্রতিনিয়ত মৃত্যুর সঙ্গে আপস করে। তাইতো সৃষ্টি হয়েছে টংক, ভাওয়ালী....এমনি কতসব প্রথা। বিচিত্র নামের কতশত পবিত্র আইন। ন্যায্য অধিকার থেকে কৃষককে বঞ্চিত করার কতশত কৌশল। এই ব্যবস্থাই চলে আসছে আবহমান কাল ধরে নানা নামে, নানা কৌশলে।

আজ তাই বিদ্রোহ এ-মিছিলে। তাই সহস্র কণ্ঠের সোচ্চার ঘোষণা—আর দেব না, আর দেব না রক্তে বোনা ধান মোদের প্রাণ হো।

শূন্য প্রান্তর থেকে এখন ঘন কুয়াশার কালো চাদরে গা মুড়ি দিয়ে শীতের সন্ধ্যা নেমে এসেছে। মিছিল তারই ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেছে। শুধু তাদের দৃপ্ত ঘোষণার উদাত্ত ধ্বনি ছড়িয়ে আছে চারিদিকে।

যথা সময়ে জেলা সদরে এই মিছিল, এই মিটিং-এর বিশেষ জরুরি রিপোর্ট চলে গেল। সেখান থেকে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা এল নারী-পুরুষ নির্বিশেষে পাহাড়ী অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে।

গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ঘোড়াটির বিরুদ্ধেও এল। সূক্ষ্ম ন্যায়ের দণ্ডধারী বৃটিশরাজ। রাজদ্রোহই সে-বিচারে সব চেয়ে বড় অপরাধ। তা, সে-অপরাধী মানুষই হোক আর ঘোড়াই হোক। এ-ন্যায়ের চোখে অপরাধী সবাই সমান। বিশেষত যখন বিদ্রোহ আর বিদ্রোহ। চারিদিকে কেবল বিদ্রোহ।

সুসং থানার চারিদিকের চত্তর জুড়ে সারি সারি তাঁবু উঠল। দেখতে দেখতে রাইফেল ও নানা অস্ত্রে সজ্জিত সশস্ত্র পুলিশের স্পেশাল রেজিমেণ্ট এল। তাঁবুগুলি ঘিরে তাদের নূতন ছাউনি বসল। পুলিশের বড় কর্তারাও এলেন। এইবার শুরু হলো গ্রামে গ্রামে হামলা। রাজদ্রোহীদের তারা সব ধরে নেবেন, কৃষকদের ঘর থেকে ধান ছিনিয়ে নেবেন, দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনবেন।

এদিকে গ্রামে গ্রামে সকল মানুষের দৃঢ় ঐক্যে গড়া প্রতিরোধের দুর্বার সঙ্কল্প। কর্মতৎপরতায় সমস্ত এলাকা চঞ্চল। অনবরত মিটিং-বৈঠক চলেছে। কত প্রশ্ন উঠছে। গভীর আলোচনা হচ্ছে—মীমাংসা হচ্ছে। পরিকল্পনা ঠিক হচ্ছে। গ্রাম রক্ষা ধান রক্ষার প্রশ্নই সব প্রশ্নের মূল প্রশ্ন। যে-যার দায়িত্ব বুঝে নিয়ে কাজে মেতে উঠেছে। প্রতি গ্রামে গ্রামরক্ষী জঙ্গীবাহিনী গঠিত হচ্ছে। প্রতিরোধের নানা কৌশল আয়ত্ত করতে তাদের নিয়মিত মহড়া চলছে। প্রতি গ্রামে রাতদিন পাহারা চলছে।

আদিবাসী এলাকার বাইরে আন্দোলন ও সংগঠন প্রসারিত করে প্রতিরোধের শক্তি বাড়াতে হবে। তাই প্রতি গ্রামের কর্মী বাছাই করে ছড়িয়ে দিতে হবে মুসলমান ও গারো কৃষকদের মধ্যে। শুরু হলো ব্যাপক অভিযান। মুসলমান ও গারো কৃষকরাও সমর্থন জানাল। স্থানে স্থানে সংগঠনও গড়ে উঠল।

কোনো গ্রামের পথে পুলিশ দল এলেই পাহারায় নিযুক্ত গ্রামরক্ষীদের সঙ্কেত-ধ্বনি বেজে ওঠে। গ্রামের লোক সতর্ক হয়ে যায়, পরিকল্পনা মতো যে-যার দায়িত্ব পালন করে। আক্রান্ত গ্রামের সঙ্কেতধ্বনি নিকটবর্তী গ্রামগুলিকে সতর্ক করে। আবার তাদের সঙ্কেতধ্বনি বেজে ওঠে। এমনি ভাবে মুহূর্তে এলাকার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিপদসঙ্কেত পৌঁছে যায়।

কালো কালো পাহাড়গুলির উঁচুনিচু গা বেয়ে লাল ঝাণ্ডার পেছনে সারি সারি মানুষ পিল পিল করে এগিয়ে আসে। তাদের হাতের অস্ত্রগুলি সূর্য-কিরণে চোখ ধাঁধানো ঝিলিক ছড়ায়। গ্রামের চারিদিকের ঝোপজঙ্গলের আড়াল থেকেও দলে দলে মানুষ বেরিয়ে আসে। সম্মুখের মাঠ-প্রান্তরের বুক জুড়ে দেখা যায় লাল ঝাণ্ডার মিছিল। এদিক সেদিক থেকে ছুটে আসা মানুষ, একজনের পিছনে একজন করে অসংখ্য লাইন। মনে হয় প্রতিরোধের জোয়ার যেন বাঁধ ভেঙে উত্তাল তরঙ্গে ধ্বংসের রক্তিম ত্রিশূল ঊর্ধ্বে তুলে চারদিক থেকে এগিয়ে আসছে। তাদের ইনকিলাব জিন্দাবাদ গর্জন পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তুলে শত-সহস্র কণ্ঠে গর্জে ওঠে।

পুলিশ দলের বুক কেঁপে যায়। তারা পালিয়ে যাওয়ার পথ খোঁজে। এমনি করে দিনে দিনে গ্রামে গ্রামে প্রতিরোধ দুর্বার হতে থাকে।

ঘোড়াটিরও মুহূর্ত অবসর নেই। এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে সে ছুটে চলেছে। সারা এলাকায় দ্রুত যোগাযোগের গুরুদায়িত্ব তার উপর। পথে-

ঘাটে পুলিশ দলের আনাগোনা লেগেই থাকে। তাকে ছুটতে হয় কত কৌশলে। আত্মরক্ষা করে।

সেদিন ছিল পুব অঞ্চলে এক জরুরি মিটিং। মধ্য এলাকা থেকে ঘোড়া ছুটেছে, পিঠে সোয়ার। ঠিক সময়টিতে পৌঁছতে হবে। বাঁধা পথ নেই। বনবাদার মাঠ-জঙ্গল পার হয়ে ঘোড়া ছুটছে। মাথার উপর উজ্জ্বল সূর্যের কিরণমালা। বাতাসে হিমেল ফেব্রুয়ারির শীতল ছোঁয়া। একটি ছোট্ট ঝর্ণা পার হয়ে এসে সামনে কিছুটা জায়গা। মানুষের পায়ের চিহ্নে অস্পষ্ট রেখা আঁকা। রেখাটি ক্রমেই ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন কতকগুলি টিলার গা ছুঁয়ে এঁকেবেঁকে বাঁ দিকে সরে গেছে। বাঁ-পাশে দুর্গম উঁচু পাহাড় আর ডান দিকে জল-কাদায় খাল-ডোবায় ভরা জঙলী মাঠ। এ-পথটুকু এড়িয়ে চলার উপায় নেই। অথচ চোখের দৃষ্টি সামনের টিলা-টিপিতে সীমাবদ্ধ। নির্জন শ্বাপদসঙ্কুল এই পথে পথিকের দেখা মেলে কদাচিৎ, চোখ-কানের উপর সমস্ত মনোযোগ টেনে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে সোয়ার চলেছে।

হঠাৎ মানুষের কণ্ঠস্বর ও সমবেত হাসির হিল্লোল। বিপদের নির্ভুল ইঙ্গিত। আর মাত্র কয়েক গজ পথ। টিলাটি ঘুরে পথের বাঁকটি পার হয়ে এলেই একদম মুখোমুখি হবে। অসহায় ভাবে পুলিশের হাতে ধরা পড়ার এক নিশ্চিত আশঙ্কা। ঘোড়ার সোয়ার কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এক মুহূর্ত চিন্তা করার সময় পর্যন্ত নেই। যা কিছু করণীয় তা এই মুহূর্তেই করতে হবে। সোয়ারটির বুকে যেন শত হাতুড়ি পিটনোর বিকট শব্দ, কান দিয়ে আগুনের জলন্ত স্ফুলিঙ্গ ঠিকরে বেরুচ্ছে। মুহূর্তে মনে হলো ঘোড়াটি সঙ্গে থেকেই যত বিপদ হয়েছে। ঘোড়া নিয়ে লুকনোর মতো ঝোপ-জঙ্গল কোথাও চোখে পড়ছে না। ঘোড়ার জন্য আজ ধরা পড়তে হলো। ঘোড়াটি না থাকলে কত সহজে আত্মরক্ষা করা যেত। এক হতবুদ্ধিকর পরিস্থিতি। সে ঘর্মাক্ত হয়ে উঠল।

ঘোড়া কিন্তু থেমে গেছে। তার কান দুটি খাড়া। তড়িৎ গতিতে পিছনে ঘুরে ছুটে কয়েক গজ এগিয়ে গিয়ে এক ঝোপের পিছনে দাঁড়িয়ে পড়েছে। ঝোপটি পথ থেকে সামান্য উপরে, টিলার গায়ে। ছোট্ট ঝোপ, তবু পথ থেকে সহজে চোখে পড়ে না। এতক্ষণে ঘোড়ার সোয়ার সম্বিৎ ফিরে পেল। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে ঝোপের ভিতর বসে রইল। একটু পরেই নিজেদের গল্পে ও হাসিতে মশগুল পুলিশদল পথ দিয়ে চলে গেল। কোনো দিকে তারা তাকালও না। ঘোড়া ও সোয়ার দুই-ই রেহাই পেল।

এমনি ছোট-বড় অসংখ্য ঘটনায় আপন বুদ্ধির কৃতিত্বে ঘোড়াটি আদিবাসী কৃষকদের প্রতিরোধ-সংগ্রামের ভেতর আরো অপরিহার্য। আজ সে সবার অতি প্রিয়।

আদিবাসী কৃষকের প্রতিরোধের সঙ্কল্প এমনিভাবেই তখন এগিয়ে চলেছিল। সেই সময় এক নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে সোমেশ্বরীর তীরে এল পরীক্ষার প্রথম লগ্ন। ত্রিশ জনের একটি সশস্ত্র বাহিনী বহেরাতলী গ্রামে এল। গ্রামের ভিতরে ঢুকে তারা দেখল গ্রাম প্রায় ফাঁকা। নারীপুরুষ প্রায় সবাই তখন ছিল গ্রামের বাইরে। সুযোগ মনে করে পুলিশদল ঘরে ঢুকে যুবতী বধূ সরস্বতীকে চুল ধরে টেনে হিঁচড়ে বের করে এনে দল বেঁধে নিয়ে চলল জঙ্গলের দিকে। বিপন্ন সরস্বতীর প্রাণপণ চীৎকার ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। যে যেখানে ছিল সবাই ছুটে এল। সেই চীৎকারে একদিক থেকে ছুটে এল সুরেন, সঙ্গে তার বাহিনী এবং অন্য দিক থেকে নারীবাহিনী নিয়ে রাসমণি। তারা দুদিক থেকে অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল পশুগুলির উপর। হঠাৎ এমনিভাবে আক্রান্ত হয়ে পুলিশদল প্রথমে হতভম্ব হয়ে গেল। তারপর সরস্বতীকে ছেড়ে দিয়েই গুলি ছুঁড়ল। ততক্ষণে সুরেনের তীক্ষ্ণ বর্শার ফলকে বিদ্ধ হয়ে একটি পুলিশ ধরাশায়ী হয়েছে। রাসমণির হাতের দা-ও লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়নি। ধরাশায়ী পুলিশের সংখ্যা দুটি হলো। সেই মুহূর্তে এক জোড়া বুলেট প্রায় একই সঙ্গে সুরেন ও রাসমণির বক্ষ বিদীর্ণ করে দিলো। তাদের অসাড় দেহ সেইখানেই লুটিয়ে পড়ল। গ্রামবাসী ও জঙ্গী বাহিনী ততক্ষণে ঝোপ-জঙ্গলের আড়ালে স্থান করে নিয়েছে। সেখান থেকে শুরু হয়ে গেছে অবিরাম শিলাবৃষ্টি ও ধনুক থেকে তীরবর্ষণ। সেই সঙ্গে ইনকিলাব জিন্দাবাদ ধ্বনি। মৃত্যুবর্ষী রাইফেলের সঙ্গে আদিবাসী কৃষকের সাধারণ-অস্ত্রের অভূতপূর্ব পাল্লা। জঙলী বাহিনীর বীরত্বপূর্ণ ও সুকৌশলী আক্রমণে অল্পক্ষণের মধ্যেই পুলিশবাহিনী ভীত ও ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। তারা হাতের রাইফেল ফেলে প্রাণভয়ে পালিয়ে গেল।

বীরের মৃত্যু বরণ করে সুরেন ও রাসমণি নারীর ইজ্জৎ রক্ষা করলেন। প্রতিরোধের নূতন শক্তি আদিবাসীদের হাতে তুলে দিয়ে তাঁরা শহীদ হলেন। দুই শহীদের অপূর্ব আত্মত্যাগ ও অমর বীরত্ব, সংগ্রামী আদিবাসীদের অন্তরে এনে দিলো নূতন প্রেরণা, আত্মবিশ্বাস ও শক্তি। আদিবাসী কৃষক রমণীর ইজ্জৎ অসীম গৌরবের অধিকারিণী হলো। অপর দিকে অস্তগামী বৃটিশ রাজের পুলিশ

বাহিনীর অবশিষ্ট মনোবল ধূলিসাৎ হয়ে গেল। গ্রামের পথে পা বাড়ানো তাদের বন্ধ হলো।

সশস্ত্র স্পেশাল পুলিশ বাহিনীর উপর ভরসা ছেড়ে কর্তৃপক্ষ এবার সামরিক বাহিনীর কর্তাদের ডাকলেন। আদিবাসী কৃষকদের আন্দোলনের উপর নূতন আক্রমণের পরিকল্পনা রচিত হলো তাঁদেরই পরামর্শ মতো।

তারপর একদিন স্টেন, গ্রেন ও মেশিন গানে সুসজ্জিত সামরিক কনভয়ের সতর্ক পরিবেষ্টনে যুদ্ধযাত্রা করে ব্যাস্টিন সাহেব লেঙ্গুরা গ্রামে উপস্থিত হলেন। পাহাড়ের শেষ প্রান্তে গণেশ্বরী নদীর পারে, প্রকৃতির এক অপূর্ব পরিবেশের মধ্যে এই গ্রামটি ছিল আদিবাসী আন্দোলনের আদিকেন্দ্র। কৃষক সমিতির প্রধান অফিস এখানে। প্রথমে গ্রামটিকে সশস্ত্র বেষ্টনে ঘিরে ফেলা হলো। এরপর এক সশস্ত্র দল নিয়ে সাহেব মানুষগুলির উপর বীরবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। নির্বিচারে নৃশংস মারপিট চলল। ঘরে ঘরে যথেচ্ছ লুটপাট হলো। অবশেষে সাহেব পেট্রল ঢেলে নিজ হাতে আগুন জ্বেলে দিলেন। সশস্ত্র প্রহরী পরিবেষ্টিত সাহেব সগর্বে দাঁড়িয়ে দেখলেন আগুনের শিখা গরীবের জীর্ণ কুটিরগুলি একে একে পুড়িয়ে ছাই করে দিলো। পৈশাচিক আনন্দে সাহেবের অট্টহাসি বিকট শব্দে ফেটে পড়ল। মিথ্যা শৌর্য আর অন্ধ প্রতিহিংসার সে-অট্টহাসি আটক পড়ে রইল সেই নিভৃত গ্রামের কোণেই। কিন্তু সাহেবের আপন হাতের অগ্নিশিখা তার অজ্ঞাতে শত-সহস্র লেলিহান জিহ্বা মেলে ছড়িয়ে পড়েছিল পরাধীন ভারতের সর্বপ্রান্তে। ভারতে বৃটিশ রাজত্ব পুড়িয়ে ছাই করে তবেই সে-শিখা নিভেছে।

শুরু হলো আদিবাসী কৃষকদের অন্দোলনের উপর অতি নির্মম, অতি বর্বর এক সামরিক আক্রমণ। সমগ্র এলাকার চারিদিকের সীমানা জুড়ে ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার ও আসাম রাইফেল বাহিনীর কয়েক হাজার শক্ত ঘাঁটি তৈরি হলো। গারো পাহাড়ের দক্ষিণ পাদদেশের ১০০ মাইল দীর্ঘ ও ১০ মাইল বিস্তৃত অবরুদ্ধ আদিবাসী অঞ্চলটি বহির্বিশ্ব থেকে সম্পূর্ণ ভাবেই বিচ্ছিন্ন হলো। বর্বর এক বন্দীশিবিরে পরিণত করা হলো অঞ্চলটিকে। লাখ লাখ ইস্তাহার ছড়ানো হলো গ্রামের উপরে এরোপ্লেন থেকে। ব্যাস্টিন সাহেবের স্বাক্ষরিত ইস্তাহার। এইভাবে সাহেব মুসলমান ও গারো কৃষকদের আদিবাসী কৃষকদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার বৃথা চেষ্টা করলেন।

নেতাদের সঙ্গে এবার ঘোড়াটির খোঁজেও শুরু হলো ব্যাপক সামরিক তৎপরতা। ঘোড়াটিকেও সম্পূর্ণভাবে আত্মগোপন করতে হলো।

গ্রামে গ্রামে উন্মত্ত অত্যাচার, নির্মম তাণ্ডবের বন্যা বয়ে গেল। সামরিক বাহিনীর এই বর্বর অভিযানে দিনরাত্রি, সকালসন্ধ্যার কোনো পার্থক্য রইল না। যে-কোনো সময় গ্রামে ঢুকে তারা শুরু করত নির্মম নিপীড়ন, হিংস্র মারপিট ও ব্যাপক লুণ্ঠন। নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধের কোনো বাছবিচার ছিল না। বিবেকহীন এক উন্মত্ত পশুশক্তি সমস্ত আদিবাসীদের ঘিরে ধরে তার প্রতিহিংসার লালসাকে দিনের পর দিন চরিতার্থ করে চলল।

সর্বাত্মক এই সামরিক আক্রমণের মুখে প্রতিরোধের কৌশল পরিবর্তন করা হলো। প্রবল শক্তিশালী শত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে গ্রামে প্রতিরোধ অসম্ভব। সর্বপ্রথম প্রয়োজন প্রতিরোধের শক্তিকে অসহায়ভাবে বিধ্বস্ত হতে না দেওয়া। তই গারো পাহাড়ের ভিতরে অত্যন্ত দুর্গম স্থানগুলিতে কেন্দ্র স্থাপন করা হলো। সেই কেন্দ্রগুলিতে কর্মী ও নির্যাতীত গ্রামবাসীদের রক্ষার ব্যবস্থা সংগঠিত করা হলো।

কিন্তু মুস্কিল ঘোড়াটিকে নিয়ে, তাকে রক্ষা করার উপায় নেই। পাহাড়ের দুর্গম সেই পথে ঘোড়াটিকে ওপরে নিয়ে আসা সম্ভব ছিল না। সামরিক আক্রমণের প্রথম কয়েক দিন ঘোড়াটি গ্রামের কাছাকাছি পাহাড়ের ঝোপ-জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েই আত্মরক্ষা করত। এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামেও তাকে স্থানান্তর করা হয়েছে। কিন্তু কয়েক দিনের ভিতরই সব গ্রামই সমান বিপদসঙ্কুল হয়ে দাঁড়াল। গ্রামবাসীরাও গ্রাম ছেড়ে পাহাড়ের গভীরে আশ্রয় নিলো। শূন্য গ্রামগুলি খাঁ খাঁ করত আর ঘোড়াটি পাগলের মতো পাহাড়ের ধারে জঙ্গলে জঙ্গলে ছোটাছুটি করত। সামরিক অভিযান পাহাড়েও শুরু হলো। ঘোড়াটিকে এই অবস্থায় রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে পড়ল।

তখন একে পাঠানো হলো এলাকার বাইরে। কিন্তু নিকটবর্তী কোনো গ্রামেও একে রাখা গেল না। এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে ঘুরে ঘুরে অবশেষে ঘোড়াটি আসামের এক সুদূর প্রান্তে গিয়ে পৌঁছল।

সম্পূর্ণ অজ্ঞাত গ্রাম, অপরিচিত পরিবেশ। আশ্রয়দাতা ছিল হাটুয়া ব্যবসায়ী। আশ্রয়দাতার কাছে ঘোড়াটির পরিচয় মাত্র একটিই ছিল—মালিকহীন ভারবাহী একটি জীব। আশ্রয়দাতার ভারী ভারী মালগুলি ঘোড়াটির পিঠে স্থান লাভ করল। প্রায় প্রতিদিনই তাকে ভারবহন করে দূরবর্তী হাটে হাটে

যেতে হতো। অনভ্যস্ত কঠোর পরিশ্রম। প্রয়োজনীয় খাদ্য ও যত্নের অভাব। সর্বোপরি এমন এক পরিবেশ—যেখানে সংগ্রামী সঙ্গীরা কেউ নেই, একটি দরদী স্পর্শ পর্যন্ত নেই। এই অবস্থায় কঠোর পরিশ্রম ঘোড়াটি বেশি দিন সহ্য করতে পারল না। নানা কঠিন রোগে সে আক্রান্ত হলো। তবু ভারী ভারী সেই সব মাল বহন করে দূরবর্তী পথে চলার কাজে তার ছুটি মেলেনি। নির্মম চাবুকের তাড়নায় তাকে চলতেই হয়েছে।

তারপর একদিন পঙ্গু দেহ নিয়ে পথের ধূলিতেই সে লুটিয়ে পড়ল। শত তাড়নাতেও সে আর চলার শক্তি ফিরে পেল না। অল্পদিনের মধ্যেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে ঘোড়াটি চিরদিনের মতো পরিত্রাণ লাভ করল।

এমনিভাবে সংগ্রামী সাথীদের থেকে বিচ্ছিন্ন এক সুদূর পল্লীতে সহানুভূতিহীন পরিবেশের মধ্যে সীমাহীন যন্ত্রণা নিয়ে একটি রাজদ্রোহী জীবনের সমাপ্তি ঘটেছে।

জানি না শহীদের গৌরবের সামান্যতম কোনো অংশ এই ঘোড়াটির প্রাপ্য হবে কি না!

'তিতুমীর নগর' (বারাসত)-এ সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সারা ভারত কৃষক সম্মেলন উপলক্ষে পুরনো দিনের এই স্মৃতিচারণটি প্রকাশ করা হলো। —সম্পাদক, পরিচয়

তোমার নাম মনে পড়লে

ধনঞ্জয় দাশ

তোমার নাম মনে পড়লেই
আমার চোখের সামনে
জ্বলতে থাকে
স্বপ্নের পৃথিবী।
তোমার নাম মনে পড়লেই
আমি শুনতে পাই
শৃঙ্খল-মুক্ত ভালোবাসার গান।
তোমার নাম মনে পড়লেই
আমি স্পষ্ট দেখতে পাই
রাত্রির আকাশজোড়া সূর্যের বল্লম
ক্রমশই ছিঁড়ে আনছে অনিবার্য দিন।

কমরেড লেনিন,
আমি কবি, এই বাঙলাদেশে বসে
তাই আত্মজিজ্ঞাসায় ভাবি ঃ
এ-প্রজন্ম কবে শুধবে তোমার সেই ঋণ,
কবে আমাদের রক্তে বাজবে
ধ্বনি-প্রতিধ্বনি ঃ লেনিন····লেনিন!

নিবেদিতা

শান্তিকুমার ঘোষ

প্রকৃতি কি শক্তি ধরে ....
নৌবহর টেনে আনে,
নিরাপদ রাখে কি বন্দরে ;
কিম্বা ডুবো পাহাড়ে সহসা
আছড়িয়ে ভাঙে ?
.... সব তুচ্ছ ক'রে
আলোকস্তম্ভের মতো নারী
নিজের যৌবন থেকে
অগ্নি জেলে নিয়ে
দাঁড়িয়ে দিশারী।

উন্মুক্ত পদ্মার তট
এই বুঝি সূর্যোদয়ে রাঙে—
কে আগে চলেছে গৌরী দীঘল গড়ন,
পিছে পিছে যত গ্রামজন ;
— জেগেছে সহস্র প্রাণ যেন মন্ত্রবলে ঃ
কবি সঙ্গে চলে।

ছুটির পর

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত

কলকোলাহলময় নগরীর হাত থেকে আমি
শুকনো কাগজ, বাসি ফুলফল, টুকিটাকি শিল্প ও প্রগতি
কিনেছি দু-মাস। এই দু-মাসের রাহা খরচের
হিসেবনিকেশগুলি মোটামুটি বিশ্বাসজনক,
তবু লাভালাভ জেনে নিতে যখনই আমার মহাজন
আড়চোখে তাকায়, আমি সদুত্তর ভুলে যাই।
আলো ও রঙমশাল প্রভৃত খরচ ক'রে মানুষের মুখ ও বুকের
যেটুকু সংবাদ এই দু-মাসের উত্তাল শহরে অধিগত,
যে-পণ্য ফুটপাতে, ভরা ট্রেনের কামরায়, কিংবা সম্ভ্রস্ত বিকেলে
নিসর্গপ্রতিম, তাকে ব্যাগে পুরে বিদেশ ভ্রমণে যেতে
কে না ভালোবাসে! কিন্তু আমার ভ্রমণ
রাহা খরচের মধ্যে বেসামাল, ধারদেনা শুধু যায় বেড়ে।

আমি মফঃস্বলী ব'লে আমাকে ভিড়ের মধ্যে থামতে হয়,
ভুল হয় ঠিকানা ও যোগাযোগ, চেনামুখ, অচেনা লোকজন।
পোস্টাপিশে বত্রিশ মিনিট কিউ দিয়ে দাঁড়িয়েও
যখন জানতে হয়—"রং নাম্বার!"
যখন মাইক্রোফোনে দু-রকম গলা, আর হরেকরকম বিবৃতির মাঝে
আমি প'ড়ে যাই একলা, তখন পথের দিশা দিতে পারে
এ-রকম একজনও কি নেই আর; বহু রিসিভার শুঁকে দেখি।

তোমার নিশান আমি চিনে গেছি, কিন্তু তুমি আমার নিশান
কেন বুঝে ছাখোনাকো; জানো তো রেলওয়ে আজো সবুজ ও লাল
যেমন প্রয়োগ করে, তার কোনো দ্ব্যর্থ নেই আর।

আমি হাত তুলে তোমাকে থামতে বলি, তুমি সে-ইঙ্গিত
ধূলিসাৎ ক'রে দিয়ে যাও, কিংবা তুমি যে-ভাষায়
আমাকে যোগ দিতে বলো তোমার মিছিলে
তখন আমার সামনে ট্রাফিকের দুরন্ত হামলা,
আমি রাস্তা খুঁজে পেতে না-পেতেই ততোক্ষণে তোমরা উধাও!
আমি যাকে থামতে বলেছি, সে থামেনি; আমি যার
পাশাপাশি চলবার চেষ্টায় ঘুরে যাই মোড়,
সে-তখন কেবলই পিছিয়ে যায়।
তার নিশানের সঙ্গে আমার নিশান
কেবলই বিচ্ছিন্ন হয়; তবু ঠিক—মাইক্রোফোনে দু-রকম গলা
অন্তত দশরকম পরস্পর-বিরুদ্ধ বিবৃতি
নগরীর দেওয়ালে-দেওয়ালে প্রতিহত হয়ে ফেরে প্রতিদিন।

•

আমাকে থামতে হয়, থেমে থেমে, ভেবেচিন্তে খানিকটা একাই চলতে হয়;
কোথায় কতোটা জল, কী রকম আলো ও আগুন
আজ এ-শহর ঘিরে আছে, বুঝে নিই। কোথায় মাকড়শা,
ইঁদুর ও কুকুরের উপদ্রব—তাও হয় জানা।
তবু এভিন্যুয়ে আলো ঢের, বাতাসও এখনি উষ্ণ, কাগজে-কাগজে
যতো লেখালেখি, তার অনেকটা অংশই আজো পরস্পরের
কমিউনিকেশন থেকে দূরে, যে-রকম দূর নিয়ে
ফিরতে হয়েছে আজ আমাকেও,
নগরীর থেকে এই কঠিন পাহাড়ে।
আমার ছুটির মাসদুটি তবু ব্যর্থ নয়, অন্তত এখনি
ট্রাফিক সিগনাল ভুলে বলা যায়,
মুখোশ সরিয়ে আজ মুখগুলি ভ'রে তোলে আমার ক্যানভাস,
ফোনে ও মাইক্রোফোনে এখন নতুনতর যোগাযোগ
গ'ড়ে নিতে ব্যস্ত আমি; শুধু আর শুকনো কাগজে
সুখ নেই, কী শহরে কিবা মফঃস্বলে।

আমি

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

তোমার কথা ভেবে আমি দুঃখ পাই
যেমন তুমি পাও আমার কথা ভেবে
কী দুঃসময়েই না আমরা জন্মেছি
যেন ইহুদি ক্রীতদাস জন্মসূত্রে অর্জন করেছি
মিশ্রীয় প্রভুদের ঘৃণা আর চাবুক
মিশর, আমার বন্দীশিবির আমাদের বধ্যভূমি
তুমি তো জন্মভূমিও
তবে কেন কেন এই উদাসীনতা
কেন ধরিত্রী দুভাগ হবে না রামেশিষ ! তোর পায়ের তলা থেকে
কেন পশ্চিমা বায়ু বহন ক'রে আনবে না
লক্ষ লক্ষ মৃত্যুবাহী পঙ্গপাল

তোমার কথা ভেবে আমি দুঃখ পাই
উদ্বাস্ত জোয়াল কাঁধে বলদ
মুষড়ে যেতে যেতেও পাথর ভাঙে
আদিতে ছিল যে শব্দ
তার শূন্য জরায়ুতে বপন করো দেবদূতের ভ্রূণবীজ
মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেও পাখা ঝাপটাও প্রাণপণে
'নীলিমা' 'নীলিমা' ব'লে চীৎকার করে নীরক্ত চোখের মণি
অথচ সময় এখন বিলকুল বদলে গেছে

আমার কথা ভেবে তুমিও দুঃখ পাও
আমি
আয়নার সামনে মুখ তুলতে পারি না—
চোখের কোটরে জ্বল জ্বল করছে ক্ষুধার্ত সাপ

দাঁতে ফুটন্ত বিষের থলি
কোষে কোষে প্রতিহিংসা
এতো পাপ নিয়ে তোমার কাছে দাঁড়াই কি ক'রে

মরতে মরতে বেঁচে আছি
সে-কোন দেশের রাজা তুমি পরিত্রাতা
কোন মরুভূমি পার হয়ে এলে
কোন অলৌকিক ক্ষমতা তোমার যাদুদণ্ডে সঞ্চিত
মরতে মরতে বেঁচে-থাকা মানুষগুলো
তোমার কথাই ভাবছিলাম।

দুহাত তুলে বৃষ্টি নামাও
আর দুভাগ করো সমুদ্র
আর ইহুদীদের পরপারে পৌঁছে দাও
আর ফেরৌন ভেসে যাক অতল অনস্তিত্বে
আর আমি বরণ ক'রে নিলাম মৃত্যুদণ্ড

আমার জন্য দুঃখ ক'রো না

মরুবিজয়ের আগে

শিবেন চট্টোপাধ্যায়

সিঁড়িতেও জলস্রোত
তুমি কিন্তু ভাবোনি কখনো
গরাদ বাঁকানো হাত
রাজপথ ছাড়িয়ে কখন
সীতা উদ্ধারের ব্রতে
নেমে পড়বে কঠিন মাটিতে।

আজ সেই রথযাত্রা
জনারণ্যে
উচ্চকিত শব্দের মৈনাক,
মরুবিজয়ের আগে
চাকার ঘর্ঘর শুনে
থমকে দাঁড়িয়ে দেখি
ছুটে যায় ক্রুদ্ধ বলরাম।

সমস্ত ব-দ্বীপ খাড়ি এইমাত্র ভেঙে গেছে
কালভৈরবের পদপাতে
গরাদ বাঁকানো হাতে
লাঙলের সুকঠিন ফাল
ডুবে গেলে মাটির জঠরে
সিঁড়িতেও জলস্রোত
ভয়ঙ্কর তীব্র হয়ে ওঠে।

বেশ কিছুকাল যাবৎ

তুলসী মুখোপাধ্যায়

বেশ কিছুকাল যাবৎ লক্ষ্য করছি
আমি এবং প্রধানত আমিই
পৃথিবীর যাবতীয় নাশকতামূলক কাজকারবার চালিয়ে যাচ্ছি
সূর্যের মে-পিঠে যখন ছায়া
আমি তখুনি দপ্ করে উঠি সেখানেই
কখনো হয়তো বেবীফুডে মিশিয়ে দিচ্ছি ঘাসের বীচি
কখনো বা কর্ডনিং ভেঙে চাল পাচার করছি কালো গুদামে
আবার কখনো গুণ্ডা সেজে হামলা করছি রাজপথে
কখনো বা নিক্সন হয়ে বোমা ফেলছি ভিয়েতনামে
অর্থাৎ পৃথিবীর তাবৎ নাশকতামূলক কাজকারবার
আমি এবং প্রধানত আমিই করে যাচ্ছি প্রবল প্রতাপে
আইন-আদালতের পুরো পৃষ্ঠায় রোজই আমার ঘাতকমুখ।

ক্রমে আমি দেখতে পাচ্ছি
আমার নিশ্বাসে নীল হয়ে ঢুলে পড়ছে শিশু
আমার স্পর্শে গাছের বাকলে লাগছে ঘুণ
আমার লালা লেগে নোনা হচ্ছে শস্যের সাহস
অথচ কয়েক লক্ষ ফাঁসির রায় বিলি করেও
আমাকে ফাঁসিকাঠে ঝোলানো গেল না
আমাকে ফাঁসিকাঠে ঝোলানো গেল না!

বেশ কিছুকাল যাবৎ লক্ষ্য করছি
আমি এবং প্রধানত আমিই
পৃথিবীর যাবতীয় নাশকতামূলক কাজকারবার চালিয়ে যাচ্ছি।

হৃদয় কথাটি

সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

হৃদয় কথাটি কানের পর্দা ছুঁয়ে গেলে
জীবনের শেষ সম্বল
হাতের কড়ি যেন টুপ ক'রে
খসে পড়ে অথৈ জলের বুকে
শূন্য হাতে ভিখারী কাঁদে
কোথায় ? কোথায় ?

হৃদয় কথাটি কানের পর্দা ছুঁয়ে গেলে
হা-ভাত হা-অন্ন আকাল সংসারে
মমতায় ফুলের পসারী নাকাল
স্নেহের পুতলি নাচে মায়ের কোলে
দামাল ছেলে যেন
খাঁজ-খোলা পাখির হদিস নিতে
ইতি উতি ধায়।

হৃদয় কথাটি কানের পর্দা ছুঁয়ে গেলে
হুস করে কখন যায় উড়ে
হটর হটর মন পবনের না
কোন দরিয়ায় বৈঠা যায়
কেউ তা জানে না।

কিছু বলাবেই

তরুণ সেন

কারা যেন দেয়ালগুলোর মুখে সারারাত কারুকাজ সেরে যায়

লাল, নীল, কালো
হরেক রঙের কাজ
কিছু বুঝি কিছুটা বুঝি না।

আমার উৎসাহ নেই কে-কখন কোন পটুয়ার তারিফে চীৎকার করছে

দেখে যাচ্ছি রোজ একটা ভিখমাঙা দিন
চুপি চপি ওখানে এসেই ফাঁসি যাচ্ছে
ভোর না হতেই লাশটা উধাও

তারপর
তদন্তকারী হাওয়া রঙ-চং কারুকাজ কিছুই মানছে না
মূল সাক্ষী দেয়ালগুলোকে হরদম খুঁচিয়ে যাচ্ছে—
কিছু বলাবেই।

চারিদিক জেগে আছে সুরে

মনীষীমোহন রায়

স্বকীয় শ্রমের সব অপার দুর্গতি দেখে
বেছে নেবে, নাও তুমি আত্মরতি
এ-কেমন সকরুণ অসুখ তোমার ?
একথা তো তোমার জানাই ছিল, আছে—
অফুরান হাততালি অঢেল মোহর পায় বাইনাচ
সামন্ত হাতের থেকে অনেক ইনাম।

ওঠো জাগো, দেখো চেয়ে ওই
কট্টর রোদের ফলা মুখের ওপরে পড়ে
কোনাকুনি ত্রিশূলের মতো।
এঁদো পুকুরের মলিন স্তরের মতো স্থবিরতা থেকে
"যাত্রা শুরু, যাত্রা শুরু" ধ্বনি
ওঠে পড়ে ফিরে যায় দারুণ ভীষণ এক
হৃত অভিমানে।
আবেগ লতানো কিছু সুঠাম বুদ্ধির সব
কারুকাজ, ফলা
নিপাট বিরস পাকে ঘেঁলি খায়, ধরাশায়ী হয়....

দেখো চেয়ে, যখন পুকুরময় ঘোর স্থবিরতা
বদ্ধ হাওয়া, শীত
গতির কাঙাল জল নিরুপায় শুয়ে থাকে শোকে
মলিন দামের স্তরে, ক্বচিৎ তখনি এক জলপিপি
ডেকে ওঠে সুরে।
চারিদিকে বেজে ওঠে "যাত্রা শুরু যাত্রা শুরু" ধ্বনি
কেন তুমি সকরুণ দারুন ঘূর্ণির পাকে
ঘোরাও নিজেকে
ছড়াও ছিটোও কালি স্নায়ুতে শোণিতে?
শানাও নিজেকে তুমি, হাতে নাও কট্টর রোদের ফলা
শানিত কৃপাণ
দেখো চেয়ে মলিন দামের স্তরে গতির আগুন জ্বেলে
পায়ে পায়ে সপাটে এগিয়ে চলে জলপিপি....
চারিদিক শানিত সজ্জিত হয়ে জেগে আছে সুরে।

নীলকণ্ঠ পাখির পালক

অমিয় ধর

হৈচৈ
চড়কের মাঠ থেকে ফিরে আসি, বাঁয়ে ফেলে রথতলা
ছায়ারৌদ্র ঝিলিমিলি পরণ-দীঘির ঘাটে।
সর্ সর্ শব্দে রোদ
ঝি-কি-মিকি
নেশাধরা সোঁদাগন্ধে বাঁশবন
ঢাউস চোখের দৃষ্টি মেলে দিই
হলুদ রোদ্দুর মাখা বাবলায়—
কার যেন পথ চেয়ে গোঁসাইতলির বাঁকে :
জলের শরীর ছুঁয়ে
অবুঝ কাঁকন বাজে—
কি করুণ বিকেলের পড়ন্ত রোদ্দুর
মনে পড়ে কার কথা।
চিক্কন সবুজ বুকে
ঢেউ রেখে,
আজো যেন বলে যায়
এই দেখো হাতে আছে
নীলকণ্ঠ পাখির পালক ঃ
ছোঁও দেখি,
ছোঁও দেখি,
ছোঁও দেখি!

গণিতের থেকে মুক্তি দাও

সত্য সেন

মৃত্যু চুমু খেতে চায় জীবনের ঠোঁটে ঠোঁট রেখে।
গলায় পরাতে চায়, অঙ্গারের
উজ্জ্বল জ্বলন্ত মালা। ভালোবেসে।
এ-প্রেমের পরিণতি 'আমি'রা প্রত্যেকে জানি।

অতএব অব্যক্তই থাক।

জানি তাই চরিত্রকে সুরক্ষিত রেখে
ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করি এই প্রেম স্বৈরিণীর।
অসহায় অনুচ্চার ভীতি।
তাকে ঘিরে
ঘৃণাটাই যদিও সোচ্চার।

তবু তাও অব্যক্তই থাক।

এ-সুর বড়ই কাঁপা। তবু,
রাগিনীর এই রূপ।
এই সুরই অভিপ্রেত জীবনের গানে।
গৌরবেই গণ্ডীবদ্ধ হয়ে থাক
এ-অসহায়তা। ততদিন,
যতদিন মানুষের হাতে
স্বৈরিণীর চরিত্রটা শোধন-সাপেক্ষে।

এ-অসহায়তা।
হয়তোবা এটাকেই ফ্রাস্ট্রেশন বলে।
স্বল্পবুদ্ধি। আমিই বুঝিনি এতদিন।
আধুনিক সাহিত্য ও শিল্পের মাধ্যমে
তাই, আমিও বিপ্লবী।

ফ্রাস্ট্রেশন বুনো ওল যদি
আমিও পেয়েছি বাঘা তেঁতুলের স্বাদ।
পেয়ে গেছি শিল্পসাহিত্যের
অধুনা ভাণ্ডারে :

যৌনতা। চরিত্রহীনতা।

চলার ছন্দে নেই বালখিল্য কোনও ভীতি
উচ্চগ্রামে সুর বাঁধা।
জীবনের জয়গান গেয়ে
এসে দাঁড়িয়েছি হাড়-কাটা গলির মোড়েতে। মুখে পান।
পানের বোঁটার চুন ঘসছিলাম জিভে।
পা-জুটোও ঘসছি তখনও।

সমুখেই হাড়-কাটা গলির বিবর।

এগিয়ে আসছে এক বরযাত্রার মিছিল।
যে-মিছিলে প্রত্যেকেই বর।

প্রতি ওষ্ঠে ওষ্ঠে যার চুম্বনের উলঙ্গ চ্যালেঞ্জ।

আমিও তো অনুরূপ বরযাত্রার যাত্রিক। অথচ :
"বহু বচন"-এর আমি চলে গেল আমাকেই ফেলে।

গোধূলির রক্তাক্ত আলোয়
প্রত্যেকেই যেন ওরা সূর্য-সহচর।

বন্যার বন্ধনমুখ উৎসারিত যেন।
গণিতের মুখে লাথি মেরে
এগিয়ে আসছে ছুটে অগণিত সূর্যের সারথী।
সমুখে দাঁড়িয়ে সেই মৃত্যুনাম্নী-স্বৈরিণী রমণী।
চুমু খেতে চান যিনি জীবনের ঠোঁটে ঠোঁট রেখে।

গলায় পরাতে চান, অঙ্গারের
উজ্জ্বল জ্বলন্ত মালা। ভালোবেসে।
কন্যাপক্ষ কন্যারই আড়ালে হাতে রাইফেল।

জীবন-মৃত্যুতে মুখোমুখি।
আরও
আরও আশ্লেষ সান্নিধ্য। বন্ধন আশ্লেষ।
চুম্বনের সশব্দ প্রত্যয়ে গোধূলির প্রায়ান্ধকার উচ্চকিত।
আলোকিত পুণঃ পুণঃ বিস্ফার আলোকে।
বরযাত্রী অনেকেরই গলায় দুলছে, অঙ্গারের
উজ্জ্বল জ্বলন্ত মালা।
মিছিলের দুর্বিনীত নিষ্ঠুর কামনা ঃ
আরও মালা চাই অগণিত।
দিতে চাই
নিতে চাই
অজস্র চুম্বন।

মৃত্যুর "চুম্বন-সাধ"
আপাদ-মস্তক ওরা
ঢেকে দিতে চায় যেন চুম্বন-কফিনে।

মুগ্ধ।
বিমুগ্ধ আমি।
জীবনের এ-অপার দুঃশ্চরিত্রতায়।
দর্শকের ভূমিকায় সাত্ত্বিক-চরিত্র পিতা
সেও দেখি, আশিস ঝরায়
সন্তানের এ-চরিত্র-হননে।

শেষ দৃশ্যে চেয়ে দেখি ঃ সূর্যকে পিছনে রেখে
প্রাণভয়ে ধাবমানা পর্যুদস্তা, বিবস্ত্রা স্বৈরিণী।
তার পিছে ধেয়ে চলে মহামানবতার মিছিল।
পায়ে বাঁধা গতিশক্তি যার
মহা-পার-মানবিক।

"হে মহান অগণিত"
আমার প্রার্থনা রাখো ঃ
গণিতের থেকে মুক্তি দাও।

মস্কোয় একটি
বিতর্কমূলক আলোচনা-সভার
বিবরণ

ছোটগল্প-বিষয়ক ভাবনা

ছোটগল্পের সামাজিক পট উক্ত শিল্প-রীতির সফল বিকাশের একমাত্র ভিত্তিভূমি—এই মতটি সোভিয়েত ছোটগল্প-বিষয়ে এক আলোচনা-সভায় সম্প্রতি সর্বসম্মত বলে গ্রাহ্য হয়। সভাটি ছিল মস্কোর **'সাহিত্য-বিষয়ক সমস্যা'** নামের পত্রিকার দ্বারা পরিচালিত নিয়মিত গোলটেবিল বৈঠকের অন্যতম।

গোলটেবিল আলোচনা-বৈঠকে যোগদানকারীরা এ-বিষয়ে একমত হন যে অন্য যে-কোনো শিল্প-মাধ্যমের মতো ছোটগল্পও জীবনের অনুসারী এবং জীবনেরই প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তনশীল। কয়েকজন আলোচক ছোটগল্পের বর্তমান অবস্থা ও তার প্রধান লক্ষণগুলি বিশ্লেষণ করেন। তাঁরা দেখান, কয়েক বছর আগের লেখা থেকেও সাম্প্রতিক সোভিয়েত ছোটগল্পের ধরনধারণ স্বতন্ত্র, বিশিষ্ট। আলোচকরা বর্তমান ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করে তাদের ক্রমবিকাশের সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং গল্পে প্লটের গুরুত্বের উপর জোর দেন। 'প্রামাণ্য তথ্য-সংবলিত' ও 'স্বীকারোক্তি-মূলক' সাহিত্যের সংজ্ঞা দুটি নিয়েও প্রচুর বিতর্ক জমে ওঠে। ছোটগল্পের রচনাশৈলী ও তার নবতন প্রকাশরীতি বিষয়ে পরস্পর-বিরোধী মতামত ব্যক্ত হয়।

বৈঠকে যোগদানকারী লেখক-আলোচকরা তাঁদের যে-লিখিত বক্তব্য সভায় পেশ করেন, নিচে সংক্ষেপে তা বিবৃত হচ্ছে।

প্রথমে **নিকোলাই আতারোফ** তাঁর 'উদ্দেশ্য-চেতনা' নামের নিবন্ধে লেখক হিসেবে নিজের তরুণ বয়সের কথা স্মরণ করেন। সেকালে "পুনর্গঠনের কর্মে রত জনগণের মধ্যে লীন হয়ে যাওয়া"-ই কর্তব্য বলে লেখকদের মনে হয়েছিল, বিবেচিত হয়েছিল—নতুন জীবন-গঠনের কর্মে লিপ্ত শ্রমজীবী মানুষের কথা সাহিত্যের উপজীব্য হওয়া উচিত। গল্পে চরিত্র-নির্বাচন ও তার পরিণতির পথনির্দেশেই একমাত্র ব্যক্তিগত অভিরুচির ব্যাপারটি নিহিত ছিল। তবে একান্ত নিজস্ব অভিজ্ঞতা বস্তুটি ছিল সর্বথা পরিত্যাজ্য। তিরিশ দশকের লেখকরা "তাঁদের সমকাল" সম্বন্ধে লিখতেই অভ্যস্ত ছিলেন আর ফাঁকে ফাঁকে নেহাতই আকস্মিকভাবে "নিজের" কথা লিখতেন। তবে এর মধ্যে জবরদস্তির

ব্যাপার ছিল না। পারিপার্শ্বিক জগতে বাইবেল-কথিত ঘটনাসদৃশ বিরাট সব পরিবর্তন সংঘটিত হচ্ছিল, জন্ম নিচ্ছিল নতুন ধরনের মানুষ। তাই এই দৃষ্টিভঙ্গি সেদিন স্বাভাবিক ছিল।

এরপর বক্তা যুদ্ধ-পরবর্তী যুগের লেখকদের সম্পর্কে আলোচনা করলেন। যুদ্ধের সময় এবং বিশেষ করে যুদ্ধের পরের বছরগুলিতে পৃথিবী থেকে যখন আপাত-শৃঙ্খলার ভাবটি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল তখন তরুণ লেখকরা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিশাল ভাণ্ডার উন্মোচিত করে তাঁদের নিজেদের মধ্যেই প্রধানত জীবনের উপাদান সংগ্রহে ব্যাপৃত হন। ফলে, অন্তত কিছুকালের জন্যেও আত্মমুখ কাব্যিক গদ্যের প্রচলন ঘটল। তবে যুদ্ধপূর্ব বছরগুলির মতো তখনও শ্রেষ্ঠ বর্ণনাত্মক রচনাই শেষপর্যন্ত মহাকালের গলার মালায় স্থান পেল। আতারোফ তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন চেখভের উদ্ধৃতি দিয়ে "সবসেরা লিখিয়ে হলেন তাঁরাই, যাঁরা বাস্তববাদী, যাঁরা জীবনকে যেমনটি দেখেন তেমনটিই আঁকেন। তবে, যেহেতু এঁদের লেখার প্রতিটি ছত্র বুকে বহতা রসধারার মতো একটি বিশেষ উদ্দেশ্যবোধে অভিষিক্ত, পাঠক সেইহেতু তা থেকে শুধু যে জীবনের হুবহু স্বাদটুকু লাভ করেন তাই নয়, জীবনের পক্ষে যা হওয়া উচিত তাও অনুভব করেন এবং করে মুগ্ধ হন।"

ইউরি ত্রিফোনোফ তাঁর আলোচনা-প্রবন্ধের নামকরণ করেন 'প্রোসাস-এর যুগে প্রত্যাবর্তন'। রচনায় কারুকৃতির সমস্যা, বিশেষ করে এ-যুগের গদ্যের নির্দিষ্ট লক্ষণ ও প্লটের সমস্যা নিয়ে তিনি আলোচনা করলেন।

তিনি বললেন, কোনো বিশেষ শিল্প-শরীরের সঠিক সীমারেখা নির্ধারণ কঠিন কাজ, উপন্যাস ও ছোটগল্পের মধ্যে একমাত্র দৈর্ঘ্য ছাড়া যেমন অপর কোনো মৌল পার্থক্য নির্দেশ করা কষ্টকর। চেখভের ছোটগল্পগুলি আসলে "চেখভের শিল্পের প্রচণ্ড 'শক্তির চাপে' পিষ্ট উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত, সঙ্কুচিত রূপমাত্র।" অপরপক্ষে দস্তোইয়েভস্কির **'পাপ ও শাস্তি'র** মতো উপন্যাস—যেখানে একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে সমগ্র কর্মকাণ্ড আবর্তিত এবং সমস্ত ঘটনা মাত্র এক বা একাধিক দিনে সংঘটিত—সে-ক্ষেত্রে তাকে গভীরতর, অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত ছোটগল্প ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। আসল বিবেচ্য বিষয় হল, অন্তর্নিহিত গতি। এই গতির পূর্ণতা থাকলে জাঁদরেল এপিক উপন্যাস ও পাঁচ পৃষ্ঠার ছোটগল্পও তুল্যমূল্য।

এই মৌল দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ত্রিফোনোফ গদ্য-সাহিত্যের বিকাশ সম্বন্ধে

সাধারণভাবে আলোচনা করলেন। কয়েক শতাব্দীর অস্তিত্বের ফলে গদ্য-সাহিত্যের নিজস্ব আইনকানুন, আদর্শ ও রচনারীতির উদ্ভব ঘটেছে। আবার এও স্মরণীয় যে গদ্য বা ইংরেজিতে যাকে 'প্রোজ' বলা হয়, সেই পরিভাষাটি লাতিন ভাষার বিশেষণ শব্দ 'প্রোসাস' থেকে উদ্ভূত। আর এই 'প্রোসাস' শব্দটির অর্থ ঃ মুক্ত, অকপট ও অদম্য।

বক্তা তাঁর নিজ অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে গল্পে প্লটের কার্যকারিতা সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করে প্লটের চরম আত্মমুখ-ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করলেন। তাঁর মতে আসল ব্যাপার হলো, এক মুহূর্তের জন্যেও লেখককে গল্পে প্রতিফলিত জীবনের সার সত্যকে ভুললে চলবে না। আর তাহলে ওই সত্যই প্লটের উন্মোচনে সহায়ক হবে।

ইউরি ত্রিফোনোফও পরিশেষে চেখভের শরণ নিলেন। সহজ বিষয় সহজ করে লেখা সম্পর্কে সাহিত্যাচার্যের মন্তব্যটির উদ্ধৃতি দিয়ে বললেন, প্লট-বিষয়ে সমস্ত সমস্যার সমাধান ওই উক্তিটিতে নিহিত।

প্লট সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব বক্তব্য উপস্থাপিত করার পর শেষকালে ত্রিফোনোফ বললেন "প্লট-বিষয়ে আমি এতাবৎ যে-মত এখানে ব্যক্ত করলুম, তা সবই যে-সাহিত্য পৃথিবী আবিষ্কারের অভিযাত্রী সেই সাহিত্য সম্পর্কিত। কিন্তু এছাড়া আরও একপ্রকার সাহিত্য আছে যা জগৎ সৃষ্টি করে, যা বাস্তব পৃথিবীকে রূপকথার জগতে পরিণত করে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে প্লট হয়ে ওঠে প্রচণ্ড, সময়ে সময়ে অলৌকিক, শক্তি-সম্ভব। গোগোল আর এডগার অ্যালান পো-র ছোটগল্প আর দস্তোইয়েভস্কির উপন্যাস এমন সব প্লটের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে যাতে প্রতিভাবানের জাদুর ছোঁওয়া লেগেছে।"

লেখক **ইউরি কুরানোফের** আলোচনা-নিবন্ধের নাম 'প্লট ছাড়া ছোটগল্প নামে বস্তু নেই'। ছোটগল্পের শিল্পশরীরের গুরুত্ব ও তার বর্তমান সাফল্যের দিকনির্ণয় এবং সাম্প্রতিক ছোটগল্পে প্লট-সম্পর্কিত ধারণার বিবর্তনের রূপরেখা নির্দেশ ছিল এঁর প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

আধুনিক সোভিয়েত ছোটগল্পে শিল্পগত গুণের লক্ষণীয় ক্রমোন্নতির উপর জোর দিলেন কুরানোফ। তিনি দেখালেন, গল্পে ঘটনাবর্ণনকে যোগ্যতার সঙ্গে গেঁথে তোলা, ঠিক ঠিক সুরটি বাজানো, যথাযথ শব্দপ্রয়োগ, ইত্যাদি এ-যুগের ওস্তাদ ছোটগল্প লিখিয়েদের ক্ষেত্রে একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। শ্রেষ্ঠ সোভিয়েত ছোটগল্পের আবেদন তাদের মানবধর্ম এবং পরিপার্শ্ব আর জগৎ সম্পর্কে ও তার

পরিবর্তনের রঙ-বদল বিষয়ে গুরুতর অভিনিবেশে নিহিত। বহু বিভিন্ন ঘটনাবলীর মধ্যে বিচিত্র জটিল পারম্পরিক যোগসূত্রের উদ্‌ঘাটনের কাজে লিপ্ত সোভিয়েত সাহিত্য। আর এই কাজটি সবচেয়ে সুষ্ঠুভাবে সম্ভবত সম্পাদন করছে ছোটগল্প। এর কারণ, ছোটগল্পের শিল্প-শরীর যেমন চনমনে তেমনই সংবেদনশীল এবং এটি সহজে প্রয়োগসাধ্য ও দ্রুত সুফলদানে সমর্থ।

প্লটের কথা বলতে গিয়ে কুরানোফ জানালেন যে প্লট ছাড়া ছোটগল্প বস্তুটির অস্তিত্ব আদপে সম্ভবই নয়। প্লট ছাড়া ছোটগল্পের এই ধারণার উৎস হয়তো এইখানে যে আধুনিক ছোটগল্প এমন প্লট অবলম্বন করতে চায় যা তার বাহ্য অবয়বমাত্র হবে না, হবে অন্তরিন্দ্রিয় সদৃশ। অর্থাৎ, এই প্লট এমন বস্তু যা গল্পের চরিত্রের অন্তরজগৎ ও বহির্বিশ্বের মধ্যে এবং ঘটনাবিশেষের অন্তঃসার ও বাহ্য অবয়বের মধ্যে সেতুবন্ধস্বরূপ হবে ও তাদের পরস্পর-প্রভাবের পথ সুগম করবে। আর এরই ফলে সাম্প্রতিক যুগে গদ্য ও কবিতার প্রকাশভঙ্গির মধ্যে চমৎকার একটি বোঝাপড়ার ভাব গড়ে উঠছে—যার পরিণতিতে আবেগে, প্রাণস্পন্দনে, রূপকের গভীরতায় গদ্য হয়ে উঠেছে আরও সজীব, আরও তর্‌তাজা। আধুনিক ছোটগল্পে তাৎপর্যের ফল্গুপ্রবাহ তাই আজ আরও অর্থবহ, তাই সে আজ ছোটগল্পের নিত্যসঙ্গী।

এড্যুয়ার্দ শিম তাঁর 'আবেগের পারা চড়াই আসল কথা' নামের নিবন্ধে জানালেন যে তাঁর মতে সত্যিকার ছোটগল্প হল প্রধানত "জীবন সম্পর্কে যথাযথ নৈতিক মনোভঙ্গি প্রকাশের অন্যতম বাহন।" এটাই তাঁর কাছে ছোটগল্পের সত্যিকার মূল্য যাচাইয়ের মাপকাঠি। অনেক লেখকই আজকাল গল্প লিখতে গিয়ে যথেষ্ট পারদর্শিতার পরিচয় দেন, অনেকে রীতিমতো ঝলমলে স্টাইলে লিখে থাকেন; কিন্তু কখনও কখনও এই দক্ষতা, এই মসৃণ লাবণ্যই পাঠকের কাছে ক্লান্তিকর হয়ে দাঁড়ায়। পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত গল্পে প্রায়শই যেমন চমৎকার স্টাইলের পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনই পাওয়া যায় শিল্পের যথাযথ আবহাওয়া আর খুঁটিনাটি বিষয়ের নিখুঁত বর্ণনা। তবু সব সত্ত্বেও ফিরে ফিরে আপনার কেমন যেন মনে হবে, সমস্ত ব্যাপারটার উৎস লেখকের "মস্তিষ্ক,' তাঁর 'হৃদয়' নয়। অথচ লেখকের আবেগের উত্তাপ বা "পারা চড়া"টাই তো এক্ষেত্রে আসল কথা। সত্যি বলতে কি, খাঁটি প্রেরণা, স্বাধীনতা আর স্বাভাবিকতা বর্জিত অগভীর ছলাকলা, ফ্যাশন দুরস্ত শব্দ-শিকার আর নিরস

ত্রুটিহীনতায় ভরা "পারানামা" ইষত্রুঞ্চ গল্প পড়তে পড়তে পড়তে বিরক্তি ধরে যাবার যোগাড় হয়েছে।

বক্তৃতার শেষে শিম জানালেন সোভিয়েত লেখক ইউনিয়ন ভবনে 'ছোটগল্পের ক্লাব' প্রতিষ্ঠার কথা। সম্প্রতি গড়ে-ওঠা এই আড্ডায় সুখ্যাত লিখিয়েরাও তাঁদের নতুন লেখা পড়ছেন। তিনি আরও জানালেন, এই ক্লাব শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পের সংগ্রহ সম্পাদনায় বিশেষ আগ্রহী।

লেখক আঁদ্রেই বিতোফ সোভিয়েত ছোটগল্পের সাম্প্রতিক কৃতসঙ্কল্প দীর্ঘ পদক্ষেপের ফলে তার যে অভাবনীয় ব্যাপ্ত শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে সেকথা জানালেন। ছোটগল্পই এখন সবচেয়ে নিখুঁত এবং সুসমঞ্জসভাবে গড়ে ওঠা শিল্প-মাধ্যম। তবু এই শিল্পরীতিটি ইতিমধ্যেই "খাবি খাওয়ার অবস্থা"য় পৌঁছেছে। বক্তা মনে করেন, গদ্যশিল্পের আরও বিকাশ ঘটতে বাধ্য। উৎকৃষ্ট গদ্যলেখকের অবশ্যই ছোটগল্প লেখার পাঠ নেওয়া কর্তব্য। তবে তাঁকে আরও বেশিদূর অগ্রসর হতে হবে।

বিতোফ বললেন, এখন এমন সব কৌতূহলোদ্দীপক ছোটগল্প লেখা হচ্ছে, যেগুলিকে একাধিক শিল্প-মাধ্যমের সীমান্তবর্তী বলা চলে। তাঁর মতে, সোভিয়েত ইউনিয়নেও এই ধরনের 'নতুন রীতি'র বেশকিছু ছোটগল্প দেখা যাচ্ছে, যাতে বিশিষ্ট শিল্প-মাধ্যমের "চৌহদ্দি অস্পষ্ট" হয়ে এসেছে এবং "জীবনের সীমাহীন বিস্তার" পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। এই ধরনের রচনাগুলিকে ছোটগল্প না বলে দীর্ঘতর কোনো রচনার একাধিক অধ্যায় বলাটাই বোধহয় সঙ্গত। গল্প পড়তে পড়তে পাঠকের যেন মনে হয়, ওইসব অধ্যায়ের সংলগ্ন (অনুপস্থিত !) আরো অনেক অধ্যায় আছে। যেন অনুপস্থিত অধ্যায়গুলি অলক্ষ্যে উপস্থিত। এ-ব্যাপারটা কিন্তু ঠিক হেমিংওয়ের অর্থের অন্তঃপ্রবাহ নয়। পূর্বোক্ত গল্পে আছে মুক্ত বাতাসের স্পর্শ, আছে দূরবিসার প্রান্তর আর জীবনের অনুভব।

বিতোফ তাই কোনো একটি বিশেষ শিল্প-মাধ্যমের সমস্যা নিয়ে নয়, সমগ্রভাবে গদ্যের সমস্যাবিষয়েই আলোচনায় অগ্রসর হন। তাঁর মতে 'স্বীকারোক্তি' জাতীয় গদ্যের ভবিষ্যৎ সবচেয়ে উজ্জ্বল। খাঁটি রূপকথার মতো এ-ধরনের রচনাকেও কোনো একটি বিশেষ সাহিত্যরীতির মুঠোয় আঁটানো যায় না। 'স্বীকারোক্তি' -ধরনের লেখা আবার 'রম্যরচনা'র চেয়ে "প্রামাণ্য তথ্য সংবলিত" গদ্যের অপেক্ষাকৃত নিকট জাতের।

পরিশেষে আঁদ্রেই বিতোফ মন্তব্য করলেন, ছোটগল্প শেষপর্যন্ত এমন একটা

সাহিত্যরীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে, যে-রীতিতে লেখক ব্যক্তিগত ও অন্তরঙ্গভাবে কথা বলতে সবচেয়ে অপারগ। তাই লেখক যখন লেখার টেবিলে বসবেন তখন কোন সাহিত্যরীতি তিনি আশ্রয় করবেন তা আগে থেকে ভাবা তাঁর একেবারেই উচিত হবে না। তা যদি ভাবেন তাহলে তিনি সরাসরি সেই রীতির খপপরে পড়ে যাবেন। বরং সেই লেখকের ভাবা উচিত তিনি কোন বিষয়ে লিখবেন এবং কেনই বা লিখবেন। তাহলেই—বলা যায় না—হয়তো দেখা যাবে রচনাটি আচমকা একটি ছোটগল্পের রূপ নিয়েছে।

মায়া গানিনা তাঁর 'অতিরিক্ত শিল্পীপনা না-ফলিয়ে' নামের আলোচনা নিবন্ধের শুরুতেই এডুয়ার্ড শিমের বিরুদ্ধমত ঘোষণা করলেন। শিম বলেছিলেন, গল্পটি যদি সৎ হয় তাহলেই হলো, কিভাবে তা লেখা হয়েছে তাতে কিছু যায়-আসে না। আর গানিনা বললেন, ছোটগল্পের শিল্পরীতি কোন খাতে বইছে, তার লক্ষ্য কী, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কোনদিকে তা মোড় নিচ্ছে, এসব বিষয়ে অনুধাবন এবং পারস্পরিক মত-বিনিময় অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক, অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। লেখিকা অতঃপর 'প্রামাণ্য তথ্যসংবলিত' এবং 'স্বীকারোক্তিমূলক' রচনাপদ্ধতির সমস্যা নিয়ে আলোচনা করলেন। বললেন, দীর্ঘায়ত শিল্পরীতির ক্ষেত্রে 'প্রামাণ্য তথ্য'-মূলক এবং সংক্ষিপ্ত রচনার ক্ষেত্রে 'স্বীকারোক্তি'-জাতীয় পদ্ধতিতে যথাক্রমে ওই দুই শিল্পরীতির ভবিষ্যৎ নিহিত। 'প্রামাণ্য তথ্যসংবলিত' রচনা বলতে গানিনা বোঝাতে চান সেই ধরনের লেখাকে যা যতদূর সম্ভব বাস্তব তথ্যের অনুসারী, যা প্রকৃত ঘটনা ও চরিত্রকেই শিল্পরূপভাত করে, যে-রচনায় স্পষ্ট চোখে পড়ার মতো তৈরি করা কোনো প্লট নেই অথচ আছে লেখকের চিন্তার সততার প্রাচুর্য, এবং ইত্যাদি।

মায়া গানিনা তাঁর আলোচনা শেষও করলেন বিতর্ক দিয়ে। এবং এবার বিতোফের সঙ্গে। বিতোফের কোনো কোনো মতে আপত্তি জানিয়ে তিনি বললেন, ছোটগল্পের শিল্পরীতি কয়েক শতাব্দী ধরে টিঁকে আছে এবং এখনও বহুকাল তা থাকবে, শিল্পমাধ্যমটি প্রয়োগের দিক থেকে সর্বাপেক্ষা কঠিনসাধ্য হওয়া সত্ত্বেও। তিনি আরও বললেন, লেখার টেবিলে বসে লেখক বা লেখিকা কোন শিল্পরীতি অবলম্বন করে লিখবেন তা তাঁকে আগে থেকে সঠিকভাবে জানতে হবে বৈকি।

বোরিস আনাশেনকোফ 'সামাজিক ভিত্তিভূমির উপর' নামে তাঁর আলোচনা-প্রবন্ধে আরও বিতর্কের ঘূর্ণি তুললেন। বললেন, "ভৌগোলিক

জ্ঞান বেশকিছু পরিমাণে" পূর্বতন যুগের লেখকদের মতিগতি "নিয়ন্ত্রিত করেছে"। আজ কিন্তু এক্ষেত্রে মানুষের হৃদয়দেশের ভূগোল পৃথিবীর ভূগোলকে স্থানচ্যুত করেছে। এদিনের ছোটগল্পে বাহ্য ঘটনাবলী গল্পে বর্ণিত চরিত্রকে আর পুরোপুরি অভিভূত করতে সক্ষম নয়, বরং তা নৈতিক কর্তব্যের সমস্তার দিকে, অর্থাৎ তার নিজের দিকেই, চরিত্রটির মনোযোগ তীক্ষ্ণ করে তোলে। তাই মনে হয় একালের ছোটগল্পে বুঝি প্লট নেই। এ-কারণেই ছোটগল্পের "বিশেষ" রীতি অর্থাৎ বুদ্ধিপ্রধান ও 'স্বীকারোক্তিমূলক' চরিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠছে। আর তাই প্রচলিত অর্থে যাকে প্লট বলা হয় তাই হয়ে পড়ছে গৌণ, প্রধান হয়ে দাঁড়াচ্ছে নৈতিক ও সামাজিক যোগসূত্র, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, গল্পে বর্ণিত চরিত্রের আন্তর গতি। অর্থাৎ, প্লটের মৃত্যু হয়েছে, প্লট দীর্ঘজীবী হোক!

'গল্পরচনার পাঠশালা' নামের আলোচনা-নিবন্ধে **ভাসিলি আকসিওনোফ** গল্পে কারুকৃতির সমস্তা নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, নিছক ঘটনা-বর্ণন থেকে পাঠক যা পান সত্যিকার খাঁটি গল্প রচনা তাঁকে তা থেকে আরও বেশি কিছু দেয়, খাঁটি গল্প পাঠকের চোখে বাস্তব তথ্যের আন্তর জীবনের ছবিটি তুলে ধরে। আকসিওনোফ লেখকদের মধ্যে রচনারীতির আঙ্গিক ও কারুকৃতি নিয়ে "কামারশালাগত" বা ব্যবসায়গত আলোচনার প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেন।

আলেক্সান্দর রেকেমচুক বিতোফের সঙ্গে বিতর্কের মধ্যে দিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেন। তিনি বলেন, ছোটগল্পের শিল্পরীতি একটি শাশ্বত ব্যাপার। বোক্কাচ্চিও ও নাভারের মার্গারেতের ক্লাসিক নভেলা বা উপন্যাসধর্মী রচনাকে একদিন রুশোর 'স্বীকারোক্তিমূলক' ও ভোলত্যারের দার্শনিক গল্প উৎসাদন করেছিল। আবার, তারপর, হঠাৎ একদিন দেখা দিয়েছিলেন মেরিমি, ক্লিইস্ত ইত্যাদি। ছোটগল্পের রচনারীতি যেহেতু চিরকালের মতো টিঁকে যাবে, অতএব আমরা নিশ্চিন্তে তার কারুকৃতি এবং বিশেষ করে প্লটের সমস্তার দিকে নজর দিতে পারি। বক্তা ছোটগল্পে প্লটের অনুপস্থিতিতে বিশ্বাসই করেন না। প্লটের অভাব পাঠকের চোখে ধাঁধা-লাগানো সাহিত্যগত কৌশল ছাড়া কিছু নয়। সত্যিকার খাঁটি ছোটগল্পে সবসময়েই এমন একটি বিশেষ মুহূর্তের সন্ধান পাওয়া যাবে যা কোনো বিশেষ ঘটনা বা ছোট্ট কাহিনীকে ওই গল্পের মূল প্লট থেকে স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট করে তোলে। আর ওই বিশেষ মুহূর্ত-

টিতেই গল্পের অন্তঃসার একটি গভীর সামান্যীকৃত বক্তব্যের রূপ নিয়ে ঝলমল করে ওঠে।

আলেক্সান্দর রেকেমচুকের আলোচনার পর আধুনিক সোভিয়েত ছোটগল্পের সমস্যাদি নিয়ে আলোচনা-বৈঠকটির অবসান ঘটে। আলোচনার গতি-প্রকৃতি অনুধাবন করলে বোঝা যায়, ছোটগল্প আজ এত বিভিন্ন ও বিচিত্র পথে বিকশিত হয়ে উঠছে যে তার মধ্যে কিছু কিছু দিক কালক্রমে পরীক্ষিত ও জনগ্রাহ্য হলেও, এমন আরও কিছু সমস্যা রয়ে যাচ্ছে যা পরস্পর-বিরোধী ও বিতর্কমূলক মূল্যায়নের জন্ম দিচ্ছে। আতারোফ যখন বলেন যে যুদ্ধপূর্ব-যুগের সোভিয়েত গল্প "সমকালকে" বর্ণনা করে কার্যত মূল সাহিত্যিক দায়ের অংশবিশেষ মাত্র পালন করেছে এবং অন্যপক্ষে যুদ্ধ-পরবর্তী যুগের গল্পলেখকরা প্রধানত "নিজেদের কথা"ই লিখেছেন, তখন তাঁর মত যে কিছুটা ছকবাঁধা ও তর্কসাপেক্ষ তা মানতেই হয়। আবার শিম ও বিতোফ যখন বলেন, আজকের দিনের অধিকাংশ ছোটগল্প লেখকের পক্ষে শিল্পরীতির বিশিষ্ট কারুকৃতি ও আঙ্গিকের প্রশ্নটি অতটা গুরুত্বপূর্ণ নয় এবং তাঁরাই যখন লেখকদের ছোটগল্পের বিশিষ্ট শিল্পরীতি ত্যাগ করে নতুন রীতি তল্লাস করতে বলেন, তখন স্পষ্টতই তাঁরা কিছুটা বাড়াবাড়ি করছেন বলে প্রতীতি জন্মায়। তবে একটা কথা ঠিক যে লেখকদের উপরোক্ত বিতর্কমূলক মতামতগুলি আসলে ছোটগল্প-বিকাশের বিচিত্র পন্থা নিয়ে বিচারবিশ্লেষণ করার গুরুত্ব ও সময়োপযোগিতার কথাই বারেবারে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়।

অরাজনৈতিক

দিলীপ সেনগুপ্ত

সহদেব যে বাড়ি থেকে মাইল খানেক দূরে ঝিলের ধারে মরে পড়ে আছে, রাতভোর অন্ধকারে উপুড় হয়ে থেকে কারখানা আর ঘরে নিশ্চিত কামাইয়ের পাকাপাকি বন্দোবস্ত করেছে, সে-খবর সবার শেষে যে জানল—কপট ভাগ্যের বলে সে-ই সহদেবের মা মনোরমা।

মুরগী ডাকার সকালে বিছানা ছেড়ে খানিকক্ষণ ঠাকুরের কাছে সহদেবের জন্যে কিছু অসম্ভব প্রার্থনা জানায় মনোরমা। প্রার্থনাগুলো আগের থেকে কয়েক দফা বেড়েছে এখন। আগে সহদেবের বাপ বেঁচে ছিল। মাথার ওপরে বটগাছের মতন। এখন ফাঁকা। ফাঁকা জায়গায় ঠাকুর ডেকে বসানোর চেষ্টায় পীড়াপীড়ি বেড়েছে এখন। ঠাকুর যতটুকু দিয়েছে সহদেব তা এমনিতেই পেত কি না কে জানে, তবে মনোরমা তার নিজের ধ্যানধারণা বলে এইটুকু পর্যন্ত স্থির বিশ্বাসে পৌঁছে গেছে যে, বেশি কিছু দিক আর না দিক, এমন কিছু ঠাকুর আলবৎ করবে না, যা তার একমাত্র সম্পদ সহদেবের পক্ষে আরও বিপদজনক হয়। "আরও বিপদজনক" বলার কারণ এই যে, সহদেবের মাঝখানে চাকরি ছিল না। কারখানা বন্ধ ছিল প্রায় দুমাস। মুরগীর ভোরে ঠাকুরের পায়ে মাথা কুটে কুটে ছেলের কারখানা খুলিয়েছে মনোরমা। এখন তাই নিশ্চিন্ত।

এইরকম একটি প্রত্যয়ী সকালে যখন উঠোনের রোদ ঘর ছুঁই ছুঁই করছে, ছোঁয়নি তবু, বাইরে থেকে ব্যগ্র গলার ডাক এল। "মাসীমা—তাড়াতাড়ি আসুন—"

ডাকের একটা মাহাত্ম্য আছে। শুনেই ছ্যাঁৎ করে উঠল মনোরমার বুকের ভেতর। নিজে ঘুঁটে দেয় রোজ। সকালবেলা ঘুঁটেগুলো বহির্দেয়াল থেকে ছাড়িয়ে ঝুড়িতে সাজিয়ে রাখে। বেলা বাড়লে কিছু বেচে দেয়। প্রয়োজনের গর্ত তবু খানিকটা বোজে আরও। কিছু ঘুঁটে পায়ের কাছে পড়ে রইল। দৌড়ে বাইরে এল মনোরমা। "কি রে—কি—! কি হয়েছে?"

খবর দিতে এসে মনোরমার মুখের চেহারায় থমকে গেল পাড়ার অল্প বয়স্ক ছেলেটি। যে-অস্থিরতা নিয়ে বাইরে থেকে মনোরমাকে ডেকেছিল, এখন তা থিতিয়ে গেল। কি বলবে! এ-খবরের বাহক সে না হলেই পারত ইত্যাদি দু-একটা ভাবনা শেষেও মুখ ফোটাতে পারল না।

"কাকে খুঁজচিস ? সহদেবকে ? ওর তো নাইট ডিউটি, আসে নি এখনও।" অতি বড় বুদ্ধিমতীও বিপদের সময় বোকামী করতে পারে। ইচ্ছে করেই করে। যেমন মনোরমা করল। যা অনুমান, তা কিছুতেই নয়, এমন একটা ভাব প্রকাশ করল গলার স্বরে। কথার তোড়ে অমঙ্গলকে হটিয়ে দেবার ফন্দি।

অল্পক্ষণ রাতের বেড়ালের মতো তাকিয়ে থেকে এবার হাউ হাউ করে কেঁদে দিল ছেলেটি। "মাসী, সহদেবদা আর—"

বারান্দা আর মাটির সিঁড়ি একলাফে টপকে ছেলেটিকে প্রায় জড়িয়ে ধরল মনোরমা। "কি বললি—ভালো করে বল!"

ভালো করে বলার মতো খবর আনেনি ছেলেটি।

কয়েক মুহূর্ত আগের শান্ত মাসীমা কত অল্প সময়ের মধ্যে কি বেনিয়ম বিভ্রান্ত হতে পারে তা লক্ষ্য করে হতচকিত সংবাদদাতা আর কথা খুঁজে পেল না। ইতিমধ্যে আরও কয়েকজন জমে গেছে এদিক-ওদিক। মৃতের মাতৃদর্শনই লক্ষ্য। একমাত্র ছেলে মরে গেলে ছেলের মাকে কেমন দেখতে লাগে? তায় জোয়ান ছেলে। মৃত্যুও অস্বাভাবিক।

মনোরমা সংবাদদাতাকে ছেড়ে দিয়ে সমাগত দর্শকদের একবার দেখে নিল। তারপর ক্ষিপ্রগতিতে পশ্চাদপসরণ করল হঠাৎ।

যারা সহদেবের শবদেহ দেখে এসে এখানে ভিড় করেছে, তারা আরও একটা জ্যান্ত শবদেহ দেখার মতো আঁতকে উঠল মনোরমাকে দেখে।

ঠাকুরের পায়ে মাথা ঠোকার মা, দেয়ালে গোল গোল করে ঘুঁটে লেপটে দেবার মা, সহদেবের খাকির প্যান্টে বাঙলা সাবান ঘষতে ঘষতে কুয়োপাড়ে গুন গুন করার মা, দুপুরে অন্য মায়ের সঙ্গে নিজের ফারাক-মিলকে হাসি-আলোচনায় যাচাই করে দেখার মা—কি আশ্চর্য!

চোখ দুটো সহদেবের মতো বেরিয়ে আসছে। দুটো ঠোঁটই বেঁকে আছে। শুকনো গালে গুটি গুটি উঠে না-ফর্সা না-কালো মুখে বীভৎস তাণ্ডব শুরুর প্রস্তুতি ঘোষণা করছে।

পুত্রের মৃত্যুতে মায়ের স্বাভাবিক শোক মোটামুটি সকলেই দেখেছে, কিন্তু এই রকম ভাবা যায় না। সকলেই পরবর্তী দৃশ্যের জন্যে রুদ্ধ নিশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগল। কেউই জানে না এরপর কি হবে। তবে সম্ভাব্য ঘটনা উথালি-পাথালি কান্না। তা-ও হল না।

দরজার ওপরে আমপাতার শেকল ঝুলছে। সরস্বতী পুজো করেছিল

সহদেব। ধাবিত মায়ের হাওয়া লেগে আমপাতা নড়ল। শুকনো বলে ডুলল না। নরম ভাব নেই বলে ডুলল না।

মিনিক দেড়েক পরে বেরিয়ে এল মনোরমা। গায়ে ব্লাউজ ছিল না এতক্ষণ। এখন তা দেখা গেল। যে-ছেলেটি খবর দিতে এসেছে, তার সামনে এসে দাঁড়াল। ছেলেটি ভয়ে সেরকমই দাঁড়িয়ে আছে।

"বল, কি করে মরেচে সহদেব?"

এ যেন পুলিশ জেরা করছে আসামীকে। ছেলেটি ভাবল, মাসী তাহলে সব জানে? অনুমানগুলো সব ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়ায় ছেলেটি শোক, তাপ ও সহদেবকে ভুলে খানিক দমে গেল। তবু, মাসীমাকে বেকায়দায় না ফেলে তার সোয়াস্তি নেই। ছেলে খুন হলে ছেলের মা অহঙ্কার দেখায় নাকি এরকম?

"আমি জানি না।" ছেলেটি যে ভঙ্গীতে জবাব দিতে চেয়েছিল, তা হল না অবশ্য। কিন্তু আশাহতের অসন্তোষ ফুটে উঠল গলার স্বরে।

"সত্যি কথা বল।" আবার জেরা।

অচেনা মূর্তি ঢের ঢের আছে পৃথিবীতে। কিন্তু এইরকম কল্পনাতীত অচেনা মূর্তির সামনে ছেলেটি ভয়ানক অসহায় বোধ করতে লাগল। রক্ষে পাবার পন্থা পায়ের ওপর আছড়ে পড়া।

"পায়ে পড়ি মাসীমা—ওরকম করবেন না।"

মনোরমা যেমন দাঁড়িয়ে ছিল, তেমনি দাঁড়িয়ে সকলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল—"খুন হয়েছে—তাই না?"

সমবেত চক্ষুকুল বিস্ফারিত হল।

বুকে সাহস নিয়ে একজন অস্ফুটে বলল—"তুমি কি করে এসব জানলে?"

মনোরমা নির্বিকার।

"গ্যাছে—মাথাটা গ্যাছে।" আর একজনের নিচু মন্তব্য শোনা গেল।

মনোরমা স্তব্ধ।

কাল থেকেই যেন এইরকম একটা খবরের জন্যে ওঁৎ পেতে ছিল মনোরমা। ঠিক করে ছিল, খবরটা এলে খুব একচোট কেঁদে গঙ্গাস্নান করে আসবে। কাঁদা হল না।

শরীর জ্বলে যাচ্ছে। পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে বুকের ভেতরটা।

"আমাকে ওরা মেরে ফেলবে মা।"

"না রে—মানুষ মারা কি অত সহজ?"

"না মা, দেখো, আমি আর ফিরব না ডিউটি থেকে।"

"সত্যি ফিরলি না রে—সত্যি ফিরল না সহদেব—!" মনোরমা সকলের প্রত্যাশা মাফিক এতক্ষণে চীৎকার করে কেঁদে উঠল।

অন্য আর এক মহিলা তাড়াতাড়ি ধরে ফেলল তাকে।

সহদেবের মা চৈতন্য হারাল।

গরীবের ছেলে হলেই যে রোগা হয় না, সহদেব তার প্রমাণ। দৈর্ঘ্যে সাড়ে পাঁচ ফুটের বেশি না হলেও প্রস্থে নিয়মিত ব্যায়াম চর্চার লক্ষণ। গায়ে জোর থাকলে সর্বত্রই বন্ধু-বান্ধবরা খাতির যেমন করে, ভরসাও তেমনি। আস্তে আস্তে দেখা গেল, পাড়া-সম্পর্কিত যে কোনো হই-হাঙ্গামায় সহদেব এক অনিবার্য সম্পদ হয়ে উঠল। প্রতিপক্ষ নাক কুঁচকে বলল, ফুটো মাসতান।

কিন্তু সহদেবকে কেউ ঝাণ্ডা আর ইনকেলাবি কথাবার্তায় কখনও নাক গলাতে দেখেনি। কারখানার ইউনিয়নে সে মাসকাবারি চাঁদা মিটিয়ে দিয়েই খালাস। রাজনীতির সাতে পাঁচে নেই। সুবিধাবাদী, পাতি-বুর্জোয়া, ও. পি. আই ইত্যাদি নানান শক্ত-সহজ সম্বোধনও নির্বিকারভাবে হজম করত সহদেব।

কারখানা বন্ধ থাকাকালীন গেটের মিটিং বা রাস্তার মিছিলে একদিনও অংশ নেয়নি। খুলেছে যখন, অনায়াসে ঢুকে পড়েছে। ফলে অনেকে ধরে নিল সহদেব দালাল। তারা বলল—"সহদেব সম্বন্ধে হুঁসিয়ার!"

সব কথাই মায়ের কাছে বলত সহদেব।

"কি জানি বাবা, ওসব তোরা বুঝিস। তবে যে-রকম মারধোর হচ্ছে চারদিকে, একটু সাবধান থাকিস বাবা।" রোজই গোটাকয়েক খুনখারাপি, বোমা-পটকার বিস্ফোরণ শুনতে পায় মনোরমা। দেশজুড়ে চলছে সমানে। যার বড় দল, তার বেলায় বলার কেউ নেই বলে নাকি থামছেও না।

"বিপিনকে আজ মারব মা'" ঘরে ঢুকে জামা খুলতে খুলতে বলল সহদেব।

"কেন—বিপিনের সঙ্গে কি হল তোর?"

মনোরমা জিজ্ঞেস করতেই চটে গেল সহদেব, "আবার জিজ্ঞেস করচ কি হয়েচে? শুয়োরের বাচ্চাটা কাল অরুণকে মেরে ফাটিয়ে দিয়েছে।"

অরুণকে চেনে মনোরমা। অন্য একটা পার্টি করে। বড় দলে ঘেঁষে না। দাঙ্গা মারামারিতে নেই। অরুণকে মিছিলে মাঝে মধ্যে দেখা যায়।

আবার বিপিনকেও মনোরমা আলবৎ চেনে। গেল বছর পুলিশ এসে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, রেলের মালপত্তর চুরি করে ঘরে রেখেছিল বলে।

ছাড়া পেয়ে ঝাণ্ডার নিচে জায়গা পেয়ে গেছে। বড় দলের ঝাণ্ডার।

"কি দরকার তোর ওসবের মধ্যে যাবার?" মনোরমা বিপিন প্রসঙ্গে একটু ভয় পেল যেন। বিশ্বাস নেই, দলের জোরে যা খুশি তাই করতে পারে বিপিন। চতুর্দিকে খুন-খারাপি।

বিকেলে সত্যি সত্যি বিপিনকে মারল সহদেব। অরুণের গায়ে অযথা হাত তোলার শোধ তুলল।

বাড়ি এসে বলল, "মা, ওরা কেউ ডাকতে এলে বলো আমি বাড়ি নেই। একে তো ওদের দলে নাম লেখাইনি বলে আমার ওপর আগে থেকেই রাগ, তার ওপর বিপিনকে দিয়েছি একচোট। বলা যায় না, শালারা এখন খুন ছাড়া কথা বলে না।"

খুন যে কি কঠিন বস্তু, ছেলেমানুষ সহদেব তা বুঝলে এমন করে মায়ের সামনে তা উচ্চারণ করতে পারত না।

কিন্তু বস্তুতই কঠিন কি না, সে-সম্বন্ধে একটু পরেই সন্দেহ জাগল মনোরমার। দিকে দিকে সহদেবের মতো ছেলে তো মাঝে মাঝেই মরছে।

ঠাকুরকে বার কয়েক ডাকল মনোরমা।

ছেলে গেল ডিউটি সারতে কারখানায়।

জীবদ্দশায় এর বেশি কিছু বলার নেই সহদেব সম্পর্কে। এখন মৃত।

অচৈতন্য মনোরমার মাথায় জল ছিটিয়ে, হাওয়া খাইয়ে, চৈতন্য ফেরানো হল সত্যি, কিন্তু এমন চৈতন্য বর্ধিত ভিড়ের কোনো মানুষ আগে দেখেনি।

"আমাকে বিপিনের কাছে নিয়ে চল।" এ-যেন গর্জন। "চল—নিয়ে চল।" সংবাদদাতা ছেলেটি সুদ্ধ অন্য সকলে হা করে তাকিয়ে রইল। বয়স্কদের একজন প্রবোধ দেবার চেষ্টা করল, "পাগলামী করো না—কপালে অপঘাত ছিল সহদেবের—কি করা যাবে?"

সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল মনোরমা। ভিড় ফুঁড়ে ছুট মারল সোজা।

সহদেব উপুড় হয়ে পড়ে আছে। পিঠের মাঝখানে একটা গর্ত। থুতনির মাংস লেপটে আছে মাটিতে। পা দুখানা টান টান। যেন পায়ের দিকটা মরেনি। মুখের দিকটাই গেছে।

"হ্যাঁরে সহদেব, বিপিনটাকে শেষ করে যেতে পারলি না?" সহদেব নড়ল না।

"মরে গেছিস, কি করা যাবে আর? তবে, এইভাবে মরলি? বিপিন যে এবার অরুণকেও মারবে তার কি হবে? কে বাঁচাবে অরুণকে?"

মনোরমা গাল পেতে দিয়েছে সহদেবের পিঠের ওপর। কাঁদছে না, কিন্তু ছেলে-বুড়ো যারা জড় হয়েছে, তাদের চোখের জল বাগ মানল না।

'বিপিন' নামটার বার বার উচ্চারণে তারা ভয়ও পেল।

মনোরমা বলছে "যদি তুই গুণ্ডার দলটাকে ধুয়ে মুছে যেতে পারতি, একটুও কাঁদতাম না আমি।"

মনোরমা চীৎকার করে কাঁদতে আরম্ভ করল। কে যেন বলল—"পুলিশের গাড়ি আসছে।" সকলে একটু একটু সরে দাঁড়াল। রাস্তার দিকে ঝুঁকল।

মনোরামা এক ইঞ্চিও নড়ল না। যেমন ছিল, তেমনি পড়ে রইল সহদেবের পিঠের ওপর। ক্ষতস্থানে।

"জয়যাত্রায় যাও হে"

দেবেশ রায়

আকুলুদ্দিন মাঠ পার হচ্ছিল।

সন্ধ্যা ঘণ্টা দুই উতরেছে। ঠিক সামনে মাঠটার শেষে জলজ্যান্ত চাঁদটা যেন আকুলুদ্দিনের জন্যই ঝুলে আছে। যেন আকুলুদ্দিন ঐ চাঁদটায় যাবে বলেই কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে, মোজা জুতো পরে, এই ভর সন্ধ্যেবেলায় হন হন করে এগচ্ছে। এই মাঠটার মাঝে মাঝে বাড়িঘর আছে। কিন্তু চাঁদ, এমন ভর-ভরন্ত চাঁদ, যখন কপাল বরাবর জলজলায়, তখন মাটির ওপরের গাছপালা বাড়িঘরগুলো আলোর সঙ্গে মিশে যায়। সারাটা দিন সূর্যের দিকে একবার না-তাকিয়ে বা সূর্যের কথা এক পলক না-ভেবে কাটিয়ে দেয়া যায়। অথচ, এমন আস্ত একখানা হলে তো কথাই নেই, আধখানা বা সিকিখানা চাঁদও যদি আকাশে লেপটে থাকে—তাহলেও জেগে থাকার দু-চার ঘণ্টা চাঁদের দিকে না-তাকিয়ে উপায়ই নেই। এমন কি মাঝরাতে গরুকে পোয়াল দিতে উঠলেও একবার তাকাতে হয়।

পা দুটোকে চোখেচোখে রাখতে না-রাখতেই কখন একসময় আবার চোখে চাঁদটা আটকে গিয়ে সব ঝাপসা করে দেয়। দুই-চারবার হোঁচট খেয়ে সারাদিনের ভাত না-পড়া পেটে আর সারাটা দুপুরের গরম সাঁই সাঁই হাওয়ায় জ্বালা ধরা শরীরে নিজের মনেই খিঁচিয়ে ওঠে আকুলুদ্দিন। এর চাইতে সোজা পশ্চিম বরাবর গিয়ে বড় রাস্তায় উঠলেই হতো, চাঁদটা এমন হাঁ করে কপাল বরাবর থাকত না। পশ্চিম বরাবর যেতে হলে নারান মল্লিকের পাড়া দিয়ে উঠতে হতো। ওরাও নিশ্চয়ই আজ মিটিংটিটিং করছে। তাকে যদি একলা পায়, তাহলে মেরে ফেলতেও পারে।

সেজন্যই চাঁদ বরাবর চলছে—ওটা আরেকবার মনে পড়ে যাওয়াতে সে বিরক্ত হলো চাঁদেরই ওপরে। পারলে আকুলুদ্দিন মাঠ থেকে ঢেলা তুলে চাঁদের গায়ে ছুঁড়ত।

আসলে রেডিওটাই সমস্ত গোলমাল করে দিয়েছে। যদি শুনত

অজয় মুখার্জি পদত্যাগ করেনি, যুক্তফ্রণ্ট টিকে গেল, তাহলে এই সারাদিনের খালি পেট আর রোদ-পোড়া মুখেই প্রায় উড়ে উড়ে ফিরত। হাঁক-ডাক দিয়ে দু-চার পাড়ার লোকজনকে জানিয়ে জাগিয়ে, হয়তো আরো দু-চার জায়গায় বসে দু-চার কথার আলাপন সেরে, বাড়ি ফিরে ঘটিভরা জল খেয়েই রাত পুইয়ে দিত। কিন্তু অজয় মুখার্জির নিজের গলায় পদত্যাগের কথা শুনে ফেলার পর এখন মাঠ ঘাট রাস্তা চাঁদ ক্ষিধে সারাদিনের রোদ—এ-সব কিছুই যেন বদলে যায়। নারান মল্লিকদের পার্টি আগামী কাল জোর করে আর একা হরতাল করবে, সেই হরতালে জুলুম হলে বাধা দিতে হবে, এখন সন্ধ্যাবেলায় একা একা পশ্চিম বরাবর বড় রাস্তায় উঠতে গেলে নারান মল্লিকদের পাড়া দিয়ে যেতে হবে, তাকে একলা পেলে নারান মল্লিকরা মেরে ফেলতে পারে, কাঁধের ব্যাগের ভেতর খাদ্যত্রাণ কমিটির একগাদা সি-পি লোনের দরখাস্ত খসখস করছে, যেন মরা মানুষটার জামাকাপড় কাগজপত্র ব্যাগে ভরে নিয়ে যাচ্ছে, জ্যোতিবাবু সরকার তৈরি করতে চান, তার মানে কি, আবার আইন-অমান্য, নাকি রাষ্ট্রপতির শাসন—এত অনিশ্চিত অবস্থায় আকুলুদ্দিনের সব রাগ গিয়ে পড়ে রেডিওর ওপর। রেডিওর খবর শোনার জন্যই সে মালিপাড়ার সি-পি লোনের এনকোয়ারির কাজকর্ম সেরে অমাকান্তের বাড়ির দিকে রওনা দিচ্ছিল, সারাদিনের ঘোরা-ফেরার মধ্যেও সে কোনো সময়ই রেডিওর খবর শোনার কথা ভোলেনি, দুপুর বেলাতেও। কেলাবের হাটের ওপরে নারান মল্লিকের দোকান থেকেই খবর শুনে নিয়েছে, এ-সব দিব্বি ভুলে গিয়ে কপাল বরাবর চাঁদের দিকে হনহনিয়ে যেতে যেতে আকুলুদ্দিন নিজের মনেই খিস্তি করে ওঠে—শালা ব্রি-রেশনের লাইন দেছে, সি-পির তানে পিটিশন কইচছে আর বালিশের বদলত মাথাত ট্যানজিস্টার দেছে; শালা দাও সব ট্যানজিস্টার পাঙ্গার জলত, অয়-অয় তিস্তার জলত ফেলি।

রেডিও না-থাকলে খবরটা তাকে শুনতে হতো না, কাল সকালের সার্ভিস এলে শুনলেই হতো, আর হরতাল ও হরতাল-ঠেকানো সবই একদিন পেছিয়ে যেত—এইসব ভাবতে ভাবতে চাঁদভরা এতবড় মাঠ একা একা পেরতে পেরতে আকুলুদ্দিন কিন্তু এ-হিসেবটা ভোলে না যে এ-বছর পাঙ্গা আর পাঙ্গা নেই, তিস্তা নদীই পাঙ্গা দিয়ে ঢুকে পড়েছে। মাইলের পর মাইল জলে ডুবে যাওয়ার পর নারান মল্লিক আর সে একসঙ্গে হাজার

খানেক লোকের মিছিল নিয়ে সদরে মন্ত্রীর সামনে বিশাল বিশাল ইঞ্জিনিয়ারদের মুখে মুখে তর্ক করেছে—এবারের বন্যায় পাঙ্গা দিয়ে তিস্তার বাড়তি জলটুকুই শুধু ঢুকেছে নাকি পাঙ্গা আর পাঙ্গা নেই তিস্তা হয়ে গেছে। স্লোগানটাও বাঁধা হয়েছিল ভালো—পাঙ্গা আর পাঙ্গা নাই, তিস্তা নদীর বাঁধ চাই। একা আছে বলে তো স্লোগানটা বদলে দিতে পারে না।

সামনে একটা উঁচু আল। এখান থেকে দেখায় চাঁদটা যেন মাটির ওপরে শুয়ে আছে—নিচু জমি থেকে আকুলুদ্দিনের মনে হলো। উঁচু জমিটার ছায়া নিচু জমির ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। সেই ছায়া থেকে লাফ দিয়ে আকুলুদ্দিন উঁচু জমিটার ওপর উঠতেই চাঁদটাও যেন লাফ দিয়ে আকাশের ওপরে উঠে গেল আর চাঁদে ভাসা সেই উঁচু জমিটার ওপর ভাসতে ভাসতে আকুলুদ্দিন অ্যাপলো এগারোর যাত্রী হয়ে যায়। আকুলুদ্দিন এ্যাপলো এগারো জানে। আমেরিকা থেকে বাঙলা বিবরণ সে তার ট্রানজিস্টরে শুনেছে।

গা-টা একটু শিরশির করে উঠতেই আরাম বোধ হলো। শরীরে সারাদিনের ঘাম শুকিয়ে চড়চড় করছে, অথচ সন্ধ্যা হলো কি হলো না অমনি ঠাণ্ডা পড়ে যাচ্ছে। রাতে কম্বল গায়ে দিতে হয়। বড় বানে অন্তত একটা উপকার করেছে—কম্বলটা পাওয়া গেছে।

বানা। আর বানা। দুই সন থেকে তিস্তা যেন উকুনের মতো পেছনে লেগেছে। শালা অফিসার হলে কি মাথাতে একটু বুদ্ধি থাকতে নেই! তর্ক লাগল, তিস্তা নদীর শুধু বাড়তি জলটুকু পাঙ্গা দিয়ে ঢুকেছে—ওটা তিস্তার নতুন সোতা না। সোতা হোক চাই না-হোক—ছ-ই কাদোবাড়ির পুব থেকে ছ-ই বারো নম্বরের দক্ষিণ পর্যন্ত তামান এলাকাটা যে ভাসি গেইল, এটা কি সাচা না মিছা। তারা দুই পার্টি মিলে মিছিল-মিটিং-ঘেরাও করেছিল বলে শেষ পর্যন্ত বাঁধের কাজটা শুরু হলো। নারান মল্লিকটা রাগারাগি করতে পারে ভালো, ঢাকাইয়া তো, জিভের জোরেই ডাঙায় নৌকা চালায়।

নরম মাটিতে হঠাৎ পা দেবে যেতেই থমকে গেল। চারপাশে তাকাল। মাঠটা তো ঠিক বুঝতে পারছে না। কোথায় এলো। চাঁদের আলোতে রাস্তা চেনা মুশকিল—ঘাসের গায়ে দাগ দেখা যায় না, সবই সমান মনে হয়। একবার পেছন ফিরে দেখল সে কোনদিক থেকে এলো। উত্তর-পূব বরাবর

জোড়বাদীর ওখানে বড় রাস্তায় উঠবে। মাটির ওপর উবু হয়ে দেখল—চাষ দিয়েছে, না-কি বানায় নরম। না। একেবারে ধবধব করছে বালি-পলি। শালা কোনদিকে এলো।

আকুলুদ্দিন সোজা উঠে দাঁড়িয়ে ডান-বাঁ দুইদিকে তাকিয়ে একটা নিশানা ঠিক করার চেষ্টা করতে লাগল। বোঝাও যায় না দুরের ওগুলো গাছের মাথা, নাকি ভাসা মেঘ। শালা চাঁদের পাছায় লাথি। অন্ধকারে রাস্তা চলা অনেক সুবিধা। তা না, একেবারে চোখ ঝাপসা করে দেয়।

একটা আন্দাজ মতো ধরে আকুলুদ্দিন পা বাড়াল। কিন্তু মাটিটা নরম হওয়ায় খুব শক্ত পায়ে এগোতে পারে না। বেশ খানিকটা এগোনর পর একটু অস্বস্তি বোধ করে। এতো নরম মাটিতে এতো পা আন্দাজে যাওয়ার আর সাহস হয় না। শক্ত মাটিতে ফিরে যেতে বাঁদিকে ফিরল।

গত সনের আগের সনে গেল বড় বানা। এ-বছর বর্ষার শুরু থেকেই তো তিস্তা পাঙ্গা দিয়ে ঢুকে একেবারে পাগলের মতো ঘুরতে লাগল। শালা কোথা দিয়ে ঢুকে যে কোথায় পড়ল তার ঠিকঠিকানা নেই। বর্ষার শুরুতে পাঙ্গা দিয়ে জল ঢুকে দুই পাড় ভাসাল; সুদক্ষ পল্লী, ভবতারিণী, মালিপাড়া, গৌড়চণ্ডী। আর বর্ষার শেষে বৃষ্টি থেমে যাওয়ার পর জল আবার নতুন বাঁক নিল বোধনির দিকে। পুরনো খাতে পলি পড়ে জল আর এগুতে পারেনি। পনর দিন পর পর যদি বানা হয় আর ডাঙা হয়—তাহলে এই চাঁদে তো দুরের কথা, ঠা ঠা রোদেও পথ খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। এখন পথ গোলমাল করে পাকিস্তানে গিয়ে না পড়ে। এখন পড়লেই বা কি। পচাগড়ে গিয়ে শ্বশুর বাড়িতে কদিন খেয়ে আসবে।

শক্ত মাটিতে পা ফেলে, ডান পাশে নরম জমিটা রেখে, এবার আকুলুদ্দিন হনহন করে সোজা উত্তরে হাঁটতে লাগল। চাঁদ থাকল তার ডাইনে। ছায়া থাকল তার বাঁয়ে। আর বালি আর পলির নরম ধবধবে কুয়াশার মতো প্রান্তরে চাঁদটার একটা ঘষা প্রতিফলনও আকুলুদ্দিনের সঙ্গে তরতরিয়ে বইতে লাগল।

একটা বিড়ি বার করে ধরাবে, দেশলাইয়ের কাঠির আগুনটাকে বাঁচাতে তাকে ঘুরে দাঁড়াতে হলো। তাতে যেন বাতাসের ঝাপটাটা কতো জোরে আসছে সে বুঝতে পারল। আর সেই তীব্র নিগুতি বাতাসে বিড়ি ধরাবার মতো একটা হামেশা ব্যাপার মুহূর্তের মধ্যে আকুলুদ্দিনকে মানুষের ছোঁয়া

বা সাড়ার জন্য অস্থির করে তুলল। কলকাতার মাঠটাতে মিটিং শুনতে গিয়েছিল মাস চার আগে। সকালবেলায় যখন গিয়ে পেঁৗছল, সারাটা মাঠ খাঁ খাঁ করছে। অত বড় মাঠের ভেতর নিজেদের দলের সঙ্গে থাকতেও খুব ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল। শেষে বিকেলের দিকে সারা মাঠটা মানুষে আর ঝাণ্ডায় ভরে যাওয়া শুরু হলে আকুলুদ্দিনের মনটি ভরভরাট হয়ে যায়। অয়-অয়, কলকাতার অত বড় আস্তায় গাড়িঘোড়া থামি গেইল্, এ-তো জোরে জোরে স্লোগান দিছু এই মাস চার আগত। আর এ্যালায় নিজের বাড়ির ঘাটা চিনিবার না পার।

কায়-ও আছ হে-এ। কোটিত আইচছু হে-এ। হেঁ-এ মনোহর। — কিন্তু জায়গাটার হদিশ না করে আকুলুদ্দিন এসব বলে চেঁচায় কি করে। কাছাকাছি তো কোনো ঘর দেখতে পাচ্ছে না। আর, ঘর তো এদিকে থাকার খুব কথাও নয়। সব তো ক্যাম্পে কি রাস্তায়। কিন্তু জায়গাটা কোথায়। শেষে না-চিনে হাঁক দিক, আর যদি তার পার্টির পাড়া না-হয়ে ওদের পার্টির পাড়া হয়, নারান মল্লিকের পার্টির পাড়া হয়, ওদের লোকজন লাঠি-শড়কি-বল্লম নিয়ে ছুটে এসে আকুলুদ্দিনকে এখানে খুঁচিয়ে মেরে ফেলে পাশের এই নরম ধবধবে পলিবালির মধ্যে পুঁতে দিক—কায়ও জানিবার পারিবে না।

আকুলুদ্দিন ভয়ে ভয়ে পাশের নরম প্রান্তরটার দিকে তাকাল, যেন তার কবর।

কিন্তু যদি তার পার্টির পাড়া হয়, যদি আকুলুদ্দিনদের লোকেরা পাশাপাশি কোথাও না-থাকে, তাহলেও আকুলুদ্দিনের "কায়-ও আছ হে" "হে-এ মনোহর" হাঁক শুনে লাঠি শড়কি বল্লম নিয়ে বেরিয়ে আসবে। যদি নারান মল্লিকদের পার্টির লোকদের পায়, একহাত দেখে নেবে।

অবস্থাটা এমনই দাঁড়িয়েছে যে আকুলুদ্দিন যদি একবার চরে হারিয়ে যাওয়া বলদের মতো টানা হাঁক দেয়—"কায় আছ হে"—তাহলে কেউ না-কেউ আকাশ ফুঁড়ে মাটি ফুঁড়ে বেরবেই বেরবে, যেহেতু তার গ্রামে-হাটে-বাজারে জলপাইগুড়ি বা কলকাতার রাস্তায়-মাঠে তার পার্টি বা ফ্রন্টের মিছিলে-মিটিঙে, আকুলুদ্দিনের গলার "কা-য় আছ হে" ডাক তার পার্টি ও নারান মল্লিকের পার্টি ও অন্যসব পার্টির লোকদের কানে লেগে আছেই আছে।

হামরালার গলাটা গত চার সনত এত চিনা হয়্যা গেইল্, এ্যালায় হে ধরিত্রী হে চন্দ্রদেবতা, তোমরালার কাছত কাথা কহিবার না পারি। হামরালার মনত মনত কাথা কহিলেও কায়ও শুনিবার পারিবে। এতো চিনা-জানা কণ্ঠ হামার, হামরালা পথ হারাইয়া পথ চাহিবার পারি না হে।

আকুলুদ্দিন একটা আন্দাজি হিসেবে এগচ্ছে। ডান পাশের নরম মাটিটার প্রান্তর না পেরিয়ে সে বড় রাস্তার দিকে এগতে পারবে না। কিন্তু জায়গাটা কোথায় না-বুঝে সে অমন অনিশ্চিত মাটিটায় পা রাখে কেমন করে। যদি উত্তর বরাবর হাঁটে তাহলে একটা কোথাও নিশ্চয়ই নরম মাটিটা শেষ হবে। তখন দেখা যাবে। নরম মাটিটা শক্ত হয়ে গেল কিনা বোঝার জন্য সে নজর রেখেছিল তার সঙ্গে তরতরিয়ে বয়ে যাওয়া নরম বালিপলিতে চাঁদের অস্পষ্ট প্রতিফলনের ওপর। তাই এক থোপ উঁচু মাটিতে বা একটুখানি কাঁটা ঝোপেও চাঁদের প্রতিফলনটা লুপ্ত হয়ে গেলে আকুলুদ্দিন চমকে চমকে উঠছিল।

এতোক্ষণ তাও আকাশের ওপর একটা টলটলে চাঁদ আকুলুদ্দিনকে সঙ্গ দিচ্ছিল, আর এখন পাশের থকথকে ধবধবে মাটিতে তার বাপের চোখের মতো চাঁদটার ওপর নজর রাখতে রাখতে আকাশটার দিকে চোখ ফেলতেই পারছে না।

আকুলুদ্দিন ফিসফিসিয়ে বলল "কা-য় আছ হে।" গলাটা যেন একটু অচেনা ঠেকল। ফিসফিসানি কেউ চিনতে পারবে না—বউও না। ঐ সব অ্যালায় গুজুর গুজুর ফুসুর ফুসুর ছাড়ো কেনে, যা ভাবিবেন কহি ফেলান, যা কহিবেন এই আকাশের তলায় চেচাঁইয়া কহেন, দশ ভাই শুনুক, অ্যালায় দশ ভাইয়ের আজত্ব, বড় দেউনিয়ার আজত্ব শেষ।

নিজের কাছেই অপরিচিত গলায় ফিসফিসিয়ে আকুলুদ্দিন পথ শুধাবে কি ঐ ঘষামাটির চাঁদের কাছে।

ঘষামাটির চাঁদ হঠাৎ বাঁ দিকে একটু বেঁকে আকুলুদ্দিনের প্রায় পায়ের ওপর দিয়ে বয়ে যেতে গেলে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। তার মানে এই নরম থকথকে বালিপলি বাঁ দিকে বেঁকে গেছে। এখন এই জমিটা বাঁচিয়ে যাবার জন্য কি আকুলুদ্দিন আবার পশ্চিমে বেঁকবে। তাহলে বোধহয় গিয়ে মালকানির রাস্তায় উঠবে। তার মানে যে-পশ্চিমের পাড়া এড়িয়ে যেতে সে পুবে মাঠ বরাবর রওনা দিয়েছে, সেই পশ্চিমের

পাড়ায় গিয়েই তাকে উঠতে হবে। নারান মল্লিকের পাড়া, লাঠি-শড়কি-বল্লম।

এটাও আন্দাজ, অত নিশ্চিত ভাবে যদি কোন মাটি কোন দিকে গড়াচ্ছে বুঝতেই পারত—তাহলে পথও বের করতে পারত আকুলুদ্দিন। পথ বের করতে পারুক চাই না-পারুক, তাই বলে পশ্চিম দিক থেকে এসে আবার পশ্চিম দিকে ফিরে যাওয়ার মতো কালাহোলায় ধরেনি আকুলুদ্দিনকে।

আর পথ তো চেনাই আছে। সিধা যদি এই থকথকে মাঠটা পার হয়ে যায়, তাহলে ওদিকে একটা শক্ত মাঠ পাবেই। কিন্তু কেউ সাড়া দিক না-দিক খুব উঁচু গলায় "কা-য় আ-ছু হে" বলে একটা হাঁক না-দিয়ে এমন অনিশ্চিত মাটিতে পা দেয় কি করে।

পায়ের কাছে চাঁদ নিয়ে আকুলুদ্দিন বিচার করল—নদী এইঠে বাঁক খাসে। পশ্চিমত দক্ষিণে বাঁক খাসে। বাঁকত নদী চাওড়া হয়। এ্যালায় এই ঠে কতো বড় নদী কায় জানে। এ্যালায় মুই কি কর। পাছুত সরু হবা পারে। আগত সরু হবা পারে। পাছুত যাম না আগত যাম।

বানার জল যখন এখানে বাঁক খেয়েছে, তখন জায়গাটা নিশ্চিত চওড়া। পেছনের জায়গাটা তাহলে সরু ছিল, সহজে পেরনো যেত, সামনেও সরু থাকতে পারে। এখন আকুলুদ্দিনকে এই সবচেয়ে চওড়া জায়গাটি পার হতে হবে?

হবা নাগে তো হও কেনে।

আকুলুদ্দিন বাঁয়ে না-বেঁকে সিধে চলা শুরু করল। আর অমনি মাটির ঘষা চাঁদটাও মাটির ওপর দিয়ে তার পায়ে পায়ে গড়িয়ে গড়িয়ে এগতে লাগল—যেন আকুলুদ্দিন চাঁদটাকে বলের মতো নাচিয়ে নাচিয়ে নিচ্ছে। পা-টা বসে বসে যাচ্ছে, কিন্তু তেমন নয় যে হাঁটতে অসুবিধে। বালিতে এর চাইতে বেশি গেড়ে যায়। মাটিটা শক্ত হছে, আর মাস-খানেক নাগিবা না হয়, দিন পনরত শক্ত হবে, কাথা ছিল বুলডোজার আসিয়া বালি সাফ করি দিবে, কাথা ছিল ট্রাক্টার বা পাওয়ার টিলার আসিয়া ছুইটা চাষ দিয়া যাবে, এই মাটিত বুলডোজার নাগিবা না হয়, বালি কম। বালির ভাগ বেশি থাকা পারলে এই ঠে চাঁদের ছায়া না পড়ে। মাটিটা রসবতী হয়্যা আছে। পাটা বুন হে। অ্যালায় কায় বা বালি

সরাবে, কায় বা চাষ দিবে? সুতরাং আকুলুদ্দিন আকাশে চোখ তোলে। চাঁদের মাটিটা কি এ্যানং নরম। পলিমাটি বালিমাটি। না-অয়, রেডিওতে কসে কাঠকয়লা যেনং। এ্যালায় হামরালার ছায়া যেনং এই নরম মাটিত, তেনং ছায়া চাঁদের মাটিত। অয়, অয়, হামরালার ছায়া ত চাঁদের মাটিত পড়িবা না হয়। এক যদি চাঁদত মিছিল যায় সেলায় যাবার পারিম।

চাঁদ দেখলে মানুষ আর মিছিল মনে পড়ে এখন। মাটির চাঁদকে পায়ে পায়ে খেলাতে খেলাতে আকুলুদ্দিনের আরো মনে আসে আজি হয় সোমবার, কালি নারান মল্লিকদের স্ট্রাইক, হলদিবাড়ির হাট, বুধ বাদে বিষুদ বারত মোহরম, শুক্কুর শনির পর দেওবারত দোল, সোমবারত কাদাখেলা।

অয়, অয়, মোহরমের তানে আর দুইদিন বসি থাকিবার না নাগে, কালি স্ট্রাইকের তানে মোহরম হবা পারে, আর লাঠি-শড়কি খুব চালাবার পারলে দোল-খেলাও হবা পারে। হা হা, কালি মোহরম, কালি দোল। একই চাঁদের হিসাবে দোল আসে, মোহরম আসে, আজিকার রেডিওটা তারিখ আগায় দেসে।

সামনে অনেকখানি জুড়ে দুটো ছায়ার তাক দেখতে পেয়ে খুশি হলো আকুলুদ্দিন। তাহলে বোধহয় নরম মাটিটা শেষ হলো। সামনে একটা উঁচু আল—তার ছায়া এই মাঠে ছড়িয়েছে। তার পরে আরো একটা উঁচু আল—তার ছায়া সামনের উঁচু মাঠটা জুড়ে আছে। দিকজোড়া বিরাট বিস্তীর্ণ ছায়া-চাঁদে রচিত সিঁড়ি যেন কোথাও অদৃশ্য হয়ে গেছে।

সামনের উঁচু আলটার ওপর পা দিয়ে উঠতেই পাড়টা ভেঙে গেল। তাহলে এটাও শক্ত মাটি নয়। সামনের উঁচু আলটা শক্ত হবা পারে। কিন্তু সামনের আলটার দিকে তাকাতেই আকুলুদ্দিন দেখতে পেল একটা কিছু সোজাসুজি দাঁড়িয়ে আছে। গাছ হবা পারে। ঘর হবা পারে। মানুষ হবা পারে। "কায়রে" জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে আকুলুদ্দিন দাঁড়িয়ে পড়ল। যদি মানুষ হয়, তার গলার স্বরটা যদি চিনিবার পারে। যদি নারান মল্লিকের পার্টি হয়।

উঁচু আলের ঐ দাঁড়ানো কিছুর দিকে তাকিয়ে আকুলুদ্দিন নিজেও দাঁড়িয়ে থাকল। থাকতে থাকতে তার মনে হলো সে উঁচু আলটার ছায়া দেখতে পেলে বুঝতে পারত মানুষ না গাছ না ঘর। তার নিজের ছায়া পড়ছে না। এই মাঠ জুড়ে উঁচু আলের ছায়া।

চাঁদ আর ভেজামাটির মধ্যে আকুলুদ্দিনই ছিল একমাত্র চলন্ত। সে-ও থেমে যাবার পর মনে হলো সবই থেমে আছে।

কিন্তু থেমে থাকলে তো উপায় নেই। এই নরম মাটিতে কতোক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে। তার বাপের মতো ফিসফিসিয়ে আকুলুদ্দিন বলল—"কায় হে, কায় হে।"

এতো মিছিল কইচ্চু—এ্যালায় হামার গলা দিয়া কাথা বাহির হওয়ার উপায় নাই—গলার স্বরটা মোর সকলের কাছে বড় চিনা—

আকুলুদ্দিনের মনে হলো সে ছায়ায় থাকায় বোধহয় সামনের বস্তুটি যেমন স্পষ্ট, তেমন স্পষ্ট নয়। সে যদি এখন বসে পড়ে, বসে বসে সামনের উঁচু আলটার তলায় যায়—তারপর লুকিয়ে দেখে নেয়, ছায়াটা মানুষের না গাছের না ঘরের!

আরো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পরও যখন সামনের ছায়াটা নড়ে না, তখন বসা ছাড়া আর উপায় থাকে না। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার ফলে পায়ের পাতা দুটি মাটিতে বেশ অনেকখানি ডুবেছে, বসার পর পাতা দুটি তুলে এক পা এক পা করে বসে বসে এগোতে লাগল। বসার পর মূর্তিটির শুধু মাথাটুকু দেখা যাচ্ছিল। উঁচু আলটার যতো কাছে এগচ্ছে, আলের ওপরের মূর্তিটি একটু একটু করে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। তারপর আর দেখা গেল না।

উঁচু আলটার নিচে গিয়ে বসে একটু জিরিয়ে নিল আকুলুদ্দিন। এতোটা বসে বসে আসতে তার কষ্ট হয়েছে। একটুখানি বসে সে অত্যন্ত ধীরে ধীরে মাথাটা উঁচু করতে লাগল। তারপর হঠাৎ যেন ভয় পেয়ে মাথাটা নাবিয়ে দিল। যদি মানুষ হয়, যদি নারান মল্লিকের পার্টির মানুষ হয়, তাহলে তো তার মাথায় লাঠি মারতে পারে। আকুলুদ্দিন একটু সরে গিয়ে আলের ওপর দিয়ে চোখ উঁচিয়ে দেখতে গিয়ে আবার বসে পড়ল। হঠাৎ তার মনে হলো দরকার কি তার দেখার। তার চাইতে এমনি আড়ালে-আড়ালে কেটে গেলেই তো হয়। যদি ওটা গাছ বা ঘর হয় হলো। আর যদি ওটা মানুষ হয়, হলো। আর যদি ওটা নারান মল্লিকের মানুষ হয়—সাবধানের মার নেই। সুতরাং উঁচু আলের তলা ঘেঁষে ঘেঁষে আকুলুদ্দিন বসে বসে এগতে লাগল। এমন করে খানিকটা এগিয়ে সে পিঠ বেঁকিয়ে, হাঁটুটাও খানিকটা বেঁকিয়ে, নিচু

হয়ে প্রায় দৌড়ের মতো করে এগতে লাগল। পায়ের তলায় নরম মাটি থেঁতলে যায়।

সামনে আবার চাঁদ ভরা মাঠ বিস্তৃত হয়ে যেতে দেখে আকুলুদ্দিন বোঝে সে আলের শেষে পৌঁছে গেছে। তবু মূর্তিটার দাঁড়িয়ে থাকার জায়গা থেকে কতোটা সরে আসতে পেরেছে দেখতে পেছন ফিরে শুধু অস্পষ্ট অন্ধকার আর চাঁদনি দেখল।

আলটা তো শেষ হলো। সামনে বেশ নিচু মাঠ। লাফ দিয়ে নামতে হবে। আর ডানদিকে বেঁকে গেলে উঁচু মাঠটার একেবারে কিনারে উঠতে পারে। আকুলুদ্দিনকে ভাবতে হচ্ছে—কি করবে। সামনে নিচু জমি। তার মানে ওখানকার জমি নরম, কাদাও থাকতে পারে। যদি কাদা থাকত, তাহলে চাঁদ মাঠে পড়ে চকচক করত। নরম কি না এতো উঁচু থেকে বোঝা যাবে না। কিন্তু উঁচু মাঠটার ওপর যদি ওঠা যায় তাহলে মূর্তিটা তাকে দেখে ফেলতে পারে।

সিদ্ধান্তে পৌঁছনর জন্য মূর্তিটা আছে কিনা দেখতে আকুলুদ্দিনকে পেছন ঘুরে একটু একটু করে চোখ উঁচু করতে হয়। কিছু দেখতে না-পেয়ে মাথাটা তুলতে হয়। কিছু দেখতে না-পেয়ে পিঠটা উঁচু করতে হয়। কিছু দেখতে না-পেয়ে আর একটু সোজা হতে হয়। তবু কিছু দেখতে না-পেয়ে একেবারে সোজা হওয়া ছাড়া কোনো গত্যন্তর থাকে না। এমন কি নরম মাটির ওপর দুই পায়ের আঙুলের ভর দিয়ে উঁচু হয়েও কিছু দেখতে না-পেয়ে আকুলুদ্দিন আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। অদৃশ্য হয়ে যাওয়াটাই মূর্তিটার মানুষ হওয়ার নির্ভুল প্রমাণ। টুপ করে সে বসে পড়ে।

মানুষটা তাহলে তার পিঠের ওপরের মাঠটাতেই কোথাও আছে। সে যে বসে বসে এগিয়েছে, সেটা তাহলে সেই মানুষটা দেখেছে। সেই মানুষটা লাঠি, শড়কি বা বল্লম নিয়ে মাথার ওপরের মাঠটাতে হয়তো তার মাথার ঠিক ওপরেই দাঁড়িয়ে আছে। তাহলে আকুলুদ্দিন তার পাল্লার ভেতর ? সুতরাং জল থাকুক আর ডাঙা থাকুক সম্মুখের ঐ নিচু জমিটাতে লাফ দিয়ে নেমে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

আকুলুদ্দিনের দাঁড়াবার জায়গাটি অন্ধকার। তার পায়ের নিচে থই থই জ্যোৎস্নায় মাঠটা চারদিকে গড়িয়ে গেছে।

সেই অন্ধকার থেকে লাফ দিতেই দীপ্ত জ্যোৎস্নায় নিচু মাঠের মধ্যে আগে হুমড়ি খেয়ে পড়ল তার ছায়া, আর সেই ছায়ার ঘাড়ে আকুলুদ্দিন হুড়মুড়িয়ে পড়তেই কে যেন অপ্রস্তুত কণ্ঠে চমকে উঠল "হে-ই।" নিজের ছায়ার ঘাড়ে চাপা আকুলুদ্দিন বাতাসের স্বরে হিসিয়ে উঠল—"কা-য় হে।" যে-আলটার ওপর থেকে আকুলুদ্দিন লাফ দিয়েছে, তার গায়ের অন্ধকার থেকে কেউ যেন আকুলুদ্দিনের বাপের মতো ফ্যাসফেসে গলায় বলে উঠল—"কে হে।" শোনামাত্র আকুলুদ্দিন নিজের ছায়া দুপায়ে মাড়িয়ে দাঁড়িয়ে উঠে দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠল "নারান—খবরদার, এক পা আগু ফেলিস না নারান—।" অন্ধকার থেকে নারান জবাব দিল—"আকুল, তোর লাশ কিন্তু পাওয়া যাবে না, সাবোধান।" "নারান, আমি তর লাশখান তর বউয়ের কাছ্‌ত পাঠাম—আয় কেনে, এইঠেই সুবিধা, কায়ও নাই।"

"আকুল, আমার ন্যামটা মনে রাখিস"

"রাখ কেনে, তর বাপার নামটা মনে কর কেনে"

"আকুল" নারানের গলার স্বরে যেন দাঁতে দাঁত ঘষার আওয়াজ পাওয়া গেল "আমি নারান মল্লিক"

"মল্লিক" আকুল শব্দ করে থুতু ফেলল "মোর নাম মোহাম্মদ আকুলুদ্দিন"

"আকুলুদ্দিন মোহাম্মদ—আমার পার্টির কাথাটা স্মরণ রাখিস, তর দুয়ারে যম খাড়াইয়া"

"নারান মল্লিক—হামার পার্টির কাথাটা ভাবিস না তুই, তর লবাবি চলি গেইল্, রেডিও শুনিস নাই, এ্যালায় আর দারোগা তর কাথা শুনিবে না"

"তুই রেডিও শুনছিস ?　আকুল"

"তুই শুনিস নাই ?"

"শুনছি" নারান মাল্লকের গলার স্বরটা একেবারে স্বাভাবিক আর নরম শোনাল। ওরা এতক্ষণ কথা বলছিল চাপা অথচ তীব্র স্বরে। যে-কোনো মুহূর্তে একজন অপরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। দুজনের কেউই এক মুহূর্তের জন্য নিজের প্রস্তুতভঙ্গি শিথিল করেনি। কিন্তু

নারান মল্লিকের শেষ কথাটা যেন সমস্ত পরিস্থিতিটাকেই শিথিল করে দিল।

"আকুল, তর ব্যাগে কি আসে রে?"

"তর ব্যাগত যা রহে!"

"সি-পি আর এচ-বি লোন, আর ঘর জ্বালানির দরখাস্ত আর জে-এল-আর-ও অফিসের জমা দিবার লিস্টি—এইগুলা আর নিয়া যাস ক্যা, এইহানে ফ্যাল"

"শালা, তর পার্টির তানে ত হইল্, শালা হাতির পাঁচ পা দেখিবার ধরসেন, শালা তরা লুটপাট করেন কেন, খুনাখুনি করেন কেন এ্যানং, মানষিলার মনত তরা বিষ ঢুকাসেন"

"হে-এ-এ আকুল, তর এখানে কতগুলা খুন করছি রে, কতগুলা লুট করছি রে? ক, ক, আজি ত শুইনতে হবে হে, শুইনতে হবে"—নারান মল্লিক মাটির দিকে তাকিয়ে কথা বলতে বলতে বসে। ওদের মাঝখানে অনেকখানি ফাঁকা জায়গা। যেন একটা খুঁড়ে রাখা কবরের দুপাশে দুজন। মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটুকু পার হয়ে অপরের অপ্রস্তুত অবস্থায় আক্রমণের সুযোগ নেয়া সম্ভব নয়। মনে হয় ওরা যেন নিজের মনে কথা বলছে। কথাগুলো এতো ধীরে এতো অস্পষ্টভাবে উচ্চারিত হচ্ছে যেন ওরা নিজের সঙ্গে অথবা আকাশের গলা-সোনারঙের চাঁদ বা আকাশ-মাটি ঘেরা কুয়াশার মতো চাঁদনির সঙ্গে কথা বলছে।

"না নারান, তর পার্টি এইঠে কোনো লুঠ করে নাই, খুন করে নাই, চা-বাগানত কইচছিস"

"কোথথন শুইনছিস রে আকুল।"

"হামার পার্টির নেতা মানষির ইপোট, কয়লাখনিতেও তরা খুন কইচছিস। তুই মানষিটা, এইঠে তর মানষিগুলা, খারাপ না হয়। কিন্তুন তর পার্টিটা বড় গুণ্ডা, তরা অজয় মুখার্জিটাকা তাড়াই দিলু—"

"ঘাড় ধরি?"

"না নারান, তরা বড় লোভী, তরা নিজেদের আজত্ব চাস, তর নেতার ঘরটা লাটসাহেবের সঙ্গে দেখা করসে—"

"কেন করব না রে, অজয় মুখার্জিটা সরকারটা ভাঙছে, আমরা ধরছি, তরা আমাদের সাপোট করস নাই কেন। তয় ত সরকারটা থাইকত।"

"তরা সরকারটা ভাঙিবার ধইললু, আর তোমরালাই সরকারটার মালিক হবা ধরিবেন ? এ-এ ক্যানং কাথা ?"

"আকুল—অয় অয়, আমারে তুই সরকারটার মালিক করবি না। আর মালিক করবি ঐ মহেশ্বররে ?"

"কেনে, ঐ শালা গুণ্ডা বদমাস জোতদারটার নাম ধরিস কেনে হে"

"রাগস ক্যারে আকুল, রাগস ক্যা, উই মহেশ্বরটা তর অজয়বাবুর দলের লিডার হইসে না ভোটের পরে ?"

"অয় ত অয়, উমরার সঙ্গে হামরার কি। মোর পার্টিখানু তো কমুনিস্ট পার্টি"

"হ, হ, হরে কমুনিস্ট পার্টি, মহেশ্বর আর নারান মল্লিক, কে তোর বেশি কাছেঃ রে, হরে কমুনিস্ট পার্টি ?"

"নারান, মহেশ্বরর পার্টিটার তলায় বড় জঞ্জাল, কিন্তু আগাটা সিধা। তর পার্টি টার আগাটায় বড় জঞ্জাল, তলাটায় তুর মতন ভালা মানষি থাকিবা পারে"

"তুই ত তলার মানুষ, তুই কি কস"

"নারান, তোরা মাতাল হবা ধরিসেন হে, ক্ষ্যামতার মদ। যেনং কংগ্রেস মাতাল ছিল। নারান, তোর পার্টির মাথাটায় ক্ষ্যামতার আগুন ধরিবার নাগে। নারান, তরা শত্রুবৃদ্ধি করিবার ধরসেন। নারান রে, আমায়নের কাথা শুনিসেন কখনো ?"

"ক, তুই ক, শুনি, হালা, মুসলমানের কাছে রামায়ণ শুনি"

"নারান, আজি রাত্তির আগে কখনো তর মনত আইচছে আমি মুসলমান ?"

"না, কিন্তুন এখন তুই হালা মুসলমান। হালা, আমিও ঢাহার পোলা। হালা এহানে বস্থা খুব লিডারি কইরব্যার ধরস। আর পাকিস্তানে আমাদের থাকার উপায় নাই—" নারান উঠে দাঁড়ায়। আকুলও।

"নারান, সাবোধান, শালা ঢাকাইয়া, ভাটিয়ার ঘর, হামার দেশি ভাই-গুলার উপর যমদুতের তানে আসি পড়ি গেইল্, শালা নারান ভাটিয়া, চলি যা আমার মাটিত, চলি যা—"

"খবরদার আকুল"

"সা-বো-ধা-ন নারান"

চারদিকের সহসা নিশ্চুপে পুব থেকে এক ঝোড়ো হাওয়া মাটি ঘেঁষে আসতে আসতে মাথা তুলে হঠাৎ হঠাৎ জ্যোৎস্নায় মাখামাখি ধুলোবালি পাতাসহ দুজনকে ঘিরে ধরে ঘুরে-ঘুরে ঘুরে-ঘিরে উত্তর পশ্চিম দিকে রণপায়ে ধেয়ে চলে যায়। তাদের দুজনের মাঝখানে জ্যোৎস্নার শবের ওপর একটা বিড়ি ছুঁড়ে দিল নারান মল্লিক, বিড়িটা আকুলুদ্দিনের কাছে এলো না। কুড়োবার জন্য আকুল এগোয় কিনা নারান যেন দেখতে লাগল। আকুল না-এগিয়ে নিজের পকেটে বিড়ির জন্য হাত দিতেই নারান মল্লিক আর একটা বিড়ি জোরে ছুঁড়ল। হাত দিয়ে আকুলুদ্দিন সেটা কুড়িয়ে নিতে নিতেই নারান মল্লিক দিয়াশালাইয়ের কাঠি জ্বালাল। নারান সামনের দুটো দাঁতে চিপে ঠোঁট ফাঁক করে বিড়ি ধরায়, আর এতো দূরে থেকেও আকুলুদ্দিন যেন দেখতে পায়—ভঙ্গিটা তার এতো চেনা। নারান নিজের কাঠিটা নিবিয়ে ফেলে দিয়ে শালাইটা ছুঁড়ে দেয়ার আগেই আকুলুদ্দিন নিজের দিয়াশালাই বের করতে পকেটে হাত দেয়।

"নারান, তুই এইঠে আলু কেনং করি ?"

"বড়কামাতে হজ-র বাড়িতে রেডিও শুইন্যা কালক্যার মিছিলের হরতালের কথা কয়্যা সিধ্যা রওনা দিয়্যা ভাবল্যাম, তগ পাড়ার উপর দিয়া যাওয়াডা নিরাপদ না। চিনব্যার পাইরলে খুন হয়্যা যাব। মাঠ বরাবর রওনা দিসি, হালা বেশ আসত্যাছি, হঠাৎ দেহি—বাঃ শালা ঘাস শ্যাষ, এমন তুলতুলানি মাটি, পা কোটে থম, আর কোটে না থম, আর তই লা দোলপূর্ণিমা আর মোহরমের চাঁদা, শালা চোখখান ঝাপটা করি দেয়"

"এই বর্ষায় হালা ঘণ্টায় ঘণ্টায় নদী মোড় নিসে, বর্ষা শেষ, শালা শীত-জলেও বানা। চিনব্যার আর কোন উপায় থোয় নাই"

"হাঁক দিবার পারি না, নারান, কোন জায়গা চিনিবার পার না। কোন পাড়া বুঝিবার পার না। এতো মিছিল কইচছু, হামার গলাটা বদলাম কেনং করি, সগায় চেনে"

"সগায় চেনে রে আকুল্যা, সগায় চেনে। আমার নাম নারান মল্লিক, হাঁক দিয়া জিগাম এইডা কোন পাড়া হে-এ, তার উপায় নাই, শুধু তর জইন্য, আকুল্যা, তর পার্টির জইন্য। আমারে এহানে একলা পাইলে খুন কইর‍্যা নরম মাটিতে কবর দিয়্যা রাইখলে এতো রাত্তিরে কাগও নাই যে দেইখবে"

"আমি তোমরাক দেখি ত আলের আড়ালত মাথা ঢাকি, এই মাঠত

নাফ দিছু রে নারান, নরম মাটি, নাফ দিবার তানে ভয় ধরসে—হাটু গাড়ি যাবা পারে"

"হয়, হয়, বালি নাই রে আকুইল্যা, বুলডোজার লাইগত না, একডা দুইডা চাষ ট্র্যাকটর দিয়া দিব্যার পাইরলে হতো। তক্ দেইখ্যা তো আমি নোর পার‍্যা আস্যা এই হানটায় চুপ দিলাম"

"তর আর হামার যাওয়ার কাথা আছিল্—ডোজার আর ট্র্যাকটরের তানে, অ্যালায় কায় যাবে রে নারান—"

"জানি না রে আকুইল্যা। তুই আর আমি একসাথ যাব্যার দিন শ্যাষ রে। তুই আর আমার কমোরেড না। তুই মুসলমান, আমি হিন্দু। তুই দেশি, আমি ভাটিয়া"

"এই জমিটা কার হয় রে নারান"

"জানি না রে আকুইল্যা"

"এই পাড়া কুন পাড়া রে নারান"

"চিনি না রে আকুইল্যা"

"এইটে কুন নদীর বানা আসিল্ রে নারান?"

"বুঝি না রে আকুইল্যা"

"হামরালা কুনঠে যাম রে নারান"

"তুই কুথায় যাবি, আমি ক্যামনে জানব। আমি কোথায় মেলা করছি তোক কব্যার পারব না। তুই যা, যেমন যাছিস। আমি যাই, যেমন যাছি।"

নারান ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। আকুলুদ্দিন সেটা খেয়াল করা মাত্র ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে পড়ল।

"হাঁক দিয়্যা জিগ্যাবার পারব না—কোন মাঠ, কোন নদী, কার পাড়া, কার ঘর। পা-আন্দাজে চলো, শুধু চ—লো, চ—অ—লো।" একটু একটু পা ফেলে নারান আলের গা ঘেঁষে ঘেঁষে পশ্চিম দিকে এগতে থাকে।

আকুল পুব দিকে চলতে থাকে। ওদের দুজনের মাঝখানের ফাঁকটা বাড়তেই থাকে। ওরা দোল মোহরমের চাঁদ আর আপাতত দিগন্ত লোপাট শূন্যতার সঙ্গে কথা বলতে বলতে চলে।

"দেশ গাঁ জন্মভূমি যদি ঘণ্টায় ঘণ্টায় নতুন নতুন বানায় ডোবে আর ডাঙায় ভাসে, কেনং করি ঘাটা-আঘাটা চিনিবারে পাম—"

"খুঁজিবার নাগিবে হে, খুঁজিবার নাগিবে—"

পুস্তক-পরিচয়

অধিকার রক্তের কবিতার। গণেশ বসু। পরিবেশক : মনীষা গ্রন্থালয়। দু-টাকা

তরুণ কবিদের কবিতা প্রায়ই পড়ি এবং সংখ্যায় তাঁরা অনেক—কিন্তু মানতে হয় যে মাঝে মাঝে তাঁদের ভাবনা-চিন্তার বা লেখারই ধরন-ধারণ অস্বস্তিকর লাগে। সব সময়ে নয়, এবং সেটাই আমার আত্মচিন্তাকে আশ্বস্ত করে।

শ্রীমান গণেশ বসুও তরুণ কবি, কিন্তু তাঁর মনের জগৎ বয়স্কের পাঠে খুব একটা অচেনা লাগেনি। মনে হয়েছে, তার কারণ তাঁর কাব্য-জগতের পুরুষার্থ আমাদের জগৎ থেকে ভিন্ন নয়। তাঁর কবিতা তাই আমার মতো পাঠকের কাছেও অনাত্মীয় ভাষা মনে হয় না, যদিচ, তাঁর তারুণ্য কয়েকটি বই পড়েই মনে হয়েছে যথার্থ নবীনতাই। তাঁর চারটি বই পড়ে মনে হয়েছে যে তাঁর কবিতার আবেগপ্রেরণা উৎসারিত নিঃস্বার্থ সৎ উৎসাহী তরুণের এবং কর্মী-তরুণের জীবনানুগতা থেকে। এই বৈশিষ্ট্য সব সময়েই সাহিত্যচর্চাকে গভীরতা দেয় এবং তাই থেকে আঙ্গিকের উপরে কর্তৃত্ব বিশেষ তাৎপর্য ও বিকাশ পেতে থাকে। তার ফলে আমাদের জীবন-যাত্রার নানা সমস্যা. তার উপরে একাধিক ন্যায্য সাংস্কৃতিক কাজ-কর্মের নৈর্ব্যক্তিক অর্থাৎ নিঃস্বার্থ উৎসাহ হয়তো বিশুদ্ধ কবিতার সেবায় বা গজদন্তমিনারের স্বপ্নলোকে গণেশ বসুর মতো তরুণ কবিকে কালহরণ করতে দেয় না। তৎসত্ত্বেও তাঁর কবিতার অজস্র প্রাণশক্তি ও তার বিকাশ দেখে খুশি লাগে।

কেউ কেউ বলেন যে সমাজ-সচেতন ব্যক্তিকোত্তর লেখকদের নাকি অসুবিধা হচ্ছে যে তাঁরা বিশুদ্ধ কাব্যচর্চার মানসিক অবকাশ পান না নানা-বিধ কর্মের ব্যস্ততায়। কিন্তু অন্যপক্ষে বলা যায় যে এঁদের সাহিত্য সৃষ্টির ও চর্চার বৈশিষ্ট্যই, তার মূল চারিত্র্যই ক্ষতিগ্রস্ত হতো যদি এঁরা ব্যক্তিগত তথা বৃহত্তর আবেগ থেকে পালিয়ে বার্-কাফে-মিনারে আশ্রয় নিতেন।

গণেশের বইকটিতে যে সুস্থ সবল মানবিকতার মানস পেয়েছি, তার

প্রভাবই তাঁর কবিতাগুলির বৈশিষ্ট্যে। এ-কবির পক্ষে ধীরে সুস্থে লেখার ঘরে বা বৈঠক-ঘরে বসে বসে কবিতার রূপাঙ্গিকচর্চা সম্ভব নয়। তাঁর কবিতা যেন স্বরূপ পেয়েছে তাঁর 'সমুদ্রমহিষ'-এর দুরন্ত আবেগের প্রতীকেই। বোঝা যায় কেন গণেশের কবিতার বইয়ের নাম হয়—'রক্তের ভিতর রৌদ্র'।

বর্তমান বইটি দেখছি তরুণ কবির পঞ্চম প্রকাশ এবং নিরবচ্ছিন্ন দীর্ঘ ও বহুরীতিবিন্যস্ত কবিতার প্রথম ও প্রশংসনীয় প্রয়াস—লেনিন শতবার্ষিকীতে 'অধিকার রক্তের কবিতার'। কারণ—"শিরায় শিরায় হাঁকে ভালোবাসা লেনিন লেনিন।" এ-অধিকার ঘোষণায় বয়স্ক লেখকও বিমূঢ় বোধ করে না, নিজেকে অনাত্মীয় ভাবে না।

মনে হয় এই কবিতায় গণেশ বৃহৎ একটি আবেগের প্রেরণাতেই দীর্ঘ বৈচিত্র্যময় কাব্য লিখতে পেরেছেন। আমার তো বরং মনে হলো, কোনো একটা কারণে, কিছুর তাড়নায়, তিনি হঠাৎ কবিতাটিতে যতি টেনেছেন। এমন কি একবার তো আমার মনে হলো হয়তো শেষের কয়েকটি পৃষ্ঠা বাঁধাবার সময় বাদ পড়ে গেছে। কবিতাটির আরম্ভ আঁটসাট কথার কাটাকাটা আবেগবহ বাক্যের পর পর যোজনায়—সংক্ষিপ্ত কিন্তু সোচ্চার বাক্যগুলির নাট্যতরঙ্গের গতি ও পূর্ণচ্ছেদগুলিকে মেলে দিয়ে ছাপিয়ে ওঠে একটা আততস্নায়ু স্ট্রফিক বা শ্বাসপর্বলয়ের গতিতে। তারপরে আসে নিয়মিত পদ্যছন্দের ক্ষিপ্র আততির ভারসাম্য :

"ছিন্নমূল আমি সে কিশোর
দোরে দোরে ঘুরেছি লোকের
স্মৃতি তেতো ঘৃণা ও ধুলোর
কান্নাজমা বিপুল বুকের। ...."

তবু—দিকে দিকে প্রাণের শিকড়—তারপরেও পদ্যছন্দই মিলান্ত কিন্তু ছাপিয়ে উঠে উঠে কাটা-কাটা অথচ দীর্ঘলয় পদ্যছন্দই।

কিন্তু পুস্তক-পরিচয়ে বাকবিস্তার নিষ্প্রয়োজন। বিশ-একুশ পৃষ্ঠা-ব্যাপী কবিতা যে-কবি লিখতে পারেন, সাধুবাদ তাকে জানাতেই হবে, যদি সে-কবিতা হয় সুস্থ প্রাণময় সততার কবিতা, হয় যৌবন-সূর্যের অধিকার, যদি তার হৃদয়ে থাকে একটি নাম, যে-নাম লেনিন—শাশ্বত সংগ্রাম।

বিষ্ণু দে

রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতি। অবন্তীকুমার সান্যাল। সারস্বত লাইব্রেরী। পাঁচ টাকা

রবীন্দ্রনাথের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। আমরা আজ যে-গদ্য নিত্য ব্যবহার করে থাকি, তা যে অনেক পরিমাণেই রবীন্দ্রপ্রভাবিত সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথ শুধু বাঙলা কাব্যের ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন সাধন করেননি, বাঙলা গদ্যরীতিও তাঁর হাতে বহুল পরিবর্তন লাভ করে। কিন্তু তাঁর কবিখ্যাতির আতিশয্যে তাঁর গদ্যশিল্পী পরিচয় কিছুটা অপরিজ্ঞাত থেকেছে। গদ্য আমরা প্রতিনিয়ত নানা প্রয়োজনে ব্যবহার করি বলেই তার বিবর্তন সম্বন্ধে আমরা সব চেয়ে অজ্ঞ এবং কৌতূহলশূন্য। আসলে গদ্যও যে মহাশিল্পীর দান, তা আমরা ভুলেই থাকি। আর যে-গদ্য এখন প্রাত্যহিক ব্যবহারের ফলেই অতিপরিচিত ও কিছুটা প্রথাসিদ্ধ, তাও একদিনে সৃষ্টি হয়নি। বিশেষত বাঙলাদেশে গদ্যের ঐতিহ্য সুপ্রাচীন নয়। এদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের কাছে আমাদের ঋণের পরিমাণ অপরিসীম। অন্য দিকে, রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল ধরে গদ্য নিয়ে যে-পরীক্ষা করেছেন, তার দ্বারা আমরা লাভবান হয়েছি সন্দেহ নেই, কিন্তু উত্তর-রবীন্দ্র বাঙলা গদ্যও ইতিহাসের নিয়মেই অগ্রসর হয়েছে এবং সম্ভবত গত তিরিশ বছরে গদ্যের এই রূপান্তর অনেক বেশি দ্রুততর ও চমকপ্রদ বলেই মনে হবে। আসলে রবীন্দ্রনাথের গদ্যকে অবলম্বন করেই তাকে অতিক্রম করতে হয়েছে—বাঙলা গদ্যের রূপ ও রূপান্তরের ইতিহাস তাই বিচার-বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতি নিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটি প্রবন্ধ লেখা হলেও, পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ এ-যাবৎ লেখা হয়নি। শ্রীঅবন্তীকুমার সান্যালের 'রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতি' (কার্তিক ১৩৭৬) গ্রন্থটি সেই প্রয়োজন কিছুটা মেটাতে সক্ষম হয়েছে, গ্রন্থটি রচনার জন্য অবন্তীবাবুকে অভিনন্দন জানাই।

গ্রন্থের সূচনায় 'বক্তব্য' অংশে লেখক গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করেছেন, "ভাষার রীতির রূপপরিবর্তন যে কখনই লেখকের খেয়াল-খুশির পরিণাম নয়, ভাববস্তুর প্রকাশের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে সম্পৃক্ত—এইটি মনে রেখে তাঁর (রবীন্দ্রনাথের) গদ্যরীতির রূপপরিবর্তনের ধারাবাহিকতা এবং চরম পরিণতির গতিরেখাটি স্পষ্ট করে তুলতে চেয়েছি।" বলাবাহুল্য, ভাব ও ভাষার অঙ্গাঙ্গীসম্বন্ধবন্ধন অবিসংবাদিতভাবে একটি

চিরন্তন সাহিত্যিক সত্য। তবে 'গদ্যরীতি'র আলোচনা করতে হলে সাধারণভাবে 'স্টাইলিসটিকস'-এর আলোচনাই করা হয় এবং তার প্রয়োজনও নিতান্ত কম নয়। মার্জারি বৌলটনের 'The Anatomy of Prose' (১৯৫৪) জাতীয় কোনো গ্রন্থ বাঙলায় এখনো লেখা হয়নি, রবীন্দ্র-গদ্যরীতির সে-জাতীয় বিশ্লেষণ তো দূর-প্রত্যাশিত! অবন্তীবাবু "বাক্যগঠন, শব্দপ্রয়োগ, অলঙ্করণ ইত্যাদির" আলোচনাকে "নিছক বহিরঙ্গ" বিচার বলেছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির "বহিরঙ্গ" বিচারেরও দরকার আছে, আর তাছাড়া 'স্টাইলিসটিকস-'এর আলোচনাকে "নিছক বহিরঙ্গ" আলোচনা বলা যাবে কিনা, তাও বিতর্কনির্ভর।

অবন্তীবাবু আলোচনার সুবিধার জন্য রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনাকে চারটি পর্বে ভাগ করে নিয়েছেন: প্রথম পর্ব ১৮৭৬—১৮৭৯, দ্বিতীয় পর্ব ১৮৮১—১৮৯৮, তৃতীয় পর্ব ১৮৯৮—১৯১২, চতুর্থ পর্ব ১৯১৬—১৯৪১। তারপর ধারাবাহিকভাবে রবীন্দ্রনাথের প্রধান গদ্য রচনাগুলির বিবর্তন দেখিয়েছেন। প্রথম পর্বের গদ্যরীতি সম্বন্ধে লেখকের সিদ্ধান্ত, "কল্পনা ও মননের যে দ্বৈতরূপটির সর্বোত্তম ও সর্বাতিশয়ী অভিব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের গদ্যসাহিত্যে পরবর্তীকালে প্রত্যক্ষ করি, তার সূচনা একেবারে প্রথম পর্ব থেকেই।" সম্ভবত, লেখকের চোখে রবীন্দ্রনাথের স্বাতন্ত্র্যটুকুই বেশি করে ধরা পড়েছে। কারণ বঙ্কিমযুগের গদ্যরীতি হিসাবে যুগগত সামান্য ধর্ম তিনি নির্দেশ করেননি। দ্বিতীয় পর্বে, চলতি ভাষার ব্যবহারে রবীন্দ্রনাথের সামর্থ্য ও সাফল্য একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। লেখক এখানে রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব দেখাবার জন্য উনবিংশ শতাব্দীর গদ্যরীতির ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন, এই ইতিহাস বিবৃতির প্রয়োজন ছিল। কিন্তু লেখকের অনেকগুলি সিদ্ধান্তবাক্য তথ্যসমর্থিত কিনা সে-বিষয়ে সন্দেহ জাগে। যেমন—

"কেরির কথোপকথনের **কাঠামোটি সাধু**।" (পৃঃ ১১)

"অভিনেয় নাটকের সংলাপ কথ্যরীতি ছাড়া সাধুরীতিতে রচিত হলে নাট্যের বাস্তবতা পীড়িত হয়, তাই সে ক্ষেত্রে কথ্যরীতি অপরিহার্য। প্রথম দিকে যে বিখ্যাত বাংলা নাটকটি মঞ্চস্থ হয়েছিল, রামনারায়ণ তর্করত্নের কুলীনকুলসর্বস্ব **এইজন্যই** অনাটকীয়।" (পৃঃ ১১)

"'মধুসূদনের চলতি ভাষার **পরিপূর্ণরূপ** ধরা পড়েছে তাঁর মায়াকানন নাটকে।" (পৃঃ ১২)

তৃতীয় পর্বই "রবীন্দ্রনাথের সাধু গদ্যের শ্রেষ্ঠ পর্ব।" এই সময়ে লেখা 'নষ্টনীড়'-এর মতো অসামান্য গল্প, 'প্রাচীন সাহিত্য'-র আলোচনা এবং 'গোরা' উপন্যাস। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের আলঙ্কারিক কবিত্বপূর্ণ গদ্য এখন অতুলনীয় সরলতা ও দ্রুতি লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে নিজের গদ্যরীতি প্রসঙ্গে বলেছেন—"আমার প্রথম দিককার গদ্যে, যেমন 'কাব্যের উপেক্ষিতা', 'কেকাধ্বনি' এসব প্রবন্ধে, পদ্যের ঝোঁক খুব বেশি ছিল, ওসব যেন অনেকটা গদ্য-পদ্য গোছের। গদ্যের ভাষা গড়তে হয়েছে আমার গল্প প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে। মোপাসাঁর মতো যে-সব বিদেশী লেখকের কথা তোমরা প্রায়ই বল, তাঁরা তৈরি ভাষা পেয়েছিলেন। লিখতে লিখতে ভাষা গড়তে হলে তাঁদের কী দশা হতো জানিনে।" ('সাহিত্য, গান ও ছবি,' 'প্রবাসী', আষাঢ় ১৩৪৮) "পদ্যের ঝোঁক" অতিক্রম করার চেষ্টা অবশ্য রবীন্দ্রনাথ সারাজীবনই করেছেন, কিন্তু একমাত্র 'জীবনস্মৃতি'ই বোধহয় এদিক থেকে তাঁর সাফল্যের সীমারেখা।

চতুর্থ পর্বে, রবীন্দ্রনাথ চলতি গদ্যকেই সাহিত্যের একমাত্র বাহনরূপে গ্রহণ করলেন, অবশ্য 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসখানি "রীতিবদলের সন্ধিক্ষণের রচনা।" অবন্তীবাবু রবীন্দ্রনাথের চতুর্থ পর্বের গদ্য সম্বন্ধে একটি মূল্যবান মন্তব্য করেছেন, "এই ভঙ্গির গদ্যের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ গদ্য ও পদ্যের ব্যবধানটি যেন ঘুচিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিলেন। ভাব ও রূপের মিলন-বিরহের বিচিত্র লীলারহস্যের সন্ধানী রবীন্দ্রনাথের কাছে এই সময় জগৎ ও জীবন যেন ভাবরূপের হর-গৌরী-মিলনে ধরা দিয়েছিল। তাই গদ্য ও পদ্যের পার্থক্যও ঘুচে গিয়েছিল।" (পৃঃ ৬৬) বলা বাহুল্য এই উক্তিটি অবলম্বনে রবীন্দ্র-গদ্যরীতির নূতন করে আলোচনার সূত্রপাত হতে পারে। অবন্তীবাবু রবীন্দ্র-গদ্যে 'ভারসাম্য'র উপর বেশি জোর দিয়েছেন।

কিন্তু তিনি রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির যে-অন্তরঙ্গ রূপটির বিবর্তন দেখাতে চেয়েছিলেন, তার আলোচনা সাতষট্টি পৃষ্ঠার মধ্যেই সম্পূর্ণ। গ্রন্থের শেষাংশে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধ যোগ করা হয়েছে, যথাক্রমে, 'নাটকের গদ্য', 'গদ্যরীতি ও পদ্যরীতি', 'অলঙ্করণ', 'স্টাইল'। শেষ দুটি প্রবন্ধের স্বতন্ত্রভাবে গ্রন্থে স্থান পাওয়ার যৌক্তিকতা কতখানি জানি না। অলঙ্করণ ও স্টাইল বলতে লেখক গদ্যের তথাকথিত 'বহিরঙ্গ' রূপের আলোচনা করেননি—সে-অবস্থায় গদ্যের

বিবর্তন প্রসঙ্গেই তো এই জাতীয় আলোচনার অবকাশ ছিল। 'অলঙ্করণ' নামে পরিচ্ছেদের সূচনাতেই লেখক জানিয়েছেন, "ব্যাপক দৃষ্টিতে রচনায় প্রযুক্ত অর্থময় শব্দের যেকোনো বিশিষ্টতা—সন্ধি, সমাস, বিশেষণ, বাক্যবন্ধ ইত্যাদি যেকোনো কিছুই—এই অলঙ্করণের বিষয়বস্তু হতে পারে।" কিন্তু প্রকৃতপক্ষে লেখক রবীন্দ্রনাথের গদ্য থেকে কয়েকটি প্রচলিত শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করেছেন মাত্র।

'গদ্যরীতি ও পদ্যরীতি' পরিচ্ছেদের প্রথম বাক্য—"রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী কোনো গদ্য লেখকই পদ্য লেখক ছিলেন না।" কথাটির অর্থ বোঝা গেল না। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের অধিকাংশ গদ্য লেখকই তো পদ্য লিখতেন, যার ভালো দৃষ্টান্ত দীনবন্ধু মিত্র; অন্যদিকে পদ্য লেখকদের মধ্যে প্রায় সকলেই গদ্য লিখেছেন, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত থেকে রঙ্গলাল-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র পর্যন্ত। আসলে মনে হয়, লেখক বলতে চেয়েছেন, গদ্য ও পদ্য উভয়ক্ষেত্রেই সমান প্রতিভার প্রকাশ দুর্লভ; কিন্তু লেখক যে-বাক্যটি ব্যবহার করেছেন তা আক্ষরিক অর্থে বিভ্রম সৃষ্টি করে। এই পরিচ্ছেদেই লেখক একাধিকবার 'পয়ার ছন্দ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন (পৃঃ ৮১—৮২), কিন্তু 'পয়ার' কোনো ছন্দের নাম নয়। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ নিজেও কখনো এই ভুলই করেছেন, কিন্তু আজকের দিনে কোনো ছন্দোবিজ্ঞানীই একে ভুল ব্যবহার ছাড়া আর কিছু বলবেন না। অন্যদিকে 'পয়ার জাতীয় মাত্রাবৃত্ত ছন্দ' বলতে লেখক কি বুঝাচ্ছেন? সেখানে কি 'পয়ার' অন্য অর্থে ব্যবহৃত?

অবশ্যই, রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতি নিয়ে প্রথম আলোচনাকালে সামান্য ত্রুটিবিচ্যুতি খুব একটা বড়ো কথা নয়। লেখকের আলোচনা-পদ্ধতি সাধারণভাবে উপভোগ্য, কারণ তিনি নিজে সাহিত্যের মূল রহস্যটি ধরতে পেরেছেন এবং সাহিত্যরসের আস্বাদ পাঠককেও দিতে সক্ষম হয়েছেন। সমগ্র গ্রন্থটি স্বচ্ছন্দ গতিতে প্রসন্ন মনে দ্রুত পড়া যায়, এবং যদিও লেখক কোনো কোনো সময়ে বড়ো বেশি সংক্ষেপে সবকিছু সেরেছেন মনে হয়, তবু এই সংক্ষিপ্তিই অধিকাংশ বক্তব্যকে তাৎপর্যপূর্ণ ও চিন্তাদ্যোতক করে তুলেছে।

গ্রন্থটিতে সূচীপত্রের অভাব বিশেষভাবে অনুভব করেছি। ছাপার ভুল একটু বেশি, কয়েকটি রীতিমতো বিভ্রান্তিকর। পরবর্তী সংস্করণে গ্রন্থটি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে উঠবে প্রত্যাশা রাখি।

অলোক রায়

সারা ভারত কৃষক সভার বিংশ সম্মেলন

এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে সারা ভারত কৃষক সভার বিংশতি সম্মেলন চব্বিশ পরগণা জেলার বারাসাত (তিতুমীর নগর)-এ অনুষ্ঠিত হলো। পাঁচ-দিনব্যাপী সম্মেলনের আগে-পিছে আরও কয়েকটি দিন নিয়ে প্রায় দশদিন বারাসাত শহরে যে-প্রাণচাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল, তার অসাধারণ অনন্যতা বহু মানুষের কাছে ধরা পড়েছে। কৃষকের সম্মেলনকে বারাসাত শহরের অকৃষক মানুষেরা এমন আপন করে নিয়েছিলেন—যার শোভা কারুর দৃষ্টি এড়াতে পারে না। ইদানিংকালে রাজনৈতিক প্রত্যেকটি প্রশ্নে প্রভূত বিবাদ পরিলক্ষিত হয় এবং সেই বিবাদই শ্রেণীসংগ্রাম বলে প্রতিনিয়ত বিস্তর প্রচার চালানো হয়। কিন্তু বারাসাত কৃষক সম্মেলনে কারুর মনেই আসেনি যে, কৃষকদের গণতান্ত্রিক সংগ্রাম দেশের বৃহত্তর গণতান্ত্রিক সংগ্রামের অঙ্গ ছাড়া অতিরিক্ত কিছু মারমুখী কিংবা নির্দয়।

অথচ বারাসাত কৃষক সম্মেলনে প্রতিনিধিরা সরাসরি সংগ্রামের ময়দান থেকে এসেছিলেন। কৃষক সম্মেলনের সংলগ্ন একটি ছোট হাসপাতাল তৈরি করা হয়েছিল। এখানে এমন একজন রোগীরও অস্ত্রোপচার করা হয়, যরি পায়ের গোড়ালি থেকে বন্দুকের বুলেট অপসারিত করতে হয়েছে। মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জাকষা বীর, কিন্তু মাটির মতোই সহিষ্ণু এই মানুষেরা বারাসাতে আজকের বাস্তবরূঢ় লড়াইয়ের সঙ্গে আগামীদিনের স্বপ্নকে সেতু বন্ধনে জোড়া লাগাতে জড়ো হয়েছিলেন।

বারাসাত সম্মেলন অত্যন্ত বিষয়নিষ্ঠ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, ৭০সাল তীব্র কৃষক সংগ্রামের বছর হবে। পশ্চিম বাঙলার কৃষক সংগ্রামের বহু বিচিত্রতা রয়েছে। তার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো কৃষক নিজেই তার ভূমি-বিপ্লবের সূচনা করেছে। যুক্তফ্রণ্টের পতন ও রাষ্ট্রপতির শাসনে অবশ্যই অনেক বিঘ্নের সৃষ্টি হবে। কিন্তু কৃষক আন্দোলন মোটের উপর এই স্থির প্রত্যয় রাখে যে, তাদের অর্জিত সাফল্যকে যেমন কেড়ে নিতে দেওয়া হবে না, তেমনই নতুন নতুন সাফল্যের জন্য সংগ্রামই হলো অর্জিত সাফল্যকে রক্ষার জন্যও সর্বশ্রেষ্ঠ রণকৌশল।

পশ্চিম বাঙলার কৃষক সংগ্রামের সবলতা সারা ভারতের হৃদয়কে স্পর্শ করেছে। বারাসাত থেকে প্রত্যাবর্তনের পরই প্রতিবেশী আসাম এবং

বহু দুরের মহারাষ্ট্র থেকেও কৃষক সংগ্রামের যে-খবরগুলি আসতে শুরু করেছে, তার মধ্যেই বারাসতের আহ্বানকে চেনা যাবে।

বারাসাতে কৃষক সম্মেলনের আর একটি উদাত্ত ডাক হলো একতার। কৃষক-ঐক্য স্থাপনের দুটি পথ। এক, কৃষকদের নিজস্ব সংগঠনে একতা গড়া। দুই, কৃষকদের মধ্যে কর্মরত সকল দলের সকল প্রতিষ্ঠানের যুক্তফ্রণ্ট গড়া। বারাসাত কৃষক সম্মেলনের মঞ্চ থেকে ফরোয়ার্ড ব্লকের প্রখ্যাত নেতা শ্রীহেমন্তকুমার বসুর বক্তৃতা, এস ইউ সি দলের নেতা শ্রীসুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষণ প্রভৃতি ঘটনার প্রকৃত তাৎপর্য দিনে দিনে বিকশিত হবে। বারাসাতের সাফল্য এখানেও যে, বারাসাতের পরই সি পি এম পরিচালিত কৃষক সভার সঙ্গে সারা ভারত কৃষক সভার যুক্ত আন্দোলনের নিমিত্ত পারস্পরিক আলোচনায় তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি ঘটেছে।

বারাসাতের কৃষক সমাবেশটি বৃহৎ ও বলিষ্ঠ হয়েছিল, মাত্র একথা বললে তার প্রকৃত মূল্যায়ন স্পষ্ট হবে না। যুক্তফ্রণ্ট সরকার পতনের অব্যবহিত পরে রাজ্যে নানা প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসার যে-মেঘ জমছিল, বারাসাত মুহূর্তের মধ্যে তা পরিষ্কার করে দিয়েছে। যুক্তফ্রণ্ট নিশ্চয়ই মানুষকে সাহস ও আত্মপ্রত্যয় দিয়েছিল। যুক্তফ্রণ্ট সরকারের পতনের পর সেই শক্তি কি ভেঙে পড়বে? বিভিন্ন দল নিয়ে যুক্তফ্রণ্ট যখন ভেঙে গেল, তখন গ্রামের গরীবদের কি মন ভেঙে যাবে? তার জবাবে বারাসাতের শিক্ষা হলো এটাই যে, একতার শিক্ষা শুধু নেতারাই দেয় না। বরং নেতারা যখন ব্যর্থ হন, তখন মানুষ নেতাদের শেখায়, পৃথিবীর যুক্তফ্রণ্টের ইতিহাস সেই শিক্ষাতেই ভরা।

জ্যোতি দাশগুপ্ত

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিজয়ের পঁচিশতম বার্ষিকী

সমাজতান্ত্রিক জার্মানিতে একটি সঙ্গীত খুব জনপ্রিয়। তার প্রথম পঙক্তিটি হচ্ছে "চিতাভস্ম থেকে আমরা জন্মগ্রহণ করেছি।" আজ থেকে পঁচিশ বছর পূর্বে জার্মানির মাটিতে ফ্যাসিবাদের উপর চূড়ান্ত আঘাত হেনেছিল মানবতা ও গণতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরী সোভিয়েত লালফৌজের দুর্জয় সেনানীরা। পৃথিবীর প্রতিটি মুক্তিকামী মানুষের আশীর্বাদধন্য লালফৌজ

ফ্যাসিস্ত নায়ক হিটলারের দেশের এক বিরাট অংশে ফ্যাসিবাদের কবর রচনা করেছিল, সেই সঙ্গে রচনা করেছিল সারা দুনিয়ায় নাৎসী বর্বরতার বিরুদ্ধে যোগ্য ও সংগ্রামী প্রতিরোধ।

পঁচিশ বছর পূর্বে, খোদ হিটলার-শাসিত জার্মানির একটি অংশে নাৎসী স্বৈরাচারী শাসনের বিরোধিতা এক অভ্যুত্থানের জন্ম দিয়েছিল এবং সেই অভ্যুত্থানের ফলস্বরূপ জন্ম হয়েছিল জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র নামে নতুন একটি রাষ্ট্রের। দু-দুটি বিশ্বমহাযুদ্ধ যে-জার্মানির ভূখণ্ড থেকে জন্মগ্রহণ করেছিল, সেই দেশের অর্ধাংশে এই শান্তিপ্রিয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উৎপত্তি ইতিহাসের দিক থেকে এক বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মহান বিজয় এই রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রচিত হয়েছিল। ওয়ারশ, রোটারডাম, কভেন্ট্রি, ফ্লোরেন্স, স্তালিনগ্রাদ—যেখানেই মানুষ ফ্যাসিস্ত বর্বরতার বিরুদ্ধে মরণপণ সংগ্রাম করেছে—সেই অমর শহীদদের স্বপ্নের সফল রূপ এই জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। ফ্যাসিবাদের কেন্দ্রস্থলে যে-আঘাত পঁচিশ বছর আগে হানা হয়েছিল, তারই ফলশ্রুতি হিসেবে মানুষের মুক্তির দিশারী হয়ে আন্ত-র্জাতিক শ্রমিক-সংহতি, দেশপ্রেমিক মানুষের মহান ঐক্য এবং নানা দল ও মতের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মোর্চার সংগ্রামী ইতিহাস ইয়োরোপে এক নতুন সম্ভাবনার জন্ম দিল।

জন্মমুহূর্ত থেকে জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র জার্মানির মাটি থেকে ফ্যাসিবাদ ও সামরিক একনায়কতন্ত্রকে শিকড় থেকে উপড়ে ফেলার গৌরবোজ্জ্বল সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। অপর দিকে পটসডাম চুক্তিকে পদ-দলিত করে প্রাচীন নাৎসী অনুচরেরা আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদের সেবাদাস পশ্চিম জার্মানিতে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে দিনের পর দিন আশঙ্কা-জনকভাবে সংঘবদ্ধ হচ্ছে।

আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ এখন হিটলারের ফ্যাসিবাদকে অনুসরণ করে চলছে। ভিয়েতনাম, লাওস, কাম্বোডিয়ায় তারা সবচেয়ে নৃশংস ও আদিম পদ্ধতিতে আগ্রাসন-নীতির বিস্তার ঘটিয়েছে এবং বিশ্বশান্তির বিরুদ্ধে এক বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। সন্‌মাই এবং অন্যান্য ভিয়েতনামী অঞ্চলে লক্ষ লক্ষ নিরীহ গ্রামবাসীকে খুন করে আমেরিকার ভাড়াটে সৈনিকেরা নাৎসী যুদ্ধ-নায়কদের হিংস্রতাকেও বহু ক্ষেত্রে অতিক্রম করেছে।

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে মানবতার পঁচিশতম বিজয়-বর্ষে কেবল অতীতের সংগ্রামের গৌরবপূর্ণ অধ্যায়ের কথা স্মরণ করাই যথেষ্ট নয়। ভিয়েতনাম, পশ্চিম জার্মানি, গ্রীস, স্পেন, এ্যাঙ্গোলা, মোজাম্বিক, দক্ষিণ আফ্রিকা, লাওস, কাম্বোডিয়া বা পৃথিবীর যে-কোনো স্থান, যেখানে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য মানুষ জানপণ লড়াই করছে—তার সপক্ষে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের সঙ্কল্প গ্রহণ করার মধ্য দিয়েই এই রজত-জয়ন্তী উৎসব সঠিকভাবে উদ্‌যাপিত হতে পারে।

ভারত-গণতান্ত্রিক জার্মান প্রজাতন্ত্র সুহৃত সমিতি দোসরা মে সুবোধ মল্লিক স্কোয়্যারে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিজয়ের পঁচিশতম বার্ষিকী উপলক্ষে যে-সভা ও অনুষ্ঠান করলেন – সেখানে এই দায়িত্ববোধের প্রকাশ সঠিকভাবেই পাওয়া গেল। (স্মরণে রাখা প্রয়োজন, ১৯৪৫-এর ৮ই মে সারা ভারতে প্রথম কলকাতায় এই সুবোধ মল্লিক স্কোয়্যার—প্রাক্তন ওয়েলিংটন স্কোয়্যার—থেকেই ফ্যাসি-বিরোধী সংগ্রামের বিজয় মিছিল বের করেছিলেন ২৫,০০০ শ্রমিক মেয়েরা তাঁদের হাতে-তৈরি জিনিসপত্র দিয়ে ভিয়েতনাম-বাজার বসিয়েছিলেন। সেখানে বেচাকেনা যা হলো—তার সমস্ত অর্থটাই যাবে ভিয়েতনামের মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যে।

মাত্র এই একটি উদাহরণেই বোঝা যায় ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই কত বিচিত্রগামী এবং তা দেশে দেশে কত রূপেই না চলেছে।

অমিতাভ দাশগুপ্ত

পশ্চিমবঙ্গ সাক্ষরতা কনভেনশন

গত ২৫ এবং ২৬এ এপ্রিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পশ্চিমবঙ্গ সাক্ষরতা কনভেনশন হয়ে গেল। সচরাচর যেমন হয়ে থাকে এইসব সীরিয়স ব্যাপার-স্যাপারে, সেই মাছি তাড়াবার অবস্থার বদলে দু-দিনের অধিবেশনই বেশ জমজমাট দেখলুম। বাঙলাদেশের ১২টি জেলা থেকে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে ১২৮ জন প্রতিনিধি এই অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁরা সবাই যে সাক্ষরতা আন্দোলনের সঙ্গে পূর্বাপর যুক্ত এমনও নয়। এঁদের মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সহ বিভিন্ন স্কুল-কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক এবং মাস্টারমশাইরা ছিলেন, শ্রমিক সংস্থার প্রতিনিধিরা ছিলেন,

আর ছিলেন বিভিন্ন সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানের কয়েকজন শিক্ষানুরাগী মানুষ। শনিবার দুটো থেকে সাড়ে ছটা পর্যন্ত এই অধিবেশন চলেছে। মাঝে চা আর মধ্যাহ্নভোজনের বিরতি। ফাঁকে ফাঁকে নাচগানের কোনো ব্যবস্থাও উদ্যোক্তরা রাখেননি (সবশেষে কবি এক্রাম আলির নিরক্ষরতার উপর কবিগান ছাড়া), তবু আশ্চর্য, এই ১২৮ জন প্রতিনিধির প্রায় প্রত্যেকে আগাগোড়া বসে সাক্ষরতা বিষয়ে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন মত শুনেছেন, নিজেদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। সম্ভবত এইবারের সাক্ষরতা কনভেনশনের সার্থকতা এইখানেই। এই প্রতিনিধিরা কেউই তাঁদের উপস্থিতিমাত্র দিয়ে কনভেনশনকে ধন্য করতে চাননি। নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে ব্যাপক গণ-আন্দোলন গড়ে তুলবার কাজে নিজেদের নিয়োজিত করা তাঁরা কর্তব্য মনে করেছেন।

ভারতবর্ষের সাক্ষরতা-মানচিত্রে পশ্চিমবঙ্গ বর্তমানে নবম স্থানে রয়েছে। স্বাধীনতার ২৩ বছর পরেও দ্বিতীয় স্থান থেকে নবম স্থানে তার এই ক্রমাবনতির কারণ প্রধানত সরকারী ঔদাসীন্য। কিন্তু আমরা যারা শিক্ষানুরাগী বলে নিজেদের পরিচিত করতে ভালোবাসি এবং রাজনৈতিক দলগুলি—আমরা কেউই একেবারে দোষমুক্ত নই। বরং আমরা যদি সমস্যাটির গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতাম, তবে সরকারী ঔদাসীন্যের প্রশ্রয়ে সমস্যাটি নিশ্চয়ই এতদূর বাড়তে পেত না।

গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতায় নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য যে-সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিরা সেখানে একটি আলোচনা-সভায় মিলিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গের নিরক্ষরতা সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনার পর একটি রাজ্য কমিটি গঠন করেন এবং ঐ সম্মেলনের ছ-মাসের মধ্যে একটি কনভেনশন আহ্বানের সিদ্ধান্ত নেন। এই কনভেনশনে বাঙলা-দেশের প্রতিটি শিক্ষানুরাগী মানুষ এবং সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, শ্রমিক-কৃষক সংস্থা মিলিত হয়ে নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে এক ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলবেন—সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিদের এমনতর একটা আশা ছিল। বলাবাহুল্য, বাঙলাদেশে শিক্ষানুরাগী মানুষের অভাব না থাকলেও, এই কনভেনশনের জন্য অনেকেই তাঁদের মূল্যবান সময় ব্যয় করতে পারেননি। কিন্তু যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, সুখের বিষয়, সমস্যাটিকে তাঁরা বিভিন্ন দিক থেকে তলিয়ে বিচার করেছেন। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বহু মূল্যবান তথ্য সাধারণের গোচরে এনেছেন। পশ্চিমবঙ্গের

রাজ্যপালের কাছে পেশ করবার জন্য নিরক্ষরতা দূরীকরণ সংগঠনী সমিতি যে-সাক্ষরতা সনদটি (Literacy charter) রচনা করেছিলেন, তার ওপর পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার জন্য তিনটি শাখা কয়েক ঘণ্টা সময় ব্যয় করেছিল। তারপর সনদটি গভীরভাবে পর্যালোচনা এবং পুনর্বিবেচনার জন্য পাঁচজনের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটি আগামী দেড় মাসের মধ্যে সংশোধিত সনদটি পেশ করলে জনমত সংগ্রহের পর তা রাজ্যপালের কাছে উপস্থাপিত করা হবে। এই সনদে সাক্ষরতা পর্ষদ গঠন, বাঙলাদেশের সাক্ষরতার হার বৃদ্ধির জন্য নির্দিষ্ট সময় সীমা বেঁধে দেয়া, নিরক্ষর শ্রমিক-কর্মচারীদের পড়াশোনার জন্য দৈনিক একঘণ্টা সবেতন ছুটি, সাক্ষরতার কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য নির্দিষ্ট ব্যয়-বরাদ্দ, ইত্যাদি দাবি জানানো হবে।

এই কনভেনশন থেকে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ১৫০তম জন্মবার্ষিকী পালনের জন্য ডঃ দৌলত সিং কোঠারীর সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়। যদিও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মবার্ষিকী পালন সাক্ষরতা আন্দোলনের কর্মীদের একচেটিয়া ব্যাপার নয়, কিন্তু অন্য কোনো ব্যক্তি বা সংগঠন এ-ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করছেন না বলেই, সাক্ষরতা আন্দোলনের সঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়কেও এঁরা সামিল করে নিলেন। গত বছর ১২ই আশ্বিন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুণ্যজন্মদিনে কলেজ স্কোয়্যারে সাক্ষরতা আন্দোলনের কর্মীরা যে-অনাড়ম্বর উৎসবের আয়োজন করেছিলেন, তাতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন বাঙলাদেশের জনসাধারণের কাছে বিদ্যাসাগর জন্ম-সার্ধশতবার্ষিকী পালনের জন্য এক আন্তরিক আবেদন জানিয়েছিলেন। বাঙলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের অবদান আজ আর আলোচনার অপেক্ষা রাখে না। বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে যাঁরা অনীহা বা ঔদাসীন্য প্রকাশ করে থাকেন, তাঁদের বর্ণ-পরিচয়ও সম্ভবত 'বর্ণ-পরিচয়' থেকেই। অথচ উপাচার্যের আবেদনের পর সাত মাস কেটে গেছে, আজও কোনো স্তরে কোনো রকম উদ্যোগ আয়োজন চোখে পড়ছে না। ধরে নেয়া যেতে পারে, এই মুহূর্তে সাক্ষরতা আন্দোলনের কর্মীরা ছাড়া বিদ্যাসাগরকে নিয়ে কারোর মাথা ব্যথা নেই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কপাল মন্দ। তাঁর শতবার্ষিকীতে দেশে শতবার্ষিকীর রেওয়াজ শুরু হয়নি। আর, ১৫০তম জন্মবার্ষিকীতেও তাঁর রচনা আর কর্মের নব মূল্যায়ন করবার,

ঘরে ঘরে তাঁর কর্মধারাকে ব্যাপ্ত করে দেবার কোনো প্রচেষ্টাই পরিলক্ষিত হচ্ছে না। সম্ভবত আমাদের দেশের অগ্রগতির সঙ্গে তিনি তাল রাখতে পারেননি। একটু পুরনো হয়ে গেছেন!

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেনকে সভাপতি করে এই কনভেনশন থেকে 'পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি' নামে একটি কমিটিও গঠন করা হলো। এই কমিটি আগামী এক বছরের জন্য নিম্নলিখিত ১৫ দফা কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন:

(১) নিরক্ষরতা দূরীকরণের সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি সংগঠন এবং নরনারীকে এই কনভেনশন থেকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করা।

(২) নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে জাতীয় উদ্যোগ সংগঠিত করবার জন্য ব্যাপক জনমত গঠন করা।

(৩) আগামী এক বছরের মধ্যে অন্তত ১৫০টি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা।

(৪) আন্দোলনকে প্রতিটি জেলায় ছড়িয়ে দেবার জন্য জেলা সংগঠন গড়ে তোলা; প্রথম দফায় অন্তত প্রতিটি জেলায় অন্তত একটি আদর্শ বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র চালু করা।

(৫) আন্দোলন সম্পর্কে প্রতিটি শিক্ষিত মানুষকে সজাগ করার জন্য আন্দোলনের গতি-প্রগতি নির্ধারণের জন্য, একটি মুখপত্র প্রকাশ করা।

(৬) সদ্য-সাক্ষরদের উপযোগী সাহিত্য প্রকাশ করা।

(৭) নিয়মিত বয়স্ক শিক্ষা শিক্ষণ শিবিরের ব্যবস্থা করা।

(৮) প্রাক-সাক্ষরতা স্তর থেকে কার্যকরী শিক্ষার স্তর পর্যন্ত একটি সুচিন্তিত সিলেবাস তৈরি করা।

(৯) এই সমস্ত কিছুরই মূল্যায়ন ও বৈজ্ঞানিকীকরণের জন্য একটি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন।

(১০) পঠন-পাঠন কর্মসূচীকে সজীব ও আকর্ষণীয় করার জন্য পদ্ধতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা। Mass mediaকে যতদূর সম্ভব ব্যবহার করা।

(১১) 'জাতীয় সেবা প্রকল্প' (National Service Scheme)-এর কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করা।

(১২) বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও অবসর সময়ের শিক্ষার বিশেষ শিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

(১৩) সাক্ষরতা প্রসারে সরকারী ঔদাসীন্যের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করা।

(১৪) বিভিন্ন সময়ে সাক্ষরতার বিভিন্ন সমস্যা ও দিক নিয়ে আলোচনা-সভার আয়োজন করা।

(১৫) সাক্ষরতা অভিযানে উল্লেখযোগ্য কাজের জন্য পুরস্কার দান।

কনভেনশনে উপস্থিত প্রতিনিধিরা যে-উৎসাহ এবং ধৈর্যের সঙ্গে কনভেনশনকে সফল করেছেন, তা যদি পূর্বাপর বজায় থাকে, তবে আশা করা যায়, বাঙলাদেশে সাক্ষরতা আন্দোলনের ভবিষ্যৎ সত্যিই আর অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকবে না।

স্বপ্না দেব

বিশ্ব-শিক্ষা-সঙ্গমে

ইউনেস্কো ১৯৭০ সালকে শিক্ষাবর্ষ বলে ঘোষণা করেছে। সারা বিশ্বের শিক্ষক সমাজ বিশ্ব-শিক্ষক সংস্থা (FISE)-র নেতৃত্বে শিক্ষাবর্ষকে পালন করল বিশ্ব-শিক্ষক সম্মেলন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো ছয় থেকে দশই এপ্রিল জি ডি আর-এর রাজধানী বার্লিন শহরে। ১৯৭০ আবার লেনিনের জন্মশতবার্ষিকী বছর। তাই এগারোই এপ্রিল বিশ্বের শিক্ষক সমাজ লেনিনের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন লেনিন ও শিক্ষা এই বিষয়ের ওপর একটি আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। বারোই এপ্রিল শিক্ষকরা মিলিত হলেন এক সংহতি কনভেনশনে। তাঁরা সংহতি ঘোষণা করলেন অমর ভিয়েতনামের সংগ্রামী শিক্ষক ও শ্রমজীবী মানুষদের সঙ্গে; প্যালেস্টাইন ও অন্যান্য আক্রান্ত আরব দেশের শিক্ষকদের সঙ্গে; কিউবা, উত্তর কোরিয়া এবং পূর্ব জার্মানির শিক্ষকদের সঙ্গে; লাতিন আমেরিকা ও আফ্রো-এশিয়ার বিভিন্ন দেশের মানুষের সঙ্গে। সমস্ত দেশেই মেহনতী মানুষকে হিংস্র সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হচ্ছে।

সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো বিখ্যাত কংগ্রেস হলে। জার্মান জাতি অতিথি-বৎসল। ব্যবস্থাপনা নিখুঁত ও সুন্দর। তাৎক্ষণিক অনুবাদের ব্যবস্থা

ছিল একসঙ্গে বারোটি ভাষায়। অর্থাৎ যে-কোনো প্রতিনিধি বেতার-তরঙ্গ মাধ্যমে যে-কোনো ভাষার বক্তৃতা ঐ বারোটি ভাষার মধ্যে তার পছন্দমতো যে-কোনো একটি ভাষায় তাৎক্ষণিক অনুবাদ মারফৎ শুনতে পেতেন। আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল বার্লিনের সেরা আন্তর্জাতিক হোটেল 'বেরোলিনায়া' এবং 'উন্‌তের দেন লিন্‌দেন্‌' (লেবুগাছের নিচে)-এ।

সম্মেলন নিজেকে চারটে কমিশনে বিভক্ত করে তার কাজ পরিচালনা করে। চারটি কমিশনের আলোচ্য বিষয় ছিল [১] কারিগরী বিদ্যা ও বিজ্ঞানের যুগে শিক্ষা এবং শিক্ষকদের ভূমিকা [২] শিক্ষার গণতন্ত্রীকরণ [৩] শিক্ষকের সামাজিক সম্মান ও আর্থিক নিরাপত্তা [৪] শিক্ষকের যোগ্যতাবৃদ্ধি ও শিক্ষক শিক্ষণ। এই চারটি কমিশন প্রচুর আলোচনা ও বিতর্কের পরে সম্মেলনের কাছে তাঁদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। দশই এপ্রিল সম্মেলনের প্লেনাম এই চারটি কমিশনের সিদ্ধান্ত ছাড়াও পাশ করে 'পৃথিবীর সমস্ত শিক্ষকদের নিকট আবেদন'। এই আবেদনে প্রধানত বলা হয় যে শিক্ষক তার পেশা অনুযায়ী শ্রমজীবী জনগণের অংশ। শ্রমিক ও কৃষক তার নিকটতম মিত্রশ্রেণী। শিক্ষায়তন এবং শিক্ষাব্যবস্থা সমাজ পরিবর্তনের এক শক্তিশালী অস্ত্র। শিক্ষককে এবং শিক্ষক প্রতিষ্ঠানকে তাদের কার্য পরিচালনা করতে হবে প্রয়োজনীয় শ্রেণীসচেতনতার সঙ্গে। শিক্ষক সংগঠনের কাজ হলো গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য নিরলস সংগ্রাম করা, আর গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থার অর্থ হলো এমন শিক্ষা-ব্যবস্থা—যেখানে প্রতিটি শিশু সর্বোন্নত শিক্ষার সুযোগ পাবে। জাতিগত, ধর্মীয়, বর্ণগত কোনো বৈষম্য এর অন্তরায় হবে না। সর্বোচ্চ শিক্ষালাভে আর্থিক অক্ষমতা বাধা সৃষ্টি করবে না। কিন্তু গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা অগণতান্ত্রিক সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামোয় সম্ভব নয়। তাই শিক্ষক সংগঠনকে সংগ্রাম করতে হবে গণতন্ত্রের জন্য, শান্তি ও স্বাধীনতার জন্য। পুঁজিবাদী দেশে, বিশেষ করে অনুন্নত দেশে, শিক্ষকদের চাকরিতে আইনগত বা আর্থিক নিরাপত্তা বা সামাজিক সম্মান কোনোটাই নেই। ব্যক্তি-মালিকানায় পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক বিত্তবানের ভৃত্যের পর্যায়ভুক্ত। শিক্ষক সংগঠনগুলোকে এক্ষেত্রে সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে শ্রমিক ও অন্য শ্রমজীবী মানুষের সহযোগিতায়। এর জন্য ব্যাপক প্রচার, ধর্মঘট এবং অন্যান্য সমস্ত পদ্ধতি অবলম্বন করতে হতে পারে।

শিক্ষককে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের সুযোগ দিতে হবে যাতে সে নিজের বিষয়ে সর্বোচ্চ বিদ্যা অধিগত করতে পারে। সম্মেলন আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠন (ILO)-এর কাছে আবেদন করেছে-যেন অবিলম্বে শিক্ষকদের সম্পর্কে আন্তর্জাতিক শালিসি সভা (International Consultative Commission) প্রতিষ্ঠা করা হয়। সমস্ত দেশের সরকার যেন ILO, UNESCO-র ১৯৬৬র যুক্ত সুপারিশ কার্যকর করে। পরিশেষে সব শিক্ষকদের ভবিষ্যত মানবজাতির প্রতি তাদের দায়িত্বের কথা; নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা, ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কার, সাম্রাজ্যবাদ ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে তাদের নিরলস সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। এসব বিষয়ে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর এবং সেখানকার শিক্ষার ও শিক্ষকদের অগ্রগতির কথা বিশেষ ভাবে স্মরণ করা হয়েছে।

সম্মেলন, আলোচনাচক্র এবং সংহতি কনভেনশনের পর আমরা গেলাম জি ডি আর ও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে শহরে স্কুলে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে ওদের শিক্ষাব্যবস্থা সমন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করার জন্য। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষার মানুষ আমরা আমাদের শিক্ষকতার ও শিক্ষা আন্দোলনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে শিখলাম অনেক দেখলাম জানলাম আরও বেশি।

মৃন্ময় ভট্টাচার্য

আনা লুই স্ট্রং

সম্প্রতি বিপ্লবী সাংবাদিক এবং সোভিয়েত ও চীন বিপ্লবের ভাষ্যকার আনা লুই স্ট্রং শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। আনার জন্ম ১৮৮৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেব্রাস্কায়। ১৯২১ সালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষে সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। সদ্যবিপ্লবসমাপ্ত রুশ দেশে তখন চলেছে মানব-ইতিহাসকে নতুন মর্যাদা দেবার মহাযজ্ঞ। বিশ্বের মানবতাবাদী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যাঁরা প্রথমেই এই মহাবিপ্লবের তাৎপর্য অনুধাবন করেছিলেন, শ্রীযুক্তা আনা লুই স্ট্রং তাঁদের একজন। রুশ দেশের চতুর্দিকে তখন বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের আগ্রাসন; ভেতরে চলেছে পুরনো আমলাতন্ত্রী, জমিদার, পুঁজিপতি, প্রতিক্রিয়াশীলদের শ্বেত-সন্ত্রাস, শ্বেত-রক্ষীদের আক্রমণ। একদিকে গৃহযুদ্ধ ও আগ্রাসন; অন্যদিকে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, মৃত্যু শিশু-সোভিয়েতকে ভেতরে বাইরে পিষে মারতে চায়। আর তখনই ১৯২১ সালে আনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে 'আমেরিকার মিত্র সেবাদল বাহিনী' নিয়ে রুশিয়ায় ছুটে এলেন। আনা হয়ে উঠলেন বিপ্লবের সহমর্মী, বিপ্লবের সাংবাদিক, ভাষ্যকার। দুনিয়া জুড়ে সোভিয়েত-বিরোধী প্রচারের বিরুদ্ধে তিনি কোমর বেঁধে দাঁড়ালেন, প্রতিষ্ঠা করলেন 'মস্কো নিউজ' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা। বহু দেশের মানবদরদী বহু মনীষী 'মস্কো সংবাদ'-এর কাছে সত্য খবর জানতে পারলেন। রমা রঁলা, এইচ. জি. ওয়েলস, বার্নাড শ, টমাস মান, আইনস্টাইন, রবীন্দ্রনাথ, আঁদ্রে জিদ, মরিস হিনডাস প্রভৃতি মনীষীরা কুৎসার কুয়াশা ভেদ করে নতুন রুশের নবজাতক মূর্তিটি দেখতে পেলেন। আনা সেই থেকে সোভিয়েত ভূমিতে রয়ে গেলেন। নতুন সভ্যতার তীর্থভূমি শোষণমুক্ত সোভিয়েত সমাজতন্ত্র। সোভিয়েত ভূমিতে বসেই তিনি সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির লেনিনবাদী কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করলেন। দেখলেন, ইওরোপে জার্মানি-ইতালিতে সাম্রাজ্যবাদ কি বীভৎসরূপ ধরে এলো ফ্যাসিবাদ-নাৎসীবাদের সভ্যতাঘাতী দমনরাজ বন্দুকরাজ হয়ে। প্রজাতন্ত্রী স্পেনের মাটিতে ফ্যাসি-বাদীরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ড্রেস-রিহার্সালের মহড়া দিল। দেখলেন, তরুণ সোভিয়েত ভূমির বিরুদ্ধে পশ্চিমী গণতন্ত্রের বাক্যবাগীশের দল কেমন করে দস্তুর ফ্যাসিবাদকে আক্রমণের জন্য ঠেলে দিতে চাইল। ভার্সাই চুক্তির

শবাধারে গণতন্ত্রের শবদেহ রাখার অভিযানে মত্ত পাশব শক্তি ফ্যাসিবাদের দাপট তিনি দেখলেন। সেই রূঢ় রাজনৈতিক ঝড়-বাদলে তিনি পথ হারালেন না। আরো শক্ত করে আঁকড়ে ধরলেন মুক্ত মানবতার তীর্থ-ক্ষেত্র সোভিয়েত ভূমিকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলিতে আনা লুই স্ট্রং জনযুদ্ধের শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক হয়ে উঠলেন।

তারপর ১৯৪৫এ রাইখস্টাগে লাল পতাকা উড়ল। যুদ্ধ শেষ। শান্তি এলো। এরপর ঠাণ্ডাযুদ্ধের যুগ। স্তালিন তখন ক্ষমতার উচ্চশিখরে। ব্যক্তিপূজার অন্ধ সংস্কারের বন্ধনে তখন তিনি সজ্ঞানে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছেন। লেনিনগ্রাদ-মস্কো-স্তালিনগ্রাদের বিজয়ী স্তালিন সন্দেহ-সংশয়ে শঙ্কিত, বিপর্যস্ত। আর সেই স্তালিনের অধঃপতনের যুগে চঞ্চল হয়ে উঠলেন আনা। মর্মবেদনায় বিক্ষত তিনি পা বাড়ালেন মহাচীনের দিকে। তাঁর পরিচয় হয়েছিল ইতিপূর্বেই মাও সে তুং, মাদাম সুং চিং লিং, চু তে, লিও সাও চি, চু এন লাই-এর সঙ্গে। স্তালিন-শাসনের শেষ পর্যায়ে মর্মাহত আনার ভাগ্যে আরও কিছু বাকি ছিল। পশ্চিমী দেশের গুপ্তচর সন্দেহে আনা সোভিয়েত ইউনিয়নে বন্দী হলেন। দুনিয়া জুড়ে প্রগতিবাদী মানুষ এ-খবরে হতচকিত হলেন। মুক্তিও পেলেন তিনি। মুক্তির পর আনা কেবল বললেন, "আমার প্রতি অবিচার হয়েছে।" আর কিছু নয়। পাছে তাঁর কথা নিয়ে পশ্চিমী শক্তিরা সোভিয়েত-বিরোধী কুৎসা ছড়ায় —তাই কিছুই আর তিনি বললেন না!

আনা লুই স্ট্রং এবার এলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। তখন রোজেনবার্গ দম্পতির বিরুদ্ধে মার্কিন সরকার গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ এনে বিচার প্রহসন চালাচ্ছে। আনা এই শান্তিবাদী বৈজ্ঞানিক দম্পতিকে মুক্ত করার জন্য মামলা চালাবার অর্থ-সংগ্রহের কাজে সক্রিয় অংশ নিলেন। তাঁর প্রতি অবিচার হয়েছে—এ-কথা ঠিক। কিন্তু সেই বেদনায় তিনি সোভিয়েত ভূমিকে বর্জন করলেন না। আমৃত্যু রইলেন সোভিয়েতের বন্ধু। রোজেনবার্গ দম্পতির মুক্তির লড়াইয়ে অংশ নিয়ে এবং সোভিয়েতের প্রতি একনিষ্ঠ থেকেই তিনি স্তালিনের অন্যায়ের জবাব দিলেন!

দ্বিতীয় প্রতিবাদ আরও বিস্ময়কর। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতি কংগ্রেসে নিকিতা খ্রুশ্চোভ যখন ব্যক্তিপূজার অধঃপতনের যুগে স্তালিনের বহুবিধ অন্যায় কাজ প্রকাশ করলেন, তখন তার ফলে দুনিয়া জুড়ে

প্রগতিশীল মানুষের মধ্যে কিছু কিছু বিভ্রান্তিও দেখা দিল। আর ব্যক্তিপূজার প্রতিবাদ করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত কেউ কেউ সোভিয়েত গঠন ও মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধে স্তালিনের অবদানই তুচ্ছ করতে শুরু করলেন। তখন বেরোল আনার 'স্তালিনের যুগ'। তাতে তিনি লিখলেন :

"I think that, looking back, men will call it 'The Stalin Era.' Tens of millions of people built the World's first socialist state but he was the engineer. He first gave voice to the thought that the peasant land of Russia could do it. From that time on, his mark was on all of it on all the gains and all the evils.

"To my friends of the west, I would say: this was one of history's great dynamic eras, perhaps its greatest. It changed not only the life of Russia but of the world. It left no man unchanged of those who made it. It gave birth to millions of heroes and to some devils. Lesser-men can look back on it now and list its crimes. But those who lived through the struggle and even many who died of it, endured the evil as part of the cost of what was built.

"Nor for this only. The Stalin Era built not only the world's first socialist state and the strength that stopped Hitler. It built the economic base for all those Socialist states today in which are one third of mankind."

১৯৫৪ সালে তিনি চীন দেশে স্থায়ীভাবে বাস করতে এলেন। মহাচীন পুনর্গঠনের মহাবিপ্লবের তিনি একজন সক্রিয় অংশীদার হলেন। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'দি চাইনিজ কন্‌কার চায়না' ও 'দি ওয়াইল্ড রিভার' চীনের নবজাগরণের এক নিখুঁত শিল্পপ্রয়াস।

আনা লুই স্ট্রং একদিক দিয়ে সত্যই ভাগ্যবতী। সোভিয়েত বিপ্লব, পরিকল্পনা, মহা দেশপ্রেমিক যুদ্ধ যেমন তিনি মনপ্রাণ দিয়ে জেনেছেন ; তেমনি চীনের বিপ্লব ও পুনর্গঠনের তিনি অংশভাগিনী। আধুনিক ইতিহাসের এই বিপজ্জনক ও দুঃসাহসিক বাঁক সার্থকভাবে অতিক্রম করেছেন আনা লুই স্ট্রং। জন রীড, লিনকন স্টিফেন, অ্যানি স্মিডলি, বার্টেট ও এডগার স্নো—এই বিখ্যাত বিপ্লবসাধক সাংবাদিকদের সঙ্গে আনা লুই স্ট্রং আমাদের যুগের বহুবিধ সাংবাদিক-বিভ্রান্তির বিরুদ্ধে মানবতার পক্ষে স্পষ্ট অঙ্গীকার। আনা লুই স্ট্রং-এর মৃত্যুতে আমরা শোকার্ত। শ্রদ্ধাবনত।

শান্তিময় রায়

'পরিচয়' পৌষ সংখ্যায় শ্রীজ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীতরুণ সেন 'পরিচয়'-এর অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত মদীয় রচনা 'লেখকদের শ্রেণী বিচার' প্রবন্ধের কোনো কোনো বক্তব্যের প্রতিবাদ করেছেন। প্রতিবাদ বা প্রত্যালোচনা সব সময়ই সুস্বাগতম্, কেননা এর দ্বারা বোঝা যায় রচনার উদ্দিষ্ট বক্তব্য অন্তত কিছু পাঠকের মনকে নাড়া দিয়েছে এবং তাঁদের মতামত অনুকূল বা প্রতিকূল যা-ই হোক তাঁদের ভাবনাকে তা উদ্রিক্ত করেছে। লেখক তো তা-ই চান—পাঠকের মনে চিন্তার তরঙ্গ তোলা, তাঁর ভাব-ভাবনাকে আলোড়িত করা। লেখকের কাছে এর চেয়ে বড়ো কাম্য আর কী হতে পারে যে তাঁর লেখা নিয়ে লোকে অন্তত কিছুক্ষণ ভাবুক, তদন্তর্গত প্রতিপাদ্যের সমর্থনে অথবা প্রতিকূলে কিছুক্ষণ ব্যাপৃত থাকুক। গুচ্ছের লেখা হলো অথচ তা-ই নিয়ে লোকের মনে কোনো সাড়াই জাগল না এমন অবস্থা কোনো লেখকের পক্ষেই শ্লাঘাকর নয়।

সুতরাং প্রতিবাদীদের আলোচনায় আমি খুব খুশী হয়েছি। আমার আত্মাভিমানকে তৃপ্ত করার জন্যে মনে মনে আমি তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানিয়েছি। কিন্তু সম্পাদক মহাশয়েরা চান যে আমি ওই দুটি প্রতিবাদের উত্তরে কিছু লিখি। ওই তো ওঁরা মুশকিল বাধালেন। কেউ প্রতিবাদ করলেই সে-প্রতিবাদের আবার প্রতিবাদ করতে হবে—এ-যে বড়ো সমস্যার কথা হল। সাহিত্য পত্রিকার নিয়মে এমন কি কোনো বিধান আছে যে, লেখকের পক্ষে তাঁর বক্তব্য নিবেদন করাটাই যথেষ্ট নয়, ওই বক্তব্য সম্পর্কে কেউ যদি লিখিতভাবে কোনো অভিমত প্রকাশ করেন তো এমনতরো প্রতিটি আলোচনার বেলায় লেখককে আবার প্রত্যালোচনার জন্য কলম ধরতে হবে? লেখককে জেরবার করবার এ-একটি সম্পাদক-রচিত সযত্ন ফাঁদ নয় কি? একে তো বর্তমান লেখক এমনিতেই কুঁড়ের হদ্দ, মূল লেখাই তার কলম থেকে সহজে বেরুতে চায় না, তার উপরে যদি আবার তাকে নূতন লেখার প্রতিবাদের প্রতিবাদ লিখতে হয়—তবে তো তা কুঁড়েমির আরাম কাটাবার একটা বাধ্যতামূলক ব্যায়াম হয়ে যায়। হায়, লেখককে কাবু করতে সম্পাদকের মনে এই ছিল! এমন জানলে আদৌ কি আমি কলম ধরতুম!

কিন্তু আপশোস করে লাভ নেই। তীর যখন একবার ছোঁড়া হয়েছে,

সে-তীর আর তূণীরে ফিরে আসবে না। লেখকদের শ্রেণীবিচার করতে বসে একবার যখন মনোজাত ভাবনাকে ভাষাগত রূপ দিয়েছি, তখন আর তা আমার আয়ত্তের মধ্যে নেই, তা সকলের আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে গেছে। সকলের—অর্থাৎ আলোচনায় যাঁরা ইচ্ছুক, তাঁদের। সুতরাং ছাপা সামলানোর জন্য তৈরি থাকতে হবে বইকি। ঝুম করে লোকের মাথা তাক করে একটা বক্তব্য ছুঁড়ে দেব, আর সে-বিষয়ে কেউ কিছু বলতে চাইলে হাত গুটিয়ে নেব, মুখে কুলুপ আঁটব—তা তো হয় না। সাহিত্যক্ষেত্রে এমন আবদারকে কেউ প্রশ্রয় দেবে না। কাজেই সম্পাদকদ্বয়ের ফরমায়েস পালন না করে উপায় কী! এ তো ফরমায়েস নয়, হুকুম। হুকুম তামিল না করে যে মানে মানে সটকে পড়ব, তার পথ তো নিজের হাতেই বন্ধ করে দিয়েছি ওই মূল লেখাটি কলমস্থ ও পত্রস্থ করে। অতএব মাভৈঃ "বাঁচি কি মরি" করে উত্তর-প্রত্যুত্তরমূলক বিতর্কে নেমে পড়া যাক।

প্রথমে শ্রীজ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্রটি নিয়ে আলোচনা করতে চাই।

আমি লেখকদের শ্রেণীবিচার করবার চেষ্টা করেছিলাম মূলত তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীর ভিত্তিতে। যেমন রাজনীতিবিমুখ অথবা রাজনীতি-সচেতন ঐতিহ্যবাদী সাহিত্যিক; অগ্রসর চিন্তার ধারক ও বাহক প্রগতিশীল কিন্তু দুর্বল ঐতিহ্যচেতনাসম্পন্ন সাহিত্যিক; গান্ধীবাদী সাহিত্যিক; সংবাদপত্র-সেবী ও সংবাদপত্র-সেবিত সাহিত্যিক; অ্যাকাডেমিক ধারার অর্থাৎ অধ্যাপকীয় গোত্রের লেখক। আমার এই শ্রেণাবিভাগ হয়তো লেখকদের বিজ্ঞান-সম্মত বর্গীকরণের কোঠায় পড়ে না, কিন্তু আমার বিনীত অভিমত এই যে, বাঙলা সাহিত্যে বর্তমানে লেখকদের মধ্যে যে-ধরনের গোষ্ঠীবদ্ধতা মেলামেশা আকর্ষণ-বিকর্ষণের পালা চলছে—তার মোটামুটি বিশ্বাসযোগ্য প্রতিফলন উপরের ঐ শ্রেণীবিভাগের মধ্যে পাওয়া যাবে।

শ্রীচট্টোপাধ্যায় আমার শ্রেণীবিভাগের নীতিতে আপত্তি তুলেছেন। তিনি বলেছেন, "আমার মনে হয়, লেখকের শ্রেণীবিভাগ করা উচিত অন্য মানুষের শ্রেণীবিভাগ যে-পদ্ধতিতে করা হয়, সেই পদ্ধতিতেই। অর্থাৎ ধন উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের শ্রেণীচরিত্র নির্ধারণের ভিত্তিতে। লেখকদের সম্পর্কেও সেই একই কথা।" তাঁর এই শ্রেণী-বিভাগ হয়তো আদর্শ শ্রেণীবিভাগ, কিন্তু তাঁর এই আদর্শ অনুযায়ী লেখক-

দের শ্রেণীচরিত্র নির্ধারণের কাজ আজ পর্যন্ত বাঙলা সাহিত্যে সাধিত হয়েছে কি? "কি হওয়া উচিত" আর "কী আছে" এই দুই অবস্থার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য বিদ্যমান। জ্যোতির্ময়বাবু যে-শ্রেণীবিভাগের কথা বলেছেন, তা বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব হলে খুবই সুখের কথা হত। কিন্তু সত্যিই কি তেমন ধারার শ্রেণীবিভাজন আমাদের লেখকদের মধ্যে চোখে পড়ছে? কই, আমার এই সাদা চোখে তো তেমন স্বর্গীয় দৃশ্য কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। তেমন দৃশ্য চোখে পড়লে দেখে চোখ জুড়নো যেত।

আসলে, জ্যোতির্ময়বাবুর অভীপ্সিত আদর্শের সঙ্গে আমার বিরোধ নেই। হয়তো তাঁর কথাই ঠিক, হয়তো তাঁর মাপকাঠি অনুযায়ী লেখকদের শ্রেণীবিচার হলে সেটাই বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিচার হত; কিন্তু জিজ্ঞাস্য, তেমন শ্রেণীবিচার আজও হয়েছে কি? শ্রেণীবিচার তো পরের পরের কথা, সে-প্রশ্ন দেখা দেবে যখন লেখকেরা একটা বিশেষ রীতিতে বা ভিত্তিতে শ্রেণীবদ্ধ হবেন; কিন্তু সত্যিসত্যি লেখকেরা তেমন ভাবে (অর্থাৎ ধন উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার ভিত্তিতে) শ্রেণীবদ্ধ হয়েছেন কি? আমার তো মনে হয়, একেবারেই হননি। তবে আর আদর্শ শ্রেণীবিভাগের কথা বলে লাভ কি?

মদীয় শ্রেণীবিচারের ভিত্তি বিজ্ঞানোচিত না হতে পারে, তাতে অসম্পূর্ণতা থাকতে পারে, থাকতে পারে অদর্শন ও অতি-দর্শনের ত্রুটি, কিন্তু এ-কথা বললে আশা করি আত্মাভিমানের দায়ে পড়ব না যে, পশ্চিমবঙ্গে লেখকেরা বর্তমানে যে-কটি মূল ধারায় বিভক্ত—তার একটা মোটামুটি প্রতীতিযোগ্য ছবি আমার বর্গীকরণের মধ্যে পাওয়া যাবে। মানলুম এটা বিজ্ঞানসম্মত বর্গীকরণ নয়, মানলুম এর ভিতর আদর্শ শ্রেণীবিচারের লক্ষ্য অস্পষ্ট রয়েছে, কিন্তু যা চোখের উপরে রয়েছে তাকে না দেখে বা এড়িয়ে গিয়ে আদর্শ শ্রেণীবিভাজনের কথা বললেই কি সেটা সত্যকথন হত?

জ্যোতির্ময়বাবু তো ধন উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে লেখকের শ্রেণীবিচার হওয়া উচিত বলে মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তিনি বুকে হাত দিয়ে বলুন তো কার্যক্ষেত্রে তাঁর আদর্শ কোথাও অনুসৃত হয়েছে কিনা। বাঙলা সাহিত্যে এই ভিত্তিতে লেখকেরা গোষ্ঠীবদ্ধ হয়েছেন কিনা।

বরং আমি তো দেখি নানা উল্টোপাল্টা চিত্র—নানা গোঁজামিলের কারসাজি। ধনিকশ্রেণী থেকে যে-লেখক উদ্ভূত হয়েছেন, বুর্জোয়া ধ্যান-ধারণা যাঁর রক্তে—তিনি হন সাম্যবাদের প্রবক্তা; আর যে-লেখক দারিদ্র্যের বেদনার মধ্যে জন্মেছেন এবং দারিদ্র্যকেই জীবনের নিত্যসঙ্গী করেছেন—তিনি সামাজিক অন্যায়, শোষণ ও অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-মুখর হলেও তাঁকে অনুচিতভাবে ঠেলে দেওয়া হয় রক্ষণশীল লেখকদের কোঠায়, যেহেতু কিনা তিনি সাহিত্যের অগ্রগতি বিধানে ঐতিহ্যের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন! যদি বলা হয়—ধনিকশ্রেণী থেকে উদ্ভূত লেখক হলেই যে তিনি অপরিবর্তনীয় ও অনিবার্যভাবে ধনিক স্বার্থের প্রতিভূ লেখক হবেন এমন তো কোনো কথা নেই, মনোভাবের দিক দিয়ে তিনি সমাজতন্ত্রী তথা সাম্যবাদী প্রত্যয়ের প্রবক্তাও হতে পারেন; কারও একটা বিশেষ শ্রেণীতে জন্মানোটাই তো চরম কথা নয়, সঙ্কল্প ও চেষ্টা দ্বারা আপনাকে স্বীয় শ্রেণীর মানসিকতা থেকে বিচ্যুত করে তাঁর পক্ষে declassed হওয়া কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়।

এই কথার উত্তরে বলব যে, অসম্ভব ব্যাপার হয়তো নয়, কিন্তু তেমন ঘটনা আমাদের দেশের লেখকদের মধ্যে এখনও ঘটেনি বলেই আমার ধারণা। ইওরোপের শিল্প-সাহিত্যের ইতিহাসে বোধহয় কিছু কিছু এ-জাতীয় ঘটনার নজির আছে, যদিও সে-বিষয়ে আমি খুব সুনিশ্চিত নই; তবে আমাদের সাহিত্যে এমনতরো এক শ্রেণী থেকে অন্য শ্রেণীতে উন্নীত বা অবনীত হওয়ার ঘটনা ঘটেনি—এ-কথা একপ্রকার নির্দ্বিধায়ই বলা যায়।

বরং বিপরীত চিত্র আছে। কেউ যদি অপরাধ না লন তো বলি, আমাদের দেশের সাহিত্যেই বোধ করি এ-রকম অদ্ভুত দৃষ্টান্ত দেখানো যাবে যে, সারাটা জীবন বহাল-তবিয়তে সরকারী চাকরি ও বুর্জোয়া জীবনযাত্রার ধারায় জীবন পরিচালনা করে এবং অবসরান্তে পেন্সনের ভোগী হয়েও অক্লেশে বামপন্থী শিবিরের পুরোভাগে থাকা যায়। কায়েমী স্বার্থের পোষক আর স্থিতাবস্থার রক্ষক যে-সরকার, তার অধীনে কার্যরত থাকার সুবিধাদির পানটি থেকে চুনটি পর্যন্ত খসাতে হচ্ছে না, এদিকে ঝাণ্ডা হাতে 'দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ' 'গণতন্ত্র বাঁচাও' কিংবা 'ভিয়েতনাম দিবস'-এর মিছিলের সামিল হতেও আটকাচ্ছে না—এ-জাতীয় আশ্চর্য সহাবস্থান বুঝি আমাদের দেশেই সম্ভব। পৃথিবীর কুত্রাপি সম্ভবত এমন "গাছের খাওয়া" এবং "তলার

কুড়ানো" রূপ অবিশ্বাস্য দ্বৈধতার নজির নেই। "ডুডও খাব, টামাকও খাব", সরকারী (ইংরেজ ও কংগ্রেসী আমলের) চাকরিও করব, আবার সাম্যবাদও করব—দুটো জিনিস, সবিনয়ে নিবেদন করি, একসঙ্গে হয় না।

যদি বলেন জীবিকার খাতিরে কোনো-না-কোনো কাজ করতেই হবে তা সে সরকারী কাজই হোক বেসরকারী কাজই হোক; তার জবাবে বলব— এই যুক্তি সচেতন বুদ্ধিজীবী আর শিল্পী-সাহিত্যিকদের বেলায় অন্তত খাটে না। শিল্পকর্ম একটা ব্রত, একটা সাধনা, শিল্পীর গোটা অস্তিত্বের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত; তা নিয়ে হেলা-ফেলা করা চলে না। আর চলে না বলেই বিশ্বাসের ঘরে ফাঁকি রেখে সেখানে দু-নৌকোয় পা দেওয়ার উপায় নেই। নিজের প্রতি খাঁটি আর স্বকীয় সাধনার প্রতি একনিষ্ঠ হতে গেলে সেক্ষেত্রে অন্য নৌকোটিকে পা দিয়ে দূরে ঠেলে দিয়ে একটিমাত্র নৌকোকেই আশ্রয় করতে হবে। বুর্জোয়া-জীবনসুলভ সরকারী চাকরি আর সাম্যবাদ—দুইয়ের ভিতর রফার কোনো অবকাশ নেই। বিপ্লবপূর্ব রুশ সাহিত্যের ইতিহাস আমার যতদূর জানা, সেদেশে জারতন্ত্রের বিরোধী এমন একজন কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, সমালোচক দেখানো যাবে না যিনি কিনা একই সঙ্গে বিপ্লবী সাহিত্য আর জারতন্ত্রের সেবা করেছেন। বিপ্লবী রুশ লেখকেরা বুকের রক্ত দিয়ে সাহিত্যের সেবা করতেন, তাঁদের পক্ষে অন্য কিছুর বা অন্য কারুর সেবা করা সম্ভব ছিল না। আর এদেশে? পেন্সনভোগী আই-সি-এস লেখকের মুখেও স্বাধীন আর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের গালভরা বুলি শোনা যায়, দেখা যায় কখনও কখনও প্রগতিশীল শিবিরভুক্ত লেখকদেরও ধনতন্ত্রের তল্পিবাহক খবর-কাগুজে বাজারী লেখকদের গাঁ-ঘেঁষাঘেঁষি করে চলতে। বাঙলাদেশের সামাজিকতার অভ্যাস এক সাংঘাতিক ব্যাধি। তা এ-দল ও-দলের সম্পর্ককে গুলিয়ে দেয় এবং দলমতবিশ্বাস নির্বিশেষে সকল লেখককে এক বিভ্রান্তিকর আত্মীয়তার হরিহর ছত্রের মেলায় এনে হাজির করে। আত্মীয়তাটাকে 'বিভ্রান্তিকর' বললুম এজন্য যে, যে-আত্মীয়তা প্রীতিচর্চার অজুহাতে শিল্পীর স্বধর্মকে ভুলিয়ে দেয়, তার ন্যায় ক্ষতিকর আর কিছু নেই।

এই তো হলো বাঙলা সাহিত্যের হাল। এমতাবস্থায় জ্যোতির্ময়বাবু লেখকদের শ্রেণীবিচারের যেসব norm বা আদর্শ নির্দিষ্ট করেছেন, কার্য-ক্ষেত্রে তার সার্থকতা কোথায়? ধনোৎপাদন আর ধনবণ্টন পদ্ধতির

ভিত্তিতে কোথায় কবে কখন আমাদের সাহিত্যে লেখকের শ্রেণীবিভাগ হয়েছে ? বরং মদীয় শ্রেণীবিচার যতই অসম্পূর্ণ আর ক্রটিযুক্ত হোক, তার একটা বাস্তব ভিত্তি আছে এবং সেই আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এই শ্রেণী-বিচারকে সমর্থন করে। জ্যোতির্ময়বাবুর কথিত আদর্শটি হয়তো সত্যি; হয়তো কেন, নিশ্চয়ই সত্যি ; কিন্তু বিনীতভাবে তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেব তাঁর শ্রেণীবিভাজন কিতাবী গন্ধযুক্ত, আমাদের সাহিত্যের বাস্তব স্থিতি তার বিপরীত সাক্ষ্য দেয়।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ আমাদের সাহিত্যের এই বাস্তব স্থিতি সম্বন্ধে পূর্ণমাত্রায় সচেতন ছিলেন এবং তা যে ছিলেন তার প্রমাণ জীবনের সায়াহ্নে রচিত তাঁর 'ঐকতান' কবিতাটি। ওই কবিতায় স্পষ্টই তিনি লিখেছেন, "কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন. কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন, যে আছে মাটির কাছাকাছি" তেমন কবিরা এখনও পর্যন্ত আমাদের সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করেননি। তেমন কবির জন্যে তিনি কান পেতে ছিলেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের ঊনত্রিশ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও আমরা দেখতে পাচ্ছি, তাঁর সে-প্রত্যাশা আজও বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করেনি। কৃষকশ্রেণী থেকে উদ্ভূত একজন সত্যিকারের কবির আজও অবধি আমরা দেখা পাইনি। শ্রমিকশ্রেণীর দুঃখ-বেদনা নিয়ে বাঙলায় বহুতর কবিতা ও ছোটগল্প লেখা হচ্ছে সন্দেহ নেই, কিন্তু সে-সকল রচনার নিরানব্বই ভাগই বোধকরি শ্রমিকশ্রেণীর দুঃখে বিগলিত চিত্ত মধ্যবিত্ত লেখকের লেখনপ্রসূত। এমন বলব না যে এ-সব 'নকল' বা 'সৌখিন মজদুরি'র দৃষ্টান্ত, কিন্তু এ-সত্য কোনোমতেই বিস্মৃত হওয়া চলে না যে, ওই রচনাগুলি শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিনিধিস্থানীয় রচনা নয়। একজন অদ্বৈত মল্লবর্মণ কিংবা একজন গুণময় মান্নাকে দিয়ে গোটা বাঙলা সাহিত্যের স্বরূপ-লক্ষণ নির্ণয়ের চেষ্টা করলে মস্ত ভুল করা হবে।

এইবারে শ্রীতরুণ সেন-এর পত্রটির দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক।

শ্রী সেন তাঁর পত্রে আমার প্রবন্ধে ব্যক্ত মতামতগুলিকে "পরস্পর বিরোধী" আখ্যা দিয়ে পত্রের আবরণে নাতিদীর্ঘ এক নিবন্ধ রচনা করেছেন। তাঁর সকল যুক্তির উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়, কারণ তা করতে গেলে দীর্ঘ প্রবন্ধ ফাঁদতে হয়। ইতোমধ্যেই লেখা বেশ বড়ো হয়ে গিয়েছে। শুধু তাঁর একটি উক্তি সম্পর্কে কিছু আলোচনা করতে চাই এবং আমার মনে হয়

ওই আলোচনায় তাঁর উত্থাপিত সব কয়টি আপত্তিরই সুত্রাকার জবাব রয়েছে।

কথাটা উঠেছে 'পরিচয়' কিংবা অনুরূপ প্রগতিশীল অগ্রসর ভাবের কাগজগুলি সম্পর্কে। আমার প্রবন্ধে এই পত্র-পত্রিকাগুলির আদর্শের সানুরাগ প্রশংসা ছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই মৃদু নালিশ ছিল যে এঁদের অগ্রসর ধারণা-ভাবনার সঙ্গে সমানুপাত রক্ষা করে এঁদের ঐতিহ্যের চেতনা যদি আরও একটু জোরদার হত তো কী সুখের বিষয়ই না হত।

তরুণবাবু আমার এ-কথায় আপত্তি করেছেন, বলেছেন, এইসব প্রগতিশীল পত্র-পত্রিকা যে অগ্রসর ভাবের চর্চা করছেন তাতেই কি প্রমাণ হয় না যে এঁরা বাঙলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যের সংস্কারকে অনুসরণ করে চলেছেন? আমি আমার প্রবন্ধে লিখেছিলাম: "বিষয়বস্তুর নির্বাচনে এঁদের যে বলিষ্ঠতা, সেই বলিষ্ঠতার অনুরূপ প্রকাশভঙ্গি খুঁজতে গিয়ে এঁরা সচরাচর যে ইডিয়ম ও পরিভাষা ব্যবহার করছেন—তা বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রবহমান সংস্কার থেকে কিয়ৎ পরিমাণে বিশ্লিষ্ট বলে মনে হয়।" তার উত্তরে তরুণবাবু লিখছেন—'তাহলে কি 'সংস্কার' ও 'ঐতিহ্য' শব্দ দুটি শ্রীচৌধুরী সমার্থক মনে করেন? আঙ্গিক সম্পর্কে নিরীক্ষা, বিষয় অনুযায়ী আঙ্গিকের বিবর্তন ও নতুন রীতির ইডিয়ম ও শব্দ ব্যবহার ইত্যাদি লক্ষণগুলিই তো বাঙলা সাহিত্যের ঐতিহ্যানুসারী।"

এ-বিষয়ে আমি স্পষ্টতই ভিন্নমত পোষণ করি এবং সবিনয়ে কিন্তু দৃঢ়তার সঙ্গে সেই মতভিন্নতার কথা জানাতে চাই।

আমার প্রথম কথা হচ্ছে: প্রগতিশীলতা-বিদ্রোহ-বিপ্লব ইত্যাদি অভীপ্সিত বিষয়গুলি কখনও আঙ্গিকের অভিনব পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ভাষার ঢঙ বদলের মধ্যে নিহিত থাকে না—থাকে ভাবের বিপ্লবের মধ্যে। আমরা প্রায়শ ভুল করে আঙ্গিক আর ভাষার বিপ্লবটাকেই সত্যিকার বিপ্লব বলে মনে করি এবং তার দ্বারা নিজেকে প্রবঞ্চিত ও অপরকে বিভ্রান্ত করি। যুগবদলের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের প্রকাশরীতির যুগোচিত বদল ঘটবেই এবং সেটা কাম্যও বটে। কিন্তু ওই পরিবর্তনটাই প্রগতিশীলতা নয়, প্রগতিশীলতার প্রমাণ খুঁজতে হবে ভাবের নিত্য নতুন চরিত্রবদলের মধ্যে।

এইখানেই আমাদের প্রগতিঅভিমানীরা ভুল করেন বলে আমার ধারণা। প্রকাশরীতি বা আঙ্গিকের বিপ্লব বিপ্লব নয়, বিপ্লব হয় ভাবের ও

চিন্তার নতুন নতুন দিগন্ত প্রসারে। আমরা ভাবের বিপ্লবে যত না যত্নবান—তার চেয়ে বেশি যত্নবান আঙ্গিকের নবনব পরীক্ষা-নিরীক্ষায়, ভাষাভঙ্গি নিয়ে নিত্যনতুন কসরত করায়। বাঙলা সাহিত্যের ঐতিহ্যানুমোদিত শব্দসংস্কার, ইডিয়ম, পরিভাষা ইত্যাদিকে বেঁকেচুরে দুমড়ে, কখনও কখনও চিনতে পারা যায় না এমনভাবে তার খোল-নলচে বদলে, প্রগতির পথে অগ্রসর হচ্ছি বলে আমরা মিথ্যা আত্মপ্রসাদ অনুভব করি। কিন্তু একথা আমরা খেয়াল করি না যে, ট্রাডিশন বা ঐতিহ্য থেকে পুরাপুরি বিচ্যুত হলে ভাষা বা আঙ্গিক কখনও জোরাল হয় না বরং দুর্বলতারই সূচনা করে। প্রত্যেক ভাষারই একটা স্বীকৃত রূপ থাকে, যাকে সেই ভাষার স্ট্যাণ্ডার্ড বলা যায়। সাহিত্যচর্চার অজুহাতে ওই স্ট্যাণ্ডার্ডকে দলে-পিষে তার জায়গায় কিম্ভুত ভাষাভঙ্গি দাঁড় করানোর অধিকার আমাদের কারও নেই—না গদ্যে, না কাব্যে। বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাজগৎ থেকে আজকের লেখকের চিন্তাজগৎ অনেক দূরে অবস্থিত এবং একথা আমি গর্বের সঙ্গে স্বীকার করব যে—ও-ব্যবধান শুধু দূরবর্তিতারই নয়, অগ্রবর্তিতারও সূচক। কিন্তু তা-ই থেকে যদি কারও এরূপ মনে হয়ে থাকে যে, আমরা বাঙলা সাহিত্যের পঠন-পাঠন-অনুশীলন কালে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষারীতিকে স্বচ্ছন্দে উপেক্ষা করতে পারি তবে তার চেয়ে মূঢ়তা আর কিছু হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-কল্পনা যে-জগৎ আমাদের সামনে উন্মোচিত করেছিল, তা যত মধুর আর রম্যই হোক, তার চেয়ে ভিন্নতর ও নূতনতর কাব্য-কল্পনার জগৎসৃষ্টিতেই আজকের কবিদের সার্থকতা। কিন্তু তার মানে যদি এই হয় যে, রবীন্দ্রনাথের কিংবা তৎপূর্ববর্তী সুবিশাল বাঙলা কাব্য-ঐতিহ্যের শব্দ বা ছন্দোসংস্কারকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করবার আমরা ছাড়পত্র পেয়েছি, তা হলে তার চেয়ে শেকড়-বিচ্ছিন্নতা আর কিছু ভাবা যায় না।

আমার অভিযোগ আঙ্গিক আর ভাষা-প্রকরণের ক্ষেত্রে প্রগতির শিবির-ভুক্ত এই নতুন লেখকদের শেকল-ছেঁড়া মত্ততার বিরুদ্ধে। শুধু 'পরিচয়', 'সাহিত্যপত্র', 'সারস্বত', 'এষা', 'উত্তরসূরী' প্রভৃতি বিশিষ্ট পত্রিকাসমূহের অথবা 'কৃত্তিবাস', 'শতভিষা', 'ধ্রুপদী' 'একক' ইত্যাদি নিরবচ্ছিন্ন কবিতা-পত্রিকাগুলির শিবিরভুক্ত কবিদের কথাই বা বলি কেন, আমার নালিশ খোদ জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী প্রমুখ আধুনিক কবিকুলের পুরোধাদেরই বিরুদ্ধে। বিনম্র দৃঢ়তার সঙ্গে এ-কথা বলতে চাই

যে, তাঁদের কাব্যসৃষ্টি প্রবহমান বাঙলা কাব্যে লক্ষণীয় নতুন রঙ-রস আর অনুভাবনীয় নতুন স্বাদ-গন্ধ যোজনা করলেও, তাঁদের কাব্যের শব্দসংস্কার আশানুরূপভাবে বাঙলা কাব্যের ঐতিহ্যানুমোদিত নয়। তাঁরা যে-পরিমাণে পাশ্চাত্য কাব্যকলার সংস্কার দ্বারা চালিত হয়েছেন, বাঙলা কাব্যের দীর্ঘকাল-পুঞ্জিত কাব্যসংস্কারে তার সিকির-সিকিও লালিত হননি, আর ওইখানেই তাঁদের কাব্যের অপূর্ণতা। আধুনিকতার অভিমানে এ-কথা আজ অনেকেই হয়তো স্বীকার করতে চাইবেন না। কিন্তু বাঙলা কাব্যের ঐতিহ্যকে যদি আমরা মনেপ্রাণে ভালোবেসে থাকি, তাহলে এ-কথা একদিন স্বীকার করতেই হবে।

আর, সাহিত্যে জাতীয়তার সমর্থনে এ-কথা আমরা বলতে চাই যে, যখনই মাতৃভাষার অনুশীলনে আমরা নিরত হই, তখনই জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে প্রত্যক্ষে অথবা পরোক্ষভাবে জাতীয় ভাবের অঞ্চল-সংলগ্ন হয়ে পড়ি। জাতীয়তার অনুশীলন বিহনে মাতৃভাষার অনুশীলন হয় না, কেন না মাতৃস্তন্য পানের মধ্য দিয়ে যে-ভাষার বিকাশ, তাকে অবলম্বন করে কিছু প্রকাশ করতে গেলেই নাড়ির বন্ধনের মতো দেশের আকাশ-বাতাস জল-হাওয়া মাটি ও মানুষ অবলীলায় সে-ভাষার বন্ধনে অচ্ছেদ্যভাবে ধরা পড়ে। সাহিত্য অর্কিডের ফুল নয় যে মাটির সঙ্গে সংযোগবিহীনভাবে তার চাষ হতে পারে। যাঁরা কথায় কথায় কাব্য বা সাহিত্যচর্চার বেলায় পাশ্চাত্যের দোহাই পাড়েন, তাঁরা সাহিত্যের এই মূলগত সত্যটিই বিস্মৃত হন।

আমি আমার বর্গীকরণে প্রথমে যাঁদের স্থান দিয়েছি: "রাজনীতি বিমুখ ঐতিহ্যাশ্রয়ী সাহিত্যিক"—ইতালীয় সাম্যবাদী তাত্ত্বিক সংগ্রামী যোদ্ধা অ্যাণ্টোনিও গ্রামচি ঐ শ্রেণীর লেখকদের বলেছেন "ঐতিহ্যবাদী বুদ্ধিজীবী" এবং তাঁদের কঠোর সমালোচনা করেছেন—তাঁদের মানসিকতার যতো অসম্পূর্ণতাই থাকুক, তাঁদের এই একটা জোর যে তাঁরা জাতীয়তার থেকে বিচ্যুত নন। অহেতুক পাশ্চাত্যপ্রেম তাঁদের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটায় না। তাঁরা বাঙলা সাহিত্যের গত হাজার বছরের ট্রাডিশনের সঙ্গে কম-বেশি পরিচিত, যে-ট্রাডিশনের কয়েকটি বিশিষ্ট দিকচিহ্ন হল—বৈষ্ণব কাব্য, মঙ্গল কাব্য, রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদ ভাণ্ডার, যাত্রা-কবি-পাঁচালি প্রভৃতি লোক-সংস্কৃতির স্তন্যরসপুষ্ট অমার্জিত কিন্তু খাঁটি দেশজ সাহিত্য, ঈশ্বর গুপ্ত-রঙ্গলালের দেশাত্মবোধক কাব্য, মধুসূদন-হেম-নবীনের ওজঃগুণ বিশিষ্ট

জাতীয়ভাবাত্মক আখ্যানধর্মী কাব্য, বিহারীলাল-রবীন্দ্রনাথের লেখনীমুখে প্রবাহিত শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক কাব্যকলার কলস্বনা স্রোতোধারা, মোহিতলাল-নজরুল-যতীন্দ্রনাথ-কুমুদ-কালিদাস-করুণানিধান-প্রেমেন্দ্র প্রমুখের মধুস্বাদী কবিতা; গদ্যশিল্পে বিদ্যাসাগরের শ্রীমণ্ডিত সুঠাম গদ্য, অক্ষয়-ভূদেব-বঙ্কিম-রামেন্দ্রসুন্দরের যুক্তিধর্মী গদ্য, বঙ্কিম-শরৎ-বিভূতিভূষণ-মানিক-তারাশঙ্কর-প্রেমেন্দ্র-শৈলজানন্দ-সুবোধ ঘোষের অপূর্ব শিল্পসৌন্দর্যের গল্পোপন্যাস, বলেন্দ্র ও অবনীন্দ্রনাথের অনবদ্য চিত্রধর্মী রোমান্টিক গদ্য, প্রমথ চৌধুরীর বুদ্ধি-দীপ্ত মননশীল প্রবন্ধ ইত্যাদি। এই সুবিশাল জাতীয় সাহিত্যের ঐতিহ্যের সঙ্গে ভালো করে পরিচয় সাধন না করে আধুনিক সাহিত্যের চর্চা করতে গেলে তাতে একদেশদর্শিতার বড়াই প্রকাশ পেতে পারে, কিন্তু প্রকৃত রচনাশক্তির অধিকারী হওয়া যায় না।

নারায়ণ চৌধুরী

এই সংখ্যা ছাপার কাজ যখন শেষ হয়ে এসেছে, তখন খবর এল মনস্বী কাজী আবদুল ওদুদ সাহেবের জীবনাবসান হয়েছে। একদা 'পরিচয়' ও প্রগতিশীল শিল্পী-সাহিত্যিকদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। আমরা এই মনস্বীর স্মৃতির উদ্দেশে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। ভবিষ্যতে 'পরিচয়'-এ ওদুদ সাহেব সম্পর্কে যথাযোগ্য আলোচনা প্রকাশিত হবে। —সম্পাদক

লেনিন সরণী

বাইশে এপ্রিল পৃথিবী জুড়ে লেনিন জন্মশতবার্ষিকী দিবস উদ্‌যাপিত হয়েছে। পৃথিবী গ্রহকে লেনিনের নামের যোগ্য করা এবং আগামী শতাব্দীতে গ্রহান্তরে লেনিন-উৎসবকে সম্প্রসারিত করার প্রস্তুতিই হচ্ছে এই শতবার্ষিকী উৎসবের মূল কথা।

ভারতবর্ষে, বিশেষত বাঙলাদেশে, বেশ ব্যাপক আকারেই লেনিন উৎসব হয়েছে। উৎসব এখনও অব্যাহত। ভারত-সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির উদ্যোগে কলকাতার প্রাণকেন্দ্রে স্থাপিত হয়েছে সোভিয়েত-ভারত সুহৃদ সমিতির উপহার লেনিনের একটি মূর্তি। সংগ্রাম ও সৃষ্টির পীঠস্থান কলকাতার ঐতিহাসিক ধর্মতলা স্ট্রীটের নতুন নাম এখন লেনিন সরণী।

ভারতবর্ষে ইতিহাসের এক ক্রান্তিলগ্নে লেনিনের পথে চলার নবতর আহ্বান এসেছে। এই পথ মানুষেরই তৈরি। এই পথে মানুষই চলে। পৃথিবীর সমস্ত মানুষ একদিন সংগ্রাম ও সৃষ্টির এই পথেই তারা মুক্তি অর্জন করবে।

কাম্বোডিয়ায় মার্কিন আগ্রাসনের প্রতিবাদে বাঙলাদেশের শিল্পী-সাহিত্যিকদের বিবৃতি

যখন সমগ্র পৃথিবী আশা করছিল হয়তো এইবার ভিয়েতনামের যুদ্ধ বন্ধ হবে, হয়তো এতদিনে মানুষ এশিয়া ভূখণ্ডের এক বিস্তৃত অঞ্চলে শান্তি ও স্বাধীনতার বিজয় পতাকা ওড়াবে, নতুন ভবিষ্যৎ গড়বে—তখন পশ্চিমবঙ্গের শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী আমরা অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম ভিয়েতনামে পরাজিত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তার যুদ্ধের এলাকা সম্প্রসারিত করার নীতি অক্ষুণ্ণ রেখে কাম্বোডিয়ার বুকে হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

যখন পৃথিবীর দেশে দেশে আলোকপূজারী মানুষ লেনিন জন্মশতবার্ষিকী উৎসব করছিলেন, যখন পৃথিবীর দেশে দেশে তিমিরবিনাশী মানুষ ফ্যাসিবাদের ঐতিহাসিক পরাজয়ের পঞ্চবিংশতম বার্ষিকী উদ্‌যাপন করছিলেন—তখন হিটলারকেও লজ্জা দিয়ে অপ্রস্তুত আর শান্ত কাম্বোডিয়ায় মার্কিন ঘাতকদের বন্দুক গর্জন করে উঠল।

মেকং নদীতে তাই আজ সার বেঁধে দেশপ্রেমিক মানুষের শবদেহ ভাসছে। কাম্বোডিয়ার বৈধ সরকার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে অপসারিত হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের অনুগ্রহপুষ্ট সামরিক চক্র গোটা কাম্বোডিয়াকে বন্দীশিবিরে পরিণত করেছে। আর—জেনেভা চুক্তি, আন্তর্জাতিক আইন ও সভ্য সমাজের সমস্ত রীতিনীতি বিসর্জন দিয়ে পালে পালে মার্কিন সৈন্য কাম্বোডিয়ায় নরকের আগুন জ্বালছে।

নিজের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে, প্যারিস বৈঠককে পায়ে মাড়িয়ে, প্রেসিডেন্ট নিকসন উত্তর ভিয়েতনামে নতুন করে বোমাবর্ষণ শুরু করেছেন। লাওস এবং কাম্বোডিয়ায় সেই একই মিথ্যাচার আর দানব বৃত্তি। সাম্রাজ্যবাদ যে সহজে তার চরিত্র বদলায় না—মার্কিন প্রেসিডেন্ট আবার তা প্রমাণ করলেন।

কিন্তু মানুষ অজেয়। তাই খাস আমেরিকাতেই নিকসন-নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে চারজন ছাত্রছাত্রী প্রাণ দিলেন। মানুষ অজেয়। তাই গোটা আমেরিকা জুড়েই আজ সাম্রাজ্যবাদের এশীয় নীতির বিরুদ্ধে শিল্পী-সাহিত্যিক-ছাত্র-যুবক-দেশপ্রেমিক জনগণ উত্তাল আন্দোলন করছেন। জর্জ ওয়াশিংটন, এব লিঙ্কন, ওয়াল্ট হুইটম্যান, মার্টিন লুথার কিং-এর অন্য

আমেরিকা এঁদেরই বীরত্বে মূর্ত হয়ে উঠছে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সমগ্র পৃথিবীর বিবেকবান মানুষদের কণ্ঠস্বর। পাবলো পিকাসো, জঁা পল সার্ত্র প্রমুখ শিল্পী-সাহিত্যিকও নীরব নেই।

রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকারী আমরা আমাদের মহৎ ঐতিহ্যকে ভুলতে পারি না। সভ্যতার এই সঙ্কটকালে তাই আমরাও আমাদের কণ্ঠ মেলাই বিশ্ববিবেকের সঙ্গে।

আমরা প্রতিবাদ করি সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার দানববৃত্তির। আমরা প্রতিবাদ করি কাম্বোডিয়ার সার্বভৌমত্বের ওপর অন্যায় হস্তক্ষেপের। আমরা সমর্থন জানাই সিহানুক সরকারকে। আমরা সমর্থন জানাই ইন্দোচীনের মুক্তি-সংগ্রামকে।

সাম্রাজ্যবাদের এই অন্যায় আগ্রাসনকে প্রতিহত করতেই হবে। কারণ—আমরা জানি তা সম্ভব না হলে আমাদের ভালোবাসার ভারতবর্ষও বিপদ এড়াতে পারবে না। কারণ ইন্দোচীনের স্বাধীন সার্বভৌম দেশগুলির সঙ্গে আমাদের ভাগ্যও অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িত।

তাই আমাদের দাবি: কেন্দ্রীয় পররাষ্ট্র দপ্তর অবিলম্বে আক্রান্তের পক্ষে দাঁড়ান, আক্রমণকারীকে সক্রিয়ভাবে প্রতিরোধ করুন। আমাদের দাবি: ভারত সরকার জোটনিরপেক্ষ ও শান্তিপ্রিয় রাষ্ট্রগুলিকে এই আগ্রাসন নীতির বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে ঐক্যবদ্ধ করুন। আমাদের দাবি: মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এই মুহূর্তে কাম্বোডিয়া থেকে, ভিয়েতনাম থেকে, গোটা এশীয় ভূখণ্ড থেকে তার ঘরে ফিরে যাক।

স্বাক্ষর:

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে, গোপাল হালদার, মনোজ বসু, বিমলচন্দ্র ঘোষ, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, দিনেশ দাশ, মণীন্দ্র রায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গোলাম কুদ্দুস, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ, বিমল কর, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার, নরহরি কবিরাজ, দক্ষিণারঞ্জন বসু, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজন ভট্টাচার্য, মৃণাল সেন, সুব্রত সেনশর্মা, সুচিত্রা মিত্র, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবিনয় রায়, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, চিত্ত ঘোষ,

রাম বসু, সিদ্ধেশ্বর সেন, সতীন্দ্রনাথ মৈত্র, জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, ধনঞ্জয় দাশ, অবন্তীকুমার সান্যাল, জীবেন্দ্র সিংহরায়, সত্যপ্রিয় ঘোষ, চিত্তরঞ্জন ঘোষ, কৃষ্ণ ধর, অমল দাশগুপ্ত, বীরেন্দ্র নিয়োগী, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, অরুণাচল বসু, জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়, উমানাথ ভট্টাচার্য, প্রমোদ মুখোপাধ্যায়, জ্যোতি দাশগুপ্ত, রণধীর দাশগুপ্ত, নারায়ণ চৌধুরী, শৈলেনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রদ্যোৎ গুহ, অমূল্য চক্রবর্তী, রবীন্দ্র মজুমদার, সুকুমার মিত্র, শান্তিময় রায়, কালীপদ ভট্টাচার্য, শঙ্খ ঘোষ, দেবেশ রায়, তরুণ সান্যাল, অমলেন্দু চক্রবর্তী, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্ল রায়, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, যুগান্তর চক্রবর্তী, অমিতাভ দাশগুপ্ত, তুষার চট্টোপাধ্যায়, শিবশম্ভু পাল, মানস রায়চৌধুরী, ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায়, শান্তিকুমার ঘোষ, বীরেন্দ্র দত্ত, রবীন্দ্র বিশ্বাস, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক ভট্টাচার্য, নির্মাল্য আচার্য, প্রসূন বসু, অমর গঙ্গোপাধ্যায়, শঙ্কর চক্রবর্তী, শৈলেন চৌধুরী, উৎপল ভাদুড়ী, জগন্নাথ ভট্টাচার্য, বিভূতি গুহ, প্রফুল্ল রায়, অসীম রায়, মানিক মুখোপাধ্যায়, কানাই পাকড়াশী, নিরঞ্জন সেনগুপ্ত, বিতোষ আচার্য, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ, নিখিল সরকার, প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়, দিলীপ বসু, বীরেশ্বর ঘোষ, পল্লব সেনগুপ্ত, শ্যামল ঘোষ, সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরজিত বসু, বেদুইন চক্রবর্তী, বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য, গণেশ বসু, শিবেন চট্টোপাধ্যায়, আশিস সান্যাল, সত্য গুহ, রঞ্জিত রায়-চৌধুরী, তুলসী মুখোপাধ্যায়, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণ সেন, অমিয় ধর, রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, প্রভাত চৌধুরী, বিশ্বরঞ্জন দে, অসিত ঘোষ, দীপেন রায়, শিশির সামন্ত, দিলীপ সেনগুপ্ত, দুলাল ঘোষ, শুভ বসু, শুভাশিস গোস্বামী, কালীকৃষ্ণ গুহ, যিশু চৌধুরী, মৃণাল বসুচৌধুরী, বিপ্লব মাজী, চণ্ডী মণ্ডল, প্রলয় সেন, রমেন্দ্র রায়, শঙ্কর রায়, গণেশ সেন, ফিরোজ চৌধুরী, শঙ্কর দাশগুপ্ত, চন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, গৌতম মুখোপাধ্যায়, মলয় দাশগুপ্ত, বাণীব্রত চক্রবর্তী, শুভঙ্কর ঘোষ, অভিজিৎ সরকার, নিমাই চট্টোপাধ্যায়, সুধাংশু মৈত্র, বিমল চট্টোপাধ্যায়, ভাস্কর চক্রবর্তী, শশধর রায়, রমেন আচার্য, মিহির রায়চৌধুরী, শ্যামলকুমার ঘোষ, ধূর্জটি চন্দ, মৃণাল দত্ত, পদ্মনাভ দাশগুপ্ত, অজয় গুপ্ত, নির্মলকান্তি দাশগুপ্ত, অমর রায়, সুমিত্রা ঘোষ, প্রণব মাইতি, সত্যরঞ্জন বিশ্বাস, গৌতম সান্যাল, তপন দত্ত, ইন্দ্র লাহিড়ী, দেবব্রত চক্রবর্তী, অরুণ সেন, শঙ্কর মজুমদার, অলোক সিংহ, জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়, জীবন সরকার, মুকুল রায়, সুকোমল রায়চৌধুরী, বিনয় মাহাতো, বরুণ গঙ্গোপাধ্যায়, কৃষ্ণগোপাল মল্লিক, শান্তি লাহিড়ী, অরুণাভ দাশগুপ্ত, দিলীপ চক্রবর্তী, রণেন মোদক, কমল সমাজদ্দার, মণীন্দ্র চক্রবর্তী, কল্যাণ চক্রবর্তী, রণজিৎ সিকদার, বাধন দাশ, শিপ্রা আদিত্য, নবেন্দু সেনগুপ্ত, বিষ্ণু দাশ, পিণ্টু ভট্টাচার্য, শৈবাল চট্টোপাধ্যায়, দেবজ্যোতি দাশ, অনন্ত দাশ, অহীন ভৌমিক, বৈদ্যনাথ সাহা।

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিসট্রেশন (কেন্দ্রীয়) আইনের
৮ধারা অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি

১। প্রকাশের স্থান—৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭

২। প্রকাশের সময়-ব্যবধান—মাসিক

৩। মুদ্রক—অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, ভারতীয় ; ৪০, রাধামাধব সাহা লেন, কলকাতা-৭

৪। প্রকাশক— ঐ ঐ ঐ

৫। সম্পাদক—দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভারতীয় ; ৭৬৫, পি ব্লক, নিউ আলিপুর, কলকাতা-৫৩
তরুণ সান্যাল, ভারতীয় ; ৬০এ, হরমোহন ঘোষ লেন, কলকাতা-১০

৬। পরিচয় প্রাইভেট লিমিটেড-এর যে-সকল অংশীদার মূলধনের একশতাংশের অধিকারী, তাঁদের নাম ও ঠিকানা :

১। গোপাল হালদার, ফ্ল্যাট ১৯, ব্লক এইচ, সি. আই. টি. বিলডিংস, ক্রিস্টোফার রোড, কলকাতা-১৪ ॥ ২। সুনীলকুমার বসু, ৭৩ এল, মনোহরপুকুর রোড, কলকাতা-৯ ॥ ৩। অশোক মুখোপাধ্যায়, ৭, ওল্ড বালিগঞ্জ রোড, কলকাতা-১৯ ॥ ৪। হিরণকুমার সান্যাল, ৮, একডালিয়া রোড, কলকাতা-১৯ ॥ ৫। সাধনচন্দ্র গুপ্ত, ২৩, সার্কাস এভিনিউ, কলকাতা-১৭ ॥ ৬। স্নেহাংশুকান্ত আচার্য, ২৭, বেকার রোড, কলকাতা-২৭ ॥ ৭। সুপ্রিয়া আচার্য, ২৭, বেকার রোড, কলকাতা-২৭ ॥ ৮। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ৫বি, ডঃ শরৎ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-২৯ ॥ ৯। সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ১।৩, ফার্ন রোড, কলকাতা-১৯ ॥ ১০। শীতাংশু মৈত্র, ১।১।১, নীলমণি দত্ত লেন, কলকাতা-২২ ॥ ১১। বিনয় ঘোষ, ৪৭।৪, যাদবপুর সেনট্রাল রোড, কলকাতা-১২ । ১২। সত্যজিৎ রায়, ৩, লেক টেম্পল রোড, কলকাতা-২৯ ॥ ১৩। নীরেন্দ্রনাথ রায় (মৃত), ৪২।৭এ, বালিগঞ্জ প্লেস, কলকাতা-১৯ ॥ ১৪। হরিদাস নন্দী, ২৯এ, কবির রোড, কলকাতা-২৬ ॥ ১৫। ধ্রুব মিত্র, ২২বি, সাদার্ন এভিনিউ, কলকাতা-২৯ ॥ ১৬। শান্তিময় রায়, 'কুসুমিকা', গরফা মেন রোড, কলকাতা-৩২ ॥ ১৭। শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ, ভুবনেশ্বর, ওড়িশা ॥ ১৮। স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য (মৃত), ৯।১, কর্নফিল্ড রোড, কলকাতা-১৯ ॥ ১৯। নিবেদিতা দাশ, ৫৩বি, গরচা রোড, কলকাতা-১৯ ॥ ২০। নারায়ণ

গঙ্গোপাধ্যায়, ৩সি, পঞ্চাননতলা রোড, কলকাতা-১৯ ॥ ২১। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ৩, শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট, কলকাতা-২০ ॥ ২২। শান্তা বসু, ১৩।১এ, বলরাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা-৬ ॥ ২৩। বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬২, ডঃ শরৎ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-২৯ ॥ ২৪। ধীরেন রায়, ১০।৬, নীলরতন মুখার্জি রোড, হাওড়া ॥ ২৫। বিমলচন্দ্র মিত্র, ৬৩, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৩ ॥ ২৬। দ্বিজেন্দ্র নন্দী, ১৩ডি, ফিরোজ শাহ্ রোড, নয়াদিল্লী ॥ ২৭। সলিলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ৫০, রামতনু বসু লেন, কলকাতা-৬ ॥ ২৮। সুনীল সেন, ২৪, রসা রোড সাউথ (থার্ড লেন), কলকাতা-৩৩ ॥ ২৯। দিলীপ বসু, ২০০ এল, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৬ ॥ ৩০। সুনীল মুন্সী, ১।৩, গরচা ফার্স্ট লেন, কলকাতা-১৯ ॥ ৩১। গৌতম চট্টোপাধ্যায়, ২, পাম প্লেস, কলকাতা-১৯ ॥ ৩২। হিমাদ্রিশেখর বসু, ৯এ, বালিগঞ্জ স্টেশন রোড, কলকাতা-১৯ ॥ ৩৩। শিপ্রা সরকার, ২৩৯এ, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৪৭ ॥ ৩৪। অচিন্ত্যেশ ঘোষ, ৯, সামবানদম রোড, টি. নগর, মাদ্রাজ-৭ ॥ ৩৫। চিন্মোহন সেহানবীশ, ১৯, ডঃ শরৎ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-২৯ ॥ ৩৬। রণজিৎ মুখার্জি, পি ২৬, গ্রেহামস লেন, কলকাতা-৪০ ॥ ৩৭। সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, ফ্ল্যাট ২, 'সী গাল', কার্মিচেল রোড, বম্বে-২৬ ॥ ৩৮। অমল দাশগুপ্ত, ৮৬, আশুতোষ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৫ ॥ ৩৯। প্রদ্যোৎ গুহ, ১এ, মহীশুর রোড; কলকাতা-২৬ ॥ ৪০। অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, ৪০, রাধামাধব সাহা লেন, কলকাতা-৭ ॥ ৪১। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫৫বি, হিন্দুস্থান পার্ক, কলকাতা-২৯ ॥ ৪২। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৭৬৫, পি ব্লক, নিউ আলিপুর, কলকাতা-৫৩ ॥ ৪৩। গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০৮, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-১২ ॥ ৪৪। নির্মাল্য বাগচি, ফ্ল্যাট নং বি সি ৩, পিকনিক পার্ক, পিকনিক গার্ডেন রোড, কলকাতা-৬৯ ॥ ৪৫। তরুণ সান্যাল, ৬০এ, হরমোহন ঘোষ লেন, কলকাতা-১০ ॥ ৪৬। বিদ্যা মুন্সী, ১৩, গরচা ফার্স্ট লেন, কলকাতা-১৯ ॥ ৪৭। বেদুইন চক্রবর্তী, ফ্ল্যাট ২, ১০, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলকাতা-৬ ॥ ৪৮। অমিয় দাশগুপ্ত, ২, যদুনাথ সেন লেন, কলকাতা-৬ ॥ ৪৯। অজয় দাশগুপ্ত, ২০৮, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-১২ ॥ ৫০। সুরেন ধরচৌধুরী, ২০০, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-১২ ॥

আমি অচিন্ত্য সেনগুপ্ত এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে উপরে প্রদত্ত তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুসারে সত্য।

(স্বাঃ) অচিন্ত্য সেনগুপ্ত

১০. ৩. ৭০

EXPORT QUALITY
এখন
আপনাদের জন্যও
পাওয়া যাচ্ছে!
সুলেখা
এক্সিকিউটিভ কালি
BLACK
EXECUTIVE INK
Sulekha
সুলেখা
ওয়ার্কস্ লিঃ
কলিকাতা-৩২
EXECUTIVE INK

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা ভি. আই. লেনিনের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত কয়েকটি মূল্যবান পুস্তক

নিকোলাই মিখাইলোভ লিখিত এবং লেনিনের কর্মজীবনের নানা চিত্র-সংবলিত বাঙলা, অসমীয়া ও ওড়িয়া ভাষায় সোভিয়েত দেশ পুস্তিকা ঃ

লেনিনের জীবন কথা

দাম ঃ এক টাকা

লেনিন সম্পর্কে প্রথম কোন পুস্তক ভারতে প্রকাশিত হয় তার বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান করতে গিয়ে লেনিন সম্পর্কে গোড়ার দিকের ভারতীয় সাহিত্যের বিষয়ে প্রখ্যাত সোভিয়েত সাংবাদিক মিঃ এল. ভি. মিত্রোখিন যে সকল তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছেন তাই লিপিবদ্ধ করেছেন সোভিয়েত দেশ প্রকাশনীর এই পুস্তকটিতে ঃ

মানুষের মাঝে এভারেষ্ট

দাম ঃ পঁচাত্তর পয়সা

এছাড়া

লেনিনের শিক্ষা এবং সদ্য স্বাধীন দেশসমূহের বিকাশের পথ

লেখক ঃ ভ্লাদিমির ফিওদরভ

দাম ঃ এক টাকা

সোভিয়েত দেশ প্রকাশনী

১১, উড স্ট্রীট

কলিকাতা-১৬

প. ব. (তথ্য ও জনসংযোগ) বি. ১২ ৪০।৭০

দেবেশ রায়ের গল্প

মূল্য : ছ-টাকা

দেবেশ রায় বাঙলা কথাসাহিত্যের এক অবিস্মরণীয় নাম।
এই বইটির বহু আলোচিত গল্পগুলি পড়া না থাকলে
বাঙলা গল্প-সাহিত্যের পাঠ অসম্পূর্ণ থাকে।

সারস্বত লাইব্রেরি
২০৬ বিধান সরণী : কলিকাতা-৬

পরিচয়

বর্ষ ৩৯ । সংখ্যা ১০-১১

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ । ১৩৭৭

সূচিপত্র

লেনিন-জন্মশতবার্ষিকী সংখ্যা । ১৯৭০

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়

পরিচয় প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

নিত্য ব্যবহারে
নিম
টুথ পেস্ট
ছেলেবেলা থেকে এই টুথ
পেষ্ট ব্যবহার করলে দাঁত
শক্ত ও মাঢ়ী সুদৃঢ় হয়।
একটি
ক্যালকেমিকো
অবদান
HTP. 190B

পরিচয়
বর্ষ ৩৯। সংখ্যা ১০-১১
বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ। ১৩৭৭

লেনিন ও বর্তমান যুগ

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বিংশ শতকের প্রথম বৎসর ১৯০০ সালে জার্মানিতে প্রবাসকালে লেনিন প্রতিষ্ঠা করেন 'ইসক্রা' সংবাদপত্র এবং বিপ্লবী সাথীদের সহায়তায় গোপনে আইনের বেড়াজাল এড়িয়ে রুশদেশে তার প্রচারের ব্যবস্থা করেন। 'ইসক্রা' শব্দটির অর্থ হলো 'স্ফুলিঙ্গ'—কাগজের নাম যেখানে ছাপা, ঠিক তার নিচে লেখা থাকত : "এই স্ফুলিঙ্গ থেকে আগুন জলবে"। জার্মানিতে 'স্ফুলিঙ্গ' পত্রিকার স্থাপনা; শত্রুর তাড়নায় তাঁকে ১৯০২ সালে যেতে হয়েছিল লণ্ডনে, আর সেখানেও বিঘ্ন দেখা দিলে যেতে হলো জেনিভা। মার্কস-এঙ্গেলস-এর উত্তরাধিকারে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন লেনিন তাঁর বিপ্লবী চিন্তা ও কর্মের সমন্বয় প্রতিভার অনন্য পরিচয় দিয়ে—মার্কসবাদের অমোঘ শক্তিবলে মেহনতী মানুষের বিশ্ববিজয়কেতন উড্ডীন রেখেছিলেন দেশ থেকে দেশান্তরে ভ্রাম্যমান এই তুলনাহীন মানুষটি।

'ইসক্রা' প্রকাশিত হওয়ার পর পাঁচ বৎসরের মধ্যে রুশ দেশে আগুন জলল। জনতার রক্তে নির্বাপিত হয়েও আবার দাবানল এল ১৯১৭ সালে। ফেব্রুয়ারি মাসে যার সূচনা, নভেম্বরে দেখা গেল তার সার্থকতা। অন্ধ বিনা সকলের কাছেই স্পষ্ট বোধ হলো—অকাট্যভাবেই নভেম্বর বিপ্লবের বাণী বিশ্বময়

ছড়িয়ে যাবে। তার জয়যাত্রাকে রোধ করা কারও সাধ্য নয়। মার্কস-এর জন্মের (১৮১৮) পর একশো বৎসর কাটার আগেই ঘটেছে প্রথম বিপুল সফল সোশালিস্ট বিপ্লব। আজ গোটা ছুনিয়ার জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ বাস করছে সোশালিস্ট সমাজব্যবস্থায়। মার্কস-এর মৃত্যুর (১৮৮৩) পর একশো বৎসর যখন কাটবে, তখন জনতার এই জগৎজোড়া জয়যাত্রা কোন স্তরে হাজির হবে তা নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণীর প্রয়াসে প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন হলো লেনিনের জন্ম-শতাব্দী পরিপূরণ উপলক্ষে ঐ বিপ্লবী মহানায়কের জীবনকাব্য বিষয়ে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন—প্রয়োজন আমাদের যুগের যিনি যুগন্ধর, তাঁর শিক্ষা আত্মস্থ করে আজকের পরিস্থিতিতে সমাজ রূপান্তরের কাজে এগিয়ে যাওয়া।

মহৎ ব্যক্তি সম্বন্ধে মহামনস্বী হেগেল-এর সংজ্ঞা বোধহয় সবচেয়ে গ্রহণ-যোগ্য। অতি-মানবের আবির্ভাব বিষয়ে যে-ধরনের কথা শোনা যায়, তা নিয়ে অতিরিক্ত মস্তিষ্ক প্রয়োগের এখানে প্রয়োজন নেই। ব্যক্তিপূজা মাঝে মাঝে যে ইতিহাসকে কিছু পরিমাণে বিকৃত করেছে, তাতেও সন্দেহ নেই। প্রকৃত শক্তিধর ব্যক্তির ভূমিকাও নিঃসন্দিগ্ধ। আকস্মিকভাবে তাঁরা যে ইতিহাসের স্বাভাবিক ও সঙ্গত গতিচ্ছন্দে কিঞ্চিৎ চাঞ্চল্য এনে থাকেন, তা মনে করারও যথাযথ কারণ নেই। হেগেল-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী কোনো এক যুগের প্রকৃত মহৎ প্রতিনিধি হলেন তিনি যিনি সেই যুগের কামনাকে বাক্যে প্রকাশ করতে পারেন, যিনি নিজের যুগকে বলতে পারেন তার ঈপ্সিত উদ্দেশ্য কি, এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনেও নামতে পারেন। "যা তিনি করেন তা হলো তাঁর যুগের মর্ম; তাঁর যুগের সত্তার গভীরে নিহিত। মহৎ ব্যক্তি হলেন নিজের যুগের বাস্তব মূর্তি।" এই সংজ্ঞা অনুসরণ করে বলা যায়, লেনিন হলেন বিংশ শতাব্দীর নায়ক, বিংশ শতাব্দীর প্রতিভূ, বিংশ শতাব্দীর ভাবধারা—রূপকের ভাষায় যে মুষ্টিমেয় ব্যক্তি সম্বন্ধে "দেবতার দীপ হস্তে যে আসিল ভবে" বলা সাজে, তাঁদেরই একজন সর্বাগ্রগণ্য।

জওয়াহরলাল নেহেরু আত্মজীবনীতে লিখে গেছেন যে তাঁর চেনা কমিউ-নিস্টদের প্রায়ই কেমন যেন বেখাপ্পা ধরনের মানুষ বলে মনে হয়েছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাদের একটা বৈশিষ্ট্য মহার্ঘ বলে মানতে সঙ্কোচ হয়নি। লেনিনের মধ্যে বৈশিষ্ট্য ছিল সবচেয়ে জাজ্বল্যমান, আর কম-বেশি পরিমাণে সব কমিউনিস্টের মধ্যেই একে তিনি দেখেছিলেন। এই বৈশিষ্ট্য হলো

"ইতিহাসের সঙ্গে তাল রেখে পা ফেলে চলা" বিষয়ে ভরসা। এর চেয়ে দামী প্রশংসাপত্র কমিউনিস্টদের বোধহয় প্রায় নেই।

ইতিহাসের গতিচ্ছন্দ হৃদয়ঙ্গম করার ক্ষমতা লেনিন আয়ত্ত করেছিলেন মার্কস-এঙ্গেলস-এর শিক্ষা থেকে। সকল অনন্যসাধারণ ব্যক্তির মতোই তিনি একযোগে ছিলেন ইতিহাস কর্তৃক গঠিত এবং সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের নির্মাতা—যে-সামাজিক শক্তিপুঞ্জ দুনিয়ার চেহারা আর মানুষের চিন্তাধারাকে পালটে দেয়, একাধারে তার প্রতিনিধি এবং তার স্রষ্টা ছিলেন। চিন্তাশীল এবং তীক্ষ্ণধী ইংরেজ ইতিহাসবিদ ঈ-এচ-কার মহৎ ব্যক্তির-ভূমিকা আলোচনা ব্যপদেশে যথার্থই বলেছেন যে, লেনিন মহতের মধ্যে মহীয়ান এই কারণে যে শুধু পূর্ব-নিয়ন্ত্রিত শক্তির তরঙ্গে ভাসমান থেকে মহত্ত্বে উত্তীর্ণ হননি (যা বলা যায় নেপোলিয়ন কিম্বা বিসমার্ক সম্বন্ধে), তিনি সমাজে বিবর্তনের সংসাধক শক্তির একজন স্রষ্টাও ছিলেন। এ-কথার যাথার্থ্য অনস্বীকার্য, কারণ লেনিন শুধুমাত্র মার্কস-কথিত সুসমাচারের প্রবল প্রবক্তা ছিলেন না, শুধুমাত্র ফলিত মার্কসবাদের উত্তরসাধক ছিলেন না—সঙ্গে সঙ্গে তিনি সমাজ-শক্তি বিশ্লেষণে মার্কসবাদে গুণগতভাবে নূতন সংযোজনা দেবার মতো সৃষ্টিক্ষমতা রাখতেন। যাগযজ্ঞে যারা কেবল ব্যাপৃত, তাদের চেয়ে বহু উচ্চে স্থান হলো মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির।

বলশেভিক পার্টি গঠনের মধ্য দিয়ে বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় দিতে পেরেছিলেন বলেই লেনিন সাম্যবাদী আন্দোলনে স্বীকৃতি অর্জন করতে পেরেছিলেন। 'ইসক্রা' প্রকাশ হওয়ার পূর্বে রুশ দেশে ধনতন্ত্রের বিকাশ সম্বন্ধে তিনি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন ; ১৯০২ সালে প্রকাশিত হলো বিখ্যাত বই 'কি করা যায়' ? যা আজও সকলের অবশ্য পাঠ্য। কিন্তু তখন মার্কসবাদীদের শিরোমণি ছিলেন অগাধ পণ্ডিত বলে পরিচিত কার্ল কাউটস্কি। ১৮৯৯-১৯০০ সালে আর এক বিরাট পণ্ডিত বের্নস্টাইন যখন পার্লামেণ্টারি রাজনীতির সঙ্গে মালাবদল ঘটিয়ে মার্কসবাদকে ঘষে-মেজে "ভদ্রস্থ" করতে লাগলেন, তখন সেই 'সংশোধনবাদ'-এর বিপক্ষে কণ্ঠ উত্তোলন করেছিলেন এঙ্গেলস-এর স্থলাভিষিক্ত কাউটস্কি। পরে আবার এই কাউটস্কি প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের যুগে নির্বিত্ত মানুষের বিপ্লবী অভিযানকে অস্বীকার করলেন, যুধ্যমান সাম্রাজ্যবাদের সপক্ষে দাঁড়ালেন এবং সোভিয়েত বিপ্লব ঘটার অব্যবহিত পরে তার প্রখর বিরোধিতা করলেন। কাউটস্কির মতো বিশ্ববিদিত তাত্ত্বিকের বক্তব্য খণ্ডন করলেন লেনিন—এটা

স্বাভাবিক ঘটনা, কারণ ইতিমধ্যে স্টুটগার্ট, কীন্থাল, ৎসিমেরভালড এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সমাবেশে রুশ-বলশেভিকদের এই ক্লান্তিহীন, ক্ষুরধার, তেজস্বী অথচ সতত স্থিতধী প্রবক্তাকে দেখা গিয়েছিল এবং তাঁরই অনুপম নেতৃত্বে জগতের এক-ষষ্ঠাংশব্যাপী যে-জারসাম্রাজ্য, সেখানে বিপ্লব সংসাধিত হলো। একদিকে যেমন লেনিন দলত্যাগী কাউটস্কিকে ধিক্কার দিলেন (১৯১৮), যেমন দেখা গেল ১৯০৫ সালে লেখা 'সোশাল-ডেমক্রাসির দুই কৌশল' শীর্ষক রচনার সৃষ্টিশীল প্রয়োগ, যেমন সবাই পেল 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' বিষয়ে তাঁর স্বচ্ছ চিন্তা (১৯১৭), তেমনই পরে বামপন্থী বাক্যবাগীশপনার উগ্র আতিশয্যকে তিনি তীক্ষ্ণ গভীর ভঙ্গীতে নিন্দা করলেন। লেনিন-রচনাবলী নিয়ে আলোচনা এটা নয়, কিন্তু বলে রাখা ভালো যে দর্শন-বিজ্ঞান-ইতিহাস-রাজনীতির তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিভাগে অসামান্য ব্যুৎপত্তি এবং তত্ত্ববিচারের ভিত্তিতে বৈপ্লবিক কর্মপদ্ধতি সংগঠন ও পরিচালনার নীতি ও কৌশল বাস্তবে রূপায়িত করার প্রতিভা একীভূত হয়ে লেনিন চরিত্রকে একটা বিশেষ গরিমা দিয়েছিল বলেই ইতিহাস আজ তাঁকে স্মরণ করে বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের গুরু ও নেতা বলে, সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির মুখ্য সংগঠক বলে, জগতের প্রথম সমাজবাদী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা বলে, একাধারে মনীষী ও বিপ্লবী বলে, সঙ্গে সঙ্গে নিয়ত নিরহঙ্কার ও সহৃদয় মানুষ বলে।

গত বৎসর ক্যানাডার প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা টিম্ বাক্ একটি প্রবন্ধের নাম দেন — 'আমাদের কালের সমস্যা বিষয়ে লেনিনের পরামর্শ গ্রহণ'। আজকের যুগের প্রধান স্রষ্টা বলে লেনিনের কথা স্মরণ করলে বাস্তবিকই পথের সন্ধান মিলতে সাহায্য পাওয়া যায়। অটল বিশ্বাসের সঙ্গে সমীচীন বিনয় চরিত্রে অঙ্গীভূত ছিল বলে একেবারে শেষ দিকের লেখা 'Better less but Better' রচনাতে লেনিন বলেন যে সব চেয়ে খারাপ হলো নিজেদের একেবারে সব বিষয়ে "সব জানতা" ধরে নেওয়া। মার্কস ঘৃণা করতেন সেই মনোবৃত্তিকে যার ফলে মানুষ বলে: "এই হল সার সত্য, এর সামনে হাঁটু গেড়ে থাকো!" কিন্তু সন্দেহ নেই যে জ্ঞান, বুদ্ধি এবং জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বর্তমান যুগে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের শিক্ষা অবান্তর হওয়া দূরে থাকুক, তার প্রাসঙ্গিকতা, তার যাথার্থ্য, তার বাস্তব প্রয়োজন স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে আজ অচল ও অবান্তর প্রমাণ করার জন্য বহু তীক্ষ্ণবুদ্ধি

পণ্ডিত বুর্জোয়া জগতে ব্যস্ত; মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিনকে একটু প্রশংসা জানিয়ে বাতিল করার কাজে নেমেছেন তথাকথিত Marxologist এবং Kremlinologist-এর দল। আজকের ক্ষুব্ধ, ক্ষিপ্র, জটিল, যুযুৎসু জীবনকে সমগ্রভাবে দেখতে অপারগ কিম্বা অনিচ্ছুক গবেষণা লেনিনের শিক্ষার মূল সত্যকে স্বীকার করতে অক্ষম — এ-হলো লেনিনবাদের বিরোধিতা করে ম্রিয়মাণ বুর্জোয়াব্যবস্থায় প্রাণ সঞ্চার করার ব্যর্থ চেষ্টা মাত্র। অবশ্য সকল প্রশ্নের যে সহজ উত্তর অবিলম্বে মিলবে তা নয়। মনে রাখতে হবে লেনিনের মন্তব্য যে "বহু আভ্যন্তরীণ বিরোধ ব্যতিরেকেই ইতিহাসের অনুগ্রহে আমরা নূতন চরিত্রের এক গণতন্ত্র পেয়ে যাব" মনে করা বাস্তবিকই অলৌকিক ঘটনায় বিশ্বাসেরই সমতুল্য।

মস্কোতে গত বৎসর জুন মাসে বহু দেশের কমিউনিস্ট পার্টির যে-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে লেনিন জন্মশতাব্দী সম্বন্ধে বিশেষ প্রস্তাবে বলা হয়েছিল "অনেকগুলি দেশে সোশালিস্ট বিপ্লব জয়ী হয়েছে; জগদ্ব্যাপী একটা সোশালিস্ট রাষ্ট্র ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটেছে, ধনবাদী দেশসমূহেও শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন অগ্রসর হচ্ছে; পূর্বতন পরাধীন ও অর্ধ-পরাধীন দেশের জনতা আত্মশক্তি বলে সমাজ ও রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে স্থান নিচ্ছে; সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অভূতপূর্ব অভিযান ঘটছে। এ-সবই হলো প্রমাণ যে ইতিহাসের পরীক্ষায় লেনিনবাদ নির্ভুল এবং বর্তমান যুগের মৌলিক প্রয়োজনগুলি লেনিনবাদেই প্রকাশ পাচ্ছে।"

বুর্জোয়া বিদ্বানেরা অবশ্য এ-কথা মানবেন না। লেনিনকে তাঁদের পক্ষে 'নস্যাৎ' করা সম্ভব নয়, তাই কথার মারপ্যাঁচ খেলিয়ে, লেনিনকে যেন দু-একটা 'সার্টিফিকেট' দিয়ে, তাঁরা বলে থাকেন যে প্রতিভাবান মানুষ হলেও লেনিনের হিসাবে মস্ত ভুল ইতিহাস ঘটিয়ে দিয়েছে (যেমন তাঁরা বলেন মার্কস-এর ক্ষেত্রেও নাকি ঘটেছে)! এঁদের কাছে শুনি যে লেনিন 'সাম্রাজ্যবাদ' সম্বন্ধে দামী কথা কিছু লিখেছিলেন বটে, কিন্তু আজ বেঁচে থাকলে তিনি নাকি বলতেন যে 'সাম্রাজ্য' ব্যাপারটাই তো উঠে গেছে! তিনি নাকি আরও দেখতেন যে আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, হলাণ্ড এবং বুর্জোয়া দুনিয়ার অন্যান্য আগুয়ান দেশে শ্রমিকরা এমনই সুখে স্বচ্ছন্দে বসবাস করছে যে বিপ্লবের কথা ঘুণাক্ষরে তাদের মনে আর নেই। এমন কি, সোশালিস্ট নামধেয় দেশগুলি দেখে আজ লেনিন খুব অপ্রতিভ না

হয়ে পারতেন না — 'সাম্রাজ্যের অবসান' এবং অন্যান্য রচনায় জন স্ট্রেচি এ-বিষয়ে বলছেন : "কমিউনিস্টরা ভয়ঙ্কর উপায় অবলম্বন করে ফল যা পেয়েছে তা হলো অকিঞ্চিৎকর!" স্ট্রেচি তাঁর বিচিত্র জীবনে অনেক ঘাটের জল খেয়েছিলেন, কিছুকাল গোঁড়া কমিউনিস্টের নামাবলীও ধারণ করেছিলেন। এ-ধরনের বেসামাল কথা তাঁর কাছ থেকে একেবারে অপ্রত্যাশিত অবশ্য নয়।

লেনিন বলেছিলেন যে সমাজবাদে উত্তরণ করবে মানুষ "একটা গোটা ঐতিহাসিক অধ্যায়" জুড়ে সংগ্রামের ফলে, এবং সেই অধ্যায়ে ক্রমাগত এবং সহজে জয়লাভ ঘটার কথা নয়, হরেকরকম মুশকিলের আহ্সান্ করে তবেই সমাজ এগিয়ে যেতে পারবে। সুতরাং আজ দেশে-বিদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনের মত এবং পথ নিয়ে পার্থক্য, পরস্পর সম্পর্কে কটূক্তি এবং মাঝে মাঝে খেদকর সংঘর্ষ আপাতদৃষ্টিতে নৈরাশ্যের সঞ্চার ঘটালেও ঐজন্য হাল ছেড়ে দেওয়া হবে একান্ত অকর্তব্য। স্বয়ং মার্কস একবার এই বলে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে সর্বদা অনায়াস বিজয় প্রতীক্ষা করলে কখনও ইতিহাস সৃষ্টি সম্ভব হবে না — নিজেদেরই মধ্যে পরিবর্তন ঘটিয়ে যুগের পরিবর্তন সাধন সোজা কাজ নয়। বর্তমানের বহু সঙ্কট ও সমস্যাকে ছোট করে না দেখেই অবশ্য বলা যায় যে লেনিন যে পথের নির্দেশ দিয়ে গেছেন, সেই পথে চলাই আজকের কর্তব্য। লেনিনের শিক্ষাকে যাঁরা বাতিল প্রমাণ করতে কোমর বেঁধে লেগেছেন, তাঁদের হিসাবেই খুব বড় দরের ভুল রয়ে গেছে, সমাজবাদের অমোঘ অগ্রগতি রোধ করতে তাঁরা পারবেন না, ঐরাবতকেও স্রোতের তোড়ে ভেসে যেতে হয়।

প্রধান যে-কথা লেনিন শিখিয়ে গেছেন, তার কিয়দংশের উল্লেখ করলেই হবে। সোশালিজম-এর জন্য লড়াই, আন্তর্জাতিক শ্রমিক-শক্তির শ্রেণীগত সংগ্রাম এবং পরাধীন দেশসমূহের মুক্তি প্রচেষ্টা, এই ত্রিবেণীকে লেনিন যুক্ত করেছিলেন। পাশ্চাত্যের অগ্রগামী দেশে সোশালিস্ট বিপ্লব না ঘটে জার সাম্রাজ্যে তা ঘটায় বিচলিত হওয়া দূরে থাক রীতিমতো আশান্বিত হয়ে তিনি বলেছিলেন আধুনিক বিশ্বব্যবস্থায় ঐ এক দেশেই সোশালিজম প্রতিষ্ঠা সম্ভব এবং সমীচীন, সঙ্গে সঙ্গে বুঝেছিলেন যে সোভিয়েতের কর্মকাণ্ড দুনিয়ার বুর্জোয়া শক্তির সমবেত ও ঐকান্তিক শত্রুতাকে পরাভূত করে দেশ থেকে দেশান্তরে সমাজবাদের জয়যাত্রা

আনতে প্রচণ্ড সহায়তা করবে। সাম্রাজ্যশাসনে পীড়িত পরাধীন দেশগুলির অবশ্যম্ভাবী মুক্তি সম্বন্ধে একাগ্র অভিনিবেশবলে লেনিন সিদ্ধান্ত করেন যে সাম্রাজ্যের শৃঙ্খল ছিন্ন করে তারা অচিরে বুঝবে যে স্বাধীনতার প্রকৃত পরিণতি হলো সমাজবাদ এবং সেজন্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার যন্ত্রণাকে এড়িয়ে অগ্রসর হবার চেষ্টা তাদের করতে হবে—পৃথিবীর কতিপয় দেশে সোশালিজম জয়ী হওয়ার কল্যাণে ধনবাদী পথ পরিহার করেই তারা স্বকীয় বিকাশ সাধনে সমর্থ হবে। আজকের যুগ সম্বন্ধে বলা যায় যে লেনিনের ঋষিনেত্রে যা গোচরীভূত হয়েছিল, তা আমাদের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

সাম্রাজ্যবাদ বস্তুটি আজ প্রায় পৃথিবীর কোথাও নেই, এ-কথা দুনিয়া যেমন মানবে না—তেমনই ধনতন্ত্রের প্রসাদে অগ্রসর দেশগুলো বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে আছে বলে বিপ্লব বাতিল, এ-কথাও মানা চলে না। লেনিনের সংজ্ঞা অনুযায়ী "ধনতন্ত্রের চরম স্তর" হিসাবে সাম্রাজ্যবাদ আজও নির্মূল হয়নি। প্রত্যক্ষভাবে আজ সাম্রাজ্যবাদ মরিয়া হয়েও মাটি আঁকড়ে থাকার চেষ্টা করছে পর্তুগীজ, আঙ্গোলা, মোজাম্বিক, গিনি-বিসু প্রভৃতি দেশে আর দক্ষিণ আফ্রিকা, রোডীশিয়ার মতো এলাকায়। পরোক্ষভাবে সাম্রাজ্যবাদ আজ ব্যস্ত দুনিয়ার সর্বত্র—সোশালিজমকে ধ্বংস করার হাজার পরিকল্পনা ছাড়াও নির্লজ্জ নোঙরা লড়াই চালাচ্ছে ভিয়েতনামে, কোরিয়ায়, কিউবার বিপক্ষে, গোটা মধ্যপ্রাচ্য আর সবকটা সদ্যস্বাধীন দেশে। যত পুরু বোরখা পরিধান করুক না কেন, সাম্রাজ্যবাদের নবরূপ দেখিয়ে কাউকে ভোলানো চলছে না—তার শঠতা, তার ক্রূরতা, তার বীভৎসতা ঢেকে রাখবার নয়।

একচেটিয়া কারবার সম্বন্ধে লেনিনের সিদ্ধান্ত আজ অচল বলার মতো বাতুলতা নেই। বেশি কথার দরকার নেই—হয়তো যথেষ্ট হবে দু-একটি মার্কিন দৃষ্টান্ত। এই শতাব্দীর প্রথমে U. S. Steel Corporation সবচেয়ে বড়ো শিল্পসংস্থা বলে যখন বিখ্যাত ছিল, তখন তার শ্রমিক ও কর্মচারীর মোট সংখ্যা ছিল ২,১০,১৮০। আজকের সবচেয়ে প্রকাণ্ড ব্যবসা হলো General Motors, যার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভগ্নাংশ হলো বিড়লার হিন্দুস্থান মোটরসের মুরুব্বি। এই 'জেনারেল মোটরস'-এর কর্মীসংখ্যা হলো ৭,৬০,০০০;

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত আঠারোটি রাজ্যের মোট রাজস্বের চেয়ে বেশি এই শিল্পসংস্থার নীট মুনাফা — নিউইয়র্ক এবং ক্যালিফর্নিয়া ছাড়া অন্য কোনো রাজ্যেরই রাজস্ব পরিমাণে 'জেনারেল মোটরস্'-এর নীট লাভের কাছাকাছি আসতে পারেনি ১৯৬৫ সালের হিসাব অনুযায়ী। দু-লক্ষের মধ্যে দুশো কোম্পানি সেখানে দেশের শতকরা শিল্পোৎপাদনে ষাটভাগ কবুল করে রেখেছে। আমেরিকার ধনপতিদের বিদেশে লগ্নি করা পুঁজির পরিমাণ ৫০০০ কোটি ডলার (প্রায় ৩৮ হাজার কোটি টাকা)। একে বাঁচানো এবং বাড়ানোর জন্য তার যুদ্ধায়োজন—ভিয়েতনামে, মধ্যপ্রাচ্যে এবং অন্যত্র হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করে চলা, নৃশংসতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখানো, মানুষ মারার অভিনব উপায় উদ্ভাবন, পরমাণু যুদ্ধের আতঙ্কে জগৎকে অভিভূত করে রাখা ইত্যাদি নয়া-সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে অপরিহার্য। খুব উচ্চস্তরের এক সরকারী রিপোর্টে জানা যায় যে যুদ্ধের জন্য এই অপরিসীম অপব্যয়কে সংযত করার উপায় অবলম্বন করা আমেরিকার পক্ষে সম্ভব নয়—করতে গেলেই অর্থনীতির বনিয়াদ ভেঙে পড়বে। 'Report from the Iron Mountain' শীর্ষক গ্রন্থটি পড়লে আতঙ্কিত না হয়ে উপায় নেই। সোশালিস্ট দুনিয়া চায় শান্তি, যাতে মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য ও সর্ববিধ উৎকর্ষ সাধনে সর্বশক্তি প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু ধনবাদী দুনিয়া শান্তিকে ভয় করে—বিপুল ব্যবসা এবং তদনুপাতে প্রত্যাশিত মুনাফাকে নিশ্চিত করার জন্য যুদ্ধসম্ভাবনা এবং যুদ্ধায়োজনের উপর নির্ভর তাকে করতেই হবে। উপায়ান্তর নেই। এরই বিপক্ষে আমেরিকার মতো দেশের মধ্যেই প্রচণ্ড প্রশ্নের ঝড় উঠেছে—সেখানকার তরুণ মনে জিজ্ঞাসা : "আমরা কেন ভিয়েতনামের জঙ্গলে যুদ্ধ করতে যাব, কার স্বার্থে যাব, কেনই বা যাব ?" অনেকে সেখানে সমাজকে পরিহার করে উদ্ভট উৎকট জীবনের দিকে যাচ্ছে, আর অনেকে বুঝছে লেনিনের শিক্ষার সত্যতা—ধনতন্ত্র সঙ্কটাপন্ন, একান্ত রুগ্ন, প্রায় মুমূর্ষু, এর রূপান্তর ঘটাবার দায়িত্ব আজকের সমাজের।

'The Year 2000' নামে এক গ্রন্থ সম্প্রতি লিখেছেন দুই মার্কিন পণ্ডিত Hermann Kahn ও Anthony J. Wiener. এঁদের হিসাব হলো যে ২০০০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট জাতীয় উৎপাদনের মূল্য হবে আনুমানিক তিন লক্ষ তেইশ হাজার একশো কোটি ডলার, আর তখন ভারতের মোট জাতীয় উৎপাদনের মূল্য হবে আনুমানিক ২৬ হাজার কোটি ডলার।

এঁরা আরও হিসাব করেছেন যে মাথাপিছু আয় ২০০০ সালে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের হবে ভারতের চল্লিশ গুণ বেশি!

ধনতন্ত্র দারিদ্র্যের সমস্যা সমাধান করে ফেলেছে বলে যে রূপকথা প্রায়ই প্রচারিত হয়ে থাকে, তার ফাঁদে পা দেওয়া সম্বন্ধে লেনিনের শিক্ষা আমাদের সতর্ক করে রেখেছে। আমেরিকার কিম্বা পশ্চিম ইয়োরোপের কোনো কোনো দেশে জীবনের মান বেড়েছে সন্দেহ নেই — তারা দারিদ্র্যকে রপ্তানী করতে পেরেছে আমাদের মতো মন্দভাগ্য দেশে আর পেরেছে ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের কৌশল প্রয়োগ করে। সেই কৌশলকে বজায় রাখারই আপ্রাণ চেষ্টা তারা আজ করছে। ঐসব দেশেও সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশার পরিমাণ কম নয়, সামাজিক বঞ্চনা ও লাঞ্ছনা সেখানে যথেষ্ট প্রকট — বহু লক্ষ শ্রমিকের সমবেত দীর্ঘায়ত সংগ্রামী ধর্মঘট তাই প্রায়ই সেখানে ঘটে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নীগ্রো অধিবাসীদের বিপুল যে অভ্যুদয় গত দশকের অবিস্মরণীয় ঘটনা, তার অনুধাবন করার প্রয়োজন তাই এত বেশি। কিউবার সোশালিস্ট বিপ্লব যে গোটা দক্ষিণ আমেরিকায় ভূমিকম্পের সঙ্কেত, তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিদারুণ দুশ্চিন্তা থেকেই প্রমাণ হচ্ছে। আমাদের মতো পিছিয়ে-পড়া দেশগুলোকে কুক্ষিগত করে অনাহারে অশিক্ষায় আটক না রাখতে পারলে ধনতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নেই। গরীব দুনিয়া মূল্য দিচ্ছে আর পাশ্চাত্যের সচ্ছল দেশগুলি খোশ মেজাজে বহাল তবিয়তে থাকছে — এই স্ববিরোধী ব্যবস্থা বাঁচতে পারে না। তার সংহার ঘটিয়ে নব সমাজের প্রতিষ্ঠা সর্বত্র সফল করার মূলসূত্র রয়েছে লেনিনের শিক্ষায়, লেনিনের নির্দিষ্ট পথে এগিয়ে চলার সঙ্কল্পে, লেনিনের নায়কত্বে স্থাপিত সমাজবাদী ব্যবস্থার ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত নীতি এবং কৌশলগত সিদ্ধান্তে।

"সর্বে জনাঃ সুখিনো ভবন্তু" — ভারতবর্ষের এই চিরন্তন আকুলতা নিহিত ছিল লেনিনের মানসে। পরাধীনতার অভিশাপ লুপ্ত হোক, মুক্ত মানুষ সম-সুযোগের সমাজে সার্থকতার সন্ধানে চলতে সমর্থ হোক, মেহনতী মানুষের অভ্যুত্থান বিশ্বব্যাপী শোষণ ব্যবস্থার অবসান ঘটাক, এই ছিল লেনিনের কামনা। মার্কস-এর মতোই তিনি বলতে পারতেন যে ষাঁড়ের চামড়া যখন আমাদের নয় তখন মানুষের দুর্দশা দেখে পিঠ ফিরিয়ে থাকি কেমন করে? চিন্তা ও কর্মের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল তাঁর জীবনে। আমরা দেখলাম তাঁকে

শুধু মনীষী রূপে নয়—দেখলাম অমিততেজ, অক্লান্ত, বুদ্ধিদীপ্ত, সমাহিতপ্রাণ কর্মবীর রূপে।

কাউটস্কির সোভিয়েত-বিরোধী বক্তব্য খণ্ডন করতে গিয়ে লেনিন বলেছিলেন (১৯১৮) যে "সর্বহারার একাধিপত্য সবচেয়ে অগ্রসর গণতন্ত্রের চেয়ে হাজার গুণ শ্রেয়।" সোশালিজম সম্বন্ধে তাঁর মনের নিশ্চিতি ছিল অটল, অকাট্য, অমোঘ। সোশালিস্ট সমাজ নির্মাণে বহু বাধা বহু প্রতিবন্ধক তিনি জানতেন; বিপ্লবের মূল্য যে মর্মান্তিক হতে পারে তাও তাঁর কাছে স্পষ্ট ছিল। কিন্তু সোশালিজমকে যেন তিনি বলেছিলেন প্রাচীন ভারত-ঋষির ভাষায়ঃ

"প্রিয়ানাম্ ত্বা প্রিয়তমম্ হবামহে।
নিধীনাম্ ত্বা নিধিতমম্ হবামহে।"

তিনি তাই সসাগরা ধরিত্রীর সর্বত্র মানুষকে জাগিয়ে তোলার ডাক দিয়েছিলেন—অণুক্ষণের জন্যও ভোলেননি ইয়োরোপের বিপ্লবের সঙ্গে বিশ্বব্যাপী মুক্তি-প্রয়াসের সম্পর্ক, সহস্র প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও ভারতবর্ষের মতো দেশ নিয়ে তিনি এত অনুশীলন করেছিলেন, জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনকে সর্বদা সহায়তায় উদগ্রীব ছিলেন। তাই আন্তর্জাতিকতা ছিল এই মানুষটির স্বাভাবিক ভূষণ, জাতিবৈরের স্পর্শ মাত্র থেকে তিনি মুক্ত ছিলেন।

তরুণ বয়সে কার্ল মার্কস-এর জ্ঞানাঞ্জন শলাকায় চক্ষু উন্মীলিত করে নিয়ে এই ভাস্বর মনস্বী কর্মক্ষেত্রে উত্তুঙ্গ বিপ্লবী প্রতিভার পরিচয় দিয়ে ইতিহাসকে প্রদীপ্ত করে রেখেছেন। লেনিনের মরদেহ আজও মস্কো শহরে রক্ষিত, প্রতিদিন সেখানে অবিরাম জনসমাগম। কিন্তু শুধু সেখানে তাঁর অবস্থিতি নয় — তিনি আজ সর্বব্যাপ্ত। শিবহীন যজ্ঞ অসম্ভব বলা হতো এককালে, তেমনই লেনিনের জাগ্রত প্রেরণা বিনা নব-সমাজ আজও অচিন্তনীয়। শোষণের অবলুপ্তি যে ঘটবে, তা আগামী প্রভাতের সূর্যোদয়ের মতো অকাট্য। তেমনই অকাট্য হলো ঐ অবলুপ্তিকরণের সঠিকতম অস্ত্র রূপে লেনিনের শিক্ষা, লেনিনের দীক্ষা।

লেনিনের শিক্ষার আলোকে জাতীয় সংহতির সমস্যা

সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

জাতীয় সংহতির সমস্যাটি বেশ কিছুদিন থেকে দেশের চিন্তাশীল শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের কাছে গভীর উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। উগ্র প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা, বর্ণগত বিরোধ, ভাষাগত দ্বন্দ্ব, আঞ্চলিক বিরোধ ইত্যাদি জাতীয় ঐক্যের পক্ষে নিতান্ত অশুভ অমঙ্গলের রূপে আত্মপ্রকাশ করছে। এই সব অশুভ শক্তি বিভিন্ন সময়ে দেশের কোনো-না-কোনো অংশে হঠাৎ নিদারুণ হিংস্র মূর্তিতে দেখা দিয়ে মেহনতী মানুষের শ্রেণীআন্দোলন এবং সমগ্রভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে প্রচণ্ড আঘাত হানে।

স্বাধীনতা লাভের আগের যুগেও জাতীয় সংহতির সমস্যা দেশপ্রেমিক চিন্তানায়কদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু তখন অনেকেরই ধারণা ছিল যে তৃতীয় পক্ষ অর্থাৎ বিদেশী শাসকের উপস্থিতি এবং চক্রান্তই এইসব অশুভ শক্তিকে উৎসাহ দিচ্ছে। তাঁরা মনে করতেন যে উস্কানি দেওয়ার মতো তৃতীয় পক্ষ এ-দেশ থেকে চলে গেলে সমস্যার সমাধান সহজ হবে। স্বাধীনতা লাভের ২২/২৩ বছর পরেও সমস্যার বীভৎস হিংস্র প্রকাশ ঘটতে দেখে তাঁরা আতঙ্কিত হয়ে উঠেছেন। তাই বেশ কিছুদিন থেকে অজস্র সভা-সমিতি, সম্মেলন, আলোচনাচক্র প্রভৃতি নানা মঞ্চে এই সমস্যা নিয়ে মতামত প্রকাশিত হচ্ছে। কিন্তু ঐ'সব বক্তব্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে সমস্যাটিকে সামগ্রিকভাবে বোঝার চেষ্টা এ-যাবৎ বিশেষ হয়নি। এমন কি, সমস্যার যা মূল চরিত্র সেদিকেও বিশেষ কেউ দৃষ্টিপাত করেননি।

ভারত হলো বহুজাতির ও বহু ভাষার দেশ। এখানে নিজস্ব সামাজিক-সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন বিভিন্ন জাতিসত্তার অস্তিত্ব রয়েছে। সুতরাং এখানে জাতীয় সংহতি বা ঐক্যের প্রশ্নটি হলো আসলে মহাজাতিক বা বহুজাতিক ঐক্যের প্রশ্ন। আর একটু বিশদভাবে বলতে গেলে আমাদের দেশে জাতীয়

সংহতির সমস্যা হলো মূলত এইসব বিভিন্ন জাতির মধ্যে যথার্থ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা এবং ভ্রাতৃত্বমূলক সহযোগিতা গড়ে তোলার সমস্যা। জাতি-সমস্যা সম্বন্ধে লেনিনের শিক্ষা এই সমস্যার মূল চরিত্র ও তার বিভিন্ন দিককে বুঝতে সাহায্য করে, তেমনি আলোকিত করে এই বহুমুখী জটিল সমস্যা সমাধানের পথকে।

লেনিন বলেছেন—সমস্ত সামাজিক প্রশ্নের মতো জাতি-সমস্যাকেও বিচার করতে হবে সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক সীমার মধ্যে এবং বিশেষ কোনো দেশের জাতি-সমস্যা বিচারের সময় সেখানকার পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্যগুলির উপরে মনোযোগ দিতে হবে।

আমাদের দেশের বর্তমান অধ্যায়ে জাতি-সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনার আগে এই প্রশ্নে লেনিনের শিক্ষার কয়েকটি মূলসূত্রের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করা দরকার। সেগুলি হলো [১] জাতি বিকাশের ঐতিহাসিক পটভূমি [২] জাতি-সমস্যার বিভিন্ন যুগ এবং সাম্রাজ্যবাদের যুগে জাতি-সমস্যা° [৩] বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ ও তার দুই রূপ [৪] জাতি-সমস্যায় শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা এবং শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতা [৫] জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন।

জাতি-বিকাশের ঐতিহাসিক পটভূমি

লেনিনের শিক্ষা অনুযায়ী জাতি হলো একটি ঐতিহাসিক সত্তা অর্থাৎ তার পিছনে থাকে গঠনের সুদীর্ঘকাল ব্যাপী প্রক্রিয়া। ইতিহাসের ভাঙা-গড়ার খেলায় বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠী এবং উপজাতির সংমিশ্রণে এক-একটি মানবসমষ্টি এক সূত্রে গ্রথিত হতে থাকে। তা জাতিসত্তা রূপে গড়ে ওঠে চারটি বিশিষ্ট উপাদানের একত্র সমাবেশে। সেগুলি হলো যথাক্রমে এক সাধারণ ভাষা, সাধারণ বাসভূমি, অর্থনৈতিক জীবন এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তথা মননভঙ্গী। বহু শতাব্দী ধরে একই নির্দিষ্ট বাসভূমিতে পাশাপাশি বসবাস, অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের ফলে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ঐক্যের যে-যোগসূত্র গড়ে ওঠে—তা প্রতিফলিত হয় ভাষাগত ঐক্যের মধ্যে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কয়েকটি ভিন্ন ভাষা-ভাষী জনসমষ্টি একটি উন্নততর ভাষা ও সংস্কৃতির বাঁধনে এক সূত্রে গাঁথা হয়েছে।

জাতি-বিকাশের এই প্রক্রিয়া পরিপূর্ণ রূপ নেয় সমাজের অগ্রগতির একটি

নির্দিষ্ট স্তরে পৌছে অর্থাৎ পুঁজিবাদের অভ্যুদয়ের যুগে। তার আগে উপরোক্ত উপাদানগুলির উপস্থিতি এবং কাজ করে যাওয়া সত্ত্বেও জাতীয় ঐক্যবোধের জাগরণ হয় না। প্রাক-পুঁজিবাদী তথা সামন্তযুগের পরিবেশ তার পক্ষে অনুকূল নয়। কেননা, সামন্তযুগীয় অর্থনীতি, সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় মানুষের চেতনা ও দৃষ্টি দুইই থাকে নানা সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে বন্দী। মানব-ঐক্যবোধ থাকে স্থানীয়, গোষ্ঠী, বর্ণ ও সম্প্রদায়গত গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। সামন্তযুগীয় ধ্যান-ধারণা ও বিধি-নিষেধ মানুষের মনকে শৃঙ্খলিত করে রাখে। সে-দিনের মানুষ জাতি বলতে বুঝত নিজের বর্ণ বা সম্প্রদায়কে, দেশ বলতে সঙ্কীর্ণ সীমিত অঞ্চলকে। কিন্তু অর্থনৈতিক বিকাশের নিয়ম অনুসারে পুঁজিবাদের অভ্যুদয় এবং সামন্তযুগীয় সমাজের ভাঙনের প্রক্রিয়ায় ক্রমশ ঐ সব গণ্ডী ভেঙে চুরমার হয়ে যেতে থাকে। বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে গড়ে ওঠে ঘনিষ্ঠ অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক যোগাযোগ এবং আদান-প্রদান। আধুনিক পুঁজিবাদের উন্নতির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য ভাষার ঐক্য এবং অবাধ বিকাশ নিতান্ত প্রয়োজন। সত্যকার স্বাধীন বাণিজ্য, জনগণকে বিভিন্ন শ্রেণী হিসাবে সংগঠিত করা এবং বাজারের সঙ্গে প্রত্যেক মালিক, বড় ও ছোট ক্রেতা-বিক্রেতাদের নিবিড় সম্বন্ধ স্থাপনের পক্ষে ভাষাগত ঐক্য কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তা সহজে বোঝা যায়।

পুঁজিবাদের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে যে-পরিমাণে জাতীয় বাজার সংগঠিত হতে থাকে এবং একই জাতিসত্তার বিভিন্ন অংশের মধ্যে অর্থনৈতিক যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর হয়, ততই একই সাধারণ ভাষার আঞ্চলিক রূপভেদের পিছনে রয়েছে যে-মূলগত ঐক্য—তা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। তখন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ঐক্য সম্বন্ধে সচেতনতা জাগ্রত হয়। জাতীয় ঐক্যবোধের ধারক ও বাহক রূপে জাতীয় ভাষা ও জাতীয় সাহিত্য রূপ নেয়, প্রতিষ্ঠিত হয় নিজ মর্যাদায়, সমগ্র জাতির মনকে ঐকতানে ছন্দিত করে তোলে। জাতি নিজেকে খুঁজে পায়। তার সৃজনী প্রতিভা নানা বিচিত্র পথে আত্মপ্রকাশ করে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহাশক্তিধর স্রষ্টা, কর্মী, চিন্তানায়ক আবির্ভূত হন নবজাগ্রত ঐক্যবোধকে নিজ কর্ম ও ব্যক্তিত্বের মধ্যে প্রতিফলিত করে।

কিন্তু জাতীয় ঐক্য জাগরণের এই প্রক্রিয়া সহজ-সরল রেখায় অগ্রসর হয় না। তাকে পথ রচনা করে এগিয়ে চলতে হয় দ্বন্দ্বের মাধ্যমে। পুঁজিবাদকে আত্মপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে হয় সামন্তযুগীয় অর্থনীতি, সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ সংগ্রামের পথে। পুঁজিবাদ

জাতীয় চেতনার জাগরণের অনুকূল বিষয়গত পরিবেশ সৃষ্টি করলেও সেই চেতনার জাগরণ তো স্বতঃস্ফূর্তভাবে বা পরিবেশের যান্ত্রিক প্রতিচ্ছবি হিসাবে গড়ে ওঠে না! মানুষের মনের প্রাক-পুঁজিবাদী যুগের চিন্তা, সংস্কার, অভ্যাস ইত্যাদির পুঞ্জীভূত অবশেষগুলির বিরুদ্ধে ভাবাদর্শগত সংগ্রামের ফলেই জাতীয় ঐক্যবোধের পক্ষে আত্ম-প্রতিষ্ঠা সম্ভব। পুঁজিবাদের বিকাশ যদি হয় বিভিন্ন কারণে ব্যাহত খণ্ডিত ও বিলম্বিত—সে-ক্ষেত্রে সামন্তযুগীয় অবশেষগুলি জাতীয় ঐক্যবোধের পথে প্রবল বাধা সৃষ্টি করে। আবার যদি একই জাতি-সত্তার বাসভূমিতে পুঁজিবাদের বিকাশ হয় অ-সমভাবে, তাহলেও ঐ চেতনার অগ্রগতিতে তারতম্য ঘটে। ফলে জাতীয় ঐক্যবোধের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় সাম্প্রদায়িক ও বর্ণগত মনোভাব, আঞ্চলিক বিরোধ ইত্যাদি।

পণ্য-উৎপাদন-ব্যবস্থার সম্পূর্ণ জয়ের জন্য উদীয়মান পুঁজিপতিশ্রেণীর পক্ষে দেশের বাজারের উপর নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা একান্ত প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্য সফল করতে হলে চাই একই ভাষা-ভাষী জনগণের রাজ-নৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ বাসভূমি। তাই উদীয়মান পুঁজিপতিশ্রেণী জাতীয় ঐক্যের ধারক ও বাহকের ভূমিকা গ্রহণ করে এবং সেই ঐক্যকে রাষ্ট্রগত রূপ দেওয়ার কাজে অগ্রণী হয়। উদীয়মান পুঁজিপতিশ্রেণীর চিন্তা-নায়কেরা জনগণের মনে জাতীয় ঐক্যবোধ জাগ্রত করেন। পুঁজিবাদী রাষ্ট্র গঠনের সংগ্রামে পুঁজিপতিশ্রেণী জনগণকে নিজেদের পক্ষে সমবেত করে। ইতিহাসের পুঁজিবাদের যুগই হলো জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের যুগ।

সাম্রাজ্যবাদের যুগে জাতি-সমস্যা

লেনিন জাতি-সমস্যায় দুটি পৃথক ঐতিহাসিক যুগের কথা উল্লেখ করেছেন। একটি হলো পুঁজিবাদের উদয়ের যুগ এবং অপরটি হলো পুঁজিবাদের পতনের পূর্বাহ্ন বা সাম্রাজ্যবাদের যুগ।

প্রথমটিতে অর্থাৎ পুঁজিবাদের উদয়ের যুগে জাতীয় প্রশ্নটি ছিল সামন্তযুগীয় সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামের এবং বুর্জোয়া গণ-তান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের প্রশ্ন। এই প্রক্রিয়াটি ঘটেছিল পশ্চিম

ইয়োরোপে। সেখানে প্রধানত এক জাতির মানুষদের ঐক্যবদ্ধ করে জাতীয় রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল। তাই তখন জাতীয় প্রশ্নটি জাতি-সমস্যা হয়ে দেখা দেয়নি বা জাতীয় স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্নটি সামনে আসেনি।

কিন্তু দ্বিতীয় যুগের অবস্থা অন্যরূপ। লেনিন পুঁজিবাদের বিকাশের দুইটি ঐতিহাসিক ঝোঁকের কথা বলেছেন। পুঁজিবাদের অগ্রগতির ফলে একদিকে যেমন জাতি-গঠন এবং জাতীয়তাবোধের জাগরণ হয়, তেমনি বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিচ্ছিন্নতার বদলে পারস্পরিক যোগাযোগ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ক্রমশ জাতিতে জাতিতে ব্যবধান দূর এবং জাতীয় গণ্ডীগুলি ভেঙে চুরমার হয়ে যেতে থাকে। বিভিন্ন জাতির মধ্যে অর্থনৈতিক যোগাযোগ এবং আদান-প্রদানের ক্ষেত্র প্রসারিত হয়। পুঁজিবাদের একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হলো উৎপাদন ও বিনিময় পদ্ধতিকে আন্তর্জাতিক চরিত্র দান করা। ফলে আন্তর্জাতিক যোগাযোগের পথ প্রশস্ত হয়। সমাজবিকাশের দিক থেকে এটি হলো অগ্রণী পদক্ষেপ।

কিন্তু পুঁজিবাদের অপর প্রবৃত্তি বা ঝোঁকটি হলো অন্যদেশের বাজারের উপর নিজের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা, পররাজ্য গ্রাস, অন্য জাতিকে গোলামে পরিণত করা। এই নীতিরই অঙ্গ হলো অনুন্নত জাতিগুলির বলপূর্বক একীকরণ, জাতিগত নিপীড়ন ও শোষণ। এই চরিত্রটি বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে সাম্রাজ্যবাদের যুগে। সাম্রাজ্যবাদী শাসনে ও শোষণে উপনিবেশের ও পরাধীন দেশের পদানত জাতিসত্তাগুলির বিকাশ সবদিক দিয়ে ব্যাহত হয়। কিন্তু ইতিহাসেরই অমোঘ নিয়মে এইসব দেশেও পুঁজিবাদের বিকাশ হতে থাকে, জাতীয় বুর্জোয়া ও শ্রমিকশ্রেণী গড়ে ওঠে। জাতি-বিকাশের প্রক্রিয়া শত বাধা সত্ত্বেও এগিয়ে চলতে থাকে।

ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ ব্যবস্থায় যেমন সেখানকার সামন্তযুগীয় অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থার ভিত্তিমূলে প্রচণ্ড আঘাত লাগে, তেমনি অন্যদিকে বিদেশী শাসন ও শোষণের স্বার্থে সামন্তযুগীয় অবশেষগুলিকে কৃত্রিমভাবে জীইয়ে রাখা হয়। তাই সাম্রাজ্যবাদের যুগে পরাধীন নিপীড়িত দেশগুলিতে জাতি-সমস্যা একাধারে সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের চরিত্র নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। জাতীয় ঐক্যের জাগরণ—জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন, জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য সংগ্রামের রূপে দেখা দেয়। জাতীয় আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকারের প্রশ্নটি সামনে এসে যায়।

বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের দুই রূপ

লেনিন বলেছেন যে প্রভুজাতির বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ এবং নিপীড়িত জাতির বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য করতে হবে। প্রথমটি হলো সম্পূর্ণভাবে প্রতিক্রিয়াশীল। আর দ্বিতীয়টির মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল দিকের সঙ্গে একটি প্রগতিশীল দিক আছে।

বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের মূল চরিত্র হলো বুর্জোয়াশ্রেণীকে সমগ্র জনগণের প্রতিনিধি এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থকে সমগ্র জনগণের স্বার্থ রূপে উপস্থিত করা। বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের সাহায্যে ঐ শ্রেণী মেহনতী জনগণকে বিশেষত শ্রমিকশ্রেণীকে শ্রেণীগত শোষণের কথা ভুলিয়ে সত্য সম্বন্ধে মোহগ্রস্ত করে রাখতে চায়। পুঁজিবাদের উদয়ের প্রথম যুগে যখন বুর্জোয়াশ্রেণী সামন্তবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রগতিশীল ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে, তখনও সে এই নীতি অনুসরণ করে। সাম্রাজ্যবাদের যুগে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির শাসকশ্রেণী পররাজ্য গ্রাস, ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণ, নিজেদের মুনাফার স্বার্থে অন্য দেশের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধ ইত্যাদিতে জনগণকে কামানের খোরাক হিসাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে জাতি-বিদ্বেষ, জাতি-শ্রেষ্ঠত্ব ইত্যাদি ধারণা প্রচারের দ্বারা মনকে বিষাক্ত করে তোলে। এইসব জঘন্যতম প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদের উৎস নিহিত রয়েছে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদে।

কিন্তু পরাধীন জাতির বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদে যে-প্রগতিশীল দিকটি আছে তা হলো সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা। বিদেশী শাসন ও শোষণ পরাধীন জাতির বুর্জোয়াশ্রেণীর বিকাশ এবং জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের আকাঙ্ক্ষার পথে প্রকাণ্ড বাধা। সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে স্বার্থসংঘাতের দরুণই তাকে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার পথ নিতে এবং জনগণকে নিজ নেতৃত্বে সমবেত করায় উদ্যোগী হতে হয়। পুঁজিবাদের উদয়ের যুগে সামন্তবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বুর্জোয়া-শ্রেণী যে-ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, তাও কিছু পরিমাণে পালন করতে হয়।

তবে যে-যুগে আন্তর্জাতিক পুঁজির সঙ্গে আন্তর্জাতিক শ্রমের সংঘাত চরম সীমায় পৌঁচেছে, সেই যুগে পরাধীন দেশেও বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের এই প্রগতিশীল ভূমিকা হয় কুণ্ঠিত এবং সীমিত। তার ভূমিকায় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার সঙ্গে সঙ্গে জড়িত থাকে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপসমুখীনতা।

এই দ্বৈত-চরিত্রের এক-একটি দিক এক-একটি পরিস্থিতিতে বড় হয়ে ওঠে। যে-পরিমাণে ঔপনিবেশিক দেশে শ্রমিকশ্রেণী গড়ে ওঠে এবং স্বাধীন রাজনৈতিক শক্তি অর্থাৎ জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে বিকাশ লাভ করে ততই বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে দোদুল্যমানতা দেখা দেয়। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে স্বার্থের মৌলিক সংঘাতের দরুণ আপোষের ইচ্ছা সত্ত্বেও তাকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভূমিকা নিয়ে চলতে হয়।

জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর দ্বৈত-চরিত্রের নেতিবাচক দিকটি প্রাধান্য লাভ করে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পরবর্তী অধ্যায়ে। সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে স্বার্থের সংঘাত তখনও থাকে কিন্তু জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর দক্ষিণপন্থী উপাদানগুলির মধ্যে ক্রমশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোষ ও গাঁঠছড়া বাঁধার নীতি শক্তি সঞ্চয় করে। বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের নেতিবাচক চরিত্রের অপর দিকগুলি যথা জাতি-বিদ্বেষ, জাতি-শ্রেষ্ঠত্ব, জাতিগত সঙ্কীর্ণতা প্রভৃতিও বড় হয়ে উঠতে থাকে এই অধ্যায়ে।

শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতা

মার্কস-লেনিনবাদের শিক্ষা অনুসারে শ্রমিকশ্রেণী কখনই জাতি-সমস্যা সম্বন্ধে উদাসীন থাকতে পারে না। শ্রমিকশ্রেণীর লক্ষ্য হলো জাতিগত শোষণ ও নিপীড়ন সহ সমস্ত রকমের শোষণের অবসান। অন্য জাতির জনগণকে পদানত করে রেখে কোনো দেশের শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে সামাজিক মুক্তি অর্জন সম্ভব নয়।

জাতি-সমস্যার ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণী তার বিশিষ্ট স্বাধীন ভূমিকা পালন করতে পারে আন্তর্জাতিকতার পতাকা হাতে নিয়ে। এই আন্তর্জাতিকতার দুটি দিক আছে। একটি হলো নিজ দেশে জাতীয় কর্তব্য পালন করা এবং অপরটি হলো সমস্ত দেশের শ্রমিক, শ্রমজীবী ও নিপীড়িত জনগণের মৈত্রীকে শক্তিশালী করা।

সাম্রাজ্যবাদী দেশের শ্রমিকশ্রেণীর কর্তব্য হলো নিজ দেশের শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামকে তীব্রতর করে তোলার সঙ্গে-সঙ্গে পরাধীন এবং ঔপনিবেশিক দেশের জনগণের মুক্তি-সংগ্রামের প্রতি সম্ভবপর সকল উপায়ে অকুণ্ঠ সমর্থন দান। প্রভুজাতির বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের সমস্ত রূপের বিরুদ্ধে ক্ষমাহীন সংগ্রাম পরিচালনা ঐ কর্তব্যের অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ।

পরাধীন দেশের শ্রমিকশ্রেণীর কর্তব্য একদিকে জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামে অগ্রণী অংশ নেওয়া, জনগণের সমস্ত দেশপ্রেমিক অংশের বৃহত্তম ঐক্য গড়ে তোলায় উদ্যোগী হওয়া, মুক্তি-সংগ্রামের সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ-বিরোধী চরিত্রকে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা, অন্যদিকে জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের আন্তর্জাতিক চরিত্র অর্থাৎ তা যে বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামেরই অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ এই সত্যটিকে বলিষ্ঠভাবে উপস্থাপিত করা। সেই সংগ্রামের প্রধান বাহিনীত্রয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ঐক্য গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় উভয় ধরনের বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের নেতিবাচক দিকগুলির বিরুদ্ধে আপোষহীন মনোভাব গ্রহণের মাধ্যমেই পরাধীন দেশের শ্রমিকশ্রেণী নিজ দেশের জনগণকে আন্তর্জাতিকতার শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করতে সমর্থ হয়।

কিন্তু লেনিনের শিক্ষা অনুসরণ করে পরাধীন দেশের শ্রমিকশ্রেণী এইসব দেশের বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে দ্বৈত-মনোভাব এবং কৌশল অবলম্বন করে। অর্থাৎ তার প্রগতিশীল দিকের প্রতি সমর্থন এবং প্রতিক্রিয়াশীল তথা নেতিবাচক দিকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী যে-পরিমাণে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করে সেই পরিমাণে শ্রমিকশ্রেণী তাকে সমর্থন করে এবং তার দোদুল্যমানতা ও আপোষমুখীনতার বিরুদ্ধে লড়াই চালায়। জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতিবাচক দিকের প্রতি শ্রমিকশ্রেণীর সমর্থন নিঃশর্ত নয়।

জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ

জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে লেনিনের শিক্ষার দুটি অঙ্গ আছে (১) সমস্ত পরাধীন জাতির পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণ — অর্থাৎ সার্বভৌম জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের অধিকার স্বীকার করা (২) সমস্ত জাতির শ্রমিক ও মেহনতী জনগণের আন্তর্জাতিক ঐক্য ও কর্তব্যের দিকটি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা। শ্রমিকশ্রেণী বলপূর্বক একীকরণের বিরুদ্ধে কিন্তু সমস্ত জাতির স্বেচ্ছামূলক ঐক্যকে স্বাগত জানায়, সেজন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করে এবং জাতিগত বিচ্ছিন্নতা তথা সঙ্কীর্ণতার মনোভাবকে প্রশ্রয় দেয় না।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথাও মনে রাখা দরকার। লেনিন বলেছেন যে নীতিগতভাবে সমস্ত জাতির বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার অধিকার সহ আত্মনিয়ন্ত্রণের

অধিকারকে স্বীকৃতি জানাবার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হওয়ার দাবীকে প্রতিটি ক্ষেত্রে বিচার করতে হবে মূর্তভাবে অর্থাৎ বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতির সঙ্গে মিলিয়ে। বিচ্ছিন্ন হওয়ার দাবী সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী সংগ্রামের পক্ষে সহায়ক হবে না, প্রতিক্রিয়ার শক্তি বৃদ্ধি করবে সেটাই হবে বিচারের মাপকাঠি।

আমাদের দেশে জাতি-সমস্যার ঐতিহাসিক পটভূমি

আমাদের দেশের জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের চরিত্রের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আছে। আগেই বলা হয়েছে যে ভারত হলো বহু জাতির দেশ। এখানে বিবিধের ঐক্যের অর্থ বহু-জাতিক তথা মহাজাতিক ঐক্য। দ্বন্দ্বমূলক ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিচার করলে এই বহু-জাতিক ঐক্যের দুটি দিক রয়েছে। একটি হলো বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সমস্ত জাতি-সত্তার মিলিত সংগ্রাম এবং অপরটি হলো বিভিন্ন জাতি-সত্তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের বিকাশ, বাজার ও স্বায়ত্ত-শাসনের দাবী। উভয়ের মধ্যে সঠিক সম্বন্ধ স্থাপনের উপরেই নির্ভর করে জাতীয় সংহতির সমস্যার সঠিক সমাধান। প্রথম দিকটি বা প্রবৃত্তি থেকে জন্ম নিয়েছে সর্ব-ভারতীয় ঐক্যবোধ কিন্তু দ্বিতীয় প্রবৃত্তিটির মধ্যে রয়েছে বিরোধের উপাদান। সঠিক পথে পরিচালিত না হলে তা তীব্ররূপে দেখা দিতে বাধ্য। তার উপরে রয়েছে ঔপনিবেশিক অতীত এবং সামন্তযুগীয় সমাজ ব্যবস্থার অবশেষগুলি। রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পূর্ববর্তী অধ্যায়ে প্রথম প্রবৃত্তিটিই ছিল প্রধান কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী যুগে দ্বিতীয় প্রবৃত্তিটি নানাভাবে তার অস্তিত্ব জানিয়ে দিচ্ছে। উপরন্তু ঔপনিবেশিক অতীতের অবশেষগুলি সমস্যাকে জটিল করে তোলে। প্রাদেশিক, ভাষাগত এবং আঞ্চলিক বিরোধ হলো জাতি-সমস্যার অর্থাৎ বিভিন্ন জাতি-সত্তার বিকাশ তথা আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়ার অভিব্যক্তি। সাম্প্রদায়িকতা এবং বর্ণগত বিরোধ হলো সামন্তযুগীয় অবশেষগুলিকে জীইয়ে রাখার পরিণাম। উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। কেননা জাতি বিকাশের প্রক্রিয়া যে-পরিমাণে বিলম্বিত ও ব্যাহত হয় সেই পরিমাণে সামন্তযুগীয় অবশেষগুলি প্রবল থাকে। অন্য দিকে উক্ত অবশেষগুলি জাতীয় ঐক্য চেতনার পথে প্রবল বিঘ্ন সৃষ্টি করে।

আমাদের দেশে বিভিন্ন জাতি-সত্তার বিকাশ ঘটেছে অ-সমভাবে। কয়েকটি ক্ষেত্রে জাতি হিসাবে গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয় বহুকাল আগে, কোনো কোনো বিদেশী মার্কসবাদী গবেষকের মতে চতুর্দশ শতাব্দী থেকে। অন্যান্য ক্ষেত্রে উক্ত প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে আধুনিক যুগে। আবার অপর কয়েকটি ক্ষেত্রে, যথা কয়েকটি উপজাতীয় জন-সমষ্টির জাতি হিসাবে বিকাশ শুরু হয়েছে একেবারে সাম্প্রতিক কালে। বিদেশী শাসকের অনুসৃত নীতি ঐ অ-সম বিকাশের প্রক্রিয়া ও বৈষম্যকে আরো বাড়িয়ে তুলেছে।

এ-দেশে কয়েকটি অংশে ব্রিটিশ শাসনের অনেক আগে থেকেই সামন্তবাদের ভাঙন এবং দেশীয় পুঁজিবাদের উদ্ভবের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। অবশ্য তার গতি ছিল অনেক মন্থর। ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের যুগে সামন্তযুগীয় অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তিমূলে প্রচণ্ড আঘাত লাগে বটে কিন্তু সেই ভাঙনের ফলে পুঁজিবাদের বিকাশের তথা সামাজিক পরিবর্তনের প্রবাহ শক্তিশালী হয়ে ওঠার যে-সম্ভাবনা ছিল তাকে ব্রটিশ সাম্রাজ্যবাদ কৃত্রিমভাবে বাধা দিয়ে ঠেকিয়ে রেখেছে। বিদেশী শাসক সামন্তযুগীয় অবশেষগুলিকে শুধু জীইয়েই রাখেনি, অনেক ক্ষেত্রে নতুনভাবে জীবন দান করেছে যথা জমিদারশ্রেণী এবং ব্রিটিশ রাজমুকুটের একান্ত বশম্বদ দেশীয় নৃপতিবৃন্দ। মোটের উপর ঐগুলি থেকেছে ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের স্তম্ভ হয়ে।

অন্যদিকে এদেশের সুপ্রতিষ্ঠিত কুটির শিল্পকে বিদেশী শাসক সুপরিকল্পিত ভাবে ভেঙে চুরমার করে দেয়। ঔপনিবেশিক যুগে এ-দেশে আধুনিক শিল্প ও বাণিজ্যের যেটুকু বিস্তার হয় তা ঘটেছিল প্রধানত সাম্রাজ্যবাদী শোষণের অনুকূলে। চরিত্রের দিক থেকে সেগুলি ছিল বিদেশী শোষণের মুখাপেক্ষী। ভৌগোলিক দিক থেকে সেগুলির অবস্থান ছিল কয়েকটি অঞ্চলে, প্রধানত বন্দরগুলিকে কেন্দ্র করে সীমাবদ্ধ।

সামন্তযুগীয় অর্থনীতির ভাঙন, আধুনিক শিল্প-বাণিজ্যের সীমিত বিস্তার ইত্যাদির সুযোগ নিয়ে ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে দেশীয়দের উদ্যোগেও ক্রমে শিল্প গড়ে উঠতে থাকে। গড়ে ওঠে দেশীয় বুর্জোয়াশ্রেণী। কিন্তু তাদের উদ্যোগে, অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও সংস্কৃতিগত বিকাশের যতটুকু প্রচেষ্টা হয়েছে স্বভাবতই সে-দিন তা ছিল খুব সীমাবদ্ধ। তার সামাজিক পরিধি ছিল সঙ্কীর্ণ এবং ঐ বন্দরকেন্দ্রিক অঞ্চলগুলির মধ্যেই সীমিত। ফলে আঞ্চলিক বৈষম্য দুই-দিক থেকে প্রবল হয়ে উঠেছে (১) বিভিন্ন জাতি-সত্তার বিকাশের মধ্যে

বৈষম্য (২) একই জাতি-সত্তার বাসভূমির বিভিন্ন অঞ্চলের উন্নতির মধ্যে প্রকট তারতম্য।

সাম্রাজ্যবাদী শাসন শুধু যে দেশের বিকাশ ও সামাজিক পরিবর্তনের পথে বাধা সৃষ্টি করেছে তাই নয়। বিদেশী শাসক নিজ শাসনকে সুরক্ষিত রাখার উদ্দেশ্যে যে-সব উপায়ের সাহায্য নিয়েছে তার মধ্যে অন্যতম ছিল ভেদ-নীতি। তারা নানা কূটকৌশলের সাহায্যে নানা ভাষা-ভাষী এবং নানা ধর্মমতাবলম্বী জনগণের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি এবং তাতে ইন্ধন যুগিয়েছে। কখনও প্রশাসনিক উপায়ে অনৈক্যকে কৃত্রিম উপায়ে বাড়িয়ে তুলেছে, যথা বহু ভাষা-ভাষী জনসমষ্টি নিয়ে প্রশাসনিক প্রদেশ গঠন, আবার একই ভাষা-ভাষী জনসমষ্টিকে বিভিন্ন প্রদেশে ও দেশীয় রাজ্যের মধ্যে বিভক্ত করা। প্রশাসনিক প্রদেশগুলিতে বিদেশী শাসক এক জাতি-সত্তার উপরের অংশকে কিছু-কিছু সুযোগ দিয়ে অন্য জাতি-সত্তার জনগণের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে।

তবু বিদেশী শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা দুর্বার হয়ে ওঠায় ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের পক্ষে জাতিগত বিভেদের অস্ত্রকে আশানুরূপভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সত্যকার জাতীয় ঐক্য বা প্রকৃত অর্থে বিভিন্ন জাতি-সত্তার ঐক্য রচনার ভিত্তি গড়ে ওঠে, বিভিন্ন জাতি-সত্তার জাগরণ প্রথম থেকেই পরিচালিত হয় সাধারণ শত্রু সাম্রাজ্য-বাদের বিরুদ্ধে। জাতীয় আন্দোলনের একেবারে গোড়ার দিক থেকেই তাকে সর্ব-ভারতীয় পটভূমিতে সংগঠিত করার প্রয়োজনীয়তা সকলেই বোধ করেন।

উপরোক্ত অবস্থায় সুচতুর বিদেশী শাসক প্রধান শক্তি কেন্দ্রীভূত করে সাম্প্রদায়িকতার অস্ত্র ব্যবহারের উপরে। সামন্তযুগীয় অবশেষগুলির শক্তি এবং জাতীয় আন্দোলনের বুর্জোয়া নেতৃত্বের কয়েকটি গুরুতর দুর্বলতার দরুণই সাম্রাজ্যবাদ এই অস্ত্র ব্যবহারে বহুল পরিমাণে সফল হয়। সে প্রসঙ্গের অবতারণা এখানে করতে গেলে প্রবন্ধের কলেবর ভারাক্রান্ত হয়ে পড়বে। সংক্ষেপে শুধু একটি কথাই বলতে হয়, জাতীয় আন্দোলনের বুর্জোয়া নেতৃত্ব মুক্তি-সংগ্রামের সামন্তবাদ-বিরোধী দিকটির উপর যথোচিত গুরুত্ব দিতে অবহেলার দ্বারা সাম্রাজ্যবাদী ভেদ-নীতির সুযোগ করে দিয়েছেন।

যাহোক, সাম্রাজ্যবাদের ভেদ-নীতি জাতীয় ঐক্যবোধের অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করলেও তার গতিরোধে সমর্থ হয়নি। জাতীয় মুক্তি

আন্দোলন গণভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তার মধ্যে ভারতের নানা ভাষা-ভাষী জাতি-সত্তার ঐক্য মূর্ত হয়ে ওঠে। অবশ্য জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব ছিল যাদের হাতে, তাঁদের মনে ভারতীয় ঐক্যের ধারণা ছিল ভাবাশ্রয়ী। দ্বিতীয়ত তাঁরা এই ঐক্যকে বহু-জাতিক হওয়ার বদলে এক-জাতিক ঐক্য বলে ভাবতেন। সেদিন বিদেশী শাসক আমাদের স্বাধীনতার দাবী প্রত্যাখ্যানের অজুহাত হিসাবে যুক্তি দিত যে ভারতবর্ষ এক জাতি নয়, নানা জাতি, ভাষা, ধর্ম ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত। স্বতরাং তার পক্ষে জাতীয় স্বাধীনতার দাবী অযৌক্তিক। এর জাতীয় আন্দোলনের নেতা ও চিন্তানায়কেরা তুলে ধরতে চাইতেন স্মরণাতীত কাল থেকে সারা ভারতের ভাবগত ঐক্যের কথা। ভারতের ঐক্যকে বহু জাতির ঐক্য বলে উপলব্ধি করাটা ছিল তাঁদের মননভঙ্গীর গণ্ডির বাইরে। উপরন্তু অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর গঠিত সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে অভিজ্ঞতার আগে বহু-জাতিক ঐক্য এবং বিভিন্ন জাতির স্বেচ্ছামূলক বন্ধুত্বপূর্ণ মিলনের ভিত্তিতে গঠিত বহু-জাতিক রাষ্ট্রের কল্পনা ছিল আকাশ-কুসুমের মতো। সাম্রাজ্যবাদের পরিবেশে জাতিগত দ্বন্দ্বটাই ছিল নিদারুণ সত্য। তাই সে-দিন জাতীয় আন্দোলনের নেতা ও চিন্তানায়কেরা ভারতের এক-জাতীয়ত্ব প্রমাণের জন্যই সচেষ্ট ছিলেন।

কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রগতির সঙ্গে-সঙ্গে ক্রমশ স্বাধীন ভারতে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় কাঠামো কি হবে তা স্পষ্টীকরণের দাবী উঠতে থাকে। ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ পুনর্গঠনের দাবী ওঠে। জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সেই নীতি স্বীকৃত হয়। ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ পুনর্গঠন আর সংবিধানের যুক্তরাষ্ট্রীয় (ফেডারেল) রূপ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা ছিল কার্যত বহু-জাতিক ঐক্যের পরোক্ষ স্বীকৃতি। সেদিন বিভিন্ন জাতি-সত্তার অন্তর্গত উদীয়মান ধনিকশ্রেণীর আত্মপ্রতিষ্ঠার দাবী ওরই মধ্যে প্রতিফলিত হয়। অ-সম বিকাশের দরুণ বৈষম্য এবং পরস্পরের সঙ্গে স্বার্থ-সংঘাতের চেয়ে সেদিন বড় হয়ে উঠেছিল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মিলিত আন্দোলনের ঐক্যের চেতনা।

এই শতাব্দীর চতুর্থ দশকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে ভারতীয় ঐক্যের বহু-জাতিক চরিত্র এবং জাতি-সমস্যা সমাধানের সঠিক পরিপ্রেক্ষিত নির্দেশের চেষ্টা হয়। বলা হয় যে বিভিন্ন জাতির সম-মর্যাদা,

সমান অধিকারের পরিপূর্ণ স্বীকৃতি এবং স্বেচ্ছামূলক মিলনের ভিত্তিতে গড়ে উঠবে যথার্থ ঐক্যের সুদৃঢ় ভিত্তি। কিন্তু মার্কসবাদের শিক্ষাকে দেশের বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে প্রয়োগের ব্যাপারে অভিজ্ঞতা এবং পরিপক্কতার অভাবে কয়েকটি গুরুতর ভুল করা হয়। তাদের মধ্যে একটি হলো সোভিয়েত রাশিয়ার অভিজ্ঞতাকে যান্ত্রিকভাবে প্রয়োগের চেষ্টা। জার শাসিত রাশিয়াতে একটি জাতির প্রভুশ্রেণী অন্য সমস্ত অ-রুশীয় জাতিগুলিকে পদানত করে রেখেছিল। তাই সেখানে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্নটি রাশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের অধিকারের রূপে আত্মপ্রকাশ করে। আমাদের দেশে সমস্ত জাতি-সত্তা মিলিতভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের অধিকারের জন্য সংগ্রাম করছিল। সুতরাং এখানে পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার বদলে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ঐক্যকে আরো শক্তিশালী করে এগিয়ে নেওয়াই ছিল সঠিক পথ। সেই সত্যটি উপলব্ধি না করে সোভিয়েত অভিজ্ঞতাকে যান্ত্রিকভাবে উপস্থাপনের চেষ্টার ফলে জাতি-সমস্যা সম্বন্ধে এদের সমাধান হয় অবাস্তব। দ্বিতীয়ত, তথাকথিত মুসলিম জাতিগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণের তত্ত্ব প্রচারের দ্বারা সেদিন জাতি-সমস্যা সম্বন্ধে মার্কস-লেনিনবাদের শিক্ষাকে বিকৃত করা হয়। এইসব ভুলের ফলে কমিউনিস্টদের পক্ষ থেকে ভারতের জাতি-সমস্যার প্রকৃত চরিত্র তুলে ধরবার প্রয়াস সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জনমানসে প্রভাব বিস্তার করা দূরে থাকুক, বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

স্বাধীনতার পরবর্তী অধ্যায়ে জাতি-সমস্যা

স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে ভারতীয় ঐক্যকে এক-জাতিক ঐক্য হিসাবে দেখার প্রচেষ্টার নেতিবাচক দিকগুলি তেমন পরিস্ফুট হয়ে ওঠেনি কয়েকটি কারণে (১) তখন ভারতের যে ভাবগত ঐক্যের কথা প্রচার করা হতো তার প্রাণবস্তু ছিল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ঐক্য। তাছাড়া সেই ঐক্য যে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য এবং বিবিধের মাঝে মহান মিলন এই সত্যটিকে ভাববাদী ধরনে হলেও স্বীকৃতি দেওয়া হতো (২) স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে প্রধানত অপেক্ষাকৃত উন্নত ভাষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের অধিকারী প্রায় বার-তেরটি জাতি-সত্তার অস্তিত্বই পরিস্ফুট ছিল। এই

কয়েকটি ভাষা-ভাষী জনসমষ্টির সংখ্যা হলো ভারতের মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৮৭.১৩ ভাগ। অন্যান্য ছোট-ছোট জাতি-সত্তা বিকাশের দিক দিয়ে অনেক পিছিয়ে পড়েছিল। (৩) বৃহত্তর জাতি-সত্তাগুলি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষা ও স্ব-শাসনের দাবী ভাষাভিত্তিক প্রদেশগুলি ও ভারতের ফেডারেল কাঠামোর মধ্যে সুরক্ষিত হবে বলে আশা করেছিল (৪) দেশীয় বৃহৎ বুর্জোয়া এবং বিভিন্ন জাতি-সত্তার অন্তর্গত বুর্জোয়াদের মধ্যে স্বার্থ-সংঘাত তখনও তেমন স্পষ্ট আকার ধারণ করেনি।

স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে সর্বভারতীয় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ঐক্য ও সংহতি বোধ গড়ে উঠেছিল তাহলো আমাদের দেশের জনগণের হাতে জাতীয় আন্দোলনের সবচেয়ে মূল্যবান উত্তরাধীকার। বর্তমান সাম্রাজ্যবাদ সামন্তবাদ বিরোধী বিপ্লবের অসমাপ্ত কর্মসূচীকে সম্পূর্ণ করে অ-ধনতান্ত্রিক পথে সমাজতন্ত্রের দিকেও অগ্রসর হওয়ার জন্য সেই উত্তরাধিকারকে অক্ষুণ্ন রেখে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন আছে। বিশেষত এশিয়া-আফ্রিকার সদ্যস্বাধীন রাষ্ট্রগুলির সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে নয়া উপনিবেশবাদী চক্রান্তের পটভূমিতে জাতীয় সংহতির প্রশ্ন নতুন গুরুত্ব অর্জন করেছে। কিন্তু রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পরবর্তী পরিবর্তিত পরিস্থিতি যে-নীতি ও পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে অগ্রসর হলে তা করা যায় সে-নীতি বা পরিপ্রেক্ষিত কোনোটি গ্রহণ করাই জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর পক্ষে সম্ভব নয়।

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে জাতীয় সংহতির সেই সংগ্রামী চরিত্রের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন ঃ

প্রথমত, ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের ও সামন্তযুগীয় অবশেষগুলির মূলোৎপাটন এবং জনগণের স্বার্থে মৌলিক অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক রূপান্তর সাধনের জন্য এক বলিষ্ঠ বৈপ্লবিক কর্মসূচী গ্রহণ।

দ্বিতীয়ত, স্বাধীন ভারতে বিভিন্ন জাতি-সত্তা এবং ভাষা ও সংস্কৃতিগত জনসমষ্টির বিকাশের সমান অধিকারের সুস্পষ্ট স্বীকৃতি এবং ভারতীয় ঐক্যের কাঠামোর মধ্যে প্রত্যেক জাতি-সত্তার নিজ-নিজ ক্ষেত্রে স্ব-শাসনের অধিকারের ন্যায্য দাবীকে বাস্তব রূপদানের উপযোগীভাবে রাষ্ট্রীয় কাঠামো তথা সংবিধান রচনা।

ঔপনিবেশিক যুগে ধনতন্ত্রের অ-সম বিকাশের জন্য যে-সব জাতি-সত্তা অপেক্ষাকৃত অনুন্নত ও পশ্চাৎপদ অবস্থায় রয়েছে তাদের দ্রুত বিকাশ

লাভের সুযোগ এবং যথোচিত সাহায্যদান। অনেকগুলি জাতি-সত্তা বিশেষত উপজাতীয় জাতি বিকাশের পথে অগ্রসর হয়েছে সাম্প্রতিক দশকগুলিতে বা তার সামান্য কিছুদিন আগে। স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ঐক্যের চেতনা এদের মানসে নানা কারণে সঞ্চারিত হতে পারেনি। সুতরাং নতুন পরিস্থিতিতে এদের ন্যায্য দাবী-দাওয়ার প্রতি সহানুভূতিশীল মনোভাব অবলম্বনের দ্বারা তাদের মনে এই বিশ্বাস জাগ্রত করা যে তারাও স্বাধীন ভারতের জাতীয় জীবনে সমান মর্যাদা এবং অধিকার সম্পন্ন অংশীদার।

তৃতীয়ত, ঔপনিবেশিক শাসনে সৃষ্ট জাতিগত দ্বন্দ্ব এবং বৈষম্যের সমস্ত কারণগুলিকে দূর করার জন্য সমস্ত রকম ব্যবস্থা গ্রহণ।

লেনিনের শিক্ষা থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে শ্রেণীগত শোষণই হলো জাতিগত দ্বন্দ্ব, অবিশ্বাস ও সংঘাতের উৎস। সুতরাং জাতি-সমস্যার পরিপূর্ণ সমাধান সম্ভব সমাজতন্ত্রের পরিবেশে। সেই সঙ্গে লেনিন এই শিক্ষাও দিয়েছেন যে সমাজতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টির আগে এই সমস্যার পরিপূর্ণ সমাধান সম্ভব নয়, এই অজুহাতে শ্রমিকশ্রেণী কখনও হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারে না। তিনি বলেছেন যে পুঁজিবাদী সমাজ ও রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে বিভিন্ন জাতির মৈত্রী ও বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার অনুকূল পরিবেশ যতদূর সম্ভব ব্যাপকভাবে সৃষ্টি করা সম্ভব একমাত্র সুসঙ্গত গণতান্ত্রিকতার ভিত্তিতে। অর্থাৎ জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারকে যতদূর সম্ভব প্রসারিত করতে এবং গণতন্ত্র বিস্তারের পথের বাধাগুলিকে দূর করতে হবে। গণতান্ত্রিক অধিকারের উক্ত সম্প্রসারণের একটি প্রধান অঙ্গ হলো আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন। আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের নীতি প্রসঙ্গে লেনিন বলেছেন যে মার্কসবাদীরা ইতিহাসে অগ্রণী পদক্ষেপ হিসাবে বৃহৎ কেন্দ্রীভূত (centralised) রাষ্ট্রের পক্ষপাতী ঠিকই, তবে তারা চায় গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণ। দেশের যে-সব অঞ্চলের সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবেশে অথবা জাতিগত গঠনে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে সেগুলির জন্য স্বায়ত্ত শাসনের ব্যবস্থার মাধ্যমেই গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণের নীতি সার্থক হয়ে উঠতে পারে।

লেনিনের শিক্ষা অনুসারে জাতি-সমস্যার সঠিক সমাধানে পথ নির্দেশ করতে পারে একমাত্র আন্তর্জাতিকতার শিক্ষায় অনুপ্রাণিত শ্রমিকশ্রেণী। কোনো ধরনের বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের অর্থাৎ বৃহৎ জাতি বা ক্ষুদ্র জাতির বুর্জোয়া

জাতীয়তাবাদের পক্ষে তা সম্ভব নয়। ভারতে স্বাধীনতার পরবর্তীকালের পরিস্থিতির পর্যালোচনা এই সত্যকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে।

আমাদের দেশে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্বে। ফলে জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে যে-সব দুর্বলতা, স্ববিরোধিতা ও দ্বন্দ্ব ছিল তা বজায় রয়ে গিয়েছে। স্বাধীনতার পর শাসকশ্রেণী জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, জাতি-সমস্যার ক্ষেত্র সহ, ঔপনিবেশিক ও সামন্তযুগীয় অবশেষগুলির মূলোচ্ছেদের নীতি গ্রহণের বদলে সেগুলিকে কিছুটা সঙ্কুচিত ও সংস্কার সাধনের দ্বারা জীইয়ে রেখেছে।

রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পরবর্তী অধ্যায়ে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতিবাচক দিকগুলি প্রাধান্য লাভ করতে থাকে। আমাদের দেশেও তাই ঘটছে। বিশেষত ঐ শ্রেণীর সবচেয়ে প্রভাবশালী ও সংগঠিত অংশ সর্ব-ভারতীয় বৃহৎ বুর্জোয়াদের মধ্যে নেতিবাচক দিকগুলি অত্যন্ত প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। বৃহৎ ধনিক গোষ্ঠি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে শক্তি সঞ্চয় করে এখন একচেটিয়া গোষ্ঠিতে পরিণত। এরা আবার নানা সূত্রে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের সঙ্গে জড়িত। সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে এদের স্বার্থের সংঘাত বিলুপ্ত হয়নি ঠিকই, তবে সহযোগিতা ও আপোষের নীতিই প্রবল। জনগণের অন্যান্য অংশের সঙ্গে এদের দ্বন্দ্বও উঠেছে অত্যন্ত তীব্র হয়ে।

সর্বভারতীয় বৃহৎ বুর্জোয়াদের উদ্দেশ্য হলো সমগ্র ভারতের বাজার এবং প্রশাসন ব্যবস্থার উপরে নিজেদের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা। জাতীয় সংহতি সম্বন্ধে এদের দৃষ্টিভঙ্গী সেই উদ্দেশ্যের দ্বারা প্রভাবিত। প্রাক-স্বাধীনতা যুগে এক-জাতিক ঐক্যের ভাবাশ্রয়ী ধারণার মধ্যে বৈচিত্র্যকে স্বীকৃতি দান ও তার সম্বন্ধে অর্থনীতি, রাষ্ট্রীয় কাঠামো, ভাষা, সংস্কৃতি ইত্যাদির বিষয়ে উদার মনোভাব গ্রহণের যে-দিকটি ছিল তাকে বর্জন করে বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রকে যথাসম্ভব সঙ্কুচিত করে আনতেই এরা তৎপর হয়ে উঠেছে। ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠন, উপজাতীয়দের জন্য আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, কেন্দ্র-বনাম-রাজ্য সম্পর্ক, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সমস্ত প্রশ্নেই বৃহৎ বুর্জোয়া শ্রেণীর একচ্ছত্র আধিপত্যের মনোভাবের প্রতিফলন সুস্পষ্ট।

বিভিন্ন জাতি-সত্তার অন্তর্গত অ-বৃহৎ বুর্জোয়াদের সঙ্গে বৃহৎ বুর্জোয়াদের স্বার্থের সংঘাত পরিস্ফুট হয়ে ওঠে ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠন, কেন্দ্র বনাম অঙ্গরাজ্যগুলির সম্পর্ক, আঞ্চলিক বিরোধ, কেন্দ্রের সরকারী ভাষা ইত্যাদি

প্রশ্ন। কিন্তু প্রথমোক্তেরা বৃহৎ বুর্জোয়াদের নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের পতাকা হাতে নিয়ে। বিভিন্ন জাতি-সত্তার অন্তর্গত বুর্জোয়াদের মধ্যেও স্বার্থের সংঘাত আছে। সুতরাং তারা নিজ-নিজ জাতি-সত্তার জনগণকে নিজস্ব সঙ্কীর্ণ শ্রেণীগত স্বার্থে ব্যবহার করতে চায়। তারা চায় নিজেদের শোষণের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করতে। সেজন্যই তারা প্রাদেশিকতা, জাতিগত বিদ্বেষ প্রভৃতির মনোভাবে ইন্ধন যুগিয়ে শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করে।

সাম্প্রতিক দশকগুলিতে যে-সব জাতি-সত্তার মধ্যে বিশেষত উপজাতীয়দের ক্ষেত্রে বুর্জোয়াশ্রেণীর উপাদান গড়ে উঠেছে সেইসব ক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট জনগণের স্বায়ত্তশাসনের দাবীর আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের পতাকার তলে। একদিকে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক এদের ন্যায্য দাবীর প্রতি ক্রমাগত উপেক্ষা এবং অন্যদিকে ক্ষুদ্র জাতির বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ দুইয়ে মিলে এইসব আন্দোলনে জাতিগত সঙ্কীর্ণতা, বিচ্ছিন্নতা এবং অন্য-জাতির জনগণের প্রতি বিদ্বেষের মনোভাব মাথা তোলে।

জাতি-সমস্যার অঙ্গীভূত বিভিন্ন সমস্যা এইভাবে জটিল হয়ে উঠেছে বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র উভয় ধরনের বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের সংঘাতে। এমনকি একই জাতি-সত্তার বাসভূমিতে অ-সম বিকাশের দরুণ যে বৈষম্য রয়ে গিয়েছে তাই নিয়ে স্বার্থের সংঘাত সংশ্লিষ্ট জাতি-সত্তার জনগণকে দুই বিবদমান শিবিরে ভাগ করে দেয়। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো স্বতন্ত্র তেলেঙ্গানার অন্দোলন।

জাতি-সমস্যার সঠিক বিকল্প সমাধানের পথ দেখতে যারা পারে সেই শ্রমিকশ্রেণী এবং তার অগ্রণী অংশ কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে ভারতের জাতি-সমস্যা এ-যাবৎ মোটের উপর উপেক্ষিত হয়ে এসেছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রশ্নে যথা ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠন, উপজাতীয়দের আঞ্চলিক স্বায়ত্ত-শাসন, ভাষা-সমস্যা, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার সম্প্রসারণ ইত্যাদি বিষয়ে আন্তর্জাতিকতাবাদী দৃষ্টি থেকে সমাধান নির্দেশের চেষ্টা হয়েছে ঠিকই। কিন্তু সমস্যাটির সামগ্রিক রূপ ও তার বিভিন্ন দিককে গভীরভাবে অধ্যয়নের কাজটি অবহেলিত হয়ে এসেছে। সমস্যাগুলির সঠিক সমাধান নির্দেশ করে তার ভিত্তিতে বিভিন্ন জাতি-সত্তার জনগণকে আন্তর্জাতিকতার শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য প্রয়োজন যে নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা এবং প্রচার-অভিযান তার প্রতি যথোচিত গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি। ফল হয়েছে এই যে উভয়

ধরনের বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের বদলে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রশ্নে কোনো না কোনো ধরনের বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের লেজুড়-বৃত্তি।

লেনিন বলেছেন, "To throw off all feudal oppression, all national oppression, all privileges enjoyed by one nation or language, is the bounden duty of the proletariat as a democratic force, and is certainly in the interest of proletarian class struggle, which is obscured and retarded by national bickering. But to help bourgeois nationalism beyond these strictly confined and definite historical limit means betraying the proletariat and taking the side of the bourgeoisie."

(Critical Remarks on the National Question, Foreign Languages Publishing House, Moscow, 1951 p., 36)

অর্থাৎ "সমস্ত রকমের সামন্তযুগীয় নিপীড়ন, সমস্ত জাতিগত নিপীড়ন, একটি জাতির বা একটি ভাষার সমস্ত বিশেষ সুবিধা — এইগুলির বিলোপ সাধন করা হলো গণতান্ত্রিক শক্তি হিসাবে শ্রমিকশ্রেণীর অবশ্য কর্তব্য। তা নিঃসন্দেহে শ্রমিকের শ্রেণী-সংগ্রামের অনুকূল, কেননা জাতিগত দ্বন্দ্ব ঐ সংগ্রামকে চাপা দেয় এবং ব্যাহত করে। কিন্তু এইসব সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক সীমা রেখার বাইরে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদকে সাহায্য করার অর্থ হলো শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর পক্ষ নেওয়া।" (ক্রিটিক্যাল রিমার্কস অন দি ন্যাশানাল কোশ্চেন, ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজেস পাবলিশিং হাউস, মস্কো, ১৯৫১, ৩৬ পৃঃ)।

শ্রমিকশ্রেণী ও তার অগ্র-বাহিনী কমিউনিস্ট পার্টিকে আন্তর্জাতিকতার শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ নিজস্ব স্বাধীন ভূমিকা নিয়ে জাতীয় সংহতির সমস্যার সমাধানে বিকল্প পথ প্রদর্শনে উদ্যোগী হতে হবে।

বিপ্লবের স্তর বিচারের প্রশ্নে লেনিন

নরহরি কবিরাজ

মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা বিপ্লবের স্তর বিচারের প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে। স্তর বিচারের প্রশ্নের সঙ্গে বিপ্লবের সাফল্যের প্রশ্নটি একান্তভাবে জড়িত। এইজন্যেই মার্কস-এঙ্গেলস লিখিত 'কমিউনিস্ট ইস্তেহারে' বিপ্লবের স্তর বিচারের প্রশ্নটি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। বস্তুত, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও সর্বহারা বিপ্লব—এই দুইয়ের পার্থক্য এবং সর্বহারা বিপ্লবের ঐতিহাসিক ভূমিকা — এই দুটির উপর ভর করেই 'কমিউনিস্ট ইস্তেহারের' কেন্দ্রীয় বক্তব্যটি গড়ে উঠেছে।

বিপ্লবের স্তর বিচারের প্রশ্নটি লেনিনীয় চিন্তারও একটি প্রধান অঙ্গ। লেনিনের শিক্ষার একটি প্রধান কথাই হলো — স্তর নিরপেক্ষ বিপ্লব বলে কোনো কিছু নেই। বিপ্লব বলতেই বুঝতে হবে — কোনো একটি বিশেষ কালের এবং কোনো একটি বিশেষ দেশের বিপ্লব। স্থান ও কাল নিরপেক্ষ বিপ্লব মার্কসবাদী ধ্যানধারণার বিরোধী একটি পেটি-বুর্জোয়া কল্পনা-বিলাস মাত্র।

সেইজন্যেই লেনিন বার বার বলেছেন — কোনো একটি দেশের বিপ্লবের গতি-প্রকৃতি বিচারের সময়ে দুটি দিকে খেয়াল রাখতে হবে। প্রথমত, আমরা যে-যুগে বাস করছি সেইযুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য কি — কোন শ্রেণী এই যুগের নিয়ন্তা-শক্তি — এই বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে।

দ্বিতীয়ত, খেয়াল রাখতে হবে — আমরা যে-দেশের বিপ্লবের কথা বলছি সেই দেশ বিপ্লবের কোন স্তরে রয়েছে।

রুশ বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য

কাল-নিরপেক্ষভাবে বিচার করলে সর্বহারা বিপ্লবের বিশেষত্বটিই আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যাবে। কেননা, সর্বহারা-বিপ্লবের পূর্বে পৃথিবীতে অসংখ্য বিপ্লব ঘটেছে। যেমন, দাসব্যবস্থা যখন প্রচলিত ছিল, তখন দাসব্যবস্থার বিরুদ্ধে বহুবার দাস-বিপ্লব ঘটেছিল। এই দাস-বিপ্লবের আঘাতে দাসব্যবস্থা ভেঙে পড়েছিল। আবার দাসব্যবস্থা ভেঙে পড়ার পরে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার

প্রভুত্বের যুগ আরম্ভ হয়। এই যুগে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সুরু হয় আবার আর এক ধরনের বিপ্লব। এই সামন্ততন্ত্র-বিরোধী বিপ্লবে নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত ছিল বুর্জোয়াশ্রেণী। তাই এই যুগকে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগ বলা হয়। আবার এই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগটিও চিরস্থায়ী হয়নি। যে-সব দেশে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব জয়যুক্ত হলো সেখানে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং পরবর্তীকালে একচেটিয়া ধনতন্ত্রের উদ্ভব ঘটল। এই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আরম্ভ হলো সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লব।

এই বিপ্লব আগের সমস্ত রকমের বিপ্লব থেকে পৃথক। কেননা, দাস-বিপ্লবের ফলে একটি শোষকশ্রেণীর (দাস-প্রভু) প্রভুত্বে ছেদ পড়লেও আর একটি শোষকশ্রেণীর (সামন্ত-প্রভু) প্রভুত্বের প্রতিষ্ঠা হয়। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে একটি শোষকশ্রেণীর (সামন্ত-প্রভু) প্রভুত্বের অবসান ঘটলেও আর একটি শোষকশ্রেণীর (বুর্জোয়া-শ্রেণী) প্রভুত্বের সূচনা হয়। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পূর্ণ নতুন ধরনের বিপ্লব। এই বিপ্লবের ফলে বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রভুত্বের অবসান ঘটার পরে সর্বহারাশ্রেণীর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা হয়। অর্থাৎ সর্বহারা বিপ্লবের ফলে একটি শোষকশ্রেণীর ক্ষমতা লাভের প্রক্রিয়াটিতে পূর্ণ ছেদ পড়ে। শ্রেণীর দ্বারা শ্রেণীর শোষণ, মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ বন্ধ হয়। এইটিই রুশ বিপ্লবের ঐতিহাসিক তাৎপর্য।

কাজেই দেখা যায় ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবের রূপেরও পরিবর্তন হয়ে যায়। কাজেই কাল-নিরপেক্ষ বিপ্লব বলে কিছু নেই। সারা পৃথিবীর ঐতিহাসিক বিকাশের প্রেক্ষাপট সামনে রেখে আরও বলা যায় — আমরা বর্তমানে যে-যুগে বাস করছি সেই যুগের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে সর্বহারাশ্রেণীর কর্মকাণ্ড যার প্রধান লক্ষ্যই হলো ধনতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটিয়ে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যের দিকে পৃথিবীকে পরিচালিত করা।

বিপ্লব কাল-নিরপেক্ষ নয়, যুগ-নিরপেক্ষ নয়, এটা যেমন লেনিনবাদের একটি বড় শিক্ষা, তেমনি আবার মনে রাখা প্রয়োজন যে বিপ্লব স্থান বা দেশ নিরপেক্ষ নয়। একই কালে বা একই যুগে সমাজবিকাশের স্তর ভেদ অনুযায়ী দেশে-দেশে বিপ্লবের স্তরভেদ ঘটতে পারে। যেমন, ১৭৮৯ থেকে ১৮৭১ সালের অন্তর্বর্তীকালীন যুগকে পশ্চিম ইওরোপের দেশগুলি (ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি) এবং আমেরিকার ক্ষেত্রে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্যের যুগ বলা যেতে পারে। এই সময়ে আমেরিকায় ও পশ্চিম ইওরোপের

দেশগুলিতে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের আঘাতে সামন্ততন্ত্রের অচলায়তন ভেঙে পড়ে এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতৃত্বে জাতীয় রাষ্ট্র গঠিত হতে থাকে। আবার, উনিশ শতকের শেষে এইসব দেশে একচেটিয়া ধনতন্ত্র গড়ে ওঠার পর থেকে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ধারা নিঃশেষিত হয়ে যায়। তখন থেকে এইসব দেশে একচেটিয়া ধনতন্ত্রকে উৎখাত করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব গড়ে তোলার কাজটি প্রধান হয়ে দাঁড়ায়।

পশ্চিম ইওরোপের দেশগুলিতে বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতৃত্বে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সুসম্পন্ন হয়েছিল এবং বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরটি শেষ হবার পরে সেখানে বিপ্লবের পরবর্তী স্তরের উদ্বোধন ঘটেছিল—এই বৈশিষ্ট্যটির প্রতি লেনিন মার্কসবাদীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন (Lenin—A Caricature of Marxism)। কিন্তু পশ্চিম ইওরোপের দেশগুলির বিপ্লবের বিকাশের এই প্রক্রিয়াটিকে একটি বাঁধা ছক হিসাবে গ্রহণ করার বিপদ সম্পর্কেও তিনি সহকর্মীদের সজাগ থাকতে উপদেশ দেন।

পশ্চিম ইওরোপের দেশগুলির ছকে ফেলে একদল মার্কসবাদী রাশিয়াতে বিপ্লব সংগঠনের কথা ভাবতেন। মেনশেভিকদের ধারণা ছিল ঃ পশ্চিম ইওরোপের ছক অনুযায়ী রাশিয়াতেও প্রথম স্তরে বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতৃত্বে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত করতে হবে এবং পরবর্তী স্তরে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত করতে হবে। মেনশেভিকরা জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের উপর জোর দিলেন এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতৃত্বে এই সংগ্রাম পরিচালনা অপরিহার্য বলে মনে করলেন।

রাশিয়াতে লেনিন মেনশেভিকদের এই দৃষ্টিভঙ্গীর বিরোধিতা করে বললেন — রাশিয়ায় সমাজবিকাশের স্তর আলাদা এবং সেইহেতু বিপ্লবের স্তরও পৃথক। সমাজবিকাশের ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতি অঙ্গুলি সঙ্কেত করে তিনি দেখালেন — রাশিয়াতে ধনতন্ত্রের উদ্ভবের প্রশ্নটি ছোট করে দেখা এবং জারতন্ত্রের অস্তিত্বের প্রশ্নটিকে বড় করে দেখা ভুল। আবার রাশিয়া যে ধনতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে খুবই পশ্চাৎপদ এবং এখানে জারতন্ত্র রাষ্ট্রক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত এটিও ভুলে গেলে চলবে না।

রাশিয়ায় সমাজবিকাশের এই অতি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে লেনিন লিখলেন — "Russia is a capitalist country. On the other hand, Russia is still very backward, as compared

with other capitalist countries, in her economic development."
(Lenin : Development of Capitalism in Russia)।

জারতন্ত্রের অবস্থানের ফলে রাশিয়াতে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কাজগুলি অসম্পন্ন থেকে যায়। আবার রাশিয়াতে একটি ধনতান্ত্রিক দেশের পর্যায়ে উন্নতি হওয়ায় বুর্জোয়া শ্রেণীর পক্ষে, যারা এই ব্যবস্থায় ছিল শোষণের অংশভাগী — তাদের পক্ষে জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে দ্বিধাহীন সংগ্রাম পরিচালনা সম্ভব ছিল না। ফলে, বুর্জোয়াশ্রেণীর পক্ষে জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেতৃত্ব নেবার সম্ভাবনাটি বাতিল হয়ে যায়। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে লেনিন লিখলেন যে রাশিয়াতে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কাজগুলিকে সম্পাদন করার ক্ষমতা বুর্জোয়াশ্রেণীর নেই। এই কাজে এগিয়ে যেতে হবে শ্রমিক ও কৃষকদের। এই কাজে নেতৃত্ব দিতে হবে সর্বহারাশ্রেণীকে। সেইজন্যে তিনি ১৯০৫ সালে সমাজের স্তর সামনে রেখে রাশিয়াতে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক একনায়কতন্ত্রের বদলে শ্রমিক-কৃষকের বিপ্লবী একনায়কতন্ত্র গড়ে তোলার আহ্বান জানান। (Lenin : Two Tactics of Social Democracy in the Democratic Revolution)।

১৯০৫ সালে রাশিয়াতে এই বিপ্লব ব্যর্থ হয়। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের মধ্যে রাশিয়াতে আবার বিপ্লবী পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। শেষপর্যন্ত ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে রাশিয়াতে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব জয়লাভ করে। জারতন্ত্রের অবসান ঘটে এবং বুর্জোয়াশ্রেণী সেই সুযোগে ক্ষমতালাভ করে। গণতান্ত্রিক বিপ্লবের এই জয়লাভের পিছনে শ্রমিক ও কৃষকের অগ্রণী ভূমিকা ছিল — ফেব্রুয়ারীর গণতান্ত্রিক বিপ্লবের এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি লেনিন দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শ্রমিক ও কৃষকের সোভিয়েত যা এই সময়ে জারতন্ত্রের পতনে অগ্রণী ভূমিকা নেয় তাকে তিনি ক্ষমতার আধার বলে চিত্রিত করেন। এই সময়ে লেনিন সময়ক্ষেপণ না করে বুর্জোয়াশ্রেণীর হাত থেকে শ্রমিক ও কৃষকের সোভিয়েতগুলির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের আহ্বান জানান। এই আহ্বানের ফলে ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে রাশিয়াতে বুর্জোয়াশ্রেণীর একনায়কত্বের অবসান ঘটে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের প্রতিষ্ঠা হয়। এইভাবেই রাশিয়াতে পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটে। (Lenin : April Thesis)।

সংক্ষেপে বলা চলে : রুশ বিপ্লব যে-পথটি গ্রহণ করে অগ্রসর হয়

হয় সেটি অনন্য। লক্ষণীয় যে পশ্চিম ইওরোপ ও আমেরিকার মতো রুশ দেশে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে বুর্জোয়াশ্রেণী নেতৃত্বের ভূমিকা নেয়নি। এই বিপ্লবে নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিল সর্বহারাশ্রেণী। রুশ দেশে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কাজগুলি সুসম্পন্ন করতে এগিয়ে আসতে হয়েছিল শ্রমিক ও কৃষকদের। শ্রমিক ও কৃষকের বিপ্লবী গণতান্ত্রিক সংগ্রামের অন্তর্বর্তীকালীন একটি স্তরের মধ্যে দিয়ে রুশ দেশকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পথটি বেছে নিতে হয়েছিল। এইটি ছিল সমাজতন্ত্রে উত্তরণে রাশিয়ার নিজস্ব পথ।

উপনিবেশিক বিপ্লবের স্তর

রুশ-বিপ্লব মানবজাতির সামনে একটি নতুন আদর্শ স্থাপন করল — এই সত্যটি উদ্‌ঘাটিত করল যে, সমাজতন্ত্রে উত্তরণ মানবজাতির মুক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ পথ।

কিন্তু রুশ-বিপ্লবের শিক্ষার অতি সরলীকৃত ব্যাখ্যা করে অনেকে বলতে থাকেন যে রুশ-বিপ্লবের এই ছক অনুযায়ী প্রতিটি দেশে এখন থেকে বিপ্লব হবে। লেনিন এই প্রবণতার বিপদ সম্পর্কে হুঁশিয়ারি দিয়ে লিখলেন—

"All nations will arrive at socialism — this is inevitable, but all will do so in not exactly the same way, each will contribute something of its own to some form of democracy, to some variety of the dictatorship of the proletariat, to the varying rate of socialist transformation in the different aspects of social life."

উপনিবেশিক ও পরাধীন দেশগুলিতেও লেনিনের শিক্ষার প্রতি অবহেলা করে একদল মার্কসবাদী বলতে থাকেন — রাশিয়াতে যেমন হয়েছে তেমনি এই সব দেশেও গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে দ্রুত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে পরিচালিত করা প্রয়োজন। তৃতীয় আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে (১৯২০) এম. এন. রায় বলেছিলেন — ভারতের জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের (অর্থাৎ গণতান্ত্রিক বিপ্লবের) স্তর শেষ হয়েছে এবং সেখানে অবিলম্বে শ্রমিক-কৃষকের শ্রেণী-সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে পরবর্তী স্তরের আন্দোলন শুরু করা দরকার। এম. এন. রায় খেয়াল করেননি যে — উপনিবেশিক ও পরাধীন দেশগুলি সমাজবিকাশের স্তরের দিক থেকে বিচার করলে শুধুই পশ্চিম ইওরোপের দেশগুলি (ইংলণ্ড,

ফ্রান্স প্রভৃতি) থেকে স্বতন্ত্র ছিল তাই নয়, রাশিয়ার থেকেও ছিল স্বতন্ত্র। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা ছিল উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশ। রাশিয়া পশ্চাৎপদ হলেও ছিল ধনতান্ত্রিক। অথচ উপনিবেশিক ও পরাধীন দেশগুলিতে ধনতন্ত্রের বিকাশ ঘটেছে অল্পই, অথবা কোনো কোনো দেশে ধনতন্ত্রের উদ্ভবই ঘটেনি; কাজেই উপরোক্ত দুটি পর্যায়ের ধনতান্ত্রিক দেশগুলির (অর্থাৎ পশ্চিম ইওরোপ বা রাশিয়া) কোনোটির সঙ্গেই পরাধীন দেশগুলির সমাজবিকাশের স্তরটি এক করে দেখা যায় না।

পরাধীন দেশের বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিত বিচার করার সময়ে লেনিন সব সময়েই এই মূল সূত্র সামনে রেখে অগ্রসর হন।

এই দেশগুলির সমাজ-বিকাশের স্তর বিচার করতে গিয়ে লেনিন তাই লেখেন, ধনতন্ত্রের অ-সম বিকাশের ফলে বাস্তব অবস্থা হলো: অতি উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির পাশাপাশি অবস্থান করছে অর্থনৈতিকভাবে স্বল্প উন্নত অথবা সম্পূর্ণতই অনুন্নত কতকগুলি দেশ। এর ফলে পৃথিবী দুই ধরনের দেশে বিভক্ত হয়েছে—অতি উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলি: যেগুলি নির্যাতনকারী দেশ, ও অনুন্নত দেশগুলি: যেগুলি নির্যাতিত দেশ। (Lenin — Preliminary Draft Theses on the National and Colonial Questions)।

এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছেন—এই দুই ধরনের দেশের মধ্যে একমাত্র পশ্চিম ইওরোপ ও উত্তর আমেরিকার উন্নত দেশগুলিতে সমাজতন্ত্রের জন্যে সংগ্রামের পক্ষে অবস্থা পরিপক্ক হয়েছে, কিন্তু অনুন্নত দেশগুলির অবস্থা আলাদা। এই নির্যাতিত দেশগুলি, ধনতন্ত্রের বিকাশের দিক থেকে বিচার করলে, অনুন্নত। কাজেই এই দেশগুলিতে ধনতন্ত্রের উচ্ছেদ বা সমাজতন্ত্র গঠনের প্রশ্ন ওঠে না। এই দেশগুলির সামনে আশু কাজ হলো বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কাজগুলি সম্পাদন করা।

বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে এই নির্যাতিত দেশগুলির আন্দোলন যে জাতীয় (সাম্রাজ্যবাদবিরোধী) চরিত্র পরিগ্রহ করে—এই বৈশিষ্ট্যের উপর জোর দিয়ে লেনিন বলেছেন—জাতীয় নির্যাতনের বিরুদ্ধে এইসব দেশে ব্যাপক জনগণের প্রতিরোধ সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং নির্যাতিত দেশের প্রতিরোধ সব সময়েই জাতীয় বিদ্রোহের রূপ নেবার দিকে অগ্রসর হয়।

লেনিন আরও লিখেছেন—যেহেতু এইসব দেশ জাতীয় আন্দোলনের স্তরে রয়েছে, সেইহেতু এই আন্দোলনে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর যোগদানের

প্রশ্নটিও গুরুত্ব দিয়ে বিচার করা প্রয়োজন। তিনি জাতীয় আন্দোলনে বুর্জোয়া-শ্রেণীর যোগদানের প্রশ্নটি উত্থাপন করে বলেছেন—প্রত্যেকটি জাতীয় আন্দোলনে সূচনাতে বুর্জোয়াশ্রেণী স্বাভাবিকভাবেই নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত থাকে। (Lenin—Right of Nations to Self-determination)। এর ফলে বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদী ধারণার উদ্ভব হয়ে থাকে। নির্যাতিত দেশের বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদের মধ্যে থাকে একটি সাধারণ গণতান্ত্রিক উপাদান—যেটিকে মার্কসবাদীরা সমর্থন করবে।

অবশ্য, লেনিন সতর্ক করে দিয়েছেন—বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদের ভিতরকার গণতান্ত্রিক উপাদানকে সমর্থন করা এবং সমগ্রভাবে বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদকে সমর্থন করা এক কথা নয়। তিনি আমাদের স্মরণ রাখতে বলেছেন যে মার্কসবাদ ও বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদ—দুটি পৃথক শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গী।

প্রত্যেকটি জাতীয় আন্দোলনের ঐতিহাসিক মর্মবস্তুটি বিচার করে দেখতে হবে এবং তার মধ্যে যেটুকু প্রগতিশীল সেইটুকুই কেবল মার্কসবাদীরা সমর্থন করবে। যতক্ষণ পর্যন্ত নির্যাতিত দেশের বুর্জোয়াশ্রেণী নির্যাতন-কারীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে—ততক্ষণ সব সময়েই প্রত্যেক ক্ষেত্রে, এবং অন্যের চেয়ে আরও দৃঢ়তার সঙ্গে, মার্কসবাদীরা তার পক্ষে থাকবে, কিন্তু যে-ক্ষেত্রে নির্যাতিত দেশের বুর্জোয়াশ্রেণী সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদের রাস্তা বেছে নেবে, সে-ক্ষেত্রে মার্কসবাদীরা তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নেবে।

এইজন্যেই লেনিন হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেছেন—নির্যাতিত দেশের সর্বহারা-শ্রেণী কোনোক্রমেই বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদের লেজুড়বৃত্তি করবে না। লেনিন লিখেছেন—সর্বহারা জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনে এইটি স্বাধীন সুস্থিরচিত্ত বিপ্লবী শক্তি হিসাবে কাজ করবে। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সর্বহারাশ্রেণী জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের ভিতরে একটি বিকল্প কর্মসূচী তুলে ধরবে। এই কর্মসূচীর (পূর্ণ স্বাধীনতা ও কৃষকের স্বার্থে ভূমিসংস্কার এই কর্মসূচীতে অগ্রাধিকার পাবে) ভিত্তিতে জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামে সর্বহারাশ্রেণী কতকগুলি বিপ্লবী উপাদান সংযোজন করবে।

জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামে (অর্থাৎ গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে) বিপ্লবী উপাদান সংযোজন বলতে বোঝায়, উপরোক্ত কর্মসূচীর ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে এমনভাবে সুসম্পন্ন করা যাতে শ্রমিক-কৃষকের স্বার্থ সুরক্ষিত হতে পারে। যাতে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে জাতীয়-বুর্জোয়াশ্রেণী

জনগণের ওপর ধনতন্ত্রের পথটি চাপিয়ে দিতে না পারে। যাঁরা মনে করতেন পশ্চিম ইওরোপের দেশগুলির মতো উপনিবেশিক দেশগুলিতেও ধনতন্ত্রের পথে গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করতে হবে, তাঁদের উদ্দেশ্যে লেনিন বলেন যে এইসব দেশের পক্ষে গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পাদনের পরে ধনতন্ত্রের পথ গ্রহণ অপরিহার্য নয়। পরিবর্তিত বিশ্ব-পরিস্থিতিতে ধনতন্ত্রের পথটি এই-সব দেশের পক্ষে পাশ কাটিয়ে যাওয়া সম্ভব এবং তাই বাঞ্ছনীয়। কেননা, ধনতন্ত্রের ক্ষয়িষ্ণুতার যুগে বিশ্ব-ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাহায্যে ভর করে এইসব দেশের বেশিদূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া, রুশ-বিপ্লবের সাফল্যের পরে ধনতন্ত্রের পাশাপাশি সমাজতন্ত্রের অবস্থান ও শক্তিবৃদ্ধির ফলে এই দেশগুলির পক্ষে বিশ্ব-ধনতন্ত্রের উপর অসহায় নির্ভরশীলতাও আজ আর আগের মতো অপরিহার্য নয়। সোভিয়েত রাশিয়ার সাহায্য ও সমর্থন পাবার ফলে এইসব দেশের পক্ষে ধনতন্ত্রের পথটি গ্রহণ না করে অ-ধনতান্ত্রিক পথটি বেছে নেওয়াই শ্রেয়। এইসব দেশের দ্রুত অগ্রগমনের পক্ষে এটিই একমাত্র নিশ্চিত পথ।

বলাই বাহুল্য, এই অ-ধনতন্ত্রের পথ ধনতন্ত্রের অবলুপ্তির পথ নয়। ধনতন্ত্রের অবলুপ্তি বা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বাস্তব অবস্থাটি এখনও এইসব দেশে সৃষ্টি হয়নি। তাই লেনিন এইসব দেশকে পরামর্শ দিয়েছেন — আপাতত ধনতন্ত্রের সঙ্কোচনের পথটি বেছে নিতে। ধনতন্ত্রের সঙ্কোচন সমাজতন্ত্র গঠনের পূর্ব-শর্তগুলি সৃষ্টি করবে এবং ভবিষ্যতে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের কাজটিকে সুগম করবে।

সংক্ষেপে বলা চলে, লেনিনের শিক্ষার মূল কথা হলো: উপনিবেশিক ও পরাধীন দেশগুলির পক্ষে এক লাফে সমাজতন্ত্রে পৌছানো সম্ভব নয়। এই দেশগুলিকে অ-ধনতান্ত্রিক পথে একটি বিপ্লবী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের অন্তর্বর্তীকালীন স্তরের মধ্যে দিয়ে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের দিকে অগ্রসর হতে হবে।

ভারতে বিপ্লবের স্তর বিচারের সমস্যা

এই লেনিনীয় দৃষ্টিভঙ্গী সামনে রেখে ভারতের বিপ্লবের মূল প্রকৃতি এবং তার দেশগত ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যগুলি বিচার করা প্রয়োজন। লেনিনীয় সংজ্ঞা অনুযায়ী ভারত ছিল একটি নির্যাতিত দেশ। সেই হিসাবে প্রকৃতির দিক থেকে ভারতের বিপ্লব ছিল নির্যাতিত দেশের বিপ্লব। স্তর হিসাবে

বিচার করলে ভারতের সংগ্রাম ছিল গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে। কেননা সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদ, সামন্ততন্ত্রের অবলুপ্তি—এগুলি গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কাজ ছাড়া আর কিছু নয়।

এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই লেনিন ভারতের জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের সমস্যাবলী বিচার করেন।

১৯০৮ সালে ভারতের বিপ্লবের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লেনিন লক্ষ্য রেখেছিলেন যে ভারত গণতান্ত্রিক বিপ্লবের জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের স্তরে রয়েছে। লেনিন আরও লক্ষ্য করেছিলেন যে এই সময়ে ভারতের জাতীয় অন্দোলনে বুর্জোয়াশ্রেণী নেতৃত্বে অবস্থান করছে এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত এই আন্দোলনে গণতান্ত্রিক উপাদান রয়েছে। সেইজন্যেই ১৯০৮ সালে তিলকের কারাদণ্ডের প্রতিবাদে যখন ভারতীয় শ্রমিকেরা ধর্মঘট করে, তখন তিনি তিলককে গণতন্ত্রবাদী নেতা বলে আখ্যা দেন এবং এই গণতন্ত্রবাদী নেতার কারাদণ্ডের প্রতিবাদে শ্রমিকেরা যে-ধর্মঘট করেন —তাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। (Lenin—Inflammable Materials in World Politics)। ১৯২০ সালে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের বুর্জোয়ানেতৃত্বের ভূমিকা নিয়ে এম. এন. রায়-এর সঙ্গে তাঁর মতভেদ হয় এবং তিনি ভারতের আন্দোলনের প্রকৃতি যে জাতীয় আন্দোলনের প্রকৃতি, গণতান্ত্রিক সংগ্রামের প্রকৃতি—এই বিষয়ে রায়কে সজাগ করে দেন। বলাই বাহুল্য, লেনিন ভারতের শ্রমিকশ্রেণীকে বুর্জোয়া-শ্রেণীর কাছে আত্মসমর্পণের পরামর্শ দেননি। তিনি ১৯০৮ সালের বোম্বাই-এর শ্রমিক ধর্মঘটের মধ্যে ভারতে শ্রমিকশ্রেণীর সচেতন রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশের চিহ্নটি দেখতে পান। ১৯২০ সালের উপনিবেশিক থিসিসের ভিত্তিতে জাতীয় আন্দোলন পরিচালনার যে-পরিপ্রেক্ষিত তিনি তুলে ধরেন, তা-ই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পথ নির্দেশ করে। এই থিসিসটি ভারতের কমিউনিস্টদের বুঝতে সাহায্য করেছিল — জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের ভিতরে থেকে একটি বিকল্প কর্মসূচীর সাহায্যে (পূর্ণ স্বাধীনতা ও কৃষকের স্বার্থে ভূমিসংস্কার যে-কর্মসূচীতে অগ্রাধিকার লাভ করেছিল) কিভাবে এই আন্দোলনে বিপ্লবী উপাদান সংযোজন করা যায়। বস্তুত, এই লেনিনবাদী চিন্তার প্রভাবেই ভারতে জাতীয় আন্দোলনের ভিতরে বামপন্থী ধারাটি একটি সুনির্দিষ্ট বিপ্লবী বিকল্প পথের সন্ধান পেয়েছিল। এই বিকল্প

পথটি হলো ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ভিতরে লেনিনবাদের প্রধান অবদান।

কিন্তু লেনিনীয় পদ্ধতির প্রয়োগের অর্থ উপরোক্ত উপনিবেশিক থিসিসের মূল নীতি শুধু গ্রহণ করাই নয়। লেনিনীয় পদ্ধতির প্রয়োগের অর্থঃ এই থিসিসের চৌহদ্দির মধ্যে থেকে ভারতের ঐতিহাসিক বিকাশ ও দেশগত বৈশিষ্ট্যগুলির যথাযথ বিচার করা, তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে ভারতে জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের স্তর থেকে সমাজতন্ত্রের স্তরে উত্তরণের নিজস্ব পথটি স্থির করা। জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের স্তর থেকে সমাজতন্ত্রের স্তরে উত্তরণের লেনিনীয় পদ্ধতিটি ঠিক এইভাবেই চীনে, কিউবা প্রভৃতি দেশে, প্রয়োগ করা হয়েছে। চীন বা কিউবা যান্ত্রিকভাবে লেনিনের উপনিবেশিক থিসিসটি প্রয়োগ করেনি, তারা এটি প্রয়োগ করেছে নিজ নিজ দেশের ঐতিহাসিক বিকাশের বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে। সেইজন্যে চীন তার নিজস্ব পথে (যার নাম জনগণতন্ত্রের পথ) জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের স্তর অতিক্রম করে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের রাস্তাটি বেছে নিয়েছে। কিউবাও তার নিজস্ব পথে (জনগণতন্ত্রের অন্তর্বর্তীকালীন স্তর ছাড়াই) জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের স্তর থেকে সমাজতন্ত্রের স্তরে পৌঁছেচে। ভারতকেও ঠিক এমনভাবেই জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের স্তর থেকে সমাজতন্ত্রের স্তরে উত্তরণের নিজস্ব পথটি বেছে নিতে হবে।

এই প্রশ্নটি খুবই জরুরি এই কারণে যে ভারত নির্যাতিত দেশ পরাধীন দেশ হলেও ইংরেজ আমলে ভারতের সমাজ-বিকাশে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দেখা গিয়েছিল। ইংরেজ শাসনে থাকাকালীন অবস্থাতেই ভারতে ধনতন্ত্রের কিছুটা বিকাশ ঘটেছিল। ভারতের প্রধান বৈশিষ্ট্য, ভারত ধনতান্ত্রিক বিকাশে যথেষ্ট উন্নত উপনিবেশগুলির মধ্যে অন্যতম। এই বৈশিষ্ট্যটি সামনে রেখে বিচার না করলে ভারতে জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের স্তর থেকে সমাজতন্ত্রের স্তরে উত্তরণের নিজস্ব পথটি আবিষ্কার করা সম্ভব নয়। আবার, ভারত ধনতান্ত্রিক বিকাশে যথেষ্ট উন্নত উপনিবেশগুলির অন্যতম—এই কথাটির অতি-সরলীকৃত ব্যাখ্যা থেকে দু-রকমের ভুল করার সম্ভাবনাও থেকে যায়। একটি হলোঃ ভারতের ধনতান্ত্রিক বিকাশের মাত্রাটি বেশি করে দেখার প্রবণতা। অপরটিঃ ধনতান্ত্রিক বিকাশের মাত্রাকে ছোট করে দেখার প্রবণতা। এই দুটিই বিপজ্জনক।

একদল মার্কসবাদী আছেন যাঁরা ভারতের ধনতান্ত্রিক বিকাশের মাত্রাটি বেশি করে দেখেন। তাঁদের মধ্যে রাশিয়ার বিপ্লবের পথের সঙ্গে ভারতের বিপ্লবের পথটিকে একাকার করে ফেলার একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তাঁদের ধারণা ১৯০৫ সালে রাশিয়াতে ভারতের তুলনায় ধনতান্ত্রিক বিকাশের মাত্রাটি বেশি হলেও ভারতের মতোই রাশিয়াও ছিল পশ্চাৎপদ দেশ। কাজেই ১৯০৫ সালে রুশ-বিপ্লবের যে-প্রকৃতি ছিল, কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য থাকলেও ভারতের বিপ্লবের অবস্থা তার সঙ্গে সাধারণভাবে তুলনীয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে 'মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি'র কর্মসূচীতে মুখে স্বীকার না করলেও রুশ-বিপ্লবের (১৯০৫) ছকটিকে অনুসরণ করার একটি প্রচ্ছন্ন চেষ্টা রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে — ভারত যেহেতু ধনতান্ত্রিক বিকাশে যথেষ্ট উন্নত উপনিবেশগুলির অন্যতম সেইহেতু এখানে অ-ধনতান্ত্রিক পথটি প্রযোজ্য নয়। ভারত উপনিবেশিক দেশ হলেও এখানে অ-ধনতান্ত্রিক পথ অচল — এই বক্তব্যটি নিশ্চয়ই 'মৌলিকত্বের' দাবি রাখে এবং নিঃসন্দেহে এই বক্তব্যটি লেনিনের উপনিবেশিক থিসিসের বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন। 'মার্কসবাদী'দের এই 'মৌলিকত্বের' পিছনে রয়েছে ভারতের উপনিবেশিক চরিত্রটি অগ্রাহ্য করে ভারতের বিপ্লবের ওপর রুশ-বিপ্লবের (১৯০৫) ছকটি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা। রাশিয়াতে ১৯০৫ সালে অ-ধনতান্ত্রিক পথ প্রযোজ্য—এই কথা লেনিন বলেননি, সেইজন্যে 'মার্কসবাদী'রাও মনে করছেন ভারতেও অ-ধনতান্ত্রিক পথটি প্রযোজ্য নয়। ১৯০৫ সালে রাশিয়াতে লেনিন অবিলম্বে ধনতন্ত্রের অবসানের দাবি তোলেননি, 'মার্কসবাদী'রা তাই তাঁদের কর্মসূচীতে সেই দাবি উত্থাপন করেননি। রাশিয়াতে (১৯০৫) লেনিন বুর্জোয়াশ্রেণীকে বিপ্লবের শক্তি হিসাবে চিত্রিত করেননি, 'মার্কসবাদী'রাও তাই ভারতে বুর্জোয়াশ্রেণীকে বিপ্লবের শক্তি হিসাবে গ্রহণ করতে নারাজ। লক্ষ্য করুন, ১৯০৫ সালের রুশ-বিপ্লবের স্ট্রাটেজি ও 'মার্কসবাদী'দের কর্মসূচীতে বর্ণিত স্ট্রাটেজির মধ্যে মিল কত 'গভীর'।

মার্কসবাদীরা বিস্মৃত হয়েছেন যে ১৯০৫ সালে রুশ-বিপ্লবের স্তর এবং ভারতের বিপ্লবের স্তরের মধ্যে পার্থক্য পর্বতপ্রমাণ। রাশিয়া ছিল পিছিয়ে-পড়া হলেও একটি ধনতান্ত্রিক দেশ ; আর ভারত ছিল উপনিবেশ। জারতন্ত্রের অবস্থান সত্ত্বেও রাশিয়া যে একটি ধনতান্ত্রিক দেশ—এই সত্যটিকে যাঁরা অগ্রাহ্য করতেন, তাঁদের ভুল ধারণার নিরসন করতে গিয়ে লেনিন লেখেন—

"It is interesting to note how far the main features of this general process in western Europe and in Russia are identical, not withstanding the tremendous peculiarities of the latter in both the economic and non-economic spheres." (Lenin — Development of Capitalism in Russia)।

যাঁরা রাশিয়া ও ভারতের স্তরকে একাকার করে দেখেন, লেনিনের এই উক্তিটি তাঁদের স্মরণ রাখা উচিত। প্রকৃতপক্ষে, ভারত যদি রাশিয়ার মতো ধনতান্ত্রিক দেশ হতো তাহলে ভারতে রাশিয়ার মতোই অ-ধনতান্ত্রিক পথটি অচল বলে বিবেচনা করা চলত। কিন্তু গোড়াতেই গলদ। উপনিবেশিক দেশের বিপ্লব এবং ধনতান্ত্রিক দেশের বিপ্লব—এই দুইয়ের প্রকৃতিভেদ 'মার্কসবাদী'রা বিস্মৃত হয়েছেন। রাশিয়া ধনতান্ত্রিক দেশ হবার ফলে সেখানকার বুর্জোয়া-শ্রেণীর সঙ্গে জারতন্ত্রের বিরোধ ছিল ক্ষীণ। তাই রুশ-বিপ্লবে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কাজগুলি সম্পাদন করার সময়েও বুর্জোয়াশ্রেণী কখনও অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেনি। কিন্তু ভারতে বিদেশী বুর্জোয়াশ্রেণীর আধিপত্য থাকায় দেশীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে তাদের বিরোধ শক্তিশালী রূপ গ্রহণ করে এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে এই বুর্জোয়াশ্রেণী বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছে। বস্তুত, রাশিয়ার মতোই ভারতে অ-ধনতান্ত্রিক পথ অচল, রাশিয়ার মতোই ভারতের বুর্জোয়াশ্রেণী প্রতিক্রিয়াশীল — ১৯০৫ সালের রুশ-বিপ্লবের নকলনবিশী থেকে 'মার্কসবাদী'দের এই ধারণাগুলির উৎপত্তি। এই কারণেই ভ্রান্ত ধারণা-কণ্টকিত 'মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি'র কর্মসূচীটি বাস্তবের আঘাতে ভেঙে খান-খান হয়ে যাচ্ছে।

ভারতে ধনতান্ত্রিক বিকাশের মাত্রাটি বড় করে দেখলে যেমন বিপদ হতে পারে, তেমনি আবার ধনতান্ত্রিক বিকাশের মাত্রাটি বাস্তব অবস্থা থেকে ছোট করে দেখলেও আর এক ধরনের বিচ্যুতি হবার সম্ভাবনা। যাঁরা ধনতান্ত্রিক বিকাশের মাত্রাটি ছোট করে দেখেন তাঁরা ভাবেন ভারত যেহেতু চীনের মতোই একটি নির্যাতিত দেশ, সেইহেতু ঐতিহাসিক চীন-বিপ্লবের সঙ্গে ভারতের বিপ্লবের হুবহু মিল থাকবে। বর্তমানে আমাদের দেশে 'মাও সে তুঙ-চিন্তা'র যাঁরা অনুগামী, 'নকশালপন্থী' বলে যাঁরা সাধারণভাবে অভিহিত, তাঁরা ভাবেন ভারতের বিপ্লব হবে চীনের বিপ্লবের কার্বন কপি মাত্র। "চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান"—এই নকলনবিশীর এক স্থূল অভিব্যক্তি মাত্র! এঁরা

ভুলে যান ভারতে ধনতান্ত্রিক বিকাশের মাত্রা বেশি থাকায় ভারতে একটি শক্তিশালী বুর্জোয়াশ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে এবং তারা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছে। চীনে ধনতন্ত্র অপেক্ষাকৃত দুর্বল থাকায় সেখানে বুর্জোয়াশ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভূমিকা ছিল তুলনায় অনেক বেশি নিস্তেজ। এই পার্থক্যটি মনে না রাখলে ভারতে বিপ্লবের পথ স্থির করা অসম্ভব।

রাশিয়া ও চীন উভয়েই ভারতের নিকট-প্রতিবেশী। তাছাড়া, এই দুটি দেশেই বিংশ শতাব্দীর দুটি ঐতিহাসিক বিপ্লবের আবির্ভাব ঘটেছে। ফলে, এই দুই বিপ্লবের কোনো একটির কার্বন কপি হিসাবে ভারতের বিপ্লবকে দেখার প্রবণতা ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসে বার বার প্রকাশ পেয়েছে।

কিন্তু বাস্তব জীবন বড়ই নিষ্ঠুর। রুশ-বিপ্লবের পদ্ধতিতে বা চীন-বিপ্লবের পদ্ধতিতে ভারতের বিপ্লবকে যাঁরাই সাজাবার চেষ্টা করেছেন তাঁরাই শেষ পর্যন্ত উপহাসের পাত্র হয়েছেন।

আসল কাজ হলো: রুশ-বিপ্লব এবং চীন-বিপ্লবের মহান শিক্ষা সামনে রেখে, ভারতের জাতিগত বিকাশের বৈশিষ্ট্যগুলিকে অনুধাবন করে, ভারতে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের নিজস্ব পথটি আবিষ্কার করা। রুশ-বিপ্লবের প্রচ্ছন্ন নকলনবিশী বা চীন-বিপ্লবের স্থূল নকলনবিশী—এই দুটি পথের কোনোটিতেই যে ভারতের পক্ষে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সম্ভব নয়, এই বিষয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সচেতন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মনে করে ভারতে নিজস্ব পথে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অন্তর্বর্তীকালীন স্তরের মধ্যে দিয়ে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ ঘটবে।

ভারতের বিপ্লব যে রুশ-বিপ্লব বা চীন-বিপ্লবের হুবহু নকল হবে না, এই বিপ্লব যে নিজস্ব পথে ঘটবে এবং এই নিজস্ব পথটি আবিষ্কার করাই যে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সামনে সবচেয়ে বড় কাজ—সমস্যার এই দিকটি সম্পর্কে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সচেতন। এই সমস্যাটির গুরুত্ব অনুধাবন করা এবং এই সমস্যাটির সমাধানের জন্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাওয়াই ভারতে লেনিনবাদীদের সামনে এই মুহূর্তের সব চেয়ে বড় কাজ।

লেনিনের আর এক নাম ভালোবাসা

সুকুমার মিত্র

এই ধূলির ধরণীকে ভালোবাসা, মাটির মানুষকে ভালোবাসা ছাড়া কমিউনিস্ট হওয়া যায় না। এই ভালোবাসাই লেনিনকে টেনে নিয়েছিল কমিউনিজমের পথে। পেট থেকে পড়েই তো কেউ কমিউনিস্ট হয় না, লেনিনও হননি। মানুষকে ভালোবেসেছিলেন বলেই রাষ্ট্র ও সমাজের অত্যাচার-অবিচার তাঁর কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছিল, তাই তিনি শুরু করেছিলেন পথ খুঁজতে। কোন পথে যাত্রা করলে শোষিত নিপীড়িত মানুষ তার সমস্ত শোষণ ও নিপীড়নের অবসান ঘটিয়ে নতুন পৃথিবী নতুন সমাজ গড়ে তুলতে পারবে তারই সন্ধানে বেরিয়েছিলেন লেনিন। শেষপর্যন্ত মার্কসবাদের পথ অনুসরণ করেই তিনি সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। কিন্তু, লেনিনের জন্মশতবার্ষিকীতে এই পরম সত্যটিকে ভুলে গেলে চলবে না যে, মানুষের প্রতি গভীর ভালোবাসা ছাড়া বিপ্লবের দুর্গম ক্ষুরধার পথ লেনিন অনুসরণ করতে পারতেন না। ভালোবাসার এই আগুনই তাঁকে পথ দেখিয়েছিল, ভালোবাসার এই আগুনেই তাঁকে নিখাদ সোনা করে দিয়েছিল, ভালোবাসার এই আগুনই তাঁর ব্যক্তিসত্তা ব্যক্তিজীবনকে নিঃশেষে বিলুপ্ত করে দিয়েছিল।

একদিন লেনিনকে "নর-পিশাচ," "নর-খাদক," "রক্ত-পিপাসু দানব" রূপে চিত্রিত করতে প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীগুলির বাধেনি; "ভয়ঙ্কর এই অমানুষটি" রাশিয়ায় যে-ভয়াবহ বিপর্যয় ঘটিয়েছে—তার রোমহর্ষক বিবরণ একদিন সাম্রাজ্যবাদী ও ধনিকশ্রেণীর মুখপত্রগুলিতে দিনের পর দিন সাড়ম্বরে প্রকাশিত হয়েছে। এই কলকাতায় সাম্রাজ্যবাদী ধনিকশ্রেণীর এক মুখপত্রে লেনিনের মৃত্যুর পর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলা হয়েছিল "End of a notorious career" (একটি কুখ্যাত জীবনের অবসান)!

সমাজতন্ত্রের সাফল্য যখন সর্বজনস্বীকৃত, সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া যখন পৃথিবীর নির্ধারক শক্তিরূপে পরিণত এবং সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র যখন পৃথিবীর

অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তি বলে পরিগণিত—তখন লেনিন সম্পর্কে উল্লিখিত মন্তব্য ও বিশেষণগুলি হয়তো হাসির উদ্রেক করবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে,-প্রতিক্রিয়ার তূণ এখনও শূন্য হয়নি। নানাভাবে নানাকৌশলে লেনিনকে হেয় করার চেষ্টা এখনও চলেছে। আজ তাই মানবপ্রেমিক লেনিনকে নতুন করে চেনা ও চিনিয়ে দেওয়া দরকার।

লেনিন এবং তাঁর ভাই-বোনদের উপর তাঁদের বাপ-মার প্রভাব অনেকখানি কাজ করেছে। তিন ভাই, তিন বোন, লেনিন (আসল নাম ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানোভ) সবার ছোট। সামন্ততন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রের মুকুটমণি জারের শোষণ ও পীড়নে রাশিয়া তখন রুদ্ধশ্বাস। বুদ্ধিজীবী উলিয়ানোভ পরিবার এই শোষণ ও পীড়নকে মেনে নেয়নি। স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ তাঁদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে বিদ্রোহী কবি প্লেপচিয়েভ-এর নিষিদ্ধ গাথার সুরঝঙ্কারের মধ্যে দিয়ে ঃ

> "সহমর্মী, সহকর্মী দাঁড়াই পাশাপাশি,
> ঝড়বাদলে ও সংগ্রামে শতবার,
> লড়ব এবং ঘৃণা করে যাব মৃত্যু অবধি—
> পীড়ন করে যে মাতৃভূমি আমার।"

[সিদ্ধেশ্বর সেন অনূদিত]

লেনিনের বাবা গাইতেন এই গান তাঁর প্রাণের সমস্ত আবেগ দিয়ে আর এই গানই উলিয়ানোভ পরিবারের ছেলে-মেয়েদের মনে আগুনের পরশমণি ছুঁইয়ে দিয়েছিল।

বাবা ও মার দৃষ্টান্ত, বিপ্লবী গণতান্ত্রিক সাহিত্যের প্রভাব এবং জনসাধারণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ লেনিনের তরুণ মনকে গড়ে তুলেছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর বড় ভাই আলেকসান্দর-এর প্রভাব। দুর্জয় সাহস ও সঙ্কল্পের অধিকারী বিপ্লবী দাদার কাছেই লেনিন পেয়েছিলেন তাঁর বিপ্লবী জীবনের প্রথম দীক্ষা, মার্কসবাদী সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়ও ঘটেছিল দাদার কাছ থেকেই।

এই সময় থেকেই ভ্লাদিমির-এর পড়া ও ভাবনার শুরু। তিনি তাঁর চোখও রেখেছিলেন খোলা, যে-চোখে পড়ত নিপীড়িত ও শোষিত মানুষের দরিদ্র ও লাঞ্ছিত জীবন, স্বৈরতন্ত্রের অত্যাচার এবং অশিক্ষা ও

কুসংস্কারের নিদারুণ পরিণতি। চুভাশ, মোরদ্‌ভিনিয়ান, তাতার, উদমূর্ত প্রভৃতি সংখ্যালঘু জাতিগুলির নিরন্তর অবমানিত ও নির্যাতিত জীবন তাঁর মনে অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে জাগিয়েছিল অসীম ঘৃণা।

এই বয়সেই লেনিন এন. ওখোতনিকোভ নামে একজন দরিদ্র চুভাশ শিক্ষককে ১৮ মাস বিনা পয়সায় পড়িয়ে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় পাশ করতে সাহায্য করেন। মানুষের প্রতি লেনিনের ভালোবাসা এইভাবেই প্রথম বাস্তব রূপ পায়।

পড়াশুনা, দেখাশোনা এবং চিন্তাভাবনার মধ্যে দিয়ে লেনিন পথ খুঁজে পেয়েছিলেন। তাই দাদা আলেকসান্দর-এর যখন মৃত্যুদণ্ড হলো, তখন তিনি দাদার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়েও স্থিরচিত্তে বলতে পেরেছিলেন "না, আমরা ওপথে (সন্ত্রাসবাদের পথ — লেখক) যাব না, ওপথ আমাদের জন্য নয়।"

দেশের মানুষকে, অবজ্ঞাত ও নিপীড়িত জনগণকে, ভালোবেসেছিলেন বলেই লেনিন ভয়হীন চিত্তে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে পেরেছিলেন তাঁর নির্ধারিত পথে। এই পথে চলতে চলতে তিনি দেখেছেন অসংখ্য মানুষকে— যারা তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, লড়েছে জীবনপণ লড়াই। তাদের সকলের সঙ্গেই তাঁর জীবন ছিল এক সূত্রে গাঁথা। অসংখ্য কাহিনীর মধ্যে ছড়িয়ে আছে এইসব মানুষের প্রতি তাঁর অপরিসীম ভালোবাসার অমর স্মৃতি।

বিপ্লবের অগ্নিপরীক্ষা, শিকার, খেলা, বৈঠক, অফিসের কাজ···সবকিছুর মধ্যেই লেনিনের ভালোবাসার ফুলগুলি চির-অম্লান হয়ে ফুটে রয়েছে।

১৯০৭ সনের কথা। প্রথম রুশ-বিপ্লব তখন ব্যর্থ হয়ে গেছে, রাশিয়ায় নেমে এসেছে নিদারুণ দমননীতির ভয়ঙ্কর কালো ছায়া। এই সময় সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির মধ্যে চলেছে তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব। লেনিন গেছেন কাপ্রিতে (ইতালি)। ইতালিয়ান ভাষা না জেনেও তিনি কাপ্রির জেলেদের অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছেন। শুধু সুতোয় বড়শী বেঁধে কি করে মাছ ধরতে হয় শিখিয়েছিল কাপ্রির মৎস্যজীবীরা। লেনিনকে তারা বলেছিল: "কোসি: দ্রিন দ্রিন, কাপিসি?" কি বুঝলেন লেনিনই জানেন। মাছ একটা ধরতে পারলেই শিশুর মতো আহ্লাদে ডগমগ হয়ে চেঁচিয়ে উঠতেন "আ! দ্রিন-দ্রিন!" জেলেদের মধ্যে উঠত হাসির হররা। ছেলে-মেয়েরা লেনিনের নাম দিল 'সিনর দ্রিন-দ্রিন'।

লেনিন কাপ্রি ছেড়ে চলে যাওয়ার বহুদিন পরেও তারা রুশ নাগরিকদের দেখলেই জিজ্ঞাসা করত "সিনর ভ্লিন-ভ্লিন কেমন আছেন? জার তাঁকে ধরতে পারবে না ঠিক জানেন?"

১৯১৯। সাম্রাজ্যবাদী দস্যুর দল হানা দিচ্ছে, সারা দেশে বিশৃঙ্খলা, দুর্ভিক্ষ। দেশের মানুষ খেতে পাচ্ছে না, কিন্তু লেনিনকে তারা তো ভুলতে পারে না। তাঁর কমরেডরা, চাষীরা, সৈন্যরা তাঁর জন্যে খাবার পাঠায়। লেনিন এসব খেতে পারেন না, পারা অসম্ভব। কিন্তু প্রত্যাখ্যান করাও তো কঠিন, যারা পাঠিয়েছে তারা ভালোবেসে পাঠিয়েছে। তাদের মনে তো ব্যথা দেওয়া যায় না। বিব্রত লেনিন ভ্রূকুঞ্চিত করে ভাবেন। তারপর ময়দা, চিনি, মাখন ইত্যাদি পাঠিয়ে দেন যারা রুগ্ন, খাদ্যাভাবে শীর্ণ তাদের জন্যে। নিজে খান নিকৃষ্ট রুটি আর চিনিহীন চা।

ভাবাবেগপ্রবণ মানুষ নন লেনিন, উচ্ছ্বাস করতে তিনি জানতেন না। হঠাৎ কখনও কখনও তাঁর আবেগ প্রকাশ পেত। গর্কীতে ছোটদের আদর করতে করতে তিনি বলেছিলেন ঃ

"এরা আমাদের চেয়ে ভালোভাবে বাঁচবে। আমাদের জীবনে আমরা যা সব পেরিয়ে এলাম তার অনেক কিছুই এদের কাছে অজানা থাকবে। এদের জীবন কঠিন হবে না।"

হাড়ভাঙা শীত। লেনিন দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর পড়ার ঘরের জানলার ধারে। সারা দেশ গৃহযুদ্ধে বিধ্বস্ত, কোথাও জ্বালানি নেই, ধোঁয়া উঠছে না একটি বাড়ি থেকেও। টাইফাস মহামারীর আকারে দেখা দিয়েছে।

লেনিন দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। ডান হাতটা হঠাৎ পকেট থেকে বের করে ডেস্কের ধারে বসে পড়ে লিখতে শুরু করলেন ঃ

"দেখবেন শিশুভবনগুলিতে জ্বালানি কাঠ সরবরাহ করা হয়েছে কিনা। না হয়ে থাকলে যাতে অবশ্যই সরবরাহ করা হয় তার ব্যবস্থা করবেন···ধাতুশিল্পের মজুরদের চিনি ও স্যাকারিনের রেশন বাড়িয়ে দিন।"···লিখছেন কামেনেভকে।

সেক্রেটারি দরজাটা ফাঁক করে ডাকলেন "ভ্লাদিমির ইলিচ।"

সাড়া নেই। আবার ডাকলেন। এবার সাড়া মিলল।

"কি চাই?" একটা কাগজ টেনে নিতে নিতে লেনিন প্রশ্ন করলেন।

"কমরেড কোরগুনোভ ১ এসেছেন।"

"বেশ, আসতে বলো।"

কোরগুনোভ ঘরে ঢুকলেন।

"আসুন, আসুন লিওনিদ আলেকসিয়েভিচ। বসুন" ইজিচেয়ারের দিকে আঙুল দেখিয়ে লেনিন বললেন।

কুশলবার্তা বিনিময়ের পর কোরগুনোভ আস্তে আস্তে আসল কথাটা পাড়লেন। ১৯০৮ সনের ৩০এ জুন সাইবেরিয়ার অরণ্যে একটা বিরাট উল্কা পড়েছে। তাঁরা কোথায় সেটা পড়েছে তা খুঁজে বের করতে চান। বিদেশে বিজ্ঞানীরা এ-ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছেন।

"এখন এই উল্কাটি···কিন্তু আপনি তো এ-সম্বন্ধে সবই জানেন।"

"অত নিশ্চিত হবেন না। কোথাও একটা উল্কা পড়েছে আমি জানি, কিন্তু ঐ পর্যন্ত···বলুন এখন···" বললেন লেনিন।

একটু হেসে "এটা কোন সাল তাই ভুলে গেছি।" কোরগুনোভও হাসলেন।

সব শুনে লেনিন তাঁদের অভিযানের জন্য কি কি লাগবে জানতে চাইলেন। তালিকা দেখার পর লেনিন উঠে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন, "হাজার হাজার মাইল গভীর অরণ্য, খরস্রোতা নদী, বুনো জানোয়ার, রাস্তাঘাট নেই। চারদিকে শত শত মাইলের মধ্যে একটি জনপ্রাণীও দেখতে পাবেন না। বুঝতে পারছেন?"

বিজ্ঞানী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

"তাহলে আপনি যাবেনই?" লেনিন বললেন।

"হ্যাঁ, আমি যাব।"

"আর কিছু চান না?"

"না, আর কিছু না।"

"কিছুই না" লিওনিদ আলেকসিয়েভিচ আবার বললেন "কিচ্ছু না।"

লেনিন কাশলেন, টেবিলের নিচে তাকিয়ে কি যেন দেখলেন, একটু হাসলেন।

"আচ্ছা লিওনিদ আলেকসিয়েভিচ" লেনিন খুশি মনে বললেন "একবার জানলাটার দিকে যাবেন?"

১। বিখ্যাত রুশবিজ্ঞানী

বিস্মিত বিজ্ঞানীর বার বার "কেন" প্রশ্নের জবাবে লেনিনের ঐ একটি কথা। অবশেষে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিজ্ঞানী গিয়ে দাঁড়ালেন জানলার ধারে।

লেনিনের দৃষ্টি বিজ্ঞানীর পায়ের জুতোর দিকে।

"এই দেখুন, ঠিক যা ভেবেছি তাই। বন্ধুবর, তাইগায় আপনি যাচ্ছেন কি করে? মস্কো থেকে পাঁচ মাইল যেতে না যেতেই তো জুতোজোড়া খসে পড়বে।"

"কেন যাব না?" অভিমানাহতস্বরে বললেন বিজ্ঞানী। "আমি দড়ি দিয়ে জুতোজোড়া বেঁধে রাখতে পারব। আমি আমার পায়ে খানিকটা কাপড় জড়িয়ে বেঁধে রাখতে পারব।"

"তা পারবেন" চিন্তাকুলভাবে বললেন লেনিন।

"বোধহয় আপনার এই একজোড়া জুতোই সম্বল।"

"আর একজোড়া কোথায় পাব?" জবাব দিলেন বিজ্ঞানী।

"তাহলে এই জুতোজোড়া পরেই আপনি যাবেন। মাপ করবেন, কিন্তু—" লেনিন আস্তে বিজ্ঞানীর কাঁধে হাত দিয়ে তাঁকে চেয়ারে বসিয়ে দিলেন।

"আশা করি আপনি রাগ করেননি।" বিজ্ঞানীর দিকে তাকিয়ে লেনিন বুঝলেন বিজ্ঞানী কিছু মনে করেননি। তখন শুরু হলো পায়চারি। লেনিন বলে চলেছেন:

"আমরা আশ্চর্য কিছু মানুষ পেয়েছি। জিওলকোভস্কির কথা ভেবে দেখুন। কল্পনা করুন একটা রুশ মফঃস্বল শহরকে। সেখানে রাজহাঁস আর শুয়োরের পালের বিনা বাধায় চরে বেড়ানো ঘাসে-ঢাকা রাস্তার ধারে একটা কাঠের বাড়িতে বাস করছেন একজন অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক। রুটি আর হেরিং মাছের রেশন তিনি পান আর ডুবে আছেন আন্তঃগ্রহ উড্ডয়নের সমস্যাগুলির মধ্যে। আর তাও বোধহয় এক ঠাণ্ডাঘরের মধ্যে। আর আপনি বুড়ো মানুষ একই পথে চলেছেন। আপনি সাইবেরিয়ায় তাইগার মধ্যে হাজার ভার্সট হেঁটে যেতে চাচ্ছেন একজোড়া ছেঁড়া বুট পরে।"

বিজ্ঞানী মনে মনে বললেন, "আর আপনি? আপনি এমন একটি দেশে সমাজতন্ত্র গড়ছেন যেখানে সকলে পড়তেও জানে না।"

মুহূর্তের মধ্যে দুটি মানুষ একেবারে কাছাকাছি এসে গেলেন — বিজ্ঞানী হাত ধরলেন বিপ্লবীর। দুজনেই স্বপ্ন দেখছেন, দুজনেই লড়ছেন সেই স্বপ্নকে সার্থক করতে।

অসুস্থ কমরেডদের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি লেনিনের। জুরুপা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, অথচ ছুটি নিচ্ছেন না। চিঠি পেলেন লেনিনের।

"কমরেড জুরুপা! আপনাকে অসুস্থ দেখাচ্ছে। এখুনি আপনাকে দু-মাস বিশ্রাম গ্রহণ করতেই হবে। আপনি যদি সত্যিসত্যি বিশ্রাম গ্রহণের প্রতিশ্রুতি না দেন তাহলে আমি কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে নালিশ জানাব।"

১৯২১ সনের ফেব্রুয়ারি মাস। ইভান বেকুনোভ নামে একজন চাষী এসেছেন লেনিনের সঙ্গে দেখা করতে। আলাপ চলতে চলতে লেনিন জানতে পারলেন যে বেকুনোভ-এর চশমাটি অতি নিকৃষ্ট ধরনের। পয়সা দিয়ে তাঁকে কিনতে হয়েছে চশমাটি, কিন্তু তাতে কাজ দিচ্ছে না। তখুনি চিঠি গেল স্বাস্থ্যমন্ত্রী এ. শেমাস্কোর কাছে। চিঠিতে বলা হলো: "কমরেড ইভান আফানাসিয়েভিচ, বেকুনোভ খুব আশ্চর্য ধরনের মেহনতী চাষী। ইনি নিজের মতো করে কম্যিউনিজম প্রচার করে থাকেন। ইনি এখন আমার অফিসে।

"ইনি চশমা হারিয়ে বাজে এক জোড়ার জন্যে ১৫ হাজার রুবল দিয়েছেন। এঁকে ভালো একজোড়া চশমা দিতে পারেন কি? এঁকে যদি সাহায্য করেন আর সাহায্য করতে পারলেন কি না তা যদি আপনার সেক্রেটারিকে আমাকে জানাতে বলেন তো আমি কৃতার্থ হব।"

যখন জীবনের উপর মৃত্যুর যবনিকা ধীরে ধীরে নেমে এসেছে, তখনও তাঁর এই ভালোবাসা — মানুষের প্রতি ভালোবাসা, জীবনের প্রতি ভালোবাসা — অটুট থেকেছে।

মনে পড়েছে পুরানো সাথীদের। মারটভ—যিনি মেনশেভিকদের সঙ্গে যোগ দিয়ে বিপ্লব-বিরোধী হয়ে ওঠেন, অথচ যিনি সত্যিই একজন ভালো কর্মী ছিলেন—তাঁকে মনে পড়েছে লেনিনের। মারটভও তখন মৃত্যুশয্যায়। লেনিন বলেছেন, "মারটভও মরছে" ("Martov is also dying")। ভুল পথে গেছেন মারটভ, এর জন্যে তাঁর মনে গভীর বেদনা; কিন্তু তিনিও যে মরতে চলেছেন—এ-কথাও লেনিন ভুলতে পারেন না।

মৃত্যুর দু-দিন আগেও সাথী ও জীবনসঙ্গিনী ক্রুপসকাইয়া পড়ে শুনিয়েছেন জ্যাক লনডন-এর 'লাভ অব লাইফ' (জীবনানুরাগ) গল্পটি। মানুষ যেখানে কখনও পা দেয়নি, তেমনি একটি তুষারাচ্ছন্ন অঞ্চলে রুগ্ন ক্ষুধার্ত একটি মানুষ পায়ে

পায়ে হেঁটে চলেছে একটি বড় নদীর ধারে অবস্থিত বন্দরের সন্ধানে। থেকে থেকে পা হড়কে যাচ্ছে, শক্তি ক্রমেই কমে আসছে। পিছনে ধাওয়া করেছে ক্ষুধার্ত নেকড়ে। অবশেষে বাধল লড়াই মানুষ ও নেকড়ে বাঘের মধ্যে, শেষপর্যন্ত জয়ী হলো মানুষ। ক্ষত-বিক্ষত, অর্ধমৃত, পৌছুল তার গন্তব্য স্থলে।

লেনিনের বড় ভালো লেগেছিল গল্পটি। এমনি সব সংগ্রামী মানুষকেই ভালোবেসেছিলেন লেনিন তাঁর সমস্ত হৃদয় দিয়ে। তারাই তো চলেছে যুগ-যুগান্ত ধরে জীবনের জয়গান গেয়ে সমস্ত ঝড়-ঝঞ্ঝা ও বিপর্যয়কে অগ্রাহ্য করে, তারাই তো জয়যুক্ত করেছে বিপ্লবকে, তারাই তো গড়ে তুলছে নতুন পৃথিবী নতুন সভ্যতা। এই নতুন পৃথিবীতে মানুষ মানুষকে ভালোবাসবে, মানুষ মানুষকে শোষণ করবে না।

শিক্ষা সম্পর্কে লেনিন

শ্যামল চক্রবর্তী

সমস্ত সমাজেই শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে ওঠে তার সামগ্রিক সমাজব্যবস্থাকে খাড়া রাখা, চালু রাখা, এক কথায় তার প্রয়োজন মেটানোর তাগিদে। আদিমতম মানুষ বাঁচবার লড়াইয়ে প্রকৃতির নিয়ম বোঝবার যা চেষ্টা করেছিল — তা হয়তো ছিল সমস্ত সমাজের মিলিত কর্মকাণ্ড, প্রকরণ-পদ্ধতি, Rituals। ক্রমে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে পরিণত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল শাস্ত্রে অধিকার ব্রাহ্মণের, শাস্ত্রে অধিকার ক্ষত্রিয়ের, বৈশ্যের শিল্পোৎপাদন ও ব্যবসায়ের সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে কুলধর্মচর্চা অনুমোদিত, কিন্তু শূদ্রের বেদে অধিকার নেই। ভাষান্তরে বলতে গেলে, সব দেশে যাজকরা জ্ঞানচর্চা করবে শাসকদের ছত্রচ্ছায়ায়; আর সাধারণ মানুষ পরিশ্রম করবে, উৎপাদন করবে, সেবা করবে যাজক ও অভিজাত শাসকদের। অর্থাৎ জ্ঞান শাসকদের কাজে লেগেছে এবং ধর্মবিশ্বাস ও বিশ্বদর্শন হিসাবে প্রচলিত সমাজব্যবস্থাটাকে মেনে নিতে শিখিয়েছে। সাধারণ মানুষকে জ্ঞানকেন্দ্র থেকে দূরে রাখা হয়েছে সযতনে।

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা যখন এল, তখন তাকে পুরনো অবস্থাটিকে বেশ খানিকটা বদলিয়ে নিতে হয়েছিল। কারণ তার বর্ধিত উৎপাদন-ক্ষমতাকে কাজে লাগাবার জন্য প্রয়োজন হয়েছিল অনেক বেশি শিক্ষিত মানুষের। সুতরাং ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু হবার সঙ্গে সঙ্গে যেমন পুরনো শ্রেণীবিন্যাস ও শ্রেণীপ্রাধান্য বদলেছে, তেমনি সৃষ্টি হয়েছে প্রসারিত শিক্ষাব্যবস্থা। আগেকার অধিকারভেদ রইল না, সৃষ্টি হলো নতুন অধিকারভেদ। এ-সমাজেও পুরনো বৈশিষ্ট্যদুটি চালু রইল। প্রথমত, দেশের খেটে-খাওয়া মানুষ অর্থাৎ ব্যাপকতম জনসমাজ হয় সম্পূর্ণ নিরক্ষর রইল, নয়তো তুলনায় অত্যন্ত নিম্নস্তরের শিক্ষার ছিটেফোঁটা নিয়ে খুশী থাকতে হলো তাদের। দ্বিতীয়ত, সামাজিক সম্পর্কের প্রকৃত রূপ অর্থাৎ শোষণ ও শাসনের আসল ছবিটির অস্তিত্ব অস্বীকার করা হলো, নয়তো নানাবিধ ধূম্রজালের মারফৎ তাকে গোপন রাখা হলো।

লেনিন কোনোদিনই শিক্ষার 'অরাজনৈতিকতা'র তত্ত্বে বিশ্বাস করেননি। লেনিন বলেছেন," 'অরাজনৈতিক' বা 'রাজনীতি-নিরপেক্ষ' শিক্ষা কথাটাই বুর্জোয়া শঠতার নিদর্শন, জনতার সঙ্গে প্রবঞ্চনা ছাড়া কিছুই নয়······সমস্ত বুর্জোয়া রাষ্ট্রেই রাজনৈতিক যন্ত্রের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক সুদৃঢ়। যদিও বুর্জোয়া সমাজ খোলাখুলি তা স্বীকার করতে পারে না।" ১ অন্যত্র বলেছেন ঃ "জীবন-বিচ্ছিন্ন রাজনীতি-বিচ্ছিন্ন স্কুল মিথ্যা, ছলনা।" ২

রুশ-বিপ্লবের পর শিক্ষাব্যবস্থা পরিবর্তনের সমস্যার সম্মুখীন হলো সোভিয়েত সরকার ও রুশ কমিউনিস্ট পার্টি, হলেন লেনিন। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, বিপ্লব ও গৃহযুদ্ধের ফলে শিক্ষকদের একটা বড় অংশ বলশেভিকী শাসনের সঙ্গে সহযোগিতা করতে নারাজ। অনেকেই আবার শিক্ষকতা কাজের সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েত-বিরোধী প্রচার চালাচ্ছে। স্কুলবাড়ি ভেঙে পড়েছে। সারাবার বা নতুন গড়বার সঙ্গতি নেই। সরঞ্জাম কিছুই নেই বললে হয়। বই, খাতা, কাগজ, কলম, কালি, চক, ডাসটার — সবকিছুরই অভাব। দ্রুত উৎপাদন করে অভাব পূরণ করা যাবে এমন ফ্যাক্টরি পর্যন্ত নেই। এ-অবস্থায় নতুন এক তত্ত্ব এসে হাজির হলো। হাজির করলেন জনৈক শুলগিন। শুলগিন বললেন ঃ "বাচ্চাকে শেখাতে হবে? কেন? সে শিখবে রাস্তা থেকে; শিখবে ওয়ার্কশপ থেকে; শিখবে পার্টির কাছ থেকে। স্কুলের দরকার কি?" পুরনো দিনের কেতাবী শিক্ষার বিরোধী বেশ কিছু বুদ্ধিজীবী শুলগিন-এর কথায় টলেছিলেন।

লেনিন এ-কথা মানেননি। তিনি বললেন ঃ "নিরক্ষর তো দাঁড়িয়ে থাকে রাজনীতির আওতার বাইরে, তাকে প্রথমে অ-আ-ক-খ শিখতেই হবে। এছাড়া রাজনীতি হতে পারে না; ওছাড়া চলে গুজব, গালগল্প, রূপকথা আর কুসংস্কার — রাজনীতি নয়।" ৩

লেনিন বললেন ঃ "রুশদেশের সংস্কৃতিগত নিম্নমানের ফলাফল সম্বন্ধে আমরা পুরোপুরি অবহিত আছি, জানি সোভিয়েত রাষ্ট্রক্ষমতায় এর প্রভাব কি পড়ছে। সোভিয়েত রাষ্ট্রক্ষমতা নীতিগতভাবে হাজির করেছে ভীষণ রকমের উন্নততর শ্রমিকশ্রেণীর গণতন্ত্র, যা সারা পৃথিবীতে গণতন্ত্রের নিরিখ হিসেবে দাঁড়াতে পারে। অথচ এই সংস্কৃতির অভাব সোভিয়েত রাষ্ট্রক্ষমতার তাৎপর্য ক্ষুণ্ণ করছে এবং আমলাতন্ত্রকে আবার জিইয়ে তুলছে। সোভিয়েত রাষ্ট্রক্ষমতা সমস্ত শ্রমজীবী মানুষের সহজে অধিগম্য — কথা ঠিক, কিন্তু আমরা সবাই জানি

যে কার্যত তা এখনও তার থেকে বহু দূরে পড়ে আছে। এমন নয় যে আইনে ঠেকাচ্ছে, বুর্জোয়া শাসনে যেমন ছিল। বরং আমাদের আইনে এ-বিষয়ে সাহায্যই করে। কিন্তু এ-বিষয়ে আইন তো যথেষ্ট নয়। বিশাল পরিমাণ কাজ বাকি পড়ে রয়েছে — শিক্ষার, সংগঠনের, সংস্কৃতির কাজ…।" ৪

অর্থাৎ রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে এসেছে ঠিকই। কিন্তু রাষ্ট্র চালানো মানে তো শুধু হুকুমজারি করা নয়, বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পক্ষে। উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপাদন সম্পর্ক নতুন ভিত্তিতে চালু করতে হবে। যে-মানুষ শুধু ভোগ্যপণ্য ও আনন্দের সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিল তাই নয়, বঞ্চিত ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের সর্বপ্রকার সুযোগ থেকে — তাকে অধিগত করতে হবে আধুনিক বিজ্ঞান আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা, বার করতে হবে সামাজিক সম্পর্ক নির্ণয় করার কৌশল। আর এ-জ্ঞান, এ-শক্তি, এ-কৌশল তো আয়ত্ত করতে হবে সমস্ত মানুষকে, বিশেষ করে বঞ্চিত মানুষকে, শহরের আর গাঁয়ের সর্বহারাকে। নইলে রাষ্ট্র আর সমাজ আবার বিশেষজ্ঞদের ব্যুরোক্রেসির হাতের পুতুলে পরিণত হবে।

কিন্তু কি শিখবে? ফিউডালিস্ট আর বুর্জোয়ারা এতকাল যে-জ্ঞানবিজ্ঞান শিখিয়ে এসেছে, তা তো অসত্য বিকৃত শোষণব্যবস্থা পরিচালনার তত্ত্ব মাত্র। সুতরাং তা তো বর্জনীয় হওয়াই উচিত।

লেনিন বললেন: "যে-জ্ঞানস্রোতের পরিণতি হিসেবে কমিউনিজম এসেছে, তাকে না জেনে শুধুই কমিউনিস্ট স্লোগান কমিউনিস্ট বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলি জেনে রাখা যথেষ্ট মনে করলে তা হবে নিতান্ত ভুল।

"সমস্ত মানবিক জ্ঞানের ভিতর থেকে সাম্যবাদ কিভাবে উঠেছে মার্কসবাদ তারই নিদর্শন।

"তোমরা পড়েছ শুনেছ যে কমিউনিস্ট তত্ত্ব, সাম্যবাদের বিজ্ঞান, প্রধানত মার্কসের সৃষ্টি; সেই মার্কসবাদের তত্ত্ব ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন সোশালিস্টের কৃতি মাত্র আর নেই, তা তিনি যতবড়ো প্রতিভাধরই হোন না কেন; তা আজ দুনিয়া জুড়ে কোটি কোটি সর্বহারার তত্ত্বে পরিণত হয়েছে। যে-তত্ত্ব তারা ব্যবহার করছে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে।

"আর যদি তোমরা জানতে চাও মার্কসের তত্ত্ব সবচেয়ে বিপ্লবী শ্রেণীর কোটি কোটি মানুষের হৃদয় জয় করে নিল কেমন করে, তাহলে একটি জবাবই পাবে: এর কারণ হলো ধনতন্ত্রের শাসনে মানুষ যে-জ্ঞান লাভ

করেছে — তার দৃঢ় ভিত্তির ওপরেই মার্কস দাঁড়িয়েছিলেন। মানবসমাজের বিকাশের নিয়ম অনুধাবন করে মার্কস বুঝেছিলেন যে, ধনতন্ত্রের বিকাশ অনিবার্যভাবে এগিয়ে চলেছে সাম্যবাদের দিকে। ধনতন্ত্র সম্বন্ধে কঠিনতম শৃঙ্খলায় অধ্যয়ন, গভীরতম অনুশীলন ও বিস্তৃততম পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের ভিত্তিতে তিনি এর মূল বস্তু প্রমাণ করেছিলেন। আর এ-কাজ সম্ভব হয়েছিল এই জন্যেই যে পুরোযায়ী বিজ্ঞান যা-কিছু শিখিয়েছে তা সবই তিনি আত্মীকরণ করতে পেরেছিলেন।

"মানবসমাজ এর আগে যা কিছু করেছে তার একটি বিষয়ও উপেক্ষা না করে সবকিছুকেই সমালোচনা দিয়ে তিনি নতুন করে গড়েছিলেন। মানুষের চিন্তা যা-কিছু সৃষ্টি করেছে — তার সবকিছুকেই তিনি নতুন রূপ দিয়েছেন, সমালোচনা করেছেন, শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের নিরিখে বিচার করেছেন, আর সেইসব সিদ্ধান্ত টানতে পেরেছেন যা বুর্জোয়া সীমায় আবদ্ধ বুর্জোয়া কুসংস্কারের পাকে জড়ানো লোকেরা টানতে পারেনি।

"এ-সব কথা মনে রাখতে হবে যখন, ধরো, আমরা সর্বহারার সংস্কৃতির কথা উল্লেখ করি। মনুষ্যসমাজের সামগ্রিক বিকাশের পথে গড়ে ওঠা সমগ্র সংস্কৃতির সঠিক জ্ঞান এবং সেই সংস্কৃতির নবরূপায়ণেই সর্বহারার সংস্কৃতি গড়ে উঠবে — এ-কথা না বুঝলে এ-সমস্যার সমাধান আমরা করতে পারব না।

"হঠাৎ কোথা থেকে এল কেউ জানে না — সর্বহারার সংস্কৃতি এমন নয়, স্বঘোষিত সর্বহারার সংস্কৃতি-বিশেষজ্ঞদের তৈরি মালও এ-নয়। ভাঁওতাবাজি কথা সব! ধনতান্ত্রিক সমাজ, জমিদারতান্ত্রিক সমাজ, আমলাতান্ত্রিক সমাজের শাসনের ভেতর দিয়ে মানুষ যে-জ্ঞানভাণ্ডার গড়ে তুলেছে — তারই স্বাভাবিক বিকাশ হলো সর্বহারার সংস্কৃতি।" ৫

আর সেইজন্যেই যুবসমাজকে সাধারণভাবে এবং যুব-কমিউনিস্ট লীগ ও অন্যান্য সংগঠনকে বিশেষ করে ডাক দিয়ে লেনিন বলেছিলেন যে, তাদের করণীয় কর্তব্যের নির্যাস একটি কথায় প্রকাশ করা যায়। তা হচ্ছেঃ "শেখো।" ৬

আর সেইজন্যই তাঁর শেষ প্রবন্ধে লেনিন বলে গিয়েছেনঃ "আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্র পুনর্গঠন করবার জন্যে যেমন করে পারি আমাদের শিখতে হবে, শিখতে হবে, আবারও শিখতে হবে [জোরালো ইংরাজি ভাষায় যা হলোঃ "first, to learn, second, to learn, and third, to learn"], তারপরে যা শিখেছি

তা কাজে লাগিয়ে পরখ করে দেখতে হবে যাতে তা না-বিলি-করা-চিঠির মতো শৌখিন বুলির মতো অব্যবহৃত থেকে না যায় (অস্বীকার করে লাভ নেই যে হামেশাই তা ঘটে থাকে), যাতে যা শিখেছি তা আমাদের সত্তার অঙ্গীভূত হয়, যাতে তা কার্যকরীভাবে পুরোপুরি আমাদের সমাজজীবনের অপরিহার্য উপাদানে পরিণত হয়।" [৭]

এ-পর্যন্ত লেনিনের চিন্তার অনুসরণ করে তিনটি সূত্র পাচ্ছি। প্রথমত, পুরোযায়ী সমস্ত জ্ঞান ও বিজ্ঞান শোষণমূলক সমাজের শাসকশ্রেণীর স্বার্থসৃষ্ট — এ-কথা বলে তাকে উপেক্ষা করা চলবে না; বিপ্লবীশ্রেণীকে সম্পূর্ণরূপে তা অধিগত করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, এই জ্ঞানকে নতুন রূপ দিতে হবে সমাজতন্ত্রের অগ্রগতির দিকে লক্ষ্য রেখে। তাঁর ভাষায়ঃ "পশ্চিম ইয়োরোপের বুর্জোয়ারা যা চায় সেই মতো দাবি রাখলে আমাদের চলবে না, যে-দেশ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চলেছে — তার উপযুক্ত চাহিদা হাজির করতে হবে।" [৮]

তৃতীয়ত, এই নবরূপায়ণের পদ্ধতি হলো মার্কসবাদী সমালোচনা, বাস্তবে প্রয়োগের বিচার, শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী অভিজ্ঞতা।

কি শিখব তা তো জানা গেল; এবার পরের প্রশ্ন হলো, কি করে শিখব।

এর জবাবে লেনিন বলেছেন — পুরনোর কাছ থেকে যে-জড় উপকরণ ও মানুষী উপাদান পাওয়া গেছে, তাকে কাজে লাগিয়েই তো সমাজতন্ত্র গড়ে তুলতে হবে। তিনি বললেনঃ "আমরা স্বপ্নাশ্রয়ী নই যে, মনে করব সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া গড়ে তুলতে হবে নতুন ধরনের মানুষ দিয়ে। পুরনো ধনতান্ত্রিক দুনিয়া থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে যে-উপাদান মিলেছে, তাকেই ব্যবহার করতে হবে। পুরনো ধরনের লোককে আমরা নতুন পরিবেশে স্থাপিত করছি। যথোপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ তাদের ওপর রাখছি, সর্বহারার সতর্ক প্রহরায় আমাদের প্রয়োজনীয় কাজ তাদের দিয়ে করিয়ে নিচ্ছি।" [৯]

কিন্তু এই নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কেও লেনিনের সাবধানবাণী ছিলঃ "আমি আবার বলছি, কেবল শক্তির প্রয়োগ আমাদের কোথাও নিয়ে পৌছবে না। শক্তিপ্রয়োগ ছাড়াও, সফল শক্তিপ্রয়োগের পরে, আমাদের প্রয়োজন সংগঠন শৃঙ্খলা এবং বিজয়ী সর্বহারার নৈতিক শক্তি···নতুন গণপরিবেশ সৃষ্টি — যা বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞদের নিঃসন্দেহে বুঝিয়ে দেবে যে তাদের কোনো বিকল্প

পথ নেই, পুরনো সমাজে ফিরে যাবার রাস্তা নেই। একমাত্র কমিউনিস্টদের সঙ্গে তাদের পাশে দাঁড়িয়েই কাজ করে যাওয়া সম্ভব…।" ১০

বস্তুত বুদ্ধিজীবীদের সম্বন্ধে লেনিন পথনির্দেশ রেখে গেছেন: "শ্রমিক-শ্রেণীর বিজয় আসবে না বুদ্ধিজীবীদের সহায়তার ওপর নির্ভর করে, বরং তা আসবে (অধিকাংশ ক্ষেত্রে) তাদের বিরোধিতা সত্ত্বেও। হঠাতে হবে তাদের যারা অসংশোধনীয় রূপে বুর্জোয়া; যারা সংশয়দোলায় দোলায়মানচিত্ত। তাদের সংশোধিত করতে হবে, পুনর্শিক্ষিত করতে হবে; ক্রমে ব্যাপকতর অংশগুলিকে নিজ দলে জয় করে আনতে হবে।" ১১

লেনিন অন্যত্র বলেছেন: "আমাদের স্কুলশিক্ষকের মান এমন উচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে যা সে বুর্জোয়া সমাজে কখনও অর্জন করেনি বা করতে পারে না। এ স্বতঃসিদ্ধ সত্য। এর প্রমাণ লাগে না। আমাদের এ-অবস্থা সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে অবিচলিতভাবে, সুশৃঙ্খলরূপে; সনির্বন্ধ কাজ চালাতে হবে—উন্নততর সাংস্কৃতিক মানে শিক্ষককে উন্নীত করতে, তার মহৎ বৃত্তির উপযুক্ত শিক্ষায় তাকে শিক্ষিত করতে এবং মূলত, মুখ্যত, প্রধানত, তার বাস্তব অবস্থার উন্নতি সাধন করতে।

"স্কুলশিক্ষকদের সংগঠিত করবার প্রচেষ্টাকে আমাদের সুশৃঙ্খলভাবে বাড়িয়ে নিয়ে যেতে হবে যাতে সমস্ত ধনতান্ত্রিক দেশে বুর্জোয়া ব্যবস্থার রক্ষাকবচের যে-ভূমিকা তারা বিনা ব্যতিক্রমে পালন করে চলেছে, তাকে বদলে সোভিয়েত ব্যবস্থার দুর্গবিশেষে তাদের পরিণত করতে পারি…।" ১২

একথা বলা ভুল হবে না যে লেনিনের নির্দেশ হচ্ছে বুর্জোয়াদের দ্বারা শিক্ষিত শিক্ষকদের দিয়েই শিক্ষাদানের কাজ শুরু করতে হবে; তাদের ওপর সুবিন্যস্ত নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে হবে; তাদের নতুন করে শিক্ষিত করে নিতে হবে, সমাজতন্ত্রই যে একমাত্র ভবিষ্যৎ সে-সম্বন্ধে তাদের বিশ্বাস সৃষ্টি করতে হবে; তাদের অবস্থার উন্নতি করতে হবে; তাদের সমাজতন্ত্রের সৈনিকে পরিণত করতে হবে। "করতে হবে" বলার অর্থ হলো, করা যায়। অর্থাৎ, এর বাস্তব পরিস্থিতি রয়েছে।

সাক্ষরীকরণ সম্পর্কে লেনিনের উদ্বেগের অন্ত ছিল না। ১৯২৩ সালে ঐ প্রসঙ্গেই তিনি লিখছেন: "সর্বহারার সংস্কৃতি এবং তার সঙ্গে বুর্জোয়া সংস্কৃতির সম্পর্ক নিয়ে যখন আমরা ঢেঁকুর তুলছি, ঘটনা ও তথ্য তখন প্রমাণ করছে যে বুর্জোয়া সংস্কৃতির দিক থেকেও আমাদের অবস্থা খুবই খারাপ। যেমন আশা

করা গিয়েছিল, ঠিক তেমনই দেখা যাচ্ছে যে সাধারণ অক্ষর-পরিচয়ের দিক থেকে আমরা এখনও খুবই পিছিয়ে রয়েছি, এমন কি জারের সময়ের তুলনায় (১৮৯৭) আমাদের অগ্রগতির হার নিতান্তই মন্থর। সর্বহারার সংস্কৃতির উত্তুঙ্গ স্বর্গে যাঁরা ভেসে বেড়াচ্ছেন তাঁদের কাছে এ-যেন কঠিন সাবধানবাণী ও নিন্দাস্বরূপ উপস্থিত হয়। এর থেকে বোঝা যায় পশ্চিম ইয়োরোপের সাধারণ একটা সভ্য রাষ্ট্রের মানে পৌঁছতে গেলেও আমাদের কতখানি গোড়ার কাজ করতে হবে। এ আরও দেখাচ্ছে যে সর্বহারা যতটুকু লাভ করেছে তার ভিত্তিতে প্রকৃত সাংস্কৃতিক মান অর্জন করতে গেলে আমাদের কি বিশাল কর্মকাণ্ড সম্পাদন করতে হবে।" [১৩]

ঐ প্রবন্ধেই অন্যত্র তিনি বলেছেন: "রাষ্ট্রের প্রথম চিন্তা হলো জনসাধারণকে পড়তে শেখানো, পড়ুয়া নাগরিকের সৃষ্টি করা…।" [১৪]

ক্লারা জেটকিন তাঁর 'লেনিনের স্মৃতি'তে লেনিনের কথা উদ্ধৃত করছেন: "ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ের সময় পর্যন্ত নিরক্ষরতা সহ্য করা গেছে, তখন প্রয়োজন ছিল পুরনো রাষ্ট্রযন্ত্রকে ভাঙা। কিন্তু একি শুধু ভাঙার জন্যেই ভাঙা? আমরা তো ধ্বংস করছি মহত্তর সৃষ্টির জন্যে। নবনির্মাণের কাজের সঙ্গে নিরক্ষরতা অচল, তার অসঙ্গতি চূড়ান্ত। তাছাড়া, মার্কসের নির্দেশানুযায়ী শ্রমিকের তো সৃষ্টিরই কাজ এবং কৃষকেরও, যদি মুক্তির অভিলাষ তাদের থাকে।" [১৫]

উৎপাদনশীল শ্রমে অংশগ্রহণ যে শিক্ষাব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ সে-কথা লেনিন ১৮৯৭ সালে তাঁর 'Gems of Narodniks' Hare-Brained Schemes' নামক প্রবন্ধে লিখে গেছেন। ক্রুপসকায়ার লেখায় এর উল্লেখ পাই। [১৬] আর এই নীতির থেকেই সোভিয়েত ইউনিয়নে 'পলিটেকনিকাইজেশন'-এর কার্যসূচী গৃহীত হয়েছে।

অবশ্য এ-বিষয়ে লেনিন অনুসরণ করেছেন মার্কস ও এঙ্গেলসকে। মার্কস তাঁর 'ক্যাপিটাল'-এর প্রথম খণ্ডে স্পষ্ট বলেছেন: "রবার্ট আওয়েন খুঁটিয়ে দেখিয়েছেন যে ফ্যাক্টরি-ব্যবস্থাতেই ভবিষ্যতের শিক্ষাব্যবস্থার বীজ নিহিত রয়েছে। এ-শিক্ষাব্যবস্থায়, একটা বিশেষ বয়সের সমস্ত শিশুর ক্ষেত্রেই, মেশানো হবে উৎপাদনশীল শ্রম, শিক্ষণ ও ব্যায়াম। উৎপাদনব্যবস্থায় দক্ষতা বাড়ানোই এর উদ্দেশ্য নয়, এই হলো একমাত্র পদ্ধতি যাতে করে মানুষের সর্বাঙ্গীন বিকাশ সম্ভব হয়।" [১৭] এ-শিক্ষাকে সাধারণ প্রযুক্তিবিদ্যাশিক্ষা বলে

ভুল করার কারণ নেই। মার্কস নিজেই বলে গেছেন যে, এ-ব্যবস্থা একদিকে উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে সাধারণ বৈজ্ঞানিক নিয়মগুলির সঙ্গে ছাত্রদের পরিচিত করবে এবং তারই সঙ্গে উৎপাদন ব্যবস্থার সবরকম শাখায় যেসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার হয় ছাত্রদের তা ব্যবহার করতে শেখাবে। সমাজতন্ত্র গঠনে এ-পদ্ধতির গুরুত্ব সম্বন্ধে এঙ্গেলসও তাঁর 'Anti Duhring' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন।

লেনিন তাই পার্টি কার্যসূচী সংশোধন বিষয়ে ১৯১৭ সালে প্রস্তাব করলেন যে, একদিকে শিক্ষাব্যবস্থায় উৎপাদনশীল শ্রমের স্থান নির্ধারণ করা হোক, অন্যদিকে ১৬ বছরের কম ছেলেমেয়েদের চাকরি দেয়া নিষিদ্ধ এবং '১৬-১৮ বছরের ছেলেমেয়েদের কাজের সময় চার ঘণ্টায় সীমাবদ্ধ করা হোক।[১৮] আজ পর্যন্ত সোভিয়েত শিক্ষাব্যবস্থায় 'পলিটেকনিক্যাল' শিক্ষা স্বীয় গৌরবোজ্জ্বল আসনে অধিষ্ঠিত রয়েছে।

লেনিন শিক্ষাবিষয়ক স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করেননি, শিক্ষাব্যবস্থার সমস্ত স্তরে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সম্পর্কে সুচিন্তিত সুগ্রথিত মতামত লিপিবদ্ধ করে যাননি। বিশেষত তাঁর চিন্তা নিবদ্ধ ছিল প্রধানত বিপ্লবোত্তর রুশদেশে সমাজতন্ত্র গঠনের কাজে শিক্ষার ভূমিকার উপর। আমাদের দেশে শ্রমিকশ্রেণীর হাতে ক্ষমতা এখনও আসেনি। সমাজতন্ত্র এখনও অল্প-বিস্তর দূরে। এমনকি শিক্ষার ব্যাপারে আধুনিক অগ্রসর ধনতান্ত্রিক দেশগুলির তুলনাতেও আমরা পেছিয়ে আছি অনেক। তাই শিক্ষা সম্বন্ধে লেনিনের চিন্তা স্মরণ করতে গিয়ে এ-প্রশ্নের জবাব দিতে হবে যে এর থেকে আজকের দিনে আমাদের দেশে কিছু পেলাম কি!

সেই জবাব গুছিয়ে পেশ করতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় যে লেনিন যদিও সমাজতন্ত্র গড়বার পটভূমিকাতেই তাঁর বক্তব্য রেখেছিলেন এবং এ-দেশে সমাজতন্ত্র আসেনি, তবু সমাজতন্ত্র আনবার পথে ক্ষমতায় যাবার লড়াই তো শুরু হয়ে গেছে। আসল কথা তো লেনিন যে-কথাটি বলেছেন তার হুবহু উদ্ধৃতি দিয়ে বর্তমানের কার্যসূচী প্রণয়ন নয়! প্রয়োজন হলো, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাপদ্ধতিকে ব্যবহার করে আমাদের সমস্যার সমাধান বার করা।

তাই কোনো কোনো বিপ্লবীর মধ্যে বুর্জোয়া শাসনাধীনে পরিচালিত শিক্ষা পরিহার করা ও এই শিক্ষাব্যবস্থাকে উপেক্ষা করার যে-প্রবণতা দেখতে পাই সেটা লেনিনের চিন্তানুযায়ী নয়। কারণ লেনিনের এ-কথা শুধু একটি বিশেষ যুগেই সত্য নয় যে সৃষ্টিশীল রূপে মার্কসবাদকে ব্যবহার করতে গেলে প্রাক-

সমাজতান্ত্রিক ধনিকশ্রেণীর সৃষ্ট জ্ঞান-বিজ্ঞানকেও আয়ত্ত করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, সেই জ্ঞানকে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থে বিপ্লবের প্রয়োজনে তীব্রতম সমালোচনার আগুনে পুড়িয়ে নবরূপায়ণ বা refashioning-এর দায়িত্ব রয়েছে। এটা করতে না পারলে লেনিনবাদী সৈনিক হওয়া সম্ভব হবে না, বুর্জোয়ার হুকুমবরদার হয়েই থাকতে হবে।

তৃতীয়ত বুর্জোয়া শাসনের কায়দা হলো জ্ঞান-বিজ্ঞানকে শ্রমিক-কৃষকের আওতা থেকে বাইরে রাখাই নয়, সাধারণের জীবনের সংস্পর্শ থেকে সযত্নে দূরে সরিয়ে রাখা। এই পদ্ধতিতে উচ্চপর্যায়ে জ্ঞানচর্চা হলো বিমূর্ত সত্যের সাধনা। বিজ্ঞানের সঙ্গে উৎপাদন ব্যবস্থার সংযোগ, সত্য ও সুন্দরের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক এ-ব্যবস্থা অস্বীকার করে। সুতরাং জ্ঞানযোগের ক্ষেত্রে সামাজিক দায়িত্বের স্বীকৃতি আদায়—এ-হলো আজকের দিনের লড়াই। শিক্ষার্থী ও শিক্ষক উভয়কেই কারখানার মজুর ও মাঠের কৃষকের জীবনের সঙ্গে জীবন যোগ করতে হবে; তাদের কাজে, কিছুটা হলেও, হাত লাগাতে হবে। সমাজতান্ত্রিক সমাজে 'পলিটেকনিকাইজেশন' যদি অপরিহার্য হয়, তবে আমাদের দেশে Work Experience সত্য নিশ্চয়ই। বুর্জোয়া শাসকশ্রেণী এ-ব্যবস্থা খুশি মনে চালু করবে না। তাই বলে মার্কসপন্থী-লেনিনপন্থীরা কি এ-ব্যবস্থা শুরু করার লড়াইটাও চালাবে না? এটা খুবই বিস্ময়ের ব্যাপার যে পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রণ্টের শিক্ষানীতিতে Work Experience-এর উল্লেখমাত্রও ছিল না এবং এ-যুক্তফ্রণ্টে লেনিনবাদী দলগুলিরই সংখ্যাধিক্য ছিল।

চতুর্থত, শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের মধ্যে, সাধারণভাবে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে, সমাজতন্ত্রের সমর্থনে তাদের একটা অংশকে জয় করে নেবার লড়াই চালানো নিশ্চয়ই সম্ভব। সমাজতন্ত্রের পরে এটা হবেই, লেনিন বলেছেন। লেনিন তাঁর বক্তৃতায় আরও বলেছেন যে জার্মান স্পার্টাকিস্টরা এসে জানাচ্ছেন — তীব্র শ্রমিক আন্দোলনের প্রভাবে এঞ্জিনিয়াররা ম্যানেজাররা এসে বলছে: "আমরা আছি তোমাদের সঙ্গে।"[১৯] বিপ্লবের পূর্বেই জার্মানিতে এটা সম্ভব হয়েছিল। তার থেকে আরও পঞ্চাশ বছর পরে, যখন বিশ্বময় সমাজতন্ত্রের বিজয় আজ অনিবার্যরূপে প্রতীয়মান, তখন বুদ্ধিজীবীদের তুলনায় বৃহত্তর অংশকে জয় করে নেওয়া অনেক বেশি সহজসাধ্য।

পঞ্চমত, লেনিনের বক্তব্যের মূল কথা ছিল—রাজনীতিবিবর্জিত শিক্ষা

ভণ্ডামিমাত্র। সুতরাং লেনিনের মন্ত্রে দীক্ষিত শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই শ্রমিক-কৃষকের মুক্তির সংগ্রামের আবর্তের বাইরে থাকতে পারে না। তাদের নিজস্ব বাঁচবার লড়াইয়েও নিস্পৃহ থাকতে পারে না।

ষষ্ঠত, ক্লারা জেটকিন লেনিনকে বলেছিলেন যে, বিপ্লবের পক্ষে বরং নিরক্ষর লোক অনেক ভালো, কারণ লেখাপড়া শিখে অন্তত বুর্জোয়া কুসংস্কারে তারা মাথাভর্তি করেনি। লেনিন নাকি তার সীমাবদ্ধ সত্যতা স্বীকার করে নিয়েছিলেন।[২০] আসলে জেটকিন-এর কথায় যে-সত্যটা চাপা রইল তা হলো ফাঁকা মাথা কারুরই থাকে না। শিক্ষিতের কুসংস্কারে যদি তা ভর্তি না থাকে, তবে ভর্তি থাকে অশিক্ষিতের কুসংস্কারে। জীবন সম্পর্কে ধ্যান-ধারণা-মূল্যবোধ সে সংগ্রহ করে বাপ-দাদার কাছ থেকে, বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে, যাজক-শোষকের কাছ থেকে, প্রাত্যহিক দিনযাপনের মধ্য দিয়ে, জীবনসংগ্রামের প্রক্রিয়ার মারফৎ। লেনিন স্বয়ং অন্যত্র ঘোষণা করেছেন, নিরক্ষরের মাথায় আছে "গুজব, গালগল্প, রূপকথা আর কুসংস্কার।" আসলে সেই বঞ্চিত নিরক্ষরকে বিপ্লবের পক্ষে টানার সহজসাধ্যতার কারণ তার নিরক্ষরতা নয়; শ্রেণীর মানুষ বলে শ্রেণীসংগ্রামের অভিজ্ঞতা তাকে সহজে বিপ্লবের দলে সাথী করে নেয়। উচ্চশিক্ষিত বুদ্ধিজীবীর শ্রেণীস্বার্থ তাকে অধিকাংশ সময়েই টানে বিপরীত দিকে। একটা প্রশ্ন মনে জাগে: এটা কি সত্য যে আমাদের দেশে এ-বিষয়ে লেনিনের চেয়ে ক্লারা জেটকিন-এর প্রভাব বিপ্লবীদের ওপর বেশি? কারণ, নিরক্ষর মজুর-চাষীকে সাক্ষর করে তোলার ব্যাপারে বিপ্লবীরা খুব কাঁধ লাগাচ্ছেন বলে তো টের পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ এ-বিষয়ে লেনিনের ছিল গভীর উদ্বেগ, আর সে-আবেগ ও দুশ্চিন্তা তো নিতান্ত যুগাশ্রয়ী নয়।

নির্দেশিকা

১. Speech delivered at an All-Russia Conference of Political Education Workers of Gubernia and Uyezd Education Departments. Lenin: On Culture & Cultural Revolution. Progress Publishers, Moscow, 1966. Pp. 157-158.

২. Lenin: quoted by Beatrice King in Changing Man. Victor Gollanez Ltd., 1937. P. 25.

৩. Lenin : The New Economic Policy & The Tasks of The Political Education Department : On Scientific Communism. Progress Publishers, Moscow, 1967. P. 366.

৪. Lenin : Report on the Party Programme, Delivered at the Eighth Congress of the R. C. P. (B.), March 19, 1919 : On Culture & Cultural Revolution. P. 76.

৫. Lenin : The Tasks of the Youth Leagues. October 2, 1920. Selected Works, Vol. II, F. L. P. H., 1947. Pp. 663-664.

৬. Ibid. P. 661.

৭. Lenin : Better Fewer, But Better. March 2, 1923. Selected Works, Vol. II, 1947. P. 845.

৮. Ibid. P. 845.

৯. Lenin : Report to Petrograd Soviet, March 12, 1919 : On Culture & Cultural Revolution. P. 63.

১০. Lenin : The Achievements & Difficulties of Soviet Government : On Culture & Cultural Revolution. P. 70.

১১. Lenin : A Great Beginning. June 28, 1919. On Culture & Cultural Revolution. P. 106.

১২. Lenin : Pages from a Diary. January 2, 1923. Selected Works, Vol. II, P. 828.

১৩. Ibid. P. 826.

১৪. Ibid. P. 827.

১৫. Clara Zetkin : My Recollections of Lenin : On Culture & Cultural Revolution. Pp. 239-240.

১৬. N. K. Krupskaya : On Education. F. L. P. H., Moscow, 1957. Pp. 164-165.

১৭. K. Marx : Capital, Vol. I, F. L. P. H., Moscow, 1954. Pp. 483-484.

১৮. N. K. Krupskaya : On Education. P. 165.

১৯. Lenin : Report on Party Programme. March 19, 1919. On Culture & Cultural Revolution. Pp. 76-77.

২০. Clara Zetkin : My Recollections of Lenin : On Culture & Cultural Revolution. P. 239.

বলশেভিজমের সূচনা ও বিপ্লবী রাজনীতির সামাজিকতা

অশোক সেন

ইওরোপের ইতিহাসে আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে এক বিরাট পরিবর্তনের কাল শুরু হয়েছিল। এই সময়ে ইংল্যাণ্ডে শিল্পবিপ্লব ও তৎপরবর্তী আর্থিক উন্নতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিছু পরে হলেও ফরাসীদেশে ক্রমে ক্রমে নানা বিপ্লব-প্রতিবিপ্লবের মধ্যে বুর্জোয়া বিকাশের সম্ভাবনা পরিপূর্ণ হয়ে আসে। সেই বিবর্তনের পটভূমিতে রাষ্ট্রবিপ্লব এবং সমাজচিন্তা ও রাজনীতির যুগান্তকারী ধ্যানধারণা সারা ইওরোপে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। সামন্ততন্ত্রের অবলোপ, স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের অবসান এবং বুর্জোয়া ব্যবস্থায় শিল্পবিপ্লবের আরম্ভ ও দ্রুতগতি তখন ইওরোপের নানাদেশে দেখা দিয়েছিল। আবার উনিশ শতকের শেষার্ধে জার্মানির জাতীয় সংহতি গড়ে উঠল এবং সে-দেশে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা না ঘটলেও রাষ্ট্রীয় স্বৈরাচারের কাঠামোতেই বিশিষ্ট ধনতান্ত্রিক পরিবর্তনের ব্যবস্থা তৈরি হলো। এসব দৃষ্টান্তের পাশে উনিশ শতকের রুশদেশে পুরাতন ব্যবস্থার প্রতিবন্ধক ছিল অনেক বেশি কঠোর ও দুর্মর, তার রাষ্ট্রব্যবস্থায় জারতন্ত্রের প্রতাপ তখনো প্রবল এবং অর্থনীতিতে ধনতান্ত্রিক সংঘাত ঘটলেও বহুলাংশে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার পিছুটান সমানে এক অচল অবস্থার সৃষ্টি করেছিল।

অনুন্নত অবস্থার মধ্যে উনিশ শতকের রুশ মনন ও সমাজচিন্তায় পরিবর্তনের প্রয়োজন তীব্র হয়ে উঠেছিল। কিন্তু দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক পরিবর্তনের পন্থানির্ণয়ে যে-ধরনের মতভেদ ও সমস্যাবলী প্রখর হয়ে উঠেছিল, তার কিছু কিছু দৃষ্টান্ত থেকে তৎকালীন রুশ সঙ্কটের স্বরূপ আমরা বুঝতে পারি। স্বৈরতন্ত্রের অবসান ও সামন্ততান্ত্রিক ভূমিদাস প্রথার বিলোপ যে নিতান্ত প্রয়োজন, সে-সম্পর্কে প্রগতিবাদী চিন্তাবিদদের মধ্যে মতৈক্য ছিল। আবার পশ্চিম ইওরোপে বুর্জোয়া বিবর্তনের কুফলগুলি সম্পর্কে অবহিতিও উনিশ

শতকের রুশ প্রগতিচিন্তায় বেশ প্রাধান্য পেয়েছিল। ফলে সামন্ততন্ত্রের বিলোপ ঘটবে, কিন্তু ধনতন্ত্রের পথে নয়। ধনতন্ত্রকে এড়িয়ে গিয়ে সরাসরি সাম্য ও স্বাধীনতার শোষণমুক্ত ন্যায়রাজ্যে পৌঁছবার স্বপ্ন তখন অনেক রুশ বিপ্লবী দেখতে শুরু করেছেন।

১৮২৫-এর ডিসেম্বরিস্ট বিদ্রোহ-প্রভাবান্বিত হারজেন ছিলেন রুশ বিপ্লব-চিন্তার এক মহান আদিপুরুষ। ১৯১২তে হারজেন-জন্মশতবার্ষিকীর শ্রদ্ধা নিবেদন প্রসঙ্গে লেনিন তাই বলেছিলেন। পশ্চিম ইওরোপের বুর্জোয়া অভিজ্ঞতা সম্পর্কে হারজেন মন্তব্য করেছিলেন যে রুশদেশের পক্ষে ঐ পথে না যাওয়ার সিদ্ধান্তই সমীচীন। ইতিহাসের পূর্বতন অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে আর সে-পথ মাড়াতে নেই, মানুষের সব অগ্রগতি এমনি এক "কালানুক্রমিক অকৃতজ্ঞতা"র কাহিনীতে জড়িয়ে আছে। আরো পরে আবার যেন হারজেন-এর প্রতিধ্বনিতেই চেরনিশেভস্কির সেই উক্তি : ইতিহাস যেন এক বুড়ি ঠাকুরমা, যাঁর ছোট নাতিদের ওপর দরদ বেশি। পরে যারা খেতে এল তাদের তিনি শুধু হাড় নয়, মজ্জার শাঁসটুকুও দেবেন, যখন আগে শাঁসের খোঁজে হাড় ভাঙবার চেষ্টায় পশ্চিম ইওরোপ তার আঙুলে বিশ্রী জখম করেছে।

এ-সব উক্তিতে ঝোঁক পড়েছিল সামন্ততন্ত্র থেকে সরাসরি এক সাম্যরাজ্যে উত্তরণের সম্ভাবনায়। অনুরূপ চিন্তাভাবনায় রুশ গ্রামীণ সমাজব্যবস্থার বিশেষ রূপ এবং তার সম্পর্কে বেশ খানিকটা আদর্শবাদী কল্পনার যথেষ্ট অবদান ছিল। তৎকালীন রুশ গ্রামসমাজে চাষের জন্য জমির বিলিব্যবস্থায় সমবেত সিদ্ধান্তের জোর খাটত এবং ব্যক্তিগত সম্পদবৃদ্ধির যুক্তিতে নয়, কোনো পরিবারে কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা অনুযায়ী জমি ব্যবহারের অধিকার ন্যস্ত হতো ; তার পুনর্বণ্টনও হতো সেই হিসাবে। ফলে সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যেও গ্রামসমাজে একটা আদিম সাম্যস্থিতির ব্যবস্থা ছিল। ১৮৬১র ভূমিদাসপ্রথা বিলোপ আইনেও গ্রামসমাজের ভূমিকা পুরোপুরি নাকচ করা হয়নি। এসবের ফলে কৃষকদের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির আগ্রহ ও যুক্তি অপরিণত থেকে যাওয়ার সম্ভাবনাকে নারোদনিক বিপ্লবীরা স্বাগত জানিয়েছিলেন। তাঁদের বিশ্বাস ছিল যে স্বৈরতন্ত্র ও সামন্ততান্ত্রিক শোষণের বিলোপ ঘটিয়ে গ্রামসমাজের ভিত্তিতেই যুগপৎ অর্থনৈতিক উন্নতি ও সমাজতান্ত্রিক ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করা শুধু যে সম্ভব তাই নয়, সেটাই হলো রুশ ইতিহাসের বিশিষ্ট লক্ষ্য ও পথনির্দেশ। হারজেন-এর প্রাথমিক চিন্তাভাবনায় এবং পরে বৈপ্লবিক প্রচার ও প্রস্তুতির সাক্ষ্যবহ চেরনিশেভস্কির

অজস্র সক্ষম রচনাবলীতে নারোদনিক মতবাদের বিকাশ হয়েছিল। 'নারোদ-নাইআ ভোলিআ' (জনগণের ইচ্ছা) নামক সংগঠনে বহু তরুণ বিপ্লবী যোগদান করেছিলেন।

রুশ ইতিহাসে ধনতন্ত্রবর্জিত রূপান্তরের কথা মার্কসও পুরোপুরি অস্বীকার করেননি। মার্কসের আলোচনা, চিঠিপত্র থেকে জানা যায় 'ক্যাপিটাল' প্রথম খণ্ডে প্রাক-ধনতান্ত্রিক প্রাথমিক সঞ্চয় সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য পশ্চিম ইওরোপ, বিশেষত ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসেই, সর্বতোভাবে প্রযোজ্য। সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে রূপান্তরের পশ্চিম ইওরোপীয় ধারা সবদেশেই ইতিহাসের একমাত্র পথ মনে করার কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। গ্রামীণ সমাজে জমির দখল ও বিলিব্যবস্থায় যৌথ অধিকারের রীতিনীতি সম্পূর্ণ বিনষ্ট না হওয়ায় রুশ ইতিহাসে হয়তো ধনতান্ত্রিক পরিবর্তনের যন্ত্রণাদায়ক অধ্যায় বাদ দিয়ে সরাসরি সমাজতন্ত্রের বৈপ্লবিক সূচনা ঘটতে পারে। অবশ্য ১৮৬১ থেকে রুশ ইতিহাস ধনতান্ত্রিক পরিবর্তনের দিকে মোড় ঘুরছিল এবং তার ফলে মার্কসের মনে হয় যে শেষোক্ত ধারা স্থায়ী রূপ পেলে রুশদেশ ধনতান্ত্রিক পর্যায়ের সাংঘাতিক ফলাফল এড়িয়ে যাওয়ার 'প্রকৃষ্টতম সুযোগ' থেকে বঞ্চিত হবে।

ভেরা জাসুলিচকে লেখা (১৮৮১) চিঠিতে মার্কস আরো জোর দিয়ে বলেছিলেন গ্রামীণ সমাজব্যবস্থা কতটা টিকে আছে তা সঠিক নির্ধারণ করা দরকার। সে-বৃত্তান্ত হাক্সথাউসেন-এর বই থেকে আবিষ্কার করে সমকালীন ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি নির্দেশ করা যাবে না। ইতিমধ্যে ধনতন্ত্রের প্রসার যদি সেই ব্যবস্থার গোড়া কেটে দিয়ে থাকে তবে আর নিছক কোনো রোমান্টিক স্বপ্নপ্রয়াণে কিছু ফল হবে না। রুশ ইতিহাসের বিশেষ বিকাশে প্রথম যুগের নারোদনিক আদর্শের যে-সম্ভাবনা মার্কস উল্লেখ করেছিলেন, তা কার্যকরী হয়-নি। পরবর্তী ইতিহাস বরং মার্কস-নির্দিষ্ট অন্য সম্ভাবনার পথে রূপ নিল। রুশ ইতিহাসের 'প্রকৃষ্টতম সুযোগ' গ্রহণে নারোদনিকদের ঝোঁক যে ক্রমশ কালনিরূপণে প্রচণ্ড এক ভ্রমের চেহারা পেয়েছিল এবং শ্রেণীদ্বন্দ্বের পরিবর্তমান সত্য বুঝতে না পেরে তাঁরা যে প্রায় প্রতিক্রিয়ায় মিশে গিয়েছিলেন, লেনিনের 'রুশ ধনতন্ত্রের বিকাশ' গ্রন্থের পাতায় পাতায় প্রতিবাদে তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে।

ইতিহাসের ধারায় যে-ধনতন্ত্র রুশদেশে অনিবার্য হয়ে উঠল, তার চেহারা পশ্চিম ইওরোপীয় বিকাশ থেকে আলাদা। বৈষয়িক উন্নতির মাত্রা বিচারে

বর্তমান শতাব্দীর বছর পার হওয়ার পরেও রুশ পরিস্থিতি পশ্চিম ইওরোপ বা জার্মানির তুলনায় অনেক পিছিয়ে ছিল। মার্কস-নির্দিষ্ট ধনতন্ত্রের দ্বিতীয় পন্থাই ছিল রুশ ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য। তাই উৎপাদনে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণে ধনতন্ত্রের ভূমিকা ছিল বিলম্বিত ও সীমাবদ্ধ। গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে 'কুস্তার্নি' শিল্পসংগঠনের রকমফের মারফত ধনতন্ত্রের সূচনা ও বিকাশে বাণিজ্যতান্ত্রিক মূলধন ও আর্থিক লগ্নির ওপর থেকে চাপানো প্রখরতর শোষণব্যবস্থাতেই ছিল পরিবর্তনের মূল সূত্র। আবার ১৮৬১র তথাকথিত কৃষক মুক্তিতেও শ্রেণীবৈষম্যের দ্বন্দ্ব বাড়িয়ে দেওয়া ভিন্ন খুব কিছু প্রগতির সম্ভাবনা ছিল না। শোষণের মাত্রা ও উৎপাদনের উপাদানগুলির বিকাশে যে-পরিপূরক সম্পর্কের ফলে উনবিংশ শতাব্দীর পশ্চিমা ধনতন্ত্র সাময়িক, এলোমেলো ও নির্মম হলেও উৎপাদনশক্তির বিকাশে প্রগতিশীল ভূমিকা অর্জন করেছিল, রুশ ধনতন্ত্র ও রাষ্ট্রব্যবস্থার ইতিহাসে তার ভিত্তি তৈরি হয়-নি। কিন্তু ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে মনোপলির সত্বর আবির্ভাব এবং ঐ একচেটিয়া বুর্জোয়া স্বার্থের সামাজ্যবাদী গতিপ্রকৃতির অভাব ছিল না।

গত শতাব্দীর শেষ দশকে দ্রুত ধনতান্ত্রিক বিকাশের পর্যায়ে সেই মনোপলি ব্যবস্থা, তার সঙ্গে রাষ্ট্রের সহযোগ, বিদেশী মূলধনের প্রতিপত্তি এবং সামরিক চাহিদার ওপর নির্ভরতার ব্যাপারগুলি প্রকট হয়ে ওঠে। আবার দ্রুত শিল্পোন্নয়নের পরিপূরক কৃষিব্যবস্থা তখনো রুশ অর্থনীতিতে গড়ে ওঠেনি। ১৯০৫-এর পরে আর একবার রাষ্ট্রীয় জুলুমের জোরে কৃষি ও শিল্পে ধনতান্ত্রিক বিকাশের নির্মম গতিপথকে সকল বাধামুক্ত করবার প্রচেষ্টা হয়েছিল। ইতিমধ্যে কিন্তু সুদীর্ঘকাল স্বৈরতান্ত্রিক পর্যায়কে স্বাগত জানাবার অবস্থা ছিল না। সেই বিরোধের পরিবেশে ১৯১৭র বিপ্লবের প্রস্তুতি এগিয়ে চলেছিল।

অন্যপক্ষে আবার চরম সামন্ততান্ত্রিক অবক্ষয়ের মধ্যেও রুশ বুর্জোয়াসির বিলম্বিত আড়ষ্ট ভূমিকা কোনোদিন গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের যথেষ্ট সক্ষমতা অর্জন করেনি। উনিশ শতকের রুশ মননে এই সঙ্কটের চেহারা স্পষ্ট। পশ্চিম ইওরোপের দেশে দেশে বিরাট পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত আর আলোকপ্রাপ্ত চিন্তাধারার প্রভাব রুশ শিক্ষিত সমাজ এবং অভিজাত ও মধ্যশ্রেণীকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। কিন্তু জ্ঞান ও চিন্তার সেই যুগান্তরকে স্বদেশের প্রত্যক্ষ বাস্তবতায় কর্মে ও কীর্তিতে সৃষ্টিময় করে তুলবার প্রয়াস উনিশ শতকের রুশ সমাজে

বারবার দিশাহারা হয়ে পড়ে। সামন্ততন্ত্র তখন চরম অবক্ষয়গ্রস্ত; উৎপাদন ও শোষণের ঐ রীতিতে যে কোনো নূতন সৃষ্টির শক্তি অবশিষ্ট নেই তা এক তর্কাতীত সত্য বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। কিন্তু রুশদেশে বুর্জোয়া বিকাশের ধারাতেও সৃষ্টিময় পরিবর্তনের দিগন্ত উন্মোচিত হয়নি। অনেকটা সামন্ত-তান্ত্রিক শোষণের সহযোগী থেকে তা যেন কেমন পরগাছার মতো বাড়তে চাইছিল। আর ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের সদাব্যাহত গতি-প্রকৃতিতে নির্বিত্ত শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক আবির্ভাবেরও কোনো অনিবার্য সম্ভাবনা স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি।

গত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে অর্থনৈতিক বিচারে তখনো খুবই অনুন্নত রুশ-দেশ। সামন্ততন্ত্র মরণাপন্ন, কিন্তু বিলুপ্ত নয়। আত্মপ্রতিষ্ঠার আবেগে প্রবল কোনো বুর্জোয়াশ্রেণীর আবির্ভাবও হয়নি। অথচ অভিজাত ও মধ্যশ্রেণীর ভদ্রলোকেরা ইওরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছেন। সেই জ্ঞানের রাজ্য ক্রমে ক্রমে ফরাসী বিপ্লবের প্রগতিচিন্তা থেকে মার্কসবাদের যুগান্ত-নির্দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ে। জারের স্বৈরতন্ত্রে আড়ষ্ট প্রতিবাদে দুর্বল বুর্জোয়াসির রুশদেশে সেই জ্ঞানকে সামাজিক কর্মকাণ্ডে সার্থক করে তুলবার পথে বহু বাধা ছিল — কি রাজনীতিতে, কি অর্থনীতিতে। আরো আগে, আঠারো শতকের শেষ দিকে, সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিন-এর সেই হাস্যকর প্রচেষ্টা থেকেই তো এই খাপছাড়া বিকাশের সূচনা — সেই যখন রাষ্ট্রব্যবস্থা ও অর্থনীতির কোনো পরিবর্তন না করে ক্যাথারিন উদারনীতির প্রবর্তনা ও সুপারিশের জন্য শুধু একটি কমিশন নিয়োগ করেছিলেন।

সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে সৃষ্টিক্ষম সম্পর্কে সংযুক্ত কোনো শ্রেণীর নেতৃত্ব ব্যতীত সমাজকে ভেঙে গড়ার আদর্শ পূর্ণ হয় না। উনিশ শতকের রুশ সমাজের বিশেষ পরিস্থিতিতে তাই কৃষকের কল্পরাজ্যের স্বপ্ন, সামন্ততন্ত্র থেকে সরাসরি সমাজতন্ত্রে উত্তরণের ওপর বেশি জোর পড়েছিল। হারজেন-এর স্বপ্নাতত্তিতে, চেরনিশেভস্কির বিপ্লব-চিন্তা ও কর্মে, বা টলস্টয়-এর ন্যায়বিশ্বে তাই বারবার মুঝিকের কর্মিষ্ঠতা, সারল্য ও অপাপবিদ্ধতার আদর্শ অত বড় হয়ে উঠেছে। দেশজোড়া অত্যাচার, অনাচার ও সৃষ্টিছাড়া শোষণের মধ্যে একমাত্র কৃষকের জীবন ও কর্মে তাঁরা উৎপাদনের যুক্তি, তথা সামাজিক মনুষ্যত্বের প্রাথমিক সূত্র খুঁজে পেয়েছিলেন। সেই আবিষ্কারের প্রাথমিক পর্যায়ে ডিসেম্বরিস্টদের মধ্যে যাঁরা ছিলেন আদর্শবাদী তাঁদের বিশ্বাস ছিল

কয়েকজন বীরপুরুষ মিলে জার-সম্রাটকে খতম করতে পারলেই মুক্ত সমাজের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে। সন্ত্রাসবাদের ঝোঁক চেরনিশেভস্কির আত্মত্যাগের আহ্বানেও নিহিত ছিল যাতে সেই ধারণা প্রবল হয়ে ওঠে যে বাছাই-করা কিছু ব্যক্তি নিজেদের চৈতন্যের ভাবমূর্তি অনুযায়ী দুনিয়া পুনর্গঠন করে দিতে পারেন। চেরনিশেভস্কির ধ্যান-ধারণায় কৃষক জনগণের মধ্যে বিদ্রোহী সত্তার সাযুজ্য অন্বেষণের প্রতিও জোর পড়েছিল। ক্রমে ক্রমে নারোদনিকদের চিন্তায় কৃষক-বিদ্রোহের প্রয়োজন অনেক বেশি গুরুত্ব পেয়েছিল। কৃষকের সঙ্গে আত্মীয়তায় নিজেদের সব অসম্পূর্ণতা ও গ্লানি থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে — এই বিশ্বাস উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বারবার বিদ্রোহী রুশ-মনকে অনুপ্রাণিত করেছিল।

র‍্যাডিকাল চিন্তাভাবনায় আপ্লুত রুশ বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের জীবন পরিস্থিতি সামাজিক অবস্থা ও ভাবাদর্শের বিরোধে পর্যুদস্ত হচ্ছিলেন। বুর্জোয়া বিকাশের আড়ষ্টতা, অসম্পূর্ণতার দরুন সেই শ্রেণীর স্বরূপে কোনো বিপ্লবী আত্মপরিচয়ের অবলম্বন ছিল না। তখন মনে হয়েছিল সমাজবাদ ছাড়া ভবিষ্যৎ নেই এবং সেই সমাজবাদের ভিৎ কৃষকের জীবন ও মনে গ্রথিত আছে। তাই কৃষকের মধ্যে সেই জীবনদায়িনী শক্তির সন্ধান মিলবে যা রুশ বুদ্ধিজীবীকে, তার মননকর্মকে, বিচ্ছিন্ন সৃষ্টিছাড়া অস্তিত্বের গৌণতা ও গ্লানি থেকে মুক্তি দেবে।

ইতিহাসের যুক্তি ছিল আরো জটিল। কৃষকদের সম্পর্কে পল্লীসমাজ সম্পর্কে যেসব রোমান্টিক বা আদর্শসর্বস্ব ধারণা নিয়ে তরুণরা গ্রামের দিকে যেতেন, অনেক ক্ষেত্রেই তা বাস্তবের রূঢ় অভিজ্ঞতার সঙ্গে আদৌ মিলত না। কৃষকদের সরল জীবন ও বৃত্তির সাধারণ্যে হয়তো সমাজতন্ত্রের প্রাকৃত সম্ভাবনা অনেক বেশি ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও কৃষকের সঙ্গে বৈপ্লবিক মৈত্রীর কর্তব্য ঠিক জড়-প্রকৃতিকে আপন কল্পনার তোড়ে উপমা-উৎপ্রেক্ষায় সাজিয়ে দেওয়ার ব্যাপার নয়। প্রাকৃত জীবনচর্চার বহু ঐশ্বর্য নিয়েও কৃষকের জীবন ও সত্তা শেষ পর্যন্ত নিছক কোনো প্রাকৃতিক ব্যাপার নয়, মানুষের ইতিহাসে সংলগ্ন হিসাব-নিকাশ সে-ক্ষেত্রে কাজ করবেই করবে। নারোদ-নিকদের ভাবাদর্শে কিন্তু শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্ব ও কার্যক্রম, তার অনুকূল গণসংগঠনের প্রয়োজন, কোনোদিন স্পষ্ট হয়নি। তাই গত শতাব্দীর দশকে দশকে রুশ তরুণদের মননে অনুভবে বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণা তীব্র থেকে তীব্রতর

হয়ে উঠেছে, স্নায়ুর আহুতিতে সমানে জ্বলেছে তাদের অন্তরের আগুন, কিন্তু সেই অগ্নিপূজা কোনো যুগান্তকারী কৃষক বিপ্লবে গোটা সমাজকে ভেঙে গড়ার সার্থকতা অর্জন করেনি। কৃষক তো আর বিদ্রোহী তরুণদের স্নায়ুযন্ত্রণা মোচনের দায়ে বিপ্লব করবে না।

অনেক সময়েই আবার তৎকালীন রুশ-চিন্তায় সমাজতন্ত্রের উৎসাহ উৎপাদনের যুক্তিতে মিলতে পারেনি। শিল্পসমৃদ্ধ ইওরোপ থেকে সমাজতন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিত গ্রহণ করবার পরে লেনিন-পূর্ব রুশ-বিপ্লবচিন্তায় বারবার এক কৃষিভিত্তিক কল্পরাজ্যের স্বপ্ন প্রশ্রয় পেয়েছিল। সামন্ততান্ত্রিক অবক্ষয়ের পরে সমাজতন্ত্রে পৌছবার উপযুক্ত অর্থনৈতিক পরিবর্তনের অনেকগুলি ধাপ সম্পর্কে অবহিতি স্পষ্ট হয়নি। তার আগেই সম-বণ্টনের আদর্শ নিয়ে আগ্রহাতিশয্য দেখা দিয়েছিল। পশ্চিম ইওরোপীয় ধনতন্ত্রের সামাজিক মানবিক ব্যর্থতা নিয়ে সমালোচনার অন্ত ছিল না, কিন্তু রুশদেশে শিল্প-বিপ্লবের কোনো বিকল্প যুক্তি-গ্রাহ্য প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়নি। তাই বেলিনস্কির মতো বিচক্ষণ ব্যক্তি যদিবা বুর্জোয়াসির ভূমিকা নির্ণয়ে ইতিহাস-চেতনার পরিচয় দিয়েছিলেন, তবু তিনিই আবার ব্যবহারিক জ্ঞানের বিভাগ ও বৃত্তিমূলক ব্যুৎপত্তির প্রতি প্রচণ্ড অনীহায় যেন শিল্প-বিপ্লবের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় কয়েকটি ব্যাপারকেই চরম উপেক্ষা করেছিলেন। রসায়ন শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ বহু রুশ তরুণ নিহিলিস্ট আন্দোলনে যোগ দিয়ে গোপনে বোমা তৈরির কাজে মেতেছিলেন। পর্যাপ্ত শিল্পোন্নয়নের অবস্থায় হয়তো এইসব তরুণরাই অন্যবিধ কর্তব্যে নিজেদের আত্মপ্রতিষ্ঠা খুঁজতেন। আর একজন মনস্বী রুশ সমালোচক টলস্টয়-এর 'রেজারেকশন' উপন্যাসের নায়ক সম্পর্কে যে-মন্তব্য করেছিলেন, তাতে তৎকালীন রুশ-মননের সঙ্কট বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে — নেখলুডভ-এর গোলমাল হয়ে গেছে এই যে তিনি নিজে কোনো কর্মময় বৃত্তি গ্রহণ না করে চাষীদের সাহায্য করতে চান।

২

রুশ সমাজ ও বিপ্লবচিন্তায় পূর্বোক্ত নানাবিধ কাল্পনিকতা, অপচয় ও অসম্পূর্ণতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে লেনিন বলশেভিক মতাদর্শের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নির্বিত্ত শ্রমিকশ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকা নির্ণয়ে তাঁর মার্কসীয় সিদ্ধান্ত সামাজিক রূপান্তরের ইচ্ছা ও আগ্রহকে সম্যক

আত্মপরিচয় ও সদর্থক বৈপ্লবিক শক্তিতে গ্রথিত করেছিল। নারোদনিকিজম, আইন বাঁচিয়ে মার্কসবাদ, অর্থনীতিবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লেনিনের প্রচণ্ড প্রতিবাদ রুশ-মনন ও সমাজচিন্তার শতাব্দীব্যাপী সীমা-সন্ধান এবং সঙ্কটের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করেছিল। রুশ সমাজচিন্তা ও বৈপ্লবিক ধারণার পূর্বতন বহু বিভ্রান্তি ও বিহ্বলতা পেরিয়ে মার্কসবাদের বৈজ্ঞানিক পথনির্দেশ স্পষ্ট হয়ে উঠল।

'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'তে জার্মানির প্রসঙ্গে মার্কস লিখেছিলেন যে সেখানে সামন্ততন্ত্রের কাঠামো অনেকটা বজায় থাকলেও বুর্জোয়াব্যবস্থা ও নির্বিত্তশ্রেণীর বিশেষ বিকাশ ঘটেছে। এই পরিস্থিতিতে বুর্জোয়া বিপ্লব হয়তো নির্বিত্তশ্রেণীর বিপ্লবেরই আশু প্রস্তাবনা হয়ে দাঁড়াবে। ১৮৫০এ কমিউনিস্ট লীগের বক্তৃতাবলীতেও মার্কস জার্মান শ্রমিকশ্রেণীর ঐতিহাসিক দ্বৈত ভূমিকার ওপর জোর দিয়েছিলেন। গত শতাব্দীর শেষ দিকে রুশদেশেও ফিউডাল অবক্ষয় ও স্বৈরতন্ত্রের পরিস্থিতির মধ্যে বুর্জোয়া পরিবর্তনের গতি বাড়ছিল। সেখানেও নিছক বুর্জোয়া নেতৃত্বের জোরে গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা হয়ে পড়ছিল সুদূরপরাহত। একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবকৌশল এবং তার অনিবার প্রয়োগে স্বৈরতন্ত্রের বিলুপ্তি ঘটতে পারে এবং বুর্জোয়াসির রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে নির্বিত্তশ্রেণীর সংগ্রাম আরম্ভ হবে। গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের এই পারম্পর্য সাধনের কর্তব্যেই মার্কস শ্রমিকশ্রেণীর দ্বৈত ভূমিকা নির্দেশ করেছিলেন। সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে তার রাষ্ট্রীয় স্বৈরাচার অবলোপের জন্য বুর্জোয়াসির সংগ্রাম আড়ষ্ট অসম্পূর্ণ হয়ে পড়লে, শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী ভূমিকা ছাড়া ইতিহাসের সেই দায় উদ্ধার সম্ভব নয়।

রুশদেশের আইনসম্মত মার্কসবাদী (legal marxists) বা নারোদনিকদের তত্ত্ব ও কর্মে ঐ বিশিষ্ট অবহিতির কোনো পরিচয় ছিল না। জারের রাজত্বেও আইনসম্মত মার্কসবাদীদের বই ও কাগজ-পত্র প্রকাশের সুযোগ ছিল বেশি, নিষেধাজ্ঞার বাধা তাঁদের ওপর কমই চাপত। তাঁদের কাজ ও মতের প্রায় কোনো বিরোধী রাজনৈতিক তাৎপর্য ছিল না। ধনতান্ত্রিক বিকাশ সম্পূর্ণ হওয়ার আগে শ্রমিকশ্রেণীর কোনো রাজনৈতিক ভূমিকা নেই, কেবল ট্রেড ইউনিয়ন মারফত অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়া আদায়

এবং উদারনীতির প্রতি সমর্থন জানিয়ে গেলেই চলবে, এই ছিল তাঁদের চিন্তা-ভাবনার মূল কথা।

নারোদনিকদের সঙ্কট ১৮৮০ থেকে খুব জটিল অবস্থায় পৌছেছিল। কৃষকের কাছে যাওয়ার কর্মসূচী ও কৃষক-বিপ্লবের প্রস্তাব সফল হয়নি। বৈপ্লবিক পরিস্থিতি সন্ত্রাসবাদী হঠকারিতায় নষ্ট হয়ে যায়। জার-সম্রাট দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারকে হত্যার পরে 'নারোদনাইআ ভোলিআ' দলের ওপর প্রচণ্ড দমননীতির আঘাত এসে পড়ে। অথচ সেই চ্যালেঞ্জের সঙ্গে মোকাবিলায় সক্ষম কোনো গণআন্দোলনের প্রস্তুতি সন্ত্রাসবাদী কর্মপন্থায় সম্ভব ছিল না। বারম্বার ব্যর্থতার প্রতিক্রিয়ায় একধরনের সুবিধাবাদ নারোদনিক আন্দোলনের এক অংশে সংক্রামিত হয়। এঁরা বিপ্লবের চিন্তা ও কাজ বাদ দিয়ে মুঝিকের কর্মিষ্ঠতার রূপকে শান্তিপূর্ণ বুর্জোয়া পরিবর্তনের যুক্তি খুঁজতে শুরু করেন। অন্যপক্ষে অবশ্য লেনিন-পূর্ব রুশ-বিপ্লবমানসের শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকার তখনো নারোদনিক আন্দোলনের বিপ্লবী অংশের মধ্যে কার্যকরী ছিল। সামাজিক বিপ্লবী (Social Revolutionaries) দলের ভূমিসংস্কার সম্পর্কিত কর্মসূচীকে গ্রহণ করে পরে লেনিন বিপ্লবী নারোদনিক ও বলশেভিকদের, কৃষক-শ্রমিকদের, যুক্তফ্রণ্ট গড়ে তুলেছিলেন। নারোদনিকদের আর এক অংশ আবার স্বদেশ থেকে নির্বাসিত অবস্থায় মার্কসবাদ ও পশ্চিম ইওরোপের শ্রমিক আন্দোলন থেকে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা গ্রহণ করেন। তাঁদের প্রচেষ্টায় ১৮৮৩তে প্রথম রুশ শ্রমিকশ্রেণীর আলাদা পার্টি স্থাপিত হলো। এই প্রসঙ্গে প্লেখানভ-এর নাম সর্বাগ্রগণ্য।

প্লেখানভ ও তাঁর সহকর্মীদের উদ্যোগে যে-বৈপ্লবিক ভাবনার সূত্রপাত, গত শতাব্দীর শেষ দশক থেকে লেনিনের চিন্তা ও কর্মের অনিবার প্রতিভায় তা ইতিহাসের প্রচণ্ড তাৎপর্য ও গতিবেগ অর্জন করল। ১৯০৩এ বলশেভিক পার্টির প্রতিষ্ঠায় লেনিনের বিপ্লবী জীবনের আদি পর্যায় আর এক সার্থক সূচনায় পৌছল। গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পুরো জোর রুশ বুর্জোয়াসির না থাকলেও, রুশ অর্থনীতি তখন আদৌ ধনতন্ত্রমুক্ত নয় — কি শিল্পে, কি কৃষিতে। এই অবস্থায় ধনতন্ত্রকে এড়িয়ে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ ইতিহাসের আয়ত্তাতীত হয়ে পড়েছিল। আবার অক্ষম আড়ষ্ট বুর্জোয়াসির চেষ্টাতেই গণতান্ত্রিক বিপ্লব সফল হবে ভেবে নেওয়ার কোনো যুক্তি ছিল না। শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রণী ভূমিকা ও উদ্যোগের বিস্তৃতি ব্যতীত গণতান্ত্রিক

বিপ্লবের সাফল্যও অনায়ত্ত থেকে যাবে। অনুরূপ ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতের সমগ্রতাতে লেনিন প্রথম বলশেভিক পার্টি ও মতবাদের প্রয়োজন ও ভূমিকা বিশ্লেষণ করেন।

প্রায় পুরো উনিশ শতক ধরে রুশ বিপ্লবী মননের সঙ্কটমুক্তির জন্য শ্রমিকশ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকা নির্ণয়ের প্রশ্নটি ছিল বিশেষ জরুরি। নির্বিত্তশ্রেণীস্বরূপের সঙ্গে সংলগ্নতাতেই রুশদেশের প্রগতিচিন্তার পক্ষে একটা বাস্তব অবলম্বনের জোর পাওয়া সম্ভব ছিল। শতাব্দীর প্রারম্ভে রাডিশেভ-এর করুণ আত্মহত্যার সময়ে, পরে হারজেন ও চেরনিশেভস্কির মানব-স্বপ্নে — তার আয়ত্তির জন্য মরিয়া আবেগে, ডোব্রলুবভ-এর বৈপ্লবিক প্রত্যয় ও সাম্যের আদর্শে, বা অন্যপক্ষে পিসারেভ-এর শিক্ষাবিস্তারের মারফত বিপ্লব-রসায়নের ধারণায় একটা ঐতিহাসিক সীমাসন্ধানের দুর্দম আগ্রহ এবং তার অসম্পূর্ণ উৎক্রান্তির পরিচয় বারবার ধরা পড়েছিল। চিন্তার স্বাবলম্বনে, আদর্শের ঐশ্বর্যে, নির্ভীক ব্যক্তিচরিত্রের মহিমায় তাঁরা অনেকে আজীবন সমাজ-বিপ্লবের সাধনায় নিজেদের নিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু তৎকালীন রুশ সমাজের বিশেষ পটভূমিতে অবক্ষয়াক্রান্ত সমাজব্যবস্থা ও স্বৈরাচারী রাষ্ট্রযন্ত্রকে ভেঙে গড়ার বিপ্লবে আগাগোড়া সামিল হওয়ার মতো আত্মপ্রত্যয় কোনো শ্রেণীতে চারিয়ে যায়নি। ফলে শ্রেণীগত তাদাত্ম্য ও একনিষ্ঠ উদ্যমের ঘাটতি বিপ্লবের পথে বাধা সৃষ্টি করেছে, কেবল বিদগ্ধ মননের উপপ্লব ও পরিবর্তন-অভীপ্সা সমাজব্যাপী প্রতিকূলতা অতিক্রমনের উপায় পুরোপুরি খুঁজে পায়নি।

বিপ্লবের শ্রেণীগত ভিত্তি তথা সামাজিক আসনের এই শূন্যস্থান লেনিন শ্রমিকশ্রেণীর মার্কসীয় ধারণা দিয়ে পূর্ণ করলেন। শ্রমিকশ্রেণীর যুগান্তকারী ঐতিহাসিক তাৎপর্য, যে-সচেতন ভূমিকায় তার বিরাট গুরুত্ব, সমাজের গতি-প্রকৃতিতে যা ক্রমাগত বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সম্ভাবনায় রূপ নিচ্ছে — নির্বিত্ত শ্রমিক জনগণের পক্ষে তার অবহিতি কোনো স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাপার নয়। বিপ্লবের ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে শ্রমিকশ্রেণী যাতে এগিয়ে আসতে পারে, তার উপযুক্ত চৈতন্যের প্রস্তুতি ও সংগঠন গড়ে তোলাই পার্টির কাজ। ইতিহাসের যে-বাস্তব সম্ভাবনা শ্রমিকশ্রেণীর পরিস্থিতিতে নিহিত আছে, অনবরত তার জ্ঞান ও নিয়মের বোঝাপড়ায় শ্রমিকশ্রেণী আপন পরাক্রম ও ভূমিকা সম্পর্কে আত্মসচেতন হয়ে উঠতে পারে। সেই আত্মসচেতনতার জোরে শ্রমিকশ্রেণী স্বীয় পরিস্থিতির সঙ্গে সমাজের স্তরে স্তরে নানা বিরোধ, শ্রেণীদ্বন্দ্ব ও

বিধি-ব্যবস্থার যোগাযোগ খুঁজে পাবে এবং প্রতিবাদে বিপ্লবে সমাজকে ভেঙে গড়ার শুধু আন্তরিক প্রেরণা নয়, বৈজ্ঞানিক প্রত্যয়ের নিশ্চয়তা অর্জন করবে।

গত শতাব্দীর শেষ দশকে রুশদেশে সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক আন্দোলন এক বিশেষ পরিস্থিতিতে পৌঁচেছিল, অথচ সেই পরিস্থিতির বিপুল সম্ভাবনাকে কার্যে পরিণত করবার উপযুক্ত তত্ত্ব ও নেতৃত্ব তখনো কোনো পার্টিতে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। নির্বিত্তশ্রেণীর সংগ্রাম তখন শ্রমিকজীবনের নূতন নূতন স্তরে বিস্তার লাভ করছে। ১৮৯০এর পরে দ্রুত ধনতান্ত্রিক পরিবর্তনের ফলস্বরূপ নির্বিত্তশ্রেণীর আয়তনও বেড়ে যাচ্ছিল। ছাত্র ও জনসাধারণের অন্যান্য বিবিধ অংশের মধ্যে গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য লড়াইয়ের প্রেরণা ছড়িয়ে পড়ছিল। নারোদনাইআ ভোলিআর সঙ্কটের পরে রুশ তরুণ ও বুদ্ধিজীবীদের যে-বিপ্লবপ্রেরণা স্তিমিত হয়েছিল, তাই যেন আবার শতাব্দীর শেষ দশকে সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক আন্দোলনের মধ্যে নূতন নেতৃত্বের প্রত্যাশায় আগ্রহান্বিত হয়ে ওঠে। আর সবকিছুর পটভূমিতে রুশ সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিরোধজর্জর অভিজ্ঞতার কোনো অন্ত ছিল না। সমগ্র সামাজিক পরিস্থিতিতে নিহিত বৈপ্লবিক সম্ভাবনাই আবার নারোদনিকদের, আইন বাঁচানো মার্কসবাদের, অর্থনীতিবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বহুবিধ বিভ্রান্তিতে বিপর্যস্ত হয়েছিল।

সমগ্র সামাজিক জীবন ও তার অন্তর্নিহিত বিরোধের স্তরগুলি সম্পর্কে চৈতন্যের সম্প্রসারণই বৈপ্লবিক রাজনীতির গোড়ার কথা। সেই চৈতন্যের জোরে শত্রু-মিত্রের চেনাশোনা, সংগ্রামের পন্থা ও লক্ষ্য শ্রমিকশ্রেণী নির্ধারণ করতে পারে। নির্বিত্তের শ্রেণীস্বার্থের ধারণা নিছক কিছু ব্যক্তিস্বার্থের যোগফল মাত্র নয়। শোষিতশ্রেণীর চেতনায় নিজের প্রয়োজনের সঙ্গে সামাজিক যুগান্তরের যোগাযোগ স্পষ্ট হয়ে উঠলে বিপ্লবের পথনির্দেশ অনিবার্য হতে পারে। সেখানেই শোষিত মানুষের ইমানের উৎস এবং তার প্রচণ্ড জোর প্রকাশ পায়। শ্রেণীশোষণের দুঃসহ সর্বহারা অবস্থাতেও সে কারও বদান্যতার অপেক্ষায় নেই, বিপ্লবের জটিল কার্যক্রমকে কোনো সমাজবিরুদ্ধ সন্ত্রাসে সংক্ষিপ্ত করবার অলীক কল্পনাও তার নেই, কোনো ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত লোভের প্রতিযোগিতায় সে ভেড়ে না। সে দৃঢ়ভাবে জানে কোথায় তার শক্তির উৎস, কোন সামাজিক সংগ্রামে তার অধিকারের

প্রতিষ্ঠা অনিবার্য ও সুনিশ্চিত। নির্বিত্ত শ্রমিকশ্রেণীকে তার এই বিরাট ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন করে তুলবার ভাবাদর্শই লেনিন 'ইসক্রা'র পাতায় দিনের পর দিন প্রচার করেছিলেন। ১৯০২এর 'কি করতে হবে' বা 'What is to be done' বইটিতে সেই ভাবাদর্শের সুসংহত পরিচয় আমাদের বিশেষ দ্রষ্টব্য। তার ভিত্তিতে ১৯০৩এ বলশেভিক পার্টির প্রতিষ্ঠা হলো।

শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিকে গোটা সমাজের জন্য একটা বিকল্প ব্যবস্থার প্রয়োজন তীব্র ও স্পষ্ট করে তুলতে হবে এই ছিল লেনিনিস্ট রাজনীতির গোড়াকার কথা। সমাজকে পালটাবার লড়াইতে শ্রমিকের ভূমিকা হবে অগ্রগণ্য, কিন্তু পালটাবার পুরো প্রস্তাব ও বিপ্লবী প্রচেষ্টায় শুধু শ্রমিকের আর্থিক অবস্থায় উন্নতির ব্যাপরটাই সব নয়। শোষণমূলক অর্থনীতি ও স্বৈরতন্ত্র সমাজবর্তী লোকজীবনের নানা স্তরকে, নানা শ্রেণীতে ছড়ানো জনগণকে, বহুবিধ বিষয়ে কোনো কোনো আকারে বিপর্যস্ত করছে। শ্রেণীশোষণ ও তার সঙ্গে জড়িত সামাজিক অব্যবস্থা অনাচারের সর্ববিধ প্রকাশকে অনিবার আন্দোলন ও প্রচারের মাধ্যমে উদ্ঘাটিত করাই পার্টির কর্তব্য। এইভাবে গণজীবন ও মনের সকল স্তরে একটা বিকল্প ব্যবস্থার জন্য আগ্রহ ও সংগ্রামের প্রস্তুতি সুদৃঢ় হতে পারে। না হলে শুধু বিচ্ছিন্নভাবে আর্থিক দাবি-দাওয়ার আন্দোলন বা গোপনে কয়েকটি শ্রেণীশত্রুকে খতম করে দেওয়ার সন্ত্রাসবাদ কিছুতেই বিপ্লবের সামাজিক শক্তি ও তাৎপর্য অর্জন করতে পারবে না।

লেনিনের চিন্তা ও আদর্শে রাজনীতি ও অর্থনীতির নিবিড় যোগসূত্র সত্ত্বেও তাদের মধ্যে স্তরভেদের সত্যটি কখনো উপেক্ষিত হয়নি। অর্থনীতিবাদ বা শুধু রুজি-রোজগারের লড়াইতে শ্রমিক-আন্দোলনকে সীমাবদ্ধ রাখবার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিবাদ 'কি করতে হবে' বইটির প্রধান বক্তব্য। তাই লেনিনের সেই উক্তি, "এক কথায় বলতে গেলে প্রত্যেক ট্রেড ইউনিয়ন সম্পাদক মালিক ও সরকারের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক সংগ্রাম চালান বা চালাতে সাহায্য করেন। বেশ জোর দিয়ে বলতে চাই যে এটা ঠিক এখনো সোশ্যাল ডেমোক্রেসি হয়ে উঠছে না। কেবল ট্রেড ইউনিয়নের সেক্রেটারি হওয়া সোশ্যাল ডেমোক্রাটের লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়, তাঁর হওয়া দরকার সর্বপ্রকারে জনগণের রক্ষক ও সমর্থক যিনি স্বৈরতন্ত্র ও অত্যাচারের যে-কোনো প্রকাশে রুখে দাঁড়াবেন তা যেখানেই প্রকাশ পাক

না কেন কিংবা যে-কোনো স্তর বা শ্রেণীর মানুষকে আঘাত করুক না কেন; যিনি ওরকম যাবতীয় ঘটনা থেকে পুলিশী জুলুম ও ধনতান্ত্রিক শোষণের একটি অখণ্ড চিত্র গড়ে তুলবেন, যিনি প্রতিটি ঘটনাকে — তা সে যত নগণ্যই হোক— তাঁর সমাজবাদী প্রত্যয় ও গণতান্ত্রিক দাবির উপস্থাপনায় ব্যবহার করতে পারবেন যাতে জনসাধারণের কাছে নির্বিত্তের মুক্তি-সংগ্রামের সর্বব্যাপী ঐতিহাসিক তাৎপর্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে" (Collected works, vol. 5, Moscow, পৃষ্ঠা ৪২৩)।

লেনিনের দৃঢ় মত ও পথনির্দেশ ছিল যে, শ্রমিকের রাজনৈতিক ভূমিকা প্রতিষ্ঠা করবার জন্য শুধু জীবিকা-সংক্রান্ত দাবি-দাওয়ার ওপর নির্ভর করে থাকা আদৌ যথেষ্ট নয়। জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের কর্মকাণ্ডের আদর্শনীয়তা সম্পর্কে লেনিন মন্তব্য করেছিলেন, "তা প্রতি ক্ষেত্রে এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের সকল প্রশ্নে হস্তক্ষেপ করে।" তাঁদের সেই কাজের কিছু কিছু দৃষ্টান্তও লেনিন দিয়েছিলেন। তার মধ্যে আছে "একজন প্রগতিকামী বুর্জোয়ার পৌরপ্রধানের পদে নির্বাচনে উইলহেলম-এর অনুমোদন না পাওয়ার ব্যাপার (আমাদের অর্থনীতিবাদীরা এখনো জার্মানদের বুঝিয়ে উঠতে পারেননি যে এমন ব্যাপারে প্রতিবাদ জানালে নাকি উদার-নীতির সঙ্গে সমঝোতা ঘটে); 'অশ্লীল' পুস্তক ও চিত্রের প্রকাশ-সংক্রান্ত আইনের ব্যাপার; অধ্যাপকদের নিয়োগে সরকারি প্রভাবের ব্যাপার প্রভৃতি সবক্ষেত্রেই দেখা যায় সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা পুরোভাগে স্থান নিয়ে সকল শ্রেণীর মধ্যে রাজনৈতিক অসন্তোষ জাগিয়ে তুলছেন, জাগিয়ে তুলছেন অলসদের, পিছিয়ে পড়াদের প্রেরণা দিচ্ছেন এবং নির্বিত্তশ্রেণীর রাজনৈতিক চেতনা ও কর্মের যাতে বিকাশ ঘটে সেই উদ্দেশ্যে প্রচুর তথ্যসম্ভার যোগাতে পারছেন" (ঐ, পৃষ্ঠা ৪৩৯)। এ-সম্পর্কে লেনিনের আরও স্পষ্ট বক্তব্যও আমাদের স্মরণীয়, "রাজনৈতিক নিপীড়ন যতদূর পর্যন্ত সমাজের সব শ্রেণীকেই আঘাত করে, যতদূর পর্যন্ত তা জীবন ও কর্মের নানা ক্ষেত্রে প্রকট — শিল্পোৎপাদন, নাগরিক, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, ধর্মগত, বিজ্ঞানকর্ম প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্র তার অন্তর্ভুক্ত —তদনুযায়ী স্বৈরতন্ত্রের নানাবিধ চেহারা প্রকাশ করে দেওয়ার জন্য সাংগঠনিক দায়িত্ব না নিলে আমরা যে রাজনৈতিক চেতনা বিস্তারের কর্তব্য পুরোপুরি পালন করব না তা কি স্পষ্ট নয়?"

পার্টির কাজকে শুধু শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবার সঙ্কীর্ণতামূলক

ভ্রান্তির বিরুদ্ধে লেনিন কঠোর মন্তব্য করেছিলেন, "সব শ্রেণীর মানুষের মধ্যে কাজের কি কোনো ভিত্তি আছে? এ-ব্যাপারে কারো সন্দেহ থাকলে তার চেতনায় স্বতঃস্ফূর্ত জনজাগরণের ধারণার দরুন ঘাটতি ঘটেছে। শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন কোনো অংশে অসন্তোষ জাগিয়েছে, কোনো অংশে বিরোধীদের প্রতি সমর্থনের আশাও জেগেছে, এবং আরও অন্যদের মধ্যে এই বোধও জাগিয়েছে যে স্বৈরতন্ত্র অসহনীয় এবং তার পতন অবশ্যম্ভাবী। অসন্তোষের প্রতিটি প্রকাশকে, যে-কোনো প্রতিবাদকে — তা যত নগণ্যই হোক না কেন — সম্যক ব্যবহার করতে না পারলে আমরা শুধু নামেই 'রাজনীতিক' ও সোশ্যাল ডেমোক্রাট থেকে যাব (বাস্তবে যা প্রায়ই ঘটছে)। লক্ষ লক্ষ মেহনতী কৃষক, কারিগর যে কোনো যোগ্য সোশ্যাল ডেমোক্রাটের বক্তৃতা শুনবেন তার থেকে এটা আলাদা ব্যাপার। সত্যিই কি এমন কোনো সামাজিক শ্রেণী আছে যার কোনো-না-কোনো ব্যক্তি গোষ্ঠী বা চক্র অধিকারের অভাব এবং স্বৈরতন্ত্র সম্পর্কে অসন্তুষ্ট নন এবং তাই তাঁরা গণতান্ত্রিক দাবির প্রবক্তা সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের প্রচারেরও অগম্য নন?" (ঐ, পৃষ্ঠা ৪৩০)

লোকসমাজে ঘনিষ্ঠ সংলগ্নতার জোরে যে-বিপ্লবী চেতনার আবির্ভাব ঘটতে পারে তার দায়িত্বে ফাঁকি দেওয়ার ফলস্বরূপ একদিকে অর্থনীতিবাদের আত্মতৃপ্তি ও অন্যদিকে সন্ত্রাসবাদের সৃষ্টিছাড়া উত্তেজনার মধ্যে একটি মৌল সাদৃশ্যের প্রতি লেনিন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তাঁর মতে, "সন্ত্রাসের ডাক বা কেবল অর্থনৈতিক সংগ্রামকে রাজনৈতিক চরিত্র দেওয়ার আহ্বান রুশ বিপ্লবীদের পক্ষে আজকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে গাফিলতির ত্রুটি ধরন মাত্র। সেই দায়িত্ব হলো ব্যাপক রাজনৈতিক প্রচার ও গণআন্দোলনের সংগঠন। * * * এতে প্রমাণ হয় যে সন্ত্রাসবাদী ও অর্থনীতি-বাদীরা উভয়েই জনগণের বিপ্লবকর্মকে কম মূল্য দেন * * * এবং একদল যেমন কৃত্রিম উত্তেজকের খোঁজ করেন, অন্যটি আবার শুধু 'সাফ সাফ' দাবির কথা তোলেন। কিন্তু উভয়েই রাজনৈতিক প্রচার ও উদ্ঘাটনের মধ্য দিয়ে নিজেদের কাজের বিকাশের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দেন না। আর বর্তমানে বা অন্য কখনোই তো আর কিছু দিয়ে এই কর্তব্যের দায় নির্বাহ করা যায় না।"[১] (ঐ, পৃষ্ঠা ৪২০-২১)

৩

'কি করতে হবে' বা 'what is to be done' বইটিতে লেনিনের সুবিন্যস্ত তত্ত্বকে, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের পক্ষে সামগ্রিক সমাজচেতনা ও সঙ্কীর্ণতামুক্ত গণভিত্তির প্রয়োজন সম্পর্কে লেনিনের সুস্পষ্ট নির্দেশকে বলা যায় বলশেভিক ভাবাদর্শের প্রাথমিক দলিল। কিন্তু আমাদের চরম দুর্ভাগ্য যে, আজ লেনিন শতবার্ষিকীর বছরে সেই প্রাথমিক নির্দেশগুলি দেশের রাজনীতি থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। ব্র্যাকেটে মার্কসের দোহাই দিয়ে যে-অন্ধ দলবাজি বা উৎকট ক্ষমতালিপ্সার কাণ্ড-কারখানা সমানে চলেছে, তার সঙ্গে মার্কস-লেনিনের চিন্তা ও বিপ্লব-তত্ত্বের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' গ্রন্থে নিঃবিত্ত শ্রেণীর একাধিপত্যের তত্ত্ব দিয়ে এই দল বাড়াবার উন্মাদনাকে সমর্থন করবার চেষ্টা নিছক সুবিধাবাদ ছাড়া আর কিছু নয়। বাঙলাদেশে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্টের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি কোনো নির্বিত্ত বিপ্লবোত্তর অভিজ্ঞতার সমতুল্য ছিল না। রাষ্ট্রীয় বিবর্তনের যে-পর্যায় ও কাঠামোর স্বীকৃতি যুক্তফ্রন্টের ভিত্তি, যুক্তফ্রন্টের জোরে ক্ষমতা হাতে পেয়ে কোনো পার্টি যদি সেই ভিতটাকেই ভাঙতে চায় তো সেই অপচেষ্টাকে রাজনৈতিক রাহাজানি ভিন্ন আর কোনো আখ্যা নিশ্চয়ই দেওয়া চলে না। ফলে আবার মেহনতী মানুষের শক্তি ও চৈতন্যের যে-অগ্রগামী প্রেরণা যুক্তফ্রন্টের প্রাণ, তার ওপরে আজ মারাত্মক অনৈক্য ও উন্মত্ত দলবাজির বিভীষিকা নেমে এসেছে। প্রতিক্রিয়ার শক্তি যে এর পুরো সুযোগ নিতে তৎপর হবে তা সহজেই অনুমেয়।

আর লেনিন তো কোনোদিন নির্বিত্তের নেতৃত্বের ব্যাপারটাকে অর্থনীতি-বাদের কর্মসূচীতে মিলিয়ে দেননি। এখানে ব্রাকেটে মার্কসবাদীদের কর্ম-ধারায় কিন্তু অর্থনীতিবাদ থেকে উত্থিত দাবিদাওয়াই প্রায় সর্বত্র জুড়ে রয়েছে। একদিকে কথায় কথায় বিপ্লবের তত্ত্ব, অন্যদিকে শুধু অর্থনীতিবাদের কর্মসূচী, এর প্রতিক্রিয়াতে হয়তো খানিকটা নবীন মনের ধৈর্যহীনতার ঝোঁকেই নকশালবাড়ির ভাবাদর্শের সূচনা ও প্রসার ঘটতে পেরেছে। সে-ক্ষেত্রে চরম অব্যবস্থা সমানে চলবে। বেকার সমস্যা প্রচণ্ড হয়ে উঠবে। সারা সমাজে অন্তহীন অনাচারে মনুষ্যত্বের চিহ্ন থাকবে না, অথচ 'বিপ্লবী' পার্টি 'বিপ্লবী' গণপ্রতিষ্ঠান তরুণদের সামনে কোনো সদর্থক পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ উপস্থাপিত না করে কেবল বিপ্লবের বুলি বা অন্য কোনো অসার নীতিকথার ভণ্ডামি সমানে চালিয়ে যাবে — পনেরো-ষোল থেকে বিশ-বাইশের শরীর-মন তার প্রতিবাদে

ক্ষেপে উঠেছে — এর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নেই। আর গত বিশ বছরের বাঙলার ইতিহাসে এই প্রতিবাদের, অস্থিরতার কারণগুলি কি পরিমাণে জমে উঠেছে তা বুঝবার জন্য খুব দুরূহ কোনো গবেষণার দরকার করে না। অবশ্য সেই মরিয়া প্রতিবাদেরও কোনো উপযুক্ত নেতৃত্ব নেই, কোনো বিজ্ঞান নেই, তা কেবল সন্ত্রাসের কাণ্ড-কারখানায় বীভৎস থেকে বীভৎসতর চেহারায় প্রকাশ পাচ্ছে। শিগগিরই হয়তো এদের দমনের জন্য পুলিশ বা এমন কি সামরিক শক্তির দ্বিধাহীন প্রয়োগ অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়াবে।

কিন্তু কেন এই বিদ্রোহী তরুণ মন গণমানসের, গণআন্দোলনের ব্যাপ্তিতে নিজেকে সংলগ্ন করতে পারল না? কেন তা শুধু এক ইতিহাস-ভূগোল-বিচ্ছিন্ন কেরার কৃষক বিপ্লবের কল্পনা ছাড়া সমাজদেহে আর কোনো অবলম্বন খুঁজে পেল না? তার উত্তরে তথাকথিত (মার্কসবাদী) রাজনীতির একটি মূল বিকৃতির কথা বিস্মৃত হওয়া অনুচিত। সেই স্বীকৃতির পরেই আমরা নূতন করে লেনিনের পথনির্দেশ বুঝবার চেষ্টা করতে পারি। নির্বিত্তশ্রেণীর রাজনীতিকে ঐ (মার্কসবাদী) নেতৃত্ব অর্থনীতিবাদের গণ্ডি ছাড়িয়ে একটা বৃহত্তর সামাজিক তথা জাতীয় তাৎপর্যে অধিষ্ঠিত করেননি। গান্ধীজী যে বুর্জোয়াসির নেতা ছিলেন তা তো মার্কসবাদী মহলে সুবিদিত। এটা বেশি বুঝে ফেলায় অন্য একটি প্রয়োজন কোনোদিনই ভারতবর্ষের মার্কসবাদীদের কাছে বড় হয়ে উঠল না। নিজের ভাবাদর্শ অনুযায়ী গান্ধীজী ভারতের সাধারণ দরিদ্র মানুষের ইমানকে দেশের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। আমাদের মার্কসবাদ কি এখনও তা পেরেছে? তাই ক্রোধের নেতিত্বে আজ নকশালপন্থী তরুণেরা 'বুর্জোয়া' গান্ধীর ছবি পোড়াচ্ছে, কিন্তু সার্থক মার্কসবাদী লেনিনবাদী নেতৃত্বের সন্ধান পায়নি, সন্ত্রাসের অনাসৃষ্টিকে বিপ্লবের পরাকাষ্ঠা মনে করছে।

বলশেভিজমের সূচনায় লেনিন রাজনীতির যে-সামাজিক ব্যাপ্তির কথা অত জোর দিয়ে বলেছিলেন তা বাদ দিয়ে ক্ষমতার লড়াই নির্বিত্তের রাজনীতিকেও পেটিবুর্জোয়া বিকৃতিতে ডুবিয়ে দেয়। মেহনতী মানুষের ইমানের জোরকে, সমাজকে ভেঙে গড়ার ব্যাপারে তার সর্বব্যাপী ভূমিকাকে, গণআন্দোলন প্রচার ও শিক্ষায় সুস্পষ্ট করে তুলবার দায়িত্ব সর্বাগ্রগণ্য। তা না করে নির্বিত্তকে কেবল মজুরির পাওনাদার বানিয়ে ফেললে লেনিনের রাজনীতি আয়ত্তাতীত থেকে যায়। আর পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্টের

পতনের অভিজ্ঞতায় তো সেই পেটিবুর্জোয়া বিকৃতিতে ভরাডুবি প্রকট হয়ে উঠল। রাজনৈতিক শিক্ষাবিহীন, শৃঙ্খলাহীন জনতার যথেচ্ছাচারকেই মার্কসবাদের স্বরূপ বলে প্রচারের সুযোগ (মার্কসবাদী) নেতৃত্বই করে দিলেন।

'কি করতে হবে' বা 'What is to be done'-এর পটভূমির সঙ্গে আমাদের একটি সাদৃশ্যের ব্যাপার আদৌ উপেক্ষণীয় নয়। অর্থনীতিবাদ ও সন্ত্রাসবাদের গোলোকধাঁধায় ঘুরে ঘুরে আমাদের বামপন্থী নেতৃত্বের বিরাট অংশ প্রচণ্ড এক সত্তা-সঙ্কটের চাপে বিপথচারী হয়ে পড়েছেন। অনুন্নত অর্থনীতি ও প্রচণ্ড দারিদ্র্যের দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা আমাদের এক নিদারুণ সত্য। গণতন্ত্র ও শিল্পোন্নয়নের কয়েকটি প্রাথমিক দায়িত্ব এ-দেশে বুর্জোয়াসি নিজের নেতৃত্বে সমাধা করতে পারেনি। সেই ঐতিহাসিক ব্যর্থতার পরিচয় দিনের পর দিন প্রকট হয়ে উঠছে। এই পরিস্থিতিতে শ্রমিক-শ্রেণীর নেতৃত্ব ও তার পুরো সামাজিক ভূমিকা বিপুল ঐতিহাসিক গুরুত্ব অর্জন করে, যে-গুরুত্বের চেতনা 'What is to be done'-এর যুগান্তকারী তত্ত্বে গ্রথিত হয়ে আছে।

অন্যপক্ষে গণতন্ত্রের যে-সুযোগ এ-দেশে এখনও পুরোপুরি হারিয়ে যায়নি তাকে ক্রমাগত শুধু সঙ্কীর্ণ দলীয়তা ও অর্থনীতিবাদের পেটিবুর্জোয়া কাণ্ডজ্ঞানহীনতায় ডুবিয়ে দিলে স্বৈরতন্ত্র ও চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়ার সর্বময় প্রতিপত্তি খুব দূরের ব্যাপার হয়ে থাকবে না। বিশ্ব-প্রতিক্রিয়ার পালের গোদা আমেরিকাও এসব ব্যাপারে নিশ্চেষ্ট দর্শক নয়। সেই সর্বনাশের সম্ভাবনা রুখবার জন্যই আজ আমাদের লেনিনের তত্ত্ব ও কর্মের সঠিক পথনির্দেশ অনুযায়ী অগ্রসর হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। দারিদ্র্যের দুঃখীদশার মধ্যেও নির্বিত্ত মানুষ কোনো প্রলোভন বা অনুশাসনে নিজের ঐতিহাসিক শক্তির ক্লীবত্ব স্বীকার করবে না এবং ইতিহাস-চেতনায় সমৃদ্ধ নেতৃত্বের শিক্ষা-দীক্ষা ও প্রেরণায় তার মধ্যে বৈপ্লবিক আত্মপ্রকাশের ঐশ্বর্য ভাস্বর হয়ে উঠবে। তাই হলো মার্কসবাদী রাজনীতির সার কথা। বৈপ্লবিক আত্মপ্রকাশের মানে আড়ালে-আবডালে সন্ত্রাসের হুমকি দেওয়া নয়, গোটা সমাজে গণজীবন ও মনের স্তরে স্তরে প্রতিবাদী চেতনা ও সংগ্রামের প্রসারেই তার বিপুল কর্মধারা গড়ে ওঠে। শ্রেণীসংগ্রামের প্রতিটি পর্যায়ে একটা কালোচিত প্রাগ্রসর সামাজিকতার প্রতিবাদী প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে

চলার সামর্থ্যে কমিউনিস্ট আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য। লোক-সমাজের দিনানুদৈনিক প্রতিটি ব্যাপারের সঙ্গে সেই প্রস্তাব ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট, তা কখনোই শুধু টাকার সঙ্গে পয়সা জুড়বার (লেনিন যাকে "adding kopeks to rouble" বলে বারবার কঠোর সমালোচনা করতেন) ব্যক্তিগত শ্রেণীগত বা দলগত আন্দোলন নয়।

নির্বিত্ত মানুষকে তার ইমানের উপকর্ষ থেকে বিচ্যুত করে, তার সামাজিক ভূমিকা থেকে উৎসাদিত করে, অথচ সেই মানুষের দারিদ্র্য-জনিত বিক্ষোভকে ক্ষমতাবিস্তারের কাজে লাগাবার রাজনীতি ফ্যাসিস্ত প্রতিবিপ্লবের মতাদর্শে মিলে যায়। তার সঙ্গে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের কোনো সম্পর্ক নেই। একটা তুলনা দিয়ে এই বক্তব্য শেষ করতে চাই। বের্টোল্ট ব্রেখট-এর 'থ্রি পেনি অপেরা'য় সেই পিচাম নামে লোকটি ভিক্ষুকাশ্রমের ব্যবসায়ে প্রচুর বৈভব ও প্রতিপত্তি লুটেছিল। নাটকের প্রথমে একটি বক্তৃতায় সে মানুষের নিঃসহায় দারিদ্র্যকে নিজের কাজে লাগাবার ফন্দি আঁটছে। আজকের বাঙলাদেশে ব্রেখট হয়তো পিচামকে একটা আলগা টুপিও পরিয়ে দিতেন যাতে ব্র্যাকেটে মার্কস-এর নাম লেখা থাকত, কারণ ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, আমাদের তথাকথিত (মার্কসবাদী) নেতৃত্বের দলীয় স্বার্থবুদ্ধির বিকৃতি কোথায় যেন পিচাম-এর সমাজবিরোধী কদর্যতাতেই মিলে যাচ্ছে। আর ব্রেখটীয় আয়রনির অভিজ্ঞতার মতো কঠোর ও নির্মোহ এক আবিষ্কার সম্পূর্ণ না করলে আজ আর আমরা মার্কস-লেনিনের সঠিক পথনির্দেশ ও বিপ্লবী মনুষ্যত্বের রাজনীতিতে উত্তীর্ণ হতে পারব না।

লেনিন ও বিজ্ঞানচিন্তা

জয়ন্ত বসু

রাজনীতি ও অর্থনীতিতে ভি. আই. লেনিনের অসামান্য অবদান সুবিদিত। কিন্তু তাঁর আশ্চর্য প্রতিভা বিজ্ঞানচিন্তার* ক্ষেত্রেও যে ভাস্বর হয়ে দেখা দিয়েছিল, তা আমরা অনেকেই সম্যক উপলব্ধি করি না। লেনিনের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির থিসিসে সঠিকভাবেই বলা হয়েছে, "লেনিন তাঁর শতাব্দীর সেই প্রথম চিন্তানায়ক, যিনি তাঁর সমসাময়িক প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের কৃতিত্বের মধ্যে বিজ্ঞানের বিরাট বৈপ্লবিক পরিবর্তনের আভাস দেখতে পেয়েছিলেন, যিনি মহান বিজ্ঞানসাধকদের মৌলিক আবিষ্কারের বৈপ্লবিক তাৎপর্য উদ্‌ঘাটন ও দার্শনিক দিক থেকে তার সাধারণীকরণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অগ্রসর ক্ষেত্রগুলিতে প্রচণ্ডভাবে 'নীতি লঙ্ঘন'-এর যুগে বৈজ্ঞানিক তথ্যের চমকপ্রদ ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছিলেন।" লেনিন কোনো বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেননি, কিন্তু বিজ্ঞানের সঙ্গে দর্শনের যে-নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে—যার সন্ধান দিয়েছিলেন কার্ল মার্কস ও বিশেষভাবে ফ্রেড্‌রিক এঙ্গেলস — নতুন বৈজ্ঞানিক তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে তার পুনর্মূল্যায়ন করে লেনিন তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। বিজ্ঞান থেকে দর্শনের ক্ষেত্রে কি শিক্ষা লাভ করা যায় এবং দার্শনিক মতবাদ আবার কি করে বিজ্ঞানচিন্তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে, তাঁর 'Materialism and Empirio-criticism,' 'Philosophical Note Books' ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে আমরা তার নির্দেশ পেতে পারি।

বিজ্ঞানের প্রয়োগের ক্ষেত্রেও লেনিন নতুন চিন্তাধারার প্রবর্তক। বিজ্ঞান

*বিজ্ঞান বলতে সাধারণত আমরা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে বোঝাই, সামাজিক বিজ্ঞানকে এর অন্তর্ভুক্ত হিসাবে ধরি না। এই প্রবন্ধেও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের কথাই কেবল আলোচনা করা হবে।

ও কারিগরীবিদ্যাকে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কাঠামোয় যথাযথভাবে স্থাপন করার যে-রীতি তিনি প্রবর্তন করেন, তা পরবর্তী যুগে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশের অর্থনীতিকেই বিপুলভাবে প্রভাবান্বিত করেছে।

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ ও বিজ্ঞান

দর্শনের মূল ধারা দুটি — বস্তুবাদ ও ভাববাদ। লেনিন এটা পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, দর্শনের যে-কোনো সামগ্রিক মতবাদকে যে-নামেই অভিহিত করা হোক-না-কেন, তা মূলত ঐ-দুটি ধারার একটির অন্তর্ভুক্ত হবে। এখন দেখা যাক ঐ ধারা দুটির প্রধান বক্তব্য কি।

যদি বলা যায় যে, বিশ্বজগতের বাস্তব অস্তিত্ব আছে এবং আমাদের ধারণা বা চিন্তা-নিরপেক্ষভাবেই তা বর্তমান, তবে তা হবে বস্তুবাদ। সেক্ষেত্রে আমাদের অনুভূতি, ধারণা ইত্যাদি হলো আমাদের মনের মুকুরে বহির্জগতের একরকম প্রতিফলন। আর যদি আমরা বলি যে, আমাদের ধারণাই হচ্ছে প্রাথমিক বিষয় এবং বহির্জগতের প্রতিটি বস্তুই প্রকৃতপক্ষে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ধারণার সমষ্টি, তবে তা হবে ভাববাদ; এই মতবাদ অনুযায়ী আমাদের ধারণায় যা নেই, তার কোনো বাস্তব অস্তিত্বও নেই।

বৈজ্ঞানিক তথ্যের বিশ্লেষণ করে লেনিন দেখিয়েছেন যে, বিজ্ঞান বস্তুবাদকেই সমর্থন করে। এই প্রসঙ্গে দু-একটি উদাহরণের উল্লেখ করা যেতে পারে। বিজ্ঞান বলে যে, এই পৃথিবীতে মানুষের জন্ম হয়েছে কয়েক লক্ষ বছর আগে কিন্তু পৃথিবীর জন্ম হয়েছে কয়েকশো কোটি বছর আগে। অর্থাৎ মানুষের (ও সেইসঙ্গে তার মনের) জন্মের অনেক আগেই পৃথিবীর অস্তিত্ব ছিল। সুতরাং মানুষের মনের বাইরে বস্তুজগতের অস্তিত্ব বিজ্ঞানীরা স্বীকার করেন। এটা হলো সম্পূর্ণভাবে বস্তুবাদ সম্মত। লেনিন তাঁর 'Materialism and Empirio-criticism' নামক গ্রন্থে বলেছেন, "প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের একটি দ্বিধাহীন বক্তব্য হলো এই — পৃথিবী একসময় এমন একটি অবস্থায় ছিল যে, কোনো মানুষ বা অন্য কোনো প্রাণীর অস্তিত্ব তখন সেখানে ছিল না বা থাকতেও পারত না। জৈব পদার্থ হচ্ছে একটি পরবর্তী ঘটনা — দীর্ঘকালব্যাপী বিবর্তনের ফলস্বরূপ।…পদার্থই হলো প্রাথমিক এবং

চিন্তা, ধারণা ও অনুভূতির উৎপত্তি হয়েছে বিবর্তনের একটি অত্যন্ত উন্নত পর্যায়ে। জ্ঞানের বস্তুবাদসম্মত তত্ত্ব হলো এইরকম এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞান স্বাভাবিকভাবেই এটা স্বীকার করে।"

বর্তমানে আমরা জানি, পরমাণুর গঠন অনেকটা সৌরজগতের মতো— এর মাঝখানে রয়েছে একটি নিউক্লিয়াস ও তাকে প্রদক্ষিণ করছে এক বা একাধিক ইলেকট্রন। একশো বছর আগে কিন্তু মানুষের ধারণা ছিল যে, পরমাণু অবিভাজ্য ও এটাই পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা। সুতরাং ভাববাদ অনুযায়ী একশো বছর আগেকার পরমাণুতে নিউক্লিয়াস বা ইলেকট্রন ছিল বলে মনে করবার কোনো কারণ নেই। কিন্তু বিজ্ঞান বলে যে, পরমাণুর মধ্যে বরাবরই নিউক্লিয়াস ও ইলেকট্রন আছে — এইটাই প্রাথমিক ঘটনা। একশো বছর আগেকার মানুষের মনে সেই ঘটনাটি ঠিকভাবে প্রতিফলিত হয়নি। পরবর্তী যুগে মানুষ সেই ঘটনা জানতে পেরেছে — এই জানতে পারাটা একটি পরবর্তী ঘটনা। এখানেও বিজ্ঞানের বক্তব্য বস্তুবাদকে সমর্থন করে।

বস্তুবাদকে আবার দু-ভাগে ভাগ করা যায় — যান্ত্রিক বস্তুবাদ ও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ। যান্ত্রিক বস্তুবাদ অনুসারে কয়েকটি অমোঘ নিয়ম দ্বারা বস্তুজগৎ যান্ত্রিকভাবে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। ঐ নিয়মগুলি মানুষ জানতে পারলে বিশ্বজগতের গতি-প্রকৃতি একেবারে নির্দিষ্টভাবে সে নির্ধারণ করতে পারবে। এ-পর্যন্ত মানুষ যেসব নিয়ম জেনেছে, তাদের আর কোনো ব্যতিক্রম সম্ভব নয়। অপর পক্ষে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ অনুযায়ী বিশ্বজগৎ ক্রমাগতই পরিবর্তিত হচ্ছে। যে-কোনো ব্যবস্থার মধ্যে মূলত দুটি বিপরীত ধারার সমন্বয় রয়েছে; এর ফলে প্রতিটি ব্যবস্থার ভিতর যে-অন্তর্দ্বন্দ্ব থাকে, তাই হলো পরিবর্তনের মূল কারণ। পরিমাণগত পরিবর্তনের একটি বিশেষ ধাপে গুণগত পরিবর্তন ঘটে থাকে। প্রকৃতি সম্পর্কে কোনো চরম সত্য বা চরম নিয়ম মানুষের জানা নেই, তবে তার জ্ঞান ক্রমশই নিম্নতর থেকে উন্নততর সত্যে উন্নীত হচ্ছে।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় দ্বন্দ্বমূলক তত্ত্বের যে অভিব্যক্তি দেখতে পাওয়া যায়, এঙ্গেলস তাঁর 'Anti-Duhring' ও 'Dielectics of Nature' নামক দুটি গ্রন্থে তা ব্যাখ্যা করেছেন। এঙ্গেলস লিখেছেন, "দ্বন্দ্ববাদই হলো বর্তমান প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে চিন্তার সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ধরন কারণ প্রকৃতিতে

বিবর্তনের যে-প্রক্রিয়াদি ঘটছে, সাধারণভাবে যেসব পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে এবং অনুসন্ধানের এক ক্ষেত্র থেকে অন্য ক্ষেত্রে যেসব উত্তরণ হচ্ছে, সেইগুলির ব্যাখ্যার পদ্ধতি কেবলমাত্র দ্বন্দ্ববাদ থেকেই পাওয়া যেতে পারে।"

যা হোক, উনবিংশ শতাব্দীতে নিউটনীয় গতিসূত্র ইত্যাদি নিয়মাবলীতে বিজ্ঞানীদের এমন আস্থা জন্মে গিয়েছিল যে, তাঁরা ঐগুলিকে অলজ্ঘ্য বলে মনে করতেন; তাঁদের এই মনোভাব যান্ত্রিক বস্তুবাদকে সমর্থন করত। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ও বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে বিজ্ঞানে এমন অনেক নতুন তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয় যে, ঐসব নিয়মের অলজ্ঘনীয়তা সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের মত পাল্টাতে হলো। ফলে যান্ত্রিক বস্তুবাদ থেকে বিচ্যুত হয়ে তাঁরা অনেকেই ভাববাদের দিকে আকৃষ্ট হলেন। চিন্তাজগতের সেই সন্ধিক্ষণে লেনিন নতুন করে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের অবতারণা করলেন। বিজ্ঞানের নবলব্ধ জ্ঞানের বিশ্লেষণ করে তিনি দেখালেন যে, বিজ্ঞানচিন্তার জগতে যে-সমস্যা দেখা দিয়েছে, তার সমাধান ভাববাদের মধ্যে নেই, তবে যান্ত্রিক বস্তুবাদের মধ্যেও নেই, আছে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মধ্যে।

১৯০৮ সালে লেনিন 'Materialism and Empirio-Criticism' গ্রন্থটি রচনা করেন। ঐ সময়টা ছিল আপেক্ষিকতা তত্ত্ব ও কোয়াণ্টাম বলবিদ্যার গোড়ার যুগ। এটা উল্লেখযোগ্য যে, সনাতনী পদার্থবিদ্যায় বিশ্বাসীদের সঙ্গে লেনিন একমত হননি, তিনি সমর্থন করেছিলেন বিজ্ঞানের নতুন প্রবক্তাদের।

পদার্থের যেসব ধর্ম আগে স্বীকৃত ছিল, ঐ সময় দেখা গেল তাদের অনেকগুলি সঠিক নয় — দেখা গেল পদার্থকণা পরমাণু অবিভাজ্য নয়, গতিশীল বস্তুর ভর অপরিবর্তনীয় থাকে না, ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে লেনিন তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, "দার্শনিক বস্তুবাদ পদার্থের যে একটিমাত্র 'ধর্মের' স্বীকৃতির সঙ্গে জড়িত, তা হলো এর বাস্তব সত্য হওয়ার ধর্ম, আমাদের মনের বাইরে এর অস্তিত্বের ধর্ম।···অপরিবর্তনীয় উপাদান, 'দ্রব্যের অপরিবর্তনীয় সারবস্তু' ইত্যাদির স্বীকৃতি বস্তুবাদ নয় — এটা হলো আধ্যাত্মিক অর্থাৎ দ্বন্দ্বমূলক-এর বিপরীত বস্তুবাদ।" ডিয়েৎজেন যে বলেছিলেন, "বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু অপরিসীম," কেবল অসীম বিশ্বেই নয়, "ক্ষুদ্রতম পরমাণুর" ভিতরেও অশেষ রহস্য রয়েছে, লেনিন সেই বক্তব্যকে সমর্থন করে লেখেন যে, কেবল পরমাণুই নয়, ইলেকট্রন সংক্রান্ত জ্ঞাতব্য বিষয়েরও অন্ত নেই। পরমাণু-বিজ্ঞানের ক্রমোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে লেনিনের দৃষ্টিভঙ্গী সমর্থিত হচ্ছে। পরমাণু-কেন্দ্রকের

মধ্যে প্রোটন, নিউট্রন, মেসন ও নিউট্রিনোর অস্তিত্ব, ঐ কেন্দ্রকের বিভাজন বা সংযোজন প্রক্রিয়া, ইত্যাদি বিভিন্ন আবিষ্কার পরমাণুর অন্তহীন রহস্যেরই ইঙ্গিত দেয়। ইলেকট্রন, প্রোটন প্রভৃতি কণার মৌলিকত্বেও বিজ্ঞানীরা এখন সন্দিহান হয়েছেন — কোয়ার্ক তত্ত্বে 'আরও মৌলিক' কণার অবতারণা করা হচ্ছে।

লেনিন লিখেছেন, "পদার্থের গঠন ও ধর্মবিষয়ক প্রত্যেকটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বই যে আপেক্ষিক ও একেবারে নিখুঁত নয়, এই কথাটি দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ জোর দিয়ে বলে ; প্রকৃতিতে চরম সীমা বলে যে কিছু নেই, আমাদের কাছে আপাতদৃষ্টিতে সামঞ্জস্যহীন মনে হলেও গতিশীল পদার্থ যে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তরিত হতে পারে, ইত্যাদি বিষয়গুলিও ঐ বস্তুবাদ জোর দিয়ে বলে থাকে।" গত কয়েক দশকে বিজ্ঞানের যে অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে, তার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে লেনিনের অভিমতের যথার্থ্যই প্রমাণিত হয়। কারণ এটা স্পষ্টই বোধগম্য হচ্ছে যে, বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ক্রমশ উন্নত হলেও তাঁর মধ্যে কিছু-না-কিছু অসম্পূর্ণতা থেকে যাচ্ছে। লেনিন তাঁর পুস্তকে তদানীন্তন ধারণা অনুযায়ী ইথারের অস্তিত্বের কথা বলেছেন। নির্গুণ স্থানে সর্বত্রব্যাপী যে-ইথার-এর ধারণা, পরবর্তী যুগে বিজ্ঞানে তা বর্জিত হয়েছে, আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব অনুসারে স্থান-কাল ব্যবস্থার জ্যামিতিক ও ভৌত ধর্ম স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু কয়েকটি ঘটনায় ঐ তত্ত্বের আশ্চর্য সাফল্য পরিলক্ষিত হলেও স্থান ও কালের কাঠামোয় বিদ্যুচ্চুম্বকত্বকে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হচ্ছে না। এই থেকে বোঝা যায় যে, বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব অত্যন্ত উন্নত হলেও তার মধ্যে অসম্পূর্ণতা থাকছেই।

সাম্প্রতিক কালে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যে-অগ্রগতি হয়েছে, তা থেকে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের সমর্থন পাওয়া যায়। আণবিক জীববিদ্যায় গবেষণার ফলে এটা ক্রমশ জানতে পারা যাচ্ছে যে, প্রাণের উদ্ভবের পিছনে কোনো অলৌকিক শক্তি নেই, বহুসংখ্যক অণুর বিশেষ ধরনের সমন্বয়ের ফলেই প্রাণের উৎপত্তি হয় — পরিমাণগত পরিবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তনে রূপান্তরের এটি একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। জে. ডি. বার্নালের 'Science in History' নামক গ্রন্থে আধুনিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকের যে-আলোচনা করা হয়েছে, তাই থেকে আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের সামঞ্জস্য উপলব্ধি করা যায়।

বিজ্ঞানের প্রয়োগ

আমাদের দেশে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সঙ্গে আমরা এখন সুপরিচিত। বর্তমান বছর চতুর্থ পরিকল্পনার দ্বিতীয় বছর। অনেকে অবশ্য একে 'পরী-কল্পনা' বলে মনে করেন। তা সে যাইহোক, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার গোড়াপত্তন হয় ১৯২৮ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে। এই ধরনের পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হলো, দেশের সামগ্রিক শক্তিকে সুসংবদ্ধ করে এবং বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যার সুষ্ঠু প্রয়োগে কৃষি, শিল্প ও সাধারণভাবে জীবিকার মানের দ্রুততম উন্নতি সাধন। এই যে সময়-সীমিত সামগ্রিক পরিকল্পনা, এর ধারণার সূত্রপাত করেন লেনিন ১৯১৮ সালে।

আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে উৎপাদনের জন্যে বিদ্যুৎশক্তির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে অক্টোবর বিপ্লবের মাত্র পাঁচ মাস পরেই লেনিন 'গোয়েলরো পরিকল্পনা' উপস্থাপিত করেন ; এর উদ্দেশ্য ছিল, সোভিয়েত ইউনিয়নে ব্যাপক ও বিস্তৃতভাবে বৈদ্যুতিকরণ করা। সাম্রাজ্যবাদীক আক্রমণ ও গৃহযুদ্ধের ফলে এই পরিকল্পনার রূপায়ণ শুরু হতে দু-বছর দেরি হয়ে যায়। পরিকল্পনা রূপায়ণের সময় বিজ্ঞানের সবথেকে আধুনিক প্রয়োগ-পদ্ধতি ব্যবহার করার জন্য লেনিন সুপারিশ করেন।

গোয়েলরো পরিকল্পনা সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বহু বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনীয়ার এটিকে সপ্রশংস অভিনন্দন জানান। আমেরিকার খ্যাতনামা ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনীয়ার চার্লস স্টেইনমেজ এর ভূয়সী প্রশংসা করে লেনিনকে একটি চিঠিতে লেখেন যে, ঐ পরিকল্পনার রূপায়ণে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক।

তবে অনেকের ঐ সময় ধারণা ছিল যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো অনগ্রসর দেশে ব্যাপক বৈদ্যুতিকরণের প্রকল্প সাফল্য অর্জন করতে পারবে না। ১৯২০ সালে রাশিয়া সফরের পর এইচ. জি. ওয়েলস গোয়েলরো পরিকল্পনাকে 'ইলেকট্রিসিয়ানদের কল্পনাবিলাস' বলে বর্ণনা করেন। এর উত্তরে লেনিন বলেছিলেন, "দশ বছরের মধ্যে রাশিয়ায় আমরা কি করেছি, আবার এসে দেখে যাবেন।" সমাজব্যবস্থা উপযুক্ত হলে বিজ্ঞানের যথাযথ প্রয়োগে প্রায় অসম্ভবকেও যে সম্ভব করে তোলা যায়, লেনিন তা ভালভাবেই জানতেন।

প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীরা ও লেনিন

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

লেনিনের সঙ্গে প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের সংযোগ কবে প্রথম স্থাপিত হয় তা এখনও আমাদের স্পষ্টভাবে জানা নেই, যদিও তা নিয়ে ভারতবর্ষে, রাশিয়ায় ও অন্যত্রও ইতিহাস-গবেষকরা তন্ন-তন্ন করে খোঁজ করে চলেছেন। তবে ১৯০৭-এ স্টুটগার্ট-এ অনুষ্ঠিত বিশ্ব-সমাজতন্ত্রী মহাসম্মেলনের আগে যে লেনিনের সঙ্গে কোনোও ভারতীয় বিপ্লবীর প্রত্যক্ষ সংযোগ হয়নি, তা একরকম সুনিশ্চিত। স্টুটগার্ট-এর মহাসম্মেলনে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাট দলের প্রতিনিধিদের মধ্যে লেনিন ও গর্কি উপস্থিত ছিলেন। আর, ভারতবর্ষের মুক্তি-আন্দোলনের তরফ থেকেও এই সর্বপ্রথম একটি প্রতিনিধি দলও স্টুটগার্ট-এ গিয়েছিলেন, যার নেতা ছিলেন প্রসিদ্ধ পার্শী দেশনেত্রী রুস্তমজী কামা এবং সদস্য ছিলেন সর্দার সিং রাণা ও সম্ভবত বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। মাদাম কামার সঙ্গে নিশ্চিত গর্কির এবং সম্ভবত লেনিনের দেখা হয় এই মহাসম্মেলনে।

বহুকাল পরে, ঐযুগের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন :

"লেনিন (স্টুটগার্ট) কংগ্রেসে প্রদত্ত তাঁর প্রথম রিপোর্টে কোনোও নামের উল্লেখ না করে, ভারতীয় প্রতিনিধিদলের উপস্থিতির কথার প্রসঙ্গটি বলেন। আর রুস্তমজী কামাও লেনিন ও রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের কথা আমাদের বলেন। বিশেষত তিনি জোর দেন জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের প্রশ্নে লেনিন যে-মনোভাব দেখিয়েছিলেন, তার উপর…।" [১]

স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আরও লিখেছেন : "আমি প্রথম লেনিনের নাম শুনি ১৯১০-এর গ্রীষ্মকালে…। কিন্তু ভবিষ্যতে সমাজতন্ত্রের অগ্রগতিতে লেনিন যে-ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করবেন, তা আমরা কেউই কখনও বুঝতে পারিনি।" [২]

মাদাম কামা ও 'চট্টো' উভয়েই ১৯১০-এ সমাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকেছেন। মাদাম কামা তো ফরাসী সমাজতন্ত্রী দলে যোগদানই করেছেন এবং তাঁর নিবিড় বন্ধুত্ব ছিল ফরাসী সমাজতন্ত্রীদের বামপন্থী শাখার ও 'লুম্যানি'তে পত্রিকা-গোষ্ঠীর সঙ্গেই। আর একজন প্রসিদ্ধ প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী লালা হরদয়াল ও ১৯১১-১২তে সমাজতন্ত্রের দিকে গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকায় তাঁর লেখা কার্ল মার্কস-এর জীবনী প্রকাশিত হয় এই সময়ই। ১৯১১তে হরদয়াল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যান ও 'ইনডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কার্স অফ দি ওয়ার্ল্ড' নামে বামপন্থী শ্রমিক সংগঠনের অনুরোধে তাদেরই সংগঠক হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্লাভ-শ্রমিকদের মধ্যে সমাজতন্ত্রের সপক্ষে বক্তৃতা করে ঘুরতে থাকেন। সানফ্রান্সিসকোর আদিতম মার্কসবাদী পাঠচক্রে একজন বাঙালি ছাত্রের নামও পাওয়া যাচ্ছে ১৯১১তে.— গিরীন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ইনি কে, কোনোও পলাতক বিপ্লবীর ছদ্মনাম কিনা — এ সব তথ্য অবশ্য এখনও আমরা জানি না। গণতান্ত্রিক জার্মানির খ্যাতনামা গবেষক ডঃ হর্স্ট ক্রুগার এ-বিষয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অনুসন্ধান চালাচ্ছেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ভারতীয় বিপ্লবীরা বার্লিনকে সদর-ঘাঁটি করে মুক্তি-প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। তখন তাঁরা যে-চুক্তি জার্মান সরকারের সঙ্গে করেন (বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়েরই নেতৃত্বে), তার ১০ নং ধারায় লেখা হয় ঃ

"আমাদের বিপ্লব সফল হইলে ভারতে সাম্যবাদী প্রজাতন্ত্র শাসন প্রবর্তন করা আমাদের অভিপ্রেত হইবে··· ।" ৩

১৯১৭তে ভারতীয় বিপ্লবীরা স্থইডেনের রাজধানী স্টকহোমে তাঁদের সদর-ঘাঁটি সরিয়ে আনলেন। স্থইডেনে তখন যিনি ইংরেজ সরকারের রাষ্ট্রদূত ছিলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ লণ্ডনে গোপন তার পাঠিয়ে জানালেন ঃ

"বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়-এর নেতৃত্বে একদল ভারতীয় জাতীয়তাবাদী বার্লিন থেকে এসে পৌঁছেছেন। এক সাক্ষাৎকারে চট্টোপাধ্যায় বলেছেন যে, শান্তির সপক্ষে প্রচার করতে তিনি আসেননি। তিনি ইংরেজদের নিয়ন্ত্রণ-মুক্ত স্বাধীন ভারত গড়বার কাজেই এসেছেন। আমার খবর হচ্ছে যে... এদের মূল উদ্দেশ্য হলো লেনিন ও অন্যান্য ইংরেজ-বিরোধী চরমপন্থী রুশ বিপ্লবীদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে জোরদার করবার জন্য সচেষ্ট হওয়া।" ৪

বহুযুগ পরে বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁর স্মৃতিকথায়ও লিখছেন ঃ

"১৯১৭ সালের গোড়ায় আমি যখন স্টকহোমে এলাম, তখন…লেনিন তখনও স্টকহোমে আছেন কিনা আমি তা জানতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমি শুনে হতাশ হলাম যে লেনিন সুইডেন ছেড়ে রাশিয়ার দিকে রওনা হয়েছেন।" ৫

১৯১৭র সেপ্টেম্বর মাসে 'চট্টো' পেট্রোগ্রাড সোভিয়েতের মেনশেভিক নেতৃত্বের কাছে একটি বার্তা পাঠান। তাতে তিনি লেখেন যে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে, পদানত জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে, মেনশেভিকদের মনোভাব গভীর হতাশা-ব্যঞ্জক। তার জায়গায় বলশেভিকদের মতামত খুবই ইতিবাচক এবং আশাপ্রদ। ১৯১৮র গোড়ায় বলশেভিক সরকার 'চট্টো'কে সোভিয়েতে আমন্ত্রণ করে।

ইতিমধ্যে ১৯১৭র নভেম্বর মাসেই, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত ভারতীয় বিপ্লবী সঙ্ঘ গদর পার্টির সভাপতি, লেনিন ও সোভিয়েত রুশকে অভিবাদন জানিয়ে এক তার পাঠান। অনুরূপ অভিবাদন জানান কাবুলে অবস্থিত ভারতীয় বিপ্লবী সরকারের প্রধানেরা — মৌলানা বরকতুল্লাহ, রাজা মহেন্দ্র-প্রতাপ ও মৌলানা ওবেইদুল্লাহ সিন্ধী। মেক্সিকো থেকে রুশ-বিপ্লব ও লেনিনকে অভিবাদন জানিয়ে, সমাজতন্ত্রী দলের একাংশ-এর নেতৃত্ব করে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত নেন, পলাতক ভারতীয় বিপ্লবী নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য — যিনি মানবেন্দ্রনাথ রায় নামেই সমধিক পরিচিত। ফিজি দ্বীপে বাগিচা শ্রমিকদের ভারতীয় নেতা ডাঃ মণিলালও এই সময়ই নিজেকে লেনিনের সমর্থক বলে ঘোষণা করেন। প্রবাসী শিখ-বিপ্লবীদের অনেকে এবং বহু প্রবাসী বাঙালী ছাত্রও এই সময়ে (১৯১৯-২১) গভীরভাবে রুশ-বিপ্লবের দিকে প্রভাবিত হন, লেনিনের বিপ্লবী চিন্তাধারার মাধ্যমেই।

১৯১৯-এর প্রথমার্ধে বরকতুল্লাহ, মহেন্দ্রপ্রতাপ প্রভৃতির সঙ্গে লেনিনের সাক্ষাৎ হয়। তার অল্পদিনের মধ্যেই তাসখন্দ থেকে বরকতুল্লাহ উর্দু ভাষায় একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন, যাতে তিনি লেখেন :

"রুশ-দিগন্তে আজ স্বাধীনতার যুগ আরম্ভ হয়েছে, আর সারা পৃথিবীর মানুষকে মহিমামণ্ডিত, অপূর্ব সৌভাগ্যের আস্বাদন দিয়ে, সূর্যের মতো আলো বিকীরণ করেছেন লেনিন।" ৬

১৯২০তে রুশদেশে পৌঁছলেন আরও কয়েকজন ভারতীয় বিপ্লবী — মানবেন্দ্রনাথ রায়, অবনী মুখোপাধ্যায়, নলিনী গুপ্ত, তিরুমল আচারিয়া, মহম্মদ শেফিক, মহম্মদ আলি, মহম্মদ রফিক প্রভৃতি। ১৯২০-রই ১৭ই

অক্টোবর এঁদের কয়েকজন মিলে তাসখন্দ-এ একত্রিত হয়ে প্রতিষ্ঠা করলেন "ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি"—প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হলেন মানবেন্দ্রনাথ রায় তাঁর স্ত্রী এভেলীন, অবনী মুখোপাধ্যায়, তাঁর স্ত্রী রোজা, মহম্মদ আলি, মহম্মদ শফিক ও তিরুমল আচারিয়া। শফিক নির্বাচিত হলেন পার্টির সম্পাদক।" ৭

ইতিমধ্যে বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, বীরেন দাশগুপ্ত প্রভৃতি বার্লিনস্থ ভারতীয় বিপ্লবীরাও সরাসরি যোগাযোগ করেছেন লেনিনের সঙ্গে। 'চট্টো' প্রস্তাব করলেন যে জাতীয়তাবাদী ও কমিউনিস্ট সহ সমস্ত প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের একত্র করে একটি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সঙ্ঘ গড়ে তোলা হোক, যার নেতৃত্ব অবশ্যই থাকবে কমিউনিস্টদেরই হাতে। এই সংগঠনের কার্যসূচীতে জোর দেওয়া হবে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংস সাধনের উপর এবং ভিত্তি হবে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য। লেনিন সোৎসাহে 'চট্টো'র এই প্রস্তাবকে সমর্থন জানালেন এবং চট্টোকে সদলবলে মস্কো আসার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন।

মস্কো থেকে ফিরে চট্টো ও ডাঃ দত্ত ভারতে বিপ্লবীদের কাছে এই নবযুগের বার্তা পাঠাতে চাইলেন। ১৯২২-এ বাঙলাদেশের এক বামপন্থী বিপ্লবী সাপ্তাহিকে "লক্ষ্য কি?" শিরোনামা দিয়ে ডাঃ দত্তের একটি খোলা চিঠি বের হলো। তাতে তিনি লিখলেন ঃ

"গণবৃন্দের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তিই আমাদের আদর্শ হইবে··· তবেই তাহারা আমাদের সহায় ও সম্পদ হইবে। দেশের মুক্তিকামীদের এখন কার্ল মার্কস ও ম্যাস মুভমেণ্টের চর্চ্চা করিতে হইবে।" ৮

১৯২১-এ মানবেন্দ্রনাথ রায়ের দূত হিসেবে নলিনী গুপ্ত এবং ১৯২২-এ বার্লিন-গোষ্ঠীর দূত হিসেবে অবনী মুখোপাধ্যায় ভারতে আসেন—অবশ্যই আত্মগোপন্ করে। ১৯২১-এ আহমেদাবাদে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনে, মানবেন্দ্রনাথ রায় ও অবনী মুখোপাধ্যায়-এর যুক্ত স্বাক্ষর বহন করে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম রাজনৈতিক কর্মসূচী প্রকাশিত হয়—পূর্ণ স্বাধীনতা, গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্র ও কৃষকের হাতে জমি চাই। প্রতিটি ছত্রে-ছত্রেই লেনিন-চিন্তাধারার উজ্জ্বল ছাপ।

এই ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে লেনিন ব্যবহার করেছিলেন স্নেহশীল অগ্রজের মতো। অবনী মুখোপাধ্যায় মালাবারে মোপলা কৃষকবিদ্রোহের

উপর একটা চটি বই লিখে লেনিনকে পড়তে দিয়েছিলেন। গৃহযুদ্ধের প্রচণ্ড কর্মব্যস্ততার মধ্যেও লেনিন যত্নসহ বইটি পড়ে, পাশে মন্তব্য লিখে রেখেছিলেন "মন্দ নয়।" [৯] সমান আগ্রহের সঙ্গেই লেনিন ঐ যুগেই পড়েছিলেন চট্টো-দত্ত গোষ্ঠীর থীসিস। আর মানবেন্দ্রনাথ রায় লেনিনের সঙ্গে তাঁর বিতর্কের বর্ণনা দিতে গিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে লিখেছেন ঃ

"সেটা সম্ভবত আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতা। একজন মহান নেতা আমাকে তাঁর সমকক্ষ ধরে নিয়ে ব্যবহার করলেন এবং এই কাজের দ্বারা তাঁর নিজের মহত্বের প্রমাণ দিলেন। লেনিন অনায়াসেই বলতে পারতেন যে একজন অখ্যাত ছোকরার সঙ্গে তর্ক করে তাঁর মূল্যবান সময় তিনি নষ্ট করতে পারবেন না আর তাহলে ঐ আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে আমার বক্তব্য পেশ করার কোনোও সুযোগই আমি পেতাম না।" [১০]

আর এক প্রবাসী ভারতবাসী দেশপ্রেমিক, নেহ্‌রু পরিবারের বন্ধু, সৈয়দ হুসেন, লেনিনের মৃত্যুতে যে-শ্রদ্ধাতর্পণ করেছিলেন তা দিয়েই এই প্রবন্ধ শেষ করছি। তিনি লিখেছিলেন ঃ "লেনিন ছিলেন পৃথিবীতে নবযুগের মহত্তম নায়ক — দাউর জাদিদ্ কা এক কায়দে আজম।" [১১] ভারতবর্ষেই হোক আর প্রবাসেই হোক, এমনিভাবেই লেনিন, প্রথম দিন থেকেই ভারতীয় মুক্তি-যোদ্ধাদের কাছে ছিলেন "নবযুগের মহত্তম নায়ক"।

পাদটীকা

১। এ. ভল্‌স্কি ঃ বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়-এর স্মৃতিকথা, লেনিনগ্রাদ, ১৯৬৯

২। ঐ

৩। ভট্টাচার্য, অবিনাশচন্দ্র ঃ "ইউরোপে ভারতীয় বিপ্লবের সাধনা", কলকাতা ১৩৬৫

৪। গোপন তার নং ১৯৯৫, ২৪ মে ১৯১৭, ভারতীয় মহাফেজখানা, নয়া দিল্লী

৫। এ. ভল্‌স্কি: বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথা

৬। বরকতুল্লাহ্: বলশেভিজম — ভারত সরকারের বাজেয়াপ্ত গোপন দলিল নং ২২৯৫, ২৮।১০।১৯১৯

৭। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সভার লিপিবদ্ধ বিবরণী, তুর্কিস্থান ব্যুরো, সোবিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি ফাইল নং ৬৩৮, ২০।১২।১৯২০, তাসখন্দ

৮। "শঙ্খ" কলকাতা, ৩০ অক্টোবর, ১৯২২

৯। সেহানবীশ, চিন্মোহন: "লেনিন ও ভারতবর্ষ" মনীষা, কলকাতা: ১৯৬৯

১০। রায়, মানবেন্দ্রনাথ: "মেমোয়ার্স" কলকাতা, ১৯৬৪

১১। "ইয়াদে ওয়াতান" (উর্দু পত্রিকা) নিউ ইয়র্ক, ১লা জুন, ১৯২৪

বাঙলা সাহিত্যে লেনিন

গোপাল হালদার

লেনিনের জন্মের শতবার্ষিকীতে সহজভাবেই একটা প্রশ্ন মনে জাগে — বাঙলা সাহিত্যে লেনিনকে আমরা কবে থেকে জানলাম, আর সে সাহিত্যে তাঁর কী রূপ দেখতে পাই। অর্থাৎ আজকালকার চলতি কাগুজে ভাষায় তাঁর 'ইমেজ' বাঙালি পাঠকের কাছে কী। কথাটা বিশেষভাবে মনে পড়েছে সম্প্রতি সুহৃদবর চিন্মোহন সেহানবীশের 'লেনিন ও ভারতবর্ষ' নামক অতুলনীয় গবেষণা পুস্তিকাটি পাঠ করে। তাতে দেখছি ১৯০০ সনের ডিসেম্বরে 'ইসক্রা' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা থেকেই লেনিন ভারতবর্ষের মানুষের বিদ্রোহ-চেষ্টার কথা উল্লেখ করেছেন। বলা বাহুল্য, তার অনেক আগেই তাহলে তিনি সে সম্বন্ধে সচেতনও ছিলেন।

সাধারণ রুশের কাছে পূর্বকাল থেকে ভারতবর্ষের 'ইমেজ' কী ছিল ? — তাদের চোখে ভারতবর্ষ ছিল আশ্চর্য যাদুর দেশ। এমনকি, তুর্গেনেফ-এরও ক্ষুদ্র একটি শেষ লেখায় আমরা সেভাবেই ভারতের উল্লেখ পাই ('পরিচয়,' ডিসেম্বর ১৯৬৮ দ্রষ্টব্য)। তবে তলস্তোয়ের কাছে ভারতবর্ষ ও ভারতবাসী, বিশেষ করে মহাত্মা গান্ধীর মতো ভারতের ধর্মবুদ্ধি (এথিক্সে প্রবণতাযুক্ত) মানুষেরা অনেক বেশি পরিচিত ছিলেন। রুশ উদারনীতিকরা অবশ্য তারও আগে সিপাহী যুদ্ধের সময় থেকেই ভারতের ব্রিটিশ উৎপীড়িত জনগণের অসন্তোষের কথাও জানতেন। লেনিনের নিকটে কিন্তু প্রথম থেকেই ভারতের একটি 'ইমেজ'ই পরিষ্কার। তা এই — ভারতবর্ষ সাম্রাজ্যবাদ-পীড়িত বহু কোটি মানুষের দেশ; যেখানে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিদ্রোহের চেতনায় মানুষ জেগে উঠছে, জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামের সূত্রে আধুনিক সমাজ-জীবনের ক্ষেত্রে উন্নীত হতে যাচ্ছে ; এবং তাদের স্বাধীনতা বিশ্ব-শ্রমিকশ্রেণীর বিশেষ কাম্য, কারণ বিশ্ব-বিপ্লবেরই দিকে তা হবে এক অনিবার্য পদক্ষেপ। লেনিনের মনে এই ছিল ভারতবর্ষের চিত্র, প্রথম থেকেই। এজন্যই আরও বিশেষ করে

আমাদের মনে এই প্রশ্নটা জেগে ওঠে ভারতবর্ষের মানসপটে লেনিনের মূর্তি কবে কীভাবে উদিত হয়, ক্রমশ কীভাবে তা রূপায়িত হয়ে উঠেছে।

বলা বাহুল্য, লেনিনের রূপ ভারতবাসীর মনে প্রকাশিত হয়েছে প্রথমত ও প্রধানত রাজনৈতিক সংবাদপত্রাদির মধ্য দিয়ে ; ইংরেজি ভাষার ও বাঙলা-ভাষার সংবাদপত্রসমূহ তাঁর কথা শাদা-কালো সরল-বক্র রেখায় প্রথম পরিবেশন করেছিল। সেই সংবাদ-তথ্যকে রঙ-রস জুগিয়ে তারপরে অবিলম্বেই প্রাণ দিয়েছেন বাঙলা সাহিত্যিকরাও। নিছক সাংবাদিকতায় পরিবেশিত লেনিন আমার এ-প্রসঙ্গে আমাদের জিজ্ঞাস্য নয়। অন্তরের রঙে-রসে রূপায়িত 'বাঙলা সাহিত্যে লেনিন'ই আমার এ-প্রসঙ্গে প্রধান আলোচ্য। অবশ্য সাহিত্যধর্মী সাংবাদিক লেখাও থাকে। সাহিত্যের সহায়ক সেরূপ সাংবাদিক লেখার স্থান স্বীকার্য।

পটভূমি

তবে এই প্রসঙ্গেরও গোড়াতে কয়েকটা জানা কথা বোধহয় আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন — ভারতবাসী লেনিন সম্বন্ধীয় ধারণার তা গোড়ার কথা। বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় কী পটভূমি ছিল আমাদের মনে, যেখানে লেনিনের চিত্র আভাসিত হয়ে, রূপায়িত হয়ে ফুটে উঠল ?

আমরা ছিলাম ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পদানত। স্বাধীন সাংবাদিকতার আমাদের তখন অবকাশ ছিলনা, স্বাধীনভাবে সংবাদ সংগ্রহেরও না। ইংরেজের হাতে-তোলা খবরই ছিল আমাদের বৈদেশিক রাজনৈতিক চিন্তার ও আন্তর্জাতিক চিন্তার খোরাক। প্রধানত কুখ্যাত 'রয়টার' ছিল বাহক, আর গৌণত 'টাইমস' প্রভৃতির দুহাত-ফেরতা সংবাদ সেই 'রয়টারে'র সংবাদে রসান জোগাত। এই একদিক। কাজেই বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪) ও অক্টোবর বিপ্লবের (১৯১৭) পূর্বে সাধারণত ভারতবাসীর লেনিনের নাম জানবার কারণ নেই ; যদিও স্টাটগার্ট সমাজতন্ত্রী সম্মেলনে (১৯০৭) লেনিনের সঙ্গে মাদাম কামা, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি নির্বাসিত বিপ্লবীদের সাক্ষাৎ হয়েছিল, পরিচয়ও হয়ে থাকবে। উল্টোদিকে, অন্তত বুয়র যুদ্ধের (বা ১৯০০ সালের) সময় থেকেই ভারতের সাধারণ সংবাদপত্র-পাঠকই ধরে নিত, ইংরেজদের দেওয়া খবর অবিশ্বাস্য, ইংরেজের স্বপক্ষে হলে তা বিশ্বাস মোটেই কোরো না। এমনকি বাঙালি পাঠকরা সেসব সংবাদেরও ব্রিটিশ স্বার্থের বিরোধী ভাষ্যই

করতেন ; সাংবাদিকরাও প্রকারান্তরে সেরূপ প্ররোচনা দিতেন। তৃতীয় দিক, রুশিয়া সম্বন্ধে আমাদের ধারণা তখন কী ছিল? ধারণা এই ছিল যে, রুশিয়া ইংরেজের (ভারত-বিষয়ক ব্যাপারে) বিরোধী পক্ষ। তার প্রতি আমাদের তাই বিরাগ ছিল না। কিন্তু জারতন্ত্র হচ্ছে ঘৃণিত স্বৈরতন্ত্র, সেই হিসাবে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেনের তাই সগোত্র, সকল দেশের গণতন্ত্রের ও স্বাধীনতার শত্রু। জারতন্ত্রের বিলোপ ঘটিয়ে রুশ বিদ্রোহীরা জয়ী হোক, এও ছিল আমাদের আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু রুশ বিদ্রোহী বলতে আমরা জানতাম কেবল 'নিহিলিস্টদের'। বাঙালি সুশিক্ষিতরা কেউ কেউ জানতেন — ইংরেজি কাগজের প্রসাদে — রুশদের মধ্যে আছে জারবিরোধী উদার গণতন্ত্রীরাও ('ক্যাডেট'দল)। ১৮৭৫-এর দিকে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম আন্তর্জাতিকের কথা ভালোই জানতেন, তিনিও মার্কস-এর নাম জানতেন না। বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথও সমাজতন্ত্রের উল্লেখ করেছেন — ১৯০০ এর পূর্বে। কিন্তু এদেশে তখনো রুশ সমাজতন্ত্রীদের খবর বিশেষ জানা যেত না। সে তুলনায় বরং নৈরাজ্যবাদীদের কথাই কিছু কিছু জানা যেত। তার কারণ, তলস্তোয়, বাকুনিন, ক্রোপোটকিনই ছিলেন মনস্বী হিসাবে ভারতে সুপরিচিত, প্লেখানভ-লেনিন প্রভৃতির নাম ১৯০৫-এও ছিল অজ্ঞাত।

এই ছিল বাঙালিরও সাধারণ মানসিক পটভূমি। এর উপর এল ১৯১৭তে প্রথম জারতন্ত্রের পতনের বার্তা, বাঙালির ও ভারতবাসীর তাতে উৎসাহের অন্ত ছিলনা। তার কিছু পরেই এল অক্টোবর বিপ্লবের বার্তা, তাও অধিক থেকে অধিকতর উদ্দীপনার সঞ্চার করেছে বিদ্রোহকামী বাঙালির মনে। সেসব সংবাদ বাঙলা ও ইংরেজিতে লিখিত গবেষণা পুস্তিকাসমূহে ১৯৬৭ সনে আমাদের নিকট পুনরুদ্ধার করে দিয়েছেন আমাদের গবেষকরা (দ্রঃ ইসকাস প্রকাশিত পুস্তিকাদি ও সম্প্রতি প্রকাশিত শ্রীঅবিনাশ দাশগুপ্তের 'লেনিন রুশ-মহাবিপ্লব ও বাঙলা সংবাদ সাহিত্য')। তা বিশদ করা এখন নিষ্প্রয়োজন।

সাহিত্যের দাবি

সাহিত্য-প্রসঙ্গে আরেকটি গোড়ার কথাও মনে রাখা দরকার : সমসাময়িক ঘটনা বা রাজনৈতিক-সামাজিক সংবাদ কেমন করে সাহিত্যভাত হয়ে ওঠে, এবং সাহিত্যের কোন বিশেষ বিভাগে এরূপ বিষয়ের সাহিত্যিক রূপায়ণ সুসাধ্য, কোথায় দুঃসাধ্য, তা মনে রাখলে বুঝতে পারব আমাদের সাহিত্যেও

লেনিনের সাহিত্যরূপ কোথায় অনুসন্ধেয়, আর কী সম্ভাব্য বিশেষ ধরনে তা লভ্য।

এই দিকে প্রথম কথা, লেনিন আমাদের নিকট অক্টোবর বিপ্লবের নায়করূপেই প্রথম উপস্থিত হন। তার আগে ভারতবর্ষে বা বাঙলায় সম্ভবত কেউ তাঁর নামও জানতেন না; কেন, তা এর ঠিক পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। বিশেষ বুঝবার কথা এই — 'অক্টোবর বিপ্লব', 'রুশ বিপ্লব', 'বলশেভিক দল', 'বলশেভিজম', 'সাম্যবাদী বিপ্লব', 'সাম্যবাদ', 'সমাজতন্ত্রী বিপ্লব-সমাজতন্ত্র', 'সোভিয়েত-সোভিয়েত নীতি' (ধনসাম্য, শ্রমিকরাষ্ট্র বিশেষ করে সর্বজাতির আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার, ও বিশ্বমানবের মৈত্রী ঐক্য, মানুষের মুক্তি) — এসব ধারণাগুলি লেনিনের নামের সঙ্গে প্রায় প্রথম থেকেই অচ্ছেদ্যরূপে আমাদের মনে গেঁথে যায়, এখনো আছে। অনেকস্থলে 'লেনিনের' নাম উল্লেখ স্পষ্ট করে করা হয় না, কিন্তু তাঁর কীর্তি দিয়েই তাঁকে চিহ্নিত বা আভাসিত করা হয়। বিশেষত সাহিত্যের অনেক বিভাগে 'ইঙ্গিত,' 'প্রতীক' ও ব্যঞ্জনা দিয়েই ব্যক্তি ও বিশেষ বিষয় আভাসিত হয়। আবার দেখা যাবে যাঁরা লেনিনের স্বধর্মী বলে তখন পরিচিত ছিলেন, (যেমন, ট্রটস্কি) কিম্বা, উত্তরসাধক বলে পরিচিত ছিলেন (যেমন, স্তালিন), তাঁদের নামও লেনিনের সঙ্গে উল্লেখিত হয়েছে। সেখানেও লেনিনই মূল উদ্দিষ্ট, অন্য সব নাম নিয়ে সংশয়গ্রস্ত হওয়ার কারণ নেই। যেখানে সোভিয়েতের সাফল্য, অক্টোবর বিপ্লবের বা ওরূপ লেনিনীয় কীর্তির কথা কীর্তিত হচ্ছে, বোঝা সহজ পরোক্ষে সেখানেও লেনিনই উদ্দিষ্ট, লেনিনই কীর্তিত। এক অর্থে তাই সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ প্রণোদিত আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের সকল লেখাই লেনিনের প্রশস্তি।

দ্বিতীয় কথা, সাহিত্যের নিজস্ব নিয়মনীতি আছে, কতকগুলি নিয়ম — রসবোধের দাবি সকল বিভাগেই খাটে। এ দাবি না মানলে তা সাহিত্য নয়। আবার, সাহিত্যের অন্তর্গত বিশেষ বিভাগের কয়েকটা বিশেষ রীতিনিয়মও আছে। যেমন, কবিতায় কোনো বিষয় বলতে হলে কবিতার নিয়মে তা বলতে হয়। আবার, যা গদ্যে সহজভাবে বলা যায়, নানা সূক্ষ্ম তর্ক শুদ্ধ, তা হয়তো কবিতায়, বিশেষ করে খণ্ড কবিতায়, বলা যায় না, ইত্যাদি। এরও পরে আরও একটা কথা আছে, লেনিনের কথা, বাঙলার মতো, এত দূরেকার, সম্পূর্ণ ভিন্ন ঐতিহ্যের একটি ভাষা ও সাহিত্যে, বলতে হলে

পথে অনেকগুলি ঐতিহ্য ও বাঁধা-নিয়মকে এড়িয়ে ও ছাড়িয়ে, — না-মেনে, ও মেনে, সাহিত্যভাত হবে। এবং যতটা জ্ঞানপ্রদ সাহিত্যে (লিটারেচার অব ইনফরমেশন এ্যাণ্ড নলেজ্) তা বলা সহজ ততটা প্রবর্তনাপ্রদ সাহিত্যে (লিটারেচার অব পাওয়ারে) তা বলা সহজ নয়। অতএব, প্রবন্ধ সাহিত্যে তথ্যপ্রধান ও আলোচনামূলক লেখায় (এমন কি, জীবনী, ভ্রমণকাহিনী প্রভৃতিতেও) লেনিনের কথা বলা সহজ। কিন্তু আমাদের গল্পে, উপন্যাসে তা উল্লেখ করা যায় প্রধানত দৃষ্টান্ত ও প্রেরণা হিসাবে। লেনিনের বিষয়ে নাটকে-যাত্রায় বলাও সম্ভব, কিন্তু সেজন্য আসর, অর্থাৎ দর্শকসমাজ প্রস্তুত হয়ে না উঠলে নাটক-যাত্রাতে ওরূপ দূর সমাজের চিত্র বা অজ্ঞাত চরিত্র রূপায়ণ স্বাভাবিক নয়। কাব্যে একদিকে বলা খুবই কঠিন, তা সাহিত্য-ধর্ম হারিয়ে বাগ্মিতা বা আবেগ-আকুলতা হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু আরেকদিকে সাহিত্যধর্ম মেনেও তা প্রশস্তিসূচক কবিতায় বলা মোটেই অসাধ্য নয়। মায়কোভ্স্কি, ইয়েসেনিন তার দৃষ্টান্ত। এমন কি শুধু বাহ্য প্রশস্তি নয়, তার অপেক্ষা গভীরতর জীবনবোধের সঙ্গে, অধ্যাত্মবোধের সঙ্গেও যুক্ত হয়ে লেনিন-চেতনা উচ্চাঙ্গের কবিতা হতে পারে। অন্য ভাষার কথা জোর করে বলতে পারব না, তবে সগৌরবে বলতে পারি, লেনিনের সম্বন্ধে এমন কবিতাও বাঙলায় আমরা পেয়েছি। লেনিন, লেনিনীয় কীর্তি, লেনিনীয় জীবনদৃষ্টি বাঙলায় উৎকৃষ্ট কবিতায় রূপায়িত হয়েছে।

তৃতীয়ত, লেনিনের লেখার বা লেনিন বিষয়ক লেখার, যেসব সরাসরি অনুবাদ বাঙলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে, তাও এ-প্রসঙ্গে গণনীয়। কিন্তু ইদানীং এ-অনুবাদ-প্রধান ধারা বিপুল। তাই এ-প্রবন্ধে আমরা বাঙলা সাহিত্যের এ-শাখাটির কথা গণ্য করছি না, তবে স্মরণ করছি।

পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন যে, সাময়িক পত্রের পাতায়, সংবাদ হিসাবে ছাড়াও, সম্পাদকীয় মন্তব্যে অক্টোবর বিপ্লবের ও লেনিনের যে উল্লেখ আছে তা মাঝে মাঝে সাহিত্য-ধর্মী, কিন্তু এ-প্রবন্ধে তাও বিশেষ গণনীয় হলো না। অথচ প্রবন্ধ সাহিত্য হিসাবে তার মূল্য যথেষ্ট। শুধু পুস্তকাকারে বাঙলা সাহিত্যে লেনিনের যেখানে স্পষ্ট ছায়াপাত হয়েছে, এবার আমরা তার হিসাব নিই।

জীবনী ও প্রবন্ধ সাহিত্য

প্রথমেই মনে পড়ে লেনিন জীবনী সমূহের কথা, বা, প্রথম দিককার লেনিন-বিষয়ক জীবনীমূলক নিবন্ধাদির (বায়োগ্রাফিক্যাল স্কেচ, প্রভৃতির) ও রাজনৈতিক আলোচনার কথা। ১৯১৭ থেকে লেনিনের মৃত্যু পর্যন্ত (১৯২৩) কালটাকে এদিকে প্রথম পর্ব বলে ধরে নিতে পারি। তখনো সুস্পষ্ট তথ্য ও ধারণা লাভ সহজ ছিল না।

বিপিনচন্দ্র পাল, রাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ মনস্বীরা বলশেভিক বিপ্লব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা জাগিয়েছিলেন। ১৯২১-এর শেষভাগ থেকেই মুজফ্‌ফর আহমদ ও অন্যান্যরা বাঙলায় কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার চেষ্টা করছিলেন। ওদিকে 'সৎসঙ্গী', বৈশাখ, ১৩২৮ (এপ্রিল, ১৯২১ সন) সালে কে ধারাবাহিক লেনিন জীবনী লিখছিলেন তা জানা যায় নি। বলা বাহুল্য 'সৎসঙ্গী' ধর্মের পত্রিকা। কিন্তু এ-লেখক কতটা ধর্মজিজ্ঞাসু ও 'সৎসঙ্গী'-ধারার মানুষ, লেখা থেকে তা বোঝা যায় না ; কিন্তু দেখা যায় তিনি লেনিনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, এবং লেনিন বিরোধী প্রচারে তিনি কিছুমাত্র প্রভাবিত হতে, বা পাঠকদের প্রভাবিত করতে অস্বীকৃত। তিনি লিখছিলেন, "এই কয় বছরে তিনি (লেনিন) বিশ-পঁচিশবার গুলির দ্বারা আহত হয়ে এবং কয়েকবার মরে গিয়ে এখনো বেঁচে রয়েছেন। প্রথম-প্রথম আমরা জানতাম তাঁর মতো রক্তলোলুপ বা নর-পিশাচ ইতিপূর্বে কুত্রাপি জন্মগ্রহণ করেনি। কাইজারের কাছ থেকে বিপুল টাকা পেয়ে এবং জারের সঞ্চিত বিপুল ধনরত্ন হস্তগত করে তিনি বিলাসব্যসনে একেবারে গা ভাসিয়ে দিয়েছেন। এ-সময়ের একটা সংবাদ এই যে, প্রত্যহ তিনি দুই হাজার রুবল মূল্যের ফল আহার করে থাকেন।" সেই ১৯১৭-১৯২১-এর কালেও লেনিনের সম্বন্ধে বিরূপ সংবাদ রটছিল। আর এসব অপপ্রচার বাঙালি শিক্ষিতরা কী অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখতেন, তা বুঝবার জন্যই এই উদ্ধৃতি।

১৯২১ থেকে ভারতবর্ষে গান্ধী আন্দোলনের যুগ, সক্রিয় আন্দোলনের যুগ। তাতে নানা রাজনৈতিক গোষ্ঠীতেই রুশ-বিপ্লবের সম্বন্ধে চেতনা জেগেছিল। লেনিন সম্বন্ধেও সকলেই জিজ্ঞাসু হন। 'সৎসঙ্গী'র মতো ধর্মীয় পত্রেও তার ছাপ তাই না পড়ে পারেনি। এই লেখা পুস্তকাকারে বোধহয় প্রকাশিত হয়নি।

ফণীভূষণ ঘোষ মহাশয়ের লেখা 'লেনিন'ই বাঙলায় লেনিনের প্রথম জীবনী-গ্রন্থ। কলিকাতা কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের 'ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব' কর্তৃক ১৩২৮-

সালের ১০ ভাদ্র (২৫ আগস্ট, ১৯২১) তা প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র-বিবেকানন্দ প্রমুখ ঐতিহ্যের দ্বারাই সে-লেখক চালিত, সেভাবেই লেনিনকেও তাঁদের সগোত্র করতে সচেষ্ট। সদুদ্দেশ্যমূলক হলেও তা ভ্রান্ত চেষ্টা. জীবনী-সাহিত্য হিসাবেও এ-বই-এর মূল্য বেশি নয়, যদিও তিনি ডাঙ্গের ইংরেজী বই 'গান্ধী বনাম লেনিন' পড়েছিলেন। অর্থাৎ বই পাওয়া না গেলেও লেনিন তখন এ-দেশে পরিচিত ব্যক্তি, আদর্শের প্রতীক হয়ে উঠেছেন।

এ-পুস্তকের সমালোচনা সাপ্তাহিক 'বিজলী'তে প্রকাশিত হয়েছিল ১২ ডিসেম্বর, ১৯২১-এ। প্রকৃতপক্ষে দেখি 'বিজলী', 'আত্মশক্তি', 'সংহতি', 'শঙ্খ', 'ধূমকেতু' (নজরুলের) ও নোয়াখালির 'দেশের বাণী' প্রভৃতি সাময়িক পত্রে সোভিয়েত বিপ্লব ও লেনিনের সম্বন্ধে (লেনিনের জীবিতকালে ও পরে) বরাবর প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হচ্ছিল। এর পরে আসে 'লাঙ্গল' ও 'গণবাণী'র দিন। বস্তুত ১৯২৩ সালে দেখি বিনয়কুমার সরকার 'নবীন রুশিয়ার জীবন প্রভাত' নামে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখছিলেন; হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় 'লেনিন' সম্বন্ধে 'আত্মশক্তিতে' জীবনী-প্রবন্ধ লিখেছেন; হেমন্তকুমার সরকার সেই নীতিতে আকৃষ্টও হয়েছিলেন। এমনকি ট্রটস্কির লেখা '১৯০৫ সালের রুশ-বিপ্লব'ও বাঙলায় তখন অনূদিত হয়েছে।

বাঙালি বিপ্লবীরা কী করছিলেন? কমরেড মুজফ্‌ফর আহমেদ ও কাজী নজরুলের নামই বিপ্লব প্রসঙ্গে প্রথম উল্লেখযোগ্য। ১৯২১-এর মার্চ থেকে 'শঙ্খ' পত্রিকায় প্রসিদ্ধ জাতীয় বিপ্লবী শচীন্দ্রনাথ সান্যাল 'লেনিন ও সমসাময়িক রাশিয়া' বিষয়ে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখছিলেন, তাও বিশেষ গণনীয়। শুধু জাতীয়তা নয়, সাম্যবাদী ভাবধারাতেই উদ্বুদ্ধ। কিন্তু পুস্তকাকারে তাঁর সে-বই প্রকাশিত হয়নি। (মুজফ্‌ফর আহমদের লেখাও তখনো পাওয়া যায় না।)

বিপ্লবী অমূল্যচরণ অধিকারী ('অনুশীলন' দলের) মহাশয়ের 'আত্মশক্তির' পাতায় (১৯২৩-এর এপ্রিল-মের) প্রবন্ধাবলী; লেনিন সম্বন্ধে লেখা স্বচ্ছ রাজনৈতিক দৃষ্টির আবেগসমৃদ্ধ প্রবন্ধ। 'যুগান্তরে'র প্রিয়নাথ গাঙ্গুলীর 'লেনিন ও সোভিয়েত'এ (১৯২৪) ততটা সুস্থির চেতনা নেই। তিনি আইরিশ বিপ্লবের দ্বারাও আকৃষ্ট ছিলেন।

সরাসরি লেনিনকে নিয়ে না হলেও বিপ্লবী রাশিয়া নিয়ে বাঙলায় যে বিপ্লবীরা, অবশ্য আরও পরে, আলোচনা গ্রন্থ লিখেছিলেন তাঁদের দু-তিনজন

বিশেষ স্মরণীয়। 'তরুণ রুশ'-এর (১৯২৫) লেখক রেবতী বর্মন, এবং 'নব্য রুশিয়া'র লেখক সরোজ আচার্য। আর ওরূপ লেখাই 'বাঙলার বাণী'তে লিখেছেন সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার।

শিবরাম চক্রবর্তীর 'মস্কো বনাম পণ্ডিচেরী' আরও আগেকার লেখা, তা বিস্মৃত হবার মতো বস্তু নয়।

ঠিক সাহিত্য পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল 'বিজলী', 'আত্মশক্তি', ধূমকেতু', 'লাঙ্গল' প্রভৃতির কোনো কোনো লেখা (বারীন ঘোষ, উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখাও তাতে আছে, নজরুল-মুজফ্‌ফর আহমদের লেখাও)। আর কতকাংশে এই শেষ তিন-চারখানি বইও প্রবন্ধ-সাহিত্যরূপে গণ্য।

পরে দেখব — প্রাথমিক পর্বেই, এই আলোচনা-সাহিত্য ছাড়া ক্ষীণভাবে হলেও কলাকুশল-সাহিত্যেও লেনিনের ছায়াপাত হয়েছিল।

অবশ্য দ্বিতীয় পর্বে (লেনিনের মৃত্যুর পরে) লেনিন সম্বন্ধে ও সোভিয়েত ও সোভিয়েত-বিপ্লব সম্বন্ধে নানা বিদেশী বই এ-দেশে আসে। তাতে শিক্ষিতরা অনেকে উদ্বুদ্ধ হন, এবং কতকটা সাম্যবাদের অনুকূল ধারণাও তাঁদের মনে গড়ে উঠতে থাকে। কতদূর যে তা গড়ে উঠেছিল কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পিতৃস্মৃতি'র (পৃঃ ২১৫-২১৭) একটি আখ্যান তার অভ্রান্ত প্রমাণ। সমস্ত ব্যাপারটাই উদ্ধৃত করার মতো — স্থানাভাবে তা সম্ভব হলো না। কিন্তু কুতূহলী পাঠকমাত্রই তা পড়ে নেবেন। অনুমান করা হয়েছে তা ১৯২৪-২৫-এর পূর্বের ঘটনা, তা হলে নিশ্চয়ই আশ্চর্যজনক কথা। পতিসরে রথীন্দ্রনাথ পৈতৃক জমিদারিতে গিয়েছিলেন, প্রজাদের এক আসরে বসে কথা শুনছেন; মনে হচ্ছিল 'মধ্যযুগে ফিরে গিয়েছি'। তারপর "পাকা দাড়িওয়ালা এক গ্রাম্য-বৃদ্ধ হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বললে, বাবুমশায়, এসব ব্যাপারে কথা বেশি বলা মানেই বাজে কথা বলা। স্বদেশী ছোঁড়ারা দেশের উন্নতি নিয়ে লম্বা চওড়া বক্তৃতা দেয় শুধু। আসল কাজের বেলায় কারো টিকিটুকু দেখবার জো নেই। হাঁ, লেনিনের মতো একজন লোক দেশে জন্মাত, দেখতেন সব ঠিক হয়ে যেত।" রথীন্দ্রনাথ বলেছেন, "রূঢ় বাস্তবের মধ্যে আচমকা যেন ফিরে এলাম।"

এই রূঢ় বাস্তব লেনিনকে তখন চিনে নিচ্ছে, সেই ১৯২৪-২৫এ। তারপর থেকে প্রবন্ধ-সাহিত্যে লেনিন ও তাঁর কীর্তিকথা, তাঁর বিচার আলোচনা ক্রমশই বেড়ে গিয়েছে। ১৯৩০-এর সময় থেকে তা আরও প্রবল হয়।

তখন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাল — তৃতীয় পর্ব তাকে বলতে পারি। রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি' বাঙলা সাহিত্যে লেনিনীয় অনুরাগের দুয়ার তখন মুক্ত করে দিল। তারপর থেকে জীবনী ও প্রবন্ধ-সাহিত্যে লেনিনীয় প্রভাবের হিসাব নেওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। চতুর্থ পর্বে, অর্থাৎ দ্বিতীয় যুদ্ধের পরে, রাশিয়ার ভ্রমণকথা বাঙলা সাহিত্যের অনেক খ্যাতনামা লেখকরাই লিখেছেন। মূল লেখায় ও অনুবাদে তখন লেনিন-প্রভাব সুপরিব্যাপ্ত হয়ে গিয়েছে।

সাহিত্যে জ্ঞানপ্রদ সাহিত্যের যে-শাখা, তাকে আশ্রয় করে এসব লেখার মধ্যে দিয়ে লেনিনের একটা স্পষ্ট রূপ এই চার পর্বে বাঙলা দেশে গড়ে উঠেছে। লেনিনের মূল বই-এর অনুবাদও এখন অনেক প্রকাশিত হয়েছে। ক্লারা ৎসেৎকিন (জেটকিন) লিখিত 'স্মৃতিকথা,' গর্কীর 'লেনিন স্মৃতি' প্রভৃতিও (অনুবাদে হলেও) বাঙলা সাহিত্যেরও এখন সম্পদ। তবু বিস্মৃত হবার কথা নয় যে, এদিকে যাঁদের সহায়তা সর্বাপেক্ষা কার্যদায়ক হয়েছে তাঁরা অনেকেই (যথা, কম মুজফ্‌ফর আহমেদ, ধরণী গোস্বামী প্রমুখ) ছিলেন কমিউনিস্ট, আরও অনেকে কমিউনিস্টদের সহযাত্রী (যেমন, কাজী নজরুল ইসলাম, ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ) এবং আরও কেউ কেউ সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, সুকুমার মিত্র প্রভৃতির মতো লেখকরা — অগ্রগণ্য সাংবাদিক, এবং অধিকাংশেই রাজনীতি সচেতন। অপরদিকে লক্ষণীয়, বাঙলা সাহিত্যে লেনিনের কুৎসামূলক সাহিত্য নেই।

রস-সাহিত্য

আশ্চর্য হবার কিছু নেই — কথা-সাহিত্যে লেনিন বা অক্টোবর-বিপ্লব সরাসরি বিষয় হয়ে ওঠেনি। কেন, তা পূর্বেই বলেছি। সুপরিচিত জীবনযাত্রার পটভূমিতেই এরূপ সাহিত্য লেখা যায়। গল্পে উপন্যাসের আমাদের জন্মক্ষেত্র বাঙালি বা ভারতীয়। তার মধ্যে শ্রমিক-কৃষকের জীবনচিত্র থাকলে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখতে হবে তাতে লেনিনের প্রভাবের চিহ্ন আছে কিনা। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'কয়লাকুঠি' থেকে একটা নতুন ধারার বাঙলা কথা-সাহিত্যের সূচনা হয়। তাতে লেনিন অপেক্ষা গর্কিরই প্রভাব বেশি বলে স্বীকার্য। দিলীপ রায় প্রভৃতি দু-একজন বিশের পরবর্তী দশকের ইউরোপীয় নরনারীদের বাঙলা কথা-সাহিত্যের চরিত্ররূপে গ্রহণ

করেছেন, কদাচিৎ দেখি তাঁদের কেউ কেউ কমিউনিজমেও অনুরক্ত। মণীন্দ্রলাল বসুর একখানি উপন্যাসেও তেমন বাঙালি চরিত্র পাই। কিন্তু কথা-সাহিত্যে এ-দেশ থেকে প্রকাশিত ও মস্কো থেকে প্রকাশিত রুশ-সাহিত্যের অনুবাদই এখনো প্রধানত লেনিনীয় প্রেরণার বাহন। রুশ-জীবন সম্বন্ধে আকর্ষণ স্পষ্ট — মূল বাঙলা উপন্যাস বোধহয় নেই। একেবারে গোড়ায় (১৯২০-এর) নজরুলের 'ব্যথার দানে' লাল ফৌজে ["এর চেয়ে ভালো কাজ আর দুনিয়ায় খুঁজে পেলুম না। তাই এ-দলে এসেছি"] দেখা যায়। উল্লেখযোগ্য হলেও, লেনিনীয় প্রভাব তাতে আবিষ্কার করা সহজ নয়। আসলে, বাঙলা-সাহিত্যের যে-বিভাগে লেনিন ও লেনিনীয় কীর্তি সগৌরবে প্রকাশলাভ করেছে সে হচ্ছে বাঙলা কাব্য-সাহিত্য আর, সাধারণভাবে কবিতা বাঙলা সাহিত্যেরও প্রধান সম্পদ।

বাঙলা কবিতায় লেনিন

বাঙলা কবিতায় লেনিনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ চিহ্ন এত প্রচুর যে শুধু তার সঙ্কলনেও একাধিক খণ্ডের বড় বই হয়ে যাবে। আর, সাহিত্যদৃষ্টিতে ঝাড়াই-বাছাই করে তা চয়ন করলে তার পরিমাণ ও উৎকর্ষও সকলকেই চমৎকৃত করবে। উদ্ধৃতি না দিলে এ-কথা সকলের উপলব্ধি হবে না। কিন্তু এ-প্রবন্ধ তা হলে আরও চারগুণ হয়েও শেষ হবে না। প্রবন্ধের এই অসম্পূর্ণতা মেনে এখানে শুধু আমরা প্রধানতম কয়েকজন লেখকের কথাই স্মরণ করছি — তাঁদের লেখার নাম করাও সম্ভব হবে না।

'লেনিন' ঠিক এই নামেই বাঙলায় প্রথম কবিতা লিখেছিলেন বোধহয় কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য মহাশয়, ময়মনসিংহ মুক্তাগাছার অধিবাসী, এখনো কলকাতায় তিনি জীবিত আছেন (কবি পূর্ণেন্দু ভট্টাচার্যের পিতা। পূর্ণেন্দুবাবুরও এ-ধারার কবিতা আছে)। যতীন্দ্রবাবু বলেছেন, তিনি লেনিনের মতবাদ সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না। জানতেন, লেনিন অক্টোবর বিপ্লবের মহানায়ক, সাধারণভাবে তাই সকল গণজাগরণের পথ-নির্দেশক, স্বাধীনতাকামীর পূজনীয়। সে-উচ্ছ্বাসেই তাঁর দীর্ঘ কবিতাটি লেখা। তখনকার দিনে (১৯২০-২১-এর দিকে) এজন্য তাঁকে পুলিশের হাতে নিগৃহীত হতে হয়, দুঃখ প্রকাশও করতে হয়। লেনিন বিষয়ে যতীন্দ্রবাবুর চিন্তা আসলে কোন ধারায় প্রবাহিত ছিল, নিচের উদ্ধৃতিটিই তার প্রমাণ :

"লেনিনেরে লক্ষ্য করি'
তারই পন্থা অনুসরি'
ক্ষুধার্ত শার্দুল সম নির্যাতিত অন্য সব জাতি,
আজি ওই উঠিয়াছে মাতি ;
প্রতিষ্ঠিবে আজি তারা দেশে দেশে প্রেমের শাসন।
...　　...　　..
জীবন্মৃত জাতি-চিত্তে জ্বালাইবে দীপ্ত হুতাশন।"

কালানুক্রমে না হলেও, বলা বাহুল্য সে-পর্বের (১৯২০-৩০) লেনিনীয় প্রভাবে উদ্বুদ্ধ প্রধান কবি কাজী নজরুল ইসলাম। তাঁর 'ব্যথার দানে'র কথা পূর্বেই বলেছি। বোধহয় স্বদেশী-বিদেশী এ-ধারার কোনো কবির তুলনাতেই তাঁকে তুচ্ছ মনে করা যাবে না। মায়াকোভ্‌স্কি, য়েসেনিন প্রমুখ তৎকালীন জগৎ-বিখ্যাত রুশ-কবিদের কথা মনে রেখেও একথা বলা যায়। নিশ্চয়ই নজরুলও তাত্ত্বিক 'সাম্যবাদী' ততটা নন যতটা 'বিদ্রোহী,' মানবীয় মুক্তির হোতা। কত পৃষ্ঠা উদ্ধৃতি দিলে এই সর্বহারা কবি নজরুলের কবিতার প্রতি সুবিচার করা হয়? বাঙালি পাঠকের পক্ষে অবশ্য উদ্ধৃতির তত প্রয়োজন নেই। অন্য ভাষার মধ্যে রুশে তাঁর কবিতার কিছু অনুবাদ হয়েছে। জানি না, রুশ অনুবাদে তাঁর কাব্যোৎকর্ষ রক্ষিত হয়েছে কিনা।

একটা কথা, ১৯২৪-৩০-এর 'কল্লোল' 'কালি-কলম' গোষ্ঠীর কবিরা একটা নৈরাজ্যের ভাবে কিছুটা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁদের কোনো লেখায় কিন্তু লেনিন বা লেনিনীয় কীর্তি বা চেতনার প্রতি শ্রদ্ধা বা আকর্ষণ দেখা যায়নি। তবে প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রভৃতি গণতান্ত্রিক দৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ ছিলেন। এবং তাঁরা লেনিন-প্রভাব অপেক্ষা হুইটম্যান-প্রভাবেই বেশি প্রভাবিত হয়েছিলেন মনে হয়।

নজরুলের পরে বাঙলা কবিতায় লেনিনীয় ভাবনা যাঁদের মধ্যে দেখা দিয়েছে তাঁদের মধ্যে কালানুক্রমিক নাম করলে বোধহয় কবি সমর সেনের নামই প্রথম করতে হয়। কবিতায় বিষ্ণু দে-এর আবির্ভাব তারও পূর্বে। তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত 'প্রতিবিপ্লব দুর্ভিক্ষ, সংগঠন' নামের ('রুশতী পঞ্চশতী'র) কবিতাটি ১৯২২-২৩-এর লেখা — আনাতোল ফ্রাঁসের বিবৃতি ও নোবেল পুরস্কারের টাকাটা সোভিয়েত ইউনিয়নে পাঠানোর খবর পড়ে তা লেখা — তাহলে এটিও হয়ত বাঙলায় প্রথম পর্বের লেনিনীয় প্রভাবের কবিতা।

সুন্দর কবিতা। তবে বিষ্ণু দে-র এ-ভাবনায় উদ্বুদ্ধ কবিরূপের নিশ্চিত প্রকাশ দেখা যায় বোধহয় তৃতীয় পর্বের শেষেই, কিছু পরে। কবি বিমল ঘোষও সে হিসাবে ১৯৪০-এর সময় থেকেই লেনিনীয় ধারার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সম্ভবত অরুণ মিত্রই ত্রিশের পরে তৃতীয় পর্বের সুস্থির লেনিনিস্ট কবি। মোটামুটি ত্রিশের বছরগুলিতে কাব্যক্ষেত্রে যাঁরা উদিত হলেন তাঁদের মধ্যে এদিক থেকে উল্লেখযোগ্য এঁরাই — সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তীরাও গণ্য, কিন্তু লেনিন-প্রভাব তাঁদের মধ্যে দুর্নিরীক্ষ্য। সমর সেন কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছেন, আর বিষ্ণু দে-এর কবিকৃতি এখনো নবায়মান। এবং এ-মুহূর্তে মনে হয় (১৯৬৯) লেনিনীয় চেতনাকে বাঙলা-সাহিত্যে যাঁরা পূর্ণতম কাব্যশ্রী দান করতে পেরেছেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও সুকান্ত।

বিষ্ণু দে বিদগ্ধ কবি, আধুনিক কবি এবং আধুনিক মানুষও। ব্যক্তি-সত্তার যে-জিজ্ঞাসা ও বেদনা লিরিক কবিতায় অনেক সময়েই প্রাণ বা আত্মা, বিষ্ণু দে-এর কবিতার উৎস তাই। সে-উৎস থেকে নিঃসৃত হয়ে সে-জিজ্ঞাসা জন-জীবনের সাগরে গিয়ে মিশে, নিঃসঙ্গ কবি-সত্তাকে মহৎ সংযুক্তিতে পূর্ণতা দান করে। প্রেমে ও সংগ্রামে, স্বদেশে ও বিশ্বে দ্বন্দ্ব-মিলনে বিধৃত হয়। বিষ্ণু দে-এর এই কবি-জীবনকে প্রত্যুদ্গমন করে যা এগিয়ে দিয়েছে তার মধ্যে লেনিন ও লেনিনীয় সাধনাই প্রধান বস্তু। একথা সকলেই জানেন বিষ্ণু দে-এর কবি-রুচি ও কবি-চেতনা অতিকর্ষিত সূক্ষ্ম শিল্পরীতিতে নিয়মিত। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কত সুনিপুণ কলাকৌশলে, অথচ নির্ভয়ে, তিনি আপনার কবিতার মধ্যে একদিকে 'লেনিন' 'চেলিউশকিন,' 'যুগাশভিলি' প্রভৃতি নামও (ব্যঙ্গচ্ছলে নয়) অত্যন্ত ব্যঞ্জনাময় করে উল্লেখ করতে পারেন, কিছুতেই সঙ্কুচিত নন, এবং সর্বত্রই সফলকাম। সত্যই 'প্রাণের কবি। অতীতের সিঁড়ি ভাঙে আর গায় ভাবীর ভাষা,' — তাঁর সম্বন্ধে সত্য 'স্তালিনগ্রাদে বাঙলা দেশের প্রান্ত মিলায়,' এ তাঁর কবিতা সম্বন্ধেও সত্য।

"লেনিনের মনপ্রাণ
আকাশ বিহারী করে দিল যৌবন।...
তাই সব শুনি সে নক্ষত্র-গান
গঙ্গায় পাই ভলগার প্রতিমান।"

'রাইশে জুন' যেমন, তেমনি "সন্দীপের চর' তাঁর কাছে একই লেনিনীয় চেতনায় মিলেছে। 'প্রাজ্ঞ' লেনিনই শুনিয়েছেন 'স্বাধীন জীবন-জলে জীবনের ঢেউ'। 'গমের ধানের ক্ষেতে প্রাণের আশ্বিন আসে স্তেপে ও তুন্দ্রায়'।

১৯৬৭ সনে প্রকাশিত 'রুশতী পঞ্চশতী'তে অক্টোবর-বিপ্লব-এর পঞ্চাশতম বার্ষিকীতে বিষ্ণু দে-এর এ-ধারার পঞ্চাশটি কবিতা একত্র প্রকাশিত হয়েছে। সম্ভবত লেনিনীয় দর্শনের, কীর্তির ও প্রেরণার এমন উৎকৃষ্ট কবিতা (রুশভাষা ভিন্ন ?) কোনো ভাষার কবির কাব্যে একত্র গ্রথিত হয়নি।

সে-বৎসরই (১৯৬৭) বিমলচন্দ্র ঘোষ-এর 'উত্তর আকাশের তারা'ও প্রকাশিত হয়েছে। বিমলচন্দ্র ঘোষ প্রেরণার সুপরিচিত কবি। তাঁর কবিতা নজরুলের কবিতার মতোই অনেকটা সিভিক পোয়েট্রি বা জনবেদ্য ভাবের কবি। বাগবিভূতিতে, রচনা-কৌশলে, সত্তাজাত দুরন্ত আবেগে ও ঐশ্বর্যে তাঁর 'লেনিন' প্রভৃতি কবিতা সকলকেই চমৎকৃত করে, সার্থকভাবেই তিনি এ গ্রন্থের জন্য নেহরু পুরস্কার লাভ করেছেন (১৯৬৮)। এই সঙ্গেই উল্লেখযোগ্য মণীন্দ্র রায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও।

ইচ্ছা করেই কিন্তু আরেক গোষ্ঠী কবিদের নাম করিনি, তাঁরা কমিউনিস্ট কবি। এঁদের পক্ষে লেনিন স্বভাবতই যুগগুরু ও পথিকৃৎ। কিন্তু কথা শুধু তা নয়, কথা এই যে, যে-বাঙলা দেশ কবিতার দেশ, সে-দেশের কবিতায় এই লেনিনবাদী কবিরাও অনেকে অগ্রগণ্য। শুধু অগ্রগণ্য নয়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মতো কেউ কেউ সরকারী প্রতিকূলতা সত্ত্বেও রাষ্ট্রপতির পারিতোষিকও লাভ করেছেন। সুভাষের কাব্য রসে, সারল্যে, শিল্পোৎকর্ষে যে-কোনো ভাষার গৌরব বৃদ্ধি করত। যাঁরা তাঁর মতো সম্মান পাননি, তাঁরাও অনেকেই রসজ্ঞ সমাজে বহুকাল স্বীকৃত। যেমন, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়। কেউ কেউ আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকল বাঙালির দ্বারা অভিনন্দিত, যেমন, কবি-কিশোর সুকান্ত ভট্টাচার্য। লেনিনের সঙ্গে আত্মিক যোগ ঘোষণা করে ২১ বৎসরের এই কবি ঘোষণা করে গিয়েছেন সে প্রেরণায় 'মনে হয় আমিই লেনিন'। 'লেনিন' সম্বন্ধীয় কবিতার মধ্যে বোধহয় এটি সাধারণ্যে সর্বাধিক আবৃত্তি-ধন্য বাঙলা কবিতা। সমস্ত ভাষার পাঠকই ঐ কবির অকালমৃত্যুর জন্য চোখের জল ফেলেন। এই সঙ্গেই উল্লেখযোগ্য, প্রায় অনুরূপ আবৃত্ত 'ইলা মিত্র' কবিতার কবি গোলাম কুদ্দুস। কিম্বা মণীন্দ্র রায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাম বসু।

অনেকেরই নাম উল্লেখ সম্ভব হলো না। তবু এঁদেরও পরে এই ভাবনার নতুন এক কবিগোষ্ঠী বাঙলা-সাহিত্যে পদার্পণ করেছেন — সিদ্ধেশ্বর সেন, তরুণ সান্যাল প্রভৃতি কবিরা বাঙলা-সাহিত্যে লেনিনীয় সুপ্রতিষ্ঠিত কবি। 'পরিচয়' বা ওরূপ প্রগতিশীল ধারার পত্র-পত্রিকা তাঁদের সার্থক সাক্ষ্য প্রতিদিন বহন করছে। নামোল্লেখও অসম্ভব — সংখ্যায় তাঁরা নগণ্য নন। আর কৃতিত্বের দিক থেকে বলা যায়, বাঙলা কবিতার সমস্ত ক্ষেত্রে তাঁরা সগৌরবেই স্বীকৃতি লাভ করেছেন। সেই সঙ্গে লেনিনের এই রূপও বাঙলা-সাহিত্যের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট — (১) লেনিন শুধু রুশিয়ার নন, বিশ্বমানুষের। বিশেষ করে বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের মুক্তির মহানায়করূপেই তিনি সকল ভাষার সাহিত্যেরও প্রেরণার উৎস। (২) ব্যক্তি-সত্তার দ্বন্দ্বোত্তীর্ণ পরিণত সাযুজ্যের মন্ত্রদ্রষ্টা, এবং (৩) নতুন মানব-সাধনার স্রষ্টারূপে লেনিন মানুষের সর্বকালের অধ্যাত্মসম্পদ। শুধু এ-শতাব্দীতে নয়, আগামী বহু শতাব্দীতেও এই যুগ-পুরুষের প্রেরণায় শিল্প-সাহিত্য সমুজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

বাঙলা সাহিত্যে দেখি — লেনিনের এই রূপ।

নয়াবাম মানসিকতার একদিক

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

'নয়াবাম', — আজকের দিনের ছাত্র-তরুণদের এক অংশের স্ব-আরোপিত অভিধা।

নয়াবাম-মানসিকতা, নয়াবাম প্রবনতা, সমাজতাত্ত্বিক-মনস্তাত্ত্বিকদের বিশেষ আগ্রহ ও কৌতূহল উদ্রেক করেছে। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নয়াবাম-মনস্তত্ত্ব নিয়ে অনেক সমীক্ষা চলেছে, সমীক্ষকদের রিপোর্ট নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে, রিপোর্টের উপর তর্ক-বিতর্কের ঢেউ বয়ে যাচ্ছে। অধিকাংশ সমীক্ষাই বুর্জোয়া-সমাজতত্ত্বের ফ্রেমে-বাঁধা অথবা ফ্রয়েডীয় ও নিও-ফ্রয়েডীয় প্রত্যয়ভিত্তিক। তা সত্ত্বেও সমীক্ষাগুলি তথ্যবহুল, এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সমীক্ষকদের সিদ্ধান্ত পূর্ব-পরিকল্পিত না হওয়ায় বিষয়মুখতা মোটামুটি অক্ষুণ্ণ। বুর্জোয়া সংবাদপত্র নয়াবামদের সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহী। সংবাদপত্রের কৃপায় কয়েকবছর আগেকার নয়াবাম আন্দোলনের নেতারা আজ বিশ্ববিখ্যাত ; তাদের সমাজবিমুখ পশ্চাদবর্তিতা এ-দেশের এবং অন্যান্য দেশের তরুণদের মধ্যে এখনও বিদ্যমান। শিল্প-সাহিত্যের বাজারে হিপী-বিটিদের প্রভাব অটুট, যদিও আজকের নয়াবামদের জঙ্গী মনোভাবের ফলে কিছুটা ম্লান। যাটের দশকে নয়াবাম আন্দোলনে 'এ্যাকটিভিষ্ট'দের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে, 'রিসেসিভ'রা আরো পিছু হটে আন্দোলনের বৃত্ত থেকে প্রায় নিষ্ক্রান্ত হয়েছে। ছাত্র-তরুণরা কয়েক বছর আগে যখন দক্ষিণ-কোরিয়া, তুরস্ক, ইন্দোনেশিয়ায় বাম বা দক্ষিণ-রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তখন আমেরিকা ইউরোপের নয়াবাম আন্দোলনে এ্যাকটিভিষ্টদের প্রভাব এত স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়নি। আজ নয়াবাম নেতৃত্বের দাবি অনুসারে প্রায় সর্বত্র নয়াবাম আন্দোলন শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে পরিচালিত। ত্-বছর আগেকার মে মাসে ফরাসী দেশের ঘটনা (নয়াবাম শিবিরের মতে বিদ্রোহ, যা কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধাচরণের ফলে অসমাপ্ত রয়ে গেছে) থেকে আজকের বন, ম্যানিলা প্রভৃতি শহরে যুদ্ধবাজ

শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ছাত্রদের প্রতিবাদ, সারা আমেরিকা জুড়ে নিক্সন-এর যুদ্ধ নীতির প্রতিকূলতায় ছাত্র-ছাত্রীদের বিক্ষোভ-মিছিল, যার ফলে এই সেদিন কেণ্ট স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের চারজন তরুণ-তরুণী জাতীয় প্রহরী-বাহিনীর গুলিতে নিহত হলেন ;—এ-সবই বর্তমান নয়াবাম আন্দোলনে জঙ্গী ভাবাপন্ন এ্যাকটিভিষ্টদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব-প্রতিপত্তির নির্দেশক। সাম্প্রতিক কালের নয়াবাম আন্দোলনের এই যুদ্ধ ও আগ্রাসন-নীতির বিরোধিতা-ইস্রায়েলে গোল্ডামেয়ার-মোশে দায়ান-এর সরকারের বিরুদ্ধেও সোচ্চার। আমেরিকা ও ইস্রায়েলে ছাত্র-তরুণদের এই মনোভাব সরকারী নীতির আশু পরিবর্তন ঘটাতে না পারলেও, সরকারকে অসুবিধায় ফেলেছে নিশ্চয়ই। এই নয়াবাম আন্দোলনের গুরুত্ব ঐ সব দেশের সরকারী অনুগ্রহপুষ্ট সংবাদ-পত্র ও তথ্য সরবরাহকারীরাও অস্বীকার করতে পারছেন না।

নয়াবাম মানসিকতা এদের আন্দোলনের রূপ, রীতি ও উদ্দেশ্য নিয়ন্ত্রণ করছে, আবার এদের আন্দোলনের রূপ-রীতি দ্বারা অনেকাংশে এদের মানসিকতা প্রভাবিত হচ্ছে। আন্দোলনের রূপ দেশ-কাল ভেদে বিভিন্ন। কখনও স্তিমিত, কখনও তীব্র ; কোথাও সীমিত, কোথাও ব্যাপক, এই মুহূর্তে অন্তঃসলিলা ফল্গু, পরমুহূর্তে প্রমত্তা পদ্মা। নয়াবামদের মতে এই অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা তাদের আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য।

লণ্ডন থেকে প্রকাশিত 'নিউ লেফট রিভিউ' পত্রিকার (নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৬৮) সম্পাদকীয় স্তম্ভে [১] বলা হয়েছে,—ফ্রান্সের মে-বিপ্লবের সম্ভাবনা আগে থেকে কেউ বুঝতে পারেননি। কোনোভাবে সতর্ক না করে বিপ্লব পৃথিবীর ওপর ফেটে পড়েছিল। পূর্ব-কল্পিত কোনো প্যাটার্নের সঙ্গে এর মিল ছিল না। ফ্রান্সের শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব-ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গিয়েছে, শ্রমিকরা মালিক-শ্রেণীর স্বার্থের তাঁবেদার, তাদের কোনো অভিযোগ নেই, অসন্তোষ নেই ; বুর্জোয়া সমাজতাত্ত্বিকদের সমীক্ষার ফলে এই রকমই মনে হয়েছিল। দেখা গেল বিপ্লবের স্রোত শুকিয়ে যায়নি, সহসা সিসমোগ্রাফে কোনো সঙ্কেত না

১। The May Revolution in France was foreseen by nobody.. It burst upon the world without warning—Editorial Introduction; New Left Review, Nov-Dec 1968 Pp 1.

দিয়েই ভূকম্পন শুরু হয়ে গেল ২। প্রশ্ন করেছেন সম্পাদক — কিভাবে এই চৈতন্যের বিস্ফোরণের ব্যাখ্যা করা যায়? ঘুমন্ত, মৃতপ্রায় বলে যাদের মনে হয়েছিল, তারা নয়াবাম আন্দোলনের মৃতসঞ্জীবনী স্রোতের স্পর্শে সহসা চোখ মেলে, মুষ্টিবদ্ধ হাত আকাশে তুলে আবার বিপ্লবের শপথ নিল। মানসিকতার পরিবর্তন আকস্মিকভাবেই ঘটে। আজ যারা সন্তুষ্ট ও বুর্জোয়া-অনুগামী শান্তশিষ্ট শ্রমিক, কালই তারা অননুগামী বিদ্রোহী হয়ে যেতে পারে। চৈতন্যের অভিব্যক্তি সম্পর্কে এ-যাবত যে-ক্রমবিকাশ তত্ত্ব প্রচার করা হয়েছে, সে-তত্ত্বের অসারত্ব মে-বিপ্লব দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। নয়াবাম মানসিকতায় বিপ্লবের আকস্মিকতা ও স্বতঃস্ফূর্ততার চিত্র বিশেষভাবে পরিস্ফুট ৩।

ড্যানিয়েল কোন বেণ্ডিটকে নয়াবামদের প্রতিনিধি বলে স্বীকার করে নিলে এই সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে, কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা আজ নিঃশেষিত; রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক পরিবর্তনে পুরনো ধাঁচের আন্দোলনের আজ আর কোনো মূল্য নেই। তাই নয়াবামরা শুধু পার্টিবিরোধী নয়, সর্বপ্রকার সংগঠন বিরোধী। কমিউনিস্ট পার্টি, ট্রেড-ইউনিয়ন বা ঐ জাতীয় গণসংগঠনের প্রতি এদের ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা অতি তীব্র।৪

২। The whole apparatus of sociology — polls, tests and questionaires — was brought to bear, not only by bourgeois scholars but also by socialists, in order to show that the working class had lost its impulse to challenge the status quo. ···We know now that all this speculation is utterly discredited. Advanced capitalist society does not reduce all its citizens into helpless automata, incapable of exercising free and independent action. The well-spring of revolt has not dried up [Ibid Pp 2].

৩। How do we explain this sudden switch of consciousness, this abrupt reversal from acceptance to rebellion, from obedience to mutiny? ···We need a theory of dual consciousness, a theory that can take account of abrupt and unexpected alternations and switches. Just as history shows uneven and confined development, so too does consciousness.

বেণ্ডিট ভ্রাতৃদ্বয়-এর লিখিত, পুস্তকটিতে [অবসলিট কমিউনিজম: দি লেফট উইং অল্টারনেটিভ] বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-পদ্ধতি, পাঠ্যক্রম, সংগঠন, পরিচালনা ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা আছে। তীব্রতর ঘৃণা প্রকাশ করা হয়েছে কমিউনিস্ট ও ট্রেড-ইউনিয়ন নেতাদের প্রতি। ধনতন্ত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিফলিত। বিশ্ববিদ্যালয় একদিকে শিল্পপতিদের অর্ডার মাফিক তাদের মুনাফা অর্জনের সাহায্যকারী হিসেবে তরুণ ছাত্রদের ভেঙে চুরে আমলাতান্ত্রিক ছাঁচে ফেলে যন্ত্রের দোসর এই সমাজব্যবস্থার পরিপোষক ইঞ্জিনীয়ার, মেকানিক, ম্যানেজার, মনস্তাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিক, কেরানী দক্ষ শ্রমিক তৈরি করছে; আবার অন্যদিকে একই সঙ্গে এইসব তরুণ-মানসে মানবতাবাদী দর্শন, মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ শিল্প-সাহিত্য ও অনুসন্ধানকারী বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ গড়ে তোলবার চেষ্টাও করছে। এভাবে শোষণ ব্যবস্থার মূল চরিত্র ঢেকে রাখা সম্ভব নয়। শোষণ যন্ত্রের অঙ্গ বিশেষে পরিণত হতে এসে ছাত্রদের অগ্রগামী অংশ শোষণের স্বরূপ বুঝতে পারছে, দুর্নীতি ও বিবেকহীনতার কারণগুলো জানছে। যে-বিশ্ববিদ্যালয় তাকে যন্ত্রাঙ্গ অটোমেটনে পরিণত করতে চাইছে, সেই আবার নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকে মুক্তিপ্রয়াসী বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত করছে। শোষণযন্ত্র তথা সর্বপ্রকার আমলাতান্ত্রিক সংগঠন ধ্বংস করবার প্রেরণা যোগাচ্ছে। এ-ছাড়া এই নয়াবাম নেতার বক্তব্য এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম, সংগঠন ও পরিচালনা ব্যবস্থা — কোনোটাই দ্রুত পরিবর্তনশীল দুনিয়ার সঙ্গে পরিবর্তিত হচ্ছে না। অচলায়তন হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় অচল অবস্থার সৃষ্টি করছে। তাই তারা, সংগ্রামী বামরা, শিক্ষা-যন্ত্রের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে, বিশ্ববিদ্যালয় দখল করবে।[৫] তাই তারা কারখানার প্রশাসক পদের জন্য নিজেদের তৈরি রাখবে। কিন্তু কিভাবে? স্বতঃস্ফূর্তভাবে যেদিন হঠাৎ রোষের প্রকাশ ঘটবে, সেইদিনে আকস্মিকভাবে ক্ষমতা দখল কি সম্ভব? এই বামরোষ 'কিন্তু (যাই বলুন না কেন নিউ লেফট রিভিউ-এর সম্পাদক) আকস্মিক নয়, একে স্বতঃস্ফূর্ত বলা তো চলেই না। ১৯৬৩ সালে

৪। Obsolete communism: The Left Wing alternative, Daniel Cohn Bendit and Gabriel Cohn Bendit.

৫। মানবমন: এপ্রিল জুন ১৯৬৯, পৃষ্ঠা ১৩৫-৩৬।

প্রকাশিত একটি সার্ভে রিপোর্ট[৬] থেকে আমরা জানতে পারি যে, সাত-আট বছর আগেও গ্রেট ব্রিটেনের মতো সংরক্ষণশীল দেশের ছাত্রদের এক অংশের মনে রোষবহ্নি ধূমায়িত হচ্ছে। তারও কয়েক বছর আগে থেকেই শিল্পে সাহিত্যে নাটকে রাগী যুবকদের প্রাধান্য দেখা গেছে। আমাদের দেশেও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা ব্যবস্থা, পাঠ্যক্রম ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ছাত্রদের ক্রোধ প্রকাশ ও বিশৃঙ্খল আচরণ এক দশকেরও বেশি পুরনো। রোষ স্ফুলিঙ্গ আকারে দেখা দিয়েছে বহুপূর্বে, রোষ সঞ্চিত হচ্ছে বহুদিন ধরে। বিশেষ রাজনৈতিক-সামাজিক পরিবেশে হয়ত দাবানল জ্বলে উঠছে। শুধু ছাত্র নয়, শুধু তরুণ নয়, বয়স-ধর্ম-পেশা নির্বিশেষে সকলেই আজ রুষ্ট। রোষপ্রকাশের সুযোগ-সুবিধা ছাত্রদের বেশি, তাই দল বেঁধে তারা পুরনো সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশ করছে, সব কিছু ভেঙে ফেলতে চাইছে। এই ধরনের কথা আমরা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির

৬। The second group, forming a minority of a quarter, responded positively to my question : 'Are you angry about something'? but the anger was rather concocted and lukewarm. The answers run as follows :

"I am angry about the way Britain is run"

"I am angry about nothing getting done, about our stagnant society"

"I am angry about the commercialism and materialism of our older generation"···

"I am angry about our educational system"

"I am angry about the H. Bomb"

"I am angry about the present society, it is all wrong"

"There is a lot of good in rebellion of youth"

"I am angry at being treated as a child"

"I am angry against these who are telling me what to do".

(Ferdy and Zweig : The student in the Age of Anxiety—A Survey of Oxford and Manchester Students : (1963)—Pp 129).

মুখে শুনতে পাচ্ছি। কিছু সত্য এই বক্তব্যের মধ্যে আছে নিঃসন্দেহ, কিন্তু ছাত্ররোষের ব্যাপকতা ও গভীরতার ব্যাখ্যা এই বক্তব্যের মধ্যে পাওয়া যায় না। সমাজ-বাস্তবের যে-ছবি এঁদের বক্তব্য থেকে ফুটে ওঠে, তা থেকে অনুমিত হয় যে, আমরা এক পরিবৃত্তিকালীন সঙ্কটের মধ্য দিয়ে চলেছি। সেই সঙ্কটকালীন অস্থিরতা শুধু ছাত্র-তরুণ নয়, কম-বেশি সব মানুষকেই প্রভাবিত করেছে, এবং ফলে বিশেষ এক মানসিকতার উদ্ভব হয়েছে। "সাধারণ অদীক্ষিত মানুষের মনে এই অবস্থায় সবকিছু তালগোল পাকাইয়া বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। পরিবর্তন এত দ্রুত ঘটিতে থাকে যে মানুষ দিশাহারা হইয়া পড়ে।···যুক্তি-বুদ্ধি ভাব-প্রবণতার মধ্যে লড়াই বাধে। যে-জগতকে চিনিতাম, বুঝিতাম, তাহার রূপরেখা অস্পষ্ট হইতেছে, রঙ মুছিয়া যাইতেছে, অন্য এক জগত নূতন রঙে, নূতন রূপে, নূতন রেখায় ফুটিয়া উঠিতেছে ; কিন্তু তাহাকে জানি না, চিনি না, বুঝি না। কোনটি আমার নিজস্ব? পরিবৃত্তিকালীন মনোবৃত্তি অনেকটা জীবন-মৃত্যু সন্ধিক্ষণে রণাঙ্গনে সৈনিকের মনোবৃত্তির সমান"[৭] 'নিউ লেফট রিভিউ'-এর সম্পাদক বা বেণ্ডিট ভ্রাতৃদ্বয়কে জানাতে চাই যে এই মানসিকতা দ্বারা তাঁরাও আচ্ছন্ন। প্যারীতে মে মাসের অভ্যুত্থান (?) কোনো বিচ্ছিন্ন, স্বতঃস্ফূর্ত ঘটনা নয়। ধনতন্ত্রের ক্রমবর্ধমান সঙ্কটের অভিব্যক্তি এই ঘটনা। তাঁরা যে-সব বিপ্লবী তত্ত্ব পরিবেশন করতে চেয়েছেন, সেগুলো ভাববাদী দার্শনিকদের কথা। মার্কসবাদকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যে এই ধরনের কার্য-কারণ-সম্পর্ক রহিত অনিশ্চয়তাবাদ, স্বতঃস্ফূর্ততা, আকস্মিকতাতত্ত্ব বহুবার বহুভাবে প্রচারিত হয়েছে,[৮] এবং মার্কসবাদীদের দ্বারা প্রতিক্রিয়াশীল

৭। মানবমন, এপ্রিল-জুন ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ১৪৫

৮। সম্পাদক (নিউ লেফট রিভিউ) বলছেন :—"This means that we must reject those traditional theories of strategy and tactics which have postulated and emphasised the gradual growth of consciousness. ···It envisages the gradual growth of a mass party, directed phase by phase and step by step by an enlightened vanguard until eventually a moment of crisis is reached and the process culminates in revolution" (New Left Review : op cit : Pp 2-3).

তত্ত্বকথা যথাযথভাবে খণ্ডিত হয়েছে। বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করতে গিয়ে আমরা যদি অবৈজ্ঞানিক মার্কসবাদ-বিরোধী তত্ত্বকথার উপর আস্থা স্থাপন করে বসি, বিপ্লবের পরিবর্তে প্রতিবিপ্লব ত্বরান্বিত হবে। মার্কসবাদীরা দ্বান্দ্বিক বিচারের সাহায্যে পূর্বাভাষ প্রদানে সক্ষম। পূর্বাভাষ সব সময়ে অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাবে, এমন কথা নয়। তা বলে, ইতিহাসের ধারাবাহিকতা নেই, সবকিছু ঘটছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে, চৈতন্যের ক্রমবিকাশ নয় আকস্মিক বিকাশ-তত্ত্বই একমাত্র সত্য; এই ধরনের একপেশে তত্ত্বকথা সত্য হয়ে উঠবে না। উইলিয়াম এ্যাশ ৯ মার্কসবাদ-বিরোধীদের লক্ষ্য করে যে-কথাগুলো লিখে ছিলেন, সে-কথাগুলো এঁদেরও শোনানো যেতে পারে। যদিও এঁরা, এই নয়াবাম প্রবক্তারা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনুমান করতে সরাসরি নিষেধ করছেন না, বা মার্কসবাদকে প্রত্যক্ষভাবে নস্যাৎ করছেন না, তবুও তাঁদের বক্তব্য মার্কসবাদ-বিরোধিতারই সামিল। সমাজ-ইতিহাসের মার্কসবাদী বিশ্লেষণ থেকে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনো আভাষ পাওয়া যায় না বলা আর মার্কস-এর ইতিহাস ব্যাখ্যাকে অস্বীকার করা একই কথা। বিপ্লবের সঠিক দিন-ক্ষণ নির্ণয় করা দুরূহ বটে, কিন্তু বৈপ্লবিক পরিস্থিতি অনুমান করে পার্টির 'স্ট্র্যাটেজী ট্যাকটিকস' ঠিক করা মার্কসবাদীদের পক্ষে সম্ভব। রুশিয়া, চীন, কিউবার ইতিহাস

৯। An empiricism of observation alone, divorced from experimental practice can prove nothing about the future of anything and ascribe its own disability to history's inscrutable nature. Far from being a method for securing tentative social advances, neo-empiricism has become a check on any change at all; and it betrays its non-materialist character by the utterly sterile and scholastic quality of its formulations by arguing that no prediction can be absolutely correct in every detail and therefore that no major social changes should ever be envisaged, this so called empiricism shows itself to be as static an idealism as the philosophical foundations of Plato's frozen Republic. William Ash : Marxism and Moral Concepts : Pp 116-117)

নয়াবাম-তত্ত্বকে সপ্রমাণ করে না। রুশিয়া, চীনে কমিউনিস্ট পার্টি বিপ্লবের পরিস্থিতি সঠিক অনুমান করেছিলেন, এবং সুশৃঙ্খলায়িত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বিপ্লবকে সাফল্যমণ্ডিত করেছিলেন। কিউবাতে কাস্ত্রো এবং তাঁর অনুগামীরা বিপ্লবের পূর্বাভাষ বুঝেছিলেন এবং তাই বিপ্লবকে সংগঠিত করতে পেরেছিলেন। রুশিয়ায়, চীনে, কিম্বা কিউবায় কোথাও পার্টি বা বিপ্লবী দল স্বতঃস্ফূর্ত বিপ্লব-তরঙ্গের শীর্ষে আরোহণ করে বিপ্লব সফল করার বাহাদুরি নিতে চাননি। নয়াবামরা যাকে স্বতঃস্ফূর্ত বলে মনে করেছেন আসলে তা নিরবচ্ছিন্নভাবে চলমান শ্রেণীসংগ্রামের একটা বিশেষ রূপ; মাত্রাগত পরিবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তনে উত্তরণের রূপ। চৈতন্যের বিস্ফোরণ বা আকস্মিক আবির্ভাব ঐ একই কথা। নয়াবামরা যান্ত্রিক এবং ভাববাদী ধারণায় আবিষ্ট। চেতনার আদিরূপেরও ধারাবাহিকতা ও ক্রমবিকাশ আছে। সংবেদন হঠাৎ একদিন আকস্মিকভাবে বস্তুর মধ্যে আবির্ভূত হয়নি। বাইরে থেকেও আরোপিত হয়নি। বস্তুর লক্ষ লক্ষ বছরের অভিব্যক্তি (ইভোলিউশন) ও ক্রমবিকাশের ফলে চেতনার প্রথম পর্যায় সেনসেশন বা সংবেদন ক্ষমতা লাভ করেছে। অজৈব থেকে জৈব পদার্থে উন্নীত হয়েছে। এককোষ প্রাণী ক্রমবিবর্তনের ফলে ক্রমশ মানুষ হয়েছে। নয়াবামরা এই ক্রমবিকাশ, এই নিরবচ্ছিন্নতা, এই ধারাবাহিকতা স্বীকার করতে চান না। এই স্বীকার করতে না চাওয়ার মধ্যে বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। বাইরের সমাজ-বাস্তবের উদ্দীপনা মস্তিষ্ককে উত্তেজিত করার ফলে ধীরে ধীরে চেতনার সঞ্চার, বিস্তার ও বিকাশ ঘটে— এই কথা স্বীকার করলে অভিজ্ঞতাকে মূল্য দিতে হয়, অগ্রগামীকে শ্রদ্ধা করতে হয়। যুক্তি-বুদ্ধির আধিপত্যকে স্বীকার করলে হঠকারিতাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না, 'পারমেনাণ্ট রেভোলিউশন'কে স্বাগত জানানো যায় না। নয়াবামরা অগ্রগামীদের উপর নানাকারণে শ্রদ্ধা হারিয়েছেন। মার্কসবাদকে অস্বীকার করতে চাইছেন, কেননা অগ্রগামীরা মার্কসবাদকে বিপ্লবের হাতিয়ার মনে করে এসেছেন ও এখনও মনে করছেন। উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কর্ম-প্রচেষ্টা ও চেতনাশ্রিত উদ্দেশ্যকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন মার্কস। সজ্ঞানে উদ্দেশ্য ও অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য প্রয়োজন পরিকল্পনার, এবং পরিকল্পিত কর্ম সম্পাদনের বিধিনিয়মের কাছে নিজের ইচ্ছাকে বিসর্জন দিতে উপদেশ দিয়েছেন। নয়াবামদের আকস্মিকতা ও স্বতঃস্ফূর্ততা তত্ত্বের মধ্যে আমেরিকার ব্যবহারবাদীদের প্রভাব সুস্পষ্ট।[১০] যুক্তিবুদ্ধির পরিবর্তে যান্ত্রিকতার জয়গান অথবা বলা চলে, একেবারে বিপরীত

মেরুতে অবস্থিত গেস্টাল্ট মনস্তত্ত্বের প্রচার বিভাগের ভার নিয়েছেন, এই নবীন বিপ্লবীরা। মার্কসবাদের 'কগনিশান তত্ত্বকে' একসময় এই গেস্টাল্ট তত্ত্ব ভাববাদী দর্শনের তরফ থেকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল। বিজ্ঞানী পাভলভ এই 'হঠাৎ জ্ঞানোদয়' বা গেস্টাল্ট তত্ত্বকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা খণ্ডন করেছেন। মার্কসবাদ এর দ্বারা বিশেষভাবে লাভবান হয়েছে।[১১]

১০। Nominally behaviourism implies the study of the behaviour of animals under the influence of external stimuli. The behaviour of animals and of men too, is said to be the sum total of the body's responses to external stimuli, under whose influence the animal organism engages in purely mechanical exercise. Hence rejection of the conscious activity of animals and men, which is dissolved in the mechanical responses of the organism. There is no indication whatsoever of any activity of the consciousness, or of man's reason. This behaviourist view of psychical activity of animals and men is purely mechanical, oversimple and vulgar (Kursanov G.—Fundametals of Dialectical Materialism : Pp 108—109)

১১। গেস্টাল্টবাদীদের বক্তব্য কি? তাঁরা অখণ্ডতারূপ মতবাদের প্রতিনিধি ও প্রবক্তা। তাঁদের মত হলো, সমগ্র সংশ্লেষিত রূপই হলো বিবেচ্য বিষয়, কোনো বিচ্ছিন্ন প্রকাশ নয়। গেস্টাল্ট শব্দটির অর্থ হলো নক্সা, বিশিষ্ট নমুনা বা প্রতিমূর্তি।...গেস্টাল্টবাদের বিদ্রোহ হলো মনস্তত্ত্বের মৌল সমস্যারূপে বিশ্লেষণ ক্রিয়াকে স্বীকৃতি দেবার বিরুদ্ধে। এই দৃষ্টিভঙ্গীটি ভারী অদ্ভুত, কারণ বিজ্ঞানের সব বাস্তব ও আধুনিক শাখাই বিশ্লেষণ ক্রিয়াকে ভিত্তিরূপে গ্রহণ করে থাকে এবং প্রারম্ভিক কাজের সূত্রপাত করে এই বিশ্লেষণকে অবলম্বন করেই। উণ্ডের বিরুদ্ধে অর্থাৎ অনুষঙ্গবাদের বিরুদ্ধ মতবাদ হিসেবেই এই গেস্টাল্টবাদের আত্মপ্রকাশ। সরল পরাবর্ত ও সংবেদন — এ দুটিকেই মেনে নিতে অস্বীকার করছে [মানবমন, জুলাই ১৯৬৪, পৃষ্ঠা ১২১]। উপরের উদ্ধৃতি আই. পি. পাভলভের "বুধবাসরীয় আলোচনাচক্রের' ১৯৩৪ সালের ২৮শে নভেম্বরের আলোচনা থেকে নেওয়া। পাঠকদের মনে রাখা দরকার সংবেদন ও বিশ্লেষণকে অস্বীকার করার অর্থ বস্তুবাদী মনস্তত্ত্বকে অস্বীকার করা। হঠাৎ চৈতন্যোদয় তত্ত্ব মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বিরোধী —" লেখক।

মার্কসবাদীরা মনে করেন চৈতন্য-বিকাশ সামাজিক অগ্রগতির সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত। চৈতন্য-বিকাশ অবিচ্ছিন্নভাবে ঘটে।[১২]

নয়াবামদের বক্তব্য ও কর্মপন্থার বিশ্লেষণে আমি কি একটু বেশিমাত্রায় মার্কসীয় দর্শন থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে ফেলেছি? তাঁরা কি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বলে আখ্যাত হতে চান? তাঁদের কাছে এইসব উদ্ধৃতির মূল্য আছে কি? আমার মনে হয়, আছে। নয়াবামদের মধ্যে নানা ধরনের মতবাদের প্রভাব আছে। মার্কস, ট্রটস্কি, মাও, কাস্ত্রো, চে, মারকিউস, — এইসব ব্যক্তিত্ব দ্বারা তারা প্রভাবিত বলে শুনতে পাই। এর মধ্যে এক মারকিউস ছাড়া আর সকলেই মার্কসবাদী বলেই পরিচিত। আমাদের দেশে তো নয়াবামদের এক বৃহৎ গ্রুপ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বলে নিজেদের প্রচার করেন। সুতরাং মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মৌল এবং সর্বজনস্বীকৃত প্রত্যয়গুলিকে তাঁরা অগ্রাহ্য করতে পারেন না। সময়োপযোগী করে রণকৌশল, 'স্ট্র্যাটেজি-ট্যাকটিকস' নির্ধারণ করতে পারেন কিন্তু দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদকে নস্যাৎ করতে পারেন না। তাঁরা যদি ঘোষণা করেন যে মার্কসবাদ মৃত বা বর্তমান পরিস্থিতিতে অচল, তাহলে অবশ্য আমার আর বলার কিছু থাকবে না। আমার মনে হয়, পুরনো মার্কসবাদী পার্টিগুলোকে আক্রমণ করার ঝোঁকে, তাঁরা মার্কসবাদকেও আক্রমণ করে চলেছেন। এর দ্বারা প্রতিক্রিয়ার শক্তিই বাড়ছে। নয়াবাম আন্দোলনের আসল উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করা, শুধু অরাজকতা বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা নয়। তাঁরা নিশ্চয়ই গত শতাব্দীর বাকুনিন ও ব্ল্যাংকুই-এর মতো নৈরাজ্যবাদী রোমান্টিসিজমে ও ইউটোপিয়ান কমিউনিজমে বিশ্বাসী নন। কেবলমাত্র চাষী ও লুমপেন প্রলেতারীয় বিপ্লব আনয়নে সক্ষম, আর কেউ নয়, — এই অবাস্তব

১২। Human consciousness develops continuously on the basis of the whole of human social development. It rises gradually to the level of abstract theoretical activity when it takes for its object not only the immediately perceived things, but also their relations. By reflecting the real relations and ties between objects, man identifies himself in the objective world and unlike the animal, comprehends his relation to it (Kursanov G : Fundamentals of Dialectical Matereealism. Pp 106).

ধারণা নয়াবামদের সকলে পোষণ করেন না নিশ্চয়ই। মারকুইস দ্বারা এদের সকলেই প্রভাবিত, আমি তা মনে করি না। উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশের শ্রমিক শ্রেণীর বৈপ্লবিক শক্তি নিঃশেষিত, — ১৯৬৮ সালের মে মাসের পর তারা নিশ্চয়ই এরকমটি আর ভাবছেন না। তাঁদের ভুল করে কেউ পেটি-বুর্জোয়া সুলভ রোমান্টিক বা হঠকারী বলুক — এ তাঁরা নিশ্চয়ই চান না। আমেরিকান সরকার, ইস্রায়েল সরকারের বিরুদ্ধে তাঁদের প্রতিবাদ-বিক্ষোভের আন্তরিকতায় কেউই সন্দিহান নয়। নবীনের ধর্ম, তারুণ্যের উচ্ছ্বাসকে আমরা অভিনন্দন জানাতেই চাই, কিন্তু অতি-উৎসাহের ঝোঁকে বিপ্লবের সর্বাত্মক এবং একমাত্র সত্য দর্শনায়ুধকে, মার্কসবাদকে, তাঁরা যদি বিকৃতির প্রলেপে অকেজো করে তোলেন, তবে প্রতিবিপ্লবকে শক্তিশালী করে মৃতপ্রায় ধনতন্ত্রকে তাঁরা আরো বেশ কিছুদিনের জন্য জীইয়ে রাখতে সাহায্য করবেন। তাই তাঁদের মানসিকতা আমরা ভালভাবে বুঝতে চাই, আমাদের মন তাঁদের কাছে মেলে ধরতে চাই। আন্তরিকভাবে পরস্পর পরস্পরকে বুঝতে চেষ্টা করি যদি, নিশ্চয়ই আমরা অনেকখানি কাছাকাছি আসতে সক্ষম হব। "জেনারেশন গ্যাপের" বাধা দুরতিক্রম্য নয়।

এতক্ষণ নয়াবামদের রাজনীতি ও রণকৌশলের মধ্যেই আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ ছিল। এইবার তাঁদের রোষের, মৌলিক কারণগুলো বুঝতে চেষ্টা করব। নয়াবাম মানসিকতার প্রধান বৈশিষ্ট্য পুরনো সব কিছুর প্রতি ঘৃণা এবং অশ্রদ্ধা। এই রোষ, ঘৃণা, অশ্রদ্ধার বহিঃপ্রকাশ কখনও প্রতিবাদ-মিছিলে, কখনও বিক্ষোভ-সভায়, কখনও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে, কখনও বা প্রধান-শিক্ষক বা উপাচার্যের কক্ষে। রোষ-বহ্নি হঠাৎ জ্বলে উঠছে, অনেক কিছু ভস্মসাৎ হচ্ছে। কোনো সময় এদের দাবি অযৌক্তিক, কোনো সময় দাবি-দাওয়ার যৌক্তিকতা অনস্বীকার্য। দাবি-দাওয়ার যৌক্তিকতা নির্ধারণের চেষ্টা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা শুধু আমাদের দেশের ছাত্রদের মানসিক পরিমণ্ডলে প্রবেশের চেষ্টা করব, সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করব, তাঁদের রোষ ও ঘৃণার সামাজিক-আর্থনীতিক ও পারিবারিক কারণগুলো বিশ্লেষণের চেষ্টা করব। বলা বাহুল্য, এই স্বল্প-পরিসর প্রবন্ধে বিস্তারিত বিচার বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। লেখকের সামর্থ্যও অত্যন্ত সীমিত। এই বিষয় নিয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে যেসব আঞ্চলিক নিরীক্ষার রিপোর্ট বেরিয়েছে, তার সাহায্য প্রয়োজন মতো আমরা গ্রহণ করব। দুঃখের বিষয়, বস্তুবাদী মনস্তত্ত্বসম্মত আলোচনা

এযাবত আমাদের নজরে পড়েনি, তাই আমরা ক্ষমতার স্বল্পতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ থাকা সত্ত্বেও, এই দুরূহ কাজে এগিয়ে এসেছি। গবেষক-নিরীক্ষকদের কাছে এযাবত অবহেলিত একটি দিক অতি সংক্ষেপে তুলে ধরবার চেষ্টা করব।

ছাত্র-তরুণরা ঐতিহ্যবিরোধী, সবরকম 'অথরিটি, কনফরমিটি'কে আঘাত করতে চায়, সবরকম প্রতিষ্ঠান ভেঙে ফেলতে চায়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় গুরুদ্রোহিতা ও অননুগামিতাই এঁদের মানসিকতার প্রধান বৈশিষ্ট্য, এঁদের বিদ্রোহের চালিকাশক্তি। একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে এর বিপরীত মনোভাবও এঁদের মধ্যে বিদ্যমান। এঁরা গুরুজনকে অনেক ক্ষেত্রে অনুকরণ করছেন, তাঁদের মতোই আচরণ করে তাঁদের প্রতি আনুগত্য, অনুগামিতার পরিচয় দিচ্ছেন। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে কর্পোরেশন, বিধানসভা, লোকসভায় ছাত্র-তরুণদের পিতৃ-পিতৃব্যরা যে-ব্যবহার, যে-আচরণের নজির দেখিয়েছেন ও দেখাচ্ছেন, সেই বিশৃঙ্খলা, সেই নিয়ম-অননুবর্তিতাই তাঁরা তাঁদের রাজ্যে প্রদর্শন করছেন। পিতৃ-পিতৃব্যকে যেসব কাজের জন্য তাঁরা শ্রদ্ধা করতে পারছেন না, সেইসব কাজ, সেইরকম ব্যবহার করেই তাঁরা তাঁদের রোষ ও ঘৃণা প্রকাশ করতে তৎপর হয়ে উঠেছেন। গত কয়েক বছরের শিক্ষকদের আন্দোলন, ব্যবহার ও আচরণে কি 'ডিসিপ্লিন' প্রদর্শিত হয়েছে? এই অবস্থায় শিক্ষক অভিভাবকরা ছাত্রদের কাছে নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রতি আনুগত্য আশা করতে পারেন কি? উত্তরে তাঁরা বলবেন, শাসক ও শোষক সম্প্রদায়ের অনমনীয় মনোভাবের বিরুদ্ধে নিজেদের নিম্নতম দাবি-দাওয়ার জন্য তাঁদের লড়াই করতে হচ্ছে এবং হবেই। এর জন্যে যদি পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের মর্যাদা রক্ষা না হয়, নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গ হয়, দায়ী সংশ্লিষ্ট অথরিটি। প্রতিবাদ করব না, করবারও কারণ দেখি না। রোষ প্রকাশ করে, বিশৃঙ্খল আচরণ করে তাঁরা আংশিক ভাবে তাঁদের দাবি-দাওয়া আদায় করেছেন। ছাত্ররাও ঠিক সেই পথই বেছে নিয়েছে[১৩] কর্তৃপক্ষ মাত্র একটি ভাষাই বোঝেন,—রোষের এবং

১৩। ......As students have been succeeding in most of their indisciplined adventures, it has been proved to them that their methods are right. This is heady wine indeed and they are intoxicated by their power against confused and vacillating authorities (Cormach Margarett : She who rides a Peacock ; Indian Students & Social Change — a research analysis, Asia Publishing, 1961-Pp 210).

ঘৃণার ভাষা; সেই ভাষাতেই বিবদমান পক্ষগুলির মধ্যে সংলাপ চলেছে। কর্তৃপক্ষ মাত্র এক ধরনের আচরণের কাছেই নতি স্বীকার করেন, কাজেই বিধানসভা, লোকসভায় বিরোধী দল সেই আচরণে অভ্যস্ত হয়েছেন; ছাত্ররাও অনন্থগামিতার পরিচয় দিচ্ছেন। অনুগামিতা, অনন্থগামিতা, গুরুবশ্যতা, গুরুদ্রোহিতা একই সঙ্গে প্রকাশ পাচ্ছে ছাত্রদের মনে। এই দ্বৈত মনোভাবের নিদর্শন দেখতে পাই শিক্ষায়তনের সঙ্গে অসংশ্লিষ্ট কার্যকলাপেও। একদিকে মাও, মার্কিউস, অথবা গুয়েভারার বাণী নির্দেশের প্রতি নির্বিচার আনুগত্য ও বশ্যতা, অন্যদিকে প্রতিষ্ঠিত পার্টি, দেশীয় সরকার, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্রোহ-মগ্নতা। সমাজবাস্তবে এই দ্বৈত-মানসিকতার কারণ অনুসন্ধান করা দরকার। মার্কসবাদী নিরীক্ষক ছাড়া অন্য কারো পক্ষে বোধহয় সঠিক বিশ্লেষণ সম্ভব নয়।

সমীক্ষক-নিরীক্ষকরা আমাদের দেশের ছাত্র-বিশৃঙ্খলার কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে শিক্ষা ও পরীক্ষাগ্রহণ পদ্ধতি এবং পাঠ্যক্রমের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। সে-গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। আমরা অন্য একটি বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু। ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক আমাদের অনুসন্ধানের বিষয়। একটি তথ্যসমৃদ্ধ নিরীক্ষা [ফিল্ড স্টাডিজ ইন দি সোসিওলজি অফ এডুকেশন — ১৯৬৫-৬৬] থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে শিক্ষকদের কাছে ছাত্রদের প্রত্যাশা পরিপুরিত হচ্ছে না। [১৪]

আর একজন সমীক্ষক আরো স্পষ্ট ভাষায় ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের ক্রমাবনতির কথা বলেছেন।[১৫] এই ক্রমাবনতি ছাত্র-মানসে অসহায়ত্বের

১৪। According to majority of the students, teachers should behave as second parent. However, it can be easily assumed that this expectation of the students is not to be fulfilled as the system goes at present. So this image of the students regarding their teachers is bound to fall to pieces [Field studies in the sociology of studies: R. Mukherjee, S. Bandopadhyaya and K. Chattopadhyaya: Pp 165]

১৫। Indian education has always rested on rote-learning (we have found few instructors who even question this method), but it also had the "guru"—the master-teacher who

ভাব আনয়ন করে। সে নিরাপত্তার অভাব অনুভব করে। উৎকণ্ঠা উদ্বেগ তাকে হয় বিমর্ষ কিম্বা অস্থির করে তোলে। শিক্ষায়তনের গুরুর উপর স্বাভাবিক নির্ভরতা ভেঙে পড়ার ফলে অতি সহজেই অন্য ক্ষেত্রে অন্য গুরুর উপর নির্ভর করে নিরাপত্তার অভাব দূর করতে চায়। সে-গুরুও হয়ত বেশিদিন তার আদর্শের প্রতিমূর্তি হয়ে থাকতে পারেন না। গুরুর ইমেজ ক্রমশ মন থেকে লোপ পায়। গুরুদ্রোহিতা এবং ঐতিহ্যের প্রতিমা ভাঙার প্রবণতা তাকে পেয়ে বসে। কর্তৃপক্ষ, এমনকি মাতা-পিতাও অনেক সময় তার এই মানসিক দ্বন্দ্ব-বিরোধের খবর রাখেন না। তাঁরা তার আচরণে বিশৃঙ্খলা-বিক্ষোভের প্রকাশ দেখে নিজেরা রুষ্ট ও শঙ্কিত হয়ে ওঠেন। উপদেশামৃত বর্ষণে ফল না পেয়ে তাঁরা হয়ত জোর করে ডিসিপ্লিন আনতে চেষ্টা করেন। ছাত্রের জেদ ও রোষ বাড়তে থাকে। তারপর একদিন ঘটে ট্রায়াল অফ স্ট্রেংথ। পিতা-মাতা-শিক্ষক কর্তৃপক্ষ সমস্বরে যুগ-প্রবণতা ও রাজনৈতিক পার্টিগুলোর প্রতি দোষারোপ করতে থাকেন; সন্তানরা-ছাত্ররা আরো জোরগলায় সবকিছু ভেঙে চুরে 'জমানা' বদলে দেবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে। শেষ পর্যন্ত, অনেক টালবাহানার পর বিশৃঙ্খল আচরণ ও শক্তিমত্তার কাছে কর্তৃপক্ষ নতি স্বীকার করেন। ছাত্র-তরুণ শক্তি-মদে আরো মত্ত হয়ে ওঠে। তাদের কাছে বন্দুকের নল এখন একমাত্র নির্ভরযোগ্য নিরাপত্তাদায়ী। ট্রাংকুইলাইজার হয়ে ওঠে এবং জমানা বদলাবার একটি মাত্র

---

was a personal mentor and "father" to a small number of students. A student identified with his guru, with his chosen master, in all life values.

The system of higher education in India is basically a "lecture-examination" system,···has discarded the tutorial system inherent in both the English and the ancient Hindu system. What is now termed "tutorial" in some institutions is mere token of the principle······

Any system that is "impersonal," rather than "personal" tends to become mechanized. Few human beings enjoy being units in a sea of anonymity···It is difficult to move from the intimate warmth of the family to a large and cold institution···[Cormach Margarett: She who rides a peacock, Pp 194.]

পন্থার উপর তাদের আস্থা আরো বৃদ্ধি পায়।[১৬] মার্গারেট করম্যাক, অন্যান্য সমীক্ষকদের মতো ট্রানজিশনাল বা পরিবৃত্তিকালীন সঙ্কটের কথা তুলেছেন। কিন্তু তিনি সঙ্কটকে ঐতিহ্যিক সমাজ থেকে আধুনিক শিল্প-সমাজে উত্তরণের সমস্যা বলে শুধু মনে করেছেন।[১৭] যৌথ পরিবারের মধ্যে যে-নিরাপত্তাবোধ ও উষ্ণতার স্পর্শ ছিল, তার অভাবে আজকের ছাত্র-মানস বিশেষভাবে পীড়িত। তাদের পারিবারিক আনুগত্য ভেঙে গেছে, আবার গণতান্ত্রিক সমাজের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় স্বাতন্ত্র্যবোধ ও গণতান্ত্রিক ব্যক্তিত্ব তাদের মধ্যে বিকশিত হবার অবকাশ পায়নি। তাই তারা দোদুল্যমান, অস্থির, অশান্ত। আনুগত্য ও বিদ্রোহের সংঘাতে বিচ্ছিন্ন এবং খণ্ডিত। দায়িত্ববোধ, দায়িত্বপালন, ব্যক্তি স্বাধীনতার মর্যাদা রক্ষা, সব বিষয়েই তারা, পিতৃ-পিতৃব্য-শিক্ষক-কর্তৃপক্ষের ঔদাসীন্য ও অজ্ঞতার দরুণ, অনভিজ্ঞ রয়ে গেছেন। জ্যেষ্ঠরা তাদের বিশ্বাস করেননি, করছেন না, কাজেই তারাও জ্যেষ্ঠদের উপর বিশ্বাস হারিয়েছে।[১৮] এই প্রসঙ্গে সমীক্ষক "ঈদিপাস কমপ্লেক্সের" কথা টেনে এনে অযথা ব্যাপারটাকে ঘোলাটে করে তুলেছেন। সমাজ-বাস্তবের কথা ভুলে গিয়ে মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে অন্তর্জাত জৈব-প্রবৃত্তির প্রভাবের উল্লেখ করেছেন। ষোলো থেকে উনিশ বছরের মধ্যে ভারতবর্ষের কিশোর আপনা থেকেই নাকি পিতৃবিদ্রোহী হয়ে ওঠে।[১৯] কিশোরের অপরিণত মন এই বয়সে পরিণত হয়, তার মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগ্রত হয়। ভারতীয়

১৬। It seems clear that the current older generation is not helping youth with their problems of entering a new age. In fact the older generation is baffled by youth, and as their voices grow shriller the eruptions of indiscipline become more serious (Ibid Pp 211).

১৭। The psychology of youth should be considered in any analyses of changes from traditional to modern life (Ibid)

১৮। Modes of obedience and loyalty to superiors, functional to a vertical hierarchical society, are not acceptable to those moving into a competitive and more horizontal society. But modes of "responsibility" and "trust" necessary to the latter type of society, are as yet neither operation nor understood (Ibid Pp 210).

১৯। ...Some small pieces of research in India indicate the Oedipus complex in boys of the age of 12 or 13, the adolescent "declaration of independence" or "anti-authority" period at 16-19. These periods are both manifestations of early concept of self (Ibid Pp 206)

কিশোর আগেকার চেয়ে অনেক অল্প বয়সে মানস-পরিণতি লাভ করে —এই পর্যবেক্ষিত তথ্যকে তিনি 'ঈদিপাস' ইত্যাদি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। সঙ্কট-কালীন বিশেষ অবস্থার জন্যই যে-কিশোর বাস্তবমুখীন হয়ে উঠেছে, এই সহজ সত্যটি তিনি ধরতে পারেননি। কারণ, পরিবৃত্তিকালীন সঙ্কট সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব অপরিণত ও অস্পষ্ট ধারণা। ঐতিহ্যিক থেকে আধুনিক শিল্প-সমাজে উত্তরণের সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে আমরা চলেছি, শুধু এইভাবে দেখলে ভারতীয় ছাত্রের মানসিকতা ও ব্যবহারের সম্যক ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে না। আরো বহুতর সমস্যাজর্জরিত সমাজ-মানস ব্যক্তি-মানসকে প্রভাবিত করছে। সরকারী পরিকল্পনার আংশিক ব্যর্থতা, তদ্দরুণ বেকারী, অন্যান্য আর্থিক সমস্যা, উন্নয়নের সমস্যা, আন্তর্জাতিক সমস্যা—যথা তাপ-পারমাণবিক যুদ্ধ-ভীতি, যুক্তরাষ্ট্রের ভিয়েতনাম-কাম্বোডিয়ায় আগ্রাসন নীতি, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট শিবিরে বিভেদ-বিরোধ—ইত্যাদি নানারকম সমস্যাভারে ছাত্র-মানস পীড়িত ও ক্ষুব্ধ।

অভীপ্সা ও অভীষ্ট-সিদ্ধির মধ্যে যে-দুস্তর ব্যবধান দেখা দিয়েছে, সেই ব্যবধানকে ছাত্র-তরুণ কিছুতেই সহজভাবে গ্রহণ করতে পারছে না। আজ মানুষ চাঁদের পিঠে পদার্পণ করেছে, কাজেই বিষম সমাজ-ব্যবস্থার দরুণ বিড়ম্বিত প্রত্যাশার বেদনায় সে অধীর হয়ে উঠেছে। এ-পরাজয় সে সহ্য করবে না। তরুণ মানস জেট প্লেনের গতিতে এগিয়ে যেতে চাইছে, আর পার্টি-প্রতিষ্ঠান শম্বুকগতি-পরিকল্পনার পাণ্ডুর আলেখ্য তার সামনে তুলে ধরছে। আমলাতান্ত্রিক স্বেচ্ছাচার, স্থবিরত্ব, দীর্ঘসূত্রতা এবং সর্বোপরি বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে সে জ্যেষ্ঠদের অভিযুক্ত করতে চাইছে এবং ক্রোধে ফেটে পড়ছে। তার রোষ অনেক স্থলে হয়তো যুক্তিহীন কিন্তু তরুণ মানসে যুক্তির থেকে আবেগের প্রভাব অনেক বেশি এ-কথা ভুললে চলবে না।

ইয়োরোপ-আমেরিকা দ্বিতীয় শিল্প-বিপ্লবের সম্মুখীন। সমাজতান্ত্রিক ভারতও সেই শিল্প-বিপ্লবের শরিক হতে পারে। প্রতিক্রিয়া-চক্রান্ত পৃথিবীর অগ্রগতিকে ব্যাহত করছে, শিল্প-বিপ্লব ঘটতে দিচ্ছে না। এই শিল্প-বিপ্লব দুনিয়ার চেহারা পালটে দেবে, প্রাচুর্যের পৃথিবী নিয়ে আসবে। কিভাবে সাম্রাজ্যবাদের অক্টোপাশী আলিঙ্গন থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করে নতুন সভ্যতার ভিতপত্তন করা যায়—এইসব নানা সমস্যায় আজকের ছাত্র-মানস ভারাক্রান্ত। এইসব মিলে আজকের সঙ্কট। এই সঙ্কটে ছাত্র-তরুণ দিশেহারা। কে দেবে সেই সোনার কাঠির বা পরশ পাথরের সন্ধান, যার ছোঁয়া লেগে সব সোনা হয়ে যাবে? কে দেবে সব থেকে সহজ ও সংক্ষিপ্ত পথের সন্ধান? কার কাছে আছে সেই চাবি যা দিয়ে নতুন সভ্যতার নতুন সমাজের সিংহ-দরোজা একবার চেষ্টা করতেই খুলে যাবে? ছাত্র-মানস এই সব চিন্তাতে অস্থির, কম্পমান। কিশোর মনে অনেক আশা, অনেক আকাঙ্ক্ষা। তাই তাকে প্রলুব্ধ করা সোজা, তাকে বিভ্রান্ত করা কঠিন নয়।

ভারতের কৃষি-সম্পর্ক বিশ্লেষণে লেনিন-নির্দেশিত পথ

ভবানী সেন

মার্কসবাদের তত্ত্ব-ভাণ্ডারে লেনিনের অবদান পশ্চাৎপদ উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশগুলির কৃষক-আন্দোলনের পথকে আলোকিত করেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ও বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে লেনিন যখন মার্কস-এঙ্গেলস প্রদর্শিত পথে ঐ বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করছিলেন তখন ভারতবর্ষের কৃষক ও গ্রামীণ গরীবেরা বৃটিশ শাসনে নিষ্পেষিত হচ্ছিল। প্রথম দিকে ডিগবী ও গণেশ দেউসকর অমানুষিক বৃটিশ শোষণের মূল অর্থনৈতিক তথ্যগুলি সংগ্রহ করেছিলেন। আর, রমেশচন্দ্র দত্ত গ্রামীণ মানুষের শোচনীয় অবস্থার কথা তাঁর দুই খণ্ডে রচিত 'Economic History of British India'তে বিস্তৃতভাবে তুলে ধরেছিলেন।

'শ্রেণী' সম্পর্কে ধারণা এবং সমাজ-ইতিহাসের ধাপগুলি তখনও ঠিকমতো উপলব্ধি করা হতো না; গ্রামীণ গরীব ও কৃষক সম্প্রদায়কে সাধারণভাবে গ্রামীণ 'জনগণ' হিসাবে চিহ্নিত করাই তখনকার রীতি ছিল। ভারতের গ্রামীণ-সমাজ, জমিদারী প্রথা ও রায়তওয়ারী ব্যবস্থা সম্পর্কে মার্কস-এর ধ্যান-ধারণা এ-দেশে তখনো পর্যন্ত অজানা ছিল। নীল-বিদ্রোহ এবং সাঁওতাল-বিদ্রোহ পর্যুদস্ত হবার পর সাধারণভাবে কৃষক জনগণকে 'লক্ষ লক্ষ মূক' জনগণ রূপেই দেখা হতো।

এমনকি, গান্ধীর নেতৃত্বে যখন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে বিরাট পরিবর্তন সাধিত হলো তখনো নতুন কংগ্রেস কৃষিজীবী শ্রেণীগুলির বৈশিষ্ট্য ও সামাজিক অর্থনীতির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হলো না। অথচ ঠিক সেই সময়েই প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে, লেনিন ও বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে রুশদেশে অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব মানব-ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল। সেই থেকে কৃষক সমস্যাবলী ও গ্রামীণ গরীবদের ভূমিকা সম্পর্কে লেনিনের অমর চিন্তাধারা সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতীয় চিন্তায় প্রভাববিস্তার করতে শুরু করল। এর ফলে, গতিশীল নতুন শক্তিগুলির

পথ খুলে দিয়ে নতুন কৃষক-আন্দোলনের সূত্রপাত হলো। বিশের দশকের মধ্যভাগে ভারতের শ্রমিক-কৃষক পার্টির জন্মে এবং ঐ একই সময়ে বিপ্লবী কৃষক-আন্দোলনের সূচনায় এই সমস্যাবলীর উপর লেনিনের অমর চিন্তাধারার প্রথম স্বাক্ষর মুদ্রিত ছিল। রাশিয়ার অভিজ্ঞতা থেকে ও দুনিয়াজোড়া সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন পর্যবেক্ষণ করে লেনিন কৃষক-আন্দোলন, কৃষি-বিকাশের স্তর ও সমাজতন্ত্রের জন্য শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী সংগ্রামের সঙ্গে তার সম্পর্ক সম্বন্ধে সাধারণীকৃত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন।

২

লেনিনের মতাদর্শ ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামীদের নিকটে পৌছবার আগে শুধুমাত্র বৃটিশ শাসন ও তার শোষণের সাধারণ চিত্রই অস্পষ্টভাবে ধরা পড়েছিল। অবশ্য জমিদারদের অত্যাচার একেবারে তাঁদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। কৃষকদের স্বাধীনতার অভাব, অসম্মান ও দুর্ভাগ্য, বিশেষভাবে তফসিলী সম্প্রদায়-গুলির প্রতি সামাজিক অসাম্য এবং বর্বরোচিত অবিচার, যা এখনো চলেছে, তা ঐতিহাসিকভাবে বাতিল হয়ে যাওয়া সমাজ-কাঠামোর বৈশিষ্ট্যরূপে অনুমিত হয়নি। সাম্রাজ্যবাদীরা সেইগুলিকেই তাদের শাসনের ভিত্তি হিসাবে স্থিতিশীল রাখতে সচেষ্ট ছিল। কেবলমাত্র মার্কস-এঙ্গেলস-এর চিন্তাধারাকে সমৃদ্ধ করে লেনিনের মতাদর্শ জানার ও ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে তা বিচার-বিশ্লেষণ করার পরই একটি সমাজ-শ্রেণী এবং বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের সহযোগীরূপে ভূস্বামীরা চিহ্নিত হয়েছিল।

"ভূমি সম্পর্কে সামন্ততন্ত্রের ভগ্নাবশেষ" এই কথা আজকাল প্রায়ই শোনা যায়। সরকারীভাবে এটা স্বীকৃত যে, স্বাধীন ভারত বৃটিশ শাসন থেকেই "সামন্ত-তন্ত্রের ভগ্নাবশেষ" উত্তরাধিকার হিসাবে পেয়েছে, যা বিভিন্ন কৃষি-সংস্কারের পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে নিশ্চিহ্ন করার ব্যর্থ চেষ্টা হচ্ছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন রূপে সামন্ততন্ত্র ছিল। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে সংস্কারের আগে রাশিয়ার ভূমিদাসপ্রথা সম্পর্কে লেনিন বলেছিলেন :

"ভূমিদাস প্রথায় ভূস্বামীদের অনুমতি ব্যতীত কৃষকেরা বিবাহ করতে পারত না…।" "ভূস্বামীদের নায়েব-গোমস্তা (বেলিফ) কর্তৃক নির্ধারিত দিনে কৃষককে তার মালিকের জন্য কাজ করতে হতো।" "ভূস্বামীর অনুমতি ব্যতীত কৃষক তার গ্রামের বাহিরে যেতে পারত না… ।" (গ্রামীণ গরীবদের প্রতি—লেনিন)

১৮৬১ সালের সংস্কারের পরও যে এই ভূমিদাসপ্রথার অবশেষ রাশিয়াতে ছিল তা নির্দেশ করে সংস্কার-পরবর্তী রাশিয়ায় সামন্ততন্ত্র বর্ণনা প্রসঙ্গে লেনিন বলেছেন :

"ইউরোপীয় রাশিয়ায় এক কোটি পাঁচ লক্ষ কৃষক-পরিবারের আওতায় ছিল সর্বমোট ৭৫,০০০,০০০ ডেসিয়াটিন জমি। প্রধানত অভিজাত সম্প্রদায়, অংশত হঠাৎ গজানো ভুঁইফোড়, ত্রিশ হাজার ভূস্বামীর প্রত্যেকের ৫০০ ডেসিয়াটিনের ঊর্ধ্বে জমির মালিকানা ছিল, সাকুল্যে তাদের ছিল ৭০,০০০,০০০ ডেসিয়াটিন জমি। রাশিয়ার কৃষিব্যবস্থায় সামন্ত-ভূস্বামীদের প্রাধান্যের এগুলিই প্রধান কারণ। এরই ফলে সাধারণভাবে রাশিয়ার রাষ্ট্র এবং সমগ্র সমাজ-জীবনে এদের প্রাধান্য ঘটেছিল। লাতিফানদিয়ার মালিকেরা অর্থনৈতিক ধারণার দিক থেকে সামন্ত জমিদার। তাদের ভূমি-মালিকানার ভিত্তি সৃষ্টি হয়েছিল ভূমিদাসপ্রথার ইতিহাস থেকেই, শতাব্দীকাল ধরে অভিজাত সম্প্রদায় কর্তৃক ভূমি-গ্রাসের ইতিহাসের মধ্য দিয়ে। তাদের বর্তমান চাষাবাদ পদ্ধতির ভিত্তি ছিল শ্রম-খাজনা ব্যবস্থা, অর্থাৎ ভূমিদাস-শ্রমকে সরাসরি জীইয়ে রাখা। এর তাৎপর্য হচ্ছে, ছোট ছোট কৃষকদের যন্ত্রপাতি দিয়েই অজস্র কায়দায় জমি চাষ করা, যেমন : শীতকালে ভাড়া-ভিত্তিতে কাজে লাগানো, বার্ষিক লীজ, শতকরা ৫০ ভাগের ভিত্তিতে ভাগচাষ, শ্রম-খাজনা, ঋণের জন্য বাঁধা পড়ে থাকা, সরেস জমির জন্য দাসত্ব-বন্ধন, অরণ্য ব্যবহারের জন্য, গোচারণ ভূমির জন্য, জলের জন্য ইত্যাদি ইত্যাদি অন্তহীন নানা বন্ধন। ('প্রথম রুশ বিপ্লবে সোশ্যাল ডেমোক্রাসীর কৃষি-কর্মসূচী'। Alliance of the working class and peasantry পৃষ্ঠা ১৬৩ দ্রষ্টব্য।)

লেনিনের এই দীর্ঘ উদ্ধৃতি প্রদানের কারণ হলো "জমির ব্যক্তিগত মালি-কানার সুযোগে অ-অর্থনৈতিক বাধ্য-বাধকতার দ্বারা শোষণ" এই রকম সরলী-কৃত সংজ্ঞার দ্বারা সামন্ত-সম্পত্তির সম্পর্ক ও সামন্ততান্ত্রিক শোষণের কৌশল সাধারণ মানুষের কাছে সহজবোধ্য করে তোলা যায় না। উপরোক্ত বর্ণনায় লেনিন রাশিয়াতে সামন্ততান্ত্রিক শোষণের কত অসংখ্য নির্দিষ্ট প্রকরণ-পদ্ধতি ছিল কিংবা পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে অতীতে ছিল অথবা এখনো আছে তা সংক্ষেপে তুলে ধরেছেন।

এই বর্ণনা এ-দেশে বৃটিশ শাসনে অনুরূপ অবস্থার কথা এবং যা দেশের বিভিন্ন অংশে কৃষিজীবী জনসাধারণের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে এখনও বর্তমান তার

কথা পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দেবে। প্রকৃত চাষীর জমিতে কোনোও স্বত্ব ছিল না। খাজনার কোনোও অর্থ নৈতিক ভিত্তি ছিল না। কেবলমাত্র তা জমির একচেটিয়া মালিকানার সুযোগে নিংড়ে নেওয়া হতো। বৃটিশ শাসনে ভাগচাষ, বেগার প্রথা (যথা, বিনা-মজুরীতে শ্রম, বাধ্যতামূলক শ্রম) ইত্যাদি ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল, যদিও বিভিন্ন সময়ে কৃষক-আন্দোলন বা কৃষক-বিক্ষোভের ফলে প্রজাস্বত্ব আইনের দ্বারা তার কিছু কিছু সংশোধনও ঘটতো। ১৯৪৭ সালে জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন, ১৯৫০ সালের প্রজাতন্ত্রের ঘোষণা এবং ১৯৫৫ সালের কৃষি-সংস্কারের সূত্রপাতের পরেও কিন্তু মধ্যযুগীয় শোষণের দিন শেষ হয়ে যায় নি; তার ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান।

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তফসিলী সম্প্রদায়ভুক্ত জাতি-উপজাতিরা এখনও অস্পৃশ্যতা, ঋণ-দাসত্ব, বাধ্যতামূলক মজুরী-খাটা ইত্যাদি নানা প্রথায় নাগরিক স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত। এক সময়ে গ্রামীণ গরীব সম্প্রদায়ের সমস্ত অংশই এই সব অসম্মানের অংশভাগী ছিল, কিন্তু বৃটিশ রাজত্বেও ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে এর কিছু ক্রমপরিবর্তন ঘটেছে। তফসিলী সম্প্রদায়ভুক্ত জাতি ও উপজাতির মধ্যে তা আজও রয়ে গেছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বর্বরতম পন্থার অস্পৃশ্যতা আজও বিরাজমান। অনেক সময় তথাকথিত অস্পৃশ্য জাতির মানুষদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যাও করা হয়। অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য সৃষ্ট আইন অকেজো হয়ে আছে। এই তফসিলীভুক্ত জাতির বেশির ভাগ মানুষই ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিক, এমনকি এদের নিজস্ব বাস্তভিটাও নেই। তারা অ-তফসিলী সম্প্রদায়ভুক্ত কৃষি শ্রমিকদের চেয়েও বেশি নির্যাতিত।

উপজাতীয় জনগণের অবস্থার প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। উপজাতিদের মালিকনাধীন জমি সংরক্ষণের জন্য সৃষ্ট আইন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই, বিশেষত অন্ধ্র, বিহার, ত্রিপুরা এবং উড়িষ্যায় প্রয়োগ করা হয়নি। উপজাতি-জনগণের অর্থনীতিতে অর্থগৃধ্নু মহাজনদেরই প্রাধান্য; এরা ঋণ-জর্জর উপজাতিদের অসহায়তার সুযোগে তাদের জমি গ্রাস করে থাকে।

সামন্ততান্ত্রিক শোষণ-পদ্ধতির ভগ্নাবশেষ অব্যাহত আছে, কারণ, গ্রামীণ গরীব সম্প্রদায় প্রচণ্ড বেকারীতে জর্জরিত। এবং তার সঙ্গে এক নতুন ধরনের বেকারীর মধ্যে ধনতান্ত্রিক সম্পর্কের সম্প্রসারণও প্রতিফলিত হচ্ছে। দেশের মোট-বেকারের সংখ্যা প্রতিবৎসর বেশ কয়েক লক্ষ করে বেড়ে চলেছে। খসড়া চতুর্থ পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় ১ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষের বাড়তি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা

আছে ; অথচ এই পরিকল্পনাকালে কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে ২ কোটি ১০ লক্ষ ; উপরন্তু এই পরিকল্পনা শুরু হবার সময়ে ২ কোটি ৭০ লক্ষ বেকার ইতিমধ্যেই রয়ে গেছে। সুতরাং যদি চতুর্থ পরিকল্পনা তার লক্ষ্যে পৌঁছেও যায় তবুও পরিকল্পনা শেষে বেকারের সংখ্যা দাঁড়াবে ৩ কোটি ৩০ লক্ষ। ১৯৬১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী দেশের মোট কর্মী জনসংখ্যার শতকরা ৬৯'৫ ভাগই কৃষিশ্রেণীভুক্ত (কৃষি-শ্রমিক সহ) এবং তার মধ্যে শতকরা ২০ ভাগই 'প্রচ্ছন্ন' বেকার। এর দ্বারা উপরোক্ত ৩ কোটি ৩০ লক্ষ বেকারের সঙ্গে আরও ২ কোটি ৬০ লক্ষ প্রচ্ছন্ন বেকার যুক্ত হয়ে যাচ্ছে। কৃষিক্ষেত্রে আধা-সামন্ততান্ত্রিক ভূমি-সম্পর্ক অব্যাহত রাখার শক্তির উৎস এই বিপুল সংখ্যক বেকারী, একই সঙ্গে, শ্রম-বাজারের সম্প্রসারণের দ্বারা ধনতান্ত্রিক বিকাশেরও এটা ভিত্তিভূমি। সুতরাং সামন্তবাদের ভগ্নাবশেষ ও উৎপাদনের ধনতান্ত্রিক সম্পর্কের বিকাশ পরস্পর অন্তর্গ্রথিত হয়ে গ্রামীন গরীব জনগণের জন্য তা একই দুর্ভোগ সৃষ্টি করছে।

৩

জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের পর কংগ্রেস শাসনে সামন্ততন্ত্রের ভগ্নাবশেষ বিশেষভাবে সঙ্কুচিত হয়ে আসছিল। সরকারের ঘোষিত নীতি ছিল :

১। রাষ্ট্র ও কৃষকের মধ্যে জমিদারী ও অন্যান্য মধ্যস্বত্বভোগীদের বিলোপসাধন।

২। (ক) খাজনা স্থিরীকরণ

(খ) জমির সর্বোচ্চ সীমা নির্দিষ্টকরণ

(গ) জমির সর্বোচ্চ মালিকানা বেঁধে দেওয়ার ফলে প্রাপ্ত উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণ

(ঘ) জোতের একত্রীকরণ এবং সেবা সমবায় প্রতিষ্ঠা সহ প্রজাস্বত্ব প্রথার সংস্কার।

প্রচুর ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থাসহ মধ্যস্বত্ব লোপ আইন প্রবর্তিত হয়েছে এবং এর দ্বারা দুই কোটি প্রজাকে প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্রীয় আওতায় আনা হয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যে ১৯৬১ সালে ২'৭৫ শতাংশেরও কম মালিক ও ভোগদখলকার পরিবার অ-রায়তওয়ারী (মধ্যস্বত্বভোগী) স্বত্বভিত্তিক ছিল।

১৭, ১৮০,০০০ হেক্টর চাষযোগ্য পতিত জমির ভিতর ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিকদের মধ্যে বিতরিত হয়েছিল মাত্র-এককোটি একর জমি।

উত্তর প্রদেশে দৈহিকভাবে অক্ষম ব্যক্তি ব্যতীত মালিক স্বত্ব ফিরে পাবে না, সমস্ত প্রজাস্বত্বের ক্ষেত্রে এই আইনগত রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে প্রজা ও বর্গাদারদের উচ্ছেদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা আছে, যদিও বাস্তবে তা অ-ব্যবহৃত। অন্যান্য রাজ্যেও স্বত্বের পুনঃগ্রহণ কয়েকটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে মঞ্জুর করা হয়েছে। কেবলমাত্র কেরোলাতেই যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে চাষে নিযুক্ত প্রজাদের স্ব-স্ব অধিকারের কর্ষণযোগ্য জোতে একতরফাভাবে মালিকানা ঘোষিত হয়েছে।

সকল রাজ্যেই আইনের দ্বারা খাজনা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। আইনের দ্বারা গুজরাট, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, দিল্লী, গোয়া, দাদরা এবং নগর-হাবেলীতে উৎপাদনের এক-ষষ্ঠাংশ খাজনা বিধিবদ্ধভাবে নির্দিষ্ট হয়েছে। আসাম, বিহার, কেরালা, মহীশূর, উড়িষ্যা, অন্ধ্র-প্রদেশের তেলেঙ্গানা অঞ্চল, মণিপুর, ত্রিপুরা এবং কোনো কোনো কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এটা উৎপাদনের এক-চতুর্থাংশ। অন্ধ্র-প্রদেশ, জম্মু-কাশ্মীর, তামিলনাড়ু, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, হিমাচল-প্রদেশ এবং পশ্চিমবাঙলায় বিধিবদ্ধ (statutory) খাজনা কিছুটা বেশি। দিল্লী, মণিপুর এবং ত্রিপুরায় প্রজাদের খাজনা মালিক কর্তৃক দেয় ভূমি-রাজস্বের চারগুণের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

খাজনা তিন প্রকারের, যথা: শ্রম-খাজনা, উৎপাদন-খাজনা ও টাকায়-খাজনা। মার্কস ও লেনিনের মতে শেষোক্তটি হচ্ছে সামন্ততান্ত্রিক খাজনার নিঃশেষপ্রায় (dissolving) রূপ। সংস্কারের পরও ভারতবর্ষে টাকায় প্রদত্ত খাজনাকে এখনও সার্বজনীন করা হয়নি; অথচ কোনো কোনো অঞ্চলে কোনো কোনো ভূমি কর্ষণকারীদের মধ্যে ইজারা প্রদত্ত জমির খাজনা রূপে শ্রম-খাজনা (বেগার), অর্থাৎ মালিকের বিশেষ জমিতে অবৈতনিক শ্রম আজও চালু আছে। ভাগচাষীরা যা দেয় তা উৎপাদন-খাজনা। এটা বিশুদ্ধ সামন্ত' খাজনাও বটে। সংরক্ষিত প্রজারা আইনের দ্বারা নির্ধারিত টাকায় খাজনা দিয়ে থাকে, এর মধ্যে ধনতান্ত্রিক ভূমি-খাজনার (ground rent) উপাদান কিছুটা অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। আইনে এখন জমির মালিকরা প্রাপ্ত খাজনার জন্য রসিদ দিতে বাধ্য। এটা নিম্নতম ধাপের প্রজাদের ক্ষেত্রে এর আগে প্রযোজ্য ছিল না।

ভূমিহীনদের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বিলির এবং প্রজাদের ভূমির স্বত্বাধিকার দেওয়ার ব্যাপারে প্রায় ৩০ লক্ষ প্রজা ও ভাগচাষীর জন্য মালিকানার ব্যবস্থা করা

হয়েছে ও ২০ লক্ষ একরের বেশি উদ্বৃত্ত জমি হস্তগত করে সংশ্লিষ্ট সরকারগুলি তার প্রায় অর্ধেক ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণ করেছেন। কিন্তু ভূমির স্বত্বাধিকারী অধিকাংশ কৃষক কোনও ভূস্বামীর পরিবর্তে রাষ্ট্রকেই ভূমিরাজস্ব দিয়ে থাকে।

কয়েকটি রাজ্যে জোত-জমি একত্রীকরণের ব্যাপারে কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে। তিন কোটি একর জোতের একত্রীকরণ হয়েছে এবং চতুর্থ পরিকল্পনার লক্ষ্য হচ্ছে ৪ কোটি ৩০ লক্ষ একর জোত।

সামন্ততান্ত্রিক অবশেষ-এর স্থানে ধনতান্ত্রিক বিকাশের পথ প্রস্তুত করার কয়েকটি উপায় হলো মধ্যস্বত্বের বিলোপসাধন, জোত জোটবদ্ধকরণ, খাজনার হ্রাস, ভোগদখল স্বত্ব স্থিরীকরণ ইত্যাদি। কংগ্রেস কর্তৃক অনুসৃত আপোষের পথে ইতিহাসের বর্তমান সন্ধিক্ষণে ধনতন্ত্রবাদের দেউলিয়াপনাই প্রতিফলিত, এই পথ আধা-সামন্ততান্ত্রিক গলাটিপে ধরা ভূমি-সম্পর্ককে বাঁচিয়ে রাখার মরীয়া প্রচেষ্টাকে সম্পূর্ণভাবে দূর করতে সক্ষম হয়নি, যদিও তা খর্বিত ও শিথিল হয়েছে।

জমির ইজারা দুই ভাবে দেওয়া হয়। প্রথমত, গরীব চাষীরা বিত্তবান চাষীদের ইজারা দেয়, এরা ভাড়াকরা শ্রমিক নিয়োগ করে চাষ করে; দ্বিতীয়ত, ধনী জমির মালিকগণ গরীব চাষীদের অস্বাভাবিক বেশি খাজনায় জমি ইজারা দেয়। দ্বিতীয় পদ্ধতিটি আধা-সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কেরই ভগ্নাবশেষ। ঐ ধরনের প্রজাদের (প্রজাস্বত্ব প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য হতে পারে) শতকরা ৮২ ভাগই স্বত্বের ব্যাপারে কোনোও নিরাপত্তা ভোগ করে না, বাস্তব ঘটনার দ্বারা এটা প্রমাণিত হয়। অন্ধ্রপ্রদেশ, আসাম, তামিলনাড়ু, বিহার, পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও পশ্চিমবাঙলায় এটা খুবই প্রচলিত।

কংগ্রেস সরকারের নতুন কৃষি-সম্পর্কিত ব্যবস্থাদির সঙ্গী হয়েছে ব্যাপক কৃষক উচ্ছেদ এবং তা কৃষকদের বিপুল সংখ্যায় উচ্ছেদও করেছে। এটা তিন প্রকারে ঘটেছে: (১) আইনের ছিদ্রপথে উচ্ছেদ। আইনে জমির মালিককে 'ব্যক্তিগত চাষের' জন্য যে অনুমতি দেওয়া হয়েছে তার সংজ্ঞা এমনভাবে দেওয়া হয়েছে যে এর দ্বারা আধা-সামন্ততান্ত্রিকভাবে অন্য ব্যক্তিকে জমি ভাড়া দেওয়া রোধ করা অর্থহীন হয়ে পড়েছে। (২) আইন ফাঁকি দিয়ে বলপূর্বক উচ্ছেদ। (৩) জমির সর্বোচ্চ সীমাকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য জমির হস্তান্তর এবং এর দ্বারা ভাগচাষী ইত্যাদির উচ্ছেদ।

জনৈক প্রখ্যাত অধ্যাপক আইনে বিধিবদ্ধ 'ব্যক্তিগত চাষ' সম্পর্কে সঠিকভাবেই নিম্নরূপ বর্ণনা দিয়েছেন:

"কায়িক শ্রম বা জমির সন্নিকটে বসবাস করা কোনোটারই দরকার ছিল না ; জমির মালিকদের প্রয়োজনীয় তদারকি কাজ-কারবার চালাবার জন্যেও কোনো স্পষ্ট শর্ত আরোপ করা হয়নি। প্রায় সমস্ত রাজ্যেই 'বক্তিগত চাষের জমি' এইভাবে ভাগচাষীদের দ্বারা চাষ করা অব্যাহত রইল। প্রয়োজন হলে কৃষি-শ্রমিকের ছদ্মবেশেও ভাগচাষীদের দিয়ে এই কাজ করানো হতো। এটা তাই কোনো আশ্চর্যের কথা নয় যে, ভূমি-সংক্রান্ত বিল প্রস্তুত ও পাশ—প্রজাদের উচ্ছেদ ও "ব্যক্তিগত চাষের' জন্য জমি পুনর্দখলের ঢেউ নিয়ে এসেছিল।"

অনেক রাজ্যে 'স্বেচ্ছ'-সমর্পণের' নামে ব্যাপকভাবে প্রজাদের ও ভাগচাষীদের উচ্ছেদ করা হয়েছে। এই উচ্ছেদ এক জটিল ও মিশ্র সামাজিক অবস্থা সৃষ্টি করেছে। আংশিকভাবে এটা ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতিকে সম্প্রসারিত করেছে। লেনিন দেখিয়েছেন যে, শ্রম-মজুর নিয়োগের দ্বারা চাষ এবং যেখানে যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য মূলধনী সম্পদ মালিক কর্তৃক সরবরাহ করা হয়, এবং যা বাজারে বিক্রীর জন্য উৎপাদিত হয় তা হচ্ছে এই ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতিরই মূখ্য বৈশিষ্ট্য। এই সমস্ত উচ্ছেদ আংশিকভাবে প্রচ্ছন্ন-পন্থায় সামন্ততান্ত্রিক কৃষি-পদ্ধতিকে (ভাগচাষ ইত্যাদি) পুনরুজ্জীবনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

আইন ফাঁকি দিয়ে কেমন করে বহু জোতদার কৃষি-আইনে যেটুকু লক্ষ্য নির্ধারিত ছিল তা ব্যর্থ করেছে, অধ্যাপক গানার মায়ারডেল তা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, "১৯৫১ সালের হায়দরাবাদ আইনের ওপর একটি রিপোর্টে দেখা গেছে যে, ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত সংরক্ষিত প্রজাদের মধ্যে ন্যূনপক্ষে দুই-তৃতীয়াংশকে আইনসম্মত কিংবা বেআইনীভাবে উচ্ছেদ করা হয়েছে, এবং আইনের উদ্দেশ্য পূর্ণ করে মাত্র বারো শতাংশই মালিক কৃষকে পরিণত হতে পেরেছে। বোম্বাই প্রজাস্বত্ব আইনের রিপোর্ট আরও জঘন্য। কারণ ১৯৫৮তে এটা প্রকাশিত হবার আগে পর্যন্ত বোম্বাই রাজ্য সাধারণত সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজাস্বত্ব আইনের অধিকারী বলে স্বীকৃত হতো। রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৪৭-৪৮ থেকে ১৯৫২-৫৩ পর্যন্ত পাঁচ বছরে মোট প্রজার মধ্যে সংরক্ষিত প্রজার অনুপাত শতকরা ৬০ ভাগের বেশি থেকে হ্রাস পেয়ে শতকরা ৪০ ভাগের কিছু বেশিতে এসে দাঁড়িয়েছিল।" (এশিয়ান ড্রামা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩০৭-১৩০৮)। গ্রামাঞ্চলে ঋণের বোঝা বেড়েই চলেছে। কারণ, অধিকাংশ কৃষক-পরিবারই অ-অর্থনৈতিক জোতের অধিকারী, ফলে লগ্নীযোগ্য উদ্বৃত্তের অভাব ঘটে। এই অবস্থার জন্য ঋণ পাবার সুযোগের স্বল্পতাই প্রধানত দায়ী। ব্যাঙ্ক ও সমবায়ের মাধ্যমে গ্রামীণ মানুষদের

কাছে ঋণের সুযোগ সম্প্রসারিত করা সত্ত্বেও ক্ষুদ্র জোতের অধিকারী বিরাট সংখ্যক দরিদ্র চাষী এখনও উপেক্ষিত। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের পর সরকারী মহলে জমির পরিবর্তে শ্রমকেই ঋণ পাবার যোগ্যতার মাপকাঠি রূপে সূত্রায়িত করার প্রচেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে শ্রেণীবিন্যাস এমনই যে, সরকার ও রাষ্ট্রযন্ত্রের মৌলিক পরিবর্তন ছাড়া নতুন কোনোও নীতিকে কার্যকর করা অসম্ভব। অবশ্য, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কিছু উন্নতি নিশ্চয়ই ঘটতে পারে।

মাঝারী ও গরীব চাষীরা কেনা-বেচার বাজারে প্রতারিত হচ্ছে, কারণ পাইকারী ব্যবসা বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজির কুক্ষিগত। বাজারের জন্য উৎপাদিত পণ্য কৃষকেরা ন্যায্য দামের চেয়ে কম দামে বিক্রয় করতে বাধ্য হয়, অথচ শিল্প-পণ্যের জন্য তাদের দিতে হয় অনেক বেশি মূল্য। সমস্ত জিনিসের মূল্য-স্তরের ক্রমাগত বৃদ্ধি শেষ পর্যন্ত মাঝারী চাষী ও গ্রামীণ গরীবকে সকলের চেয়ে বেশি আঘাত করে। একচেটিয়া পুঁজির বাজারের ওপর কব্জা এত বেশি যে ১৯৬৯ সালে শিল্প-পণ্যের উৎপাদন ৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও পাইকারী মূল্য-সূচী শতকরা ১১.১ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

চূড়ান্ত বিচারে বলা যায়, ভারতবর্ষ ক্ষুদ্র জোতের দেশ হিসাবেই রয়ে গেছে। সেইজন্য এ-দেশে আধা-সামন্ততান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক উভয় ক্ষেত্রেই ক্ষুদ্র কৃষি-অর্থনীতির প্রাধান্য এবং ক্ষুদ্রায়তনের চাষবাস কৃষি-উন্নতির পরিপন্থী।

জাতীয় নমুনা-সমীক্ষার অষ্টম ও সপ্তদশ পর্যায়ে সমীক্ষার সময়-সীমার (অর্থাৎ ১৯৫৩-৫৪ এবং ১৯৫৯-৬১) মধ্যে ক্ষুদ্র ও বিক্ষিপ্ত জোতের পরিবর্তনের হার খুবই কম। ১৯৫২-৫৩ সালে জোতের শতকরা ৬০ ভাগ ও কর্ষিত জমির শতকরা ২৫.৪৪ ভাগ ছিল ৫ একরের নীচে। ১৯৫৯-৬১ সালে ঐ হার ছিল যথাক্রমে শতকরা ৬১.৬৯ ও শতকরা ১৯.১৮ ভাগ। দশ একরের নীচের জোত-জমির-হার শতকরা ৭৯.৭৩ থেকে বর্ধিত হয় শতকরা ৮১.৪৯ ভাগে এবং কর্ষিত এলাকার ক্ষেত্রে শতকরা ৩৪ ভাগ থেকে ৩৯.৮৮ ভাগে দাঁড়িয়েছে।

উপরোক্ত সংখ্যাগুলি অবশ্য কিছু 'জোত-জমির একত্রীকরণে'র দ্যোতক (অবশ্যই দরিদ্র চাষীদের বিনিময়ে) তবুও এ-পরিবর্তন এতই স্বল্প যে কৃষি-অর্থনীতিতে ছোট কৃষি-চরিত্র প্রায় অক্ষুণ্ণই থেকে যায়।

নিম্নোক্ত সারণী ১৯৫৩-৫৪ এবং ১৯৫৯-৬১ সালের মধ্যে তুলনামূলক হিসাব তুলে ধরেছে :

কৃষি-জোত (শতকরা হিসাব)

	অষ্টম সমীক্ষা (১৯৫৩-৫৪)		সপ্তদশ সমীক্ষা (১৯৫৯-৬১)	
জোতের আকৃতি (একরে)	সংখ্যা	আয়তন	সংখ্যা	আয়তন
০.৫০-এর নীচে	১১.৭১	০.৩০	৮.৫৫	০ ৩৮
১.০০-এর নীচে	১৯.৭২	১.০৭	১৭.১৩	১.২৭
২ ৫০-এর নীচে	৩৯.১৪	৫.৪৩	৩৯.০৭	৬.৮৬
৫ ০০-এর নীচে	৬০.০০	২৫.৪৪	৬১.৬৯	১৯.১৮
৭.৫০-এর নীচে	৭২.১৭	২৫.৩৪	৭৪.৫৩	৩০ ৯১
১০.০০-এর নীচে	৭৯.৭৩	৩৪ ০০	৮১.৪৯	৩৯ ৮৮
২০.০০-এর নীচে	৯১.৮১	৫৬.৫৩	৯৩.১৯	৬৩.৬৬
৩০ ০০-এর নীচে	৯৫.৭৩	৬৯.১৯	৯৬.৭৯	৭৬ ৩৫
সম্পূর্ণ পরিমাণ	১০০.০০	১০০,০০	১০০.০০	১০০ ০০

এই সমীক্ষায় দেখা যায় যে, এই সময়ে কৃষি-জোতের (হোল্ডিংস) মোট সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এটা কিছুটা পরিমাণে জমির সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দেওয়ার ফল। এটা আরও তুলে ধরে যে বৃহদয়াতন ধনতান্ত্রিক চাষ-আবাদের সূচনা ঘটেনি, কিন্তু বৃহৎ সামন্ত-সম্পত্তি কিছু খণ্ড-বিখণ্ড হয়েছে। মোটের ওপর, জোত-জমির খণ্ড-বিখণ্ডীকরণ ও বিভাজন থেকে উদ্ভূত যে-সমস্যা সে সমস্যার সমাধান হয়নি।

৪

ভারতের কৃষি-সম্পর্ক, চাষীদের অবস্থা, গ্রামীণ গরীবদের শ্রেণীচরিত্র ইত্যাদি অতি জটিল সমস্যাগুলি অনুধাবন করে দেখতে হবে। সামন্ততন্ত্র অক্ষুন্নই আছে, অথবা যা ঘটছে তা সামন্ততন্ত্রের দিকেই পশ্চাদগতি কিংবা ভারতের কৃষিতে ধনতন্ত্রের প্রাধান্যই বর্তমান—এ-ধরনের চরম সংজ্ঞায়িত দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষ্য করা যায়। বিশের দশকের প্রারম্ভে এম. এন. রায়ও এই জাতীয় সিদ্ধান্ত স-প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। এ-সমস্ত হলো নিঃসন্দেহে সামগ্রিক ভূমি-সম্পর্কের বিভিন্ন দিকের অখণ্ড অনুশীলন না-করে কয়েকটিমাত্র বিষয়ের খণ্ডিত অনুশীলনের ভিত্তিতে অগভীর সামান্যীকরণ মাত্র।

এই পরিপ্রেক্ষিতে 'রাশিয়ায় পুঁজিবাদের বিকাশ' সম্পর্কে লেনিনের বইখানি চমৎকার দিকনির্দেশক। 'ক্যাপিটাল'-এর ৩য় খণ্ডে মার্কস কর্তৃক ব্যাখ্যাত একই সমস্যা, লেনিন ১৮৯৯ সালে প্রথম প্রকাশিত এই পুস্তকে রাশিয়ার বাস্তব পরিস্থিতিতে অপূর্ব বিশ্লেষণের মাধ্যমে সৃজনশীলভাবে প্রয়োগ করেছিলেন। যে-সমাজে শ্রম-খাজনা বা বাধ্যতামূলক শ্রম প্রবলভাবে উপস্থিত ছিল, সামন্ত ভূস্বামীদের অধিকাংশ জমির ওপর একচেটিয়া অধিকার ছিল এবং ভিত্তিমূলে পুরনো গ্রামীণ সম্প্রদায়ের (মির) অবশেষ ছিল সুদৃঢ়, সেখানে লেনিন-এর এই বিশ্লেষণ কৃষি-সম্পর্ক অনুধাবনের পক্ষে এক মূল্যবান পথ-প্রদর্শক। সংগৃহীত তথ্য থেকে নারোদনিকরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে, রাশিয়ার কৃষিতে ধনতন্ত্র বিকশিত হয়নি এবং হবেও না। গ্রামীণ কমিউনগুলি সরাসরিভাবে কৃষিতে সাম্যবাদে রূপান্তরিত হবে।

এই পুস্তকে লেনিন সামন্ততন্ত্র এবং গ্রামীণ কমিউনগুলি বহাল থাকা সত্ত্বেও রাশিয়ার কৃষিতে ধনতন্ত্র বিকাশের অস্তিত্ব আবিষ্কার করে এই মতবাদ খণ্ডন করলেন। লেনিনের সংজ্ঞা অনুযায়ী কৃষি-ধনতন্ত্র হলো : "ধনতান্ত্রিক খামার-পদ্ধতি হচ্ছে ভাড়ায় শ্রমিক নিয়োগ (বার্ষিক, মরশুমী, দৈনিক ইত্যাদি), যারা মালিকদের যন্ত্রপাতির সাহায্যে জমি চাষ করে।" (সংগৃহীত রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১৯৫)।

এই বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা কোনো কোনো ভারতীয় আর্থনীতিবিদ উপেক্ষা করেন। তাঁরা প্রমাণ করতে চান যে, 'খামার সংশ্লিষ্ট ভৃত্যকুল,' 'শ্রমিকের মরশুমী চরিত্র,' 'মজুরীর অত্যধিক স্বল্পতা,' 'গ্রামীণ বেকারী' ইত্যাদি ধনতন্ত্র নয়, আধা-সামন্ততন্ত্রের পরিচায়ক। নারোদনিকদেরও এই দৃষ্টিভঙ্গী ছিল। লেনিন মার্কস-এর মূল দৃষ্টিভঙ্গী থেকে শুরু করে দেখালেন : "শেষ পর্যন্ত এটা দেখা কর্তব্য যে, কখনও কখনও শ্রম-সেবা ব্যবস্থা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে অনুপ্রবেশ করে এবং তার সঙ্গে এমনভাবে মিশে যায় যে তাদের মধ্যে পার্থক্য টানা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক, একজন কৃষক নির্দিষ্ট দিনের কাজের বিনিময়ে একখণ্ড জমি খাজনায় নিল (যা আমরা ব্যাপকভাবে প্রচলিত বলে জানি, পরবর্তী অধ্যায়ের উদাহরণ দ্রষ্টব্য)। এই ধরনের কৃষক' ও পশ্চিম ইউরোপের কিংবা 'ওস্কসি খামার শ্রমিক' যারা নির্দিষ্ট কয়েক দিনের কাজের বিনিময়ে এক খণ্ড জমি গ্রহণ করে তাদের মধ্যে আমরা কেমন করে পার্থক্য টানি ? জীবন নানা আঙ্গিক-প্রকরণ রচনা করে, যা উল্লেখযোগ্য ক্রমানুসরণেযে অর্থনৈতিক

ব্যবস্থাগুলির মূল বৈশিষ্ট্য বিপরীত ধর্মী সেগুলি পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত রাখে। কোথায় 'শ্রম-সেবার' অবসান ঘটে এবং কোথায় 'ধনতন্ত্রের' সূত্রপাত হয়, তা বলা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।" (সংগৃহীত রচনাবলী, ৩য় খণ্ড পৃষ্ঠা ১৯৭)।

কখনও কখনও দুইটির মধ্যে পার্থক্য টানা কঠিন হয়ে পড়লেও আশ্চর্য প্রাঞ্জলভাবে লেনিন ভূমিদাস-প্রথা থেকে কৃষি-ধনতন্ত্র বিকাশের জটিল পদ্ধতি চিত্রিত করেছেন। এই জটিলতা সম্পর্কে অজ্ঞতাই অনেক বিশেষজ্ঞকে ভারতীয় কৃষিতে যে ধনতন্ত্রের উদ্ভব ঘটছে তা অস্বীকারের পথে পরিচালিত করেছে।

রাশিয়ায় ধনতন্ত্রের বিকাশ সম্পর্কিত পুস্তকে লেনিন কৃষিতে প্রাক-ধনতান্ত্রিক এবং ধনতান্ত্রিক পদ্ধতির পার্থক্য এইভাবে তুলে ধরছেন :

প্রাক-ধনতান্ত্রিক পদ্ধতি :

"...প্রাক-ধনতান্ত্রিক কৃষি-পদ্ধতির বর্ণনায় মার্কস অর্থনৈতিক সম্পর্কের সমস্ত রূপ বিশ্লেষণ করেছেন ... এবং ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা এবং শ্রম-খাজনা, সামগ্রীর মাধ্যমে খাজনা ও টাকায় প্রদত্ত খাজনা উভয় ক্ষেত্রেই চাষী ও জমির মধ্যে বন্ধনের ওপর স্পষ্টভাবে জোর দিয়েছেন।" "উৎপাদকএবং উৎপাদনের উপকরণের মধ্যে এই বন্ধন হলো মধ্যযুগীয় শোষণের উৎস এবং শর্ত। এটাই কৃৎকৌশল এবং সামাজিক নিশ্চলতার ভিত্তি রচনা করে এবং 'অর্থনৈতিক চাপ ব্যতীত' অন্য সমস্ত রকম চাপকে সঙ্গতভাবে প্রয়োজনীয় করে তোলে।" (সংগৃহীত রচনাবলী, ৩য় খণ্ড পৃষ্ঠা ২১১)।

সংক্ষেপে, জমি ও চাষীর বন্ধন, ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন এবং ভূস্বামী কর্তৃক খাজনার হার সম্পর্কে অ-অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি, এই তিনটি হচ্ছে প্রাক-ধনতান্ত্রিক ভূমি-সম্পর্কের মূল বৈশিষ্ট্য।

ধনতান্ত্রিক পদ্ধতি :

"কৃষি-ধনতন্ত্রের প্রধান প্রকাশিত রূপ — ভাড়াকরা শ্রমিক নিয়োগ, আমরা এখন আলোচনা করব।" (সংগৃহীত রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩৭)। এবং এ-ছাড়া : "ধনতান্ত্রিক খামার-পদ্ধতি হচ্ছে ভাড়ায় শ্রমিক নিয়োগ (বার্ষিক, মরশুমী,

দৈনিক ইত্যাদি), যারা মালিকের যন্ত্রপাতির সাহায্যে জমি চাষ করে।" (ঐ· পৃষ্ঠা ১১৫)। লেনিনের মতে অবশ্য প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে. এরি সঙ্গে যুক্ত-হবে বাজারের জন্য উৎপাদন, যা সরাসরি ভোগের জন্য উৎপাদনের বিপরীতধর্মী এবং সর্বশেষে উন্নততর উৎপাদনকৌশল প্রয়োগ। পণ্য-অর্থনীতি প্রাক-ধনতান্ত্রিক সম্পর্ককে ম্লান করে এবং ধনতন্ত্রকে বিকশিত করে।

লেনিনের এই বিচার-পদ্ধতি (লেনিন মার্কস-এর বিশ্লেষণ-প্রণালী অনুসরণ করেছিলেন) প্রয়োগ করে আমরা ভারতের কৃষি-সম্পর্ক—স্বাধীনতা অর্জনের সময় থেকে, বিশেষভাবে কংগ্রেস সরকার কর্তৃক কিছু কৃষি-সংক্রান্ত ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর, যেভাবে বিকশিত হয়েছে তার বিচার-বিশ্লেষণ করতে পারি।

১৯৬১ সালের আদমসুমারী দেখিয়েছে যে, গ্রামীণ জনসংখ্যার শতকরা ৫৬.৯৮ অংশ শ্রমিক এবং তাদের মধ্যে ৩০.৬১ ভাগই কৃষি-শ্রমিক (ক্ষেত-মজুর)। আদমসুমারীর প্রতিবেদনের এই নির্দিষ্ট পঞ্জীভুক্তিতে ভাগচাষীদেরও এক বিরাট অংশ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কিন্তু তা সত্ত্বেও গ্রামীণ শ্রমিকদের মধ্যে মজুরীর দ্বারা জীবিকা-নির্বাহ করে এমন কৃষি-শ্রমিক (ক্ষেত-মজুর) অন্ততঃপক্ষে শতকরা ২০ ভাগের কম নয়। সেন্সাসের সংজ্ঞা অনুযায়ী কৃষি-শ্রমিকের সংখ্যা ১৯৫১ সালে ছিল ২ কোটি ৭৫ লক্ষ, ১৯৬১ সালে সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছিল ৩ কোটি ১৫ লক্ষ। এই ঘটনা দেখায় যে, বৃটিশ-শাসনে কৃষিতে শ্রম-মজুরীর বিকাশ শুরু হয়েছিল এবং স্বাধীনতার পূর্বে ও কংগ্রেস সরকার কর্তৃক কয়েকটি কৃষিব্যবস্থা প্রবর্তনের আগে কৃষি-ধনতন্ত্রের স্বদেশী বাজার বিদ্যমান ছিল, কংগ্রেস সরকার কৃষিতে কোনো বিপ্লবই আনতে পারেনি। কিন্তু কংগ্রেস সরকারের কৃষি-ব্যবস্থা শিল্প-সম্প্রসারণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে, অর্থাৎ সাধারণভাবে ধনতান্ত্রিক বিকাশ, কৃষি-ধনতন্ত্রকেও উদ্দীপনা জুগিয়েছে।

কৃষি-শ্রমিক ও স্বেচ্ছাধীন প্রজা tenant-at-will (ভাগচাষী সহ) এর মধ্যে ভূমি-সম্পর্কের দিক দিয়ে মূল পার্থক্য হচ্ছে প্রথমোক্তরা মালিকের (জমির মালিক বা লীজধারী প্রজা) যন্ত্রপাতির দ্বারা জমি চাষ করে ও স্বেচ্ছাধীন প্রজারা তাদের নিজস্ব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে। প্রথমোক্তদের ক্ষেত্রে কাজের সময়ের ভিত্তিতে শ্রমিকদের মজুরী বেশি বা কমনির্ধারিত হয় এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ভূ-স্বামীর অংশ (অর্থাৎ খাজনা) নির্দিষ্ট থাকে কিংবা তার খেয়ালের দ্বারা নির্ধারিত হয়। ভাগচাষী বা স্বেচ্ছাধীন প্রজা আইন সম্মতভাবে জমির সঙ্গে আবদ্ধ নয়; কিন্তু যেহেতু জমিতে একচেটিয়া ব্যক্তিগত মালিকানা বর্তমান এবং অন্য কোথাও

কাজ পায় না সেইহেতু সে প্রকৃতপক্ষে জমি ছেড়ে যেতে পারে না। জনমজুর যে কোনোও জায়গায় স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে কিংবা যৌথভাবে শিল্প-শ্রমিকের ন্যায় প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে পারে। কিন্তু ভূমির অসম্ভব স্বল্পতা এবং বিপুল সংখ্যক কৃষি-শ্রমিকের উপস্থিতিতে তার প্রতিযোগিতার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। অতীতে অসংখ্য আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ভাগচাষীরা স্বাধীনতার বহু পূর্বেই জমির বন্ধন ও অ-অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতা থেকে নিজেদের অনেকটা মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিল।

এ থেকে বোঝা যায় যে প্রাক-ধনতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক দিকগুলির পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবেশের জন্য বহুলাংশে পরিবর্তমান (Transitional character) চরিত্র নিয়েই ভারতের কৃষিভূমিসম্পর্কগুলি সুচিহ্নিত। তা সত্ত্বেও তিন ধরনের খামারের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য টানা যায়।

(১) ভাগচাষী ও অন্যান্য স্বেচ্ছাধীন প্রজাদের মধ্যে লীজ দেওয়া জমি, যারা নিজেদের যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উপকরণাদি দিয়ে সেই জমি চাষ করে ;

(২) ভূস্বামী বা কৃষকদের খামার যা প্রধানত ভাড়াকরা শ্রমিকের দ্বারা কর্ষিত হয়, এবং

(৩) ছোট কৃষকের খামার, যা তাদের নিজেদের শ্রম ও যন্ত্রপাতির দ্বারা কর্ষিত হয়, কিছু পরিমাণে যা আবার ভাড়াকরা শ্রমিক দ্বারাও সাহায্য প্রাপ্ত।

উপরোক্ত ধরন-ধারণগুলির বিশেষ চরিত্র পরীক্ষা করে দেখার পূর্বে আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, অতীতের তুলনায় গত দুই দশকে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বাজারের জন্য কৃষি-উৎপাদন (অর্থাৎ পণ্য-অর্থনীতি) বিস্তারলাভ করেছে। মুদ্রা-অর্থনীতি সুদূরতম গ্রামাঞ্চলে এমনভাবে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে যে, প্রাক-ধনতান্ত্রিক ভূমি-সম্পর্ক তাতে অবসান হতে বাধ্য। আজকাল ছোটখাটো চাষী, যে নিজের সামান্য জোতজমিতে সম্বৎসরের খোরাকের জন্য খাদ্য-শস্যও ফলাতে পারে না, সেও বছরের প্রথম দিকে বেশ কিছু অংশ বাজারে বিক্রয়ের জন্য খাদ্য-শস্য উৎপাদন করছে এবং বছরের মধ্যভাগে আবার নিজের খাবারের জন্য সেই খাদ্য-শস্য বাজার থেকে কিনতে বাধ্য হচ্ছে। এইভাবে ধনতন্ত্রের আভ্যন্তরীণ বাজার পূর্বের তুলনায় বিস্তৃততর হয়েছে। ধনতন্ত্রের মূলভিত্তি, পণ্য-অর্থনীতি এত দ্রুত প্রসারলাভ করছে যে, বাজারের জন্য উৎপাদন সমস্ত ধরনের চাষীর পক্ষে প্রায় সাধারণ নীতিতে পর্যবসিত হচ্ছে। বাণিজ্যিক ফসলের

ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ উৎপাদনই বাজারের উদ্দেশ্যে উৎপাদিত হয়। এখন পূর্বোক্ত পর্যায়-ভুক্তির অর্থনৈতিক চরিত্রগুলি পর্যালোচনা করা যাক।

১নং পর্যায়ভুক্ত : ১৯৫১ সালে প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ জমি খাজনায় জমা দেওয়া হয়েছিল (বড় বড় ভূস্বামী কর্তৃক প্রধানত ছোট চাষীদের কাছে লীজ প্রদত্ত হয়েছিল) এবং ১৯৬০ সালে এই লীজ কমে দাঁড়াল শতকরা ১৪ ভাগে, যার একটা অংশ ধনী ভূস্বামীরা গরীব চাষীদের নিকট থেকে লীজ হিসাবে গ্রহণ করেছিল। (জাতীয় নমুনা সমীক্ষার ১৬ দফা পর্যায়)। ১৯৬১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী প্রজাবিলি জোত-জমির পরিমাণ ছিল চাষে নিযুক্ত মোট জমির শতকরা ২২ ভাগ। এর থেকে এটাই উদ্‌ঘাটিত হয় যে, সামন্ত-সুলভ ভূমি-সম্পর্কের সঙ্কোচন ঘটেছে। কিন্তু এই সঙ্কোচনের পরিমাণ সংখ্যা-তথ্যে প্রদর্শিত আয়তনের তুলনায় কম ছিল, কারণ, 'প্রচ্ছন্ন প্রজাস্বত্ব' এতে দেখানো হয়নি। তাছাড়া শতকরা ২২ ভাগ প্রজা-জমির কিছু অংশ আবার গরীব চাষী কর্তৃক বড় ভূ-স্বামীদের লীজে প্রদান করা হয়েছিল।

যাই হোক, স্বাধীনতার পর আধা-সামন্ততান্ত্রিক ভূমি-সম্পর্ক সমস্ত চাষযোগ্য জমির শতকরা ৪০ ভাগ থেকে কমে অন্তত ২৫ ভাগে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য অনু-সন্ধানের দ্বারাই এই অনুমাণ প্রমাণসিদ্ধ করতে হবে।

২নং পর্যায়ভুক্ত : বর্তমানে মোট চাষযোগ্য জমির শতকরা ৩০ থেকে ৪০ ভাগ সম্পূর্ণ কিংবা আংশিকভাবে ভাড়াকরা শ্রমিকের সাহায্যে চাষ করা হয়। ১৯৫৩-৫৪ সালে বিশেষজ্ঞদের মতে শতকরা ১০ ভাগ জমি সম্পূর্ণভাবে কিংবা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ভাড়াকরা শ্রমিকের দ্বারা চাষ করা হতো এবং এখন এর হার নিশ্চয় আরো বেড়েছে। মহারাষ্ট্র, উত্তর প্রদেশের পশ্চিমভাগ, অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূল-বর্তী জেলাগুলিতে শতকরা হার অনেক বেশি। এর থেকে এটাই বোঝা যায় যে, ধনতান্ত্রিক চাষ-পদ্ধতি এবং ধনতান্ত্রিক সম্পর্ক বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং কোনো কোনো অঞ্চলে কৃষিতে এরই প্রাধান্য পরিলক্ষিত হচ্ছে।

৩নং পর্যায়ভুক্ত : পূর্বোক্ত হিসাব অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে, শতকরা ৬০ থেকে ৬৫ ভাগ চাষযোগ্য জমি ছোট মালিক-চাষীরা প্রধানত নিজস্ব শ্রমে এবং নিজেদের যন্ত্রপাতির দ্বারাই চাষ করে। তারা সামন্ত ভূস্বামীর পরিবর্তে সরাসরি সরকারী-কর্তৃত্বাধীন। তাদের তিনটি আঘাত সহ্য করতে হয় : (১) মূলধনের স্বল্পতা ; (২) মহাজনী সুদে ঋণ গ্রহণ ; এবং (৩) দামের যাঁতাকল (Price Scissors).

উপরোক্ত তিন পর্যায়ভুক্ত কৃষকদেরই সাধারণভাবে নিম্নোক্ত প্রাক-ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির যা এখনও টিকে আছে তাতে ভুগতে হয়। এছাড়া একচেটিয়া পুঁজিপতিদের বাজারের কারসাজির ফলও তাদের ভোগ করতে হয়।

(১) **সুদে মহাজনী ঋণ**ঃ কৃষকের মোট ঋণের প্রায় শতকরা ৮০ ভাগই হচ্ছে বৃহৎ ভূস্বামী ও পেশাদার মহাজনের কাছে। অধুনা পেশাদার মহাজনী কারবারের অনুপাতের সঙ্কোচন ঘটেছে ও ধনী চাষীরা এই ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করেছে।

(২) পাইকারী ব্যবসায়ী সহ বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজিপতিরা উৎপাদিত দ্রব্যের ন্যায্য মূল্য থেকে চাষীদের বঞ্চিত করে। ধনী কৃষকেরা এই ধরনের শোষণ থেকে কিছুটা মুক্ত হলেও ছোট জোতের গরীব চাষীরা এসব থেকে বেশি নির্যাতিত হয়। কিন্তু শিল্প-পণ্যের অত্যধিক মূল্য মারফৎ একচেটিয়া ব্যবসায়ীর দ্বারা সমগ্র কৃষক-সমাজ শোষিত হচ্ছে।

(৩) কৃষির উন্নতির জন্য কারিগরী সম্পদের অভাবই কৃষকদের বহুলাংশে আবহাওয়ার ওপর নির্ভরশীল হতে বাধ্য করে। সেচ-ব্যবস্থা ও সার সরবরাহে কিছুটা উন্নতি ঘটলেও উপরোক্ত অবস্থা সমগ্র কৃষক সমাজের দুর্ভোগের এক উৎস।

৫

সামন্ত-অবশেষ থেকে উদ্ভূত স্বল্প-সংখ্যক, এবং ধনতান্ত্রিক খামার ব্যবস্থাতেও যা অব্যাহত, পরিবারের হাতে জমির একচেটিয়া মালিকানাই শতকরা ৮০ ভাগ কৃষক-পরিবার এবং ক্ষেত-মজুরের মধ্যে তীব্র জমির ক্ষুধা সৃষ্টি করেছে। এমনকি, ১৯৬১ সালেও ২০ একর বা তার বেশি জোতের শতকরা ৭ ভাগ ছিল কর্ষিত জমির শতকরা ৩৬ ভাগ। আবার অন্যদিকে, ৫ একর বা তার নীচের জোতের শতকরা ৬১.৬৯ ভাগ ছিল কর্ষিত জমির মাত্র ১৯.১৮ ভাগ। এটা মুষ্টিমেয় লোকের হাতে জমির একচেটিয়া মালিকানা প্রমাণ করে। একদিকে গ্রামীণ জন-সংখ্যার শতকরা ১০ ভাগ লোক শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশি জমির মালিক। অন্যদিকে রয়েছে ভূমিহীন কিংবা অতি নগণ্য জমির অধিকারী গ্রামীণ জন-সংখ্যার শতকরা ৭৫ ভাগের তীব্র জমির ক্ষুধা। এটা জোতের সাংঘাতিক খণ্ড-বিখণ্ডীকরণকেও তুলে ধরে; এই খণ্ড-বিখণ্ডীকরণই আমাদের কৃষির কারিগরী পশ্চাৎপদতা এবং নিশ্চলতার জন্য দায়ী। ভূমি-বণ্টন কাঠামোটিই আমাদের

গ্রামীণ অর্থনীতি এবং কৃষক-জনতার পক্ষে সবচেয়ে জরুরী সমস্যা। তাই ডাক উঠেছে জোত-জমির সর্বোচ্চ সীমা সংশোধনের এবং ভূমিহীন ও গরীব চাষীদের মধ্যে উদ্বৃত্তজমি বণ্টনের জন্য। সমবায়গুলিকে বিশেষ সরকারী সাহায্যে উৎসাহিত করে বৃহৎ আকারে কৃষি-সমবায় বিকাশের জন্যও ডাক এসেছে। সরকারী পতিত জমিসহ জমির নির্দিষ্ট উচ্চসীমা প্রবর্তনের দ্বারা উদ্বৃত্ত জমি কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করাই হলো প্রাথমিক উৎসাহব্যঞ্জক কাজ। কিন্তু ঋণ, সার ও সেচ-এর সুযোগ এবং ন্যায্য মূল্যের প্রশ্নটিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই সমস্ত ব্যবস্থাগ্রহণ শুধুমাত্র সামন্ত-বিরোধী ব্যবস্থাগ্রহণই নয়, কারণ বড় জোত-জমিগুলি বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভাড়াকরা শ্রমিক নিয়োগ করে চাষ করা হয়। এই ব্যবস্থাবলম্বনই অ-ধনতান্ত্রিক বিকাশের পথ প্রশস্ত করতে পারে।

সামন্ততন্ত্রের ভগ্নাবশেষ মুছে ফেলতে, ধনতান্ত্রিক একচেটিয়াপতিদের শোষণ খর্ব করতে এবং তার মধ্য দিয়ে কৃষির উন্নতি এবং কৃষকদের সমৃদ্ধিশালী জীবনের পথ প্রশস্ত করার জন্য দীর্ঘ পথ-পরিক্রমার এইগুলি কয়েকটি ধাপ মাত্র।

ঐতিহাসিক ও অর্থনৈতিক অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ কারণে আমাদের কৃষিতে আধা-সামন্ত ভূমি-সম্পর্কের ভগ্নাবশেষে কৃষির ধনতান্ত্রিক বিকাশই অবশ্যম্ভাবী বিকল্প নয়।

অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বলা যায়, এমনকি তথাকথিত 'সবুজ বিপ্লব'-এর দ্বারা ধনতান্ত্রিক চাষাবাদ পদ্ধতির উন্নতিতে শুধুমাত্র বিত্তবান কৃষকেরাই লাভবান হয়েছে। মাঝারী চাষীরা কম লাভবান হয়েছে এবং বিরাট সংখ্যক গরীব চাষী ও ক্ষেত-মজুরেরা কোনো লাভের মুখই দেখতে পায়নি।

সামগ্রিক কৃষিউৎপাদন-সূচক ১৯৪৯-৫০ সালের ১০০ থেকে ১৯৬৮-৬৯-এ ১৬৩ পর্যন্ত বর্ধিত হয়েছে, এবং উৎপাদন দাঁড়িয়েছে ১০ কোটি টন।

তথাকথিত 'সবুজ বিপ্লবের' 'নতুন রণনীতি'টি (নিবিড় কৃষি-উন্নয়ন কর্মসূচী) ১৯৬৫ সালে ভারত সরকার কর্তৃক রচিত হয়েছিল। এই কর্মসূচী উচ্চ ফলনশীল বীজ, সার ও সেচের জল সরবরাহের মাধ্যমে ১১৪টি জেলায় প্রয়োগ করা হয়েছিল। USAID সংস্থার উদ্যোগে ফ্রান্সিন ফ্রাঙ্কেল কৃষকদের সামাজিক-অর্থনৈতিক সম্পর্কের উপর এর প্রভাব অনুশীলনে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তাঁর রিপোর্টের উপসংহারপর্ব ২৯ শে নভেম্বর, ১৯৬৯ তারিখে 'মেইন স্ট্রিম' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এতে নিম্নলিখিত তথ্য পরিবেশিত হয়ঃ

"যে সমস্ত ক্ষেত্রে ছোট চাষী, যারা অংশত লীজ নেওয়া জোত-জমিতে চাষ করে, অথবা নির্ভেজাল প্রজামাত্র, সেই সমস্ত মালিক-প্রজা-চাষী শ্রেণীর অর্থ-নৈতিক অবস্থার চরম অবনতি ঘটেছে। কারণ (জমির মূল্য প্রচণ্ডবেগে বৃদ্ধি পাওয়ায়) সাম্প্রতিককালে খাজনার পরিমাণ বৃদ্ধি এবং / অথবা ভূস্বামীদের মধ্যে নিজ চাষের জন্য জমি পুনঃগ্রহণের প্রবণতা (লাভজনক কলা-কৌশল প্রবর্তনের দ্বারা) প্রকৃতপক্ষে তাদের এই দুর্দশার দিকে ঠেলে দিয়েছে।"

ফ্রাঙ্কেল তারপর বলেন: "পাঁচ থেকে দশ একর জোত-জমির মালিকানার কৃষকেরা অপেক্ষাকৃত ভাল করেছে"…"কিন্তু এটা দেখা যায় যে, দশ একর বা তার বেশি জোত-জমির অধিকারী চাষীদের ক্ষুদ্র সংখ্যালঘুরাই শুধু জমির উন্নতিতে লগ্নি করার জন্যে উদ্বৃত্ত মূলধন সংগ্রহ করতে পেরেছে, বিশেষভাবে ছোটখাটো সেচের জন্য— যা কিনা আধুনিক উৎপাদন-উপাদান (in-put) যথোপযুক্ত প্রয়োগের ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যকীয় পূর্ব শর্ত।"

ফ্রাঙ্কেল-এর তথ্যানুসন্ধান দুটি বিষয়কে প্রতিষ্ঠিত করে। প্রথমত, সামন্ততন্ত্রের ভগ্নাবশেষ সম্পূর্ণভাবে মুছে না ফেলে ব্যাপক কৃষি-সংস্কার মারফৎ ধনতান্ত্রিক বিকাশে কৃষির উন্নয়ন সীমাবদ্ধ হতে বাধ্য। দ্বিতীয়ত, এমনকি ধনতান্ত্রিক বিকাশের গণ্ডীর মধ্যেও বিরাট সংখ্যক দরিদ্র চাষীরা সুযোগ-সুবিধা লাভে বঞ্চিত হয়। এই অবস্থায়, সামন্ততন্ত্রের ভগ্নাবশেষ অবলুপ্তির পরে অ-ধনতান্ত্রিক বিকাশই কৃষি-উৎপাদনে জোয়ার সৃষ্টির একমাত্র পথ।

রাশিয়ার অবস্থা বর্ণনা-প্রসঙ্গে লেনিন ধনতান্ত্রিক বিকাশের দুটি পথের কথা বলেছিলেন—বৃহদায়তন বেসরকারী ভূস্বামী-পুঁজিপতির খামার গঠনের প্রুশীয় পথ এবং ভূস্বামীদের সমস্ত সম্পত্তি সম্পূর্ণভাবে বাজেয়াপ্ত করে ও দ্রুত ধনতান্ত্রিক বিকাশের জন্য জমি জাতীয়করণের বিপ্লবী পথ। কিন্তু ১৯৭০-এর ভারত ১৯০০-এর রাশিয়া থেকে পৃথক। ভারতের কৃষিতে ধনতান্ত্রিক বিকাশ সামন্ততন্ত্রের ভগ্নাবশেষ সম্পূর্ণ উচ্ছেদ না করেই, এমনকি উনবিংশ শতাব্দীর রাশিয়ার মতো বৃহৎ ভূস্বামী-ধনতান্ত্রিক খামার গঠন না করেই ঘটছে। চরম দক্ষিণ পন্থীরা এই ধরনের বিকাশের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে, কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোত-জমির প্রাধান্য থাকায় তা বাস্তবায়িত করতে পারে না। কারণ, ঐ ধরনের বিকাশের জন্য যে বিরাট সংখ্যায় কৃষক-উচ্ছেদ প্রয়োজন, তা সম্ভব নয়। ধনতান্ত্রিক বিকাশের ইতিহাস-সম্মত বিপ্লবী পথও নিম্নলিখিত কারণে অবাস্তব:

(১) ক্ষুদ্র চাষীরা জমির জাতীয়করণ চায় না, যা ছাড়া এই ধরনের বিকাশ

অচিন্ত্যনীয়। তারা এই সমাধান মেনে নেয় না, কারণ জমির ব্যক্তিগত মালিকানা কৃষকদের মধ্যে সুদৃঢ়ভাবে প্রোথিত। সুতরাং ধনতান্ত্রিক বিকাশের একমাত্র পথ থমকে দাঁড়াতে বাধ্য; এর কারিগরী দিক দুর্বল থাকতে এবং বিরাট সংখ্যক ক্ষেত-মজুরেরা জনসংখ্যার অন্যান্য অংশের তুলনায় অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দুস্থতর হতে বাধ্য।

(২) ভারতের ধনতন্ত্রবাদ ইতিমধ্যে তার ক্ষয়িষ্ণু স্তরে পৌঁছে গেছে। শিল্পের ক্ষেত্রে তার প্রগতি খুবই ব্যাহত এবং উৎপাদনের তুলনায় সংবহনে (in circulation) বেশি মূলধন আটকা পড়েছে। কালোবাজার 'আর্থিক মূলধনকে' 'উৎপাদনী মূলধনে' রূপান্তরিত হতে বাধা দিচ্ছে। স্বভাবতই শিল্প-ধনতন্ত্রের তুলনায় কৃষি-ধনতন্ত্র আরও ধীরগতি হতে বাধ্য। যেহেতু ভারতবর্ষ নানাভাবে ধনতান্ত্রিক পথের সঙ্কটের মধ্য দিয়ে চলেছে সেইহেতু জনগণের জন্য ··কৃষি-ধনতন্ত্রের মধ্যে কোনো ভবিষ্যৎ নেই।

(৩) বিদেশী পুঁজির সঙ্গে সহযোগিতায় ভারতের জাতীয় অর্থনীতিতে একচেটিয়া পুঁজির আবির্ভাব, উৎপাদন শক্তির বিকাশকে ব্যাহত করে, বিশেষ করে তাদের শোষণ কৃষি-বুর্জোয়াদের বিকাশ সীমিত করে।

(৪) অর্থনৈতিক অবস্থার একটি লক্ষণীয় দিক হচ্ছে কৃষিতে পুঁজি সৃষ্টির অভাব। সর্বভারতীয় গ্রামীণ-ঋণ-পর্যালোচনা কমিটির মতে, "গ্রামাঞ্চলে সঞ্চয় এবং আয়ের অনুপাত ১৯৫০-৫১ থেকে ১৯৬২-৬৩ পর্যন্ত শতকরা ২.৩-এ প্রায় অপরিবর্তিত ছিল, যদিও গ্রামীণ আয় উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়েছে। অথচ শহরের পরিবার প্রতি এই অনুপাত একই সময়ে ৭·৩ ভাগ বেড়ে শতকরা ১৭ ভাগে দাঁড়িয়েছে।···সমগ্র অর্থনীতিতে সঞ্চয়ের তুলনায় এই সময়ে গ্রামীণ সঞ্চয় শতকরা ২৯.৩ ভাগ থেকে প্রায় দেড়গুণ কমে শতকরা ১৫.২ ভাগে পৌছায়। অথচ, তুলনামূলকভাবে এই কালটাই হলো ভারতে ধনতন্ত্র-বিকাশের দ্রুত বৃদ্ধির সময়।

(৫) কৃষি-ধনতন্ত্রের দেউলিয়াপনা ক্ষেত-মজুরের অবস্থার মধ্যেও প্রতিফলিত হয়। অন্যান্য সমস্ত শ্রেণীর তুলনায় তাদের অবস্থা নিকৃষ্টতর। ন্যূনতম মজুরী আইন কোনো কাজেই আসেনি। কৃষি-শ্রমিকের গড়-পড়তা বার্ষিক আয় শিল্প-শ্রমিকের সর্বনিম্ন আয়ের চেয়েও অনেক কম। কৃষি-শ্রমিক পরিবারের শতকরা ১৫ ভাগ বেকার অথচ অন্যান্যদের মধ্যে এই হারের পরিমাণ শতকরা ৬ ভাগ। সামাজিক বৈষম্যের ব্যাপারেও ক্ষেত-মজুরেরা সব থেকে বেশি নির্যাতিত। থাকবার

জন্য তার কোনো বাসস্থান নেই, কাজের স্থায়িত্ব বা নিরাপত্তাও নেই; মহার্ঘ-ভাতা তার কাছে এক অকল্পনীয় স্বপ্ন।

(৬) পরিশেষে এবং প্রাথমিকভাবে, আধুনিক যুগে, বিংশ শতকের সূচনায় রুশদেশের মতো ভারতীয় কৃষিতে ধনতান্ত্রিক বিকাশ ঐতিহাসিক দিক দিয়ে অপরিহার্য নয়। মহান অক্টোবর বিপ্লবের পর, বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এর সম্প্রসারণ ঘটায় এবং অধিকাংশ উপনিবেশ ও আধাউপনিবেশের মুক্তির পর, এযাবৎ পশ্চাৎপদ দেশগুলিতেও অ-ধনতান্ত্রিক বিকাশের পথ প্রশস্ত হয়েছে। বিশ্ব-পুঁজিবাদী ব্যবস্থার তুলনায় বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব ধনতান্ত্রিক পথের ভাগ্যকে রুদ্ধ করে দিয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে, ভারতের প্রকৃত বিকল্প—ধনতান্ত্রিক বিকাশের পথ—দুটি নয়। সেই পথ হলো অন্য "দুটি পথ", যথা—সীমাবদ্ধ ধনতান্ত্রিক পথ এবং বিপ্লবী অ-ধনতান্ত্রিক পথ। ভারতীয় কৃষক ও ভারতীয় কৃষির জন্য দ্বিতীয় পথটির অনুসরণ ঐতিহাসিকভাবেই নির্দেশিত। এই ক্ষেত্রে ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মতাদর্শের ক্রম-প্রাধান্য ও সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার অগ্রণী ভূমিকা, মানসিক ক্ষেত্রেও ভারতীয় কৃষিতে "বিকল্প ধনতান্ত্রিক পথ"—এই মতাদকেই নাকচ করে দেয়। (ফেব্রুয়ারি, ১৯৭০)

অনুবাদ: ধনঞ্জয় দাশ। সমীর চট্টোপাধ্যায়

লেনিনের রাষ্ট্র

জ্যোতি দাশগুপ্ত

লেনিনের জন্মশতবর্ষে নিশ্চিতই লেনিনবাদী নন এমন অনেক মানুষ এবং বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক মতাবলম্বীরা ভারতে এবং সারা পৃথিবী জুড়েই লেনিন-এর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। কলকাতায় লেনিন উৎসবে রাজ্যপাল শান্তিস্বরূপ ধাওয়ান যখন লেনিনের ব্রোঞ্জের প্রতিমূর্তি উন্মোচন করছিলেন তখনই তার মাত্র পাঁচশো গজ দূরে শহীদ মিনারের পাদদেশে এক পৃথক সভায় 'মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির' পলিটব্যুরোর সদস্য ও নেতা শ্রী বি. টি. রণদিভে বিদ্রূপভরে রাজ্যপালের সভার উদ্যোক্তা ও সঙ্গীদের উল্লেখ করে বলেন যে, লেনিনের "জাত-শত্রুদের নিয়ে যাঁরা লেনিন-উৎসব উদযাপন করছেন, তাঁরা লেনিনের অপমান করছেন।" পৃথিবীতে লেনিনবাদের ব্যাখ্যাকারের কোনও অভাব নেই, তবু লেনিনবাদের অমন অপব্যাখ্যা করার জুড়ি বাস্তবিকই বিরল। সঙ্কীর্ণতা-বাদ মগজকে ছাড়িয়ে হাড়-মজ্জায় প্রবেশ করেছে বলেই কোনো বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে ঐরূপ শিশুসুলভ ভাষ্যদান সম্ভব।

লেনিনকে পুরোপুরিভাবে গ্রহণ করা এবং লেনিনবাদী হওয়া অবশ্যই কঠিন কাজ। সেজন্য শ্রমিক-বিপ্লবকে শুধু গ্রহণ করা নয়, তারি জন্যে সর্বস্ব পণের বিপ্লবী হতে হয়। কিন্তু লেনিনকে পুরোপুরিভাবে বর্জন করা আরও কঠিন। সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার বুক চিরে লেনিন প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জনক। সাম্রাজ্যবাদের পাল্টা মানবশক্তির মধ্যেই লেনিনের বিকাশ ও বিস্তার এবং সেজন্যই লেনিনবাদীদেরও ছাড়িয়ে লেনিন মানবতার মধ্যে বিরাজমান।

লেনিনকে পরিহার করতে চাইলে সেই গর্ত এমন ভয়ঙ্কর যে, সে-নরকমূর্তির নাম ফ্যাসিজম। বুর্জোয়া রাজনৈতিক ধুরন্ধর বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল লেনিনবাদের অবশ্যই একজন জাতশত্রু। কিন্তু ফ্যাসিবিরোধী মহাযুদ্ধে লেনিন-এর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মৈত্রী ছাড়া বৃটেনের স্বাধীনতাকে বাঁচানো যায় না, এই বাস্তব রাজনীতিক জ্ঞানে আপৎকালে চার্চিল খুবই টনটনে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বারুদ-গন্ধ না মিলাতেই চার্চিল সোভিয়েত-মিত্রতাকে বরবাদ করে পুনরায় সোভিয়েত-বিরোধী শিবিরের নেতা হন। কিন্তু তার জন্যেও বৃটেনকে যে-হীনমন্যতার মাশুল গুনতে হচ্ছে, বেশিদিন বৃটেনের মানুষ সেই বোঝা কাঁধে নিয়ে চলতে পারে না। বিশ্বখ্যাত কামউনিস্ট ইতিহাসবেত্তা শ্রীরজনীপাম. দত্ত তাঁর 'সমসাময়িক ইতিহাসের সমস্যা' পুস্তকে তারই এক নাটকীয় বর্ণনায় দেখিয়েছেন যে "আর একটি হতবুদ্ধিকর চিত্র হলো, অবস্থা আজ এই পর্যায়ে পৌছেছে যে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের ক্রমান্বয়ে সঙ্কুচিত সীমানার মধ্যে সৃষ্ট মরীয়া জংলী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রাক্তন প্রভু সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির স্বাধীনতাকেই বিসর্জন দিতে হচ্ছে। ১৯৪৭ সালে বৃটিশ সেনাবাহিনী ভারত ছাড়ে। ১৯৪৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী বৃটেনে প্রবেশ করে। বৃটেনে এখন আমেরিকার যুদ্ধঘাটি রয়েছে, শুধু তাই নয়, বৃটেনকে এমনকি জার্মান সৈন্যের মহড়ার জন্য বুকেও স্থান করে দিতে হচ্ছে।"

চার্চিল লেনিনকে ধরেন ও ছাড়েন। কিন্তু লেনিনকে দৃঢ়ভাবে ধরা ছাড়া বৃটেনের মুক্তি নেই।

বৃটেনের এই উল্টাপাল্টা রাজনীতি বহুদিনের। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যেও বিচিত্র ও বিভিন্নমুখীন গতিতে বৃটেনের রাজনীতি প্রসিদ্ধ। চেম্বারলেন হিটলার ও ফ্যাসিবাদকে দুধকলা দিয়ে পুষেছিলেন এবং যুদ্ধের প্রথম বলি চেকোস্লোভাকিয়াকে নিজ হাতেই হিটলারকে দিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু সোভিয়েতের জাতশত্রু চার্চিল প্রধান মন্ত্রী হবার পর ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধে সোভিয়েতের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করা ছাড়া গত্যন্তর দেখেননি। "কাজের সময় কাজী কাজ ফুরালেই পাজি" এই বর্বরতায় চার্চিল হিটলার-এরই মন্ত্রশিষ্য, কারণ হিটলারও যুদ্ধের প্রথম অঙ্কে সোভিয়েতের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি করে প্রয়োজনীয় কার্যসিদ্ধির পর সোভিয়েতের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে দেরি করেনি। কিন্তু এক্ষেত্রে চার্চিল কিংবা হিটলার প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হলো এখানে যে, বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলি নিজ নিজ আপৎকালে লেনিন-এর রাষ্ট্রের মহিমাকে বোঝে এবং এমনকি সেই পথ ধরেও বৃটেনের মানুষ এবং জার্মানির মানুষও লেনিনকে বোঝে। হিটলারের বার্লিনে আজ জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র স্থাপিত, লেনিন-এর পতাকা উড়ছে এবং কুখ্যাত হিটলার একটি কালো দাগ ছাড়া ইতিহাসে আর কোনও স্থান পাবে না। অনুরূপ ইতিহাস চার্চিল-এর বৃটেনেও যে ঘটবে তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। সেই সাফল্যসাপেক্ষে বৃটেনের এই করুণ অবস্থা, একদিন যে-বৃটেন ফৌজ দিয়ে আমেরিকার স্বাধীনতাকে বিনাশ

করতে চেয়েছিল; আজ উল্টে মার্কিন ফৌজ বৃটেনে ঘাঁটি গেড়ে বসেছে এবং বৃটেনের সার্বভৌমত্ব শিকেয় উঠেছে।

বৃটেনের শ্রমিকশ্রেণী এবং স্বাতন্ত্র্যকামী মানুষ জাতীয় এই অবমাননায় সহজে যে বিচলিত হয় না তার কারণ আর ইতিহাসও বিচিত্র। পররাজ্যলুণ্ঠনের বখরা দিয়ে বৃটিশ বুর্জোয়াশ্রেণী শ্রমিকদের একাংশকেও কলুষিত করেছে এবং ক্ষুদ্র আত্মসুখে মগ্ন জাতি স্বাধীনতার মর্যাদা চিরদিনই হারিয়ে ফেলে। বৃটেনের এই দুর্ভাগ্যের কথা বহুবর্ষ আগেই কার্ল মার্কস বর্ণনা করেছিলেন। এঙ্গেলস-এর কাছে এক পত্রে কার্ল-মার্কস লিখেছিলেন :

"বৃটেনের শ্রমিকেরা স্পষ্টতই বুর্জোয়াদের ছোঁয়াচজনিত রোগ থেকে কতদিনে মুক্তি পাবে তা অপেক্ষা করে জানতে হবে···ঐরূপ বিশাল আকারের পরিবর্তনের জন্য বিশ বছর একদিনের সমান—যদিও ভবিষ্যতে আবার এমন সময় আসতে পারে যখন একটি দিনের মধ্যে বিশ বছর ঠাসা হয়ে থাকবে।" (৯ এপ্রিল ১৮৬৩)

পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতা রক্ষায় লেনিন-এর অবদান ফ্রান্সের রাষ্ট্রনায়ক দ্য গলকেও অম্লানবদনে স্বীকার করতে হবে।

দ্য গল ব্যক্তিগতভাবেই তার প্রধান সাক্ষ্য। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে দ্য গল লণ্ডনের এক কামরায় ফ্রান্সের স্বাধীন সরকারের দীপ জেলে বসেছিলেন। যুদ্ধের পর শান্তি প্রতিষ্ঠার এবং বিশ্বের নিরাপত্তা রক্ষার নিমিত্ত জাতি-সঙ্ঘের গঠন ও ভবিষ্যৎ কার্যসূচী সম্পর্কে স্তালিন, রুজভেল্ট ও চার্চিল যখন বৈঠক করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন, তখন দ্য গল মস্কোতে আমন্ত্রিত হলেন। সোভিয়েত রাষ্ট্রনায়কেরাই এই প্রস্তাব উপস্থিত করলেন যে, জাতি সঙ্ঘের মাথায় যে-কয়েকটি রাষ্ট্রের বিশেষ দায়িত্ব বর্তাবে, তার মধ্যে ফ্রান্স হবে অন্যতম। দ্য গল বীর হলেও তখন তিনি বৃটেনের অনুগৃহীত। বৃটেনের মতলব দ্য গল-এর কাছেও অস্পষ্ট ছিল না। বৃটেনের সমকক্ষরূপে ফ্রান্স ইয়োরোপের বুকে বিরাজ করুক তা কখনো কোনো পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের ইচ্ছা হতে পারে না। সোভিয়েত প্রস্তাবে দ্য গল বস্তুতই বিপন্ন বোধ করলেন। দ্য গল-এর দুশ্চিন্তা পাছে গাছের পাখি ধরতে গিয়ে খাঁচার পাখি হারিয়ে যায়। তিনদিন ধরে আলোচনা নিথর। অবশেষে মস্কো থেকে দ্য গলকে ফেরৎ যাবার গাড়িতে তুলে দেওয়া হলো। কিন্তু গাড়ি যখন ছাড়িছাড়ি করছে তখনই দ্য গল বিবেকদংশনে জর্জরিত হয়ে আবার বৈঠকের প্রস্তাব করলেন। আর তার ফলশ্রুতিতেই নিষ্পন্ন সোভিয়েত-ফ্রান্স

চুক্তিতে স্থির করা হলো যে, ফ্রান্স জাতিসঙ্ঘে বৃহৎ পাঁচশক্তির একজন হবে। সাম্রাজ্যবাদের পদানত দেশগুলির মুক্তির জন্য লেনিন, মাত্র ততটুকু নয়, সাম্রাজ্যবাদী প্রভু দেশগুলির মুক্তির জন্যও লেনিন ও লেনিন-এর সৃষ্ট সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া প্রকৃত কোনো সহায় নেই।

দ্য গল লেনিনবাদী নন। তিনি কিছুতেই লেনিনবাদী হতে পারেন না। ফ্রান্সের গোটা জাতিটাও লেনিনবাদী হয়ে ওঠেনি। কিন্তু জাতি হিসেবেই ফ্রান্স যদি লেনিন-এর প্রতি কৃতজ্ঞ না হয়, তবে সেই কৃতঘ্নতার অবধি থাকে না। ফ্যাসি-বিরোধী যুদ্ধে সোভিয়েতকে অস্বীকার করে ইয়োরোপের মুক্তির কোনও উপায় ছিল না। ফলে গোটা ইয়োরোপই লেনিন-এর কাছে ঋণী।

এভাবেই পূর্ব-ইয়োরোপের ওয়ারস-বুদাপেস্ত-বুখারেস্ট থেকে শুরু করে মধ্য-ইয়োরোপের প্রাগ-বার্লিন-পারী ছাড়িয়ে পশ্চিম সীমানার লণ্ডন পর্যন্ত সর্বত্র লেনিন-এর প্রতি অকপট শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্য লেনিনবাদীরা ছাড়াও সমগ্র মানবতার প্রতিনিধিরা মিলিত হতে পারেন। সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের কুচক্রীরা ছাড়া মানুষ মাত্রই লেনিনকে ভালোবাসতে পারেন।

দীর্ঘদিনের পরাধীনতার পর সদ্য-স্বাধীন ভারতের মতো দেশগুলির কথা আরও স্বতন্ত্র। সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠনে পুঁজির শূন্যতায় কৃশ এবং কৃৎকুশলতায় দু-শতাব্দীর অবজ্ঞায় পশ্চাৎপদ এইসব দেশ সাম্রাজ্যবাদের সর্বশেষ মরীয়া আক্রমণ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে লেনিন-এর রাষ্ট্রের সহায়তা দ্বারাই পুনর্জীবনের রসদ পায়। সম্প্রতি সোভিয়েত ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি কর্তৃক সহায়তার দ্বারা ভারতে ভারী-শিল্প স্থাপনের এক হিসেবে বলা হয়েছে যে হিটলার-বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হবার সময় সোভিয়েতে যে-পরিমাণ ভারী-শিল্পের কারখানা ছিল, আজ শুধু সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সহায়তায় ভারতে তদনুরূপ ভারী-শিল্প গড়ে উঠেছে। সর্বাধুনিক ইস্পাতের কারখানা ভিলাই ও বোকারো, ভারী যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানা রাঁচি, কয়লাখনির যন্ত্রপাতি তৈরি করার দুর্গাপুর, ভারী বৈদ্যুতিক যন্ত্র প্রস্তুত করার হরিদ্বার, তেল উত্তোলনের সর্ববিধ সাহায্যের শক্তিতে 'ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন'-এর প্রতিষ্ঠা ও বৃদ্ধি, তাপ ও জল-বিদ্যুতের বিশাল বিশাল প্রকল্প, কৃষিক্ষেত্রে যন্ত্রীকরণের সুরতগড় খামার এবং দেশরক্ষা শিল্পে 'মিগ' বিমানের কারখানা প্রভৃতি সবদিকে এবং সব বিষয়ে সাম্রাজ্যবাদের শিকল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার জন্য সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে সাহায্য করেছে। সাম্রাজ্যবাদের পাল্টা রাষ্ট্র হিসেবে সদ্য-স্বাধীন দেশগুলিকে সহায়তা দান করা

যেমন লেনিন-এর রাষ্ট্রের অপরিহার্য ধর্ম, তেমনই সাম্রাজ্যবাদের অক্টোপাস থেকে মুক্তির জন্য সত্যমুক্ত রাষ্ট্রগুলির পক্ষেও সোভিয়েতের সাহায্য নেওয়া তাদের অবস্থানেরই অনিবার্য ফলশ্রুতি।

লেনিন ও লেনিন-এর রাষ্ট্রের সাহায্য গ্রহণের সঙ্গে লেনিনবাদ গ্রহণের কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। লেনিন ও লেনিন-এর রাষ্ট্রকে গ্রহণ না করে বর্জন করতে চাইলে বিভিন্ন জাতির আপন স্বাতন্ত্র্যই বিপন্ন হয় এবং সেকারণেই লেনিন-এর রাষ্ট্রের বিরোধিতার পথ সোজা ফ্যাসিবাদ ও নরকের দিকে প্রসারিত। এমন এক রাষ্ট্রের সৃষ্টিতেই লেনিন ঐতিহাসিক পুরুষ হয়েছেন, শুধু তাই নয়, তিনি ইতিহাসের নিয়ন্তা হয়েছেন।

এভাবেই দেখা যায় শুধু নিজ দেশের স্বাতন্ত্র্যের ও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের মধ্যেই লেনিনবাদ সীমিত নয়। লেনিনবাদী হওয়ার অর্থ লেনিন-এর শিক্ষায় স্বদেশেও অনুরূপ আন্তর্জাতিকতায় পুষ্ট শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য তত্ত্ব ও কর্মে বিপ্লবী হওয়া। বিপ্লবী বলশেভিক সৈনিক কখনো ঝাঁকে ঝাঁকে তৈরি হয় না। মেনশেভিকদের সংগঠনী চিন্তাকে বাতিল করে দিয়ে লেনিন বলশেভিক পার্টি গড়ার সময় বিপ্লবী পার্টির সদস্যের যে-সংজ্ঞা স্থির করেছিলেন, আজও পৃথিবীর সব দেশের কমিউনিস্ট পার্টির কাছে সেটাই অনুজ্ঞা। শ্রমিক-শ্রেণীর অগ্রণী নেতাদের নিয়ে একটি নেতৃত্ব দানের পার্টি গঠন করতে হবে, কমিউনিস্ট পার্টি কখনোই বৃটিশ লেবর পার্টির মতো শ্রমিকদের একটি দলমাত্র নয়, কিংবা সকল শ্রমিকের সম্মিলিত ট্রেড ইউনিয়নের মতো একটি সংস্থার সংস্করণও নয়। শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রণী ও বিপ্লবী তত্ত্বে বিশ্বাসী আন্তর্জাতিকতা-বাদী হওয়া ছাড়া কোনো ব্যক্তি কমিউনিস্ট হবার যোগ্য হতে পারে না। শ্রমিক-শ্রেণীর আন্তর্জাতিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো শক্তিশালী বিপ্লবী রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের স্বার্থে লেনিন-এর আপন সৃষ্টি রুশ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে নিঃস্বার্থভাবে বিপন্ন করতেও লেনিন কিরূপ প্রস্তুত ছিলেন তার এক বর্ণনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বলশেভিক পার্টিরই 'মস্কো রিজিওনাল ব্যুরো' ১৯১৮ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি জার্মানির সঙ্গে ব্রেস্ট শান্তি-চুক্তির বিরোধিতা করে এক প্রস্তাব গ্রহণ করে। ঐ প্রস্তাবের মধ্যে বলা হয়েছিল যে, "বিশ্ব বিপ্লবের স্বার্থে আমরা সোভিয়েত ক্ষমতা হারাবার সম্ভাবনা মেনে নেওয়াকেও যথার্থ বলে বিবেচনা করি।"

লেনিন ঐ প্রস্তাবের জবাব দিতে গিয়ে বললেন :

"ঐ প্রস্তাবের রচয়িতারা হয়তো এইরূপ ধারণা করেছেন যে জার্মানিতে ইতোমধ্যেই বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে এবং একটি প্রকাশ্য দেশব্যাপী গৃহযুদ্ধের পর্যায়ে জার্মানি পৌঁচেছে; সেজন্যই আমাদের কাজ হলো জার্মানির শ্রমিকশ্রেণীকে সাহায্যের জন্য নিজেদের শক্তিকে নিয়োজিত করা। যে-জার্মান বিপ্লব চূড়ান্ত লড়াইয়ের পর্যায়ে পৌঁছে বিপুল বাধার সম্মুখীন হয়েছে, তাকে বাঁচাবার জন্যই কি আমাদের ধ্বংস হওয়া ("সোভিয়েত ক্ষমতা হারানো") প্রয়োজন? ঐ তত্ত্বের প্রবক্তাদের মতে আমরা নিজেরা ধ্বংস হলেও জার্মান প্রতিবিপ্লবী ফৌজের একটি অংশকে আমাদের দিকে টেনে রেখে জার্মানির বিপ্লবকে আমরা সাহায্য দিতে পারি।

"একথা অনস্বীকার্য যে, ঐ প্রতিপাদ্যগুলি যদি সঠিক হতো তবে আমাদের পক্ষে পরাজয়ের সম্ভাবনাকে ও সোভিয়েত ক্ষমতা হারানোর বিপদকে স্বীকার করে নেওয়া 'যথার্থ কাজ' হতো। শুধু তাই নয়, তা হতো আমাদের অপরিহার্য কর্তব্য। কিন্তু ঐ প্রতিপাদ্যগুলি বাস্তবে অনুপস্থিত। জার্মানিতে বিপ্লব পরিপক্ক হচ্ছে; তবে সেই বিপ্লব জার্মানিতে বিস্ফোরণের স্তরে পৌঁছয়নি, গৃহযুদ্ধের স্তরে ওঠেনি। 'সোভিয়েত ক্ষমতাকে হারাবার সম্ভাবনাকে মেনে নিয়ে আমরা জার্মানির বিপ্লবকে পরিপক্ক হয়ে উঠতে সাহায্য করব না, বরং তার পথের বিঘ্নই বাড়াব।" (সিলেক্টেড ওয়ার্কস, ২৭ খণ্ড, পৃঃ ৭২)

রুশ দেশে লেনিন প্রথম যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপন করে তার প্রধান হয়েছেন, জার্মানিতে একটি বলিষ্ঠতর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপনের বাস্তবতা সৃষ্টি হলে তার স্বার্থে রুশ রাষ্ট্রটিকে বিপন্ন ও বিলুপ্ত হতে দিতেও লেনিন প্রস্তুত। এরই নাম শ্রমিকশ্রেণীর লেনিনীয় আন্তর্জাতিকতা।

স্বদেশে আন্তর্জাতিকতাবাদী ঐরূপ একটি শ্রমিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সাধন ও কর্মে লিপ্ত বিপ্লবীরাই কমিউনিস্ট, বলশেভিক এবং লেনিনবাদী। আদর্শে এবং বীরত্বে সুশিক্ষিত এবং সুনিপুণ নেতাদের নিয়ে গঠিত ঐরূপ একটি পার্টির পক্ষেই অধিকাংশ শ্রমিককে এবং অ-শ্রমিক মেহনতী জনতারও বিপুল অংশকে অনুপ্রাণিত করে শ্রমিকবিপ্লব এবং শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

ক্ষয়িষ্ণু সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদীদের হিংস্র প্রতিযোগিতার জংলী অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে আপন দেশ ও আপন স্বাতন্ত্র্যের নিমিত্ত লেনিনকে গ্রহণের তালিকায় চার্চিল আছেন, দ্য গল আছেন, এবং অনুন্নত সদ্যস্বাধীন দেশসমূহের রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে নেহরুজী ইন্দিরাজী প্রমুখ বিস্তরই রয়েছেন, কিন্তু তাঁরা

মানে কখনো এই নয় যে, নিজ নিজ রাষ্ট্রকেও লেনিনবাদী রাষ্ট্র করার নিমিত্ত তাঁরা শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী নেতা বনে গেছেন। তবু লেনিনবাদীরা এবং কোনো লেনিনবাদী রাষ্ট্র যাবতীয় উৎপীড়িত জাতি এবং যে কোনো জাতির পীড়ায় লেনিনের মতোই অকাতর সাহায্য দিতে যেমন কুণ্ঠা বোধ করছেন না, তেমনই সাহায্যপ্রাপ্তরা লেনিনের জয়গান করলে কিংবা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে তার ফলে "লেনিনের অপমান" হলো, এমন উদ্ভট চিন্তাও পোষণ করবে না।

লেনিন বিশ্বে প্রথম সফল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জনক। আজ আরো তেরটি দেশে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগোষ্ঠী সৃষ্টি হয়েছে এবং পুঁজিবাদের সঙ্গে সর্বদার জন্য সরাসরিভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ একটি বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু হয়েছে। এই অবস্থায় পুঁজিবাদের দেশগুলিতেও যেমন সমাজতন্ত্র একটি প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি, তেমনই সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতেও পুঁজিবাদ তার সমাজ-দর্শন ও প্রতিযোগিতার যাবতীয় শক্তি নিয়ে নাক গলাবার মরীয়া প্রচেষ্টা চালায়। বিশ্বজোড়া এই সংঘাতের মধ্যে অবিরাম লেনিনীয় হবার সাধনা ব্যতিরেকে কোনো একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পক্ষেও সর্বদা মাথা ঠিক রাখা সহজ হয়ে ওঠে না। ফলে অর্থনীতি এবং সমাজক্ষেত্রে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরও নানা জাতীয়তাবাদী চিন্তা এবং বুর্জোয়া রোগ রাষ্ট্রযন্ত্রে গজায়—অর্থাৎ ঐসব দেশ স্পষ্টতই সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদী ভাবধারার খপ্পরে পড়ে। লেনিনের রাষ্ট্র নিশ্চিতই তাদের সমাজতন্ত্র স্থাপন, নির্মাণ ও গঠনে সাহায্য করেছে, তার স্বীকৃতি দেওয়া সহজ; কিন্তু নিজেদের রাষ্ট্রকেও লেনিনবাদে উত্তীর্ণ করার সাধনায় ঘাটতি পড়া তখনো অসম্ভব নয়। তার প্রমাণ হামেশাই দেখা যায়। মাও-সেতুং-এর মতবাদ লেনিনবাদের পথ থেকে সেই বিচ্যুতিরই প্রতিমূর্তি।

আন্তর্জাতিকতা সমাজতন্ত্রের অন্তর্নিহিত ধর্ম। স্বদেশে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র-বিরোধী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা দ্বারাই শুধু নয়, বিশ্ব-প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণা না করে জাতীয় প্রলেতারীয় রাষ্ট্র এবং সমাজব্যবস্থাকে রক্ষা করা যায় না। অথচ চীন-এর নেতারা এমন কথাও বলতে শুরু করেছেন যে, আজ আর কোনো সমাজতান্ত্রিক শিবির নেই এবং তাকে রক্ষা করারও কোনো প্রয়োজন নেই। আর এই তাত্ত্বিক প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বন-জার্মানির সঙ্গে চুটিয়ে শুধু লেন-দেন-এর বাণিজ্য নয়, সমাজতান্ত্রিক জগতের বিরুদ্ধে তীব্র

প্রতিহিংসাপরায়ণ ঐ বন-এর সহযোগিতায় পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণেও চীন-এর নেতারা কোনরূপ কুণ্ঠা বোধ করছেন না। অথচ পৃথিবীর বুর্জোয়া শিবিরের কার্যকলাপকে লক্ষ্য করলেই পাল্টা সমাজতান্ত্রিক শিবিরের কর্তব্যগুলি বেরিয়ে আসে। স্বদেশের কি বিপুল প্রতিবাদ. এমন কি স্বদেশের দীর্ঘ প্রতিষ্ঠিত স্বাধীনতাকে পর্যন্ত উপেক্ষা করে বৃটিশ বুর্জোয়া শাসকেরা কিভাবে ইংলণ্ডে ইংয়াকি ও জার্মান ফৌজকে ঘাঁটি বানাতে দেয় এবং সম্পূর্ণ অকারণ ভিয়েতনাম যুদ্ধে আমেরিকাকে সাহায্য করে তার মধ্যেই বুর্জোয়া শিবিরের বিশ্ব-ঐক্য প্রতিফলিত। কি নিদারুণ অসঙ্গতি নিয়ে ফ্রান্সের শাসকেরা জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রকে আজও কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করে চলে, তার মধ্যেও দেখা যায় যে, সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিশ্ব-পুঁজিবাদের সংহতি আজও কত শক্ত। কিন্তু তার প্রতিদ্বন্দ্বী সমাজতান্ত্রিক সংহতি যদিও লেনিনবাদের আত্মা, তবু সেই আন্তর্জাতিক দায়িত্বকে অস্বীকার করে পৃথিবীতে নানা রঙ-বেরঙএর পাতিবুর্জোয়া সমাজতন্ত্র সৃষ্টি হয়েছে, শুধু তাই নয়, তাঁরা আবার লেনিনবাদের নামে শপথ ঘোষণাও করেন।

লেনিনের জীবনই লেনিনবাদীদের শিক্ষণীয়। সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার মধ্যে পাতিবুর্জোয়া ভাবধারা চুঁইয়ে আসে, একেবারেই কোনো আনকোরা কথা নয়। এবং তার চেহারা দেখে ভীত কিংবা আতংকিত হওয়াও লেনিনবাদ নয়। স্বয়ং লেনিন — কাউটস্কি প্লেখানভ বুখারিন থেকে শুরু করে ট্রটস্কি পর্যন্ত বিশ্বখ্যাত দিক্‌পালদের সঙ্গে লড়াই ক'রে লেনিনবাদের প্রতিষ্ঠা করেছেন। আজ বিশ্ব-পুঁজিবাদের চূড়ান্ত ধস ও ভাঙনের দিনে অযুত অযুত নতুন পাতি-বুর্জোয়া স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক আসরে উপস্থিত হচ্ছেন। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর বিশ্বদর্শনও আজ এমনই শক্তিশালী যে, লেনিনের ইস্পাত-দৃঢ়তা নিয়ে লেনিনবাদীরা অবশ্যই পৃথিবীকে জয় করবেন।

ডায়ালেকটিক এবং লেনিনের রাজনীতি

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

এক

বুর্জোয়া ইতিহাসবিদ্‌দের কেউ কেউ লেনিনকে কেবল 'man of action' এবং 'brilliant opportunist and tactician' বলে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু লেনিনের রচনাবলীর সঙ্গে যাঁদের সামান্য পরিচয়ও আছে তাঁরা জানেন এই ধরণের চরিত্র-চিত্রণ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। লেনিনবাদের ছাত্রমাত্রই জানেন যে তত্ত্বের ক্ষেত্রেও লেনিনের অবদান অপরিসীম। রাশিয়ার মতো অনগ্রসর দেশে পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ; আর্থ-নীতিক এবং রাজনীতিক সংগ্রামের পরস্পর সম্পর্ক; সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র; কৃষি-সংক্রান্ত তত্ত্ব; রাষ্ট্র ও বিপ্লব; রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখল ও সমাজবাদী সমাজ-গঠনে পার্টির অপরিহার্যতা; বুর্জোয়া দর্শনের নতুন চিন্তাধারার বস্তুবাদী বিচার; ডায়ালেকটিকাল পদ্ধতি এবং জ্ঞানের তত্ত্ব ইত্যাদি নানাপ্রশ্নে লেনিনের রচনাবলী মার্কসবাদের ভাণ্ডারকে অপরিমেয় ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ করেছে। লক্ষণীয় এই যে লেনিনের এই তাত্ত্বিক অবদান একজন 'বিশুদ্ধ' তত্ত্ববিদের মস্তিষ্ক-চর্চার পরিণতি নয়। মার্কস বা এঙ্গেলস তাঁদের জীবদ্দশায় যা-যা দেখে যেতে পারেননি বা যে-সব বিশ্লেষণ তাঁদের রচনায় পূর্ণাঙ্গ আকার লাভ করেনি সেই সমস্ত শূন্যস্থান পূরণ করার জন্য লেনিন অ্যাকাডেমিশিয়নের ভূমিকা গ্রহণ করেন নি। শ্রমিকশ্রেণীকে বিপ্লবীকর্মে প্রস্তুত করার জন্য, পার্টিকে বিপ্লবসম্পাদনের যোগ্য হাতিয়ারে পরিণত করার জন্য তিনি মার্কসবাদী তত্ত্বকে বিকশিত ও সমৃদ্ধ করেছিলেন।

লেনিনের রচনাবলীর সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তিমাত্রই জানেন যে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনে যে সংস্কারবাদী প্রবণতা দেখা দেয় তার বিরুদ্ধে তীব্র আদর্শনৈতিক সংগ্রামকে পরিচালনাকালে তিনি হেগেল সম্পর্কে সুগভীর অধ্যয়ন করেন (১৯১৪-১৬)।[১] সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে

ভাবাদর্শগত সংগ্রামের কাজে হেগেলের The Science of Logic পাঠ ছিল লেনিনের কাছে একান্ত প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য। কেন তাঁর কাছে এমন মনে হয়েছিল? তার কারণ, সোশ্যালিষ্ট আন্তর্জাতিকের মধ্যে যে-সব ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত ছিল তার বিরুদ্ধে ক্ষুরধার সংগ্রাম পরিচালনা করতে গেলে এবং সেই সব সর্বহারাবিপ্লব-বিরোধী ধারণাকে শ্রমিকশ্রেণীর মন থেকে নির্মূল করতে গেলে মার্কসবাদের যা মর্মবস্তু—অর্থাৎ তত্ত্ব ও ব্যবহারের ডায়ালেকটিকাল ঐক্য-সম্পর্ক[২]—তাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা একান্তভাবেই অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত এবং ব্যবহারিক কর্মজীবনের এই সম্পর্ককে 'সাধারণভাবে' এবং 'একবারের মতো এবং শেষবারের মতো' বোঝা যায় না; কারণ মার্কসবাদ একটা দার্শনিক সূত্রসমষ্টি নয়—মার্কসবাদ হলো সমাজের বিপ্লবী রূপান্তরের দিগ্‌দর্শক। শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণাসমূহকে পরাস্ত করার সংগ্রামের প্রক্রমই মার্কসীয় পদ্ধতিকে সমৃদ্ধ করে। কোন্ কোন্ গ্রন্থপাঠ একান্ত প্রয়োজন এবং সেইসব রচনার প্রকৃত তাৎপর্য কিসে সম্পর্কে মার্কস-বাদীকে সঠিক পথের নিশানা দেয়। এই পরিবেশে মার্কসবাদীরা একটি বিপ্লবী পার্টিতে সংগঠিত হয়ে, তত্ত্বকে অধিগত করে, তাকে সমৃদ্ধ করে এবং তত্ত্বের আলোকে বিপ্লবী কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে সামাজিক রূপান্তরের কাজ ত্বরান্বিত করে।

এটা হঠাৎ কোনও ঘটে যাওয়া ব্যাপার নয় যে লেনিন প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে —যখন পুঁজিতন্ত্রের আভ্যন্তরীণ বিরোধ প্রকট হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল এবং বৈপ্লবিক সংকট একটা পরিণতির দিকে অগ্রসর হচ্ছিল—দর্শন এবং বিশেষ-ভাবে মার্কসীয় ডায়ালেকটিক সম্পর্কে সুগভীর অধ্যয়নের কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। লেনিনের মনে এ বিষয়ে কোন দ্বিধা ছিল না যে, একমাত্র বস্তুবাদী ডায়ালেকটিক-এর যুক্তিসূত্রে অনুধাবন করেই সাম্রাজ্যবাদের আভ্যন্তরীণ বিরোধের মার্কসীয় বিশ্লেষণ, প্রথম মহাযুদ্ধের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র উদ্ঘাটন, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতৃত্বের সুবিধাবাদী রাজনীতির মুখোশ-উন্মোচন এবং সর্বহারা শ্রেণীর শোষণমুক্তি-সংগ্রামের রণনীতি এবং কৌশল নির্ধারণ সম্ভবপর। এই আমলের লেনিনের বিভিন্ন রচনা (যথা 'ইম্পিরিয়ালিজম অ্যাজ দি হাই-য়েস্ট স্টেজ অব ক্যাপিটালিজম', 'সোশ্যালিজম অ্যাণ্ড ওঅর', 'দি ইউনাইটেড স্টেটস্ অব ইউরোপ স্লোগান', 'দি জুনিয়াস প্যাম্ফলেট', 'সোশ্যালিস্ট রেভো-

ল্যুশন অ্যাণ্ড দি রাইট অব্ নেশনস টু সেলফ ডিটারমিনেশন' যা মার্কসবাদী ক্লাসিকস্-এর মর্যাদা লাভ করেছে 'ফিলজফিকাল নোট বুকস' থেকে অবিচ্ছেদ্য।

ডায়ালেকটিক-এর তন্নিষ্ঠ পর্যালোচনার ফলে লেনিন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে দর্শনের মৌলিক প্রশ্নে এবং ডায়ালেকটিকের পদ্ধতিতে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। ক্রুপস্কায়া তাঁর 'লেনিনের স্মৃতি' গ্রন্থে বলছেন যে Encyclopaedia Granat-এর জন্যে Essay on Marxism লেখার জন্যে লেনিন হেগেল সম্পর্কে গভীরভাবে অধ্যয়ন শুরু করেন। এই প্রবন্ধের প্রথম অংশে দেখা যায় লেনিন দার্শনিক প্রশ্নকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। ক্রুপস্কায়ার মন্তব্য: "This was not the usual way of presenting Marx's teaching" কথাটি সত্য। লেনিনের আগে মার্কসীয় অর্থনীতির উপর অনেক 'সরলীকৃত ভাষ্য' প্রকাশিত হয়েছিল। মার্কস-এঙ্গেলসের মৃত্যুর পর লেনিনের Essay প্রথম রচনা যেখানে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী যথোচিত গুরুত্বসহকারে উপস্থাপিত হয়েছে। ডায়ালেকটিককে এইভাবে অধিগত করার ফলেই তাঁর পক্ষে ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের রণনীতি ও কৌশল সংক্রান্ত সমস্যাদি অনুধাবন করা সম্ভবপর হয়েছিল। ডায়ালেকটিক তাঁর সম্পূর্ণ অধিগত ছিল বলেই তিনি কোন বাঁধাধরা ফরমুলা বা সূত্রসমষ্টি সৃষ্টি করে যাননি। তিনি প্রায়শই বলতেন: 'সত্য সব সময়েই বাস্তব' ('দি ট্রুথ ইজ অলওয়েজ কনক্রিট')। ১৯১৭ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে 'পুরনো বলশেভিকরা' পরিস্থিতির নিরপেক্ষ বিচারে ১৯০৫-৬এর স্লোগানের ('প্রোলেতারিয়েত ও কৃষকদের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব'-এর স্লোগানের) পুনরাবৃত্তি করেন। উদ্দেশ্য: অস্থায়ী সরকারের প্রতি সর্তসাপেক্ষ সমর্থন জানানো (অর্থাৎ অস্থায়ী সরকার যে পরিমাণে শান্তি চুক্তি প্রভৃতি গণতান্ত্রিক কর্তব্য সম্পাদন করেন তার সেই সব ব্যবস্থার প্রতি সমর্থন জানানো)। ১৯১৭ সালে রুশ দেশের এই পরিস্থিতিতে বলশেভিকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছিলেন, নতুন পরিস্থিতিতে পুরনো স্লোগান কাজে লাগানোর চেষ্টা করো না। বাস্তব পরিস্থিতির বাস্তব বিশ্লেষণ করতে সচেষ্ট হও।

লেনিনের বৈশিষ্ট্য ছিল তোতাপাখির মতো পুরনো স্লোগানের পুনরাবৃত্তি নয়—নতুন পরিস্থিতির বিশ্লেষণ এবং সেই বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে ইতিকর্তব্য নির্ধারণ। তাই যখন তিনি দেখলেন যে এই 'গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব' বর্তমান এবং তা একটি বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করেছে তখন নতুন বাস্তব পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে—শ্রেণীবিন্যাসও পরিবর্তিত হয়েছে। 'গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব'-এর স্লোগানের

বিচারবিহীন পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে পেটি-বুর্জোয়া শক্তিসমূহ অস্থায়ী সরকারকে সমর্থন করে বুর্জোয়া শ্রেণীশাসনকে সংহত করতে চেয়েছিলেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমাজবাদী বিপ্লবের বিকাশমান পরিস্থিতিতে বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থানুকূল এই ধরণের রাজনীতিক সিদ্ধান্ত লেনিনের মতে ছিল শ্রমিক স্বার্থবিরোধী ও বিপ্লব প্রচেষ্টার পথে বিঘ্নস্বরূপ।

নতুন ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে পার্টির সঠিক নীতি নির্ধারণে লেনিনের 'এপ্রিল থিসিস-'এর ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অস্থায়ী সরকারকে উচ্ছেদ করে মেহনতী জনতার রাষ্ট্র ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক কর্তব্যের তাত্ত্বিক বনিয়াদ লেনিনের 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' গ্রন্থে অত্যন্ত দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব'-এর উপ-শিরোনামা 'মার্কসীয় রাষ্ট্রতত্ত্ব ও বিপ্লবে সর্বহারা শ্রেণীর কর্তব্য'। উপ-শিরোনামাটি অত্যন্ত সুপ্রযুক্ত এবং উপ-শিরোনামাটির অর্থেই আমরা সাধারণত (এবং সঙ্গত কারণেই) 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব'কে গ্রহণ করে থাকি। কিন্তু ডায়ালেকটিক পদ্ধতির দৃষ্টিকোণ থেকেও এই গ্রন্থটি গভীরতর আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

একটা বৈজ্ঞানিক থিয়োরি হিসেবে, কর্মের পথপ্রদর্শক তত্ত্ব হিসেবে মার্কসীয় রাষ্ট্রতত্ত্বকে উপস্থাপিত করতে গিয়ে লেনিন কেবল কতকগুলো শাশ্বত অনবচ্ছিন্ন নীতির তালিকা পেশ করেন নি। পরন্তু লেনিন দেখিয়েছেন যে মার্কসের রাষ্ট্রতত্ত্বের বিকাশে সংগ্রামরত শ্রমিকশ্রেণীর প্রয়োজনীয়তা ও অভিজ্ঞতা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। 'Marxism is the conscious reflection of an unconscious process' রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসবাদী ধ্যান-ধারণায় স্বাভাবিকভাবেই শ্রেণীর অভিজ্ঞতা বিধৃত হয়। এবং সেই কারণেই লেনিন দেখান যে কিভাবে মার্কস-এঙ্গেলস ১৮৪৭-৪৮ সালে রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করে এই সত্যে উপনীত হন যে রাষ্ট্র হচ্ছে শ্রেণীগত আধিপত্য প্রতিষ্ঠার যন্ত্র, এক শ্রেণী কর্তৃক অন্য শ্রেণীর উপর নির্যাতন চালাবার যন্ত্র। ইতিহাসের বস্তুবাদী বিশ্লেষণের ফলে মার্কস-এঙ্গেলস দেখান যে রাষ্ট্রের যে-সব বৈশিষ্ট্যকে 'স্বাভাবিক' এবং অপরিহার্য বলে ধরে নেওয়া হয় সেগুলো আসলে সমাজের শ্রেণীবিভাগের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি।

১৮৪৭-৪৮-এর যুগে শ্রমিক আন্দোলনে সুবিধাবাদী রাজনীতিক নেতা ও চিন্তাবিদের দল মার্কস-এঙ্গেলসের এই বৈজ্ঞানিক মতের বিরোধিতা করেন। লেনিন বলেন যে মার্কসের পর প্রত্যেক দেশে মূলধনী-পুঁজি ও একচেটিয়া পুঁজি

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের মারফত পৃথিবীর বাজার দখল করার কাজে এগিয়ে এসেছে, শ্রেণীশোষণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সেই কারণে রাষ্ট্রের নির্যাতন-মূলক এবং জঙ্গী চরিত্র আরো বেশি সংহত হয়েছে। (সমকালীন পৃথিবীতে রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসীয় পদ্ধতিতে আলোচনা করলে, যে-আলোচনার অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে, দেখা যায় লেনিনের বিশ্লেষণ কত বৈজ্ঞানিক। লেনিন-বর্ণিত শ্রেণীশোষণ কিভাবে বেড়ে চলেছে তার তথ্যসমৃদ্ধ বিবরণও জানা যাবে এই ধরনের আলোচনায়।) এর পাশাপাশি লেনিন দেখাচ্ছেন কিভাবে শ্রমিক আন্দোলনে সুবিধাবাদী এবং মধ্যবিত্ত-সুলভ প্রবণতা প্রকট হয়ে উঠেছে, মার্কসের রাষ্ট্রতত্ত্ব থেকে তা কতটা সরে এসেছে, যার পরিণতি দেখা যায় প্রথম মহাযুদ্ধের সময় অন্য দেশের বিরুদ্ধে "পিতৃভূমিকে রক্ষা' করার নামে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সংস্কারবাদী নেতৃত্বের আত্মসমর্পণের নীতির মধ্যে। সেই কারণেই লেনিনের মতে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের চূড়ান্ত সংগ্রামকে সার্থক করতে গেলে এবং সুবিধাবাদী রাজনীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করতে গেলে রাষ্ট্র সম্পর্কে ডায়ালেকটিকাল দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারের প্রশ্ন অত্যন্ত জরুরি প্রশ্ন হিসাবে দেখা দেয়। সেই কারণেই প্রয়োজন হলো :

(১) ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সম্পর্কে মার্কস-এঙ্গেলসের বক্তব্যের বিশ্লেষণ।

(২) বিপ্লবী সংগ্রামে, বিশেষত ১৮৪৮-এর অভ্যুত্থান, ১৮৭১-এর পারী কমিউন এবং ১৯০৫ এবং ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ এবং মার্কসবাদে যে এই সব গণসংগ্রামের অভিজ্ঞতা বিবৃত ও তার ফলে এই মতবাদ যে সমৃদ্ধ হয়েছে তা প্রতিষ্ঠা করা। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা চলতে পারে, ১৮৭১-এর পরেই মার্কস-এঙ্গেলসের পক্ষে তাঁদের ধ্যান-ধারণাকে মূর্তায়িত করা সম্ভব হয়েছিল :

[ক] পুরনো রাষ্ট্রযন্ত্র সম্পূর্ণভাবে চূর্ণ করতে হয়, তাকে অবিকৃত রেখে বা তার সংস্কার সাধন করে তাকে ব্যবহার করা চলে না, বা শ্রমিকশ্রেণী আগের তৈরি রাষ্ট্রযন্ত্র কেবল করায়ত্ত করেই তার নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য চালনা করতে পারে না, এবং

[খ] নতুন শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্রক্ষমতা হবে 'কমিউন'-এর মতো, যেখানে সমগ্র শ্রমিকশ্রেণী প্রশাসন ব্যবস্থার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকবে এবং যা ধীরে ধীরে রাষ্ট্রের ক্রমাবলুপ্তির দিকে অগ্রসর হবে : অর্থাৎ ১৮৪৭ সালে 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'তে ধ্বংসপ্রাপ্ত রাষ্ট্রযন্ত্রের কী দিয়ে পুরণ

হবে মার্কস-এঙ্গেলস এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন সম্পূর্ণ বিমূর্তভাবে। পারী কমিউনের অভিজ্ঞতার আলোকে সেই বিমূর্ত ধারণা মূর্ত অবয়ব লাভ করে। এটা সম্ভব হয় শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী ব্যবহারিক সংগ্রামের অভিজ্ঞতার আলোকে।

(৩) মার্কসবাদ যে অচল-অনড় মতসমষ্টি নয়, তার যে বিকাশ ঘটে এবং শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের দিগ্‌দর্শক হিসেবে এই মতবাদ যে আরো বিকশিত হতে পারে, শ্রমিক আন্দোলনে ভ্রান্ত ধারণা ও বিরোধী শ্রেণীর মানসিক প্রবণতাজাত বিচ্যুতির বিরুদ্ধে পরিচালিত সংগ্রামের মধ্যেই যে একমাত্র এই বিকাশলাভ সম্ভব, এই সত্য প্রতিষ্ঠা করা। বিরোধের মাধ্যমেই থিয়োরিরও বিকাশলাভ ঘটে—ডায়ালেকটিকের মূলসূত্র এইভাবেই কার্যকর হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, একদিকে সুবিধাবাদী ও অন্যদিকে নৈরাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে তীব্র আদর্শনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনার মাধ্যমেই মার্কসের নিজের ধারণা স্বচ্ছতর হয়। লেনিন এইসব বিরোধের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করেন এবং তাঁর সময়কার শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের বিশ্বাসঘাতকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করেন। এইভাবেই তিনি হেগেল অধ্যয়ন করে যে ডায়ালেকটিকাল পদ্ধতিকে আয়ত্ত করেন তাকে বাস্তবে রূপ দেন। শ্রমিক আন্দোলনে ভাবাদর্শ এবং থিয়োরির ব্যবহারিক প্রয়োগমূল্য আছে সেই কারণে থিয়োরিকে অধিগত করার জন্য সর্বদা নিজেদের প্রস্তুত রাখতে হয়, থিয়োরিকে শাণিত করতে হয়; কঠোর তত্ত্বগত প্রস্তুতির মাধ্যমে শ্রেণীর অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে জানতে হয়। যদি এই অভিজ্ঞতাকে নেহাতই রুটিনের পর্যায়ে ফেলা যায় তাহলে শ্রমিকশ্রেণী ধনিকশ্রেণীর ধ্যান-ধারণার আধিপত্যের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। সুবিধাবাদী 'থিয়োরি'র ভূমিকা হলো যাতে এই ধরনের ঘটনা ঘটে তার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। এই বোধ থেকেই লেনিন সংস্কারবাদী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। কারণ সংশোধনবাদীদের মুখ্য কাজই ছিল শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামকে সংস্কারবাদের আয়তির মধ্যে বা জাতীয় গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখা।

বর্তমান প্রবন্ধের সীমিত পরিসরে বিশদ আলোচনার অবকাশ নেই; প্রয়োজনীয়তাও বিশেষ নেই। মার্কসবাদের প্রতিটি ছাত্রকেই 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' পাঠ করে (এবং বার বার পাঠ করে) দেখতে হবে লেনিন কিভাবে মার্কসবাদের বিকৃতিকারীদের বিপ্লব বিরোধী স্বরূপ উন্মোচন করে দিয়েছিলেন। সুবিধাবাদী

হিসাবে এই সংস্কারপন্থীরা স্বাভাবিকভাবেই ডায়ালেকটিকাল পদ্ধতি থেকে সরে যান; তাঁরা তাঁদের সুবিধাবাদী রাজনীতির গরজ-ঘেঁষা যুক্তিবাদ হিসেবে মার্কসের রচনাবলী থেকে (বিশেষত আগেকার রচনাবলী থেকে) বিক্ষিপ্ত অংশ উদ্ধৃত করে নিজেদের বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করার অপপ্রয়াস পান। অনুরূপভাবে, কাউটস্কি এবং তাঁর অনুবর্তীরা গভীরভাবে রাষ্ট্রের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ বা মার্কসের রাষ্ট্রতত্ত্ব অনুধাবন করেননি। নিজেদের সুবিধেমতো মার্কস-এঙ্গেলসের রচনা থেকে ইতিহাস-পারম্পর্য বিচ্ছিন্ন কিছু বাক্যবন্ধ উদ্ধৃত করতেই তাঁদের আগ্রহ ছিল বেশি। এই প্রবণতাকে আমাদের বিচার করতে হবে ১৯১৪ সালের পর সোশ্যালিজমের প্রতি দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতৃত্বের বিশ্বাসঘাতকতা এবং ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের পটভূমিকায়। বিশ্বাসঘাতক নেতৃত্বের সঙ্গে লেনিনের সম্পর্কচ্ছেদ ও 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' অচ্ছেদ্য সূত্রে গ্রথিত। তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত এবং ব্যবহারিক কর্মজীবনের ঐক্যই যে মার্কসীয় দর্শনের অন্যতম মূলসূত্র তা লেনিন প্রতিষ্ঠিত করলেন এইভাবে। সুবিধাবাদীদের ব্যবহারিক কর্মপ্রচেষ্টার সমর্থনে এক বিশেষ ধরনের থিয়োরির (বা থিয়োরির অস্বীকৃতির) দরকার পড়ে।

তাদের ধ্যান-ধারণাকে শ্রমিকশ্রেণীর উপর শ্রমিক-আমলারা জোর করে চাপিয়ে দেয়। এবং শ্রমিক-আমলাদের স্বার্থ শ্রেণীশত্রুর স্বার্থের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য-ভাবে জড়িত। (যথা ধনিক জাতীয় রাষ্ট্রের সংরক্ষণ, যে-রাষ্ট্রের মধ্যে তারা তাদের আর্থনীতিক এবং রাজনীতিক [পার্লামেণ্টারি] বিশেষ সুযোগ-সুবিধা লাভে সমর্থ হয়।) শ্রমিক-আমলাদের ধ্যান-ধারণার অবস্থান ডায়ালেকটিকের মূল সূত্রের বিপরীত বিন্দুতে। ডায়ালেকটিকের থিয়োরিই একমাত্র থিয়োরি যা শ্রমিকশ্রেণীকে বিভিন্ন ফ্রণ্টে আদর্শনৈতিক, রাজনীতিক, আর্থনীতিকও বিভিন্ন দেশে পরিচালিত সংগ্রামের মধ্যে যে-আন্তর-সম্পর্ক বর্তমান সে-সম্পর্কে সচেতন ও বৈজ্ঞানিক চেতনায় প্রবুদ্ধ করে। রাষ্ট্রের ডায়ালেকটিকাল থিয়োরিকে অধিগত করার ফলেই লেনিনের পক্ষে ১৯১৭ সালে বলশেভিক পার্টি ও রুশ দেশের শ্রমিক-শ্রেণীকে বিপ্লবের পথে পরিচালিত করা সম্ভব হয়েছিল। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, ডায়ালেকটিকের বহুপার্শ্বতার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করার মানেই তাঁর রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও শাণিত। হেগেলের ডায়ালেকটিকের মূলসূত্র আয়ত্ত করে তিনি বুঝেছিলেন যে ব্যবহারের মধ্য দিয়েই চিন্তা এবং ধ্যান-ধারণার বিকাশ ঘটে। সেই বোধের ফলেই ১৯১৭ সালে তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামে তাঁর সাফল্য অর্জিত হয়। অপরপক্ষে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পর প্রথম

কয়েকমাস 'পুরনো বলশেভিক'রা দোদুল্যমানতা ও দ্বিধাগ্রস্ততায় পীড়িত হন। ডায়ালেকটিকাল দৃষ্টিকোণের অভাবের ফলেই সেদিন 'পুরনো বলশেভিক'দের বক্তব্যে মেনশেভিক ও সোশ্যাল-রেভোল্যুশনারী রাজনীতির প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়।

দুই

লেনিন জানতেন, জনগণের স্বতঃস্ফূর্তির উপর নির্ভর করে বসে থাকলে বিপ্লব সম্পাদন করা যায় না, শ্রমিকশ্রেণীর সচেতন ও প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ না হলে বিপ্লব হয় না। শ্রমিকশ্রেণী সমাজের শোষিত অংশ…অতএব তারা বিপ্লবের পথে এগিয়ে আসবেই, এ-ধারণা অবৈজ্ঞানিক। 'বাইরে থেকে' শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি করতে হয়। তাই প্রয়োজন হয় শ্রমিকশ্রেণীর দর্শনে বিশ্বাসী সচেতন উদ্যোগে অভিজ্ঞ কর্মীবাহিনীর—'পেশাদার বিপ্লবী'দের। রাজনীতির ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক শক্তির আবির্ভাব হয়, এই ছিল লেনিনের বিশ্বাস। লেনিনীয় পার্টি-ধারণা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার কোনো অবকাশ বর্তমানে নেই। শুধু এইটুকু উল্লেখ করাই যথেষ্ট যে লেনিনীয় পার্টি-ধারণা মার্কসবাদকে সমৃদ্ধ করেছে এবং তাকে জীবন্ত মতবাদে পরিণত হতে সাহায্য করেছে। কোনো বিপ্লবী পার্টি ছাড়া যে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা যায় না, এ-বিষয়ে লেনিনের মনে কোনো দ্বিধা ছিল না।

বুর্জোয়া পাণ্ডিত্যাভিমানীর দল ও সংস্কারবাদী গণতান্ত্রিক সমাজবাদীরা প্রায়শই অভিযোগ উত্থাপন করে থাকেন যে লেনিন ছিলেন "উপদলীয় চক্রান্তকারী" "শ্রমিক আন্দোলনের ঐক্য বিভাজনকারী" ইত্যাদি। কিন্তু আমরা যদি লেনিনের সময়কার রুশ দেশের সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টির বিবর্তন ও সেই দলের বিভিন্ন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির ধ্যানধারণার তাৎপর্য অনুধাবন করতে চেষ্টা করি এবং লেনিন কিভাবে সেইসব বক্তব্যের বিরোধিতা করেছিলেন, কিভাবে মার্কসবাদী মতে স্থির-প্রত্যয়, গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতির ভিত্তিতে দৃঢ়ভিত্তিক, বিপ্লব সম্পাদনের যোগ্যতাসম্পন্ন পার্টি গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন—সেই ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত হই, তাহলেই এইসব বক্তব্যের অভিসন্ধিমূলক তাৎপর্য বোঝা সহজ হবে।

১৯১৮ সালে পেট্রোগ্রাড সোভিয়েটে এক বক্তৃতায় জিনোভিয়েভ বলেন যে মেনশেভিক অ্যাকসেলরড একথা বলে বেড়াচ্ছেন যে লেনিনের প্লেখানভ-

বিরোধিতার মূল কারণ ব্যক্তিগত ক্ষমতালিপ্সা। বলা বাহুল্য, ক্ষমতালিপ্সা চরিতার্থ করার জন্য নয়, বিপ্লবী নীতিতে অবিচল থাকার জন্যই রাজনৈতিক প্রশ্নে সংস্কার-পন্থার বিরুদ্ধে বিপ্লবী সংগঠননীতিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই লেনিনকে সংস্কারবাদী 'অগ্রজ'দের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করতে হয়েছিল।

একথা সুবিদিত যে ১৯০৩ সালে অনুষ্ঠিত রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে পার্টি-নিয়মাবলীর আলোচনায় প্রবল মতভেদ দেখা দেয়। লেনিন চেয়েছিলেন সংগ্রামী চেতনায় ও কর্মে প্রবুদ্ধ একটি ঐক্যবদ্ধ পার্টি গড়তে, যার প্রত্যেকটি সভ্যই বিপ্লবী সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করবে এবং পার্টি শৃঙ্খলা মেনে চলবে। সেই জন্য তাঁর মত ছিল যে পার্টি সভ্য সেই হতে পারবে যে পার্টি-কর্মসূচী মানে, সভ্য চাঁদা দেয় এবং **কোনো একটি পার্টি-সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে** তার কাজে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু মার্তভের প্রস্তাব ছিল যে পার্টির কর্মসূচীর প্রতি আনুগত্যের স্বীকৃতি ও পার্টিকে বৈষয়িক সাহায্যদানই সভ্যদের পক্ষে যথেষ্ট; পার্টি-সংগঠনে অংশগ্রহণ ও পার্টিশৃঙ্খলা বাধ্যতামূলক করার দরকার নেই।

লেনিনের সূত্রে পার্টিতে অ-প্রোলেতারীয়, অদৃঢ় লোকদের প্রবেশ কঠিন হয়; সম্ভবপর হয় সংগঠিত ও সুশৃঙ্খল পার্টি গঠন। অপর পক্ষে, মার্তভের সূত্র অনুযায়ী পার্টি হয়ে দাঁড়াত নিরাকার; অদৃঢ় প্রকৃতির লোকদের প্রবেশের জন্য তার দ্বার উন্মুক্ত হতো। এই ধরনের পার্টি নিয়ে ধনবাদী ব্যবস্থার উচ্ছেদ ও শ্রেণীশত্রু-দের উপর বিজয়অর্জন শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে কখনও সম্ভবপর হতো না। আপাত দৃষ্টিতে গৌণ এই মতপার্থক্য সূচনা করে দুই রাজনীতির—বিপ্লবী রাজনীতি বনাম আপসকারী সুবিধাবাদী রাজনীতি। সংগ্রাম শুরু হয় বিপ্লবী বলশেভিকবাদ বনাম সংস্কারবাদী মেনশেভিকবাদের।

রাজনৈতিক কারণেই, কেবল সাংগঠনিক কারণে নয়, সেদিন লেনিনকে পার্টিকে বিভক্ত করতে হয়েছিল। ১৮৯৫ সাল থেকে লেনিন ও মার্তভ একসঙ্গে কাজ করে এসেছেন, দুজনের ব্যক্তিগত বন্ধুত্বও ছিল সুগভীর। কিন্তু লেনিন সেদিন ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের ঊর্ধ্বে বিপ্লবের স্বার্থকে স্থান দিয়েছিলেন।

ক্রুপস্কায়ার স্মৃতিকথা থেকে আমরা জানতে পারি, পার্টির এই বিভাজন ও মার্তভের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ হওয়ার পর লেনিন তীব্র মানসিক আঘাত পান। কিন্তু কোনো সময়ের জন্যই তিনি বিপ্লবের পথ থেকে সরে এসে সুবিধাবাদিতাকে প্রশ্রয় দেওয়ার কথা চিন্তা করেননি।

শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী পার্টি গঠনে সংগঠন-সংক্রান্ত মূলনীতির প্রশ্নে লেনিনের অনমনীয় মনোভাব সম্পর্কে ট্রটস্কি সেই সময় লেনিনকে সমর্থন করেননি। পরবর্তীকালে নিজের দুর্বলতা স্বীকার করে তিনি 'আমার জীবন'-এ লিখছেন :

"Revolutionary centralism is a harsh, imperative and exacting principle. It often takes the guise of absolute ruthlessness in its relations to individual members, to whole groups of former associates. It is not without significance that the words 'irreconcilable' and 'relentless' are among Lenin's favorites. It is only the most impassioned revolutionary striving for a definite end—a striving that is utterly free from anything base or personal—that can justify such a personal ruthlessness. In 1903, the whole point at issue was nothing more than Lenin's desire to get Axelrod and Zasulitch off the editorial board. My attitude toward them was full of respect, and thought highly of them for what they had done in the past. But he believed that they were becoming an impediment for the future. This led him to conclude that they must be removed from their position of leadership. I could not agree. My whole being seemed to protest against this merciless cutting off of the older ones when they were at last on the threshold of an organised party. It was my indignation at his attitude that really led to my parting with him at the Second Congress. His behavior seemed unpardonable to me, both horrible and outrageous. And yet, politically it was right and necessary, from the point of view of organization. The break with the older ones, who remained in the preparatory stages, was inevitable in any case. Lenin understood this before any one else did." ৩

উদ্ধৃতিটি দীর্ঘ হয়ে গেল। কিন্তু এই উদ্ধৃতির মধ্যে ধরা পড়বে যে লেনিনের কাছে মার্কসীয় থিয়োরি এবং বিপ্লবী সংগঠনের নীতি ছিল অচ্ছেদ্যভাবে একসূত্রে গ্রথিত। প্রথমাবধি, নারদনিক, 'বৈধ মার্কসিস্ট' এবং 'ইকনমিস্ট'দের সঙ্গে বিতর্কে লেনিন এ-কথাটাই বিশেষ জোর দিয়ে বলতে চেয়েছিলেন যে বিপ্লবী পার্টির কাছে বিপ্লবী থিয়োরিই হলো তার প্রাণ। পুনরুক্তি হলেও এ-কথাটা বলা দরকার যে

লেনিন ব্যাখ্যাত এই নীতির অর্থ হলো যে পার্টির ইতিহাসে ধ্যান-ধারণার প্রতিটি বহিঃপ্রকাশকেই ভালোভাবে অনুধাবন করতে হয়। পার্টির আভ্যন্তরীণ জীবনে বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রবণতা, শ্রেণী ও পার্টির বিকাশের ধারায় এইসব প্রবণতার প্রতিক্রিয়া—সব কিছুই বুঝতে হয় শ্রমিকশ্রেণীর ঐতিহাসিক লক্ষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে। একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে ব্যাপারটিকে বোঝার চেষ্টা করা যেতে পারে। ১৯১৩ সালে মেনশেভিকদের একটি অংশের পক্ষ থেকে বলশেভিকদের সঙ্গে 'ঐক্য স্থাপনের অভিযান' শুরু হয়। এঁদের বক্তব্য ছিল, ট্রটস্কিও এই সময়ে অগস্ট ব্লকে তাঁদের সমর্থন করেন, তাৎকালিক রাজনৈতিক সমস্যাসমূহের চাপ দুই পার্টির মিলনের প্রশ্নটিকে অত্যন্ত জরুরি প্রশ্ন হিসেবে উপস্থাপিত করেছে। এঁরা আরও মনে করতেন তাৎকালিক রাজনীতিক প্রশ্নের অনেক ক্ষেত্রেই দুই অংশের মধ্যে ঐকমত্য খুঁজে পাওয়ার ব্যাপারে কোনো অসুবিধে নেই। মেনশেভিকদের-'ঐক্যকামী' অংশের মৌলিক ত্রুটি ছিল এই যে তাঁরা থিয়োরি ও রাজনৈতিক কর্মসূচীর সম্পর্ক বিষয়ে মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে অগ্রসর হননি। তাৎকালিক জরুরি রাজনৈতিক প্রশ্নের আপাত দৃশ্যমান 'ঘটনা' দেখে নয়, যে-শ্রেণীসংগ্রামের প্রক্রমের অন্তর্ভুক্ত এই সব জরুরি প্রশ্ন—তার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করতে হয়—এই হলো মার্কসীয় পদ্ধতির শিক্ষা। তাই তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পরিহার করে ও নীতিগত পার্থক্যকে দূরে সরিয়ে রেখে রাজনীতিক প্রশ্নের আশু সমাধানের উদ্দেশ্যে 'ঐক্য' স্থাপন করতে গেলে জন্ম নেয় সুবিধাবাদ। লেনিন এই ধরনের সুবিধাবাদকে প্রশ্রয় দিতে পারেন নি। আলোচনা দীর্ঘ না করে বরং পরবর্তীকালে ট্রটস্কি এ-বিষয়ে যা বলেছিলেন তা দেখা যাক। ট্রটস্কি তাঁর এককালের শিষ্য শাখটম্যানের বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে ঐতিহাসিক তুলনা দিয়ে ১৯৪০ সালে লিখছেন :

"Most of the documents were written by me and through avoiding principled differences had as their aim the creation of a semblance of unanimity upon 'concrete political questions'. Not a word about the past! Lenin subjected the August bloc to merciless criticism and the hardest blows fell to my lot Lenin proved that in as much as I did not agree politically either with the Mensheviks or the **Vperyodists** my policy was adventurism. This was severe but was true." ৪

তত্ত্ব ও ব্যবহারের ডায়ালেকটিকাল সম্পর্ক যথাযথভাবে অনুধাবন করতে পারার

ফলেই লেনিন সেদিন সুবিধাবাদীদের সঙ্গে ঐক্য প্রস্তাবে রাজী হতে পারেননি। ট্রটস্কির ভ্রান্তির কারণও ছিল তাঁর সেদিনকার ডায়ালেকটিক সম্পর্কে বোধের ন্যূনতা।

তিন

১৯০৮ সালের এপ্রিলে লিখিত 'মার্কসবাদ ও সংশোধনবাদ' শীর্ষক রচনায়[৫] লেনিন এটা পরিষ্কার ভাবে দেখান যে বুর্জোয়াশ্রেণী ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে যত বেশি পরিমাণে দেউলিয়া হয়ে পড়ছে সেই পরিমাণে তারা মার্কসবাদের সংশোধনকারী ও দলত্যাগীদের উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠছে যাতে করে শ্রমিকশ্রেণীকে বিভ্রান্ত করা যায়, সর্বহারাশ্রেণী যাতে করে তার ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে না পারে। আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতাও তাই। দলত্যাগী প্রাক্তন-কমিউনিস্ট এবং বিভিন্ন দলের প্রাক্তন-মার্কসবাদীদের আজ প্রধান কাজই হলো মার্কসবাদ সম্পর্কে জনমানসে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা। একাজ চলেছে অত্যন্ত সুচতুর ও সংগঠিত ভাবে। বিরাট বিরাট গবেষণাকেন্দ্র ও প্রকাশন-সংস্থা স্থাপিত হয়েছে, কমিউনিজমের 'এক্সপার্ট'দের মোটা অঙ্কের টাকায় নিয়োগ করা হচ্ছে কমিউনিজম সম্পর্কে 'ভেতরের অভিজ্ঞতা' বর্ণনা করার জন্য; 'প্রাক্তন কমিউনিস্টদের বিবেক' আজকের ধনিকশাসিত সমাজে বিক্রয়ের পণ্যে পরিণত। আক্ষেপের কথা, শোষিত মানুষের মুক্তি-আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত এমন কয়েকজন র‍্যাডিকাল বুদ্ধিজীবী ছিলেন এবং আছেন যাঁরা সমাজ রূপান্তরে শ্রমিকশ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকাকে স্বীকৃতি জানাতে প্রস্তুত নন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুজন শ্রদ্ধেয় বুদ্ধিজীবীর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এঁরা হলেন জাঁ পল সার্ত্র ও সি. রাইট মিলস। নন-কনফরমিস্ট সমাজতত্ত্ববিদ্ রাইট মিলস তাঁর বিভিন্ন রচনায় প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আমাদের চেতনাকে উন্নততর স্তরে নিয়ে যেতে সাহায্য করেন ঠিকই কিন্তু ইতিহাসের ডায়ালেকটিককে মেনে না নেওয়ার ফলে তিনি শ্রমিকশ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকাকে স্বীকৃতি জানান না। (তাঁর মতে শ্রমিকশ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হলো 'labour metaphysic.') সার্ত্র এবং মিলস উভয়েই ডায়ালেকটিকাল পদ্ধতিকে নস্যাৎ করে দিতে চেয়েছেন। সার্ত্র ডায়ালেকটিকাল বস্তুবাদ সম্পর্কে একটি সমালোচনা গ্রন্থ[৬] প্রকাশ করেছেন। মিলসের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত

গ্রন্থে ডায়ালেকটিক সম্পর্কে তাঁর বিরূপতা অত্যন্ত স্পষ্ট। মার্কস সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলছেন: "His method is a signal and lasting contribution to the best sociological ways of reflection and inquiry available." কিন্তু ঐ বাক্যবন্ধের সঙ্গে তারকা চিহ্ন দিয়ে তিনি পাদটীকায় বলছেন: "I do *not* refer to the mysterious 'laws of dialectics' which Marx never explains clearly but which his disciples claim to use."

ডায়ালেকটিকের প্রতিটি 'law'কে সমালোচনা করার পর তিনি 'সন্ধান্তে পৌছন যে: "As a guide to thinking, 'dialectics' can be more burdensome than helpful, for if everything is connected, dialectically. with everything else, then you must know 'everything' in order to know anything, and causal sequences become difficult to trace."[৭]

ডায়ালেকটিককে অর্থাৎ মার্কসীয় যুক্তিবিকাশের মূলসূত্রকে অস্বীকার করার ফলেই মিলসের মতো সমাজ-সমালোচককেও প্রয়োগবাদের আবর্তের মধ্যে বিচরণ করতে হয়েছিল। আলোচনা দীর্ঘ না করেও একথা নিশ্চয়ই বলা চলতে পারে যে কেবল র‍্যাডিকাল বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেই নয়, শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে আজকের দিনেও নানা সুবিধাবাদী প্রবণতা সক্রিয় আছে। সমাজবাদী আন্দোলনে সুবিধাবাদ এবং তাত্ত্বিক অগ্রগতির সহ-অস্তিত্ব সম্ভবপর নয়। সুবিধাবাদীরা শ্রমিকশ্রেণীর বিশেষ কোনো অংশের জন্য (শ্রমিক-আমলা) বিশেষ এবং আংশিকভাবে সমস্যার 'সমাধান'-এর জন্য সচেষ্ট হয় এবং শ্রমিক-শ্রেণীকে সেই পথে পরিচালিত করতে চেষ্টা করে। সুবিধাবাদের রাজনীতির বক্তব্য হলো: শ্রেণীসমাজ-উদ্ভূত সমস্যার সমাধান বিশেষ ক্ষেত্রে এবং আংশিক-ভাবে সম্পাদিত হতে পারে। আর ডায়ালেকটিকসের শিক্ষা অনুযায়ী প্রতিটি সমস্যাকে প্রতিটি সংগ্রামকে সামগ্রিক ব্যবস্থার মধ্যে যে-মৌলিক সংগ্রাম চলেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে হয়।

মার্কসীয় থিয়োরি যদি সংগ্রামের মাধ্যমে নিজেকে বিকশিত ও সমৃদ্ধ করতে না পারে তবে তা সুবিধাবাদী রাজনীতির যুক্তিবাদে পরিণত হয়। কথাটা আর একটু বিশদ করে বলা দরকার।

থিয়োরি যেমন আমাদের কাজের পথ দেখাবে, কাজের ভেতর দিয়ে হাতে

কলমে থিয়োরিকে, তাত্ত্বিক বিচারের সিদ্ধান্তকে তেমনি আবার পদে পদে যাচাই করে নিতে হবে। যদি হাতে-কলমে সে সিদ্ধান্ত ভুল বা অকার্যকর বলে প্রতিপন্ন হয়, তাহলে থিয়োরি পালটাতে হবে, সিদ্ধান্ত বদলিয়ে কাজে লাগাবার মতো থিয়োরি গড়ে নিতে হবে। সাধারণভাবে মার্কসের বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকের সূত্রকে এইভাবেই বোঝা এবং ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। কিন্তু এই ব্যাখ্যার ত্রুটি হচ্ছে যে এতে ব্যবহারিক উপযোগিতা বা প্রয়োগমূল্যকে বেশি বড় করে ধরা হয় এবং তাতে ব্যবহারিক সুবিধাবাদের পথ উন্মুক্ত হয়। ডায়ালেকটিক বস্তুবাদের বৈপ্লবিক ব্যবহারবাদকে অনুধাবন করতে গেলে মার্কস এ-সম্পর্কে যা বলেছিলেন তার পারম্পর্য অনুধাবন করা প্রয়োজন।

মার্কসের প্রথম বক্তব্য, বাস্তব পরিবেশকে বদলাতে গেলে, তাকে আয়ত্ত করতে হলে, পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম করে তাকে রূপান্তরিত করতে হলে, প্রথম দরকার পরিবেশকে জানার। দরকার পরিবেশের গতি-প্রকৃতি, তার গতি নিয়ম, তার বিবর্তনের এবং রূপান্তরের নিজস্ব নিয়ম কি—সেটা অনুধাবন করার। কারণ সেই নিয়ম না জেনে, না বুঝে বা না অনুধাবন করে পরিবেশের পরিবর্তন সাধন করা যায় না।

মার্কসের দ্বিতীয় বক্তব্য, কোন্ পথে পরিবেশের রূপান্তর ঘটানো যাবে সেকথা চিন্তা করার সময় মনে রাখতে হবে বাস্তব পরিবেশ তার নিজের নিয়মে, আমাদের জানা-না-জানা বা ভালো-লাগার মন্দ-লাগার অপেক্ষা না রেখে অবিরাম বদলে চলেছে। পরিবেশকে বদলে নূতন করে ঢেলে সাজতে চাইলে তার নিজস্ব বিবর্তন বা রূপান্তরের বাস্তব নিয়ম কি, কোন্ ধরনের পরিবর্তনের সম্ভবপর বা সাধ্য, কোন্ ধরনের পরিবর্তন তার নিজস্ব গতির নিয়মে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে বা উঠছে, তা জানতে হবে।

মার্কসের তৃতীয় বক্তব্য, পরিবেশের বাস্তব নিয়মকে লঙ্ঘন করা বা তার গতিরোধ করা যদিও সম্ভব নয়, মানুষের সমাজ এবং ঐতিহাসিক বিবর্তনের ক্ষেত্রে (যেহেতু, মানুষের সমষ্টিগত ব্যবহারিক জীবন, তার কাজ, তার ইচ্ছা অনিচ্ছা ছাড়া সামাজিক রূপান্তর বা অগ্রগতি সম্ভবপর নয়) পরিবেশের নিজস্ব নিয়মে যে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে, যে-ধরনের সামাজিক রূপান্তর অপরিহার্য হয়ে দেখা দিচ্ছে বা দেখে দেবেই, আমরা তাকে সুপরিকল্পিতভাবে আসন্ন এবং অপরিহার্য জেনে ত্বরান্বিত করতে পারি, আসন্ন সমাজ-বিপ্লবকে দ্রুততর করতে পারি—আর সেটাই হলো বিপ্লবী মানুষের এবং বিপ্লবী দলের

পূজা এসে গেল
এই আনন্দের দিনে ঘরে ঘরে চাই
তন্তুজ

দি ওয়েষ্ট বেঙ্গল ষ্টেট হ্যাণ্ডলুম উইভার্স
কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড
৬৭, বদ্রীদাস টেম্পল ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪
ফোন ঃ ৩৫-৩৬৫৮

নবান্নর-নাট্যকার

বিজন ভট্টাচার্যর

নতুন নাটক

চলো সাগরে

মূল্য : তিন টাকা

সারা ভারত জুড়ে চলছে ভূমিহীন ক্ষেতমজুর ও নিপীড়িত কৃষকের মরণপণ লড়াই। ভারত-রাষ্ট্রের পুঁজিবাদী নেতৃত্ব শিল্প ও কৃষিতে পুঁজিবাদী বিকাশের পথ গ্রহণ করে ভারতব্যাপী যে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সংকট ঘনিয়ে তুলেছে সেই সংকট থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার পথ-নির্দেশ করেছেন প্রখ্যাত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নেতা কমরেড ভবানী সেন। এই পুস্তিকা প্রতিটি রাজনৈতিক কর্মীর অবশ্য পাঠ্য।

ভারতের কৃষি-সম্পর্ক বিশ্লেষণে লেনিন-নির্দেশিত পথ

ভবানী সেন

মূল্য : পঞ্চাশ পয়সা

প্রাপ্তিস্থান :

মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড

৪।৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা ১২

পরিচয়
বর্ষ ৪০। সংখ্যা ১-২
শারদীয়। ১৩৭৭

সূচীপত্র

শারদীয় সংখ্যা। ১৩৭৭

প্রবন্ধ

গল্প

কবিতাগুচ্ছ

প্রেমেন্দ্র মিত্র। বিষ্ণু দে। বিমলচন্দ্র ঘোষ। কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত। দক্ষিণারঞ্জন বসু। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। লোকনাথ ভট্টাচার্য। কৃষ্ণ ধর ২৫-৩২

মণীন্দ্র রায়। চিত্ত ঘোষ। সিদ্ধেশ্বর সেন। শান্তিকুমার ঘোষ। বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত। শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়। বিতোষ আচার্য। শান্তনু দাস। শিবেন চট্টোপাধ্যায়। পবিত্র মুখোপাধ্যায়। তুলসী মুখোপাধ্যায়। অরুণাভ দাশগুপ্ত। ১৪১-১৫০

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়। রাম বসু। শঙ্খ ঘোষ। মোহিত চট্টোপাধ্যায়। শক্তি চট্টোপাধ্যায়। শিবশম্ভু পাল। অমিতাভ দাশগুপ্ত। সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত। আশিস সান্যাল। তরুণ সেন। সত্য গুহ। শুভ বসু। অনন্ত দাশ। গণেশ বসু। বাসুদেব দেব। দিলীপ সেনগুপ্ত। শুভাশিস্ গোস্বামী। মৃণাল বসুচৌধুরী। সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। দুলাল ঘোষ। ধনঞ্জয় দাশ। তরুণ সান্যাল। সতীন্দ্রনাথ মৈত্র ১৮৮-২০৯

প্রচ্ছদ

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

উপদেশকমণ্ডলী

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য। হিরণকুমার সান্যাল। সুশোভন সরকার। অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র। গোপাল হালদার। বিষ্ণু দে। চিন্মোহন সেহানবীশ। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। সুভাষ মুখোপাধ্যায়। গোলাম কুদ্দুস

সম্পাদক

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তরুণ সান্যাল

পরিচয় প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

পরিচয়
বর্ষ ৪০ । সংখ্যা ১-২
শারদীয় ১৩৭৭

বিপ্লব, আবেগ ও প্রজ্ঞা

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

"রাজর্ষি" লেখার আগে রবীন্দ্রনাথ রেলগাড়িতে শুয়ে স্বপ্ন দেখেছিলেন, শিশুকণ্ঠে শুনেছিলেন, "এত রক্ত কেন?" আমরা যখন "রাজর্ষি" পড়েছি, তখনো হাসি ও তাতা-র কথা ভুলতে পারিনি। আজও যেন কানে শোনা যায় শিশুর সরল মনের চকিত আর্তি—"এত রক্ত কেন?"

মানুষের এতদিনকার ইতিহাসও ঐ প্রশ্ন তুলে ধরেছে—যুগযুগান্তের অজস্র বিড়ম্বনা, শুধু রক্তপাত নয়, আরও কত দুঃখ কত ব্যথা জীবনকে জর্জর করে রেখেছে। আকাশচারী কল্পনায় মানুষ সান্ত্বনা খুঁজেছে; ধর্মবিশ্বাস আর অনুষ্ঠানের মধ্যে সর্ববিধ ক্লেশহরণের প্রয়াস পেয়েছে, মোহাঞ্জন প্রলেপের অন্বেষণ করেছে, যেখানে উদ্দীপ্ত চেতনা সেখানে বুদ্ধের ন্যায় বলেছে, নিজের কাছে প্রদীপের মতো হও ("আত্ম-দীপো ভব")। জীবের দুঃখ দূর করার প্রেরণা ও প্রতিজ্ঞা নিয়ে সিদ্ধার্থ রাজগৃহ ত্যাগ করেছিলেন, সাধনাবলে সম্বুদ্ধিও অর্জন করেছিলেন কিন্তু মূল প্রশ্নের সমাধান আজও হয়নি—ব্যক্তিবিশেষ জীবন্মুক্তির অনুভূতি কতটা পেয়েছেন তা ধরা-ছোঁওয়ার মধ্যে আসে না। তবে এটা ঠিক যে জীবনকে জয় করতে আজও মানুষ পারেনি। শিল্পের কল্পলোকে কিংবা মানসিকতার অন্য ক্ষেত্রে হয় তো তুরীয় মার্গে স্বল্প বিচরণ সম্ভব। কিন্তু জীবনের সামান্য অর্থাৎ সর্বগ্রাহ্য স্তরে তার সম্ভাবনা নেই। আজও তাই "অমাবস্যার কারা" কবির "ভুবন" "লুপ্ত" করে রেখেছে, "অমানুষতা"র অভিযান আজও সম্পূর্ণ ব্যাহত নয়। মানবসত্তা আজও শীর্ণ, সঙ্কীর্ণ, বহুল পরিমাণে ব্যর্থ।

এই দুঃসহ অবস্থিতি থেকে পরিত্রাণের সংগ্রাম ইতিহাসকে দিয়েছে তার পৌনঃপুনিক দীপ্তি। স্তর থেকে স্তরান্তরে সমাজের উত্তরণ তাই ঘটেছে, মানুষ চলেছে এগিয়ে, মন্ত্র নিয়েছে "চরৈবেতি, চরৈবেতি"। সতত সঞ্চরমান এই বিশ্বে জীবন হয়েছে জঙ্গম, নিয়ত গতিশীল, স্তব্ধতার পরিপন্থী। মাঝেমাঝে যখন বিশেষ এক যুগের ষোলকলা পূর্ণ হয়েছে তখন এসেছে যুগান্তর, ঘটেছে বিপ্লব। জন্ম নিয়েছে নূতন সমাজ। এ-বিপ্লব স্বয়ম্ভু নয়; 'আপনাতে আপনি বিকশি' এর আবির্ভাব ঘটে না; স্বতঃস্ফূর্ত নয় এর উপস্থিতি। এ-বিপ্লবকে ঘটায় মানুষ, এর সাধকতম শক্তি হলো বহুজনের সংহত কর্মকাণ্ড, এর অভ্যুদয় হয় তখনই যখন সমষ্টির প্রয়োজনে ও প্রযত্নে জীবনের বহু রুদ্ধ দ্বার ভেঙে যায়, সাক্ষাৎ মেলে জ্যোতির্ময় নবযুগের। সহজে এ-ব্যাপার অবশ্য ঘটে না। সাধনা বিনা যেমন সিদ্ধি সম্ভব নয়, মূল্য দান বিনা প্রাপ্তি যোগও তেমনই সম্ভব নয়। পূর্বতন সমাজব্যবস্থাকে অসহনীয় ভেবে এবং জেনে মানুষকে তাই বারবার লড়তে হয়েছে। লড়্‌বার জন্যই ভাবতে হয়েছে। পথের সন্ধান করতে হয়েছে, নানাবিধ কাজে নাম্‌তে হয়েছে। কৃচ্ছ্রসাধন, আত্মোৎসর্গ, বহুজনের সংহতি সাধনে প্রবৃত্ত হতে হয়েছে। ব্যক্তিবিশেষের কাছ থেকে চিন্তা ও কর্ম ব্যাপারে নেতৃত্ব অবশ্যই এসেছে। কিন্তু ইতিহাসের নায়ক ব্যক্তি নয়। নায়ক হলো জনতা। রথের রশি জনতার হাতে না থাকলে ইতিহাসের চাকা নড়তে পারেনি; অচলায়তনকে সচল করতে পেরেছে মানুষের সমবেত, সংগঠিত, সুসংহত শক্তি। এই শক্তির পরিমাণ ও গুণ, বিস্তার ও চরিত্র স্বভাবতই বিপ্লবকে চিহ্নিত করে, জায়মান সমাজের গতি প্রকৃতিকে যথাসম্ভব নিয়ন্ত্রিত করতে থাকে। ইতিহাস তাই চলেছে পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থায়। তাই যুগসন্ধিক্ষণে একান্ত প্রয়োজন প্রখর ও গভীর সমাজ চেতনা, প্রয়োজন নবকালের পদধ্বনি শুনতে পাবার ক্ষমতা, প্রয়োজন বাস্তব বোধ, প্রয়োজন প্রকৃত সামাজিক সদিচ্ছা, নিষ্ঠা ও শৃঙ্খলার প্রতি অনুরাগ। কোনো বিপ্লবই অবশ্য চূড়ান্ত নয়; ইতিহাসে পূর্ণচ্ছেদ ঘট্‌লে তো পূর্ণচন্দ্র স্তব্ধ হয়ে থাকবার মতোই বিপর্যয় ও বিলুপ্তি। তবে বিপ্লবের আপেক্ষিক যুগানুগ সার্থকতা বহুল পরিমাণে নির্ভর করে উপরোক্ত শর্ত পূরণের উপর।

বিপ্লবের মূল্য অবশ্য দিতেই হয়—মানুষ চা'ক্ বা না চা'ক্, ইতিহাসের প্রতি অধ্যায়েই উত্তরণের মূল্য দিতে হয়েছে। একেবারে আদিম যুগে প্রাণ রাখতেই মানুষ প্রাণান্ত হতো, জীবনধারণের পক্ষে মাত্র ন্যূনতম প্রয়োজন মিটাবার

মতো উৎপাদনক্ষমতা তার ছিল বলে সমাজে শান্তি না থাকুক্, একটা স্থায়ু ভাব ছিল। কিন্তু কালের গতি এবং দৈনন্দিন কাজের অভিজ্ঞতার ফলে ঐ উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি পেল, কিঞ্চিৎ হলেও উদ্বৃত্ত কিছু উৎপন্ন হতে লাগ্‌ল, উদ্ভব হলো শ্রেণীবিভক্তির; সমাজের উদ্বৃত্ত সম্পত্তি স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তির হস্তগত হতে লাগ্‌ল। ক্রমশ দেখা গেল জাদুকর আর পুরোহিত আর গণক আর সপারিষদ রাজা এসে হাজির হচ্ছে, মানুষে মানুষে তারতম্য সমাজের রীতিনীতি নির্ধারণ করছে, শ্রেণীবৈষম্য প্রকট হচ্ছে, মুষ্টিমেয় সমাজপতির শাসন ও শোষণের পত্তন হচ্ছে। আদিম মানুষের ইতিবৃত্তকে স্বর্ণযুগের কাহিনী বলে বহু বর্ণনা আছে কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইতিহাসের অস্পষ্ট প্রত্যূষেই জীবনের যন্ত্রণা মানুষকে ভোগ করতে হয়েছে। "লেভায়াথান্"—প্রণেতা হব্‌স্-এর রচনায় আছে যে মানুষের জীবন তখন ছিল "একক, শ্রীহীন, পশুতুল্য এবং সংক্ষিপ্ত" ("Solitary, nasty, brutish and short")। একেবারে আদিযুগে শ্রেণীভেদ ছিল না কিন্তু জীবন ছিল দুঃসাধ্য ; কবিকল্পনায় তৎকালীন সারল্য মোহনীয় প্রতিভাত হওয়া সত্ত্বেও এ-কথা ভুল্‌লে চলে না। তারপর বহুবর্ষব্যাপী পরিবর্তনের ফলে এল শ্রেণীশাসন—যার হেরফের দেখা গেছে গোলামী ব্যবস্থায়, ভূমিদাসপ্রথায়, সামন্ততন্ত্রে, ধনবাদী কর্তৃত্বে। যুগ যুগ ধরে মানুষের ইতিহাসেরই অঙ্গীভূত এই ধারাকে পাল্‌টে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের কথায় সমাজদেহের পাঁজর থেকে লোভ নামক মৃত্যুশেলকে উৎপাটিত করে, নূতন শ্রেণীবিহীন শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস নভেম্বর বিপ্লব (১৯১৭) থেকে দুনিয়া জুড়ে চলেছে। এ-কাজ সহজ নয়। সস্তায় কিস্তি মাৎ হয় না, চালাকি দ্বারা মহৎ কাজ সম্ভব নয়—সুতরাং আশ্চর্য হবার কথা নয় যে এখনও সকল অন্ধকারের অবসান হয়নি, সকল বাধা অপসৃত হয়নি। কিন্তু এ-কাজের মূলগত গরিমাই আজ পৃথিবীর ইতিহাসকে ভাস্বর করে রেখেছে—"নতশির মূক সবে ম্লান মুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর বেদনার করুণ কাহিনী" এ-ছবি আজ সত্য নয়, দেশে দেশে বহু বর্ণ বহু জাতি বহু ধারার মানুষ আজ জেগেছে। নবজীবনে উত্তরণের জন্য মূল্য দিতে পরাঙ্‌মুখ তারা নয়, ইতিহাসের নায়ক আজ তারা।

মার্ক্‌সীয় বিচার বলে যে প্রাচীন সমাজদেহের অভ্যন্তরেই নূতন সমাজ জন্মের জন্য অপেক্ষা করছে, সমাজব্যবস্থারই অন্তর্ভূত বহু বৈপরীত্য পরিপক্ক হয়ে ওঠার ফলে নবজাতকের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। পূর্ব থেকে

বুদ্ধি বিবেচনা প্রয়োগ করে এবং সংগঠিত সংহতি শক্তি ব্যবহার করে সমাজের অনিবার্য নবজন্মকে মানুষ যদি অভ্যর্থনা করতে পারে, তাহলে জন্মকালীন যে অকাট্য কষ্ট ও ক্লেদ তার অনেকাংশ নিবারিত হওয়া সম্ভব। চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রয়োগে প্রগতির ফলে যেমন বিনা যন্ত্রণায় গর্ভধারিণীর দেহ থেকে প্রসবের ব্যবস্থার কথা শোনা যায়, তেমনই বহুজনের সমাজচেতনার প্রকৃত উদ্রেক ঘটলে পূর্বতন বিপ্লবের তুলনায় রক্তক্ষয় এবং অন্যান্য মূল্য কিছু কম হওয়ার সম্ভাবনা। এ-কথা মনে রেখেই স্বকীয় সরস ভঙ্গীতে বার্ণার্ড শ প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বে এক ভাষণে বলেন ঃ "বিপ্লবের জন্য আমি অধীর। কাল যদি বিপ্লব হয় তো আমি আহ্লাদে আটখানা হব। তবে গড়ের হিসাবে সাধারণ মানুষের মতো আমিও কাপুরুষ। তাই চাই আপনারা যথাসম্ভব ভদ্রভাবে বিপ্লব ঘটিয়ে দিন!" এটাও মনে রাখতে হবে যে ইতিমধ্যে দুটো বিশ্বযুদ্ধ হয়েছে। রুশ বিপ্লব ইতিহাসের বনিয়াদকে নাড়া দিয়েছে, চীন বিপ্লব (১৯৪৯) প্রাচ্য ভূখণ্ডে নূতন জীবন ও উদ্দীপনার সঞ্চার করেছে, ভিয়েৎনাম, কোরিয়া, কিউবা প্রভৃতি নূতন বৈভবের সূচনা করেছে। এশিয়া আফ্রিকা লাতিন-আমেরিকায় জাতীয় মুক্তি এবং তার সার্থকতা সাধনের অবিরাম অভিযান চলেছে. সাম্রাজ্যবাদ পরাজয়ের ধাক্কায় ভোল্ বদলাতে বাধ্য হচ্ছে, তার কলাকৌশল ফন্দি-ফিকির ক্রমশ ব্যর্থ হতে থাকছে, সমাজবাদের শক্তিই যে তার আভ্যন্তরীন অথচ সাময়িক বৈষম্য সত্ত্বেও ভবিষ্যৎকে নিয়ন্ত্রিত করতে চলেছে তাই আজ ইতিহাসের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। এমন পরিস্থিতিতে বিপ্লবের রক্তমূল্য পূর্বাপেক্ষা স্বল্প হওয়ার প্রকৃত সম্ভাবনায় আস্থা রাখায় ভ্রান্তি নেই।

ভ্রান্তি ঘটে যদি মার্কসবাদ এ-বিষয়ে প্রখর সতর্কতার যে শিক্ষা দেয় তা ভুলে যাই। যদি ভাবি যে ভদ্র, শিষ্ট, শান্ত, মন্থর গতিতে এগিয়ে যাওয়া চলে, যদি ভাবি ভোট কিম্বা অনুরূপ উপায়ে অধিকাংশের অভিমত মোটামুটি নির্ঝঞ্ঝাটে সংগ্রহ করে বিপ্লবের লক্ষ্যস্থলে পৌঁছানো যায়, যদি শ্রেণীশত্রুর শক্তি ও স্বার্থসাধনে অপরিসীম ক্রূরতা অবলম্বনের সঙ্কল্প সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়ি। বামপন্থার নামে অকারণ, অশোভন এবং অসার্থক হঠকারিতার আতিশয্য লক্ষ্য করে তাকে লেনিনের অনুসরণে "শৈশবের ব্যারাম" অভিহিত করা অবশ্যই ভুল নয়। কিন্তু ভ্রান্তি ঘটে যদি বিস্মৃত হই মার্কসীয় নীতির শিক্ষা যে, বিপ্লবের সময় যখন নিকট তখন বিপ্লব

থেকে পরাঙ্‌মুখ থাকা হলো সময় হওয়ার পূর্বেই বৈপ্লবিক আতিশয্যে মত্ত হওয়ার চেয়ে বড়ো অপরাধ। বিপ্লব-পরাঙমুখিতার উদাহরণ মার্ক্স তাঁর জীবদ্দশাতেই দেখে বলেছিলেন তাদের সম্বন্ধেঃ "বীজ পুঁতেছিলাম দানবের, আর ফসল তুলছি পতঙ্গের!" সমাজে আজ যারা মালিক তারা বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্র মেদিনী ছাড়তে রাজী নয়। জমির লড়াইয়ে এই মুহূর্তেই তো তার ভূরিভূরি দৃষ্টান্ত মিলছে।[১] ভালোমানুষের মতো হার মানবে না তারা, এবং তাই সংগ্রামের প্রস্তুতি নিয়ত প্রয়োজন। যুগের হাওয়া শুভবুদ্ধি মানুষের পক্ষে বলে সংগ্রামের তীব্রতা হ্রাস করতে পারা নিশ্চয়ই সম্ভব। কিন্তু সংগ্রাম এড়িয়ে যেতে পারব ভাবা বাতুলতা।

এজন্যই আজ যুবমনের মধ্যে কিছুটা বেপরোয়া কায়দায় প্রাণ দেওয়া নেওয়ার জন্য তৈরী থাকার মনোভাবকে তাচ্ছিল্য করা অন্যায়। ভীরু অপবাদে আহত বোধ করে বাঙালি তরুণ একদা যেমন বোমা পিস্তল হাতে নিয়ে অকুতোভয় যাত্রা শুরু করেছিল, তেমনই মান্ধাতাগন্ধী এই দেশে মানুষের দুর্ভোগ কাটছে না অথচ বিপ্লব ব্যাপারীদের মধ্যেই বিবাদ বিভেদ এবং তারই অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ বিপ্লব বিমুখিতা আর নির্বাচনী রাজনীতির সুরক্ষিত পথে বিচরণপ্রবণতা দেখে সেই তরুণদের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙলে আশ্চর্য হবার কথা আছে কি? আর যদি সত্যিই পরিস্থিতি বিশ্লেষণে ভরসা রাখি তো এ-ঘটনায় অতিরিক্ত বিচলিত হওয়ারও কোনো হেতু থাকে কি?

অস্বীকার করা চলে না যে আমাদের বর্তমান রাজনীতিতে শুধু তত্ত্বের স্পর্শরহিত উষরতা আসেনি। সঙ্গে সঙ্গে যেন এসেছে একপ্রকার ক্লীবতা, যার বিপক্ষে অস্ত্রধারণের প্রয়োজন সজীব মন আজ বেশি অনুভব করছে। মহাত্মা কবিরের সাধনা ছিল 'বিনা খড়্‌গের সংগ্রাম' কিন্তু সকলেতো মানসিকতার ঐ স্তরে অবস্থান করে না। দেশের চারদিকে তাকিয়ে চেতন অবচেতন মনে অর্জুনকে সম্বোধন করে কৃষ্ণের উক্তি স্মরণ হওয়া স্বাভাবিক; "ক্লৈব্যং মা স্ম গমঃ পার্থ"। বিপ্লবী বাক্য ব্যবহারে পারঙগম হলেও বিপ্লবী কর্ম বিনা সবই ব্যর্থ। যেমন "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ"। তেমনই বিপ্লব তো কয়েকটা ধ্বনির কল্যাণে আসবে না। বিপ্লবের জয় আপনা থেকে আসবে না। সংগ্রামী মানুষকে একত্র হয়ে এগিয়ে গিয়ে তাকে হাতে ধরে টেনে আনতে হবে। রেশমের দস্তানা পরে এ-লড়াই নয়, গোলাপজল

ছড়িয়ে এ-যুদ্ধ নয়। তাই উচ্চৈঃস্বরে অনেকে আজ বলছেন, রক্ত দেখলে যারা মূর্ছা যায়, বিশেষত নিজের গায়ের রক্ত, তারা অন্দর মহলে চলে যাক্‌!

অতিবিপ্লবীদের বিভ্রান্তি যাই হোক না কেন, তাদের সমালোচনায় মুখর হয়ে সাম্রাজ্যবাদী এবং তার অনুচরদের পাশবিকতার সম্বন্ধে গা-সওয়া ভাব দেখানো একটা বড়ো দরের অপরাধ। সর্ব দেশে, বিশেষত আফ্রিকার মতো ভূভাগে, সাম্রাজ্যবাদের কীর্তিকলাপ দেখে ফরাসী মনীষী সার্ত্র্‌ (Sartre) কিছুকাল আগে বলেন যে "অপ্রত্যাশিত এক দৃশ্য চোখের সামনে খুলে গিয়েছে যা হলো পাশ্চাত্য মানবিকতার আবরণমুক্ত নগ্নতার দৃশ্য"। ফ্রান্‌জ্‌ ফানঁ-র মতো মহাজন বলেছেন, শুধু হিংসার পথকে নিন্দা করলে তো চলবে না, এতকালের জমানো অন্যায়ের প্রতিকারে অস্ত্রধারণ একান্ত সঙ্গত, নইলে মানুষের মুক্তি আসবে, নবজন্ম ঘটবে কেমন করে? নজরুলের গানে "মরণ ভীত মানুষ-মেষের ভীতি" "হরণ" করার ডাকে সাড়া দেওয়ার মতো মানুষের অভাব হলেতো সমাজ পঙ্গু, বিকল, ব্যর্থ। "জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন", এমন বোধ ব্যাপক না হলে কি বলা যায়, দিন আগত ঐ? মৃত্যু যদি না ঘটে তো পুনর্জন্ম হবে কোথা থেকে?

"দ্বিজেন্দ্র দীপালি" গ্রন্থে শ্রদ্ধেয় শ্রীদিলীপ কুমার রায় তাঁর পিতৃদেবের "আমার দেশ" গানটির রচনা সম্বন্ধে লিখেছেন যে সাবধানী বন্ধুদের পরামর্শে (এবং রাজপুরুষ হিসাবে কবিকে রাজদ্রোহে অভিযুক্ত হওয়ার আশঙ্কার কথা তোলার ফলে) "আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা, হৃদয়রক্ত করিয়া শেষ" পংক্তিটি বদলে বসাতে হয়, "আমারা ঘুচাব মা তোর কালিমা, মানুষ আমরা নহি তো মেষ"। এতে কবির মনে বেদনার অন্ত ছিল না, কিন্তু তৎকালীন অবস্থায় তিনি ছিলেন নিরুপায়। দেশে যারা নূতন প্রভাত আনতে চায় "হৃদয়-রক্ত শেষ" করার প্রতিজ্ঞা না নিয়ে তো উপায়ান্তর নেই।

মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন—এ-হলো এ-দেশের বহুদিনের কথা। কিন্তু বিপ্লবের যে-মন্ত্র এনেছে মার্কস্‌বাদ, তাতে আবেগের আতিশয্যে লক্ষ্যভ্রংশ সম্বন্ধে নিয়ত অবহিতি একটা প্রধান কথা। প্রচুর সদ্‌বুদ্ধি সত্ত্বেও উচ্ছ্বাসপ্রবণতা প্রায়ই বিপ্লবের উদ্দেশ্য এবং অগ্রগতিকে বিপন্ন করার কারণ হয়। মার্কস্‌-এর

জীবৎকালেই নৈরাজ্যবাদের প্রবক্তারা এই আতিশয্যকে ব্যবহার করতে গিয়ে বহু অনর্থের সৃষ্টি করেছিলেন। বিশ শতকের আদিতে ফরাসী চিন্তানায়ক Sorel সমাজবাদী ঐক্যে কথঞ্চিৎ ফাটল ঘটিয়েছিলেন; তাঁর প্রচারিত তত্ত্বে হিংসাকে একটা বিশিষ্ট স্থান দেওয়া হয়েছিল—হিংসাই বুঝি জীবনের মলিনতা দূর করতে পারে, জগতে নবজীবন সঞ্চার করতে পারে, প্রাক্তন দাস ও প্রভু উভয়কেই প্রকৃত মনুষ্যে রূপান্তর করার শক্তি রাখে। বৈপ্লবিক কর্মের বাস্তব পরীক্ষায় কিন্তু এ-ধরণের চিত্তবৃত্তি যে বিপদ এবং ব্যর্থতা টেনে আনে তা দেখা গেছে। সেজন্যই বিশেষভাবে কর্তব্য সমসাময়িক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং গভীর পর্যালোচনার ভিত্তিতে কার্যক্রম নির্ধারণ। কাউট্‌স্কির মতো বিদ্বানের ক্ষেত্রে দেখা গেছে বিপ্লব বিষয়ে অগাধ তাঁর জ্ঞান কিন্তু বিপ্লবের আসর যখন পাতার আয়োজন চলছে তখন তিনি বিমুখ। অপর দিকে সদাসতর্ক থাকতে হবে যে বিপ্লবের আবেগে আপ্লুত হয়ে স্থানকালপাত্র বিস্মৃত হয়ে চমকপ্রদ একটা কিছু করার মধ্যে সত্তাকে ডুবিয়ে রেখে চিন্তারহিত কর্মের পথে এগিয়ে যাওয়া মারাত্মক ভুল। বিপ্লবের প্রথম বা দ্বিতীয় অঙ্ক যখন চলছে, তখন পঞ্চম অঙ্কের কল্পনা করে তদনুযায়ী ব্যবহার হলো বিপ্লবী চিন্তা, কর্ম ও আন্দোলনের একান্ত অপরিণতিরই পরিচায়ক। মার্কস্‌বাদের শিক্ষা এই উভয় বিপদ থেকে আন্দোলন ও সংগ্রামকে মুক্ত রাখার উপর বিশেষ জোর দিয়েছে। এবং সেজন্যই দেখা যায় যে মার্কস্‌বাদকে মূলত অগ্রাহ্য করে কোথাও কোথাও যে অভ্যুত্থানের আভাস দেখা যায় তা কিছুকাল দপ্‌ করে জ্বলে উঠে নিভে যেতে থাকে। বিপ্লবের ফুল ফোটার আগেই ঝরে যায়।

ভারতবর্ষের জনতার মনে যেন আজ অনেকদিনের জমে থাকা "রাগের আঙুর" ("grapes of wrath") পেকে উঠছে। এ থেকে আমরা পাব সুরা না সুধা, তা নির্ভর করছে আমাদেরই উপর। আবেগবিধুর হলে আমাদের চলবে না, হতে হবে স্থিতপ্রজ্ঞ।

এক পুরুষ ফাঁক

অন্নদাশঙ্কর রায়

কথাটা 'জেনারেশন গ্যাপ'। আমি তার তর্জমা করেছি 'এক পুরুষ ফাঁক'। এটা যাঁদের পছন্দ নয় তাঁরা ইচ্ছামতো তর্জমা করে নিতে পারেন।

কথাটা যাই হোক না কেন ব্যাপারটা হলো এই যে আমাদের সঙ্গে আমাদের তরুণদের স্বাভাবিক মতভেদ ইতিমধ্যে এতদূর গড়িয়েছে যে কেউ কারো ভাষা বোঝে না, বোধহয় বুঝতেই পারে না। এ যেন দুই বধিরের কথোপকথন।

মতভেদ স্বাভাবিক। আজকের দিনে মতবাদ ভিন্ন হলেও কেউ আশ্চর্য হয় না। হওয়া উচিত নয়। কিন্তু যেমন দেখা যাচ্ছে বড়োদের সঙ্গে ছোটদের কথাবার্তাই বন্ধ হয়ে যেতে বসেছে। কথাবার্তার জন্যে উভয়পক্ষের বোধগম্য ভাষারই অভাব।

আমরা বড়োরা যদি ছোটদের ভাষা বুঝতে পারতুম তা হলে ওরা আমাদের বোমা দিয়ে বুঝিয়ে দিতে চাইত না। যারা বোমা দিয়ে বোঝাতে চায় না তারাও এমন বিচিত্র ব্যবহার করে যে, হয় ওরা অবুঝ, নয় আমরা অবুঝ।

এই 'জেনারেশন গ্যাপ' শুধু যে এই দেশেই লক্ষ করা যাচ্ছে তা নয়। দুনিয়ার বহু দেশেই একই দৃশ্য দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ধনীর দেশেও যে 'এক পুরুষের ফাঁক' নেই তা নয়। বরঞ্চ কথাটা ধনির দেশ থেকেই এসেছে। যাঁদের চোখ আছে তাঁরা নিশ্চয়ই চাক্ষুষ করেছেন যে আমাদের দেশের ধনীর ঘরের দুলালরাই সবচেয়ে বেপরোয়া। না মানে তারা গুরুশিষ্য সম্পর্ক, না পিতাপুত্র সম্পর্ক, না জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠ সম্পর্ক। বামপনার যেটা চরমতম রূপ তাতেও তারা অগ্রণী। আবার সমাজবিরোধী কর্মেও তারাই সবচেয়ে অগ্রসর। ডাকাতকেও তারা ডাকাতি শেখাতে পারে। এমন বিদ্বান! একদিন হয়তো ফ্যাসিস্ট হতেও তাদের বাধবে না।

সমাজ থেকে সৎঅসৎ জ্ঞান যদি লোপ পায়, একজন অন্যায় করছে বলে আরেকজনও যদি জেনে শুনে অন্যায় করে, জোর যার তারই ইচ্ছা যদি জয়ী

হয়, জোট যার তারই জেদ যদি সফল হয়, শঠ যারা তারাই যদি শিরোপা পায়, তবে সমাজের নৈতিক ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। তেমন সমাজ ক্যাপিটালিস্ট না হয়ে কমিউনিস্ট হলেও কি বেশীদিন খাড়া থাকতে পারবে? সমাজবিরোধী অপরাধের ভিতর দিয়ে কখনো সত্যিকার সামাজিক পরিবর্তন আসতে পারে না। একদল মরে, আরেকদল মারে। কিন্তু যারা মারে তারাও বেঁচে থাকে না। আরো একদল এসে তাদেরও মারে। এই অন্তহীন হানাহানির পাপ হজম করতে বহু পুরুষ লেগে যায়। সাফল্য যে ধোপে টিকবেই এমন কী কথা আছে? সফল নেশনেরও বহু প্রতিদ্বন্দ্বী নেশন জোটে। বলপরীক্ষায় প্রতিবার জিৎ হবেই এমন কী নিশ্চয়তা আছে?

একালের ছেলেছোকরাদের মাথায় খুন চেপেছে। উদ্দেশ্য হয়তো মন্দ নয়, কিন্তু উপায় তো মন্দ। সকলেই যদি মন্দ উপায় অবলম্বন করে সকলেই বিড়ম্বিত হবে। যার জন্যে এত পাপ সেই লক্ষ্য আরো দূরে সরে যাবে। সামাজিক ন্যায় ব্যক্তিগত অন্যায়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

পুলিশ যদি আদৌ না থাকে কিংবা থেকেও না থাকে তাতে কি বিপ্লবীদের কাজ কিছু এগোয়? সেটা একটা ভ্রম। তেমনি মিলিটারি যদি না থাকে কিংবা থেকেও না থাকে। তাতেও কি বিপ্লবীদের কিছু সুরাহা হয়? সেটাও আর একটা ভ্রম। পুলিশ না থাকলে বা নিষ্ক্রিয় হলে প্রাইভেট পুলিশ গড়ে উঠবে। মিলিটারি না থাকলে বা নিষ্ক্রিয় হলে প্রাইভেট আর্মি গড়ে উঠবে। তার আভাস কি আজকেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না? অরাজকতা বিপ্লবের প্রস্তুতি নয়। ফাসিবাদেরই প্রস্তুতি।

এ-রাজ্যের অবস্থা এমন হয়েছে যে পুলিশ যে-কোনোদিন ফেল করতে পারে। মিলিটারি অবশ্য অত সহজে ফেল করবে না। কিন্তু আখেরে যা হবে তা ইন্দোনেশিয়ার অনুরূপ। আশ্চর্য হই একথা ভেবে যে আমাদের তরুণরা কেবল হিমালয়ের উত্তরদিকেই তাকায়, বঙ্গোপসাগরের পূব-দক্ষিণদিকে তাকায় না। ইন্দোনেশিয়ার তরুণদেরও দৃষ্টি ছিল পশ্চিম-উত্তরদিকে নিবদ্ধ। কই, কেউ তো এল না ওদের বিপদের দিন ত্রাণ করতে?

ভারত সরকার কতদূর দৃঢ়প্রতিষ্ঠ কেউ তা জানে না। পরে কাদের হাতে ক্ষমতা পড়বে বলা যায় না। জার্মানীতে সংবিধানও ছিল, নির্বাচনও ছিল, কিন্তু হিটলারকে ভোটে জিতিয়ে দেবার পর দেখা গেল একে একে সব কিছু অচল। পার্লামেন্ট থাকতেও পার্লামেন্ট না থাকার সামিল, কারণ বারো

বছরকাল তার কোনো অধিবেশনই হয়নি। আমাদের তরুণদের এসব জানা উচিত। ক্ষমতা যে দক্ষিণ মার্গে যাবে না এমন অভয় কে তাদের দিয়েছে? আমাদের জনগণ কি জার্মানীর জনগণের চেয়ে আরো শিক্ষিত না আরো সেকুলার? ধর্মের নামে ভোট চাইলে এখনো তাদের অনেকেই ভোট দেবে।

প্রতিষ্ঠিত সংবিধানকে অমান্য করে, দুর্বল করে, ভেঙে চুরে যা হবে তা এতই ভয়ঙ্কর যে প্রগতিশীলমাত্রেরই উচিত ও-পথে না চলা। একদল দুঃসাহসী একটা ভুল পথে চললেই যে ওটা ঠিক পথ হয়ে যাবে তা নয়। এই দিক্‌ভ্রান্তদের শেখানো হচ্ছে যে অতীতের সন্ত্রাসবাদীরাই নাকি ইংরেজকে হারিয়ে দিয়ে দেশকে স্বাধীন করেছিল। একটা অসত্য দিয়ে আরেকটা অসত্যকে সমর্থন করতে গেলে যা হবার তা হবেই। দুই পক্ষেরই কতকগুলি অমূল্য প্রাণ অকালে ও অকারণে বিনষ্ট হবে। পরে সন্ত্রাসবাদী অধ্যায়ের মতো এ-অধ্যায়েরও শেষ হবে।

মার্কসবাদ প্রসঙ্গে কয়েকটি গোড়ার কথা

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

মার্কসবাদের দার্শনিক ভিত্তি এবং মার্কস-এর যুক্তিবিন্যাস নিয়ে দেশে-বিদেশে বহু আলোচনা হয়েছে। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী, চিন্তার বিশিষ্ট পদ্ধতি এবং মুখ্য সিদ্ধান্তগুলি সম্পর্কে নানাভাবে যেসব তর্ক-বিতর্ক ও সমালোচনা হয়েছে, তাই থেকেই প্রমাণ হয় মার্কসবাদের অশেষ গুরুত্ব ও ঐতিহাসিক পরিণতির দিকে তার অগ্রগতি। সেই সাম্যবাদী সমাজের প্রতিষ্ঠা ও বিপ্লবী আন্দোলন বা মুক্তিসংগ্রামগুলির আসন্ন সার্থকতা সম্পর্কে যারা সচেতন ও সচকিত, তাদের কাছে মার্কসীয় দর্শনের ত্রুটি, যুক্তিবাদের অযৌক্তিকতা এবং অনেক সিদ্ধান্তের অসারতা প্রতিপন্ন করা অত্যন্ত জরুরী হয়ে ওঠে। এটা অস্বাভাবিক নয়, প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব এবং বিপ্লব-বিরোধিতাও দুর্বোধ্য নয়। তবে যেখানে সমালোচনাটা বুদ্ধিগত, দর্শনভিত্তিক এবং সংস্কৃতির স্বাধীনতার দাবিতে উপস্থাপন করা হয়, সেখানে প্রত্যাশা করা যেতে পারে যে মার্কসবাদের ব্যাখ্যা যেন অপব্যাখ্যা না হয়। অর্থাৎ আপাত-সত্য কথনের নামাবলী গায়ে হাজির না হয় এবং সাধারণ-শিক্ষিত মানুষের সামনে মূল প্রসঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করে মার্কস-এর মূল যুক্তিগুলিকে বিভ্রান্তিকর, মানব-সম্পর্কহীন, রূঢ় ও নির্মম জড়বাদ হিসেবে ব্যাখ্যা করা না হয়।

যে কোনও মহৎ দর্শন, মহৎ ভাবনা মাত্রই চিন্তার ও আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে থাকে। তাই নিয়ে টীকা ও ভাষ্য রচিত হয়। কিন্তু সেই ভাষ্য যদি অভিসন্ধিপ্রসূত হয়, নঞর্থক হয়, কয়েকটি উক্তিকে বিচ্ছিন্ন করে দেখানো হয় যে মার্কস-এর দৃষ্টি বক্তব্যের মধ্যে কত বড়বড় ফাঁক রয়েছে, তাঁর বস্তুবাদী ইতিহাস-ধারণা কতখানি অমানুষিক, অর্থনৈতিক ভাবনা ও সিদ্ধান্ত কি পরিমাণে অচল, তাহলে সেটা অপভাষ্যের পর্যায়ে পড়ে। শ্রম-শিল্পবিপ্লবের ফলে একটি খণ্ডযুগে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, যে দেশগুলির সামাজিক তথা অর্থনৈতিক চেহারা তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যে এসেছিল, মাত্র সেই বিশিষ্ট কাল ও বিশেষ-বিশেষ অঞ্চলের ক্ষেত্রেই তাঁর বক্তব্য ও বিশ্লেষণ খাটানো

হয়েছিল, আর সেই বিশ্লেষণ-পদ্ধতি সর্বকালীন সত্য নয় এবং সিদ্ধান্তগুলিও খণ্ডিত একদেশদর্শী—এসব যুক্তিপ্রদর্শন যে নিরপেক্ষ বিষয়গত বিচার এবং নিঃস্বার্থ হিতৈষণার নমুনা নয়, তা বলাবাহুল্য।

যে যুক্তিটা মার্কস-কৃত বিশ্লেষণের বিরুদ্ধে প্রায়ই প্রয়োগ করা হয়, তা হচ্ছে: মার্কস একটি বিশেষ যুগের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে তাঁর সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছিলেন। পরবর্তী কালে এমন সব ঘটনা ঘটেছে এবং সমাজ-ব্যবস্থারও পরিবর্তন হয়েছে, যার ফলে মার্কস-এর প্রতিপাদ্য খণ্ড সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেটা সম্পূর্ণ সত্য বলে গ্রহণ করা যায় না। অতএব মার্কসীয় বিশ্লেষণ পদ্ধতির নূতনত্ব ও যুক্তিধর্মিতা স্বীকার করেও বলতে হয় যে তাঁর মূল সিদ্ধান্তগুলি অর্থাৎ শ্রেণীবৈষম্য, সংঘাত ও বিপ্লবের দ্বারাই ধনতান্ত্রিক সমাজের উচ্ছেদসাধন এখন খাটে না। সমাজের মধ্যে যেসব অদলবদল হয়েছে, শ্রমিক-শ্রেণীর জীবনযাত্রার মান যেভাবে উন্নত হয়েছে তথাকথিত ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায়ও, তাতে মার্কস-এর উপলব্ধ আংশিক সত্যকে বাস্তবের চেয়ে বড় করে দেখা চলে না। সাদা কথায়, মার্কসকে একটি বিশেষ যুগের, খণ্ড কালের সীমার মধ্যে রাখলেই তাঁর মতামতের বিচার, এবং সুবিচার সম্ভব। অন্যথায় মার্কসকে প্রাপ্যের অতিরিক্ত মর্যাদা দিয়ে তাঁকে পয়গম্বর বানাতে হয়। এবং তাহলে তাকে ঐতিহাসিক মূল্যায়ন বলা যায় না।

কিন্তু এই যে দৃষ্টিকোণ, সেটা নিতান্তই কৌণিক। প্রথম কথা, মার্কস কখনো ও কোথায়ও নিজেকে 'প্রফেট' হিসেবে হাজির করেননি এবং দাবিও করেননি যে তাঁর প্রতিপাদ্য সর্বকালের চরম ও শেষ সত্য। তবে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, বিপুল অধ্যবসায়, যাবতীয় ভাববাদ ও বস্তুবাদের গভীর অনুশীলন ও অতিসূক্ষ্ম আলোচনার শেষে যদি তাঁর সামগ্রিক দর্শনে বলিষ্ঠ প্রত্যয় এসে থাকে, আর সেই প্রত্যয়শীলতার উপর দাঁড়িয়ে যদি তিনি এমন দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে উপস্থিত হন যার ফলিত প্রয়োগে জগতের আবহমান সমাজ-ইতিহাস আলোকিত হয়ে ওঠে, সামাজিক উৎপাদন-ব্যবস্থার গঠনেই মৌলিক দ্বন্দ্বের স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ে, তা হলে অকাট্য যুক্তিশৃঙ্খলায় শ্রেণী-বিন্যাস, শ্রেণী বৈষম্য ও শ্রেণী-সংঘাতের সরলীকরণ-পর্বশেষে প্রোলিটেরিয়টের মুক্তি-পরিণতির সিদ্ধান্তটিকে কি শুধু আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন, উচ্চারিত আদর্শ অথবা প্রফেট-এর ভবিষ্যদ্‌বাণী বলে সরিয়ে রাখা চলে? তা ছাড়া, ঐতিহাসিক বিচার বা মূল্যায়ন কথাটাই অনৈতিহাসিক মনে হচ্ছে। মার্কস-এর ইতিহাস-দর্শন সম্পূর্ণই স্বতন্ত্র, তাঁর

ব্যাখ্যার পদ্ধতিও আলাদা। সমাজ-সভ্যতার বৃহৎ ইতিহাসকে তিনি যে ভাবে উদ্‌ঘাটিত করেছেন, সেখানে অর্থনৈতিক কার্যকারণের প্রভাব না দেখালে চলে না। শিল্পবিপ্লবের যুগ ও তার অব্যবহিত পরবর্তী কালের চরিত্র-বিশ্লেষণ তাঁর মুখ্য কাজ হলেও, তিনি সভ্যতার সমগ্র ইতিহাসকেই সামাজিক উৎপাদন পদ্ধতির খাতে প্রবাহিত করে তবে তার রূপ, রূপান্তর ও শেষ পরিণতির চিত্র তুলে ধরেছেন। সে ক্ষেত্রে, বর্তমান কালের কোনও খণ্ড-যুগের, একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে, বিরোধী তথ্যপুঞ্জ সংগ্রহ ও সমাবেশ করে মার্কস-এর সামগ্রিক ইতিহাস-বিচার করতে যাওয়ার অর্থ—খণ্ডিত ইতিহাস-চেতনার অথবা সেচ্ছায় অন্ধত্বের পরিচয়।

যেমনটির সাক্ষাৎ মেলে ঐ ধনতন্ত্রের চেহারা বদল আর শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মানোন্নতি — এই দুটি অজুহাত বা নমুনা দেখানোর মধ্যে। ধনতন্ত্রের আকৃতি বদল হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতিকে সে লঙ্ঘন করতে পারে? যদি করত, তাহলে তো সমস্যার সুরাহা হতো। আসলে যে বদল ঘটেছে বা ঘটছে, সেটা বাহ্যরূপের। জনগণের স্বাধীনতা, অধিকার, গণতান্ত্রিক বৈধ উপায়ে তার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ধরতাই বুলি আর কিছু নয়, ডেমোক্রেসির রঙীন ডোজ-মেশানো বিষপ্রয়োগ। এবং ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় যে অর্থনৈতিক প্রসার এবং তারই ফলে শ্রমিকশ্রেণীর যে স্বাচ্ছন্দ্য দাবি করা হয়, সে সমাজ-ব্যবস্থা একটা বিচিত্র যৌগিক পদার্থ। পরিসংখ্যানের সাহায্যে আমেরিকার মতো কয়েকটি পাশ্চাত্ত্য দেশের কয়েক বছরের উন্নতি প্রমাণ করা গেলেও, সে-প্রমাণ অকাট্য বলে গ্রাহ্য নয় এবং মার্কস-এর উক্তি যে ভ্রান্ত, সে কথাও সিদ্ধ হয় না। প্রথমতঃ, সংখ্যাতত্ত্বকে ইতিহাসের মতোই নানাভাবে ইচ্ছা ও সুবিধামাফিক ব্যবহার করা যায় এবং হয়েও থাকে। তা ছাড়া যে আর্থিক প্রসার ও উন্নয়নের নজির দেওয়া হয়, সেটা কি যথাযোগ্য উৎপাদনের ফল না-কি অতিউৎপাদনের — যার জন্য অনুন্নত দেশগুলিকে সাহায্য দেবার অছিলায় কুক্ষিগত করার চেষ্টাই প্রকট? আর যে হারে উৎপাদন এবং জাতীয় সমৃদ্ধির প্রসার ঘটেছে, সেই হারে ও অনুপাতে শ্রমিকজীবন কি উন্নত হয়েছে বা হচ্ছে? এই উৎপাদনের যন্ত্রগুলি এখনও কাদের অধিকার এবং লভ্যাংশের বণ্টন কার হাতে? সেটা কি সমবণ্টন, ন্যায়সঙ্গত বিতরণ? তাহলে সমাজব্যবস্থার যে রূপান্তর হচ্ছে বলা হয়, সেটা কি পুঁজিবাদের প্রাণের দায়ে আত্মরক্ষণের মরণান্তিক চেষ্টা নয়? নিপুণ কৌশলী অপপ্রচার ছাড়া একে আর কি বলা যায়?

ধনতান্ত্রিক সমাজসম্পর্কে মার্ক্স-এর বক্তব্য সম্পূর্ণ ও সমগ্রভাবেই বিচার করতে হবে। বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটি দেশের বিশেষ অবস্থার নজির দেখানো টুকরো টুকরো দৃষ্টান্ত দিয়ে—এটা নির্ভুল বিচারপদ্ধতি নয়। তা ছাড়া উন্নতমান ধনতান্ত্রিক দেশগুলির যে অতিসচ্ছলতা, যে জাতীয় আয়বৃদ্ধির কথা আমরা পড়ি ও শুনি, তার একটা বৃহৎ পরিমাণ কি ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেণ্টের মুনাফা নয় যে মুনাফা অনুন্নত এবং অর্ধোন্নত অঞ্চলগুলির সাহায্য-ব্যপদেশে লগ্নী করবার থেকে আসছে? কিন্তু সে কথা থাক। শ্রমিক জীবনের মান পরিবর্তনের কথায় আসি। এই শ্রমিকরা কোথাকার, কোন দেশের—এ জিজ্ঞাসা নিশ্চয়ই করা যায়। মার্ক্স-এর জীবদ্দশায় ধনতান্ত্রিক দেশগুলির তথাকথিত বিস্ময়কর পরিবর্তন তাঁর দেখার সুযোগ হয়নি, একথা ঠিক। কিন্তু তাদের শ্রমিক সমাজে যদি যথেষ্ট সচ্ছলতা এবং জীবনযাত্রায় উন্নতির লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে থাকে, সেটা কি করে সম্ভব হয়েছে? কারুর দয়ায়, দানে, নিঃস্বার্থ উন্নয়ন কামনায়? না-কি পুঁজিবাদের মিলিত শোষণক্রিয়ায়? শ্রমিকসমাজ বলতে কি অধুনা উন্নত পাশ্চাত্য কয়েকটি দেশের শ্রমিকবর্গ বুঝব? না-কি অনুন্নত এবং উন্নত—উভয় অঞ্চলেরই শ্রমিকশ্রেণীর কথা ভাবব?

উপরন্তু, মার্ক্স-এর উক্তি যে বিভ্রমকর, তার নজির স্বরূপ বলা হয় অনেক ক্ষেত্রে যে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় শ্রমিকদের ক্রমশঃ অধোগতি অনিবার্য, এ-কথা স্বীকার করা যায় না। কিন্তু কেন যায় না? প্রথমতঃ ধনতন্ত্র স্বভাবতই বর্ণচোরা এবং বহুরূপী হয়ে টিকে থাকতে চায়। মার্ক্স তো সেই কথাই বলেছেন। ধনতন্ত্রের মধ্যে যে প্রকৃতিগত অসঙ্গতি ও বৈপরীত্য আছে, তার উৎপাদন-পদ্ধতিতে যে শৃঙ্খলার অভাব আছে, তার উৎপাদনী শক্তি সামাজিক লক্ষ্যনিবদ্ধ না থাকায় সেই শক্তির যে ক্ষয় ঘটে—সেই ফলাফলগুলির অনিবার্যতাই মার্ক্স পরিস্ফুট করতে চেয়েছেন। শ্রমিকদের অধোগতি 'ক্রমিক' ও অনিবার্য বলেননি, বলেছেন তাদের 'ক্রমিক' দৈন্য-দুর্গতির কথা। বিশ্বের শ্রমিকসমাজই ছিল তাঁর চিন্তনীয় বিষয়। লোলুপ ধনতন্ত্রের আওতায় সেই শ্রমিকদের জীবনযাত্রা হীনমান হয়ে পড়ে, মার্ক্স দৃষ্টান্ত বাবদ তার উল্লেখ করেছেন, এই পর্যন্ত। শ্রমিক সমাজের অর্থনৈতিক দাসত্ব এবং পুঁজিবাদের দয়ার উপর তাদের জীবিকার নির্ভরতায় ক্রমশঃ তাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা হ্রাসের কথাই তিনি বলতে চেয়েছিলেন। ট্রেড ইউনিয়ন প্রভৃতি আন্দোলন

এবং অন্তবিধ উপায়ে তাদের মজুরীবৃদ্ধি হবে বটে কিন্তু ধনতন্ত্রের শোষণ শৃঙ্খল নানা কৌশলে ও উপায়ে তাদের ক্রমশই বেঁধে ফেলবে।

অতএব দেখা যাচ্ছে, মার্কসবাদের বিচার আলোচনা প্রাসঙ্গিক এবং সামগ্রিক হওয়া দরকার। মার্কস-এর কয়েকটি উক্তি টুকরো হিসাবে দেখা উচিত নয়, তাঁর সে উক্তিগুলি আপ্ত বাক্যের সামিল না ভেবে সেগুলিকে একটি সম্পূর্ণ বিশদ যুক্তিবিন্যাসের অঙ্গীভূত ও একাত্ম বিষয় বলেই গ্রহণ করতে হবে। বস্তুতঃ, এইটাই মার্কস-এর শ্রেষ্ঠ পরিচয় যে তিনি অনেক পড়ে ভেবে ও দেখে একটা বড় রকমের যুক্তিবিজ্ঞান ও নূতন বস্তুবাদ রচনা করে গেছেন যার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো; সেটি পুরোপুরি 'অবজেক্টিভ', 'প্র্যাকটিক্যাল-ক্রিটিক্যাল' এবং 'রেভল্যুশনারি' — অর্থাৎ শুধু দার্শনিক মতবাদ নয়,বস্তুগত সত্যাশ্রয়ী, ক্রিয়াশীল, কার্যকারণ-নির্ভর এবং বিপ্লবী প্রচেষ্টায় কার্যক্ষম। এবং এই মার্কসীয় দর্শন একটি যান্ত্রিক ছক মাত্র নয় তা 'মানব--সমাজ' অথবা 'সামাজিক মানবের' যাবতীয় সম্পর্ক ও ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে অন্বিত। খাঁটি বিজ্ঞানেও ব্যত্যয় ঘটে। কাজেই যখন যে নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, মার্কসীয় সমাজবিজ্ঞানকে সেইসেই অবস্থা ও সমস্যার উপর প্রয়োগ করে দেখতে হবে। যদি তাতে সমাধান না মেলে, তার মানে নয় মার্কস-এর দৃষ্টি ভুল অথবা তাঁর যুক্তি অসার। যদি নূতন তথ্য বা সত্যের একটা খোঁজ পাওয়া যায়, তা হলে স্বীকার করা উচিত মার্কস-এর বিশ্লেষণে বিজ্ঞান-ধর্ম আছে এবং তাঁর সিদ্ধান্তগুলি পথ চিনিয়ে দিচ্ছে।

সমাজ-সন্ধিৎসায় মার্কস যে যুক্তিবিজ্ঞানের কাঠামো তৈরি করলেন, সেইটা বোধহয় তাঁর শ্রেষ্ঠ দান। তাঁর বস্তুবাদী ইতিহাস ধারণাকে একটি যুগান্তকারী ঘটনা বলেই চিহ্নিত করতে হয়। এ-বিষয়ে মার্কস-এর চিন্তার মাধ্যমে ইতিহাসের ছাত্ররা খুঁজে পাবেন সামাজিক ঘটনাপ্রবাহের বিশ্লেষণী আলোচনা অর্থাৎ স্টেজ-অ্যানালিসিস। মার্কসই প্রথম দেখালেন যে ইতিহাসের গতি-প্রকৃতি একটি নিয়মানুবর্তী। এবং সেই গতিপ্রবাহে কয়েকটি সন্ধিক্ষণ আছে, যেসব সময় যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটে। সেই পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণগুলিও আবার সেই ঐতিহাসিক নিয়মেরই পরিণতি। অতএব মানুষের ইতিহাসে সামাজিক রাজনৈতিক ও বৈষয়িক পট-পরিবর্তনের যে যুগনির্ণয় ও স্তর-বিন্যাস তিনি করে দেখালেন, তা পরবর্তী ঐতিহাসিক এবং সমাজ-তাত্ত্বিক আলোচনায় একটি অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে দেখা দিল।

মার্ক্স-এর চিন্তায় বিচ্ছেদের (এলিয়েনেশন) প্রকৃতি এবং কারণ একটি মৌলিক সমস্যা। তাঁর মতে, সমাজ যতদিন শ্রেণীবিভক্ত থাকবে এবং মানুষ যতদিন না নিজের পারিপার্শ্বিককে আয়ত্তের মধ্যে আনতে পারবে ততদিন এই বিচ্ছেদবোধ থাকবেই এবং তার কোনও কার্যকর সমাধান হতে পারে না। 'উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে শ্রমজীবী মানুষদের আয়বৃদ্ধি সত্ত্বেও তারা সামাজিকভাবে পুঁজির শৃঙ্খলে বাঁধা পড়তে পারে, মার্ক্স-এর এই অভিমত পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এর কারণ মানুষের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক, সমাজে মানুষের স্থান, সব প্রশ্নই অর্থনৈতিক বা বৈষয়িক উপকরণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু মার্ক্স এইখানেই বোধহয় থামেননি সমস্যাটিকে আরও একটু তলিয়ে দেখেছিলেন। তাঁর কাছে এ-সমস্যাটা শুধুই সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা নয়। এটা হচ্ছে একটি সামগ্রিক সমস্যা, মানবচেতনারই সমস্যা — যার মূল সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে 'পার্সোন্যালিটি ফর্মেশন' বা ব্যক্তিত্ব বিকাশের ইতিহাসে নিহিত।

অতএব উচ্চ পর্যায়ের সামাজিক অর্থনৈতিক সুযোগ—সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করা সত্ত্বেও, এবং যান্ত্রিক কৃতকৌশল বিদ্যার যথেষ্ট উন্নতি সত্ত্বেও — এমনকি অনেক সময়ে ঐ কারণেই, একটি মানুষের সঙ্গে সমাজের ও অন্য ব্যক্তির সম্পর্কের মধ্যে নানা পর্যায়ে নানাভাবে বিচ্ছেদভাব থাকে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থারও সেরকম বিচ্ছিন্নতাবোধ করার সমস্যা থেকে যেতে পারে। আর সেই কারণে, শুধু উৎপাদিকা শক্তিগুলির সামাজিকরণ দ্বারাই যে সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যায়, এমন নাও হতে পারে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ত্রুটি সন্ধান ও বিরূপ সমালোচনার চেয়ে আরও বড় ও দরকারী কথা হলো —ঐ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে এই অনন্বয় বা বিচ্ছেদবোধের আর কি কি কারণ থাকতে পারে, সেটাও ভেবে দেখা। যাইহোক, বিচ্ছেদের সমস্যাকে মার্ক্স যেভাবে দেখেছিলেন, সেটা একটা বিশেষ কোনো পর্যায় বা বিশেষ কোনো কালপর্বের লক্ষণ নয়। তার মূল আরও গভীরে। বর্তমান কৃৎকৌশলভিত্তিক সমাজে মানুষের নিঃসঙ্গতা, অসহায় বিচ্ছেদবোধ এবং তার থেকে উদ্ভূত নানা রকমের সামাজিক ও মানসিক অকল্যাণ এবং ব্যাধির কথা চিন্তা করতে গেলে, মার্ক্স-এর চিন্তাধারার কতকগুলি মৌলিক দিকের কথা স্মরণ রাখতে হবে।

মার্ক্স-এর ভাবনা পরবর্তী এক শতাব্দীকাল ধরে পৃথিবীর মানুষের

চিন্তাধারাকে এবং ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহকে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভাবে প্রভাবিত করেছে। স্বপক্ষীয় এবং বিপক্ষীয় সবরকম দল ও মতাদর্শই মার্কস-এর চিন্তাধারাকে এবং তার যুক্তিপদ্ধতি ও বিচারপদ্ধতিকে অগ্রাহ্য করতে পারেন না। এই 'মেথডলজি'র উদ্ভাবন ও তার কার্যকরী প্রয়োগ মার্কস-এর এক অবিস্মরণীয় দান। একথা ঠিক যে গত শতাব্দীতে ঠিক যে-যে সমস্যাকে মার্কস দেখেছিলেন এবং যে ভাবে তার সম্মুখীন হয়েছিলেন, সেই সমস্যাগুলি ঠিক সেইভাবে আজ আমাদের সম্মুখীন নাও হতে পারে। অথবা তাদের প্রকৃতি কিছুটা পালটেও যেতে পারে। অতএব আজকের জগতে মার্কস--এর বক্তব্যকে হুবহু নকল করতে গেলে অসুবিধার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু তাঁর চিন্তা-দর্শনের খুঁটিনাটি দিকগুলি নকল করা হোক এবং আপ্ত বাক্যের মতো উদ্ধৃত হতে থাকুক, একথা মার্কস বোধ হয় স্বপ্নেও ভাবতে পারতেন না। তাই মার্কসবাদকে যদি প্রসারিত করে তাঁর সুচিন্তিত কোনো মন্তব্যের মধ্যে নূতন একটা সূত্রের বা অর্থের সন্ধান চলে তা হলে তাকে 'সংশোধনবাদ' বলে নস্যাৎ করা অনুচিত। ঐ প্রচেষ্টাই প্রমাণ করে মার্কসবাদ এক জীবন্ত তত্ত্ব। মগজের খোপে ঢাকা জড় দর্শন মাত্র নয়।

মার্কস তাঁর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে মানুষের সামাজিক ক্রমবিকাশের রহস্য উদ্‌ঘাটনের যে হাতিয়ার দিয়ে গেছেন, চিন্তার জগতে সেটাই মনে হয় তাঁর সবচেয়ে বড় দান। আধুনিক মার্কসোলজিস্ট রেওয়াজে শোনা যায়, প্রথম দিককার মার্কস আর পরবর্তী কালের মার্কস-এর মধ্যে পার্থক্য আছে। যদি থাকে তা বিচিত্র নয় এবং তার কারণ বোধহয় এই যে প্রথম দিকে মার্কস যে সব বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন, পরে নিষ্প্রয়োজন বোধে সেগুলির পুনরাবৃত্তি করা দরকার মনে করেন নি। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে — সেই গোড়ার কথা। অর্থাৎ মার্কসকে সমগ্রভাবে পড়তে হবে, বুঝতে হবে। একটা গোটা মানুষের সমগ্র মানস ও চিন্তার যুক্তি পরম্পরা বুঝতে গেলে তাঁর সমস্ত রচনা মতামত আদ্যন্ত মিলিয়ে পড়া দরকার। তবেই সঠিক ও সশ্রদ্ধ বিচার সম্ভব। মার্কস-এর দৃষ্টি পরিধিটা পৃথিবীর সমগ্র সমাজকে ঘিরে; তাঁর কামনা মানব-সমাজের মুক্তি কামনা — 'প্রয়োজন থেকে মুক্তিতে উত্তরণ'। শ্রমিকসমাজ এরই একটা বড় অংশ বলে সেই বিশেষ অংশের অশেষ দুর্গতির কারণ অনুসন্ধানে তাঁকে সমাজ-সভ্যতার স্তরবিন্যাস ও চরিত্র বিশ্লেষণ করতে হয়েছিল। অতএব

তাঁর বস্তুবাদ থিয়োরি-সর্বস্ব নয়, মুখ্যতঃ এবং মূলতঃ প্র্যাকটিকাল। কার্যকরতায় তার বনিয়াদ, প্রয়োগনির্ভরতায় তার সফলতা।

অতএব মার্কস-এর টেক্স্ট বা মূল গ্রন্থপাঠ ও অনুশীলনই তাঁকে যথার্থ বোঝার একমাত্র উপায়। বিক্ষিপ্ত উক্তি আর প্রসঙ্গবদ্ধ মন্তব্যকে সম্পর্কহীন ভাবে আলোচনায় সার্থকতা নেই। মার্কস-এর মতাদর্শ সূত্রাকারে নিবদ্ধ দর্শন-তত্ত্ব নয়, ব্যাখ্যানে বিশ্লেষণে যুক্তিশৃঙ্খলায় একটি সম্পূর্ণ চিন্তাবিন্যাস —যা মানুষের সমাজ, পারস্পরিক সম্পর্ক, অধ্যাত্মপ্রক্রিয়া, তার সাহিত্য ও সংস্কৃতি অর্থাৎ সামাজিক আধার ও উপকরণ, এক কথায় ভিতরকার কাঠামো এবং বাইরের উপরতলা ইমারৎ—সব কিছুকেই স্পর্শ করছে। এই প্রসঙ্গে মার্কস-এর একটি কালোপযোগী উক্তি স্মরণীয়; অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণে যখন সমাজের বৈষয়িক ভিত্তির পরিবর্তন হয়, তখন ঐ বহিরবয়ব অর্থাৎ শিল্প সংস্কৃতিরও 'সাধারণ আকৃতি-প্রকৃতি' বদলায়, 'অল্প বিস্তর তাড়াতাড়ি রূপান্তরিত হয়'।

পুরনো দার্শনিক বস্তুবাদের সঙ্গে তাঁর প্রবর্তিত বস্তুবাদের তফাৎ কোথায়, তা মার্কস নিজেই বলে গেছেন ফয়ারবাখ সম্পর্কে দশম থীসিস-এ। নব্য বস্তুবাদের ভিত্তি ও দৃষ্টিকোণ স্বতন্ত্র। 'সিভিল সোসাইটি' নয়—'হিউম্যান সোসাইটি' কিংবা 'সোস্যালাইজড হিউম্যানিটি' অর্থাৎ গোটা আসল মনুষ্যসমাজ ও সামাজিক সম্পর্কই হচ্ছে তার বিষয়বস্তু। মার্কস প্রসঙ্গে উপরের কথাগুলি নিতান্ত প্রাথমিক। কিন্তু গোড়াকে ঠিক মতো ধরতে হলে গোড়ার কথাই বলতে হয়। কারণ, মার্কসকে বাদ দিয়ে তো মার্কসবাদী হওয়া যায় না। রাজনীতিতে হয়তো হয়, কিন্তু সততায়, বিবেকবিচারে, বোধনিষ্ঠার দাবিতে? হয় না। মার্কসকে সম্পূর্ণ খুঁটিয়ে পড়লে ও বুঝলে 'কনভিন্সড মার্কসিস্ট' না হয়ে পারা যায় না। মুস্কিল ও ভয়তো সেখানেই বুদ্ধিজীবীদের। ভয় থেকেই আসে নিপুন বিদ্রূপ, জ্ঞান থেকেই অজ্ঞানের নিখুঁত অভিনয়।

বৈজ্ঞানিক এঙ্গেলস

দিলীপ বসু

মার্কস ও এঙ্গেলস দুটি মানুষ, কিন্তু তাঁদের দুজনের মস্তিষ্ক যেন একটি, একটিই মননশক্তি, একটিই বিরাট প্রতিভা যেন দুটি দেহের মাধ্যমে প্রকাশিত। ইতিহাসে এরূপ বন্ধুত্বও বিরল।

মার্কসের জন্ম ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে, এঙ্গেলসের ১৮২০-এ, মার্কসের দেড়শত জন্মবার্ষিকী পালন করার পরে এবার এঙ্গেলসের ১৯৭০-এ। আসলে এই দুই মহারথীর সার্ধশত-জন্মবার্ষিকী পালনের মধ্য দিয়ে আমরা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র, কমিউনিজম বা মার্কসবাদকেই আরো ভালো করে বুঝে আমাদের জীবন-সংগ্রামে প্রয়োগ করতে পারি।

মার্কস-এঙ্গেলসের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র বা কমিউনিজমের বিশ্ববীক্ষা নিশ্চয়ই বস্তুবাদী, আর বিচারপদ্ধতি (methodology) হলো ডায়া-লেকটিক (দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ী, আমরা মূল গ্রীক শব্দটি ব্যবহারের পক্ষপাতী)। মার্কস-এঙ্গেলসের বা মার্কসীয় দর্শনের মূলসূত্র ডায়ালেকটিক বস্তুবাদ কেবল-মাত্র অর্থনীতি, রাজনীতি বা ইতিহাসের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। আমরা যাকে বিজ্ঞান বলে অভিহিত করে থাকি—পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, জীববিদ্যা, বলবিদ্যা ইত্যাদি—মার্কস-এঙ্গেলসের সময়ে যাকে natural philosophy বা প্রকৃতির দর্শন বলা হতো সেই বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও ডায়ালেকটিক বস্তুবাদের বিশ্লেষণ সমভাবেই প্রযোজ্য। যেমন গ্রীক যুগে তেমনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর যুগেও দর্শন ও বিজ্ঞানের প্রচলিত ধারণার তফাৎ যে আবার জোড়া দেবার চেষ্টা হচ্ছে, মার্কসীয় বিচার-পদ্ধতিতে সেটা গোড়া থেকেই স্বীকৃত।

দুই চিন্তানায়ক খানিকটা কাজ ভাগ করে নিয়েছিলেন। মার্কসের ওপর ভার পড়ে অর্থনীতি, সমাজনীতি, সমসাময়িক ইতিহাস, এবং টেকনো-লজির (বা কারুশিল্পের) ইতিহাস এবং কৃষিকার্যের রসায়ন (agricultural chemistry)। এই অধ্যয়নের পুরো ফল দেখতে পাই আমরা মার্কসের 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে এবং তৃতীয় খণ্ডের 'জমির খাজনার'

(ground rent) আলোচনাতে। 'ক্যাপিটাল' লিখতে আরম্ভ করে ১৮৫৮ নাগাদ মার্কস প্রথমে বীজগণিত, পরে বিশ্লেষক জ্যামিতি এবং ডিফারেন্সিয়াল ও ইন্টেগ্র্যাল ক্যালকুলাস্ ভালো করে অধ্যয়ন করেন। (অঙ্কশাস্ত্রের বিষয়ে মার্কসের পাণ্ডুলিপি এখনও ইংরাজিতে অপ্রকাশিত)।

এঙ্গেলসের কাজ স্থরু হয় পদার্থবিদ্যা ও শারীরবিদ্যা নিয়ে। উদ্দেশ্য ছিল, জীবকোষের থিয়োরি ও শক্তির (energy) রূপায়নের ক্ষেত্রে ডায়ালেকটিক বস্তুবাদী বিচারপদ্ধতির বিশেষ প্রয়োগ। ইতিমধ্যে ১৮৫৯ সালের শেষে ডারউইনের 'Origin of Species' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গেসঙ্গেই এঙ্গেলস তা পড়ে ফেলেন, মার্কস পড়েন ১৮৬০-এ। ১৮৬০ সালের ১৯-এ ডিসেম্বর মার্কস একটি পত্রে এঙ্গেলসকে জানাচ্ছেন: "This is the book which provides the natural historic basis for our concept" (এই কেতাবটি আমাদের চিন্তাভাবনার স্বাভাবিক ঐতিহাসিক ভিত্তি হাজির করছে)। এর পরের বছরগুলিতে তাঁরা জীববিদ্যা, এনাটমী, শারীরবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র এবং বিজ্ঞানের (এখন থেকে চলতি অর্থেই কথাটি ব্যবহার করা হবে) অন্যান্য বিভাগে অধ্যয়ন স্থরু করেন।

মার্কস-এঙ্গেলসের যুক্ত পত্রালাপে (ইংরাজিতে মাত্র একটি সঙ্কলিত খণ্ড এতাবৎ প্রকাশিত) বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বেশ কিছু টুকরো টুকরো আলোচনা এখানে-ওখানে ছড়ানো রয়েছে। অর্থনীতি, সমাজনীতি, ইতিহাস ইত্যাদিতে যেমন মার্কসের, তেমনি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এঙ্গেলসের উদ্যম ছিল অপেক্ষাকৃত বেশি। আমরা আগেই বলেছি, দুই বন্ধুর কাজের ভাগ ছিল, এবং পত্রালাপে দেখছি, ক্রমাগতই একজন তাঁর জ্ঞানের বিশিষ্ট বিভাগের দিকে আর একজনের নজর টানছেন।

আমরা এখন বিশেষ করে এঙ্গেলসের বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার দিকটি তুলে ধরবার চেষ্টা করব।

প্রথম সূচনা

এঙ্গেলসের বিজ্ঞান সম্পর্কিত লেখা প্রধানত তাঁর 'এন্টি-ডুহরিং'-এ খানিকটা, 'বাঁদর থেকে মানুষের বিবর্তনে শ্রমের ভূমিকা'তে* খানিকটা এবং

---

*১৮৯৬ সালে প্রথম আলাদা পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হলেও, পরে 'ডায়ালেকটিকস্ অফ্ নেচার'-এর অন্তর্ভুক্ত হয়।

'ডায়ালেকটিকস্ অফ নেচার'-এ পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয়, শেষোক্ত পুস্তকটির পরিকল্পনা ১৮৭৩, ৩০-এ মে মার্কসকে লেখা একটি চিঠিতে এঙ্গেলস প্রথম পেশ করলেও, পুস্তকটি অসম্পূর্ণ এবং এঙ্গেলসের এমন কি লেনিনের জীবদ্দশাতেও অপ্রকাশিত ছিল। ১৮৯৫-এর ৫ই আগস্ট এঙ্গেলসের মৃত্যুর পর মার্কস-এঙ্গেলসের যাবতীয় লেখা, নথিপত্র ইত্যাদি জার্মান সোস্থাল ডেমোক্রাসির সুবিধাবাদী নেতাদের হাতে গিয়ে পড়ে। একমাত্র ১৯২৫-এ সোভিয়েত ইউনিয়নে এটি প্রথম জার্মান ও পাশাপাশি রাশিয়ান তর্জমাতে প্রকাশিত হয়। ইংরাজি সংস্করণ আরো অনেক পরে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়।

১৮৮৩-তে মার্কসের মৃত্যুর পরে জীবনের শেষ বারো বছর এঙ্গেলসকে বন্ধু মার্কসের পাণ্ডুলিপি থেকে 'ক্যাপিটাল'-এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড উদ্ধার করে প্রকাশ করতেই বহু সময় যায়। বলা বাহুল্য, তিনি ছাড়া এ-কাজটি আর কেউ-ই করতে পারতেন না।

৩০-মে ১৮৭৩ সালে এঙ্গেলস্ মার্কসকে লেখা চিঠিতে তাঁর 'ডায়ালেকটিকস্ অফ্ নেচার' (প্রকৃতিরাজ্যে তথা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ডায়ালেকটিকসের প্রয়োগ) পুস্তকের মূল তিনটি প্রতিপাদ্য উপস্থিত করেন (এঙ্গেলসের বিজ্ঞানচিন্তার উদাহরণ দিতে গিয়ে বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে আমি ইংরাজিতে অনূদিত এঙ্গেলসের রচনা থেকে মৎকৃত অক্ষম অনুবাদ বা ভাবার্থ ব্যবহার করছি)।

(১) বস্তু ও গতিকে পৃথক করা যায় না (গতি হচ্ছে বস্তুর অস্তিত্বের প্রকাশ—motion as the mode of existence of matter)।

(২) "বিভিন্ন ধরণের গতির গুণগত বিভিন্নরূপ, তথা বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বিভিন্ন চিন্তাধারা (যেমন বলবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, জীববিদ্যা) যেভাবে এই গতির বিভিন্ন রূপের চরিত্র অনুসন্ধান করে থাকে।"

(৩) "এক ধরণের গতি থেকে অন্য ধরণের গতিতে ডায়ালেকটিকীয় (দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়ের মিলিত) রূপান্তর, অর্থাৎ এক ধরণের বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সঙ্গে অন্য ধরণের চিন্তাধারার যোগসূত্র স্থাপন করা যেতে পারে।" ('ডায়ালেকটিকস্ অফ্ নেচার', মস্কো সংস্করণ, ১৯৫৪, পৃষ্ঠা ৬-এ চিঠিটির সারাংশ দেওয়া হয়েছে, মূল চিঠিটি 'মার্কস-এঙ্গেলস পত্রালাপ' ইংরাজি সংস্করণ, মস্কো, ১৯৬৫, পৃষ্ঠা ২৮১-৮২-তে দ্রষ্টব্য)।

'ডায়ালেকটিকস্ অফ্ নেচার' লেখার প্রধান লক্ষ্য কি ছিল? এঙ্গেলস্ নিজেই এ্যানটি-ডুহরিং-এর দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকাতে লিখছেন :

"এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, সাধারণভাবে যেটা বিশ্বাস করতাম তাকেই খুঁটিয়ে বোঝবার জন্য গণিত ও প্রকৃতি বিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলি আর একবার অনুধাবন করলুম। তাতে দেখা গেল যে, প্রকৃতিতে পরিবর্তনের যতই লীলাখেলা চলুক না কেন, ঐ একই গতির ডায়ালেকটিকের নিয়মগুলি কাজ করে যাচ্ছে, যেমন ইতিহাসের আপাতঃবিচ্ছিন্ন খানিকটা আকস্মিক ঘটনাবলীর মধ্যেও ঘটে থাকে।...প্রকৃতিরাজ্যে ডায়ালেকটিকসের সূত্রগুলি গড়ে তোলবার কোনো প্রশ্নই আমার কাছে থাকতে পারে না, আমার কাজ ছিল তাদের আবিষ্কার করে তাদের প্রয়োগপদ্ধতির দ্বারা ভবিষ্যতের বিকাশকে সূচিত করা।" (এ্যানটি-ডুহরিং, মস্কো সংস্করণ, ১৯৬৯, পৃঃ ১৬ ও ১৭)।

"কিন্তু নিয়মশৃঙ্খলার সঙ্গে একে প্রতিটি বিভাগে শ্রেণীবদ্ধ করা বৃহৎ কাজ। কারণ, এর জন্য জ্ঞানের যে বিরাট পরিধি আয়ত্বে আনতে হবে, সেটা যেমন একেবারে অন্তহীন, তেমনি প্রকৃতিবিজ্ঞানের সমস্ত ক্ষেত্রেই আজ এমন বৈপ্লবিক রূপান্তর সাধিত হচ্ছে যে, যে-সমস্ত লোকেরা এই কাজে তাদের সর্বসময় দিতে পারে, তারাও এর অগ্রগতির সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে পারে না। আর কার্ল মার্কসের মৃত্যুর পর থেকে আমার সময়কে অন্য কাজে নিযুক্ত করতে হয়েছে; কাজে কাজেই আমার নিজের কাজকে স্থগিত রাখতে হয়েছে। [ঐ পৃঃ ১৮]

এ্যানটি ডুহরিং-এর দ্বিতীয় সংস্করণের এই ভূমিকাটি লেখা হয়েছিল ২৩-এ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৫—মার্কসের মৃত্যুর দুই বছর পরে।

তিনটি বিষয়

উনবিংশ শতাব্দীর যে তিনটি আবিষ্কার এঙ্গেলসের বৈজ্ঞানিক মানসে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, তা হলো : (ক) জীবকোষের গঠনতন্ত্রের প্রথম খানিকটা ধারণা; (খ) শক্তির নিত্যতা (Conservation of Energy) ও এক ধরনের শক্তি থেকে অন্যতে রূপান্তর এবং (গ) ডারউইনবাদ অর্থাৎ জীবজগতের ক্রমবিবর্তন তথা বাঁদর (ape) থেকে মানুষে অনুক্রমণ।

জীববিদ্যাতে জীবকোষের গঠন তথা প্রাণের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে এঙ্গেলস দেখাচ্ছেন, প্রাণ কোনো আধিভৌতিক ব্যাপার নয় যা একমাত্র

অতীন্দ্রিয় আধিবিদ্যক কোনো শক্তি বা ঈশ্বরের সৃষ্টি বলে চালানো যেতে পারে। এঙ্গেলস বলছেন :

"প্রাণ হচ্ছে প্রোটিনের দ্বারা গঠিত বস্তুর অস্তিত্বের প্রকাশ। তার আসল ব্যাপারটা হচ্ছে এই প্রোটিনের সঙ্গে তার বাইরের পারিপার্শ্বিকের ক্রমাগতই বিপাকীয় লেনদেন চলছে এবং যেটা থেমে গেলে প্রোটিনের ক্ষয় হয়ে শেষ হয়ে যাবে।" (ডায়লেকটিকস্ অফ্ নেচার, মস্কো সংস্করণ, ১৯৬৪ পৃষ্ঠা ৩০৬)।

আধুনিক বিজ্ঞান এঙ্গেলসের উপরিউক্ত প্রাণের সংজ্ঞাকে পুরোপুরি গ্রহণ করেছে।

শক্তির নিত্যতা এঙ্গেলসের সময়ে প্রথম একেবারে অবিসম্বাদীভাবে গৃহীত হলেও তখনকার বিজ্ঞানে বিংশ শতাব্দীর আইনস্টাইনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার, $E=mc^2$ জানা ছিল না। [E হচ্ছে শক্তি (energy), m হলো ভর (mass) এবং c হলো আলোর গতিবেগ—এই বিখ্যাত সমীকরণ আবিষ্কার করে আইনস্টাইন দেখালেন যে জড় পদার্থের ভরকে শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়। এই সূত্রানুসারেই আজকে পারমাণবিক শক্তির হিসাব করা হয়ে থাকে।]

জ্যোতির্বিদ্যাতে দার্শনিক কান্ট ও গণিতজ্ঞ লাপলাসের থিয়োরিতে যখন সৌরজগতের উৎপত্তির কার্যকারণ সম্পর্ক ধরা পড়ল, তখন বোঝা গেল যে, প্রকৃতিরও ইতিহাস ও বিকাশ আছে। সত্য বটে, কান্ট-লাপলাসের থিয়োরি অনুসারে জ্বলন্ত ঘূর্ণমান নীহারিকাপুঞ্জ থেকে সূর্য ও গ্রহাদির যে উৎপত্তির কথা বর্ণনা করা হয়েছে, আধুনিক বিজ্ঞান তা থেকে অনেকদূর এগিয়েছে। কৌণিক ভরবেগের (angular momentum) হিসাবের গোলমাল ধরা পড়লে প্রথম জীনস্, চেম্বারলেন, মোলটনের থিয়োরি চালু হলো—একক নক্ষত্রের সঙ্গে নীহারিকাপুঞ্জের সংঘাতে সূর্য ও গ্রহাদির উৎপত্তি। গোঁজামিল তাতেও বেশ ভালোরকমেরই ছিল এবং আজকে মার্কস-এঙ্গেলসের মানসপুত্র সোভিয়েত ইউনিয়নের বৈজ্ঞানিক অটো স্মিডের দ্বারা আবিষ্কৃত সৌরজগতের উৎপত্তির থিয়োরিই সর্বজনগৃহীত ও গণিতের হিসাবে মেলে।

গ্রহান্তরে প্রাণ ?

অটো স্মিডের থিয়োরি (স্থানাভাবে তার বিশদ আলোচনা এখানে সম্ভবও নয়, কিছুটা অবান্তরও বটে) থেকে আমাদের এই সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে, আমাদের সূর্যের মতো কোটি কোটি নক্ষত্রের বা সূর্যের মধ্যে অন্তত কয়েক

কোটি নক্ষত্র বা সূর্যকে কেন্দ্র করে গ্রহরাজির (আমাদের সৌরজগতের মতন) সৃষ্টি হয়েছে। আর তা হয়ে থাকলে, যদিও আমাদের সৌরজগতে উপস্থিত, একমাত্র পৃথিবীতেই প্রাণের বিকাশ হয়েছে ধরে নিলেও, অন্য নক্ষত্রের অন্য সৌরজগতের গ্রহান্তরে প্রাণের, তথা বুদ্ধিমান প্রাণীর বিকাশ হয়ে থাকা সম্ভব। অবশ্যই আধুনিক বিজ্ঞানের এই প্রতিপাদ্য খৃষ্টীয় ভগবান বা ঈশ্বরের ধারণাকে ("man is made in the image of God") বড় চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করেছে।

আশ্চর্যের কথা এঙ্গেলসের সময়ে বিজ্ঞানের এতটা উন্নতি না হলেও, কান্ট-লাপলাসের থিয়োরির ডায়ালেকটিক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলছেন যে, গ্রহান্তরে প্রাণের এবং বুদ্ধিমান প্রাণীর সৃষ্টি হতেই হবে।

প্রকৃতির নিয়মে জন্ম ও মৃত্যু পাশাপাশি চলেছে, অতএব কোটি কোটি বছর ভবিষ্যতে হলেও একদিন আমাদের পৃথিবীতে প্রাণের এবং পৃথিবীরই মৃত্যু অনিবার্য (ঐ, পৃষ্ঠা ৩৬)। তারপর ?

এঙ্গেলস বলছেন, ২ × ২ = ৪-এর মতো সোজা জবাব এর নেই : তাঁর রচনার ভাবার্থ :

"যদি ধরা যায় যে, বস্তু তার অনন্তকালব্যাপী অস্তিত্বের মধ্যে মাত্র একবার এবং তাও স্বল্পকালের জন্য, (অনন্তের তুলনায় মুহূর্তমাত্র) তার গতির বিচিত্রতা প্রকাশ করতে পেরেছিল এবং তদ্বারা গতির সমস্ত সম্পদ উদ্ঘাটিত করেছিল—বস্তুর যান্ত্রিক স্থান পরিবর্তনের গতি অনুকূল পরিবেশে তাপরূপী, বিদ্যুৎশক্তিরূপী, রাসায়নিক ক্রিয়ারূপী, প্রাণরূপী গতিতে রূপান্তরিত হয়, কিন্তু তার নিজের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা নেই সেই রূপান্তর ঘটাবার—এটা মানতে হলে বলতে হয় যে, সেই বস্তু তার গতিকে খুইয়ে ফেলেছে ; অর্থাৎ এমন গতি, যার বিভিন্ন গুণগত রূপান্তরিত গতিতে চলনশীলতা থাকতে পারে, কিন্তু এনার্জি বা শক্তির দ্বারা রূপান্তর ঘটবার ক্ষমতা নেই। দুটোই চিন্তার বাইরে।" (ঐ পৃঃ ৩৭)

আজ বিজ্ঞান আমাদের হাতে প্রত্যক্ষ প্রমাণ হাজির করতে না পারলেও বহু অপ্রত্যক্ষ কিন্তু প্রমাণিত নজীরের সাহায্যে গ্রহান্তরে প্রাণের অস্তিত্বের কথা জোর করেই বলা যায়। এঙ্গেলস একমাত্র বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকসের বিচারপদ্ধতির আশ্রয় করেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছিলেন।

আজকের বিজ্ঞানের অগ্রগতি দেখে এঙ্গেলস কেবল খুশীই হতেন না, আবার নতুন করে বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকসের সাহায্যে বর্তমান জ্ঞানের ভিত্তিতে ভবিষ্যতকে বিচার করতে বসতেন নিশ্চয়ই।

বিস্ফোরণ

প্রেমেন্দ্র মিত্র

কমজোর বিজ্‌লীর বাতি
বাড়ন্ত বিদ্যুতে।
ম্যাড়মেড়ে আলোয়
রুগ্ন মেঘলা অন্ধকার
বিষণ্ণ পাণ্ডুর,
নোংরা রাস্তা কাদায় প্যাচপেচে।
কোথাও মানুষ নেই,
অগুণতি সত্তার পিণ্ড
চটকে মেখে শশব্যস্ত কাল
ফুটপাথে ট্রামে ও বাসে
লেপ্‌টে কিংবা ঠেসে দিয়ে নাড়ে।
অত ঘন ঘেঁসাঘেঁসি
ঠাস-বুনুনি জনে জনে তাই
পরস্পর কি দুস্তর দূর,
হঠাৎ আঁৎকানো হাঁক,
বোমা! বোমা!
এক সাথে শাসন বিদ্রোহ
ছুটছে উর্ধ্বশ্বাস।

সময়! সময়!
কত বিস্ফোরণ চাই
এ প্রাণের পরিসর একটু বাড়াবার?

সেই কবে কোন্ এক ইস্টেশনে

বিষ্ণু দে

We disregard a number of attributes as *contingent* ; we separate the essence from the appearance...

কী আশ্চর্য লেগেছিল
অথচ ঔচিত্যে সোজা, স্বাভাবিক ! তাই এখনও অবাক !
যখন পারলুম সেই স্বভাবের যাথার্থ্যের ইতিবৃত্ত জানতে,
সেই কবে কোন এক ইস্টেশনে, রুশিয়ার উত্তরসীমান্তে
সহকর্মী কয়জনা সময় হয়েছে কিনা সেই তর্কে ব্যতিব্যস্ত, —
আর লেনিন বললেন, সন্ত দেশে ফেরা,
কিন্তু সেই সদা তীব্রতায় মিতবাক,
সোনালি শ্যেনের দৃষ্টি একবার হেনে —
তাহলে সিদ্ধান্তে এলে ডেকে দিয়ে বোলো,
আপাতত এই বাক্সটার ওপরে শুয়ে পড়ি,
ক্লান্তিতেও সংশয়-দ্বিধার নই ভক্ত।

সিদ্ধান্তে পৌঁছল সেই জনা কয় সহকর্মী, জানালও,
অমনি ক্লান্তিও দূর,
শুরু হলো সেই ক্ষিপ্র মাপা পদক্ষেপ,
স্নায়ু-মননে সংবৃত কেন্দ্রে, ব্যক্তিবিশ্বে ধৃত ব্যাসে।
তারপরে ?
তারপরে সতেরোর শবরী আগত ঐতিহ্যের সপ্তপ্রান্তে।

আজও সে সত্তরে স্থির চিরগতিশীল কেন্দ্রে
মৃত্যুহীন স্বর,
বোলো তাকে বোলো
ব্যাপ্ত আজ বিশ্বে ভুলভ্রান্তিতেও.
এমন কি দুর্গতির দুর্মর অভ্যাসে দুর্বল বাঙলায়।
তাই গঙ্গাতেও সূর্য জ্বলে। চেতনায় উদয়াস্ত।
আর সোনালি রশ্মিরা ঝরে
যেখানেই তরুর তম্বুরা বাজে বাগানে ময়দানে পথে
আর সর্বত্রই উন্মীলিত গুলমোরের থোলো॥

তিন সত্যি

বিমলচন্দ্র ঘোষ

চৈতালী রাত্রির শুকনো বাতাসে চিতার আগুন
দাউ দাউ কোরে জ্বলছে।
চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে
গোলাপ আর রজনীগন্ধার ছেঁড়ামালা।
লোকে চিরদিন মনে রাখবে ভেবে
শ্মশানের উঁচু পাঁচিলগুলোর দেয়ালে
অবুঝ শবযাত্রীরা
মৃতদের কারুর কারুর নাম লিখে রেখেছে
পোড়া কাঠকয়লা দিয়ে।

রাত তখন এগারোটা
পাঁচিলের পশ্চিম মুখো দরোজা দিয়ে বেরিয়ে
আদিগঙ্গার ঘাটে গিয়ে বসি।
যার দেহটা পুড়ে প্রায় শেষ হয়ে এসেছে
তার সঙ্গে আমার নিবিড় সম্পর্কের কথা
আজকের এই দুঃসহ শোকের মধ্যে দিয়ে
বিনা চেষ্টায় ভুলে যেতে হবে।

অপার্থিব নক্ষত্রেরা
পার্থিব আকাশের সর্বাঙ্গে জ্বলছে।
পৃথিবীর বুকে প্রেম জন্মাবার বহু আগে থেকেই
ওরা জ্বলছে।
প্রেম যেদিন থাকবে না
সেদিনও ওরা জ্বলবে কিনা
কেউ বলতে পারে না।

যার বিংশতি বসন্তপুষ্ট তনুলতা
পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে
সে প্রায়ই বিক্ষুব্ধ স্বরে আমাকে বলতো,
"আর কাউকে তুমি আদর কোরে কাছে টানলে
আমার ভীষণ রাগ হয়।"
আজই দুপুরে যখন ওর মৃত্যু হলো
ওরই প্রিয় বান্ধবী আকস্মিক আঘাতে
ভীষণ ভয় পেয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে
ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল।
বলেছিল, "তুমি আমাকে এখানে একা রেখে
শ্মশানে যেও না।"

ঘাটের ধারের কৃষ্ণচূড়া গাছটার মাথায়
একটা পেঁচা তিনবার ডেকে উঠলো।
মনে পড়ে গেল
মৃতার শূন্য ঘরে যে আমার প্রতীক্ষায় রয়েছে
সে আমাকে দিয়ে
তিন সত্যি করিয়ে নিয়েছে
যত রাতই হোক
যেন ওর কাছে ফিরে যাই।

অনুভব : ১৯৭০

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

যা কিছু ঘটছে চতুর্দিকে
সব মেনে নিতে
বুকে বড়ো কষ্ট হয়,
সমস্ত চোয়ালে রক্তে অস্থিরতা বাড়ে

এখন রক্তের নিচে
ভীষণ সন্দেহ দোলে,
অবিশ্বাস, দুঃসহ শূন্যতা ;
যেন বাগানে ঢুকেছে সাপ,
ফুলগুলো বিষাক্ত হাওয়ায়
ঝরছে নিঃশেষে
অবিরাম। অথচ এখন
পাশাপাশি চললেই দুঃস্বপ্নের শব
কাঁধ থেকে ছুঁড়ে ফেলা যায়
নিমেষেই। যাওয়া যায়
অভিভূত টানে
জলের উৎসের দিকে,
রৌদ্রের সত্তায়।
নষ্ট দিনগুলোকে আবার
ভুলে যেতে হবে। যে-রকম
দুঃস্বপ্ন ক্রমশ লীন
প্রত্যয়ের অমল আলোয়। যে রকম
দুষ্টক্ষত নিরাময় হলে
হেসে ওঠে সহিষ্ণু মানুষ ॥

কালো পৃথিবীর মানুষ

দক্ষিণারঞ্জন বসু

আলোড়ন ঃ অনাদি অনন্ত এক
আলোড়ন সর্বক্ষণ যেন
আমায় চারদিক থেকে ঘিরে আছে।
আমি তাই একটা অস্থিরতার বন্দী,
আন্দামানের পুরনো বন্দীর মতো।
আফ্রিকার যে কালো মানুষটিকে
আমি ভালোবাসি,

আমেরিকার যে নিগ্রো মেয়েটিকে
আমি ভালোবাসি —
আশপাশের শ্বেতাঙ্গদের প্রতি,
আমেরিকার শ্বেতাঙ্গদের প্রতি
আজীবন কী অসীম তাদের ঘৃণা।
আঘাতে আঘাতে, মনুষ্যত্বের প্রতি
আঘাতের যন্ত্রণায় বিমূঢ় তারা,
আকণ্ঠ তারা পূর্ণঘৃণার তীব্র বিষে।
আফ্রিকার সেই কালো মানুষটি,
আমেরিকার সেই নিগ্রো মেয়েটি
আমি যাদের নিজের মতো ভালোবাসি,
আমার সেই বন্ধুরা ঘৃণার উত্তরে ঘৃণায়
আকাশের দিকে তাকিয়ে অন্য
আর কিছু নয়, শুধু মাত্র ন্যায়বিচার ও
আত্মার অবমাননা থেকে
আন্তরিক আকুলতার মুক্তি চায়।
আদৌ এ দাবি উড়িয়ে দেওয়া চলে না ;
আমেরিকার ও ইয়োরোপের,
আফ্রিকার ও অস্ট্রেলিয়ার
আপামর শ্বেতাঙ্গ সমাজকে
আজ জোরের সঙ্গেই জানিয়ে দিতে হবে —
আজকের যুগে, এই বিংশ শতাব্দীতে
আমরা যারা কালো পৃথিবীর মানুষ
আর আমরা কিছুতেই সইবো না
আত্মার অবমাননা, মনুষ্যত্বের অপমান
আমরা আর মোটেই বরদাস্ত করবো না।
আলোড়ন : অনাদি অনন্ত এক
আলোড়ন সর্বক্ষণ যেন
আমায় চারদিক থেকে ঘিরে আছে,
আমি তাই একটা অস্থিরতার বন্দী।

ক্রুশবিদ্ধ মানুষের জন্য

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ঘুমের ভোরগুলি
নিবিড় হয়ে এলে
তোর মুখের স্মৃতি
আমাকে ছিঁড়ে ফেলে,

কেবলি ভয় হয়
যদি ও কুয়াসায়
তোর আঁধার লেগে
গোলাপ ঝরে যায় !

অঝোর বর্ষায়
ঘণ্টা বাজে শুনি
রক্তেভাসা মুখ
ধুয়ে কি দেবে খুনী ?

কেবলি ভয় হয়
তোর দু চোখে যা
গোলাপ কত লাল
কেউ সে জানে না,

অঝোরে বারি ঝরে
ঘণ্টা বেজে যায়
কে করে প্রার্থনা
তোর কী আসে যায় !

এক ধাপ, দু ধাপ

লোকনাথ ভট্টাচার্য

প্রথম জন। এক ধাপ, দু ধাপ, তিন ধাপ, পরেই কথাটা উচ্চারণ করার মুখেই···যাকগে, জানানোর কিছু নেই, দর্শক-গ্যালারিতে চোখের পাতা পড়েনি।

আকাশ কি বদলালো ?   হাত কাঁপল বেহালাবাদকের, আঙুল উল্টো পর্দায় ?

দ্বিতীয় জন। এক ধাপ, দু ধাপ, তিন ধাপ, পরেই…

তৃতীয় জন। এক ধাপ, দু ধাপ,·· ইত্যাদি

সারিতে চতুর্থ ছিলাম। এবার আমার পালা। পা টলছে না।

অচিরেই সূর্যাস্তের কনে-দেখা আকাশ পাল্টাবে রঙ, বেহালা থামবে। যজ্ঞ শেষ হলে টিকিটের অর্ধাংশ ছিঁড়ে ফেলে যে-যার রাত্রিতে ফিরে যাবে, প্রিয়ার চাহনিতে স্নিগ্ধ হতে।

শুধু যতক্ষণ না শকুনের কারুণ্য পায়, ক্রমশই ঘন হয়ে নামা বোবা অন্ধকারে এখানে থাকবে পড়ে চোখ-খোলা চারটে শব, শিরশিরে হাওয়ায়—ও শকুনের ঘ্রাণের বাইরে, জীবন্ত অনুচ্চারিত এক কথা।

তবু আজ বাঁচি

কৃষ্ণ ধর

কঠিন সময় তার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে বাহু
উদ্বিগ্ন মানুষ যাদের একদিন জেনেছি আপন
এই বাঙলাদেশে, জেনেছি যাদের গাঢ়তম প্রেমে
আজ কেন মনে হয় দুঃসময়, গ্রাস করে রাহু ?

এই ফুলগুলি আমাদেরই, এ উদ্যান আমাদের চেনা
বকুলফুলের মালা গাঁথা হলে, প্রেয়সীকে দেবো
মুখশ্রী শ্যামল তার বাঙলার নদী প্রান্তরের
নম্রজল, তপ্ত অশ্রু, টলমল—শোধ করি দেনা।

জানি আমরা একদিন অন্তরঙ্গ ছিল এই মাটি
মানুষের, পৃথিবীর ঘ্রাণে, তৃণে সমর্পিত আশা
মিশেছিল প্রার্থনায়, তার থেকে জন্ম নিয়ে এসে
আনন্দিত সূর্যকর, জ্যোৎস্নার অমলতায় হাঁটি।

এইভাবে আমরা সব ভালবাসা নিয়ে আজ বাঁচি
প্রত্যহের স্বপ্ন নিয়ে আগামীকালের কাছাকাছি।

শ্রেণীশত্রু

অসীম রায়

সিগারেট কিনতে গিয়েই শ্রেণীশত্রুকে দেখতে পায় সে। আর দেখামাত্র পিঠের শিরদাঁড়া শিরশির করে উঠল। রমেনও দড়ির আগুনে সিগারেট ধরাতে ধরাতে তার দিকে আড়চোখে চায়। নারকেল দড়িটা ঠিকসময় না সরানোয় আগুনের ফুলকিগুলো হাওয়ায় উড়ে এসে তার শার্টে পড়তেই সে একটা কথা বলবার ছুতো পায়।

'ষাঃ! শার্টটা পুড়ে গেল!' শার্ট ঝাড়তে ঝাড়তে বলে রমেন।

নন-র গলা দিয়ে কথা বেরোয় না। প্ল্যাটফর্মের সীটে সেণ্ট্রাল রিসার্ভ পুলিশগুলোর দিকে এক নজর চেয়ে রমেনের গলার দিকে তাকায়। এখনই খতম করা যায় না, খালিহাতে? প্রশ্নটা মনের মধ্যে আসতেই নন আড়ষ্ট হয়ে পড়ে। কিন্তু এক প্রবল সম্মোহনে রমেনের গলার দিকে চেয়ে থাকে।

রমেন এতক্ষণ পর সিগারেটে টান দেয়। এক গাল ধোঁয়া সেই নিঃশব্দ ভাষাময় চোখদুটোর দিকে ছুঁড়ে বলে, 'বাড়ি?'

'হ্যাঁ।'

তারপর দুজনের কোনো কথা থাকে না। অথচ এক প্রবল আকর্ষণে দুজনে দুজনের প্রায় গায়ে গায়ে সেঁটে থাকে। এতক্ষণ পোঁ পোঁ করে একটা মশা উড়ছিল। সেটা নন-র ঘাড়ে কামড়াতেই সে নিজের ঘাড়ে থাপ্পড় দেয়। রমেন দুহাত পেছনে ছিটকে আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে দাঁড়ায়। কেউ হাসে না। রমেন হাত নামিয়ে নিচু গলায় বললে, 'আমি ভাবছিলাম তুই আমায় স্ট্যাব করবি।'

'তুই এখন কোথায় চলেছিস?' ঠাণ্ডা নিষ্প্রাণ গলায় নন প্রশ্ন করে।

'আমি? আমি তো এই এলাম। এই···এই সাতটা চল্লিশ ধরব বলে।' রমেন যেন একটু বেশি তাড়াতাড়ি জবাব দেবার চেষ্টা করে।

'আচ্ছা আর্য।'

কলকাতাগামী সাতটা চল্লিশের আওয়াজ আসে। বেশি যাত্রী নেই শহরে,

ফেরার ট্রেনে। নন-র ট্রেন সাতটা তিরিশের যাত্রীতে এখনও স্টেশন অঞ্চল গিসগিস করছে। স্টেশনের গায়েই, খোলাবাজারে কলোনিমুখী যাত্রীরা কেউ লাউ কিনছে, কেই চালের দর করছে। নন আবার প্ল্যাটফর্মের দিকে ফিরল। মেঘ ডেকে ওঠে। বর্ষার ঠাণ্ডা হাওয়া ছেড়েছে। প্লাটফর্মের কোণে বেঞ্চিতে কাত হয়ে রাইফেল আঁকড়ে দুটো সেপাই ঘুমোচ্ছে। নিওন আলোয় দুটি তরুণ ছেনতাইয়ের অপেক্ষায় বাঙলা কাগজ পড়ছে। নন-কে তারা বোধহয় চেনে। নন এগিয়ে আসতেই তারা কাগজে মুখ ঢাকে।

ট্রেনটা ছাড়ছে। রুটি চাওয়ালার ফাঁকে ফাঁকে রমেনকে খোঁজে নন। রমেন নিশ্চয় মিথ্যে বলেছে। নন বোঝে কলকাতা যাবার জরুরি প্রয়োজন থাকলেও সে ফিরে আসবে। কারণ নন আর রমেন যে এক নতুন গাঁটছড়ায় আবদ্ধ। এই গাঁটছড়া থেকে মুক্তি পাবার জন্যে সে গত তিন সপ্তাহ পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে না? রমেন তাদের দলের মধ্যে সবচেয়ে ধূর্ত, দক্ষ ও কর্তব্য-পরায়ণ। মুখের খাবার ফেলে পালিয়ে যাবার ছেলে সে নয়। এটা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ রমেন কলকাতায় না ফিরে তাদের কলোনিতে ফিরে গেছে তাদের ডেরায়।

নিওন আলোয় আলোকিত প্ল্যাটফর্মটায় থমকে দাঁড়ায় নন। ঠিক দ্বীপের মতো লাগে স্টেশনটাকে। স্টেশনটার আশপাশের ছোট রাস্তা দোকান-পাট, অনতিদূরে বিস্তীর্ণ যশোর রোড, স্পিনিং মিলের লম্বা জলেপচা ধূসর পাঁচিল এগুলো সবই এই দ্বীপের অংশ। নন-র একবার চিন্তা আসে এই দ্বীপেই এই রাতটা কাটিয়ে ভোরে কলোনিতে ঢুকে বউকে দেখেই সকাল সকাল ফিরে যাবে। কিন্তু এক ঝটকায় এই সব চিন্তাগুলো মন থেকে সরিয়ে স্টেশন থেকে বেরিয়ে আসে।

সামনেই ব্রজবাবু, নিতাই চলেছে। কোনো সরকারী অফিসের স্টেনোগ্রাফার। এখানকার আদি বাসিন্দেদের মধ্যে অন্যতম। সরকারী অফিসের নেলী ও বেলাও চলেছে। একটু এগিয়ে ওরা সাইকেল রিকশা ধরে। ব্রজ আর তার ভাই নিতাই যশোর রোডে পড়েই জোর কদমে এগোয়। সেদিকে চেয়ে মনে মনে হাসে নন। এইসব নন-পলিটিকালদের কাণ্ড দেখে তার করুণা হয়। এইরকম ইঁদুরের মতো বেঁচে থেকে কী লাভ? একবার ইচ্ছে হয় 'ব্রজদা' বলে হাঁক দেয়। কিন্তু তাহলেই তার যেতে দেরি হয়ে যাবে। ব্রজদা হয় তাকে দেখে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দেবে, নইলে তাকে স্টেশনে ফিরে যেতে

অনুনয় করবে। অন্তত তাদের সঙ্গ নিলে ব্রজদা যে আর্তকণ্ঠে ককাতে থাকবে এটা নিশ্চিত। 'আমরা নন ছাপোষা লোক, আমরা দশটা-পাঁচটা করি। বাজার করি, ছেলে পড়াই। আমাদের কেন টানছ ভাই? আমরা একটু এগিয়ে যাই নন, তারপর তুমি এসো, কেমন।' নন সশব্দে হেসে ওঠে। আর তার হাসিতে পাকিস্তানমুখী একটা লরির হিন্দুস্থানী ঝাঁকাওয়ালা তার দিকে গলা বাড়িয়ে দেখে। পরক্ষণই লোকে টলমল বাসটা তার গা দিয়ে বেরিয়ে যায়।

ম্লান চাঁদনি রাস্তায়। নন একটু সরে দাঁড়ায়। একদল অফিস ফেরতা লোক তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়। একটা হিসেব হঠাৎ অহেতুকভাবে নন-র মাথায় নড়ে ওঠে—বারো হাজার ট্রেনের মান্থলি তাদের কলোনি থেকে প্রতি মাসে কাটা হয়। এই সব হিসেব, সামাজিক বিবরণ, গ্রাম-শহরের অর্থনীতির ইতিহাস—এগুলো ব্যাঙের ছাতার মতো এখনও সারা গায়ে তার গজিয়ে আছে। বারেবারে গা রগড়িয়েও এগুলো তুলতে পারা যাচ্ছে না। আর এর জন্যে একজনকেই মনে মনে আসামী করে নন, স্থানীয় স্কুলের হেডমাস্টার। লোকটা পলিটিক্স করতে করতে বসে গেছে, কিন্তু এই তীব্র শ্রেণীসংগ্রামের যুগেও সমান দাপটে চালিয়ে যাচ্ছে। নন মেহগেনির ছায়ায় থুতু ফেলে। তারপর মুখ তুলে চায়। পাশে রঙধোয়া বিস্তীর্ণ স্পিনিং মিলের পাঁচিল আর মাথার ওপরে চাঁদনির জালিকাটা মেহগেনির সারি। এই বিরাট, ঘেরওয়ালা গাছগুলোর নিচ দিয়ে যেতে যেতে পরম নিশ্চিন্তে দীর্ঘশ্বাস ফেলে নন। অবিভক্ত বাঙলাদেশের প্রতিভূ এই যশোর রোডের মেহগেনিগুলো আজ শ্রেণীসংগ্রামের বিজয়কেতন। এরই আড়াল থেকে তার সহকর্মীদের পিস্তল অবিরত অগ্নিবর্ষণ করেছে পুলিশের ওপর। একটু দূরেই পায়ের শব্দে চোখ তোলে নন। তাদের দলের স্কোয়াড বেরিয়েছে। সবকটি ছেলেই তার চেনা, বলতে গেলে তারই হাতের তৈরি। কলোনির বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে যশোর রোড পর্যন্ত তারা সন্ধ্যের পর টহল দিয়ে বেড়ায় শ্রেণীশত্রু খতম করার জন্যে। নন-র নিজেকে অসম্ভব দোষী লাগে। তিন সপ্তাহ আগেও সে এই স্কোয়াডের নেতা ছিল। কিন্তু তারপর তাকে পালিয়ে যেতে হয়েছে রমেনদের জন্যে। তার বাড়ির একটা দিক ছাড়া আর তিন দিক জুড়ে রমেনদের পার্টি তাদের ডালপালা মেলে ধরেছে। নইলে এ-অঞ্চল তাদের অঞ্চল, বলতে গেলে মুক্ত অঞ্চল। এ-অঞ্চলে রমেনদের স্থান নেই। নন মেহগেনির ছায়ায় দৃঢ়মুষ্টি হয়ে দাঁড়ায়।

'কে যায়?' পরিমলের গলার আওয়াজ টের পায় নন। এবার হায়ার সেকেণ্ডারি দিয়েছে। তাজা টগবগে ছেলেটা তার দৃঢ়তা ও ক্ষিপ্রতায় সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য লাগে নন-র কাছে।

'আমি ব্রজ, ব্রজ ভট্‌চাজ। আমার ভাই নিতাই।' প্রায় কান্নায় বোজা ব্রজদার গলার স্বর।

'চলে যান।'

পরিমলকে দেখা দিয়ে সে কী বলবে? বলবে, তিন সপ্তাহ পালিয়ে থেকে আর থাকতে পারল না? অনেক চেষ্টা করেও আসন্নপ্রসবা স্ত্রীর কথা ভুলে থাকতে পারল না? তাই এই সন্ধ্যায় একটা ব্যবস্থা করতে যাচ্ছে যাতে তার অবর্তমানেও তার প্রথম সন্তান খালাস করার সুবন্দোবস্ত হয়! কিন্তু কিরকম একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার মনে হবে না? যখন সবাই জীবন মরণের সংগ্রামে লিপ্ত, যখন গাছের পিছন থেকে পিস্তল অগ্নিবর্ষণ করছে আর ডাল থেকে বৃষ্টির ফোঁটার মতো বোমা ঝরছে শত্রুর গায়ে, তখন এই ব্যক্তিগত অরাজনৈতিক সমস্যার স্থান কোথায়? তাছাড়া পরিমল নিশ্চয় বাড়ি ফিরতে দেবে না। অথবা তার সমস্ত স্কোয়াডশুদ্ধ নন-র বাড়ি উঠে আসবে। তার মানে এক অকারণ বৃহত্তর সংঘর্ষ রমেনদের সঙ্গে, আর রমেনরাও ঐটা চায়। পাড়ার আশে পাশের মাস্তান নিয়ে সেও জোরাল স্কোয়াড তৈরি করছে, হত্যার উৎসবে সে মেতেছে, সুতরাং এক অহেতুক অরাজনৈতিক সংঘর্ষে সহকর্মীদের ঠেলে দেওয়ার মতো হঠকারিতায় সে নামতে চায় না।

যশোর রোড ছেড়ে সরু ছোটো বিশ বছর আগেকার পিচদেওয়া এবং এখন এবড়োখেবড়ো কর্দমাক্ত প্রায় কাঁচা পথে নামে নন। এ-অঞ্চলটা তার শরীরের মতো তার কাছে মুখস্ত। বোধহয় চোখ বন্ধ করেও সে ঠিক বাড়ি পৌছে যাবে। অর্ধ-বৃত্তাকারে এই রাস্তা কলোনির কোন জায়গায় এসে সেই একশো ষাট ফুট চওড়া এককালীন এরোড্রোমের রানওয়েকে কাট করবে তা চোখ বুজে হাঁটতে হাঁটতে বলে দিতে পারে, যেমন সে অন্ধকারেও বড় বড় মেহগেনি-বট-অশত্থর জঙ্গলে ঢাকা মুখুজ্জেদের বাগান, পরাণের চায়ের দোকান টের পায়। এক কাপ চা খাবে নাকি? চিন্তাটা মাথায় আসতেই সেটা এক ঝটকায় সরিয়ে দেয়। বটগাছটার নিচে পেট্রোম্যাক্সের আলোর নিচে কয়েকটা মাথার দিকে এক নজর চেয়েই মুখ ফিরিয়ে হন হন করে

এগিয়ে যায় নন। একবার মনে হয় তার পিঠের ওপর পেট্রোম্যাক্সের আলোয় আলোকিত কয়েকটা চোখ জেগে আছে। তবে দিনের আলোয় দু-চারটে ছটকে পড়া রমেনদের দলের লোক ছাড়া সন্ধ্যের পর শত্রু শিবিরের লোক এদিকে বড় পা মাড়ায় না। এবার মুখুজ্জেদের বাগানের কাছে এসে সে এক ঝলক থমকে দাঁড়ায়। তারপর প্রায় এক শারীরিক আকর্ষণে এক পা এক পা করে বাগানের মধ্যে এগোয়। অযত্নে বর্ষায় আগাছায় নরম জমিটা থেকে একটা চেনা ভ্যাপসা গন্ধ ওঠে। দিন পনেরো আগে ঠিক এমনি ভ্যাপসা গন্ধ কে পেয়েছিল। সামনে মেহগেনি গাছ দুটোর গায়ে দাঁড়িয়ে কে অন্ধকারে জমিটার দিকে চেয়ে থাকে। এইখানে এক অলিখিত অসম সাহসী বীরত্বের কাহিনীর সে এখন নীরব সাক্ষী। এখানে তার সহকর্মীদের সঙ্গে লড়াই হয়েছিল পুলিশের। সে চোখের সামনে দেখতে পায় তার সহকর্মী নেতার অব্যর্থ সন্ধানী রিভলবারের মুহুর্মুহু অগ্ন্যুৎপাত। তারপর অসম যুদ্ধে নেতার মৃত্যু। বুক ভরে নিঃশ্বাস নেয় নন। সে ওসব মার্কসবাদী থিওরির কচকচি বোঝে না, বোঝে না লক্ষ লক্ষ লোকের করতালি মুখর বিরাট মিটিংয়ে নেতাদের আত্মতৃপ্ত বক্তৃতা। সে শুধু বোঝে এই জ্বলন্ত সংঘর্ষ—যেখানে ফুলঝুরির মতো আগুনের ফুল কাটতে কাটতে দু-পক্ষের প্রাণ ঝরে যায়। ভেজা মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে নন। মনে মনে ভাবে, ভালোই হয়েছে। এই রাত্তিরের অন্ধকারে বাড়িতে ফেরার দরুণই সম্ভব হয়েছে এ-বাগানে প্রবেশ। গত পনেরোটা দিন পুলিশের অত্যাচারে সমস্ত অঞ্চল তটস্থ ছিল। এখনও দক্ষিণ কোণেই পুলিশের তাঁবুর মাথা দেখা যায়। সে অন্ধকারে মৃত সহকর্মীর শরীরটা প্রত্যক্ষ করে। আর তার কল্পনায় আগুনের জ্বলন্ত পাহাড়ের মতো ঝলমল করে সেই গুলি-ঝাঁঝরা দেহখানা। বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে নন দাঁড়ায়। সামনের রাস্তাটা পুলিশ ক্যাম্পের গা দিয়ে. সেদিকে না এগিয়ে নন বাগানের আর এক প্রান্তে ইটখসা হাঁটুসমান পাঁচিল টপকে কলোনির আর এক রাস্তায় পড়ে। পাড়াটা অন্ধকার। গত পনেরোদিন আগের ঘটনাটা ঘটবার পর থেকেই এ-পাড়ার লোকেরা আলো জ্বালে না, জানলাগুলোও বন্ধ।

এবার সেই পুরনো বিস্তীর্ণ রানওয়ে। জ্যোৎস্নায় নিষ্প্রদীপ রাস্তাটা বেঁটে বেঁটে কয়েকটা গাছ মাথায় নিয়ে ভুতুড়ে দেখায়। একটাও লোক নেই রাস্তায়।

নন-র মেজাজটা খারাপ হয়। এত দমে যাবার কি হয়েছে ? ঐ তল্লাটে কিছু জোয়ান ছেলে ধরা পড়েছে, পুলিশের ঠেঙানি খেয়ে কারুর হাড়গোড় ভেঙেছে, তাতে হয়েছে কি ? বিপ্লব কি ড্রইংরুমের গুলতানি, খবরের কাগজে জ্ঞান দেওয়া ? বিপ্লব মানেই সংঘর্ষ, অবিরত সংঘর্ষ। এইরকম কতগুলো কথা, কতগুলো যুক্তি, কতগুলো শোনা কথা, কতগুলো নিজের কথা এক সঙ্গে তার মাথায় ধাক্কা মারে। মনে মনে মন্ত্রের মতো কথাগুলো অওড়ায়—ঠিক, বছরের পর বছর সংঘর্ষের আগুন জ্বালিয়ে যেতে হবে, কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে, হ্যাঁ, কোনো ক্ষয়ক্ষতির হিসেবনিকেস না করে। নন চট করে বাঁ-দিকে মোড় নেয়। সামনেই স্কুল, তার গায়েই একতলা আলোকিত তুখানা ঘর। হেডমাস্টারের বাড়ি। নন গতি বাড়িয়ে দেয়। বাড়িটা যখন প্রায় পেরিয়ে এসেছে তখন বারান্দায় একটা মূর্তি দেখা দেয়।

'কে ?'

স্বধীরবাবুর ডাক। নন এক মুহূর্ত চিন্তা করে, ফিরবে কি ফিরবে না।

'নন না ?' চাপা গলায় স্বধীরবাবু ডাকেন।

আর এক প্রবল আকর্ষণে নন পেছন ফেরে। ঠিক যেরকম আকর্ষণে সে মেহগেনি বনে ঢুকেছিল তেমনি এক প্রচণ্ড শারীরিক আকর্ষণে সে থমকে দাঁড়িয়ে মুখ ফেরায়। স্বধীরবাবু এগিয়ে আসেন। গেঞ্জি আর লুঙ্গিপরা লোকটার মুখে জ্বলন্ত বিড়ি।

'এত রাত্তিরে ফিরছিস ?'

'কাল সকালেই চলে যাব।'

'দীপাকে আমরা ডাক্তার দেখিয়েছি। বেলার জন্যে তোর কোনো ভাবনা নেই। তুই ফিরে যা।'

'কেন ফিরব ?' নন হঠাৎ রুখে দাঁড়ায় তার মাস্টার মশাইয়ের সামনে। 'আপনি বলবেন বলেই ফিরে দাঁড়াব ? আপনি ভাবছেন আমি আপনার সেই ক্লাস নাইনের নন। আপনার উপদেশগুলো আপনার অন্য ছেলেদের জন্যে রেখে দেবেন। রমেনকে বলবেন। সে আপনার কথা শুনবে।'

চাপা রাগী শোনায় স্বধীরবাবুর গলা, 'তোর ফিরতে হবে। কেন ফিরতে হবে জানিস না ? সমস্ত অঞ্চলটা তো দাঙ্গার সময় হিন্দু-মুসলমানের মতো ভাগ করেছিস। এপাড়ায় রমেনদের মারছিস, ওপাড়ায় রমেনরা তোদের মারছে। এই শ্রেণীসংগ্রাম কদ্দিন চলবে নন ? কদ্দিন এই তাজা

রক্ত ঝরবে কলোনিতে ? এই কাদায় সাপের কামড় খেয়ে ভাড়াটে গুণ্ডাদের সামনে দাঁড়িয়ে কলোনি বানিয়েছি, দোরে দোরে ভিক্ষে করে ইস্কুল বানিয়েছি। কত কাজ আছে করার নন, কত কাজ! তুই রমেন আমার সব হীরের টুকরো ছেলে। মনে আছে, তুই যেবার ফার্স্ট নন সেবার সেকেণ্ড, রমেন যেবার ফার্স্ট তুই সেবার সেকেণ্ড। তোরা নিজেদের মধ্যে লড়াই করে শেষ হয়ে যাচ্ছিস নন।'

একটা বৃদ্ধলোক যেন অন্ধকারে এক ক্ষোভের গান গাইছে, এক দীর্ঘ আশাভঙ্গের সেই বিলাপে রাগে নিশপিশ করে নন। বিদ্রূপের হাসিতে তার সরু মুখখানা আরো তীক্ষ্ণ লাগে। আস্তে আস্তে বলে, 'আসলে তো স্যার আপনি বুড়ো হয়ে গেছেন।'

'তার মানে এসটাব্লিশমেণ্টের সঙ্গে এখন আপোষ করতে আমি বাধ্য, তাই না ?'

'ঠিক তাই।'

'রাস্কেল! তুই আমাকে এ-কথা বললি, কলোনির কোনো লোক এ-কথা বলবে না।'

ধীরে শান্ত গলায় নন বললে, 'আপনি অহেতুক চেঁচাচ্ছেন স্যার। আপনাকে আমরাও—হ্যাঁ, কিছুটা শ্রদ্ধা করি। কিন্তু চারপাশে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে যে-বিপ্লব চলেছে, আপনি সে-সম্পর্কে কী ইণ্টারেস্ট দেখিয়েছেন ?'

'আমি তোর চ্যালেঞ্জ নিতে রাজী আছি, তুই যদি কথা বলিস, যদি মন্ত্রের মতো শ্রেণীসংগ্রামের কথাগুলো জপ না করে'…

'স্যার'…

'মারবি ?' লুঙ্গিপরা বৃদ্ধটি এগিয়ে আসে। তার শীর্ণ পোড় খাওয়া মুখের ভেতর থেকে জ্বলজ্বলে চোখ দুটো তার প্রিয় ছাত্রের মুখখানা নিরীক্ষণ করে। এবং এক ক্ষোভ ও ব্যর্থতায় নন ভেতরে ভেতরে নিশপিশ করে। এই স্মৃতির আগাছাগুলো সে ছেঁটে ফেলতে পারছে না বলে নিজেকে ব্যর্থ বোধ করে। সে কেন দাঁড়িয়ে পড়েছিল সুধীরবাবুর ডাকে তার কারণ তার পঁচিশ বছরের জীবনটার বেশির ভাগ অংশ এমন আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলেছে লোকটা নিজের জীবনের সঙ্গে যেমনভাবে অগণিত কলোনির ছেলেদের জীবন জড়িয়ে ফেলেছে। সেই স্মৃতির অক্টোপাসের শুঁড়ে সে আটকা পড়ে গিয়েছিল। সেই সাদা চুলভর্তি মাথাটার দিকে চেয়ে নন-র

হঠাৎ মনে পড়ে যায় একদা সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসের শেষে স্তালিন-বর্ণিত গ্রীক-পুরাণের নায়ক অ্যান্টিয়াসের সঙ্গে সে মনে মনে সুধীরবাবুর উপমা খুঁজেছিল। বস্তুত বসুন্ধরার সঙ্গে সেই পৌরাণিক নায়কের শারীরিক সম্পর্কের মতো সুধীরবাবু একেবারে আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছেন কলোনির ছেলেগুলোর সঙ্গে নিজেকে। কিন্তু আজ রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রবল সম্পর্কের চেহারাটা নন-র কাছে পাল্টে গেছে। এই টান ছিঁড়ে বেরোতে হবে। তার জন্যে নিজেকে কষ্ট পেতে হলেও কিছু এসে যায় না। আসল কথা হলো স্মৃতির জাল কাটতে হবে। তার শৈশব, তার কৈশোর, তার এমন যৌবনের দিনগুলো দরকার হলে পা দিয়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

সুধীরবাবু একেবারে তাঁর ছাত্রের গায়ের কাছে এগিয়ে আসেন, যেন তিনি আলিঙ্গনে আবদ্ধ করতে চান নন-কে। নন এক পা সরে আসে। এবার পাতলা মেঘের আস্তরণে জ্যোৎস্না ঢাকা পড়ে। ভিজে ঠাণ্ডা হাওয়া বয়। অন্ধকারে বিলাপের মতো শোনায় সুধীরবাবুর গলা, 'আটটা খুন, শুধু নিজেদের মধ্যে মারামরি করে।'

'নটা স্যার। ওরা চারটে মেরেছে, আমরা পাঁচটা।'

'আমরা কোথায় যাচ্ছি নন?'

'আপনি স্যার বসে গেছেন। সরে দাঁড়ান। এর মধ্যে থাকবেন না। এর মধ্যে থাকলে পক্ষ নিতে হবে।'

'নইলে নয়ের ওপর দশ হবে, এই তো?'

'আপনাদের সময় এখনও আসেনি স্যার।'

'সে তোরা যা করার করবি। কিন্তু আজ তোর ফেরা হচ্ছে না।'

নন ভুরু কুঁচকায়। লোকটার এই ক্ষমতা কোথা থেকে আসে তাকে হুকুম করার? হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে নন, 'রাজনীতি আপনাদের মতো ভালো মানুষদের জন্যে নয়। ঐ সব উদারনৈতিক ভালোমানুষদের যুগ চলে গেছে।'

চাপা গলায় সুধীরবাবু বললেন, 'ঠিক উল্টো নন, ঠিক উল্টো নন। নিজেদের দিকে চেয়ে কথা বল। তোরা রাজনীতিতে এসেছিস কিসের জন্যে? রাজনীতির চেহারা পাল্টে ফেলার জন্যে। তোরাই তো আশা! তোরাই তো বিশ্বাস আনবি লোকের মনের মধ্যে। বুড়োদের ফিকিরফন্দি সবরকম ফেরেপবাজি তোরা উল্টে-পাল্টে দিবি। রাজনীতির ইমেজ আজ পাল্টে দিতে হবে।'

অন্ধকারে সোঁসোঁ করে হাওয়া দেয়। রাস্তার পাশে বেঁটে গাছগুলোও নড়েচড়ে। আবার চাঁদ জেল্লা দেয় সুধীরবাবুর পাকা চুলে। আর নিজের অতীত থেকে, বলতে কি নিজেকে নিজের কাছ থেকে হ্যাঁচকা দিয়ে নন পেছন ফেরে। ঝড়ো হাওয়ায় তার 'চললাম স্যার' একটা ঝাপ্টার মতো মুখে লাগে সুধীরবাবুর।

আরও সাত মিনিটের পথ। এ-কলোনির রাস্তার অসংখ্য শিরা-উপশিরা এই আলো-আঁধারে ঝড়ো হাওয়ায় কিছুমাত্র অস্পট নয় নন-র কাছে। 'আগাছা কাটো, আগাছা কাটো', নিজের মনে বিড়বিড় করে ওঠে নন। আর সুধীরবাবুর মতো মোটা ঝাপড়া তেজাল আগাছার সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরের সঙ্গে লেপ্টে থাকা আর একটা আগাছার কথা তার মনের মধ্যে নড়ে ওঠে। দীপার প্রত্যক্ষ শারীরিক উপস্থিতিটা সে কিছুতেই চেঁছে চেঁছে তুলে ফেলতে পারছে না তার মন থেকে, তার শরীর থেকে। দীপা তার প্রায় তারই সমান লম্বা পাটজোয়ান চকচকে কালো শরীরখানা নিয়ে সর্বক্ষণ তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে, কথা বলছে। ঠিক এ-রকম জানলে সে বিয়ে করত না। দু-বছর আগেও সে কি জানত ভারতবর্ষে শ্রেণীসংগ্রাম এ-রকম অগ্নিবর্ষী রক্তক্ষয়ী রূপ নেবে? ভেবেছিল জনতার অর্থনৈতিক সংগ্রাম ধাপেধাপে রাজনৈতিক সংগ্রামে রূপ নেবে। তারই মধ্যে মানুষের বিবাহ, সংসারযাত্রা। কিন্তু রাজনৈতিক সংগ্রাম আজ যখন জ্বলন্ত, তাতে নেতৃত্ব দিতে গেলে আজ নেঙটা হয়ে দাঁড়াতে হবে। কলোনির শিরা-উপশিরা দিয়ে যেতে যেতে নন সেই রকম একটা রাজনীতির স্বপ্ন দেখে যা চল্লিশ বছর আগে বিনয়-বাদল-দীনেশরা স্বপ্ন দেখেছিল। পবিত্র এক শিখার মতো মানুষকে দাঁড়াতে হবে, সে যদি আগুন জ্বালাতে চায় তাহলে তাকে নিজে হতে হবে অগ্নিবৃক্ষ। নইলে বিপ্লবের দাবানল সম্ভব নয়। কাজেই মানুষের এই অন্তিম মুক্তিযুদ্ধে সুধীরবাবুর যেমন স্থান নেই, তেমনি স্থান নেই দীপার। তাহলে? তাহলে সে কেন প্রবল ঝুঁকি মাথায় নিয়ে তার বাড়ি ফিরছে?

আর একটা বাঁক নেয় নন। যতই বাড়ির কাছে এগোয় ততই তার মধ্যে দুটো মন একই সঙ্গে কাজ করে চলে। একটা মন তাকে সাবধান করে, আগাছাগুলো মন থেকে ছেঁটে বাদ দিতে আহ্বান জানায়, তার অপরিসীম দায়িত্বের কথা স্মরণে আনে। আর একটা মন তাকে ঠেলে নিয়ে যায় দীপার কাছে, দীপার সঙ্গে তার পরিচয়ের তিন-চার বছরের জগতে। দীপার

টেলিফোনে চাকরি হওয়া, তার বাড়িতে দীপার মিষ্টি পাঠানো, এ-নিয়ে তাদের বাড়িতে একটা সেকেলে তুফান, বিয়ের আগে তাদের মাঝেমাঝে কলকাতা বেড়ানো। নন-র বাবার মৃত্যু, তার নিজের চাকরি, এইসব জড়িয়ে মিশিয়ে এক প্রবল স্মৃতির তাড়না তাকে এই ঝড়ো হাওয়ায় সামনের দিকে ঠেলে দেয়। সে এখন স্পষ্ট দেখতে পায়, দীপা বসে আছে তার পরিবর্তিত বিশাল শরীরখানা বালিশে ঠেস দিয়ে। দীপার এক লাইনের চিঠির স্মৃতি 'তোমার এখন এদিকে না আসাই ভালো' আকস্মিক এক ব্যথার মতো টনটনিয়ে ওঠে। বস্তুত ঐ একটা লাইনই তার কাছে চ্যালেঞ্জের মতো দাঁড়িয়ে ছিল, রমেনদের নাকের ওপর তুড়ি দিয়ে সে যাবে। একমাত্র রমেন ছাড়া তার দলের কেউ কৌশলে তার সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারবে না। নিঃশব্দ বাড়িগুলোর দিকে চেয়ে চেয়ে একবার মনে হচ্ছিল নিরস্ত্র অবস্থায় আসা বোধহয় তার ঠিক হয়নি! কিন্তু পরমুহূর্তেই নিজেকে সে আশ্বস্ত করে, কলোনির মুখে ঢোকার প্রায় সমস্ত রাস্তাগুলোই তাদের দলের পাহারাধীন। অথবা পুলিশের কোনো না কোনো ছাউনির গা দিয়ে রমেনকে যেতে হবে। সেদিক থেকে সে নিশ্চিত। আর সে ভোরেই চলে যাবে। পাঁচটা সতেরোয়।

ঝিরঝির করে বৃষ্টি শুরু হয়। এই বৃষ্টিতে ফুটবল খেলার কথা মনে আসে নন-র। শুকনো মাঠে তার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারত না রমেন, কিন্তু ভেজামাঠে কাদায় তার সঙ্গে পেরে ওঠা মুস্কিল হতো। আর আশ্চর্য ড্রিবল করতে পারত রমেন। সেটা ছিল তার একই সঙ্গে দোষ-গুণ। তারপর থেকে রমেন ড্রিবল করতে করতেই গেল, খালি ফন্দি-ফিকিরের ড্রিবল, খালি কতগুলো কবিতার মতো স্লোগানের আওয়াজ তুলে শ্রেণীসংগ্রামকে ঠেকিয়ে রাখার ড্রিবল। আশ্চর্য ক্ষমতা নিয়ে রমেন আরও অনেকের মতো গেঁজিয়ে গেল। গেঁজিয়ে যাওয়া ছাড়া নন কী বলবে? সবই তো এখন বিপ্লবের নামে এক ক্লান্ত রুটিন। সবাই জানে এ-দৌড়ে কদ্দূর অবধি যাওয়া যাবে। পুলিশ থেকে মিল মালিক অবধি সবাই এখন ব্যস্ত রমেনদের সঙ্গে টার্মসে আসতে। আর রমেনরা তা নিজেরাই জানে। তাই তো তারা বর্তমান সমাজব্যবস্থার আর একটা নতুন খুঁটি। এ-নড়বড়ে ব্যবস্থাটায় এক ধাক্কা মারতে গিয়ে তারা আরও এর বনেদ পাকা করতে উদ্যত। আর তাদের এই রাজনীতির নাটকে সবাইকে ছিটেফোঁটা পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। সেইজন্যে অনেক লোক আসছে দলে-দঙ্গলে বিপ্লবের নামে, ভেজালে দেশ ভরেছে।

আর সুনীলবাবু স্যার? পলিটিক্সে নতুন ইমেজ আনার কথা যে বলে? কথাগুলো ঠিকই, কিন্তু সুনীলবাবু তো কখনোই তাদের সংঘর্ষের পথ মেনে নেবে না, দূরে থেকে দাঁড়িয়ে সেকেলে আদর্শবাদীদের মতো তাদের জখমে হাত বুলোবে, বড়জোর তাদের যুদ্ধের স্ট্রেচার বেয়ারার। এরকম লোকেরও হয়তো দরকার আছে—নন এ-ব্যাপারে ঠিক সিদ্ধান্তে আসতে পারে না। তার কাছে গোটা পৃথিবীটা দুটো নিরেট শিবিরে বিভক্ত। শত্রুদের সে স্পষ্ট চেনে, কিন্তু বন্ধুদের ব্যাপারে তার মনস্থির হতে এখনও বাকি।

পিঠ ভিজছে. এবার বাজারের আলো দেখা যায়। বৃষ্টিকে সে মনে মনে স্বাগত জানায়! বোমা সেঁতানোর সম্ভাবনা যথেষ্ট। বাজারে নিওন আলো, আলুর দোকানে ট্র্যানজিস্টরে বাজছে রবীন্দ্রসঙ্গীত। এক মুহূর্ত থমকায় নন। হঠাৎ কলকাতার সেই অবাস্তব জগতের কথা মনে পড়ে। এক দূর সম্পর্কের জ্যাঠার বাড়ি কালীঘাটে ছিল কয়েক মাস। সন্ধ্যের পর স্নান করে ফুলবাবুটি হয়ে বেরনো, রাস্তায় রাস্তায় গা-দেখানো মেয়েদের ভিড়, কলেজের সভায় গণতন্ত্র নিয়ে আলোচনা, হঠাৎ কোনো ফিল্ম নিয়ে উত্তেজনা, এগুলো কেমন ভুতুড়ে লাগে। এবার দুটো বাড়ি ছাড়তেই ব্রজবাবুর বাড়ি, একদম অন্ধকার, নিঃশব্দ খালি সামনের পেঁপে গাছ দুটোর আড়াল, পাতায় জল পড়ার আওয়াজ। নন নিঃশ্বাস বন্ধ করে আর একটা বাঁক নেয়। সামনেই তাদের বাড়ি। আর বেশি দূর এগোতে হয় না। রিভলবারের দুটো গুলির আওয়াজ আসে। তারপরই সারা কলোনি জুড়ে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামে। আর সেই বৃষ্টির আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে বাজারের আলুর দোকান থেকে কাননবালার গান ভেসে আসে, 'তার বিদায় বেলার মালাখানি আমার গলায় দোলে।'

খুনীরা খুনের জায়গায়

চিত্তরঞ্জন ঘোষ

না, রক্তের কোনো দাগ নেই।

সুমন এসে দাঁড়াল বটগাছটার তলায়। ডানহাতি একটা বড় ভুরকুণ্ড গাছ, পূবের দিকে একটা লম্বাটে স্বর্ণচাঁপা গাছ। মাটিতে ঘাস, কিছু আগাছা, কোথাও কল্লোলের রক্তের ছোপ লেগে নেই।

সুমন নিজের হাত দেখল। সেদিন হাতে রক্ত লেগেছিল। না, এখন নেই।

দোমড়ানো আগাছাগুলো এখন আবার স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। শুকনো বটপাতা ঝরে পড়ে আছে মাটিতে। চাঁপাগাছে ফুল ফুটতে সময় পায় না, ছেলেপুলেরা পেড়ে নিয়ে যায়। তাও মগডালের ফুলগুলো টক আঙুরফলের মতো বেঁচে থাকে। আর খুদে লুঠেরাদের হাত থেকে কোলে আঁচল চাপা দিয়ে দুটো-চারটে ফুলকে ঠিক আড়াল করে বাঁচিয়ে রাখে চাঁপাগাছটা। দিনের আলোয় তাদের চোখে পড়ে না। সন্ধ্যে হলে নির্ভয়ে ঘন গন্ধ ছড়ায়। এখনও সন্ধ্যে হয়নি। বিকেলের রোদটা মরছে। দূরে রঙ-কলের শেড আর চিমনি পশ্চিমী রোদে উজ্জ্বল, আর লালচে। রোদটায় যেন রক্ত গুলে গেছে। কিন্তু মাটিতে, ঘাস আর আগাছার যে-যায়গাটায় কল্লোলকে রড দিয়ে পিটিয়ে আর ছোরা দিয়ে কুপিয়ে খুন করেছে সুমনরা, সেখানটা পরিষ্কার। এই কদিনে দু-এক পশলা বৃষ্টি হয়েছে।

হ্যাঁ, এই। আমি বললাম। চিনিয়ে দিলাম। আমার সঙ্গে ছিল তিরিশ জন সুতা-কলের মজুর। সুতাকলের ইউনিয়ন আমাদের। সেখান থেকেই এসেছিল ওরা। হ্যাঁ, এই। হ্যাঁ, এই। কল্লোলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল দলটা। শালা, বাঞ্চোৎ। খিস্তি করছিলাম আমরা। কল্লোল রাতে বাড়ি ফিরছিল—মিটিং সেরে। ও চেঁচাবার আগেই আমরা ওকে টেনে হেঁচড়ে ছুটিয়ে নিয়ে গেলাম। আমাদের শিরার মধ্যে প্রতিহিংসার আগুন লকলক করছিল। শালাকে পুড়িয়ে মারো। আমাদের পার্টির একটি

ছেলেকে কল্লোলরা খুন করেছে। আমরা শ্রেণীশত্রু! আমরা সমাজবিরোধী! সেই খুনের বদলা। উড়িয়ে নিয়ে এলাম কল্লোলকে এই জায়গাটায়। লোহার রডগুলো ওর দিকে ছুটে এল। ঠেকাবার চেষ্টায় ও হাত তুলল। শালা হারামির বাচ্চাটা ভয় পেয়ে গেছে। ঠেকাতে গিয়ে ওর হাতের পাতা ফেটে গেল। আঙুলগুলোর ফাঁকে রক্ত। রডের পর রড। চার দিক থেকে। রক্ত কোথায় নেই, সর্বত্র. হাতে, মাথায়, মুখে, চোখে, সারা গায়ে। ঘাস আর আগাছা পিষে ও পড়েছে। কাতরাচ্ছে। আমার হাতের রডটা উঠছে, নামছে। শালার রক্ত নিয়ে আবার উঠে আসছে। রক্তের এক একটা চুমুক। রডটা রক্তে চুমুক দিচ্ছে। ওটার কষ বেয়ে রক্ত গড়িয়ে আমার হাতে পৌঁছচ্ছে। নেশা। উন্মাদ উল্লাস। পিটিয়ে চলেছি। শালা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ছাড়ব না। আমার কমরেডকে খুন করবি!

আমাদেরই একটা লোক আমাকে থামাল। তখন লোকটাকেই আমার রড-পেটা করতে ইচ্ছে হলো। কিন্তু লোকটা আমায় ছেড়ে কল্লোলের দিকে এগিয়ে গেল। তার হাতে একখানা ছোরা। মাংস-কাটা ছোরার মতো বার বার সেটা পড়তে লাগল কল্লোলের গলায়, কাঁধে, পিঠে, মুখে। ঠিক আছে। মার শালাকে। হাঁটু দুটো মুড়ে বাঁ হাতটা চিতিয়ে থোড়া মাংসের মতো রক্ত-মাখা কল্লোল পড়ে রইল।

ঐ ঘাস আর আগাছার জঙ্গলের মধ্যে। জায়গাটায় সুমন পা দিয়ে দাঁড়াল। এই জায়গাটাই তো? নাকি আর একটু ওধারে? তখন উত্তেজনায় সবই ঝাপসা দেখেছে সুমন। মনটাকে একাগ্র করে সে জায়গাটা খুঁজতে লাগল, সম্পূর্ণ অকারণে। প্রথম কিছুক্ষণ সে খেয়াল করল না যে এই প্রচেষ্টাটা উদ্ভট। কিন্তু খানিক বাদে এক সময় সে থেমে গেল। ভাবল —কেন খুঁজছি, সবই তো অকারণ। এখানে আসাটারই কোনো মানে নেই, খুনীরা নাকি খুনের জায়গায় বার বার ফিরে আসে। সুমন তো অন্তত এসেছে।

অবশ্য এ-জায়গাটা শুধু খুনের জায়গা নয় সুমনের কাছে। এখানে তারা বহুদিন আড্ডা দিয়েছে। আড্ডা অন্যত্রও দিয়েছে। রেস্তোরাঁয়; বাড়িতে। সুমন-কল্লোল ছাড়াও অন্য বন্ধুরা থাকত। বান্ধবীদের মধ্যে বেশি থাকত চন্দ্রা। সবাই এক ক্লাসের ছাত্র, এক পার্টির সদস্য। তারপর একদিন ঝগড়া বাধল। তর্ক। মারামারি।

সুমন। বিপ্লব আর পার্লামেণ্টারি রাজনীতির দু-নৌকোয় পা দিয়ে তোরা আসলে সুবিধাবাদের খেলা খেলছিস।

কল্লোল। দুটো জোতদার খুন করে তোরা বিপ্লব আনবি! হুঁঃ!

সুমন। আসলে আমরাই আনব, তোরা পার্লামেণ্টের খোঁয়াড়ে ঢুকে শুয়োর হয়ে গিয়েছিস।

কল্লোল। তোরা তো এক-একটা পাকা ক্রিমিনাল, অ্যাণ্টিসোস্থাল।

সুমন। রাখ, রাখ। তোদের মতো ডিজঅনেস্ট লোকের মুখে ওসব বাক্যি শুনতে চাই না।

বিকেলের আলো একটু একটু করে মরছে। ছেলেপুলেদের হাত-এড়ানো চাঁপার ফিকে গন্ধ আসছে। পায়ের তলায় আগাছা, কোনটা খুনের জায়গা, কোনটা আড্ডার জায়গা, কিছু খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

দল ভাগ হয়ে গেছে। সুমন আর কল্লোল আলাদা দুই দলে। দুই বন্ধু। দুই সহপাঠী।

হ্যাঁ, অনেক ভাবনা-কল্পনা-কর্মের সঙ্গী ছিল সে আমার। রাজনীতিতে একসঙ্গে দীক্ষা আমাদের। একসঙ্গে অনেক বই পড়েছি, সিনেমা দেখেছি, আড্ডা দিয়েছি। কল্লোলের বাড়িতে অগণ্য দিন গিয়েছি, ওর মা-র হাতের রান্না খেয়েছি। এখন হঠাৎ যদি মাসীমা—কল্লোলের মা—আমায় বলেন, 'সুমন, বাবা, তুই একাজ করতে পারলি?' তাহলে আমি কী জবাব দেবো?

কমরেড সুমন, অপরাধ বোধ কোরো না। মাথা উঁচু রাখো। তুমি কোনো অন্যায় করোনি। তুমি যা করেছ, বিপ্লবের স্বার্থে করেছ। বিপ্লবের যেখানে বাধা, সেখানে কোনো ক্ষমা নেই। কমরেড সুমন, তুমি একজন খাঁটি বিপ্লবী, সেইজন্যে গৌরব বোধ করো।

সুমন। কল্লোল, তোর টুঁটি ছিঁড়ে নেবো বলে দিলাম। তোরা আমাদের নামে পুলিশে খবর দিচ্ছিস।

কল্লোল। বাজে কথা।

সুমন। আমাদের খুন করে জোতদারদের রক্ষা করবার জন্যে রাইফেল বাহিনী বসিয়েছিস, সেটাও বাজে কথা, না?

কল্লোল। তোরা তো নাকি বিপ্লব করবি। তাহলে লড়ে নে।

সুমন। লড়েই নেবো। সেই লড়াইতে তোদেরও টুঁটি ছিঁড়ব।

কল্লোল। আরে ফুটানি রাখ। কুসুমপুরে কী হোলো দেখলি তো।

সুমন। হ্যাঁ, ওখানে তোরা দলে ভারী ছিলি—আমাদের কয়েক জনকে পিটিয়ে মেরেছিস। আর যেখানে দলে কম সেখানে পুলিশে খবর দিচ্ছিস। শালা পুলিশের পকেটে বসে-থাকা ইঁদুরছানা।

শুকনো একটা বটের পাতা হাওয়ায় ভাসছে, নামছে আগাছার ওপর। কতগুলো পাখি কিচিরমিচির করছে ভুরকুণ্ড গাছে। চাঁপা গাছটা গন্ধ মেখে দাঁড়িয়ে আছে। সুমন এর মাঝখানে।

খুনীরা খুনের জায়গায় ফিরে আসে। কেন আসে ?

দল ভাগ হওয়ার পর চন্দ্রা গিয়েছে ও-দলে। চন্দ্রার সঙ্গে যথেষ্ট ভাব ছিল সুমনের। ও ও-দলে যাওয়ায় দুঃখই পেয়েছিল সুমন। রাজনৈতিক মত একটা কারণ নিশ্চয়ই, দ্বিতীয় কারণ কল্লোলের সঙ্গে ওর হৃদ্যতা। কোনটা বেশি জোরাল ছিল তা সুমন জানে না।

ওরা তিনজনে অনেক সময় এক সঙ্গে বেড়িয়েছে, আড্ডা দিয়েছে, সিনেমা দেখেছে। একবার মেট্রোতে একটা রগরগে ছবি দেখার পর ময়দানে বসে ওরা ঘোরতর তর্ক করেছিল অপসংস্কৃতি প্রসঙ্গে। এই সব ছবিকে গালাগাল দেওয়া এবং দেখা—এই আত্মবিরোধ তাদের মধ্যে আছে এটা স্বীকার করতে তাদের কেমন অস্বস্তি ও বিরক্তি হয়েছিল।

তিনজন। মুখোমুখি। চীনে বাদাম। ভাঁড়ের চা। মাঠের ওধারে ধীর সূর্যাস্ত। তার আভায় চন্দ্রাকে সুন্দর লাগছিল।

ঐ তো সেই জায়গাটা। আশশ্যাওড়া গাছগুলোর এই পাশে। খুঁজে পেয়েছে সুমন জায়গাটা। প্রথমে কাত হয়ে পড়েছিল কল্লোল। তারপরে খানিক সময় ও ছটফট করেছে। অনেকটা জায়গা জুড়ে। তারপর মাংস খোড়ার সময় কাত হয়ে মুখ গুঁজে আর একটু ওধারে গিয়ে পড়ল। ছোরার কোপের জায়গায় হাঁ, হাঁ দিয়ে রক্তবমি হচ্ছে। সারা গায়েই রক্ত। কিন্তু চোখের পাশ দিয়ে যে-ধারাটা নামছিল, সেইটাই বেশি মনে আছে। মার, মার। চোখ, গাল, গলা, বুক, পেট। কোথাও যেন এক ফোঁটা প্রাণ না থাকে। কেটে ফেল, থেঁতলে দে সবটুকু প্রাণ। অসংখ্য গভীর ক্ষত। রক্ত। রক্ত।

এখন আগাছা ও ঘাসের গায়ে রক্ত নেই। বটের পাতা ঝরেছে রক্তের জায়গায়। খুনীরা খুনের জায়গায় ফিরে আসে, কী অর্থে লোকে এ-কথাটা বলে ? খুনের জায়গায় এসে তারা কি তাদের কাজটাকে যাচাই করতে চায় ?

সে কি তার নিজের মুখোমুখি দাঁড়ানোর চেষ্টা? অথবা এ শুধু কৃতকর্মের স্মৃতিটাকে নেড়েচেড়ে দেখার মোহ? কিংবা একেবারেই আলাদা এর অর্থ? খুনীরা একবার খুন করলে অসংখ্য পথে তার প্রতিক্রিয়া হতে থাকে—তাই শুরু করা মানেই খুনের কাছে বারবার ফিরে আসা।

আগাছা আর ঘাস। ওখানে একটা দেহ থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ে পড়ে সম্পূর্ণ নীরক্ত হয়েছিল দেহটা। আমি কি কারো দেহের কলসীটা ভেঙে সব রক্ত বার করে নিতে পারি? কী আমার অধিকার? আমি ভালো, আমার মত সঠিক, এই দাবির জোরে একটা লোককে কুপিয়ে তার সব রক্ত নিতে পারি আমি? কোন নীতির জোরে নেবো?

আমার রাজনীতি বলে—খুন করতে পারো বিপ্লবের স্বার্থে। একটি নারীকে যখন একটি পশু ধর্ষণোদ্যত, তাকে রক্ষা করবার আর কোনো উপায় খোলা নেই, তখন আমি হত্যা করতে পারি। যখন একটা লোক অন্য লোকের বুকের ওপর বসে তার রক্ত চোষে, তখন আমি তাকে হত্যা করব। অনেক পূজোয় পাশবশক্তিকে বলি দিতে হয়। বিপ্লবেও তাই। সেই বলি যদি ছোরা হাতে আমি নিজে দিই, তাহলে পাপ হয় না, পুণ্যকর্ম করছি বলে অন্তরে তৃপ্তি আসে। বিশুদ্ধ মনে আমি খুন করি কারণ আমার উদ্দেশ্য মহৎ। নিছক খুনী খুন করে ব্যক্তিস্বার্থে, লোভে, প্রতিহিংসায়। আমার হাতে এর আগে দুটো জোতদার খতম হয়েছে। কিন্তু তাতে এত চিন্তা আসেনি মাথায়। কিন্তু এখানে মনে হচ্ছে খুনটাকে জাস্টিফাই করা দরকার। যতগুলো কোপ মেরেছি, সবগুলোর ন্যায্যতা প্রমাণ করা দরকার। এইখানে দাঁড়িয়ে আমি চীৎকার করে বলতে চাই, 'এ-ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না রে কল্লোল।'

হঠাৎ শুকনো বটপাতায় একটু শব্দ হলো। আশশ্যাওড়ার গাছটা দুলে উঠল। আর একটি নারীমূর্তি যেন বাতাসে ভেসে এল একেবারে সামনে। চন্দ্রা।

চমকে উঠল সুমন। সঙ্গে লোকজন নিয়ে আসেনি তো বদলা নিতে? না, কেউ নেই। তাহলে? পুলিশে খবর দিয়ে আসেনি তো?

চন্দ্রা, তোকে আজ আর বিশ্বাস করতে পারি না। এতে বড় কষ্ট।

কমরেড সুমন, বিপ্লবের স্বার্থে এ-কষ্টকে মেনে নাও।

চন্দ্রা, তোকে নয় শুধু, নিজের দলেরও কাউকে কাউকে আমার সন্দেহ

হয়। তোরও নিশ্চয়ই নিজের দলের কোনো কোনো লোক সম্পর্কে হয়। বিপ্লব মানুষ হিসেবে আমাদের বড় করবে কথা ছিল। কিন্তু ছোট হয়ে যাচ্ছি, বদ্ধ লাগে। কী হতাশ লাগে। [illegible] লাগে।

[illegible] বুকে [illegible] কোনো ফুলের তীব্র সৌরভ। সূর্যাস্তের আলো পড়েছে চন্দ্রার মুখে। [illegible] সেই ময়দানের দিনের মতো [illegible] কিন্তু তোর চোখেও কী [illegible] উপচে পড়ছে অনর্গল তীব্রতায় উপচে পড়ছে, ঘৃণা, ঘৃণা, ঘৃণা। কোনো একজন [illegible] বলেছেন [illegible] আসলে [illegible] তার কথাটার [illegible] পাচ্ছি আমি।

হঠাৎ চন্দ্রা একটু এগিয়ে এল, একটা ঝাঁকি দিয়ে সুমনের ভেতরটা ঝটকা মেরে টান হয়ে উঠল। সাবধান কমরেড সুমন, সাবধান। সাপের মুখের সামনে [illegible] 'কোন' দিক দিয়ে ছোবলটা আসবে কে জানে। মুহূর্তে এক পা পিছিয়ে একটু সরিয়ে সতর্ক হয়ে দাঁড়াল সুমন। চন্দ্রার কাপড়ের আড়ালে পিস্তল বা ছোরা বা বোমা কিছু নেই তো? অথবা চিরন্তন মেয়েলি পন্থায় হঠাৎ কাছে এসে গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে চিৎকার জুড়ে, লোক জড়ো করে বলবে, এই লোকটা আমার ইজ্জত নিয়েছে।

কিন্তু চন্দ্রা থেমেছে। চোখ দুটো আস্তে নামাল খুনের জায়গাটায়। তার চোখের চাউনি এখন আর দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু সুমনের মনে হলো, চন্দ্রার চোখের পাতা কাঁপছে, ঐ কাঁপনে ঘৃণাগুলো হয়তো সব ঝরে গেল তার চোখ থেকে।

চন্দ্রা অনেক দিন পরে এখানে আমরা আবার তিনজন। তুই, আমি আর কল্লোল। না, কল্লোল নয়, মাঝখানে কল্লোলের খুনের জমি। না, তিনজন আমরা আর হব না, দু-জন। না, দু-জনও নয়। মাঝখানে ঐ খুনের জমি। এধারে আমি তোকে সন্দেহ করি। ওধারে তুই, তোর চোখে ঘৃণা, মাঝে জমিটা।

জমির ওপর কল্লোল কাতরাচ্ছে। যন্ত্রণার আর্ত শব্দ। মার, মার! কেটে ফ্যাল। মাংসের ওপর ভারী ছোরা পড়ছে। একটা বড় শত্রু খতম! রক্ত, রক্ত।

সুমন। ছোরার প্রতিটি কোপের ন্যায্যতা প্রমাণ করতে হবে তোমায় সুমন।

চোখ থেকে সুমন চোখ সরিয়ে নিল, আকাশে যেন চাঁপা আর চন্দ্রার ফিসফিস স্বর। 'কী ভাবছিস রে সুমন ?'

বাতাসের উত্তর, 'পুরনো কথা মনে পড়ছে রে চন্দ্রা।'

চাঁপার ফিসফিস। 'ক্লাস! ক্লাস পালানো! রেস্তোরাঁ! আড্ডা! এক সঙ্গে রাজনীতিতে নামা! বিপ্লবের স্বপ্ন দেখা!'

বাতাস। 'হ্যাঁ রে। মেট্রো! সূর্যাস্তের ময়দান! বেসুরো গলায় বিপ্লবী গান গাওয়া!

চাঁপা। 'কল্লোলদের বাড়িতে মাসীমার দেওয়া আচার খাওয়া!'

বাতাস। 'কলেজের স্ট্রাইক! ফাংসন!'

চাঁপা। 'এখন তোর কী ইচ্ছে করছে রে সুমন ?'

বাতাস। 'চন্দ্রা, ইচ্ছে করছে, তুই চোখটা বোজ, সূর্যাস্তের আলোয় লালচে টসটসে তোর মুখখানা দু-হাতে তুলে ধরে দেখি এইসব কথা কেমন আলোছায়ার বুনুনি বোনে তোর মুখে। বড় একা হয়ে পড়েছি রে চন্দ্রা। বিপ্লবের কাজে অনেকে মিলব ভেবেছিলাম। কিন্তু সব ব্যাপারই চাপা চাপা গোপন। উন্মাদনায় থাকলে বেশ থাকি। অন্য সময় বড় একা, তোর এখন কী ইচ্ছে করছে রে চন্দ্রা ?

সুমন তাকাল চন্দ্রার দিকে। তার চোখ দুটো সাপের মতো বিষিয়ে জ্বলছে। চাঁপার তীব্র গন্ধ নীরবে সাপের মতো হিসিয়ে উঠল, 'তোকে খুন করতে ইচ্ছে করছে রে সুমন। তোর আর আমার মাঝখানে এই জমিটায় ফেলে তোকে কোপাতে ইচ্ছে করছে। কুপিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে আমার হাত অসাড় হয়ে যাক।'

চুপ কর। তোর চোখ দুটো আমি গেলে দেব চন্দ্রা। সে আমি পারি তুই জানিস। আমার হাতে এখনও কল্লোলের রক্তের গন্ধ রয়েছে। আঃ! একটিও কথা না বলে শুধু ঐ চোখে তাকিয়ে আছিস। এখনও, এখনও!

হঠাৎ হৈ হৈ করে একটা চিৎকার। চমকে উঠল সুমন। রঙকলের মজুরদের একটা দল ছুটে আসছে। তাদের হাতে লোহার রড তলোয়ার। রঙ কলের ইউনিয়ন ওদের দখলে। ওরে শয়তানী, আমায় খুন করার জন্য এই ব্যবস্থা করে এসেছিস! আঃ, সত্যি তোর চোখ দুটো এতক্ষণ গেলে দিইনি কেন ?

কোমরে একটা অস্ত্র আছে সুমনের। সেটা দিয়ে অত লোকের সামনে

কী হবে! ঝড়ের বেগে এসে গেল ওরা। একটা ধাক্কায় সুমন পড়ল সামনের জমিটায়। কয়েকটা রড পড়ল মাথায়, পিঠে।

এর পরে আসবে তলোয়ারটা। রডের চোট খেতেখেতেও আমি মনের মধ্যে তলোয়ারটা দেখতে পাচ্ছি। কোপের পর কোপ। রক্ত, মাংসের কিমা, আমি আজকের কল্লোল। গোঙানির আওয়াজ আমার গলায়। ছটফট করছি।

'এ সে নয়।' এতক্ষণ কথা বলছিল বাতাস, পাতা, চাঁপা। কিন্তু এবার এই এতক্ষণে একটা কথা বলল চন্দ্রা, 'এ সে নয়।'

ঐ জনতাকে কী করে ঠেকাল কে জানে। ওদের পার্টির মেয়ে, চেনে-জানে কল্লোলের বন্ধু বলে, হয়তো তাই।

'চল, লক্ষ্মী কাফেতে আছে বোধহয় শালা।' ঝড়ের মতোই ছুটে চলে গেল দলটা।

সুমন ধুলো ঝেড়ে উঠল। বিশেষ কিছু হয়নি। মাথা ফেটে ঘাড়ের কাছে রক্ত পড়ছে। বাঁ-চোখের কোণটা ফুলে উঠেছে। শিরদাঁড়া সোজা করতে পারছে না। কয়েকটা জায়গায় ছড়েছে। জামার আস্তিন ছিঁড়েছে।

এখন সুমন কীভাবে কৃতজ্ঞতা জানাবে? চন্দ্রার হাত দুটো চেপে ধরবে? ওর কাছে গিয়ে একটু কাঁদবে?

কী করত সুমন কে জানে! একটু কাছে এগোতেই দেখল, চন্দ্রার সেই এক জোড়া চোখ। হিংস্র ঘৃণায় ঠিক আগের মতোই জ্বলছে। ডিজায়ার টু কিল। তাহলে খুন করল না কেন? বাঁচাল কেন? কিছুই বুঝতে পারে না সুমন। দুর্বোধ্য, দুর্বোধ্য। হাতে শিকার পেয়েও ফসকে গেলে বন্য পশুর যে উন্মত্ত ক্রোধ, তাই তখন চন্দ্রার চোখে। ছেড়ে দিয়েছে বলে সে হয়তো এখন নিজেরই টুঁটি টিপে ধরতে পারে। সুমনের এখন ইচ্ছে করছে তার প্রাণদাত্রীর চোখটা গেলে দেয়।

দাঁড়াল চন্দ্রার মুখোমুখি। ভাবল, চন্দ্রাকে ধরে একটা নাড়া দেয় জোরে কিন্তু নিজের হাতটা তুলে সে অনুভব করল, তার গা-হাত-পা এখনও কাঁপছে। মাংস-মজ্জা-স্নায়ুর কোন গভীর মূল থেকে কাঁপনটা উঠে আসছে।

চন্দ্রা, একটা কথা বল। আমায় গালাগাল কর। মার। খুন কর। শুধু ঐরকমভাবে তাকিয়ে থাকিস না। চাঁপার তীব্র ঘ্রাণ। ভুরকুণ্ড গাছে পাখি ঠোকরাচ্ছে। অন্ধকার হয়ে আসছে। আর একটু অন্ধকার হলেই

তোর চোখ আর দেখা যাবে না। হয়তো এখনই দেখা যেত না, যদি আমি একটু দূরে দাঁড়াতাম।

'চন্দ্রা, চলি।' বলল সুমন। এখন তার এ-জায়গা তাড়াতাড়ি ছাড়া দরকার। পেছন ফিরল। ফিরেই ভয় হলো — চন্দ্রা একটা ছোরা হঠাৎ পিঠে বসিয়ে দেবে না তো! নিজে হাতে খুনটা করবে বলেই হয়ত তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

চট করে ঘুরে মুখোমুখি হলো সুমন। চন্দ্রা ঠিক একইভাবে দাঁড়িয়ে আছে। যেন মরে শক্ত হয়ে গেছে, ঠেলা লাগলে পড়ে যাবে। শুধু চোখ দুটো নৃশংসভাবে বেঁচে আছে।

আমার এমন হঠাৎ ফেরা দেখেই ও বুঝেছে, আমি ভয়ে ও সন্দেহে ফিরেছি। লজ্জা হলো। হ্যাঁ, আমার প্রাণদাত্রী, আমি লজ্জিত, হ্যাঁ আমার বন্ধু, তোকে আমি ভয় করি, সন্দেহ করি। আর এই নিয়েই আমায় বেঁচে থাকতে হবে। কল্লোল মরে কি খুব ঠকেছে রে চন্দ্রা?

হঠাৎ একটা শব্দ। সশস্ত্র পুলিশের দুটো গাড়ি বন-বাদাড় পিষে বিদ্যুৎ গতিতে ছুটে এল। দ্রুত লাফ দিয়ে নামল জন কুড়ি পুলিশ। এক ধাক্কায় সুমনকে ফেলল কল্লোলের খুনের জায়গাটায়। হাতের রুল দিয়ে পেটাল। বাইরের চামড়াটা এরা ঠিক রাখবে। ভেতরটা পুড়িয়ে দেবে। মুখ থুবড়ে পড়ে সুমন কাতরাচ্ছে। 'এ সে নয়।' — কেউ বলল না। বললেও হয়ত কিছু কাজ হতো না এখানে। কিন্তু বলতে পারত, বাধা দিতে পারত। না, ওর তো আনন্দ হওয়ার কথা। অথবা, হ্যাঁ বোঝা গেছে, পুলিশে খবর দিয়েছে চন্দ্রাই।

এক হ্যাঁচকা টানে মাটি থেকে সুমনকে তুলল পুলিশরা। তাকে গাড়িতে ছুঁড়ে দেওয়ার আগে একবার সে চন্দ্রার মুখের দিকে তাকাল। চন্দ্রার মুখ এখন সন্ধ্যার অন্ধকারে একদম ঢাকা। কিছুই বোঝা যায় না, চোখ দুটো আড়াল পড়ে গেছে। ঐ চোখে এখন আগুন, না তৃপ্তির হাসি।

ঠোঁটের কষ থেকে রক্তটা মুছে নিল সুমন।

চন্দ্রা, তুই পুলিশে খবর দিয়েছিস! তুই আমায় খুন করতে চাসনি, বাঁচিয়ে রেখে মারতে চেয়েছিস। তবে জেনে রাখ আমি যদি ছাড়া পাই, তাহলে এই খুনের জায়গায় আবার ফিরে আসব আমি। আমার ছোরার মুখেই তোর শাস্তি পেতে হবে। আর যদি আমার ফাঁসির হুকুম হয়, তাহলেও জানবি আমি বিপ্লবী, ফাঁসির আগে আমার ওজন বাড়বে।

পুলিশের গাড়ি ঘাস পিষে চলেছে। চাঁপার তীব্র ঘ্রাণ। বটের পাতা নাচতে নাচতে নামছে। চন্দ্রার মূর্তি দূরে সরে যাচ্ছে, অন্ধকার, শুধু ওর মুখ নয়, ওর সর্বাঙ্গ ঢেকে ফেলছে।

আততায়ী

মিহির সেন

যেন সন্ধ্যায় কাউকে হত্যা করা হবে, সকাল থেকে চলেছ তার সতর্ক প্রস্তুতি।

সবুজ সুজনিটা বের করেছে রমলা। পাকিস্থান থেকে পাঠিয়েছিলেন ওর মা। বিশেষ অতিথি-অভ্যাগতদের জন্য সযত্নরক্ষিত থাকে বলেই এতদিন আছে। ফুলশয্যার রাতে অসংযত হাতের ধাক্কায় উপহার পাওয়া ফুলদানির একটা ভেঙে গিয়েছিল। ভাগ্যর ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্য, না, ঘরে আর ফুলদানি নেই বলেই কে জানে, অন্যটি আলমারি থেকে বের করেছে আজ। ঝুল ঝেড়েছে ঘরের। ময়লা জামাকাপড়ে এলোমেলো আলনাটা সরিয়ে দিয়েছে ঘর থেকে।

একটা নিঃশব্দ ছায়া হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে রমলা। আসন্ন সন্ধ্যার আয়োজন সারছে। কিন্তু সমগ্র সত্তা এখন চিন্তার গভীরে স্থিত, চোখের দৃষ্টি তার প্রমাণ। প্রতি অঙ্গ সঞ্চালনে এক করুণ গাম্ভীর্য।

সকাল থেকে নিঃশব্দে বসে বসে লক্ষ্য করছে অবিনাশ। ষড়যন্ত্রের যে-অধ্যায়ে এলে অবান্তর কথা বলায় অনীহা জন্মে, সেই অধ্যায়ে উপনীত ওরা। মাঝেমাঝে অবশ্য দুই বছরের রিঙ্কুর সঙ্গে বাধ্য হয়ে দু-একটা কথা বলতে হচ্ছে। পুতুলের সংসার নিয়ে বিপদগ্রস্ত মেয়েটাকে দু-একটা সমাধানও বাতলে দিতে হচ্ছে। কিন্তু এটুকু উচ্চারিত শব্দেও যেন বিরক্তি।

অথচ কাল রাত পর্যন্ত ওদের সিদ্ধান্ত ছিল, ব্যাপারটা যখন কিছুই না, তখন ছেলেখেলার মতো সহজভাবেই গ্রহণ করা হবে অধ্যায়টিকে। রোজের সকাল-বিকেল-রাত্রির মতোই নির্বিশেষ একটি সন্ধ্যা হিসেবেই গণ্য করবে ওরা আজকের সন্ধ্যাটাকেও। সংসারের অগণিত সমস্যাকে যৌথ প্রচেষ্টায় এভাবে বা ওভাবে যেমন করে মিটিয়ে ফেলে, এই সমস্যাটাকেও সেই ভাবেই, বড়জোর একটি নতুন উপায়ে, মিটিয়ে নিচ্ছে ওরা ; তার বেশি কিছু নয়।

কিন্তু সকাল থেকেই ওরা অনুভব করতে পারে, এত সতর্ক প্রস্তুতি সত্ত্বেও

কোথায় যেন চির ধরতে শুরু করেছে। বিশ্বাস আর সাহসের প্রাচীরে ফাটল ধরছে। বিশেষ করে বড় তিনটি ছেলে-মেয়েকে ওদের মামাবাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসার পর থেকেই এই নিঃশব্দ সন্দেহটা টের পায় ওরা।

অবিনাশ ফেরার পর রমলা জিজ্ঞেস করেছিল, মা কিছু জিজ্ঞেস করলেন না?

অবিনাশ জামা ছাড়তে ছাড়তে বলল, না। কিন্তু আর একটু হলেই বিপদ ঘটেয়েছিল পিকলুটা।

—কেন ?

—আমি কেউ কোনো প্রশ্ন করার আগেই বলেছিলাম, ওরা পরীক্ষা হয়ে যাবার পর থেকেই মামাবাড়ি মামাবাড়ি করে একেবারে মাথা খেয়ে ফেলছিল, তাই—। কিন্তু তার আগেই পিকলু হঠাৎ বলে বসল, বা রে, তুমিই তো ক-দিন থেকে 'মামাবাড়ি যাবি? মামাবাড়ি যাবি?' বলে আমাদের নাচাচ্ছিলে!

রমলা ভয় পেয়ে যায়। ওর প্রশ্নেও সেটা প্রকাশ পায়, মা কিছু সন্দেহ করলেন না তাতে?

হাসার চেষ্টা করে অবিনাশ। বলে, না। সবাই হোহো করে হেসে উঠেছিল ওর পাকামিতে। আমি কোনো রকমে ম্যানেজ করলাম।

রমলা চোখ নামিয়ে জানতে চাইল, কমলারা কিছু বলল না?

—হ্যাঁ, বিস্ময় প্রকাশ করল। বলল, কি ব্যাপার? দিদির এত উন্নতি? ছেলেমেয়েদের আঁচলের তল থেকে শুধু বের করা না, একেবারে চোখের আড়াল করে দিল?

আবার সেই ভয়ের চোখ তুলে তাকায় রমলা। অবিনাশ জামাটা নিয়ে আলনার দিকে এগিয়ে বলে, বললাম, সে-কৃতিত্বটা পুরো আমারই। ধমকে বুঝিয়ে কোনো রকমে রাজী করিয়েছি। এরকম পুতু-পুতু করে রেখে যে ছেমেয়েগুলোর বারোটা বাজিয়ে দিচ্ছে, সেটা বোধহয় বুঝতে পেরেছে এতদিনে। কিন্তু একটু হলেই আর একটা বিপদ বাধিয়ে বসেছিল কমলা।

রমলা ভুরু কুঁচকে বলে, কেন?

—তোমার এই উন্নতির জন্য আজ বিকেলে তোমাকে একটা কনগ্রাচুলেশন জানাতে আসার পরিকল্পনা ছিল ওর।

—তুমি কি বললে?

—বললাম, তাহলে সেটা সামনের রবিবার পর্যন্ত মুলতুবি রাখো। কারণ,

তোমার দিদির সাহসিকতার পুরস্কার হিসেবে তাকে নিয়ে আজ দুপুরে ডায়মণ্ডহারবার গেছে বেড়াতে।

জামার পকেট থেকে কানের ফুল জোড়া বের করে টেবিলের ওপর রাখে অবিনাশ। রমলাই কমলার কাছে ওর ফুল জোড়া আজকের জন্য চেয়ে পাঠিয়েছিল।

সেদিকে চোখ রেখে অনুচ্চস্বরে জিজ্ঞেস করে রমলা, ও বিশ্বাস করেছে তো? আবার হুট করে এসে হাজির হবে না তো সন্ধ্যায়?

সন্ধ্যার উল্লেখে অবিনাশ অলক্ষ্যে একটু গম্ভীর হয়ে উঠেছিল। চকিতে একবার রমলার দিকে তাকিয়েই চোখ সরিয়ে নিয়েছিল দেশলাইয়ের ওপর। একটা সিগারেট ধরিয়ে বলেছিল, না বিশ্বাস করেছে।

একটা বড় করে নিঃশ্বাস ফেলে সরে যাচ্ছিল রমলা। হয়তো অসতর্ক মুহূর্তে বেরিয়ে এসেছে। ওকে আস্তে ডেকেছিল অবিনাশ, তোমার ভয় করছে না তো?

গভীর এক জোড়া দৃষ্টি তুলে অবিনাশের চোখে কী যেন খুঁজেছিল রমলা। কিন্তু অল্পক্ষণের জন্যই। তারপর চোখ ফিরিয়ে নিয়ে মাথা নেড়েছিল, না।

তারপর থেকেই ওরা আর খুব বেশি কথা বলেনি। সময় যত এগিয়েছে ওদের কথা তত পরিমিত হয়েছে। তারপর কখন যেন নিজেদের অজান্তেই নীরব হয়েছে ওরা। কিন্তু কেউ কারো চোখের সামনে থেকে সরে যায়নি। দুজনেই দুজনের সান্নিধ্য থেকে সাহস খুঁজছিল বলেই বোধহয়।

আবার নিঃশব্দ আয়োজনে হাত লাগিয়েছিল রমলা। কিছু একটা অবলম্বনের প্রয়োজনে একটা পুরনো পত্রিকা খুলে বসেছিল অবিনাশ। তবু তারই ভেতর দুজনের দৃষ্টি বিনিময় হয়েছে মাঝেমাঝে। সতর্ক দুই আততায়ীর সূক্ষ্ম বোঝাপড়ায় চকিত চাউনি যেন।

রিঙ্কু ঘুমিয়ে পড়েছে। ওপাশ ফিরে শুয়ে আছে রমলা। ওকে একটু ঘুমিয়ে নিতে বলেছিল অবিনাশ। অবিনাশ অবশ্য মুখে ক্লান্তির কথাটাই বলেছিল, কিন্তু দুজনেই যেন জানে আসলে ক্লান্তির জন্য নয়, দুপুরে ঘুমালে শরীরটা ঝরঝরে লাগে বলে, দেখতে একটু আদুরে আদুরে লাগে বলেই, রমলাকে আজ দুপুরে ঘুমোতে বলে অবিনাশ নিজেও চোখ বুজে শুয়েছিল। ও জানে,

রমলাও চোখ বুজেই শুয়ে আছে। যে-উদ্বেগ উত্তেজনা অবিনাশকে আজ ঘুমাতে দেবে না, সেই একই কারণ আজ রমলাকেও জাগিয়ে রাখবে।

অবিনাশের একবার ইচ্ছে হলো রমলার গায়ে হাত রাখে। অথবা মিলমিশের দুপুরে অনেক সময় গালে ঠোঁটে যেমন আলতো আদর বুলোয়, তেমনি কিছু। কিন্তু সাহস পায় না। সে-আদরে যদি কষ্টে গড়ে তোলা প্রতিরোধের প্রাচীরে চির ধরে রমলার? বরং দূরে যাক রমলা। চেতনার পুরো সীমানা জুড়ে নিঃশব্দে যেভাবে শিবির সমাবেশ করতে চায় ও, করুক। কারণ, আজ সন্ধ্যার চরম মুহূর্তের অধিনায়কত্ব একা রমলারই।

অথচ ঠিক সপ্তাহখানেক আগেও জানত না রমলা, অথবা অবিনাশ, যে গত দু-বছরের দুর্জয় জীবনসংগ্রামের শেষ অধ্যায়ে এরকম এক সক্রিয় ভূমিকায় নামতে হতে পারে রমলার। দু-বছর আগে অবিনাশের চাকরি যাবার পরও রমলা ছিল নীরব দর্শক। যন্ত্রণার মূক অংশীদার। আজীবন সহধর্মিনী রমলার জীবিকার ক্ষেত্রে স্বামীর সহধর্মিনী হবার মতো প্রস্তুতি ছিল না কোনোদিনই। না শিক্ষায়, না অর্জিত কোনো কর্মকুশলতায়। অবিনাশও গৃহবধূ রমলার এ-সমস্যা নেবার মতো কোনো ভূমিকা খুঁজে পায়নি।

অবিনাশের মনে পড়ে, বহুদিন অভাবে, অপমানে, আত্মগ্লানিতে ক্ষিপ্ত অবিনাশ রমলার ওপর অযথা হামলা করেছে। গঞ্জনা দিয়েছে ওকে দুর্বহ পারিবারিক বোঝার দায়ে। কিন্তু মুহূর্তের জন্যও রমলা মুখরা হয়নি। ধৈর্য হারিয়ে মনে করিয়ে দেয় নি যে রমলা ওর জীবনে আরোপিত নয়, সানন্দ উৎসবে বরণ করে আনা বধূই। সন্তানকটি ওর একক আনন্দের ফসল নয়, ওদের যৌথ আকাঙ্ক্ষার ফল। নিঃশব্দে সব লাঞ্ছনা সহ্য করেছে রমলা। আর সাহস জুগিয়েছে, দেখ, একটা কিছু সুবিধে হয়ে যাবেই। তুমি তো আর মূর্খ নও, একটা কিছু কাজ জুটে যাবেই।

হ্যাঁ, মূর্খ নয় অবিনাশ। উজ্জ্বল প্রতিভা না হলেও জীবিকার জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যার ছাড়পত্র ওর পকেটেও আছে। আর সেই সঙ্গে আছে শিক্ষার অভিমান। যে-অভিমান কাঙালের মতো প্রসারিত হতে হাতকে বাধা দেয়। অনধিকারী উপদেষ্টাকে বিনীত মস্তকে মেনে নিতে অস্বীকার করে।

আরো বিশেষ করে আজকের এই নিরুপায় বেকারত্বর জন্য ওর নিজের কোনো অক্ষমতা বা নৈতিক অপরাধ দায়ী নয় বলেই অভিমানটা আরো বেশি। মালিক নামধারী একজনের লাভের অঙ্ক ঠিক রাখতে গিয়ে এখানকার

অফিসটাই যদি উঠে গিয়ে থাকে—সে দোষ কার? অবিনাশের? না, একক লাভের অঙ্কের ওপর অগণিত জীবন নির্ভরশীল করে তোলে যে-সমাজব্যবস্থা—তার?

কিন্তু গোটা পরিবার নিয়ে এক অনিশ্চিত শূন্যতায় নিক্ষিপ্ত হবার পর থেকেই উপলব্ধি করল অবিনাশ, এ-প্রশ্নের উত্তর দেবার মতো সময় বা সহনশীলতা নিয়ে বসে নেই কেউ। নতুন করে অনুভব করল, মানুষ কত স্বার্থপর, আত্মমগ্ন।

প্রথম প্রথম সকলেই সহানুভূতি দেখাল। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করল। খুব কাছের কয়েকজন ওকে আশ্বাস দিল। দু-একজন যে যৎসামান্য আর্থিক সাহায্যও না করল, তা নয়। কিন্তু কিছু দিন পরই অনুভব করতে পারল অবিনাশ, সবার চোখে আস্তে আস্তে ও করুণার পাত্র হয়ে উঠছে। কোনো কোনো পরিচিত দরজায় ওর ছায়া বিরক্তির উদ্রেক করছে। ওর অক্ষমতায় নিকট আত্মীয়রাও অস্বস্তি বোধ করছে।

তবু এই নিরালম্ব শূন্যতা আর অনিশ্চয়তার বিরুদ্ধে আপ্রাণ লড়ে যেতে লাগল অবিনাশ। তারপর এক দিন সভয়ে অনুভব করল, যে-ক্ষোভ যে-আক্রোশ সমাজের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত হচ্ছিল, কবে যেন তা আত্মগ্লানিতে রূপান্তরিত হয়েছে। নিজের বিরুদ্ধেই এক তীব্র বিদ্বেষ একে আত্মহননের হাতছানি দিতে শুরু করেছে।

কিন্তু ঘুমন্ত রমলা আর শিশু সন্তানকটির করুণ মুখের দিকে তাকিয়ে সেকথা ভাবতেও শিউরে উঠেছে। কল্পনায় অবগুণ্ঠিতা, অভুক্ত সন্তান পরিবৃতা রমলাকে ফুটপাথে ভিক্ষার প্রসারিত হাতে বসে থাকতে দেখে আঁতকে উঠেছে। সংবাদপত্রে ক্ষুধার তাড়নায় সপরিবারে আত্মহত্যার সংবাদে ভয়ার্ত পশুর মতো ছুটে গিয়ে পথের ভিড়ে মিশেছে কতদিন। জীবনের স্রোতে, শব্দের তরঙ্গে অশরীরী দুঃস্বপ্নগুলোকে ভুলতে চেয়েছে।

কিন্তু কর্মব্যস্ত মানুষের মিছিলের মুখে বেকার নিজেকে আরো অসহায়, অক্ষম মনে হয়েছে। নির্বীর্য নিষ্প্রয়োজন মনে হয়েছে। কখনও উচ্চারিত, কখনও অনুচ্চারিত করুণ প্রার্থনায় পথে পথে ঘুরে বেরিয়েছে—আমাকে বাঁচতে দাও। আমার শিক্ষা, শক্তি, সামর্থ আছে। তবু কোন অপরাধে আমাকে এমন বাতিল হয়ে যেতে হবে? আমার সঙ্গে জড়িত, শুধু এই অপরাধে কেন একটি নারী, কটি অসহায় শিশু অনাহারের মুখে নিক্ষিপ্ত হবে?

কিন্তু এ-আর্তিও কোনো জবাব পায়নি। নিষ্ফল দিনের শেষে বিপন্ন পদক্ষেপে রাত্রের বিবরে ফিরে এসেছে অবিনাশ করুণ আত্মগ্লানি নিয়ে। দিনে দিনে পুঞ্জীভূত হয়েছে তীব্র ক্ষোভ। চারপাশের সমস্ত নিয়ম-শৃঙ্খলা-নীতি ভেঙে তছনছ করে দেবার জন্য নিশপিশ করেছে দুটো মরিয়া মুঠি।

অবিনাশের উত্তেজনার এই শীর্ষ বিন্দুগুলো বোধহয় টের পেত রমলাও। নিঃশব্দে ওকে লক্ষ্য করত বলেই। আর সেই উদ্বেল মুহূর্তগুলোতে স্বামীর বুক ঘেঁষে এসে সান্ত্বনা দিত, ভেব না, দেখো, একটা কিছু সুবিধে হয়ে যাবেই। তুমি তো মূর্খ না।

রমলা এ-পাশ ফিরে শোয়। চোখ বন্ধ করে অবিনাশ। রমলা ঘুমোয় নি? যদি চোখ মেলে ওর দিকে তাকায়, চোখাচোখি হয়ে যায় দুজনের, অবিনাশকে কিছু বলতে হবে। কি বলবে? সব বোঝাপড়ার শেষে বিশেষ করে আর কী বলার আছে অবিনাশের। বরং আসন্ন মুহূর্তের জন্য নিঃশব্দে অপেক্ষা করতেই ভালো লাগছে এ-সময়। সব গুছিয়ে নেবার সময় পাচ্ছে।

আস্তে রিঙ্কুকে বুকের কাছে টেনে নিল রমলা।

সেই প্রথম দিনও রিঙ্কুকে বুকে টেনে নিয়েছিল রমলা। তবে এ-রকম আলতো হাতে নয়। শঙ্কিত আতঙ্কে যেন অবিনাশের স্পর্শ থেকে কেড়ে নিয়েছিল মেয়েটাকে। বুকের ভেতর আঁকড়ে ধরে শেষ আশ্রয় খুঁজছিল।

ঠিক তার আগের অধ্যায়টুকুও মনে আছে অবিনাশের। নিষ্ফল দিনের শেষে রাত্রের বিবরে ফিরে নিঃসঙ্গ নিরাশ্রয় একটি আহত পৌরুষ নারীর নগ্নতায় আশ্রয় খুঁজছিল। একদিন যে-উত্তপ্ত আবেগ সম্প্রসারিত ছিল, আজ যেন তা সাধনার ধন।

রমলাও বোধহয় টের পেত। সর্বাঙ্গ সর্বাঙ্গে আবদ্ধ। পরুষ মুষ্টিবদ্ধ স্তন। আবরণ উন্মোচনে ন্যস্ত আঙুল। কিন্তু সব কিছুই যেন নিষ্প্রাণ। নিরুত্তাপ। পাওয়ার আবেগ নেই স্পর্শে। কিছু নেই বলেই যেন ওর নিরাভরণতায় অন্যমনস্ক আশ্রয় হাতড়ে বেড়াচ্ছে অবিনাশের হাত।

বোধহয় মায়া হয়েছিল রমলার। সহানুভূতি বোধ করেছিল। তাই সাজানো কামনার উত্তাপে ওর ভয়ের চিন্তাগুলোকে গালিয়ে দেবার জন্যই নিজেকে আরো ঘনিষ্ঠ করেছিল।

স্বভাবে শীতল রমলার এই অভিনয়-উত্তাপ টের পেয়েছিল অবিনাশ।

লিপ্সার পোশাকে এই করুণা প্রদর্শনে অপমানিত বোধ করেছিল। আস্তে বলেছিল,, ছাড়ো, গরম লাগছে।

সামান্য আলগা দিয়েছিল রমলা। কিন্তু অবিনাশকে অসহ চিন্তায় ফিরে যেতে দেবে না বলেই যেন চটুল হয়েছিল। স্বামীর ঠোঁটে ঠোঁট ঘষে একটু হেসে বলেছিল, যৌবনেই যোগিনী করে তুলবে নাকি?

নিরুত্তাপ স্বরে বলেছিল অবিনাশ, জীবনের সর্বক্ষেত্রেই তো আমার অক্ষমতা দেখতে পাচ্ছ। অসহ্য মনে হলে নিজের চেষ্টায়—

রমলা এ-ইঙ্গিতে অবাক হয়েছিল। তারপর আহত অভিমানে বলেছিল, সহ্য করতে পারবে?

নির্লিপ্ত স্বরে বলেছিল অবিনাশ, মার খেতে খেতে মনে কড়া পড়ে গেছে। এখন আর অসহ্য বলে কিছু নেই। তাছাড়া ন্যায়-নীতির বোধ-গুলো যে কী পরিমাণ সাজানো, শূন্যগর্ভ—সেটাও টের পেয়ে গেছি। প্রতি মুহূর্ত যাদের লড়ে বাঁচতে হয় তাদের কাছে ওগুলো শুধু হাস্যকর শব্দ।

ভয় পাওয়া গলায় বলেছিল রমলা, সে হয়তো ছেলেদের কাছে, কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে নয়। মেয়েরা যুগে যুগে সম্ভ্রম বাঁচানোর জন্য আত্মাহুতি দিয়েছে, তবু—

মাঝ পথেই ওকে থামিয়ে দিয়েছিল অবিনাশ, জীবিতরা যুগে যুগে তাদের এই বোকামির নেশায় মাতিয়ে রাখতে পেরেছিল বলেই।

রমলার ভয় আরো গাঢ় হয়েছিল, তার মানে, তুমি বলতে চাও সতীত্বের কোনো দামই নেই।

এবার উঠে বসেছিল অবিনাশ। একটা বিড়ি ধরিয়েছিল। তারপর কেমন যেন এক অপরিচিত স্বরে বলেছিল, অন্তত যে-সমাজ তোমার বাঁচার অধিকার নির্মমভাবে ছিনিয়ে নিচ্ছে, সে-সমাজে নয়। মরে যাওয়া মানে তো সেই অবিচার ক্লীবের মতো মেনে নেওয়া। বাঁচতে হলে এই সমাজকে ভেঙেচুরে শোধ নিয়েই বাঁচতে হয়।

অন্ধকারে বিড়ির ধিকিধিকি আগুনটাকে একটা হিংস্র শ্বাপদের চোখ বলে মনে হচ্ছিল।

অবিশ্বাসের স্বরে ফিশফিশ করে বলেছিল রমলা, তাহলে কি তুমি চাও আমি—।

বিড়ির আগুনটা জলে উঠেছিল একবার। দৃঢ়স্বরে এবার বলেছিল অবিনাশ, চাইলেও কি অন্যায় চাওয়া হবে?

—তুমি আমাকে ? কথা শেষ করতে পারেনি রমলা। আচমকা রিঙ্কুকে হিঁচড়ে বুকে টেনে নিয়েছিল। তারপর ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল।

এলার্ম ঘড়িতে চারটে বাজল। জানত, আজ কেউ ঘুমাবে না। তবু এ-সাবধানতাটুকু অবলম্বন করেছিল ওরা। রিঙ্কুরও ঘুম ভেঙে গেছে। ওকে নিয়ে অস্তে উঠে বসল রমলা। ঘুমের ভান করে শুয়ে থাকল অবিনাশ। ওদের প্রস্তুতিপর্ব শেষ হোক, তারপর ওঠা যাবেখন।

অবশ্য এই সন্ধ্যার আসল প্রস্তুতির জন্য ওদের আরো অনেক যন্ত্রণাদায়ক মুহূর্ত পেরোতে হয়েছিল। অনেক সূচীমুখ প্রশ্ন, রক্তক্ষয়ী দ্বন্দ্ব।

প্রথমে একবেলা, তারপর প্রায় দু-বেলায়ই উপোস শুরু হয়েছিল। এতদিন যে-আগুন থেকে অবোধ সন্তানকটিকে আড়াল রাখার চেষ্টা চলছিল, সেটাও দুঃসাধ্য হয়ে উঠল। আগুনের হল্কায় কচি মুখগুলো ক্রমেই বিহ্বল, আতঙ্কিত হয়ে উঠছে টের পেল। আর আতঙ্কে তাড়িত জন্তুর মতো দিন-দিন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে লাগল অক্ষম দুই স্বামী-স্ত্রী।

সারারাত ঘুমতে পারত না অবিনাশ। সেই বিমূঢ় বিপন্নতার মুখোমুখি নিঃশব্দে জেগে বসে থাকত রমলাও।

অবশেষে একদিন হঠাৎ রমলাকে সরাসরি প্রশ্ন করে বসেছিল অবিনাশ, আত্মহত্যার সাহস আছে ?

মনে মনে চমকে উঠেছিল রমলা। তারপর নিথর বোবা দৃষ্টি তুলে তাকিয়েছিল স্বামীর মুখের দিকে, বাচ্চাগুলোর কি হবে ?

চাপা কিন্তু গভীর স্বরে বলেছিল অবিনাশ, সেই দুশ্চিন্তারই বাইরে যেতে চাচ্ছি।

কিছুক্ষণ চুপ করে বসেছিল রমলা। তারপর আস্তে ওর চোখে চোখ রেখে ফিশফিশ করে বলেছিল, সেদিন রাত্রে তুমি যা বলেছিলে সেটা মন থেকেই বলেছিলে ?

অবাক চোখে তাকিয়েছিল অবিনাশ। কি এক অজানা আশঙ্কায় মন বুক কেঁপে উঠেছিল। নিজেরই প্রস্তাবের এই ভয়ঙ্কর বাস্তব রূপটার সঙ্গে পরিচয় ছিল না ওর।

তারপর ভাঙা গলায় বলেছিল, কি জানি, এতদিন পর ঠিক মনে নেই।

সব সংশয় পেরিয়ে আসা স্বরে জিজ্ঞেস করেছিল রমলা, সহ্য করতে পারবে ?

পরাভূত স্বরে বলেছিল অবিনাশ, কি জানি, জানি না। কিন্তু এর চেয়েও কি সেটা অসহনীয় হবে?

আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে অবিনাশের বুকে মাথা এলিয়ে দিয়েছিল রমলা। আস্তে ওকে বুকের ভেতর জড়িয়ে নিয়েছিল অবিনাশ। তারপর, বহুদিন পর এক তীব্র আবেগে পরস্পর পরস্পরকে জড়িয়ে শুয়েছিল সেদিন। সারারাত। উত্তাল সমুদ্রে তলিয়ে যাবার আগের আকুল আলিঙ্গন যেন।

তবু, মানুষের সবচেয়ে বড় ভয় বোধহয় নিজেকে। সবচেয়ে বড় সঙ্কোচ নিজের কাছে। না হলে সেই বোঝাপড়ার পরও আরো বিনিদ্র কটা রাত অপচয় করতে হলো কেন এই সন্ধ্যায় পৌছাতে? নিজেদের কাছেই সমাধানটাকে নিতান্ত নিরুপায় একটা হালকা উপায় হিসেবে গড়ে তুলতে?

নিজেদের মনের সঙ্গে শেষ বোঝাপড়ার সেই অসহ মুহূর্তগুলো এলোমেলো ভাবে মনে পড়ে অবিনাশের। আসামী ও বিচারক একই মনের চুলচেরা সওয়াল-জবাব। এবং সেই সর্বশেষ রায়—বাঁচার জন্য এ-বিচ্যুতি নয়, ন্যায়সঙ্গত বিদ্রোহ। তাছাড়া বিপদের মুহূর্তে যেকোনো উপায়ে আত্মরক্ষাই তো মানুষের সবচেয়ে বড় ধর্ম। বড় দুর্ভিক্ষে, বিপর্যয়ে, যুদ্ধে যুগে যুগে তাই হয়েছে। সমাজ সেক্ষেত্রে নিরুপায় বিচ্যুত মানুষকে ক্ষমা করে। সহানুভূতি দেখায়। সেই একই সঙ্কট যদি বৃহত্তর জাতীয় ক্ষেত্রে না এসে একক জীবনের ক্ষেত্রে আসে, তাহলে তার ক্ষমা নেই? তাছাড়া, এই ন্যায়-নীতিগুলো তো সমাজ রক্ষার জন্য? বেশ তো, সমাজকে টের না পাইয়ে, অক্ষত রেখে, আমরা যদি একান্ত ব্যক্তিগত কোনো বাঁচার উপায় বের করে নিতে পারি, তাহলে ক্ষতি কি?

—কই, উঠবে না? বিকেল হয়ে গেল যে!

রমলার হাতের ছোঁয়ায় চেতনায় ফেরে অবিনাশ। আলতো ভঙ্গীতে আড়মোড়া ভেঙ্গে সহজভাবেই উঠে বসে। তারপর রমলার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলে, ও, তুমি তৈরি?

নিঃশব্দে সরে যায় রমলা। হাত-মুখ ধুয়ে এসে চা খেতে খেতে লক্ষ্য করে অবিনাশ, শুধু রমলা নিজে নয়, প্রয়োজনীয় সব কিছুই তৈরি। রিঙ্কু সেজেগুজে বসে পুতুল খেলছে। সবুজ সুজনী, সূক্ষ্ম সূচিশিল্পে সাজানো বালিশের ঢাকনি, এক ঝাঁক পাখি উড়ে যাওয়া জানলার সেই সুদিনের পর্দা—সব, সব কিছু মানানসই!

বুকের ভেতরটা হঠাৎ টনটন করে করে ওঠে অবিনাশের। একটা চাপা

যন্ত্রণা পাক খেয়ে উঠতে চাচ্ছে যেন। মনে মনে ভয় পায় অবিনাশ। এ-মুহূর্তে একবার রমলার মনটা দেখ্‌তে ইচ্ছে করে ওর। ও কি সত্যিই ভয় পায়নি ? না কি, এই ঘরের মতোই ওর সহজ ভঙ্গীটাও সাজানো ?

নিঃশব্দে চা শেষ করে উঠে দাঁড়ায় অবিনাশ। জামা-কাপড় বদলায়। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মাথা আঁচড়ে নেয়। সেই ফাঁকে একবার ভালো করে লক্ষ্য করে নিজেকে। কোনো চাপা উত্তেজনায় বিপর্যস্ত, বিভ্রান্ত, বিপন্ন মনে হচ্ছে না তো সাজানো দেহটাকে ?

আয়নায় একবার দূরবর্তী রমলাকে দেখা যায়। নিজেকে প্রস্তুত করে অবিনাশ রমলার সামনে এসে দাঁড়ায়। চোখে চোখ রেখে একটু হেসে বলে, চলি ?

উত্তরে সামান্য হাসল রমলা। তারপর দুজন দুজনের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল কিছু সময়। দীর্ঘ বিচ্ছেদের বেদনা, বিপদসঙ্কুল কোনো অভিযানের আশঙ্কার আভাস দৃষ্টিতে। দ্রুত চোখ সরিয়ে নিল অবিনাশ। ঘর থেকে বেরিয়ে কাজে বেরিয়েছি, ফিরতে রাত হবে।

নিশির ডাকে যেন ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে অবিনাশ। পথে ব্যস্ত মানুষের মিছিল। বিচিত্র শব্দের স্রোত। কিন্তু দুর্বোধ্য এক শূন্যতার ভেতর দিয়ে স্মৃতিভ্রষ্ট কাউকে হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে যেন ও।

জায়গাটা আগে থেকেই ভাবা ছিল। নিঃশব্দে এসে সেখানে থামল একবার। চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে একটা নিরিবিলি লাইট-পোস্টের নিচে এসে দাঁড়াল। তারপর বিক্ষিপ্ত চেতনাকে মনে মনে সাজিয়ে নেবার চেষ্টা করল।

ছাত্রজীবনে অথবা প্রথম যৌবনে অনেক পথচারীর মতো সুবেশ অবিনাশের কাছেও ভুল প্রস্তাব এসেছে মাঝে মাঝে এসব জায়গায়। একা এবং সামান্য অস্থিরতা প্রকাশ পেলেই সেই অন্ধকারের চরগুলো নিঃশব্দে পাশে এসে দাঁড়ায় এখানে। অস্ফুটে জিজ্ঞেস করে, কিছু চাই স্যার ?

ইদানিং অবশ্য ব্যাপক দারিদ্র্যের পটভূমিতে এই লালসার আহ্বানগুলো স্বশরীরেও পথে নেমে আসতে শুরু করেছে। নিজেরাই কোমল থাবা বাড়িয়ে শিকারকে গহ্বরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে অবিনাশের, সেদিনের সম্ভাব্য শিকার আজ নিজেই গোপন শিকারী !

আর সঙ্গে সঙ্গে রমলার কথা মনে পড়ে। রমলা কি করছে এখন? রিঙ্কুকে আদর করছে? নিঃশব্দে বসে কাঁদছে? না, কান্নার পর্ব পেরিয়ে চতুর হাতে মৃত্যুবাসর রচনা করছে?

রমলা কি সত্যিই ভয় পায় নি? আজ সকাল থেকে কথাটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভেবেছে অবিনাশ। যে রমলা ওর বন্ধুদের সঙ্গে পর্যন্ত মুখতুলে কথা বলতে পারত না বলে কতদিন বকেছে, সে আজ সকাল থেকে কি করে এমন অবলীলাক্রমে দ্বিতীয় বাসর রচনা করতে পারছে? আশ্চর্য!

অবিনাশ সচেতন হয়। একটি সুবেশ যুবক এসে লাইট-পোস্টটার কাছে দাঁড়িয়েছে। কিছুটা চঞ্চল দৃষ্টিতে চারপাশে তাকাচ্ছে। তীব্র দৃষ্টিতে ওকে নিরীক্ষণ করল কিছুক্ষণ অবিনাশ। তারপর নিজেকে মনে মনে প্রস্তুত করে সামনে এগোল।

কিন্তু ও গিয়ে পৌঁছানর আগেই সামনের একটা ট্যাক্সি থামিয়ে উঠে বসল যুবকটি। ট্যাক্সিটা সবেগে বেরিয়ে গেল সামনে দিয়ে। সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে একসময় সবিস্ময়ে অনুভব করল অবিনাশ, যুবকটি এ-ভাবে হাতছাড়া হয়ে যাওয়াতেও সেরকম ক্ষুণ্ণ হয় নি যেন ও!

আবার স্বস্থানে এসে দাঁড়ায়। চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি। কিন্তু নিজেকে যেন পূর্ণ চেতনা দিয়ে উপলব্ধি করতে পারছে না। এ যেন ওর দ্বিতীয় সত্তা। অথবা নিজেকে নিয়েই নিজের স্বপ্ন।

খুব কাছেই এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক এসে দাঁড়ালেন। প্রস্তুত অবিনাশ এবার আর বৃথা সময় নষ্ট করল না। একবার ওঁর সর্বাঙ্গে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে আস্তে পাশে এসে দাঁড়াল। কিন্তু কিছুতেই যেন আমন্ত্রণের সঠিক ভাষাটা সাজিয়ে নিতে পারছে না। ওকে উসখুস করতে দেখে ভদ্রলোক ফিরে তাকালেন। বললেন, কিছু বলবেন?

একটা সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ পায় যেন অবিনাশ। একটু হাসে। বলে, না, জিজ্ঞেস করছিলাম, আপনার কিছু, মানে—

ভদ্রলোকের দৃষ্টিতে সন্দেহ ফোটে। আচমকা বলে বসে অবিনাশ, মানে, আপনার কাছে দেশলাই আছে?

ভদ্রলোক নিঃশব্দে পকেট থেকে দেশলাই বের করে দিলেন। কিন্তু চোখের সন্দেহ তখনও কাটে নি। পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরিয়ে

নিয়ে দেশলাইটা ফেরৎ দেয় অবিনাশ। তারপর দ্রুত পায়ে সরে যায় সেখান থেকে। একটা ধন্যবাদ পর্যন্ত জানিয়ে যেতে ভুলে যায়।

এবার স্বস্থানে না ফিরে আরো দূরের একটা নিরিবিলি জায়গা বেছে নেয়। সাবধানের মার নেই। তারপর বেশ কিছুক্ষণ সেখানে বসে বসে সিগারেট টানে। অভ্যেসমতো একবার কব্জি উল্টে সময় দেখতে গিয়ে মনে পড়ে, ঘড়িটা বিক্রি করে দিয়েছে।

নিঃশব্দে একটি লোক ওর পাশে এসে দাঁড়াল। আড়চোখে লোকটাকে একবার দেখে নেয় অবিনাশ। লোকটি ফিসফিস করে যেন নিজের মনেই উচ্চারণ করল একবার, লাগবে স্যার?

বুঝল, তবু আমন্ত্রণের প্রত্যক্ষ পাঠ নেবার জন্যই যেন জিজ্ঞেস করল অবিনাশ, কি?

—ফ্রেস স্যার—। সুইট সিক্সটিন!

প্রত্যক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী। তবু মনেমনে সামান্য কৌতুক বোধ করে অবিনাশ। কিন্তু পরবর্তী স্বার্থের কথা ভেবেই চাপা ধমক দেয় ওকে, ইয়ার্কি পেয়েছ? ভাল চাও তো এক্ষুনি কেটে পড়।

লোকটি আদৌ ভয় পেয়েছে বলে মনে হলো না। শান্ত পদক্ষেপেই সিগারেট টানতে টানতে চলে গেল।

কিছুক্ষণের ভেতরই সামান্য সতর্ক ভঙ্গীতে এক প্রৌঢ় অবাঙালি ভদ্রলোক সামনের লাইটপোস্টের নিচে এসে দাঁড়ালেন। যেন ব্যস্ত হয়ে ট্যাক্সি খুঁজছেন।

কেমন যেন সন্দেহ হলো অবিনাশের, ভদ্রলোকের এটা সাজান ব্যস্ততা। অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে ভদ্রলোককে ভালো করে লক্ষ্য করল কিছুক্ষণ। অবাঙালি, এটা একদিক দিয়ে আশীর্বাদ। দূরতম কোনো সূত্রেও পরে পরিচয় বেরিয়ে পড়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।

চারদিকে একবার সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে নেয় অবিনাশ। মাথায় রক্তের চাপ বাড়ছে। বোধগুলো আরো ঝাপসা হয়ে আসছে। তবু মরিয়া হয়ে পায়ে পায়ে ভদ্রলোকের পাশে এসে দাঁড়াল। তারপর, যেন অস্ফুটে স্বগত উচ্চারণ করল, লাগবে স্যার?

ভদ্রলোক আড়চোখে ফিরে তাকালেন।

ট্রামের তারে চোখ রেখে ফিসফিস করে উচ্চারণ করল অবিনাশ, ফ্রেস স্যার—। সুইট সিক্সটিন!

ভদ্রলোক আস্তে জিজ্ঞেস করলেন, ঠিক কত ?

নিজের স্বর নিজের কাছেই দূরাগত অন্য কারো বলে মনে হয় অবিনাশের—আপনি যা দেবেন ?

—বয়সের কথা বলছি।

কিছু না ভেবেই বলে বসে অবিনাশ, নিজেই দেখবেন চলুন।

একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অবিনাশকে নিরীক্ষণ করে নিলেন ভদ্রলোক। আস্তে জিজ্ঞেস করলেন, লাইনে নতুন ?

পূর্ণদৃষ্টি তুলে ধরল অবিনাশ। কাঁপা গলায় বলল, আজই প্রথম।

মনেমনে কি যেন একটু ভেবে নিলেন ভদ্রলোক। কিছু হিসেব মিলিয়ে নিলেন যেন। তারপর বললেন, এগোন।

সারা পথ একবারও পেছন ফিরে তাকায়নি অবিনাশ। ছেলেবেলায় রাত্রে নির্জন পথে যে ভয়ে একবারও পেছন ফিরে তাকাত না, সেই একই ভয় যেন তাড়া করে নিয়ে যাচ্ছে ওকে।

একেবারে বাড়ির দরজায় পৌঁছে থামল ও। পেছন ফিরে একবার দেখে নিয়ে দরজায় টোকা দিল। অস্ফুটে ডাকল একবার, রমলা ?

বোঝা গেল রমলা প্রস্তুত ছিল। এক ভাবেই নিঃশব্দে দরজা খুলে দিল। তারপর দ্রুত পায়ে ভেতরে চলে গেল।

ভদ্রলোককে ভেতরে এনে দরজাটা ভেজিয়ে দিল অবিনাশ। বলল, বসুন, চা করতে বলি।

ভদ্রলোক ব্যস্তভাবে বললেন, না না, চায়ের দরকার নেই।

ভদ্রলোকের আশু দরকারটা অনুমান করতে পারে অবিনাশ। কাঁপা গলায় বলে, একটু বসুন, আমি ডেকে আনছি।

পর্দার আড়ালে রিঙ্কুকে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করছিল রমলা। অবিনাশ আস্তে ওর পাশে এসে দাঁড়াল। বলল, চল।

ঠোঁট দুটো একবার কেঁপে উঠল রমলার। অদ্ভুত আতুর একটা দৃষ্টি ফুটে উঠল চোখে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই নিজেকে সামলে নিল। একটু হেসে রিঙ্কুকে এগিয়ে ধরে বলল, বুঝিয়ে শুনিয়ে রেখ।

রিঙ্কুকে নিয়ে জানলার শিক ধরিয়ে দাঁড়া করিয়ে দিল অবিনাশ। তারপর রমলার দিকে ফিরে দাঁড়াল। দুহাত দিয়ে ওকে ধরে রমলার আনত দৃষ্টিকে নিজের দিকে ফিরিয়ে নিল। গভীর অন্তর্ভেদী বেদনার্ত দৃষ্টি অবিনাশের।

রমলার চোখের মণিতে নিজের প্রতিবিম্ব দেখছে যেন। রমলার মণি দুটো ঘষা আয়নার মতো ঝাপসা।

আচমকা রমলাকে বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরে অবিনাশ। তীব্র আবেগে ওর ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরে। বিয়ের রাতের প্রথম চুম্বনের মতো দুর্বার আকর্ষণে রমলার ঠোঁট দুটো মুখ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে চায় যেন।

ব্যথায়, না আবেগে বুঝতে পারে না, রমলার চোখে জল। মুহূর্তে চেতনায় ফিরে আসে অবিনাশ। রমলাকে ছেড়ে দেয়। সরিয়ে দেয়। রমলা সামান্য হেসে চোখের জল মুছে নেয়। সেই সাজানো হাসির পাশে অবিনাশও মিথ্যেই হাসার চেষ্টা করে। ফিসফিস করে বলে, ভয় করছে নাতো ?

মাথা নাড়ে রমলা। অস্ফুটে বলে, চল।

দরজার মুখে এসে আর একবার ফিরে রিঙ্কুকে দেখে নেয়। অবোধ মেয়েটা খুসির আকাশ দেখছে দাঁড়িয়ে !

রমলাকে দেখে ভদ্রলোক সোজা হয়ে বসেন। একটু যেন বিস্মিত হয়েছেন। এতদিনের অভিজ্ঞতার হিসেব মিলছে না যেন।

রমলা একটু হেসে নমস্কার করল। বলল, চলুন, ওঘরে গিয়ে বসি।

নিঃশব্দে পেছনের ঘরে চলে গেল ওরা। মন্ত্রমুগ্ধের মতো শূন্য ঘরে একা দাঁড়িয়ে থাকে অবিনাশ। যাওয়ার সময় মাঝের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে গেল রমলা। ওপাশ থেকে ওর স্বর শোনা গেল, এটাই থাকবে, না নীল আলোটা জ্বেলে দেব ?

কি যেন বললেন ভদ্রলোক। সুইচের শব্দ শোনা গেল। মুহূর্তে ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে একটা বিষধর সাপের মতো নীল আলোর ফালিটা অবিনাশের পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আর, সঙ্গে সঙ্গে একটা চকিত সন্দেহ আচমকা ফণা তুলে দাঁড়াল অবিনাশের সামনে—অবিনাশের ছাড়পত্রের ভেলায় চেপে কোনো গোপন সুখের সন্ধানে পাড়ি জমাল না তো রমলা ?

দ্রুত পায়ে সদর দরজাটা বন্ধ করে দিল অবিনাশ। তারপর একটা ভীত জন্তুর মতো পাশের ঘরে গিয়ে রিঙ্কুকে কোলে তুলে নিল।

সমস্ত চেতনায় একটা চরম শূন্যতা ছড়িয়ে পড়ছে। অসংলগ্ন, অস্পষ্ট এক অনুভূতির অন্ধকারে ধীরে ধীরে তলিয়ে যাচ্ছে যেন।

ওঘর থেকে মাঝে মাঝে টুকরো টুকরো কথা ভেসে আসছে। কিছু শব্দ।

স্থূল লোকটা এখনও কি মুখোমুখি বসে গল্প করছে? না-কি, আদুরে অবকাশে অবিনাশ যেমন রমলার ঠোঁটের তিলটা নিয়ে খেলা করত, তাই করছে? অথবা আরো কিছু? আরো ঘনিষ্ঠ কিছু?

মাথার ভেতর একটা যন্ত্রণা অনুভব করে অবিনাশ। রিঙ্কুকে কাঁদিয়ে নেবে? শব্দের তরঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে দেবে ও-ঘরটাকে?

রমলার একটা চাপা হাসি, না, কি কান্না, ভেসে এল। কিন্তু মাঝপথেই চাপা পড়ে গেল সেটা। শব্দের উৎসটাকে কিছু দিয়ে কেউ হঠাৎ বন্ধ করে দিল যেন। লোকটার কদাকার ঠোঁট দুটোর কথা হঠাৎ মনে পড়ে অবিনাশের। ঘৃণায় মুষড়ে ওঠে বুকটা।

আবার নৈঃশব্দ। এই শব্দহীনতার মঞ্চে অভিনীত অধ্যায়টিকে সজাগ কল্পনায় দেখতে চেষ্টা করে অবিনাশ। মনেমনে শিউরে ওঠে। রমলার দেহের প্রতিটি প্রত্যঙ্গ চোখের সামনে ভেসে ওঠে। প্রতিটি প্রত্যঙ্গ নিয়ে এতদিন রমলার যে পবিত্র নিরাবরণতার ওপর ছিল ওর অবিসম্বাদী একক অধিকার।

বুকের ভেতর একটা তীব্র যন্ত্রণা বোধ করে অবিনাশ। কেউ যেন একটা উত্তপ্ত বর্শার ফলা ওর বুকে ঠেসে বসিয়ে দিচ্ছে!

রিঙ্কুকে নিয়ে উঠে দাঁড়ায় একবার। অস্থিরভাবে পায়চারি করতে থাকে ঘরের ভেতর। ওঘর থেকে আগুনের হল্কার মতো ছোটছোট শব্দ ভেসে আসছে আবার। দুহাতে কান চেপে ধরে অবিনাশ। বুকের যন্ত্রণাটা তীব্রতর হয়। আগুনে ঝলসানো একটা সাঁড়াশি দিয়ে কেউ যেন হৃদপিণ্ডটাকে উপরে নিতে চাচ্ছে। অসহ্য অসহ্য লাগছে।

দ্রুত পায়ে ওঘরের দিকে ছুটে যেতে গিয়েও থেমে পড়ে অবিনাশ। রিঙ্কুকে বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরে। তারপর পেছনের দরজা খুলে ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে যায়। মুক্ত বাতাসে গিয়ে বুক ভরে দম নিতে থাকে।

প্রায় আধঘণ্টা বাদে যখন বাড়ি ফিরে এল অবিনাশ, পুলিশে তখন বাড়ি ছেয়ে গেছে। কৌতূহলী জনতার ভীড়ে চাঞ্চল্য। নিষ্প্রাণ একটা মমির মতো পায়ে পায়ে ঘরে এসে দাঁড়াল অবিনাশ। পুলিশ অফিসারের সামনে মাথা নিচু করে বসে আছেন ভদ্রলোক। দু-হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে রমলা।

অফিসার কি যেন লিখছিলেন, অবিনাশকে দেখে চোখ তুললেন।

—আপনি ?

—অবিনাশ চৌধুরী।

অবিনাশের স্বর শুনে চমকে মুখ তুলে তাকাল রমলা। তারপর ছুটে এসে ওকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল।

—আপনি এঁর স্বামী ?

—হ্যাঁ।

—কোথায় ছিলেন এতক্ষণ ?

—মেয়েকে নিয়ে পার্কে বেড়াতে গিয়েছিলাম।

পুলিশ অফিসার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর নিরক্ত ভাবলেশহীন মুখের দিকে কি যেন খুঁজলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, আমরা ফোনে একটা ইনফরমেশন পেয়ে এসেছিলাম। এ্যাণ্ড ইট ওয়াজ করেক্ট! আপনাদের তিনজনকেই আমার সঙ্গে একটু থানায় যেতে হবে।

আদালতে তিনজনই দোষ স্বীকার করল। স্বল্পমেয়াদী বিচারপর্ব তাই অনেক উৎসাহী ব্যক্তিরই নৈরাশ্যের কারণ হলো। কিন্তু বিচারকের তাৎপর্যপূর্ণ রায়টি সতর্ক অনেক নাগরিককেই সাময়িকভাবে কিছুটা বিচলিত করেছিল সেদিন।

রায় দিতে গিয়ে মাননীয় বিচারপতি নির্দ্বিধায় ঘোষণা করেছিলেন, আইনের চোখে আসামী অবিনাশ চৌধুরী অপরাধী। তাই বিচারক হিসেবে আমি তাঁকে শাস্তি দিতে বাধ্য। কিন্তু সমাজব্যবস্থা কোন স্তরে পৌঁছালে একজন শিক্ষিত ভদ্রলোকের বাঁচবার শেষ উপায় হিসেবে, নিজের স্ত্রীর জন্য লোক সংগ্রহ করতে পথে নামতে হয়, সেটাও আজ সচেতনভাবে বিচারের সময় এসেছে।

কিন্তু বিচারের শেষেও বিচারক, পুলিশ বা এই কেস-প্রসঙ্গে উৎসাহী সবার কাছেই একটি প্রশ্ন চিরদিনের মতোই অনুদ্ঘাটিত থেকে গেল—পুলিশকে কে ফোন করেছিল ?

বাঙলা ভাষায় লেনিন

চিন্মোহন সেহানবীশ

লেনিনের লেখা বা লেনিন-প্রসঙ্গে লেখা রচনার পরিমাণ এখন বাঙলা ভাষায় নেহাৎ কম নয়। গত দু-দশকে তো তার বহর বাড়তে বাড়তে বেশ চোখে পড়ার মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। মহানগরীর পথেঘাটেই শুধু নয়, মফঃস্বল শহরে, এমন কি সুদূর গ্রামাঞ্চলেও এখন লেনিনসাহিত্য মোটের উপর সহজলভ্য। গত পাঁচ দশকে বাঙলাভাষায় তার এই উত্তরোত্তর প্রসার লেনিনের চিন্তার এমন এক দুর্বার শক্তির পরিচয় দেয় আমাদের সুদূর এই বাঙলাদেশেও যার আকর্ষণ অপ্রতিরোধ্য।

জীবন্ত আরো অনেক ব্যাপারের মতো এরও সূচনা কিন্তু কিছুটা অকিঞ্চিৎকর। এখনো পর্যন্ত যতদূর জানি বাঙলাভাষায় লেনিনের প্রথম সশ্রদ্ধ উল্লেখ ১৩২৮ সনের বৈশাখ সংখ্যা 'সৎসঙ্গী' পত্রিকার পাতায় (৪৯০ পৃষ্ঠা)—১৯২১ সনের এপ্রিল মাসে। 'লেনিন' শিরোনামার সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধটিতে অজ্ঞাতনামা লেখক ধারাবাহিকভাবে বৈশাখ থেকে ভাদ্র পর্যন্ত পাঁচ সংখ্যায় চেষ্টা করেছিলেন লেনিনের জীবন ও কর্মকাণ্ডের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার। লেখার মুন্সীয়ানা সত্ত্বেও রচনাটি থেকে থেকেই অবান্তর ও কিছুটা আজগুবী বিষয়ের আমদানীতে ভারাক্রান্ত। ইতিপূর্বে ১৯১৯ সালে লেনিন-বিরোধী বিলাতী সংবাদপত্রের বিকৃত তথ্যের উপরে ভিত্তি করে, লেনিনকে জার্মান গুপ্তচর আখ্যা দিয়ে, বসুমতী সাহিত্য মন্দির থেকে 'বলশেভিকবাদ বা রাশিয়ার বিপ্লব' নামে একটি বই বেরিয়েছিল।

ব্যাপারটায় আমাদের আরো অবাক লাগে এজন্য যে লেনিন যাকে বিপ্লবের 'সসজ্জ মহড়া' বা 'dress rehearsal' আখ্যা দিয়েছিলেন সেই ১৯০৫ সনের বিপ্লবকে এর দেড় দশক আগেই রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 'প্রবাসী'তে একাধিকবার অভিনন্দিত করেছিলেন স্বৈরাচারী জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রপীড়িত রুশ জনসাধারণের ন্যায্য অভ্যুত্থান হিসেবে। তবে ঐ বিপ্লবে রুশ সোশ্যাল ডেমক্র্যাটিক লেবার পার্টির বা বলশেভিকদের অথবা তার পিছনেও লেনিনের অসামান্য ভূমিকার অবশ্য কোন উল্লেখ ছিল না সেখানে। থাকা সম্ভবও ছিল না—সে খবর তখনো পর্যন্ত পৌঁছয়নি এ দেশের ওয়াকিবহাল মহলেও।

অথচ 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় রামানন্দবাবু আর দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ান' পত্রিকায় গান্ধীজী বেশ কয়েকবার তখনই দাবি জানিয়েছিলেন ঐ বিপ্লবে যোগদানের অপরাধে সেণ্ট পিটার্সবুর্গের কুখ্যাত 'পিটার ও পল্' দুর্গে আটক ম্যাক্সিম্ গর্কির মুক্তির জন্য। ব্যাপারটাতে কিন্তু আসলে আশ্চর্য হওয়ার তেমন কিছু নেই। কারণ তখনো পর্যন্ত লেনিন ছিলেন এমন এক রাজনৈতিক নেতা যাঁর জীবনের অধিকাংশ সময়ই কেটেছে নির্বাসন ও আত্মগোপনের আবছায়ায়। জগৎজোড়া খ্যাতির খর সূর্যালোকে তখনও তিনি এসে দাঁড়াননি। আর গর্কির সাহিত্যিক প্রতিভা তখনই ইয়োরোপ আমেরিকায় যথেষ্ট প্রতিষ্ঠিত যার দরুন তাঁর মুক্তির জন্য তখন আন্দোলন চলছিল পশ্চিমের বুদ্ধিজীবী মহলে। সে আন্দোলনের কিছু কাগজপত্র হয়তো পেঁাছেছিল ঐ দুই সম্পাদকপ্রবরের দপ্তরে এবং তাঁরা তাতে সাড়াও দিয়েছিলেন যথোচিতভাবেই। গান্ধীজী তো গর্কির ছোট একটি জীবনীচিত্রও রচনা করেছিলেন তাঁর পত্রিকায়—তাতে তাঁরই কবিতার নামে গর্কির নামকরণ করা হয়েছিল বিপ্লবের 'ঝোড়ো পাখি' বা 'stormy petrel', যদিও গান্ধীজী বা রামানন্দবাবু কেউই তখনো পর্যন্ত 'stormy petrel' বা গর্কির কোন রচনাই পড়েছিলেন কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

তবু এ-সবের চাইতে আশ্চর্য ব্যাপার এই যে ১৯১৭ সনের মার্চ ও নভেম্বর মাসে পর পর দু-দুটো বিপ্লব ঘটে যাওয়ার পরেও বেশ কয়েক বছর বাঙলা পত্র-পত্রিকায় কোন উল্লেখ দেখা গেল না লেনিনের। 'দৈনিক বসুমতী'র মতো দৈনিক আর 'প্রবাসী' বা 'নায়কের' মতো সাময়িক পত্রিকায় দুনিয়া কাঁপানো দশ দিনের ঘটনাকে মোটের উপর স্বাগত জানানো হলেও ১৯২০ সন অবধি লেনিন অনুপস্থিত রইলেন বাঙলা পত্রিকার পাতায়। অথচ ১৯১৮ সনের ২৯শে জানুয়ারি তারিখেই অর্থাৎ বিপ্লবের তিন মাস পরেই স্বয়ং তিলককে দেখা যায় 'কেশরী'তে প্রবন্ধ লিখতে 'রুশ নেতা, লেনিন'কে অভিনন্দিত করে। ১৯২০ সনে আবার 'কেশরী'তে (২১শে আগস্ট) প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় 'লেনিনের নৈতিক জয়' শিরোনামায়। তেমনি গণেশশঙ্কর বিদ্যার্থী সম্পাদিত হিন্দী মাসিক পত্রিকা 'প্রভা'য় (মে সংখ্যা) রামাশঙ্কর অবস্তীর লেনিন-বিষয়ক রচনা আর হিন্দী দৈনিক 'আজ' পত্রিকায় (৫ই অক্টোবর) 'লেনিনের স্থান' প্রবন্ধ প্রকাশিত হলো ঐ বছরেই।

ব্যাপারটা আরো আশ্চর্য ঠেকে এইজন্য যে বাঙলা দেশ থেকে প্রকাশিত ইংরেজি পত্রপত্রিকায় কিন্তু কম হলেও লেনিনের কথা তখন লেখা হচ্ছিল মাঝে মাঝে (১৯১৯ সনের ফেব্রুয়ারি সংখ্যা 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় Leninist Right of National Self-determination'-প্রবন্ধ বা ১৯২০ সনের ২০শে আগস্ট তারিখের 'অমৃতবাজার পত্রিকায়' Mr. Lloyd George and the Soviet Government' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতে লেনিনকে 'বুদ্ধিমত্তায় এমন এক অতিকায় পুরুষ' বলে বর্ণনা করা হয়েছে যাঁর পাশে 'বার্ট্রাণ্ড রাসেলও বামন')। 'মডার্ন রিভিউ'তে যা হতে পারছে 'প্রবাসী'তে তা না হওয়ার কারণ সত্যই বোঝা যায় না।

তবে এই অনুল্লেখের ব্যাপার নিয়ে খুব বেশি বাড়াবাড়ি করাও বোধহয় সমীচীন নয়। কি বাঙলা, কি ইংরেজি পত্রিকামহলে তখন এ ক্ষেত্রের প্রধান সমস্যা ছিল চেতনার অভাব ততটা নয়, যতটা নিয়মিত, যথাযথ তথ্য সরবরাহের অভাব। লেনিনের নাম উল্লিখিত না হলেও সঠিক তথ্যের অভাব সত্ত্বেও ঐ গোড়ার যুগেও যথেষ্ট সচেতন ও বুদ্ধিদীপ্ত অনুমান ও কল্পনার দুটি নমুনা এখানে দেওয়া যেতে পারে।

১৯১৮ সনের জুলাই মাসের 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় 'At the cross-roads' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন : 'We have heard that Modern Russia is floundering in its bottomless abyss of idealism because she has missed the sure foothold of the stern logic of Real Politik. We know very little of the history of the present revolution in Russia, and with the scanty materials in our hands we cannot be certain if she, in her tribulations is giving expression to man's indomitable soul against prosperity built upon moral nihilism. All that we can say is that the time to judge has not yet come, especially as Real Politik is in such a sorry plight itself. No doubt if Modern Russia did try to adjust herself to the orthodox tradition of Nation-worship, she would be in a more comfortable situation today, but this tremendousness of her struggle and hopelessness of her tangles do not, in themselves, prove that she has gone astray. It is not unlikely that, as a nation, she will fail; but if she fails with the flag of true ideals in her hands, then her failure will fade,

like the morning star, only to usher in the Sunrise of the New Age'.

এ লেখায় সংশয় নিশ্চয়ই রয়েছে কিন্তু রুশবিপ্লবের ঘটনা প্রবাহের মূল ব্যঞ্জনাও কি এর মধ্যে অন্তত আভাসেও ধরা পড়েনি কিছুটা? নইলে, 'নবযুগের সূর্যোদয়ের' ইঙ্গিত কেন?

আর ১৯১৯ সনে করাচী সৈন্যব্যারাক থেকে ৪৯ নং বেঙ্গল রেজিমেণ্টের জনৈক হাবিলদার বাঙলা উপন্যাসের যে পাণ্ডুলিপিটি কলকাতার এক বন্ধুর কাছে প্রকাশের জন্য পাঠালেন তার থেকে বোঝা গেল যে ইতিমধ্যে ব্যাপারটা আরো স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে কিছু তরুণের মনে। উপন্যাসের কাহিনীটি এইরকম: উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ভারতীয় ফৌজের এক সিপাহী ভালোবাসে স্থানীয় এক তরুণীকে। কিন্তু সে আবার অপরের বাগদত্তা। ব্যর্থপ্রেমিক তাই সৈন্যবাহিনী থেকে পালিয়ে ও সীমান্ত অতিক্রম করে শেষপর্যন্ত আশ্রয় নিল বিচিত্র এক দেশে। সেখানে সে যোগ দিল লালফৌজে যে বাহিনী সংগ্রাম করে সারা দুনিয়ার নিপীড়িত মানুষের জন্য। এইভাবে সে মুক্তি পেল তার ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্কট থেকে। তার ভাষায়: 'এর চেয়ে ভালো কাজ আর দুনিয়ায় খুঁজে পেলুম না। তাই এ-দলে এসেছি।'

উপন্যাসটির নাম 'ব্যথার দান' — লেখক নজরুল ইসলাম। সাহিত্যের নিরিখে ঐ উপন্যাসের মূল্য কতখানি সেটা এখানে বিচার্য নয়, শুধু রুশবিপ্লবের বাণী কত আগে বাঙালি সাহিত্যিককে উদ্বুদ্ধ করেছিল সাহিত্য-রচনায়, সে কথা বলার জন্যই এর অবতারণা অথচ এতে লেনিনের নাম নেই কোনখানে।

বিপিনচন্দ্র পাল, রাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মনস্বীরাও তেমনি বলশেভিকবাদের তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন লেনিনের নাম উল্লেখ না করেও। সংবাদপত্র বা পত্রিকাতেও তেমন লেখা প্রকাশিত হতো যথেষ্টই।

যাই হোক ১৯২১ সনে 'সৎসঙ্গী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে 'লেনিন' প্রবন্ধ প্রকাশের পর থেকে একের পর এক বেশ কিছু লেখা প্রকাশিত হতে লাগল লেনিনের জীবন এবং তাঁর রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও দার্শনিক মতামত প্রসঙ্গে। ঐ বছরের আগস্ট মাসের শেষ দিকে (১৩২৮ সালের ১০ই ভাদ্র) প্রকাশিত হলো ফণীভূষণ ঘোষের 'লেনিন'।

স্বতন্ত্র পুস্তিকা আকারে এটিই বাঙলা ভাষায় প্রথম লেনিনের জীবনী। শ্রীযুক্ত ডাঙ্গের ঃ 'গান্ধী বনাম লেনিন' গ্রন্থ-দ্বারা এ রচনা বিশেষভাবেই প্রভাবিত। ঐ বছরেরই শেষ দিকে 'শংখ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে খ্যাতনামা বিপ্লবী, শচীন্দ্রনাথ সান্যালের 'লেনিন ও সমসাময়িক রুশিয়া' প্রবন্ধ। স্বভাবতই এতে রাজনৈতিক বিশ্লেষণের প্রয়াস আগের তুলনায় অনেক বেশী লক্ষণীয় ও সার্থকও।

১৯২২ সনে আনন্দবাজার পত্রিকায় (নবপর্যায়) 'লেনিনের ছাত্রজীবন' নামে একটি লেখা প্রকাশিত হয়। শ্রীঅবিনাশ দাশগুপ্ত তাঁর 'লেনিন, রুশ মহাবিপ্লব ও বাংলা সংবাদসাহিত্য' নামে সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থে লিখেছেন যে এ রচনাটি সম্ভবত 'মোহম্মদী' পত্রিকা থেকে পুনর্মুদ্রিত।

১৯২৩ সনের এপ্রিল, মে মাসে ছ' সপ্তাহ ধরে 'আত্মশক্তি' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় আর এক বিশিষ্ট রাজনৈতিক কর্মী, অমূল্যচরণ অধিকারীর 'লেনিনের জীবন কথা' এবং 'সংহতি' পত্রিকায় (১৩৩০ সালের মাঘ সংখ্যায়) কেশবেশ্বর বসুর 'লেনিন' প্রবন্ধ।

বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় সামান্য উল্লেখ বাদে লেনিনের জীবন বা মতামত সম্পর্কিত গ্রন্থের বা বিশদ আলোচনার এই হলো মোটামুটি পরিচয় তাঁর জীবদ্দশায়। মৃত্যুর পরে অবশ্য বহু রচনা বা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, এখনো হচ্ছে। তার পুরো পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয় আমার পক্ষে। তবে একটা মোটামুটি পঞ্জী দেওয়া গেল এরই সঙ্গে। এর জন্য আমি শ্রীঅবিনাশ দাশগুপ্তের কাছে বহুলাংশেই ঋণী।

এই প্রসঙ্গে একটি জিনিস লক্ষণীয় — শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার তার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণও করেছেন সম্প্রতি — বাঙলা সাহিত্যে লেনিনের প্রতি কুৎসামূলক রচনা নেই।

লেনিনের মৃত্যুর পরেই 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১) প্রকাশিত হয় লেনিনের উদ্দেশে রচিত প্রথম বাঙলা কবিতা — 'লেনিন'। শুনেছি কবি শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্যকে এর জন্য নিগৃহীত হতে হয়েছিল পুলিশের হাতে। তার পরে প্রেমেন্দ্র মিত্র, মণীশ ঘটক, বিষ্ণু দে, বিমলচন্দ্র ঘোষ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, গোলাম কুদ্দুস, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সুকান্ত ভট্টচার্য প্রমুখ বহু বিশিষ্ট প্রবীন ও নবীন বাঙালি কবি অসংখ্য কবিতা রচনা করেছেন লেনিনের উদ্দেশে — আজো

লেখা হচ্ছে অজস্র। এ ধরণের তিনটি কবিতার সংকলন — শ্রীতরুণ সান্যাল ও শ্রীগণেশ বসু সংকলিত 'লেনিনের যুগ' (১৯৬৯), শ্রীবীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সংকলিত 'খাড়া পাহাড় বেয়ে' (১৯৭০) এবং শ্রীদীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত 'লেনিন শতাব্দী' (১৯৭০) ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে।

লেনিনের নিজের লেখা এক মাত্র কবিতা বাঙলায় অনুবাদ করেছেন বিশিষ্ট কবি শ্রীঅরুণ মিত্র তার ফরাসী তর্জমা থেকে। ১৯০৫ সনের রুশ বিপ্লব সম্পর্কে লেখা লেনিনের এই কবিতাটির বাঙলা নামকরণ করা হয়েছে 'সে এক ঝোড়ো বছর'।

বাঙলা ভাষায় লেনিনের রচনার তর্জমা শুরু হয়েছে কিছুটা দেরীতে — সম্ভবত ত্রিশের কোঠার গোড়ার দিকে। দুটো ব্যাপার লক্ষণীয় এ ক্ষেত্রে, প্রথমত এখনও পর্যন্ত বেশ সামগ্রিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ধারাবাহিক অনুবাদের ব্যবস্থা করা যায়নি — মোটের উপর খেয়ালখুশি মতো, বড়জোর বিশেষ প্রয়োজনের তাগিদেই সে-কাজ চলছে। দ্বিতীয়ত এখনো পর্যন্ত তর্জমা হচ্ছে ইংরেজি সংস্করণ থেকে, মূল রুশভাষা থেকে নয়। মূল রুশ-ভাষায় লেনিনের গোটা॰ রচনাসংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে ৫৫ খণ্ডে—ইংরেজিতে এতাবৎ ৪৫ খণ্ড বেরিয়েছে তার বাঙলা অনুবাদ দূরে থাক, মস্কো থেকে লেনিনের যে তিন খণ্ড নির্বাচিত রচনাবলী প্রকাশিত হয়েছে তার অনুবাদেরও কোন পরিকল্পনা এখনো পর্যন্ত কার্যকর হয়নি।

এতাবৎ লেনিনের যে সব লেখার তর্জমা বাঙলায় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে তার একটি তালিকা এর সঙ্গে দেওয়া হলো। মস্কো থেকে বাঙলায় লেনিনের যে সব বই প্রকাশিত হয়েছে সেগুলিকে অবশ্য এর মধ্যে ধরা হয়নি। তালিকাটি কালানুক্রমিক, তবে নিশ্চয়ই অসম্পূর্ণ। যেমন, লেনিনের Imperialism গ্রন্থের যে অনুবাদটির কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে তা ছাড়া আর একটি তর্জমা প্রকাশিত হয়েছিল। তার প্রকাশক বা প্রকাশকাল জানা নেই। তেমনি 'টলস্টয় প্রসঙ্গে লেনিন' নামে লেনিনের লেখা থেকে শ্রীপীযুষ দাশগুপ্তের তর্জমা ন্যাশনাল বুক এজেন্সী থেকে প্রকাশিত হয়েছিল তারও প্রকাশকাল জানি না।

তালিকাভুক্ত বইগুলির মধ্যে একটির সম্পর্কে একটা কথা জানা দরকার। শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী ১৯৩২ সনে যখন লেনিনের 'State and Revolution' বইখানির বাঙলা তর্জমা প্রকাশ করেন তখন তিনি 'Revolution'-এর

প্রতিশব্দ হিসাবে সহজ ও স্বাভাবিক 'বিপ্লব' শব্দটি বাদ দিয়ে কেন যে 'আবর্তন' শব্দ ব্যবহার করেছিলেন তার কারণ হয়তো এখন অনেকেই অনুমানও করতে পারবেন না। কিন্তু ব্যাপারটা সে-সময়ে আদৌ অহেতুক ছিল না। কি অবস্থার মধ্যে সে-যুগে লেনিন সাহিত্য তর্জমা ও প্রচারের কাজ এদেশে শুরু করতে হয়েছিল তা ঐ একটি ঘটনাতেই পরিস্ফুট।

সবশেষে লেনিনের এই জন্মশতবর্ষপূর্তির বছরে লেনিন সম্পর্কে যে অসংখ্য বই, পুস্তিকা, রচনা বা লেনিনের লেখার তর্জমা প্রকাশিত হয়েছে তার কথা কিছু বলা দরকার। এ-সবের পূর্ণ তালিকা দেওয়া অবশ্য এখানে সম্ভব নয়। তবে দু'এক কথা বলা যেতে পারে সে সম্পর্কেও। লেনিনের উদ্দেশ্যে রচিত পুরনো ও নতুন কবিতার সংকলন প্রকাশের কথা আগেই বলেছি। এ ছাড়া কবি সিদ্ধেশ্বর সেন অনুবাদ করেছেন লেনিনের মৃত্যুর পর তাঁর উদ্দেশ্যে লেখা মায়াকোভস্কির সুদীর্ঘ কবিতাটি। শ্রীঅমল দাশগুপ্ত 'কমরেড লেনিন' নামে একটি জীবনী লিখেছেন যাতে লেনিনের মানবিক ও রাজনৈতিক দিক, উভয়েরই পরিচয় মেলে চমৎকার। অনেক পত্রিকা বিশেষ সংখ্যাও প্রকাশ করেছেন এ উপলক্ষে—তার মধ্যে জ্ঞাতব্য খবর বহু আছে। আর যা উল্লেখযোগ্য এই প্রকাশনার ক্ষেত্রে সেটি হলো লেনিন সম্পর্কে কিছুটা তত্ত্বতল্লাসীর কাজ। কাজটা একদিক থেকে শুরু বলা যেতে পারে তিন বছর আগেই — রুশবিপ্লবের অর্ধশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে। যেহেতু ঐ বিপ্লব ও লেনিন অবিচ্ছেদ্য তাই সে প্রসঙ্গেও লেনিন-চর্চার কাজ হয়েছিল বেশ কিছুটা। এ দিক থেকে গত তিন বছরে যেসব বই বা পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে এগুলি উল্লেখযোগ্য :

১। 'সোভিয়েত-বিপ্লব ও ভারতবর্ষ' শিরোনামায় 'ভারত-সোভিয়েত সংস্কৃতি সমিতি' প্রকাশিত তিনটি পুস্তিকা—বিশেষ করে শ্রীনিরঞ্জন সেনগুপ্তের লেখা ২নং পুস্তিকা; ২। শ্রীসুশোভনচন্দ্র সরকার ও শ্রীগোপাল হালদার সম্পাদিত 'সোভিয়েত-বিপ্লব পরিচয়' সঙ্কলন; ৩। শ্রীগৌতম চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'রুশবিপ্লব ও বাঙলার মুক্তি আন্দোলন'; ৪। শ্রীমতী মঞ্জু গুপ্ত ও শ্রীগৌতম চট্টোপাধ্যায়ের 'সমকালীন বাঙলাদেশ ও লেনিন' পুস্তিকা; ৫। শ্রীঅবিনাশ দাশগুপ্তর লেখা 'লেনিন, রুশ মহাবিপ্লব ও বাঙলা সংবাদসাহিত্য' গ্রন্থ। এতে শ্রীদাশগুপ্ত বহু তথ্যের সমাবেশ করেছেন গোড়ার যুগের লেখায় লেনিন প্রসঙ্গে আলোচনার ব্যাপারে। ৬। এই নিবন্ধকারের

লেখা 'লেনিন ও ভারতবর্ষ' পুস্তিকা, যেখানে চেষ্টা হয়েছে লেনিনের রচনায় ভারতপ্রসঙ্গ আলোচনা বা ভারতবর্ষের উল্লেখগুলিকে সঙ্কলিত করার। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে ঐ সঙ্কলন অসম্পূর্ণ—আরো বহু তথ্য জানা গেছে ঐ পুস্তিকা প্রকাশের পর।

বাঙলা ভাষায় লেনিন-বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জী *

১৯২১ — 'লেনিন'-ফণীভূষণ ঘোষ, ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব, কলিকাতা।

১৯২৬ — 'লেনিন ও সোভিয়েট'-প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী, সরস্বতী লাইব্রেরী, ১লা মাঘ, ১৩৩৩, কলিকাতা।

১৯৩২ — 'লেনিন' (৩য় সংস্করণ) সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গণবাণী পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা।—'লেনিন ও রোজা লুক্সেমবার্গ'-সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বর্মণ পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা।

১৯৩৫ — 'লেনিনের সহিত'-ম্যাক্সিম গর্কি (অনুবাদ ঃ মণিলাল শ্রীমাণী), প্রকাশক ঃ কল্যাণময় শ্রীমাণী, ১৩৪২ কলিঃ।

১৯৩৯ — 'লেনিন ও বলশেভিক পার্টি'—রেবতীমোহন বর্মণ, কলিকাতা।

১৯৪১ — 'রুশজাতির কর্মবীর'—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, ইউ, এন, ধর এণ্ড কোং, কলিকাতা।

১৯৪৩ — 'বিজয়ী লেনিন'—নিরঞ্জন মজুমদার, 'রঞ্জন', কলিকাতা।

১৯৪৪ — 'কমরেড লেনিন'—ধীরেন্দ্রলাল ধর, এম, সি সরকার এণ্ড সন্স, কলিকাতা।

১৯৪৭ — লেনিনের স্মৃতি'-এন, কে, ক্রুপস্কায়া (অনুবাদ ঃ সরোজকুমার দত্ত), ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, কলিকাতা।

১৯৫১ — 'লেনিনের কথা'-জে, স্তালিন (অনুবাদ ঃ নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়), ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, কলিকাতা।—'জনসেবক লেনিন' সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, দেবসাহিত্য কুটির।

১৯৫৮ — 'লেনিন' (৩য় সংস্করণ)-শিবশংকর মিত্র, র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব, কলিকাতা।

১৯৬২ — 'লেনিন'—ইলা মিত্র, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, কলিকাতা।

১৯৬৮ — 'লেনিন'—(সঙ্কলন-অনুবাদ), বিংশ শতাব্দী, ১৩৭৫, কলিকাতা।

১৯৬৯—'লেনিনের যুগ' (কবিতা সঙ্কলন) সম্পাদক তরুণ সান্যাল, গণেশ বসু, সারস্বত লাইব্রেরী, কলিকাতা।

---

* সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে প্রকাশিত বাঙলা বই এ হিসেবের মধ্যে ধরা হয়নি।

১৯৭০—'কমরেড লেনিন'—অমল দাশগুপ্ত, লেখাপড়া, কলিকাতা।—'অধিকার রক্তের কবিতার' (কবিতা)—গণেশ বসু, সীমান্ত প্রকাশনী, কলিকাতা। —'কমরেড লেনিন'—সনৎ মিত্র, বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা। —'ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন-ভ্লাদিমির মায়াকোভ্স্কি (অনুবাদ: সিদ্ধেশ্বর সেন), সারস্বত লাইব্রেরী, কলিকাতা।—'খাড়া পাহাড় বেয়ে' (কবিতা সঙ্কলন)—সম্পাদক বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, উচ্চারণ, কলিকাতা।—'লেনিন শতাব্দী' (কবিতা সঙ্কলন)—সম্পাদক দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মনীষা গ্রন্থালয়, কলিকাতা।—'লেনিন আলো আমার' (কবিতা)—নিমাই মান্না, সংস্কৃতি, চাকপোতা, হাওড়া।

বাঙলা ভাষায় লেনিনের রচনা *

১৯৩২—'রাষ্ট্র ও আবর্তন' (State and Revolution)-অনুবাদক: সোমনাথ লাহিড়ী, গণশক্তি পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা।—'সাম্রাজ্যবাদ' (Imperialism, the highest stage of Capitalism.) অনুবাদক: অনিল রায়, সরস্বতী লাইব্রেরী, কলিকাতা।—'মার্কসবাদ' (Karl Marx: A biographical sketch) অনুবাদক: অনিল রায়, বর্মণ পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা।

১৯৩৯—'১৯০৫ সালের বিপ্লব' (Revolution of 1905) অনুবাদক: সুনির্মল সেন, অগ্রণী লাইব্রেরী, কলিকাতা। —'পথের ইঙ্গিত' (Selections from Lenin's works: The tasks of the proletariat.) অনুবাদ: শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামী, বর্মণ পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা। —'মার্কসবাদ' (Teachings of Karl Marx) অনুবাদক: পূর্ণেন্দু দস্তিদার, বর্মণ পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা।

১৯৪০—'রাষ্ট্র' (State)-অনুবাদক: ব্রজবিহারী বর্মণ, বর্মণ পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা।

১৯৪১—'সর্বহারা বিপ্লব ও দলত্যাগী কাউট্স্কি' (Proletarian Revolution and the Renegade Kautsky) অনুবাদক: সুধী প্রধান, অগ্রণী বুক ক্লাব কলিকাতা।

১৯৪৪—'গ্রামের গরীবদের প্রতি'. (To the Rural Poor)-অনুবাদক: বিভূতি গুহ ও অরুণ মিত্র, নিউ পাবলিশার্স, কলিকাতা। —'কার্ল মার্কসের শিক্ষা' (Teachings of Karl Marx)-অনুবাদক: অমিত সেন, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, কলিকাতা। —'সোশ্যাল ডেমক্র্যাসীর দুই কৌশল' (Two Tactics of Social Democracy in the Democratic Revolution) অনুবাদক: বিভূতি গুহ, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, কলিকাতা।

* সোভিয়েত ইউনিয়ন বা ভারতে সোভিয়েত তথ্যবিভাগ থেকে প্রকাশিত বইগুলি এই হিসাবের মধ্যে ধরা হয়নি।

১৯৪৫—'গ্রামের গরীবদের প্রতি' (To The Rural Poor)-অনুবাদক : বিভূতি গুহ ও অরুণ মিত্র, ২য় সংস্করণ, নিউ পাবলিশার্স, কলিকাতা।

১৯৪৭—'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' (State and Revolution) অনুবাদক : অনিল কাঞ্জিলাল, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, কলিকাতা। —'ধর্ম' (Religion) অনুবাদক : মন্মথ সরকার, বর্মণ পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা।

১৯৪৮—'নারী ও সমাজ' (Women and Society)-অনুবাদক : কনক মুখোপাধ্যায়, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, কলিকাতা।

১৯৪৯—'গ্রামের গরীবদের প্রতি' (To the Rural poor)-অনুবাদক : বিভূতি গুহ, অরুণ মিত্র, ৩য় সংস্করণ, নিউ পাবলিশার্স, কলিকাতা।
—'১৯০৫ সালের বিপ্লব' (Revolution of 1905)-ন্যাশনাল বুক এজেন্সী কলিকাতা :

১৯৫১—'বামপন্থী কমিউনিজম' (Leftwing Communism—an Infantile Disorder)-অনুবাদক : নবগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রদ্যোৎ গুহ, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, কলিকাতা।
—'বামপন্থী কমিউনিজম, শিশুসুলভ বিশৃঙ্খলা' (Leftwing Communism—an Infantile Disorder)-ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, কলিকাতা।
—'গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সোশ্যাল ডেমক্র্যাসীর দুই কৌশল' (Two Tactics of Social Democracy in the Democratic Revolution)-ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, কলিকাতা।

১৯৫৫—'এক পা আগে, দুই পা পিছে' (One Step Forward, Two Steps Back)-ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, কলিকাতা।
—'কি করিতে হইবে?' (What is to be done ?)-ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, কলিকাতা।

১৯৫৮—'পার্টি কংগ্রেসের কাছে লেনিনের চিঠি' (Letters to Party Congress)-ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, কলিকাতা।

১৯৬৩—'সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে' (Against Revisionism) ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, কলিকাতা।

১৯৬৪—'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পতন' (Collapse of the Second International)-ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, কলিকাতা।
—'জাতীয় কর্মনীতির প্রশ্নাবলী ও প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদ' (Question of National Policy and Proletarian Internationalism)-ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, কলিকাতা।
—'বামপন্থী কমিউনিজম, শিশুদের রোগ' (Leftwing Communism —an Infantile Disorder)—২য় সংস্করণ কালান্তর প্রকাশনী, কলিকাতা।

১৯৬৯—'কমিউনের শিক্ষা, কমিউনের স্মৃতি' (Lessons of the Commune, In Memory of the Commune)-বিংশ শতাব্দী, কলিকাতা।

—'ইয়োরোপে শ্রমিক আন্দোলনে মূল পার্থক্য' (Differences in the European Labour Movement)-বিংশ শতাব্দী, কলিকাতা।

—'সাম্রাজ্যবাদ ও সমাজতন্ত্রের বিভেদ' (Imperialism and the Split in Socialism)-বিংশ শতাব্দী, কলিকাতা।

—'তলস্তয় সম্পর্কিত প্রবন্ধাবলী' (Articles on Tolstoy)-বিংশ শতাব্দী, কলিকাতা।

—'যুব প্রসঙ্গে' (On Youth)-বিংশ শতাব্দী, কলিকাতা।

—'অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার সম্পর্কে' (On Provisional Revolutionary Government)-বিংশ শতাব্দী, কলিকাতা।

—'সমাজতন্ত্র ও যুদ্ধ'(Socialism and War) বিংশ শতাব্দী, কলিকাতা।

—'মার্কসবাদের ঐতিহাসিক বিকাশের কয়েকটি দিক' (Certain Features of the Historical Development of Marxism) মনীষা গ্রন্থালয়, কলিকাতা।

—'কোথা থেকে শুরু করতে হবে ?' ইত্যাদি (Where to begin ? etc)-মনীষা গ্রন্থালয়, কলিকাতা।

—'আমাদের বিপ্লবে সর্বহারার কর্তব্য' (The Tasks of the Proletariat in our Revolution)-মনীষা গ্রন্থালয়, কলিকাতা।

—'জাতীয় এবং উপনিবেশিক প্রশ্ন সম্পর্কিত প্রাথমিক খসড়া প্রস্তাব (Preliminary Draft Thesis on the National and the Colonial Question)-মনীষা গ্রন্থালয়, কলিকাতা।

—'কৃষিসংস্কারের সমস্যা সম্পর্কিত প্রাথমিক খসড়া (Preliminary Draft Theses on the Agrarian Question)-মনীষা গ্রন্থালয়, কলিকাতা।—'সংগ্রামী বস্তুবাদের তাৎপর্য সম্পর্কে' (On the Significance of Militant Materialism)-মনীষা গ্রন্থালয়, কলিকাতা।

—'বরং কম, তবে আরো ভালো' (Better fewer, but better)-মনীষা গ্রন্থালয়, কলিকাতা।

১৯৭০—'আসন্ন বিপর্যয় ও কিভাবে তাকে প্রতিহত করা যায়' (The Impending Catastrophe and How to Combat it)-মনীষা গ্রন্থালয়, কলিকাতা।

—'ফসলে (দেয়) ট্যাকস' (Tax in Kind)-মনীষা গ্রন্থালয়, কলিকাতা।

—'যে উত্তরাধিকার আমরা বর্জন করি' (The Heritage We Renounce) মনীষা গ্রন্থালয়, কলিকাতা।

৩০শে আগস্ট সাহিত্য অকাদেমীর (পূর্বাঞ্চল শাখা) লেনিন-জন্ম-শতবার্ষিকী সেমিনারে পঠিত।

ভারতে কৃষি-অর্থনীতির বিবর্তনের সমস্যা

কল্যাণ দত্ত

স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর তেইশ বছরে ভারতীয় অর্থনীতি ও রাজনীতিতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে এবং এখনও ঘটছে। বৃটিশযুগের অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থা যে অনড় হয়ে বসে নেই, বসে থাকতে পারে না, এ-কথা সকলেই স্বীকার করবেন। আমাদের জীবনে যে-সমস্ত সমস্যা, সঙ্কট ও অস্থিরতা প্রতিদিনই দেখা যাচ্ছে, তা সমাজের ভিত্তিমূলে আঘাতজনিত পরিবর্তনেরই বাহ্যরূপ। পরিবর্তনগুলি ভালো-কি-মন্দ এ-আলোচনার আগে ভেবে দেখতে হয় পরিবর্তনের প্রকৃতি কি। এ-সম্পর্কে একাধিক সমাজবিজ্ঞানী বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আলোচনা করেছেন, কিন্তু মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে সামগ্রিকভাবে আলোচনা এ-পর্যন্ত হয়েছে বলে অন্তত লেখকের জানা নেই। সম্প্রতি প্রকাশিত শ্রীরণজিৎ দাশগুপ্ত-র 'অর্থনৈতিক বিবর্তনের সমস্যা: ভারত-বিষয়ক আলোচনা' এরূপ একটি প্রচেষ্টা। এজন্য রণজিৎবাবুর কাছে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞ।

বইটিতে প্রচুর তথ্যের সমাবেশ করে লেখক তাঁর অসামান্য অধ্যবসায়ের স্বাক্ষর রেখেছেন। শুধু তাই নয়, মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে সেইসব তথ্যের বিশ্লেষণ করার ফলে আলোচনা বিক্ষিপ্ত না হয়ে সুসংবদ্ধ হয়েছে। ভারতীয় অর্থনীতির উপর লিখিত বহু পুস্তকেই এই গুণটির অভাব লক্ষ্য করা যায়। ঐ সমস্ত লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সামগ্রিকতা না থাকাই এর কারণ।

রণজিৎবাবুর মূল সিদ্ধান্ত হলো: ভারতীয় অর্থনীতিতে পুঁজিবাদের বিকাশ হচ্ছে, কিন্তু সে-বিকাশ অবাধ নয়। প্রতি পদেই তাকে ঔপনিবেশিক, সামন্ততান্ত্রিক ও প্রাকপুঁজিবাদী সমাজের সম্পর্কগুলির দ্বারা ব্যাহত হতে হচ্ছে। এই দ্বন্দ্বের ফলাফল হলো অর্থনৈতিক বিকাশের মন্থরতা, সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতা ও রাজনৈতিক জীবনে অস্থিরতা।

'Problems of Economic Transition : Indian Case Study by Ranjit Dasgupta, Price Rs. 25.00, Published by National Publishers, 206 Bidhan Saranee, Calcutta-6.

মার্কসের মতে পুঁজিবাদী সমাজবিকাশের দুটি ধারা আছে। প্রথমটি বিপ্লবী ধারা, যা দেখা গেছে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকায়। এখানে কৃষক ও কুটিরশিল্পীরাই পুঁজিপতিতে পরিণত হয়েছে। দ্বিতীয়টি হলো প্রাশিয়ান ধারা। এখানে বণিক ও মহাজনেরাই সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থার উপর কর্তৃত্ব করে মুনাফা কামায়। উৎপাদনের গতি এখানে মন্থর, কৃষক ও কুটিরশিল্পীদের উপর শোষণের মাত্রা অত্যধিক, উৎপাদন ব্যবস্থায় কোনোও বৈপ্লবিক পরিবর্তন এখানে হয় না। রণজিৎবাবুর মতে ভারতের পুঁজিবাদ এই দ্বিতীয় ধারাতেই বিকশিত হচ্ছে। মহাজনী ও বণিক শোষণের সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ভারতের উৎপাদন ব্যবস্থাকে প্রাচীনত্বের বেড়াজালে আটকে রেখেছে, শিল্প-পুঁজির বিকাশকে ব্যাহত করছে।

ইংলণ্ড আমেরিকা ইত্যাদি ক্লাসিক পুঁজিবাদী দেশে শ্রেণী-সম্পর্ক অপেক্ষাকৃত সরল। সেখানে দুটি শ্রেণী—একদিকে শিল্প-শ্রমিক যারা মজুরির বিনিময়ে শ্রমক্ষমতা বিক্রি করছে; অন্যদিকে পুঁজিপতি, যারা শোষণের জন্য পুঁজিকে ক্রমশই শিল্পে নিয়োগ করছে। ভারতের শ্রেণী-সম্পর্ক ও শোষণ ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত জটিল। এখানে দেশী-বিদেশী পুঁজি একদিকে যেমন শিল্পে নিযুক্ত হচ্ছে, অন্যদিকে সামন্ততান্ত্রিক শোষণ এবং মহাজনী ও বণিক-পুঁজি শিল্প-পুঁজির বিকাশকে ব্যাহত করছে, শিল্পায়নের গতিকে রুদ্ধ করছে।

রণজিৎবাবুর সিদ্ধান্ত অবশ্যই তর্কসাপেক্ষ। বর্তমান লেখকের মতে তিনি সামন্ততান্ত্রিক শোষণ এবং বণিক ও মহাজনী পুঁজির ভূমিকাকে অতিরিক্ত বড় করে দেখেছেন। এ-কথা অবশ্য এখনও বলার সময় হয়নি যে ভারত পুরোপুরি একটা পুঁজিতান্ত্রিক দেশে পরিণত হয়েছে। কিন্তু পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্কগুলি অনেকক্ষেত্রে যেভাবে সামন্ততান্ত্রিক ও মহাজনী শোষণকে ক্ষুণ্ণ করছে তা-ও উপেক্ষণীয় নয়। এইসকল ঘটনা রণজিৎবাবুর দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। এ-ছাড়া কিছু সংজ্ঞাগত ও বিশ্লেষণ পদ্ধতির বৈগুণ্যের ফলেও রণজিৎবাবুর সিদ্ধান্ত একপেশে হয়েছে।

কৃষিতে পুঁজিবাদের বিকাশ সম্পর্কে রণজিৎবাবুর অভিমত নিয়েই এ-প্রবন্ধে আলোচনা করছি।

কংগ্রেসের ভূমি সংস্কার যে সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কের প্রাধান্য নষ্ট করতে পারেনি তা প্রমাণ করতে গিয়ে লেখক যে-সমস্ত তথ্যের উল্লেখ করেছেন তা হলো:

১ জমির মালিকানা ক্রমশই অল্প লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে এবং ক্রমশই বেশি সংখ্যায় কৃষকেরা ভূমিহীন ও নির্বিত্ত হচ্ছে।

২ বড় বড় জমির মালিকেরা নিজ তত্ত্বাবধানে মজুর লাগিয়ে চাষ করছে না, জমিতে কোনোও পুঁজিও লগ্নী করছে না, বর্গাপ্রথায় চাষ ক্রমশ বাড়ছে।

৩ বড় বড় জমির মালিকেরা উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধির কাজে পুঁজি নিয়োগ করছে না ; বড় জোতের চেয়ে ছোট জোতের একর পিছু ফলন বেশি। নিজে চাষ না করে প্রজাদের দিয়ে চাষ করানোর ফলেও জমির উৎপাদিকা শক্তি কম হচ্ছে।

৪ খাজনার হার এত বেশি যে প্রজাদের হাতে পুঁজি জমতে পারছে না।

অল্পসংখ্যক লোকের হাতে জমি কেন্দ্রীভূত হচ্ছে—এর তাৎপর্য কী? এ-বিষয়ে লেনিন বলেছেন :

"Majority of writers···regard the disintegration of the peasantry simply as the rise of property inequality··· undoubtedly, the rise of property inequality is the starting point of the whole process, but the process is not confined to "differentiation" at all. The old peasantry is not only differentiating, it is being completely dissolved, it is ceasing to exist, it is being ousted by absolutely new types of rural inhabitants—types that are the basis of a society in which commodity economy and capitalist production prevail. These types are the rural bourgeoise and the rural proletariat—a class of commodity producers in agriculture and a class of agricultural wage-workers." (লেনিন : Development of capitalism in Russia, পৃষ্ঠা ১৭৪)।

লেনিনের মতে অল্পসংখ্যক লোকের হাতে যখন জমি কেন্দ্রীভূত হয়, তখন থেকেই ধনতন্ত্রের সূত্রপাত। এর ফলে নির্বিত্ত কৃষকেরা শ্রমক্ষমতা বিক্রি করতে বাধ্য হয় এবং পুঁজিবাদ হচ্ছে সেই ধরনের অর্থনীতি যেখানে শ্রমক্ষমতা পণ্যে পরিণত হয়। কংগ্রেসী ভূমিসংস্কারের ফলে আজ যদি সারা দেশে স্বত্ববান মধ্য-কৃষকের প্রতিষ্ঠা হতো তাহলেই বরং পণ্য অর্থনীতি ও পুঁজিবাদ গড়ে উঠতে পারত না। কারণ মধ্য-কৃষক কেনা-বেচা সামান্যই করে ;

শ্রমক্ষমতা সে কেনে না বা বেচে না। এই ধরনের অর্থনীতিতেই বরং সামন্ততান্ত্রিক ও মহাজনী শোষণ তীব্রতম হয়। মধ্যকৃষক সচ্ছল নয়, সে বাড়তি আয়ের পথ খোঁজে। আবার সম্পত্তি থাকায় সে কলে-কারখানায় মজুর হিসাবে খাটতেও যেতে পারে না। তাই অ-কৃষক খাজনাভোগী জমির মালিকের জমিতে সে নিজের হাল-বলদ নিয়ে খাটতে যায়। এখানে জমির মালিককে কোনোও পুঁজিই নিয়োগ করতে হয় না, কারণ চাষের যন্ত্রপাতি বা খোরাকির (যা-ও একরকম পুঁজি) জন্য মধ্য-কৃষক অপরের উপর নির্ভরশীল নয়।

সামন্ততান্ত্রিক শোষণের ভিত্তি natural economy অর্থাৎ এমন ধরনের অর্থনীতি যেখানে কেনা-বেচার পরিধি সীমিত; সেখানে উৎপাদকেরা সরাসরি নিজেদের ভোগের জন্য উৎপাদন করে, তারাই উৎপাদনের উপকরণের মালিক। উৎপাদকদের উদ্বৃত্ত ফসল যে খাজনা হিসাবে জমিদারদের ঘরে যায়, তার কোনোও অর্থনৈতিক কারণ নেই—তার কারণ, মার্কস যাকে বলেছেন extra-economic coercion। জমিদারেরা ততদিনই কৃষকদের শোষণ করতে পারে যতদিন তারা রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত।

অন্যদিকে পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থা পণ্য-অর্থনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এখানে বিক্রয়ের জন্যই উৎপাদন। কি ভোগ্যবস্তু, কি উৎপাদনের উপকরণ, সব-কিছুই এখানে কিনতে হয়। অর্থ, বাজার ও প্রতিযোগিতা হলো পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য। দামের টানাপোড়েন ও প্রতিযোগিতার ফলশ্রুতি হিসাবেই এখানে একদল উৎপাদক হয় নির্বিত্ত। তখন তারা শ্রমক্ষমতা পণ্য হিসাবে বিক্রি করে। শ্রমক্ষমতা কিনে তার থেকে উদ্বৃত্ত শ্রম আদায় করেই পুঁজিপতিরা নিজেদের মুনাফা ওঠায়। কৃষকদের হাতে জমি ও উৎপাদনের উপকরণ না থাকলে যেমন সামন্ততান্ত্রিক শোষণ সম্ভব নয়, তেমনি যতদিন তাদের হাতে জমি আছে ততদিন পুঁজিবাদী শোষণও সম্ভব নয়। তাই ভারতে জমির মালিকানার যে-কেন্দ্রীভবন ঘটেছে, তা সামন্ততান্ত্রিক শোষণের অবসানই সূচিত করছে।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে, জমির মালিক যদি উৎপাদনের কাজে কোনোওরকম খরচ বা তত্ত্বাবধান না করে প্রজাদের কাছে খাজনার বিনিময়ে জমি বিলি করে দেয়, তাহলেও কি তাকে সামন্ততন্ত্রের পর্যায়ে ফেলা যাবে না? রণজিৎবাবু absentee landlordism-এর কথা বলেছেন। এ-সম্পর্কে তথ্যাদি বিচার করা যাক।

১৯৫৪-৫৫ সালে ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভের সমীক্ষায় দেখা যায় যে কৃষি-জমির শতকরা ২৪ ভাগ লীজ নেওয়া হয়েছে; এর অর্ধেক অর্থাৎ শতকরা ১২ ভাগ লীজ নেওয়া হয়েছে বাইরের লোকেদের কাছ থেকে, অর্থাৎ যারা গ্রামাঞ্চলে থাকে না তাদের কাছ থেকে। তারা অবশ্য কোন শ্রেণীর লোক তা বোঝার উপায় নেই। যেমন অনেক গরীব লোক শহরে খাটতে যায় নিজেদের জমি অন্যকে লীজ-বিলি করে। এইসব লোকেরা চাষের কোনোও খরচ বহন করে কিনা তাও জানা যায় না।

এইবারে দেখা যাক গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে পুরোপুরি অ-কৃষক খাজনা-ভোগীরা কত জমি বিলি করেছে। ঐ সমীক্ষাতেই প্রকাশ যে এই ধরনের লোকেরা মোট কৃষি-জমির শতকরা ৩ ভাগ মাত্র খাজনায় বিলি করেছে। শতকরা ৯ ভাগ এসেছে সেই সমস্ত কৃষকের কাছ থেকে যারা নিজেরাও কিছু জমি চাষ করে।

অর্থাৎ সমগ্র ভারতে কৃষি-জমির শতকরা ১৫ ভাগ আসে অ-কৃষক খাজনাভোগীদের কাছ থেকে, আর শতকরা ৯ ভাগ আসে যাদের কাছ থেকে তারা একদিকে কৃষক অন্যদিকে খাজনাভোগী।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বিচার করা দরকার। **ভারতের সব অঞ্চলেই দেখা যায় যে যারা নিজেদের জমি পুরোপুরি বিলি করে দেয় তারা অপেক্ষাকৃত কম জমির মালিক; অন্যদিকে যারা নিজেদের জমির কিছুটা বিলি করে আর কিছুটা নিজে চাষ করে (নিজ মেহনতে অথবা তত্ত্বাবধানে) তারা বেশি জমির মালিক।** নিচের তালিকাটি লক্ষণীয়:

অঞ্চল	জমির মালিকানার গড় পরিমাণ (একর)		
	সমস্ত পরিবারের	যারা পুরোপুরি জমি বিলি করে	যারা অংশত জমি বিলি করে
উত্তর ভারত	৩'৫৩	২'৯২	৮'৪৫
পূর্ব ভারত	২'৯৬	১'২৯	৬'১২
দক্ষিণ ভারত	৩'৪২	২'৫৫	১০'৯৩
পশ্চিম ভারত	৭'১৮	৮'৬৮	১৮'৪২
মধ্য ভারত	৮'২০	৫'৯৫	১৮'০২
উত্তর-পশ্চিম ভারত	৭'১৭	৬'৭১	১২'৮৮
সমগ্রভারত	৪'৭২	৪'২১	১০'৯৩

দেখা যাচ্ছে যে যারা পুরোপুরি খাজনাভোগী তাদের জমির পরিমাণ অপেক্ষাকৃত সামান্য। একমাত্র পশ্চিম ভারত বাদ দিলে আর সব অঞ্চলেই তাদের গড় জমি আঞ্চলিক গড়ের চেয়েও কম। কিন্তু যারা একাধারে কৃষক ও অন্যদিকে খাজনাভোগী, তাদের জমির পরিমাণ সর্বত্রই আঞ্চলিক গড়ের চেয়ে বেশি।

খাজনায় জমি বিলি করাই যদি সামন্তপ্রথার নিদর্শন হয় তবে বলতে হবে যে, ভারতে গরীবেরাই সামন্ত-শোষক আর ধনীরা পুরোপুরি সামন্ত-শোষণ চালায় না।

গ্রামে যদি সামন্ত-শোষণের প্রাধান্য থাকত তাহলে এর বিপরীত চিত্রই আমরা দেখতাম। আমরা দেখতাম যে, বড় বড় জমির মালিকরাই তাদের পুরো জমিটা বিলি করছে; কেননা জমি থাকলেও তারা শ্রম করে না বা শ্রমক্ষমতা কেনে না। সামন্ত-প্রথায় ছোট জমির মালিকেরাই উৎপাদক, তারা জমি বিলি করে না বরং জমি বন্দোবস্ত নেয়। আসল অবস্থা হলো যে, ছোট ছোট জমির মালিকেরা উৎপাদনের উপকরণ হারিয়ে জমি বিলি করে দিতে বাধ্য হচ্ছে। জমি বিলি করে তারা শ্রমক্ষমতা বিক্রি করছে গ্রামে ও শহরে। এটা সামন্ত-প্রথা ধ্বংসেরই পরিচয়।

কিন্তু কথা উঠতে পারে যে, বড় জমির মালিকেরা সম্পূর্ণ জমি নিজে বা মজুর লাগিয়ে চাষ না করে খাজনায় বন্দোবস্ত করে দিচ্ছে কেন? এর অর্থ কি এই নয় যে পুঁজিবাদী বিকাশের পরিবর্তে সামন্ত-প্রথার অবশেষটাই টিঁকে থাকছে? এটা অবশ্য রণজিৎবাবুর মত। খাজনা যেহেতু জমিদার-জোতদারের আয়, অতএব আক্ষরিক ও আইনগত অর্থে খাজনা নেওয়াটা সামন্ততান্ত্রিক শোষণ। কিন্তু পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদের আকারগত প্রভেদ না দেখে যদি সারবস্তুটা দেখা হয় তাহলে জমি বিলি বা বর্গাচাষমাত্রকেই সামন্ত-প্রথা বলা চলে না।

এ-প্রসঙ্গে মার্কস ও লেনিনের বক্তব্যগুলি মনে রাখা দরকার। সামন্ত-তান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী কৃষিব্যবস্থায় মৌলিক প্রভেদগুলি লেনিন এইভাবে দেখিয়েছেন:

"...The methods of obtaining the surplus product under corvee (সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা) and under capitalist economy are diametrically opposite: the former is based on the

producer being provided with land, the latter on the producer being divorced from land.…a condition for such a system of economy was the personal dependence of the peasant on the landlord. If the landlord had not possessed direct power over the person of the peasant, he could not have compelled a man who had a plot of land and conducted his own husbandry to work for him. Hence, there was required "extra-economic coercion" as Marx calls it in describing this economic regime...." (লেনিন : Development of Capitalism in Russia, পৃষ্ঠা ১৯২)

১৮৬১ সালে ভূমি-সংস্কারের পর রাশিয়াতে কৃষকেরা জমি পেয়েছিল। কিন্তু জমিদারদের হাতেও বিস্তর জমি রয়ে গেল, যেগুলি তারা কৃষকদের ভাড়া দিত। এই জমির জন্য কৃষকেরা খাজনা দিত—কখনও বা ফসলের ভাগ দিয়ে (আমাদের দেশে বর্গা-প্রথার মতো) কখনও বা জমিদারদের খাস জমিতে বেগার খেটে। এই প্রথাকে বলা হতো otrabotki. এর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে লেনিন বলেছেন: "…here we see "renting" which is simply a survival of corvee economy (সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা) and which sometimes passes imperceptibly into the capitalist system of providing the estate with agricultural workers by alloting patches of land to them…thus, we have here *renting of quite a special kind*, one expressing not the abandonnment by the landowner of his own farm, but the development of private landowner cultivation,—expressing not the consolidation of the peasant farm by the enlargement of the area held, but the *conversion of the peasant into an agricultural worker*." (লেনিন : ঐ, পৃষ্ঠা ২০০-২০১)

লেনিন দেখিয়েছেন যে সব বর্গাচাষের প্রকৃতি এক নয়। কোনোও ক্ষেত্রে বর্গাদারের নিজের হালবলদ ও পুঁজি থাকে; কোনোও ক্ষেত্রে তার কিছুই থাকে না। এই দুই ধরনের বর্গাদারদের সম্পর্কে লেনিন লিখেছেন:

"Otrabotki, as practised in present day landlord farming should be divided into two types :

(1) Otrabotki that can only be performed by a peasant farmer who owns draught animals and implements and (2) Otrabotki that can be performed by a rural proletarian who has no implements. It is obvious that for both peasant and landlord farming, the first and the second type of otrabotki one of opposite significance, and that *the latter type constitutes a direct transition to capitalism merging with it by a number of quite imperceptible transition.*" (লেনিন : ঐ, পৃষ্ঠা ২০৭)

বর্গাচাষ মাত্রই যে সামন্ততান্ত্রিক শোষণ এ-ধারণা অতি-সরলীকৃত এবং ভ্রান্ত। লেনিন বর্গাচাষকে দেখেছেন দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে। যেখানে পণ্য-অর্থনীতি বিস্তার লাভ করেছে, জমিদারেরা যেখানে উৎপন্ন ফসলকে পণ্য হিসাবে বিক্রি করছে, বাজার অর্থনীতি ও প্রতিযোগিতার ফলশ্রুতি রূপে যেখানে কৃষকদের এক অংশ সর্বস্বান্ত হচ্ছে, এইরূপ অর্থনীতিতে বর্গাচাষ সরাসরিভাবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়। নিঃস্ব বর্গাচাষী আর ক্ষেতমজুরের মধ্যে আকারগত প্রভেদ থাকলেও সারবস্তুগত প্রভেদ নেই। কৃষিতে পুঁজিবাদ কখনোই শিল্পে পুঁজিবাদের রূপ নিতে পারে না।

কৃষিতে একজন মালিকের তত্ত্বাবধান-ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত সীমিত, বিশেষ করে তার জোতগুলি যদি ছড়ানো থাকে। এই অবস্থায় কিছু জমিতে নিজ তত্ত্বাবধানে এবং বাকি অংশে বর্গাপ্রথায় চাষই স্বাভাবিক ঘটনা।

এই প্রসঙ্গে আবার লেনিনকে উদ্ধৃত করছি : "... our literature frequently contains too stereotyped an understanding of the theoretical proposition that capitalism requires the free landless worker. This proposition is quite correct as indicating the main trend, but capitalism penetrates into agriculture particularly slowly and in extremely varied forms. The allotment of land to the rural worker *is*

very often done in the interests of the rural employers themselves, and that is why the allotment holding rural worker is a type to be found in all capitalist countries." (লেনিন, ঐ, পৃষ্ঠা ১৭৯)

বর্গাদারদের কতজনের কৃষি-যন্ত্রপাতি আছে আর কতজন নিঃস্ব এ-সম্পর্কে রণজিৎবাবু কোনোও তথ্য দেননি, যদিও বর্গাপ্রথার চরিত্র বিচারে এ-তথ্য একান্ত প্রয়োজনীয়। যারা জোতদার তারা খাজনার ফসল নিজেদের ভোগে কতখানি লাগায়, কতখানি তারা মুনাফার উদ্দেশ্যে বাজারে বিক্রি করে, এ-বিষয়েও রণজিৎবাবু কোনোও আলোচনা করেননি। এ-কথা অবশ্য সকলেই জানেন যে বর্তমানকালের জোতদারেরা, বিশেষ করে কৃষক-জোতদারেরা, নিজেদের উপার্জন ভোগবিলাসে খরচ করে না। যে-উদ্বৃত্ত তারা লাভ করে তাকে পুঁজি হিসাবে খাটানোতেই তাদের প্রবণতা।

মার্কস যাকে extra-economic coercion বলেছেন, সামন্ততান্ত্রিক শোষণের পক্ষে তা অপরিহার্য অঙ্গ। ভারতে এই ধরনের উৎপীড়ন যে বহুলাংশে কমে গেছে তাও বাস্তব ঘটনা। এই অবস্থায় জমির মালিক ও ধনী কৃষকদের শোষণ চালানোর কেবলমাত্র একটি উপায়ঃ তা হলো কৃষকদের জমি ও উৎপাদনের উপকরণ থেকে বঞ্চিত করে তাদের শ্রমক্ষমতা বিক্রি করতে বাধ্য করা। Extra economic coercion নেই বলেই বর্গাদারদের জমি থেকে উচ্ছেদ করা হয় এবং জমিতে তাদের স্বত্বও দেওয়া হয় না। অথচ এই ঘটনাকে রণজিৎবাবু সামন্ততান্ত্রিক শোষণের পরিচয় হিসাবেই দেখেছেন।

রণজিৎবাবু বলেছেন ছোট ছোট কৃষকদের জমি থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে কিন্তু এর ফলে বৃহদায়তন কৃষির প্রবর্তন হচ্ছে না (পৃষ্ঠা ১৩৭)। এর সপক্ষে তিনি কোনোও তথ্য উপস্থিত করেননি। এ-কথা অবশ্যই স্বীকার্য যে ভারতের বহু অঞ্চলে ছোট জোতের সংখ্যাই বেশি। কিন্তু বেশ কয়েকটি অঞ্চলে যে বড় বড় জোতের আবির্ভাব হয়েছে, ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভের ১৯৬১-৬২ সালের সমীক্ষায় তা দেখা যায়। এই কয়েকটি অঞ্চল সম্পর্কে তথ্য নিচে দেওয়া হলোঃ

অঞ্চল	২০ একর ও তার বেশি জোতে	
	মোট কৃষি-জমির কত অংশ চাষ করা হয়	মোট লীজ দেওয়া জমির কত অংশ লীজ নেওয়া হয়েছে
অন্ধ্র	৪৩.৮৮	২৭.৯৪
গুজরাট	৫১.১১	৪৪.৫৪
মধ্যপ্রদেশ	৪১.৯৮	৩৪.৭৭
মহারাষ্ট্র	৫৫.০২	৫৩.১৩
মহীশূর	৪৫.৮৪	৫০.৪৭
পাঞ্জাব	৪০.৯১	৩৩.৫৬
রাজস্থান	৬০.৭৩	৫৮.১৭

উপরোক্ত অঞ্চলগুলিতে দেখা যাচ্ছে যে মোট কৃষি-জমির শতকরা ৪০ ভাগ, কোথাও বা শতকরা ৬১ ভাগ, চাষ করা হচ্ছে ২০ একর ও তার বেশি পরিমাণ জোতে। আরও লক্ষণীয় যে, এই বড় বড় জোতের মালিকেরাই লীজ দেওয়া জমির বড় অংশ বন্দোবস্ত নিয়েছে। ছোট ছোট জোতে বর্গাপ্রথায় চাষ হচ্ছে—এই চিত্র রণজিৎবাবু তুলে ধরতে চান। উপরোক্ত অঞ্চলগুলি নিশ্চয় তার ব্যতিক্রম।

জমিতে মূলধন লগ্নীর হার বাড়ানো পুঁজিবাদের একটা বড় লক্ষণ। অবশ্য এটাকেই মূল বৈশিষ্ট্য বলে মনে করা ভুল। এমনকি শিল্পেও পুঁজিপতিরা সবসময়ে অবাধগতিতে মূলধন লগ্নী বাড়িয়ে চলে না। কিন্তু পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে যেহেতু প্রতিযোগিতা আছে এবং প্রতিযোগিতায় লাভের অঙ্ক বাড়ানোর জন্য উৎপাদিকাশক্তির বিকাশের প্রয়োজন, সেইজন্য মূলধন লগ্নীর হারও সাধারণভাবে বেড়ে চলে। সামন্তপ্রথায় এ-প্রচেষ্টা একান্তভাবেই অনুপস্থিত। রণজিৎবাবু বলেছেন যে, আমাদের দেশে বড় বড় জমির মালিকেরা জমিতে পুঁজি লগ্নী করে না, তারা বরং জমি কেনাতে ও মহাজনী কারবারে টাকা খাটায়। মহাজনী কারবারের আলোচনা পরে করা যাবে, কিন্তু জমি কেনার জন্য টাকা খাটানোকে রণজিৎবাবু পুঁজিবাদী কর্মধারার অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেন না কেন? উৎপাদনের উপকরণাদি কেন্দ্রীভূত করা তো পুঁজিবাদেরই অন্যতম মূল বৈশিষ্ট্য। জমি কেনা ছাড়াও কৃষকেরা যে অন্য ব্যাপারে ক্রমশ বেশি বেশি পুঁজি খাটাচ্ছে, এ-তথ্যও একেবারে অস্বীকার

করা যায় না। অবশ্যই ফসলের চড়া দাম, উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি ও সারের দুষ্প্রাপ্যতা, সেচব্যবস্থার অপ্রতুলতা ইত্যাদি নানা কারণে উৎপাদনের কাজে পুঁজি. লগ্নীর হার কম-বেশি হতে পারে। কিন্তু মূল কথা হলো যে এ-ব্যাপারে ধনী কৃষকদের অনীহা অথবা আগ্রহ, কোনটি বাস্তব সত্য?

Reserve Bank of India-র Rural credit follow up survey থেকে নিচের তথ্যগুলি উদ্ধৃত করা হলো:

জমি ও গবাদি পশু ক্রয় ব্যতীত অন্যান্য খাতে মূলধন খরচ

একর পিছু টাকা

	১৯৫১-৫২	১৯৫৮-৫৯
জলপাইগুড়ি	১	৭
মির্জাপুর	১	৭
হিসার	০	৫
আমেদাবাদ	৮	৭
কুডাপ্পা	৯	১০

খামার পিছু টাকা

	১৯৫১-৫২	১৯৫৬-৫৭
ব্রোচ	৯২	১৫১
পশ্চিম গোদাবরী	৩৫১	২৮০
কইম্বাটুর	৪০৩	৩২০

উপরের তথ্য থেকে দেখা যায় যে, একর পিছু মূলধনী খরচ সব জেলাতেই বেড়েছে (আমেদাবাদ ছাড়া)। খামার পিছু খরচ তিনটি জেলার মধ্যে একটিতে বেড়েছে, অন্য দুটিতে কমেছে। খামার পিছু হিসাবের একটা অসুবিধা এই যে, খামারের সংখ্যা বেড়েছে না কমেছে তার কোনোও হিসাব নেই। ফলে একর পিছু মূলধন লগ্নী বাড়ল না কমল বোঝা যায় না।

রণজিৎবাবু বলেছেন ছোট জোত অপেক্ষা বড় জোতের উৎপাদিকা শক্তি কম। এর সপক্ষে তিনি Farm Management Survey-র তথ্যাদিও উপস্থিত করেছেন। এই তথ্য সম্বন্ধে একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, এখানে জোতের বড়-ছোট বিচার করা হয়েছে একরের পরিমাণ দিয়ে। জমির উর্বরতা-অনুর্বরতা সেচ ও সেচবিহীন এলাকার পার্থক্য ধরা হয়নি।

কিন্তু সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি যে, সেচ এলাকায় এক একর জমির যা গুণ তা সেচহীন এলাকার একাধিক একরের সমান। সুতরাং এ-তথ্য থেকে এ-কথা বলা যায় না যে, বড় জোতের মালিকেরা উৎপাদিকা শক্তি বাড়াতে অপেক্ষাকৃত কম আগ্রহসম্পন্ন।

এ-প্রসঙ্গে অবশ্য তত্ত্বগত একটা বিচার তোলা প্রয়োজন। পুঁজিবাদী অর্থনীতির সঙ্গে প্রাকপুঁজিবাদী অর্থনীতির মৌল পার্থক্য কি একর পিছু উৎপাদনের হ্রাস-বৃদ্ধি দিয়ে বিচার হবে? ধনতান্ত্রিক কৃষিব্যবস্থা বলতেই অনেকের মনে একটা ছবি ভেসে ওঠে—বড় বড় জোত, মাইনে করা মজুরেরা ট্রাকটর দিয়ে চাষ করছে, একর পিছু ফলন বাড়ছে ইত্যাদি। আমার মতে এগুলি পুঁজিবাদের লক্ষণ, কিন্তু তার মূল বৈশিষ্ট্য নয়। এই লক্ষণগুলি দেখা দেবে কি না তা নির্ভর করে বিশেষ বিশেষ দেশের ঐতিহাসিক পারিপার্শ্বিকতার উপর। যেমন আমেরিকায় ধনতান্ত্রিক কৃষির যে-চেহারা হবে, ভারতে নিশ্চয় তা হবে না। কিন্তু সব পুঁজিবাদী অর্থনীতিরই একটি মূল চরিত্র—তা হলো পণ্য-অর্থনীতির চরমতম বিকাশ। উৎপাদনের যত বেশি অংশ বিক্রয়ের জন্য নির্দিষ্ট হবে, শ্রমক্ষমতা যত বেশি পণ্যে পরিণত হবে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থাও তত দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হবে।

এই প্রসঙ্গে নিচের তালিকাটি রণজিৎবাবুর বই থেকেই উদ্ধৃত করছি (পৃষ্ঠা ১৬২):

জোতের পরিমাণ (একর)	মোট ফসলের কত শতাংশ উদ্বৃত্ত পণ্য
০—৫	৩৩·৬
৫—১০	২৭·৪
১০—১৫	২৩·১
১৫—২০	৩০·১
২০—২৫	৩২·২
২৫—৩০	৩৯·৭
৩০—৪০	৩৯·৮
৪০—৫০	৪৬·৪
৫০ উর্দ্ধ্ব,	৫১·৪

দেখা যাচ্ছে গরীব কৃষক (৫ একরের নিচে) ও ধনী কৃষকই (২৫ একরের উপর) তাদের উৎপাদনের বেশি অংশ পণ্য হিসাবে বিক্রি করে। ধনী কৃষকের জমিতে একর পিছু উৎপাদন কম হতে পারে—কিন্তু উৎপাদনের ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ তারা বাজারে বিক্রি করছে আর মধ্য-কৃষক বিক্রি করছে ২৩ থেকে ৩২ শতাংশ।

তথ্যটি রণজিৎবাবু উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু ধনতান্ত্রিক বিকাশের পক্ষে এর তাৎপর্য উপলব্ধি করেননি। কারণ, পণ্য-অর্থনীতির ব্যাপকতা তাঁর কাছে অর্থবহ নয়; কৃষিতে যন্ত্রের প্রয়োগ এবং উৎপাদিকাশক্তির বৃদ্ধিকেই তিনি পুঁজিবাদী অর্থনীতির মূল বৈশিষ্ট্য বলে মনে করছেন।

আমেরিকা ও পশ্চিম ইওরোপের পুঁজিবাদী দেশে ধনী কৃষকেরা উন্নত প্রথায় চাষ করে উৎপাদিকাশক্তিকে যথেষ্ট বাড়িয়ে তুলেছে। কিন্তু এটা সম্ভব হতো না, যদি না কৃষি পণ্য-অর্থনীতির অন্তর্ভুক্ত হতো। মুনাফার জন্য বিক্রয় করা যেখানে উৎপাদনের লক্ষ্য, কৃষি-পণ্যকে যেখানে বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়, সেই অর্থনীতিতে কৃষিউৎপাদনের টেকনিক বা কলাকৌশল কখনও মান্ধাতার আমলে পড়ে থাকতে পারে না। তার মানে অবশ্যই এই নয় যে, টেকনিকাল বিপ্লব যতদিন না হচ্ছে ততদিন পুঁজিবাদের বিকাশ হয়েছে এ-কথা বলা যাবে না। তাই পণ্য-অর্থনীতির বিকাশকেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলে স্বীকার করতে হয়।

রণজিৎবাবু বলেছেন (পৃষ্ঠা ১৮০) যে, বাজারের আয়তন অতিমাত্রায় সীমিত হওয়ার জন্য পুঁজিবাদের বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে। তিনি অবশ্যই স্বীকার করেছেন যে, পণ্য-অর্থনীতির বিস্তৃতি ও ছোট ছোট খামার ধ্বংস হওয়ার ফলে পুঁজিবাদী বাজারের সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই বাজার যে বাড়তে পারছে না তার জন্য তিনি চারটি কারণ দেখিয়েছেন ঃ

১ যে-সব কৃষক উৎখাত হয়ে যাচ্ছে তারা শ্রমক্ষমতা বিক্রি করছে না,- তারা বর্গাদার হিসাবে ছোট ছোট জোতে চাষ করছে।

২ খাদ্যশস্য উৎপাদনকারী কৃষকেরা তাদের ফসলের বেশির ভাগটাই নিজেরা খায় অথবা গরীবদের দাদন হিসাবে দেয়।

৩ কৃষকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যেহেতু অতি দুঃস্থ, সেজন্য তাদের ভোগের মান অত্যন্ত কম।

৪ এখনও যন্ত্রপাতি, সার ইত্যাদি উৎপাদনের উপকরণের চাহিদা খুবই কম।

পুঁজিবাদী বাজারের বিকাশ সম্পর্কে মার্কসীয় বিশ্লেষণ মেনে নিয়েও রণজিৎবাবু কার্যত তাকে অস্বীকার করছেন। তিনি যদি বলেন যে উন্নত পুঁজিবাদী দেশের তুলনায় আমাদের দেশের বাজার সীমিত, তাহলে তর্কের কোনোও অবকাশ নেই। কিন্তু মূল প্রশ্ন সেটা নয়। মূল প্রশ্ন অতীতের তুলনায় আমাদের দেশের বাজার ক্রমশই বাড়ছে কি না এবং ভবিষ্যতেও সে-বাজার আরও বাড়বে কি না। **কৃষকেরা যতই জমি ও উৎপাদনের উপকরণ হারাতে থাকবে, মধ্য-কৃষক-অর্থনীতি যতই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, ততই যে পুঁজিবাদী বাজার বাড়বে—মার্কসের এই বিশ্লেষণ মেনে নিলে এটা অস্বীকার করা যায় না যে ভারতে পুঁজিবাদী বাজারের বিকাশ ঘটছে ও ঘটবে।**

এবারে রণজিৎবাবু যে-চারটি কারণ দেখিয়েছেন, সেগুলি আলোচনা করা যাক। প্রথমত তিনি বলেছেন যে জমিহারা হয়েও কৃষকেরা মজুরে পরিণত হচ্ছে না, ছোট ছোট বর্গাচাষীতে পরিণত হচ্ছে। যে-সমস্ত বর্গাচাষীর জমি হাল-বলদ কিছুই নেই তাদের সঙ্গে মজুরদের যে মৌলিক পার্থক্য করা যায় না সে-কথা আমরা আগে দেখিয়েছি। এখন দেখা যাক যে মধ্য-কৃষকের তুলনায় ছোট ছোট বর্গাচাষীর সংখ্যা বাড়লে পুঁজিবাদী বাজার বিস্তৃততর হয় কি না। বিভিন্ন কৃষক তাদের ফসলের কত অংশ বাজারে বিক্রি করে এ-সম্পর্কে এর আগে যে-তথ্য দেওয়া হয়েছে, তাতে পরিষ্কার দেখা যাবে যে মধ্য-কৃষক অপেক্ষা গরীব ও ধনী কৃষকেরাই ফসলের বেশি অংশ বাজারে বিক্রি করে। ধনী কৃষকেরা বিক্রি করে মুনাফার জন্য, গরীবেরা বিক্রি করতে বাধ্য হয় কারণ চাষের উপকরণ, গৃহস্থালীর সরঞ্জাম এবং অসময়ের খাদ্য তাদের কিনে খেতে হয়। যেটা দেখা দরকার তা হলো সার, বীজ, গবাদি পশুর খাদ্য, গৃহস্থালির সরঞ্জাম (বাঁশ, খড়, জালানি) ইত্যাদির কত অংশ কৃষক তার নিজস্ব খামার থেকে পায় আর কত অংশ তাকে কিনতে হয়। এটা জানা কথা যে মধ্য-কৃষক এই জিনিসগুলির বেশির ভাগটাই নিজের খামার থেকে পায় আর গরীব কৃষককে এগুলি কিনতে হয়। ধনী কৃষক যেহেতু উন্নত ধরনের বীজ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক ঔষধ, পাকা বাড়ির সাজসরঞ্জাম কিনতে চায়; সেজন্য সেও তার ফসলের বেশির ভাগ অংশ বিক্রি করে।

ক্ষেতমজুরদের তুলনায় বর্গাচাষীর সংখ্যা বেশি বলে বাজারের আয়তন সীমিত—রণজিৎবাবুর এই বক্তব্যের উত্তরে আরও একটি কথা বলা প্রয়োজন। জমিদার বা জোতদার প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা হিসাবে যে-ফসল পায়, তাকে তারা কীভাবে ব্যবহার করে? সেই ফসল যদি জমিদার-জোতদারের পরিবারের খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় তাহলে তা নিশ্চয় বাজারের পরিধি বাড়ে না। এক্ষেত্রে অর্থনীতিটা পুরোপুরি সামন্ততান্ত্রিক। কিন্তু বর্তমানে কি ঠিক এই জিনিস হচ্ছে? প্রথমত, জোতদারেরা বাধ্য হয় সেই ফসল বিক্রি করতে চালকলের কাছে, কেননা ধান থেকে চাল করার যন্ত্র তাদের কাছেও নেই কৃষকের কাছেও নেই। চালকলের কাছ থেকে চাল ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশে পণ্য হিসাবে। দ্বিতীয়ত, কৃষকদের কাছ থেকে পাওয়া ফসলের যা মূল্য তার অল্পপরিমাণই জোতদারেরা নিজেদের ভোগে লাগায়, কেননা ফসলকে তারা মুনাফা-অর্জনকারী পণ্য হিসাবেই দেখে, ভোগ্যদ্রব্য হিসাবে নয়। সামন্ততান্ত্রিক জোতদার আর পুঁজিবাদী জোতদারের পার্থক্য রণজিৎবাবু গুলিয়ে ফেলেছেন। সামন্ততান্ত্রিক জোতদার বাজার সৃষ্টি করে না, পুঁজিবাদী জোতদার বাজার সৃষ্টি করে।

খাদ্যশস্য দাদন হিসাবে দেওয়া হয় বলে বাজার সঙ্কুচিত হচ্ছে — রণজিৎ-বাবুর এ-বক্তব্যও মানা যায় না। গরীব কৃষক যদি দাদন হিসাবে খাদ্যশস্য না পেত, তাহলে সে তার ফসলের বেশির ভাগটা বিক্রি করত না, নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করত। তাহলেও বাজার সঙ্কুচিত হতো। দাদনের আসল তাৎপর্য এই নয় যে, এর ফলে বাজার সঙ্কুচিত হচ্ছে। এর তাৎপর্য বুঝতে হলে রণজিৎবাবু ১৬২ পৃষ্ঠায় যে-তথ্য উদ্ধৃত করেছেন তার বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

দেখা যাচ্ছে যে, বাজারে যে-পণ্য বিক্রি হচ্ছে তার ৪৬·৫ শতাংশ আসছে ১০ একরের কম জোতের কৃষকদের কাছ থেকে। বলা বাহুল্য এই পরিমাণ ফসল distress sale হিসাবে বিক্রি হয়েছে অল্প দামে। গরীব কৃষকেরা যদি দাদন না পেত তাহলে তারা নিজেদের ফসলের বেশির ভাগ অংশ নিজেরাই খেতে বাধ্য হতো। এর ফলে তাদের অবস্থার নিশ্চয় উন্নতি হতো না, হয়তো অবনতি ঘটত, কিন্তু ব্যাপারী ও মহাজনী শোষণ তাদের ঘাড়ে চাপত না। আবার এক্ষেত্রে বড় জোতের মালিকেরা (৪০ একরের বেশি), যারা এখন মোট বিক্রীত পণ্যের ২০·৭ শতাংশ দিচ্ছে, তাদের কাছ থেকে আরও বেশি পণ্য বাজারে আসত। কারণ, শস্যের যে-অংশ তারা দাদন দিত সেটা এখন বাজারে বিক্রির জন্য যাবে, কিন্তু, যেহেতু তারা distress sale করে না, সেইজন্য তারা

ফসলের জন্য কিছুটা বেশি দাম পাবে। **অর্থাৎ ফসল দাদনের ফলে বাজারে বিক্রির পরিমাণ কমে যাচ্ছে একথা ঠিক নয়, এর ফলে গরীব কৃষকেরা মহাজনী ও ব্যাপারী শোষণের শিকার হচ্ছে, এটাই হলো প্রকৃত সত্য।**

বাজার সঙ্কোচনের তৃতীয় কারণ হিসাবে রণজিৎবাবু বলেছেন যে, কৃষকদের ভোগের মান অত্যন্ত কম। ভোগের পরিমাণ আর ক্রয়ের পরিমাণ যে এক নয়, সেটা রণজিৎবাবুর জানা উচিত। এ-প্রসঙ্গে লেনিনের বক্তব্য ঃ "The rural proletariat, by comparison with the middle peasantry, *consumes less*, and moreover consumes food of worse quality, *but buys more*." (লেনিন, ঐ, পৃষ্ঠা ১৮২-৮৩)। চতুর্থ কারণ হিসাবে রণজিৎবাবু উল্লেখ করেছেন যে, উন্নতধরনের কৃষিযন্ত্রপাতি ও সারের ব্যবহার এখনও কম। কিন্তু এইসব জিনিসের চাহিদা যে ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে তা কি তিনি অস্বীকার করবেন ?

রণজিৎবাবুর আর একটি মূল বক্তব্য — মহাজনী শোষণ কৃষিতে পুঁজিবাদের বিকাশকে ব্যাহত করছে। এ-সম্পর্কে প্রথমে মার্কসীয় তত্ত্বের কিছু আলোচনা প্রয়োজন।

প্রাকধনতান্ত্রিক সমাজে মহাজনী পুঁজির চরিত্র সম্পর্কে মার্কস বলেছেন ঃ

"First, usury by lending money to extravagant persons of the higher classes, particularly to landowners ; secondly, usury by lending money to small producer who is in possession of his own means of employment, which includes the artisan, but more particularly the peasant, since under precapitalist conditions, so far as they permit of independent individual producers, the peasant class must form the overwhelming majority." [Capital vol. 3, chapter XXXVI]

অর্থাৎ মহাজনী পুঁজি শোষণ করে বিত্তবান জমিদার সম্প্রদায়কে আর যাদের উৎপাদনের উপকরণ আছে সেই কৃষক সম্প্রদায়কে।

শোষণ করে মহাজনেরা বড়লোক হয়, তাদের হাতে অর্থ-পুঁজি কেন্দ্রীভূত হয়, কিন্তু উৎপাদন-সম্পর্ক আগেকার মতোই থেকে যায়। অর্থাৎ, উৎপাদনের উপকরণগুলির মালিকানা উৎপাদনকারী কৃষকদের হাতেই থেকে যায়। মার্কস বলেছেন ঃ

"Usury centralises money wealth, where means of production are disjointed. It does not alter the mode of production, but attaches itself to it as a parasite and makes it miserable. It sucks its blood, kills its nerve, and compels reproduction to proceed under even more disheartening conditions." [Capital. ch. XXXVI]

মহাজনি শোষণ ততদিন চলতে পারে যতদিন কৃষকদের হাতে উৎপাদনের উপকরণ আছে। জমি, হাল, বলদ ইত্যাদি উৎপাদনের উপকরণগুলি মহাজন কেড়ে নেয় না, এগুলিকে কৃষকদের হাতেই রেখে দেয়। মার্কস বলেছেন ঃ

"The ownership, or at least the possession of the means of employmet by the producers, and small scale producion corresponding to this, are its essential pre-requisites [Capital ঃ ঐ]

মহাজনি শোষণ পুঁজিবাদের বিকাশের পথে একটি বড় অন্তরায়। মহাজনেরা চায় উৎপাদনের উপকরণগুলি ছোট ছোট কৃষকমালিকদের হাতেই থাকুক ; কারণ ছোট উৎপাদকের অর্থনৈতিক দুরবস্থাই মহাজনি শোষণের সবচেয়ে বড় সুযোগ। অন্যদিকে পুঁজিবাদী চায় ছোট ছোট কৃষকেরা জমি ও উৎপাদনের উপকরণ থেকে বঞ্চিত হয়ে শ্রমক্ষমতা বিক্রি করতে বাধ্য হোক। কেননা, তাদের শ্রমকে পণ্যে রূপান্তরিত করেই পুঁজিপতিরা মুনাফা অর্জন করে। মহাজনি শোষণ ও পুঁজির শোষণ তাই সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী ; একটি যখন বেড়ে ওঠে, অন্যটি তখন কমে যায়। কোনো শোষণ প্রাধান্য লাভ করবে তা নির্ভর করে বিশেষ দেশের অর্থনৈতিক বিকাশ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর।

আমরা আগেই দেখিয়েছি যে, ভারতের কৃষিতে উৎপাদনের উপকরণগুলি জমা হয়েছে অল্পকয়েকজন ধনী কৃষক বা কৃষক-জোতদারের হাতে। এদের শোষণের প্রকৃতি মূলতই পুঁজিতান্ত্রিক। এরা ক্ষেতমজুর ও নিঃস্ব বর্গাদারদের উদ্বৃত্ত শ্রমকে পণ্যে রূপান্তরিত করে মুনাফা কামায়। এরা চায় না যে ছোট ছোট বা মধ্যবিত্ত কৃষকেরা জমির মালিক থাকুক ; যে-কোনোও সুযোগেই এরা অন্যের সম্পত্তি গ্রাস করে। মহাজনি কারবারে এরা ঢুকেছে এইজন্যই যে, কৃষককে সর্বস্বান্ত করে তাদের জমিজমা এরা কিনে নেবে। সরকারি রিপোর্টে এদের নাম হলো Agriculturist money lender.।

অন্যদিকে সরকারি রিপোর্টে যাদের Professional money lender বলা হয় তারা হলো প্রকৃত অর্থে মহাজনি শোষক। তারা কৃষকদের উদ্বৃত্ত সম্পদ শোষণ করে কিন্তু তাদের জমিজমা কেড়ে নেয় না। কারণ, উৎপাদনের কাজে পুঁজি খাটাতে তারা অক্ষম।

Agriculturist money lender ও Professional money lender-দের চরিত্রের এই পার্থক্য বিভিন্ন সরকারি রিপোর্টে স্বীকৃত হয়েছে। Indian Central Banking Enquiry Committee-এর: (১৯৩১) রিপোর্টের ৭৫-৭৬ পৃষ্ঠা থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি:

"His (agriculturist money lender's) main and sometimes his sole objective is to get possession of the land of his debtors. The united provinces committee also report that the methods of the agriculturist money lender may not differ materially from those of the professional money lenders in such matters as security, the renewal of bonds, the rates and calculation of interest but they necessarily regard their operations in a somewhat different light. Money lending to them is not always a mere investment ; it often has an ulterior motive"

All India Rural Credit Survey (১৯৫১), Genéral Report-এর ১৬৯ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে যে, Agriculturist money lender প্রধানত জমিজমা বন্ধক রেখে ধার দেয় আর Professional money lender প্রধানত ধার দেয় গহনা বন্ধক রেখে।

Agriculturist money lender-এর চরিত্র যে পেশাদার মহাজনের চরিত্র থেকে গুণগতভাবে পৃথক, এ-কথা এ-পর্যন্ত কেউ বলেননি। মার্কসীয় তত্ত্বের নিরিখে বিচার করলে দেখা যাবে যে, একজন মূলত পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের ও অন্যজন মূলত প্রাকপুঁজিতান্ত্রিক সমাজের প্রতিভূ।

এইবারে রণজিৎবাবুর বইয়ের ১৬৬ পৃষ্ঠার তথ্যগুলি বিচার করে দেখা যাক। ১৯৫১-৫২ সালে গ্রামীণ ঋণের শতকরা ৪৫ ভাগ আসত পেশাদার মহাজনের কাছ থেকে; সমবায়গুলি দিত শতকরা ৩ ভাগ; আর কৃষক মহাজন দিত শতকরা ২৫ ভাগ। ১৯৬১-৬২ সালে পেশাদার মহাজনের অংশ কমে হয়েছে শতকরা ১৩ ভাগ; কৃষক মহাজনের অংশ বেড়ে হয়েছে শতকরা ৩৪ ভাগ। সমবায়গুলির অংশও বেড়ে হয়েছে শতকরা ১৪ ভাগ।

এই তথ্যগুলি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, গ্রামীণ ঋণব্যবস্থার চরিত্রের মৌলিক পরিবর্তন ঘটছে। ক্ষুদ্র ও মধ্য কৃষকদের অর্থনীতিকে জীইয়ে রেখে যারা শোষণ চালায় সেই পেশাদার মহাজনের ভূমিকা অতি দ্রুত শেষ হচ্ছে। অন্যদিকে যারা ঐ অর্থনীতি ধ্বংস করতে চায়, সেই কৃষক-মহাজনের ভূমিকা ক্রমশই বড় হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে সমবায়গুলির ভূমিকাও যে বাড়ছে তাও লক্ষ্য করা দরকার। এবং এ-কথা প্রায় সকলেই মানেন যে, সমবায়গুলি প্রধানত ধনী কৃষকদের পুঁজিবাদী অর্থনীতিকেই শক্তিশালী করছে।

এই প্রসঙ্গে লেনিন ১৮৯৯ সালের রাশিয়া সম্পর্কে যা বলেছিলেন, আমাদের দেশে তার তাৎপর্য সম্পর্কে রণজিৎবাবুকে ভেবে দেখতে অনুরোধ করি। লেনিন লিখেছিলেন :

"If capital in our countryside were incapable of creating anything but bondage and usury, we could not, from the data on production, establish the disintegration of the peasantry, the formation of a rural bourgeoisie and a rural proletariat ; the whole of the peasantry would represent a fairly even type of poverty stricken husband men, among whom only usurers would stand out, and would do so exclusively as to the extent of money owned and not as to the extent and organisation of agricultural production."
লেনিন, 'The Development of Capitalism in Russia'।]

রণজিৎবাবুর বক্তব্যের সঙ্গে আমাদের বক্তব্যের পার্থক্যগুলিকে এবারে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করা যাক :

১. অল্পলোকের হাতে জমি ও পুঁজি এসে জমা হচ্ছে — এই ঘটনাকে রণজিৎবাবু দেখেছেন শুধুমাত্র ধনবৈষম্যের নিদর্শন হিসাবে। আমরা এই ঘটনার মধ্যে একটা নতুন গ্রাম্য অর্থনীতির বিকাশ দেখছি। এ-অর্থনীতিতে একদিকে কৃষক-পুঁজিপতি অন্যদিকে কৃষক-সর্বহারা (যাদের মধ্যে আমরা ক্ষেতমজুর, হালবলদহীন বর্গাদার ও গরিব চাষী যারা শ্রমক্ষমতা বিক্রি করে তাদেরও অন্তর্ভুক্ত করছি)। আমাদের বক্তব্যের তাৎপর্য এই যে, আগামী দিনের কৃষিবিপ্লবে সর্বশ্রেণীর কৃষকদের ঐক্য থাকবে না ; অথবা ঐক্যের তুলনায় অনৈক্য ও দ্বন্দ্বটাই প্রাধান্য লাভ করবে।

২. রণজিৎবাবু জোতদারদের সামন্তশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আমরা দেখিয়েছি গ্রামীণ জোতদারদের মধ্যে দুটি ভাগ। গ্রামের যে-লোকেরা তাদের সমস্ত জমিটাই খাজনায় বিলি করে তারা হলো গরিব। আর যাদের হাতে বেশি জমি আছে তারা কিছু জমিতে নিজে চাষ করে (নিজের পুঁজি লাগিয়ে) বাকিটা খাজনায় বিলি করে। অর্থাৎ এরা সামন্তশ্রেণীর লোক নয়। একদিকে এরা পুঁজিবাদীপ্রথায় মজুর লাগিয়ে চাষ করে অন্যদিকে খাজনার বিনিময়ে জমি বিলি করে। এদের বলা যায় কৃষক-জোতদার। অতএব সমস্ত জোতদারকে এক শ্রেণীভুক্ত করা বা তাদের সামন্তশ্রেণী হিসাবে চিহ্নিত করা ঠিক নয়।

৩. রণজিৎবাবু বর্গাপ্রথায় চাষকে সামন্ত অর্থনীতির নিদর্শন হিসাবে দেখেছেন এবং সমস্ত বর্গাদারকেই ভূমিদাসরূপে চিহ্নিত করেছেন। আমাদের বক্তব্য ঃ natural economy এবং extra-economic coercion যা হলো সামন্ত অর্থনীতির ভিত্তি তা এদেশে নেই। জোতদারেরা খাজনা ভোগ করে না, তাকে পুঁজি হিসাবে খাটায়। তারা বর্গাদারদের শোষণ করে কোনোরকম সামাজিক বা রাজনৈতিক জোরজুলুম খাটিয়ে নয়; বর্গাদারেরা নিঃস্ব হয়ে শ্রমক্ষমতা বিক্রি করতে বাধ্য হয় বলেই জোতদারি শোষণ চলতে পারে। এখানে শোষণের মূল স্পষ্টতই পণ্য-অর্থনীতির মধ্যে। আবার বর্গাদাররাও সবাই একশ্রেণীর নয়। ভারতের একাধিক অঞ্চলে ধনী কৃষকেরাই বর্গাদার ; অর্থাৎ তারা অন্যের জমি ভাগে চাষ করে। কিছু বর্গাদারের নিজস্ব হালবলদ ও অন্যান্য পুঁজি আছে। আর কিছু বর্গাদার একেবারে নিঃস্ব। এই তিন শ্রেণীর সংখ্যা কিরকম তার হিসাব পাওয়া যায় না। তবে অনুমান করা যায় যে, প্রথম ও তৃতীয় শ্রেণীর সংখ্যাই ক্রমশ বাড়ছে এবং সেটা পুঁজিবাদের বিকাশেরই প্রমাণ।

৪. রণজিৎবাবু সব মহাজনকেই একশ্রেণীভুক্ত করেছেন। আমরা দেখিয়েছি যে, পেশাদার মহাজন ও কৃষক মহাজনের মধ্যে গুণগত পার্থক্য আছে। প্রথম শ্রেণীর মহাজনেরা পুঁজিবাদের বিকাশের পথে অন্তরায় ; উৎপাদনের উপকরণগুলি যতদিন ছোট ও মধ্য কৃষকের মালিকানায় থাকে, ততদিনই তাদের শোষণ চলে। অন্যদিকে-

কৃষক-মহাজনের লক্ষ্য হলো উৎপাদনের উপকরণগুলিকে কেন্দ্রীভূত করা, ছোট ও মাঝারি চাষীকে নিঃস্ব করে মজুরে পরিণত করা। এর অনিবার্য ফলশ্রুতি পুঁজিবাদের বিকাশ। তথ্যে প্রমাণ যে, পেশাদার মহাজনের তুলনায় কৃষক মহাজনের গুরুত্ব আমাদের অর্থনীতিতে ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে।

রণজিৎবাবুর সঙ্গে আমার পার্থক্য শুধু তত্ত্বগত নয়। কৃষিবিপ্লবের কর্মসূচীতেও এই পার্থক্যের প্রতিফলন দেখা যাবে। সামন্ত-বণিক-মহাজনি শোষণকে যদি আমরা বেশি গুরুত্ব দিই তাহলে কৃষিবিপ্লবে সর্বহারার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। কেননা সামন্তশ্রেণী, বণিক ও মহাজনেরা শোষণ করে স্বত্ববান কৃষকদের, মজুরদের নয়। এই অবস্থায় কৃষিবিপ্লবের কর্মসূচী রচিত হবে প্রধানত মধ্যকৃষকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে, জমির স্বত্ব, খাজনা ও সুদের হার, ফসলের দাম, সমবায়, সেচ, সার, কৃষিযন্ত্রপাতির সুলভ সরবরাহ ইত্যাদি বিষয়ই কৃষিবিপ্লবের কর্মসূচীতে প্রাধান্য পাবে।

অন্যদিকে আমাদের অভিমত হলো যে কৃষিতে পুঁজিবাদী অন্তর্দ্বন্দ্বই এখন প্রধান। এই অন্তর্দ্বন্দ্বের রূপ লেনিন সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন:

"Competition, the struggle of economic independence, the snatching up of land (purchasable and rentable), the concentration of production in the hands of a minority, the forcing of the majority into the ranks of the proletariat, their exploitation by minority through the medium of merchant capital and the hiring of farmworkers. There is not a single economic phenomenon among the peasantry that does not hear this contradictory form, one specifically peculiar to the capitalist system, i.e., that does not express a struggle and antagonism of interests, that does not imply advantage for some and disadvantage for others. It is the case with the renting of land, the purchase of land ··· it is also the case with technical progress of farming." [লেনিন, ঐ পৃষ্ঠা ১৭২]

গ্রামীণ সমাজের চিত্র যদি এই হয় তাহলে মধ্যকৃষকের নেতৃত্বে কোনোও বিপ্লবই সফল হতে পারে না। জমির স্বত্ব, ফসলের দাম ইত্যাদি বিষয়ে কোনোও মীমাংসাই সম্ভব নয় কারণ, লেনিনের ভাষায় এসব বিষয়ে একজনের লাভ

মানেই অপরের ক্ষতি। সমবায়, কৃষির উৎপাদিকা শক্তিবৃদ্ধি ইত্যাদির জন্য যাকিছু ব্যবস্থা নেওয়া হোক না কেন, তার ফলে পুঁজিপতি কৃষকেরাই হবে লাভবান, মধ্যকৃষক হবে নির্বিত্ত আর সর্বহারা কৃষকের ওপর শোষণ হবে তীব্রতর।

আমাদের বক্তব্য, কৃষিবিপ্লবকে সফল করতে হলে গ্রাম ও শহরের পুঁজিবাদকে এবং যে-পণ্য-অর্থনীতির ভিত্তিতে পুঁজিবাদ গজিয়ে ওঠে সেই অর্থনীতিকে ধ্বংস করার লক্ষ্য গ্রহণ করতে হবে। এই লক্ষ নিলে ধনী কৃষক সমেত সর্বশ্রেণীর কৃষকদের ঐক্য থাকে না; কেননা ধনী কৃষকদের শোষণের বিরুদ্ধেই আক্রমণ পরিচালিত হয়। এ-আক্রমণের সূচনা হবে গরিব কৃষক ও কৃষিমজুরদের স্বতন্ত্র ট্রেড ইউনিয়ন গড়ার মাধ্যমে। কিন্তু ট্রেডইউনিয়নগত কার্যকলাপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। মজুরদের বেতন বৃদ্ধি, চাকুরির স্থায়িত্ব, গরিব বর্গাদারদের ফসলের ভাগ বৃদ্ধি, জমি থেকে উৎখাত বন্ধ করা, খাদ্যশস্যের দাদনকে আগাম মজুরি হিসাবে গণ্য করা (অর্থাৎ তার উপর সুদ নেওয়া চলবে না) ইত্যাদি দাবিকে প্রাধান্য দিতে হবে। কিন্তু এটা বড় কথা নয়; বড় কথা হলো, গ্রামের গরিবদের বোঝাতে হবে যে, তারা মজুর, তারা শিল্পশ্রমিকদের সমগোত্রীয়। শহরের শ্রমিক ও গ্রামের গরিব কৃষক (সব কৃষক নয়) এদেরই মিলিত হয়ে গ্রাম ও শহর থেকে পুঁজিবাদের উচ্ছেদ ঘটাতে হবে।

সাম্প্রতিক শিল্পচিন্তা বিষয়ক

রবীন্দ্র মজুমদার

দেশ স্বাধীন হবার আগে তো বটেই, তারপরও বেশ কিছুকাল ধরে কলকাতাই ছিল ভারতের কলাকেন্দ্র। তখন কলকাতায় চিত্রপ্রদর্শনীর আসর বসত প্রধানত শীতকালে, বড়দিনের কাছাকাছি সময়ে, সংখ্যায় গুটিকয়েক, কিন্তু আকার-আয়তন- সমারোহে সুবিশাল। আর সর্বস্তরের রুচির জোগান দেওয়া সব রকমের মালে ঠাসা সে-এক দম-আটকে আসা গাদাগাদি ব্যাপার! আমরা নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করতাম—'আর্টের কল্পতরু উৎসব!' ঠিক এই সময়টাতেই যে কলকাতায় সেই আর্টের মোচ্ছবে সর্বভারতীয় শিল্পীর দল এসে মাথা মুড়োতেন। তার কারণটা তো সবাই জানি। কলকাতায় তখন বড়দিনের স্ফূর্তির আসর জমত খুব জোর! ভাইসরয়-গভর্ণর-ভি. আই. পি.-দের সঙ্গে নেটিভ প্রিন্স রাজা-রাজড়া শিল্পপতি হোমরা-চোমরারা সব কলকাতায় এসে জড়ো হতেন সেই আসরে যোগ দিতে। আর সেই সঙ্গে তাঁরা শিল্পীদেরও কিছু কিছু পেট্রোনাইজ করে যেতেন—না করলে প্রেস্টিজ থাকে না, কারণ তাঁরাই তো কালচারের জগতে এলিট!

বড়দিনে কলকাতার সেই স্ফূর্তির আসর আজও জমে। বরং বার-এর সংখ্যা বেড়ে ক্যাবারে-সমন্বিত হয়ে হালে তা আরো জমজমাট। কিন্তু এই ক-বছরে দিল্লী বোম্বাইও তো পিছিয়ে নেই। বিশেষ করে ভারতে সিনেমা-রাজধানী আর 'কেন্দ্র'-সোহাগিনী, সবচেয়ে বিত্তশালী শহর বোম্বাই তো এসব ব্যাপারে নানা সমস্যায় জর্জরিত কলকাতাকে অনেক পিছনে ঠেলে দিয়েছে।

সে যাইহোক, কলকাতার অন্তত শিল্পজগতে এর ফল যা হয়েছে, তার ঠিকমতো মূল্যায়ন করা বেশ একটু মুশকিল বলে মনে হচ্ছে।

আর্টের সেই লম্বোদর পেট্রনরা আজ এখানে সংখ্যায় বেশ কম। সর্ব-ভারতীয় শিল্পজগতের ন্যাড়ানেড়ির দল আজ ভিড় জমান বোম্বাই-দিল্লীতে, যেখানে মার্গ আর ললিতকলা অকাদমির দধি-কর্দমে একবার গড়াগড়ি দিতে

পারলে নাকি কপাল ফিরে যায়। অন্তত নগদ বিদায় জোটে মন্দ-না। বলা বাহুল্য সেখানে বাঙলাদেশেরও বেশ কিছু সংখ্যক শিল্পী পাত পেড়ে বসেন। সামনের সারিতে খুব একটা পাত্তা না পেলেও, দু-চারখানা লুচি-মণ্ডা যে তাঁদের কপালে না জোটে তা নয়। কিন্তু এর জন্যে যথেষ্ট মূল্য দিতে হয় এঁদের। বাঙলাদেশের চিত্রকরদের প্রতি আর শিল্পী-ঐতিহ্যের প্রতি এই এস্টাব্লিশমেন্টের গদিতে সমাসীন ব্যক্তিদের অনেকেরই অপরিসীম এক উন্নাসিক অবজ্ঞার কথা সুবিদিত। আঞ্চলিক পক্ষপাতিত্ব, প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা, স্বজনতোষণের মনোভাবে পরিকীর্ণ আর্টের দেউড়ির এই নয়া দ্বারপালদের যথোচিত প্রণামী না জোগাতে পারলে শিল্পীর ভাগ্যে সরকারী-আধাসরকারী প্রসাদ জোটে না। যে-কোনো এস্টাব্লিশমেন্টের সাধারণ নিয়মেই, এখানেও তাই ট্যালেন্ট-এর চেয়ে তদ্বিরের কার্যকরী মূল্য ঢের বেশি।

পক্ষান্তরে কলকাতায় হালে চিত্রপ্রদর্শনীর সংখ্যা এতো বেড়েছে যে আমরা অনেকেই শত ইচ্ছা সত্বেও সবগুলি দেখে উঠতে পারিনে। সারা বছর জুড়ে কোথাও-না-কোথাও কোনো-না-কোনো শিল্পী বা শিল্পীগোষ্ঠীর প্রদর্শনী লেগেই আছে। গ্যালারির সংখ্যাও বেড়েছে প্রচুর আর নতুন নতুন শিল্পীর সংখ্যাবৃদ্ধির তো কথাই নেই! সবগুলি দেখে ওঠা বোধহয় একমাত্র বাজারি কাগজের পেশাদার 'কলা-সমালোচক'দের পক্ষেই সম্ভব, যাঁদের হালের রেট শুনেছি—যতো পেগ হুইস্কি ততো কলাম-ইঞ্চ 'ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশন'-এর নামে আধ-সেঁকা এক ধরনের নির্বোধ চালিয়াতি। শিল্পীরাই বা কি আর করেন, তাঁদেরও তো 'কেরিয়ার' বলে একটা জিনিস আছে! অগত্যা তাঁরাও কবিগুরুর নির্দেশই মেনে চলেন।

ক্রিটিক মহল করেছি ঠাণ্ডা,
মুর্গি এবং মুর্গি আণ্ডা
খেয়ে করে শেষ, আমি হাড় দুটি-চারটি পাই,
ভোজন-ওজনে লেখা ক'রে দেয় সার্টিফাই।

কলকাতায় সারা বছর জুড়ে এইসব চিত্রপ্রদর্শনী যতোদূর পারি ঘুরে ঘুরে দেখে বেড়াই বটে, কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মন ভরে না। অধিকাংশ ছবিই দেখি বিজাতীয়, পশ্চিমী 'মডার্ন' চিত্রকলার উৎকেন্দ্রিক ফর্ম-সর্বস্বতার লেজুড় বৃত্তি। ব্যতিক্রম আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু তা এতোই বিরল যে আমাদের

চিত্রকলার বর্তমান সাধারণ অবস্থাটা আশার চেয়ে নৈরাশ্যই বেশি জাগায়। প্রধান প্রবণতাগুলি হলো মোটের উপর ইওরোপীয় চিত্রকলার হরেক মডার্নিস্ট ধারার অন্তঃসারশূন্য অনুকরণ। অনুকরণ বলতে হচ্ছে এইজন্যে যে ইওরোপীয় চিত্রকলায় এইসব মডার্নিস্ট আন্দোলনগুলি এসেছিল তার নিজস্ব ইতিহাসের ধারায়। খুব সংক্ষেপে এখানে সেই ধারাটিকে স্মরণ করছি — কিছুটা অতিসরলীকরণের দোষে অভিযুক্ত হবার সম্ভাবনা সত্ত্বেও।

মডার্ন ইওরোপীয় আর্টের সূত্রপাত যে-ইম্প্রেশনিজম থেকে, তার ধারাবাহিকতার শিকড় একদিকে যেমন পূর্ববর্তী রোমান্টিসিজমের মধ্যে নিহিত, অন্যদিকে তেমনি তা সালঁ-র রক্ষণশীলতা আর সরকারী অ্যাকাডেমিক আর্টের কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। তারপর 'শতাব্দী শেষ'-এর (fin de siecle) 'আর্ নুভো'র অবক্ষয়—যখন শিল্পী তাঁর সমাজ-বিচ্ছিন্নতা সম্বন্ধে সচেতন হতে শুরু করেছেন, সেই সমাজের আপাতত প্রচ্ছন্ন কিন্তু অনিবার্যভাবেই ভবিষ্যৎ গতিমুখের দিশারী শক্তিগুলির সঙ্গে সমীকরণ করতে পারছেন না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে. সাধারণভাবে, পশ্চিম ইওরোপীয় শিল্পীর সেই সমাজ-বিচ্ছিন্নতা প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে আসে। পুঁজিতন্ত্র-শাসিত সমাজের অমানুষিকতা তাঁর মনে নিদারুণ হতাশা জাগিয়েছে, কিন্তু নূতন কোনো আশার ভিত্তি তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না। ফরাসী বিপ্লবের পরবর্তী নবীন বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রবল প্রাণশক্তি শিল্পীকে যে রিয়ালিস্ট রোমান্টিসিজমে অনুপ্রাণিত করেছিল, (কিংবা ১৯১৭র পরে সোভিয়েট শিল্পী যেভাবে সোশ্যালিস্ট রোমান্টিসিজমে উদ্বুদ্ধ), সধারণভাবে দীর্ঘকাল ধরে বুর্জোয়াশ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতায় লালিত পশ্চিমী শিল্পীরা সেই রোগজীর্ণ পড়ন্ত বুর্জোয়া সমাজের গ্লানিতে পীড়া বোধ করছেন। একদিকে সাধারণ মানুষের মধ্যে নন্দনতাত্ত্বিক বোধের আর শিল্পশিক্ষার অভাব (যেটা পুঁজিতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থারই ফল), অন্যদিকে ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়াদের স্থূল রুচির জোগান দিতে তাঁর নিদারুণ অনীহা। ফলে, শিল্পী ক্রমেই তাঁর সামাজিক ক্রিয়া উপযোগিতার ক্ষেত্রে, সোশ্যাল ফাংশন-এর ক্ষেত্রে যেমন ব্যর্থতা বোধ করেছেন, তেমনি হতাশাজনিত এক নৈরাজ্যবোধে তাঁর মন আচ্ছন্ন হয়েছে। তাই সমাজের দিকে পিছন ফিরে বসে তিনি শুরু করেছেন সন্ধ্যা-ভাষায় চিত্রলিখন। এসব ছবিতে তাই তাঁর বস্তুজগতের প্রতিচিত্রণ সংক্রান্ত (রিপ্রেজেণ্টেশন্যাল) উপলব্ধি

উৎকেন্দ্রিক, ভাবকল্পনা (ইমেজ) বিকৃত, প্রতীকগুলি নিতান্তই ব্যক্তিগত যা তিনি নিজে ছাড়া অন্য কেউ বোঝে না; ফলে তিনি আরো বেশি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। জীবনবোধের অভাবই পশ্চিমী শিল্পীকে ঠেলে দিয়েছে মডার্নিজমের আজকের যে-পরিণতি, সেই পিওর অ্যাবস্ট্রাকশনের নিরুদ্দেশ যাত্রায়। বলা বাহুল্য, পশ্চিমের সব শিল্পীই এই 'পরিশুদ্ধ বিমূর্ত' শিল্পের উপাসক নন, সুস্থ সচেতন অন্বেষা-তন্ময় বহু শিল্পী আছেন যাঁরা শিল্পকে তার নিজস্ব সামাজিক সত্তায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রামের সামিল। এখানে শুধু দেওয়া হলো আজকের পশ্চিম ইওরোপীয় শিল্পের গতি-প্রকৃতির একটা খুব মোটা দাগের রূপরেখা মাত্র।

পশ্চিমী চিত্রকলার এই যে বিবর্তনের ধারায় পিওর অ্যাবস্ট্রাকশনিজম-এর আবির্ভাব, আমাদের নিজস্ব চিত্রকলার বিকাশও কি সেই একই ধারানুসারী? মোটেই তা নয়। তা যদি হতো, তাহলে আমাদের মডার্ন আর্টও হতো আমাদেরই নিজস্ব ধরনের। সেক্ষেত্রে লণ্ডন গ্রুপের কথা মনে করে আমাদের শিল্পীদের ক্যালকাটা গ্রুপ তৈরি করতে হতো না, কিংবা 'সোর্সেরেরি আইডিওগ্রাম' বা ডাইনীতন্ত্রের রূপকচিহ্নের জায়গায় শাক্ত তন্ত্রসাধনার প্রতীক চিহ্ন বসিয়ে মডার্ন হবার দরকার পড়ত না। আমাদের মডার্নিস্টদের এসব ছবির সামনে দাঁড়িয়ে তাই তাঁদের রচনাকে অত্যন্ত কৃত্রিম বলে মনে হয়।

উনিশ শতকের শেষ দিকে তার চলতি শতকের গোড়ার দিকে ইওরোপীয় চিত্রকলার জগতে যখন অবক্ষয়ী মডার্নিস্ট আন্দোলনগুলির পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে আমাদের চিত্রকলায় ঠিক তখনই এসেছে এক নবজীবনের জোয়ার। আমাদের জাতীয় চেতনার সেই পরিপূর্ণ বিকাশের যুগে, 'স্বদেশী আন্দোলন'-এর যুগ, জাতীয় সাংস্কৃতিক চেতনার নববিকাশের অঙ্গ হিসেবেই ঐতিহ্য-ধারাবাহী ভারতীয় চিত্রপদ্ধতির অনুশীলন ছিল নিঃসন্দেহে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা। লুপ্তস্মৃতি ভারতীয় চিত্রকলাকে সেই সময়ে একদল পথিকৃৎ শিল্পী তার নিজস্ব জাতীয় উত্তরাধিকারে সুপ্রতিষ্ঠ করেছিলেন। সেই 'আধুনিক' বা 'নব্য' ভারতীয় চিত্রকলাকে যাঁরা শুধুই 'রিভাইভালিজম' বলে নস্যাৎ করে দেন, তাঁরা নিশ্চয়ই এর এই অনস্বীকার্য ঐতিহাসিক পটভূমিটুকু স্মরণে রাখেন না। এবং তা রাখেন না বলেই তাঁরা পশ্চিমী চিত্রকলার দিকে মুখ তুলে অত্যন্ত বিজাতীয় এক কৃত্রিমতার স্রোতে গা ভাসান।

আমাদের সামাজিক ঠিকানা-বিবর্তনের দ্রুত প্রবহমান ধারায়, ইতিহাসের নিয়মেই, সেই তথাকথিত নব্যভারতীয় চিত্রকলা তার নিজস্ব ভূমিকাকে পূরণ করার পর স্বাভাবিকভাবেই পিছনে সরে গিয়ে ইতিহাসের নথিভুক্ত হয়েছে। তাই, তারপরে যেটা হওয়া উচিত ছিল সেই অতি মূল্যবান ভূমিকাটির পটে আমাদের যথার্থ এক নিজস্ব শিল্পমূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা। সেটা মোটেই শুধু পদ্ধতি-নির্ভর একটা ফর্মাল ব্যাপার নয়। সেটা করতে গেলে রচনার মধ্যে এক সর্বাঙ্গীনতা সঞ্চারিত করতে হয়, সাধর্মব্যাপ্তি আনতে হয়। সেটা আসে সমকালীন জীবন মুখাপেক্ষী বিষয়বস্তুর ইন্টারপ্রিটেশনের দাবিতেই পদ্ধতিগত হেরফেরের মধ্য দিয়ে। নতুন বিষয়বস্তু তার স্বভাবধর্মেই নতুন প্রকাশ-পদ্ধতিকে, নতুন রূপরীতিকে আশ্রয় করে সার্থক রচনায়। কিন্তু সেই নতুন পদ্ধতি, রূপরীতি, ফর্মাল কোয়ালিটি, কিছুতেই পূর্বাপর-সঙ্গতিহীন সম্পর্কচ্যুত নিরালম্ব স্বয়ম্ভু হতে পারে না। তার মধ্যে জাতীয় চিত্রকলার একটা বিকাশগত ধারাবাহিকতা থাকবেই।

আফসোসটা সেইখানেই। কলকাতার সমকালীন যেসব শিল্পীর চিত্রপ্রদর্শনী দেখে বেড়াই সেগুলির মধ্যে খুব কম ক্ষেত্রেই আমাদের নিজস্ব উত্তরাধিকার সম্বন্ধে আন্তরিক অনুসন্ধিৎসার পরিচয় মেলে। গুটিকয়েক বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া, অধিকাংশই মডার্ন পশ্চিমী চিত্রকলার উৎকেন্দ্রিক ফর্ম-সর্বস্বতার খেলো অনুকরণ। এই অনুকরণের মনোভাব কোথাও এসেছে স্থানীয় কোনো কোনো কনস্যুলেট জেনারেলের কর্মকর্তাদের আর ম্যাকিন-ফরাসী টুরিস্টদের পকেটের দিকে লক্ষ্য রাখার ব্যবসায়িক বক্রদৃষ্টি থেকে, কোথাও বা ট্যাঁস সংবাদপত্রগুলির হাততালি কুড়ানোর মনোভাব থেকে।

মোট কথা, আমাদের চিত্রকলার হালের অবস্থাটা বিশেষ আশাজনক নয়। আমাদের এইসব শিল্পী তাঁদের নিজস্ব জাতীয় শিল্পীভাষা খুঁজে পাচ্ছেন না কেন? পশ্চিম ইওরোপীয় কলাকৈবল্যে এঁরা এতোখানি অভিভূত হলেন কি করে? শুধু কি ছবি এঁকে জীবিকানির্বাহের দায়েই এঁরা এতোখানি আত্মবিস্মৃত আর আত্মবিক্রীত?

অহোরাত্র

গুণময় মান্না

শেষরাত্রে স্বপ্ন দেখছিল রতন ভুলে। সাহাবাবুর আলু-খেতে 'শিপনি' দিয়ে জল ছিঁচে দিচ্ছিল, 'জোল'-এর এদিকের ধাপে সে, আর ওদিকের ধাপে খলিল। জল-ছেঁচায় খলিলের হাত ভালো, জল তোলা-ফেলার ছাঁদে তার সঙ্গে ঠিক তাল রাখতে পারছিল না। বিরক্ত হচ্ছিল খলিল। 'ডুব ভুলের পোকে ছিঁচে, লাগসই টান ধর, হেঁই··'। হ্যাঁ, রতনকেও শিপনিতে ছিঁচে শূন্যে ফেলে দিল খলিল। গাঁয়ের শেষ দিকের গাছগুলোর ওপর দিয়ে দিয়ে ভেসে যাচ্ছিল সে, ওপরে উঠে নিচে নেমে ঢেউ-ঢেউয়ের মতো। হঠাৎ একটা তালগাছের মাথায় ধাক্কা লেগে ঘুড়ির মতো গোঁত্তা খেয়ে পড়ল।

ঘুম ভেঙে গেল রতনের। তার বউ পরীর কাঁচের চুড়ি পরা হাতটা তার গলায় চেপে পড়েছিল। ধড়মড় করে উঠে বসতে গেল রতন, কিন্তু হাতটা সরিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ে রইল। জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে, এই ফালগুনের শেষ রাত্রেও ঘেমে গেছে। একটু জল পেলে হতো।

'এই মেজকি, উঠ, একটু জল দে ত···' পরীকে একটা ঠেলা দিলে রতন।

'আঁ···' কাতরানির শব্দ করল পরী, ওর মুখটা ঠেলা হয়ে এল রতনের বুকের দিকেই। রতন আর একবার গোঁত্তা দিয়ে জল আনার কথা বললে। পরীর জাগার মতো হলো, 'তুমি নিজে লাও গে···'

'কেনে, তোর গতর কি ক্ষয়ে যাবে না কি···উঠ না···'

'পারবনি আমি···' ঘুমের মধ্যে ঝিনকে উঠে পরী রতনের বুকের দিকে গুঁজে এল। রতনের মাথায় রাগটা ছলাৎ করে উঠল যেন, জোর ধাক্কা দিয়ে ওকে সরিয়েও দিতে চাইল, কিন্তু হঠাৎ ভিন্নতর আবেগ পেয়ে বসল ওকে, বউয়ের মাথাটা টেনে নিয়ে চুমু খেল।

পরীর দেহটা নির্বিকার, তেমনি পড়ে আছে।

ফিকে হয়ে আসা অন্ধকারে দেহটা দেখল। বুকের কাপড় নেই, তিন

ছেলের মার শিথিল, কোঁচকানো স্তন। কোলের কাছের কাপড়টা ফাল হয়ে ছেঁড়া, কাঠির মতো পা। সেই দেহটাকেই চেপে জড়িয়ে ধরল রতন।

পরীর দেহে আক্ষেপ শুরু হলো, ছাড়িয়ে নেবার জন্য, তাতে ওর স্বল্প বসন বিস্রস্ত হলো। কিন্তু রতনের জোরালো বেড়টা ঢিলে হয়ে এল, যে-আবেগটা হঠাৎ এসেছিল, সেটা হঠাৎই ছেড়ে গেল। হাঁপিয়ে ঘেমে উঠল রতন, বউকে ছেড়ে দিল।

'আ মরণ আমার···' পরী পুরোপুরি জেগে উঠেছে। 'ছ্যানাপ্যানার দিকে তমার লজর নাই গা···' কথায় রাগ, কিন্তু চাপা, কেমন লজ্জা-লজ্জা। গজর গজর করতে করতে উঠে গেল।

রতন হাঁপাচ্ছে, ঘেমে পড়ে আছে। খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে আলো এসে পড়েছে মেঝের ওপর। বিছানাটার শেষ প্রান্তে বনা আর মনা। ছেলে দুটো ঘুমোচ্ছে তখনো। বনার একটা পা মনার গায়ের ওপর। দুগগি মেয়েটা মেঝের ওপর গিয়ে পড়েছে।

তেতো লাগছে, গলার ভেতরটা, কেন কে জানে। রতনের তখন স্বপ্নটার কথা মনে হলো? শিপনি দিয়ে জল ছেঁচার কথা। খলিল আর বংশীর সঙ্গে ওর বচসা হয়ে গিয়েছিল। ওকে কাজে নিতে চায় না। কোনো জায়গায় কাজের খবর এলে, এক পাড়াতেই ঘর, একটু খবর দেয় না ওকে। অথচ ভিন-পাড়ার লোককে ডেকে আনে।

'কেনে, আমি কাজের খপর পেলে তোদিকে ডাকিনি?···' মনে মনে খিঁচিয়ে ওঠে রতন, 'না-কি, আমার গতরে জোর-তাগত নাই!'

একটু আগের পরীকে নিয়ে ঘটনাটার কথা মনে পড়ল। 'হ্যাঁ, ওই ত তাগতের নমুনা দেখলম···' কথাগুলো বিঁধল ছুরির ফলার মতো। 'ধ্যেৎতুরি, লিকুচি করেছে···' ঝটকা মেরে উঠল রতন, 'আজ দেখা হ'ক, শুনি' তুবখন মিষ্টি মিষ্টি কথা···'

বাইরে উঠোনে বালতি-ঘটির শব্দ। পরী বাসিপাট করছে। এরপর মাছ ধরতে যাবে বোধহয়, নয়তো শাক তুলতে।

মনে পড়ল, সাহাবাবুদেরই আজ ধান কাটা হবে চণ্ডীতলার মাঠে। খলিল-বংশীরাই বলেছে জুটতে। রতন তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল। দুয়োরের বাঁশের খুঁটিটা ধরে চালের বাতা কাটবার জন্যে মাথা নিচু করে নামল উঠোনে। হঠাৎ মাথাটা ঘুরে গেল, ধপ করে বসে পড়ল সেখানেই। পেটের

ভেতর গুলোচ্ছে, গলা বসে গিয়ে জিব বেরিয়ে আসছে। তারপরই কতকটা বমি করে ফেলল।

'কি হলো গা…' পরী বালতি রেখে ঝাঁটাটা নিতে যাচ্ছিল, ছুটে এসে ওকে ধরল। রতনের দেহটা তখনো কাঁপছে। এখনো আক্ষেপটা যায়নি। আরো একটু বমি করে নেতিয়ে পড়ল।

'শুয়ে পড় দিকিনি একটু…' পরী দুয়োরের কোণে রাখা খেজুর পাতার চ্যাটাইটা বিছিয়ে দিল। ওকে ধরে তুলে শোয়াল। বনা-মনা তখন বেরিয়ে এসেছে, 'কি হল…মা, কি হইচে…'

পরী আবার নামল উঠোনে। এক ঘটি জল আর সেই ফেলে দেওয়া ঝাঁটাটা নিয়ে বমির কাছটায় এল। দেখল থুতুর ফেনা, লালা। জল কেটেছে অনেকটা, হালি-সবুজ রঙ।

'পিত্তি পড়েছে গো পিত্তি পড়েছে…' ধুয়ে পরিষ্কার করতে লাগল পরী। একটু পরে বলল, 'বামুন দয়ে যাচ্ছি আমি, শুনছি 'দেশগুলান' হবে, যা পাই মাছ-টাছ…' উঠোন পেরিয়ে রাস্তায় নামবার মুখে বলল, 'চারটি পান্তা আমানি রইচে। তমার পিত্তি পড়েছে, আমানিটা খেয়ে লিও, পান্তাগুলা মুঠাটাক করে ছ্যানাগুলাকে দিও, বুঝলে…' রোদের দিকে তাকিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠল পরী, 'এক প'র বেলা হয়ে গেল গা, সবাই নেমে পড়েছে, আমি কী পাব…'

ছেলেগুলোকে পরী কিছু বলল না। ওরাও এদিক-ওদিকে বেরিয়ে গেল, না কী-কী করতে লাগল। দুগগি তখনো ওঠেনি।

চোখ বুজে চিত হয়ে পড়েছিল রতন, এখন চোখ মেলে তাকাল। উঠোনের পরেই সজনে, আম, তেঁতুল গাছ; তারপরেই দোলুইদের ঘর। গাছগুলো সব রতনদেরই। গাছগুলোর মাথার দিকে তাকিয়ে রইল ও। রোদ পড়েছে। খুব ছেলেবেলায় জর হলে এই বারান্দায় শুয়েশুয়ে গাছগুলোর দিকে তাকালে ওর কেমন উল্টো-উল্টো লাগত। যেন ওর মাথাটা নিচের দিকে ঝুলে রয়েছে। এখনও তাই মনে হচ্ছে।

একটা কাক কা-কা করে উঠল তেঁতুলগাছের ডালে। রতনের চেনা কাক, একদিকের ডানার খানিকটা খসা। আর একটা বক উড়ে এসে বসল। কাক-কাকী। অনেকদিন এখানে আছে। কাকটা তেঁতুলগাছ ছেড়ে আমগাছে বসল, সেখান থেকে সজনেগাছের ডালে, তারপর উড়ে এল। রতন দেখতে না পেলেও বুঝতে পারল তাদের চালের মটকায় এসে বসেছে। সেখান থেকে

ডেকে উঠল একবার। রতনের চোখ দুটো ঠেকল গিয়ে চালের ভেতরের দিকের মটকায়। মটকার বাঁশগুলো সব বেরিয়ে পড়েছে, খড় দিতে হবে। আবার কা-আ করে একটা দীর্ঘ ডাক। কাকটা যেখান থেকে এসেছিল, সেই তেঁতুল গাছের ডালে কাকীর পাশে গিয়ে বসল। উঠে পড়ল রতন। না, মাথাটা বেশ পরিষ্কার।

'এই মনা, দুগগি কুথা গেল রে, না-কি, এখন ঘুমাচ্ছে ?'

'না, বাবা, দুগগি বামুন-দয়ে চলে গেছে মায়ের কাছে…একলাই গেছে…'

'আর বনা ?…'

'ওই যে, কপাচ্ছে…'

শুনে বনা একবার মুখ তুলে তাকাল, তারপর সেই কুপোতে লাগল। মাদা তৈরি হচ্ছে। কী লাগাবে।

যে-খুঁটিটা ধরে নামতে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিল রতন, তার পাশে ঘটিতে তখনো আদ্ধেকটা জল আছে। চোখে-মুখে ছিটিয়ে দুটো কুলকুচো করে ঘরে গিয়ে ঢুকল রতন। কোণের হাঁড়ি খুলে দেখল, কতকটা আমানি রয়েছে। হাত ভরে দেখল চারটি পান্তা আছে বটে, দলাখানেক হবে। একটা কলাইকরা ডিশে ঢেলে, কিছু নূন ছিটিয়ে দিল ও। খাওয়া শেষ করতে শরীরটা খুব সুস্থ মনে হলো।

ডিশ হাতে বাইরে বেরিয়ে আসতেই মনা বলল, 'বাবা, আমাদিকে পান্তা দিলেনি ?…'

'ছিল না-কি! এই মুঠাটাক…' আঙুলগুলো মুড়ে গোলাকার করল রতন, পরিমাণ বোঝাবার জন্য। ডিশটা উঠোনে রাখতে বলল, 'এইটে ধুয়ে রাখবি ত, মনা…' বলে খুঁটিতে বাঁধা ময়লা গামছাটা টেনে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

দুই

সাহাবাবুদের যে-আলু-জমিটায় কাল জল ছিঁচেছিল, রতন সেইখানে এসে দেখল কেউ নেই। বংশী, খলিল, কি আর কাউকে দেখতে পেল না। যে উৎসাহে জোরে জোরে পা ফেলে এসেছিল রতন, তা যেন ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল। গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল ও। গাছের গোড়াগুলো হলদে হয়ে এসেছে, পাতা শুকোতে আরম্ভ করেছে। না, আর ছি চতে হবে না। দিনকয়েক পরে খুলে ফেলতে হবে।

'কে গো ওখেনে, কে দাঁড়িয়ে···' বুড়ি সাহাবাবুর মা, ঠেকা হাতে ঘাটে যাচ্ছিল।

'আমি গো, পিসী, আমি রতন দুলে···' পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল ও। 'হ্যাঁ, পিসী, বংশী খলিল কি কেউ এসেনি ?···'

'কই, না ত, কাকেও দেখিনি ত, বাবা···'

'তমাদের চণ্ডীতলার মাঠে ধান কাটার কথা ছিলনি ? বোরো ধান ?···'

'তা ত কিছু জানিনি, বাছা। মুনিষ লাগার কথা ছিল না-কি···'

বা রে, বুড়ি যে আবার ঘুরে আমাকেই জিজ্ঞেস করে। ভাবতে ভাবতে ওখান থেকে সরে গেল রতন। ভাবল, তার আসতে দেরি হয়েছে দেখে ওরা হয়ত চণ্ডীতলার মাঠেই চলে গেছে। একবার এগিয়ে দেখাই ভাল।

'পাড়াটা পেরিয়ে একটা ছোট্ট মাঠ, তারপর বামুনদ। বিরাট, উঁচু পুকুরের বাঁধ, বাঁধে ছাড়া-ছাড়া গাছ। ওপরে পাক দিয়ে দিয়ে চিল উড়ছে। মাছ উঠেছে খুব বোধহয়। পরী নিশ্চয় হাঁড়ি ভরতে পারবে। রতনের একবার প্রচণ্ড ইচ্ছে হলো, সেও গিয়ে জলে নামে, তার ঘূর্ণি জাল নিয়ে। কিন্তু না, চণ্ডীতলার মাঠেই যাবে।

'আরে, যাঃ··· বংশী না ?···' মাথায় গামছা বেঁধে বামুনদ-র দিকেই এগিয়ে চলেছে। বংশী কি মাছ ধরতে যাচ্ছে, না-কি, না-কি দয়ের পাশের 'বেড়বাগান' দিয়ে চণ্ডীতলার মাঠে যাবে ?

'বংশী-ই···' হাঁক দিল রতন। কয়েক বার ডাকার পরও শুনতে পেল না। না, দয়ের দিকে যাচ্ছে না, বেড়বাগানের দিকেই গতি। 'বংশী-এ-এ···' দু-হাতের তেলো মুখের সামনে গোলাকার করে লম্বা হাঁক দিল রতন।

রতন ছুটতে লাগল। ওরই মধ্যে একবার নিজেরই আশ্চর্য লাগল যে সকালের বমি-টমি হওয়া সত্ত্বেও সে ছুটতে পারছে। কিন্তু বংশী শুনতে পাচ্ছে না, ফিরেও দেখছে না। এরপর বাগানে ঢুকে গেলে আর দেখাও যাবে না। ওটা বংশী বটে তো ?

রতন মাঠ পেরিয়ে বাগানে ঢুকল, বাগান পেরিয়ে আর একটা মাঠের ধারে এসে পড়ল। চণ্ডীতলার মাঠের এই শুরু। কিন্তু কোথায় বংশী, বা আর কেউ ? কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকার পর দূরের দিকে তাকাল ও, সাহাবাবুদের জমিটা যেখানে আছে সেই আন্দাজ। কিন্তু কই, মাঠেও তো লোকজন নেই। ওদের আজ মুনিষ লাগেনি। আজ আর কাজ হলো না।

ওখান থেকে ফিরতে গিয়েই থমকে গেল রতন। বাঁ-দিকে মাঠ আর বেড়ের ধার বরাবর চোখ পড়তেই একটা জটলা দেখতে পেল। নায়েকদের ইটের পাঁজার কাছে। মাঠ ঝাঁপিয়ে সেখানে পৌছতে বেশি দেরি হলো না। গিয়ে যা বুঝতে পারল তা হচ্ছে পাঁজা থেকে ইট বওয়া হচ্ছিল। পাঁজার এক কোণ ধ্বসে একটা মুনিষ চাপা পড়েছে। ইট সরানোর কাজ চলছিল, রতনও হাত লাগাল। লোকটাকে বের করা হলো, ধরাধরি করে ওটাকে এনে শোয়ালে জামগাছ তলায়, ঘাসের চাপড়ার ওপর চোখমুখ থেঁতলে গেছে, ইটের গুঁড়ো, ছাই সর্বাঙ্গে। লোকটাকে চেনাও যায় না, বেঁচে আছে কি না তার ঠিক নেই।

কয়েকজন লোক জল এনে ছিটোতে লাগল ওর চোখমুখে। এঃ, নাক দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে। লোকটা ডান হাতটা নাড়ল একটু, বেশি নয়, একটু শব্দও করল।

'না, গো, মরে নি…'

'এস, সব ধর দিকি নি, হাসপাতালে লিয়ে যাই…'

তিন

রতন ওদের সঙ্গে লোকটাকে নিয়ে হাসপাতালে যায় নি। ওখান থেকে ঘরে ফিরে এল। ঘরে শেকল দেওয়া, তালা দেওয়া নেই। ও সবের বালাই থাকে না। ঘরে কেউ নেই, ছেলেগুলোও কোথাও সটকেছে। ধীরে, ক্লান্ত পায়ে উঠোনটা পেরোল রতন, খুঁটির গায়ে হেলান দিয়ে বারান্দায় বসে পড়ল। একবার চালের বাতার দিকে তাকালও, যদি একটা বিড়ি গোঁজা থাকে। নেই। আচ্ছা, একটু পরে বেরিয়ে গিয়ে কিনতে হবে। কিন্তু এখন টানবার ভীষণ ইচ্ছে করছিল।

নিচে যেখানটায় ঝাঁট দিয়ে পরী বমি নিকিয়েছিল, সেখানটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। কী রকম ফাটা-ফাটা, তেমন তকতকে ছিরি একটুও নেই। রোদের দিকে তাকাল রতন বেশ খটমটে হয়ে উঠেছে, ফাল্গুণের দিন বলে মনেই হয় না। আর একটু পরেই গাটা চড়বড় করবে তেতে। আজকাল ওই রকম হয়েছে।

রতন ওখান থেকে উঠল, শেকল খুলে ঢুকল ঘরে। কোণে সেই পান্তার হাঁড়িটা মুখ-খোলা পড়ে রয়েছে। পরী এখনো ফেরে নি। সে মাছ-টাছ

পেল কি না কে জানে। আলনায় ছেঁড়া শাড়ি একটা, তার পাশেই গামছা, বনা-মনার প্যাণ্ট, তার নিচে মেঝের ওপর কাঁথা-মাদুর। আজ মেঝেয় ছাতা পড়েনি।

ঘরের মধ্যেটা ঠাণ্ডা, আবছা অন্ধকার। লম্বা, কালো প্যাকাটির মতো রতন কতক্ষণ এসবের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। তারপর আবার শেকল তুলে দিয়ে উঠোনে নেমে এল। তখনই ওর খেয়াল হলো, ইঁটের ধুলো আর ছাই তারও 'আষ্টাঙ্গে' লেগে রয়েছে। গামছাটা কোমর থেকে খুলে গা হাত ঝাড়তে ঝাড়তে বেরিয়ে গেল, পুকুরে ধুয়ে নিলেই চলবে।

ঘোষেদের বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিল রতন। এ বাড়ির মালিকের নামও রতন—ঘোষ। দু মাইল দূরে শহরে এদের আড়ত আছে, গুড়, ধান, পাটের। ঘেরা পাঁচিলের মধ্যিখানে ছোট্ট দরজায় একটি আধ-ঘোমটা টানা, প্রৌঢ়া সধবা বেরোতে গিয়েই এক পা পিছিয়ে গেল—রতন ঘোষের স্ত্রী। মনে হলো কিছু যেন বলবে।

রতন পেরিয়ে যাচ্ছিল, বললে, 'তুমি বাপু ঘরে আছ? মুনিষ খাটতে যাও নি?…'

'না…' রতন অবাক হলো, পাড়ায় ঘর হলেও রতনের সঙ্গে কথা বলে না। 'কেনে?…'

'না, এই বলছিলম, একটা 'মোট' নিয়ে যাবে?…' রতন জিজ্ঞাসু হয়ে উঠেছে দেখে বললে, 'টুনি শ্বশুর-ঘর যাচ্ছে, বাসে, যাবে, তাই…'

রতনের ভেতরটা শুকনো, খটখটে লাগছিল। কি একটা ভাবছিল ও, স্বর কেটে গেছে। হঠাৎ বললে, 'আপনারা কত দিবেন?…'

'কত আর দিব…বার আনা পাবে…'

'অত কমে পারব নি, খুড়ি, দু টাকা লাগবে…'

মুহূর্তের জন্য মুখের কোমল প্রসন্নতা দুমড়ে গেল যেন। 'দু-টাকা… কেন, এত দিব কেন…এক টাকার বেশি পারব নি, বাবা, ওই নিয়ে যাও…'

'পারব নি, বাবু…' বলে রতন এগিয়ে গেল।

'শুন, শুন…' পিছন থেকে ওকে ডাকলে।

'আমি যাব নি, বাবু, শহরে, আমার কাজ আছে আপুনি অন্য লোক দেখ…' ওর কেন জানি রাগ হতে লাগল। এক টাকার বেশি পারব নি। লক্ষ্মীর মা ভিখ মাগে। একবারও মনে হলো না, আজ ও রোজগারবিহীন।

কিছুদূর যেতে না যেতে ওকে পিছন থেকে ডাকলে, রতন ঘোষেরই ছোট ভাই নয়ন ঘোষ। একেবারে ছোকরা, কি সব পড়াশুনো শেষ করে মিউনিসিপ্যালিটিতে 'মেম্বর' হয়েছে।

'কি গো, তুমি চললে কোথায় ?···' নয়ন জিজ্ঞেস করলে।

'এই দেখি, বেরিছি ত, দু-পা যেমনে যায়···'

'বেশ, বেশ, ভালই। তাহলে আমি শহরে যাচ্ছি, আমার সঙ্গে এস না কেন। হ্যাঁ, আজকের বিকালের মীটিংএর কথা শুনেছ তো? আসবে নিশ্চই···' মনে হলো নয়ন ঘোষ কথা বলতে খুবই উৎসুক। ওর পাশে পাশেই চলতে লাগল।

'হ্যাঁ, তাই চলেন···' প্রথম কথার উত্তরে রতন হেসে বললে। 'কিন্তু কিসের মীটিন্···'

'সে কি, কৃষক সভার মীটিং, শোননি ?'

'না ত। আচ্ছা নয়নবাবু, ইসব মীটিনে কী হয় ?···'

'কী হয়, মানে? হয় অনেক কিছু, পরে আরো বেশি হবে··· বলতে বলতে নয়ন ঘোষের গলার ধরণটা বদলে গেল। 'আচ্ছা, রতন, তুমি এবার বাস্তর খাজনা-ট্যাক্স দিয়েছ ?'

'না, দিতে পারিনি, দু-বছরের বাকি। এই বোশেখে···'

'না, হে, না। আমি পেয়াদা আসিনি। তুমি এবারে শীতে ছেলে-মেয়েদের কাপড়-জামা কিনে দিয়েছিলে—কখানা ?'

রতন হু-হা করতে লাগল, 'আমরা শীতের কাপড় কিনব ? থালেই হইচে···'

'আজকে চাল কিনবে না, বাজারে যাবে কখন ?···'

নয়ন ঘোষ এমনি প্রশ্ন করে করে শেষকালে বললে, 'এই সবের জন্যেই কৃষকসভা···'। কৃষকদেরই এসব ছিনিয়ে নিতে হবে, পরনের বস্ত্র দুবেলা পেটপুরে খাবার খাদ্য, ছেলেমেয়েদের শিক্ষা, মানুষ হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াবার শক্তি।

রতনের গলার স্বরটা কেমন গলা-গলা মনে হল, 'হ্যাঁ, বাবু, ইসব ত খুব ভাল কথা···'

বিকালে মীটিংএ আসছ তো, তাহলে? ওই বাস-স্ট্যাণ্ডের পাশের মাঠটাতেই মীটিং হবে···'

'নিশ্চয় যাব, বাবু, আমরা যাবনি আবার !···'

চার

এর কয়েক ঘণ্টা পরেকার কথা, তখন ছুপুর গড়িয়ে গেছে বিকেলের দিকে। যে শহরটার কথা ওরা বলছিল, সেটা একটা গঞ্জের মতো, নাম শ্রীপুর। তারই একটা দোকানে বসেছিল রতন, দোকানটা পান-বিড়ি, চা-বিস্কুট, মুড়ি-তেলেভাজার। ইতিমধ্যে রতন কিছু রোজগার করেছে। ঐ রতন ঘোষেরই আড়তে একটা কাজ করেছিল। গরুর গাড়ি বোঝাই গুড় এসেছিল, গাড়ি থেকে গুদামে তুলে দিয়েছে 'নাদা'গুলো। তিনটে গাড়ি খালাস করতে হয়েছিল, অবশ্য গাড়োয়ানরাও সাহায্য করেছিল। আশ্চর্য এই, যার স্ত্রীর কথা শোনেনি, সে বলা মাত্রই কাজে লেগে গিয়েছিল, দর-দামও করেনি। বারো আনা পেয়েছে।

চার আনার মুড়ি তেলে-ভাজা কিনে খেয়ে আরও চার আনার দিতে বলেছে, এমন সময় ওর বড় ছেলে বনা ওদিক থেকে ছুটে এল, 'বাবা···', তারপর যখন দেখলে রতন মুড়ি তেলেভাজা কিনে খাচ্ছে, তখন থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে কুতকুত করে তাকাতে লাগল।

হাত বাড়িয়ে নতুন ঠোঙাটা নিতে গিয়ে বনাকে ডাকলে রতন, 'আয়···'। ছুজনে মিলে খেতে বাকি পয়সাটাও গেল। পয়সা ছুয়েকের বিড়ি ধার চাইল দোকানীর কাছে, পেয়েও গেল। তারপর সেইখানেই বসে বসে টানতে লাগল রতন। কোন ফাঁকে বনা আবার সটকে পড়ল। বনা কেন এসেছিল এখানে, কোথায় গেল—এসব যেমন রতন ভাবলে না, তেমনি ওর একবারও মনে হলো না, পরী বাড়ি ফিরেছে কিনা, রান্নার জোগাড়ই বা কী হয়েছে। বনা তবু কিছুটা খেল, অন্য ছেলে-মেয়ে ছুটো কিছু খেল কিনা তাও ওর মনকে ছুঁতে পারল না।

এই গঞ্জেরই এখানে-ওখানে ওর বিকেলটা কাটল, সন্ধ্যাটাও। আটটা সাড়ে আটটা নাগাদ বাড়িমুখো হল ও। দোকানপাট, বাড়ি-ঘরে যে কেরোসিনের আলোগুলো জ্বলেছিল, মাঠে এসে পড়তেই তা আর দেখা গেল না। ঘুটঘুটে অন্ধকার। তা হোক, রাত্রিতে মেঠো রাস্তায় পথ চলতে ওর অসুবিধে হয় না। চোখে অন্ধকার একটু সয়ে এলেই বেশ দেখা যায়।

দিনের বেলাতে বেশ গরম ছিল, কিন্তু এখন তার সঙ্গে মিল নেই। বেশ শীত করছে। গামছাটা কোমর থেকে খুলে গায়ে দিলে রতন, হাত ছুটো জড়াজড়ি করে বুকের ওপর রেখে বুকটাই খুব চেপে ধরল।

অন্ধকারে পথ চলতে চলতে হঠাৎ অনেক কাল আগেকার একটা কথা মনে পড়ে গেল ওর। সে প্রহরটাক বেলাকার ছবি। গ্রাম থেকে পরী চুপড়ি নিয়ে এই গঞ্জে চলেছে, তার পিছনে পিছনে রতন। চুপড়িতে পাঁকাল মাছ, পুঁটি-ট্যাংরা, কলমি শাক আর হাতে কচু-ডাঁটা। 'আজ শুস্‌নি শাক তুলু নি?' রতন জিজ্ঞেস করত। 'না রোজ রোজ শাক হয়।…' রতন, 'হ্যাঁ রে, মাছ ঘরে কিছু রেখেছ? না কি সব লি' যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ সে রেখেছি…তুমি যাচ্ছ কোথা? শিগ্রি চলে এসবে, হ্যাঁ?…

'অ ভুলে বউ মাছ দিবে? এস…' রাস্তার পাশের ঘর থেকে ওকে ডাকত। সে সব অনেক আগেকার কথা, এখন আর সে রকম হয় না।

'কে যায়?… পরিচিত কণ্ঠস্বরে ফিরে দাঁড়াল রতন। কাছে আসতেই লোকটাকে চিনতে পারল — বংশী। তখন আবার চলতে আরম্ভ করল, পিছনে বংশী আসছে।

কোথা গেছলে, বংশী?'

তার উত্তরে পাল্টা জিজ্ঞেস করল ওকে, 'তুমি কোথা গেছলে বল দিকি? কিষক সভার মিটিনে গেছলে?…

'না ত, তুমি গেছলে?…

সকাল বেলায় নয়ন ঘোষকে দেওয়া প্রতিশ্রুতির কথা মনে পড়ল, কিন্তু তা কোনো দিকেই ওকে নাড়া দিলে না।

'গেছলম ত, অনেক কিছুই বললে। আচ্ছা, তোমার কি মনে হয়…' কথাবার্তা বলতে বলতে মাঠটা পেরিয়ে গেল ওরা। সকালে মুনিষ লাগার কি হলো, বা, পরের দিন কোথায় কাজ হবে কিনা, এ-নিয়ে কোনো কথাই হলো না।

পাঁচ

উঠোন পেরিয়ে বারান্দায় গিয়ে উঠল রতন। দরজা ভেজানো ছিল, তা ঠেলে ভেতরেও ঢুকল। অন্ধকার। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দে বুঝল ওরা সবাই ঘুমোচ্ছে। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, সন্ধ্যার পর পাড়ার সবাই ঘুমিয়ে পড়ে। রতন ডাকাডাকি করে পরীকে উঠাল। ট্যাঁক থেকে দেশলাই বের করে লম্ফ জ্বালল।

'তুমি কোথা ছিলে বল দিকিনি…সারাদিনটা গেল…'জিজ্ঞেস করতে

হয়, তাই জিজ্ঞেস করা। তা না হলে কণ্ঠস্বরে অনুযোগ নেই। বললে, 'চারটি ভাত আছে, খাও···।' সত্যিই কয়েক মুঠো ভাত ছিল, ঠাণ্ডা, কড়কড়ে। কেবল নুন হলুদ দিয়ে সেদ্ধ কিছু মাছ, স্পষ্টত, পরী সকালে যে ধরেছিল, তারই অংশ।

একটু পরেই আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ল ওরা।

মাঝ রাত্রি, না কি শেষ রাত্রি তখন। পরী ওকে ঠেলা দিয়ে ওঠাল বিছানায় সে উঠে বসেছে। মড়ার মতো ঘুমোয় রতন, ঘুম-জড়ানো স্বরে বললে, 'অঁ ?···'

'দেখ, উঠ দিকিনি, বাইরে কি যেন শব্দ হল···'

'তোর রাজার ধন আছে না কি, শালী। লে শুয়ে পড়···'পরে যোগ করলে, 'আমার কাছে সরে আয়···'

কতক্ষণ পরে তাই করল পরী। ওর কাছে সরে এল, রতনও ধরলে ওকে জড়িয়ে। তবু ঘুমের মধ্যেও অন্য রকম চেতনা, রতন ওকে আরো কাছে টানতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে হাঁপানো অবস্থায় উঠে বসল, এবারে রতন। গেল ভোরে যে আবেগটা অতৃপ্ত রয়ে গিয়েছিল, তা এখন তৃপ্ত হয়েছে। চ্যাটাই কাঁথার প্রান্তে যে বিড়ি রেখেছিল তা খুঁজে ধরাল রতন।

তারপর পরীও উঠে বললে, হ্যাঁগা, বুড়া হলে, তবু তোমার সখ মিটল নি ? আবার কি ছ্যানা-প্যানা হবে ?···

'হ্যাঁ, হবে তুই কি খাওয়াবি ?···'

'হ্যাঁ, তাই লয়ত কি ? আজ কার ভাত খেইচ ?··

'আমি তোদিকে রেখেছি, তাই লয় দুপয়সা আনিস...আমি উপায় করি নি ?···'

'তা আবার কর নি...' পরী কাঠি-কাঠি হাতে রতনের জানুটা ধরলে 'হ্যাগা, তুমি ত জিগাস করলে নি, ভাত হল, তার চাল এল কোথা থিকে ?···

'তুই বামুন দ'য়ের মাছ বিক্রি করে চাল কিনেছিলি, হলত ?···

'হল। সেরটাক চাল হয়েছিল। মন্দলের ভূষি-দোকানে চার পয়সার লঙ্কা ধার চাইলম, মুখপড়া দিল নি—' পরী চুপ করল মুহূর্তের জন্য। তারপর অনেক দিন আগেকার কিশোরী বধূর মতো গদ্গদ স্বরে বললে,

'জান গা, মাছ একটা যা পিছলে গেল নি!···এই সের চারেক বুয়াল মাছটা হবে, জালে তুলেও ছিলম, কিন্তু লাফ মেরে পেলি গেল·· এঃ···'

'সে আর কি করবি। মাছ ধরতে গেলে জালে পড়ে, পালি'ও যায়···' রতন বিড়িটায় শেষ টান দিয়ে মেঝেতে ঘসে নিবাল।

'হ্যাঁ গা, তমার যখন কাজ হলনি, তখন তুমিও গেলে নি কেনে নামতে? আদ্ধেক ভাগ পেতে···যা হয় হত··'

ওরা আবার শুয়ে পড়ল। পরী আবার বললে, 'কাল তমার কাজ হবে ত কোথাও?'

'এই যাঃ, বংশীকে জিগাস করতে ভুলে গেলাম। ভোর বেলাই যাবখন ··'

ভোর বেলা রতনেরই ঘুম ভাঙল আগে। ওরা সবাই ঘুমোচ্ছে। বাইরে বেরিয়ে এল ও। ঘটিটা নিয়ে পুকুরের দিকে রওনা হল। পুব দিকের আকাশটা লাল হয়ে উঠেছে, পাখি ডাকছে, একটা কাক ডেকে উঠল তেঁতুল গাছের ডালে। ওদের চেনা কাক। ওটা এখন তেঁতুল গাছ থেকে আমগাছে, আমগাছ থেকে সজনে গাছ, সেখান থেকে হয়তো চালের মটকায় এসে বসবে। অনেক দিন আছে। ছেড়ে পালায় না।

লীগ এগেন্‌স্ট ইম্পিরিয়ালিজম্‌

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

ভারতের জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে তার বহু বন্ধু জুটেছিল। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো ১৯২৭-এ গঠিত "লীগ এগেন্‌স্ট ইম্পিরিয়ালিজম্‌"—জন্মলগ্ন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত যার অন্যতম যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন প্রসিদ্ধ ভারতীয় বিপ্লববাদী বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ("চট্টো")। এই সংগঠন গড়ার ইতিবৃত্ত ভাল করে বুঝতে গেলে একটু পূর্ব ইতিহাস জানতে হয়। ১৯২০-এ কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসের সময়েই লেনিন ও মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মধ্যে সংগ্রামের রণকৌশল নিয়ে গুরুতর মতভেদ হয়। লেনিন পরামর্শ দেন ভারতের ও প্রাচ্য দেশের তরুণ কমিউনিস্টদের জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে মিলেমিশে জাতীয় যুক্তফ্রন্ট গড়ে কাজ করতে। আর রায় মনে করেন যে প্রাচ্য জগতের বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীদের প্রগতিশীল ভূমিকা ফুরিয়ে গেছে, অতএব জোর দিতে হবে শ্রমিককৃষকদের সংগঠন গড়ার ও সরাসরি সমাজতন্ত্রী বিপ্লবের দিকে অগ্রসর হবার উপর।

সেই একই সময় প্রসিদ্ধ ভারতীয় বিপ্লবী বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, নিজের অভিজ্ঞতা থেকে লেনিনের কাছাকাছি মতামত প্রকাশ করেন ও কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কাছে সুপারিশ করেন যে ইউরোপে যত প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী আছেন তাঁদের একটা ঐক্যবদ্ধ সংগঠন গড়ে তোলা ও ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করার জন্য সমস্ত প্রগতিশীল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করাই প্রধান কাজ। লেনিন ও সোভিয়েত নেতৃত্ব তাঁর সঙ্গে মতৈক্য জানান।

এবিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের এক গোয়েন্দাচূড়ামনি লিখছেন:

"প্রসিদ্ধ ভারতীয় বিপ্লববাদী চট্টোপাধ্যায় তখন স্টকহোমে ছিলেন। ১৯২০-এর অক্টোবর মাসে তিনি প্রস্তাব করলেন যে ইউরোপের সমস্ত ভারতীয়

বিপ্লবীদের একটি সম্মিলিত সংস্থা গড়ে তোলা হোক। 'ভারতীয় বিপ্লবী সংঘ' নাম দিয়ে বার্লিনে একটি সংস্থা গড়া হোক, যাতে থাকবে সবমতের বিপ্লবীরা — জাতীয়তাবাদী অথবা কমিউনিস্ট — কিন্তু কার্যকরী সমিতির অধিকাংশই আসলে হবে কমিউনিস্ট। তাদের মধ্যে থাকবে তিন ধরণের লোক — ক) রাজনৈতিক, খ) বাণিজ্যিক ও গ) প্রচারক। খ) বিভাগের সদস্যরা, ক) কিম্বা গ) বিভাগের লোকদের সঙ্গে কোন সংযোগ রাখবেন না। প্রত্যেক দেশেই সংগঠনটির শাখা থাকবে এবং কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতির একজন সদস্য হবেন প্রত্যেক শাখার কর্তা। এই শাখাগুলি প্রতি তিনমাসে একবার সভা করবেন। রাজনৈতিক বিভাগের যিনি প্রধান হবেন তিনি সোভিয়েত রুশ নেতৃত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে চলবেন।…চট্টোপাধ্যায় প্রস্তাব করলেন যে তাঁর এই সুপারিশ নিয়ে সবিস্তারে আলোচনার জন্য তাঁর মস্কো যাওয়া দরকার। সোভিয়েত সরকার আলোচনায় রাজি হলেন এবং চট্টোপাধ্যায় মস্কোতে গেলেন ও লেনিনের সঙ্গে দেখা করলেন। লেনিন তাঁকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিলেন……।"[১]

বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সঠিক ভাবেই ধরতে পেরেছিলেন যে ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করতে গেলে প্রয়োজন সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিসমূহের ঐক্য — বিপ্লবীদের ঐক্য, হিন্দুমুসলমানের ঐক্য, ভারতের জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ঐক্য। তাই একদিকে তিনি সমস্ত ভারতীয় বিপ্লবীদের সম্মিলিত সংস্থা গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। অপরদিকে সোভিয়েত নেতৃত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। কিন্তু চট্টোর, বিপ্লবী বৈশিষ্ট্য এইখানে যে তিনি কারুরই অন্ধ ভক্ত ছিলেন না — বন্ধুকেও প্রয়োজনমতো সমালোচনা করতে দ্বিধা করতেন না। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের নেতৃত্বে তখন একটি প্রবণতা দেখা দিয়েছিল — প্যান ইসলামপন্থীদের সঙ্গে মিতালী করার। চট্টোপাধ্যায় তার তীব্র ও খোলাখুলি সমালোচনা করেন ও বলেন যে প্যান-ইসলামপন্থীরা ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের পথে প্রতিবন্ধক। "চট্টোপাধ্যায় দৃঢ়তার সঙ্গে দাবি করেন যে মস্কো প্যান-ইসলামপন্থীদের প্রচার বন্ধ করুক, কারণ হিন্দু-মুসলমান বিরোধ ভারতের পক্ষে ক্ষতিকারক হবে। মস্কোর উচিত জাতীয়তাবাদকেই সমর্থন করা। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জন করলে, তখন কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার লড়াই করতে হবে।……সোভিয়েত নেতৃত্ব

চট্টোপাধ্যায়ের সমালোচনাকে গ্রহণ করলেন এবং বিনাদ্বিধায় ভারতে বিপ্লবী আন্দোলনকে সমর্থন করার প্রতিশ্রুতি দিলেন।"[২]

১৯২১ থেকে ১৯২৬ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট নেতৃত্ব ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে গভীর সংযোগ স্থাপনের প্রাণপণ চেষ্টা করলেন। তার জন্য ইউরোপের বিপ্লবীদের দূত হিসেবে ভারতে এলেন নলিনী গুপ্ত, অবনী মুখোপাধ্যায় ও শউকৎ উসমানি। বিভিন্ন ভাবে তাঁদের যোগাযোগ হলো বহু জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীর সঙ্গে, যোগাযোগ হলো ডাঙ্গে, সিঙ্গারাভেলু, গোলাম হুসেন, ডাঃ মণিলাল, আব্দার রেজ্জাক্ খাঁ, মুজফ্ফার আহমদ, গোপেন চক্রবর্তী প্রভৃতির সঙ্গে। ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের সূত্রপাত হলো। সে আর এক কাহিনী।

ইতিমধ্যে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পরাধীন দেশসমূহের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন প্রবল বিস্তৃতি ও গভীরতা লাভ করেছে। লেনিন আর তখন নেই কিন্তু আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে তাঁর যাঁরা উপযুক্ত শিষ্য, তাঁরা উদ্যোগ নিলেন একটি বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংঘ গড়ার। উদ্যোক্তাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের অন্যতম নেতা বুখারিন, জাপানী কমিউনিস্ট নেতা সেন কাতায়ামা, জার্মান কমিউনিস্ট নেতা উইলি মুন্‌ৎসেনবার্গ ও ভারতীয় বিপ্লবী নায়ক বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

১৯২৭-এর ১০ই থেকে ১৫ই ফেব্রুয়ারি, বেলজিয়মের রাজধানী ব্রুসেল্‌সে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সমস্ত নিপীড়িত জাতির মুক্তিসংগ্রামের সমর্থনে মহা-সম্মেলন সুরু হয়। তার সভাপতিমণ্ডলীতে ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত জার্মান বৈজ্ঞানিক অ্যালবার্ট আইনস্টাইন, ফরাসী ঔপন্যাসিক আঁরি বারবুস, চীনা জননেত্রী মাদাম সান ইয়াৎ সেন প্রভৃতি। কার্যকরী সমিতিতে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন ইংরেজ শ্রমিক নেতা জর্জ ল্যানসবারী, ইন্দোনেশীয় জাতীয় নেতা মহম্মদ হাত্তা, জার্মান কমিউনিস্ট নেতা উইলি মুনৎসেনবার্গ ও ভারতবর্ষের জওহরলাল নেহরু। সংগঠনের সম্পাদকমণ্ডলীতে নির্বাচিত হন বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।[৩]

ভারতবর্ষের বেশ কয়েকজন প্রতিনিধি গিয়েছিলেন ব্রুসেলস্ সম্মেলনে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন জওহরলাল নেহরু (ভারতের জাতীয় কংগ্রেস), মৌলানা বরকতুল্লাহ্ (হিন্দুস্থান গদর পার্টি), বাকর্ আলি মীর্জা (ভারতীয় মজ্‌লিশ্, অক্সফোর্ড), এস. এ. রহমান (ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন,

এডিনবরা), জয়সূর্য নাইডু (মধ্য ইউরোপে ভারতীয়দের সংঘ), তারিণী সিংহ (বৃটিশ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট লেবার পার্টির ভারতীয় শাখা), এ. সি. এন. নাম্বিয়ার ও বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (ইউরোপে ভারতীয় সাংবাদিক সমিতি)। এ ছাড়াও ছিলেন ইংলণ্ডের কমিউনিস্ট নেতা শাপুরজী শাকলাৎওয়ালা।[৪]

ব্রুসেল্‌স সম্মেলন থেকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন জানিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়। তাতে বলা হয় :

"পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে ভারতে যে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন চলছে, এই মহাসম্মেলন তাকে সোল্লাস সমর্থন জানাচ্ছে।

এই মহাসম্মেলন মনে করে যে বিশ্বমানবতার পরিপূর্ণ মুক্তির জন্য, বিদেশী আধিপত্য থেকে ভারতের শৃঙ্খলমোচন এক অবশ্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। এই মহাসম্মেলন বিশ্বাস করে যে অন্যান্য দেশের জনগণ ও শ্রমিক শ্রেণী এই সংগ্রামে সর্বপ্রকার সহযোগিতা করবে এবং বিশেষতঃ ভারতে বিদেশী ফৌজ পাঠানোর ও সেদেশে সাম্রাজ্যবাদী ফৌজ রাখার প্রাণপণ বাধা দেবে। এই মহাসম্মেলন আরও আশা করে যে ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন তার কর্মসূচিতে শ্রমিক ও কৃষকদের পরিপূর্ণ মুক্তির প্রশ্নকে অগ্রাধিকার দেবে, কেননা তা বাদে প্রকৃত স্বাধীনতা আসতে পারেনা…।"[৫]

ব্রুসেলস্ মহাসম্মেলন সম্বন্ধে জওহরলালও সপ্রশংস মন্তব্য করেন :

"১৯২৬-এর শেষে আমি বার্লিনে ছিলাম। সেখানেই আমি জানতে পারলাম যে ব্রুসেল্‌সে নিপীড়িত জাতিদের মহাসম্মেলন হবে। প্রস্তাবটা আমার ভালই লাগল এবং আমি দেশে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসকে লিখে পাঠালাম যে আমাকে সরকারী ভাবে ব্রুসেলস মহাসম্মেলনে যোগ দিতে দেওয়া হোক। আমার অনুরোধ রক্ষিত হলো এবং আমি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধি মনোনীত হলাম।…সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংঘের ব্রুসেলস্ মহাসম্মেলন ও পরবর্তী সভাগুলি, আমাকে উপনিবেশসমূহ ও পরাধীন দেশসমূহের বহু সমস্যা বুঝতে সাহায্য করেছিল।…কমিউনিজমের প্রতি আমার মনোভাব বন্ধুতাসূচক হয়ে উঠল, কেননা ঐ আদর্শের আর যত দোষই থাকুক না কেন, তাতে ভণ্ডামি ছিল না এবং সাম্রাজ্যবাদের প্রতি তার কোন দুর্বলতাও ছিল না।"[৬]

অন্যদিকে, সাম্রাজ্যবাদী মহল এই মহাসম্মেলনের সাফল্যে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হলো। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের সবচেয়ে প্রচ্ছন্নপ্রহরী বৃটিশ শ্রমিকদল মন্তব্য করল : "ব্রুসেল্‌স্‌ মহাসম্মেলনকে, বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের স্বার্থে খুবই ধূর্ততার সঙ্গে কাজে লাগিয়েছে কমিউনিস্টরা।"[৭]

ভারত সরকারও এই সংগঠনকে গভীর সন্দেহের চোখে দেখল ও গোপন রিপোর্টে মন্তব্য করল যে :

"এই সংঘ ও ভারতবর্ষের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ খুবই বিপদজনক।...সংঘ যে আসলে কমিউনিস্টদেরই পরিচালিত, তাতে কোনই সন্দেহ নেই। আমাদের দৃঢ় ধারণা এই যে চট্টো ও তাঁর বন্ধু-বান্ধবরা এই সংঘ ও ভারতের মধ্যে সম্পর্ককে আরও নিবিড় করার জন্য উঠে পড়ে লাগবেন...।"[৮]

ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের সন্দেহ আদৌ অমূলক ছিল না। বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শাপুরজী সাকলাৎওয়ালা ও আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট নেতৃত্ব সত্যই কোমর বেঁধে লাগলেন "লীগ এগেনস্ট ইম্পিরিয়ালিজম্‌"-এর মারফৎ ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে সুদৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন করতে। ১৯২৮ এর ২৮-এ এপ্রিল, ঐ সংঘের কার্যকরী সভার অধিবেশনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে সাকলাৎওয়ালা বললেন :

"এই সংঘ সম্বন্ধে ব্রিটিশ শ্রমিকদল এমন একটা বাজে মনোভাব দেখাচ্ছেন, যে শীঘ্রই সমস্ত নিপীড়িত জনগণের কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে একমাত্র নির্ভরযোগ্য সাথী কমিউনিস্টরাই...।"[৯]

১৯২৮-এর মে মাসে বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, জওহরলাল নেহরুকে এক পত্রে লেখেন :

"আমাদের সংঘের মূল ভিত্তি হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টিগুলি, সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক সাধারণ কর্মীরা এবং উপনিবেশের জাতীয় বিপ্লবী আন্দোলন সমূহ...।"[১০]

সংঘের ইংরেজি মুখপত্রেও লেখা হলো :

"ব্রুসেলস্‌ মহাসম্মেলনেই যুক্ত কর্মসূচির ভিত্তি রচিত হয়েছিল এবং সংগঠন দানা বেঁধেছিল। সংঘের মূলনীতি স্পষ্টই হচ্ছে নিপীড়িত জাতিসমূহের প্রতিনিধিদের, জাতীয় বিপ্লবী সংগঠনদের, বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের, সমাজতন্ত্রীদের ও কমিউনিস্টদের মধ্যে যুক্ত আন্দোলন গড়ে তোলা...।"[১১]

তবুও, পৃথিবী জুড়ে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় মুক্তি আন্দোলন তখন

যে উত্তাল স্রোতের মতো এগিয়ে চলেছিল, 'লীগ এগেনস্ট ইম্পিরিয়ালজম্' তার সঙ্গে পুরোপুরি তাল রেখে চলতে পারে নি। সম্ভবতঃ এই ব্যাপক যুক্তফ্রণ্টের নীতি ও রণকৌশলকে, সব কমিউনিস্ট পার্টিরা মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারে নি, অথবা নামে গ্রহণ করলেও, কর্মক্ষেত্রে তদানীন্তন সঙ্কীর্ণতার প্রবণতাকে কাটিয়ে উঠতে পারে নি। এ সমালোচনা সেযুগেও হয়েছিল এবং সমালোচনা করেছিলেন সর্বোচ্চ কমিউনিস্ট নেতারাই। ১৯২৮-এ কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ষষ্ঠ কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে কমিণ্টার্ণের তৎকালীন সম্পাদক স্বয়ং বুখারিন সমালোচনা করে বলেছিলেন ঃ

"আমার মনে হচ্ছে যে আমরা এই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংঘকে যথেষ্ট সাহায্য করছি না। অনেক কমরেড মনে করেন যে এই সংঘটা নিতান্তই অকেজো। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা তার ঠিক বিপরীত প্রমাণ করেছে।… ইউরোপ, আমেরিকা, এশিয়া, আফ্রিকা—যে মহাদেশেই হোকনা কেন, বিপ্লবের প্রস্তুতিতে আমাদের দরদীদের ব্যাপক অংশকে একজোট করা জরুরী কাজ, এবং সেই কাজেই এই সংঘের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ… ।"[১২]

প্রাচ্য দেশের আর একজন কমিউনিস্ট নেতা সেন কাতায়ামা বলেন ঃ

"……কমরেড বুখারিনের সঙ্গে আমিও একমত যে যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের সপক্ষে, 'লীগ এগেনস্ট ইম্পিরিয়ালিজম'কে জোরদার করা জরুরী প্রয়োজন।……উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশের মানুষ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এই সংঘের দিকে অধীর আগ্রহের সঙ্গে তাকিয়ে আছে…… ।"[১৩]

ঐ বছরই আগস্ট মাসে বার্লিনে সংঘের কার্যকরী সভায় ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হলো।[১৪] সংঘের অন্যতম নেতা, ইংরেজ বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নিস্ট ব্রিজম্যান ও ডেভিস ১৯২৮-এর শেষের দিকে ভারতে আসবার চেষ্টা করলে, তাদের ভারতে প্রবেশপত্র দিতে আপত্তি জানিয়ে ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তর, ইংলণ্ডে এক বার্তা পাঠান যে ঃ

"সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংঘ যে শুধু কমিউনিস্টদের ছদ্মবেশী সংগঠন—তাই নয়, উপরন্তু তার লক্ষ্য হলো ভারত সরকারকে উচ্ছেদ করার আন্দোলনকে সাহায্য করা……।"[১৫] কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের এই বিরূপ মনোভাব ও ব্রিটিশ শ্রমিক দলের কুৎসা প্রচার, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাছে, সংঘের আদর আরও বাড়িয়ে দেয়। ১৯২৮-এর

ডিসেম্বর মাসে, কলকাতায় ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন থেকে প্রস্তাব গ্রহণ করে সংঘকে অভিনন্দন জানান হয়। আর কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী—'হিন্দুস্থান সেবা দল' আরও স্পষ্টভাবে বলেঃ "ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে 'লীগ এগেনস্ট ইম্পিরিয়ালিজম্', যে সাহায্য করেছে, তার জন্য এই সম্মেলন তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে……।"[১৬]

১৯৩৩ অবধি এই সংঘ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং ভারত সহ সমস্ত পরাধীন দেশের মুক্তি সংগ্রামের সপক্ষে নিরবচ্ছিন্ন অভিযান চালিয়ে যায়। ভারতবর্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে তার অধিবেশনে যোগদান করেন বিঠল ভাই প্যাটেল, শউকৎ উসমানি, মানবেন্দ্রনাথ রায়, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অন্যান্যরা। আর শেষদিন অবধি তার অন্যতম সম্পাদক থাকেন 'চট্টো'। হিটলারের ক্ষমতা দখলের পর ফ্যাসিষ্ট দস্যুরা তছনছ করে দেয় বার্লিনে সংঘের খাস দপ্তর। সোভিয়েতে চলে যেতে বাধ্য হন চট্টো ও অন্যান্য নেতারা। ঘাতকের হাতে প্রাণ হারান সংঘের জার্মান নেতারা অনেকেই। তারপর প্রায় চার দশক কেটে গেছে। ভারতবর্ষও বহুদিন স্বাধীন হয়ে গেছে। কিন্তু তার মুক্তি সংগ্রামের এক সন্ধিক্ষণে ভারতের স্বাধীনতার সপক্ষে সারা দুনিয়ায় জোরদার প্রচার চালিয়েছিল এই যে বন্ধু সংস্থা, তাকে আজ নতুন করে স্মরণ করা দরকার—বিশেষ করে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে কমিউনিস্টদের গৌরবময় ভূমিকাকে বিকৃত করার অপচেষ্টা যখন নতুন করে মাথা চাড়া দিয়েছে।

পাদটীকা

১। সেসিল কে: "কমিউনিজম্ ইন ইণ্ডিয়া" ভারত সরকারের গোপন পুস্তিকা, দিল্লী, ১৯২৬। পৃঃ ১-২। ২। ঐ, পৃঃ ৩। ৩। লাইপজিগে ডিমিট্রভ্ মহাফেজখানায় সংরক্ষিত দলিল থেকে সংগৃহীত, শ্রীচিন্মোহন সেহানবীশের সৌজন্যে। ৪। ঐ। ৫। হোম/পল/এফ নং ১০ (২), ১৯২৯, পরিশিষ্ট নং ২, ভারতীয় মহাফেজখানা, নয়া দিল্লী। ৬। জওহরলাল নেহরুঃ "আত্মজীবনী" (ইংরেজি সংস্করণ) ৭। হোম/পল/এফ নং ১০ (২), ১৯২০, পরিশিষ্ট নং ১। ৮। ঐ, পরিশিষ্ট নং ২, পৃঃ ৯। ৯। "ইন প্রেকর." ৪ঠা মে ১৯২৮। ১০। হোম/পল/এফ নং ১০ (২), ১৯২৯, পৃঃ ৭। ১১। "অ্যান্টি ইম্পিরিয়ালিস্ট রিভিউ" লণ্ডন, ১৯২৮, প্রথম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা। ১২। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ষষ্ঠ কংগ্রেসে বুখারিনের প্রদত্ত রিপোর্ট থেকে (১৯২৮)—"ইন প্রেকর" ৩১শে জুলাই। ১৩। ঐ, সেন কাতায়ামার বক্তৃতা—"ইন প্রেকর" ঐ। ১৪। "ইন প্রেকর" ২৮শে আগস্ট ১৯২৮ ১৫। হোম/পল/এফ নং ১০ (২), ১৯২৯, তাং ৬/১২/১৯২৮। ১৬। ১৯২৮-এর ডিসেম্বরে কলকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতীয় সেবা দলের বার্ষিক অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব থেকে।

কিংবদন্তি

অমলেন্দু চক্রবর্তী

বাঁশের মাচার এক কোণে ঝুলছিল হ্যাজাকের আলোটা। সেই সন্ধে থেকে একটানা ভঁস্-ভঁস্ করে ফুঁসছে, তেল পুড়ছে আর ঝাঁকে-ঝাঁকে পোকা এসে কিলবিল করে ঘুরছে চারদিকে, ঠোক্কর খেয়ে পুড়ে-পুড়ে মরছে। জোয়ান বুড়ো, মাগী-মর্দা মানুষগুলির মতো। ওষুধ নেই, পথ্যি নেই ডাক্তার-বদ্যি কিছু নেই, যেন মরলেই হলো। অমাবস্যের রাত আকাশ ছেপে আঁধার নেমেছে। ঘুটঘুটে আঁধার। তিন ক্রোশ, চার ক্রোশ দূরের-দূরের গ্রাম-গঞ্জ, খানা-খন্দ, বুক-টান-করা মাঠের পর মাঠ সব কালো করে চারপাশে চাপ-চাপ আঁধার। মরা মানুষের পাঁজরার মতো ঠায় ঝিম্ মেরে দাঁড়িয়ে আছে গাছপালা, বাঁশবন, ঝোপজঙ্গল। একটু বাতাস নেই, নিঃশেষ নিতে কষ্ট হয়, বুকে টান ধরে, গল্‌গল্ করছে ঘাম। চিমসে-পেটে কালো মানুষ গুলি ধুঁকতে-ধুঁকতে আসে, হাঁটু ভেঙে বসে, মাটিতে লুটোয় — 'মা, মাগ, রক্ষে কর মাগ। মাঠ পুইড়ে খাক হলো, হাল-নাঙল সব বিকোল, দেশ জুইড়ে ভাগাড়, স্বজন-স্বজাতি শেয়াল-শকুনে খায়…'। ভয়ে তাকিয়ে থাকে সব। ভয়! মায়ের-থান সাজিয়েছে জোয়ান মরদ বাউড়িরা যারা এই আকালেও ঘরের বাপ্-মা, স্বজন-স্বজাতিকে টেনে-হিঁচড়ে সোনাডাঙার মাঠের ভাগাড়ে ফেলে আসতে পারে শেয়াল-শকুনের মুখে। চারিটে বাঁশ পুতে মাচা, বাহারের খেজুরপাতা আর কামিনীগাছের ডাল দিয়ে ঘিরেছে চারদিক মায়ের-থান। চার-চারটে ধুনুচি থেকে ধোঁয়ার-কুণ্ডলী ওঠে, সরু হয়ে উপরের ছাউনিতে গিয়ে ছড়িয়ে পড়ে; পাকে পাকে মোচড় খেয়ে খেয়ে ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় আড়াল হয়ে যায় শ্মশানকালীর মূর্তি। লাল-কাপড়পরা কাপালিক-ঠাকুর ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় মিশে যান। আধ-বস্তা ধানের পেন্নামী দিয়ে দূরের গাঁ থেকে আনতে হয়েছে ঠাকুরকে। এই আকালের দিনে কেউ আর চায় না মুখপানে। মানুষগুলি মানুষ নেই আর। শুয়োরের মতো মাটি শোঁকে। সুযোগ পেলেই হাড়-মাস চিমসে নিতে চায়। ড্যাং

ড্যাং ড্যাং বাদ্যি বাজে, নিঃঝুম রাতের মাঠে মাঠে ছড়ায়। ধরাস ধরাস করে বুকগুলি, চোখের পলক পড়ে না। বাউড়িদের গাঁ-এ এমন বাদ্যি বাজেনি কোনোদিন। কিন্তু কথা বলেনা কেউ। চুপটি করে বসে থেকে আর বুকের ভিতর সিঁধিয়ে গিয়ে মাগী-মর্দা, বাচ্ছা-বুড়ো খিদেয়-তেষ্টায় কাতরায়। ধোঁয়ার নাচন দেখে আর ভাবে — অমন সোনার-মাঠে ভাগাড় কেন? দুপুরের রোদে সব জ্বলে-পুড়ে খাক! চোত-বোশেখের মাঠ। পোয়াতি বৌ-এর পেটের মতো মাটি ফেটে চৌচির। বড়ো বড়ো হা। লাঙল ফেলতে গেলে ইশ্ ডোবে না, মোষ-বলদের পা ডুবে যায়। তিন চার ক্রোশ ধরে ছড়ানো বিশাল মাঠের মাঝখানে পঞ্চাশ-ষাট ঘরের বাউড়িদের ছোট গ্রাম। পিঠের আঁচলের মতোন। ইঁদারা নেই, পঞ্চাইতের টেপা-কল ছিল একটা, গেল দু-দিন ধরে পড়ে পড়ে মরচে ধরল। হাত দিলে শুধু খটাং খটাং করে। এঁদোডোবা, পানাপুকুর দু-একটা যা-ও ছিল, অগস্ত্যমুনি শুষে নিলেন। তলানির কাদাও শুকিয়ে কাঠ, পায়ে-পায়ে বেঁধে। রাত দুপুরে গোয়ালের দড়ি ছিঁড়ে গাই বলদ মাঠে মাঠে ছোটে। তেষ্টা! তেষ্টার টানে সারামাঠ জুড়ে ডাকতে ডাকতে আঁধার রাতে কোথায় চলে যায়। সব ফেরে না। দু-চারটের খোঁজ মেলে — মাঠের মধ্যে হুমড়ি খেয়ে মরে পড়ে আছে। শেয়াল-শকুনের মোচ্ছব। শিবঠাকুরের বাহন। চাষীর ঘরে মা-বাপ। তেষ্টায় বুকের ছাতি ফাটে; কিন্তু সইতে পারে না চাষী। চোখ ফেটে জল গড়ায়। জল! চোখের কোল থেকে গাল বেয়ে ঠোঁটের দিকে নামে। জিব টেনে লোনা জল টেনে নেয়। খুশির টানে বাচ্চাগুলি বুকে চাপে। বাপের গাল চাটে ছেলে। গলা ভেজে না, তেষ্টা। জগৎ জুড়ে ছেলে-বুড়ো, মাগী-মর্দা সব মানুষের তেষ্টা। নির্দয় আকাশ। কুকুর বেড়ালের বাচ্চার মতো মানুষের বাচ্চাগুলি বাউড়ি-বৌর বুক খাবলে ধরে মাই কামড়ে রক্ত চোষে। যন্ত্রণায় কাতরায় বৌ। কিল-চড়-ঘুসি-লাথি কান্না—কার বৌ, কার বাচ্চা, এক বাউড়ি বৌর দুধ-জমানো-বুকে বাউড়ি বাচ্চাদের মোচ্ছব। দুধেল গাই মুখ মুচড়ে আছড়ে পড়ে মাটিতে, ধুঁকতে ধুঁকতে মরে যায়। টেনে-হিঁচড়ে ভাগাড়ে টেনে নেবে মানুষ নেই। মড়ক। গাই-বাছুর-মোষ-বলদ-কুকুর-বেড়ালের মরা শরীর পচে-গলে দুর্গন্ধ ছড়ায়, ঝাঁকে ঝাঁকে শকুন ওড়ে গাঁয়ের আকাশে। মাটির ঘরের চালে, বাড়ন্ত মড়াই-এর উপর, তাল খেজুরের ডোগায়, শেতলা মায়ের থানে, পালুই-এর

যাথায় ঘরের দাওয়ায়, নিকোন উঠোনে শকুন। দিনদুপুরে পরান বাউড়ির ন্যাংটো মেয়েটাকে উঠোন থেকে সুঁচোল ঠোঁটের ডগায় গেঁথে উড়িয়ে নিয়ে গেল একটা শকুন। মেয়েটার কান্নায় পড়শীরা ছুটে এসে ভিড় করল, হাঁ করে ঘাড় উঁচিয়ে দেখল সবাই, সাতজন্মে এমন অলক্ষুণে কাণ্ড দেখেনি কেউ, এক বছরের একটা শিশুর বুক-চেরা কান্না সীতা মায়ের মতো উড়ে যাচ্ছে আকাশে, টশ্ টশ্ করে রক্ত ঝরছে মাটিতে। চিনে চিনে জোয়ানরা মাঠের দিকে অনেকদূর এগোয়। বিশাল ডানার ছায়াটা মাঠের উপর দিয়ে কোথায় হারিয়ে গেল! সেই থেকে একটা ভয়, অমাবস্থের আঁধারে শকুনের ডানা-ঝাপটানির মতো ভয় আর তরাসে বুক কাঁপছে মানুষের। মুখ তুলে কথা কইতে সাহস পায় না। কি সব্বোনেশে কাল গ। অমন অলক্ষুণে ব্যাপার জীবনে দেখেনি কেউ। অকল্যেন। ভরদুপুরে শেয়ালেরা ঘুরে বেড়ায়। ঘরে ঘরে কান্না আর নাভিশ্বাস। বমি আর পায়খানায় মাখামাখি। মাগী-মর্দা, ছেলে-বুড়ো প্রাণপনে মাটি আঁচড়ায়। জল! তেষ্টায় বুক ফাটে, কণ্ঠনালী শুকোয়। চোখ ভাসিয়ে জল — এক ফোঁটা জলের আশ মেইটে দাও গ ভগমান। হেই মা বিশেলাক্ষী! মা শেতলা! মা গ —পালুই-এর তলায় অন্ধকার থেকে, ঝোপ-জঙ্গলের ফাঁকে চুক্ চুক করে জিব চাটতে চাটতে বেরিয়ে আসে শেয়ালেরা। সোনা বাউড়ির বুড়ো বাপ হাড় জিরজিরে নধর বাউড়িকে ঘরের ভিতর গিয়ে কামড়ে ধরল। তাড়া খেয়ে পালাল বটে, কিন্তু বুড়ো গল্‌গল্ বমি করতে করতে তেষ্টায় সেই বমি চাটতে চাটতে ধুঁকে ধুঁকে মরল। ওলাওঠা! ঘরে ঘরে হাহাকার। বুক হাতড়ে, গলা ছিঁড়ে অসহায় কাতরানি। জোয়ান-মরদ যারা তখনও ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াতে পারে, বুঝতে পারে না, কি করবে। মাঠের মাঝে মাঝে ছেঁড়া ছেঁড়া গ্রাম — সুতাহাটি, জাগুলি, মাতালি কোমপুর, ছুলে বাগদী বাউড়ি ক্ষেতমজুর গরিব কিষেনের বাস। দূর থেকেই দেখা যায় সব গাঁ-এর আকাশেই কাক-চিলের মতো টান টান ডানা-মেলা শকুন, মাঠ ভরে ভাগাড়, আম-কাঁঠাল-তেঁতুল-বট-অশ্বত্থের পাতা ঢেকে ডানা ঝাপটাচ্ছে শকুনের পাল। রক্ষে নেই। মা বিশেলাক্ষীর শাপ। 'জন-মনিষ্যি আর বাঁইচবে না গ। মরণ।' ঘরে ঘরে কান্না। ডাক্তার-বদ্যি নেই। আসবে না কেউ, আসে না। আড়াই ক্রোশ দূরে, সরকারি পাকা-রাস্তার ধারে বামুন-কায়েত, মালিক-জোতদার বাবুদের গ্রাম। হাট-

বাজার, দোকান-পাট, ডাক্তার-বস্তি, টেপাকল, ইঁদারা, শান-বাঁধান দীঘি সব আছে বাবুদের বাস চলে দিনভর। শহর থেকে বাবুদের লোক এসেছিল, সুঁচ ফুঁড়ে দিয়ে গেছে দলে দলে, মাঠ পেরিয়ে গরিবদের গাঁ-এ আসেনি এতদূর। ফকির বাউড়ি, মদন, কানু, বিশে নন্দকে নিয়ে এই বোশেখ-মাসের আগুন মাথায় নিয়ে ভরদুপুরে গিয়েছিল। সরকারি হাসপাতালের ডাক্তারবাবু, যামিনী ডাক্তার, নলিনী কবরেজ—সকলের পায়ে মাথা কুটে কান্নাকাটি করে ফিরে এল। কেউ এলেন না। চারদিকে মড়ক, পোকা-মাকড়ের মতো মরছে মানুষ। পেটের দানা নেই কিন্তু ওরা পেট পুরে জল খেয়ে এল, তিন ঘড়া জল নিয়ে এল গাঁ-এ। জল? এক-দুপুর ধরে কয়েক হাজার মেয়ে-পুরুষের পিছনে লাইন দিয়ে জল এনেছে। মাঠের আল ধরে ঘড়া-মাথায় ওদের আসতে দেখেই গাঁ-এর ছেলে-বুড়ো-মাগী-মর্দা সব পিল্‌পিল্‌ করে ছুটে গেল লোভে, দু-পা সোজা করে দাঁড়াতে পারে, এমন যতোগুলি মানুষ ছিল সবাই। সোরগোল তুলে হুমড়ি খেয়ে পড়তেই তিনটে ঘড়া মাটিতে পড়ে গুঁড়িয়ে গেল। জল গড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ল মাটিতে। মাঠের তেষ্টা আকাশ ভেজায়। দু-ঘড়া জল চোখের পলকে শুকিয়ে গেল আল্‌-কেউটের গর্তে। নন্দ বাউড়ির মাথার ঘড়াটাও যাচ্ছিল। পড়িপড়ি করে হাত ফসকে যাবার আগেই লাফ দিয়ে, হাত বাড়িয়ে ওটা ধরে ওটা নিয়ে ছুটতে শুরু করে সদা বাউড়ির মেয়ে টেঁপি। ভয়ঙ্কর মেয়ে। ঘড়াটাকে কেড়ে নিয়েই মাথায় বসিয়ে সোজা ছুটল গাঁ-এর দিকে। একঘড়া জল। অমন সাধের অমেত্ত। ও বেহায়া ছুড়ি একা নিবে কেন? রোগা-আধমরা টিং-টিং-এ মেয়ে-পুরুষ, কাচ্চা-বাচ্চা সবাই মিলে ওকে ছেঁকে ধরল আলের উপরই। 'ই আমার তরে লয় গ, তুদের দিব। জনে জনে ভাগ কইরে দিব···হা-পিত্যেশ করিস লাই··ই তুদের—' কে শোনে! সবাই মিলে খামচে ধরল, কিল-চড়-খামচি আর কামড়, মেয়েটা সামলাতে পারল না। মাথার উপরই ঘড়াটা ফাটল গল্‌গল্‌ করে টেপা-কলের ঠাণ্ডা-জল ওর দেহ ভিজিয়ে, ওর জট-পাকানো লালচে দীঘল চুল, নাক-মুখ-ঘাড়-গলা-বুক, বুকের কাপড় সব ভিজিয়ে ওকে স্নান করিয়ে দিল। আহ, কি সুখ! যেন বর্ষার জলে কাদা-মাঠে ধান রুইতে নেমেছে মনে হয়। আরামে চোখ বোঁজে টেঁপি। আর তখন ওকে নিয়ে হুটোপুটি। ওর শরীর চাটে জোয়ান-বুড়ো-মাগী-মর্দা। সোমত্তা মেয়েমানুষের টগবগে

শরীর। পুরুষমানুষের জিবে শেয়ালের লালা। সর্ব অঙ্গে জ্বালা। মেয়েটা বাঁচতে চায়। চারদিকে মারধোর করে বেরোতে চেষ্টা করে। কিন্তু ওর ভেজা ভেজা-শাড়ির আঁচল ধরে টান। টেঁপি চিৎকার করে ডাকে, দু-হাতে প্রতিরোধ করে—'নজ্জা গ, মেয়েমানুষের এজ্জত···।' ভেজা-শাড়ির আঁচল টেনে দাঁতে কামড়ে, চুষে চুষে গলা ভেজায় দেশ-গাঁ-এর চেনা-মানুষেরা। সব জানোয়ার বনে গেছে, শেয়াল-কুকুর, মেয়েটা ভয় পায়, দু-হাতে বুকের মাই চেপে তাকিয়ে দেখে নিজেও ঘাবড়ে যায়—মানুষগুলি মানুষ নয়, আর ওরা এবার মানুষের রক্ত চুষে খাবে। ছেঁড়া-তালিমারা ডুরিকাটা পুরানো শাড়িটা মাঠের মাঝখানে ঘরের মানুষের হাতে, সম্পূর্ণ ন্যাংটো হয়ে, এক-কুড়ি বয়সের তাজা মেয়েটা অমন কাঁচা বয়সের ডাগর শরীরটা নাচাতে নাচাতে আলের পথ ধরে মেয়েমানুষের লাজ-লজ্জা, ভয়-ডর সব কিছুর মাথা খেয়ে, ছুটতে ছুটতে, হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরের দিকে ছোটে। সুপুষ্ট শরীরটা নেশা ছড়ায়, উদোম বুক লাফায়, উপায় নেই, ঘরের মানুষ লজ্জা কাড়লে, তামাম দুনিয়ার মানুষ জানোয়ার হয়ে গেছে। একরাশ শেয়াল-শকুনের ভিড় ঠেলে গাঁ-এর উপর উঠে টেঁপি ঘরের দিকে ছোটে। তেঁতুল-তলায় গাছের গুঁড়ি আঁকড়ে মরে পড়ে আছে একটা মানুষ। একপাল শকুন বসে মোচ্ছব করছে। সোনা বাউড়ির ঘরের ভিতর মেয়েমানুষের গোঙানি, মা-শেতলার থানে তিনটে শেয়াল গন্ধ শুঁকছে, গাঁয়ের পাশে বেগমপুরের মাঠে ভাগাড়, গাই-বলদের সঙ্গে স্বজন-স্বজাতিকে টেনে টেনে ফেলা হচ্ছে ভাগাড়ে, শেয়াল-শকুনের কাড়াকাড়ি, সারা গ্রাম জুড়ে মরামানুষের পচা দুর্গন্ধ। মেয়েটা কোনোদিকে তাকায় না, প্রায় নির্জন শ্মশান-গ্রামের উপর দিয়ে দৌড়ে এসে নিজের মাটির ঘরে ঢুকে নিঃশ্বেস নেয় আর হাঁপায়। এই মড়কেই দুদিন আগে মরেছে মা-টা, বমি-পেচ্ছাব-পায়খানায় সারা শরীরে পচা গন্ধ মেখে ধুঁকছে বুড়ো-বাপ্। কথা বলতে পারে না, ভাঙা-চোয়ালে জিব দিয়ে ঠোঁট চাটে, চোখে জল। মেয়ে সামনে এসে দাঁড়াতেই যেন মাটিতে-লেপ্টে-থাকা রুগ্ন শরীরে একটা কাঁপুনি লাগল হঠাৎ। পলক না ফেলে ঘোলাটে চোখে তাকিয়ে থাকে সদা বাউড়ি। নড়ে না টেঁপি। শ্মশানকালীর ভয়াল-মূর্তিতে বাপের উপর চোখ রেখে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে! অক্ষম হাত দুটো তুলে কি যেন বলতে চেয়ে, বলতে পারে না সদা বাউড়ি। খড়-পচে-যাওয়া ভাঙা-চালে শকুন ডাকে, চোখের উপর বমি করতে করতে পাঁজরা ছিঁড়ে বুড়ো-বাপ মরে এবং এত

যন্তরনা দেখেও মেয়েটা হাত বাড়িয়ে ধরে না। মাটিতে আছড়ে পড়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদে—'কেউ বাঁচবে না বাপ্। সোদর ভাই আমার বুক চেইটেছে, সোদর বোন বুকের-কাপড় টেইনে আমায় ন্যাংটো কইরেছে। দেশ-গাঁ-এ আর মনিষ্যি নেই গ বাপ্, শ্যাল্-কুত্তা···' এবং তখনই গাঁ-এর আর দশজনকে নিয়ে এসে ছেদাম বাউড়ি ঘিরে ধরল ঘর—'ডাইনি মাগী, ই মাগী রাককুসী গ। সোয়ামীর ঘর কইরবে না মাগী, পাছা নাইচে বেড়াবে দিনভর। ব্যাটছেইলের চরিত্তির খুইবে। রেতের বেলা পেট খসাবি দিনের বেলায় চোখ লাচাবি। মর, মর···থুঃ···ওয়াক্ থুঃ...পাপ, পাপে ভইরল দেশ, ভাগাড় হলো গাঁ···দূর কর, দূর কর, উ মাগীকে ভাগাড়ে দে আয় সব···'টেঁপি মাটিতে মুখ থুবড়ে কাঁদে। চোখের উপর জোয়ান-মরদ বাউড়িরা বুড়ো বাপ্‌কে পা ধরে মাটি ঘসে হিঁচড়ে বাইরে নিয়ে যায়। ভাগাড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। শেয়াল-শকুনে খাবে। টেঁপি কাঁদে—'আমার দুষ লাই গ বাপ্। দুষ লাই···' যমও নেয় না ওকে। সেই কতো সন আগে একরত্তি বয়সে বিয়ে হয়েছিল অনেক দূরে, বাসে চেপে যেতে হয়, হ্যাদামখালি গাঁ-এর খুনে-ডাকাত প্যালা বাউড়ির সঙ্গে। ক-বছর আর ঘর করেছিল! একদিন রাতে হাতকড়া বেঁধে ধরে নিয়ে গেল হাজতে। আর ফিরল না কোনদিন। রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে কুড়ুল নিয়ে কোপাতে এল শ্বশুর, বঁটি নিয়ে তেড়ে এল বুড়ি শ্বাশুড়ি। বলল—'ডাইনি।' সেই থেকে বাপের ঘরে পালিয়ে এল টেঁপি। আর ফেরেনি। শরীল! টেঁপি বোঝে না সেই দোষ কার? গায়ে-গতরে, হাড়ে-মাসে সোমত্ত বয়সের শরীরটা যদি ধেইধেই করে বেড়ে ওঠে, তবে লোকে দুষবে কেন? ওর শরীরের পাপে মড়ক? টেঁপি পিঠটান করে উঠে দাঁড়ায়। জট-বাঁধা এলোচুলে খোঁপা বাঁধে, আরেকটা পুরনো ছেঁড়া-শাড়ি গায়ে জড়িয়ে আবার রাস্তায় নামে। কারও ঘরের বাঁধা-মেয়েমানুষ নয় সে, কোনো ব্যাটাছেলের পোষ নয়, নিজে গায়ে-গতরে খেটে খায়, ঘরামির কাজ করে, তিন ক্রোশ হেঁটে গিয়ে বেড়াবনীর হাটে বসে লাউটা-কুমড়োটা বিকিয়ে আসে, আবাদের দিনে জোতদার ধান-রুইবার আগাম দিতে চাইলে টেঁপির জন্য আলাদা দর। তিন মেয়েছেলের কাজ একা করে সে। সেই টেঁপি মড়কের মুখে ধন্বন্তরী। পেটে দানা নেই, পথ্যি নেই। আকাল। পেটে খিদে, গলায় তেষ্টা। শরীর আর সয় না। তবু কার ঘরে কে মরল, পায়খানা-পেচ্ছাব-বমিতে কে মাখামাখি, কাকে ভাগাড়ে ফেলতে হবে,—মেয়েটার ভয়-ডর নেই, ক্লান্তি নেই, সারা গাঁ-এ

লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ায়। কিন্তু সেদিন রাতের বেলায়, সারা গাঁ-এ সবাই যখন ঘরেঘরে ঘাপ্‌টি মেরে ছিল, খিদের জ্বালায় তেষ্টাতে না পেরে যখন বুড়ো ন্যাড়া-বাউড়ি বৌ-ছেলেকে ঘরের ভিতর কুপিয়ে মারল, চিৎকার শুনে ছুটে এলো সবাই। বীভৎস দৃশ্য। রক্তের বান ছুটেছে মেঝের উপর। দাবড়াতে নিঃসাড় পড়ে আছে শরীরগুলি। রক্তমাখা কুড়ুল ধরে হাঁটু ভেঙে বসে বেহুসের মতো ঢলে পড়েছে ন্যাড়া বাউড়ি। পড়শীদের দেখেই ভেউভেউ করে তারস্বরে কান্না। কিন্তু মুখের রা নেই মানুষগুলির। ভয়ে সিঁটিয়ে গেছে সব। এ ওর মুখের দিকে চায়। কথা কয় না কেউ। গাছের এঁচোড় আর কাঁঠাল হলো না, কলার কাঁদি পাকল না. কাড়াকাড়ি, হুটোপুটিতে সব সাবাড় করে, পুঁই-পালং চিবোনোর পরও যারা ঘাস খেয়ে টিঁকে ছিল, ন্যাড়া বাউড়ির কাণ্ড দেখে সবাই কেমন বোবা বনে গেল। অবিশ্বেস! খিদের জ্বালায় মানুষ এখন মানুষ খাবে। সবাই সবাইকে মুখ খিঁচোয়, চোখে চোখে শানায়। জোয়ান-মরদ বাউড়িরাও কেমন যেন মুষড়ে গেল। তাগৎ গেছে, দম ফুরিয়েছে, কোন উৎসাহ নেই। সবাই আকাশের দিকে ঘাড় উঁচিয়ে তাকায়। নির্দয় আকাশ। ওরা ভাবে, বাবুদের কারচুপি। গরিব-মারার ফাঁদ। ও বাবুরা সব পারে, চাষীকে জল দিতে পারে না? জমির উপর মাটি কেটে কেনেল কাটে, রাস্তা বানায়, বাস চলে, রেল চলে, বিজলী জ্বালায়, তাইচুন, তাইনান, এ-আর-এইট বারোমাসী ধানের বীজ আনে, মেঘ আনতে পারে? জোয়ান চাষী মদনা চিৎকার করে হাঁকে—'পাইলে যাব গ। চলো সবে, পাইলে যাই…' সবাই কেমন ধাক্কা খায়। পায়ের-আঙুল থেকে মাথার-তালু পর্যন্ত তিরতির করে রক্ত ছোটে। শিরশির করে—'যাব কুথা গ?'… 'শহরে গ, লঙরখানায়' 'বাপ্-ঠাকুদ্দার ভিটেয় পড়ি রইল বুড়ো-বুড়ি, ঘরের মাগ, কোলের বাচ্চা, তুরা জোয়ান জোয়ান মরদ চলি যাবি শহরে। যা যা। আটকুইড়্যার ব্যাটা বেইমান যা। লাতজামাই করি ঘরে পুইষবে তুদের শহরের মানুষ যা যা, হারামি বাঞ্চোৎ…' গোটা শরীরে চাড় দেয় মদনা, ফুঁসে ওঠে—'কইরব কি এখেনে? বাঁইচব লাই…' কথাটা মনে ধরে। এক ঝটকায় ওঠে নড়ে সব মেয়ে-পুরুষ। মানিক ডুলে বুড়োমানুষ, আকালের গল্প বলে। সেই অনেক অনেক সন আগে এক আকালের গল্প। ব্রতকথার মতো সবাই শোনে, ভয়ে শিউরে ওঠে। সবাই গিয়েছিল শহরে লঙরখানায় কেউ ফেরেনি। যারা জোয়ান-মরদ চাবুক খেয়ে মরল, সোমত্ত বৌ-ঝিরা শরীর বিকোল পয়সা গুণে, বাঁচল না, বুড়ি-বুড়ি

কাচ্চা-বাচ্চা পথেই পড়ে পড়ে মরল। ‘পাড়া-গাঁ-এর মনুষ্য আমরা, জলের মাছ, শ'রের ভাঙায় বাইচব লাই…' মানিক তুলের কথায় সবাই ভয়ে কুঁকড়ে যায়। শেতলা মায়ের থানে মাথার উপরে শকুন ডানা ঝাপ্‌টায়, ভাগাড়ে শেয়াল ডাকে।… ‘কিন্তুক আমরা বাঁইচব লাই…? সি বিধেন দাও গ মুড়ল…' সবগুলি দাঁত-পড়া গালে ঘনঘন চোয়াল চোষে বুড়ো মানিক মোড়ল। বিধেন! ন্যাড়া-বাউড়ির হাতে রক্তমাখা কুড়োলটা চোখে ভাসে। কুড়োলটা দেখতে দেখতে মায়ের হাতের খাঁড়া হয়ে ওঠে, খাঁড়ার চোখে আগুন। লক্‌লকে আগুন আর রক্তের স্রোতে মায়ের সেই রাক্কুসী নেত্য! ছানি-পড়া-চোখে জগৎ আঁধার। তবু মানিক বাউড়ি যেন স্পষ্ট দেখতে পায়, কালী-করালীর দামাল নেত্য। দেশ জুড়ে ভাগাড়, স্বজন-স্বজাতি একেএকে সব গেল, শেয়াল-শকুনে কাড়াকাড়ি। ‘ই নেত্য থাইম্‌বে না গ—' শেতলা মায়ের থানে দাঁড়িয়ে জনেজনে শুধোয় — ‘মায়ের পুজো দিতি হবে গ। শ্মশেনকালী মা, তেনার হাতেহাতে মুণ্ডমালা, জিবে অক্ত, পায়ের গোড়ায় শ্যালের হা। সি পায়ে অক্তজবা দে পেন্নাম করো গ সবে। আমি হপন দেইখেছি — হে…ই ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া মেঘবরণ কেশ গ মায়ের, পূজো দিলি জল ঝইরবে মাঠে, হবে গ, ফের সব হবে। জোত-জমি, গাই-বলদ, কাচ্চা-বাচ্চা, ঘর-দোর সব হবে…' বুড়ো মোড়লের চোখে সত্যি স্বপ্ন কথা বলে। হপন! পিঠে-পেটে এক ক্ষুধার্ত মানুষগুলি হা করে, অবাক হয়ে শোনে। বাঁচার নেশা ধরায়। হপন! জোয়ান-মরদ বাউড়িরা বিশ্বাস করে না। মদন, বিশে, কানু, নন্দ, ভোলা জোট বাঁধে, ঝাকড়া মাথায় গাজনের নাচ খেলিয়ে বুক চিতিয়ে দাঁড়ায় — ‘উ বুড়া মুড়লের হপন না বুছরুকি। মাইনব না, যাব,' ‘যাবি কুথা…,' ‘শ'রে লঙরখানায়…,' ‘শ'রের লেশায় মইরবি না মদনা, শ'র শত্তুর…' ‘বুড়া মুড়লের বাক্যি অগ্‌গেহ্যি করিস নে শুয়ার, সইবে নি…' অসহায় মানুষগুলি হতবিহ্বল। আকাশ আর মাঠভরা আঁধার দেখে ভাবে — কার বাক্যি সত্যি? আঁধার রাতে মাঠ জুড়ে শ্মশেনকালীর এলোকেশের আঁধার, শেয়াল-শকুনের মোচ্ছব। বুড়ো মোড়লের স্বপ্নটা চোখে চোখে সংক্রামিত হয়। ভয়ে বুক ধড়াস্‌ধড়াস্‌ কাঁপে। আঁধার রাতে খিদের জ্বালায় পাগল হয়ে বুনো জানোয়ারের মতো টেঁপিকে জাপটে ধরে কাঁটা-নটে; শেয়াল-কাঁটা, ঝোপের ধারে টেনে নিয়ে যায় মদনা। আছড়ে ফেলে ঝাঁপিয়ে পড়ে পুরুষ মানুষের বুকের তলায় খল্‌বলায় মেয়েটা —

'অকালের দিনে শ্যাল্-শকুন হোস্ নে মদনা। তুরে সব দিব। দশজনের কতা ভেইবে গ্যাখ্। মুড়লের কতা শোন, মান্যি জন…' আঁধার রাতে বাঘের মতো বুকের উপর থাব্‌লা মারে বিশে। টেঁপি হাসে — 'মেয়ে মানুষ নে শুতি চাস্ তুর লাজ লাই শিবে? তুর বাপ, আমার বাপ্ সোনাডাঙার মাঠের ভাগাড়ে, শ্যাল-শকুনে হাড় চিবুচ্চে। মুরদ না তুই? দেশের লোককে মেইরে তুই পাইলে যেতি চাস্। থঃ, ঝাঁটা মারি তুর মুকে…তুর বাছা-বৌ যা পারেনি আমি তুকে দিব। কতার পুব্বে দেশ-গাঁ-এর দশজনকে বাঁচা শিবে, বাঁচা…' জনে জনে ভোলায় টেঁপি। শরীর বাঁধা রাখে। আকালের দিনে পাপ-পুন্যি নেই। মাঠেমাঠে ঢেউ খেলিয়ে সোনার ধান নাচুক, শেয়াল-শকুন ভাগাড়ে যাক, গোয়ালঘরে গাই-বলদ আসুক, রাতে উঠে পোয়াল দেব, ডাবায় ভরে খোল দেব। নতুন খড়ে ঘর ছাইব, পাশ পুকুরে সাঁতার দেব, পোলো ফেলে মাছ ধরব। সেদিন — টেঁপি ভাবে — যদি কথা রাখতে হয়, তবে নিজেকে ছিঁড়েখুঁড়ে দেবে। তুষবে মানুষ — ছেনাল মেয়ে, তুষুক্। কিন্তু! টেঁপি খুশির মৌজে স্বপ্ন দেখে — সোনার দিন এলে মদনা-শিবে-ভোলা শেয়াল-শকুন থাকবে না আর আবার সব মানুষ হয়ে যাবে। তার আগে এ-আঁধার সরাতে হবে, 'ই আঁধার শত্তুর'। সারা গাঁ-এর মানুষের চোখে মোড়লের স্বপ্নটা লেপ্‌টে যায়। শহরের বাবুরা মাঠ পেরিয়ে আসে না এতদূর, জোতদার-মহাজনরা পাকা-ধানের-আঁটি গোনার মনিব। মোড়ল! মোড়ল ছাড়া পথ নেই। কিন্তুক্! আবার মুষড়ে পড়ে। 'ট্যাকা?' সবশুদ্ধ ছ'মাসের খোরাকির চাল থাকে না ঘরে, গরিবের উঠোনে ধানের-মরাই বাচ্চা-বৌ-এর পেট, খড়ের পালুই থুরথুরে কুঁজো-বুড়ির চুলের গুছি। এর উপর আকালের টানে সব গেছে — ঘটি-বাটি, গাই-বলদ, হাল-লাঙল সব। তবু মায়ের জিবে রক্তের তেষ্টা। পূজা চাই। বুড়ো মোড়লের হপন। দেশ-গাঁ-এর এতএত স্বজাতির মৃত্যু দেখেও বেঁচে ছিল বুড়ো। এখন খিদেয়-তেষ্টায় মাটি আঁচড়াচ্ছে আঁধার-ঘরে। গাছের ডগায় শুকনো খেজুরপাতার মতো পড়িপড়ি করে ঝুলছে পরানটা। টেঁপি লাফিয়ে লাফিয়ে ঘরেঘরে ছোটে — 'দাও গ, দাও, যা আচে সব দাও। ফের দাদন লাও গ তুমরা, টিপসই দাও মা'জনের কাগজে। দেশ-গাঁ বাঁচাও…' কলাগাছের গায়ে বাঁশের শক্ত ঠেকনা দিয়ে চাঙা রাখে মদনা-শিবে-ভোলাকে, যৈবনকে — 'নাউসেন-বীর না তুরা? বুড়া-ঢ্যামনা মুরদ দেখা। তা নইলে মেয়েছেইলার নাকি তুদের কপালে। অঁ…'

রাত দু-পহর পেরিয়ে তিন-পহরে পুজোর জোগাড় শেষ হয়। ঝোপ-জঙ্গলের জোনাকি আর আকাশের লাখো লাখো তারাকে অন্ধ করে অমাবস্তের রাতে হ্যাজাকের বাতি জলে বাউড়িদের গাঁ-এ, পেট-মোটা ঢোলের গায়ে মোহন-ঢুলির হাতের-কাঠি তিরবিড়িয়ে নাচে ড্যা-ড্যা-ড্যাং, ড্যাং-ড্যাং-ড্যাং …কাঁসি ধরেছে মোহনের বেটা। ঝিঁ-ঝিঁ পোকা বোবা বনে গেছে, মাঠে-বাদাড়ে শেয়ালের রা নেই। বোকা-হাবা, ভয়ার্ত মানুষগুলি জটলা পাকিয়ে চুপটি করে থাকে। খালি-গায়ে শীতশীত করে। নড়ে না। ধোঁয়ার বাস নাকে লাগে চোখ জলে। এক পলকে তাকিয়ে থাকে মায়ের থানে, শ্মশেন-চিতার ধোঁয়া পাক খেয়েখেয়ে ছড়াচ্ছে চারদিকে। উঠতে উঠতে চাগিয়ে যাচ্ছে মাঠেমাঠে, বড়োবড়ো মাঠের ওপারে আরও দশটা গাঁ। যেখানে যাবে সেখানেই জমাট ধোঁয়া মেঘ হয়ে ভাসবে, আকাল মরবে ধোঁয়ার আড়ালে মা-কে খোঁজে সবাই, মায়ের রক্তমাখা চরণ। আঁধার ঠেলে কোথ্ থেকে টেঁপি এসে আলোর মধ্যে পড়ে। দৌড়ে এসেছে। হাঁপাতে থাকে। গরম-লোহার ছ্যাঁকা লাগে গায়ে, নড়ে ওঠে মানুষগুলি, মায়ের থানে কুলটা মাগী তুই! ভাতার খেকো; রাক্‌কুশি! কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারে না কেউ, তাকিয়ে থাকে শুধু। এই আকালের দিনে নিজের হাতে পায়খানা-পেচ্ছাব কেচেছে মানুষের। কিন্তু গতর রেখেছে ঠিক। তাই সন্দ হয়, রাক্‌কুশি! অমাবস্তের আঁধার গায়ে মেখে দাঁড়ায় মেয়েটা; লাল ডুরি-কাটা শাড়িতে সুপুষ্ট বুক-পাছা ঢাকা পড়ে না, গোলগোল সুডোল হাত-পা, পিতিমের মতো মুখ-চোখ, ছুট-বাঁধা এলোচুল পিঠ ছাপিয়ে কাঁধে-বুকে এসে পড়ে। টেঁপি নিজেও বোঝে, ঘৃণার চাবুক লাগছে গায়ে। পালিয়ে যায় না, দাঁড়িয়ে থেকে মায়ের-থানে ধোঁয়ার পাক দেখে। ধোঁয়ার বাস নাকে লাগে, চোখ জলে। শরীর জুড়োয় সুখে।

'কই গ, পুজোর জোগান কই সব —' যেন মেঘ গর্জায় নিঝুম রাতের বিনি মেঘের আকাশে। মানুষগুলি চমকে ওঠে। মিনমিন করে কাঠির নাচন থেমে যায় মোহন-ঢুলির হাতে, কাঁসিও থামে। সবাই তাকিয়ে থাকে। ধোঁয়ার আড়াল থেকে বেরিয়ে আসেন কাপালিক ঠাকুর। মাথায় জটা, গাল-ভরে জটা, সিঁদুরমাখা কপাল। যেন মেঘের ভিতর থেকে উঠে এলেন সগ্‌গের সন্ন্যেসী ঠাকুর।

'এ পুজো হবে না।'

হবে লাই ! চিমসে পেটে খিঁচুনি ধরে, বুকের পাঁজরায় মোচড় লাগে — 'হবে লাই কেনে গ ঠাকুর।'

মানুষগুলির আর্তনাদ। কাপালিক ঠাকুর বিড়ি ধরালেন। চোখ পড়ে টেঁপির উপর। গোলাগোলা চোখের আগুন। টেঁপি ঝিম্ মেরে দাঁড়িয়ে থাকে। পোড়ে না। — 'পঞ্চমুণ্ডের আসন কোথা তোদের? পাঁচটা মাথার খুলি, সেই খেনে মায়ের কারণ বারি থাকবে। নইলে পুজো হবে না।'

'সে তো সব আপুনি আইনবেন গ ঠাকুর। কতা ছেল··'

'চোপ্ বাঞ্চোৎ···' কাপালিক ঠাকুরের চোখের আগুন টেঁপির শরীর চাটে। টেঁপি কথা কয় না হঠাৎ খিঁচিয়ে ওঠেন মানুষগুলির দিকে — 'সব আনব? কেনে? কতা ছেল না, পাঁচটা মাথার খুলি ঠিক রাখবি। আমি আনব না। কোথা তোদের মোড়ল? ছোকরাগুলা কোথা? ডাক্···'

মাগী-মর্দা এতগুলি মানুষের আর্তনাদের মধ্যে সিধু বাউড়ি ডাক পেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঠাকুরের পায়ে — 'গরিব-মানষের সব্বোস্বি দে' পুজোর জোগাড় গ ঠাকুর। বাঁচাও, বাঁচাও···'

সাষ্টাঙ্গে পড়ে পায়ের দিকে হাত বাড়াতেই লাফ দিয়ে পিছু হটলেন ঠাকুর — 'আরে ছ্যা, ছ্যা, এই সব সব হারামজাদা, শুদ্দুর চণ্ডাল, ছুঁস্ নে, ছুঁস্ নে··'

এবার সব মানুষ টেঁপির দিকে চায়। ঝোপের আড়ালের শেয়াল-গুলির মতো পা টিপেটিপে, সেয়ানা চোখ মেলে উঠে আসে সামনে — 'তুই, তুই, মায়ের থানে তুই কেন এলি রাক্কুশি আবাগী মাগী, সব্বোনাশী!' শেয়ালগুলি চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে। কুত্কুতে চোখে অবিশ্বেসের বিষ। জলবিছুটির জ্বালা। চোখ বুজে ঝিম্ মেরে দাঁড়িয়ে থাকে টেঁপি। মানুষের মাংস মানুষ খায়। দেশে আকাল! 'তুই কেন এলি এখেনে। সব্বোনেশী! তুই এলি আর বাদ সাইধলেন ঠাকুর·' উত্তেজনা বাড়ে। স্বজাতির অবিশ্বেসে। জ্যান্ত যদি পুঁতে দেয় মাটিতে, যদি ছুঁড়ে মারে শেয়াল-শকুনের মুখে। উপায় নেই বাঁচবার। এলোচুলে হাত পড়ে, কার শক্ত হাতের থাবা। মুড়ি-ভাজার গরম বালি চিড়মিড় করে বুকের ভিতর। ঝামটা মেরে তাকায়। টান পড়ে চুলে। কাপালিক-ঠাকুর! একমাথা

জটা আর দাঁড়ির জটার ফাঁকে বেহ্মদত্যির হাসি। চোখ দুটো কপালের সিঁদুরের মতো লাল। ভুরভুর করে নেশার বাস।

'এটা কে বটে?'

'সদা বাউড়ির কইন্যে গ ঠাকুর। সোয়ামী খে বাপের ঘরে এল, ই আকালে মাকে খেল, বাপকে খেল…'

'অ…' ঠাকুরের দাঁতে বেহ্মদত্যি মুখ খিঁচোয়। অসহায়ভাবে চারদিকে মানুষ খোঁজে টেঁপি। আপন মানুষ। চারদিকে স্বজাতির চোখ। আরেকটা থাবা পড়ে বুকের উপর। শরীরটা টানে। যন্ত্রণায় চিৎকার করে ওঠে টেঁপি — 'পাঁচ-মাথার খুলি দিব ই পূজো হবে গ, হবে…'

'লাগ্‌বে না —' বেহ্মদত্যির বুকের তলায় টেঁপির শরীর কাঁপে।

'লাইগ্‌বে…'

'না…আ—

একটা হ্যাঁচকা-টানে ছিটকে গিয়ে আঁধারে লাফ দেয় টেঁপি। শাড়ির আঁচলে টান। পিঠ বাঁকিয়ে ঝুঁকে পড়ে উদোম বুক চুলে ঢেকে শাড়ি ধরে টানে। বেহ্মদত্যি হাসে। ডানা-ঝাপটায় শকুন। স্বজন-স্বজাতিরা পিছিয়ে যায় ভয়ে। ড্যাবডেবে চোখে অবাক হয়ে দেখে — দেবতা মানুষের লড়াই। ই কোন্ আকালের শাপ গ। আকালের মেয়ে দাঁত মুখ খিঁচে প্রাণপণ শক্তিতে নিজের কাপড় টানে। পারে না। দম ফুরিয়ে যায়, হাতের পাতায় জ্বালা, শরীর নেতিয়ে পড়ে। গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে আসে বেহ্মদত্যি। হাতের নাগালে পৌছতেই শাড়ির সবটা হাতে এসে যায়। মানুষগুলি দম আটকে মরে, জটলা বেঁধে সিঁটিয়ে যায় ভয়ে — 'ই আঁধারে গেল কুথা মেয়ে? গোখরো, তেঁতুলগোখরো, চাঁদবোড়া, কেউটে …ঝোপে ঝোপে শেয়াল, গাছে গাছে শকুন…।'

উত্তরের মাঠের ধারে বুড়ো-অশ্বত্থের তলায় শুকনো কাঠ আর পাতা জ্বেলে সন্ধে থেকে পচাই গিলে বেহুঁস হয়ে পড়েছিল সব। লাজ নেই মেয়েটা একেবারে মাঝখানে এসে লাফিয়ে পড়ল। মাটির উপরে দগ্‌দগে পোড়া ঘা এর মতো জ্বলছিল নিভন্ত আগুন। নেশার ঘোরে ভিরমি খেয়ে আঁৎকে উঠল জোয়ান-মরদ মানুষগুলি। ঘুটঘুটে আঁধারে শ্মশানকালীর নেত্য! লালচে আগুনে ন্যাংটো মায়ের ভয়াল মূর্তি।

নেশায় টলমল করে শরীর। ভয়ে কোমর ছেঁচড়ে পিছোতেও হুড়মুড়

টলে পড়ে। 'গাঁ এর লোকেই আকালে বিশ্বেস কইরে ট্যাকা দিল তুদের হাতে, সি ট্যাকায় তুদের মাল এইনেচিস্ মুখপোড়া বেজন্মা, ই পিচ্ছাব গিলচিস্ নুইকে নুইকে···লাথি তুদের মুখে···'ওরা চমকায়। মানুষের ভাষায় কথা বলে সগ্গের মা! বিশ্বেস হয় না দেখে। চোক রোগড়ে ভালো করে তাকায় — আঁধার, আঁধারে মায়ের মূর্তি। গায়ে গা ঘেঁসে গলায় গলা জড়িয়ে, দলা পাকায় আঁধারে।

'চ' মদনা, যাই··'

'কুথা ?'

'স্থনাড্যাঙার ভাগাড়।'

'ডর লাগে গ। আঁধার···'

'ডর! নাউসেন মুরদ না তুরা? মাঠে নাঙল চইষে আবাদ করবি, খাল কেইটে জল আইন্‌বি, মাঠ কেইটে আস্তা গইড়বি, ঘরের মাগের পেটে ছেইলে দিবি, কিসের মুরদ তুরা ?'

'শ্যাল শকুনের ড়র গ, আঁধার রেতের ডর···'

'ই আকালে তুর বাপ্ মইরেচে মদনা, তুদের মা মইরেচে শিবে, ভোলা, আমার মা বাপের মাস সব শকুনে চিবিইয়েচে, শ্যালে হাড় চুইষচে। চ ভোলা যাই···'

'কুথা ?'

'ভাগাড়ে···'

'কেনে···'

'বাপের মাতার খুলি আইন্‌ব। পূজো হবে।'

'কার পূজো গ ?'

'আঁধার রেতের মার···'

অমাবস্তের নিঝুম রাতে সোনাডাঙার মাঠের মধ্যে লাখোলাখো শেয়াল ডেকে ওঠে, মাথার উপরে গাছের ডালেডালে শকুনেরা ডানা ঝাপটায়। গনগনে আঁচে দপ্ করে হঠাৎ যেন আগুন জলে ওঠে। আঁধার রাতের মশাল। লাল আগুনের ছোঁয়াচ লাগে। চোখের নেশায় ঘোর কাটে রক্তের নেশায় মাতন লাগে। আঁধার, আঁধার ঘিরে চারদিকে। ঘুটঘুটে অমাবস্তের আঁধার। শেয়ালেরা স্বাদ পায়। হাড় মাংসের স্বাদ। আধার থেকে উঠে আসে সন্তর্পণে, পা টিপে টিপে। কালোকালো হাত — ক্ষুধা,

ছুঁচোল ছুঁচোল নখ, লোভ, লালা ঝরা জিব, তেষ্টা। হাতগুলি থাবা মারে, নখগুলি আঁচড়ায়, জিব চাটে শরীর। আঁধার আঁধার, শরীর ভরে যন্তরনা। শেয়ালগুলির হিংস্রতায় সারা শরীর রক্তাক্ত হবার আগেই হঠাৎ সম্পূর্ণ অতর্কিতে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে, উত্তর থেকে উত্তরে, আরও উত্তরে, সোনাডাঙার মাঠে আঁধারের সমুদ্দুরে ঝাঁপ দিল আঁধার রাতের কন্যে। মাঠ জুড়ে লাখোলাখো শেয়ালের উল্লাস, আকাশ ভরে শকুন, শকুনেরা ডানা ঝাপটায় ডানা ঝাপটানির বাতাস কাঁপে থরথর করে, মাঠের পর মাঠ জুড়ে আঁধার ঘিরে উথালপাথাল তোলপাড়। অসার দাঁড়িয়ে থেকে আবার চচাই-এর হাঁড়ি টেনে নেয় বাউড়ি জোয়ানরা। দূরে নতুন করে হাতের কাঠির নাচন লাগে মোহন ঢুলির ঢাকে। আকাল তাড়ুয়ার বাজি।

আর, আঁধার রাতের কন্যে হাঁটে সোনাডাঙার মাঠে। বাপ্‌ঠাকুরদার মাথার খুলি খুঁজতে হবে তাকে।

আজো মাঝে মাঝে

মণীন্দ্র রায়

উনত্রিশ বছর আগে পাবনার গ্রামের
মনে পড়ে সন্ধ্যার আঁধার।
সেদিন রহিম শেখ
দিলপশার স্টেশনের নিচু কাঁচা প্ল্যাটফর্মে হেসে
বলছিল ঃ আমারও পোলা কাগজে-কলমে
কী যেন আকছার লেখে। খোকাবাবু কও,
খামারে কামের থেকে পত্তের পাতায়
বেশি রস জমে ?

ভাবলাম, জানাই তাকে —
এও এক বুনো বাঁজা খামারেরই কাজ।
লাঙলে ওল্টানো মাটি, রোদ্দুরের তাপ বুকে নিয়ে
বীজ রোপনের মতো গূঢ় প্রজনন,
আবার হাঁটুর কাছে শিশুর মতোই
মাঠেই ধানের ছোঁয়া কবিতা কেমন
দিনে দিনে বেড়ে উঠে
শোণিতের শ্বেতসারে নিহিত আগুন
মানুষেরই ভাঁড়ারের লড়াইয়ের পাশাপাশি ঐ
ঢেলে দেয় জীবনের খুন।

অথচ যেহেতু বুকে ছিল না সাহস
কিছুই হল না তাকে বলা।
বলির বাজনার মতো ঘৃণা আর ক্রোধের চিৎকারে
সময়ের হাড়িকাঠে রুধিরাক্ত মন
শোনে আজো রহিমের গলা।

খুবই কাছে আগুনের সিঁড়ি

চিত্ত ঘোষ

আমরা সাময়িকভাবে তৃষ্ণাকে মেটাতে চেয়ে দেখি
খুবই কাছে আগুনের সিঁড়ি।
অনেক শীতল শব্দ পাথরের মতো যেন
গড়িয়ে গড়িয়ে নামে।
আর আমরাই তো পুড়ি
স্বাভাবিক ভাবে সে-আগুনে।
ছিন্ন হয় যোগসূত্র, সব পরম্পরা
সময়ছিন্নতা জুড়তে কেউ কেউ মন দেয় তবু
এবং তা নিয়ে অধ্যায় রচনা করে।
আর সময়ের লম্বা বারান্দায় শরণার্থী জমে
কিছুই হয় নি বলে গান গাওয়া তবু
সবই ঠিক আছে এমন রঙের ছবি আঁকা
আর নিজেই নিজেকে ডেকে নিঃসঙ্গ বিদায়
অথচ একটি আধারে সবই থাকে। জলের অতল সীমা।
আমরা দেখি আগুনের সিঁড়ি।
আমরাই তো পুড়ি
স্বাভাবিক ভাবে সে-আগুনে

কর্তা, এখনো সময় হয়নি

সিদ্ধেশ্বর সেন

ভূতগ্রস্ত দেশ নাকি
যখন যা চাপে, তাই-ই চাপে
কিংবা, শাস্ত্রমতে, কাঁধে ভর করে
বলিহারি ওঝাও, বরাতে
ঝাড়ফুক, উচাটন-মারণ,
নামানোর চেয়ে যেন চাপানেই ঝুঁকে সব পাল্লা মাপে

মাঝে-মাঝে, এমনও সম্ভব, লেগে যায় ভিরকুটি, দাঁতে দাঁত,
চরম খিঁচুনি
অর্ধেক প্রাণ তাতে ওষ্ঠাগত, অর্ধেক ফাঁকি

কর্তা, জোড়হাত, সময় কি এখনো হয়নি

সেই একবার, ভুলে কবে ভেবেছেন তিনি,
ছেড়ে যান ভিটেমাটি,
কিন্তু নেহাৎ
দয়ার শরীর, তাই, পরের ভাবনায় বাড়ে ধন্দ

সেই থেকে ভবিষ্যৎ
দমবন্ধ, বর্তমান মাত্র ভারবাহী
স্কন্ধ, ভয়ে ভয়ে,
মেনে-মেনে পাওয়াটাও সয়নি

"কর্তা, এখনো কি ছাড়বার সময় হয়নি"

আছে কলকাতা

শান্তিকুমার ঘোষ

গ্রামগুলো একদৃষ্টে চেয়ে আছে শহরের পানে
কলিকাতা কমলালয়ের টানে।
ভাঙা নাট মন্দির আজকে—জোড় বাঙ্গালা কোথায়
দোরে হাতি নেই, বাইরে নেইকো ঘোড়া।
লতা পাতা কুঁড়ি তিন বোন স্বপ্ন দেখে যাবে কলকাতা ঃ
তারা মেখেছে পারুল তেল, জেনেছে নগর জুড়ে জলে রোশনাই।
কৈশোর যৌবন হয়···যৌবন প্রৌঢ়তা,
তিনটি হৃদয় জানে আছে কলকাতা।

মৃদু লাঠিচার্জ

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত

মৃদু লাঠিচার্জ তাকে নিতে হয় মাথা পেতে,
মাথার খুলিতে ধীর নিঃসরণ…
ঐ যে মার্বেল, ধীরে—ঢালুতে; খুলির মধ্যে চার্জ বুঝে
সর্দি ও কফের হিম নিয়ে যায় ; তুমি
ভারবোধ থেকে এক নির্ভার জীবন
চেয়েছো, খুলির নিচে বহুদূর বুকের ভিতরে
আইন অমান্য ক'রে মেনে নাও এই যে গ্রেপ্তার,
পাথর ভাঙার শব্দে সচকিত এই যে তারের বিকলতা,
তুমি কি জেনেছো ঢের বিন্দুসব ঝুলে থাকে,
থাকে না, গড়িয়ে যায়, ঢালু পেয়ে হাতের মার্বেল
চেপে বসে গর্তের ভিতর।

যেন ভেঙে পড়ে, যেন শিরদাঁড়া নাই।
স্নেহভরে তুলে-নেওয়া আঙুল এবং শিল্পজাত
গুণ্ঠন মানো কি ? ঐ কাঁচা পাট রয়েছে নীরবে,
ছাড়িয়ে দেবার আগে তার ছাল যেমন সবুজে
ঘিরে রাখে দিঙ্‌মণ্ডল, যেমন নিয়র
খুলে দেয়, কুয়াশার ক্রিয়া বুঝে, সতর্ক আদরে ;
যদি এ-ধড়ের পরে মুণ্ড আর মালাখানি
তেমনি সহজ ভাবে পেতো তার সে-অবগুণ্ঠন !

পায়না সে ; তাকে নিতে হয় মৃদু লাঠিচার্জ,
চারদিকে কংক্রিট থেকে কালো পীচে কঠিন সড়কে—
ছাতার অর্ধেক বাঁট এখন যেখানে
জেনে যায় নিঃসরণ…

যেখানে জুতোর গর্তে তুমি নাই
যেখানে প্রতিমা
পুরো কাঠামোটি আজ কাঁধে নিয়ে জানে বিসর্জন
শস্য নাই রেশমের স্পর্শ নাই তার
ভালোবাসা নাই···
ছাখো, আজ চার্জ বুঝে সেইখানে একজন শুয়েছে।

আজ জয়

শংকর চট্টোপাধ্যায়

আজ জয়—ঘরের উজ্জল ছাদে ছায়া পড়েছে বাঁকা—ক্রুশকাষ্ঠের
ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে মানুষ, লোকালয়ে—তাজা রক্তের ভেতর পা ডুবিয়ে হেঁটে যাচ্ছে
সভ্যতা—নীলিমার গায়ে লেগেছে পোড়া সহরের ছাই, ধূলি—
জন্মজন্মান্তরের সাঁকো পেড়িয়ে নেউল দম্পতি চলেছে বাস্তু ভাঁড়ারের
দিকে—আজ আমাদের স্নায়ুতে মজ্জায় রঙিন হয়ে উঠেছে গতজন্মের স্মৃতি

আজ ঋণশোধ—চতুর্দিকে কারা যেন বলছে 'জয়' 'জয়'—আজ উৎসবের
শেষ—ফুটপাত থেকে ফুটপাতে গড়িয়ে যাচ্ছে, বসন্ত—ঘরের
ভেতর কারা যেন বসাচ্ছে নরকের চুল্লি—উড়ন্ত আঁধার
লাফিয়ে নামছে চতুর্দিকে

আজ জয়—ক্রুশকাষ্ঠের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে মানুষ, লোকালয়
সমুদ্রের জল ছেড়ে উড়ে যাচ্ছে কথা ও লবণ—সজ্ঞানে মানুষ
গাইছে প্রকৃতির গান—আজ উৎসবের শেষ—জন্ম জন্মান্তরের
সাঁকো পেড়িয়ে নেউল দম্পতী চলেছে বাস্তু ভাঁড়ারের দিকে

অকালবৃষ্টি

বিতোষ আচার্য

বৃষ্টিভেজা ঝরাপাতা পথ চলতে পা জড়িয়ে ধরে
দক্ষিণে বাতাস বইছে, সূর্য নামছে
এমন ফাল্গুনে রৌদ্র রহস্যে গভীর কলকাতায়
রৌদ্রের ভিতরে রৌদ্র নৌকো চলছে কাঁপছে ফুলছে বিবর্ণ বাদাম
ভুরভুরে বৃষ্টির গন্ধে আনচান আনচান

সেসব সময় কই ঃ
নিস্তরঙ্গ দুপুরের ঝুলে সেদিনের উত্যক্ত বেকার
নিরিবিলি গলির উজানে ক্ষুরের ওপরে হাঁটত…
দরজা ছেড়ে সশব্দে চাবির গোছা কাঁধের ওপরে ঝামরে পিক ফেলত
ঢেউঢেউ শরীরে হাসত, চুণ চাইত…
তিনকেলে গ্যাসের খুটি সন্ধ্যে থেকে একপায় একঠায়
কেবলই মিটমিট হাসত লোক গুনত…

সে সব সময় কলকাতার আর নেই নেই ?
হয়তো আছে, তিরিশে চল্লিশে ছিল…
লোলজিহ্ব উদ্বায়ু মজুর বুকের হাপর টানত
কুকুরকুণ্ডলী ঘুমে ঝাঁকামুটে স্বপ্ন দেখত বুঝিবা ভোরের
হয়তো আছে, হয়তো পাল্টেছে চোখ চোখের ভিতরে অন্য চোখ
নাগালের বাইরে দৃশ্য দেখবার নিরিখ

এখন সত্তর ঃ
চৌরাস্তার চারমোড়ে ঠিকেদার, পুলিস, হকার চোঙাপ্যান্ট বিস্তর বিস্তর
সর্বদাই সরগরম
পরনারী, পর্ণোগ্রাফি খোলাবাজারের পণ্য মিশ্র অর্থ-রাজ-নীতি-সমাজতাত্ত্বিক
চেড়ী পানখায়, আঁচলও দোলায় ডাকে…

এ কী? অকালবৃষ্টিতে গা ধুয়ে সন্ধ্যা, তুমি?
কবেকার কাঁচপোকার টিপ জলজ্বল জ্বলজ্বল করছে
নাইলনের বুটিদার শাড়ির আড়াল রাখনি কিছুই
তুমি এতোকাল কি করে বেঁচেছ? হ্যাঁ, সন্ধ্যা, তুমিই!

ফাল্গুণের অকালবৃষ্টিতে, রৌদ্রে গোধূলির বিলম্বিত লয়ে নৌকো চলছে
কাঁপছে ফুলছে বিবর্ণ বাদাম, ঝরাপাতা পা জড়িয়ে ধরে
ময়দানের হুহু ঝাউ হাওয়া এসে সব কিছু তছনছ করে চুল ছেঁড়ে
হন্যে হাত দুর্ধর্ষ আবেগে খানখান খানখান করতে চায়॥

দীর্ঘ প্রতীক্ষায়

শান্তনু দাস

কখনো কখনো জীবনের ভিত নড়ে যায়ঃ
প্রতিমার দেহ থেকে খসে পড়ে পল্কা আস্তরণ,
রক্তশূন্য হতে থাকে ক্রমশঃই মূল্যবোধ জমানো যা কিছুঃ
যেমন ভাদ্রের নদী গ্রীষ্মের দুপুরে
কুকুর লাফিয়ে চলে যায়,
যেমন আঙুর-ঠোঁট ক্রমশঃ শুকিয়ে কিসমিস।

তখনই রক্তাক্ত প্রেম জীবনের বালিয়ারী থেকে
হামাগুড়ি ঢেউ হয়ে দূরে সরে যায়…
তখনই বিশাল তটে একা থাকি গাঢ় অন্ধকারে
দীর্ঘ প্রতীক্ষায়ঃ
কখন আকাশ থেকে বটের ফলের মতো ঝুলে পড়বে
রক্তিম সকাল॥

পথের দু পাশে

শিবেন চট্টোপাধ্যায়

পথের দু পাশে আজ রক্ত শিমূলের বুকে দাহঃ
মাতৃত্বের যন্ত্রণায় গৃহস্থ সকাল পড়ে আছে।
তুমি পথে নামো
এখনো মুখোস পরে কিছু লোক চলাফেরা করে
কিছু লোক ক্রুর হাসি চেপে রাখে বুকের তলায়
এখনো অনেক লোক পরম নিশ্চিতে বসে প্রহর কাটায়।

সব পথ রৌদ্র দগ্ধ
ঘরের ভিতরে নেই কোন শান্ত শুভ্র উপত্যকা
দিন যাপনের গ্লানি জীবনের প্রতি কোষে কোষে
এখন ভিতরে বাইরে প্রস্তুতির কঠিন সময়।

সময় এগিয়ে যায় নদীপথ বাঁকেনা সহজে
জোয়ার ভাটার ডাকে দ্রুত হয় বুকের স্পন্দন
শেষ প্রহরের ঘণ্টা বেজে উঠলে গীর্জার চূড়োয়
সব পথ আলোয় উজ্জ্বল।

সঙ্গ-নিঃসঙ্গতার দিনলিপি

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

হেরে যাচ্ছি বারবার নিঃস্ব হবার সাধনায়
কে না জানে বীজ ছড়িয়ে বাঁচে বৃক্ষ প্রাণ ছড়িয়ে জীবন
রক্তমন্থনে ফোটে পূর্ণতাপ্রয়াসী স্বর্ণচাঁপা
রিক্ত হবার সাধনায় নিরন্তর জ্বলে উঠছে প্রকৃতি
আমি তেমন কোরে নিঃস্ব হতে পারি না
তেমন কোরে পূর্ণ হতে পারি না।

যেমন তুমি প্রভু !　সাম্রাজ্য আর সুখ অনায়াসে ছুঁড়ে ফেলে
নগর ছেড়ে চলে গেলে অনন্তে
আমি তোমার রত্নখচিত পোষাক কুড়িয়ে নিলাম ধুলো থেকে
এ কেমন কাঙাল আমি !
এ কেমন দীনতা আমার !
যেমন তুমি প্রভু ! শিলাখণ্ডে বীজ ছড়াতে গিয়ে নিহত হলে পাথরে
বরণ কোরে নিলে আমারি দেওয়া মৃত্যুদণ্ড
এ কেমন পাথর আমি !
এ কেমন নীচতা আমার ?

এই সব দান দিগন্তকে ছড়িয়ে দেয় দিগন্তে—কপাল ফুঁড়ে শিকড় ছড়ায় বোধিবৃক্ষ
ভিখারী হবো তোমার মতন　　পারছি না
নিঃস্ব হবার সাধনায় বারবার হেরে যাচ্ছি

মিছিল থেকে ফেরারপর

তুলসী মুখোপাধ্যায়

মিছিল থেকে ফেরার পর
আয়নার সামনে আমি দাঁড়াতে পারি না
দাঁড়ালেই
একশো শেয়াল ফিক্‌ফিক্ করে হেসে ওঠে
দেয়ালের মহাপুরুষ ফেটে যায় চৌচির হয়ে
মেঝে ফুঁড়ে উঠে আসে সাক্ষাৎ পাতাল।

মিছিল থেকে ফেরার পর
আয়নার সামনে দাঁড়ালেই
আমার মনে হয়

আমি যেন এই মাত্তর
মায়ের সতীত্ব নিয়ে ঠাট্টা করে এলুম
বাবার ভদ্রাসন বিক্রি করে এলুম ফুটোপয়সায়
আমার কেবলই মনে হয়
আমি এই মাত্তর
বন্ধুর চোখে উড়িয়ে এলুম যাদুই রুমাল
সহোদর ভাইকে করে এলুম গুম খুন
আর সারারাত
বাতাসে ফাঁসির দড়ি

মিছিল ফেরার পর
আয়নার সামনে আমি দাঁড়াতে পরিনা ॥

একই ঝড় অন্তরে বাহিরে

অরুণাভ দাশগুপ্ত

মগ্ন মুহূর্তের দেখা, তবু ঝড় অন্তরে বাহিরে

যেরকম ছুঁয়ে থাকে
শান্ত জিরাফের পায়ে উৎক্ষিপ্ত সবুজ,
জানালায় ঘনবাষ্প, পায়ে পায়ে
বিষন্ন স্মৃতির চেয়ে দীর্ঘপথ···
সেরকমই ছিলে
শীতে
পশমের মতো উষ্ণ অনুভূতিমালা।

এক জন্ম পর দেখা, একই ঝড় অন্তরে বাহিরে !

দুর্ঘটনা

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

তখনও অন্ধকার মরেনি। খোলা জানালায় চোখ রাখল কণা। ওর ঘুম সেই কখন ভেঙে গেছে। কেমন একটা আলস্য শরীরে—উঠতে ইচ্ছা করছে না। সমীর, পাশে ঘুমোচ্ছে। ওপাশের খাটে ওর দুই মেয়ে এক ছেলে ঘুমোচ্ছে। শীতের রাত। অথচ কলকাতার এই ঘরগুলো কি গরম। সে যেখানে থাকে, জায়গাটা গ্রাম জায়গা। ওর স্কুলের চারপাশে পাঁচিল। কোয়ার্টার কম্পাউণ্ড পার হলে সামনেই একটা পুকুর। সে পুকুরের পাড়ে দাঁড়ালে ছায়াটা তার প্রায়ই কাঁপে। শীত এত বেশি সেখানে যে সে বিকাল হলেই স্কার্ফ গায়ে দেয়। মেয়েদের হোস্টেল থেকে চেঁচামেচি শুনতে পেলেও সে নড়তে চায় না। কেমন শীতকাতুরে অথচ এখানে অর্থাৎ ট্রেন থেকে নামলেই অথবা ট্রেনটা দক্ষিণেশ্বরের-ব্রীজে ঢুকে গেলেই ওর মনে হয় গ্রামের শীত এখান থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছে, সহরের শীত আরম্ভ হয়েছে। সে স্কুলের ছুটি পেলেই কখনও রোববার এবং মাঝে সোমবার ছুটি নিয়ে সে সমীরের কাছে চলে আসে। এবং সকালে, এই সাড়ে আটটায় একটা ট্রেনে আছে, সেই ট্রেনে সমীর ওকে তুলে না দিলে এগারটার ভিতর স্কুলে পৌঁছানো যায় না। সে রাত থাকতেই বিছানা থেকে উঠে তাড়াতাড়ি গোছগাছ করে নেয়। একটা মোরগ সহরের কোথাও তখন ডাকে।

কণার মনে হলো যে সকাল সকাল জেগে গেছে। টর্চ জেলে ঘড়িটা দেখল। অন্যদিন ঘড়িটাতে এলার্ম দিয়ে রাখে। কিন্তু ইদানিং কি যে হয়েছে ঘড়িটায়, কিছুতেই সময় মতো এলার্ম দেয় না। যখন তখন বেজে ওঠে। ফলে কণা সকালে যাবে বলে রাতে একটা উদ্বিগ্ন ভাব থাকে। বারবার রাতে তার ঘুম ভেঙে যায়। টর্চটা সে বালিশের নিচে রাখে। টর্চ টেনে তার ঘড়ি দেখার অভ্যাস।

এখন চারটা বেজেছে। সুতরাং সে উঠে পড়ল। সমীরকে কিছু পরে ডাকবে। সমীর ওকে স্টেশনে তুলে দিয়ে আসবে। শেয়ালদাতে হাঁটতে,

হাঁটতে ওরা দুজন চলে যাবে। তখন কতরকমের কথা—ছেলে এবং মেয়েদের প্রসঙ্গেই বেশি কথা। ট্রেনিং নেবার পর সে ভেবেছিল এই কলকাতার উপরই ওর একটা চাকুরি হয়ে যাবে। কিন্তু সে কিছুতেই এবং সমীর এত হাঁটাহাঁটি করেও ওর জন্য স্কুলের কোনো চাকরি ঠিক করতে পারেনি। এতদূরে কণার থাকতে ভালো লাগছে না, সে এলেই আর যেতে চায় না। মেয়েরা এভাবে মা কাছে না থাকলে মানুষ হবে না এমন একটা অনুযোগ প্রায়ই সমীরকে শুনতে হয়। সমীর তখন কিছু বলে না—চুপচাপ থাকে। সংসারের চাপ, আর্থিক অনিশ্চয়তা তাকে কেমন দুঃখী করে রাখে।

সমীরের ঘুম ভারি। তবু কণা পা টিপেটিপে সব কাজগুলো করে নেয়। মাসী উঠে গেছে। সে চা এবং খাবার করে দেবে। কিছুটা খাবে। বাকিটা নিয়ে যাবে কণা। ওর চুলে দুবেণী বাঁধার অভ্যাস। মাঝেমাঝে এ নিয়ে সমীর ঠাট্টা করলে কণা আর কথা বলে না। সে চুল বাঁধার সময়ই ডাকে, এই ওঠ। সময় হয়ে গেছে।

এখনও রাত আছে। শীতের রাত যেন শেষ হতে চায় না। সে উঠেই হাত ঘড়িটা দেখল। তারপর হাই তুলে যেমন বলে থাকে, তোমার মানিব্যাগ নিয়েছ? টাকা পয়সা সাবধানে রেখ। গিয়েই চিঠি দেবে। সকালে দুধের সঙ্গে একটা কাচা মুরগীর ডিম খাবে। আর শরীরের প্রতি নজর রাখবে। ওদের জন্য চিন্তা করো না। পরে যেতে যেতে বলবে, হাঁ তোমাকে বলতে ভুলে গেছি। জানতো আমার এক বন্ধু জামাইবাবু এখানে ডি-আই হয়ে এসেছেন। দেখি তাকে ধরে কিছু হয় কি-না। কণা জবাব না দিলে বলবে, আমার মনে হয় হয়ে যাবে।

কণা যতবার এসেছে এমন একটা প্রত্যাশার কথা সে তাকে শুনিয়েছে। আর গিয়েই চিঠিতে সেই এক কথা, তুমি দেখা করেছিলে, আমার সার্টিফিকেট-গুলো কালো ট্রাঙ্কটার নিচে ডান দিকে. যেখানে গয়নাগুলো আছে তার নিচে। তুমি কপি করিয়ে রেখ। ভেবেছি এবার গিয়ে আমি নিজেই একবার যাব। এইবার চিঠি এলে সমীর কেমন তখন অন্যমনস্ক হয়ে যায়। সত্যি তারও ভালো লাগে না। কাজ শেষে বাড়ি ফিরলে সে মেয়ে দুটোর মুখের দিকে তাকাতে পারে না। ছেলেটা চুপচাপ চেয়ারে বসে পড়তে পড়তে ঝিমোয়। সে এসেই ওদের···ওদের আর বয়েস কত — বারো, দশ. আট। এই তিন বালক-বালিকা, আর মাসী এবং ওদের ছোটকা, এই মিলে সংসার।

ফ্ল্যাট বাড়ি। সে মেয়েদের কড়া নিয়মে রেখেছে। মা কাছে থাকে না বলেই হয়ত, বড় মেয়েটা সমীরের কিছুকিছু দুঃখ বুঝতে শিখে গেছে। সে অফিস থেকে ফিরে এলেই মেয়েটা বলবে, দিদি, বাবাকে চা দাও। তুমি বাবা তাড়াতাড়ি হাত পা ধুয়ে নাও। চা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

বড় মেয়েটার স্বভাব ওর মায়ের মতো। ছেলেটার স্বভাব সমীরের মতো, জেদি, একগুঁয়ে। প্রথম প্রথম বড় যন্ত্রণা দিত ছেলেটা কিছুতেই মাকে যেতে দেবে না। তখন সমীরের কোনো কোনো দিন অফিস কামাই করতে হতো। অফিস কামাই করলে ওর যেন মাথা ঠিক থাকে না, সে ওপরওয়ালার কথা শুনবে এই ভয়ে কেমন রেগে থাকে সবসময়। মাঝেমাঝে সে ছেলেকে কণার সঙ্গে দিয়ে দিয়েছে, কিন্তু গ্রাম জায়গা, পড়াশোনার মান তেমন উঁচু নয়, এই বয়সেই যদি একটু কাঁচা থেকে যায়, এবং সবচেয়ে বড় কথা পরিবেশ, এইসব ভয়ে সে পরে আবার ছেলেকে এখানেই নিয়ে এসেছে। কণারও সায় থাকে না। গ্রাম্য জংলি হয়ে যাবে এমন একটা ভয় কণার সব সময় আছে। সে তাই সকাল হলে চুপি চুপি প্রায় চুরি করে সমীরের সঙ্গে দরজা পার হয়ে রাস্তায় নেমে থাকে। যা কিছু কথা তখন এদের এই রাস্তায়। মাথার ওপর সহর রাতের আকাশ। ওরা পরস্পর এত বেশি সংলগ্ন হয়ে হাঁটে যে মনে হয় এই নির্জন রাস্তায় ওরা নতুন প্রেম করছে। বস্তুত কণাকে সমীরের কিছুতেই কাছ ছাড়া করতে ইচ্ছা হয় না তখন।

কণার ছোট্ট এ্যাটাচিটা সমীর হাতে নিল। সে একটা মাফলার গলায় প্যাঁচিয়ে নেবার সময় বলল, কার্ডিগানটা হাতে নিলে কেন। ওটা পরে নাও।

— পরব। বলে সে বড় মেয়েকে ফিসফিস করে ডাকল। — আমি যাচ্ছি। ভাইকে মের না। বোনকে দেখে রেখ। ভালোভাবে থাকলে তোমাদের প্রাইজ দেব। তারপর সে দরজা খুলতেই ঠাণ্ডা হাওয়া হুহু করে ভিতরে ঢুকে গেল। ওর শীতে শরীর কাঁপছে। বাইরে এত যে শীত ঘরের ভিতর সে অনুভব করতে পারেনি। তাহলে কলকাতায় মাঝেমাঝে খুব শীত নেমে আসে। ঠিক গ্রাম দেশের শীতের মতো। সে কার্ডিগানটা পরে ফেলল। সমীর ওর স্কার্ফটা গলায় প্যাঁচিয়ে দিয়ে বলল, ঠাণ্ডা লাগাবে না।

ওরা এবার বাইরে নেমে এল। পথের আলোগুলি সব জ্বালা। একটা দেবদারু গাছের নিচে ওরা দেখল কেউ বসে রয়েছে। এই ভিখারিটিখারি হবে। ঠাণ্ডায় কুঁকড়ে আছে। দোকানগুলো সব বন্ধ। দু-একজন করে

এই শেষ রাতে উঠে পড়ছে। রাস্তায় লোক চলাচল বড় কম। ফুটপাথে হাঁটা যাচ্ছে না। ছেঁড়া তোষক, বালিশ অথবা শুধু কাঁথার ভিতর কাতারে কাতারে মানুষ এই শীত উপেক্ষা করে শুয়ে আছে। ঘুমোচ্ছে-কি-জেগে আছে বোঝা যায় না। পূবের আকাশ ফর্সা হয়ে উঠছে। ট্রাম ঘুমটি থেকে প্রথম ট্রাম ছাড়ার শব্দ পেল। একটা কুকুর পার হয়ে গেল রাস্তাটা। ওরা কাঠের দোকানগুলি পার হয়ে এল, এখানে এলেই সেই ডাস্টবিনটা, মলমূত্রের গন্ধ। ওপাশে না যাবার জন্য ওরা ডানদিকের ফুটপাথ ধরে হাঁটছে। তবু গন্ধটা এসে নাকে লাগছিল। সমীর দেখল সেই পরিচিত ভিখারি একটা কাঠের বাক্সে শুয়ে আছে। সে কেমন দেখা হলেই রোজ একটা দশ পয়সার মুদ্রা ওকে ছুঁড়ে দেয়। যদি দশ পয়সার মুদ্রা না দিতে পারে তবে দু-পয়সা এবং এক-পয়সা মিলে দশ পয়সা করে নেবে। দশ পয়সার কম সে একে দেয় না। এবং এই পয়সা দিতে দিতেই ওর একটা সংস্কার জন্মে গেছে। সে দিনে যদি দু-বার যায় এই পথে অন্তত একবার সে দশটা পয়সা দেবে। সে দুবার দেবে না। অর্থাৎ হিসাব মতো সে দিনে একবার একটা দশ পয়সার মুদ্রা দেবার চেষ্টা করবে। একবার কি কারণে ওর পকেটে চেঞ্জ ছিল না, সব সময় যে চেঞ্জ থাকতে হবে তার কোনো মানে নেই, পকেটে দশ টাকার নোট — সে এই দশ পয়সার জন্য একটা দশটাকার নোট ভাঙিয়েছিল। সে সিগারেট খায় না, তবু দশটা পয়সা না দিলেই ওর মনে হয় ছোট ছেলেটা হয়ত বাড়ির বাইরে না বলে না কয়ে চলে গেছে এবং হয়ত গিয়ে শুনবে মোটর চাপা পড়েছে। সুতরাং সে এখানে এলেই দশটা পয়সা দেয়। এই পয়সা দিতে দিতে ওর কেমন একটা কর্তব্য বোধ জেগে গেছে। সে দেখল শীতে সেই বালক ভিখারি বড় কষ্ট পাচ্ছে। এমনভাবে তাকালে ওর মনে হবে সে একদিন ওর যাবতীয় দ্রব্যাদি ওকে দিয়ে দেবে। সুতরাং সে লাফিয়ে পার হয়ে এল জায়গাটা। এবং মাংসের দোকানটা পার হতেই কণা বলল, তোমার টেবিলের ড্রয়ারে তিনটা দরখাস্তে সই করে রেখে এসেছি। বিজ্ঞাপন দেখে স্কুলের নাম সেক্রেটারির নাম বসিয়ে দিও।

রোববারের অমৃতবাজার সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কলমটা দেখে। তারপর যথা নিয়মে দুটো-একটা বিজ্ঞাপন কণার কোয়ালিফিকেসনের সঙ্গে মিলে গেলেই সে দরখাস্ত পাঠিয়ে দেয়। এটাও একটা সংস্কারে দাঁড়িয়ে গেছে যেন, রোববারের কাগজটা না দেখলে ওর মনটা খুঁত খুঁত করে এবং মনে

হয় একটা সুযোগ তার ফসকে গেল, দরখাস্ত করলেই কণার চাকরিটা হয়ে যেত। সে কোনো কারণে পত্রিকা না পেলে এমনভাবে।

মাংসের দোকানের নিচে কেউ বোধ হয় শুয়ে আছে। কে আর হবে — এই রাস্তার মানুষ জন। মাঝেমাঝে ওর একটা ভয় হয়, যেন সে তার সন্তান-সন্ততিদের নিয়ে ফুটপাথে এসে দাঁড়িয়েছে। এবং একটা গাছের নিচে সকলে শুয়ে আছে। এমন একটা স্বপ্নই সে মাঝেমাঝে দেখতে পায়। বিশেষ করে যেদিন সে জানতে পারে অফিসে ফের গণ্ডগোল আরম্ভ হয়েছে, কোম্পানির অবস্থা ভাল যাচ্ছে না, কিছু লোকের চাকুরি যাবে, এমন শুনলেই সে বিমর্ষ হয়ে যায়। কথা বলে না, রাতে স্বপ্ন দেখে আর বড়বড় চিঠি লেখে বৌকে, কণা, তুমি খুব যত্ন নিয়ে কাজ করবে। শরীরের প্রতি যত্ন নেবে। রাতে একবার লেশ্‌নগুলো সব দেখে নেবে। অর্থাৎ সমীর চায় তখন তার স্ত্রী একেবারে আদর্শ শিক্ষয়িত্রী হয়ে যাক। ওর চাকুরিটা থাকলে ফুটপাথে গিয়ে আর দাঁড়াতে হবে না।

ওরা এবার ব্যারন হোটেলের বরাবর এসেই রাস্তা পার হলো। এখন উভয়ের কেউ কথা বলছে না। গতকাল এখানে সে একটা এ্যাকসিডেন্ট দেখেছে। একটা রাস্তার ছেলে, তখন এই কটা বাজে, প্রায় দশটা বাজে, কাল রোববার ছিল, ট্রামবাসের তেমন ভিড় ছিল না, তবু একটা ডাবলডেকার ওকে চাপা দিয়ে চলে গেল। সে তখন ফিরছিল। ট্রাম বাস থেমে গেলে সে নেমে পড়েছিল। এবং হাঁটতে শুরু করেছিল। সে বারবার ভেবেছে যেখানে লোকজন ঘিরে আছে লাসটাকে সে সেদিকে তাকাবে না। অথচ কি আশ্চর্য সে কিছুতেই না তাকিয়ে পারেনি। সে মানুষ জনের ফাঁকেই দেখেছিল, মাথাটা এবং ধড়টা আলাদা হয়ে গেছে। পেট ফেটে সব হলুদ রঙের নাড়ি নাভির চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এবং মনে হলো ঘিলু চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সে দেখল তার পায়ের কাছে মাংসের টুকরো। মনে হলো ওটা ঐ বালকের কলিজার অংশ। সে দ্রুত পা চালিয়ে হেঁটেছিল। এবং মনেমনে সে ভাবল আর সে মেজছেলেকে খাবার পর পথের মোড় থেকে পান আনতে একা পাঠাবে না। সে সারা রাস্তায় ওর সন্তানের মুখ বাসের চাকার নিচে দেখতে পেয়েছে।

গতকাল এই ঘটনা দেখার পর বাসায় ফিরে ভেবেছিল কণাকে বলবে। কিন্তু কণা এ-নিয়ে ভাববে বেশি। সে এখানে থাকে না বলে ট্রাম বাসের

একটা ভয় সবসময়ই ওর ভিতর কাজ করে। মেয়েরা স্কুলে যায়। আগে মাসি দিয়ে আসত। কিন্তু এখন আর দিয়ে আসে না। কারণ ছেলের জন্য তাকে অন্য স্কুলে যেতে হয়। মেয়েরা তাই একাএকা রাস্তা পার হয়ে স্কুলে যায়। এই দুর্ঘটনার খবর বললে কণা আর একদিন স্কুল কামাই করবে। যাবার সময় বারবার পথ কেমন করে পার হতে হয় তার নির্দেশ দেবে। এবং সে নিজে পুলিশ হয়ে যাবে, হাত তুলে ট্রাফিক কন্ট্রোল করার মতো দাঁড়িয়ে থাকবে। আর মেয়েদের বলবে, তোমরা রাস্তা পার হবার সময় প্রথম ডানদিকে আসবে, কোনো গাড়ি দেখলে না তখন একটু এগিয়ে যাবে, খুব বেশিদূর যাবে না, মাঝ রাস্তা পর্যন্ত যাবে। তার আগেই বাঁ দিকে তাকাবে, দেখবে যদি গাড়ি আসে তবে রাস্তা পার হবে না। রাস্তা পার হতে ছুটবে না, ছুটবে না কিন্তু। ধীরেধীরে হেঁটেহেঁটে পার হবে। মনে থাকবে। ওরা যত বলবে মনে থাকবে তত সে ওদের স্মরণ করিয়ে দেবে। যেমন ওদের আরও ছোট বয়সে কণা, ওদের ঠিকানা মুখস্ত করাত। বাবার নাম, রাস্তার নাম এবং বাড়ির নম্বর। ওরা হারিয়ে গেলে পুলিশকে কি বলবে, অথবা হারিয়ে গেলে, প্রথমেই ওরা কোনো পুলিশের সাহায্য নেবে, তারপর পুলিশের পোষাক কেমন থাকে. রাস্তায় সে পুলিশ দেখলেই বলত, বুঝলে এরা হচ্ছে পুলিশ। ওদের পোষাক দেখে রাখ। এমন পোষাকের মানুষ দেখলেই বুঝবে ওরা পুলিশ। হারিয়ে গেলে ওদের সাহায্য নেবে। বাড়ির নম্বর, রাস্তার নাম এবং বাবার নাম বললে ওরা তোমাদের বাড়ি দিয়ে যাবে।

সমীর সেজন্য গতকাল যে এখানে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে বলল না, এবং যেখানে ধড় এবং মাথাটা আলাদা হয়ে পড়েছিল, ঠিক তার উপর দিয়ে কণা হেঁটে যাচ্ছে। কণা টেরই পাচ্ছে না এখানে একজন নাবালক কাল সারা রাস্তায় ঘিলু ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়েছিল, ঠিক হরিলুটের বাতাসার মতো, নাকি নীল আকাশের নক্ষত্রের মতো। কালো পিচের পথ, কি পরিচ্ছন্ন তখন মনে হচ্ছিল। শীতের সূর্য সোনালি কিরণ দিচ্ছে আর ছেলেটা দু-হাত ছড়িয়ে মাথা বগলে নিয়ে মাথা থেকে লুটের বাতাসার মতো সারা রাস্তায় ঘিলু ছড়িয়ে রেখেছিল। সমীর এতসব জেনেও কিছু বলল না। সে কণার হাত ধরে পথ পার হয়ে এল। এখন কণা এই হাত ধরা বেশি পছন্দ করে না। কথায় কথায় বলবে, তোমার কি সমীর

আর হয়স হবে না। একটু রাস্তা ফাঁকা পেয়েছ আর হাত ধরে আদর খাচ্ছ।

সে এগিয়ে গেল। পাশে ঠিক গেটের মুখেই ওরা কিছু লোকজন দেখতে পেল। এখন বোধহয় ঝাড়ুদার জল মেরে সব ধুয়ে দেবে, তাই ওরা উঠে বসেছে। যেখানটায় সারাদিন একজন পাউরুটিয়ালা রুটি নিয়ে বসে থাকে তার ডানদিকে সে হঠাৎ কিছু মানুষের চীৎকার শুনতে পেল। সে আর এগুল না। ট্রেনের দেরী আছে। ওরা আজ কিছু আগে এসে গেছে। সে দেখল, অতীব দুঃখের ছবি। সে এখানে এসেই যেন শীতের তীব্রতা অনুভব করল।, তিন-চারজন তালি মারা শিশু শুয়ে আছে। শিশুই বলা চলে, তালি মারা কারণ ওরা একটা চাদর গায়ে ঠাণ্ডা শানের ওপর সারারাত একটা কুকুরকে জড়াজড়ি করে শুয়ে আছে। সারারাত যেমন একটা ট্রেন সিগন্যাল না পেয়ে ক্ষণেক্ষণে চেঁচায়, তেমনি ওরা শীত সহ্য করতে না পেরে সারারাত এভাবে চেঁচিয়েছে। ওদের এমন চীৎকারে সমীর বিরক্ত হয়েছিল, কারণ সহসা সহসা হল্লার মতো শব্দ করে সিটি বাজানো। সে ভেবেছিল এক ধমক দেবে। কিন্তু কাছে গিয়ে বুঝল ওরা একটা ছেঁড়া কম্বল টানাটানি করে গায়ে দিচ্ছে, চাদর না কম্বল, ছেঁড়া না তালিমারা এই অস্পষ্ট খয়েরি রঙের আলোতে বোঝা যাচ্ছে না। ওদের ভিতর একটা নেড়ি কুকুর। সেও শীতে কুই কুই করছে। কুকুরটাকে জড়িয়ে থাকায় যে-উষ্ণতা পাচ্ছিল ওরা, সমীর তা টের পাচ্ছে। ওর মনে হলো ওরা শীতের জন্য চেঁচায়, সিটি মারে, এবং এভাবে শরীর ওরা গরম রাখে। এত বড় সহরে, যখন সে তার ফ্ল্যাটবাড়িতে স্ত্রীর ঠাণ্ডা লাগবে বলে দরজা জানালা বন্ধ করে রাখে তখন সামান্য এক কুকুরী ওদের তা দিচ্ছে। এই নগরীতে সে কুকুরীকে কোনো এক মহতী সভায় নিয়ে যাবে ভাবল। তখনই কণা ডাকছে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি দেখছ।

কণার কাজ করার পর এটা হয়েছে। কণা মাঝেমাঝে ডাকলেই সে কেন জানি ভিতরেভিতরে চমকে যায়। আগে সে কণাকে ভয় পেতনা। এখন পায়। কারণ সে জানে কণার চাকরিতে ওর চেয়ে বেশি নিরাপত্তা আছে। কণার সুখসুবিধা আজকাল বেশি মাত্রায় লক্ষ্য রাখে। এমন কি কণা একাএকা থাকে বলে, একা শোওয়ার অভ্যাস। সে কাউকে নিয়ে শুতে পারে না। সে এলেই আজকাল আল্গা হয়ে শোয়। হাত

পড়লে শরীরে কণা বলবে একটু সরে শোওনা। আমার আজকাল কেউ পাশে শুলে ঘুম আসে না।

বস্তুত সমীর ভেবেছে আর একটা সে খাট কিনবে। এসেই প্রথম রাতে কেমন কণা ক্লান্ত থাকে দ্বিতীয় রাতে ওরা কাছাকাছি থাকে খুব। এবং প্রয়োজন হলে কণা উঠে আসে ওর বিছানায়। সমীর সন্তানদের পাশে শুয়ে ঘুম যায়। কিছুক্ষণ পরস্পর কাছাকাছি থেকেই তারপর আবার কণা কেমন দূরের মানুষ হয়ে যায়। সে তখন কণাকে একটা ছোট জলাশয় ভাবে। এত ছোট জলাশয়ে ডুব দিতে সমীরের কেন জানি ভয় হয়।

কণা ডাকতেই সমীর ফের হাঁটতে থাকল। সে কণাকে গতকালের দুর্ঘটনার কথা বলল না।

এমনভাবেই সাধারণত দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার আগে কেউ জানে না তার জন্য মারাত্মক কিছু একটা অপেক্ষা করছে। সে যেতেযেতে এমন ভাবল।

ইলোরা স্টলের পাশে গিয়ে ওরা দাঁড়াল। স্টলের চারপাশ বন্ধ। ডানদিকের টিকেট কাউন্টারে কোথাকার টিকিট বিক্রি করা হচ্ছে। কণা টিকিট কেটে আনল। এবং কণার সঙ্গে এক ভদ্রলোক। সমীরের সমবয়সী। বলল, একে তুমি চিনবে না। ভদ্রলোক আমাদের ওখানে ছেলেদের স্কুলে কাজ করেন।

সমীর বলল, তাই বুঝি।

লোকটি কেমন কৈফিয়তের সুরে বলল, আমি রাণাঘাটে দিদির বাড়ি গেছিলাম। টিকিট কাউন্টারে দেখি আমাদের মিসেস চক্রবর্তী।

কণা বলল, আমি বললাম, চলুন আলাপ করবেন আমার কর্তার সঙ্গে। বলে কণা সহজভাবে মানুষটির দিকে তাকিয়ে হাসল। আপনাদের হেড মাস্টার নাকি চলে যাচ্ছেন।

—কলকাতার কলেজে উনি একটা চাকুরি পেয়েছেন।

—মানুষটি বড় ভালো ছিলেন!

সমীর দেখল কণা এখন ওর সঙ্গে কথাবার্তা বলার ফুরসত পাচ্ছে না। ওর ভিতরেভিতরে কেমন একটা কষ্টবোধ হচ্ছিল। দুর্ঘটনার আগে কেউ কিছু টের পায় না। সে বলল, আচ্ছা আপনারা যখন দুজন হয়ে গেলেন, আমি তবে চলি।

কণা বলল, তুমি তবে চলে যাও। টোটন উঠলে জামা প্যান্ট পরিয়ে

দিও। ও কান্নাকাটি করলে বলো, তুমি আমার কাছে আগামী রোববারে ওকে নিয়ে যাবে।

সমীর হাঁটতে থাকলে বলল, ঝুনুকে বলো টোটনের বইয়ের ভিতর ওদের মাইনের টাকা রেখে এসেছি। আজই যেন দিয়ে দেয়। তা না হলে ফাইন দিতে হবে।

সমীর আবার হাঁটতে আরম্ভ করলে বলল কণা, তুমি কিন্তু টিফিন খাবে। খেতে ভুলে যাবে না। আমি না থাকলে তোমরা যে-যার খুশি মতো চলো।

সমীর আবার হাঁটতে আরম্ভ করল। সে হাতের এ-পিঠে, অথবা ও-পিঠে এখনও রাতের অন্ধকার লেগে রয়েছে কিনা এমনভাবে হাত দেখছে। ওর পিছনের দিকে তাকাতে ইচ্ছে হচ্ছে না। ওদের হেডমাস্টার মশাই বড় ভালোমানুষ ছিলেন। সংসারে আমরা সবাই ভালোমানুষ। শুধু সময় এবং সুযোগের অভাব। মনটা সহসা কেন জানি তিক্ততায় ভরে গেল সমীরের।

যেখানে দুর্ঘটনা গতকাল ঘটেছিল সেদিকটায় কেন জানি সে দ্রুত হেঁটে গেল। পুবদিকটা ফর্সা হয়ে গেছে। কণা সেই অপরিচিত মানুষের সঙ্গে এখন রেলের কামরায়। রেলের কামরায় কি এখনও অন্ধকার আছে! যাত্রী স্বভাবতই কম। কণা আজকাল একা শুতে ভালোবাসে। রেলের কামরার ভিতরে কণা। সে দুর্ঘটনার ভিতর। সে একা দাঁড়িয়ে আছে। একটা ট্রাম দ্রুত ছুটে আসছে। সে একা দাঁড়িয়ে আছে। রেলের কামরাতে কণা। সে দুর্ঘটনার ভিতর। ট্রেনের কামরাতে কতক্ষণে যে আলো ঢুকবে! কণাকে সে আর নিজের ভাবতে পারছে না। কণা যেন ইচ্ছা করলে সেই মানুষটার বৌ হয়ে যেতে পারে। সে ইচ্ছা করলে এখনই একটা দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে। কণার কি এখন কিছু ইচ্ছা করছে না মানুষটাকে কাছে পেয়ে! একটা দুর্ঘটনা ঘটাবার ইচ্ছা হচ্ছে না।

সে অস্থিরভাবে পায়চারী করতে করতে সহসা ফের স্টেশনের দিকে ছুটে গেল। এবং গেট পার হয়ে প্ল্যাটফরমে ঢুকতেই দেখল, ট্রেনটা চলতে আরম্ভ করছে? সে কিছুতেই আর ট্রেনের নাগাল পেল না। পাষাণের মতো সে সকালের প্ল্যাটফরমে ট্রেনটাকে চলে যেতে দেখল।

হিরোসিমাঃ একটি দিনের স্মরণে

শঙ্কর চক্রবর্তী

এবছর ৬ই আগস্ট তারিখে ইতিহাসের একটি ভয়ঙ্কর দিনের পঁচিশতম বার্ষিকী আমরা স্মরণ করলুম। পঁচিশ বছর আগে এ-দিনটিতে পৃথিবীর মানুষ এক ভয়াবহ শক্তির সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করে। ঐ শক্তি লুকিয়ে ছিল পরমাণুর অন্তর্লোকে, বহু বিজ্ঞানীর সাধনায় যে-শক্তি এক অপরূপ রেখাচিত্রকে উদঘাটিত করে চলেছিল বিজ্ঞানসাধকের কাছে, মানুষেরই হাতে সেই শক্তি একদিন এক বর্বরতম মারণাস্ত্রের ভূমিকায় নেমে এলো মানুষেরই উপর।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তখন শেষ পর্যায়। জার্মানী ইতিমধ্যেই আত্মসমর্পণ করেছে। জাপানের যুদ্ধের ক্ষমতাও প্রায় শেষ। কিন্তু ইতিমধ্যে জাপানের জন্যে এক গোপন অস্ত্র বরাদ্দ হয়ে বসে আছে।— পারমাণবিক বোমা আমেরিকার লস আলামোস গবেষণাগারে দীর্ঘ ছ-বছর অগণিত বিজ্ঞানীর কর্মপ্রচেষ্টায় যে-অস্ত্রের নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ হয়েছে, ১৯৪৫ সালের ১৬ই জুলাই নিউ মেক্সিকোর এক প্রান্তরে প্রাথমিক পরীক্ষাকাজও সাফল্য-মণ্ডিত হয়েছে, এবারে কাজ হলো যুধ্যমান জাপানের দুটি জনবহুল শহরের ওপর এর ক্ষমতার আরো বড় পরিচয়কে গ্রহণ করা।

পারমাণবিক বোমার লক্ষ্যবস্তু নির্বাচন কমিটি জাপানের চারটি শহরকে তাদের তালিকাভুক্ত করেছিলেন—হিরোসিমা, কোকুরা, নুগাটা এবং কিয়োটো। হিরোসিমা ছিল প্রথম লক্ষ্যবস্তু। কিয়োটো অজস্র মন্দিরে ভরা, জাপানের এক অতি পুণ্য তীর্থক্ষেত্র। লস আলামোসের এক তরুণ পদার্থবিদের সকাতর অনুনয়ে কিয়োটোর জায়গায় নাগাসাকি শহরের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হলো।

১৯৪৫ সালের ৬ই আগস্ট সকালবেলা একটি আমেরিকান বি-২৯ বোমারু বিমান হিরোসিমার দিকে এগিয়ে চলেছে। বিমানটির মধ্যে রয়েছে একটি পারমাণবিক বোমা। হিরোসিমা এবং অন্য তিনটি শহরের অধিবাসীরা নিজেদের ভাগ্যবান বলে গণ্য করতে আরম্ভ করেছিল। কারণ ঝাঁকে ঝাঁকে

আমেরিকান বোমারু বিমান যখন প্রতিদিন নির্বিচারে জাপানের বিভিন্ন শহর ও সামরিক লক্ষবস্তুর ওপর বোমা ফেলে চলেছে তাদের গায়ে তখন পর্যন্ত আঁচড়টিও পড়েনি। তারা জানত না, একটি বিশেষ পরীক্ষাকাজের জন্য গিনিপিগ হিসাবে তাদের জিইয়ে রাখা হয়েছে।

বি-২৯ বোমারু বিমানটিকে হিরোসিমার মানুষ প্রতিদিনই দেখত আকাশে। আজও তারা সন্ত্রস্ত হয়নি। 'অল ক্লিয়ার' সঙ্কেত বাজবার সঙ্গে সঙ্গে তারা সবাই তাদের নিরাপদ আশ্রয় থেকে বেরিয়ে এসে যে-যার কর্মক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে চলল। ঠিক তখনই পারমাণবিক বোমাটিকে ফেলা হলো হিরোসিমার ওপর। সময়টা ছিল সকাল ৮-১৫। এক বিরাট ধুলো আর ধোঁয়ার মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে গেল হিরোসিমা।

চব্বিশ ঘণ্টা বাদে ধোঁয়ার মেঘ কেটে গেলে উদ্ঘাটিত হলো এক ভয়াবহ দৃশ্য। গোটা শহরটাই তখন এক ধ্বংসস্তূপ। নিহত হয়েছে প্রায় এক লক্ষ লোক — বেশির ভাগ প্রচণ্ড তাপে ঝলসে গিয়ে, বাদবাকি মারাত্মক তেজস্ক্রিয় বিকীরণের প্রভাবে। আহতও হয়েছিল একলক্ষের মতো মানুষ — যাদের অনেকেই তেজস্ক্রিয়ার শিকারে আজ মৃতের তালিকায়, মন্থরগতিতে তিলেতিলে যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর হাতে আজও অনেকে শিকার হয়ে চলেছে।

ঠিক তিনদিন বাদে ৯ই আগস্ট তারিখে দ্বিতীয় পারমাণবিক বোমাটিকে ফেলা হলো নাগাসাকির ওপরে। লক্ষ্যবস্তু ছিল কোকুরা শহর, নাগাসাকি নয়। ঘন মেঘের আড়ালে ঢাকা থাকার জন্যে বেঁচে গেল কোকুরা, ধ্বংস হলো নাগাসাকি। ১০ই আগস্ট জাপান আত্মসমর্পণ করল।

বোমা তৈরির প্রকল্প

হিরোসিমা, নাগাসাকি এক ভয়াবহ মারণাস্ত্রের সঙ্গে পরিচয় ঘটাল পৃথিবীর মানুষের। এই মারণাস্ত্র তৈরির কাহিনী শুরু হয়েছিল ১৯৩৯ সালের একটি দিনে। মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইনের কাছে এসেছিলেন ইয়োরোপ থেকে নাজী অত্যাচারে বিতাড়িত সিলার্ড, টেলার প্রমুখ বিজ্ঞানীরা। পরমাণু বিভাজনের (ফিসন) প্রাথমিক পরীক্ষাকাজ ইয়োরোপের কিছুকিছু গবেষণাগারে বিজ্ঞানীরা শুরু করেছেন। জার্মানীতেও এ-বিষয়ে কাজ শুরু হয়েছে, সে কাজের অধিকর্তারূপে হিটলার নির্বাচিত করেছিল হাইসেনবার্গকে। বিতাড়িত ইহুদী বিজ্ঞানীদের ভয়, পাছে হিটলার আগেই পরমাণুর শক্তিকে কাজে

লাগাবার মতো কোনো ভয়াবহ মারণাস্ত্রের অধিকারী হয়ে বসে। সিলার্ডের সনির্বন্ধ অনুরোধে আইনস্টাইন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের কাছে ১৯৩৯ সালের আগস্ট মাসে এক চিঠি লিখলেন। মৌলিক পদার্থ ইউরেনিয়ামের পরমাণুর ভরকে যদি শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায় তাহলে তার বিপুল সম্ভাবনার কথা সেই চিঠির মধ্যে ছিল। "কোন বন্দরের ওপর এ জাতীয় শক্তিধর একটি বোমার বিস্ফোরণ ঘটালে সেই বন্দর এবং তার চারপাশের এলাকা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়ে বসতে পারে"—আইনস্টাইন তাঁর চিঠিতে লিখেছিলেন।

আইনাস্টাইনের এই চিঠি থেকে যে কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছিল, তারই পরিণতি হচ্ছে পারমাণবিক বোমা। ১৯৪২এর শেষভাগ থেকে সুপরিকল্পিতভাবে যে বোমা তৈরির গবেষণা কাজে সময়ের সঙ্গে যেন এক দৌড় শুরু হলো।

১৯৩৮ সালে ইটালীর বিখ্যাত পদার্থবিদ এনরিকো ফার্মি পরমাণু বোমা তৈরির একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র 'কেন্দ্রকীয় পরম্পর প্রক্রিয়ার (নিউক্লিয়ার চেন রিঅ্যাকসন) আবিষ্কার করেছিলেন। এই আবিষ্কারের জন্যে তিনি নোবেল পুরস্কার পান। পুরস্কার নেবার জন্যে সুইডেনে এসে সেখান থেকে দেশে না ফিরে তিনি আমেরিকা চলে আসেন। ফার্মির স্ত্রী লরা ছিলেন ইহুদী, কাজেই স্বদেশে কোনো না কোনো সময়ে অত্যাচারিত হবার ভয় ছিল তাঁর। ১৯৪২ সালের ২রা ডিসেম্বর ফার্মি আমেরিকায় 'কেন্দ্রকীয় পরম্পর প্রক্রিয়া' বা পরমাণুর কেন্দ্রকে বিভাজনের কাজ শৃঙ্খলের আকারে শুরু করে গ্রাফাইট-দণ্ডের দ্বারা তাকে নিয়ন্ত্রণের পরীক্ষায় সফলতা অর্জন করলেন। পারমাণবিক বোমা তৈরির পথে এ ছিল আর একটি মস্ত বড় পদক্ষেপ।

জার্মানীতেও পারমাণবিক বোমা তৈরির কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলার খবর আসছিল। নরওয়ের মেরু অঞ্চলের উপকূলভূমি জুড়ে জার্মানরা 'ভারী জল' তৈরির বিরাট বিরাট কারখানা বসিয়েছিল। পারমাণবিক বোমা তৈরির ব্যাপারে ভারী জল হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মিত্রপক্ষের বোমারু বিমানবাহিনী বিপুল ক্ষতি স্বীকার করেও ঐ কারখানাগুলোকে ধ্বংস করে ফেলে। এ সত্ত্বেও জার্মানরা আবার নতুন জায়গায় 'ভারী জল' তৈরির কারখানা গড়ে তোলে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হবার পর জার্মান বিজ্ঞানীদের জিজ্ঞাসাবাদের মধ্য

দিয়ে জানা যায় যে পারমাণবিক বোমা তৈরির ব্যাপারে জার্মানী আমেরিকার চেয়ে একবছর মাত্র পিছিয়ে ছিল।

ধ্বংস ও শান্তি

১৯৪৫ সালের জুলাই মাসে মেক্সিকোর প্রান্তরে পারমাণবিক বোমার প্রাথমিক সফল পরীক্ষার ভয়াবহ নিদর্শন দেখে সিলার্ড প্রমুখ বিজ্ঞানীরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়লেন; যেভাবেই হোক, মানুষের ওপর এই বোমার পরীক্ষাকাজকে কখনোই ঘটতে দেয়া হবে না। তাদের আর্জি নিয়ে তাঁরা আবার দরবার করলেন আইনস্টাইনের কাছে এবং সেখান থেকে আমেরিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের কাছে। তাঁদের প্রস্তাব প্রায় গৃহীতও হতে চলেছিল। কিন্তু লস আলামোস গবেষণাগারের প্রশাসন ও গবেষণা বিভাগের দুই কর্মাধ্যক্ষ গ্রোভস ও রবার্ট ওপেনহাইমার ছিলেন উচ্চাভিলাষী। এত বিপুল অর্থব্যয় এবং বৈজ্ঞানিক শ্রমশক্তির বিনিময়ে যে বস্তুটি নির্মিত হয়েছে, সমগ্র মানবজাতির দৃষ্টি আকর্ষণকারী কোনো ঘটনা ছাড়া এক বিপুল গৌরব ও খ্যাতির অধিকারী তো তারা হতে পারবেন না। আমেরিকার প্রশাসক মহলকেও তারা তাদের মতানুগামী করতে সমর্থ হন।

পারমাণবিক বোমা নির্মাণের পেছনে যে বিজ্ঞানীরা দীর্ঘকাল ধরে কাজ করেছেন, তাদের এক বিরাট অংশের ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে এবং অজ্ঞাতসারে হিরোসিমাকে হত্যার ষড়যন্ত্রের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলল। ষড়যন্ত্রকারীদের ভয় ছিল, পাছে বোমাটিকে ব্যবহারের আগেই জাপান আত্মসমর্পণ করে বসে।

বিশেষজ্ঞেরা বলেছেন, পারমাণবিক বোমা দুটিকে জাপানের হিরোসিমা, নাগাসাকির ওপর ব্যবহার না করে জাপানেরই কোনো খোলা জায়গার ওপরেও যদি ফেলা হতো, তাহলেও তার ধ্বংসের প্রচণ্ড ক্ষমতার চেহারা দেখেই জাপানী সরকার শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হতো।

পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণের ভয়াবহ ঘটনার কথা শুনে সবচেয়ে বেশি বেদনাহত হয়েছিলেন, আইনস্টাইন। তাঁরই উদ্যোগে এবং 'ভর ও শক্তির সমানুপাতিক' সম্পর্করূপ তাঁরই বৈজ্ঞানিক সূত্রের ওপর ভিত্তি করে পারমাণবিক বোমার সৃষ্টি—এ-কথা তিনি কিছুতেই ভুলতে পারছিলেন

না। ধ্বংস ও মৃত্যুর শক্তির বিরুদ্ধে সংহত হবার জন্যে মানুষের শুভবুদ্ধির কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন তিনি।

১৯৪৫ সালের ৬ই আগস্ট যে পারমাণবিক যুগের শুরু হলো, তা পারমাণবিক শক্তির ধ্বংসের চেহারাটাই আমাদের সামনে তুলে ধরেছিল। যুদ্ধশেষ হতে না হতেই সাম্রাজ্যবাদীরা ঠাণ্ডা যুদ্ধের মহড়া শুরু করলেন। সাম্রাজ্যবাদী ধুরন্ধর চার্চিলের ফুলটন বক্তৃতার পর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হলো অস্ত্র জমানোর পালা, স্টক পাইলিং। বাধ্য হয়ে, যুদ্ধের আঘাতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত সোভিয়েত ইউনিয়নকে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির দিকে দ্রুত এগোতে হলো। দেশে দেশে তখন জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের জোয়ার এসেছে। সদ্যজাত সমাজতন্ত্রী দেশগুলি বিকশিত হবার স্বপ্ন দেখছে। বিশ্বের শ্রমিক-শ্রেণী—সাম্রাজ্যবাদের আসল স্বরূপ চিনে ফেলেছে। এ-অবস্থায় নিউক্লিয়ার ব্ল্যাক মেলিঙ-এর জবাব দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর কোথায়? আমেরিকার নেতৃত্বে পৃথিবীর পুঁজিবাদী এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিজোট এই শক্তির অধিকারের গর্বে গোটা পৃথিবীর ঘটনাস্রোতকে নিউক্লিয়ার ব্ল্যাকমেলিঙ-এর সাহায্যে নিয়ন্ত্রণের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল। সেই স্বপ্ন তাদের চূর্ণ হলো ১৯৪৯ সালে—সোভিয়েট ইউনিয়ন তাদের প্রথম পারমাণবিক বোমার সফল পরীক্ষা করলেন ঐ বছর। দুই শক্তিজোটের মধ্যে এরপর শুরু হলো এক অশুভ প্রতিযোগিতা। জলে, স্থলে, আকাশে ক্রমিকভাবে পারমাণবিক অস্ত্র-পরীক্ষা ঘটে চলল। তেজস্ক্রিয়ার মারাত্মক বিষে ভরে উঠতে থাকল পৃথিবী।

১৯৫৪ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন হাইড্রোজেন বোমার প্রথম পরীক্ষায় সফলতা অর্জন করলেন। একটি আধুনিক হাইড্রোজেন বোমা হিরোসিমা-জাতীয় পারমাণবিক বোমার তুলনায় প্রায় সহস্রগুণ বেশি শক্তিশালী।

পরমাণুর বিপুল ধ্বংসের চেহারাটাই যে তার সত্য পরিচয় নয়, যে অপরিমেয় শক্তির উৎস সেই পরমাণুর মধ্যে লুকিয়ে আছে, তার কল্যাণময়ী রূপটাই যে বড়, এই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পৃথিবীর ৭২টি দেশের বহু শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীরা স্বইজারল্যাণ্ডের জেনিভা শহরে ১৯৫৫ সালের মাঝামাঝি নাগাদ সমবেত হয়েছিলেন। পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ প্রয়োগের ভিত্তিতে এক সর্বব্যাপী আলোচনার আয়োজন হয়েছিল সেই সম্মেলনে—বিজ্ঞানীদের পারস্পরিক ভাববিনিময়ের মাধ্যমে যে থানে রাখীবন্ধন হলো মানুষের শুভবুদ্ধির

সঙ্গে পরমাণুর অপরিমেয় শক্তিভাণ্ডারের। আমাদের ভারতেরই বিজ্ঞানী হোমি ভাবা সেই বিশ্ববিজ্ঞান সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন।

জেনিভা সম্মেলনের মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে পারমাণবিক অস্ত্রপরীক্ষা নিষিদ্ধকরণের দাবি বিজ্ঞানীদের তরফ থেকে জোরালভাবে উত্থিত হলো। ১৯৬৩ সালে মস্কোতে পৃথিবীর জমির ওপর পারমাণবিক অস্ত্রপরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তি গৃহীত হয়েছে, তাতে পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশ স্বাক্ষর দিয়েছেন। কিন্তু আজও ফ্রান্স এবং চীন জমির ওপর পারমাণবিক অস্ত্রপরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে এবং ভূগর্ভে এই অস্ত্রপরীক্ষা নিষিদ্ধকরণের ব্যাপারে পৃথিবীর দুই বৃহত্তম রাষ্ট্র সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং আমেরিকা আজও কোনো চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারেননি।

জমির ওপরের তুলনায় ভূগর্ভে পারমাণবিক অস্ত্রপরীক্ষায় তেজস্ক্রিয়ার মারাত্মক প্রভাব চারিদিকে ছড়িয়ে যাবার সম্ভাবনা খুবই কম, কিন্তু তাহলেও এ-জাতীয় পরীক্ষাতে যে বিপদ নিহিত রয়েছে তাকে অস্বীকার করা যায় না। পারমাণবিক অস্ত্রপরীক্ষার সর্বাত্মকভাবে নিষিদ্ধকরণের জন্যে সারা পৃথিবী জুড়ে তাই যে দাবি উঠেছে—সে দাবির যৌক্তিকতা আমরা সবাই উপলব্ধি করি।

পারমাণবিক শক্তি, পারমাণবিক ও হাইড্রোজেন বোমা, তেজস্ক্রিয়া প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গগুলো নিয়ে এবারে আমরা কিছু আলোচনা করব।

ভর ও শক্তি

পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ পরমাণুর কেন্দ্রকে রয়েছে প্রোটন ও নিউট্রন। পরমাণুকেন্দ্রকের মাপ এক মাইক্রনের একশকোটি ভাগের একভাগ মাত্র—আর মাইক্রনের মাপ হলো এক মিলিমিটারের হাজার ভাগের মাত্র একভাগ। প্রোটনের বৈদ্যুতিক চার্জ হলো পজিটিভ, নিউট্রনের কোনও বৈদ্যুতিক চার্জ নেই। পরমাণুকেন্দ্রটিকে ঘিরে পরিক্রমা করছে ইলেকট্রন। ইলেকট্রনের বৈদ্যুতিক চার্জ নেগেটিভ।

সবচেয়ে হালকা মৌলিক পদার্থ হাইড্রোজেনের কেন্দ্রকে রয়েছে একটিমাত্র প্রোটন এবং সেই কেন্দ্রকের চারপাশে ঘুরছে একটিমাত্র ইলেকট্রন। প্রকৃতির রাজ্যে স্বাভাবিক অবস্থায় যে মৌলিক পদার্থগুলি রয়েছে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে ভারি ইউরেনিয়ামের পরমাণুকেন্দ্রকে রয়েছে ৯২টি প্রোটন ও একাধিক বহির্কক্ষে আবর্তিত হচ্ছে ৯২টি ইলেকট্রন।

কল্পনাতীত ক্ষুদ্র পরমাণুর মোট চেহারার তুলনায় তার কেন্দ্রকের মাপটা এত ছোট যে সমস্ত পরমাণুটাকে একটা ফাঁকা জায়গা বললেও মোটেই ভুল হবে না। অথচ এই পরমাণুর অন্তঃপুরে কি অনন্ত রহস্য! সেই রহস্যের সন্ধানে নেমে বিজ্ঞানীরা খুঁজে পেলেন আলাদিনের দৈত্যের শক্তিকে। এই শক্তিকে মুক্তি দেবার কাজে যাঁদের অবদান সকলের বড়, তাঁরা হলেন পিয়েরি ও মেরি কুরি, অ্যালবার্ট আইনস্টাইন, আর্নেস্ট রাদারফোর্ড, নীলস্ বোর, ফ্রেডেরিক ও আইরিণ জোলিও-কুরি, অটো হান, আর্নেস্ট লরেন্স, এনরিকো ফার্মি প্রভৃতি।

পরমাণুর ভরকে (ম্যাস) শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়, আবার শক্তিকে রূপ দেয়া যায় ভরে, মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন ১৯০৫ সালে একটি ঐতিহাসিক সূত্রের মাধ্যমে তা প্রকাশ করেছিলেন। এই সূত্র অনুযায়ী, এক কিলোগ্রাম ইউরেনিয়ামের ভরকে যদি সম্পূর্ণভাবে শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়, তাহলে তার পরিমাণ দাঁড়াবে আড়াই হাজার কোটি কিলোওয়াট-ঘণ্টার সমান। অর্থাৎ, এই শক্তির সাহায্যে এক হাজার ওয়াট শক্তিসম্পন্ন আড়াই হাজার কোটি বাতিকে একঘণ্টা জ্বালিয়ে রাখা যাবে। এই বিপুল শক্তির দ্বারা হয়তো আমাদের গোটা ভারতবর্ষের সমগ্র শিল্পব্যবস্থার পুরো এক বছরের চাহিদাই মেটানো যেতে পারে। শক্তির এ রূপটা হলো পারমাণবিক।

পরমাণুকেন্দ্রকের বিভাজনের মধ্য দিয়েই পারমাণবিক শক্তিকে পাওয়া যেতে পারে। ইউরেনিয়াম, প্লুটোনিয়াম প্রভৃতি হলো এ-জাতীয় বিভাজনশীল পদার্থ, অর্থাৎ যাদের পরমাণুকেন্দ্রককে সহজে ভেঙে ফেলা যায়। ভাঙার কাজে নিউট্রনকে লাগানো যায় বুলেট বা হাতিয়ারের মতো। যেহেতু নিউট্রনের কোনো বৈদ্যুতিক চার্জ নেই, তাই ও ইলেকট্রনদের বেড়াজাল ডিঙিয়ে সোজা আঘাত হানতে পারবে পরমাণুকেন্দ্রকের ওপর।

ইউরেনিয়াম হলো আবার একটি তেজস্ক্রিয় পদার্থ। এর পরমাণুরা নিজেদের ভরকে ক্রমাগত আলফা (হিলিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রক), বিটা (ইলেকট্রণ কণা) ও গামা রশ্মির আকারে খুইয়ে চলেছে। ক্ষয় পেতে পেতে ইউরেনিয়াম ও অন্যান্য তেজস্ক্রিয় পদার্থ শেষপর্যন্ত সীসায় পরিণত হয়, কিন্তু এই ক্ষয়ের কাজ চলে এত ধীরগতিতে যে আজ থেকে ৪৫০ কোটি বছর পরেও পৃথিবীর মোট ইউরেনিয়াম সঞ্চয় মাত্র অর্ধেক নিঃশেষিত হবে।

পারমাণবিক বোমা

সাধারণ ইউরেনিয়ামের মধ্যে তিনটি আইসোটোপ রয়েছে—ওরা হলো. ইউ-২৩৮, ইউ-২৩৫ ও ইউ-২৩৪। প্রতিটি আইসোটোপের পরমাণুকেন্দ্রকে রয়েছে ৯২টি প্রোটন, কিন্তু নিউট্রনের সংখ্যা হলো যথাক্রমে ১৪৬, ১৪৩ ও ১৪২। সব মৌলিক পদার্থেরই এমনি আইসোটোপ রয়েছে। রাসায়নিক বিচারে মূল পদার্থদের সঙ্গে তাদের আইসোটোপের কোনো তফাৎ নেই, গুণাগুণের তফাৎটা শুধু পারমাণবিক ভরের (প্রোটন ও নিউট্রনের মিলিত ভর) বেলায়।

একতাল ইউ-২৩৫এর মধ্যে স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয়ার প্রভাবে সব সময়েই কিছু না কিছু পরমাণুকেন্দ্রকের মধ্যে বিভাজন ঘটছে। ফলে আলফা, বিটা ও গামা রশ্মির সঙ্গে ছাড়া পাচ্ছে কিছু তাপশক্তি এবং পরমাণুকেন্দ্রক থেকে ছাড়া পাচ্ছে কিছু নিউট্রন। এই নিউট্রনেরা আবার প্রতিবেশি পরমাণুদের ভাঙার কাজ জুড়ে দিল। ছাড়া পেল আরো বেশি নিউট্রন। ভাঙার কাজটা এভাবে শৃঙ্খলের মতো ছড়িয়ে যায় বলে এর নাম দেয়া হয়েছে পরম্পর প্রক্রিয়া (চেন রিঅ্যাকসন)। ইউ-২৩৫এর পরমাণুদের কেন্দ্রকের পর কেন্দ্রকে ভাঙন ঘটতে ঘটতে এভাবে ছাড়া পাবে এক বিপুল শক্তি এবং একই সঙ্গে উদ্ভব হবে এক প্রচণ্ড তাপের। বহুসংখ্যক ইউ-২৩৫এর পরমাণুকেন্দ্রকের ভাঙন থেকে এভাবে হিরোসিমার ওপর ফেলা পারমাণবিক বোমার তাপ ও ধ্বংসের ক্ষমতা জন্ম নিতে পারে। নিউট্রনের দ্বারা পরমাণুকেন্দ্রকের এই ধ্বংসপ্রক্রিয়ার নাম হলো বিভাজন বা fission।

যে বাড়তি নিউট্রনেরা তৈরি হচ্ছে ইউ-২৩৫এর পরমাণুর মধ্যে, তারা যদি বাকি পরমাণুকেন্দ্রকগুলোর ঘাড়ে না পড়ে ফসকে বেরিয়ে যায়, তাহলে বিভাজনের কাজের সেখানেই ইতি ঘটবে। পরমাণুগুলো প্রায় ফাঁকা গড়ের মাঠ বলেই এই ভাবনাটা রয়েছে। অতএব দরকার ইউরেনিয়াম-২৩৫এর এতবড় একটা স্তূপ (পাইল), যাতে ফসকে যাওয়া নিউট্রনের সব ক্ষতিপূরণ হয়েও কাজ চালানোর মতো নিউট্রনের সরবরাহ চালু থাকে। এই নির্দিষ্ট পরিমাণ স্তূপের নাম হলো ক্রান্তিমাত্রিক ভর (ক্রিটিকাল ম্যাস)।

একটি পারমাণবিক বোমার ক্ষেত্রে এই ক্রান্তিমাত্রিক ভরের পরিমাণ এক কিলোগ্রামের কম হলে চলে না। বস্তুখণ্ডকে দুটো টুকরো অংশে আলাদা করে রাখা হয়। একসঙ্গে জুড়ে দিলেই শুরু হয়ে যায় পরম্পর প্রক্রিয়া ও বিস্ফোরণের প্রচণ্ডতায় ফেটে পড়ে।

একটি পারমাণবিক বোমার মধ্যে সমগ্র বস্তুর এক হাজার ভাগের একভাগ মাত্র ভর শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। তার চেহারা দেখেই আমাদের আতঙ্কের শেষ নেই। পুরো ভরটা শক্তিতে রূপ পেলে কি ভয়াবহ ব্যাপারটাই না হতো।

হাইড্রোজেন বোমা

হিরোসিমা ও নাগাসাকির ওপর যে পারমাণবিক বোমা ফেলা হয়, তার বিস্ফোরক শক্তির পরিমাণ ছিল ১৫০০০ থেকে ২০,০০০ টন টি. এন. টি. বোমার সমান। টি. এন. টি. (ট্রাইনাইট্রোটলিউয়েন) হলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সর্বাধিক ব্যবহৃত বিস্ফোরক পদার্থ।

হাইড্রোজেন বোমারূপ যে দুর্ধর্ষ মারণাস্ত্রটি অপর্যাপ্ত পরিমাণে বর্তমানে পৃথিবীতে মজুত রয়েছে, তাদের কোনো কোনোটির শক্তির মাপ ১৫ মেগাটন (১ মেগাটন=১০ লক্ষ টন) টি. এন. টি. বোমার কাছাকাছি। পৃথিবীতে আগ্নেয়াস্ত্র আবিষ্কারের প্রথম দিন থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষদিন পর্যন্ত মানুষ যত আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করেছে, তাদের মোট শক্তির তুলনায় এই এক একটি হাইড্রোজেন বোমার শক্তি অনেক বেশি। এ-জাতীয় একটি বোমাকে যদি পৃথিবীর বৃহত্তম জনবহুল যেকোনো একটি শহরের ওপর ফেলা হয়, তাহলে সেই শহরের প্রতিটি মানুষ এবং ঘরবাড়ি প্রভৃতি সর্বাত্মকভাবে ধ্বংস লাভ করবে।

একটি হাইড্রোজেন বোমার মধ্যে সাধারণ হাইড্রোজেন এবং হাইড্রোজেনের আইসোটোপ ডয়টেরিয়াম (এর পরমাণুকেন্দ্রকে রয়েছে একটি প্রোটন ও একটি নউট্রন) পরমাণুদের জুড়ে দিয়ে (ফিউসন) হিলিয়াম পরমাণুদের তৈরি করা হয়। এ-কাজের জন্যে দরকার এক বিপুল পরিমাণ তাপশক্তির, যে তাপশক্তিকে পাওয়া যায় হাইড্রোজেন বোমার মধ্যে বসানো একটি পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ থেকে।

হাইড্রোজেন বোমার মধ্যে পারমাণবিক বোমার তুলনায় অনেক বেশি ভর শক্তিতে রূপান্তরিত হয়, ফলে সেই শক্তির চেহারাও হয় প্রচণ্ড ভয়াবহ। সূর্য এবং অন্যান্য নক্ষত্রদের কেন্দ্রে প্রায় চার কোটি ডিগ্রি ফারেনহিট তাপের পরিমণ্ডলে এই ঘটনাটাই অহরহ ঘটে চলেছে।

পশ্চিম জগতের পারমাণবিক বিজ্ঞানীদের নির্ভরযোগ্য হিসেব থেকে দেখা

যায় বর্তমান দুনিয়ায় পারমাণবিক মারণাস্ত্রের ক্ষমতা হলো ২৫০,০০০ মেগাটন বা ২৫০০০ কোটি টি. এন. টি. বোমার ক্ষমতার সমান। অর্থাৎ আমাদের পৃথিবী নামক গ্রহের প্রতিটি অধিবাসীর জন্যে মজুত রয়েছে ৮০ টনেরও বেশি বিস্ফোরক পদার্থ। পৃথিবীর অধিকাংশ লোক বুভুক্ষায় জর্জরিত হলেও মারণাস্ত্রের সরবরাহ তাদের জন্যে অপর্যাপ্ত পরিমাণেই রয়েছে। কি নিদারুণ পরিহাস!

তেজস্ক্রিয়া

আমরা পৃথিবীর মানুষ একটি 'স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয় পরিমণ্ডলে বাস করি। পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম, রেডিয়াম প্রভৃতি তেজস্ক্রিয় পদার্থ যেমন এই পরিমণ্ডল গঠনের একটি মূল উপাদান, তেমনি অন্যান্য উপাদান হলো—আমাদের দেহমধ্যস্থ তেজস্ক্রিয় পটাসিয়াম, ঘড়ির রেডিয়াম ডায়াল, চিকিৎসার জন্যে ব্যবহৃত রঞ্জন রশ্মি, ইটের তৈরি বাড়ি, বায়ুমণ্ডলের তেজস্ক্রিয় কার্বন ডাই-অক্সাইড, মহাকাশের অভ্যন্তরজাত মহাজাগতিক রশ্মি। এই সমস্ত উপাদানের একবছরে মিলিত তেজস্ক্রিয়ার পরিমাণের হিসেব নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। কেউ বলছেন সেই হিসেবটা ১৩৪ মিলিরেম (মিলিরেম =এক রেমের এক সহস্রাংশ ; রেম=একজন মানুষ যতটা রোয়েণ্টজেন ধারণ করতে সক্ষম ; রোয়েণ্টজেন=তেজস্ক্রিয়া পরিমাপের একক), আবার কারুর মতে ২১০ মিলিরেম। সমুদ্রপৃষ্ঠের এক মাইল ওপরেই এই মাত্রা বেড়ে ৩৫০ মিলিরেমে পৌছোয়। প্রত্যেক মানুষের ক্ষেত্রে এই তেজস্ক্রিয়ার মাপ, দেশ ও স্থানভেদে কোথাও কম, কোথাও বেশি।

যে পরিমাণ তেজস্ক্রিয়া মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে না, তার মাপ হলো প্রতি বছরে ৫০০ মিলিরেম।

একটি পারমাণবিক বা হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণে একদিকে যেমন সৃষ্টি হয় প্রচণ্ড তাপশক্তি ও মারাত্মক আলফা, বিটা ও গামারশ্মি তেমনি তৈরি হয় বহু তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ।* বিস্ফোরণের প্রচণ্ড সংঘাতে লক্ষ লক্ষ টন মাটি ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয় তেজস্ক্রিয় ভস্মকণার আকারে ও বায়ুমণ্ডলের সর্বনিম্ন অঞ্চল ট্রপোসফিয়ারে গিয়ে হাজির হয়। এই ভস্মকণার দল আবার নেমে আসে মাটির দিকে। সবচেয়ে মারাত্মক হলো আঞ্চলিক ভস্মপাত।

বিভিন্ন বায়ুস্রোতে বাহিত হয়ে তেজস্ক্রিয় ধুলোর মেঘ বারকয়েক পৃথিবী

পরিক্রমাকালে আর একটি ভস্মপাত ঘটায় (ট্রপোসফেরিক ফল-আউট)। মেগাটন পর্যায়ের প্রচণ্ড শক্তিশালী হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণজনিত তেজস্ক্রিয় ধুলোর মেঘ বায়ুমণ্ডলের দ্বিতীয় স্তর ষ্ট্র্যাটোসফিয়ারে গিয়ে হাজির হয়। এই অঞ্চল থেকে বায়ুস্রোতে বাহিত হয়ে পৃথিবীর যে কোনো জায়গায়, যে কোনো সময়ে, এমনকি বোমা বিস্ফোরণের দশ বৎসর বাদেও তেজস্ক্রিয় ভস্মপাত ঘটতে পারে।

তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ

পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণে যে বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের সৃষ্টি হয়, তাদের মধ্যে বেশির ভাগেরই অর্ধ-জীবনকাল (মোট তেজস্ক্রিয় বস্তুর অর্ধেকটা নিঃশেষিত হতে যত সময় লাগবে) কয়েক মিনিট থেকে কয়েক দিন। কিন্তু কয়েকটির যেমন রুবিডিয়াম-৮৭, ষ্ট্রনসিয়াম-৯০, সিজিয়াম-১৩৭ ও সিরিয়াম-১৪৪-এর অর্ধ-আয়ুষ্কাল হলো যথাক্রমে ৬'১ × ১০ বছর, ২৮ বছর, ৩৩ বছর ও ৯ মাস এবং মানবদেহের ওপর এদের প্রত্যেকটির প্রতিক্রিয়া ক্ষতিকারক।

বিশেষভাবে ক্ষতিকারক হলো ষ্ট্রনসিয়াম-৯০ নামক তেজস্ক্রিয় আইসোটোপটি। বৃষ্টিপাতের সঙ্গে এর ভস্মকণা পৃথিবীতে নেমে আসে এবং মাটির ওপরকার স্তর তাদের শোষণ করে নেয়। সেখান থেকে গাছের শিকড় বেয়ে তেজস্ক্রিয়া গিয়ে হাজির হয় ঘাস ও ছোট ছোট গাছের কাণ্ড, শাখা-প্রশাখা, লতাপাতায়। গৃহপালিত জীব সেই ঘাস বা গাছের পাতা খেলে ষ্ট্রনসিয়াম-৯০কেও একই সঙ্গে হজম করে বসবে। রাসায়নিক বিচারে ষ্ট্রনসিয়াম ক্যালসিয়ামের সমগোত্রীয়। প্রাণীদেহের দুধে ক্যালসিয়াম প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। ষ্ট্রনসিয়াম-৯০ ক্যালসিয়ামকে অনুসরণ করে দুধের মধ্যে গিয়ে হাজির হয় এবং সেখান থেকে সেই দুগ্ধপায়ী মানবদেহে।

খাদ্যবস্তুর মধ্যে ক্যালসিয়াম মানবদেহের অস্থি গঠনে সাহায্য করে। ক্যালসিয়ামের সঙ্গে স্ট্রনসিয়াম-৯০ও অস্থিমজ্জার মধ্যে সঞ্চিত হতে থাকে। দেহের অস্থিমজ্জায় রক্তের লোহিতকণিকা গঠিত হয়। রক্তস্রোতের সঙ্গে ষ্ট্রনসিয়াম-৯০ মাতৃদেহ থেকে মাতৃজঠরস্থিত সন্তানের রক্তস্রোতে এবং তার অস্থিতে গিয়ে হাজির হবে।

মানবদেহের কোনো অংশে যদি ক্রমাগতভাবে ঘর্ষণ জাতীয় ব্যাপার

ঘটতে থাকে, তাহলে সেখানে ক্যান্সার জাতীয় রোগের উৎপত্তি হওয়া বিচিত্র নয়। ষ্ট্রনসিয়াম-৯০শ্রেণীর তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ যখন মানবদেহের অভ্যন্তরে অবস্থান করে তখন ক্রমাগত তেজবিকীরণের ফলে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় তা থেকে অস্থির ক্যান্সার এবং রক্তের ক্যান্সার বা লিউকেমিয়া রোগের সৃষ্টি হতে পারে।

ষ্ট্রনসিয়াম সাধারণত দেহের সেই অংশেই জমা হয়, যেখানে অস্থিবৃদ্ধির হার খুবই বেশি। শিশুদের দেহে এই বৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশি বলে তারাই অধিক মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আমেরিকার নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক লাইনাস পলিং হিসেব করে দেখিয়েছেন—১৯৬৩ সালে পারমাণবিক অস্ত্রপরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার আগে যে পরিমাণ পরীক্ষাকাজ পৃথিবীতে ঘটেছে, শুধু তারই ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সতের লক্ষের মত শিশু বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মাবে। অস্ত্রপরীক্ষার তীব্রতা যদি একই মাত্রায় ঘটে চলত, তবে আগামী দশকের মাঝামাঝি নাগাদ পৃথিবীর বেশ কিছু জায়গায় জমি ও জলভাগের তেজস্ক্রিয়ার পরিমাণ এতটাই বেড়ে উঠত যে, ঐ সব অঞ্চল মানুষের বসবাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য হয়ে দাঁড়াত। ফলে যেমন আরো বহু লক্ষ শিশু বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মাত, তেমনি সারা পৃথিবী জুড়ে মানবজাতির ওপর কতগুলো ক্ষতিকর প্রভাব বেড়ে উঠত যেমন জীবনীশক্তি কমে আসা, অকালবার্ধক্য, অস্থির ক্যান্সার ও লিউকেমিয়া রোগের ক্রমিকবৃদ্ধি, সংক্রামকরোগের সংখ্যাধিক্য; স্নায়ুকেন্দ্রের বিকারগ্রস্ততা ইত্যাদি।

মস্কো পারমাণবিক অস্ত্রপরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তির ফলে পৃথিবীর মানুষ এক বিরাট বিভীষিকার হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে। ভূগর্ভে অস্ত্রপরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ এবং সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের দিকে এগিয়ে যাবারই পথনির্দেশ করছে হিরোসিমা-দিবসের পঁচিশতম বেদনাদিগ্ধ স্মরণ বার্ষিকী। ধ্বংস নয়, পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ রূপায়ণের মধ্য দিয়ে মানুষ তার ভবিষ্যত পৃথিবীকে অনেক সুন্দর করে গড়ে তুলবে। যে পৃথিবীর স্বপ্ন আজ আমরা দেখি, তা বাস্তব হয়ে উঠবে আমাদেরই উত্তরপুরুষদের হাতে।

ব্যুরোক্রেসী

বাসব সরকার

আমলাশাহী নিপাত্ যাক্। শুধু শহর কলকাতার মানুষ নয়, বাঙলা দেশের গাঁয়ে-গঞ্জের মানুষের কাছে এই জিগির বহু পরিচিত। অন্তত গত বিশ বাইশ বছর ধরে সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষ, শ্রমিক, কৃষক কর্মচারী এই জিগিরে কোনো-না-কোনো সময়ে সামিল হয়েছেন। এর মধ্যে দুবার জনপ্রিয় যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়েছে, কিন্তু তবুও এই জিগিরের জনপ্রিয়তা কমে যায়নি। তাই সাধারণভাবে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা খর্ব করা যায় না কেন? কিম্বা অন্যভাবে বলা যায় যে, জনপ্রিয় সরকার গঠিত হওয়ার পরেও এই সমস্যা থেকে যায় কি করে? জনপ্রতিনিধিরা আমলাতন্ত্রকে খর্ব করতে পারেন না কেন?

এ-ধরনের প্রশ্নের একটা চালু জবাব আছে, যার সঙ্গে কমবেশি সকলেই পরিচিত।···পার্লামেণ্টারী রাজনীতিতে দলীয় শাসনে পরিবর্তন ঘটে বলেই, কোনো নির্দিষ্ট সময়ে শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত মানুষদের শাসন দক্ষতা নাও থাকতে পারে। ভালো রাজনীতিক সুশাসক হবেন, এটা কোনো স্বতঃসিদ্ধ নয়। তাই প্রশাসনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখবার জন্যেই কর্মদক্ষ প্রশাসক গোষ্ঠীর প্রয়োজনীয়তা আছে। এ জবাব কেতাবী। অর্থাৎ ধরে নেওয়া হচ্ছে যে, পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থায় কিম্বা আরো সম্প্রসারিত করে বলা যায় যে, পরোক্ষ গণতন্ত্রে আমলাশাহী অনিবার্য।

কিন্তু সমাজবিজ্ঞানীরা বলবেন আমলাতন্ত্র প্রায় সভ্যতার সমবয়সী। একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, সভ্যতার শৈশবে, আমলাতন্ত্রের চেহারাটা আজকের মতো বিরাট, জটিল ছিল না। বরং একথা বলাই অনেক সঙ্গত যে, আমলাতন্ত্রের চেহারা, ক্ষমতা এক কথায় প্রভাব প্রতিপত্তি যুগে যুগে ভিন্নতর হয়েছে। এবং রাষ্ট্র জন্মের সুরু থেকেই রাষ্ট্রিক সমাজের সমস্যা ক্রমেই মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। রাষ্ট্রের বিমূর্ত ধারণার সঙ্গে সাধারণ মানুষের কোনো সম্পর্ক নেই। রাষ্ট্রের পরিচয়, তার অস্তিত্বের ধারণা সম্পূর্ণভাবে প্রশাসনকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে। তাই রাষ্ট্র মানে হলো শাসনযন্ত্র, যার বাস্তবরূপ মানুষের চোখে ধরা পড়ে রাজনীতিক, আমলাতন্ত্র, পুলিশ সৈন্যবাহিনী ইত্যাদির অস্তিত্বের জটিল যোগফলের মধ্যে। এটা একটা বিশেষ গোষ্ঠী, একটা জৈবসত্তা যা নিজেকে

সমাজের থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে পারে এক বিশেষ ধরণের শ্রমবিভাগের মধ্য দিয়ে।

সমাজ বিজ্ঞানের গোড়ার কথা হলো মানুষের অকৃত্রিম সামাজিকতা নিয়ে। ইতিহাসের অমোঘ নিয়মেই সেই সামাজিকতা সমকালে রূপ নিয়েছে রাষ্ট্র সত্তায়। রাষ্ট্র তাই সমাজ বিকাশের স্বাভাবিক, অনিবার্য পরিণতি। কিন্তু সেই রাষ্ট্রেই আবার বাস্তবে শাসনযন্ত্রে পরিণত হয়ে, মানুষের সামাজিকতার পূর্ণতম বিকাশে বাধা দিচ্ছে। যে মানুষ রাষ্ট্র গড়েছে ইতিহাসের নিয়মে নিজের প্রয়োজন মেটাতে, সেই মানুষ আবার রাষ্ট্রে অর্থাৎ বাস্তবে শাসনযন্ত্রের অপ্রতিহত ক্ষমতার শিকার হতে নারাজ হয়ে দূরে সরে যাওয়ার চেষ্টা করছে। এ এক অদ্ভুত পবস্পর বিরোধিতা, যার ফলশ্রুতি হলো বিচ্ছিন্নতাবোধ বা alienation।

ইংরেজি ব্যুরোক্রেসীর, যার বাঙলা চালু প্রতিশব্দ আমলাতন্ত্র, আভিধানিক অর্থই হলো একটা যন্ত্রের শাসন। যান্ত্রিকতা এবং সেই অর্থে নৈর্ব্যক্তিকতা এর সহজাত। আমলাতন্ত্র কথাটির মধ্যে সেই যান্ত্রিক, নৈর্ব্যক্তিক সত্তা ধরা পড়ে না। প্রশাসনের কেন্দ্রে এধরনের একথা নৈর্ব্যক্তিক প্রতিষ্ঠান জায়গা দখল করে থাকলে, তার কাছে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের আশা-নিরাশা, সঙ্কট সমস্যার কথা পৌছয় না। সন্দেহ নেই যে স্বভাবধর্মে যতই যান্ত্রিক হোক না কেন, আসলে কিছু উচ্চশিক্ষিত মানুষদের নিয়েই এটা তৈরি। তাদেরও ব্যক্তিজীবন আছে, সমাজজীবন আছে। কিন্তু শাসনযন্ত্রের মধ্যে থেকে তার সঙ্গে একাকার হয়ে গিয়ে, সমাজের মৌল জীবনস্রোত থেকে তারা বিচ্ছিন্ন। এবং এই বিচ্ছিন্নতা এমন একটা মানসিকতার জন্ম দেয়, যেখানে সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা, আবেদন-নিবেদন কোনো সাড়া জাগাতে পারে না। ইংরাজিতে আমলাতন্ত্রের বর্ণনায় যে "স্টিল ফ্রেমের" ধারণাটি প্রায় প্রবাদে প্রচলিত তার থেকে যথাযথ কথা বোধহয় নেই।

কথাটা এমন নয় যে আমলাতন্ত্রের এই চরিত্র আমাদের অজানা। কিন্তু যে জিনিসটি সাধারণভাবে মানুষের নজর এড়িয়ে যায়, তা হলো কেমন করে এর উদ্ভব হলো এবং কিভাবেই বা সমাজের সচেতন মানুষের চোখের সামনে আমলাশাহীর বাড়বাড়ন্ত অপ্রতিহত থেকে গেল? ইতিহাসের ভাববাদী ব্যাখ্যায় যাঁরা বিশ্বাসী তাঁরা মনে করেন আমলাতন্ত্রের অবাধ ক্ষমতা ও কর্মদক্ষতা হলো সমাজ তথা রাষ্ট্র বিকাশের চরমোৎকর্ষ।

মধ্যবিত্ত মানুষের চিন্তা চেতনায় যেহেতু ক্ষমতা লোভ ও ক্ষমতা ব্যবহারকারী সম্পর্কে একটা বশম্বদ মনোবৃত্তি থাকে তাই মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মানুষের জীবনে সরকারের পদস্থ আমলা হওয়ার আকর্ষণ চিরকাল, সবদেশেই জোরালো। আর যে দেশে রাজনীতিতে মধ্যবিত্তের প্রাধান্য বেশি সেখানে বিপ্লবীরাও এই মানসিকতা থেকে মুক্ত নয়। সেখানে বিপ্লবীয়ানার চরমতম প্রকাশে সুদক্ষ প্রশাসকের দেখা মিললে, প্রশংসার বান ডেকে যায়।

অথচ সমাজবিকাশের বস্তুবাদী ব্যাখ্যায় এ ধারণা একেবারে গোড়াকার কথা যে, উৎপাদন ব্যবস্থার বিকাশের সঙ্গেসঙ্গে মানুষের কাজের ধরনে যে ভাগাভাগির সূচনা হয়েছিল তাই পরিণতিতে আমলাতন্ত্রের জন্ম দিয়েছে। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গেসঙ্গে উৎপাদন ব্যবস্থা যতই জটিল থেকে জটিলতর হতে শুরু করেছে, ততই কায়িক ও মানসিক শ্রমের মধ্যে ফারাক বেড়ে গেছে। পরিশেষে মানসিক শ্রমের সঙ্গে যুক্ত যারা তাদেরই একাংশ সমাজের ভাঙাগড়ায় প্রশাসন যন্ত্রের সঙ্গে অনিবার্যভাবেই যুক্ত হয়ে, নিজেদের ক্ষমতার কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এই প্রতিষ্ঠার যুগ মোটামুটি ধনতান্ত্রিক সমাজবিকাশের সঙ্গে যুক্ত। সামন্ততন্ত্রের অবসানে জাতীয় বাজার ও টাকার প্রচলনের সঙ্গেসঙ্গেই গড়ে উঠেছে আজকের আমলাতন্ত্রের বনিয়াদ।

নির্বাচন পরোক্ষ গণতন্ত্র আমলাতন্ত্রের জন্ম দেয় বহুল প্রচলিত ধারণা হলেও, ইতিহাসের বিচারে তা সঠিক নয়। প্রাচীন গ্রীসে, বিশেষত এথেন্সে দেখা যায়, রাষ্ট্রের মধ্যে যারা উৎপাদন ব্যবস্থার মালিকানা বজায় রেখেছে প্রশাসনের দায়িত্ব তারা নেয়নি। এমনকি নিজেদের শ্রেণীভুক্ত কাউকে নিতেও দেয়নি। সেখানে আমলাতন্ত্র গঠিত হয়েছে এই মালিক শ্রেণীর ক্রীতদাসদের নিয়ে। পরবর্তীকালে সামন্তযুগে কিন্তু এর পরিবর্তন হলো। কারণ সামন্ত নায়করা নিজেরাই স্বয়ং গ্রহণ করলেন প্রশাসনের দায়িত্ব কিংবা যাদের ওপর দায়িত্ব ছিল তাদের সামন্তসমাজের কাঠামোর মধ্যে সমগোত্রীয় করে নিল। আরো পরে দেখা যায় আমলারা হয়েছে সামন্ত প্রভুদের আজ্ঞাধীন বেতনভুক্ ভৃত্য। প্রাচীন গ্রীসের কাল থেকে সামন্ততন্ত্রের শেষকাল পর্যন্ত আমলাতন্ত্রের শেষ কাল পর্যন্ত আমলাতন্ত্রের যে ক্রমবিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, এক কথায় বললে হয়, তারা তখন চিরকালের কেনা গোলাম থেকে তখন মাইনে করা গোলামে রূপান্তরিত হয়েছে।

ধনতন্ত্রের যুগ আমলতন্ত্রের যুগ। এযুগেই লক্ষ্য করা গেল আমলারা একটা স্বতন্ত্র সামাজিক গোষ্ঠী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে চেয়েছে এবং পেয়েছে। তাদের লক্ষ্য তখন সমাজের শ্রেণীবিন্যাসের উপরে নিজের ঠাঁই করে নেওয়া। এবং সে কাজে সীমিতভাবে হলেও কিছুটা সাফল্য তারা লাভ করেছে। বুর্জোয়া সমাজে রাষ্ট্রক্ষমতা যেভাবে কেন্দ্রীভূত হয় এর আগে তা ছিল অভাবিত। আর এই কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার একচ্ছত্র প্রয়োগের অধিকার জমা হয় প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের হাতে। প্রশাসনকে মানুষ দেখতে থাকে একটা অতিমাত্রায় সচল ক্ষমতার যন্ত্র হিসেবে। ধনতান্ত্রিক সমাজের বিস্তীর্ণ কর্মকাণ্ডে প্রায় সবখানেই তার অস্তিত্ব কোথাও প্রত্যক্ষভাবে কোথাও বা পরোক্ষে। অথচ সমাজের নিয়ম-নীতিতে সেখানে চালু হয়েছে সার্বজনীন সাম্যের ধারণা। কিন্তু সাম্যের তত্ত্বটা যে নিতান্ত পোষাকী, তাকে আটপৌরে ব্যাপার করার সামান্যতম আগ্রহ যে কোথাও নেই এবং শ্রেণীগত কারণে থাকতেও পারে না, তা আড়ালে রাখতে হবে। অর্থাৎ শাসক ও শাসিতের মধ্যেকার মৌল পার্থক্যকে এমন কৌশলে আড়াল রাখতে হবে, যাতে শাসিত মানুষকে শাসকের দাপটে কম্পমান হয়েও মনে করার সুযোগ পায় যে, শাসক হওয়ার অধিকার তাদেরও আছে। এই বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে আমলাতন্ত্রের অবদান প্রচুর। তাকে এমন ধাপেধাপে নিচের থেকে ওপর পর্যন্ত স্তরভেদ করে সংগঠন করা হলো যেন তার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত মানুষই মনে করতে পারে যে, শাসন ক্ষমতার সে একজন শরিক। তা না হলে সরকারী অর্থ দপ্তরের কনিষ্ঠতম কেরানী দরিদ্র শিক্ষকের পাওনা টাকা আনতে গেলে তাঁকে দশবার ঘোরাতে পারতো না ক্ষমতার দম্ভে, পারতো না রাস্তার পাহারাদার পুলিশ ভিড় সরাবার জন্যে হাতের ব্যাটন চালাতে।

আমলাতন্ত্রের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো স্বয়ং সম্পূর্ণ চরিত্র। আধুনিক রাষ্ট্রের বিরাট কর্মকাণ্ডে প্রশাসনের সঙ্গে যারা যুক্ত নয়, তারা সকলেই কোনো না কোনো ভাবে অন্যের কাজের সঙ্গে জড়িত। অন্য অনেকের ভালোমন্দের সঙ্গে তাদের ভালমন্দ জীবিকার তাগিদেই যুক্ত। প্রশাসন বিভাগের ক্ষেত্রে একথা প্রযোয্য নয়। এই স্বয়ংসম্পূর্ণতা তাদের দিয়েছে স্বাতন্ত্র্য ও শক্তি। ধনতান্ত্রিক সমাজের সর্বত্রই এই চেহারা। এর কোনো ব্যতিক্রম নেই।

কিন্তু সঙ্গেসঙ্গে এটাও স্মরণীয় যে আমলাতন্ত্রের শক্তি ও দাপট সব

ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে একরকম নয়। বরং একথা বলাই অনেক সঙ্গত যে ধনতান্ত্রিক সমাজ যতো বেশি নিজের আন্তরকারণে দুর্বল। সেখানে আমলাতন্ত্রের শক্তিমদমত্ততা ততো বেশি প্রকট। সমাজের বিরাট অংশ যেখানে নিজের বাঁচার তাগিদে হাড়ভাঙা খাটুনিতে নির্জীব সেখানেই দেখা যায় একটা নিতান্ত ক্ষুদ্র অংশ মানসিক শ্রমে বিশিষ্টতা অর্জন করে প্রশাসনে নিজেদের ক্ষমতা কায়েম করে রেখেছে। তাই এক কথায় বলতে গেলে দেখা যাবে যে, সমাজের বিরাট অংশের বুদ্ধিগত দৈন্য থেকেই জন্ম নেয় শক্তি, পায় আমলাশাহী।

এ কথাগুলি বলেছিলেন এঙ্গেলস্। যে কোনো সমাজের সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতা থেকেই আমলাতন্ত্রের উদ্ভব। এবং সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতা যেহেতু ধনতন্ত্রে বিরাটসংখ্যক মানুষের স্বার্থের পরিপন্থী, তা যেহেতু শ্রেণীবিভক্ত সমাজে কায়েমী স্বার্থের প্রতিফলন ঘটায়, তাই আমলাতন্ত্র শ্রেণীবিভক্ত ধনতান্ত্রিক সমাজে প্রশাসনের সমস্ত ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার সুযোগ পায়। পক্ষান্তরে দেখা যায় যে, ধনতান্ত্রিক সমাজে স্বশাসনের অধিকার বুর্জোয়া কাঠামোর মধ্যেও যেখানে যতটা ব্যাপক ও প্রতিষ্ঠিত, সেখানে আমলাতন্ত্রের প্রভাব তুলনামূলকভাবে তত কম। তাই পুঁজিবাদী সমাজের মধ্যে বসে, পুঁজিবাদ বিরোধী হয়েও আমলাতন্ত্রের মধ্যে ঝাড়াই বাছাই করার চেষ্টা নিতান্ত বাতুলতা। তাছাড়া এর অন্তর্নিহিত বিপদ হলো অন্যদিকে এমন প্রবণতাও সৃষ্টি হতে পারে যেখানে আমলাতন্ত্র কাজে লাগানোর চেষ্টা হবে বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনে, যেমনটি ঘটেছিল আমাদের দেশে স্বাধীনতা-উত্তরকালে দুই দশকেরও বেশি কাল ধরে।

ধনতান্ত্রিক সমাজে একটা বিপ্লবী দল বা জনপ্রিয় শাসনব্যবস্থা তাহলে আমলাতন্ত্র সম্পর্কে কি দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করবেন ?

সোভিয়েত বিপ্লবের আগে লেনিন বলেছিলেন যে রুশদেশে এমন এক রাষ্ট্র গঠন করার জন্যে বলশেভিক দল ব্রতী যেখানে একজন রাঁধুনীও প্রশাসক হতে পারে। সমগ্র প্রশাসন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজার ব্যাপারে সুস্পষ্ট বলশেভিক নীতি না থাকলে এমন কথা নিঃসন্দেহে লেনিন বলতেন না। আর সেই নীতি ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মধ্যে মৌল পার্থক্যের নির্দেশক। ধনতন্ত্রে শাসনব্যবস্থার কাজ মানুষকে শাসন করা। আমলারা সে কাজেই পটু। তাদের নিয়োগ নীতি থেকে আরম্ভ করে কাজের নিয়ম কানুন, পাওনা

গণ্ডার হার হিসেব ও অবসর গ্রহণের পর পর্যন্ত সেই বিশিষ্টতার ছাপ সর্বত্র। মানুষকে শাসন করার বিশেষ কেরামতী অর্জন না করলে আমলা হিসেবে কর্মজীবনের শীর্ষে ওঠা যায় না। অন্যদিকে সমাজতন্ত্রে প্রশাসনের লক্ষ্য হলো সমাজের উৎপাদিত সম্পদের বণ্টন, নিয়ন্ত্রণ। শ্রেণীবিভক্ত ধনতান্ত্রিক সমাজে শ্রেণীস্বার্থ শাসনক্ষমতার মধ্যে নিজের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার তাগিদেই, মানুষের অবাধ্যতা সাম্যের দাবিকে চূর্ণ করার জন্যেই মানুষকে শাসন করতে চায়। অন্য দিকে সমাজতন্ত্রে শ্রেণীদ্বন্দ্বের অবসান হয়েছে বলেই মানুষকে শাসন করার কৌশল শেখাটা অপ্রাসঙ্গিক।

কিন্তু যে সমাজে ধনতন্ত্র এখনো জবরদস্ত সেখানে বিপ্লবী দল বা কোন জনপ্রিয় সরকার গঠিত হলে (যেমন পশ্চিম বাঙলায় যুক্তফ্রণ্ট সরকার) তখন কি হবে? প্রথমেই মনে রাখা দরকার যে, চাইলেই বা মিছিলে মিটিঙে দাবি করলেই আমলাতন্ত্রের ক্ষমতার সামান্যতম পরিবর্তন ঘটবে না। কারণ ধনতন্ত্রের সঙ্গে আমলাতন্ত্রের সম্পর্ক নিবিড়, প্রায় অঙ্গাঙ্গী।

তাই ধনতন্ত্রের অবসান না ঘটাতে পারলে আমলাতন্ত্রের অবসান ঘটবে না। অবশ্য ধনতন্ত্রের বিলোপ সাধন করলে আমলাতন্ত্রের অবসান ঘটবে, তেমন কথা সমাজতান্ত্রিক দুনিয়াতেও সত্য নয়। তবে নিশ্চয়ই তার সুপরিচিত চেহারাটা থাকবে না। এখানে ধনতান্ত্রিক দেশে বিপ্লবী দল ও জনপ্রিয় সরকারের লক্ষ্য হবে আমলাতন্ত্রের অবসানের জন্যে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। আর সেই সংগ্রামকে হতে হবে শ্রেণী-সংগ্রাম। সমস্ত শোষিত মেহনতী মানুষকে একত্র করে ঐক্যবদ্ধ করে এই শ্রেণী-সংগ্রাম পরিচালনা করার লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতে পারলেই আমলাতন্ত্রের চারিত্রিক পরিবর্তন সম্ভব। যেহেতু যে কোন সংঘর্ষই শ্রেণী-সংগ্রাম নয় তাই যে কোন জনপ্রিয় সরকার সংগ্রামের হাতিয়ার এই জিগির দিলেই আমলাতন্ত্রকে খর্ব করার লক্ষ্যের দিকে অগ্রগতি ঘটে না।

আমলাতন্ত্রের চারিত্রিক রূপান্তরের লক্ষ্য ও উদ্যোগ সম্পূর্ণ রাজনৈতিক। সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে তা যুক্ত। সমশ্রেণীর মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাতে তা কেবল পিছিয়ে যায় না, লক্ষ্যও বিপর্যস্ত হয়। আর সেই দ্বন্দ্বে যদি আমলাদের সহযোগী হিসেবে পাওয়া যায় তাহলে তো কথাই নেই। শ্রেণী-সংগ্রামকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কর্মসূচি ব্যাহত হলে, তা সে এক লাফে অনেক দূর এগিয়ে যেতে চাওয়ার জন্যেই হোক বা কোন সঙ্কীর্ণ রাজনৈতিক কারণেই হোক, আমলাতন্ত্র তাতে আরো জাঁকিয়ে বসার সুযোগ পায়। যেমনটি ঘটে চলেছে আমাদের সমকালের অভিজ্ঞতায়।

সাম্প্রতিক বাঙলাসাহিত্য কি প্রগতিশীল

সত্যপ্রিয় ঘোষ

এক

'প্রগতিশীল' শব্দটি বাঙলাদেশে সীমিত বিশেষ অর্থ পরিগ্রহ করেছে প্রগতি লেখক সঙ্ঘের উদ্ভবের পরে, অস্তরবির রশ্মি-আভায় বাঙলাসাহিত্যের পশ্চিম দিগন্ত তখনও রঙিন বটে কিন্তু পূর্ব দিগন্ত সন্দেহ-সংশয়ের মেঘে আবৃত ও বিষণ্ণ ; ধূর্জটিপ্রসাদের ভাষায় তখনকার "বাঙলা কবিতা ও কথাসাহিত্য বড় চাকরির দরখাস্ত লেখার শামিল হয়েছে। যাঁরা গরীব গৃহস্থের দুঃখে হা-হুতাশ করেন তাঁরা লোক ভালো, কিন্তু রোমান্টিক। আমাদের সাহিত্যসৃষ্টির পিছনে তথ্য, ঘটনা ও মূল্যজ্ঞানের কোনো যথার্থ তাগিদ নেই। যখন তা নেই তখন আঙ্গিকের কেরামতি ঝুটো মনে হয়। আগে জীবন সম্বন্ধে জ্ঞান আসুক, তার ওপর রূপসৃষ্টি হোক, তবেই প্রগতিশীল সাহিত্য রচনা হবে।" ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত প্রগতি লেখক সঙ্ঘের প্রথম গ্রন্থ 'প্রগতি'-র পৃষ্ঠায় ধূর্জটিপ্রসাদ এই কথা লিখেছিলেন তাঁর 'প্রগতি' শীর্ষক প্রবন্ধে। এর বছর দুই আগে প্রকাশিত প্রগতি লেখক সঙ্ঘের ইস্তাহারে ঘোষণা করা হয়েছিল, "বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদকে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করে প্রগতিকামী মননধারাকে বেগবান করা, এই আমাদের লেখকদের কর্তব্য।...আমরা চাই জনসাধারণের জীবনের সঙ্গে সর্ববিধ কলার নিবিড় সংযোগ ;...আমরা বিশ্বাস করি যে ভারতবর্ষের নবীন সাহিত্যকে আমাদের বর্তমান জীবনের মূল সমস্যা ক্ষুধা, দারিদ্র্য, সামাজিক পরাঙ্মুখতা, রাজনৈতিক পরাধীনতা নিয়ে আলোচনা করতেই হবে। যা-কিছু আমাদের নিশ্চেষ্টতা, অকর্মণ্যতা, যুক্তিহীনতার দিকে টানে, তাকে আমরা প্রগতিবিরোধী বলে প্রত্যাখ্যান করি। যা-কিছু আমাদের বিচারবুদ্ধিকে উদ্বুদ্ধ করে, সমাজব্যবস্থা ও রীতিনীতিকে যুক্তিসম্মতভাবে পরীক্ষা করে, আমাদের কর্মিষ্ঠ, শৃঙ্খলাপটু, সমাজের রূপান্তরক্ষম করে, তাকে আমরা প্রগতিশীল বলে গ্রহণ করব।" যে-চারিত্র বিধৃত হয়ে 'প্রগতিশীল' শব্দটি নতুন সংজ্ঞার্থ পেল তার পটভূমি ও পরিপ্রেক্ষিত ছিল মার্কসবাদ, নভেম্বর বিপ্লব, এদেশে কমিউনিস্ট ভাবধারার বিস্তার এবং কমিউনিস্ট পার্টি এদেশে নামে ওর অনেক আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেও কার্যত তখনই তার অঙ্কুরোদ্গম।

এরপর সাড়েতিন দশক ধরে এই শব্দটি অবিশ্রান্ত ব্যবহৃত হয়েছে এবং এখনও হয়ে চলেছে, অনেকের মতে ব্যবহৃত হয়ে; ব্যবহৃত-ব্যবহৃত-ব্যবহৃত হয়ে হয়ে হয়ে হয়ে শুয়ারের মাংস হয়ে গেছে, আবার অনেকের মতে আজও তা মূল্যায়ন পুনর্মূল্যায়নের মাধ্যমে অবস্থান নির্ণয়ের জন্য সজীব ও অর্থবহ আছে।

সাম্প্রতিক বাঙলাসাহিত্যের চরিত্রবিচারে এই বিশেষণটির জাত্যর্থ কতদূর প্রযোজ্য তা খতিয়ে দেখবার আগে, দুঃখের সঙ্গে এই কথাটা স্মরণ রাখলে ভালো হবে যে যে-বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের কষ্টিপাথরে যাচাই করে 'প্রগতি'-র অর্থকে উপর্যুক্ত ইস্তাহারে স্পষ্টতা দান করা হয়েছিল তা বাঙলাদেশে প্রগতি লেখক সঙ্ঘের প্রথম সভাপতি নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত-এর ন্যায় মনস্বীও দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নিতে পারেননি; 'প্রগতি'-সম্বন্ধে লোকচিত্তে যে চিরাচরিত, অনির্দিষ্ট, অস্পষ্ট ও অজ্ঞেয় ধারণা বলবৎ ছিল, শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে শব্দটির সেই ব্যক্তার্থের পরিবর্তন ঘটিয়ে, সুনির্দিষ্ট সব লক্ষণ ও গুণাবলীর দ্বারা গঠিত তার ঐ জাত্যর্থ তাঁর কাছেও স্পষ্ট প্রতীত হয়নি বলেই পূর্বোক্ত 'প্রগতি' গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখতে পেরেছিলেন, "প্রগতি ছাড়া সাহিত্যই হয় না।" মহত্ত্ব ছাড়া মানুষই হয় না এরকম দাবি করলে মনুষ্যসংসারে যে-পরিমাণ বিপদ দেখা দেবে, নরেশচন্দ্রের ঐ ধারণা সাহিত্যসংসারে যে ততটাই বিপদ ডেকে আনে একথা আমরা অনেকেই, আজকের দিনেও, প্রায়ই ভুলে থাকি বলেই কথাটা বিশেষভাবে বলতে হলো।

প্রগতির ধারণাকে যথাযথ ও সত্য করে তুলবার জন্য ধূর্জটিপ্রসাদ বৈজ্ঞানিক তথ্য, প্রতিষ্ঠানিক বা সৃষ্টিমূলক ঘটনা এবং দার্শনিক মূল্যজ্ঞান—এই ত্রিস্তর মনোভাব গঠনের অপরিহার্যতার কথা তাঁর পূর্বোক্ত প্রবন্ধে বলেছিলেন। এই মনোভাবের মধ্যদিয়ে যে-জীবনবোধের উন্মেষ ঘটে সর্বযুগে সর্বদেশে তা-ই প্রগতিশীল শিল্প-সাহিত্যের প্রাণ। কিন্তু ভাববাদীদের কাছে প্রগতির অন্তর্নিহিত এই প্রক্রিয়াটি কিছুতেই ধরা পড়ে না; সাহিত্য সম্পর্কে ধারণা ব্যক্ত করতে গিয়ে ভাববাদীরা বরাবরই এই বলে আরাম বোধ করেন যে সাহিত্য হচ্ছে বিশুদ্ধ হৃদয়ের অতীন্দ্রিয় এক অভিব্যক্তি, তার সর্বাপেক্ষা বড়ো দাবি এই যে সে সত্য কারণ সে জন্মলাভ করেছে, সে বৃহৎ না হতে পারে মহৎ না হতে পারে তবু সে যে আছে এইখানেই তার সার্থকতার প্রাথমিক সনদ পাওয়া হয়ে গেল। কিন্তু জীবনের দ্বন্দ্ব

এবং মূল তত্ত্বটি যাঁরা বোঝেন তাঁরা এই নিরালম্ব মায়াবাদে আচ্ছন্ন হন না, তাঁদের এই অপরিহার্য তথ্যটি ভুলবার জো নেই যে সৎ ও অসতের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই মানুষের সর্বপ্রকার মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটে, তাই পিশাচ ও দেবতা যে মানুষেরই দুই রূপ, পরস্পরবিরোধী রূপ, একথা সর্বদা ও সর্বথা খেয়াল রাখতে তাঁদের আটকায় না; গতি ও স্থিতির নিয়ত দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই যে প্রগতিও আসে আবার দুর্গতিও আসে—এবং শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এই বিজ্ঞানবুদ্ধি বিসর্জন দেওয়া চলে না বলেই যে সবিশেষ লক্ষণার্থে 'প্রগতিশীল' কথাটা সাহিত্যের বিশেষণ রূপে গৃহীত হয়েছিল তা প্রগতি লেখক সঙ্ঘের প্রথম সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী "বিশুদ্ধ হৃদয় নিষ্পাপ আদিম অবস্থার মতোই অবাস্তব" প্রভৃতি কথা বলে প্রাঞ্জল করতে চাইলেও তখনকার দিনে তো নয়ই, আজকের দিনেও কথাটা বহুজনের কাছেই এখনো স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। এবং উঠবে না, কারণ মনুষ্যসমাজের এক অংশ প্রাকৃতিক নিয়মেই চিরকাল, হ্যাঁ চিরকাল, অ্যান্টিথিসিসের পোষকতা করবে।

দুই

'সাম্প্রতিক' শব্দটির পরিধিও আগেভাগেই পরিষ্কার করে নেওয়া ভালো। যে-আর্থনীতিক ভিত্তির ওপর এই পশ্চিমবঙ্গে এখন আমাদের অবস্থান তার সূত্রপাতের কাল পর্যন্তই সাম্প্রতিকতার ব্যাসার্ধ টানা যেতে পারে, কিন্তু যেহেতু এই ভিৎ এখনও সর্বস্তরে সন্দেহাতীতভাবে সামন্ততন্ত্রের ভগ্নাবশেষ থেকে ধনতান্ত্রিক বিকাশের অধ্যায়ে উত্তীর্ণ হয়নি, যেহেতু মিশ্র অর্থনীতির টানাপোড়েনে এবং ক্ষতিপূরণ সহ জমিদারীপ্রথা বিলোপসাধন ও অন্যান্য জাতীয়করণের মধ্য দিয়ে এবং সর্বোপরি সর্বগ্রাসী বিপুলপরিমাণ বৈদেশিক ঋণের অক্টোপাস-বন্ধনে এদেশের উৎপাদনশক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্কগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধিত না হবার দরুন আমাদের পায়ের তলাকার মাটি এখনো অস্থির, অবক্ষয়ী অপচীয়মান সেহেতু দোদুল্যমান এই অন্তর্বর্তী সময়ের একটি ভগ্নাংশকে উপযুক্ত কাল-লক্ষণের নিরিখে পর্যালোচনা করা অযৌক্তিক হবে না। আলোচনার পরিধিটা ছোট করে নেবার জন্যেই ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কংগ্রেস-শাসনের অবসান অর্থাৎ এক অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ উপাঙ্গের উৎখাতের কাল থেকে প্রকটিত লক্ষণগুলির দিকে আপাতত দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখব।

অস্বীকার করবার উপায় নেই উত্তাল জলস্তম্ভ সদৃশ সেই রাজনৈতিক ঘটনাটি এদেশে ঘটল নিতান্ত অতিনাটকীয়ভাবে। হালের অধিকাংশ মাঝি ব্যাপারটির জন্য মোটেই তৈরি ছিলেন না, সচেতন ছিলেন না, ঘর একেবারেই গোছানো ছিল না। সব কিছু ঘটল এমন আচমকা, এমন হিসেবের ভুলের মধ্য দিয়ে, এমন এক-ঘণ্টার মধ্যে জনগণের থাপ্পড়-খাওয়া হাত-মেলানোর মধ্য দিয়ে যে সেই নতুন পালাবদলের সত্যিকারের উদ্বোধন-সঙ্গীত হতে পারত, "লক্ষ্মী যখন আসবে তখন কোথায় তারে দিবি রে ঠাঁই? / দেখ রে চেয়ে আপন-পানে, পদ্মটি নাই, পদ্মটি নাই।" নেই তো কী হবে, আঠারো দফা কর্মসূচীর এক কাগজের পদ্ম বানিয়ে বিপ্লবের লক্ষ্মীকে বসতে দেওয়া হলো। লক্ষ্মী অবস্থা দেখে তৎক্ষণাৎ পালিয়ে যেতেন হয়তো, কিন্তু তখন-তখনই পালানোর পথও ছিল বন্ধ, কারণ ঢেউ তখনও উত্তাল, চতুর্দিকে জনসমুদ্রের জোয়ার, সুতরাং ভাটির অপেক্ষায় একটু বসে যেতেই হলো। আমাদের কবি-কবি-গল্পলেখক-উপন্যাসিক-নাট্যকারেরা তখন কী করছিলেন?

তিন

প্রগতিশীল ভাবধারার বাহক এমন কোন দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক বা ত্রৈমাসিক বাঙলা সাহিত্যপত্র এখন পশ্চিমবঙ্গে আছে কিনা সন্দেহ যার নিয়মিত আগ্রহী পাঠকের সংখ্যা হাজার পেরোবে। কথা উঠতে পারে এই ধরনের কটি পত্রিকা আছে যা খাঁটি অর্থে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়?—ঠিকই, সংখ্যাটি খুবই ক্ষীণ হবে। এইসব পত্রিকার 'নিয়মিত পাঠক' বলে যাদের হিসেবের মধ্যে গণ্য করতে ইচ্ছে হয় তাদের মধ্যে একটু খোঁজ করলেই দেখা যায়, এমন গ্রাহক বেশ কিছু আছেন যারা আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের অনুরোধ-উপরোধে ঢেঁকি গিলেছে, হাতে বা ডাকযোগে পত্রিকাটা বাড়িতে এলে অনাদরে অবহেলায় সেটা এখানে-সেখানে পড়ে থাকে—নিতান্ত দৈবাৎ যদি-না পাশের বাড়ির কোনো তরুণ সাহিত্যপাগল সেটি কুড়িয়ে নিয়ে গিয়ে একান্তে আপন মনে বক্ষে ধারণ করে। বুকষ্টলে এই সব পত্রিকার বিক্রয় সংখ্যা দেড়-শো-দুশো হলেই সেসব পত্রিকার সংগঠকদের মুখে হাসি ফোটে—সাম্প্রতিক কালে এই হাসি যারা হাসতে পেরেছে তাদের অর্থাৎ তেমন পত্রিকার সংখ্যা গণ্ডাখানেক অন্তত হবে তো?

অবস্থাটা আরও শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায় যখন টের পাই বিজ্ঞাপন-

দাতাদের ভরসাই এইসব পত্রিকার বেশির ভাগেরই বড়ো ভরসা। তাহলে দাঁড়াচ্ছি কোথায়? বিজ্ঞাপন বন্ধ হলেই প্রগতিশীল ভাবধারার অধিকাংশ বাহক স্থাণু এবং মূক? প্রগতিশীল ভাবধারা উদ্দেশ্য রেখে বিজ্ঞাপনটা উপায় মাত্র হলে একেবারে হাল ছেড়ে দেবার মতো অবস্থা হয় না, কিন্তু অবস্থাগতিকে শেষে কখন যে বিলোমক্রিয়া ঘটে যায়, ঘোড়ার আগে গাড়ি জুতে উল্টোভাবে অবস্থান করি, উদ্দেশ্যটাই হয়ে যায় উপায় আর উপায়টা উদ্দেশ্য—চোখে আঙুল দিয়ে সেটা কেউ দেখাতে এলে অবিশ্যি ভীষণ রাগ লাগে। ক্ষেত্রবিশেষে বড়োজোর এই ভেবে সান্ত্বনা পাওয়া যেতে পারে যে উপায়টার একেবারে অপহ্নবই ঘটে যায়, দুটোই উদ্দেশ্যরূপে পরস্পরের পরিপূরক হয়।

বাঙলা সাময়িক পত্র-পত্রিকায় প্রগতিশীল সাহিত্য-প্রচারের এই হলো মোটামুটি একটা পরিলেখ।

আর লেখকদের খবর কী? এইসব পত্রিকায় লিখে দক্ষিণার প্রশ্ন তোলা অবান্তর ও হাস্যকর—কালেভদ্রে দু-একজন যদি দু-এক জায়গা থেকে হঠাৎ কিছু পেয়ে যান তো সেটা পড়ে-পাওয়া চৌদ্দআনার শামিল। নিতান্ত ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর মনোবৃত্তি যাঁদের আছে তাঁরাই এইসব পত্রিকায় লেগে থাকেন। কিন্তু তাঁদের সংখ্যা এখন এদেশে উৎসাহ-ব্যঞ্জক নয়।

এসব পত্রিকায় টাকার সুখ না থাকলেও ব্যবসাভিত্তিক সাহিত্যপত্রিকা-গুলিতে আজকাল টাকার ছড়াছড়ি। যেসব প্রতিষ্ঠান ও পত্রিকা সাহিত্যকে পণ্যদ্রব্য করে নাম কিনতে পেরেছে তারা আজকাল মনভোলানো চটকদার সাহিত্যস্রষ্টাকে তো বটেই, কানাখোঁড়া হাবাগবা সাহিত্যস্রষ্টাকেও পকেট-বোঝাই করে দিয়ে দিচ্ছে। বলাই বাহুল্য, ওরই মধ্যে ক্ষমতা যাঁর বেশি তিনি বেশি পাচ্ছেন। কিসের ক্ষমতা? লিখবার? সেটা বাদ দিয়ে নয় নিশ্চয়ই, কিন্তু মূল উদ্দেশ্য যেখানে ব্যবসা, সাহিত্যের মূল চারিত্র যেখানে পণ্য হিসেবে চাহিদা, সেখানে কেবল কলমের জোর অধিকদূর অগ্রসর করে না, আরো পাঁচরকম এমন ধরনের জোর সেই 'ক্ষমতা'-র তুল্যমূল্য উপাদান যেগুলির সঙ্গে কলমের দূরতম সম্পর্কও নেই।

পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি সমাজে সামগ্রিকভাবে এখন সেইসব লোকই লেখক বলে বিচার-বিবেচনার জন্য গণ্য হন যাঁরা প্রায় সকলেই এইসব ব্যবসাভিত্তিক পত্রিকার কোলে কোনো-না-কোনোভাবে আশ্রিত। খ্যাতির প্রসারিত ক্ষেত্র

এবং নগদ বিদায়ের নিরুপায় প্রয়োজনের কারণ দর্শিয়ে এইসব পত্রিকার কিছু লেখককে ক্ষেত্রবিশেষে ম্লানমুখে এই খেদোক্তি করতে শোনা যায় যে, যদি অনুরূপ ক্ষেত্র এবং মোটামুটি একটা গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা প্রগতিশীল পত্র-পত্রিকা দিতে পারত তাহলে তাঁরা ওদিক থেকে এদিকে অবিলম্বে চলে আসতেন। অর্থাৎ এঁরা যাঁরা প্রগতিশীলতার বিবেকদংশনে এখনও ভুগছেন অথচ অবস্থাবিপাকে টাকার ফেরে পড়েছেন এবং মুনাফাবাজদের সেবাদাসত্ব করতে বাধ্য হচ্ছেন তাঁরা প্রগতিশীলতাকে জীবনের 'উদ্দেশ্য' রূপে তবেই বরণ করতে পারবেন যদি তা জীবন-যাপনের 'উপায়' হয়ে দেখা দেয়।

সাম্প্রতিক কালে সমাজজীবনের সর্বক্ষেত্রে মূল্যবোধ ও স্থির আদর্শ এমন-ভাবেই বিপর্যস্ত হয়ে গেছে যে, বিবেকদংশনের এই জ্বালাও আজকাল খুব কমসংখ্যক লেখক বোধ করছেন। অধিকাংশই প্রায় নিরঙ্কুশ হয়ে গিয়ে ঝুট ঝামেলা ঝেড়ে ফেলে 'প্রগতিশীলতা' শব্দটিকে আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করেছেন এবং যা-কিছু করছেন বলছেন লিখছেন সবই ড্যাঙড্যাঙিয়ে বুক ফুলিয়ে, 'উপায়'-টাকেই জীবনের প্রথম ও শেষ কথা বলে ঘোষণা করে।

এদিকে প্রগতিশীল নামে যেসব পত্র-পত্রিকা চিহ্নিত সেগুলির সঙ্গে যেসব লেখক জড়িত আছেন তাঁদের মধ্যে তো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে—অল্প কয়েকজন বাদে অধিকাংশের মধ্যেই—কেবলই হা-হুতাশ, কী-যেন ব্যর্থতার জ্বালা, কী পাইনি তার হিসাব মেলাতে সর্বদাই রাজী, যার ফলে তাঁদেরও প্রগতিশীলতা বচনসর্বস্ব ও প্রচারসর্বস্ব হয়ে যায়, নিজেদের গণ্ডির মধ্যেও তা আস্থা সৃষ্টি করে না, অপরকে প্রেরণা দেয় না; ক্ষুদ্র গণ্ডিকে ক্রমশ প্রসারিত করে নেবার বদলে তা আত্মসংকোচনে পীড়িত হয় পিষ্ট হয়। '৬৭ সালের পূর্বকথিত কাগজের পদ্মকে তাই সাহিত্যের জমিতেও তাঁরা হৃদয়ের পদ্ম দিয়ে প্রতিস্থাপন করতে পারলেন না। কেবলই সন্দেহ সন্দেহ সন্দেহ, সকলকে সকলের সন্দেহ, কে কোন রাজনৈতিক দলের সমর্থক তাই নিয়েই সমস্ত কোঁদল সমস্ত কানাকানি হাসাহাসি সমস্ত বিচার ও সমস্ত সিদ্ধান্ত—অথচ বিশবছরের শুকোতে-থাকা মরা নদীর বুকে জীবনের যে বন্যা উত্তাল হয়ে প্রতিফলিত হচ্ছিল জনগণের চোখে-মুখে-আচরণে, জনসভা ও মিছিলগুলিতে, তা দৃষ্টি এড়িয়ে যাবার মতো ব্যাপার তো ছিল না।

অল্প কয়েকজন অবশ্যই আছেন, সকল বয়সের মানুষই আছেন তাঁদের মধ্যে, যাঁরা জনজীবনের মূল সমস্যা—ক্ষুধা, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, রাজনৈতিক

অচেতনতা ও সংগঠনহীনতা, শ্রেণীবৈষম্য, খেত-খামার ও কলে-কারখানায় সহযোদ্ধাদের মধ্যে অনৈক্য, নিয়তির প্রতি অন্ধ বিশ্বাস, ধর্মীয় কুসংস্কার প্রভৃতি সমাধানের মধ্যেই সাহিত্যের প্রগতিশীলতার চিরায়ত ধারার সন্ধানে নিরত আছেন। কোনটা ভালো কোনটা মন্দ, কে শত্রু কেই বা মিত্র, কী আমাদের পেছন দিকে টানে কীই বা আমাদের সম্মুখ পথে এগিয়ে দেয়, কেন নিশ্চেষ্টতা অকর্মণ্যতা যুক্তিহীনতা প্রগতিবিরোধী বলে প্রত্যাখ্যানের যোগ্য তা এঁরা দিনরাত মোটামোটা পুঁথির মধ্যে সন্ধান না করে নিজেদের জীবনে নিজের চোখে নিজের বুদ্ধিতে বুঝবার চেষ্টা করছেন ; সেই চেষ্টায় তাঁরা কবিতা গল্প নাটক গান সবই লিখছেন। কী তাঁদের নাম, কোন পত্রিকায় কবে কোন লেখায় এইসব লক্ষণ ফুটেছে তা জানবার প্রত্যাশা খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু এই প্রত্যাশা পূরণের একমাত্র উপায় স্বীয় অনুসন্ধান, নামের কোনো তালিকা আমি এখানে এখন নাই-বা পেশ করলাম।

চার

এটা দুর্ভাগ্যেরই কথা যে সাম্প্রতিক কালে বাঙলাদেশে এমন লেখক খুঁজে পাওয়া মুশকিল যিনি বা যাঁরা একক প্রচেষ্টায় সাম্প্রতিক উচ্ছন্নদশার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত প্রতিভার দ্যুতিতে সকলকে ছাপিয়ে প্রগতির উজ্জ্বল মশাল তুলে ধরতে পেরেছেন। প্রায়ই একটা আক্ষেপ শোনা যায় আমাদের সাহিত্যে যদি একজন গোর্কি জন্মাতেন! কিন্তু এ আক্ষেপ করে কী হবে, রুশ সাহিত্যও কি দু-জন গোর্কি পেয়েছে ? একজন গোর্কি এলে একাই একশোর কাজ হয় সত্যি বটে, কিন্তু তেমন একজনের অবর্তমানে যদি একশোজন সংশপ্তককে পাই তবে বাঙলাসাহিত্যের পথের দিশা ঠিকই থাকবে।

অথবা, এই পথের দিশা ঠিক রাখার জন্যই যেমন একজন মধ্যবয়সী গল্পলেখক অসীম রায় বছরখানেক আগে পরিচয় শারদীয় সংখ্যায় গল্প লিখেছেন 'ধোঁয়া ধুলো নক্ষত্র' ঃ "রতন নিজেকে আর ফেলুকে দুই বিপরীত ধারা রূপে দেখতে পায়। সে আর ফেলু, ইস্কুলে পড়ানো আর ওয়াগান ভাঙা, এই দুটোই রাস্তা। এ-দুটো মূল্যবোধের কোনটা জয়ী হবে শেষ পর্যন্ত ?' এই প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে লেখক বর্তমান ক্ষয়িষ্ণু সমাজের রূপান্তরসাধনে নিযুক্ত বিপ্লবীদের কাছে প্রতিবিপ্লবী আত্মহননের যে সর্বনাশা দিকটি তুলে ধরেছেন তা জনজীবনের একটি মূল সমস্যাকে প্রগতিমুখী করতে সাহায্য করেছে বলেই গল্পটি প্রগতিশীল

বলে স্বীকার্য। অথবা, উল্লেখ করা যায় বছর দেড়েক আগে লেখা একটি নাটকের, লিখেছেন একজন প্রৌঢ় নাট্যকার ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়; নাটকটির নাম 'কল্মাষপাদ', বাঙলাদেশের নাট্য-আন্দোলনে যে বিচ্ছিন্নতাবাদ, অজ্ঞাবাদ, অর্থহীনতাবাদ অতিপ্রাকৃতবাদ, নিয়তিবাদ, অধিবাস্তববাদ, স্বভাববাদ এবং অতিবিপ্লবী হঠকারিতা জনমনে বিষক্রিয়া করছে তার বিরুদ্ধে পাভলভ ইনস্টিটিউট নাট্যসংস্থার এই নাটক বারংবার অভিনয়ের মধ্য দিয়ে জনজীবনের যথার্থ পথনির্দেশে খুবই সহায়ক হবে; প্রতীকধর্মী এই নাটকের প্রধান দুটি চরিত্র — একজন নাট্যকার, অন্যজন পাতালপুরীর কুবের ট্রাস্টের এজেন্ট তথা অন্তরীক্ষ নাট্য-কনট্রোল কমিশনের চেয়ারম্যান মিস মুখার্জীর মধ্যে কিছুটা সংলাপ এখানে উদ্ধৃত করছি :

"নাট্যকার—আজ্ঞে, না বোঝার মতো দুর্বোধ্য করেই বলব। — জীবন আর শিল্প, সত্তা আর চেতনা, আর্তি' আর বেদনা নিয়ে এমন গোলক-ধাঁধার সৃষ্টি করব যে অতি বড়ো প্রোগ্রেসিভও বুঝতে পারবে না যে তার সামনেটা পেছনে না পেছনটা সামনে। অস্তিবাদ-নাৎসীবাদ, স্বস্তিবাদ-বস্তিবাদ, সৌম্যবাদ-সাম্যবাদ মিলিয়ে সমন্বয়ের শ্রীক্ষেত্র বানাব। পিকিং-প্যারি, মস্কো-ওয়াশিংটন, বার্লিন-লণ্ডনের আমদানী মাল মিশিয়ে এমন নাট্য-চচ্চড়ি পরিবেশন করব যে দর্শকরা না বুঝে বাহবা দেবে, সমালোচকরা না চেখে তারিফ করবে, সম্পাদকরা না দেখে লিডার লিখবে।

[নেপথ্যে অভিনেতারা প্রতিবাদ জানাতে দাঁড়িয়ে মুখোশ পরল।]

মিস মুখার্জী— সাধু! সাধু! সময়ের স্রোতকে আমরা উল্টো মুখে ফেরাব ঈগলকে আমরা ডানা কেটে মাটিতে নামাব। অধ্যাপকরা এ নিয়ে থিসিস লিখছেন।

নাট্যকার— অহো! প্রলাপের বায়না পর্যন্ত দিয়ে ফেলেছেন। তাহলে প্রলয় রুখেই গেছে ধরে নিন।"

একজন গোর্কি একজন বিদ্যাসাগর একজন রোলাঁ। একজন রবীন্দ্রনাথ কবে-উদয় হবেন, হলেই আমাদের চলা শুরু হবে নয়তো শুয়ে-বসে হাই তুলব আর তুড়ি দেব এবং কেউ তাড়া করলে পেছন ফিরে দৌড় দেব এবং নিরাপদ দূরত্বে পৌছে এইই জীবন এইই জীবন বলে উচ্চিংড়ের মতো নাচতে থাকব আজকাল এটাই যেন আমরা স্বতঃসিদ্ধ ও অনিবার্য বলে মেনে নিয়েছি।

এ-কথা কেন আমাদের মনে থাকে না যে এক-যে-ছিল-রাজার যুগেও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক ছিল সাধারণ মানুষ, তখনকার দিনে রাজার গুরুত্ব বা ব্যক্তিবাদ প্রগতির বিরুদ্ধশক্তি ছিল না বটে কিন্তু সমাজচরিত্র সম্পূর্ণভাবে বদলে গিয়ে ব্যক্তিপূজা এখন তো প্রগতির প্রধানতম এক প্রতিবন্ধক; এখন একা-মানুষের দিন আর নেই এখন একশো মানুষের দিন।

কিন্তু একশো মানুষের সৃষ্টিশক্তি সঙ্ঘশক্তি গড়ে উঠবে যাদের নিয়ে তারা আজ ছন্নছাড়া সৃষ্টিছাড়া। রাম বসুর ভাষায় বলা যায় যা তিনি হো চি মিনের মৃত্যুর পর সেই মানুষটির জীবনচারণের পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের ঘরের দিকে তাকিয়ে প্রবল বিক্ষোভে লিখেছেন:

"ঘরে
এক ক্লান্ত ইতিহাস, জানি
ক্লিন্ন কোঁদলের পাঁচালি খেউড়
একান্নবর্তী কোন নিম্নবিত্ত পরিবার যেন
জীবন্ত নরক,"

সেই একই প্রসঙ্গে সতীন্দ্রনাথ মৈত্রও তুলে ধরেছেন সেই একই ক্লিন্ন চিত্র:

"কেউ আজ কারো চেয়ে এতটুকু কমে
রাজী নয়;
প্রত্যেকেই ছুরি খুলে ধরে;
সব চেয়ে বিস্ময়,
হো এখানে প্রতিদিন মরে।"

এই যখন অবস্থা, তারই মধ্যে প্রগতির পথে অগ্রসর হবার অঙ্গীকার যারা নিয়েছে, কিছুতেই যারা হাল ছাড়তে রাজী নয় তারা গ্রামে-গঞ্জে-শহরে খেতখামার-কলকারখানা-দপ্তরখানায় হাটে-ঘাটে-বাটে নিভৃতে-মিছিলে-সভায় কেমন করে একশো মানুষ হয়ে উঠবে সেই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে না এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। কিন্তু সমস্ত প্রচেষ্টাই চলছে বিচ্ছিন্ন-ভাবে, দানা বেঁধে উঠবার কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না এখনো পর্যন্ত। এমনি এক বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার কথা বলা যায়, গতবছর জুন মাসে মহাজাতি সদনে এক সম্মেলন হয়েছিল, প্রগতিশীল আদর্শে বিশ্বাসী শিল্পী-সাহিত্যিকদের মধ্যে সমন্বয় ও সংহতিসাধনের উদ্দেশ্যে সমমেলভিত্তিক একটি মিত্র সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখবার জন্য দুইদিনব্যাপী সেই সম্মেলনে যে-

প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল আর মধ্যে ছিলঃ "পশ্চিমবাঙলার সমুদয় বিচ্ছিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলো এবং তাদের একক প্রচেষ্টাগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করা প্রয়োজন। কারণ, আমাদের সংগ্রামী ঐক্য যত বৃদ্ধি পাবে ততই আমাদের প্রতিপক্ষ অর্থাৎ বর্তমান সমাজব্যবস্থার ধারক ও পোষক শক্তিগুলো ততই দুর্বল হবে। পূর্ববর্ণিত সাংস্কৃতিক কার্যক্রম যাদের লক্ষ্য, সেইসব প্রতিষ্ঠান ও কর্মীর নিকট এই সম্মেলন একটি ঐক্যবদ্ধ সাংস্কৃতিক মোর্চা গঠন করার আবেদন জানাচ্ছে।"

কিন্তু ঐ প্রস্তাব পর্যন্তই, কাজে কিছুই হয়নি। প্রস্তাব নিচ্ছেন, এমনি আবেদন জানাচ্ছেন, এর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করছেন, মুখে বলছেন, কাগজে লিখছেন — এরকম লোক বা ছোটো-বড়ো সংগঠন বা পত্রিকাগোষ্ঠী বাঙলা-সাহিত্যক্ষেত্রে আজ নিতান্ত কম নয়, কিন্তু আমরা এখনো যে এ-বিষয়ে আশ্বস্ত হবার মতো কিছু করে উঠতে পারিনি তা আমাদের দুরবস্থাই সূচিত করেছে। একথা খেয়াল রাখলে বাঙলাসাহিত্য এখন প্রগতিশীল আদর্শে বহমান আছে, এ-দাবি তোলার কোনো যুক্তি নেই।

এ-অবস্থায় সাড়ে তিন দশক আগে প্রগতি লেখক সঙ্ঘের ইস্তাহারে বিধৃত একটি স্বপ্ন পুনরায় স্মরণ করতে ইচ্ছে হয়ঃ "আমরা চাই জনসাধারণের জীবনের সঙ্গে সর্ববিধ কলার নিবিড় সংযোগ; আমরা চাই যে সাহিত্য প্রাত্যহিক জীবনের চিত্র ফুটিয়ে তুলুক, আর যে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা আমরা করছি তাকে এগিয়ে আনুক।"

"কিন্তু তরুণ তো শুধু স্বপ্ন দেখে না"— লিখেছিলেন হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১৯৬৮ সালে সপ্তম পশ্চিমবঙ্গ যুব-উৎসবের স্মারকপত্রেঃ "স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করার কাজে সে নামে, সহজ স্বাভাবিক উদ্দীপনা নিয়ে। এই কাজেই দেশের যুবসমাজ আত্মনিয়োগ করবে — অধৈর্যের আতিশয্য মাঝেমাঝে ঘটুক না কেন, সত্য পথের সন্ধান সে পাবেই।"

অতএব কে আছ জোয়ান, হও আগুয়ান, হাঁকিছে ভবিষ্যৎ!

শত্রু

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

দিনের জঙ্গলে ওকে তাড়া করি আতিপাতি খুঁজি
রাত্রে ও-ই পিছু নেয় আমাদের

সমস্ত সকাল আমরা নিশানে ফেস্ট্‌নে রক্তচোখ
হুঁশিয়ার দিই
অখণ্ড দুপুর আমরা পোস্টারে ও দেয়ালের অব্যর্থ লিখনে
মোড়ে মোড়ে নক্‌শা আঁকি ওর
হিংস্র দাঁত-নখ
প্রখর চতুর একটা মন
আরো ভয়ঙ্কর একটা করুণ-মধুরে মেশা হাসি
অতএব যে-বা-যারা জীবন্ত কি মৃত ধরবে
যে-বা-যারা শিকারী কি অন্তত সন্ধান দেবে
দু-লক্ষ টাকার চেয়ে বেশি তাকে দু-লক্ষ বছর পরমায়ু
দিয়ে যাব
সমস্ত বিকেল আমরা টলাই মিছিলে টানা লম্বা দু-মাইল
ধিক্কারে হুঙ্কারে রৌদ্র বল্লমে টাঙ্গিতে সূর্য
জেলে নিয়ে যুদ্ধযাত্রা।
পরে বাড়ি ফিরে একা সন্তর্পণে দোর দিই
পুঙ্খ পুঙ্খ খুঁজি চতুর্দিক
সমস্ত আলো ও সব অন্ধকার নেড়েচেড়ে দেখি
কোনোখানে ওত্‌ পেতে আছে কি জন্তুটা

ওটা ওত্‌ পেতে থাকে ভেতরে-ভেতরে
স্বপ্ন মগ্নচেতনাকে
ক্ষণে ক্ষণে নখ দিয়ে ভীষণ আঁচড়ায়

দাঁত দেখায়, লাঙুল আছড়ায় বুকের ওপর বসে
ফোঁসে
বুকচাপা দুঃস্বপ্ন ধরে পাঁচ-আঙুলে গলা
গর্‌র্‌-গর্‌র্‌ শব্দ তোলে বলে রোসো, বলে
রোসো
আর কী আশ্চর্য হাসতে থাকে বেল্লিকের হাসি
তারপর গলির মোড়ে ভাইকে ভাই ছুরি
কালকের বন্ধুকে আজ বোমা
সব জিন্দাবাদ সব গলাগলি বন্ধুত্বের মুখে অ্যাসিড বাল্‌ব
উপহার দিচ্ছি দেখে কেমন ফিক্‌ফিক্‌ হাসি হাসতে হাসতে
হিহি-হোহো হাসতে হাসতে
কুট্‌পাট কুট্‌পাট হেসে গড়াতে গড়াতে একসময়
গলাটি জড়িয়ে দেখি আমারই মনের মধ্যে মন হয়ে ঘুমোচ্ছে জন্তুটা

রাত্রে ও-ই মূর্তি নেয় আমাদের
দিনের জঙ্গলে যাকে তাড়া করি আতিপাতি খুঁজি।

কানামাছি

রাম বসু

একটুও কাঁপে না হাত
ছোরা রড মলটোভ ককটেল
নিরুত্তাপ মুখ
দৃঢ় চোয়ালের হাড়
চোখে ছানি

স্থানু দৃশ্যপট
হাত একটুও কাঁপে না
সোরগোল নেই

কেবল কিঞ্চিৎ ধোঁয়া
শব্দ
অন্তিম চিৎকার

আনি মানি জানি নে
ঘরের ছেলে মানি নে
কানা মাছি ভোঁ ভোঁ
যাকে পাবি তাকে ছোঁ

চোখে ছানি
হাতে ছোরা
রক্তাক্ত সময়

মাটিতে লুণ্ঠিত লাশ
হিম দেহে জেগে আছে ছুরি

নিভে যায় পড়শিদের সতর্ক জটলা
পুনরায়
সাজানো সংসার, সাজা, সিনেমা, বোনাস
পুনরায় ঘুষ-খোর মিছিলে সংগ্রামী
রোঁয়া-ওঠা ঘেয়ো দৃশ্যপট

আমাদের সরুগলি মাঝরাতে সটান দাঁড়ায়
হাঁটে কালপুরুষের মতো
রাগে ক্ষোভে ছেঁড়ে চুল
হাঁটে মহাজাগতিক দেহ
বিষণ্ণ বিবরে

চুপ করে থাকি
কথা নিরর্থক
সব কথা বাসি পচা মাংস হয়ে গেছে
যতই বোঝাতে যাই ভুল বোঝে ততই সবাই

মনে হয়
স্তব্ধতাই অমোঘ ভাষণ
অনুভব
বিধবা মায়ের মতো একমাত্র রুগ্ন পাংশু শিশুর শিয়রে
জেগে থাকে প্রদীপের আলোর তলায়

শূন্য বুকে ধাক্কা দেয় হাওয়া
নক্ষত্রের আলো গাছ পাখিখানি, সব
মানুষের উত্তরাধিকার
তার, সার্থকতা ব্যর্থতা, সমস্ত
জটিল রহস্য বলে এক হয়ে গিয়ে
বঙ্গোপসাগর
আটা.পাড়া লেনে
জানলার গ্রীল ধরে ডাকে ঃ
রাম, রাম, তুমিও ঘুমালে ?

আমি জেগে আছি ভাই
নৈশ-নির্জনতা
বসে আছে কপালের আহত গোলাপে
প্রবালপুঞ্জের গন্ধ সর্বাঙ্গে এখনো
এখনো শিকড়ে জল চাতকের চোখ

আমি জেগে আছি ভাই
মুখে নিয়ে ঝঞ্ঝা আর বনতুলসীর স্বাদ
ছিন্নভিন্ন, তবু
প্রসারিত করেছি নিজেকে
মুখ দিয়ে রক্ত তুলতে তুলতে এখনো বলছিতো ঃ
আবিলতা স্বভাবের স্বাভাবিক ক্রিয়াভূমি নয়
সততা ও সন্ধান থাকলে
ফিরতেই হবে মধুমূলে।

চিতা

শঙ্খ ঘোষ

আজ সকাল থেকে কেউ আমাকে সত্যি কথা বলে নি
কেউ না
চিতা, জ্বলে উঠো

সকলেরই চোখ ছিল লোভে লোভে মণিময়
মুখে ফোটে খই
চিতা, জ্বলে ওঠে

যা, পালিয়ে যা —
বলতে বলতে বেঁকে যায় শরীর
চিতা

একা একা এসেছি গঙ্গায়
জ্বলে ওঠো

অথবা চণ্ডাল
দেখাও যেভাবে চাও সমীচীন ছাইমাখা নাচ !

এই আশ্বিনে

মোহিত চট্টোপাধ্যায়

আমরা রয়েছি কাছাকাছি, দেখাশুনো তবু ঢের বাকি
চোখের ভিতর তাই একটি মনের মতো চোখ এঁকে নেব।
তাহলে সঠিক পথ হয়তো হৃদয় থেকে শুরু হবে ;
দেখা যাবে, দূরের নদীটি আছে করতলে শুয়ে।

জল কুড়াবার মেলা ; মাথায় সাজানো ঘট কারা যেন হেঁটে যায় দূরে
তেমন দেখিনা মুখ, রৌদ্রহীন কি যেন আড়াল করে আছে ;
কি যেন বাতাস হয়ে এসে হৃদয়ে খানিক থেকে চলে যায়
তেমন দেখিনা তারে কেমনে বসাব এনে ঘরে—
চোখের ভিতর তাই একটি মনের মতো চোখ এঁকে নেব।

ঐখানে কাশবনে ওরা কি ভীষণ হেসে উঠেছিল এই আশ্বিনে ?
কুড়ায়ে পেয়েছে নাকি হৃদয়ের সাথে প্রিয় হৃদয়ের খেলা ;
ভালোবেসে এই মাটি, চিনেছে কি কোন সোনা খাঁটি ?
ছিলনা ফাল্গুন তবু উড়ায়েছে বসন্তের ফাগ ?
বাতায়ন ছিল তবু রৌদ্রহীন কি যেন আড়াল ক'রে থাকে
এ-কেমন দৃষ্টিপাত ? কার মুখ চিনে নিয়ে কার সাথে পথ চিনে নেবো
চোখের ভিতর তাই একটি মনের মতো চোখ এঁকে নেব ।

একদিন

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

মানুষের ভালোবাসা মানুষের কাছে ছিলো দামী
একদিন, সুস্পষ্ট গন্ধ ছিল তার সন্ন্যাসী গুহায়
অর্থাৎ হৃদয়ে ঘ্রাণ, মনঃপ্রাণ ভক্তের প্রণামী
নিতেও উৎসুক ছিল, চারিদিক আত্মহত্যাকামী
আজ, কেন ? কী কারণে ? জেনেও নিশ্চিন্ত সুবিধায়
মানুষ লুকিয়ে থাকে ঘাস হয়ে মনের গভীরে···
সাড়াহীন, শ্রুতিবদ্ধ, প্রজড় জীবিতমাত্র প্রাণে
মানুষই ছুটেছে দেখি মৃত্যুর নিষ্ঠুর অনুষ্ঠানে
সারবদ্ধ পোকা যেন বাদলের, তাড়িত বিষের
কিংবা তারো চেয়ে নীল, শোণপাংশু, মালিন্যের হীরে—
মানুষ ? মানুষই তাকে বলা যায়, অন্যকিছু নয় ।
উৎকৃষ্ট বিশ্বাস নিয়ে জন্মে যদি শিশুর হৃদয়,
এখনো আমার দেশে, তার কানে-কানে বলি আমি ঃ
মানুষের ভালোবাসা মানুষেরই কাছে ছিলো দামী
একদিন !

জবানবন্দী, আমার নিজস্ব ধরণে

শিবশম্ভু পাল

কে আর সম্পূর্ণ বলো, বশীভূত পাখিটাকে অহেতুক দোষ দিওনাকো।
স্বাধীনতা কিছু নয়, কম্পিত বিস্তার অব্দি সীমায়ত সোনার পিঞ্জর
বৈজয়ন্তী একবার দুর্গশীর্ষে ওড়ানোর পর
সেই ফের নেমে আসা, শেকলভাঙার রক্ত ক্রমে ক্রমে হয়ে যায় মসৃণ গার্হস্থ্য
বাবুয়ানা।
থামতে হবেই, কেউ আগে কিম্বা কিছু পরে···কেউ কিছু স্ফুলিঙ্গের মতো
উড়ে গিয়ে শূন্য হতে চায়না কখনো।
সুতরাং এই বেশ, মাত্রাবৃত্ত শ্বাসাঘাত পয়ারের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মেনে
নিয়ন্ত্রিত অক্ষরের পরে জমিদারী!

অথচ বারুদচাপা বর্ণচোরা হতে হবে প্রতিটি শব্দকে
শুধু একটু আগুনের কণা যদি চক্ষু থেকে সংবেদনা থেকে
লেগে যায়, বিস্ফোরণ, জ্বলে পুড়ে ছাই হবে কর্বুসিওরের স্বপ্ন সাজানো শহর
অনির্বাচ্য অশান্তির তেজস্ক্রিয় হাওয়া
জনে জনে এনে দেবে দুরারোগ্য বিশুদ্ধ অসুখ।
অথচ খাঁচার পাখি বারবার অরণ্যের সমুন্নত মাথার ওপরে
গম্ভীর বিশাল নীলে মেশাবে মুমূক্ষা ব্যথাজর্জরিত পক্ষ বিধূননে
যেমন অরণ্যচর পাখিও চেয়েছে তার শুভ্র সহযোগ।

শৌখিন উড়নচণ্ডী স্বেচ্ছাচারিতার
শব্দনির্যাতন যার ভালো লাগে সে আমার শত্রু নয় মিত্র নয়,
বড় জোর আজব সংবাদ ;
আমি জানি উড়ে গিয়ে কেউ কিছু স্ফুলিঙ্গের মতো
শূন্য হতে চায়নাকো, সেই ফের সমাজের দরদের কাছে
করজোড়ে আসতে হয় সঙ্গে নিয়ে বর্ণচোরা অক্ষরের অগ্নিময় বাণ
অন্য এক জন্মমৃত্যু দেয়া নেয়া করা ছাড়া গতি নেই, তাই
সেদিকেই যেতে চাই অসম্পূর্ণ বশীভূত বিহঙ্গের সীমাবদ্ধতায়
ছন্দের করদরাজ্য যথাসাধ্য প্রশাসিত রেখে।

শ্রেণীশত্রু

অমিতাভ দাশগুপ্ত

দশ দিনের আঁতুড়ে নুন খাইয়ে মেরেছিলে।
তুমি আমার মা।
পানের ভেতর হীরেকষ মিশিয়েছিলে।
তুমি আমার স্ত্রী।
আলিঙ্গনের সময়
লাফিয়ে ওঠা হৃৎপিণ্ডে
গেঁথে গিয়েছিল ছুরির শার্পলাইন।
তুমি আমার ভাই।

দু-কান-চাপা কমলালেবু নয়,
ভূগোলের চেনা পৃথিবী
শার্শি ভেঙে বোমা হয়ে ঢুকেছিল আমার ঘরে,
ডুগ্‌ডুগি বাজাবে ব'লে
আমার ছ-খানা পাঁজর খুলে নিয়ে গেল
টায় টায় আমার মাথায়
আমার মতোই অল্প-সল্প-লেখাপড়া জানা
দিনে-আনা দিনে-খাওয়া
আমার ছ-ছ'টি ভাই-বেরাদার।

এ রাস্তায়
লাল নিশানে মোড়া আমার সাড়ে তিন হাত শরীর নিয়ে
একদল যখন
জয়ধ্বনি দিতে দিতে যাচ্ছিল,
ও ফুটপাতে লাল নিশানের নিচে দাঁড়িয়ে
আমার দিকে তখন তর্জনি উঁচিয়ে মস্করা করছিল
আমার ভাই। আমার স্ত্রী। আমার-ই মা।

সংস্কার

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

সরযূ নদীর জল আজ বড় শান্ত হয়ে আছে।
সাদামেঘের সৌজন্যে পাখিদের ডানার শূন্যতা
প্রতিবিম্বে কাছে আসে। আমি বহুদূর থেকে এসে
চালাক পোষাক ছেড়ে গন্ধর্বপ্রথায় স্নানে নামি।
কেউ নেই, শুধু সন্ন্যাসীর মতো সুখ দুঃখহীন
কটি অর্ধনিমগ্ন মহিষ নাক উঁচু ভেসে আছে,
পৃথিবীর বাতাস ঐ পথে জলের নিচের কালো
শরীরে সঠিক যাচ্ছে—ফিরছে ; কখনোবা মীন
আশ্চর্য শৈবাল ভেবে ঠুকরে দেখছে
তাদের সজল ধৈর্য !

ভোরে ঘন দুধ দেবে তারা
মানুষের শিশু কিংবা শিশুর বাবাকে !

মানুষকে মানুষ ভালবাসে, মানুষকে জন্তুও তার
দান দিতে চায় ; আমি অপ্রাপনীয়, পথে পথে ঘুরি
ধুলোয় পোষাক গেরুয়া হ'লেই নামি
নির্মোক গাহনে ; তবু সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশ এসে
শরীর অর্জন করে, সাময়িক শ্রান্তির আড়ালে
চতুর্দিকজোড়া তীর্থ মানুষের চেয়ে বেশি বিগ্রহ সাজায়,
আমি তৎক্ষণাৎ স্নান সেরে উঠি, আর
বিব্রত কাপড়জামা প্রক্ষালন ছলে
সরযূর শান্ত জলে সাদা প্রতিবিম্ব নষ্ট করি,

আকাশ আকাশে ফিরে যায়।

স্বাগত প্রথম রৌদ্রে

আশিস সান্যাল

এ কোন্ উদ্‌ভ্রান্ত হাওয়া ? ছলাৎ ছল জলের প্রবাহ ?
এ কোন্ দিগন্ত জুড়ে বিপুল বর্ষণ ?
বিদ্যুৎ-প্লাবারে কোন্ ত্রস্ত বনস্থলী ভয়ানক আন্দোলিত ?
মেঘে মেঘে ঘোষিত এখন
এ কোন্ চৈতন্যবাহী জলীয় ঝঞ্ঝার উদ্দাম উদ্ধত ধ্বনি

হে ত্রিকালদর্শী সপ্তর্ষি আকাশ,
এ কোন্ দিনান্তে আমি নিপতিত ?
যে দিকে তাকাই শুধু ভাঙনের প্রতিধ্বনি।
আচ্ছাদিত অন্ধকারে আর দেখি ক্ষয়িষ্ণু শৃগাল কম্পমান মৃত্যুভয়ে।
গেরিলা মরসুমী দিকে দিকে নিনাদিত এ কোন্ আঁধারে ?

কোন্ দিকে ফিরে যাবো তবে ?
রক্তভয় মৃত্যুভয় থেকে নন্দন কাননে কোন্ কুড়াবো বকুল ?
গাঁথবো নিরভ্র মালা ?
প্রেয়সীর ঘরে সজ্জায় ছড়াবো কোন্ স্নিগ্ধতার বিস্তীর্ণ মুকুল ?

কোনোদিকে পথ নেই। ফিরবার সমস্ত দুয়ার রুদ্ধ।
সর্বত্র ভীষণ উত্তাল স্রোতের ধ্বনি। বিদ্যুতে ঝলসাবে দেহ।
বাতাস কামান ভাঙবেই ব্যর্থতার নিশ্চল মিনার।

এক যুগ আলোকিত। তারপর ক্ষণিক আঁধার পুনর্বার জাগরণে সেই অন্ধকারে
আলোড়নে হেঁকে ওঠে প্রত্যাশী বিমান
রক্তে পরিস্নাত হয় বসুন্ধরা, গঞ্জে ও খামারে
আসন্ন জন্মের লগ্নে কেঁপে ওঠে পটভূমি গর্ভিনী মাতার।

কম্পমান পটভূমি। কোনোদিকে আর ফিরবার পথ নেই।
চতুর্দিকে অবিরত আসন্ন ঝঞ্ঝার ভয়াল বিপুল শব্দ।

ইতিহাস গর্জে ওঠে : রক্তে তার অভিরাম জেগে ওঠে ধ্বনি,
কোথাও বিদ্যুৎ ফোটে স্বাগত প্রথম রৌদ্রে যেন তার উদ্ভাসিত শুনি প্রতিধ্বনি।

কুয়াশায় কুয়াশায় আমের বউলের মতো প্রাণ

সত্য গুহ

এ ফোড় ও ফোড় করে লাল নকল স্থতো সারাবেলা
নক্সী কাঁথা ধুলে জলে পুরনো কাদায়
বুনেছ, কেমন অন্ধ, দেখছ না শুয়ে কে কাঁদে বা
কেন কাঁদে জিজ্ঞাসায় সমস্ত সময়

আমার তো বুক থেকে খসে পড়ে হাওয়া
মুখের কী ঘা-ঘা গন্ধ, বিকলাঙ্গ অথবা নিখুঁত
কারুকার্য ভরা মুখ দেবতাদুর্লভ
শিশু তুমি কী পেয়েছ, কিরকমভাবে কোল জুড়ে
বেঁচে আছে দেখছনা, বসুধা,

মা হবে অথচ থাকবে উদাসীন, এ হতে পারে না,
দুধ কি শুকিয়ে গেছে স্তনে, নাকি বেবি-ফুড ফুরলো
মিশকালো বেড়ালে উধাও, তুমি জানো না, অথচ
ঘুমপাড়ানির ছড়া সারারাত বসাচ্ছ শিশুর শরীরে
ঘুমোতে ও মরে যেতে কিন্তু অনিচ্ছুক

বেচারা, তোমার কি হলো, এমন তো ছিলে না
তুমি তো অক্লান্ত শক্তি লালন পালনে খুঁজেছিলে
চেয়েছিলে ভিটে ভরে আলোমালা সাজানোর মতো বাতি আলো
অভাগী, কী কপাল করেছ, দেখো, হিম
পাণ্ডুর করুণ চাঁদ রক্তশূন্যতা রোগে খুন হয়ে যায়

কুয়াশায় কুয়াশায় আমের বউলের মতো প্রাণ।

প্রতীক্ষা

শুভ বসু

তোমাকেই খুঁজেছিল লুইপাদ কুক্কুরীপাদেরা
সন্ধা ভাষার গাঢ় অবয়ব মেনে
অথবা সে চণ্ডীদাস খুঁজেছিল বাস্থলিমন্দিরে
যখন মেঘের জটা এনে দেয় শ্রাবণ রিম্ঝিম্,

যেমন খুঁজেছি শারদ সন্ধ্যাশেষে
যখন আকাসে চিরায়মানের প্রতীকের জেগে থাকা
যখন পায়ের সার বয়ে যায় মৌন ফুটপাথে,

তুমি কি আসবে এই প্রতীক্ষা কুড়াতে
যেরকম সেই শিশু এসেছিল উদ্‌গ্রীব গোকুলে,
তুমি কি আসবে এই জীবনের সেতারে মেজরাব,
মাঠে মাঠে উদার ফলনে, গানে, সাথে
ফুল রোদ কড়ি আর ধানের অঞ্জলি।

যা কিছু আমার নয়

অনন্ত দাশ

যা কিছু আমার নয়, তাই দূরে চলে যায়
হাতে থাকে উষ্ণ বালি, খরস্রোতা স্মৃতি
ফ্রেমে বাঁধা ভালবাসা চূর্ণ করে
মধ্যাহ্নের মেঘ আরো কিছু দাবি নিয়ে আসে।

ও-কারা ছিনতাই করে স্বপ্নগুলি মধ্যরাতে
ঘনিষ্ঠ আবেগে আমি জাপটে ধরি
রৌদ্রময় দিন ; মেঘের বর্ণালি
ছায়া ছায়া মুখে আঁধারের কারুকার্য করে।

দগ্ধভাল বেঁচে আছি, সীমিত পথের সীমারেখা
চূর্ণ করে প্রতিটি সকাল, আজানুলম্বিত আয়ু
দীর্ঘ ছায়া দুইপার্শ্বে ফেলে হেঁটে যায়
শীর্ণ হাতে তুলে আনি ঘাস, জন্মের গভীরে।

কিছুই ভুলিনি

গণেশ বসু

এভাবে সমস্ত রাত কে পারে কাটাতে ঘুমে সন্ত্রাশের ঝড়ে
কে পারে এমনভাবে বল্লমের মুখে গেঁথে পরিচিত মুখ
নখের ক্ষুরের ধারে বুক থেকে তুলে নিয়ে শিশুর ফুসফুস
চেতনায় লোপামুদ্রা শরীরে জাগাতে। কে পারে দোলাতে
গাছে গাছে ছিন্নমুণ্ড ভাইবন্ধুপ্রিয়তমা নিষ্ঠুর বিষাদ
সব কিছু ভুলে গিয়ে, ভুলে গিয়ে আত্মবাহী শিরা ও ধমনী
পার্কে পার্কে ঘরে বা রাস্তায়
অন্ধকারধর্ষিতার আ-ভুবন কাঁপানো গোঙানি ?

এ ভাবে সমস্ত রাত কে পারে কাটাতে ছিঁড়ে খুঁড়ে
আমাদেরই ইতিহাস, স্বেদ অশ্রু ঘাম ভালোবাসা
শ্রমের শিমুল লাল বেমালুম ঝরিয়ে এড়িয়ে, কে পারে, কে
হাওয়ায় উড়িয়ে দিতে রশীদ-দিবস স্মৃতি রক্তকরবীর।
সঞ্চয়ের হৃৎপিণ্ড নাবিক-বিদ্রোহ,
ধানের মুকুটে গাঢ় তে-ভাগ উল্লাস থরো থরো ভায়াল্লার
রুদ্রভাষা কৃষ্ণচূড়া জ্যৈষ্ঠের আবেগ।
কে পারে, কে,
এভাবে সমস্ত রাত নীরবে কাটাতে ছিন্নমূল যন্ত্রণায়, ভুলে যেতে
স্বপ্ন আর স্বপ্নের প্রাসাদ !

তবু এই দিনলিপি আশ্চর্য স্বদেশ !

এখনো আমার কাঁধে ছায়া আছে,
কাঁধে-কাঁধ, হাতে হাত, যৌবনতরঙ্গ ছাখো ছায়া
কাঁদানো ধোঁয়ার জ্বালা সমস্ত ধিক্কার
খাঁচার ভিতরে পাশাপাশি ব্যর্থতার রাগে রি রি ;
এখনো আমার হাতে স্বাদ আছে
হাতে হাতে পেশল পাহাড়ে প্রতিরোধ আমাদের ;

এখনো আমার চোখে ভেসে আছে
এক সুরে হেঁটে চলে জীবন্ত মেলায় গাঢ় পতাকায় ফসফরাস মালা
এক ছাঁদে হেঁটে চলে আদিবাসী রমনীর লক্ষ লাল ফুলের খোঁপাটি;
সব কিছু জেগে আছে আজো
যুবকের যুবতীর বুক ফুঁড়ে চলে গেছে বারুদের গোলা
ঝরেছে রুদ্রের ক্ষোভ ঘোড়সওয়ারের খুরে লাঠির ত্রিশূলে;
এখনো আমার বুকে একই ধ্বনি দুরন্ত উদ্বেল
একই স্বপ্ন পায়ে পায়ে শিকল ভাঙার।

মাঝে মাঝে প্রশ্ন জাগে শুধু গণ্ডারের নাকে। মাঝে মাঝে
প্রশ্ন জাগে ভুল বকি বিধ্বস্ত বাঙলার স্মৃতি নিয়ে জানি না স্বদেশ।
জানি না আ-মরি ভাষা, আ-মরি স্বদেশ
কেন যে সমস্ত রাত ঝন্‌ঝন্‌ লাফায় দাপায়
সমস্ত স্মৃতিকে ভুলে নিজেরই ছায়াকে ঘিরে সন্ত্রাশের ছোরা।
কিছুই ভুলিনি আমি, লোনা রক্ত কিছুই ভোলে না।

সবুজ দলিল

বাসুদেব দেব

দীর্ঘ দীর্ঘতর হয় মৃত্যুর দু হাত
বাতাসে পরাগ রেখে ভেসে যায় সায়াহ্ন কেতকী
বেনোজল ছুঁয়ে থাকে জন্মভিটে
বেস্পতির ম্লান বারবেলা

পোড়ো দালানের ভাঙা কড়ি বরগায়
নির্মম সত্যের ছাপ লেগে আছে, তক্ষক ঘোষক
কুলুঙ্গির কাছে তবু তেল সিঁদুরের বসুধারা
ঠাকুরমার দেওয়া নাকি?
মরাডালে লাল চেলি দোলে

ইটের ফোকর থেকে সবুজের সূক্ষ্ম মৃদু হাসি
মেঘের সুদূর সখ্য নিয়ে হয় আকর্ণ বিস্তৃত
মৃত্যুর ভিতরে শক্র কাঁকনের বর্তুল ধ্বনিটি
চলে যায় বহুদূর, নদীর ভিতর থেকে তুলে নিতে গ্রাম।

দ্রুত ভুলে যাই

দিলীপ সেনগুপ্ত

এই যে বিদীর্ণ টিলা
দৈনিক বয়েস কমে ক্রমে —
সখা-শত্রু পৃথিবীকে —
নুইয়ে মস্তক
লুপ্ত হবে অন্যতর নামে।

এখন যেটুকু চিহ্ন
ছিদ্রে ছিদ্রে অশেষ প্রলাপ —
একদা প্রভাত হতো
কীর্তনিয়া গানে
সন্ধ্যায় —!
আশ্চর্য সে হুল্লোড়ের কাল।

আজও তো ডাকছে পাখি
ঘিরে ঘিরে টিলার ঘরণী,
উই পোকা ঢেকে নাক-কান
সমস্ত শরীর।
নিজের কীর্তির কথা, শুষে নেয়
নিজেই তখন —
ভুলে যাই, দ্রুত ভুলে যাই
এ ভোলার অনেক কারণ।

আস্‌চে, আস্‌বেই

তরুণ সেন

বেঁচে থাকতে হ'লে একটা আওয়াজ চাই।
যারা কাঁটার টিক্‌টিক্‌ শুনছে না
তাদের জন্যে চাই ঘণ্টা —
হয় গির্জার, নয় কবরখানার
এখন ডেকে লাভ নেই —
সময় আসবেই, আস্‌চে।
পায়ের গোড়ালিটা
রোদ্দ্‌রেতো বটেই
মাঝে মাঝে মাঘের শীতেও ডুবিয়ে নেওয়া ভালো —
'থাক্‌ব' এই কথাটা ভাবতে
কোনও ভুল না হয়

হাত, পা, মুখ
এর একটা বা সবগুলোয়
ভুলবার তো কথা ছিল না,

সময় আসবেই, আস্‌চে —
'দেখো — এই সব ঘণ্টা থেমে গেলে
একবার ডেকে উঠ্‌তেই
গোটা একটা মানুষ
সটান দাঁড়িয়ে বল্‌বে —
হা — জিঁ — র!

উজ্জ্বল কার্নিভাল

শুভাশিস্ গোস্বামী

বুকের রক্ত দিয়ে ফোটাতে পারো কি তুমি একটি গোলাপ ?
কিশোরের মতো সব মার সয়ে আনো দেখি রক্তকরবী।
বুলডোজারের মতো ভেঙে ফেলে পুরনো কাঠামো
নতুন সরণী গড়ো সব্যসাচীবৃত্তিপটুতায়।
নচেৎ ক্রোধাক্ত হাতে ভেঙেচুরে সাজানো আঙিনা
বুকের বিবরে তুমি পুষে রাখো কিসের উল্লাস ?
আগাছা উপড়ে ফেলে কর্ষণে উর্বর করো আপন মৃত্তিকা,
একটি ফুলের জন্যে গর্ভের ভিতরে ঘটে দীর্ঘ সংগ্রাম।
হাতে হাতে মেলে ধরো। তুমি-আমি-কিশোর-নন্দিনী
শক্ত পেশল হাতে অজস্র ফুল ফোটাই এসো।
প্রিয়, ফুল ফোটাবার দিন নয় অদ্য ? বলো তো ?
মানুষের জন্যে এক উজ্জ্বল কার্নিভাল করি আয়োজন।

আজ আমি

মৃণাল বসু চৌধুরী

যদি পারো আমাকে হটাও
দু হাত দু পায়ে আজ পরাও শিকল
কঠিন বুলেটে ভাঙো বুকের পাঁজর
পারো যদি মুক্ত করো নিজের সীমানা
দেব প্রাণ তবু আমি সরে দাঁড়াব না
কেন না আসার আগে দীর্ঘদিন আমরা শিখেছি
শিকল আইন যুদ্ধ স্থায়ী অধিকার
এরকম হাবিজাবি
সমস্ত শব্দের কোন স্থির অর্থ নেই
জন্ম মৃত্যু ক্ষুধা তৃষ্ণা জীবন যাপন

এ সবের মধ্যে
কোন বিভাজন রেখা নেই
আজ আমি স্থির জানি আমাদের কি কি চাই
সোনা চাই মুঠো মুঠো সোনা
মারো কাটো আজ আমি এক পা-ও সরে দাঁড়াবো না।

বর্ণালি সোনালী ডিম

সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

হয়ত কখনো সখনো হেলাফেলা পথ চলতে মিলতে পারে
অকস্মাৎ ঝড় বৃষ্টি জলে
ধ্বস্ত নীড়ে, অথবা স্খলিত গুহা থেকে বর্ণালি সোনালী ডিম
আদরে আবেগে তুলে নিতে বুকের নিকট
ভালোবাসা মমতার উচ্চ আঁচে হয়ত ফুটবে কোনদিন
সোনালী ডানার পাখি স্বর্ণ-চিল

ভাবছো তুমি
দিনভোর উড়ে উড়ে মুখে করে
সন্ধ্যায় সে ফিরে আসবে নীড়ে
রৌদ্রদীপ্ত তোমার দূরের ইচ্ছাগুলি
অথচ তোমার আপ্তবাক্য বিস্মরণ
ভরত রাজার স্নেহের হরিণ শিশু
বনবাসী কুটীরে ফেরে না কোনদিন
ভালোবাসা মমতার বুকে
বিষাক্ত নিশ্বাস হানে
সরীসৃপ ডিমের খোলোসে ঢাকে অভিশাপ
জন্মের রহস্য তার।

নিরাময়ের জন্য

ধনঞ্জয় দাশ

লেনিন, কখনো তুমি নাড়ী-টেপা ডাক্তার ছিলেনা
তবু মানুষের স্বস্তি-সুখ-শান্তি স্বাস্থ্য ও সম্পদ
আধি ও ব্যাধির ঝড় ক্রমান্বয়ে রুখে
উচ্ছল ঝর্ণার মতো হেসে উঠবে
মানবিক শ্রমে ভরবে গোলাভরা ধান
এ-মতো বিশ্বাস বুকে নিয়ে
চোখে মেখে স্বপ্নের অঞ্জন
আমাদের হাতে হাতে গুঁজে দিলে আশ্চর্য নিদান।

অথচ কী বিড়ম্বনা দেখ ঃ
আমাদের বুকে আজ শোভা পাচ্ছে স্টেথিস্কোপ
হাতে ঘুরছে বীক্ষণ যন্ত্রের চাকা
রোগের বীজাণু সব খুঁজতে খুঁজতে
খুলতে খুলতে জটিল রোগের জট
কখন যে বিষরক্ত বুকে টেনে
রক্তক্ষরণের রোগে সকলেই রোগগ্রস্ত
কেউ তা জানিনা।

কমরেড লেনিন, তুমি এসে দেখে যাও
হাসপাতালের বেড আলো করে
আমরা সবাই আজ শুয়ে আছি বাম ও দক্ষিণে॥

ঈশ্বর, ঈশ্বর……

তরুণ সান্যাল

…I shall live to go back to India and tell my country that you are not only Vidyasagar but Karunasagar also.

অশ্রুপাত, রক্ত, লোনাসমুদ্রের ফেনপুঞ্জে উচ্ছ্রিত বকুল ঝরে আছে
নাকি মৃত্যু হাতের তালুতে বিন্দু অস্থির পারদ
যেমন হাওয়ার হাত নদীজলে শ্লথ শাড়ি মেলে দেয় ছলছল তরঙ্গে ফের তোলে
দিনযাপনের নাম শুধু এইটুকু ?
যেমন বালির বুকে আলস্য দুপুর ঠা ঠা রোদ
মধ্যদিন কাকের উদাস ডাকে কা কা, ফাঁকা বুকের ভিতর কোন পাতার
আড়ালে ঘু-ঘু ঘু-ঘু
দিন যাপনের নাম সকালে ধোঁয়ার মধ্যে উসকে দেওয়া আঁচ, এইটুকু ?
তারপরো বেলা যায়, বেলা যাবে, কেমন সন্ধ্যার মুখে ঝড়, ডাল পাতা লতা
দুমড়ে ভেঙে মুচড়ে উল্টে গাছ
নদীর ঢেউয়ের ঘুষি বুকচাপা গারদ খাড়া ভাঙার গরাদে, ঘন বিদ্যুতের
বিস্ফোরণ,
ক্রুদ্ধ বৃষ্টিপাতে লাঠি চার্জ
দিগ্বিদিকে জ্ঞানশূন্য কয়েক রাউণ্ড

মায়ের কোলের কাছে নিহত তরুণ ছাত্র কলেজ স্ট্রীট খাঁ-খাঁ,
বালির বন্যার পিছে ভ্রূকুটি ঘূর্ণির তোড়ে রাইফেলের অন্ধ নলে ইতিহাসে
ধীরপায়ে উজান
কেবল গলির মুখে ইটের স্টাম্পের সামনে এলেবেলে খেলার আরেক নাম
মৃত্যু-মৃত্যু উৎসবে বিপ্লব
মায়ের কোলের কাছে মরা ছেলে, ফুটপাথে রক্তের ছোপ
অস্ত্রে অস্ত্রে কানামাছি,
এরই নাম বলিদান, এরই নাম শস্ত্রে অভ্যুত্থান ?

মাথা নীচু ফিরে আসি, হাতের ওপিঠে রক্ত কার
সে আমার, সে আমারই অতীত বৎসর, সেই দায়িত্ববিহীন ধুলো ছোঁড়া
ঘাড় হেঁট হয়ে আসে মানুষের, স্বদেশের পায়ের নিকটে বারবার
এসব আমারি কাজ, আমাদের, সশব্দ ধ্বনির ছন্দে ব্রেকার-বিস্ফার ঘোড়া
শোণিতে আহত বালুবেলা

মানুষ আমাকে ক্ষমা করো; আমি তোমাদের আলো দিতে নিজেই আঁধার
মানুষী আমাকে ক্ষমা করো, আমি চক্রান্তে বাইচ খেলি তোমাদের সাধ ও আহ্লাদে
মা, আমাকে ক্ষমা করো, ক্ষমা করো দিনরাত্রি জ্যোতিপুঞ্জ, নীহারিকা নক্ষত্র নীহার
তোমার কোলের কাছে, মা, তোমারই শিশু, ঐ মৃত্তিকায় পুনর্বার জন্ম নিতে চায়
দামোদর সাঁতরে যেন চলে আসছে ঈশ্বর মায়ের কাছে,
…কৃষ্ণদাস, বাছা ঘরে আয়…
শোক মিছিলের চতুর্দিকে কেন ঝামর সহস্র মুখ, ঘনমেঘ, মেঘের ওপারে স্তব্ধ হয়ে বজ্রপাত
ওমা, মা রে, সার্ধশত বার্ষিকীতে সেন্টেনারী বিলডিঙের চত্বরে ছাত্রের শব,
রাস্তার ওপারে স্তব্ধ, আসন পিঁড়িতে ওকে পাষাণসাগরে স্ফূর ঢেউ
বর্ণপরিচয়হীন দুচোখে দেখছেন, স্বরব্যঞ্জনবিহীন কানে ঝরে পড়ছে জন্মদিনে ফাঁপা শব্দ প্রথাসিদ্ধ,
উত্তরাধিকারহীন স্তব
শুনতে পাচ্ছি মা ডাকছেন
বেলা বহে যায়, বাছা, বাঙলা দেশে,…ঈশ্বর ঈশ্বর ঘরে আয় ॥

মৃত্যু, চেয়ে দেখো

দুলাল ঘোষ

মৃত্যু, তোমার মুখে আগুন জেলে কেমন আমি ঘর বেঁধেছি
চেয়ে দ্যাখো হাসনুহানা, ডালিয়া ফুল
হু-হু করা বুকের পাঁজর চিতিয়ে দিয়ে ঝড় রুখেছি—বৃষ্টি, তা'ও —।
চেয়ে দ্যাখো স্বর্গ থেকে ছিনিয়ে আনা অপ্সরী চাঁদ হাতের মুঠোয়
তবু আমি নিজের রক্তে গা ভাসিয়ে
চেয়ে দ্যাখো তোমার হাতে নিগৃহীতা লজ্জাবতী
নিকষ কালো রাত্রি নিয়ে কেমন আমি সুখেই আছি।

'হোয়চে, আর বছর দিইনি; দু-বছর হয়ে গেল! ই-বছর না দিলেই লয়!'

'তবে বাড়োই লাগাওনি কেনে?'

'খুব টানাটানি চলছে!'

'তমাদের আবার টানাটানি!'

'নারে টাকাকড়ি একদম নাই! ই-মাসটা যাগ!'

অবনী অনেক চেষ্টা করেও আজও কাজ পেল না। কেউ ঘরামীর কাজ করায় কিনা খোঁজ করতে বেরিয়েছিল। ক'দিন দেখছে, রায়বুড়োর ঘরের ছাউনি পচে গেছে। দু-চারবার হনুমান লাফালে দফা-রফা। হনুমানের অত্যাচারও কমে গেছে। গত বছর কত হনুমান মেরে ফেলল। হনুমানের মৃত্যু দেখে অবনীর ধারণা হয়েছিল—হনুমান অমর নয়। বুকে তীর বিঁধে গেছে। গাছ থেকে নেমে এসে রায়বুড়োর পা জড়িয়ে ধরল। রায়-বুড়ো যদিও হনুমান মারতে হুকুম দিয়েছিল, এ-রকম আত্মসমর্পণে বিগলিত হয়েও সেই হনুমানটিকে বাঁচাতে পারেনি, তবে হনুমান মারা বন্ধ করেছিল। আর কয়েকটি মাত্র বংশের বাতি জ্বালিয়ে রয়েছে। ঐ অবশিষ্ট হনুমানের অত্যাচারে চাল ফুটো হয় না। এক-বছরের ছাউনি দু-বছর টেঁকে, ফলে ঘরামীরও কাজ পাওয়া যায় না। অবনী হতাশ হয়। শুধু কল্কেটা হাতের মুঠোয় নিয়ে তামাকে টান দেয়। তারপর ঘরে ফেরার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

'দাঁড়াও আমিও যাব!'

'চল!'

অবনী খুব দ্রুত হাঁটছিল। অর্থাভাবজনিত ভাবনা তাকে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে তাড়িত করছে যেন। শ্যামা কিছুতেই পায়ে পা মিলিয়ে চলতে পারছিল না। মাঝে-মাঝে দৌড়ে পাশে আসতে হচ্ছে। ঘরের সামনাসামনি এলে অবনীর হাত ধরে ফেলল। তখন চারদিকে অন্ধকার, কোনো শব্দ নেই কোথাও। গেরস্ত-ঘরে আলোর ঠিকানা ছাড়া আর কিসেরও হদিস পাওয়া যায় না। শ্যামা আস্তে চলতে অনুরোধ করল। অবনী অনুমান করল, শ্যামা কিছু বলার জন্যে বড় উতলা হয়ে রয়েছে। অবনী বলল, 'কি বলবে বল।'

'পারুকে মারবেনি, আমি খুব মেরেচি!'

'কেনে?' অবনী থমকে দাঁড়াল।

'বখরাটা শিয়ালে লিয়েচে !'

শ্যামার কথা শেষ হলো-কি-হলো না, অবনী দৌড়ে ঘরের দিকে গেল। পারুল তার আগেই আত্মগোপন করেছে। সামনে শ্যামাকে পেয়ে রাগ বাড়ল, দু-ঘা দিয়েও দিল। 'যেমন মা তেমনি মেয়ে!' শ্যামাকে উত্তম-মধ্যম দিয়ে অবনী এক-কোণে বসল। কিছুক্ষণ চোখের জল মুছে শ্যামা যা আছে তাই ফোটাতে হাঁড়ি চড়াল। পারুল সেই কখন থেকে পালিয়েছে, ঘরে ফেরেনি। রান্না হয়ে গেল, অবনীর খাওয়াও হলো, পারুল ফিরল না। শ্যামা তেলের বাটি নিয়ে একদিকে রেখে, অবনীর জন্যে বিছানা করল। কাঁথাটা বিছোতে গিয়ে রক্তের দাগ দেখে একটু থমকে দাঁড়াল। অবনীর ব্যায়রাম, সারাজীবন গায়ে খোস। বাচ্চাবেলা থেকে এই রোগ, মাঝে কিছুদিন ঠিক হয়ে গেলেও শীতের হাওয়া পড়লেই খোসগুলো উজিয়ে ওঠে। রাতে শোয়া-কষ্ট, সকালে বিছানা ছাড়ানো যায় না। টেনে তুললেই রক্তারক্তি। কাঁথাটা কেচে দিলে দাগগুলো মিটে যায়, সাবানের অভাবে হয় না। বিছানা পাতা হয়ে গেলে অবনী শুয়ে পড়ল, শ্যামা খোসের ওপর তেল লাগাল। পারুলের কথা ভাবতে-ভাবতে শ্যামা বলল, 'ঝপ করে ঘুমি পড় !'

'ঘুম কি হাতের মোয়া, বললেই ঘুমি পড়ব !' অবনী রেগেই আছে।

'পারু যে হিমে ভিজচে, শেষে রোগ-লাড়া হবে !'

'মরুক !'

'তুমি মারবেনি বল, ডেকে লিয়ে আসি, আমি যে খুব মেরেচি !'

'এই করেই মাথায় তুলেচ ! মারবেনি পূজা করবে ?'

'অর কি দোষ, আমাদের কপাল।'

'তালে ডেকে লিয়েস !'

অবনী এতক্ষণে সবকিছুর উৎস খুঁজে পেল। কপাল মন্দ না হলে এমন হয় না। শ্যামা লণ্ঠনটা নিয়ে বেরোলো। আদর করে ডাকল। কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। সন্ধ্যাদের ওখানে নেই, গাঁয়ের কোনো বাড়িই নেই। পারু, পারু! শেষ পর্যন্ত দেখল, বাঁশতলায় পারুল হাঁটু মুড়ে চুপচাপ বসে রয়েছে। এখানে ঘোষেরা গোরু বাঁধে, খড় দেয়। শ্যামা মেয়েকে আদর করে টেনে তুলতেই পারুলের রাগ বাড়ল। সে কিছুতেই ঘরে যাবে না। তথাপি মায়ের আদরের ফলে পারুল রাগের চোটে কেঁদে ফেলল 'আমার লাগেনি বুঝি, কত মারলে আমাকে !'

'বখরাটা খেয়ে লিল, তোর বাপের যে কত বাজচে তুই বুঝবিনি !'

পারুল ও শ্যামা ঘরে এলে অবনী দেওয়ালের দিকে মুখ করে শুয়ে রইল। মেয়ের মুখ আর দেখতে ইচ্ছে নেই। মেয়ে ও বউ-এর খাওয়াকালীন শব্দ হলো কিছুক্ষণ, তারপর মুখ ধোবার সময় জল ঢালার শব্দ, এরপর অবনীর রাগ পড়ে গেল। শ্যামা মেয়েকে মাঝখানে রেখে শুয়ে পড়ল। তালপাতার বেড়া দিয়ে ঘরখানা দু-ভাগ করা। একদিকে ছাগল থাকে, অন্যদিকে মানুষ। ছাগলের গন্ধ নতুন করে অনুভব করল অবনী। টুকটাক ভাবনা ভাবতে-ভাবতে আরো একটি দিনের মুখ আলোকিত হলো, কিন্তু অবনীর সমস্যার কোনো পরিবর্তন নেই। শ্যামা সকালবেলা উঠেই যা পুঁজি ছিল অবনীর হাতে দিয়ে রায়গিন্নির ওখানে একটুকরো সাবান পাওয়া যায় কিনা দেখতে গেল। অবনী আকাশ-পাতাল ভেবেও নিরুপায় বসে রইল। কিছুক্ষণ পরে শ্যামা ফিরে এল, বেলা একটু বাড়লে রক্তমাখা কাঁথাটা নিয়ে পুকুরঘাটে গেল, পারুল সঙ্গে। কখনো শ্যামা কখনো পারুল সাবান লাগিয়ে কাঁথাটা পায়ে দলল। প্রায় একটা পুরো সানলাইট কাঁথায় লেগে গেল, সোডা দিয়ে ফোটালে এতখানি লাগত না। তবু বিনাপয়সায় সাবান দিল রায়গিন্নি, তাতেই শ্যামা কৃতজ্ঞ। কাঁথাটা শেষ-মেশ ধুয়ে চাতালে রেখে পারুলকে টেনে জলে নামাল। কি কাণ্ড! বাঁশি পাতার মতো সাবানটা পারুলের মাথায় ঘষে উকুন কমাতে শ্যামার আগ্রহ বেড়ে গেল। সাবান জলে চোখ জ্বলতে থাকল, কিছুই করার নেই, পারুল কাঁদো-কাঁদো হয়ে ঘাটের সিঁড়িতে বসে রইল। বলল, 'মাগো চোখ জ্বালা করে !'

শ্যামা রেগে গিয়ে, মাথাটা যেহেতু আয়ত্তে আছে, জোরে নাড়িয়ে দিল। 'মুখপুড়ি ডেঙর করেছ কেনে, মাথায় ?' পারুলেরই হাত রয়েছে এসব পোকার উৎপাদনে এমনভাবে শ্যামা বলল। কিন্তু পারুলের এত ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সাবানের জ্বালা সহ্য করতে পারছে না। এই জল ঢালবে তার মা, এই জল ঢালবে ভেবে-ভেবে শেষ পর্যন্ত কেঁদেই ফেলল। কান্নার জন্যে শ্যামা আরো বিরক্ত হলো, থামিয়ে দেওয়ার জন্যে গালে এক চড় মারল. তাতেও কান্না থামে না। তখনই শ্যামা বুঝতে পারল সত্যিই চোখ জ্বালা করছে এবার, তাই হাত ধরে টেনে জলে প্রায় চেপে ধরল। সাবান জল ধুয়ে তবে পারুল ভেসে উঠল।

'এতখন ডুবে থাকতে পারু ?'

শ্যামা ও পারুল পুকুরপাড়ে চেয়ে দেখে অবনী দাঁড়িয়ে রয়েছে। পারুল এক ডুবে পুকুরের কতখানা যেতে পারে তার বর্ণনা দেওয়ার উপক্রম করলেই শ্যামা ধমক দিয়ে থামিয়ে দিল। 'আর কান্না নাই, যা উঠে যা!' পারুল ভয়ে-ভয়ে উঠে চলে গেল। শ্যামা জলে গা ডুবিয়ে কাপড় ভাসিয়ে দিল। অবনী এখন দাঁড়িয়ে আছে দেখে একটু তিরস্কার করল। তারপরই রায়েদের রঘুনাথের মন্দিরে ঘণ্টাধ্বনি শোনা গেল। শ্যামা বুকে কাপড় জড়িয়ে পিছন ফিরে দেখল, অবনী চলে যাচ্ছে। চেঁচিয়ে বলল, 'পুরুৎ ঠাকুর এসচে দেখ!' অবনী মন্দিরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দেখল, পুজারী ব্রাহ্মণ পঞ্চপ্রদীপ এক হাতে অন্যহাতে ঘণ্টা নিয়ে আরতী করছে। ব্রাহ্মণের খালি গা, পিঠ-পেট-ছাতি-কাঁধ হয়ে পৈতেটা প্রলম্বিত। হাঁটুর ওপরে একটা ধুতি, লজ্জার বস্ত্র। ব্রাহ্মণের মাথায় ও বুকের চুল শাদা হয়ে গেছে। নাকটা তীক্ষ্ণ। পঞ্চ-প্রদীপের আলো মুখটাকে উদ্ভাসিত করছে। মন্ত্রোচ্চারণের ফলে মন্দিরের ভিতরটা গমগম করছে। দরজার সামনে অবনীকে মাঝে-মাঝে দেখছে। অবনী ব্রাহ্মণের মুখ দেখে অনুমান করার চেষ্টা করছে — ঠাকুর ক্রুদ্ধ কি-না! পূজা শেষ হলে পিঁড়ির ওপর বসে, মন্ত্রোচ্চারণ করতে-করতে যা-কিছু নৈবেদ্য একখানা গামছায় বেঁধে নিল ব্রাহ্মণ। দরজার সামনে থেকে একদিকে সরে দাঁড়াল অবনী। মন্দিরের দরজা বন্ধ করতে-করতে ব্রাহ্মণ বললেন, 'তোকে ছুবনি. পতু দেড় টাকা করে দিয়েছে!'

পায়ের ধুলো নিয়ে অবনী বলল, 'না ঠাকুরমশায়, না দিলেই লয়!'

'তুই ত বার-আনা দিবি, আমার লকসান!'

নৈবেদ্য হিসেবে ব্রাহ্মণ যে-আতপচাল পায়, তার কে. জি. হিসেবে মূল্য দেড় টাকা। এই দেড় টাকা মূল্য পতু-ময়রা দেবে, কিন্তু অবনী তা দিতে পারবে না। ফলে ব্রাহ্মণ কিছুতে রাজী নয়। অবনীর ঘরে হাঁড়ি চড়বে না, ব্রাহ্মণের দায় নয় হাঁড়ি চড়ানো। কাজেই ব্রাহ্মণ কাঁধের ওপর চালের পোঁটলা ঝুলিয়ে কুঁজো হয়ে এগিয়ে চলল। অবনী পিছনে-পিছনে নানা দুঃখের কথা শোনাল। পতু ময়রার দোকানে এসে সে এক নিমেষে তার দুঃখ ব্রাহ্মণের অন্তরে প্রবেশ করানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো। পতুর দোকানটা হাটের একদিকে। পাঁচ গাঁয়ের একমাত্র মিষ্টির দোকান। জিলিপি, বোঁদে, বোঁদের মিঠাই, তেলেভাজা. ইত্যাদি পাওয়া যায়। পতু তখন উনুনে কড়াই চড়িয়ে একটা দালদার টিন উপুড় করছিল। ব্রাহ্মণকে দেখে সাদর অভ্যর্থনা জানাল।

আন্দাজ মতো ঘি ঢেলে ব্রাহ্মণের সঙ্গে ব্যবসায়ীর মতো কথা শুরু করল। অবনীর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী পতু ময়রা। রোষে দপদপ করে উঠছে অবনীর ভিতরটা। নড়বড়ে বেঞ্চে বসে ব্রাহ্মণ আতপ-চালের পোঁটলা খুলে পতুর সামনে ধরল। পতু চালগুলি পাত্রে নিয়ে সহকারী সন্তানকে বললে, 'তিনটাকা দিয়ে দে ঠাকুর মশায়কে !'

'দেখলি, দেখলি, তুই কত দিতিস ? দেড় টাকা।' অবনীকে প্রায় ভেঙচি কেটে ব্রাহ্মণ বলল। অবনী ঠায় দাঁড়িয়ে সহ্য করল। পতু কড়াইয়ে ছান্তা ডোবাল ! একটি শিশু এক-আনার ফুলুরী নিয়ে খেতে-খেতে চলে গেল। ব্রাহ্মণ টাকা গুণে নিয়ে চলে গেল। অবনীর কিছু করার নেই, নিরুপায়। বাইরে যে-বেঞ্চিটা পাতা রয়েছে, তাতে বসে-বসে মাছি তাড়াতে থাকল। ভেজা আতপ-চালও সে কিনতে পারল না। কয়েকটা মাছি মুঠোয় ধরে বেঞ্চের ওপর আছড়ে দেয়। কোনোটাই মরে না, উড়ে পালায়। পতু এক-ছান্তা মিহিদানা তুলে ঝাড়তে-ঝাড়তে বলল, 'ধান ঝাড়চু যে অবনী !'

'আর কেনে বল, মিষ্টির দোকান লয় নদ্দমা !'

'কেনে ? চালগুলান আমি লিয়ে লিলম বলে !'

'তা লয় ! মাছির রাজত্ব এখেনে !'

পতু ময়রা হাসল। পতুর ছেলেটা আলমারীর ভিতর থেকে মাছি খেদাচ্ছিল সেও হেসে উঠল। বলল, 'তমার খোস ত মোলেও যাবেনি !'

'তা ঠিক !'

'মলম লাগাওনি কেনে ?'

'ফুরি গেছে, আজ ডাক্তারবাবুর কাছে যাব, মলম লিতে হবে !'

'জ্যোতির বউকে দেখতে এসছে ডাক্তারবাবু যাও না !'

অবনী খবর পেয়েই উঠল লাফিয়ে। বেঞ্চটা মচমচ করে শব্দ করল। একদল মাছি ভনভন করে উড়ে গেল। জ্যোতি সরকারের বাড়ির দাওয়ায় এসে একদিকে মাটিতে বসল অবনী। সদর ঘরে একটা চৌকি পাতা, চৌকির পাশে বদনা, বদনার মাথায় তোয়ালে। একপাশে একটুকরো সাবান। সাবানটা লাল রঙের, কোন ধরনের অবনী জানে না। ডাক্তারবাবু রোগী দেখে জ্যোতির সঙ্গে কথা বলতে-বলতে বেরিয়ে এল। জ্যোতি তোয়ালেটা কাঁধে ফেলে ডাক্তারবাবুর হাতে বদনা থেকে জল ঢেলে দিল, সাবান ধরিয়ে দিল। জ্যোতির এমন ভাব যেন ডাক্তারবাবুর সেবা করলে বউ-এর অসুখ ভালো হয়ে

যাবে। ডাক্তারবাবু হাত ধুয়ে তোয়ালেয় মুছতে-মুছতে অনেক কথাই বলল। যাবার সময় বলল, 'তোমাকে আর যেতে হবে না জ্যোতি, অবনী আছে!' অবনী হাসল। ডাক্তারবাবুর ওষুধের বাক্সটা নিয়ে পিছন-পিছন হাঁটতে থাকল, জ্যোতিও কিছুদূর এগোল, তারপর বাড়ি ফিরে গেল। এবার অবনী কথা বলার সুযোগ পেল।

'ঘড়াটা মরে যেতে আপনার অনেক কষ্ট!'

'কি মলম ফুরিয়েছে বোধহয়!'

'ফুরিচে ডাক্তারবাবু, ফুরিচে ; তবু আপনার কষ্ট হচ্ছে কিনা বলুন! ইখান থিকে বেঙরাল যেতেও আপুনি ঘড়ায় চড়তেন, এক পাউড়ি মাটিতে পাতেননি! ঠিক কি-না বলুন! আপনার খুব কষ্ট হচ্চে ডাক্তারবাবু! একটা ঘড়া কিনেন, আমি সহীস হব!'

'সেদিন আর নেই অবনী! এই তো জ্যোতির বউকে দেখতে এলাম, অবশ্য বাঁচবে না, মাত্র দু-টাকা দিল! বাজারে পয়সা কোথায়?'

'ডাক্তারবাবু, বাঁচবেনি! ই-তল্লাটে অমন মেয়ে নাই!'

'হুঁ ভালো লোকই তো আগে মরে!'

'না ডাক্তারবাবু, মরতে দিলে চলবেনি!'

'খুব অসময় বুঝলি, অনেকদিন আগেই চিকিৎসা করানো উচিত ছিল, চেপেছিল এদ্দিন!'

'ভাল করেনি? আপনি ত সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী! মনে আছে, পালেদের বউয়ের গলা শুকি গেল! মর-মর, আপনাকে ডেকে লিয়ে গেল, কত ওষুধ দিলেন! তখন ঘড়াটা ছিল! আমি দেখছিলম নিজের চোখে! কুনু ওষধ কাজ করলনি! শেষকালে আপুনি নাদা থিকে একদলা পুরনো তেঁতুল দেখি লালসা দিলেন ; আহা পালবউর জিব ভিজে জল, আর, যারা ছিল, সবারই জিব সমুদ্দুরে ভাসছিল!'

ডাক্তারবাবু জোরে হাসছিলেন। 'আমার কিছু হয়নি!'

'আপনি ধন্বন্তরী, সব পারেন!'

ডাক্তারখানায় এসে অবনী ওষুধের বাক্সটা কমপাউণ্ডারের হাতে দিয়ে বাইরে বসে মাছি মারতে থাকল। খোসের মলম তো পাওয়া যাবে, পেটের খোরাকের কি করবে তাও ভেবে কূল পায় না। কিভাবে যে বলবে তাও বুঝতে পারছে না ডাক্তারবাবু না বলে দিলে ওনার স্ত্রী এক-দানা চাল দেবে

না। ডাক্তারবাবুর জন্যে কত রোগী অপেক্ষা করছে, সকলেই ওষুধ নিচ্ছে চলে যাচ্ছে। অবনী ঠায় বসে রইল। তার ওষুধ চাল, ভাত। শ্যামা এখন কি করছে কে জানে। পারুল হয়ত ছাগলগুলো নিয়ে বেরিয়েছে। আজও যদি শেয়াল নেয়, একেবারে কেটেই ফেলবে পারুলকে। এরকম ভাবনা চকিতে খেলে গেল মনে। খোসের জ্বালায় স্থির বসতে পারছে না। ডাক্তারবাবু অবনীর এরকম অবস্থা লক্ষ্য করে কমপাউণ্ডারকে নির্দেশ দিলেন, কিছুটা মলম তৈরি করে দিতে। অবনী দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে মলম তৈরি দেখল। কমপাউণ্ডারের কানের কাছে প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'খোসের ওষুধ দিলেন, পেটের খ্যান!'

'পেটে আবার কি?'

'হাঁড়ি চড়বেনি আজ!'

'না, কানাকড়ি নাই আমার!'

অবনী মুখ চূন করে ডাক্তারখানার বাইরে বেরল। এখন দুপুর। সূর্য মাথায় উঠবে এমন চড়া রোদ ছড়িয়েছে। কোনো উপায় না দেখে তার মাথা প্রায় খারাপ। ঘরে গিয়ে পেটে হাত রেখে শুয়ে পড়বে এমন চিন্তাও হচ্ছে। দূর থেকে দাঁড়িয়ে ঘরখানা দেখছে। ঘরের বাইরে উঠোনে বসে পারুলের উকুন বাছছে শ্যামা। নিজের চুলও এলো করে দিয়েছে রোদে। অবনী দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখলে কি ভাবত কে জানে! বউকে দূর থেকে দেখে আর ঘরে ফিরতে ইচ্ছে হয় না। বউকে খেতে দিতে পারবে না, মেয়েকে খাওয়াতে পারবে না, সে কেমন পুরুষ। শ্যামা পারুলকে কোথায় যেতে বলল হয়ত, পারুল উঠে চলে গেল। অবনী লুকোবার জন্যেই হয়তো শ্যামার দৃষ্টির আড়ালে যেতে চেয়েছিল। পিছন ফিরে দেখল আল্লারাখি ঝুলি কাঁধে মাঠে নামছে। অবনী হাঁক দিয়ে দৌড়ে গেল তার দিকে। আল্লারাখিকে খাতির করে একটু বসতে বলল। রোদে হাঁটতে-হাঁটতে বুড়ি একেবারে আমসি হয়ে গেছে। আল্লারাখির অনেক দুঃখ। স্বামী মারা যাবার পর অনেকে নিকে করল, তালাকও দিল। প্রথম স্বামীর একমাত্র সন্তান পিঠে করে ভিক্ষে করে ফিরতে হলো। পিঠেই সেই সন্তান প্রাণ হারাল। আল্লারাখির অনেক দুঃখ। সে ভিক্ষে করে বুড়ি হয়ে গেল। জোয়ান বয়সে ধান ভেনেছে, ধানকল গাঁয়ে বসতে সে-পাটও চুকে গেল। আল্লারাখি পথ চলতে-চলতে বুড়ি হয়ে গেল।

'ঘামে লাইচু যে!'

'ঘাম দিবেনি ত কি!'

'বোস না!'

'সময় নাই, এক মুঠা ফুটি খেতে হবেনি?'

'সেত আমাকেও ফুটাতে হবে, দেনা দু-কেজি চাল!'

'দেড় টাকার পাই কয়ে দুবনি, ঠাকুরমশায় ভিজা চাল দেড় টাকায় বেচে।'

'দুব দুব, দেড় টাকাই দুব, তুই দে দু-কেজি!'

'নগদ, ধারে দুবনি।'

'আজ আদ্দেক দুব, পরে…!'

'হবেনি!' বলে আল্লারাখি রাগ করে উঠে পড়ছিল, অবনী হাত ধরে বসিয়ে দিল। চোখ দপদপ করছে অবনীর। সে মরিয়া হয়ে উঠেছে। 'তুইও দুঃখী আমিও দুঃখী সংসার করবিনি?'

'না!…'

'দেখ তোর কমর ভেঙে দুব!'

'কবে দিবে দাম?'

'পরশু, হাটে দিয়ে দুব!'

আল্লারাখি ঝুলি খুলল এতক্ষণে। অবনী যেরকম মরিয়া হয়ে উঠেছে, শেষপর্যন্ত কেড়ে-কুড়ে নেবে। চালগুলি একমুঠো তুলে দেখল অবনী। ভিক্ষের চাল, পাঁচমিশাল। আতপ চালের চেয়ে অনেক ভালো। বাজারে এখন চালের দাম দু-টাকা কেজি! দেড় টাকা হিসেবে দু-কিলো চাল মেপে দিল আল্লারাখি, হাতের মাপে দু-কিলো। অবনীর সন্দেহ হলে আল্লারাখি আল্লার কিরা করল। 'বরঞ্চ বেশি হবে কম নয়!' চালগুলি নিয়ে অবনী ঘরে ফিরল। শ্যামা ডেকচিটায় চাল ঢালতে-ঢালতে অনুমান করল ব্রাহ্মণ আতপচাল দেয়নি। শেষ পর্যন্ত কোথা থেকে নিয়ে এসেছে তাও বুঝতে পারল। তারও ভাবনা কম নয়। আজ না হয় কোনো রকমে চলে গেল, কাল? খেজুরপাতগুলো শুকনো হলেও হয়তো রাতারাতি একখানা চাটাই করে বেচতে পারত। তাও তো শুকোবে না। একদিনের রোদে সবুজ পাতাগুলি কখনোই শুকোতে পারে না। অবনী একঘটি জল খেয়ে বলল, 'আমি বেরাই, একবারে দুবেলার রাঁধবে বুঝলে?'

'তা ত করব, তুমি কুথা যাচ্চ?'

'কৈবর্ত-পাড়ায়, যদি একমণ ধান পাই!'

'ক্ষেপেচ নাকি, বাড়ে ধান লিলে কুনুদিন শোধ করতে পারবে?'

'উপায় নাই আর!'

'তুমি বোসো, সব ঠিক হোয় যাবে।' অবনী এমনিতেই ক্লান্ত ছিল। বউ-এর সাহসের ইঙ্গিতে বসে পড়ল। 'সকাল থিকে ত খাওনি, মুড়ি রোয়চে, তমার তরে রেখেচি!' কাঁসিতে মুড়ি দিল শ্যামা। বেশি করে জল ঢেলে অবনী মুড়ি ভিজিয়ে খেল। শ্যামা বেড়ার ধার থেকে লঙ্কাগাছ থেকে লঙ্কা তুলে দিয়েছিল। তাতে কামড় বসিয়ে ঝালে বিব্রত হয়ে পড়ল। গেলাসের পর গেলাস ভর্তি জল খেয়েও ঝাল মেটে না। শ্যামা হাসতে-হাসতে সরে গেল। 'পারুর মত তুমিও ঝাল খেতে জাননি!'

'দেখে বুঝিনি, হুনমান হলে এতখন গালে চড় মারত!'

অবনীর ঝাল লেগেছে, ঝালের চোটে গালে চড় মারার ইচ্ছে হচ্ছে। এই সময় হনুমান হলে কিভাবে ছটফট করে সে-দৃশ্য মনে করে শ্যামা ও অবনী হাসল। নাদা থেকে এক কোয়া তেঁতুল নিয়ে এসে দিল শ্যামা। অবনী তেঁতুল চেটে ঝাল মেটাবার প্রয়াসে ব্যস্ত হলো। পারুল একটা ছোটো শিশিতে নারকেল তেল নিয়ে শ্যামাকে দিল। শ্যামা দু-পা ছড়িয়ে পারুলকে সামনে বসিয়ে মেয়ের চুল বাঁধতে বসল। নারকেল তেলের গন্ধটা ভাল নয়। অবনী নাক সিটকোল। 'পচা তেলটা!'

'দু-পয়সার তেল পচা বলেই এতখানা দিয়েচে!'

পরেই অবনীর খেয়াল হলো, তার গায়ের খোসের গন্ধের চেয়ে তেলের গন্ধটা ভালো। কলাপাতায় মোড়া মলম একদিকে পড়ে রয়েছে। মলমের গন্ধটাও ভালো। পাছায় কাপড় সেঁটে বসেছে। উঠে দাঁড়িয়ে খোসের ওপর থেকে কাপড়টা খসিয়ে বলল, 'লেয়ে আসি!'

'যাও ছাগলগুলান আজ বাঁধা আছে দেখবে ত! একটু লেড়ে দিবে!'

'পাতকাটি দাও না, দুটো ডালা-পালা কেটে লিয়ে আসি!'

ঘরের চালে বাঁশের ডগায় বাঁধা পাতকাটি ঠেসান ছিল। হাতের তেলোয় তেল নিয়ে, সপ্-সপ্ করে ঘসে শরীরের চারদিকে পাঁচ আঙুলের দাগ বসিয়ে একটু মালিশ করে বাঁশটা কাঁধে তুলে নিল। ছাগলে বাঁশপাতা অথবা অশথপাতা খেতে খুব ভালোবাসে। বাঁশপাতা কাটা এখন সম্ভব নয়,

রায়গিন্নি চেঁচামেচি করবে। গাঁয়ের একধারে অশথ গাছটার তলে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ পাতার মর্মরধ্বনি শুনল। এমন উঁচু ডালগুলি বাঁশে কুলোল না, দেখে অবনী গাছে উঠতে বাধ্য হলো। গাছের গুঁড়িতে সিঁদুর দিয়ে স্বস্তিকা চিহ্ন এঁকে গেছে গ্রামের ধার্মিক মেয়েরা। চিহ্নগুলি দেখে গাছে উঠতে দ্বিধা এলেও অবনী উঠতে বাধ্য হলো। কারণ গ্রামের এই অশথ গাছটিই খুব কাছের; যত লোক এই গাছটা থেকে পাতা কেটে নিয়ে যায় ছাগল ভেড়ার জন্যে। এখন গাছটার এমন অবস্থা, কাছাকাছি কোনো ডালেই পাতা নেই। অবনী কিছুদূর উঠে ডাল কেটে ফেলল অনেকগুলি। মাথায় করে নিয়ে এসে ছাগলের ঘরে রেখে চান করতে গেল। পারুল বলল, 'আমি যাচ্ছি বখরীটাকে লিয়ে এসব!' পারুলের চুলে তেল দিয়ে খোঁপা করে বেঁধে দিল শ্যামা। তারপর উনুনে শুকনো তালপাতার আগুন জেলে ভাত চড়াল। পারুল ছাগলগুলো এনে ডাল-পালার মধ্যে ছেড়ে দিতেই মচ্-মচ্ করে পাতা চিবোতে থাকল। এতক্ষণ ডাঙায় বাঁধা ছিল, খিদে পেয়েছে! অবনী চান করে এল। শ্যামার রান্না দেখতে-দেখতে মাছির তাড়ায় বিব্রত হয়ে উঠল। 'পারুল দেত বিষ ঢেলে!' পারুল মলম লাগিয়ে দিল খোসগুলিতে। মাছিগুলি চারদিকে উড়ছে, খোসের ওপর বসছে না। অবনী মাছিগুলির এরকম অবস্থায় মজা পেল। শ্যামা রোদ থেকে খেজুরপাতাগুলো তুলে নিয়ে এল। একদিনের রোদে শুকোয় না, দু-তিনটে রোদ খাওয়াতে হয়। কিন্তু উপায় নেই। আজ একবেলা ও কাল একবেলার মতো খাদ্য রয়েছে। পরশু হাটবার। দু-খানা চাটাই না বুনলেই নয়। ডাল থেকে পাতাগুলো ছিঁড়ে, কাঁটা কেটে তাড়া বেঁধে রেখেছে। অবনী দেখল। কিছুক্ষণ নানাদিক ভেবেই বলল, 'শুকায়নি, তালোই করলে ব্যারবেরে হোয় যাবেনি?' শ্যামা কোনো উত্তর দিল না। ভালোভাবে পাতা না শুকিয়ে চাটাই বুনলে পরে শুকিয়ে কুঁচকে পাতলা হয়ে যায়, আঁটুনি ঢিলে হয়। ভাবনা খুবই সঙ্গত, কিন্তু শ্যামার উপায় নেই। হাতে মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা সময় রয়েছে, দরকার হলে আগামীকাল রাতটাও জাগতে হবে। তবু পরদিন সকালে ঘণ্টাখানেক রোদে পাতাগুলো বিছিয়ে সংসারের প্রয়োজনীয় কাজ সেরে চাটাই বুনতে বসল। চোদ্দ-পাটিরই বুনবে, সময় পেলে ষোলপাটির। চোদ্দপাটির চাটাই ষোলপাটির চেয়ে কম লম্বা-চওড়া হয়। একটানা কাজ করতে থাকল, যে-চালগুলি

ছিল পারুল ধোঁয়ায় কান্নাকাটি করতে-করতে হাঁড়িতে চড়াল। শ্যামা পারুলের এই অবস্থা দেখে আগুন। 'উনানটাও ধরাতে জানেনি!'

'সব ভিজা!'

'তুলে রাখতে পারুসনু? হিমে ভিজতে দিবি!'

অবশ্য পারুলেরও পুরো দোষ নয়। গতকাল পেটের ভাত জোগাড় করতেই মানুষ তিনটির মানসিকতার ওপর দিয়ে জ্বালাময় বিদ্যুৎ খেলে গেছে। পারুলের এসব বিষয়ে ভাবনার বয়স না হলেও, মা-বাবার পাশে-পাশে থেকে সব কিছু ভাবতে শিখেছে, তাছাড়া খিদে গেলে তার অসুবিধাটা অন্যান্য বয়স্ক লোকদেরই মতো সমান। ফলে জ্বালানিগুলি তুলে রাখতে ভুলে গেছে, কারো মনে হয়নি যে হিমেল হাওয়ায় ওগুলি ভিজে যেতে পারে। এখন পারুলের চোখের জলের শেষ নেই। শ্যামা ধোঁয়ার মধ্যেই বসে বসে চাটাই বোনায় নিমগ্ন। অস্বস্তি বোধ হলেও বাইরে বসতে পারছে না, কড়া রোদ বাইরে। ধোঁয়া কমানোর জন্যে বাঁশের চোঙা ফুঁকলো গিয়ে, তবু কি ধোঁয়া কমে। পারুল রোদে এসেই চোখ জুড়োচ্ছিল। লম্বা তালগাছটার মাথায় সূর্য ঝলমল করছে। সূর্যের দিকে লালচোখ তাকাতেই চোখের সামনে শুকনো তালপাতা ঝুলে থাকতে দেখে প্রার্থনা করল, 'একটা পাতা খসে পড়!' তাকি পড়ে? এই ভর দুপুরে চরাচরে হাওয়া কোথায়? ঝিঙেফুলগুলিও কুঁকড়ে শুকিয়ে যাচ্ছে। শ্যামা উনুনের সঙ্গে লড়াই করে বিরক্ত হয়ে, পাতা ইত্যাদি নিয়ে চলল বাঁশতলায়, সেখানে ধোঁয়া নেই ছায়া রয়েছে। 'কুনুরকমে ভাত সিদ্ধ কর!' পারুলকে হুকুম করে দিল। সে অবশ্য পালন করল। খাবার সময় সকলেই বুঝতে পারল কেমন ভাত রান্না হয়েছে। তবু ফ্যান-ভাত নুন দিয়ে সকলেই তৃপ্তির সঙ্গে খেল। তখন বিকেল হয়ে গেছে। অবনী একদিকে খোসে মলম লাগিয়ে শুয়ে পড়ল, ছাগলগুলোকে পাতা কেটে দিয়েছে, পাশের ঘরে পাতা চিবোচ্ছে। খাসিটাকে শিয়ালে ধরে নিতে আর মাঠে চরাতে নিয়ে যায় না পারুল। আট হাত-চার হাত দু-খানা চাটাই বুনতে শ্যামার রাতভোর হয়ে গেল। হাটে খুব তাড়াতাড়ি পেঁছাতে হবে, নইলে বিক্রি করার অসুবিধা হয়। অবনীও শেষ পর্যন্ত শ্যামার সঙ্গে হাত লাগিয়ে চাটাই করা সমাপ্ত করল। অবনী গুটিয়ে কাঁধে নিয়ে রওনা হবার সময় শ্যামা বলল, 'প্রথমে দু-টাকা বলবে, দেড় টাকার কমে বিচবেনি!'

বাজার যেরকম খারাপ বিক্রি করাই এক সমস্যা। সকলেই গরজ ঠাওরায়। অবনী হাটের মাঝখানে বট গাজটার গুঁড়িতে চাটাই তুটি ঠেসিয়ে বসে রইল। অনেকে এল, দর করল চলে গেল। কেউ কেউ বলে গেল, 'ই-বছর একটা শীতলপাটি দিস ত অবনী!' অবনী সেইমতো অর্ডার নিল। মনে মনে কেবলই ভাবল কখন প্রকৃত খদ্দের আসবে। অবনীর মতো গরিব-দুঃখী মানুষ পাশে বসল, অবনীকে বিড়ি খেতে দিল, গল্প করল, চাটাই বিক্রি হচ্ছে না। বাধ্য হয়ে চাটাই দুটি বাজারের তুলনায় কমদামে বিক্রি করে বাড়ি ফিরল। শ্যামা শুয়ে রয়েছে, পারুল কোথায় বেরিয়েছে। অবনী পুকুরঘাট থেকে পা-হাত-মুখ ধুয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, 'কি হল আবার!'

'কমরটায় বেদনা!'

ব্যথা হওয়া স্বাভাবিক। একটানা বসে বসে কাজ করতে হয়েছে। অবনী পাশে বসে অনেক কিছু ভাবতে ভাবতে বলল, 'বাজার খুব খারাপ, ই-বাজারে বাঁচতে পারবনি!' শ্যামা কথাগুলি শুনল ও সায় দিল। অবনী আল্লারাখির কাছে ঋণ শোধ করে অবশিষ্ট অর্থেই বেঁচে গেল। বাজার সত্যিই খারাপ, খাদ্য-দ্রব্যের দাম প্রচণ্ড হওয়া সত্ত্বেও অবনী মরল না। তার এত কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও কারো চুরি-ডাকাতি না করে, কাউকে দায়ী না করে অবনী-শ্যামা-পারুল আরো কয়েকদিন বাঁচবার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠল। অবনী শ্যামার কোমরে তেল মালিশ করে দিল, পারুল অবনীর খোসে মলম লাগিয়ে দিল। দিব্যি একএকটি দিন আসে কোন ফাঁক দিয়ে যে মানুষ তিনটি বেঁচে যায় কেউ টের পায় না। অবনী তবু মাঝেমাঝে বলে, 'ই-বাজারে বাঁচতে পারবনি!' আর সকালবেলা রায়বুড়ো ঘরামীর কাজের জন্যে ডাকলে অবনী লাফিয়ে চলে যায়।

'হোয়চে, আর বছর দিইনি; দু-বছর হয়ে গেল! ই-বছর না দিলেই লয়!'

'তবে বাড়োই লাগাওনি কেনে?'

'খুব টানাটানি চলছে!'

'তমাদের আবার টানাটানি!'

'নারে টাকাকড়ি একদম নাই! ই-মাসটা যাগ!'

অবনী অনেক চেষ্টা করেও আজও কাজ পেল না। কেউ ঘরামীর কাজ করায় কিনা খোঁজ করতে বেরিয়েছিল। কদিন দেখছে, রায়বুড়োর ঘরের ছাউনি পচে গেছে। দু-চারবার হনুমান লাফালে দফা-রফা। হনুমানের অত্যাচারও কমে গেছে। গত বছর কত হনুমান মেরে ফেলল। হনুমানের মৃত্যু দেখে অবনীর ধারণা হয়েছিল—হনুমান অমর নয়। বুকে তীর বিঁধে গেছে। গাছ থেকে নেমে এসে রায়বুড়োর পা জড়িয়ে ধরল। রায়-বুড়ো যদিও হনুমান মারতে হুকুম দিয়েছিল, এ-রকম আত্মসমর্পণে বিগলিত হয়েও সেই হনুমানটিকে বাঁচাতে পারেনি, তবে হনুমান মারা বন্ধ করেছিল। আর কয়েকটি মাত্র বংশের বাতি জ্বালিয়ে রয়েছে। ঐ অবশিষ্ট হনুমানের অত্যাচারে চাল ফুটো হয় না। এক-বছরের ছাউনি দু-বছর টেঁকে, ফলে ঘরামীরও কাজ পাওয়া যায় না। অবনী হতাশ হয়। শুধু কল্কেটা হাতের মুঠোয় নিয়ে তামাকে টান দেয়। তারপর ঘরে ফেরার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

'দাঁড়াও আমিও যাব!'

'চল!'

অবনী খুব দ্রুত হাঁটছিল। অর্থাভাবজনিত ভাবনা তাকে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে তাড়িত করছে যেন। শ্যামা কিছুতেই পায়ে পা মিলিয়ে চলতে পারছিল না। মাঝে-মাঝে দৌড়ে পাশে আসতে হচ্ছে। ঘরের সামনাসামনি এলে অবনীর হাত ধরে ফেলল। তখন চারদিকে অন্ধকার, কোনো শব্দ নেই কোথাও। গেরস্ত-ঘরে আলোর ঠিকানা ছাড়া আর কিসেরও হদিস পাওয়া যায় না। শ্যামা আস্তে চলতে অনুরোধ করল। অবনী অনুমান করল, শ্যামা কিছু বলার জন্যে বড় উতলা হয়ে রয়েছে। অবনী বলল, 'কি বলবে বল।'

'পারুকে মারবেনি, আমি খুব মেরেচি!'

'কেনে?' অবনী থমকে দাঁড়াল।

'বখরাটা শিয়ালে লিয়েচে !'

শ্যামার কথা শেষ হলো-কি-হলো না, অবনী দৌড়ে ঘরের দিকে গেল। পারুল তার আগেই আত্মগোপন করেছে। সামনে শ্যামাকে পেয়ে রাগ বাড়ল, দু-ঘা দিয়েও দিল। 'যেমন মা তেমনি মেয়ে!' শ্যামাকে উত্তম-মধ্যম দিয়ে অবনী এক-কোণে বসল। কিছুক্ষণ চোখের জল মুছে শ্যামা যা আছে তাই ফোটাতে হাঁড়ি চড়াল। পারুল সেই কখন থেকে পালিয়েছে, ঘরে ফেরেনি। রান্না হয়ে গেল, অবনীর খাওয়াও হলো, পারুল ফিরল না। শ্যামা তেলের বাটি নিয়ে একদিকে রেখে, অবনীর জন্যে বিছানা করল। কাঁথাটা বিছোতে গিয়ে রক্তের দাগ দেখে একটু থমকে দাঁড়াল। অবনীর ব্যায়রাম, সারাজীবন গায়ে খোস। বাচ্চাবেলা থেকে এই রোগ, মাঝে কিছুদিন ঠিক হয়ে গেলেও শীতের হাওয়া পড়লেই খোসগুলো উজিয়ে ওঠে। রাতে শোয়া-কষ্ট, সকালে বিছানা ছাড়ানো যায় না। টেনে তুললেই রক্তারক্তি। কাঁথাটা কেচে দিলে দাগগুলো মিটে যায়, সাবানের অভাবে হয় না। বিছানা পাতা হয়ে গেলে অবনী শুয়ে পড়ল, শ্যামা খোসের ওপর তেল লাগাল। পারুলের কথা ভাবতে-ভাবতে শ্যামা বলল, 'ঝপ করে ঘুমি পড় !'

'ঘুম কি হাতের মোয়া, বললেই ঘুমি পড়ব !' অবনী রেগেই আছে।

'পারু যে হিমে ভিজচে; শেষে রোগ-লাড়া হবে !'

'মরুক !'

'তুমি মারবেনি বল, ডেকে লিয়ে আসি, আমি যে খুব মেরেচি !'

'এই করেই মাথায় তুলেচ ! মারবেনি পূজা করবে ?'

'অর কি দোষ, আমাদের কপাল।'

'তালে ডেকে লিয়েস !'

অবনী এতক্ষণে সবকিছুর উৎস খুঁজে পেল। কপাল মন্দ না হলে এমন হয় না। শ্যামা লণ্ঠনটা নিয়ে বেরোলো। আদর করে ডাকল। কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। সন্ধ্যাদের ওখানে নেই, গাঁয়ের কোনো বাড়িই নেই। পারু, পারু! শেষ পর্যন্ত দেখল, বাঁশতলায় পারুল হাঁটু মুড়ে চুপচাপ বসে রয়েছে। এখানে ঘোষেরা গোরু বাঁধে, খড় দেয়। শ্যামা মেয়েকে আদর করে টেনে তুলতেই পারুলের রাগ বাড়ল। সে কিছুতেই ঘরে যাবে না। তথাপি মায়ের আদরের ফলে পারুল রাগের চোটে কেঁদে ফেলল 'আমার লাগেনি বুঝি, কত মারলে আমাকে !'

'বখরাটা খেয়ে লিল, তোর বাপের যে কত বাজচে তুই বুঝবিনি !'

পারুল ও শ্যামা ঘরে এলে অবনী দেওয়ালের দিকে মুখ করে শুয়ে রইল। মেয়ের মুখ আর দেখতে ইচ্ছে নেই। মেয়ে ও বউ-এর খাওয়াকালীন শব্দ হলো কিছুক্ষণ, তারপর মুখ ধোবার সময় জল ঢালার শব্দ, এরপর অবনীর রাগ পড়ে গেল। শ্যামা মেয়েকে মাঝখানে রেখে শুয়ে পড়ল। তালপাতার বেড়া দিয়ে ঘরখানা দু-ভাগ করা। একদিকে ছাগল থাকে, অন্যদিকে মানুষ। ছাগলের গন্ধ নতুন করে অনুভব করল অবনী। টুকটাক ভাবনা ভাবতে-ভাবতে আরো একটি দিনের মুখ আলোকিত হলো, কিন্তু অবনীর সমস্যার কোনো পরিবর্তন নেই। শ্যামা সকালবেলা উঠেই যা পুঁজি ছিল অবনীর হাতে দিয়ে রায়গিন্নির ওখানে একটুকরো সাবান পাওয়া যায় কিনা দেখতে গেল। অবনী আকাশ-পাতাল ভেবেও নিরুপায় বসে রইল। কিছুক্ষণ পরে শ্যামা ফিরে এল, বেলা একটু বাড়লে রক্তমাখা কাঁথাটা নিয়ে পুকুরঘাটে গেল, পারুল সঙ্গে। কখনো শ্যামা কখনো পারুল সাবান লাগিয়ে কাঁথাটা পায়ে দলল। প্রায় একটা পুরো সানলাইট কাঁথায় লেগে গেল, সোডা দিয়ে ফোটালে এতখানি লাগত না। তবু বিনাপয়সায় সাবান দিল রায়গিন্নি, তাতেই শ্যামা কৃতজ্ঞ। কাঁথাটা শেষ-মেশ ধুয়ে চাতালে রেখে পারুলকে টেনে জলে নামাল। কি কাণ্ড ! বাঁশি পাতার মতো সাবানটা পারুলের মাথায় ঘষে উকুন কমাতে শ্যামার আগ্রহ বেড়ে গেল। সাবান জলে চোখ জ্বলতে থাকল, কিছুই করার নেই, পারুল কাঁদো-কাঁদো হয়ে ঘাটের সিঁড়িতে বসে রইল। বলল, 'মাগো চোখ জ্বালা করে !'

শ্যামা রেগে গিয়ে, মাথাটা যেহেতু আয়ত্তে আছে, জোরে নাড়িয়ে দিল। 'মুখপুড়ি ডেঙর করেছ কেনে, মাথায় ?' পারুলেরই হাত রয়েছে এসব পোকার উৎপাদনে এমনভাবে শ্যামা বলল। কিন্তু পারুলের এত ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সাবানের জ্বালা সহ্য করতে পারছে না। এই জল ঢালবে তার মা, এই জল ঢালবে ভেবে-ভেবে শেষ পর্যন্ত কেঁদেই ফেলল। কান্নার জন্যে শ্যামা আরো বিরক্ত হলো, থামিয়ে দেওয়ার জন্যে গালে এক চড় মারল, তাতেও কান্না থামে না। তখনই শ্যামা বুঝতে পারল সত্যিই চোখ জ্বালা করছে এবার; তাই হাত ধরে টেনে জলে প্রায় চেপে ধরল। সাবান জল ধুয়ে তবে পারুল ভেসে উঠল।

'এতখন ডুবে থাকতে পারু ?'

শ্যামা ও পারুল পুকুরপাড়ে চেয়ে দেখে অবনী দাঁড়িয়ে রয়েছে। পারুল এক ডুবে পুকুরের কতখানা যেতে পারে তার বর্ণনা দেওয়ার উপক্রম করলেই শ্যামা ধমক দিয়ে থামিয়ে দিল। 'আর কান্না নাই, যা উঠে যা!' পারুল ভয়ে-ভয়ে উঠে চলে গেল। শ্যামা জলে গা ডুবিয়ে কাপড় ভাসিয়ে দিল। অবনী এখন দাঁড়িয়ে আছে দেখে একটু তিরস্কার করল। তারপরই রায়েদের রঘুনাথের মন্দিরে ঘণ্টাধ্বনি শোনা গেল। শ্যামা বুকে কাপড় জড়িয়ে পিছন ফিরে দেখল, অবনী চলে যাচ্ছে। চেঁচিয়ে বলল, 'পুরুৎ ঠাকুর এসচে দেখ!' অবনী মন্দিরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দেখল, পুজারী ব্রাহ্মণ পঞ্চপ্রদীপ এক হাতে অন্যহাতে ঘণ্টা নিয়ে আরতী করছে। ব্রাহ্মণের খালি গা, পিঠ-পেট-ছাতি-কাঁধ হয়ে পৈতেটা প্রলম্বিত। হাঁটুর ওপরে একটা ধুতি, লজ্জার বস্ত্র। ব্রাহ্মণের মাথায় ও বুকের চুল শাদা হয়ে গেছে। নাকটা তীক্ষ্ণ। পঞ্চপ্রদীপের আলো মুখটাকে উদ্ভাসিত করছে। মন্ত্রোচ্চারণের ফলে মন্দিরের ভিতরটা গমগম করছে। দরজার সামনে অবনীকে মাঝে-মাঝে দেখছে। অবনী ব্রাহ্মণের মুখ দেখে অনুমান করার চেষ্টা করছে — ঠাকুর ক্রুদ্ধ কি-না! পূজা শেষ হলে পিঁড়ির ওপর বসে, মন্ত্রোচ্চারণ করতে-করতে যা-কিছু নৈবেদ্য একখানা গামছায় বেঁধে নিল ব্রাহ্মণ। দরজার সামনে থেকে একদিকে সরে দাঁড়াল অবনী। মন্দিরের দরজা বন্ধ করতে-করতে ব্রাহ্মণ বললেন, 'তোকে দুবনি. পদু দেড় টাকা করে দিয়েছে!'

পায়ের ধুলো নিয়ে অবনী বলল, 'না ঠাকুরমশায়, না দিলেই লয়!'

'তুই ত বার-আনা দিবি, আমার লকসান!'

নৈবেদ্য হিসেবে ব্রাহ্মণ যে-আতপচাল পায়, তার কে. জি. হিসেবে মূল্য দেড় টাকা। এই দেড় টাকা মূল্য পদু-ময়রা দেবে, কিন্তু অবনী তা দিতে পারবে না। ফলে ব্রাহ্মণ কিছুতে রাজী নয়। অবনীর ঘরে হাঁড়ি চড়বে না, ব্রাহ্মণের দায় নয় হাঁড়ি চড়ানো। কাজেই ব্রাহ্মণ কাঁধের ওপর চালের পোঁটলা ঝুলিয়ে কুঁজো হয়ে এগিয়ে চলল। অবনী পিছনে-পিছনে নানা দুঃখের কথা শোনাল। পদু ময়রার দোকানে এসে সে এক নিমেষে তার দুঃখ ব্রাহ্মণের অন্তরে প্রবেশ করানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো। পদুর দোকানটা হাটের একদিকে। পাঁচ গাঁয়ের একমাত্র মিষ্টির দোকান। জিলিপি, রোঁদে, বোঁদের মিঠাই, তেলেভাজা ইত্যাদি পাওয়া যায়। পদু তখন উনুনে কড়াই চড়িয়ে একটা দালদার টিন উপুড় করছিল। ব্রাহ্মণকে দেখে সাদর অভ্যর্থনা জানাল।

আন্দাজ মতো ঘি ঢেলে ব্রাহ্মণের সঙ্গে ব্যবসায়ীর মতো কথা শুরু করল। অবনীর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী পচু ময়রা। রোষে দপদপ করে উঠছে অবনীর ভিতরটা। নড়বড়ে বেঞ্চে বসে ব্রাহ্মণ আতপ-চালের পোঁটলা খুলে পচুর সামনে ধরল। পচু চালগুলি পাত্রে নিয়ে সহকারী সন্তানকে বললে, 'তিনটাকা দিয়ে দে ঠাকুর মশায়কে!'

'দেখলি, দেখলি, তুই কত দিতিস? দেড় টাকা।' অবনীকে প্রায় ভেঙচি কেটে ব্রাহ্মণ বলল। অবনী ঠায় দাঁড়িয়ে সহ্য করল। পচু কড়াইয়ে ছান্তা ডোবাল! একটি শিশু এক-আনার ফুলুরী নিয়ে খেতে-খেতে চলে গেল। ব্রাহ্মণ টাকা গুণে নিয়ে চলে গেল। অবনীর কিছু করার নেই, নিরুপায়। বাইরে যে-বেঞ্চিটা পাতা রয়েছে, তাতে বসে-বসে মাছি তাড়াতে থাকল। ভেজা আতপ-চালও সে কিনতে পারল না। কয়েকটা মাছি মুঠোয় ধরে বেঞ্চের ওপর আছড়ে দেয়। কোনোটাই মরে না, উড়ে পালায়। পচু এক-ছান্তা মিহিদানা তুলে ঝাড়তে-ঝাড়তে বলল, 'ধান ঝাড়চু যে অবনী!'

'আর কেনে বল, মিষ্টির দোকান লয় নদ্দমা!'

'কেনে? চালগুলান আমি লিয়ে লিলম বলে!'

'তা লয়! মাছির রাজত্ব এখেনে!'

পচু ময়রা হাসল। পচুর ছেলেটা আলমারীর ভিতর থেকে মাছি খেদাচ্ছিল সেও হেসে উঠল। বলল, 'তমার খোস ত মোলেও যাবেনি!'

'তা ঠিক!'

'মলম লাগাওনি কেনে?'

'ফুরি গেছে, আজ ডাক্তারবাবুর কাছে যাব, মলম লিতে হবে!'

'জ্যোতির বউকে দেখতে এসছে ডাক্তারবাবু যাও না!'

অবনী খবর পেয়েই উঠল লাফিয়ে। বেঞ্চটা মচমচ করে শব্দ করল। একদল মাছি ভনভন করে উড়ে গেল। জ্যোতি সরকারের বাড়ির দাওয়ায় এসে একদিকে মাটিতে বসল অবনী। সদর ঘরে একটা চৌকি পাতা, চৌকির পাশে বদনা, বদনার মাথায় তোয়ালে। একপাশে একটুকরো সাবান। সাবানটা লাল রঙের; কোন ধরনের অবনী জানে না। ডাক্তারবাবু রোগী দেখে জ্যোতির সঙ্গে কথা বলতে-বলতে বেরিয়ে এল। জ্যোতি তোয়ালেটা কাঁধে ফেলে ডাক্তারবাবুর হাতে বদনা থেকে জল ঢেলে দিল, সাবান ধরিয়ে দিল। জ্যোতির এমন ভাব যেন ডাক্তারবাবুর সেবা করলে বউ-এর অসুখ ভালো হয়ে

যাবে। ডাক্তারবাবু হাত ধুয়ে তোয়ালেয় মুছতে-মুছতে অনেক কথাই বলল। যাবার সময় বলল, 'তোমাকে আর যেতে হবে না জ্যোতি, অবনী আছে!' অবনী হাসল। ডাক্তারবাবুর ওষুধের বাক্সটা নিয়ে পিছন-পিছন হাঁটতে থাকল, জ্যোতিও কিছুদূর এগোল, তারপর বাড়ি ফিরে গেল। এবার অবনী কথা বলার সুযোগ পেল।

'ঘড়াটা মরে যেতে আপনার অনেক কষ্ট!'

'কি মলম ফুরিয়েছে বোধহয়!'

'ফুরিচে ডাক্তারবাবু, ফুরিচে; তবু আপনার কষ্ট হচ্ছে কিনা বলুন! ইথান থিকে বেঙরাল যেতেও আপুনি ঘড়ায় চড়তেন, এক পাউড়ি মাটিতে পাতেননি! ঠিক কি-না বলুন! আপনার খুব কষ্ট হচ্চে ডাক্তারবাবু! একটা ঘড়া কিনেন, আমি সহীস হব!'

'সেদিন আর নেই অবনী! এই তো জ্যোতির বউকে দেখতে এলাম, অবশ্য বাঁচবে না, মাত্র দু-টাকা দিল! বাজারে পয়সা কোথায়?'

'ডাক্তারবাবু, বাঁচবেনি! ই-তল্লাটে অমন মেয়ে নাই!'

'হুঁ ভালো লোকই তো আগে মরে!'

'না ডাক্তারবাবু, মরতে দিলে চলবেনি!'

'খুব অসময় বুঝলি, অনেকদিন আগেই চিকিৎসা করানো উচিত ছিল, চেপেছিল এদ্দিন!'

'ভাল করেনি? আপনি ত সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী! মনে আছে, পালেদের বউয়ের গলা শুকি গেল! মর-মর, আপনাকে ডেকে লিয়ে গেল, কত ওষুধ দিলেন! তখন ঘড়াটা ছিল! আমি দেখছিলম নিজের চোখে! কুনু ওষধ কাজ করলনি! শেষকালে আপুনি নাদা থিকে একদলা পুরনো তেঁতুল দেখি লালসা দিলেন; আহা পালবউর জিব ভিজে জল, আর, যারা ছিল, সবারই জিব সমুদ্দুরে ভাসছিল!'

ডাক্তারবাবু জোরে হাসছিলেন। 'আমার কিছু হয়নি!'

'আপনি ধন্বন্তরী, সব পারেন!'

ডাক্তারখানায় এসে অবনী ওষুধের বাক্সটা কমপাউণ্ডারের হাতে দিয়ে বাইরে বসে মাছি মারতে থাকল। খোসের মলম তো পাওয়া যাবে, পেটের খোরাকের কি করবে তাও ভেবে কূল পায় না। কিভাবে যে বলবে তাও বুঝতে পারছে না ডাক্তারবাবু না বলে দিলে ওনার স্ত্রী এক-দানা চাল দেবে

না। ডাক্তারবাবুর জন্যে কত রোগী অপেক্ষা করছে, সকলেই ওষুধ নিচ্ছে চলে যাচ্ছে। অবনী ঠায় বসে রইল। তার ওষুধ চাল, ভাত। শ্যামা এখন কি করছে কে জানে। পারুল হয়ত ছাগলগুলো নিয়ে বেরিয়েছে। আজও যদি শেয়াল নেয়, একেবারে কেটেই ফেলবে পারুলকে। এরকম ভাবনা চকিতে খেলে গেল মনে। খোসের জ্বালায় স্থির বসতে পারছে না। ডাক্তারবাবু অবনীর এরকম অবস্থা লক্ষ্য করে কমপাউণ্ডারকে নির্দেশ দিলেন, কিছুটা মলম তৈরি করে দিতে। অবনী দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে মলম তৈরি দেখল। কমপাউণ্ডারের কানের কাছে প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'খোসের ওষুধ দিলেন, পেটের ছ্যান !'

'পেটে আবার কি ?'

'হাঁড়ি চড়বেনি আজ !'

'না, কানাকড়ি নাই আমার !'

অবনী মুখ চূন করে ডাক্তারখানার বাইরে বেরল। এখন দুপুর। সূর্য মাথায় উঠবে এমন চড়া রোদ ছড়িয়েছে। কোনো উপায় না দেখে তার মাথা প্রায় খারাপ। ঘরে গিয়ে পেটে হাত রেখে শুয়ে পড়বে এমন চিন্তাও হচ্ছে। দূর থেকে দাঁড়িয়ে ঘরখানা দেখছে। ঘরের বাইরে উঠোনে বসে পারুলের উকুন বাছছে শ্যামা। নিজের চুলও এলো করে দিয়েছে রোদে। অবনী দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখলে কি ভাবত কে জানে! বউকে দূর থেকে দেখে আর ঘরে ফিরতে ইচ্ছে হয় না। বউকে খেতে দিতে পারবে না, মেয়েকে খাওয়াতে পারবে না, সে কেমন পুরুষ। শ্যামা পারুলকে কোথায় যেতে বলল হয়ত, পারুল উঠে চলে গেল। অবনী লুকোবার জন্যেই হয়তো শ্যামার দৃষ্টির আড়ালে যেতে চেয়েছিল। পিছন ফিরে দেখল আল্লারাখি ঝুলি কাঁধে মাঠে নামছে। অবনী হাঁক দিয়ে দৌড়ে গেল তার দিকে। আল্লারাখিকে খাতির করে একটু বসতে বলল। রোদে হাঁটতে-হাঁটতে বুড়ি একেবারে আমসি হয়ে গেছে। আল্লারাখির অনেক দুঃখ। স্বামী মারা যাবার পর অনেকে নিকে করল, তালাকও দিল। প্রথম স্বামীর একমাত্র সন্তান পিঠে করে ভিক্ষে করে ফিরতে হলো। পিঠেই সেই সন্তান প্রাণ হারাল। আল্লারাখির অনেক দুঃখ। সে ভিক্ষে করে বুড়ি হয়ে গেল। জোয়ান বয়সে ধান ভেনেছে, ধানকল গাঁয়ে বসতে সে-পাটও চুকে গেল। আল্লারাখি পথ চলতে-চলতে বুড়ি হয়ে গেল।

'ঘামে লাইচু যে!'

'ঘাম দিবেনি ত কি!'

'বোস না!'

'সময় নাই, এক মুঠা ফুটি খেতে হবেনি?'

'সেত আমাকেও ফুটাতে হবে, দেনা দু-কেজি চাল!'

'দেড় টাকার পাই কমে দুবনি, ঠাকুরমশায় ভিজা চাল দেড় টাকায় বেচে।'

'দুব দুব, দেড় টাকাই দুব, তুই দে দু-কেজি!'

'নগদ, ধারে দুবনি।'

'আজ আদ্দেক দুব, পরে…!'

'হবেনি!' বলে আল্লারাখি রাগ করে উঠে পড়ছিল, অবনী হাত ধরে বসিয়ে দিল। চোখ দপদপ করছে অবনীর। সে মরিয়া হয়ে উঠেছে। 'তুইও দুঃখী আমিও দুঃখী সংসার করবিনি?'

'না!…'

'দেখ তোর কমর ভেঙে দুব!'

'কবে দিবে দাম?'

'পরশু, হাটে দিয়ে দুব!'

আল্লারাখি ঝুলি খুলল এতক্ষণে। অবনী যেরকম মরিয়া হয়ে উঠেছে, শেষপর্যন্ত কেড়ে-কুড়ে নেবে। চালগুলি একমুঠো তুলে দেখল অবনী। ভিক্ষের চাল, পাঁচমিশাল। আতপ চালের চেয়ে অনেক ভালো। বাজারে এখন চালের দাম দু-টাকা কেজি! দেড় টাকা হিসেবে দু-কিলো চাল মেপে দিল আল্লারাখি, হাতের মাপে দু-কিলো। অবনীর সন্দেহ হলে আল্লারাখি আল্লার কিরা করল। 'বরঞ্চ বেশি হবে কম নয়!' চালগুলি নিয়ে অবনী ঘরে ফিরল। শ্যামা ডেকচিটায় চাল ঢালতে-ঢালতে অনুমান করল ব্রাহ্মণ আতপচাল দেয়নি। শেষ পর্যন্ত কোথা থেকে নিয়ে এসেছে তাও বুঝতে পারল। তারও ভাবনা কম নয়। আজ না হয় কোনো রকমে চলে গেল, কাল? খেজুরপাতগুলো শুকনো হলেও হয়তো রাতারাতি একখানা চাটাই করে বেচতে পারত। তাও তো শুকোবে না। একদিনের রোদে সবুজ পাতাগুলি কখনোই শুকোতে পারে না। অবনী একঘটি জল খেয়ে বলল, 'আমি বেরাই, একবারে দুবেলার রাঁধবে বুঝলে?'

'তা ত করব, তুমি কুথা যাচ্চ?'

'কৈবর্ত-পাড়ায়, যদি একমণ ধান পাই!'

'ক্ষেপেচ নাকি, বাড়ে ধান লিলে কুনুদিন শোধ করতে পারবে?'

'উপায় নাই আর!'

'তুমি বোসো, সব ঠিক হোয় যাবে।' অবনী এমনিতেই ক্লান্ত ছিল। বউ-এর সাহসের ইঙ্গিতে বসে পড়ল। 'সকাল থিকে ত খাওনি, মুড়ি রোয়চে, তমার তরে রেখেচি!' কাঁসিতে মুড়ি দিল শ্যামা। বেশি করে জল ঢেলে অবনী মুড়ি ভিজিয়ে খেল। শ্যামা বেড়ার ধার থেকে লঙ্কাগাছ থেকে লঙ্কা তুলে দিয়েছিল। তাতে কামড় বসিয়ে ঝালে বিব্রত হয়ে পড়ল। গেলাসের পর গেলাস ভর্তি জল খেয়েও ঝাল মেটে না। শ্যামা হাসতে-হাসতে সরে গেল। 'পারুর মত তুমিও ঝাল খেতে জাননি!'

'দেখে বুঝিনি, হুনমান হলে এতখন গালে চড় মারত!'

অবনীর ঝাল লেগেছে, ঝালের চোটে গালে চড় মারার ইচ্ছে হচ্ছে। এই সময় হনুমান হলে কিভাবে ছটফট করে সে-দৃশ্য মনে করে শ্যামা ও অবনী হাসল। নাদা থেকে এক কোয়া তেঁতুল নিয়ে এসে দিল শ্যামা। অবনী তেঁতুল চেটে ঝাল মেটাবার প্রয়াসে ব্যস্ত হলো। পারুল একটা ছোটো শিশিতে নারকেল তেল নিয়ে শ্যামাকে দিল। শ্যামা দু-পা ছড়িয়ে পারুলকে সামনে বসিয়ে মেয়ের চুল বাঁধতে বসল। নারকেল তেলের গন্ধটা ভাল নয়। অবনী নাক সিটকোল। 'পচা তেলটা!'

'দু-পয়সার তেল পচা বলেই এতখানা দিয়েচে!'

পরেই অবনীর খেয়াল হলো, তার গায়ের খোসের গন্ধের চেয়ে তেলের গন্ধটা ভালো। কলাপাতায় মোড়া মলম একদিকে পড়ে রয়েছে। মলমের গন্ধটাও ভালো। পাছায় কাপড় সেঁটে বসেছে। উঠে দাঁড়িয়ে খোসের ওপর থেকে কাপড়টা খসিয়ে বলল, 'লেয়ে আসি!'

'যাও ছাগলগুলান আজ বাঁধা আছে দেখবে ত! একটু লেড়ে দিবে!'

'পাতকাটি দাও না, দুটো ডালা-পালা কেটে লিয়ে আসি!'

ঘরের চালে বাঁশের ডগায় বাঁধা পাতকাটি ঠেসান ছিল। হাতের তেলোয় তেল নিয়ে, সপ্-সপ্ করে ঘসে শরীরের চারদিকে পাঁচ আঙুলের দাগ বসিয়ে একটু মালিশ করে বাঁশটা কাঁধে তুলে নিল। ছাগলে বাঁশপাতা অথবা অশত্থপাতা খেতে খুব ভালোবাসে। বাঁশপাতা কাটা এখন সম্ভব নয়,

রায়গিন্নি চেঁচামেচি করবে। গাঁয়ের একধারে অশথ গাছটার তলে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ পাতার মর্মরধ্বনি শুনল। এমন উঁচু ডালগুলি বাঁশে কুলোল না, দেখে অবনী গাছে উঠতে বাধ্য হলো। গাছের গুঁড়িতে সিঁদুর দিয়ে স্বস্তিকা চিহ্ন এঁকে গেছে গ্রামের ধার্মিক মেয়েরা। চিহ্নগুলি দেখে গাছে উঠতে দ্বিধা এলেও অবনী উঠতে বাধ্য হলো। কারণ গ্রামের এই অশথ গাছটিই খুব কাছের, যত লোক এই গাছটা থেকে পাতা কেটে নিয়ে যায় ছাগল ভেড়ার জন্যে। এখন গাছটার এমন অবস্থা, কাছাকাছি কোনো ডালেই পাতা নেই। অবনী কিছুদূর উঠে ডাল কেটে ফেলল অনেকগুলি। মাথায় করে নিয়ে এসে ছাগলের ঘরে রেখে চান করতে গেল। পারুল বলল, 'আমি যাচ্ছি বখরীটাকে নিয়ে এসব!' পারুলের চুলে তেল দিয়ে খোঁপা করে বেঁধে দিল শ্যামা। তারপর উনুনে শুকনো তালপাতার আগুন জ্বেলে ভাত চড়াল। পারুল ছাগলগুলো এনে ডাল-পালার মধ্যে ছেড়ে দিতেই মচ্-মচ্ করে পাতা চিবোতে থাকল। এতক্ষণ ডাঙায় বাঁধা ছিল, খিদে পেয়েছে! অবনী চান করে এল। শ্যামার রান্না দেখতে-দেখতে মাছির তাড়ায় বিব্রত হয়ে উঠল। 'পারুল দেত বিষ ঢেলে!' পারুল মলম লাগিয়ে দিল খোঁসগুলিতে। মাছিগুলি চারদিকে উড়ছে, খোসের ওপর বসছে না। অবনী মাছিগুলির এরকম অবস্থায় মজা পেল। শ্যামা রোদ থেকে খেজুরপাতাগুলো তুলে নিয়ে এল। একদিনের রোদে শুকোয় না, দু-তিনটে রোদ খাওয়াতে হয়। কিন্তু উপায় নেই। আজ একবেলা ও কাল একবেলার মতো খাদ্য রয়েছে। পরশু হাটবার। দু-খানা চাটাই না বুনলেই নয়। ডাল থেকে পাতাগুলো ছিঁড়ে, কাঁটা কেটে তাড়া বেঁধে রেখেছে। অবনী দেখল। কিছুক্ষণ নানাদিক ভেবেই বলল, 'শুকায়নি, তালোই করলে ব্যারবেরে হোয় যাবেনি?' শ্যামা কোনো উত্তর দিল না। ভালোভাবে পাতা না শুকিয়ে চাটাই বুনলে পরে শুকিয়ে কুঁচকে পাতলা হয়ে যায়, আঁটুনি ঢিলে হয়। ভাবনা খুবই সঙ্গত, কিন্তু শ্যামার উপায় নেই। হাতে মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা সময় রয়েছে, দরকার হলে আগামীকাল রাতটাও জাগতে হবে। তবু পরদিন সকালে ঘণ্টাখানেক রোদে পাতাগুলো বিছিয়ে সংসারের প্রয়োজনীয় কাজ সেরে চাটাই বুনতে বসল। চোদ্দ-পাটিরই বুনবে, সময় পেলে ষোলপাটির। চোদ্দপাটির চাটাই ষোলপাটির চেয়ে কম লম্বা-চওড়া হয়। একটানা কাজ করতে থাকল, যে-চালগুলি

ছিল পারুল ধোঁয়ায় কান্নাকাটি করতে-করতে হাঁড়িতে চড়াল। শ্যামা পারুলের এই অবস্থা দেখে আগুন। 'উনানটাও ধরাতে জানেনি!'

'সব ভিজা!'

'তুলে রাখতে পারুসনু? হিমে ভিজতে দিবি!'

অবশ্য পারুলেরও পুরো দোষ নয়। গতকাল পেটের ভাত জোগাড় করতেই মানুষ তিনটির মানসিকতার ওপর দিয়ে জ্বালাময় বিদ্যুৎ খেলে গেছে। পারুলের এসব বিষয়ে ভাবনার বয়স না হলেও, মা-বাবার পাশে-পাশে থেকে সব কিছু ভাবতে শিখেছে, তাছাড়া খিদে গেলে তার অসুবিধাটা অন্যান্য বয়স্ক লোকদেরই মতো সমান। ফলে জ্বালানিগুলি তুলে রাখতে ভুলে গেছে, কারো মনে হয়নি যে হিমেল হাওয়ায় ওগুলি ভিজে যেতে পারে। এখন পারুলের চোখের জলের শেষ নেই। শ্যামা ধোঁয়ার মধ্যেই বসে বসে চাটাই বোনায় নিমগ্ন। অস্বস্তি বোধ হলেও বাইরে বসতে পারছে না, কড়া রোদ বাইরে। ধোঁয়া কমানোর জন্যে বাঁশের চোঙা ফুঁকলে গিয়ে, তবু কি ধোঁয়া কমে। পারুল রোদে এসেই চোখ জুড়োচ্ছিল। লম্ব তালগাছটার মাথায় সূর্য ঝলমল করছে। সূর্যের দিকে লালচোখ তাকাতেই চোখের সামনে শুকনো তালপাতা ঝুলে থাকতে দেখে প্রার্থনা করল, 'একটা পাতা খসে পড়!' তা কি পড়ে? এই ভর দুপুরে চরাচরে হাওয়া কোথায়! ঝিঙেফুলগুলিও কুঁকড়ে শুকিয়ে যাচ্ছে। শ্যামা উনুনের সঙ্গে লড়াই করে বিরক্ত হয়ে, পাতা ইত্যাদি নিয়ে চলল বাঁশতলায়, সেখানে ধোঁয়া নেই ছায়া রয়েছে। 'কুনুরকমে ভাত সিদ্ধ কর!' পারুলকে হুকুম করে দিল। সে অবশ্য পালন করল। খাবার সময় সকলেই বুঝতে পারল কেমন ভাত রান্না হয়েছে। তবু ফ্যান-ভাত নুন দিয়ে সকলেই তৃপ্তির সঙ্গে খেল। তখন বিকেল হয়ে গেছে। অবনী একদিকে খোসে মলম লাগিয়ে শুয়ে পড়ল। ছাগলগুলোকে পাতা কেটে দিয়েছে, পাশের ঘরে পাতা চিবোচ্ছে। খাসিটাকে শিয়ালে ধরে নিতে আর মাঠে চরাতে নিয়ে যায় না পারুল। আট হাত চার হাত দু-খানা চাটাই বুনতে শ্যামার রাতভোর হয়ে গেল। হাটে খুব তাড়াতাড়ি পেঁছাতে হবে, নইলে বিক্রি করার অসুবিধা হয়। অবনীও শেষ পর্যন্ত শ্যামার সঙ্গে হাত লাগিয়ে চাটাই করা সমাপ্ত করল। অবনী গুটিয়ে কাঁধে নিয়ে রওনা হবার সময় শ্যামা বলল, 'প্রথমে দু-টাকা বলবে দেড় টাকার কমে বিচবেনি!'

বাজার যেরকম খারাপ বিক্রি করাই এক সমস্যা। সকলেই গরজ ঠাওরায়। অবনী হাটের মাঝখানে বট গাজটার গুঁড়িতে চাটাই দুটি ঠেসিয়ে বসে রইল। অনেকে এল, দর করল চলে গেল। কেউ কেউ বলে গেল, 'ই-বছর একটা শীতলপাটি দিস ত অবনী!' অবনী সেইমতো অর্ডার নিল। মনে মনে কেবলই ভাবল কখন প্রকৃত খদ্দের আসবে। অবনীর মতো গরিব-দুঃখী মানুষ পাশে বসল, অবনীকে বিড়ি খেতে দিল, গল্প করল, চাটাই বিক্রি হচ্ছে না। বাধ্য হয়ে চাটাই দুটি বাজারের তুলনায় কমদামে বিক্রি করে বাড়ি ফিরল। শ্যামা শুয়ে-রয়েছে, পারুল কোথায় বেরিয়েছে। অবনী পুকুরঘাট থেকে পা-হাত-মুখ ধুয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, 'কি হল আবার!'

'কমরটায় বেদনা!'

ব্যথা হওয়া স্বাভাবিক। একটানা বসে বসে কাজ করতে হয়েছে। অবনী পাশে বসে অনেক কিছু ভাবতে ভাবতে বলল, 'বাজার খুব খারাপ, ই-বাজারে বাঁচতে পারবনি!' শ্যামা কথাগুলি শুনল ও সায় দিল। অবনী আল্লারাখির কাছে ঋণ শোধ করে অবশিষ্ট অর্থেই বেঁচে গেল। বাজার সত্যিই খারাপ, খাদ্য-দ্রব্যের দাম প্রচণ্ড হওয়া সত্ত্বেও অবনী মরল না। তার এত কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও কারো চুরি-ডাকাতি না করে, কাউকে দায়ী না করে অবনী-শ্যামা-পারুল আরো কয়েকদিন বাঁচবার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠল। অবনী শ্যামার কোমরে তেল মালিশ করে দিল, পারুল অবনীর খোসে মলম লাগিয়ে দিল। দিব্যি একএকটি দিন আসে কোন ফাঁক দিয়ে যে মানুষ তিনটি বেঁচে যায় কেউ টের পায় না। অবনী তবু মাঝেমাঝে বলে, 'ই-বাজারে বাঁচতে পারবনি!' আর সকালবেলা রায়বুড়ো ঘরামীর কাজের জন্যে ডাকলে অবনী লাফিয়ে চলে যায়।

আমরা যদি একপ্রাণ হই
সাফল্য অর্জন আমরা ক'রবোই

...কেবল সুদীর্ঘ এবং কঠিন শ্রমের মধ্যে দিয়েই লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন গড়ে তোলা যেতে পারে। বেশি সংখ্যক লোকের জন্য চাকরি এবং দেশের সম্পদ বাড়ানোর জন্য বাংলাদেশের বড় ও ছোট কলকারখানাগুলিকে বিনা বাধায় কাজ করতে দিতে হবে। অর্থনীতির সম্প্রসারণের মধ্য দিয়েই বেকার সমস্যা সমাধান হতে পারে। শিল্পের প্রসার এবং অর্থনীতির অগ্রগতির পথকে যে-কোনভাবে বাধা দেওয়ার অর্থই হচ্ছে দেশের যুবসমাজের ক্ষতি করা, বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ প্রগতির পথ বন্ধ করা। বাংলাদেশ এবং ভারতবর্ষ যে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেছিল, সে বিপ্লব ছিল — চিন্তার বিপ্লব, উৎকর্ষ, দক্ষতা ও কর্ম-কুশলতার বিপ্লব। আমাদের দেশে আমাদের নিজস্ব সৃজন ক্ষমতা দিয়েই আমাদের দেশের পরিবর্তন আনতে হবে। হিংসাকে সম্বল করে এবং আইন শৃংখলাকে পায়ে মাড়িয়ে এই পরিবর্তন আনা যাবে না। শৃংখলা, সদিচ্ছা ও শান্তিপূর্ণ পথে এই পরিবর্তন আনতে হবে। সব সময়েই আমাদের মনে রাখতে হবে সমস্ত রাজনীতিক দলের উপরে দেশের জনগণ। অফিসে খেটে খাওয়া মানুষ, সুন্দর তরুণী, সুন্দর সুন্দর শিশু, প্রাণোদ্দীপ্ত তরুণ, সদাসতর্কময় বুদ্ধিজীবী এবং সমস্ত আন্দোলনের মেরুদণ্ড বিশেষ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় — এঁরাই হচ্ছেন আমাদের জনগণ। আমাদের নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এই জনগণের স্বার্থকে বিপন্ন করা উচিত নয়। তাঁদের এই চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যগুলি বর্তমানের অসুবিধাগুলিকে কাটিয়ে উঠবার কাজে লাগাতে হবে। পথ বিপদসংকুল, কিন্তু আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ হই, এবং বাংলার অমর ঐতিহ্যের দ্বারা চালিত হই তবে সফল আমরা হবই।

—ইন্দিরা গান্ধী

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পশ্চিমবংগ সরকারের
সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা

পশ্চিমবংগ

বিজ্ঞাপন প্রচারের উপযুক্ত মাধ্যম

বিজ্ঞাপনের হার

তৃতীয় প্রচ্ছদ	...	২০০ টাকা
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	...	১২৫ „
সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা	...	৭৫ „

বিজ্ঞাপন প্রকাশের শর্তাবলী সম্পর্কে
নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

বিজনেস ম্যানেজার, তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ
পশ্চিমবংগ সরকার, রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা—১

প. ব. (তথ্য ও জনসংযোগ) বি. ৩৪২৪।৭০

পরিচয়
বর্ষ ৪০। সংখ্যা ৩-৪
আশ্বিন-কার্তিক ১৩৭৭

সূচিপত্র

প্রচ্ছদ ঃ দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক ঃ দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তরুণ সান্যাল

পরিচয় প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

পরিচয়
বর্ষ ৪০ । সংখ্যা ৩-৪
আশ্বিন-কার্তিক ১৩৭৭

শিল্পীর স্বাধীনতা ও দায়

সিদ্ধেশ্বর সেন
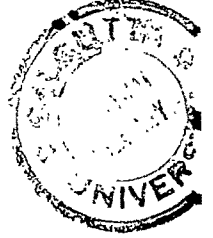
কর্মগতিকে, একসময়—প্রায় দেড়যুগ আগে—আমাকে কিছু ঘুরতে হয়েছিল মফঃস্বল আর গ্রামবাঙলায়। সে-সময়, মেদিনীপুরের এক প্রত্যন্ত চাষীপাড়ায়, একতারা-বাজানো এক বাউলের গলায় শুনেছিলাম :

"আমি বৃন্দাবনে ঘুরে বেড়াই,
কারে ডরাই, কারে ডরাই,
আমি স্বাধীনরাজ্যে বসত করি
চলবে না রে ছলচাতুরী।"

তখন ও-অঞ্চলে খাদ্যসঙ্কট লেগেছিল। জায়গাটা এমনিতেই খরা। তায় দুর্বিপাক। লোকজনের অবস্থা আরও কাহিল। তবু, তার মধ্যেও, শ্রোতাদের মাথা নাড়া, গানের সঙ্গে সঙ্গত করা তো দেখেছি!

আশ্চর্য লেগেছিল। কিংবা, আশ্চর্যেরই-বা কতটা আছে!

তার অল্পদিন বাদেই দেশে আসছিল এক সাধারণ নির্বাচন। ওই গ্রাম্য গায়কটির কোনও স্থায়ী ঠিকানা বা ভোট ছিল কিনা জানি না। কিন্তু চাষীদের ছিল। ভোটের বাবুরাও আনাগোনা শুরু করেছিলেন, শুনতে পাই। তাই কি একান্ত মরমী যোগ-বোধ ছাড়াই, বা তা ছাড়াও, পরিস্থিতির কার্যকারণের তাগিদেই সেই গ্রাম্য-শিল্পীর বর্ণনায় এক পুরাণ-অতিকথার "বৃন্দাবনের স্বাধীনরাজের" আশা অতগুলি দুর্দশাগ্রস্ত জাগতিক গেরস্ত-চাষীর মনে পরিবর্তনের কোনও ঈষৎ কল্পনাও জাগিয়ে তুলতে চাইছিল?

কে জানে। তবে "মুক্তি", "স্বাধীনতা"—জনসমাজে এ-দুটি শব্দের আবেদন ও উদ্দীপনের তুলনা মেলা ভার। যে অবস্থাতেই হোক না কেন,

আপেক্ষিক ভাবেই। লেখক-শিল্পীর "সৃষ্টি"র বা "চিন্তার স্বাধীনতা"ও যে কেন এর থেকে একেবারে ভিন্নকোটিতে অবস্থান করবে, তার কোনও যুক্তিবুদ্ধি বর্তমান আলোচকের মতে, নেই। তাই, সব যুগেই সব সৎ সাহিত্যিকই সে-প্রেরণা নিজেদের রচনাকর্মে অঙ্গীকৃত না করে, সচেতনভাবে না হোক বাস্তবতার প্রতিফলনের নিয়মেই বোধহয়, এক পা-ও এগোতে পারেন নি।

লেখক-শিল্পীর সৃষ্টির স্বাধীনতা কথাটা তবু, দুর্ভাগ্যত, আজ উঠেছে যেন নতুন করেই, পশ্চিমীমহল থেকেই বিশেষ ভাবে—এবং আমার মতে, গোটাটাই এক ভুল পরিপ্রেক্ষিতে।

এ-প্রশ্নটির সত্যিকারের সদর্থক ও সার্থক আলোচনা তাই থমকে যায় এক নঙর্থক ঘোরপ্যাঁচে। যাঁরা তথাকথিত "স্বাধীন" বনতে চান—অদৃষ্টের পরিহাস—তাঁরাই আবার কোনও বিশেষ সামাজিক শ্রেণীর বা মতবাদের অধীন ও অধঃস্তন না হয়ে তা পারেন না, একটির পক্ষে ও অপর একটি "বাদ" বা ভাবাদর্শের বিরোধিতা না করে তা পারেন না। অর্থাৎ "নিরপেক্ষ" "স্বাধীন" বস্তুটি সেই তাঁদের হাত থেকেও ফস্কে কখন তলিয়ে যায়, যেটি পড়ে থাকে—সেটি সেই অদৃষ্টেরই গেরো। পরশ্রমজীবীতন্ত্রে এই সামাজিক বুদ্ধিভ্রান্তিই তাই এই প্রশ্নে বহুতর বুদ্ধিজীবীরই বুদ্ধিনাশের নজির হয়ে থাকে, এদেশে-ওদেশে। কে না জানে, এ-ভ্রান্তিবিলাসের বেসাতি সাজিয়ে আস্ত এক আন্তর্জাতিক সংস্থাই কাজ করে চলেছে, যার নাম 'কালচারল ফ্রিডম'! এই বাঙলাদেশেই যে একদিন মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল—ঝোপ বুঝে বিশেষ কোপ মারার এক উপযুক্ত পরিস্থিতি পেয়ে, অবশ্যই কিছু মান্য সাহিত্যিককে সঙ্গী জুটিয়ে নিয়ে—এক 'স্বাধীন-সাহিত্য সমাজ', তাও আশা করি আমাদের অনেকেরই আজও স্মরণের বাইরে যায় নি। তবু, অল্পদিনেই আবার "স্বাধীন"ভাবেই আত্মবিলোপের পথ না নিয়ে, এদেশের সমাজ-নৈতিক জলহাওয়ায়, তা-ও কূল পায় নি।

এই "স্বাধীন" শিল্পীদলের মোদ্দা তত্ত্ব হলো সমাজতন্ত্র ও সাম্যতন্ত্রের সঙ্গে সৃষ্টির স্বাধীনতা ব্যাপারটি আদৌ খাপ খেতে পারে না। কারণ, এই "মুক্ত" দুনিয়ার প্রবক্তারা প্রাণপণ বোঝাবার চেষ্টা করে আসছেন যে, একমাত্র পুঁজিতন্ত্রী ব্যবস্থাতেই শিল্পী ও স্রষ্টা তাঁর আত্মপ্রকাশের "অবাধ স্বাধীনতা" ভোগ করেন আর সমাজতন্ত্রী দুনিয়াতে নাকি সবকিছুই সৃষ্টিকর্ম চলে "ওপর থেকে ফতোয়া জারী" করে। অবশ্য মাত্র পঞ্চাশাধিক বছরের সমাজতান্ত্রিক

সভ্যতায় শিল্প-সাহিত্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিচারে অনেক সময় যে-অবাঞ্ছিত, এমনকি গুরুতর, ভুলত্রুটিও কোনো কোনো পর্বে ঘটে গেছে—বর্তমান আলোচক কিন্তু আদপেই তার স্বপক্ষে ধামাধরার কথা বলছেন না; এরেনবুর্গ, শোলোখভের মতো সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের বরেণ্য সাহিত্যিক নিজেরাই কোনো না কোনো সময়ে তার সমালোচনা করেন। কিন্তু, সেই সব ব্যতিক্রমকে নিয়ম বলে মানতে বর্তমান আলোচক অপারগতা জানায়। শুধু, 'শিল্পীর স্বাধীনতা ও তার দায়'-এর সমস্যাটিই এখানে আলোচ্য ও অনুসন্ধানের বিষয়।

একটি কথা এ-প্রসঙ্গে আগেই বলে রাখা দরকার যে, নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজের নির্মাণ যেখানে চলেছে, সেখানে স্বভাবতই শিল্পী-সাহিত্যিকদের দৃষ্টিভঙ্গী কিছুটা ইতিবাচক হয়েই গড়ে ওঠে। স্বাভাবিক কারণেই তা ঘটে।

অথচ, পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে সেই সব শিল্পী ও লেখকই শ্রেষ্ঠত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হন যাঁদের সৃষ্টিকর্মে স্থিত স্বার্থ ও "প্রতিষ্ঠান" বা "এস্ট্যাবলিশমেণ্ট" সম্পর্কে থাকে অন্তত সমালোচনাত্মক, বিশ্লেষণমুখী দৃষ্টিভঙ্গী—বাস্তবতা শুধু নয়, ক্রিটিক্যাল বাস্তবতা—একান্ত মৌলিক রূপান্তরধর্মী দৃষ্টিভঙ্গী যদি না-ও থাকে। কেন এমন হয়, সে-কারণটিও আমাদের বুঝে দেখার কথা। ঐতিহাসিক ও বস্তুবাদী ডায়লেকটিকসের বিচার-প্রণালীই, আমার মতে, এ-অবস্থাটি বোঝার পক্ষে সহায়ক।

পুঁজিতন্ত্র তার সূচনাসময়ে শিল্প-সাহিত্যের বিকাশে, সন্দেহ নেই, এক ইতিবাচক ভূমিকাই নিয়েছিল। কিন্তু, কালক্রমে পুঁজিতন্ত্রে যখন সবকিছুই হয়ে উঠল বিক্রয়যোগ্য ও মুনাফাশিকারী পণ্য, তখন শিল্পী-সাহিত্যিকও সেই বাজারী সম্পর্কের নিয়মের আবর্তে না জড়িয়ে পারেন নি। এর ফলাফল যা হবার হলো। ইতিহাসের সব থেকে এক নিষ্ঠুর একনায়কতন্ত্র—পুঁজির একনায়কতন্ত্রের শিকার হলেন সৃষ্টিশীল্প লেখক-শিল্পীরাও। সেকালের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের সৃষ্টিকর্মেও এ-ট্রাজেডির স্বাক্ষর রয়েছে।

তবু, উদাহরণত, রাজতন্ত্রী বালজাকও যে সমাজতন্ত্রী মার্কস-এঙ্গেলসের অন্যতম প্রিয় লেখক হয়ে ওঠেন, তার কারণও এই যে মহাশিল্পী বালজাক তাঁর বুদ্ধির পক্ষপাত সত্ত্বেও শিল্পসৃষ্টিতে প্রতিফলন ঘটান তৎকালীন সমাজবাস্তবতারই। তলস্তয় প্রসঙ্গে লেনিন যেমন লিখেছিলেন, "আমাদের আলোচ্য শিল্পী যদি প্রকৃতই মহৎ শিল্পী হন, তবে তিনি তাঁর রচনাবলীতে

বিপ্লবের অন্তত কিছু তাৎপর্যপূর্ণ দিকের প্রতিফলন ঘটিয়েছেনই।" এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই ঐতিহ্য ও আধুনিকতার দ্বন্দ্ব-সঙ্গতিতে একটি অগ্রসরমান শিল্প-সাহিত্যধারা গড়ে ওঠে।

পণ্য, মুনাফা ও বাজারীতন্ত্র যে পুঁজিতন্ত্রের গর্ভে অনিবার্যভাবেই বেড়ে উঠেছে, শেক্স্‌পীয়রের মহৎ প্রতিভা সে-প্রক্রিয়ারও প্রতিফলন ঘটায়ঃ

"......Commodity, the bias of the world,
The world who of itself is poised well,
Made to run even upon even ground,
Till this advantage, this wide-drawing bias,
This sway of motion, this Commodity
Makes it take head from all its differency,
From all direction, purpose, course, intent......"

পণ্য, পুঁজি ও মুনাফাতন্ত্রী সমাজে, বিশেষভাবে তার সর্বগ্রাসী পর্যায়ে—সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ বা নয়া-উপনিবেশবাদের যুগে—ব্যক্তির বিযুক্তি-বোধ, শোষিত নিপীড়িত ও শ্রমজীবী মানুষের পক্ষে যেমন প্রধানত সামাজিক-অর্থনৈতিক, লেখক ও শিল্পীর ক্ষেত্রে তেমনি প্রধানত আত্মিক-মানসিক এমন একটা স্তরে পৌঁছে যায়, যখন তার "স্বাধীনতা"র স্পৃহা পর্যবসিত হয় মাত্র তার "আত্মবিক্রয়েরই স্বাধীনতা"তে।

ভাসা-ভাসা ভাবে দেখতে গেলে মনে হতে পারে যে, তা কেন? বাজারে অবাধ প্রতিযোগিতা তো সকলের জন্যে "অবাধ" সুযোগই উপস্থিত করেছে। আর তাই যে যা খুশী, এমনকি শিল্পের নাম নিয়েও, করে খেতে পারে। সৃষ্টির স্বাধীনতার এমনি এক "নিরঙ্কুশ" "পরম" বিভ্রম তৈরি করলেও, তার পর মুহূর্তেই বাজারী নিয়মেই শিল্পীর সেই মনসিজা কল্প-প্রতিমা অচিরে ধূলিসাৎ করে দিতে পুঁজিতন্ত্রী "অবাধ" ব্যবস্থা কোনোই কার্পণ্য করে না। তাই এই ধনতন্ত্রী পণ্যতন্ত্র ব্যবস্থায় প্রতিটি সৎ শিল্পীই জানেন যে, সৃষ্টির স্বাধীনতা এ-পরিবেশে কতখানি অলীক-কুসুম, এবং শ্বাসরুদ্ধ। আর, তা সত্ত্বেও, যদি প্রতিভাধর সৎশিল্পী এই সমাজেই সৃষ্টিকর্মের স্বাধীনতার অপরাহত মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করে এগিয়ে যেতে পারেন, তার কারণ তাহলে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শোষণবিরোধী শক্তিগুলির জোরালো অবস্থানই সেই শিল্পীর পক্ষে, আপেক্ষিক ভাবে, প্রকৃত স্বাধীন থাকার শর্তগুলি সৃষ্টি করে দেয়।

পুঁজিতন্ত্রী, উপনিবেশী ও আধা-উপনিবেশী সমাজে শ্রমজীবী ও নিপীড়িত মানুষের এই জোরাল মুক্তিআন্দোলনের অস্তিত্বই শিল্পীর স্বাধীনতার আপেক্ষিক অবস্থা নিয়ে আসে। এই মুক্তিআন্দোলন কী পরিমাণে শক্তিশালী —তার ওপরেই নির্ভর করে লেখক-শিল্পীর এই আপেক্ষিক স্বাধীনতাও। নইলে, লেনিন যেমন দেখিয়েছিলেন, "বুর্জোয়া শিল্পী, লেখক, অভিনেতার স্বাধীনতা হলো নিছক মুখোশ ঢাকা (বা ভণ্ডভাবে মুখোশ আঁটা) নির্ভরশীলতা —টাকার থলি, দুর্নীতি ও গণিকাবৃত্তির ওপর।" কেননা, মনোপলি নিয়ন্ত্রণ করে বৃহৎ বাজারী সংবাদপত্র-পত্রিকা, চলচ্চিত্র-শিল্প, বাণিজ্যিক বেতার, টেলিভিশন (যেসব দেশে তার চল আছে), রঙ্গমঞ্চ এবং বাজারী নিয়ম অনুযায়ী, এমন কি তারা শিল্প-সাহিত্যরুচি তৈরি করারও স্পর্ধা দেখায়। সামাজিক সমস্যা থেকে ও তার নিরসনের সংগ্রাম থেকে মানুষ যাতে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারে, একমাত্র তেমন সব কাজকেই অবাধ বিকাশের সুযোগ দেওয়া হয়।

জীবনবাদী, প্রগতিধর্মী লেখক-শিল্পীদের রচনা যাতে ব্যাপক পাঠক-সমাজের কাছে না পৌঁছতে পারে, তার সবরকম ব্যবস্থাই তারা নেয়—উপেক্ষা, অবহেলা বা সাক্ষাৎ বিরোধিতায়। অবশ্য, তাতে মানবতাবাদী শিল্পী-সাহিত্যিকদের সৃষ্টি থেমে থাকে না। বাঙলা সাহিত্যে এর একটি মহৎ দৃষ্টান্ত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। খ্যাতির তুঙ্গে থাকাকালেও গণতান্ত্রিক সংগ্রামী মানুষের দিকে তাঁর পক্ষপাতিত্বের কারণে বড় বড় পত্র-পত্রিকার দরজা তাঁর রচনাপ্রকাশের ক্ষেত্রে যে একদিন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, সে-তথ্যও তো আমাদের অজানা থাকার কথা নয়।

তবু, নিজদেশের সামাজিক অর্থনৈতিক এবং সেইহেতু মানবিক মুক্তি ও শ্রমজীবী মানুষের আত্মপ্রতিষ্ঠার আন্দোলনের জোরাল বিকাশে অংশীদার হয়ে সুস্থ গণতন্ত্রী মানবতাবাদী শিল্প-সাহিত্যধারার উদ্ভব ও তার ক্রমিক প্রসারও আমাদের যুগের এক লক্ষণীয় বাস্তবতা। এ-অবস্থাটির ওপর আরও বৈপ্লবিক প্রভাব ফেলে বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অস্তিত্ব ও তার উত্তরোত্তর পরাক্রম, আজকের আফ্রো-এশীয় দুনিয়ার দুর্নিবার্য উত্থানও তারই আরও এক অবশ্যম্ভাবী শর্ত সৃষ্টি করছে। তাই, বিমূর্তভাবে নয়, শিল্পীর স্বাধীনতা ও দায়ের সমস্যাটিকে এই মূর্ত সামাজিক-ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটেই বিচার করে দেখতে হবে।

আজ নয়, সেই স্বদেশীর যুগে, রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্য সৃষ্টি' প্রবন্ধে লিখেছিলেন "বর্ষা ঋতুর মতো মানুষের সমাজে এমন এক একটা সময় আসে যখন হাওয়ার মধ্যে ভাবের বাষ্প প্রচুররূপে বিচরণ করিতে থাকে। চৈতন্যের পর বাংলাদেশে সেই অবস্থা আসিয়াছিল।...ফরাসি বিদ্রোহের সময়েও তেমনি মানবপ্রেমের ভাবহিল্লোল আকাশ ভরিয়া তুলিয়াছিল। তাহাই নানা কবির চিত্তে আঘাত পাইয়া কোথায় বা করুণায়, কোথাও বা বিদ্রোহের স্বরে আপনাকে নানামূর্তিতে অজস্রভাবে প্রকাশ করিয়াছিল। অতএব কথাটা এই, মানুষের মন যেসকল বহুতর অব্যক্তভাবকে নিরন্তর উচ্ছ্বসিত করিয়া দিতেছে, যাহা অনবরত ক্ষণিক বেদনায়, ক্ষণিক ভাবনায়, ক্ষণিক কথায় বিশ্বমানবের সুবিশাল মনোলোকের আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এক-একজন কবির কল্পনা, এক-একটি আকর্ষণ কেন্দ্রের মতো হইয়া তাহাদেরই মধ্যে এক-এক দলকে কল্পনাসূত্রে এক করিয়া মানুষের মনের কাছে স্পষ্ট করিয়া তোলে......।" মহাকবির এ-কথাটি যেন আমরা তলিয়ে ভাবি।

যে-শিল্পী বা মানুষ নিজেই যন্ত্রবৎ বা যান্ত্রিকতারই পূজারী, তার কোনো স্বেচ্ছা-নির্বাচন নেই, নিজের নির্বাচিত পথ নেই—একমাত্র বাইরের অবস্থান্তরের হিসেবের অদলবদলেই তারও অদলবদল। এ-শিল্পীকে, তাই, স্বাধীন বলতে পারি না, কারণ দায়বোধ না থাকলে স্বাধীনতা কিসের? তাই কোনো কাজ ও তার ফলাফলের জন্যে এমন ব্যক্তিকে দায়ী করাও নিরর্থক। তেমনি সমান সত্য হলো প্রকৃত সৃষ্টির স্বাধীনতা অসম্ভব যদি না শিল্পী তাঁর দায় সম্পর্কে পূর্ণভাবে আত্ম-সচেতন থাকতে পারেন। সৃষ্টিকর্মেও সেই ভাবাকাশকেই সমগ্রভাবে মেলে ধরার দায়ও তাই এই প্রকৃতভাবে স্বাধীন শিল্পীর কাঁধেই বিশেষ করে বর্তায়।

৫ই অকটোবর কলকাতা তথ্যকেন্দ্রে আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলনের পশ্চিমবঙ্গ প্রস্তুতি অধিবেশনের সেমিনারে পঠিত।

জাপানের সাহিত্য

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকের পূর্বে জাপানে কোনো লিপি প্রচলিত ছিল না। জাপান প্রথমে চৈনিক লিপি পুরোপুরি গ্রহণ করেছিল। কয়েক শতাব্দী পরে চৈনিক চিত্রলিপি ও জাপানের প্রচলিত ভাষার সমন্বয়ে জাপানী লিখিত ভাষার জন্ম হয়। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে জাপানী লিপিপদ্ধতির সরলীকরণ সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় নতুন নতুন রচনার প্রেরণা দেয়। তারপর থেকে জাপান অবিচ্ছিন্ন সাধনার দ্বারা ভাষার উন্নতি এবং প্রকাশন শিল্পের প্রসার করে চলেছে। বর্তমানে প্রকাশন শিল্পে রাশিয়ার পরেই জাপানের স্থান। জাপান প্রতি বছর গড়ে চার হাজার লোকের জন্য একটি করে বই প্রকাশ করে। ভারত করে প্রায় তেইশ হাজার নাগরিকের জন্য একটি বই।

জাপানী সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন নারা যুগের (৭১০-৭৯৪)। একটি হলো গদ্যে রচিত **কোজিকি**; আর একটি **মানয়োশু**, কাব্য-সঙ্কলন। কোজিকি শিন্টোদের ধর্মগ্রন্থ। আমাদের পুরাণের মতো অনেক কাহিনী আছে। রাজা যে পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রতিনিধি তার সমর্থন আছে এই গ্রন্থে। চৈনিক সভ্যতার প্রভাব এই যুগের রচনায় সুস্পষ্ট। জাপানী পণ্ডিতরা প্রায় সকলেই লিখতেন চীনা ভাষায়। বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থের উপর টীকাটিপ্পনী রচনাই ছিল তাঁদের প্রধান কাজ।

মানয়োশু কাব্য-সঙ্কলনে জাপানী কবিতার প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায়। উপন্যাসে জাপানী সাহিত্য যত সমৃদ্ধ, কবিতায় সেরূপ নয়। অথচ কবিতা জনসাধারণের নিকট বড় প্রিয়; সেখানে যে শুধু কবিরাই কবিতা রচনা করবেন, তা নয়। কবি না হলেও সেখানে কাব্যরচনা করবার রীতি আছে। সম্রাট থেকে আরম্ভ করে চাষী-মজুর সকলেই কবিতা লেখেন। জাপানী ছন্দ খুব সহজ। তঙ্কারীতির কবিতায় থাকে ৩১ সিলেবল, আর হাইকু মাত্র ১৭ সিলেবলের কবিতা। কবিতা এত ছোট বলে কোনো জটিল বিষয়ের অবতারণা সম্ভব হয় না। কবিতার বিষয় প্রধানত প্রেম ও প্রকৃতি।

সুতরাং দু-তিনটি বিষয়বস্তুর উপরে ছোট কবিতা রচনা করা কঠিন কাজ নয়। অবশ্য সত্যিকারের ভালো কবিতা লেখা প্রতিভাবান ছাড়া কারো পক্ষে সম্ভব নয়—কবিতার আকার যা-ই হোক না কেন।

তিন-চার লাইনের জাপানী কবিতা সকল দেশের সমালোচকদের নিকটই সমাদর লাভ করেছে। সমাদর পেয়েছে তাদের সঙ্কেতময়তার জন্য। বিখ্যাত কবি বাশো-র (১৬৪৪-৯৪) একটি হাইকুর দৃষ্টান্ত দেওয়া হচ্ছে ঃ

মেঘের শিখর
ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল—
পর্বতের বুকে চাঁদের আলো।

আর একজন কবি, ওনিৎস্থরা, লিখেছেন ঃ

আজ আকাশে এমন চাঁদ!
এমন কোনো লোক আছে কি
যার হাতে কলম নেই!

মানয়োশু থেকে একটি তঙ্কার উদাহরণ দেওয়া হলো ঃ

দুষ্টু লোকেরা আমাদের দূরে রেখেছে,
সরিয়ে দিয়েছে তোমাকে আমাকে ;
এসো, প্রিয়তম, এসো!
ওদের অনধিকার চর্চা যেন
স্বপ্নেও শোনোনি, এমনিভাবে এসো।

উপরে দুটি জাপানী কাব্যসঙ্কলনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। আরও দুটি বিখ্যাত সঙ্কলন-গ্রন্থ **কোকিন-শিউ** (দশম শতাব্দী) এবং **হিয়াকু-নিন ইস্সু** (ত্রয়োদশ শতাব্দী) প্রাচীন জাপানী কবিতার আকরস্বরূপ।

পাশ্চাত্য প্রভাব জাপানের কথাসাহিত্যে রূপান্তর এনেছে। কিন্তু কাব্যের ক্ষেত্রে তেমন কোনো বিপ্লব আসেনি। হাইকু কবিতার এখনো প্রাধান্য চলছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে শ্রেষ্ঠ হাইকু কবি ছিলেন মাৎসুও বাশো ; পরবর্তী শতাব্দীর খ্যাতনামা হাইকু কবি কোবায়াসি ইস্সা। হাইকু এবং ৩১ সিলেবলে রচিত ওয়াকা রীতিতে জাপানী কবিরা এখনো কবিতা লিখছেন।

জাপানী নাটকের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্য বিদেশী সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। জাপানে চারশ্রেণীর নাটক প্রচলিত আছে। নো, কাবুকি, পুতুল দিয়ে অভিনয় করানো পালা এবং পাশ্চাত্যের

প্রেরণায় রচিত নাটক। মুরোমাচি আমল (১৩৩৩-১৬০০) যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকলেও সমগ্র দেশে রাজনৈতিক ঐক্য এসেছিল ঐ সময়। এই সময়েই সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার সূত্রপাত হয়। নো নাটক তার মধ্যে অন্যতম।

রাজসভায় নো নাটকের জন্ম। ধর্ম এর মূল কথা। নো-র রচনা-কৌশল একান্ত সহজ সর্বজনবোধ্য। শিল্পকলার সূক্ষ্ম দিকটার উপর জোর দেওয়া হতো না। নো নাটক গদ্যে-পদ্যে মিলিয়ে লেখা। পদ্যাংশ গান করা হয়; গদ্যাংশ করা হয় আবৃত্তি। পাত্র-পাত্রীরা অভিনয় করে কাঠের মুখোশ পরে। শিন্টো ও বৌদ্ধ উৎসব উপলক্ষেই সাধারণত নো অভিনীত হতো। চতুর্দশ শতাব্দীতে নো নাটক প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কানামি কিয়োৎসুগু এবং তাঁর পুত্র জিয়ামি মোতোকিয়ো ঐ শতকের দুজন বিশিষ্ট নো নাট্যকার।

নো নাটকের বিষয়বস্তু বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য। সঙ্কেতময়তা নো নাটকের প্রধান ঐশ্বর্য। ইয়েটস এবং ইয়োরোপের আরও কয়েকজন লেখক এই কারণে নো-র প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। নো এখনো জাপানে নিয়মিত অভিনীত হয়।

নো বুদ্ধিজীবীদের জন্য। সাধারণ দর্শকদের চাহিদা মেটাবার জন্য সপ্তদশ শতক নাগাদ কাবুকি নাটকের উদ্ভব হয়। কাবুকি নো নাটকেরই রূপান্তর—মান খানিকটা নিচু, সর্বসাধারণের উপযোগী করে লেখা। সাজপোশাকে অভিনয়ে প্রচার সোচ্চার হয়ে ওঠে। অনেকটা আমাদের পুরনো দিনের যাত্রার মতো।

আমাদের দেশেও পুতুলখেলা আছে। রামায়ণ মহাভারত কিংবা অন্য কোনো প্রচলিত কাহিনী অবলম্বনে পুতুলের পালা রচনা করা হয়। জাপানে কিন্তু পুতুলের নাটক একটি সুনির্দিষ্ট পৃথক শিল্পরীতি। এর জন্য পৃথক নাটক লেখা হয়। জাপানের প্রসিদ্ধ নাট্যকার চিকামাৎসু (১৬৫৩-১৭২৫) তাঁর সবগুলি নাটক লিখেছেন পুতুলের পালা হিসেবে। তিনি বাস্তব ও অবাস্তবের সুন্দর মিলন ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন; তাই তাঁর পুতুল-নাটকগুলি খুবই জনপ্রিয় হতে পেরেছিল।

ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে জাপানী রঙ্গমঞ্চে পাশ্চাত্য প্রভাব দেখা যায়। শেক্‌স্‌পীয়রের নাটক অনুবাদ করা হয় জাপানী ভাষায়। তবে সমসাময়িক

জাপানী নাটকে ইবসেন ও স্ট্রীণ্ডবার্গের প্রভাব বিশেষরূপে লক্ষণীয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইয়োরোপ-আমেরিকার সকল আধুনিক নাট্যকারই জাপানী নাটকের উপর প্রভাব বিস্তার করেছেন।

জাপানী সাহিত্যের সবচেয়ে সমৃদ্ধ শাখা উপন্যাস। আধুনিক জাপানী উপন্যাস বিশ্ব-সাহিত্যে গৌরবের স্থান অধিকার করেছে। এর সূত্রপাত হয় প্রায় হাজার বছর পূর্বে। **দি টেল অব গেন্‌জি** শুধু জাপানের নয়, পৃথিবীরও প্রথম উপন্যাস। অন্তত বর্তমানে উপন্যাস বলতে আমরা যা বুঝি সেই অর্থে প্রথম। গেন্‌জির লেখিকা মুরাসাকি শিকিবু আনুমানিক ৯৭৮ থেকে ১০২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। রাজপ্রাসাদের জীবনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে মুরাসাকি তাঁর কাহিনী রচনা করেছেন। আড়াই হাজার পৃষ্ঠার বিরাট উপন্যাস চুয়ান্নটি অধ্যায়ে বিভক্ত। এর মধ্যে একচল্লিশটি অধ্যায়ে রাজকুমার গেন্‌জির জীবন-কাহিনী বিবৃত করা হয়েছে; বাকিগুলিতে আছে গেন্‌জির এক ছেলের কথা। মুরাসাকি অনেক অবান্তর কাহিনীর অবতারণা করেছেন, ছোটো ছোটো ঘটনাকে অনাবশ্যক টেনে বড় করেছেন; কিন্তু সে-যুগে এটা নিন্দনীয় ছিল না। বরং সে-সময়কার মন্থর জীবনের পক্ষে এটা স্বাভাবিকই বলা যায়। জাপানের দশম শতাব্দীর অভিজাত সমাজের জীবন্ত ছবি এঁকেছেন লেখিকা। আর সেই ছবিতে কত বর্ণ কত রৌদ্র-ছায়ার খেলা! ১৯২৩ সালে এই উপন্যাসের ইংরেজী অনুবাদ বেরুবার পর পৃথিবীর সর্বত্র সাড়া পড়ে গেল। এতদিন পূর্বে এমন উপন্যাস লেখা হতে পারে সে-ধারণাই কারো ছিল না। সমালোচকরা টেল অব গেন্‌জির তুলনা করলেন ডেকামেরন, ডন কুইকসট, গারগানটুয়া অ্যাণ্ড প্যাণ্টাগ্রুয়েল প্রভৃতির সঙ্গে। কেউ বললেন, মার্সেল প্রুস্তের রচনা-রীতির সঙ্গে আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে!

মুরাসাকির পরে যিনি শক্তিশালী ঔপন্যাসিক তিনি হলেন ইহারা সাইকাকু (১৬৪২-১৬৯৩)। হাইকু কবি হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল। **জীবন, প্রেমের সাধনা**—এই উপন্যাস লিখে তিনি কথাসাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাঁর উপন্যাসে প্রেমের প্রাধান্য, যৌনতার রঙ বেশ চড়া।

জাপানী ঐতিহ্যের শেষ উল্লেখযোগ্য ঔপন্যাসিক বাকিন (১৭৬৭-১৮৪৮)। তাঁর কাহিনী দুর্বল। এই দুর্বলতার ক্ষতি তিনি পূরণ করতে চেয়েছেন কাব্যময় ভাষা প্রয়োগ করে। উপন্যাসের নামকরণেও এই কাব্যধর্মী বৈশিষ্ট্য

ধরা পড়ে। তাঁর একটি জনপ্রিয় উপন্যাসের নাম : **বর্ষা রাতের মেঘের ফাঁকে চাঁদের আলো।**

ফুতাবাতেই শিমেই (১৮৬৪-১৯০৯) প্রথম পাশ্চাত্য রীতির সূত্রপাত করেন তাঁর উপন্যাস **ড্রিফটিং ক্লাউড**-এ। কাহিনী ও ভাষার দিক থেকে এটি অভিনব। এর পূর্বে উপন্যাসের ভাষায় ছিল কৃত্রিমতা। দৈনন্দিন জীবনের ভাষার প্রতি ছিল অবজ্ঞা। শিমেই টুর্গেনিভের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে দৈনন্দিন ব্যবহারের ভাষাকে উপন্যাসে প্রয়োগ করেছেন। নাৎসুমে সোসেকি (১৮৬৭-১৯১৬) ইয়োরোপীয় সাহিত্যের অনুকরণে জাপানী কথাসাহিত্যে ন্যাচারালিজমের প্রবর্তন করেন। ইয়োরোপীয় সাহিত্যের সংস্পর্শে এসে জাপানী লেখকরা যে সমাজের নানা সমস্যা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন তার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রমাণ শিমাজাকি তোসনের **দি ব্রোকন কমাণ্ডমেণ্ট।** এক অস্পৃশ্য যুবকের সামাজিক নিপীড়নের কাহিনী এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। সর্বহারাদের জীবনের উপর আলোকপাত করেছে কোবায়াশি তাকাজির উপন্যাস **দি ক্র্যাব ক্যানিং বোট**-এ। এখানে লেখক সাম্যবাদ যেভাবে প্রচার করতে চেয়েছেন তা মোটেই শিল্পসম্মত হয়নি।

কাফু নাগাই (১৮৭৯-১৯৫৯) একালের একজন শক্তিশালী লেখক। তাঁর লেখা ইংরেজীতে বিশেষ অনুবাদ হয়নি বলে জাপানের বাইরে প্রায় অপরিচিত রয়ে গেছেন। তিনি জোলার মতোই অনেকটা বাস্তববাদী ; কিন্তু রোমান্টিসিজমকে অস্বীকার করেননি। তাঁর রচনায় পুরনো ঐতিহ্যের প্রতীক গীশা, অভিনেতা-অভিনেত্রী, গায়ক-গায়িকার (— কালের পরিবর্তন যাদের শহরের কেন্দ্র থেকে ঠেলে দিয়েছে উপকণ্ঠে—) জীবন স্থান পেয়েছে। টোকিও শহরের বিভিন্ন অঞ্চল তাঁর উপন্যাসে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

ওগাই মোরি আধুনিক উপন্যাসের একজন পথিকৃৎ। তাঁর **বুনো হাঁস** একটি ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী।

জুনিকিরো তানিজাকির **থিন স্নো** বর্তমান যুগের একটি বিশিষ্ট উপন্যাস হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। অনেক জাপানী সমালোচক এই উপন্যাসটিকে তাঁদের সাহিত্যের মাস্টারপীস হিসাবে উল্লেখ করেছেন। জীবনের বাস্তব ছবি ফুটিয়ে তোলাতেই লেখকের কৃতিত্ব। এক সচ্ছল জাপানী পরিবারের ১৯৩৬-৪১ সালের ইতিহাস এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। প্রায় দেড় হাজার পৃষ্ঠার পরিসরে পারিবারিক ইতিহাসের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ঘটনা হুবহু

ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বই পড়া শেষ করে পাঠকের মনে হবে যেন এই পরিবারের সঙ্গে কিছুকাল বাস করে এসেছি, পরিবারের লোকদের জীবনযাত্রা নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করেছি।

তানিজাকির অন্যান্য জনপ্রিয় উপন্যাসের মধ্যে আছে **দি মাকিয়োকা সিস্টারস, দি কী** এবং **সাম প্রিফার নেটল্‌স্‌**। শেষোক্ত উপন্যাসটির বিষয়বস্তু একালের অসুখী দাম্পত্য জীবন। তাঁর পত্নীর সঙ্গে বিচ্ছেদের ঘটনা কাহিনীর উপর ছায়া ফেলেছে।

সমারসেট মমের **অব হিউম্যান বণ্ডেজ**-এর ছায়া নিয়ে তানিজাকি লিখেছেন **এ ফুল্‌স্‌ লাভ**। তাঁর আর একটি কীর্তি হলো **দি টেল অব গেন্‌জি**-কে আধুনিক ভাষায় রূপান্তরিত করা।

তোয়োহিকো কাগাওয়া (১৮৮৮-১৯৬০) কবিতা, প্রবন্ধ ও উপন্যাস লিখেছেন। তাঁর উপন্যাসের মধ্যে **এ গ্রেন অব হুইট** এবং **বিফোর দি ডন** উল্লেখযোগ্য। শেষের উপন্যাসটি আত্মজীবনীমূলক।

এইজি য়োশিকাওয়ার **দি হেইকে স্টোরি** বিক্রি হয়েছে দশ লক্ষ কপিরও বেশি। মধ্যযুগে হেইকে ও গেন্‌জি বংশের মধ্যে দীর্ঘকালব্যাপী যে-যুদ্ধবিগ্রহ চলেছে, লেখক আধুনিক পাঠকের উপযোগী করে তা পরিবেশন করেছেন। য়োশিকাওয়ার নিজের জীবনও গল্পের মতোই বিচিত্র। সামান্য লেখা-পড়া শেখার সুযোগ পেয়েছিলেন; জীবিকার্জনের জন্য মজুরের কাজ থেকে সব কিছুই করেছেন। শেষে হলেন সংবাদপত্রের রিপোর্টার। ১৯২৩ সালের ভূমিকম্পে সংবাদপত্রের আপিশ ধ্বংস হয়ে যায়। তারপর থেকে তিনি লেখাকেই পেশা হিসেবে গ্রহণ করলেন।

গল্প লেখক হিসেবে আকুতাগাওয়া বিশ্বজোড়া খ্যাতি লাভ করেছেন রশোমন ফিলমটির জন্য। ঐ নামের গল্পের উপর ভিত্তি করে রচিত ফিলমটি ভেনিসের আন্তর্জাতিক মেলায় গ্র্যাণ্ড প্রাইজ পেয়েছে। তাঁর গল্পে বাস্তব জীবনের কথা নেই। অপ্রাকৃত পরিবেশ নিয়ে তাঁর কাহিনী রচিত। গল্পের রস কম। ইঙ্গিতময়তা প্রধান বৈশিষ্ট্য। বাস্তব জীবনকে লেখক নিজে বেশি দিন সহ্য করতে পারেননি। আত্মহত্যা করে এই জীবন থেকে বিদায় নিয়েছিলেন।

যুদ্ধ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য লেখকরা, বিশেষ করে জার্মানরা, যেমন সচেতন— জাপানী লেখকরা তেমন নন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রচণ্ড সংঘাত এবং

হিরোশিমার ধ্বংসস্তূপ জাপানী লেখকদের যে বিচলিত করেছে, তার প্রমাণ সাহিত্য থেকে তেমন পাওয়া যায় না। শুধু দুটি উপন্যাসের ইংরেজী অনুবাদ থেকে আমরা জাপানী সাহিত্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রভাব দেখতে পাই।

যুদ্ধের সংঘাত সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করেছে জাপানের অভিজাত শ্রেণীকে। বনেদি পরিবারগুলি ভেঙে পড়েছে। এমনি এক বনেদি পরিবারের ভাঙনের ছবি এঁকেছেন ওসামু দাজাই (১৯০৯-১৯৪৮) তাঁর **দি সেটিং সান**-এ। নায়িকা কাজুকো তাদের পরিবারের পতনের কথা বলছে। পতনের সূত্রপাত হলো বাবার মৃত্যুর পর। আশা ছিল, ছোট ভাই নাওজি জীবনে সাফল্য লাভ করে পরিবারের গৌরব বাড়াবে। কিন্তু তাকে যেতে হলো যুদ্ধে। যুদ্ধ শেষ হলেও নাওজি ফিরে এলো না। কাজুকো তার রুগ্ন মাকে নিয়ে চরম দুর্দশায় পড়ল। কিছুদিন পরে সংবাদ এলো নাওজি জীবনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে আত্মহত্যা করেছে। বনেদি পরিবারের বংশধারার সমাপ্তি হলো।

লেখক নিজেও জীবনে বীতস্পৃহ হয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন।

দ্বিতীয় উপন্যাসটির নাম **ফায়ারস অন দি প্লেন**। লেখক শোহেই উকা। উকা ফরাসী সাহিত্যের অধ্যাপক। তিনি যুদ্ধে যোগ দিয়ে আমেরিকানদের হাতে বন্দী হয়েছিলেন।

উপন্যাসের নায়ক তামুরা। জাপানী সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছে ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জে। নতুন অপরিচিত জায়গায় পা দিতেই ধরা পড়ল তামুরা যক্ষ্মারোগে ভুগছে। জাপানী বাহিনী প্রতিপক্ষের আক্রমণে উদ্‌ব্যস্ত। তাই বাহিনীর নায়ক তামুরাকে শিবির থেকে বিদায় দিলেন। তামুরা তারপর থেকে বাঁচার তাগিদে কি ভাবে অচেনা শত্রু অধ্যুষিত দেশে ঘুরে বেড়িয়েছে, তারই মর্মস্পর্শী বিবরণ দিয়েছেন লেখক। ক্ষুধার এমন নগ্ন চিত্র পৃথিবীর সাহিত্যে কমই আছে।

সমকালীন লেখকদের মধ্যে য়ুকিও মিশিমা জনপ্রিয়। তিনি উপন্যাস, কাবুকি নাটক, প্রবন্ধ ইত্যাদিও লিখেছেন। তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য—**দি সাউণ্ড অব ওয়েভস**, জেলে সমাজে প্রথম প্রেমের কাহিনী; **কনফেশানস অব এ মাস্ক**; **আফটার দি বাঙ্কোয়েট**; **দি টেম্পল অব দি গোল্ডেন প্যাভিলিয়ন**, ইত্যাদি।

সর্বপ্রথম একজন জাপানী লেখক নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন ১৯৬৮

সালে। তিনি ঔপন্যাসিক ও গল্পকার ইয়াসুনারি কাওয়াবাতা। এখন তাঁর বয়স সত্তর পার হয়েছে। জন্মের কিছুদিন পরেই কাওয়াবাতা মা-বাবাকে হারান। হয়তো সেই কারণেই তাঁর রচনায় নিঃসঙ্গতা ও মৃত্যুর প্রভাব বড় বেশি। শূন্যতা ও রাত্রি ফিরে ফিরে আসে। কথনো কথনো মনে হয় লেখক বড় নির্মম। অথচ পার্থিব জীবনের প্রতি কাওয়াবাতার নায়ক-নায়িকাদের যে আকর্ষণ নেই তা নয়। বরং অনেক ক্ষেত্রেই যৌনতার আধিক্য নিয়ে অভিযোগ উঠতে পারে। কিন্তু এসব একান্তই বাহ্যিক। যেন মৃতদেহের আচ্ছাদনের ওপর শিল্পীর কারুকার্য। আচ্ছাদন সরালেই বেরিয়ে পড়বে মৃত্যুর বীভৎসতা। কাওয়াবাতা প্রেম আর মৃত্যুকে যুক্ত করে দেখেছেন।

প্রথম জীবনে কাওয়াবাতা ও তাঁর কয়েকজন বন্ধু স্থির করেন কাব্যধর্মী উপন্যাস লিখে যুগান্তর আনতে হবে। এই সঙ্কল্পের ফল কাওয়াবাতার **দি ইজু ড্যান্সার**। এক তরুণ ছাত্র আর এক কিশোরী নর্তকীর কাহিনী। দুজনেই সরল ও নিষ্পাপ। ইজু উপদ্বীপের পটভূমিকায় কাব্যধর্মী গল্পটি বলেছেন লেখক।

বার্ডস অ্যাণ্ড বীস্ট-এর নায়ক মানুষের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে পাখিদের সঙ্গী করল। তাদের যৌবন বার্ধক্য ও মৃত্যু সে প্রতিদিন লক্ষ্য করে। পাখি দেখতে দেখতে হঠাৎ চোখের সামনে ভেসে ওঠে তার পুরনো প্রণয়িনীর মুখ। সেই নর্তকী প্রণয়িনীও এই পাখির মতো যৌবন পার হয়ে বার্ধক্যে পৌঁছে যাবে। সে যেন দেখতে পাচ্ছে তার গলিত দেহ। কাহিনীর শেষে দেখা গেল নায়ক নর্তকীর নৃত্য দেখতে গেছে। চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ নৃত্যরতা প্রিয়তমা হারিয়ে গেল, ভেসে উঠল তার মৃতদেহ।

নোবেল কমিটি বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেছেন কাওয়াবাতার **স্নো কান্ট্রি** উপন্যাসটির কথা। পর্বতের চূড়া ঢাকা থাকে তুষারে। সেখানকার উষ্ণ প্রস্রবণের আকর্ষণে লোক আসে। এই পটভূমিকায় সুন্দরী গীসা তরুণীর সঙ্গে টোকিওর এক নাগরিকের উন্মত্তের মতো কাটানো কয়েক দিনের কাহিনী। কিন্তু গীসার কথায় নায়ক পর্বতচূড়ার স্বাস্থ্যনিবাস ত্যাগ করে ফিরে গেল টোকিওর কোলাহলে।

থাউজ্যাণ্ড ক্রেইনস বিড়ম্বিত প্রেমের কাহিনী। মধ্যবয়সী বিধবা

গভীরভাবে আকৃষ্ট হলো এক তরুণের প্রতি। এই তরুণের পরলোকগত পিতা ছিল তার যৌবনের প্রেমিক। যুবক কাছে এলেই সেই হারানো যৌবনের কথা মনে পড়ে যায়, মনে হয় বুঝি একে অবলম্বন করে ফিরে পাওয়া যাবে যৌবনের দিনগুলিকে। কিন্তু আশা সফল না হওয়ায় আত্মহত্যা করল সে। এবার যুবক আকৃষ্ট হলো বিধবার যুবতী কন্যার প্রতি। যুবতীর মুখের দিকে তাকালেই মনে পড়ে যায় প্রৌঢ়া রমণীর কথা, যে তাকে অবলম্বন করে নতুন জীবনের স্বাদ পেতে চেয়েছিল। কিন্তু তরুণী অকস্মাৎ কোথায় চলে গেল।

জাপানী সাহিত্যের ইতিহাস দীর্ঘকালের। ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা করা চলে। পৃথিবীর দীর্ঘতম আদি উপন্যাস এবং ক্ষুদ্রতম কবিতা জাপানী ভাষায় রচিত হয়েছে! কবিতা ও নাটকের ক্ষেত্রে পুরনো রীতি ও ঐতিহ্য এখনো চলে আসছে সামান্য পরিবর্তিত হয়ে। পাশ্চাত্যের আদর্শে এবং সেখানকার বিখ্যাত নাট্যকারদের অনুকরণে কয়েকটি নাটক অবশ্য লেখা হয়েছে। তবে জাপানী নাটকের অভিনয় দেখে প্রায়ই মনে হয় নাট্যকারের চেয়ে অভিনেতা ও প্রয়োগকর্তা বড়। আধুনিক জাপানী সাহিত্যের সমৃদ্ধতম শাখা উপন্যাস।

জাপানী সাহিত্যে সমাজবোধ প্রবল নয়। গোষ্ঠীর চেয়ে ব্যষ্টি প্রধান। বাস্তবতা অপেক্ষা রোমান্টিকতার প্রতি বেশি ঝোঁক। বাস্তবতা যে নেই, তা নয়। অনেক লেখকই দক্ষতার সঙ্গে বাস্তব জীবনের ছবি উপস্থিত করেছেন। কিন্তু সে-সব ছবি বৃহত্তর সামাজিক পটভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। রোমান্টিকতার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে একটা অনির্দেশ্য বেদনাবোধ আচ্ছন্ন করে রেখেছে জাপানী সাহিত্যকে, বিশেষ করে সমকালীন সাহিত্যকে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আমেরিকান সাহিত্য থেকে জাপানী লেখকরা একটি জিনিস গ্রহণ করেছেন। সেটা হলো নিঃসঙ্গতা। জাপানী উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাদের জীবনে নিঃসঙ্গতার প্রভাব যথেষ্ট।

শতবর্ষের আলোয় দীনবন্ধু অ্যাণ্ড্রুজ

সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়

*The Civil and Military Gazette*এ প্রকাশিত এক উদ্ধত পত্রে ভারতের স্বদেশপ্রেমিকেরা নির্দেশিত হলেন : "a handful of mis-educated malcontents who could and should be dealt with like ill-disciplined schoolboys." (Benarsidas Chaturbedi and Majorie Sykes : *Charles Freer Andrews*. London 1949)। এ-মতো উৎকট চিত্তবিক্ষেপের জবাব যিনি দিলেন, তিনি ভারতবাসী নন ; তবে নিঃসন্দেহে তাঁর 'দ্বিতীয় স্বদেশ' ছিল ভারতবর্ষ। তিনি হলেন মহামতি চার্লস ফ্রিঅ্যর অ্যাণ্ড্রুজ। লর্ড কার্জনের বিধানে বঙ্গচ্ছেদ কার্যকরী হওয়ার-পর বাঙলাদেশ তথা ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনে যে-উচল উতরোল শুরু হয়েছিল, সেই পটভূমিকায় ভারতপ্রেমিক অ্যাণ্ড্রুজের প্রতিবাদপত্রের (সেপ্টেম্বর ১৯০৬) গুরুত্ব যে কি পরিমাণ—সে-সম্পর্কে সন্দেহের কোনোও অবকাশ নেই। প্রসঙ্গত বলা চলে, এই ঘটনার মাত্র তিন মাসের মধ্যে অ্যাণ্ড্রুজ সাহেব সমগ্র ভারতবর্ষের মহান নেতৃবর্গের শ্রদ্ধাভাজন হয়ে ওঠেন। আর তারপর থেকে আমৃত্যু অ্যাণ্ড্রুজের চৈতন্য উৎসর্গিত হলো ভারতাত্মার মুক্তিসাধনে !

বসন্তের শুরুতে শীতের আমেজমাখা এক সকালে ইংলণ্ডের নিউক্যাসল-অন-টাইনের ধূসর রাস্তাগুলি পার হয়ে ওয়েস্টগেট জেলার একটি শ্রীহীন অফিসে পৌঁছে বলিষ্ঠ যুবা জন্ এড্উইন্ অ্যাণ্ড্রুজ জানালেন—তাঁর দ্বিতীয় পুত্রের জন্মের সেই সুখবরটি। পঞ্জিকা-মতে সেদিন ছিল ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ১২ ফেব্রুয়ারি। অ্যাণ্ড্রুজ তাঁর মা মেরি শলিটের সুদৃশ্য চোখ দুটির ওয়ারিসই হলেন না ; তাঁর দ্বিতীয় নাম 'ফ্রিঅ্যর'-এ তাঁর মাতৃকুলের উত্তরাধিকার সুস্পষ্ট (তাঁর মায়ের মাতামহ ছিলেন স্টাউরব্রিজের উইলিয়ম লিক্রফট ফ্রিঅ্যর)।

ছ-বছর বয়সে চার্লিকে এক গুরুতর ব্যাধির শিকার হতে হয়। মায়ের প্রবল পরিচর্যায় পুত্রের প্রাণ রক্ষা পায় শেষাবধি। চার্লির চারিত্রিক

বৈশিষ্ট্যে তাঁর মায়ের প্রভাব প্রকটিত। পরবর্তীকালে আপন স্বভাবে মাতৃসুলভ মানসিকতার পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখেছিলেন (২৭ জানুআরি ১৯১৪): "My life seems only able to blossom into flower when I can pour out my affection upon others as my mother did upon me." চার্লির অসুস্থতার অল্পকাল পরেই অ্যাণ্ড্রুজ পরিবার নিউক্যাসল থেকে বারমিংহামে বাসস্থান স্থানান্তরিত করলেন। ৬ কি হিল্ ড্রাইভের শান্ত কানাগলিতেই প্রথম চার্লির মধ্যে বহির্বিশ্ব সংক্রমিত হয়। তারপর পরিবারের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির জন্যে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে কি হিল্ স্ট্রিট থেকে তাঁরা বাসস্থান পুনরায় পরিবর্তন করেন হ্যাণ্ডসওয়ার্থের সীমান্তবর্তী ১ সাউথ রোডে। চার্লি এখানে ডিকিনের পাঠশালায় ভর্তি হলেন। সর্বোপরি সহৃদয় পিতার সতত সাহচর্য তথা শিক্ষণ চার্লিকে যথার্থই প্রাণিত করে। একদা বাবার বইয়ের আলমারির পিছনে শস্তা কাগজে অযত্নে ছাপা ওয়ালটার স্কটের উপন্যাস ও কবিতার এক সম্পূর্ণ সেট আবিষ্কারে চার্লি উৎফুল্ল হলেন: "a golden store of wealth that could neither be diminished nor exhausted." আর তারপর শারীরিক স্বাস্থ্য কিঞ্চিৎ দৃঢ়তর হতে থাকলে স্নেহবৎসল পিতা তাঁর পুত্রকে নিয়ে বেড়াতে বেরোলেন—সবুজ প্রান্তর থেকে নগরকেন্দ্রাভিমুখে; নিছক ভ্রমণই নয়, চার্লি তাঁর আদর্শ শিক্ষক পিতার মুখে শুনতে পেলেন ইতিহাস রাজনীতি ও ধর্মতত্ত্বের কথা। যদিচ চার্লির পিতার প্রবল প্রত্যয় ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সীমাহীন মহত্ত্বে; তৎসত্ত্বেও শুধুমাত্র সচিত্র *Deeds that won the Empire* গ্রন্থটি ছেলেকে পড়তে দিয়েই তিনি তাঁর দায়িত্ব চুকিয়ে ফেললেন না—ইতিহাসের রোমাঞ্চিত সব কাহিনী সমানে শুনিয়ে চললেন চার্লিকে যাতে ১৮৫৭-র ভারতীয় মহাবিদ্রোহের বিবরণীও বাদ পড়ল না! এইসব বৃত্তান্ত চার্লির চিন্তনকে উদ্দীপ্ত তথা উচ্চকিত করতে নিঃসন্দেহে সহায়ক হয়। একটি ঘটনা এইপ্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। একদিন বাড়ি ফিরে ব্যগ্রচিত্তে চার্লি তার মাকে জানায়: "I want a bit of rice to eat with my dinner everyday—please! You see, I'm going to India when I grow up, and father says everyone eats rice there."

১৮৮৫-র খ্রীস্টমাসে, পনেরো বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার আগেই, সুবিখ্যাত King Edward VI High School থেকে চার্লি *Classical III*-এ

প্রথম স্থান অধিকার করেন। প্রসঙ্গত বলা যায়, এই সুপ্রাচীন বিদ্যালয়ের সুদক্ষ প্রধান-শিক্ষক রেভারেণ্ড এ. আর. ভ্যার্ডীর সংস্পর্শে এসে চার্লির শিক্ষাজীবন সম্ভাবিত হয়। বিদ্যালয়ের লোভনীয় পুরস্কারগুলি সহজেই চার্লি লাভ করতে সমর্থ হলেন। সর্বোপরি ১৮৮৯-এর Speech Day-তে তাঁর এক কনিষ্ঠ সহোদর গর্বভরে লক্ষ্য করেছিলেন—চার্লি বিদ্যালয়-কর্তৃবর্গকে অভ্যর্থনা জানালেন গ্রীক কবিতায়। আর নিছক বিদ্যাচর্চাই নয়, বিতর্কসভা থেকে নাট্যাভিনয় পর্যন্ত—বহুধাবিচিত্র অনুসন্ধিৎসায় অব্যাহত ছিল চার্লির মননচর্যা। ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে স্কুল-জীবনের শেষপর্বে (term) সোফোক্লেসের 'ফিলোক্‌তেতেস্' নাটকের নৈঃসঙ্গ্য তথা মর্মন্তুদ চিত্রকে চার্লি এক আশ্চর্য নৈপুণ্যে মূর্ত করেছিলেন। তারপর Open Classical Scholarship-এ মনোনীত (মার্চ ১৮৯০) হয়ে চার্লি কেমব্রিজের পেমব্রুক কলেজে যোগদান করলেন। ডারহ্যামের বিশপ ওয়েস্টকট এবং অক্সফোর্ডের তরুণ ভাবুক চার্লস গ্যর্-এর (যিনি হ্যারোতে একদা ওয়েস্টকটের ছাত্র ছিলেন) উপদেশে আস্থাবান হওয়ায় অ্যাণ্ড্রুজের মানসিক ভিত্তি দৃঢ়তর ও সুসংবদ্ধ হতে থাকে। অত্যাশ্চর্য আন্তরিকতায় অ্যাণ্ড্রুজ Christian Social Union-এর (কেমব্রিজ শাখা) কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, বলা বাহুল্য এজন্যে তাঁকে আদৌ কোনো মানসিক দ্বন্দ্বে ভুগতে হয়নি। ওয়েস্ট-কটের নিপীড়িত ও শোষিত শ্রমিকসংসক্তি সংক্রমিত হলো অ্যাণ্ড্রুজের চেতনায়। ক্যামডেন স্ট্রিটের বস্তি তথা কেমব্রিজের অসংখ্য আর্ত পরিবারের দুঃখদুর্দশার শরিক হলেন তিনি। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ক্ল্যাসিক্যাল ট্রাইপস্ প্রথম ভাগে অ্যাণ্ড্রুজ প্রথমশ্রেণীতে (অবশ্য তৃতীয় বিভাগে) উত্তীর্ণ হন। দু-বছর পরে (১৮৯৫) থিয়লজিক্যাল ট্রাইপস্ প্রথম ভাগেও তিনি কৃতিত্ব দেখান উপর্যুপরি। বিশ্ববিদ্যালয়গত সাফল্য সত্ত্বেও জীবনচর্যার বৈচিত্র্যে তাঁর ঔৎসুক্য ছিল অপার। অভিযানপ্রেমিক প্রাকস্নাতক ছাত্রদের সঙ্গে সমানে তিনি অনেক রাত্তির অবধি অধ্যাপক এডওয়ার্ড গ্র্যানভিল ব্রাউনের ঘরে (পেমব্রুকের আইভি কোর্টে) বসে তাঁর পারস্যভ্রমণ তথা ইসলামী ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা শুনতেন। পেমব্রুক কলেজ মিশনে কর্মরত থাকাকালীন কেমব্রিজের তিনটি কলেজের ফেলোশিপ প্রত্যাখ্যান করেন অ্যাণ্ড্রুজ! যদিও শেষাবধি তাঁকে ফিরে আসতে হয় কেমব্রিজে—পেমব্রুক কলেজের ফেলো নির্বাচিত হয়ে (নভেম্বর ১৮৯৯)।

কেমব্রিজে কিছুকাল কাটানোর পর অ্যাণ্ড্রুজের কৈশোরের স্বপ্ন সফল হলো। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের ২০ মার্চ তিনি বোম্বাইয়ে এসে পৌছলেন। দিল্লীর সেণ্ট ষ্টিফেনজ কলেজে অ্যাণ্ড্রুজের অধ্যাপক হিসেবে যোগদানকালীন অধ্যক্ষ ছিলেন হিব্যর্ট ওয়েভ। কেমব্রিজে অ্যাণ্ড্রুজের সমসাময়িক হলেন এই হিব্যর্ট সাহেব। তৎসত্ত্বেও তিনি এখানে যে-মানুষটির ব্যক্তিত্বে বিমুগ্ধ হন তিনি স্বনামখ্যাত সুশীলকুমার রুদ্র (উক্ত কলেজের উপাধ্যক্ষ)। ওয়েস্টকট-এর পরম সুহৃৎ রুদ্রমশায়ের মানবিক বোধই অ্যাণ্ড্রুজকে আমৃত্যু তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা বজায় রাখতে সাহায্য করে: "I owe to Susil Rudra what I owe to no one else in all the world," ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে (অধ্যক্ষপদ থেকে) রুদ্রমশায়ের অবসর গ্রহণের সময় সপ্রশংস প্রশস্তিতে অ্যাণ্ড্রুজ লেখেন, "a friendship which has made India from the first not a strange land but a familiar country।" পরবর্তীকালে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা থেকে আমরা জানতে পারি: "সেণ্ট ষ্টীফেনস কলেজের প্রিন্সিপ্যাল স্বর্গত সুশীলকুমার রুদ্র দীনবন্ধুর অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। উভয়ে যেন আধ্যাত্মিক অভিন্নহৃদয় ছিলেন। রুদ্র মহাশয়ের একটি নাতনীর যখন জন্ম হয়, তখন অ্যাণ্ড্রুজ আমাকে স্পর্দ্ধার সহিত লিখিয়াছিলেন, 'এখন আমিও ঠাকুরদাদা হয়েছি!'—কারণ তিনি বোধ হয় মনে করিতেন, আমার অনেকগুলি নাতনী আছে বলিয়া আমি অহঙ্কৃত।" (প্রবাসী। বৈশাখ ১৩৪৭)। রুদ্রমশায়ের প্রভাবই ভারতবর্ষ সম্পর্কে অ্যাণ্ড্রুজের অন্তর্দৃষ্টিলাভের সহায়ক হয়। অর্থবিজ্ঞানী রুদ্রমশায়ই তাঁর মনে এক স্থির প্রত্যয় জাগান যে ব্রিটিশ শাসনের দায়দায়িত্ব সম্বন্ধে গোপালকৃষ্ণ গোখলের অভিযোগ: "a fearful impoverishment of the people" (সভাপতির অভিভাষণ: ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ১৯০৫) সর্বত সত্য। সর্বোপরি অচিরে এক ইংরেজ সহকর্মীর উৎকট মনোভাবেই যেকালে তাঁর সঙ্গে অধ্যক্ষের বাঙলোয় রুদ্রমশায়ের অবস্থান অসম্ভব হয়ে ওঠে তখন তাঁর কাছে আমলাতন্ত্রের যথার্থ স্বরূপটি স্পষ্টতর হয়।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত Congress of the Universities of the Empire-এ যোগদান করার জন্যে অ্যাণ্ড্রুজ কেমব্রিজ থেকে রওনা হলেন। লণ্ডনে লেখক ও সাংবাদিক হেনরি উড নেভিনসনের (যিনি দিল্লীতে অ্যাণ্ড্রুজের অতিথি ছিলেন) মুখে উইলিয়ম রোটেনস্টাইনের

বাসস্থানে (হ্যামপস্টিডে) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আগমনের কথা শুনলেন। আর তারপর সেই রবিবারের ঐতিহাসিক সন্ধ্যায় উইলিয়ম ব্যটলর য়েটসের মুখে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠ (ইংরেজি তরজমায়) এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সৌহৃদ্য অ্যাণ্ড্রুজকে নতুনতর এক চিন্তনে উদ্বুদ্ধ করেছিল। উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকে এ-সম্পর্কে জানা যায়: "তখন আমি লণ্ডনে ছিলুম। কলাবিশারদ রোটেনস্টাইনের বাড়িতে সেদিন ইংরেজ সাহিত্যিকদের ছিল নিমন্ত্রণ। কবি ইয়েট্স আমার গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদ থেকে কয়েকটি কবিতা তাঁদের আবৃত্তি ক'রে শুনিয়েছিলেন। শ্রোতাদের মধ্যে এক কোণে ছিলেন এণ্ডরূজ। পাঠ শেষ হ'লে আমি ফিরে যাচ্ছি আমার বাসায়। কাছেই ছিল সে-বাসা। হ্যাম্পস্টেড হীথের ঢালু মাঠ পেরিয়ে চলেছিলুম ধীরে ধীরে। সে-রাত্রি ছিল জ্যোৎস্নায় প্লাবিত। এণ্ডরূজ আমার সঙ্গ নিয়েছিলেন। নিস্তব্ধ রাত্রে তাঁর মন পূর্ণ ছিল গীতাঞ্জলির ভাবে। ঈশ্বরপ্রেমের পথে তাঁর মন এগিয়ে এসেছিল আমার প্রতি প্রেমে। এই মিলনের ধারা যে আমার জীবনের সঙ্গে এক হয়ে নানা গভীর আলাপে ও কর্মের নানা সহযোগিতায় তাঁর জীবনের শেষ পর্ব পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে চলবে সেদিন তা মনেও করতে পারি নি।" (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: দীনবন্ধু এণ্ডরূজ। 'প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৪৭)

১৯১২-র নভেম্বরে অ্যাণ্ড্রুজ দিল্লীতে ফিরে আসেন এবং শিক্ষাদানকেই মিশনারী কর্মকাণ্ডের মৌল উপকরণ ঠওরান: "My own hope lies more and more in education," এক চিঠিতে (২০ ডিসেম্বর ১৯১২) তিনি মার্কিন মুলুকে রবীন্দ্রনাথকে লিখলেন, "My own missionary work would be impossible in any other sphere, but along this line I feel I can fulfil my highest Christian instincts and fulfil also the highest service to India।" উপর্যুক্ত পত্রের আর একটি মূল্যবান অংশ প্রণিধানযোগ্য: "My thoughts turn more and more to an India that shall be really independent. And yet one knows that this can hardly be at present. Only how to get out of this vicious circle of subjection leading to demoralisation (both of rulers and ruled) and demoralisation leading to further subjection?"

ইতিমধ্যে মার্চ মাসের গোড়ার দিকে অ্যাণ্ড্রুজের শান্তিনিকেতন দর্শনের

প্রথম পর্ব চুকেছে। রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ-সহোদর দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ক্ষিতিমোহন সেন প্রমুখ গুণীজনেরা তাঁকে সাদর সম্ভাষণ জানান। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে অ্যাণ্ড্রুজ শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দিলেন। "সবল চারিত্রশক্তির গুণ এই যে কেবল ভাবাবেগের উচ্ছ্বাসের দ্বারা সে আপনাকে নিঃশেষ করে না, সে আপনাকে সার্থক করে দুঃসাধ্য ত্যাগের দ্বারা। কখনো তিনি অর্থ সঞ্চয় করেন নি, তিনি ছিলেন অকিঞ্চন। কিন্তু কতবার এই আশ্রমের অভাব জেনে কোথা থেকে তিনি যে একে যথেষ্ট অর্থ দান করেছেন তা জানতেও পারি নি।" (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: দীনবন্ধু এণ্ডরুজ। প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৪৭)। যদিচ বিশ্বভারতীর এক ভূতপূর্ব ছাত্রের লেখা থেকে জানা যায়: "এণ্ড্রুজ এবং পিয়ার্সন যে সরকারী স্পাই বা গুপ্তচর নন এই বিশ্রী ধারণাকে মন থেকে মুছে ফেলতে আমাদের বেশ সময় নিয়েছিল। এই ধারণাকে অনেকদিন পর্যন্ত আমাদের অনেকের মধ্যে অল্প-বিস্তর থাকার জন্য, আমাদের অনেক রকম ভাল কাজের মধ্যে তাঁদের সহযোগিতাকে আমরা স্বচ্ছন্দচিত্তে গ্রহণ করতে পারিনি। ...অবশেষে মহাত্মা গান্ধী তাঁকে (এণ্ড্রুজকে) স্পষ্টভাবেই জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তিনি অর্থাৎ এণ্ড্রুজ আমাদের যতটা আপন জন বলে মনে করেন প্রকৃত পক্ষে আমরা অনেকেই তাঁকে আপন জন বলে অন্তরে মেনে নিইনি।" (সুধাকান্ত রায়চৌধুরী: বিশ্বভারতী ও ৺ সি. এফ. এণ্ড্রুজ। সপ্তর্ষি, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৯)

শান্তিনিকেতনের নির্দিষ্ট কোনো কাজে দীর্ঘকাল অ্যাণ্ড্রুজকে "বেঁধে রাখা অসম্ভব ছিল।" কেননা "নিখিল মানবসমাজের নিদারুণ যন্ত্রণার" বিরুদ্ধে ছিল তাঁর আমরণ অভিযান। "দেখেছি তাঁর অশেষ করুণা এ-দেশের অন্ত্যজদের প্রতি। তাদের কোনো দুঃখ বা অসম্মান যখনি তাঁকে আহ্বান করেছে তখনি নিজের অসুবিধা বা অস্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য না রেখে সকল কাজ ফেলে ছুটে গিয়েছেন তাদের মধ্যে।" (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: দীনবন্ধু এণ্ডরুজ। প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৪৭)। অবশ্য অ্যাণ্ড্রুজের অসামান্য আত্মোৎসর্গ আদৌ ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমারেখায় শান্ত হয়নি, সুদূর দক্ষিণআফ্রিকার "কাফ্রি অধিবাসীদের সম্বন্ধে"ও সমানে তাঁর উৎকণ্ঠা দেখা গেছে।

আর অ্যাণ্ড্রুজ ভারতবর্ষের সঙ্গে আপন নাড়ির যোগ অনুভব করে এদেশের মানুষকে যে-কালে পরম স্বজন ঠাওরালেন—সেই সন্ধিক্ষণটি যে কিরূপ সঙ্কটাপন্ন ছিল তা বলাই বাহুল্য। প্রচণ্ড রাষ্ট্রীয় উত্তেজনা ও সংঘাত সত্ত্বেও

আপন আত্মিক শক্তির জোরেই তিনি "এ-দেশীয়দের মধ্যে আপন সৌহৃদ্যের আসন" লাভে সমর্থ হন। "যখন মহাত্মাজী ও রবীন্দ্রনাথের কোন কোন বিষয়ে মতভেদ হয়েছে তখন কত এদেশীয় লোক তো ছিলেন কেউ সেই ভেদকে মিটিয়ে দেবার কথাও মনে করেন নি, মহামতি এণ্ড্রুজ সাহেবের তখন দিবারাত্রি চেষ্টা ছিল কিসে এই দুইজন মহাপুরুষের ভেদ মেটে। সবারমতি ও শান্তিনিকেতনের মধ্যে তিনি ছিলেন নিত্যযোগসেতু।" (ক্ষিতিমোহন সেন : মহামতি এণ্ড্রুজ। প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭)

ভারতবর্ষের আপামর জনসাধারণের নানাবিধ দুঃখ-দুর্দশা সাধ্যমতো প্রাণপণে মেটাতে চেষ্টা করেছেন অ্যাণ্ড্রুজ। আপন অস্তিত্বকে তিলে তিলে তিনি বিলিয়ে দিলেন মানবকল্যাণে। মৃত্যুর মাত্র মাসকয়েক আগেও ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতার কথা তাঁর লেখায় সমানে উচ্চারিত : "Every year that now passes in India, without the removal of the foreign yoke, is undoubtedly an evil. It is likely to undo any benefit that may have been derived before. This was my main thesis in a series of articles which I wrote in 1921, called, 'The Immediate Need of Independence,' where I emphasised the word 'immediate'; and I hold fast to every word which I then wrote. Nearly twenty years have passed since that date and hope deferred has made the heart sick. Things in India *have* deteriorated, as Prof Seely prophesied, and the evil is rapidly increasing. This agony of Subjection is eating like iron into the soul, and the strain must be relieved at once." (*The Modern Review*, February 1940)

কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেনর‍্যাল হাসপাতালে দ্বিতীয়বার অস্ত্রোপচারের পর অ্যাণ্ড্রুজ আর চেতনা ফিরে পেলেন না। তারপর ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ৫ এপ্রিল শুক্রবার ব্রাহ্মমুহূর্তে ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের মেহনতী মানুষের সঙ্গে দীনবন্ধু অ্যাণ্ড্রুজের এতকালের স্বাস্থ্যপ্রদ সম্পর্ক সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়ে গেল!

পরিশেষে তাই পূর্ণ মনুষ্যত্বের যথার্থ সংজ্ঞা কি সেই জটিল তত্ত্বের চুলচেরা বিচারে কালক্ষেপ না করে একাধারে পরম হৃদয়বান ও প্রতিভাবান এ মানুষটির স্মৃতির প্রতি আমাদের সানুরাগ শ্রদ্ধা জানাই। কার্যত কিকেরো কথিত সেই স্মরণই আমাদের অবধেয় যা সমস্ত বস্তুর শুভসাধক, অমূল্য অবলম্বন : *Memoria est thesaurus omnium rerum et custos*

রক্ত

সুবিমল মিশ্র

ডোবার ধার দিয়ে যে-অব্যবহৃত পথরেখাটি বেঁকেছে—সেখানে আসশ্যাওড়ার জঙ্গল, সে-জঙ্গল বাড়ির বারান্দা পর্যন্ত বিস্তৃত, সমস্ত অঞ্চলটায় ইতস্তত পুরনো ইঁট দালানের ভাঙা থাম ও তার অংশ ছড়ানো, যা দেখলে বাড়িটিকে অতি সহজে পোড়ো বাড়ি বলে মনে হয় এবং তাই পারতপক্ষে লোকে সাপখোপ আর এই ধরনের নানারকম উপদ্রবের ভয়ে এ-অঞ্চলে পা দেয় না। সঞ্জয়দা বললেন 'এই ধরনের পরিবেশ আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করেছে, নয়তো যে-কোনো সময় লোকজন আমাদের দেখে ফেলত, আর তাহলে দলের কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়াও মোটেই সহজ হতো না।' সঞ্জয়দা পা ছড়িয়ে বসে সিগারেট ধরিয়েছেন। নৃপেন রাজিব দেয়ালে পিঠ, মাথা সামনের দিকে ঈষৎ হেলানো, বসে আছে। রবিনকে এখনো উত্তেজিত দেখাচ্ছে, শিরদাঁড়া সোজা, বুকের ওপর হাতদুটো আড়াআড়ি রেখে পায়চারি করছে। ঘরের ভেতর মোম জ্বলছে। সঞ্জয়দা সিগারেটে দুটো টান দিয়ে ঘাড় কাত করে রবিনকে দেখলেন, তারপর বললেন 'রবিন, তোমাকে এখনো বেশ উত্তেজিত দেখাচ্ছে, ওটা ভালো না এই সব কাজে।' রবিন এই কথায় ক্ষণমাত্র থমকে দাঁড়িয়ে আবার পায়চারি শুরু করল, কিছু একটা বলবে ভেবেও বলল না। তারপর একপাক ঘুরে এসে স্বপ্নের মতো স্বরে বলল 'লোকটা পড়ে গিয়ে দু-হাতে মাটি আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করেছিল।' সঞ্জয়দা সিগারেটে আরো দুটো টান দিলেন। অদূরে আসশ্যাওড়ার জঙ্গলের ধারে শেয়াল ডাকল। শব্দ থেমে গেলে সমস্ত চুপচাপ। রবিন পায়চারি করছিল, কেবল সেই শব্দ। সমস্ত নিস্তব্ধতার ভেতর সেই শব্দ বাজছিল, হৃৎপিণ্ড চারটিতে বাজছিল। রবিন বাঁহাত দিয়ে মাথার চুলগুলো মুঠো করে ধরল। তারপর ছেড়ে দিল। তারপর আবার ধরল, ছেড়ে দিল। তার মুখ দিয়ে আবার সেই স্বপ্নের মতো স্বর বেরুল 'লোকটা কিন্তু পড়ে যাওয়ার আগের মুহূর্তেও আমার উদ্দেশ্যটা ধরতে পারেনি।' সঞ্জয়দার মুখ নিচু, নতুন করে সিগারেট ধরাচ্ছিলেন, মুখ তুললেন না।

দেশলাইয়ের কাঠির ক্ষণিক আলোকে তাঁর মুখ লালচে দেখাল। আবার নিস্তব্ধতা। আবার পায়চারির শব্দ। সেই শব্দ চারটে হৃৎপিণ্ডের ভেতর গিয়ে থপথপ করে বাজছিল। মোমটা পুড়ে শেষ হয়ে এসেছে, সঞ্জয়দা একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে দেখলেন। এরপর অন্ধকারেই বসে থাকতে হবে—চিন্তিত হলেন। একসময় নৃপেনের শরীর নড়ল, ঘাড়ে গুঁজে রাখা মাথাটা উঁচু হলো, দেখল মোম পুড়ে যাচ্ছে, তার ধোঁয়া কিছুটা উপরে উঠে অন্ধকারের সঙ্গে একাকার হয়ে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে তার মনে হলো—এখন সময় কত? সে সঞ্জয়দার দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে মারল 'এখন সময় কত সঞ্জয়দা?' সঞ্জয়দা একটু কাশলেন, গলা পরিষ্কার করলেন 'বারোটা বেজে গেছে মনে হয়।' 'কিন্তু লাস্ট ট্রেন যায়নি!' 'তাহলে এখনো যায়নি মনে হয়।' আবার সবাই চুপচাপ। বলার মতো কথা ফুরিয়ে যাওয়ার মতো। মোমটার শেষাংশ জ্বলছিল। ধোঁয়া উঠছিল। রবিন পায়চারি করছিল। শব্দ উঠছিল। নৃপেন এইসব দেখল, শুনল। শুনে স্বাভাবিক হবার, কথা বলার চেষ্টা করছিল। 'বারোটার ভেতরই তো আসার কথা।' 'সেই তো শুনেছিলাম।' 'তবু আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।' 'আচ্ছা, কলকাতা থেকে আসছেন?' 'ঠিক জানি না।' 'এখানে আসবেন?' 'আমাদের এখানে অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে।' নৃপেন চুপ করে গেল, আবার ঘাড়ে মাথা গুঁজে ফেলল, ফেলার আগে মোমটা জ্বলছে, তার মাথায় ধোঁয়া, সেই ধোঁয়া অন্ধকারে মিশছে দেখে নিল। সঞ্জয়দা সিগারেটের শেষটা ঘরের কোণায় ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। অন্ধকারের ভেতর আগুনের লাল দেখা যেতে লাগল। সঞ্জয়দা তাকিয়ে থাকলেন। সেই লাল একসময় নিভলে সেই ফুটকি মতন জায়গাটা অন্ধকারে ভরে গেল দেখলেন। মোম দেখলেন। মোমের শিখা লাল নয় সাদাটে ভাবলেন। এই আলো আর বেশিক্ষণ ধরে রাখা যাবে না ভাবলেন। ভেবে ওদের দিকে তাকালেন। রবিন পায়চারি করে যাচ্ছে। রবিন সবচেয়ে ছেলেমানুষ। প্রথম দায়িত্বটা ভালোভাবেই করেছে, তবুও ছেলেমানুষ। ওকে এইভাবে চুপচাপ থাকতে দেওয়া অস্বস্তিকর। তিনি ওর মুখ দেখার চেষ্টা করলেন, দেখা যায় না, গেলেও চেনা যায় না, গেলেও ঠিকঠিক ধরা যায় না। তিনি কথা বলবেন ঠিক করলেন, বললেন 'রবিন কি ভাবছ?' রবিন পায়চারি একটু শ্লথ করল, সঞ্জয়দার মুখের দিকে দেখল, বলল 'সঞ্জয়দা একটা জিনিস দেবেন?' 'কি?' 'একটা চার্মিনার।' 'তুমি তো সিগারেট

খেতে না।' 'এখন খেতে ইচ্ছে করছে।' সঞ্জয়দা প্যাকেট থেকে বার করে দিলেন, নিজে নিলেন, তারপর আগুন জ্বালালেন। রবিন অনভ্যস্ত ভঙ্গিতে টানতে গিয়ে কেশে ফেলল। 'চার্মিনার খুব কড়া সিগারেট, সকলে খেতে পারে না।' রবিন কিছু বলল না। আবার টান দিল। আবার কাশল। কাশতে কাশতে মোমের দিকে দেখল। 'সঞ্জয়দা, মোমটা তো পুড়ে এল, তারপর?' 'তারপর অন্ধকার।' 'আমাদের এইভাবে অপেক্ষা করতে হবে?' 'তাই বলা হয়েছে।' 'সঞ্জয়দা, আমি ভয়ানক ক্লান্ত।' রবিন বলার সময় সিগারেটটা ঘরের কোণায় ছুঁড়ে দিল। মাথার চুল মুঠি করে ধরল। সঞ্জয়দা কিছু বললেন না। সিগারেটে টান দিলেন। 'সঞ্জয়দা, ক্রমশ অন্ধকার হয়ে আসছে।' সঞ্জয়দা সিগারেটে একটা বড় টান দিলেন। 'সঞ্জয়দা, সমস্তটা অন্ধকারে ভরে যাবে একসময়।' সঞ্জয়দা এবার মুখ তুললেন। 'প্রথম প্রথম এরকম মনে হয়, ও কিছু না।' সঞ্জয়দা আর কিছু বললেন না। রবিন পায়চারি বন্ধ করে দিয়েছে, দিয়ে মোমের শিখার দিকে তাকিয়ে আছে। সব নিস্তব্ধ এখন। নৃপেন রাজিব মাথা গুঁজে আছে। সঞ্জয়দা সিগারেট ফেলে দিয়েছেন। এই নির্জনতায় রবিন আলোকশিখার ভেতরে দেখছিল। দেখতে দেখতে সে এক গ্রামের ছেলেকে নদীর ধারে জঙ্গলে গুলতি দিয়ে পাখি মারতে দেখল। বলল 'লোকটার বুক ফুটো হয়ে গেছিল, হু হু করে রক্ত বেরিয়ে জামাটা আর নিচের হৃৎপিণ্ডটা ভিজিয়ে দিচ্ছিল। আমি এক মুহূর্তের জন্য, ছুটে পালিয়ে আসার আগের মুহূর্তে, দেখেছি।' সঞ্জয়দার ছায়া দেয়ালে পড়ে আছে, কুঁজো হয়ে থাকা দুটো মানুষের ছায়া তাদের দেহের সঙ্গে লেপটে আছে। মোম জ্বলছে, রবিন সেই আলোর ভেতর তাকিয়ে আছে। 'জানেন সঞ্জয়দা, ছোটবেলায় আমি কবি হতে চেয়েছিলাম।' রবিন থামে, তারপর 'কবি হওয়া আমার হয়নি।' সঞ্জয়দা নড়লেন, জামার পকেটে হাত ঢোকালেন, প্যাকেট বার করে সিগারেট নিলেন, ধরালেন, তারপর ধোঁয়া ছাড়লেন আর বললেন 'তুমি এখনো বড়ো সেন্টিমেন্টাল।' রবিন সঙ্গে সঙ্গে বলল 'মোটেই না। তা হলে মানুষ মেরে আসতে পারতাম না।' 'তার জন্য আমি তারিফ করছি। কিন্তু তুমি সেন্টিমেন্টাল।' 'কবিতা লিখতাম বলে?' 'তাও বটে।' 'ওই বয়েসে তো বাঙলাদেশের সব ছেলেই কবিতা লেখার কথা ভাবে।' 'না—সবছেলে না, আমি ভাবিনি।' 'আপনি একসেপশান সঞ্জয়দা।' সঞ্জয়দা উত্তরে কিছু না

বলে সিগারেটে টান দিলেন এবং ধোঁয়া ছাড়লেন। আবার সব চুপচাপ। এবার মোমের শিখাটা শেষবারের মতো দপদপ করে উঠল আর নিভে গেল। সবাই, সেই চারজন, আলো মরে যেতে দেখল। নৃপেন একটু নড়েচড়ে বলল 'এবার অন্ধকার হয়ে গেল। এখানে আমাদের থাকতে হবে।' সঙ্গে কেউ কোনো কথা যোগ করল না। খুব কাছেই আবার শেয়াল ডাকল। নৃপেন ভাববার চেষ্টা করল রাত কত হবে। ভাববার চেষ্টা করল রাতের শেষ ট্রেন নিশ্চয় চলে গেছে, আমরা শুনতে পাইনি। ভাববার চেষ্টা করল এই নির্জন পোড়ো বাড়ি, জনমানবহীন, এখানে কোনো শব্দই এসে পৌঁছবে না। সে কোনো শব্দ না-ভাববার চেষ্টা করল। এখানে, এমনিভাবে, এই অন্ধকারে, আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। যতক্ষণ না তিনি আসেন। হয়তো সারা রাত্তির। হয়তো সকাল পর্যন্ত। হয়তো অনন্তকাল। তিনি আসবেন, অথচ তিনি কোথা থেকে আসবেন আমাদের জানানো হয়নি। তিনি কি করবেন আমাদের জানানো হয়নি। একটা জিনিস তিনি আমাদের দিয়ে যাবেন, খুব জরুরি জিনিস, সেটি নিয়ে আমাদের যথাস্থানে পৌঁছে দিতে হবে। আর রবিন তাঁর সঙ্গে চলে যাবে। এখন রবিনের পক্ষে এ-অঞ্চলে থাকা নিরাপদ নয়। নৃপেন অন্ধকারে বুকের ওপর হাত রাখল। রেখে আবার নামিয়ে নিল। রাজিব নড়েনড়ে উঠছে। বলল 'বড় মশা। একটু ঘুমুতে দিচ্চে না।' রাজিব দুহাতে তালি দিয়ে মশা মারল, তার শব্দ হলো। বলল 'মেরেছি।' রবিন অন্ধকারের ভেতর থেকে বলে উঠল 'ঠিক?' রাজিব 'নিশ্চয়ই, আমার টিপ ফসকায় না।' রবিন 'সঞ্জয়দা, দেশলাইটা দিন তো, রাজিবের হাতে মশার রক্তের ছোপটা দেখব।' রাজিব 'মশার রক্ত নয়।' রবিন 'কার?' রাজিব 'তোমার রক্ত। মশারা খেয়ে গেছে।' রবিন (সেই স্বপ্নের মতো স্বরে) 'সত্যিই আমাদের রক্ত।' সঞ্জয়দা কথা আরম্ভ করলেন 'তুমি বড় সেন্টিমেণ্টাল কথা বলছ রবিন।' রবিন প্রতিবাদ করল 'মোটেই না। আমার অনেক সাহস আছে।'

এরপর আর কেউ কিছু বলছিল না। অন্ধকারের ভেতর সেই চারটি প্রাণী বসে থাকতে লাগল। ভাবতে লাগল। অন্ধকারে মশারা বাড়ছিল। মশাদের ওড়ার শব্দ। নিশ্চুপে বসে থাকার শব্দ। নৃপেন নিজের হৃৎপিণ্ডের ওপর হাত রাখল। রাজিব আবার মশা মারল। কিছুতে একটু ঘুমুতে

দিলে না। আর এই অন্ধকার। অন্ধকার হলেই মশা হয়। আর মশারা বড় জ্বালায়। 'এই অবস্থায় তোমার ঘুম আসছে' নৃপেন বলে। 'কেন, ঘুমোবার পক্ষে তো অন্ধকার প্রশস্ত' রাজিব বলে। আবার সব চুপচাপ। নৃপেন আর থাকতে পারছে না 'রাত এখন কত হবে সঞ্জয়দা?' 'যতই .হোক, আমাদের এইভাবে এইখানে অপেক্ষা করতে হবে।' রবিন হঠাৎ অন্ধকারের ভেতর থেকে বলল 'লোকটা যখন মুখ থুবড়ে পড়ে গেল, আমার ইচ্ছে হচ্ছিল ওর বুক থেকে এক খাবলা রক্ত তুলে নিয়ে দেখি, পরীক্ষা করি—মানুষের রক্ত কিরকম, কেমন তার গন্ধ।' 'তাহলে তুমি মরতে—নির্ঘাত ধরা পড়তে—' রাজিব বলল। সঞ্জয়দা নৃপেন কিছু বলল না। কিছুক্ষণ চুপচাপ। বুকের শব্দ মশার শব্দ। সত্যিই তারা অন্ধকারেরও একরকম শব্দ শুনছিল। শুনতে শুনতে হাঁফিয়ে উঠছিল। কিছু কথা বলা দরকার। এই কথার শব্দ এখন তাদের কাছে বড় স্বস্তিকর। এই সময় তারা তাদের চারদিকে কিছু যেন উড়ে বেড়াতে শুনতে পেল। চামচিকে। সেই শব্দ সারা ঘরে ঘুরে বেড়াতে লাগল। রাজিব বলল 'এদিকে মশা ওদিকে চামচিকে। উপায় থাকলে সব কটাকে মেরে ফেলতাম।' 'মেরে কি করবে, চামচিকের গায়ে রক্ত নেই'—নৃপেন। রবিন আগ্রহ নিয়ে বলল 'সত্যি নাকি সঞ্জয়দা? চামচিকের গায়ে রক্ত নেই?' সঞ্জয়দার স্বরে বিরক্তি বেরুল 'আমি জানি না।' আবার সবাই চুপ হয়ে গেল। কেবল চামচিকে ওড়ার শব্দ, কেবল নিজের নিজের ফুসফুসের শব্দ। তার ভেতর একসময় সবাই শুনল সেই স্বপ্নের মতো স্বরে রবিন বলছে 'আমি কিন্তু জানি চামচিকের রক্ত আছে। কারণ রক্ত না থাকলে কোনো প্রাণী বাঁচে না।' সেই সময় শেয়াল ডাকল আবার। রাজিব মশা মারল। অস্পষ্ট শব্দে গজগজ করতে থাকল। সঞ্জয়দা খস করে দেশলাই জ্বালিয়ে সিগারেট ধরালেন, সকলে সেই মুহূর্তে আলো দেখল। মুহূর্তের আলোতে সঞ্জয়দা দেখলেন রবিন বড় উসখুস করছে, তিনি চিন্তা করলেন করতে থাকলেন। রাত নিশ্চয়ই তিনটে বেজে গেছে। এখনো তিনি, যাঁর আসার কথা, এলেন না। রবিনকে নিয়ে এখন কি করা যায় ভাবতে লাগলেন। সিগারেটের লালচে শিখার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে তাঁর মনে হলো রবিনকে কিছুটা প্রবোধ দেওয়া দরকার। তিনি প্যাকেট থেকে আর একটা সিগারেট বার করলেন, আর একটু ভেবে নিলেন, ,তারপর আরম্ভ করলেন 'রবিন, আর

একটা সিগারেট খাবে ?' রবিন প্রথমে অস্পষ্টভাবে না বলল, তারপর বলল 'হাঁ দিন।' সঞ্জয়দা যত্ন করে তার মুখে আগুন ধরিয়ে দিলেন 'ধীরে ধীরে টানো, তেতো লাগলেও খারাপ লাগবে না।' রবিন টানতে লাগল, সঞ্জয়দা অন্ধকারেই তার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর ধীরে ধীরে শুরু করলেন 'এক-আধটা মানুষ মারার কথা, ছোটোখাটো সেন্টিমেন্টের কথা, আমাদের এখন ভাবলে চলবে না। চিন্তা করে দেখো তো সারা পৃথিবীর অবস্থাটা কি—।' সঞ্জয়দা থামলেন, দেখলেন রবিন জোরে জোরে দুবার সিগারেটে টান দিল। তিনি স্থিরভাবে কথা চালিয়ে যাবেন মনস্থ করলেন, কিন্তু তাঁর কথা শুরু হওয়ার আগেই রবিন বলতে লাগল 'তোমার সেই গানটা জানা আছে সঞ্জয়দা, চমৎকার সুর সেই গানটার—একবার বিদায় দে মা ফিরে আ-া-া সি। তার পরের লাইনটা কি সঞ্জয়দা ?' সঞ্জয়দা বাধা পাওয়াতে সম্ভবত কিছু বিরক্ত হলেন, তারপর বললেন 'আমি ঠিক জানি না।' 'হাসি হাসি পরব ফাঁসি দেখবে ভারতবাসী—বোধহয় এই লাইনটা। আচ্ছা সঞ্জয়দা ? তখন মানুষ ক্ষুদিরামকে যে-চোখে দেখত, এখনকার মানুষ কি আমাদের সেই চোখে দেখে ?' সঞ্জয়দা বিরক্ত হচ্ছিলেন, তিনি জোরে জোরে সিগারেট টানলেন। রবিন সিগারেট ফেলে দিয়েছে। চামচিকে উড়ছে। মশা উড়ছে। কান পাতলে অন্ধকারের শব্দও আছে। এই নির্জনতা বড় বিরক্তিকর। অস্বস্তিকর। সবাই বুক দিয়ে তা বুঝছিল। অনুভব করছিল। কিন্তু কোথাও যাওয়ার নেই। কিছু করার নেই। তিনি আসবেন, শুধু তাঁর জন্য অপেক্ষা। সারারাত ধরে। সমস্তক্ষণ ধরে। হয়তো অনন্তকাল ধরে। রবিন অন্ধকারে গুনগুন করে গাইল 'হাসি হাসি পরব ফাঁসি দেখবে জগৎবাসী', পরে শুদ্ধ করে নিল, 'ভারতবাসী।' রাজিব আবার ছটফট করল 'এই অন্ধকারে তোমার গান বেরোয় রবিন ?' 'তোমার তো বেশ ঘুম হচ্ছে।' 'হচ্ছে আর কোথায়। মশা।' 'আর চামচিকে—' রবিন বলল। তারপর সেই স্বপ্নের মতো স্বরে যোগ করল 'এই মশা আর চামচিকে যদি একযোগে আমাদের ঘিরে ফেলে তাহলে আর আমরা বেরুতে পারব না। আমাদের রক্ত শুষে খেয়ে একদম ঠাণ্ডা করে দেবে।' 'তা যা বলেছ, মশারা চামচিকেরা বড় ভয়ানক জীব এই অন্ধকারে। আমাদের সব কটার রক্ত অনায়াসে শুষে নিতে পারে।' আর কেউ কিছু বলল না। সঞ্জয়দার সিগারেট শেষ হয়ে গিয়েছিল, ফেলে দিয়েছেন। রবিন আর গান গাইছে না। দুটো হাঁটুর মাঝে মাথা গুঁজে

বসে আছে। দেখছে—সেই ছেলেটা তার কবিতার খাতার এক-একটা পাতা ছিঁড়ে জলে ভাসিয়ে দিচ্ছে। জলে স্বল্প ঢেউ, সেই ঢেউতে পাতাগুলো এলোমেলো, দূরে ভেসে গেল। ছেলেটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল সেই সময়। নৃপেন আবার উসখুস করছে। অন্ধকারের ভেতর বলল 'রাত্তির বোধহয় আর বেশি নেই সঞ্জয়দা।' সঞ্জয়দা কিছু বললেন না। উৎসাহ, উত্তর না পেয়ে নৃপেন চুপ করে গেল। আবার স্তব্ধতা গড়িয়ে যাচ্ছিল সেই ঘরে। কেবল মশার শব্দ, চামচিকের শব্দ, অন্ধকারের শব্দ। সেই শব্দগুলো বুকে বুকে বেজে গেল। প্রতীক্ষা। প্রতীক্ষা প্রতিটি বুকে ঘণ্টা বাজায়। বসে থাকতে থাকতে সেই চারজন সেই নির্জন ঘণ্টাধ্বনি শোনে। শুনতে শুনতে নিজের মধ্যে ডুবে যায়। সঞ্জয়দা ভাবে আমাকে এভাবেই বসে থাকতে হবে। পার্টির নির্দেশ আমি অমান্য করতে পারি না। অনন্তকালের জন্য হলেও আমাকে অপেক্ষা করতে হবে। ধৈর্য হারালে চলবে না। তিনি নতুন করে আবার সিগারেট ধরান। গুনে দেখার চেষ্টা করেন আর কয়টা বাকি রইল। আর কতক্ষণ থাকবে। দেশলাই জ্বালান সঞ্জয়দা, অন্ধকারের বুকে আলোর শব্দ হয়, জ্যোতি ছড়ায়, তারপর আবার সেই অন্ধকার। প্রতীক্ষা, অন্ধকার। বাইরে আবার শেয়াল ডাকে। বুনো পাখির পাখা ঝাপটানির শব্দ হয়। নৃপেন ভাবে আর কতকাল এই অপেক্ষা, আর কতকালের জন্য আমাদের এভাবে বসে থাকতে হবে। নিশ্চল হয়ে বসে থাকার কোনো মানে হয় না। নিশ্চয়ই সকাল হয়ে আসছে। এবার পাখি ডাকবে। বাইরে গেলে হয়তো দেখা যাবে পূবদিক ফর্সা হয়ে এসেছে। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। তিনি বোধহয় আর এলেন না। অথচ তাঁর আসার কথা ছিল। না হলে এই এত সময় ধরে নির্বোধের মতো প্রতীক্ষা করার কোনো মানে হয় না। একবার বুকে হাত দেয় নৃপেন, একবার গালে হাত দেয়, একবার মাথা গুঁজে বসে ঘরের মধ্যে। এই প্রতীক্ষা বড় অস্বস্তিকর, বড় একঘেয়ে। নৃপেন ভাবতে ভাবতে একসময় আর কিছু ভাবতে পারে না। বলে 'সঞ্জয়দা, একবার বাইরে থেকে ঘুরে আসব?' 'সেটা আমাদের পক্ষে খুব নিরাপদ নয়'—সঞ্জয়দা বলেন। রাজিব আবার মশা মারে। ভাবে আমার হাতটা মশার রক্তে লাল হয়ে গেছে বোধহয়। অন্ধকারে রক্তের রঙ কালোই দেখাবে। হাত দুটো নাকের কাছে নিয়ে মশার গন্ধ, রক্তের গন্ধ শুঁকে দেখার চেষ্টা করে। ওরা তো বলেছে রক্তটা মশার নয় আমাদের। রাজিব ভাবে—আমি যে রক্তের গন্ধ নিচ্ছি, তা আমার শরীরের রক্তও হতে

পারে। রাজিব তখন বিরক্ত হয় 'ধ্যুৎ, এভাবে অনন্তকাল অপেক্ষা করার কোনো মানে হয় না।' সারারাত কেটে গেল, তিনি এলেন না। অথচ আমরা অপেক্ষা করে আছি। রাজিব ভেবে যায়। এর থেকে ঘুমোলে ভালো হতো। কিন্তু মশাদের জ্বালায় কি ঘুমোবার জো আছে। রবিন তেমনি হাঁটু মুড়ে মাথা তার মধ্যে গুঁজে রেখে বসে থাকতে থাকতে সেই ছেলেটিকে গুলতি নিয়ে পাখি মারতে দেখতে পায়। ছেলেটা পাখি খুঁজতে খুঁজতে গুলতি হাতে নদীর পাড়ে চলে গিয়েছে। মাথা থেকে একটা যন্ত্রণা উঠে ধীরে ধীরে তার সারা শরীরে ছড়িয়ে যাচ্ছে। দু-হাতে রবিন মাথা চেপে রাখে। পার্টিতে আসার আগে কে যেন বলেছিল, অনেক কষ্ট তোমাকে সহ্য করতে হবে, পারবে তো? 'যে কবিতা লেখা ছাড়তে পারে সে সবকিছু করতে পারে।' গুলি করার আগে লোকটার মুখ দেখেছিল রবিন—ঠিক তার জেঠুর মতো। কেউ তাকে ধরতে পারেনি, নিরাপদে কাজ উদ্ধার করে সে চলে এসেছে, পার্টির সবাই বাহবা দিয়েছে। জেঠু পূজো করতেন। তাঁর ঘরে অনেক দেবদেবীর ছবি ছিল। দুর্গার ছবি, কালীর ছবি, শিবের ছবি—দরজার একদিকে এতবড় একটা নরকের ছবি। ভিন্ন ধরনের পাপের ভিন্নভিন্ন শাস্তি —পরদার গমনের, ভ্রূণহত্যার, গরুহত্যার, নরহত্যার। ছবিগুলো মনে আনার চেষ্টা করল রবিন। শুধু অন্ধকার। মশার শব্দ। চামচিকের শব্দ। বুকের ভেতর অন্ধকার সেঁধিয়ে গেছে, তার শব্দ। প্রতীক্ষা, অনন্তকাল ধরে প্রতীক্ষা। তিনি আসবেন। তাঁর সঙ্গে তাকে যেতে হবে। বাইরে বোধহয় পাখি ডাকল। সমস্ত কিছু অসহ্য লাগছে। মাথা টনটন করছে। সঞ্জয়দা সিগারেট ধরালেন। ক্ষণিকের জন্য সঞ্জয়দার মুখে, দুই হাতের ঘেরাটোপে, আলো ঠিকরে গেল। 'সঞ্জয়দা, আর একটা সিগারেট দিন তো।' সঞ্জয়দা দিলেন। রবিন আগুন ধরিয়ে নিল সঞ্জয়দার আগুন থেকে। সমস্ত কিছু অসহ্য ঠেকছে এ-সময়। এই প্রতীক্ষা এই খুন এই অন্ধকার। এ-সবের শেষ নেই। একহাতে মাথা টিপে ধরল রবিন। স্বস্তি হচ্ছে না। সিগারেটের আগুনের দিকে তাকাল। সমস্ত অন্ধকারটার ভেতরে এই এক টুকরো আলোর বিন্দু। রক্তের সঙ্গে আগুনের রঙের এত সামঞ্জস্য আছে রবিনের আর কোনোদিন মনে হয়নি। সে ডান হাত দিয়ে সিগারেটের মাথাটা মুঠো করে ধরল। হাত কি পুড়ছে? আমি তো কিছুই টের পাচ্ছি না। সেই মুহূর্তে একটুকরো আলোর জন্য রবিন ছটফট করে উঠল। তার জানা দরকার—হাতের চেটোটা পুড়ে কালো হয়ে গেছে, না, রক্তে লাল হয়ে গেছে সমস্তটা!

বরফের আগের দিন

রাজশেখর দত্ত

আমরা যে বরফ দেখেছিলাম তার কথা ভাবছিলাম। আমি বলেছিলাম, বরফের মধ্যেই তার হাত বাড়িয়ে দেওয়া উচিত ছিল। পিছনে তাকিয়ে দেখলাম, কাঠের বারান্দায় কেউ দাঁড়িয়ে নেই। একদিকে রেলিঙটা ঢাকা পড়ে গেছে নতুন লাল কম্বলে, আর, অন্যদিকটায় বারান্দার ফাঁকগুলোয় রোদ ঢুকে সমান্তরাল ছায়া ফেলেছে।

চ্যারিটেবল হসপিটাল পার হয়ে যেতে যেতে দেখলাম ইংরাজিতে লেখা আছে—টেলিফোনটা সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য। টেলিফোন করা উচিত। না উচিত না, তাতে কাজ হবে না। পাকদণ্ডী ভাঙতে গিয়ে ঝোপ ভর্তি গুচ্ছ গুচ্ছ জাফরানী রঙের বুনো ফলগুলো আমাকে ফিরিয়ে আনল সমস্ত কিছুর কাছে। অল্পক্ষণ পরেই আবার অন্তঃকরণ বিরক্তিতে ভরে গেল। মোজার মধ্যে ঢুকল পাইনের কাঁটা।

অর্ধকিলোমিটার কি আধফার্লং জুড়ে, প্রায় কার্ট রোড পর্যন্ত, সিঁড়িভাঙা ইঁটের লালচে থাকগুলো মনে করিয়ে দিল টুকটুকে ইংরেজনীদের কথা। আর সেকালের গোলাপ ঝোপের কথা। ইংরেজরা একটা দোকানদারের জাত ছিল। বিশেষ কোনো জাত বা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিষাক্ত ভাব রাখা হয়তো ঠিক না। কিন্তু ঘৃণা বা অশ্রদ্ধাও ভালোবাসার মতো একটা মানবিক বৃত্তি। কে ডাকল, পিছন থেকে কাকে কে ডাকল দুবার "…বাবু।" ডানদিকে ফিরে তাকালাম, "না, আপনাকে না", হাত জোড় করে দোকানী মার্জনা চাইল। আমি উপরে উঠে গেলাম। কার্ট রোড দিয়ে নিজেকে ঘুরিয়ে নিয়ে পোস্টঅফিসে ঢুকে বেরিয়ে এলাম।

চেম্বার থেকে বেরিয়ে মাথার সঙ্গে ভুঁড়ির উপর স্টেথোস্কোপটা দুলিয়ে বাঙালি ডাক্তার অভিবাদন জানাল। বাঙালিরা সর্বত্রই আছে। হ্যাঁ, সন্ধ্যায় আমি তাঁর সঙ্গে অবশ্যই দেখা করব। আজ সন্ধ্যায়ই। আমি ভীষণ ব্যস্ত। না, এখন না। দরকারী কাজ আছে।

গাড়োয়ালীদের সঙ্গে যখন কথা বলছিলাম, সূর্য তখন আকাশের কেন্দ্রের কাছাকাছি ঘুরছিল। ওরা দুজন। একজন পূর্ণ পরিণত পুরুষ আর অন্যজন কিশোর। মুখে বিলাতী পশমের মতো মসৃণ গোঁফের অঙ্কুরোদ্গাম হচ্ছে। কিশোরটা সঙ্গে ছিল। আমি পুলের যে-পাশে বসেছিলাম, তার উল্টোদিকে লোকটা বোঝা নামিয়ে দম নিচ্ছিল। সম্ভবত লোকটা দূর থেকে আসছে, অথবা বোঝাটা খুব ভারী।

লোকটা নিরাসক্তভাবে উত্তর দিল, "ক্যা মালুম?" ছেলেটি উৎসাহী। পাখিটা সে আগেও দেখেছে। ও-রকম পাখি সে আরো অনেক দেখেছে। শিকারীরা ও-পাখির জন্য বন্দুক নিয়ে খুব ছোটাছুটি করে বা ও-রকম একটা কিছু। প্রায় একশ বা দুশ ফুট নিচে যেখানে বড় বড় পাথরগুলোর মধ্যে দিয়ে মৃদু স্বরে জল নিসৃত হচ্ছিল, পাখিটা সেখানে একটা পাথরের উপর পড়েছিল। বেশ বিরাটাকার পাখি, কিন্তু মৃত। ঘাড় তার রঙ করা সোনালী রেশমের মতো উজ্জ্বল হলদে, কিন্তু কয়েক জায়গায় জড়িয়ে গিয়ে মিইয়ে গেছে। গাড়োয়ালীরা চলে গেলে নির্জনতা এবং পাহাড়ের শব্দ অনেকক্ষণ শুনলাম। তারপর উঠে এলাম।

বিকালে বাতাসের বেশ জোর ছিল। রেলিঙের থাম ধরে বিস্ময়ে সে লক্ষ্য করছিল। বাতাসের তরঙ্গগুলো পাইনের মাথার উপর দিয়ে কিভাবে এগিয়ে আসছে। একসময় আমিও লক্ষ্য করলাম পাশের বাড়ির বাগানে বাচ্চা তিনটে কিভাবে ছুটে ছুটে তাদের জননীকে খড়কুটো এগিয়ে দিচ্ছে। খুরপি দিয়ে নিড়িয়ে একটা আয়ত জায়গাতে পাখিদের হাত থেকে অথবা সূর্য কি তুষারের হাত থেকে একটা কিছু রক্ষা করার সমবেত চেষ্টা চলছে। "হয়তো গোলাপ হবে" বলে আবার আমি বইর মধ্যে আত্মগোপন করলাম। সে তখন চিরুনীর মোটা দিকটা দিয়ে সরু একগুচ্ছ চুলকে ক্রমাগত প্রহার করছে।

—কাজ আছে, জরুরি কাজ আছে

—কেন, কেন একটু বিশ্রাম নিতে পারো না

—মাংস তোমার ভালো লাগে না? মাংস কিন্তু লিভারের পক্ষে ভালো।

—আমার ইচ্ছা করছে কিছু চিংড়ি মাছ, বরফের তাও ভালো, আর শুঁটকি মাছ খেতে।

—ওরকম কখনো কখনো হয়।

—সকালে তুমি যখন বেরিয়ে গেলে না…

—হ্যাঁ ?

—না, কিছু না।

—কেন, কিছু না কেন ?

—আমার মনে হলো তুমি চলেই যাচ্ছ, মানে একেবারেই···

—ওটা একটা উৎকণ্ঠ অবস্থা, অনেক সময় হয় ও-রকম, বিকালে আজ একটা

—হ্যাঁ বললে না

—না, কিছু না, কিন্তু তুমি ওরকম ভাবো কেন ?

—আমি জানি না, ও-রকম চিন্তা আমি করতে চাই না, কিন্তু চিন্তাটা কি করে এসে গেল।

আমি তাকিয়ে দেখলাম, চোখের কোণে তার সামান্য একটু উৎকণ্ঠার চিহ্ন আছে। প্রকৃতির একটা চমৎকার সৃষ্টি। কিছুতেই কিছু বোঝা যায় না। একটা গোলমাল শেষ অবধি থেকে যায়।

—আচ্ছা, ধরে নাও আমি তোমাকে এখানে ছেড়ে গেলাম। ঠিক এই অবস্থায়। তুমি কি করবে ?

—আমি জানি না, ঠিক ঠিক বলতে পারব না।

—কেন পারবে না পরিষ্কারভাবে চিন্তা করো।

—আমি পারব না।

—কেন পারবে না, পারবে না কেন, তাহলে ও-রকম চিন্তা করতে গেলে কেন ?

—ঠিক জানি না

—জানো

—না, জানি না

—আমরা যে বিয়ে করেছি তাতে তুমি সন্তুষ্ট না ?

—কেন, অসন্তুষ্ট কেন হব ?

—রেজিস্ট্রেশন অনেক নিরাপদ এবং সুস্থ।

—তা ঠিক

—তবুও, গান, আলো, লোকজন, হৈ চৈ, এ-সমস্ত মেয়েরা বিয়ের সঙ্গে এক করে দেখে। তুমিও দেখ

—না, আমি দেখি না

তার চুল আঁচড়ানো হয়ে গেছে, আমি যাব, তাই কালো জুতোজোড়া সে অন্যমনস্কভাবে বুরুশ করছে, তার হাত চলছে দ্রুত। উত্তেজনার মতো। আমি তাকে বহুবার বারণ করেছি। তবু সে বোঝে না, শোনে না। তার চাপা ঠোঁটেও যেন বিরক্তি আছে। আমি অস্থিরভাবে জিজ্ঞাসা করলাম—তাহলে অমনটা ভাবতে গেলে কেন?

—আমি জানি না।

—আমরা ইচ্ছা করলে অপেক্ষা করতে পারতাম।

—তা পারতাম

—আরো অপেক্ষা করতে পারতাম

—অপেক্ষা তো করেছিলাম

—আমরা সবাইকে বাধ্য করতে পারতাম

—আর পারছি না, চেষ্টা তো সবরকম করেছিলাম, তুমি ভুলে যাচ্ছ এখন।

—না, ভুলিনি, এফেকটিভলি কিছু করতে পারতে, ভয় দেখাতে পারতে, বলতে পারতে গলায় দড়ি দেবে

—এ-আলোচনা বন্ধ করো, আমি ভয় দেখিয়েছিলাম, তুমি বিশ্বাস করো, ব্যাপারটা সত্যিসত্যি আমি ভেবেওছিলাম, চিন্তা করেছিলাম, সাহস হয়নি, পারিনি।

আমি লক্ষ্য করে দেখলাম আমার জুতোর উপর দু-তিন ফোঁটা চোখের জল পড়েছে। মেয়েরা এত সহজে কেন ভেঙে পড়ে। ভয় দেখানো এক কথা, আর সিরিয়াসলি ভাবা! তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে কেন এতখানি মানসিকতা। রাগ হলো।

—তুমি এ-সমস্ত আগে বলোনি কেন আমায়?

—তোমার জন্যই তো ভয় বেশি ছিল, তুমি যদি একটা কিছু, মাথা ভুল করে ভুল একটা কিছু করে বসতে। এ-আলোচনা এবার বন্ধ করো, ভালো কিছু বলো।

—তাহলে তুমি ভাবলে কেন ও-সমস্ত?

—আমি জানি না, জানি না, কতবার বললাম তোমায়

—আচ্ছা, তুমি সব বাড়িতে খুলে বলেছিলে

—হ্যাঁ, বলেছিলাম।

—সমস্ত কিছু বলেছিলে ?

—কী ? না। তা বলিনি, সেতো তোমাকেও বলিনি, তাতে কি হতো ? উল্টোটা হতো, খুন করে ফেলত, তুমি জানো না।

—খুন করে ফেলত ? না, না। এত উত্তেজিত হচ্ছ কেন ? এ-জায়গাটা তোমার ভালো লাগছে না। অস্বস্তি লাগছে বোধহয়।

—না।

—এখান থেকে অন্যকোথাও গেলে হয়তো ভালো লাগবে, তাই না ?

—জানি না।

যাবার সময় সিঁড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে বললাম।

—আবোল-তাবোল ভাবলে আমার মাথা গরম হয়ে যায়

—তাড়াতাড়ি এসো।

—আমার যে অনেক কাজ আছে।

—তাড়াতাড়ি সেরে নিও। অন্ধকারের আগেই ফিরে এসো।

পথগুলোয় তখন বিকালের ছায়া নেমে আসছে। মাথার উপর একটি বানর পরিবারে হয়তো কর্তৃত্বের প্রশ্নে তুমুল বিতর্ক চলছে। শব্দের মাত্রায় মনে হলো মহিলারাও মতামত ব্যক্ত করছেন। কী করে দীর্ঘদিন ধরে একটি পুরুষ এতগুলো গৃহিণীর যৌথ পরিবারকে একত্র রাখে এটা একটা গবেষণার বিষয় হওয়া উচিত। হলদে কাগজের ঠোঙায় দোকানী চামচে দিয়ে ভরতি করছে বনস্পতি। নিচ্ছে বাদামী বেণী-ঝোলানো ছোট্ট একটা শিখ বালক। বালিকাও হতে পারে।

ইঁটের সিঁড়ি করা পথটা দূর থেকে মনে হয়, লম্বা লম্বা ঝোলানো অনেকগুলো পাঁজরার মাংসের মতো। চারদিক থেকে পাহাড়ের গা বেয়ে পাকদণ্ডীগুলো নেমে গেছে নিচের দিকে, অনেক নিচে, কোথাও একটা শেষ নিশ্চয়ই আছে। সেখানে কিছু থাকবেই। গুহা-গহ্বর, নদী, গরু-বাছুর, কয়েকটা কুঁড়ে ঘর—এ-সমস্ত থাকবেই। টিনের হোক, খড়ের হোক, কাঠের হোক, চাল থেকে ধোঁয়া উঠবে। ঝাউগাছের ধোঁয়া। আবার ঝাউগাছের ভিতর দিয়ে ছড়িয়ে যাবে অনেক দূর অবধি।

ঘড়িতে দেখলাম তিনটে বেজে গেছে। রঙ মেলানো পোষাকে এক ঝাঁক মেয়ে কোথা থেকে নিজেদের ছড়িয়ে দিতে লাগল চারদিকে। তাদের

কিচির মিচির ক্ষীণ হয়ে আসতেই কানে এল শৃঙ্খলিত কণ্ঠস্বর। একটা জাঠা আসছে।

এগিয়ে গেলাম। কার্ট রোড ধরে তাদের সঙ্গে সঙ্গে আমিও কিছুটা গেলাম। পিছিয়ে পড়া একজনকে মিছিলের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করলাম। রিকশাচালক, ওরা মজুরী বাড়াতে চায়। রাস্তায় প্রফেসর মালহোত্রাও মিছিল দেখছিলেন, তাঁকে ঘাড় হেঁট করে অভিবাদন করে হাত তুলে জানালাম, সন্ধ্যায় দেখা হবে। তরুণ শোভাযাত্রী আমার মুখের দিকে তাকিয়ে তার হিসাবে একটু রদবদল করে নিল। উত্তরগুলো একটু সপ্রতিভ হলো। হ্যাঁ, বিশেষ বিশেষ অবস্থায় একটা রিকশাচালক একটা রিকশা কিনে ফেলতে পারে। কিন্তু সমস্যাটা একই থাকবে। রিকশা টানার জন্য এখন তার লোক লাগবে। ওখানে একটা রিকশার জন্য গ্রীষ্মকালে দুটো "মজদুর" এবং শীতকালে চারটে "মজদুর" লাগে। তার উপর রিকশাটা দুটো শিফটে খাটালে আটটা লোক লাগবে। উচ্চতর মাইনে দিতে হলেও তার সঙ্গে শ্রমিকদের স্বার্থের দ্বন্দ্ব হবে না। মাইনে তো সে তার পকেট থেকে দেবে না। "সাহেব" এবং "মেমসাহেব"রা বেশি ভাড়া দেবেন, সে বেশি মাইনে দেবে এবং সেই অনুপাতে বেশি লাভ করবে।

তাকে তারিফ করলাম যে সে অর্থনীতির নিয়মগুলো জানে। তখন সে লজ্জিতভাবে মাথা হেঁট করে জানাল, সে ঠিক রিকশাচালক নয়, ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী, লাল ঝাণ্ডার লোক। এটা প্রত্যাশিত ছিল না, তার পোশাক-পরিচ্ছদ, মুখশ্রী···সবই একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। এতক্ষণে পোস্ট অফিসের সামনে এসে গেছি।

—দুঃখিত স্যার, কিছুই আসেনি।

—একটু দেখে বলুন, ভালো করে একটু দেখুন।

—আমি খুব ভালোভাবেই চেক করেছি।

ছেলেটা দাড়িও কামায়নি। চামড়ার বেল্টের নিচে নেমে গেছে খাকি প্যাণ্টালুন। ভাঁজ পড়া সবুজ শার্টে কালি লেগেছে, কোমরের কাছে। আমার উপর সে কিছুটা বোধহয় অনুরক্ত ছিল। তাই আবার আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে সব জিনিসগুলো খুঁজে দেখল। এ, বি, সি, ডি, যে, ষে, য়ে, ষে। কিছুই পেল না। তার দৃষ্টি পিছনে চলে গেল। সেখানে টেবিলের উপর অন্য কয়েকজন মিলে বস্তা উপুড় করে জিনিসপত্র ঢালছে

এবং বাছাই করে সাজিয়ে নিয়ে খোপে ঢোকাচ্ছে। সে আমাকে একটু অপেক্ষা করতে বলল।

পিছনে হাত দিয়ে পায়চারী করলাম। তারপর জানালায় আবার ফিরে এসে যে-খামটা পেলাম, তার কোণার ছোট ছোট লেখাগুলো দেখে বুঝলাম এটা সেটা না। তবুও খুললাম। খারাপ কিছু না, অন্য প্রকাশকের চিঠি। খারাপ না। মেজাজটা একটু প্রসন্ন হতেই দেখলাম ছেলেটা দাঁড়িয়ে আছে।

আমি তাকে ধন্যবাদ দিলাম। মুখ দেখে মনে হলো ও-জিনিসটা সে বড় একটা পায় না। চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, তারপর সে দাঁড়াল, কী একটা মনে পড়েছে।

—তাই তো আপনি তো শ্রী···একটা মানি অর্ডার আছে।

—আছে? কোথায়?

—কিন্তু পোস্টম্যান তো নেই, আপনাকে কাল সকালে আসতে হবে। মানি অর্ডারের জন্য উৎকণ্ঠা প্রকাশ কিছুটা অশোভন; বিশেষত বিদেশে। তাই কিছুটা নিরাসক্তভাবে বলার চেষ্টা করলাম।

—যদি দরকার হয় তো আমি অপেক্ষা করতে পারি।

—না, পোস্টম্যান তো বাড়ি চলে গেছে, তার বাড়ি নাভা ছাড়িয়ে তিন কিলোমিটার। অপেক্ষা করার কী দরকার?

—না, তার দরকার নেই।

—তার উপর "মাস্টার সাব"ও চলে গেছেন, মানে যাননি এখানো।

উত্তরে হিমবাহ নিশ্চয়ই গলে যাচ্ছে। কাঠের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখলাম সূর্যাস্ত হচ্ছে মন্থরভাবে। পাইনের পাতাগুলোর ভিতর দিয়ে অগ্নিকোণে রশ্মিগুলি এক জায়গায় ভিবজিওরে ভেঙে গেল। সে হঠাৎ ঘুরে ঘাড়টা বেঁকিয়ে দিল ফিকে লাল সূর্যের দিকে, মুখটা ঘুরে এল আমারি দিকে। আমি দেখলাম না।

—কী সুন্দর, তুমি সূর্যাস্তের আগেই ফিরেছ।

তার চুলের মধ্যে দিয়ে আলো এল, গালের উপর নরম একটা আলোর প্রলেপ লাগল। মনে হলো, আমিও সেন্টিমেন্টাল হয়ে যাচ্ছি। তবু কথা-গুলো খুব সংযত করতে পারলাম না।

—সূর্য-রশ্মিগুলি রঙ পালটাচ্ছে, জোলো হাওয়া, তাই না?

—যদি বরফ পড়ে সমস্তদিন আমরা বাড়িতে থাকব।

—বরফ পড়তে পারে।

—তোমার হয়তো ভালো লাগবে না।

—বাধ্য হওয়াটা আমার ভালো লাগে না। বরফ যদি পড়ে…তুমি স্পেশাল একটা কিছু করবে। আমিও পারি। কিছু ভাজা করব। ভাজাটা সহজ। ডাক্তারের কাছে যাওনি?

—তুমি না করলে যে

—লোকটা চমৎকার, গলগণ্ডের উপর লোকটা কী যেন গবেষণা করছে।

—ডাক্তার তো! দেখে খুব বুদ্ধিমান মনে হয়।

—গাধা। বিকেলে একটা মিছিল দেখলাম, তাতে একটা কম্যুনিস্টও ছিল, কিন্তু পোশাক তার একেবারে কুলিদের মতো।

—এখানে কম্যুনিস্টও আছে নাকি? চলো কোথাও যাই।

—এ-জায়গাটা বুঝি ভালো লাগছে না!

—ভালো, অন্য জায়গা থেকে ভালো!

—আমরা মানালি যেতে পারি, কিন্তু দু-এক দিনের মধ্যে বরফ পড়বে।

—তাহলে এখানেই থাকব।

—মানালিতেও বরফ পড়বে।

—তাই নাকি? কিন্তু বাসে যেতে হবে…

—ডিলুক্স বাস।

সে চুপ করে গেল, মুখ তুলে দেখল আমার মুখের দিকে। আমার মুখেও বোধহয় সূর্যাস্তের আলো পড়েছিল। সন্ধ্যায়ই হোক অথবা অন্য কোনো জটিল কারণে তার মুখে তখন অন্ধকার। অন্যমনস্কভাবে জিজ্ঞাসা করল।

—কী বলছিলে?

—পশ্চিমের পাহাড়ের নিচে, অনেক নিচে, পাথরে যেখানে নাম লিখেছিলে, পুলটা মনে আছে? শাদা আর কালোতে রঙ করা…

—দেখেছিলাম।

—নিচে, চার-পাঁচশ ফুট নিচে, জল যাচ্ছে ঝির-ঝির করে…

—মনে পড়ছে।

—সেখানে গেছিলাম, দুটো মেয়ে দেখলাম, খুব সুন্দর পাহাড়ী মেয়ে।

—তুমি কি করলে?

—তাদের ভাষা তো জানি না, তোমার হিংসে হচ্ছে না তো ?

—একটুও না।

—মেয়ে দুটো মুচকি হেসেছিল, টগবগ গাল হাসিতে ফুলে উঠেছিল, ইচ্ছা করছিল দুজনকেই চুমু খেয়ে দিতে। কিন্তু জামাকাপড় একেবারে অপরিষ্কার, গাড়োয়ালী মেয়ে।

—তারপর ?

—তারা যখন চলে যাচ্ছিল আমি হাত নেড়ে দূর থেকে সম্ভাষণ করলাম। আমি একলা, তারা দুজন, মাথা নাড়ল, না, না···আর দুজনেই হেসে খুন হচ্ছিল। তখনি তোমার কথা মনে হলো।

—কী মনে হলো ?

—মনে হলো তারা অন্য লোক, আর তুমি শুধু তুমি।

—আর কী ?

—আর তুমি আমারি, এবং তুমি আরো সুন্দর, তোমাকে আমি জানি।

—এখন সব বানাচ্ছ, এ-সব ভাবনি তুমি, এ-সব বানাচ্ছ তুমি নিশ্চয়ই।

আমি তাকিয়ে দেখলাম কপট প্রতিবাদের আনন্দে আমার বালিকাটির চোখে, মুখে, গালে, ঠোঁটে রক্তপ্রবাহ বা অন্য কোনো শারীরিক কিছু ফুলে ফুলে উঠছে।

—বানাচ্ছি না, একটুও বানাচ্ছি না, তারপরেই দেখলাম পাখিটা নিচে, আহত হয়েছে, পাথরে ডানা ঝাপটাচ্ছে, তার বোধহয় জল চাই।

—কোন পাখিটা ?

—সেই যেটা বললাম, সেই বিরাট পাখিটা যার গলার রঙ আকাশের মতো নীল।

—নাম কি পাখিটার ?

—নাম জানি না, মেয়ে দুটোও জানে না, কেউই জানে না।

—তারপর ?

—তারপর আমি যখন পাহাড়টা পার হয়ে এলাম, তখন দেখি আকাশে সে তার নীল ডানা ঝাপটাচ্ছে।

—সেই পাখিটাই ?

—সেইটাই। তারপর তোমার কাছে চলে এলাম।

—চলো, এখন একটু হেঁটে আসি, কালকে বরফ পড়বে।

কলকাতার দাসব্যবসা

পঞ্চানন সাহা

উনবিংশ শতাব্দীর কলকাতার বাবুসমাজের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে তথ্যের অপ্রতুলতা নেই। শুনতে একটু আশ্চর্য লাগলেও, ক্রীতদাস রাখাটাও কলকাতার সমাজব্যবস্থার একটি অঙ্গ ছিল। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের এমন কোনো উচ্চবিত্ত পরিবার ছিল না যাঁরা নিজগৃহে এক বা একাধিক ক্রীতদাস রাখতেন না।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে দাস বিক্রির বিজ্ঞাপন কলকাতার বিভিন্ন ইংরেজী পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ১৮৩০ থেকে ১৮৪০-এর মধ্যে বাঙলাদেশ ও ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে দাসব্যবসা সম্পর্কে অন্ততপক্ষে ছটি পুস্তিকা ও পার্লামেণ্টারি পেপারে আলোচনা হয়েছে।

১৭৮০ সালে কলকাতার একটি পত্রিকায় প্রকাশিত দাস বিক্রির তিনটি বিজ্ঞাপনের নমুনা থেকে এ-বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত হবে।

"*Wanted*—Two Coffrees who can play very well on the French Horn and are otherwise handy and useful about a house, relative to the the business of a consumer or that of a cook; they must not be fond of liquor."

"*To be sold*: Two French Hornmen, who dress hair and shave, and wait at table."

"*To be sold*: A fine Coffree boy that understands the business of a butler, kitmutgar and cooking. Price four hundred sicca rupees. Any gentleman wanting such a servant may see him and be informed of further particulars by applying to the printer."

উপরোক্ত বিজ্ঞাপনগুলিতে বোঝা যায় যে কলকাতার ইংরেজ অধিবাসীদের মধ্যে আফ্রিকার কাফ্রি দাসদের যথেষ্ট প্রচলন ছিল এবং তাদের মূল্যও নেহাত কম ছিল না।

দেশীয় অধিবাসীদের মধ্যে দাসপ্রথা সম্পর্কে ১৮২৬ সালে কৌলব্রুক নামের এক সরকারী কর্মচারী তাঁর রিপোর্টে লিখেছেন : "দেখা যাচ্ছে যে হিন্দু এবং মুসলমান এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই সাংসারিক কাজের জন্য দাস নিয়োগ একটা খুবই সাধারণ ব্যাপার। প্রত্যেক স্বচ্ছল ব্যক্তিই সাংসারিক কাজের জন্য দাস নিয়োগ করে এবং ক্রীতদাসীদেরই মধ্য থেকে হিন্দু-মুসলমান উভয়ই রক্ষিতা সংগ্রহ করে।"

কলকাতার এই শ্রেণীর দাসদের অবস্থা সম্পর্কে বলতে গিয়ে এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা স্যার উইলিয়াম জোনস ১৭৮৫ সালে প্রধান জুরির (Grand Jury) উদ্দেশে বলেছিলেন : "আমাদের ক্ষমতার মধ্যে দাসদের অবস্থার কল্পনাতীতভাবে শোচনীয় এবং তাদের উপর নিষ্ঠুরতা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। অল্পবয়সী ছেলে এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে তা আরও ভয়ানক।"

এই ধরনের ক্রীতদাস রাখার ব্যাপকতা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে স্যার জোনস ক্ষোভের সঙ্গে অনুযোগ করেছেন : "এই জনবহুল শহরের কোনো প্রান্তে এমন কোনো স্ত্রী বা পুরুষ নেই যারা নামমাত্র মূল্যে একটি অল্পবয়সী দাস রাখেনি।"

এই ক্রীতদাস সংগ্রহের প্রথা ছিল অত্যন্ত নিষ্ঠুর। "কলকাতার বাজারে প্রকাশ্যে বিক্রির জন্য এরকম শিশুদের বোঝাই বিরাট বিরাট নৌকা গঙ্গাপথে কলকাতায় আসত। ঐ সমস্ত শিশুদের অধিকাংশই ছিল দুঃসময়ে পিতামাতার কাছ থেকে সামান্য চালের বিনিময়ে সংগৃহীত বা চুরি করে আনা।"

কর্নেল ওয়েলস নামক আর একজন ইংরেজ রাজকর্মচারী এই দাস সংগ্রহের প্রথাকে ব্যাখ্যা করে লিখেছেন : "Great numbers used formerly to be kidnapped from a distance, and sold by dealers for both domestic and agrestic purposes. Many have been, and still are, sold in infancy by parents and relations, particularly in times of famines, and scarcity, to any one who will purchase them".

শুধু বাঙলাদেশের অভ্যন্তর থেকেই নয়, ভারতবর্ষের বাইরের বহু দেশ থেকে, বিশেষ করে পারস্যসাগর অঞ্চল থেকে, কলকাতার বাজারে দাস আনা হতো। কলকাতার বিভিন্ন সংবাদপত্র এই দাসব্যবসা সম্পর্কে নিঃশ্চুপ থাকেনি। ১৮২৩ সালে 'Calcutta Journal' লিখেছিল : "এই বিশাল রাজধানী একাধারে প্রাচ্যের বাণিজ্য ও সম্পদের কেন্দ্রবিন্দু। এখানে যেমন পশুবিক্রি হয় তেমনি বন্দী আফ্রিকান ক্রীতদাসদের খোলা বাজারে সর্বোচ্চ মূল্য-প্রদানকারীর কাছে বিক্রি করা হয়। আমরা সংবাদ পেয়েছি যে এ-বছর

ব্রিটিশ-ভারতের রাজধানীতে দাসরূপে বিক্রির জন্য আরব জাহাজে ১৫০ জন খোজাকে আনা হয়েছে। আমরা এও জানতে পেরেছি যে এ-সমস্ত আরব জাহাজ আবার কাফ্রি দাসদের বিনিময়ে এদেশ থেকে স্থানীয় দাস, বিশেষ করে মেয়েদের, আরব দেশে বিক্রির জন্য নিয়ে যায়।"

এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ১৮০৭ সালে সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যে দাসব্যবসা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও বৃটিশ সরকারের নাকের ডগায় এ-ধরনের দাসব্যবসা হামেশাই চলছিল।

১৮৩০ সালের জুন মাসে 'India Gazette'-এ একটা খবর বেরোল যে অযোধ্যার নবাব একদল নতুন আমদানীকরা আবিসিনিয়ান দাসের পরিবর্তে চার লক্ষ টাকা মূল্যের হীরা-জহরত কলকাতার এক মনিকারকে বিক্রির জন্য দেন।

'India Gazette'-এর এই অভিযোগের কোনো অনুসন্ধান হয়নি। ইতিমধ্যে বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্টে দাসপ্রথা উচ্ছেদ করে আইন গৃহীত হয়। কলকাতার প্রধান ম্যাজিস্ট্রেট ১৮৩৪ সালের জুন মাসে সরকারকে কলকাতায় দাসব্যবসা বন্ধ করার জন্য কড়া নির্দেশ জারী করেন।

কলকাতার বাইরে বাঙলাদেশের অন্যান্য স্থানেও এ-দাসপ্রথার অস্তিত্ব ছিল। ১৮০৪ সালে কোলব্রুক তাঁর 'Remarks on the husbandry and internal commerce of Bengal'-এ লিখেছেন যে "বাঙলাদেশে দাস-প্রথা অজানা নয়। বাঙলাদেশের কতগুলি জেলাতে কৃষিকাজ প্রধানত দাসদেরই সাহায্যে হয়ে থাকে", ১৮২৬ সালে একটি সরকারী রিপোর্টে তিনি আরও পরিষ্কারভাবে লিখেছেন যে: "we find domestic slavery very general among both Hindus and Musalmans."

একটা কথা মনে রাখা দরকার যে বাঙলাদেশ বলতে তিনি Bengal Presidency অর্থাৎ বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার এবং উত্তরপ্রদেশের নব সংযুক্ত অঞ্চল (১৮১৮ সালের) বোঝাচ্ছেন। তিনি তাঁর রিপোর্টে আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে এই প্রদেশের নিম্নাঞ্চলে অর্থাৎ প্রকৃত বাঙলা-দেশে কৃষিকাজে দাস নিয়োগ মোটেই ব্যাপক নয় তবে তা একেবারেই যে নেই তাও নয়। শুধু পশ্চিম-বিহার থেকে বারাণসী পর্যন্ত অঞ্চলে কৃষিকাজ দাসদের সাহায্যেই অনুষ্ঠিত হয়। বাঙলাদেশে দাসদের সংখ্যা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি পরিষ্কারভাবে লিখেছেন: "Slaves are neither so few (in Bengal) to be of no consideration, nor so numerous as to constitute a notable portion of the mass of the population."

তবে এ-কথা ঠিক পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের ক্রীতদাসদের সঙ্গে তুলনায় বাঙলাদেশের দাসদের অবস্থা নানা ঐতিহাসিক কারণে অনেক পৃথক।

১৮৩৪ সালে বৃটিশ সাম্রাজ্যে আইনত দাসপ্রথা উচ্ছেদ হলেও কার্যত বহুস্থানে তার অস্তিত্ব বজায় ছিল। ১৮৪১ সালের ৪ঠা মে British and Foreign Anti-Slavery Societyর দ্বিতীয় রিপোর্টে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের দাসদের সংখ্যা বর্ণিত আছে। ঐ রিপোর্টে বলা হয়েছে যে "All the Jagheerdars, Deshwars, Zemindars, principal Brahmins and Sahookdars retain slaves in their domestic establishments." বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির বিভিন্ন জেলার দাসদের সংখ্যা সরকারী তথ্য থেকে সংগ্রহ করে রিপোর্টে বলা হয়েছে, সবচেয়ে বেশি দাস (গৃহদাস বাদে) হলো বিহার ও পাটনাতে ১৩১,২৮০ জন, তারপর যথাক্রমে শ্রীহট্ট-বাখরগঞ্জে ৮০,০০০; পূর্ণিয়ায় ২৪,৫৬০; সাহাবাদে ২১,৩৪০; ভাগলপুরে ১৭,৭৩৬; ত্রিহুতে ১১,০৬১। অবশ্য ঐ সংখ্যা দক্ষিণ-ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের তুলনায় যথেষ্ট কম। একমাত্র মাদ্রাজের তিন্নেভেলি অঞ্চলেই ৩২৪,০০০ দাস ছিল। কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণে তামিল দেশে অচ্ছুৎ পারিয়ারা ছিল জনসংখ্যার এক পঞ্চমাংশ এবং তার অধিকাংশই ছিল দাস। ১৮৩৪ সালের বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্টারি পেপারে বলা হয়েছে যে কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণভাগের জনসংখ্যা অন্ততপক্ষে দেড় কোটি এবং "The Parias, therefore, would amount to 3 million, all of whom, the same accurate writer (Buchanan Hamilton), on the authority of Dr. Francis Buchanan, states to be slaves."

দক্ষিণ-ভারতের দাসদের উপর যে-ধরনের অত্যাচার করা হতো তা অবর্ণনীয়। এ-সম্পর্কে বিভিন্ন ইংরেজ কর্মচারী যা বলেছেন তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বাবের নামক একজন ইংরেজ কর্মচারী বলেছেন দাসদের তুলনায় "Nothing can be more abject and wretched"; ওয়েলশ বলেছেন "Slaves can be and are sold at pleasure"; ক্যাম্পবেল লিখেছেন "the sale of agrestic slaves is common."

সে-তুলনায় বাঙলাদেশের বা কলকাতার দাসদের অবস্থা নেহাত মন্দ ছিল না।

এই প্রবন্ধে যেসব বইয়ের সাহায্য নেওয়া হয়েছে ঃ

1. Slavery and the Slave Trade in British India, London, 1841. Pp-3, 29, 30, 33 -34
2. Pegg—East India Slavery, London. Pp-24, 31
3. Bengal Past and Present, Vol II, 1908
4. Parliamentary Papers : No : 138, 1839 pp-311
5. Ibid No : 128, 1834 Vol II Pp-6, 179

উত্তরবঙ্গের ছড়া ও ধাঁধা

স্মরজিৎ চক্রবর্তী

উত্তরের গ্রাম-বাঙলার শিশুদের ছড়া বাঙলার শিশুসাহিত্যে স্থান পায়নি, লোকসাহিত্যের উপাদান হিসেবেও এগুলির স্বীকৃতি খুব একটা নেই। তাই বলে লোকসংস্কৃতির এই সম্পদগুলির মূল্যকে উপেক্ষা করার উপায় নেই। কারণ, ছড়াগুলির বাক্যবিন্যাস ও ভাষাগত বৈচিত্র্য ছাড়া পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য এগুলিকে এক নতুন রূপ দিয়েছে।

ছড়া শিশুমনকে নাড়া দেয়। সর্বকালের সর্বদেশের শিশুদের মতো উত্তর বাঙলার (কুচবিহার, রঙপুর ও জলপাইগুড়ি) শিশুরাও তাই 'আবোল তাবোল' অনেক ছড়ার প্রতি আকৃষ্ট হবে—এটাই স্বাভাবিক শিশু-মনস্তত্ত্ব। সুর এবং ছন্দ রয়েছে ওদের সকালের অ, আ, ১, ২ পাঠের ভেতরে, দুপুরের খেলাঘরে, বিকেলের হাডুডু, চাম্‌ছি, ঠুস কিংবা ডাংগুলি খেলায় এবং রাত্রের শয্যায়। এরা ক, খ মনে রাখার জন্য এমনি করে পড়েঃ

হাটুভ্যাঙা দ,
কানমুচুরি ধ,
নাইরকোলের ঝোপা শ,
প্যাটকাটা ষ; ইত্যাদি।

এগুলি ছড়া নয়। কিন্তু এতেও সুর আছে। যেমন আছে নামতা বলায়, কিংবা একের পিঠে এক এগারো পাঠের ভেতরে।

খেলাঘরের রান্নায় ছড়া মন্ত্রের কাজ করে। ভাত রান্না তাড়াতাড়ি করার জন্য ওরা বিড়বিড় করেঃ

গোদোর গোদোর মানার পাত,
পানি আইনতে হইল ভাত। ইত্যাদি।

শুধু ভাত নয়, আরও অনেক কিছু রান্না করে ওরা। মাটি চাল, কচুর ডাঁটা মাছ, কাঁঠালের পাতা কলাপাত হিসেবে খেলাঘরে ওরা ব্যবহার করে।

দিয়ারী বা ভাড় 'আন্‌জা' রাখার জন্য ব্যবহৃত হয়। ওদের রান্নার অনেক 'আইটেম'। যেমন ঃ

অ্যাতর ব্যাতর কইতোর ভাজা,
দাইরকা মাচের নরম খাজা,
পুটি মাচ আইসালো,
সরপোত্‌ খাইতে দিন গেলো।

পায়রা ভাজা, দাইরকা মাছের নরম খাজা, পুটি মাছ ছাড়াও গরমের জন্ত ঠাণ্ডা পানীয়র ব্যবস্থা রয়েছে।

খেলাঘরে শুধু রান্না নয়। স্বামী-স্ত্রীর অভিনয় আছে। নানাধরনের খেলা আছে। নানা প্রকারের ছড়াও ঃ

ইচন বিচন ধাপরি বিচন,
তার তলোত্‌ হইল মোগল পাটা,
মোগল পাটা খান নড়ে চড়ে,
কাউয়ার ব্যাটা ঠোকোর মারে,
আয় গুবুরী ভাত খাই,
দুহু মাকা ভাত খাই,
না খাই তোর হাতে—
গুবুরী গুবুরী গোন্দায় হাত,
অ্যালপাত ব্যালপাত—
ছিড়ি আংটি তোল হাত।

উপরের ছড়াটির মতো আরও অনেক ছড়া—যাকে বলে 'ননসেনস রাইমস" —এদের মধ্যে আছে। ক্রন্দনরত ছেলে বা মেয়েকে সামলাবার জন্ত শায়িত অবস্থায় দুই হাঁটুর উপর তুলে মা কিংবা বাবা ওদের দুলিয়ে দুলিয়ে বলেন ঃ

হুরকুর নাটুয়া,
মইষের খটুয়া,
তাপ্তি জলে,
নিবুক ত্যাল,
গাং সরিষা পাকা ব্যাল,
ভ্যাবারু রে ভ্যাবারু—
আম কনটা পালু,

কিসোত বসিয়া থালু,
ভাঙ্গা ডুলির মাঝে,
কে কে তোর সাক্ষী,
দল কুমারীর দাসী—
তোর ব্যাটার নাম কি—
আপপাল গোপাল।
তোর বেটির নাম কি—
খলিসামুটি।
ঝিলালো রে ঝিলালো।

এই ঝিলালো রে ঝিলালো বলে দুই হাঁটু উপরে তুলে দিলে "ছিঁচ্ কাঁদুনে মিচ্‌কে"রা হেসে দেয়।

এ ছাড়া আছে গোদার ছড়া। ছড়াটি নিম্নরূপ ঃ

আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে নদীত্ হইল ভীর—
যত গোদা যুক্তি করি কাটিল্ বরষির ছিল।
কেহ নিল সুতা বরষি কেহ নিল্ চ্যারা
নদীর পাড়ে পড়িয়া থাকা কন্টিকারীর মূড়া,
ওরে মাচো না পাইল টাচো না পাইল ফিরিয়া আসিল বাড়ি,
আকার পাড়োত্ বসিয়া গোদা গপ্প দিল ছাড়ি—
দুইটা টোপও থাইছে—
একটা হুক্‌সি গেইচে।
এই কথা শুনি গুহুনি রাগে হইল টং—
ভাত ঘাটা নাকুরী দিয়া মাতায় মাইরলো ডাং,
গোদা বাইরে গেল।

কিছুদিন আগেও বিহার প্রদেশের মেহনতি মানুষেরা শীত কেটে গেলে এই অঞ্চলে কাজের জন্য আসতেন। মাটিকাটা এবং জঙ্গল ছাপ, কাঠ চেরাই করে অর্থ উপার্জনের পর আবার ঘরে ফিরে যেতেন। এদেরকে এঁরা 'পশ্চিমা' বলেন। এদের নিয়ে একটি ছড়া এখানে কিশোরদের মুখে শোনা যেত ঃ

পশ্চিমাভূত—
জঙ্গোল বাড়িত শুত,
জঙ্গোল বাড়িত্ আগুন নাগে ছ্যাং—
ধড়্‌পড়েয়া উঠ্।

এটা একান্তই 'মজাক' করার জন্য। অন্য প্রদেশের মানুষের প্রতি অবজ্ঞাসূচক উক্তি নয়।

ছেলে বা মেয়েদের আনন্দ দান, ভোলানো এবং ঘুমপাড়ানোর জন্য অনেক ছড়া আছে এই অঞ্চলের মায়েদের মুখে মুখে। ঘুমের মাসি-পিসিরা ঘুম দিয়ে না গেলে এদের ঘুম আসে না। আহ্বান করেন নিদ্রা দেবীকে :

আয় নিন্দ আয়, নিন্দ দিয়া যা।

কিংবা :

নিন্দোবালি আয়,
নিন্দ যাবার চায়।

কিন্তু অনেক চেষ্টার পরেও দুষ্টু ছেলেটির ঘুম না এলে মা তাকে ভয় দেখান :

আয় ঘুম বায় ঘুম—
পাইকোড়ের পাক্,
কানকাটা কুকুর আইস্চে,
ঝিত্ করিয়া থাক।

অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত এবং আলোকপ্রাপ্ত মায়েরা সুর করে আবৃত্তি করেন :

আইল পুত্রের ঘুম—
পুত্র রাখি বুকে,
ধীরে ধীরে করাঘাত—
এই কতা মুকে।

শিশু এক-পা দু-পা করে হাঁটতে শেখার সময় তাদের উৎসাহ দেবার জন্যও এদের ছড়া জানা আছে :

হাটে সোনা হাটে—
হাটিয়া যায় সোনা খুটিয়া খায়,
হাটের মোলামুড়ি কিনিয়া খায়,

হাঁটতে শিখলেই সে হাট যেতে পারবে। হাটে গিয়ে মোয়া-মুড়ি কিনে খেতে পারবে। এর চাইতে বড় প্রলোভন আর কি হতে পারে? শুধু হাঁটার জন্য উৎসাহদান নয়, এদের আনন্দ দেবার জন্যও কিছু ছড়া এই অঞ্চলে আছে। যেমন :

হাত ঘুরাইলে নাড়ু দেবো,
নইলে নাড়ু কোথায় পাবো,
সোনার নাড়ু গরেয়া দেবো।

অথবা :

ঢুল ঢুল ঢুলে—
ঢুল কদমের তলে,
হাতির পিটিত্ চড়ে—
হাতি মাইরলে লাতি,
কুড়িয়া পাইলে ধুতি—
সেও ধুতি রাঙা,
মোর সোনাটা ঢাঙা।

অনেক মেয়েদের ছড়াও এই অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। সেগুলি এইরূপ :

১

উলুউলু মানদারের ফুল,
কইনার বাড়ি কত দূর,
কইনা আসিল ঘামিয়া—
ছাতি ধর টানিয়া।
ছাতির উপর গামছা,
তিন বইনে তামাসা।

২

পাত্রী ধুমুরী বিয়ার পাত্র ধুমুরা,
একটা পইসার ইচিলা মাচ তিনটা কুমড়া
বিয়ার পাক্ পরশ রে।
বাইজ আইনচে ধ্যারো ধ্যারো
আর ত্যারো ত্যারো সানাই,
কারো স্বর না মিলে।

৩

ভাল করিয়া বাজান রে ঢাকুয়ার—
সুন্দরী কমলা নাচে,
সুন্দরী কমলার পেন্দনের শাড়ী
রৈদে ঝিলমিল করে

এ বাড়ি হইতে ও বাড়ি যাইতে—
ঘাটাত্ ছিপছিপ পানি,
বরের ভিজিল জামা রে জোড়া
কইনার ভিজিল শাড়ী।

শুধু ছড়াই নয় ধাঁধাগুলির গ্রন্থনাতেও ঠিক একই মৌলিকতা এবং বুদ্ধি-দীপ্তির পরিচয় মেলে। এগুলির বিষয়বস্তু ব্যাপক। চিন্তার 'রেঞ্জ'ও খুব ছোট নয়। এগুলি নিঃসন্দেহে এই অঞ্চলের মানুষের সৃষ্টিপ্রতিভার স্বাক্ষর বহন করছে। কতকগুলি ধাঁধা নিচে উদ্ধৃত করা হলো :

পিপিপি—
নেটু দিয়া জল খায় তার নাম কি ? — ল্যাম্প

ইনকিচি বিনকিচি
নাই চোচা নাই বিচি। — লবণ

খ্যাড় বাড়ি হাতে বিরাইল টিয়া—
সোনার টুপি মাথাত্ দিয়া। — মোচা

চুটুত্ পাকড়া—
মধ্যোত্ ভ্যাকড়া,
খই—
কয়য়া দিবার নই। — খই

এই ধাঁধাটি চাবির ইংরেজী 'কি ?' অথবা সীতার অপর নাম 'জানকী' ধরনের।

এক গচে এক ফল, পাকি আচে টলমল। — আনারস

আকাশ থাকি পইল ভ্যাট্—
ভ্যাট্ কয় মোর প্যাট কাট। — গুয়া (সুপারী)
অ্যাখান কাইমত্ দুখান চাল। — কলার পাতা
চাল্লে ছাই — টাইনলে পাই। — তামাক
এক ছাওয়াতে বুড়ি। — কলাগাছ

ইত্তি গেনু উত্তি গেনু গেনু চিলকির হাট—
একনা বুড়ির দেখি আসনু ১৪ কোনা দাঁত। — ব্যাদা

ইত্তি গেনু উত্তি গেনু গেনু চিলকির হাট—
একনা বুড়ির দেখি আসনু ১৬ কোনা দাঁত। — ১ ছড়া কলা

সর্বশরীরে শিং — পড়ি আচে ডিং ডিং। — কাঁঠাল

একটা গরুর তিনটা শিং। — উটকন (বাঁশের তৈরি
এই জিনিষটি দিয়ে গরুর দড়ি পাকানো হয়।)

হাত নাই পাও নাই সলসলেয়া যায়,
পিটিত্ চামরা নাই সর্বলোকে খায়। — জল

ওপারে পোনাগুলা থুকুর বুকুর করে,
এ পারের চেংরাকোনা টিকাত্ চাপর মারে। — ভাত

আকাশ থাকি পইল, চ্যাপগা নাগি রইল। — গোবর

আকাশ হাতে পইল টেম্‌কি টেম্‌কি আগুন জলে,
ছাওয়ার হাতোত্ দিলে তাঁয় কিচির মিচির করে। — জোনাকি

আগালোত ঝিকিমিকি গোড়োত্ বাদা—
এই শোলোক ভাঙি না দিলে গুষ্টি সুদ্দায় গাধা। — আদা

মন্থনদীত্ ফেলাইলোং ছাই, ভাসি উঠিল কালা গাই! — জোঁক

দেখিতে সুন্দর যেমন উজান বয়সের বেলা—
কোন বিধির বিড়ম্বনা মুক করিচে কালা,
রসতে পরিপূর্ণ জাম্‌রি তো নোয়ায়,
ভাবিয়া দেখ এখন হয় কি ওয়ায়। — স্তন

খ্যাড় বাড়ী খান পোড়া গেইল—
ভুসকুরা টা চায়য়া রইল — উই-এর ঢিপি

একটা গচ ঝাপুর ঝুপুর
তাত চইড়চে কালা কুকুর — উকুন

হার দিয়া পাত রাধিচং ছাল পারি খ্যাং বইস
তিন টা কতার উত্তর দিয়া ভাত খাবার বইস। — পাটগাছ

আগাল ঝাটাং পাটাং গোর ভেরুয়া—
এই শোলোক ভাঙি না দিলে গুষ্টি সুদ্দায় জারুয়া। — ঝাঁটা

উটিতে ঝাটাং পাটাং বসিতে পাহাড়—
লক্ষ লক্ষ জীব মারে না করে আহার। — মাছ ধরা জাল

মনে করি কড়ি করি—
হয় কিন্তু হয় না। — হাতি কেনার ইচ্ছে কিন্তু ঘোড়াই হয় না

আইলে আইলে যায়—
ভুল্‌কি মারি চায়। — বিন্দি (সুঁচ)

একনা বুড়ি — নিন হাতে উঠি মাথাত্‌ গুড়ি। — গরুর খুঁট

একনা বুড়ি—কোনা মুতুরি
—ছ্যাকার খাস্‌সি (ক্ষার-জলের ছোট ঝুড়ি)

ইত্তি গেনু উত্তি গেনু গেনু বলাইর হাট—
একটা চেংরাক দেখি আসনু প্যাটের উপরা দাঁত। — বদনা

ইত্তি গেনু উত্তি গেনু গেনু চিলকীর হাট—
একনা বুড়ীর দেখি আসনু খিসখিসা দাত। — কুমড়া

প্যাট খোল খোল পিটি টান—
কোন জন্তুর চাইরটা কান। — ঘর

এক ভাই সাগোরোত্‌,
এক ভাই নগোরোত্‌,
এক ভাই গচের আগালোত্‌। — গুয়া, পান, চুন

তিনকানি মধ্য খাল—
ঘাড় ধরি ঠ্যালা মারির ভাল,

কেকৃরিয়া চড়্‌ত তোলে—
তলপাকের নাল পানি টুপুস টুপুস পরে। যাকই বাঁশের তৈরী।
ছোট খাল বিলে মাছ ধরার জন্য ব্যবহার করা হয়।

আগাল খান ঝাটাং পাটাং—
গোড়খান হইল আচ্চা,

মুখ দিয়া প্রসবিল ডিম্ব—
পুকৃটি দিয়া হইল বাচ্চা। — কলাগাছ

ঘাটায় ঘাটায় দাড়ায়,
মানুষ দেখিলে ঠারায়,
কোকরা নাগি ধরে,
অক্ত বির করি ছারে। — চিনাজোঁক

চিকমিকাটায় খোরে মাটি—
দশ ঠ্যাং তিন পুকৃটি। — চাষী ও হাল

চকর চাল চকর চাল—
গোড় ঝাউপসা মাতা নাল। — আনারস

আট ঠ্যাং ষোল হাটু,
মাচ ধরিতে গেল লাটু,
শুকনো ভূমে পেতে জাল,
মাছ ধরে চিরকাল। — মাকড়সার জাল

অডিম পকী অফুলা শাক—
কোন জন্তর আটারো নাক।—গড়াই মাছ

টিকা শুল্কা মাতা ফ্যার—
ধান ধরে আঠারো স্যার। — প্যাচা

ধুম ঘড় এক পই,
ছাতার ভারি কবার নই। — ছাতা

চার পায় খচে—
দুই পায় মোচে—
তার সংগে কি তোমার খাওয়া দাওয়া আছে ? — মাছি

উপর হলদিয়া ভিতর সাদা—
পণ্ডিতের ঘর বোঁজে আদামাদা,
মুর্খের ঘর বোজে কলা। — কলা

আকাশে ঘর—
পাতালে দুয়োর,
এই শোলোক যাঁয় না
ভাঙি দিবে তার বাপ শুয়োর। — পাখির বাসা

পাতা খসখস ড্যারা খসখস ধরে নোদা নোদা—
এই শোল্লোক ভাঙি না
দিলে তার গুষ্টি সুদ্দায় ভোদা। — মিষ্টি কুমড়া

এক বাটা সুপারী — গনির না পায় ব্যাপারী। — তারকা

জঙ্গল বাড়ি থাকি বিড়াইল হাতি—
সোনায় ঝলমল রূপার ছাতি। — সূর্য

গৃহস্থের প্রতি ঘরে—
দেখা যায় ব্যবহারে,
মেয়েলোকে নারে চারে,
পাওয়া যায় না হাটবাজারে,
দিনে আছে রাইতে নাই,
এই শোল্লকটার মানে চাই। — রোদ

ঠকঠক বগুলা—
চারি মাথা বার ঠ্যাং কোথায় দেখিলা ?
—গাই, বাছুর, ধরাইয়া, ছ্যাকাইয়া।

চাইর চৌদোল মুই কর্তা বামুন মোর ভারি,
মাইয়া হইল ঠাকুরাণীমাও মুই হনু তার ভাণ্ডারি — বিয়ের বর।

ভারতে মুক্তি-আন্দোলন ও সেনাবাহিনীর ভূমিকা

শান্তিময় রায়

রাষ্ট্র যে-তিনটি প্রধান স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে থাকে তার মধ্যে সশস্ত্র-বাহিনী অন্যতম; অন্য দুটি হচ্ছে আমলাতন্ত্র ও সামাজিক সম্পর্ক। এই সেনাবাহিনীর ভূমিকা সমাজ ও রাষ্ট্র-বিপ্লবের প্রায় অপরিহার্য অঙ্গ। এই ভূমিকা সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় উভয়তই হতে পারে। কারণ সশস্ত্রবাহিনীর নিরপেক্ষ বা নিষ্ক্রিয় ভূমিকা বিপ্লবের অন্যান্য সংগ্রামোদ্যত শক্তিগুলিকে আক্রমণাত্মক ভূমিকা গ্রহণে সাহায্য করে। আবার অনেক সময় নিরপেক্ষ থাকার অপরাধে যখন বিশ্বস্ত সশস্ত্রবাহিনীর নিকট থেকে আক্রমণ আসে তখন আত্মরক্ষার অঙ্গ হিসেবে তাদের বিদ্রোহ করতে হয় এবং এই বিদ্রোহ বিপ্লব ডেকে আনে।

সেনাবাহিনীর বেশিরভাগ মানুষ সাধারণ সমাজ থেকেই আসে, তাই বিভিন্ন আন্দোলনের প্রতিক্রিয়াও তাদের ওপর পড়তে বাধ্য। কারণ তারা সমাজের মধ্যেই প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের দ্বারা প্রভাবান্বিত।[১]

আধুনিককালে যে-সমস্ত জাতীয় ও গণতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত হয়েছে, ১৬৭৪ সালে ডাচ নাবিকদের (তাদের নৌবহর নিয়ে) স্পেনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রাম তার মধ্যে সর্বপ্রথম। ইংলিশ বিদ্রোহ বা পিউরিটান বিদ্রোহে সেনাবাহিনীর এক বিশিষ্ট অংশ ক্রমওয়েল, উইনস্টেণ্টলী ও কিলবার্নের নেতৃত্বে বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করে বিপ্লবকে বিজয়ের পথে নিয়ে যায়।[২]

১৭৮৯ সালে ফরাসী বিপ্লব শুরু হয় রাজকীয় রক্ষীবাহিনীর নিরপেক্ষ

১। Cholo-regh : Army and the revolution.

২। Christopher Hill : English Civil War.

ভূমিকার মধ্যে। রাজা যোড়শ লুই-এর আদেশ অমান্য করে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে তারা অস্বীকার করে। এই অবস্থার মধ্যেই যোড়শ লুই প্যারিসের জনতার দাবি মেনে নেন এবং স্টেটস জেনারেল আহ্বান করার কথা ঘোষণা করেন।

রুশিয়ার জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে ১৮২৭ সালেই, প্রথম নিকোলাসের সময় সেনাবাহিনীর মধ্যে এক বিপ্লবী চক্র গড়ে ওঠে। তাঁরাই প্রথম বিদ্রোহী, যাদের বলা হয় ডিসেমব্রিস্ট।[৩] বেশিরভাগ বিদ্রোহীকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। কিন্তু তাঁদের উত্তরসূরীরা আবার সেনাবাহিনীর মধ্যে গোপন বিপ্লবী চক্র গড়ে তোলেন। এবং এই বিপ্লবী চক্রের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন উলিয়ানভ লেনিন ও তাঁর সহকর্মীরা। ১৯০৫ সালের বিপ্লবেও কৃষ্ণসাগরের পোটেমকিন যুদ্ধজাহাজের বিদ্রোহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

নৌবিদ্রোহ দিয়েই রুশিয়ার অক্টোবর বিপ্লবের শুরু। তার আগে জারতন্ত্রের বিরুদ্ধেও প্রথম বিদ্রোহ শুরু হয় সেনাবাহিনীর মধ্যে। তার নির্মাতা বা সংগঠক ছিলেন লেনিন ও বলশেভিক পার্টি।[৪]

অতি আধুনিক যুগে আলজেরিয়া ও কিউবা, ইরাক ও ঈজিপ্ট সেনাবাহিনীর প্রগতিশীল ভূমিকার অন্যতম দৃষ্টান্ত। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁরা ছিলেন বিপ্লবী গণতন্ত্রকামী জনতার পাশে এবং বিপ্লবের সমান অংশীদার।

ভারতবর্ষের মুক্তি আন্দোলনে সেনাবাহিনীর ভূমিকা কি ছিল, এই প্রশ্ন এখনও তেমন বড় হয়ে দেখা দেয়নি। কিন্তু বিপ্লবের মহাযজ্ঞে কার কতখানি অবদান, সে ছোট হোক বড় হোক তার মূল্যায়ন হওয়া উচিত। আগামী দিনের গবেষকরা নিশ্চয়ই এই দৃষ্টিকোণ থেকে তথ্যানুসন্ধান করবেন। আমি আমার এই নিবন্ধে তাঁদের সম্মুখে কতকগুলি উল্লেখযোগ্য তথ্য উপস্থিত করছি।

প্রথমত স্বাধীনতার অর্থ যদি বৃটিশ শাসক থেকে ভারতবর্ষের মুক্তি এই হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে ওহাবি সংগ্রামের উদ্যোগপর্ব ভারতের মুক্তি সংগ্রামের শুরু ধরা যেতে পারে। কারণ ওহাবিদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এবং সংগঠিত প্রয়াসের মধ্যে যে-কথাটি সবচেয়ে পরিষ্কার, সেটা হচ্ছে

৩। History of the U. S. S. R., Vol. II.

৪। History of the U. S. S. R. Vol.

বৃটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বা ধর্মযুদ্ধ এবং এই যুদ্ধ জয়লাভের জন্যে সেনাবাহিনীর মধ্যে বিপ্লবী চক্র গড়ে তোলার প্রচেষ্টা। "Their ultimate object had been the overthrow of British Power in India and that with this view they had been endeouvaring to make converts among the native army."[৫] ওহাবী নায়ক সৈয়দ আহমেদ নিজে প্রথম থেকেই এইদিকে নজর্ দেন এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি নিজে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। ১৮৩৯ সালে হায়দারাবাদ, মাদ্রাজ, ভেলোর; ১৮৪৫ সালে পাটনা ও ১৮৫২ সালে রাওলপিণ্ডি প্রভৃতি যেসব ষড়যন্ত্র মামলার বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়, তার মধ্যে সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংযোগসাধনের বিভিন্ন কলাকৌশলের তথ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাধারণত পণ্ডিত ও মোল্লাদের সাহায্যে সৈন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হতো। তারপর দেওয়া হতো ওহাবীদের কাগজ-পত্র যার মধ্যে ধর্মরাজ্য স্থাপনের জন্য বৃটিশদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধের কথা বারবার বলা হতো।

১৮৩০ সাল থেকে ওহাবীদের সংগ্রাম চট্টগ্রাম থেকে পেশবার, মাদ্রাজ থেকে কাশ্মীর সীমান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের, মধ্যে যা-কিছু সামান্য সাংগঠনিক ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়, প্রায় সবটাই এসেছিল ওহাবী মুক্তিযোদ্ধাদের তরফ থেকে। রাণী লক্ষীবাই, নানাফারনবিশ, কনোয়ার সিং ও মঙ্গল পাঁড়ের প্রচেষ্টার মধ্যে ভারতের মুক্তিযুদ্ধের পরিষ্কার ঘোষণা বা সাংগঠনিক কুশলতার কোনো নজির প্রায় দুর্লভ।[৬] শারিয়াতুল্লার ফরাজী আন্দোলন ছিল প্রধানত গরিব অত্যাচারিত কৃষকদের প্রতিবাদ। বারাসতের নিসার আলি (তিতুমির) ও ফরিদপুরের মহম্মদ মুসলিমের (দুদুমিঞা) বিদ্রোহ ভারতের মুক্তিযুদ্ধের প্রথম আবাহন সঙ্গীত। উত্তরকালে হায়দরাবাদের মুবারিজুদ্দুল্লা (১৮৩৯) বেঙ্গল আর্মির মধ্যে বিদ্রোহী চক্র গড়ে তোলেন।

এই সম্পর্কে ফ্রেজার ও ম্যলকমের নেতৃত্বে একটি তথ্যানুসন্ধানী দল নিম্নলিখিত মন্তব্য করেন— "...That Mubariz had not only enter-

৫। G. Ahmed, Wahabi movement, N. C. Chawdhury's monograph : the Wahabi conspiracy in Hydrabad, 1839-40.

৬। Revolt of Hindusthan.

tained treasonable designs against his sovereign (the Nizam) but also had hostile intention more specifically directed against the British Government as manifested by the extra ordinary pains he and agents had taken to tamper with the allegiance of Native infantry especially at Secundrabad and Nagpur".[৭]

মুরারিজকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় (১৮৪০)। ১৮৫৪ সালে গোলকুণ্ডা দুর্গে তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

১৮৩৯ সালে ভেলোরের ভারপ্রাপ্ত সামরিক কর্মচারী মাদ্রাজ সরকারকে এক চিঠিতে জানান যে কবুদা মিঞা (Cowda-Mian) নামে একজন লোক সৈনিকদের সঙ্গে দাবা খেলে বন্ধুত্ব করতে চেষ্টা করছিলেন। তিনি নিয়মিত রাজদ্রোহাত্মক প্রচারপত্র বিলি করে চলেছিলেন।

বিহারের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার চাপে, এখানেও সেনা-বাহিনীর লোকেরা সহজেই ওহাবীদের প্রভাবের মধ্যে এসে পড়ে।

১৮৪৫ সালের সরকারী রিপোর্টে জানা যায় যে, চারদিকে এক ব্যাপক ষড়যন্ত্র চলেছে — "to tamper with the allegiance of the native officers and sepoys in Dinapur." পিরবকস (Ist Regiment N I) ও রাহাত আলীর মধ্যে সংযোগ হয়। ওহাবী নেতা সইফ আলী ছিলেন ষড়যন্ত্রের প্রধান নেতা! একজন পণ্ডিতের সাহায্যে তিনি সৈন্যদের মধ্যে রাজদ্রোহ প্রচার করেন। সৈইফ আলীকে ধরা সম্ভব হয়নি। তিনি ভারতের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এক বিস্ময়।

১৮৫২ সালে রাওলপিণ্ডি ষড়যন্ত্র মামলায় 'চতুর্থ দেশীয় পদাতিক বাহিনী'র (4th Native Infantry) মুন্সী মহম্মদালী কৃত অনেকগুলি চিঠিপত্র থেকে জানা যায় যে, সিতানার আক্রামুল্লা, পাটনার হুসেন আলিখাঁনের সঙ্গে একযোগে এঁরা সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ ঘটাবার প্রচেষ্টায় ছিলেন। এই প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন মীরাটের কাজী মহম্মদ ও লুধিয়ানার আব্বাস আলী। ওহাবীদের এই মহৎ প্রচেষ্টা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ডাঃ কোয়ামুদ্দীন আহমেদ লিখেছেন—"It is to the credit of the Wahabi

৭। G. Ahmed, Wahabi movement
Hunter, The Indian Mussalman.

leaders that they realised very early in their struggle with the English that the Indian Army occupied a key position in it. This was the main instrument of the power of the English and if this could somehow be 'neutralised' half the battle would be won. It was this realisation which made the Wahabi agents repeatedly bring home to the Indian Sepoys the full extent of the immense power wielded by them and of the dependence of the English on them…" "ওহাবীরা সাটলেজ থেকে কলকাতা পর্যন্ত প্রত্যেকটি সামরিক ঘাঁটিতে সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংযোগ সাধন করার চেষ্টা করেন।"[৮]

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের মধ্যে বিভিন্ন বিদ্রোহের স্রোতোধারা এক উত্তাল তরঙ্গের সৃষ্টি করে। নিঃসন্দেহে ওহাবী মুক্তিকামীরাই ছিলেন সবচেয়ে বেগবান প্রবাহ। দুঃখের বিষয় ওহাবী মুক্তিসংগ্রাম অভিজাত ইতিহাসের আসরে আজও অপাংক্তেয়। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের ফলে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সংগঠন পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন করা হয়। সাঁজোয়াবাহিনী, ভারী-কামান-বাহিনীতে সম্পূর্ণভাবে ইংরেজ কর্মচারীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[৯] তাছাড়া সামরিকবাহিনীর মধ্যে গুপ্তচর বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। রাজদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করাই এর প্রধান উদ্দেশ্য।" সেনাবাহিনীর মধ্যে বৈষম্যমূলক আচরণের ভিত্তিতে ইংরেজ ও দেশীয় সৈন্যদের মধ্যে দুটো সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়।[১০] ১৮৫৭ সালের পর ওহাবীদের কার্যকলাপ স্তিমিত হতে থাকে। ১৮৬৩ সালে ওহাবীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে ভারতে মুক্তি-সংগ্রামের এই প্রথম অধ্যায়ের যবনিকা পড়ে।

এরপর আরম্ভ হয় জাতীয়তাবাদের উন্মেষের যুগে মুক্তিসংগ্রাম। ১৮৫৭ থেকে ১৯০০ পর্যন্ত নবীন রাজনৈতিক চেতনার মধ্যে সর্বভারতীয় রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে ওঠে। ভারতসভা ও সর্বজনিকসভার গোড়াপত্তন হয়। আলিগড় শিক্ষা আন্দোলন ও জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হলো। ১৮৮৫ সাল

৮। G. Ahmed, Wahabi movement.

৯। Dr. R. C. Mazumder, British Paramountcy & Bengal Renaissance, Vol I.

১০। Dr. R. C. Mazumder, The Revolt of 1857.

থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত সারা দেশে এক বিপুল সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন আসে।

পাবনায় কৃষক-বিদ্রোহ, দাক্ষিণাত্য দুর্ভিক্ষ, হিউমের ভারতের অবস্থা সম্পর্কে রিপোর্টে আসন্ন বিদ্রোহের চিত্র, ইংরেজ শাসন সম্পর্কে রমেশ দত্ত, গোখলে, দাদাভাই নৌরজী প্রভৃতি মডারেট কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের তীব্র সমালোচনা ও ব্যর্থ আবেদন-নিবেদনের আন্দোলন ধীরেধীরে নিঃশেষ হয়ে জন্ম দিল সশস্ত্রবিদ্রোহের অগ্নিযুগ।[১১]

১৮৯৮ সালে মহারাষ্ট্রে এই বিপ্লবীপন্থার প্রথম অনুশীলন আরম্ভ হয়। পুণার নিকট এক দেশীয় রাজ্যের দেওয়ান বাবা ঠাকুর সাহেব ভারতে গুপ্ত সমিতির প্রথম উদ্ভাবক। প্রায় একই সময়ে লণ্ডনে গঠিত ('Lotus and Dagger Society') 'লোটাস ও ডেগার সমিতি' বিদেশের প্রথম সংগঠিত গুপ্ত সমিতি। এই গুপ্ত সংগঠনের সঙ্গে অরবিন্দ ঘোষের নাম জড়িত।[১২] এঁরা দুইজনেই অন্যান্য কর্মোদ্যোগের সঙ্গে সেনাবাহিনীর মধ্যে গুপ্তচক্র গড়ে তোলার কথা অন্যতম প্রধান কাজ বলে বিবেচনা করেছিলেন। ঠাকুর সাহেব এইদিক থেকে দেশীয় রাজ্যের মধ্যে সহানুভূতি সম্পন্ন সৈন্যদের নিয়ে গুপ্ত দল গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন (১৮৯৮)। এক বছরের মধ্যেই অরবিন্দ ঘোষ বরোদা কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়ে, যতীন বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাঙলাদেশ থেকে নিয়ে এসে বরোদার মহারাজার দেহরক্ষীবাহিনীতে ভর্তি করিয়ে দেন।[১৩] কিছুদিন কাজ করার পর যতীন বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙলাদেশে চলে এসে বিপ্লবী গুপ্তসমিতি চক্র গড়ে তোলার কাজে বারীন ঘোষের সহকর্মী হন। পশ্চিম ভারতে 'অভিনব ভারতী' ও 'মিত্রমেলা' নামক গুপ্তসমিতিগুলি যে প্রথম থেকে দেশীয় রাজ্যের সেনাবাহিনীদের মধ্যে সংযোগের চেষ্টা করেছিল তা মনে করার সঙ্গত কারণ আছে।[১৪] ঠাকুর সাহেবের সঙ্গে অরবিন্দের যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল

১১। ডাঃ যদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, বিপ্লবী জীবনের স্মৃতিকথা। Rajani Palme Dutt, India today.

১২। শ্রী অরবিন্দ ও স্বদেশী সমাজ, গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী। (চিন্মোহন সেহানবীশের সৌজন্যে)।

১৩। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস, পৃষ্ঠা ৬৪।

১৪। রাওলাট কমিটির রিপোর্ট ; Bombay Freedom Movement Paper, Vol 1.

তারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে।[১৫] অরবিন্দ তাঁর আত্মজীবনীতে এক জায়গায় লিখেছেন[১৬]—"The Thakur was 'a noble of the Udaipur State' and happened to be the head of a secret society that had been silently working in Bombay. ...His foresight made him realise that unless there be a considerable section in the Army to help the cause of the revolution, the movement could not have the same strength as was essential for this occassion. On this assumption he directed his secret efforts towards this end and succeeded in winning over two or three regiments of the Indian Army."[১৭]

অরবিন্দ ঘোষ পরবর্তীকালে ১৯০৭ সালে ১২ই আগস্ট 'যুগান্তর' সম্পাদকীয় প্রবন্ধে এক জায়গায় লিখেছিলেন—"The foreign goverment has to recruit most of the soldiers from among the people. There fore if the revolutionists secretly announce the message of independence to there native soldiers, a noble work will be done. When at least they have to encounter the imperial power the revolutionists not only gain the well trained native soldiers, but also get the benefit of the arms and ammunition which the imperial power gave the soldiers." রাওলাট কমিটির রিপোর্ট থেকে পাওয়া যায়, যে-কয়টি গ্রন্থ আদিপর্বে বিপ্লবী দলগুলিকে গড়ে উঠতে সাহায্য করেছে তার একটি গ্রন্থ হচ্ছে 'মুক্তি কোন পথে' ও দ্বিতীয়টি 'বর্তমান রণনীতি'। 'মুক্তি কোন পথে'-এর এক জায়গায় আছে—"The assistance of Indian soldiers must be obtained. They should be made to realize the misery and wretchedness of the country"[১৮] অন্য এক জায়গায়—'Although these soldiers

১৫। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম, পৃষ্ঠা ৬৪।

১৬। Arbinda on himself and on mother, পৃষ্ঠা ২৮।

১৭। K. C. Ghosh, Roll of Honour, Pp. 67.

১৮। Sedition Commission Report.

for the sake of their stomach accept service in the Government of the ruling foreigners. Still they were nothing but men made of flesh and blood. They possessed the power of original thinking. Therefore when the revolutionaries had explained to them the woes and miseries of the country they in proper time, would swell the ranks of the revolutionaries with arms and weapons given to them by the rulers. As it was possible to persuade the soldiers in this way, the modern English Raj of India did not allow the cunning Bengalies to enter into the ranks of the Army. ......Aid in the shape of arms might be secretly obtained by securing the help of the foreign ruling powers."[১৯]

স্বভাবতই সে-যুগে বিভিন্ন সংবাদপত্রে অগ্নিবর্ষী প্রবন্ধগুলি সশস্ত্রবাহিনীর লোকেদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছিল। যথা—পুণাবৈভব (১৮৯৭), মদভৃত্য (১৮৯৭), কেশরী, কাল (১৮৯৫), বিহারী। বন্দেমাতরম (১৯০৬), যুগান্তর, সন্ধ্যা, নবশক্তি, কর্ম্মযোগিন (১৯০৬), প্রতোদ (বম্বে), সহায়ক (লাহোর), পোশোয়াল (লাহোর), হুঙ্কার, স্বরাজ, দেশসেবক, জমিন্দার (লাহোর)।[২০]

১৯০৭-৮ সালে পাঞ্জাবে কলোনাইজেশন-বিল নিয়ে বিরাট আন্দোলন হয়। অজিত সিং, লালা লাজপৎ রায় প্রভৃতি এই আন্দোলনে ধৃত হন। এই সময়ে গোটা পাঞ্জাব গর্জে ওঠে। "ব্যারাকে ব্যারাকে শিখ সৈনিকেরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।" লর্ড কিচেনার অবশ্য বিক্ষোভ বেশি দূর গড়াতে দেননি।[২১]

বিদেশে তখন শ্যামজী কৃষ্ণভার্মা, হরদয়াল, সাভারকার 'The Indian sociologist' কাগজখানার মাধ্যমে রাজদ্রোহ প্রচার করতে থাকেন। এই সময়ে তাঁরা ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের অমর শহীদ স্মরণে এক সভার আয়োজন করেন। এরপর থেকে মহাবিদ্রোহের অমর কাহিনী সেনানিবাস-গুলিতে প্রচারের ব্যবস্থা হয়।[২২]

১৯। Sedetion Commission Report.
২০। K. C. Ghosh, Roll of Honour, Pp. 134.
২১। Rowlat Commision Report.
২২। —do—

১৯০৯ সালে বিপ্লবী যতীন মুখার্জি, আদি অনুশীলন বা কলকাতার অনুশীলন দল (যুগান্তর) সহ বাঙলাদেশের অনেকগুলি দলকে এক নেতৃত্বাধীনে নিয়ে আসেন। অরবিন্দ ঘোষের পর তিনি আবার সেনাবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। শিবপুরের নরেন চট্টোপাধ্যায়ের মাধ্যমে একজন শিখ সৈনিকের সঙ্গে প্রথম সংযোগ করা হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে যখন ব্রিটেন ও জার্মানির যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠল, তখন ভারতবর্ষে বিশেষ করে উত্তর ভারতে যতীন মুখার্জি ও ডাঃ রাসবিহারী বসু মিলিতভাবে সেনানিবাসগুলিতে সংযোগ আরম্ভ করেন। বিদেশে জার্মান সরকার সমর্থিত বিখ্যাত 'বার্লিন কমিটি' রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ. মৌলানা বরকতুল্লা, ওবিদুল্লা সিন্ধী, ডাঃ ভূপেন দত্ত, অবিনাশ ভট্টাচার্য, মাদাম কামা, বীরেন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নেতৃত্বে বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদানীর ব্যবস্থা করা হয়।

রাওলাট কমিশন এ-সম্পর্কে এক জায়গায় মন্তব্য করেছেন—"It was supported by efforts to evolve a system to affiliate all those behind the movement into an efficient working unit the principal aim of which would be to cause mutiny among native troops in British India and in different centres engaged in war."

"One of the prominent Indian revolutionaries was given charge to direct a campaign to win Indian prisoners of war caytured by the Germans from tne British ranks from their allegiance."

কলকাতার ফোর্ট-উইলিয়ামে তখন ১০ নম্বর জাঠ রেজিমেণ্টের সঙ্গে যে সংযোগ সাধন করা হয়, সে-ব্যাপারে অনুশীলন ও যুগান্তর দুই দলেরই দাবি আছে। তবে যতীন মুখার্জি যে এই প্রধান উদ্যোগের সংগঠক ছিলেন তা অনস্বীকার্য।

১৯১৫ সালের বিপ্লবীদের এই প্রচেষ্টা সম্পর্কে মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী তাঁর 'জেলে ত্রিশ বছর ও ভারতের বিপ্লব সংগ্রাম' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ৭২) নিম্নলিখিত, মন্তব্য করেছেন (১৯১৫ সাল)—"এদিকে দেশে অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ, বোমা তৈরির ও ভারতীয় সৈন্যদিগকে হাত করার চেষ্টা চলিতে থাকে। ...শুধু বাঙলাদেশে ১২ শত বিপ্লবী ধৃত হইয়া জেলে আবদ্ধ হইল। বিপ্লব চেষ্টা তবু চলিতে লাগিল। শ্রীরাসবিহারী বসু, শচীন্দ্রনাথ সান্যাল, গিরিজা দত্ত, অনুকূল চক্রবর্তী

অমৃত সরকার, পণ্ডিত পরমানন্দ, পৃথ্বি সিং আজাদ, জোয়াল সিং, মোহন সিং, পণ্ডিত জগৎরাম, বিষ্ণু গনেশ পিংলে, বিনায়ক রাও কামলে প্রভৃতি অনুশীলন সমিতির নেতারা ও কর্মীগণ লাহোর হইতে ঢাকা পর্যন্ত এবং মধ্যপ্রদেশে সৈন্যদল হাত করার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সৈন্য সংগ্রহের জন্য শ্রীরাসবিহারী বসু ও শচীন্দ্রনাথ সান্যাল, শ্রীদামোদর স্বরূপকে এলাহাবাদে, দিলা সিংকে কাশীতে, বিশ্বনাথ পাঁড়ে ও মঙ্গল পাঁড়েকে রামগড়ে, জব্বলপুরে কর্তার সিং ও পৃথ্বি সিংকে লাহোর আম্বালা, ফিরোজপুর, রাওয়ালপিণ্ডি, বিষ্ণু গণেশ পিংলেকে মীরাট, পণ্ডিত জগৎরামকে পেশোয়ার, পণ্ডিত পরমানন্দকে ঝাঁসী, কানপুর প্রভৃতি স্থানে পাঠাইলেন। সর্দ্দার মদন সিং ও সর্দ্দার হাজরা সিং ২৬ নম্বর শিখ রেজিমেণ্টের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিলেন। সর্দ্দার হরনাম সিং মিয়ানওয়ালী ছাউনীর সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিলেন।"

মহাযুদ্ধের প্রথম দিকে ইংরেজদের উপর্যুপরি পরাজয়ের ফলে বৃটিশ সৈন্যদের মনোবল ভেঙে পড়ে। এই সময়ে ভারতীয় সৈনিকদের মধ্যে স্বাধীনতার বাণী প্রচারের ফলে সৈনিকদের মনে এক অভূতপূর্ব সাড়া জাগে। "তাহারা বিদেশী সরকারের জন্য প্রাণ বিসর্জন অপেক্ষা স্বদেশের স্বাধীনতা অর্জন করাই শ্রেয় বলিয়া মনে করিল। রাসবিহারীর সংস্পর্শে ভারতীয় সৈনিকদের আত্মসম্বিৎ ফিরিয়া আসিল, তাহারা দেখিল ভারতের স্বাধীনতা তাহাদেরই হাতের মুঠার মধ্যে। ঐ সময় ভারতে মাত্র ১২ হাজার ব্রিটিশ সৈন্য ছিল। ভারতীয় সৈন্যগণ স্থির করিলেন, তাহারা হঠাৎ ব্রিটিশ সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিয়া, পরাজিত ও বন্দী করিয়া, প্রকাশ্য ঘোষণা দ্বারা জাতীয় গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিবেন। ঐ সময় তাহাদের বন্দুক নিজেদের নিকট রাখিতে পারিত এবং ফোর্টের ভিতর তাহাদের আত্মীয় যাইতে পারিত। রাসবিহারী বোস-এর নামে যখন বহু সহস্র টাকা পুরস্কার ঘোষণা ছিল, তখন তিনি সৈনিকদের আত্মীয় সাজিয়া ফোর্টের ভিতর গিয়া সৈন্যদের সহিত ভাবী বিপ্লব সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করিতেন। ফোর্টের গেটে রাসবিহারীর বিশ্বস্ত ভক্ত পাহারা দিত। এইসব ঘটনা যখন প্রকাশ হইয়া পড়ে, তখন হইতে আর সিপাহীদিগের নিকট বন্দুক রাখিতে দেওয়া হয় না, প্রত্যহ কুচকাওয়াজের পর বন্দুক মেগাজিনে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয় এবং ফোর্টের ভিতর বাহিরের কোন লোক যাইতে পারে না।"[২৩]

২৩। মহারাজের মন্তব্য, পৃষ্ঠা ৭২-৭৩।

যুগান্তর, অনুশীলন সমিতির সঙ্গে আরো দুটি প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। আমেরিকার গদর পার্টি ভারতের সশস্ত্র বিপ্লবে অংশগ্রহণের অভিপ্রায়ে অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহে সচেষ্ট হয়। বাবা মোহন সিং ছিলেন এদের সভাপতি। সেনাবাহিনীর মধ্যে তাঁদের যথেষ্ট সংযোগ ছিল। পাঞ্জাবী সেনারাই শৌর্য-বীর্যের অধিকারী, সুতরাং গদর দল কামাগাটামারু নামক জাহাজে কলকাতার বজবজে পৌছাবার পর এক ঐতিহাসিক সংঘর্ষে লিপ্ত হন। এর আগে "এই দলের স্টকহলমে (১৯১৪) এক সম্মেলনে স্থির হয় ভারতে বিপ্লবী দলের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিতে হইবে এবং ভারতের বাহিরে ভারতীয় সৈনিকদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিতে হইবে।"২৪ এই সংঘর্ষ এড়িয়ে অনেক শিখ পাঞ্জাবি উপস্থিত হতে সক্ষম হন। শত শত শিখ এইবার সৈন্যদের মধ্যে কাজে নেমে যান।

অপর প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত 'প্যান ঐস্লামিক বিপ্লবী দল' দেওবন্ধ মহাবিদ্যালয় থেকে যেসব প্রগতিশীল মুসলিম যুবক মধ্যপ্রাচ্যের দিকে অধ্যয়নের জন্য গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই এই বিপ্লবী দিকটি গড়ে তোলেন। ব্রিটিশদের তাড়িয়ে ভারত স্বাধীন করার ব্রত তাঁরাও গ্রহণ করেন। ওবিদুল্লা সিন্ধি ছিলেন এঁদের নেতা। তুর্কীর আনোয়ার পাশা ও মিশরের বিপ্লবীরা এঁদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সমস্ত মধ্য প্রাচ্য, উত্তর পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ, সিন্ধু, পাঞ্জাব কাশ্মীর, ইরাক, ইরান, হেজাজ, আরব প্রভৃতি দেশে এঁদের কেন্দ্র ছিল। সৈন্যদের মধ্যে ও ভারতের বাইরে বসরা, মালয়, সিঙ্গাপুর, জাভা, সাংহাই প্রভৃতি সেনানিবাসে এঁরা প্রচারপত্র বিলি করতেন। (রাওলাট কমিশন)। কথা ছিল ২১ ফেব্রুয়ারী ১৯১৫ সালে স্বাধীনতা ঘোষণা করা হবে। কিন্তু কৃপাল সিং নামে একজন সৈনিকের বিশ্বাসঘাতকতায় অভ্যুত্থানের পূর্বেই ব্রিটিশ সরকার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক থানাতল্লাসী ও ধরপাকড় শুরু করে। পণ্ডিত জগৎরাম পেশোয়ারে ধৃত হন। পিংলে বোমা-পিস্তল সহ মীরাট কেণ্টনমেণ্টে দ্বাদশ অশ্বারোহী বাহিনীর লাইনে ধৃত হলেন। নবম ভূপাল পদাতিকবাহিনীর শিখ হাবিলদার সর্দ্দার হরনাম সিং ফৈজাবাদে ধৃত হন। সর্দ্দার নারায়ণ সিংহ ও সর্দ্দার মোহনলাল পিস্তল সহ ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত মেইমোতে ধৃত হন। গভর্নমেণ্ট ভারতীয় সৈন্যদের বিভিন্ন স্থানে ছত্রভঙ্গ করে দিল। আম্বালা, ফিরোজ প্রভৃতি স্থানে যেসব ভারতীয় সিপাহী বিপ্লবীদের সংস্পর্শে এসেছিলেন

২৪। রাওলাট কমিশন। গদর—১৯১৫।

কোর্টমার্শাল বিচারে তাদের গুলি করে হত্যা করা হলো। (মহারাজের মন্তব্য)। এই সময় বসরাতে প্রায় দুইশত বিদ্রোহী সৈন্যকে তোপের মুখে উড়িয়ে দেওয়া হয়।

রাওলাট কমিশনে ও ডেভিড পেট্রির 'দূরপ্রাচ্যে রাজদ্রোহাত্মক কার্যাবলী সংক্রান্ত রিপোর্ট'-এ মন্তব্য করা হয়েছে—"The revolutionaries were to go through China, Japan, Borneo and Siam into Burma. In the west it was planned to seize Suez Canal to go through Persia and Afganisthan and thence to the west coast of India.

"The scheme which depended on Moslem disaffection was directed against the north west frontier.

"But the other scheme relied upon the Ghadar party of Sanfrancisco and the Bengali revolutionaries."[২৫]

"১৯১৫ সালে হেরম্ব গুপ্ত, ওবিদুল্লা সিন্ধি, মৌলানা বরকৎউল্লা প্রভৃতি কয়েকজন ভারতীয় বিপ্লবী বার্লিন কমিটির প্রতিনিধিরূপে কনস্টান্টিনোপল-এ উপনীত হন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল মেসোপোটেমিয়ায় অবস্থিত ভারতীয় সেনাবাহিনীর মধ্যে প্রচার পুস্তিকা বিতরণ করে তাদের বিদ্রোহের পথে নিয়ে আসা।" সম্ভবত এঁদের প্রচেষ্টাতেই বসরাতে বিদ্রোহ হয় এবং সে-বিদ্রোহ হেজাজের মেয়র মহম্মদ শরীফের বিশ্বাসঘাতকতায় ব্যর্থ হয়। এঁদের কিছু অংশ পারস্যের দিকে অগ্রসর হয়ে ধৃত হন এবং সবাইকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এই নিয়ে যে-মামলা দায়ের করা হয় তার নাম 'রেশমী রুমাল ষড়যন্ত্র মামলা'। পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অন্যূন প্রায় ৩০ জন মুসলিম ছাত্র-বিপ্লবীকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। বাকি সবাইকে দীর্ঘদিনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।[২৬]

১৯১৫ সালে দূর প্রাচ্যে সিঙ্গাপুরে অবস্থিত 6th Native Light Infantry ও ভারতীয় সৈন্যগণ ১৫ই ফেব্রুয়ারি স্বাধীনতা ঘোষণা করে বিদ্রোহ করেন। ভারতীয় সৈন্যগণ ইংরেজ সৈন্যদের বন্দী করে দু-সপ্তাহ পর্যন্ত সিঙ্গাপুর শহর দখল করে রাখেন। অবশেষে ব্রিটিশের মিত্র জাপ-রণতরীর সাহায্যে বিদ্রোহ দমন সম্ভব হয়।

২৫। Rowlat Commission Report.

২৬। Do

এই বিদ্রোহে চারজন ইংরেজ সেনাও যোগ দেন। কাশিম ইসমাইল মুনশুর ও মোহনলাল ছিলেন এই বিদ্রোহের প্রধান নায়ক। ৮ই মার্চ রসুলাহ্ ইমতিয়াজ আলি, রঘনুদ্দিনকে ; ১৩ই মার্চ হাবিলদার বান্দ সলেইমান, নায়েক মুন্সী খান, নায়েক জাফর আলি খান ও আবদুর রেজা খানকে চরম দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

সেই সঙ্গে ভগৎ সিং, আতর সিং, তন্নর সিং, রুলা সিং, হাজরা সিং, তামার সিং ও বীর সিংকে তোপের মুখে উড়িয়ে দেওয়া হয়। এ-ছাড়া ৬৫ জন বিদ্রোহী সৈনিক প্রাণ হারান।[২৭] এইসঙ্গে মালয় রাজ্যেও বিদ্রোহ দেখা দেয়। এঁরা ছিলেন মালয় স্টেট গাইডের অন্তর্ভুক্ত। এই বিদ্রোহীদের মধ্যে সুবেদার দাণ্ডে খাঁন, জমাদার চিস্তি খাঁন, হাবিলদার রহমত আলি খাঁন, সিপাহী হাকিম আলি ও হাবিলদার আব্দুল গনি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯১৫ সালের ২৩শে মার্চ তাঁদের কোর্ট মার্শাল করা হয়। দূর প্রাচ্যে বিদ্রোহগুলি দমন করার পর দুইটি ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয়। মান্দালয় ও বার্মা ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামী মোহনলালকে সরকারের সেনানিবাসে বিদ্রোহ সংঘটিত করার অপরাধে ১৯১৬ সালের জানুয়ারি মাসে মান্দালয় জেলে ফাঁসি দেওয়া হয়।

মৃত্যুর পূর্বে লাটসাহেব জেলে গিয়ে মোহনলালকে বলেছিলেন—"ক্ষমা প্রার্থনা করিলে তাহার প্রাণদণ্ড রহিত হইবে।"

উত্তরে মোহনলাল বলেছিলেন—"যদি প্রার্থনা করিতে হয় তবে ইংরেজ জাতিই ক্ষমা প্রার্থনা করিবে, এ-দেশে তাহাদের কোন অধিকার নাই।" বিদ্রোহী[২৮] ১৩০ নম্বর বেলুচ রেজিমেণ্টের প্রায় দুশ সৈনিক বিভিন্ন দণ্ডে এবং মোস্তাফা হুসেনও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে ফাঁসির রজ্জু বরণ করেন।

"এই ষড়যন্ত্র মামলায় লালা হরদয়াল, রাসবিহারী বসু, বরকতুল্লা প্রভৃতির নাম প্রকাশ পায়। রাজসাক্ষী বলিয়াছিলেন, লাল রঙ হিন্দুর, নীল রঙ মুসলমানের, সবুজ রঙ শিখদিগের। এই মামলায় মোহনলাল কৃপারাম, হরনাম সিং, কালা সিং, বাসুদেব সিং-এর ফাঁসি হয়। চৈৎরাম কাপুর সিং, হরজিৎ সিং, বদন সিং, গুজর সিং রামরক্ষা প্রভৃতির যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয়।[২৯]

২৭। Rowlat Commission Report.

২৮। মহারাজের মন্তব্য

২৯। ঐ

উত্তর-ভারতে বিদ্রোহ ব্যর্থ হবার পর "বিভিন্ন কেন্টনমেণ্টের বিপ্লবী সৈন্যদিগকে হত্যা করিয়া অবশিষ্ট যাহারা ছিলেন তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ষড়যন্ত্র" এই অভিযোগে বিখ্যাত "লাহোর ষড়যন্ত্র" মামলা দায়ের করা হয় (১৯১৫)।" এই মামলার তিন-দফায় ৯০ জনের ফাঁসির হুকুম হয় এবং ৮০০ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডাদেশ হয়।

এই মামলার রাজসাক্ষীদের জবানবন্দী থেকে জানা যায় যে "বিপ্লবীরা মিরাট, আগ্রা, কানপুর, এলাহাবাদ, বেনারস, ফিরোজপুর, আম্বালা প্রভৃতি সেনানিবাসে গিয়া সৈনিকদের হাত করিয়াছিলেন।"[৩০]

"যাহাদের ফাঁসির হুকুম হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে ছিলেন শ্রী গণেশ বিষ্ণু পিংলে, সর্দ্দার জগৎ সিং, সর্দ্দার স্বরণ সিং, সর্দ্দার হরণাম সিং।"[৩১]

যাদের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয়েছিল তাদের মধ্যে (১) বলবন্ত সিং (২) হরনাম সিং তুন্দ্রা (৩) কেদার সিং (৪) খুসল সিং (৫) নন্দ সিং (৬) পৃথ্বি সিং (৭) রুর্লা সিং (৮) সেওয়ান সিং (৯) মোহন সিং (১০) ওয়াসন সিং (১১) ভাই পরমানন্দ (১২) পণ্ডিত পরমানন্দ (১৩) হির্দেরাম (১৪) রামশরণ দাস (১৫) জত্রিৎ রাও (১৬) গুরুমুখ সিং (১৭) জোয়ালা সিং (১৮) শের সিং (১৯) পণ্ডিত জগৎরাম (২০) নিধান সিং (২১) কেশর সিং (২২) বিশাখা সিং (২৩) রুবসিং (২৪) ভাল সিং (২৫) কেহের সিং (২৬) উদম সিং (২৭) পিয়ারা সিং (২৮) কৃপাল সিং (২৯) ইন্দ্র সিং (৩০) লাল সিং (৩১) কালা সিং (৩২) নাথা সিং (৩৩) শিব সিং (৩৪) সঞ্জন সিং প্রভৃতি ছিলেন।[৩২]

"১৯১৫ সালে বেনারস ষড়যন্ত্র মামলার রায়েও বিচারকগণ আসামীদিগের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করেন তাহার মধ্যে সর্বপ্রধান ছিল—নানাস্থানে সৈন্য ব্যারাকে বিক্ষোভ সৃষ্টি করা ও বিদ্রোহে উত্তেজিত করার জন্য নানাবিধ রাজদ্রোহ মূলক পুস্তকাদি প্রচার করা।" এই মামলারই অন্যতম আসামী ছিলেন রাসবিহারীর সহকর্মী বিপ্লবী নায়ক শ্রীশচীন্দ্রনাথ সান্যাল এবং তাঁর

৩০। মহারাজের মন্তব্য

৩১। ঐ

৩২। রাওলাট কমিশন রিপোর্ট।

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। তাঁর সঙ্গে ছিলেন শ্রীদামোদর স্বরূপ, গণেশলাল, নলিনী মুখার্জি, কালীপদ, জিতেন্দ্রনাথ সান্যাল প্রভৃতি।[৩৩]

প্রথম মহাযুদ্ধের ১৯১৪-১৬ সালের মধ্যেই সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় বিদ্রোহ ও বিপ্লব সংঘটিত করার মহৎ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এই ব্যাপক প্রচেষ্টার ব্যর্থতার মূলে একটি বড় কারণ ছিল। সাম্প্রদায়িক ঐক্য, অসামান্য বীরত্ব ও আত্মত্যাগের জলন্ত নিদর্শন সত্ত্বেও এই বিদ্রোহগুলির ব্যর্থতার পশ্চাতে ব্যাপক গণচেতনার একান্ত অভাবই সেই কারণ। সমস্ত পরিকল্পনাগুলি ছিল জার্মানির জয়-পরাজয়কে কেন্দ্র করে। জার্মানির পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহের প্রধান প্রেরণার সূত্রও নিঃশেষ হয়।

দ্বিতীয়ত, বিদ্রোহী নেতৃবৃন্দ দেশবাসীকে তাদের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র সম্পর্কে কোনো আভাস না দিতে পারার ফলে গণচেতনার দৃঢ় ভিত্তির উপর এই বিপ্লব প্রচেষ্টা রচিত হলো না। এমন কি ইতালি বা আয়ার্ল্যাণ্ডের বিদ্রোহের মতো গণভিত্তিও রচনা করা হয়নি। ডিসেম্ব্রিস্টরাও ১৮২৮ সালে ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রের ছবি দিতে পেরেছিলেন।[৩৪]

তৃতীয়ত, বিদেশ থেকে যাঁরা এই বিপ্লবের পরিকল্পনা ও নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁদের অনেকের দেশপ্রেম সম্পর্কে সন্দেহ করার মতো সঙ্গত কারণ আছে। টাকা-পয়সা নিয়ে কাড়াকাড়ি, পারস্পরিক হিংসা, হীনমন্যতা ও আত্মসর্বস্ব সঙ্কীর্ণ মনোভাব জাতীয় বিপ্লবের অগ্রগতির পক্ষে প্রবল বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।[৩৫] অথচ যাঁরা তাঁদের নির্দেশে বিদ্রোহে প্রাণ দিলেন তাঁরা তাঁদের নেতাদের চেয়েও মহান। ইতিহাসে এঁদের কোনো স্থান হয়নি। এঁদের সম্পর্কে গবেষণার প্রয়োজন আছে। কারণ এঁদের গৌরবময় ঐতিহ্য আমাদের সৈনিকদের মনে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় আনবে।

১৯১৮ সাল থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যবর্তী সময়ে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ভূমিকার বিষয়ে পরবর্তী কোনো সংখ্যায় আলোচনার আশা রইল।

৩৩। রাওলাট কমিশন রিপোর্ট। মহারাজের মন্তব্য।

৩৪। ডাঃ ভূপেন দত্ত, অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস, ২য় খণ্ড।

৩৫। German Micro Film documental record of German Foreign office. ডাঃ ভূপেন দত্ত, অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস, ২য় খণ্ড। ডাঃ অবিনাশ ভট্টাচার্য, ইউরোপে ভারতীয় বিপ্লবের সাধনা। M. N. Roy, Autobiography.

নিজের মুখোমুখি আমরা

অসিতকুমার ভট্টাচার্য

কেউ কেউ না খেয়ে রাত কাটায়, দীর্ঘদিন···
কেউ কেউ ভাঙা-গালে হাত দিয়ে বসে থাকে,
কেউ বা,
অকারণে রাস্তায় নিহত হয়।
কেউ কেউ জন্মেছে বলেই অপরাধী,
কারুর
চোখ তুলে তাকাবার অধিকার নেই।
এ সবই আমরা শুনেছি, ভুলেছি, শুনেছি
কতবার···
শুনি, ভুলি, শুনি, প্রতিদিন
উঠতে বসতে, রাস্তায় রেস্তোঁরায়
চা খেতে-খেতে, কাগজ-হাতে, অন্যমনস্ক
গল্পের ফাঁকে ফাঁকে,—দেখি, ভুলি, দেখি,—
কতবার—।
হঠাৎ সেই ম্রিয়মান ছায়াগুলি
কি করে অশ্বারোহণে ছুটে আসে!
চিরপলাতক শিখাগুলি—
প্রকাণ্ড কালো ঘোড়ার মতো। নাসারন্ধ্রে আগুন
স্ফুরিত নাসারন্ধ্রে
বিদ্যুৎ ক্ষুরধ্বনিতে; কঠিন ক্ষুরধ্বনিতে
বিদ্যুৎ—
আমরা অবাক!
এই সব রক্তমুখী বিশাল বর্শাগুলি,
কি করে এতকাল চোরকাঁটার মতো লুকিয়েছিল।
আয়নায় নিজের মুখ আর চিনতে পারি না
পরস্পরকে কি নামে ডাকব জানি না।

আর পরস্পরকে···।
নতুন চোখে দেখতে গিয়ে চোখ বুঁজি
কি বলব আমরা? কি ভাবব?
আমরা
জীবন্ত অস্বস্তি হয়ে জেগে থাকি॥

বুলেট

প্রভাকর মাঝি

সেয়ানা সংসারে থেকে বেধড়ক খাচ্ছিল ও মার,
শেখে নি বাঁচার বিদ্যে। এবং শতাব্দী নয় সতী।
ঘা দিয়ে, চিৎকার করে, যে যার আদায় করে দাবি,
মৃত্তিকায় মুখ থুবড়ে ও ভাবছিল : নিয়তি, নিয়তি।

আদ্যিকালের ভোঁতা চিন্তাগুলো চটকাতো কেবল,
জানতো না কালে কালে মত পথ জীবন বদ্‌লায়।
চকচকে তলোয়ার—বুদ্ধি নিয়ে দক্ষ খেলোয়াড়
নির্বোধ গাড়োলটার মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খায়।

কেঁচোর মতন এই কুঁকড়ে-বেঁচে-থাকা কোনোক্রমে
নিবতে গিয়ে জলে উঠতে ইচ্ছে নেই দাউ দাউ করে?
আসলে, নিজের ঘরে নিজেই ও ছিল পরবাসী—
জিরো আওয়ারের ঘণ্টি বেজে উঠলো একদা অন্তরে।

ধাক্কা খেতে খেতে, ঝোঁকে উঠলো মাথা—যা হচ্ছিল হেঁট
রুখে উঠতে দেখা গেল—কেঁচো নয়, ও আস্ত বুলেট।

'কুয়ো ভাডিস'

জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়

জীবন-অনীহা একি, মর্ষকাম ভাঙনে সোচ্চার?
নাকি কোন্ ফ্রয়ডিয় আদিপাপ-অপরাধ বোধ
ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে আত্মঘাতী, কুরুক্ষেত্রে পদসঞ্চার?
নাকি শুধু সর্ত্তাধীন পরাবর্ত্তে আশ্রিত, নির্বোধ,
শ্বাপদ, মনুষ্যেতর নখদন্ত বিকাশের ছল?
জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরাজিত মানব সন্তান
জীবনের কামনায় অনীহাকে করেছে সম্বল,

কার্য ও কারণ তার, মূল্যমান, কে করে সন্ধান?
তবু জানি, মানবজাতির প্রতি চরম বিশ্বাস
রবীন্দ্রনাথের কাছে সহজাত উত্তরাধিকার,
যা পেয়েছে সারা দেশ, সে বায়ুতে প্রাণের নিঃশ্বাস,
সে দীপ্তিতে আছে আলো, দূর হবে যাতে অন্ধকার।
সেই আলো, সেই হাওয়া, জীবনের সেই সার্থকতা
রয়েছে সমুখে, তবু তাকে ফেলে চলেছি এ কোথা?

স্বপ্ন-তোরণ

পরিমল চক্রবর্তী

তারপরেও অনেকক্ষণ তোমার স্মৃতি আমাকে ঘিরে
থাকলো···ছায়ার মতো···মায়ার মতো। আমি ভয়ে
ভয়ে পা বাড়ালাম হৃদয়ের সবুজ প্রান্তরের ওপর
দিয়ে পায়ে-হাঁটা সেই পথে, যে-পথটা থেকে থেকে
এঁকেবেঁকে মনের অরণ্যে এসে হারিয়ে গিয়েছে॥

কান্নার যে-খেইটা আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম একেবারে
কৈশোরের প্রান্তিক প্রহরে, সে-খেইটা আবার ফিরে
পেলাম যৌবনের ত্রিসীমায় পৌঁছেই ; অথচ, আশ্চর্য,
তার স্বরূপ বদলে গেলো ঋতুবদলের মতো। তবু, তবু
শেষ বিস্মরণের আগে, তোমার কথাই আবার মনে পড়লো
একবার···বারবার······বহুবার ॥

তখন আমি একা একা স্বপ্ন-তোরণে দাঁড়িয়ে ॥

কালের নায়ক

সরিৎ শর্মা

১

আমি অনেকবার শীর্ষবিন্দু দেখতে চেয়েছি
পাহাড়ের পাদদেশে শুয়ে—
অভ্রংলিহ কিনা···

অনেকবার দিগন্তের সীমান্ত দেখতে চেয়েছি
সৈকতে সমান্তরাল শুয়ে—
সমুদ্র দিগ্‌বলয়ান্ত কিনা···

আমি অনেকবার শব্দের তরঙ্গ ছুঁতে চেয়েছি
নৈঃশব্দের দেওয়ালে কান পেতে—
শব্দও অপার কিনা···

অনেকবার সময়কে মাপতে চেয়েছি
দিনপঞ্জি, ঘড়ির কাঁটায়—
অনাদ্যন্ত কিনা···

শূন্যতায়
অস্তিত্বের খণ্ডিত চেতনায়
চেতনায় বিচ্ছিন্ন ব্যর্থতায়
ব্যর্থতায় নিরন্ত ক্ষুদ্রতায়
ক্ষুদ্রতায় একান্ত দর্পণে
শূন্যতায়
স্ফুটমান পট তুমি মানুষের
সংহত অভিজ্ঞ ক্রম···সমগ্র অস্তিত্ব ক্রম···
পাহাড়ের চূড়োয় পাহাড়
সমুদ্রের পারে সমুদ্র
শব্দের ওপারে শব্দ
সময়ের অমিত সময়

২

অথচ সময় তুমি নির্যাতিত মৃত্যুর
সময় যুদ্ধ বিপ্লবের
সময় তুমি সুখ-শান্তির
সময় মানবিক মহা সৃষ্টির
মহা প্রেম, নবজাতকের···

৩

প্রেম···
আমার প্রতি মুহূর্তের পতনে তুমি
অংকুশ— প্রেমের মতন···
প্রতি মুহূর্তের মহিমায় তুমি
সূর্য—প্রেমের মতন···
যন্ত্রণার ব্যাখ্যা প্রিয় আনন্দের দিশারী
হৃৎপিণ্ডের শব্দ প্রিয় ভালোবাসার অভীপ্সা
তুমি প্রেম···

৪

হে আমার নিকট সুদূর
হে আমার অদেখা প্রত্যক্ষ
হে আমার অজানা বিজ্ঞান···
আমার সকল পথেই তোমার পদচিহ্ন ভবিষ্যৎ
পথের মোড়ে তোরণ দ্বারে তোমারই ছবি ভবিষ্যৎ
নিহত আমার রক্তে লেখা তোমারই শপথ ভবিষ্যৎ
সকল নামের অন্তরালে তোমারই নাম ভবিষ্যৎ
হে আমার বিরোধের কেন্দ্র
হে আমার মিলনের সমাধান
স্বদেশে বিদেশে সেতুবন্ধ···

৫

শোষণের ধ্রুব মৃত্যু ভ্রান্তির রাহুমুক্তি
শান্তির স্থির বিশ্বাস লক্ষ্যের শুভ যুক্তি
যুগজীবনের নিঃশ্বাস মহা বেদনার শুক্তি
মহা মানবতা নির্যাস চির দুর্মর আশা
তোমারই নাম বলব আগুন ও ভালোবাসা
পাহাড়ের চূড়োয় পাহাড়
সমুদ্রের···
কালের নায়ক তুমি
মানুষের
তুমি চিরদিন···
তোমারই উপমা তুমি
কমরেড লেনিন।

আজ যখন বাড়ি ফিরে আসতে চাই

কালীকৃষ্ণ গুহ

দীর্ঘদিন আমি পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছি, আজ যখন
বাড়ি ফিরে আসতে চাই
তখনই সমস্ত কথা মনে পড়ে, সমস্ত বিস্তীর্ণ পথ মনে পড়ে।

দীর্ঘদিন পথে পথে ঘুরে আমি একজন পাগলকে ঝুলি নামিয়ে
সারাক্ষণ খেলা করতে দেখেছি।

আমি যখনই তাকে বুঝতে চেষ্টা করেছি কাছে গিয়ে, খুব কাছে গিয়ে
তখনই সে কাঁধে ঝুলি নিয়ে কার্জন পার্কের উপর দিয়ে
হেঁটে গেছে।

আমি পথে পথে ঘুরে একজন নারীকে প্রার্থনা করতে দেখেছি
মধ্যরাত্রে, সূর্যোদয়ের কিছু আগে।
তার মুখে অন্ধকার, সূর্যোদয়ের আভা লেগে ছিলো।

আজ যখনই আমি বাড়ি ফিরে আসতে চাই, সেই পাগল
ঝুলিটা নামিয়ে রেখে গভীর ঘুমের মধ্যে ঢলে পড়ে

সেই নারী সন্তানের পাশে শুয়ে গভীর অঘোরে নিদ্রা যায়।

মায়ের কাছে, কবি

শঙ্করনাথ নাহা

নুন দিয়ে কি খাস তুই মা চিবোস কি চোখ বুঁজে
বুকের খিলে সুর আছে তোর? বয়স মাপার ফিতে?
ঢেউ তোলে কি তোর জমিনে সোনার ধানের গোছা
উজান জোয়ার সে বীজ রোয়ার মুখ ফেরে কোন ভিতে?

তোর স্নেহ মা ঘুমোয়, কাঁঠাল পাতায় ঢাকা মুখ—
অন্তঃশীলায় জর, প্রলয়ের বাতাস বণ্টি সাজে,
খায় কুরে হায় মৃত্যুকীটে ছেলেমেয়ের বুক
তবু শ্যামল ঘাসের জিহ্বা জলে সবুজ আঁচে।

ফাটা মাঠের আলে ঘুড়ি ওড়ায় ন্যাংটো খোকা
স্বপ্নসুতোয় সুর বেঁধে সুখ অসুখে কাঁধ মেলে
সতীন শোনায় গল্প, মৃত্যুদূত যেন ঘুণপোকা
আউল বাউল বাতাস উদোম মাঠের ধুলো খেলে।

বছর বছর কার্তিকমাস, বেহুলা আঁতুড় ঘরে
হায়না হানায় আমন মাঠে রক্তচোঁয়া ফাঁসি
সিঁদুর বিকেল, নিকোনো দাওয়া, সিঁদুর মোছা সতী
জোৎস্না যেন রায়বাহাদুর-পাকাগোঁফের হাসি।

ক্রমশ দ্বন্দ্বের হাতে

অলককুমার চৌধুরী

ক্রমশ দ্বন্দ্বের হাতে নিজেকে অর্পণ কোরে
নিরুপায় আমি,—
বলিষ্ঠ লাঙল কাঁধে আত্মস্থ কৃষক
নির্বিকার মেঠো হাওয়া—
দেয়ালের ছবি ;
ক্রমাগত ভিতর বাহির আর বাহির ভিতর
বারংবার আত্মপর আবার উদার ;
ঘটনার অমোঘ চক্রান্তে—
স্থিতপ্রজ্ঞ প্রসন্ন নাবিক
জলের মতন জল—
স্বপ্নিল বিভ্রম !

নীলনদীর প্রতি

[ইউসুফ আল্ সেবাই-কে]

জঁ। ব্রিয়েররি (সেনেগাল)

রজস্বলা, তোমার বিপুল হরিৎ রজঃস্রাবে
ক্রমশ কঠিন কাদা গ্রানিট-ব্যাসল্ট-ঝামাপাথরে পাথরে
গড়ে তোলে প্রকাণ্ড সবল ইমারত।
দ্বিলিঙ্গ হার্‌মাফ্রোদিতে—আফ্রোদিতে সন্তান যার—
তোমার বিশাল গর্ভ গর্ভাধান ও প্রজননের
উপযোগী,
দেবতা আর মানুষের বাসন্তিক বিবাহ
আর বদ্বীপ-ভূমির উপর দিয়ে বয়ে গেল ঢেউয়ের পর ঢেউ
এক জাতিপ্রবাহ : বস্তুকে স্বপ্নের আয়তন দিতে,
নগণ্য বালুকণায় খোদাই করতে
মহাজগতের প্রপঞ্চময় ছন্দ
হিসাব মেলায় যে,
অটুট রাখতে গণিত-সংখ্যার
পবিত্র আদি শব্দার্থ, জালি-কাজ আর সূক্ষ্মাগ্র খিলানের
পুষ্পময় প্রতীক তাদের।
সমুদ্র-দেবতার হাতে প্রথম দাঁড় তুলে দিলে তুমিই
কবরের দেশে-দেশে শোনাতে তোমার কীর্তিকথা।
আস্ওয়ান-গিরিগুহার মুখ দিলে খুলে।
খনি থেকে কেটে তুলল পাথর
তোমার ঢেউ, গড়ে তুলল
অ্যাকেশিয়া সিক্যামর আর তালীবনে
মৃদু হাতে নিপুণ পালিশ-করা অকলঙ্ক সব সৌধ।
কী-সব সৌধ!
আহ্, আকাশে মাথা তুলে ওরা হলো প্রেমের প্রহরী, মৃত্যুত্তীর্ণ,

একা প্রত্যয়ের উত্তাপে জোড় মিলিয়ে
ভিত্তি আর চূড়ার মধ্যে রচনা করল সূক্ষ্ম সমন্বয়।
খাঅপ্‌স, খাফ্রা, মাইসেরিনাস—
নাম, নাম, এরা সব ঘোষণা করে তোমার মহত্ত্ব।
ওই উর্মিমালা থেকে লহরে লহর তুলে জন্ম নিল এই জাতি,
মৃত্যুকে কবর দিতে ইথিওপিয়া থেকে মর্মর-ফলক বয়ে আনল
যে মানুষ-পিঁপড়ে,
যন্ত্রণার পূতিগন্ধ থেকে মুক্তি দিতে আত্মাকে
আকাশ আর অনন্তের অভিমুখ এক তীর্থপথের ধারে ধারে
শুভ্র সঙ্কেতের চিহ্ন রাখল উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে ;
যেদিন থেকে আছ তুমি, সেদিন থেকে মৃত্যু নেই এই জাতির।
নামহারা এই জনতা
যার কথা বলে না কেউ,
সৈন্যদল যার
সযত্নরক্ষিত, আরকে-ভেজানো নয়,
মরুদেশে বিস্মৃতির বালুতলে শুয়ে,
ওরা আজ ফিরে এল তোমার সকাশে—
হে মাতা, হে প্রজ্ঞা-পারঙ্গমা,
অগ্নির হে পালয়িত্রী,
অগণ্য দেবতা আর ভাস্করের জন্মদাত্রী মাতা,
পরিচ্ছন্ন গর্ভ তোমার স্নেহার্দ্র আলিঙ্গন।
দৃঢ় ও সুস্থির
মাটির উপরিতলে এখন তোমার শয্যাসুখ।
আগ্রাসনের পিছনেই আছে তোমার ফলফুলদান।
জলদান কর তুমি পিরামিডের পাথুরে শিকড়ে
আদিম রসধারার অন্তহীন আস্রবণে
যেন অব্যাহত রাখতে পারে পিরামিড-সারি, অটুট
বাতাসের সঙ্গে, বালু আর নক্ষত্রের সঙ্গে
অচলিত বিশ্বাসের সৌন্দর্যচিহ্নিত তাদের
সহস্র বৎসরের কথোপকথন।

তুমি-যে একই সঙ্গে সাগর আর ভেলা
জীবন আর মৃত্যু।
মাস্‌তাবাস স্ফিংকস আর পিরামিড-সারি
তোমার সবুজ দৃষ্টিপথেই ওরা অমর মনোহারি
জলে তোমার ছায়া ফেলে উৎরে যায় মহত্ত্বের সীমানায়—
কারণ তুমিই কেবল চিরস্থায়ী
আদিঅন্তহীন তুমি।
মানবতার কোনো আস্ফালন
সমকক্ষ নয় তোমার।
যেদিন থেকে দেখেছি তোমার বহতা জলধারা
আকাশ আর স্মারক প্রস্তরসৌধ প্রক্ষালন করে চলেছে,
আগের চেয়ে অনেক অনেক তীব্র প্রবল অবজ্ঞায়
ততদিন অভিভূত আমি ঘৃণার অনুভব রাখি ঠোঁটে—
যারা তোমায় লুণ্ঠন করল
তোমার প্রস্তরদৈত্যের মুখমণ্ডল করে দিল বিক্ষত
মমিদের অন্ত্র টেনে বের করল, অপবিত্র করল তোমার মন্দির
তাদের প্রতি—
যাদের তুমি বাধা দিচ্ছ প্রতিদিন বালুঝড়-তোলা বাতাসে
তোমার খনিজ নৈঃশব্দ্য নিয়ে, অতলস্পর্শ-দৃষ্টি নিয়ে স্ফিংক্সের।

অনুবাদ—মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

পুস্তক-পরিচয়

গান্ধী-রম্যাঁ রলাঁর দৃষ্টিতে। রম্যা রলাঁ। অনুবাদক লোকনাথ ভট্টাচার্য। সাহিত্য অকাদেমী।
মূল্য আট টাকা

গান্ধী-জন্মশতবার্ষিকীর বৎসরে সাহিত্য অকাদেমী প্রকাশিত রম্যাঁ রলাঁর গান্ধী-সম্বন্ধীয় এই বইখানি গান্ধী-সাহিত্যে একখানি উল্লেখযোগ্য অবদান। বইখানি বিশিষ্ট আরও এ-কারণে যে, এটি ইংরেজী ভাষার হাত-ফেরতা হয়ে বাঙলা ভাষায় আসেনি, যা অধিকাংশ তথাকথিত কঁতিনেতাঁল বইয়েরই বাঙলা তর্জমার বেলায় ঘটে থাকে; এ সরাসরি মূল ফরাসী ভাষা থেকে বাঙলায় অনূদিত হয়েছে। অনুবাদ করেছেন ডক্টর লোকনাথ ভট্টাচার্য, যাঁর কবিখ্যাতির উপরেও ফরাসী ভাষায় অধিকার সুবিদিত। ডক্টর ভট্টাচার্য রম্যাঁ রলাঁর গান্ধী-বিষয়ক চিন্তাধারাকে বাঙলা ভাষাভাষী পাঠকদের সামনে উপস্থাপিত করে তাঁদের গান্ধী-চিন্তার দিগন্তকে বিস্তৃততর করতে সহায়তা করেছেন। এজন্য তিনি এবং তাঁর বইয়ের প্রকাশক সাহিত্য অকাদেমী সবিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

বিশ্ববিশ্রুত লেখক রম্যাঁ রলাঁর ভারত-অনুরাগ দুটি ধারায় প্রবাহিত দেখতে পাই। এর একদিকে আছে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-শিবানন্দ প্রমুখ অধ্যাত্ম সাধকদের সাধনার আদর্শের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, অন্যদিকে রয়েছে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে চালিত ভারতের জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের অহিংস সত্যাগ্রহের কলাকৌশলের প্রতি নিবিড় অনুরাগ। এবং এই দুই প্রান্তীয় অনুরাগের মধ্যবর্তী স্তরে রয়েছে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদী কাব্যাদর্শের প্রতি একজন মুখ্যত মানবতাবাদী লেখকরূপে রলাঁর সমপ্রাণতার অনুভূতি।

কিন্তু রলাঁর এই ভারত-দর্শনের কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল, যা সচরাচর আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়। সেটি হচ্ছে, রলাঁর ভারত-সম্বন্ধীয় চিন্তাধারা বিবর্তনের চিহ্নাক্রান্ত, তা পূর্বাপর এক জায়গায় স্থাণুবৎ অচল ছিল না। উল্লিখিত দিকপাল ভারত-পুরুষদের মধ্যে যাঁরা তাঁর সময়ে জীবিত ছিলেন তাঁদের সম্পর্কে রলাঁর সশ্রদ্ধ মনোভাব অবস্থান্তর অনুযায়ী বর্ধিত বা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে,

যদিও মূল শ্রদ্ধার অনুভূতিতে কখনও চিড় ধরেনি। রলাঁর চিন্তার এই বিবর্তনমুখী প্রবণতা যদি আমরা ভুলে যাই এবং তাঁকে একজন নিঃসর্ত ভারতপ্রেমিক এবং 'তিনি আমাদেরই একজন' মনে করে তাঁকে বগলদাবা করবার আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে উঠি, তাহলে রলাঁর প্রতি সুস্পষ্ট অবিচার করব।

রমাঁ্যা রলাঁ একজন আশ্চর্য মানসিকতার মানুষ। একদিকে তিনি আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের প্রতি গভীর প্রত্যয়শীল, অন্যদিকে তিনি বিশ্বের নিপীড়িত ও শোষিত মানুষদের প্রকৃত বন্ধু। আধ্যাত্মিকতা ও সাম্যবাদের মধ্যে সমন্বয় অতি কঠিন স্তরের সাধনা, এমন সাধনার দৃষ্টান্ত এদেশে বা বিদেশে কোথাও তেমন দেখা যায় না; সেই সাধনায় সিদ্ধিলাভেরই একটি বিরল উদাহরণ হলেন রমাঁ্যা রলাঁ।

অন্য ভারত-মনীষীদের প্রসঙ্গ এখন থাকুক, গান্ধীজি সম্পর্কে রলাঁর ভাবনা চিন্তার মূল্যায়নের বেলাতেও আমাদের উপরের পটভূমিটি সর্বদা স্মরণ রাখা কর্তব্য। আমরা যখন গান্ধীজির অহিংস অসহযোগের কার্যক্রমের মাহাত্ম্য কীর্তনকারী রলাঁর ভূমিকা স্মরণ করব, সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এ-কথাও স্মরণ রাখা আবশ্যক যে এই রলাঁই বাস্তিল কারাগারের পতনের ঘটনার ভিত্তির উপরে রচিত '১৪ই জুলাই' নামক অবিস্মরণীয় নাটকের স্রষ্টা; সাম্যবাদী প্রত্যয়ের প্রতি আনুগত্যের দলিল রূপে পরিগণিত 'আই উইল নট রেস্ট' বইয়ের লেখক; সোভিয়েট বিপ্লবের উদ্গাতার ও সোভিয়েট রাষ্ট্রের সুহৃৎ; অপিচ শিল্পী-সাহিত্যিককুলের ভিতর ফ্যাসীবাদের সবচেয়ে বলিষ্ঠ আর সবচেয়ে নির্মম সমালোচক। রলাঁকে আমরা গেরুয়া পরিয়ে যতোই কেন-না ভারতবন্ধু সাজাই আর তা থেকে আত্মপ্রসাদ লাভের চেষ্টা করি, এ-সত্য বিস্মৃত হলে আমরা খণ্ডদৃষ্টির দোষে দোষী হব যে, রলাঁ আসলে ছিলেন ফরাসী বিপ্লবের মানস-সন্তান, ইউরোপের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী শিল্প-ঐতিহ্যে লালিত, সর্বস্তরের অন্যায় ও অবিচারের আপসহীন প্রতিবাদী, কায়েমী স্বার্থের ধ্বজাবহনকারী শাসকশ্রেণীর অকৃত্রিম শত্রু। রলাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'জাঁ-ক্রিসতফ' কখনই রচিত হতে পারত না, যদি-না তাঁর শিল্পী-মানসে এইসকল বিভিন্ন ভাবের উপাদান সমন্বিত হতো।

তবে কি গান্ধীজির অহিংসাকে রলাঁ যখন প্রশস্তি করেছেন, তিনি নিজের প্রতি অসত্যাচরণ করেছেন? মোটেই তা নয়। বর্তমান গ্রন্থের ডায়েরী

অংশের পাতা উল্টোলেই দেখা যাবে, রল‍ঁা একাধিক জায়গায় অহিংসাকে মানুষের মুক্তি অর্জনের বিকল্প দুটি পথের ভিতর অন্যতর পথরূপে অভিহিত করেছেন কিন্তু একমাত্র পথ কোথাও বলেননি। এ-বিষয়টি নিয়ে পরে আরও আলোচনা করার অবকাশ হবে, সুতরাং আপাতত বিষয়ান্তরে যাই।

সমালোচ্য গ্রন্থখানির দুটি অংশ: এক, 'মহাত্মা গান্ধী' নামক রল‍ঁার ১৯২৪ সালে প্রকাশিত নাতিক্ষুদ্র প্রসিদ্ধ গ্রন্থ; দুই, ১৯৩১ থেকে ১৯৩৫ সালের মধ্যে লিখিত রল‍ঁার ডায়েরীর গান্ধী-সংক্রান্ত অনুচ্ছেদগুলির সঙ্কলন। প্রথম গ্রন্থখানি বহুল পঠিত। মূল ফরাসী থেকে ক্যাথারিন ড গ্রথ ইংরেজিতে এর অনুবাদ করেন। তার শ্রীঋষি দাস কৃত বাঙলা তর্জমা অনেক দিন যাবৎ বাঙলাদেশে প্রচলিত। কিন্তু অন্য অংশটি অর্থাৎ 'ডায়েরী' অংশটি একেবারেই নতুন, এটি রল‍ঁার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত 'আঁদ' (Ind) নামক ভারত-সম্বন্ধীয় জার্নালধর্মী গ্রন্থের অঙ্গবিশেষ যা কেবলমাত্র গান্ধীর কথায় পূর্ণ। বলা আবশ্যক, 'আঁদ'-এর এখন পর্যন্ত ইংরেজি তর্জমা হয়নি, এবং বাঙলাতে এর গান্ধী-সম্বন্ধীয় অংশের এই প্রথম তর্জমা। ইতঃপূর্বে শ্রীপ্রমোদ সেনগুপ্ত এর কিছু কিছু অংশের বাঙলা তর্জমা করেছেন বটে, কিন্তু তা এখনও গ্রন্থাকারে প্রকাশ হয়নি।

রল‍ঁার 'মহাত্মা গান্ধী' বইটি ছেচল্লিশ বৎসর যাবৎ বর্তমান এবং তা এত ব্যাপকভাবে পঠিত ও আলোচিত যে, আমরা বর্তমান আলোচনার পরিসর থেকে তার প্রসঙ্গ বাদ দেব। আমাদের মনোযোগ শুদ্ধমাত্র 'ডায়েরী' অংশেই কেন্দ্রভূত হবে। যে চিন্তার বিবর্তন রল‍ঁার মানস-বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করেছি, তার ছাপ ডায়েরীর পাতায় পাতায়। 'মহাত্মা গান্ধী' বইতেও যে প্রশ্নের তর্জনী উদ্যত হয়ে নেই এমন নয় কিন্তু 'ডায়েরী'তেই যেন সমালোচনা তীক্ষ্ণ আর গান্ধী-আদর্শকে নতুন করে মূল্যায়নের প্রয়োজন খরতর হয়ে উঠেছে। বিশের দশকে রল‍ঁার গান্ধী-মনস্কতা যেখানে ছিল, তিরিশের দশকের প্রথম চার বছরে তা যেন সেখান থেকে বেশ কিছু দূরে সরে এসেছে এবং ইতোমধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীরও যেন স্পষ্ট বদল হয়েছে। আমরা দেখতে পাই আধ্যাত্মিক ও নৈতিক সত্তাকে পেছনে ফেলে রেখে রল‍ঁার জনদরদী সত্তা ও নির্যাতিত শ্রেণীর প্রতি সমবেদনা ক্রমশঃ অধিক মাত্রায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে এবং তাঁকে সমাজতন্ত্রী মানবতাবাদ অথবা মানবতন্ত্রী সমাজবাদ—যে নামেই এই আদর্শের বর্ণনা করি-না-কেন তার দিকে তাঁকে সুনিশ্চিতভাবে

ঠেলে দিচ্ছে। গ্রন্থের 'ডায়েরী' অংশ সেই ঝোঁক-বদলেরই একটি অসংশয় দলিল।

দলিলটি এখানেই সম্পূর্ণ নয়, তার আরও অনুচ্ছেদ আছে, যেগুলি পরবর্তী বৎসরগুলির রোজ-নামচার অন্তর্গত। সেখানে অহিংসা সম্পর্কে মোহভঙ্গ প্রায় সম্পূর্ণ বললে চলে (শ্রীপ্রমোদ সেনগুপ্ত এ-রকম কিছু কিছু অংশের অনুবাদ করেছেন এবং যতদূর আমার স্মরণ হয়, ডঃ লোকনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ও এইরকম একটি-কি-তুটি অংশের অনুবাদ প্রকাশ করেছেন), কিন্তু বোধগম্য কারণেই সেই সকল অনুচ্ছেদ এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি। এই গ্রন্থ গান্ধী-শতাব্দী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত শ্রদ্ধার অঞ্জলি। যতটা সমালোচনা এই গ্রন্থের পরিসরের মধ্যে আছে তা-ই নিরপেক্ষ বিচারণার পক্ষে যথেষ্ট, বইয়ের ওপরে আরও বেশি সমালোচনার ভর সওয়াতে গেলে সমালোচনা তেতো হয়ে যেত এবং শ্রদ্ধার অভিষেকের নামে মহাত্মাজির পুণ্যস্মৃতির প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করা হতো। তা অনুবাদক বা প্রকাশক করতে পারেন না। আর, তা-ই ডায়েরী-র নিরপেক্ষ গান্ধী-ভাষ্য 'দাস ফার অ্যাণ্ড নো ফার্দার'-এর সীমানায় এসে ঠেকেছে। অনুবাদক ও প্রকাশকের এই আত্ম-আরোপিত সংযম সুসংগত হয়েছে।

গান্ধীজির অহিংসা, অছিবাদ, ধনিকশ্রেণীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদি সম্পর্কে উত্তরোত্তর বর্ধমান সপ্রশ্ন মনোভাব সত্ত্বেও মহাত্মা গান্ধীর যেটা বিশুদ্ধ ব্যক্তিত্ব—মতামতের ভিন্নতা ও সাময়িক আচরণাদির বৈসাদৃশ্যের দ্বারা যা মলিন নয়—তাঁর প্রতি রলাঁর সম্ভ্রম যে কত গভীর ছিল, এই ডায়েরীর একাধিক জায়গায় তার অকুণ্ঠ অভিব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯৩২ সালের অক্টোবর মাসে জেনিভায় মিসেস এইচ. এস. কাজিনস্ এবং রেভারেণ্ড সি. এফ. এণ্ড্রুজের উদ্যোগে গান্ধীজি প্রবর্তিত ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সাফল্য কামনা করে যে 'আন্তর্জাতিক দিবস' পালিত হয় তাতে রলাঁ যে-বাণী পাঠান তার একাংশ নিম্নরূপ :

"ভারতের যীশুখৃষ্ট…অহিংসার মহাত্মা, সত্যাগ্রহের ঋষি ও বীর গান্ধী। জগতের এক নিকৃষ্ট যুগে তাঁর আবির্ভাব। এলেন এমন এক সময় যখন যা-কিছু নীতি এতদিন পাশ্চাত্য সভ্যতাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল, তা নষ্ট হয়েছে। ইউরোপের পা আজ টলমল করছে, পাশবিক হিংসার চিরাচরিত বৃত্তিতে আজ তা আত্মসমর্পণ করেছে, উন্নত বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত

মারণাস্ত্রে সে ধ্বংসমুখি হয়েছে। আজ যখন চার বছরের এক ভয়ানক যুদ্ধ সবে সমাপ্ত এবং আগামীকালে সম্ভাবনা একটা নয়, দশটা সম্মিলিত যুদ্ধের—যার ফলে নিরপেক্ষ রাষ্ট্র আর একটিও টিকে থাকবে না—এই দুই ভয়াবহ সত্যের মধ্যিখানে ভারতের দুর্বলশরীর ঋষি এসে হাজির, বসেছেন তিনি দ্বিতীয় বুদ্ধের মতো। সর্বব্যাপী মানবতাগ্রাসী কোন লোহিত সমুদ্রের দুটি মধ্যবর্তী সঙ্কীর্ণ স্থানে যেন তিনি রয়েছেন। তিনি একাকী, তাঁর গ্রহণ না করার নীতিতে আমরণ দৃঢ় ও প্রশান্ত—পাশবিক শক্তিকে তিনি বাধ্য করেছেন তাঁকে সমীহ করতে। এই যুদ্ধের আমরণ অনশনের প্রতিজ্ঞার (তদানীন্তন ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের ঘোষিত 'কম্যুনাল অ্যাওয়ার্ড' বা সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার উদ্দেশ্যে গান্ধীজি যারবেদা জেলে যে ঐতিহাসিক অনশন করেন, সেই অনশন) দৃপ্ততম সাম্রাজ্যও ভয়ে নতজানু—বহু বছরের যুদ্ধ যে-জয়ে সফল হয়নি, এই একটিমাত্র অনশনে তা অর্জিত।…এই প্রথমবার ইউরোপের সামনে দৃষ্টান্ত তুলে ধরলেন সেই নতুন সেণ্ট টমাস যাঁর একমাত্র বিশ্বাস শুধু অর্জনেই, এবং যে গৌরবজনক দৃষ্টান্তটির নামকরণ গান্ধী নিজেই করলেন 'আত্মত্যাগের তরবারি।' ইত্যাদি (পৃষ্ঠা ২৩৬-৩৭)

ওই 'আন্তর্জাতিক দিবস' পালন উপলক্ষ্যেই ডক্টর এ্যালবার্ট শভাইটজারকে লেখা এক চিঠিতে রলাঁ লিখছেন— "গান্ধী নিয়ে প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন ভারত নিয়েও নয়। কিন্তু যে উদ্দেশ্য গান্ধী নিজের মধ্যে মূর্ত করেছেন ও যার জয় বা ধ্বংসের উপর ইউরোপের নিয়তি আগামী এক শতাব্দী বা তারও বেশি কাল ধরে নির্ভর করবে, প্রশ্ন সেই অহিংসাকে নিয়ে।… জানি ইহুদী এক বিচারকর্তার দ্বারা অনুপ্রেরিত এই-যে বীরত্বপূর্ণ ও ধৈর্যসম্পন্ন পরীক্ষাটি চালিয়েছে গোটা একটা জাত, একমাত্র সেইটেই এতদিনের সঞ্চিত প্রকাণ্ড হিংসাশক্তিকে ঠেকানোর এমন এক শেষ বাঁধ যার জুড়ি নেই। কারণ একমাত্র সেই কার্যকরী অস্ত্রেরই শক্তি আছে ঘৃণা ব্যতীত সামাজিক রূপান্তর সাধনের, অথবা আরো ভালো এমন এক হঠাৎ পরিবর্তন আনার যা যেমন জরুরী তেমনি ভয়ঙ্কর। গান্ধী না থাকলে হিংসার বন্যায় সারা জগৎ প্লাবিত হবে" (পৃষ্ঠা ২৩৪)।

এই গেল শ্রদ্ধা-সম্ভ্রমের অভিব্যক্তির সাক্ষ্য, আবার এর পিঠে সমালোচনার সুরও স্পষ্ট শ্রুতিগম্য। সমীহ আর সমীহহীনতায় আন্দোলিত ও মথিত রলাঁর অন্তরটি কী নির্ভুলভাবেই না ধরা পড়েছে নিচের লাইন কটিতে—"পাঁচটা

বাজতে না বাজতেই গান্ধী এসে হাজির হলেন আমার কাছে। কিন্তু আমি একটু ক্লান্ত বোধ করছিলাম, এবং এটাও স্বীকার করব, সেদিন আমার মনে হচ্ছিল গান্ধীর পথ নানান ব্যাপারে আমার থেকে এত ভিন্ন এবং সে-পথ ইতিমধ্যে এত পরিষ্কারভাবে তিনি তৈরি করে রেখেছেন যে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করার কিছু হয়তো নেই আমার। দুজনেই জানি যে ঠিক কোথায় যাচ্ছি—এবং গান্ধীর পথ নির্ভুল যেমন তাঁর পক্ষে, তেমনি তাঁর অনুসরণ-কারীদের পক্ষে, আর সেটা তাই থাক, আমিও তা চাই। তাঁকে শ্রদ্ধা করি, ভালোবাসি। কিন্তু আমরা পরস্পর পরস্পরকে কী বলতে পারি, ইত্যাদি।" (পৃষ্ঠা ১৬৪-৬৫)

ডায়েরীর অন্য একটি অংশে সেলার এ্যাডিসন নামক জনৈক ইংরেজ ভারতপ্রেমীকে লেখা রলাঁর চিঠির একাংশ এইরূপ "...ভারতের সত্যাগ্রহের পরীক্ষা এক শেষ সুযোগ নিয়ে এসেছে। একমাত্র এই পরীক্ষাতেই হিংসা ব্যতীত মনুষ্যসমাজের রূপান্তর সম্ভব। এ-পরীক্ষা যদি ব্যর্থ হয়, যদি তাকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের হিংসা একদিন ধ্বংস করে অথবা ভারত যদি নিজেই তাকে গ্রহণ করতে সমর্থ না হয়, তাহলে হিংসা ব্যতীত মানুষের ইতিহাসে আর কোনো সমাধানই থাকবে না, এবং একমাত্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যই তখন সে-হিংসার পথ নির্ধারিত করে দেবে। **হয় গান্ধী, নয় লেনিন—যাই ঘটুক না কেন, সামাজিক ন্যায়কে জয়যুক্ত করতেই হবে।**" (পৃষ্ঠা ২১২-১৩)

এছাড়া, ডায়েরীর ১৯৩৪ সালের এপ্রিলের একটি ভুক্তি (entry) এইরূপ : ফাদার সেরেজোল-এর হাত দিয়ে গান্ধীজিকে লেখা একখানা চিঠিতে রলাঁ লিখছেন—"সত্যাগ্রহের যে-মহান পরীক্ষা আপনি করছেন, ও যার ফলাফল আজো অনিশ্চিত, আশা করি ভারতের পক্ষে তার জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। কিন্তু বর্তমান ইউরোপে তার সফল হওয়ার এতটুকু আশাও নেই।... অহিংস যারা, নিক তারা অহিংসার অস্ত্র—অন্যেরা নিক সশস্ত্র যুদ্ধের পথ। কিছুতেই নিষ্ক্রিয় থাকা চলবে না। পাপকে গ্রহণ করা বা তাতে অভ্যস্ত হওয়া, তা সম্ভব নয়, না আপনার পক্ষে, না আমার পক্ষে। আপনি যুদ্ধ চালান সত্যাগ্রহের মাধ্যমে, প্রোলেটেরিয়ান বিপ্লবের রয়েছে অন্য অস্ত্র। কিন্তু যুদ্ধটা একই যদিও তার কর্মক্ষেত্র দুটি আলাদা।" (পৃষ্ঠা ২৪৬, ২৪৯)

অন্য একটি ভুক্তির বয়ান এইরূপ : "যদি অপর্যাপ্ত ও নঙর্থক ফল সত্ত্বেও তিনি (গান্ধী) সেই নীতি (অহিংসা নীতি) একগুঁয়ের মত ধরে বসে থাকেন,

অথবা যদি বিশেষ করে মূলধন ও শ্রমের অনিবার্য সংঘাতে তিনি বিনাশর্তে ও স্বতপ্রণোদিতভাবে শ্রমের পক্ষ না নেন তো তাঁর বিরুদ্ধে যেতে-হয়-তো হোক, আমি শ্রমের পক্ষই নেব। এ-কথা আমি কোনোদিন গোপন করিনি।" (পৃষ্ঠা ২৫৮)

১৯৩৫ সালের এপ্রিলে স্থভাষচন্দ্র রলাঁর সঙ্গে দেখা করেন। তাঁদের মধ্যে যে-আলোচনা হয় তার একটা প্রতিলিপি তৈরি করে স্থভাষচন্দ্র রলাঁর কাছে সেটি অনুমোদনের জন্য পাঠান। ওই সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে রলাঁ ডায়েরীতে লিখছেন—"দুর্ভাগ্যক্রমে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব যদি হয়ই একদিন, যার ফলে গান্ধী (অথবা অন্য কোনো পার্টি) শ্রমিক-মজতুরদের স্বার্থের বিরুদ্ধে যান, বিরোধিতা করেন তাদের সমাজবাদী আন্দোলনের প্রয়োজনীয় বিবর্তনের, অথবা যদি তখন গান্ধী (বা অন্য কোনো পার্টি) তাদের প্রতি নিরাসক্ত হয়ে দূরে সরে যান তো তা সত্ত্বেও আমি চিরকালই থাকব শ্রমশক্তির পক্ষে, যুক্ত থাকব তাদের সংগ্রাম ও প্রচেষ্টার সঙ্গে: কারণ তাদের দিকেই রয়েছে সত্যকারের ন্যায়, মনুষ্য সমাজের আবশ্যক অগ্রগতির ন্যায়সঙ্গত রীতিও তাদের স্বপক্ষে···**অহিংসা অনেক পথের একটিমাত্র, বহু প্রস্তাবের একটি, ও আজও তা পরীক্ষাধীন**।" (পৃষ্ঠা ২৬১-৬২)

রলাঁর ডায়েরীর উদ্ধৃতিসমূহ একটু বিশদভাবেই এখানে দেখালাম পাঠকের কাছে তাঁর চিন্তার বিবর্তনের ছাঁচটি স্পষ্ট তুলে ধরবার জন্য। হিংসা ও অহিংসার প্রশ্নটি বিপ্লবীদের কাছে একটি মৌল প্রশ্ন, এই প্রশ্নে রলাঁর চিন্তাধারা কোন্ পথ বেয়ে অগ্রসর হয়েছে তা আশা করি উদ্ধৃতিগুলিতে স্থপরিস্ফুট হয়েছে। রলাঁর গান্ধী-অনুরাগ গভীর কিন্তু নিঃশর্ত নয়। ধনিক ও শ্রমিকের স্বার্থ-সংঘাতের প্রশ্নে রলাঁর সহানুভূতি স্পষ্টতই শ্রমিকশ্রেণীর দিকে।

১৯৩১ সালে বিলেতে গোলটেবিল বৈঠক সেরে গান্ধীজি স্থইজারল্যাণ্ডের ভিল-নভে রলাঁর সঙ্গে দেখা করে ইতালী হয়ে ভারতে ফেরেন। গান্ধীজির ইতালী সফর ও তদুপলক্ষ্যে মুসোলিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিভিন্ন প্রত্যক্ষদর্শী প্রদত্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ ডায়েরীতে সঙ্কলিত আছে। এখানে সে-সব বৃত্তান্তের আভাস দেওয়ার প্রয়োজন নেই, শুধু একটি বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। সেটি এই যে, গান্ধীজি যাতে আতিথেয়তায় বিমুগ্ধ হয়ে মুসোলিনীর সযত্নরচিত প্রচারের ফাঁদে পা না দেন তার জন্য রলাঁর অন্তহীন ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে ডায়েরীর অংশটিতে। কী অপরিসীম ধৈর্যেই না তিনি এই

সংক্রান্ত তাবৎ খুঁটিনাটি রোজনামচার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তুচ্ছতম ঘটনার বা বস্তুটির প্রতিও রমঁ্যা রলাঁর কী সুতীক্ষ্ণ মনোযোগ! আমাদের দেশের কোনো ডায়েরীকার হলে এমনতরো ঘটনাদি লিপিবদ্ধ করবার ক্ষেত্রে অর্ধপথে এলিয়ে পড়তেন। একেই বলে ফরাসী খুঁটিনাটিপরায়ণতা, একেই বলে জার্মান thoroughness, দুই-দেশের যে সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যদ্বয়ের সমন্বয় রলাঁর লেখক-ব্যক্তিত্বের ভিতর বিধিমত সাধিত হয়েছিল।

মুসোলিনীর ফাঁদে পা দেওয়ার বিপদ সম্পর্কে দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ রলাঁর এই প্রথম নয়। ইতঃপূর্বে রবীন্দ্রনাথের ইতালী ভ্রমণের সূত্রেও তাঁর একই প্রকার আকুলতা আমরা লক্ষ্য করেছি। এবং আমরা সেই সময় দেখেছি, রলাঁর রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে উদ্বেগ ভিত্তিহীন ছিল না। রবীন্দ্রনাথ ফাসিস্ত শাসনের স্বরূপ ও মুসোলিনীর দুরভিসন্ধি প্রথমটা ধরতে পারেননি, রলাঁই কবির চোখ ফুটিয়ে দেন। কতকটা অপ্রাসঙ্গিক হলেও এইখানে বলি, যে ইতালী সফরের ব্যাপারটিকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ ও রলাঁর মধ্যে প্রাথমিক যে দৃষ্টি-ভিন্নতা দেখা দিয়েছিল সে সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বিশ্বভারতীর জনৈক অধ্যাপক-লেখক 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত এক সাম্প্রতিক ধারাবাহিক নিবন্ধে একতরফা রবীন্দ্রনাথের পক্ষ সমর্থন ও রলাঁর কটূক্তি করেছেন। আমরা বলি কি ; এ-সব জটিল রাজনৈতিক বিতর্কের পক্ষাপক্ষ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বিশ্বভারতীর বেতনভুক অধ্যাপকটির মতো একতরফা ঢালাও রায় দেওয়া মোটেই নিরাপদ কাজ নয়। 'যাঁর নুন খাই তাঁর গুণ গাই'—এই নীতিটি আমাদের এই কর্তাভজা দেশে খুব চালু নীতি বটে, কিন্তু ওর দ্বারা সত্যনির্ণয়ে কোনো সহায়তা হয় না, সেটা সংশ্লিষ্ট সকলেরই জানা ও বোঝা আবশ্যক। অধ্যাপক-লেখক মহাশয় যদি মনে করে থাকেন যে তিনি রলাঁর বিরুদ্ধে কটুবাক্য প্রয়োগ করে রবীন্দ্রনাথের মহিমাবৃদ্ধির সহায়তা করেছেন তবে তিনি মস্ত ভুল করেছেন।

ডায়েরীর আর একটি চিত্তাকর্ষক অংশ হলো প্রিভা-দম্পতির ভারত-সফরের বিবরণ যা ডায়েরীতে গ্রথিত হয়েছে, সেখানেও আমরা গান্ধীজি, তাঁর সহকর্মিবৃন্দ ও সবরমতী আশ্রম সম্পর্কে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য জানতে পারি।

পরিশেষে, এই বইয়ের অনুবাদ সম্পর্কে একটি কথা। ফরাসী গদ্যের উৎকর্ষের যা প্রধান লক্ষণ—যাথাযথ্য (Precision), ডক্টর লোকনাথ

ভট্টাচার্য মহাশয়ের অনুবাদে তা যথাসম্ভব রক্ষা করবার চেষ্টা করা হয়েছে বাঙলা গদ্যের সীমাবদ্ধতা মেনে নিয়ে। তবে শব্দ-ব্যবহার কোথাও-কোথাও একটু বেশি কথ্যরীতির ধার ঘেঁষে গেছে। এই সামান্য বিচ্যুতি বাদ দিলে, আশ্চর্য প্রাঞ্জল অনুবাদের গদ্য। বোধহয় প্রাঞ্জলতার খাতিরেই কথ্যভঙ্গীর প্রতি এই পক্ষপাতিত্ব।

বইয়ের ছাপা বাঁধাই সজ্জা চমৎকার। কিন্তু পাঠে ছাপার ভুল একাধিক। সাহিত্য অকাদেমীর মতো সম্ভ্রান্ত সংস্থার বইয়ে ছাপা ভুল না থাকাই বাঞ্ছনীয়।

নারায়ণ চৌধুরী

মহাকাশ পরিচয়। শ্রীজিতেন্দ্রকুমার গুহ। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রকাশিত (১৯৬৯)। মূল্য পাঁচ টাকা।

সাম্প্রতিক কালে মহাকাশ-রহস্য বৈজ্ঞানিকদের নিকট ক্রমশ উদ্ঘাটিত হওয়ার ফলে শিক্ষিত জনসাধারণ মহাকাশ সম্পর্কে অধিকতর আগ্রহী হচ্ছেন। ইংরেজি ভাষায় এই বিষয়ে সাধারণের জন্য লিখিত বইয়ের সংখ্যা অনেক হলেও বাঙলা ভাষায় এই সম্পর্কিত বই প্রায় নেই বললেও চলে। শ্রীজিতেন্দ্র কুমার গুহ প্রণীত 'মহাকাশ পরিচয়' বাঙলা ভাষায় একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিবিধ জটিল তথ্য লেখক সামগ্রিক ও ধারাবাহিকভাবে প্রাঞ্জল ভাষায় বিবৃত করেছেন। বইটি মোট একবিংশ অধ্যায়ে বিভক্ত। 'পৃথিবী' অধ্যায়ে পৃথিবীর গঠন, আবহমণ্ডল ও ঋতু পরিবর্তনের কারণের কথা লেখক যেমন বলেছেন, তেমন পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রের বিন্যাস, মেরুজ্যোতি, পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে সূর্যনিঃসৃত তড়িতাহিত কণার আবদ্ধীকরণ ও তার ফলে ভ্যান অ্যালেন বলয়ের উৎপত্তির কথা পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে বলেছেন। সূর্য, সৌরকলঙ্ক ও সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহ সম্পর্কে লেখকের বিবরণ বহুবিধ তথ্য সম্বলিত। সৌরজগতের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন আধুনিক মতবাদও লেখক সাধারণের বোধ্য ভাষায় বর্ণনা করেছেন।

জ্যোতির্বিজ্ঞানে পদার্থবিদ্যার যে-সমস্ত তত্ত্বের সাহায্য নেওয়া হয়, বইটিতে

সেগুলি সরলভাবে বিবৃত করা হয়েছে। দূরবীক্ষণ যন্ত্র, বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্র, ডপলার তত্ত্ব ও তার প্রয়োগ, নক্ষত্রের দূরত্ব নির্ণয়, রেডার, বেতার দূরবীক্ষণ যন্ত্র প্রভৃতি বিষয়ের মূলসূত্র লেখক গাণিতিক সঙ্কেত ব্যতিরেকেই বর্ণনা করেছেন।

নক্ষত্রজগৎ সম্পর্কিত অধ্যায়গুলি যথেষ্ট আধুনিক তথ্য সম্বলিত। ফ্রেড হয়েল ও অন্যান্য বিজ্ঞানীদের মতবাদ অনুসারে নক্ষত্রের জন্মকাহিনী লেখক খুবই মনোজ্ঞভাবে উপস্থাপিত করেছেন। মহাকাশে মহাজাগতিক ধূলিকণার গ্যাস ঘনীভূত হয় এবং একসঙ্গে অসংখ্য নক্ষত্রের উৎপত্তি হয়। বিরাট গ্যাস পুঞ্জ থেকে পরমাণুর মুক্তিবেগ বা প্রস্থানবেগ গ্যাসপুঞ্জের ভরের উপর নির্ভরশীল। এর সাহায্যে লেখক ফ্রেড হয়েলের মতবাদের যৌক্তিকতা দেখিয়েছেন। নক্ষত্রের তাপ ও ঔজ্জ্বল্যের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়কারী চিত্র—রাসেল হ্যার্ৎজ্‌স্প্রুং ছক সপ্তদশ অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানে এই চিত্রটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্পন্দনশীল সেফাইড তারার স্পন্দনকাল ও আপাত ঔজ্জ্বল্য পর্যবেক্ষণ করে সেফাইড তারার দূরত্ব নির্ণয় করা হয়ে থাকে। লেখক এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন অষ্টাদশ অধ্যায়ে। এ-ছাড়া লেখক 'লাল দানব' (Red Giant) 'শ্বেত বামন' (White Dwarf) 'নব তারা' (Novae) 'অতি নবতারা' (Super novae) প্রভৃতি সম্পর্কে অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে আলোচনা করেছেন। রাশিচক্র, সায়ন ও নিরয়ন রাশিচক্র প্রভৃতিও সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

রেডিও অ্যাস্ট্রোনমির বাঙলা করা হয়েছে বেতার জ্যোতির্বিজ্ঞান। বেতার জ্যোতির্বিজ্ঞানের সংক্ষিপ্ত অথচ বহু তথ্য সমন্বিত আলোচনা ঊনবিংশ অধ্যায়ে করা হয়েছে।

বিংশ অধ্যায়ে কস্‌মোলজি বা ব্রহ্মাণ্ড তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। ১৯২৭ সালে দুই জ্যোতির্বিদ হাব্‌ল্ এবং হুমাসন নক্ষত্রজগৎ বা গ্যালাক্সীর দূরত্ব এবং তাদের পারস্পরিক অপসারণ বেগের সমানুপাতের সূত্রটি আবিষ্কার করেন। এর সাহায্যে ব্রহ্মাণ্ডের প্রসারণ সম্পর্কিত মতবাদটি স্থাপিত হয়। গ্যালাক্সী যে দূরত্বে থাকলে তার অপসারণ বেগ আলোকের গতিবেগের সমান হয়, তাই হল ব্রহ্মাণ্ডের হাব্‌ল্ ব্যাসার্ধ। এই হাব্‌ল্ ব্যাসার্ধ আমাদের পরিদৃশ্যমান বিশ্বের সীমা। এসব তথ্য যথাযথভাবেই আলোচিত হয়েছে।

একবিংশ অধ্যায়ে রকেটের সাহায্যে মহাকাশ সমীক্ষা ও মানুষের মহাকাশ

অভিযান বর্ণিত হয়েছে, লেখক রকেটের মূল কার্যপ্রণালী ব্যাখ্যা করার পর রাশিয়া ও আমেরিকা কর্তৃক বিভিন্ন উপগ্রহ-স্থাপন ও রকেট অভিযানের কথা বর্ণনা করেছেন। পৃথিবীর আহ্নিকগতির সমান পরিক্রমণকাল বিশিষ্ট কোনো উপগ্রহ মহাকাশে স্থাপিত হলে তা পৃথিবীর একই স্থানের উপর স্থির থেকে পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে আবর্তিত হবে। এতে দূরপাল্লার টেলিভিসন ও বেতার বার্তা প্রেরণ সহজসাধ্য হবে। এসব উপগ্রহগুলিকে সিন্‌ক্রোনাস উপগ্রহ বলে। এসব তথ্য বিস্তৃতভাবে লেখক বর্ণনা করেছেন। সর্বশেষে অমিত শক্তিশালী স্যাটার্ন-৫ রকেটের সাহায্যে মানুষের চন্দ্র অভিযানের বিস্ময়কর কাহিনী বর্ণনা করেছেন।

পুস্তকটি যথেষ্ট চিত্র সমন্বিত হওয়ায় এর উপযোগিতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। বহু রেখাচিত্রের সাহায্যে মূল বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করা হয়েছে; নীহারিকা, নক্ষত্রপুঞ্জ প্রভৃতির অনেক হাফটোন চিত্রও বইটিতে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

গ্রন্থটিতে দু-একটি সামান্য ত্রুটি আছে। সেফাইড তারার আপাত ঔজ্জ্বল্য ও দূরত্বের মধ্যে সম্পর্ক প্রথম আবিষ্কার করেন হার্ভার্ড কলেজ অবজারভেটরীর এক মহিলা বিজ্ঞানী শ্রীমতী হেনরিয়েটা লিয়াভিট ১৯৬২ সালে। লেখক এই তথ্যটির উল্লেখ করলে ভালোই করতেন। এ-ছাড়া নক্ষত্রের আভ্যন্তরিক শক্তি সৃষ্টি সম্পর্কে বিজ্ঞানী হান্‌স বেথের কার্বন চক্রের কথা ব্যাখ্যা করলে নক্ষত্র সম্পর্কিত আলোচনাটি পূর্ণতর হতো। লেখক মহাকর্ষের সমার্থবোধক দুটি শব্দের কথা উল্লেখ করেছেন অভিকর্ষ ও মাধ্যাকর্ষণ। বস্তুতপক্ষে বাঙলায় গ্র্যাভিটিকে অভিকর্ষ বা মাধ্যাকর্ষণ ও গ্র্যাভিটেশনকে মহাকর্ষ বলা হয়। পরিভাষায় একটি নিয়ম মেনে চলাই সম্ভবত বাঞ্ছনীয়। দু-একটি মুদ্রণ প্রমাদ রয়েছে। সূচিপত্রে বিদ্যুৎ চৌম্বক শক্তিকে বেতার চৌম্বক শক্তি বলা হয়েছে—এটি সম্ভবত মুদ্রণ প্রমাদ। লেখক বিভিন্ন নক্ষত্রপুঞ্জ (constellation) সম্পর্কিত একটি বর্ণনা দিলে খুবই ভালো করতেন। পরিভাষার একটি তালিকা পরিশিষ্টে থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এ-সমস্ত বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও বইটি বিজ্ঞানের সাধারণ পাঠকের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

বস্তুত বইটিতে প্রাঞ্জল ভাষায় এত বহুবিধ তথ্য বর্ণনা করা হয়েছে যে এখানে তার সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞরা ছাড়া প্রায় সর্বস্তরের পাঠকই এই পুস্তক পাঠে নতুন তথ্যের সন্ধান পাবেন।

বাঙলা ভাষায় এই পুস্তক প্রণয়ন করে শ্রীজিতেন্দ্র কুমার গুহ অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন। তিনি নিঃসন্দেহে ধন্যবাদার্হ।

বইটির ছাপা পরিচ্ছন্ন ও প্রচ্ছদপট মনোরম।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ বহুকাল থেকেই বাঙলা ভাষায় বিজ্ঞানের পুস্তকাদি প্রকাশ করে বাঙলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার পথ সুগম করছেন এবং বিজ্ঞানের আধুনিক তথ্যাদি বাঙলা ভাষাভাষী জনসাধারণের নিকট উপস্থাপিত করছেন। এরূপ প্রশংসনীয় উদ্যম সকলের সক্রিয় সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রত্যাশা করতে পারে।

ব্রহ্মানন্দ দাশগুপ্ত

প্রতিবেশিনীর কাছে। চিত্ত ভট্টাচার্য। ইণ্ডিয়া বুক কনসার্ন। চার টাকা।

এই যুগের চারিত্র্য সকলের চোখে সমান নয়। কারো চোখে জগৎ মানে একটা নিরবয়ব শূন্যতা—যার অনিবার্য পরিণাম একরাশ অন্ধকার কিংবা আদিগন্ত বিষণ্ণতা। আর এই রকম একটা উপলব্ধির উদ্ভব নিছক অনুষঙ্গের অভাব থেকে—বিচ্ছিন্নতার চেতনায় তা কোথাও অনুচ্চারিত, কোথাও বা বিভাবিত। আবার কারো দৃষ্টিতে খোলা চোখের সরস স্বাস্থ্য আস্তিক্যবোধের আলো—তাই জগৎ আজও তাদের কাছে অর্থবহ—'জল তেল খাদ্য' এবং 'পরিচ্ছন্ন বাতাসের সিন্ধুতীর'-এর আশ্বাস নিয়ে।

চিত্ত ভট্টাচার্য কোনো তাত্ত্বিক বিশ্বাসে সমর্পিতপ্রাণ কিনা জানি না। কিন্তু এই গ্রন্থে তাঁর আশাবাদী পুরুষার্থ অবলম্বন পেয়েছে কোনো নির্দিষ্ট তাত্ত্বিক ছকে নয়, নিতান্তই ইতিহাসমুখী শিক্ষিত মনের বিচিত্র কৌতুহলে। তাঁর মনের বাস্তুভিটার কোনো স্থিরিকৃত ভূগোল এখানে পাওয়া যায় না, যদিও তিনি স্পষ্টত মানুষেরই সপক্ষে, অতিমানবিকতা বা অমানবিকতার বিপক্ষে। এবং সেটাই তাঁর সাহিত্যিক সততার চাবিকাঠি। সেই সততা নিয়ে তিনি এখানে দেখেছেন জগৎসংসারকে—কোথাও বিস্ময়কর সরল চোখে, কোথাও বা উলট পুরাণের ভঙ্গিতে। ভঙ্গি যাই হোক, তার ফল একই। তাঁর চোখে পারিপার্শ্বিকতাসহ মানুষই হচ্ছে সবচেয়ে বড়ো শিল্পকর্ম।

'প্রতিবেশিনীর কাছে' লঘুগুরু প্রবন্ধের সঙ্কলন। লঘু প্রবন্ধ চারটি—তালা, ধার করার সপক্ষে, উলট পুরাণ, মুদ্রাদোষ। সাহিত্যবিষয়ক গুরু প্রবন্ধ

ছয়টি—শার্ল বদ্‌লেয়র, আধুনিক বাঙলা কবিতা, নতুন গল্পরীতি, চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ, 'অচলায়তন' প্রসঙ্গে ও শিবু মাঝির গান। ভ্রমণস্মৃতিমূলক রচনা চারটি—প্রতিবেশিনীর কাছে, স্মৃতিতীর্থ চিল্কা, দেউল পরিচিতি, কোণারক। লঘু প্রবন্ধগুলির অবলম্বন সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগত মানুষের চিন্তা ও স্বভাবের কোনো না-কোনো অসঙ্গতি। লেখকের সরস্ চেতনার সঙ্গে এসে মিশেছে ঈষৎ কৌতুক বা ব্যঙ্গের দৃষ্টি। রচনাগুলির ভঙ্গি হালকা, কিন্তু বক্তব্য ঠিক হালকা নয়। এই জাতীয় লেখায় চিত্তবাবুর মুন্সীয়ানার পরিচয় আছে। সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে লেখকের নানামুখি চিন্তার স্বাক্ষর পাওয়া যায়। সে চিন্তা কোথাও পূর্ণাঙ্গ, কোথাও আংশিক, কোথাও বা ইঙ্গিতসর্বস্ব। তাঁর সঙ্গে পাঠক সর্বাংশে একমত হবেন এমন সম্ভাবনা নেই। কিন্তু তাতে ক্ষতি কী? যদি আর কিছু না হোক কিছু বাক-বিতণ্ডা প্রবন্ধগুলি সৃষ্টি করতে পারে তবে তার ভেতর থেকেও শেষ পর্যন্ত সত্যের সন্ধান মিলতে পারে। চিত্তবাবু কতকগুলি প্রসঙ্গ উত্থাপন করে নতুন চিন্তার আগুন জ্বালতে পেরেছেন এটাই বড়ো কথা। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এক আশ্চর্য সহমর্মিতা তাঁর চিন্তার সহগ; যেমন বদ্‌লেয়র প্রসঙ্গে—'আমরাও আর সেই ঝলমলে পোষাক পরা কবিকে চোখের সামনে দেখব মনে করলেও দেখতে পাব না; যাকে দেখা যাবে স্মরণের পর্দায় তিনি তো মাতাল এক কবি—সারা জীবন মাতালের মতো যিনি টলমল করেছেন ভাবের ঘোরে সূক্ষ্ম চৈতন্যের অধীশ্বর—যিনি পারিপার্শ্বিক অবস্থার তথাকথিত স্থূল ঐশ্বর্যের দিকে মুখ ফিরিয়ে ঘৃণায় লম্বা চুরোট মুখে পথ চলতে চলতে দাঁড়িয়ে যেতেন। সর্বোপরি বদ্‌লেয়র মাতাল ছিলেন। এই তাঁর পরিচয় হোক।' স্মৃতিমূলক প্রবন্ধগুলিতে ছড়িয়ে আছে চিত্তবাবুর বুদ্ধি ও অনুভবের সৌরভ। তিনি শুধু চোখ দিয়ে দেখেন না, হৃদয় দিয়েও দেখেন। ত্রুটি হিসাবে চিল্কাপ্রসঙ্গের কথা উল্লেখ করতে পারি। রচনাটি আর একটু বস্তুনিষ্ঠ হলে ভালো হতো।

ভিন্নরুচির পাঠকরা কী বলবেন জানিনা। সব মিলিয়ে বইটি আমার ভালো লেগেছে। বাহাদুরি বা চমক কোথাও নেই, কিন্তু বোধ ও বুদ্ধির স্বচ্ছতা আছে। গ্রন্থটির অঙ্গসজ্জা সুরুচি সম্মত। প্রুফ দেখায় প্রকাশকের আরও যত্নবান হওয়া উচিত ছিল।

জীবেন্দ্র সিংহরায়

শ্রমিক আন্দোলনের হাতেখড়ি। অনিল মুখার্জি। কমিউনিস্ট পার্টি প্রকাশনী। দু-টাকা।

সারাভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের পঞ্চাশ বছর বয়স হলো এ-বছর। লক্ষ লক্ষ ভারতীয় শ্রমজীবী মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক এই সংগঠনের ইতিহাস বড়ই বৈচিত্র্যময়। বহু বাঁক-বাধা বহু বিভেদ উত্তীর্ণ হয়ে তার ক্রমবর্ধমান শক্তি, সামর্থ ও প্রভাব ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর সাবালক হয়ে ওঠার পরিচয় বহন করে। সহস্র সহস্র আত্মনিবেদিত কর্মী ভারতের শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলন সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন নানা সময়ে। শ্রীঅনিল মুখার্জি তাঁদেরই একজন। ১৯৫১ সালে পাকিস্থান সরকারের বন্দী থাকার সময় এই বইটির একটি পাঠ রচিত হয়। "সে সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে বিপ্লবী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে অভিজ্ঞ কোন শ্রমিক নেতা বা কর্মীই জেলের বাইরে ছিলেন না। নানা ধরণের প্রতিক্রিয়াশীল, সুবিধাবাদী, ভাগ্যান্বেষী এবং কারখানামালিক ও সরকারের লোভী দালালরা মজুর আন্দোলনে নানা রকমের বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে শ্রমিক আন্দোলনকে বিপথগামী করার অপচেষ্টায় মত্ত হয়েছিল।" লেখক তাঁর অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান রাজনৈতিক প্রয়োজনের তাগিদে লিপিবদ্ধ করেন। কিন্তু পাণ্ডুলিপিটি জেলের বাইরে গোপনে পাঠাবার পর হাত বদলাতে বদলাতে এক সময় হারিয়ে যায়। প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়সে অনিলবাবু তাঁর শ্রমিক আন্দোলন সংগঠনের অভিজ্ঞতা আবার লিপিবদ্ধ করেছেন। লেখক ও প্রকাশকের কাছে এই অমূল্য অভিজ্ঞতা পাঠকদের হাতে পৌঁছে দেবার জন্য কৃতজ্ঞতা না জানানো ছাড়া রাস্তা নাই।

পুঁজিবাদ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর যেমন সংখ্যা বাড়ে, তাদের সংগঠনও রূপ পরিগ্রহণ করে। শ্রমিকদের নানা সমস্যা নিরাকরণের প্রয়োজনে গড়ে ওঠে ট্রেড ইউনিয়ন বা শ্রমিক সংঘ। শ্রমঘণ্টা কমানো বা মজুরি বৃদ্ধির জন্য সংগ্রাম, ছাঁটাই, লে-অফ, ক্লোজার-লক আউট প্রভৃতির বিরুদ্ধে লড়াই; সামাজিক সুবিচার, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা প্রভৃতির দাবিতে আন্দোলন—এসবই শ্রমিক সংঘের প্রথাসিদ্ধ কাজ। কিন্তু শ্রমিক শ্রেণী যে ধনবাদী ব্যবস্থায় সবচেয়ে শোষিত শ্রেণী এবং শ্রমিক শ্রেণীই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা চূর্ণ করে মানুষের হাতে মানুষের শোষণ চিরকালের মতো অবসান ঘটিয়ে বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করে —এ কথা সুবিধাবাদী ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা গোপন রাখে। এই নেতারা মালিক শ্রেণীর সঙ্গে গোপন ও প্রকাশ্য সম্পর্ক রচনা ক'রে মালিক শ্রেণীর মুনাফা

অব্যাহত রাখে, এবং শ্রমিক শ্রেণীকে নানা সংস্কারবাদী চিন্তার দিকে ঠেলে দিয়ে পথভ্রষ্ট করে। এমন কি শাসন-শোষণের তুঙ্গ স্তরে জাত্যন্ধ ফাসিবাদী ব্যবস্থার শিকলে বেঁধে রাখতে তৎপরতাও দেখায়। যেহেতু শ্রমিকশ্রেণী অভিজ্ঞতার তাৎপর্যে শোষণব্যবস্থাকে চিনে ফেলে, সে জন্য নানা রঙের সমাজতন্ত্রের কথা মালিকশ্রেণীই তাদের শোনায় এবং পথভ্রষ্ট করার প্রচেষ্টা চালায়। সাম্রাজ্যবাদ আবার যে দেশে উপনিবেশ তৈরী করেছে, সেখানে শ্রমিক-শ্রেণীর অবস্থা আরো ঘোরালো। সামাজিক প্রতিষ্ঠাতো দূরের কথা, অতি দীন হীন তাদের জীবন। নানা অর্থনৈতিক ও অ-অর্থনৈতিক চাপ তাদের উপর। তাছাড়া তাদের পশ্চাদ্-পদতার সুযোগ নিয়ে তাদের সংগ্রামী চেতনা ধ্বংস করার জন্য সাম্রাজ্যবাদীরা সাম্প্রদায়িকতা, ভাষাবৈরীতা, প্রাদেশিকতা প্রভৃতি নানা বিভেদের কীলক প্রবেশ করিয়ে দেয়। বহুক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় বুর্জোয়ারাও শোষণ ব্যবস্থা চালু রাখতে স্বাধীনতা আন্দোলনকারীর নামাবলীর তলায় শ্রমিকবিভেদের ছুরি শানিয়ে রাখে। অন্যদিকে শ্রমিকশ্রেণীকে সত্যকারের রাজনীতিতে টেনে আনা, শ্রমিক শ্রেণীই যে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ফ্রন্টের সবচেয়ে শক্ত খুঁটি এমন চেতনা গড়ে তোলা, বা শ্রমিক শ্রেণীই যে নতুন যুগের পথিকৃৎ এই রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি করার কাজে বিপ্লবী ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের শ্রমের ও আত্মত্যাগের সীমা থাকে না। কোনো কোনো বিপ্লবী কর্মী মনে করেন ব্যক্তি জীবনে শৃঙ্খলারহিত, আধানৈরাজ্যবাদী ভাবে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে কাজ করলে, তাদের সহানুভূতি পাওয়া যায়। শ্রমিকদের মতো হয়ে যাওয়া বা ডি ক্লাসড্ হওয়া যে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যেকার পশ্চাদপদতার সামিল হওয়া নয়, বরং শ্রমিক শ্রেণীর যা হওয়া উচিত সেই পথ দেখানো—একথা এঁরা ভুলে যান। আর ব্যক্তিগত সন্ত্রাস নয়, শ্রেণীগত ঐক্য এবং সংঘবদ্ধ ম্যাস অ্যাকসনেই শ্রমজীবী মানুষের চেতনা, সংগঠন ও ঐক্য এগিয়ে যায়, এটাও মনে রাখার কথা। অনিলবাবুর 'শ্রমিক আন্দোলনের হাতেগড়ি' পড়তে পড়তে নিজের অজানাতে এ-সব শিক্ষা পাঠকের হবে। অনিলবাবু শ্রমিক আন্দোলনের কোনো তত্ত্ব গ্রন্থ লেখেননি। ছোটবেলায় দেশপ্রেমিকদের কাহিনী শুনতে শুনতে তাঁর দেশপ্রেমের উন্মেষ। বাল্যে আসামের চা-বাগানের শ্রমিক ধর্মঘট ও কর্মত্যাগের সমর্থনে, বিলাতী মালিকের শোষণের প্রতিবাদে রেল আর জাহাজ শ্রমিকের ধর্মঘটের ঘটনা দেখে তাঁর মধ্যে শ্রমজীবী মানুষ সম্পর্কে শ্রদ্ধার ভাব সৃষ্টি হয়। নির্যাতিত ও গরীবদের সংগ্রামের প্রতি কমিউনিস্টদের আদর্শবোধ, লেখকের সাম্প্রদায়িকতা ও

ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে মনোভাব, সোভিয়েত বিপ্লব সম্পর্কে গ্রন্থপাঠ, এমনকি গোর্কির 'মা' ও জোলার 'জার্মিনাল' পাঠ তাঁকে শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট করে। ১৯৩৮ সালে আট বছর কারাবাসের পর তিনি দমদম জেল থেকে বেরিয়ে দেখা করলেন মুজফফ্‌র আহমদ ও সোমনাথ লাহিড়ির সঙ্গে। তাঁরা অনিলবাবুকে তাঁর স্বজেলার নারায়ণগঞ্জের সুতাকল শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করতে উৎসাহ দেন। অনিলবাবু নারায়ণগঞ্জে এলেন। এবং শুরু হলো তাঁর শ্রমিক আন্দোলনের হাতে খড়ি।

'শ্রমিক আন্দোলনের হাতে খড়ি' একটি আশ্চর্য বই। এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলা যায়। বানানো কাহিনী নয়, জীবনের অভিজ্ঞতার উজ্জ্বল চিত্রগুলি আমাদের সামনে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করে। এর যে কোন একটি কাহিনী নিয়ে কোনো উপন্যাসের প্রস্তাবনা হতে পারে। আটত্রিশ থেকে ছেচল্লিশ—এই ন বছরের নারায়ণগঞ্জের বীর সুতাকল-মজুরদের সংগঠিত সংগ্রামের কাহিনী বইটিতে আছে। হাতে খড়ি শব্দটি পড়ে প্রথমে ভেবেছিলাম, বইখানি গুরুগম্ভীর চালে, ট্রেড ইউনিয়ন কি, তার কি কি কাজ—এবং ইত্যাদি—নানা ব্যাপারে ভারাক্রান্ত হবে হয়তো। কিন্তু বইটি একটি সুখপাঠ্য কাহিনী-সঙ্কলনও বটে। পরবর্তী সংস্করণে মুদ্রনপ্রমাদগুলি বাদ দিলে আরো ভালো হবে। এ বই প্রতিটি কমিউনিস্টেরই নয়, প্রতিটি প্রগতিশীল সাহিত্যপিপাসু মানুষের অবশ্য পাঠ্য বলে মনে করি।

তরুণ সান্যাল

ছিন্নমস্তা রাজনীতি, পুলিশী সন্ত্রাস ও বিভ্রান্ত যৌবন

কিছুকাল ধরে পশ্চিমবঙ্গে নৈরাজ্যের তাণ্ডব নৃত্য চলেছে। রাজনৈতিক দলের কর্মীদের মধ্যে হানাহানি, রাতারাতি সমাজবিরোধীদেরও, রাজনৈতিক গুপ্তহত্যার আয়োজন ও প্রয়োজনে, পঙ্‌ক্তিভোজনে সম্মানিত আসন প্রদান, ঘনঘন দম্ভী নেতাদের অন্য রাজনৈতিক দলের কর্মীদের নিকেশ করে দেবার জন্য কর্মীসমাবেশে ঘোষণা, স্কুল-কলেজের সম্পত্তি বিনষ্টি, শ্রদ্ধেয় নেতৃবৃন্দ ও সমাজ-কর্মীদের মর্মরমূর্তি চূর্ণিকরণ ইত্যাদি চলেছে। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক আসরে রাজ্যপালের আমলাদের 'নিয়মশৃঙ্খলা ও গণতন্ত্রে'র রক্ষা-কর্তার ভূমিকায় অবতরণ, চূড়ান্ত দক্ষিণপন্থীদের রণহুঙ্কার, এবং সর্বোপরি পুলিশের নরঘাতী রূপ—সমস্ত অবস্থাকে বিষাক্ত, ঘোরালো এবং দিশেহারা করে তুলেছে। হত্যা, ধ্বংস এবং অনিশ্চয়তা আজ পশ্চিমবঙ্গ, বিশেষভাবে কলকাতার নিত্যসঙ্গী। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে গণতন্ত্রঘাতী বিনাবিচারে বিনাপরোয়ানায় বন্দী রাখার আইন।

কিন্তু কেন এমনটা হলো? পশ্চিমবঙ্গ নাকি সারা ভারতের গণতান্ত্রিক ও বামপন্থী আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র! অথচ এখানেই এত অনিশ্চয়তা কেন? নানা মুনির নানা মত আছে। আমাদেরও কিছু কিছু বলার আছে। এবং নিরাকরণের ব্যাপারে আমাদেরও কিছু কিছু মতামত থাকার কথা।

ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া একই বৃন্তের যথাক্রমে সরস ও নষ্ট ফল। বৈপ্লবিক ক্রিয়া যত বাড়ে, মানুষের মধ্যে রূপান্তরণের স্পৃহা, আবেগ ও সংগঠন যত শক্তিশালী হয়, প্রতিক্রিয়াও সেগুলি প্রতিরোধের জন্য হন্যে হয়ে ওঠে। আর সেই প্রগতির সামান্য পদস্খলনেরও সুযোগ নিয়ে প্রতিক্রিয়া করাল মূর্তি ধারণ করে তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সদ্যসদ্য প্রমাণ রয়েছে ইন্দোনেশিয়ায়। আমলা-তন্ত্রীরা এ রাজ্যে আজ রক্ষকের ভূমিকায়। পুলিশও রাজনৈতিক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে। এবং বাছা বাছা প্রতিক্রিয়াশীলরা এ-রাজ্যে ও-রাজ্যে পশ্চিমবাঙলাকে গলা টিপে মারবার জন্য নানা দমনমূলক আইন চাপিয়ে দেবার সুপারিশ করছে।

এমন-কি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী বহু ব্যক্তি ও দল দমনমূলক আইনকে নান্যপন্থা বলে মনে করছেন। প্রগতি ও গণতন্ত্রের শিবিরেও আজ বিভ্রান্তি ও অসহায়তা। এ-সুযোগে সরকারকে দক্ষিণপন্থীরা বাধ্য করছে রাষ্ট্রযন্ত্রের হাত দিয়ে চরম প্রতিক্রিয়ার ও গণতন্ত্রঘাতী অস্ত্র ব্যবহার করতে। গড়ে উঠছে প্রতিক্রিয়ার সরকারী-বেসরকারী পিটুনিবাহিনী। অথচ সাধারণ মানুষ বিব্রত, হতচকিত। প্রবল বোমাবৃষ্টির মধ্যে সে সন্ত্রস্ত, পুলিশের দমনপীড়নের সম্মুখে সে অসহায়। রাজনৈতিক গুপ্তহত্যার সে নীরব সাক্ষী। অনেকে সন্ত্রাসের রাজনৈতিক চাপে প্রতিবাদেও অক্ষম। অথচ কথা ছিল অন্য রকম কিছু হবার।

বড়ো রাজনীতির কথা মনে করা যাক। বিভক্ত ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন হলো, পড়ে রইল 'লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনা'। দুর্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহন করছিল বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা। একদিকে ভারতের লোলুপ একচেটিয়াপতিরা দেশটাকে পুঁজিবাদী বিকাশের পথে ঠেলে দিয়ে দারিদ্র্যের অসহায়তার শ্মশানে তাণ্ডব নৃত্য করছিল, অন্যদিকে তাদের হাত ধরে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি ষড়যন্ত্রজাল বিস্তার করছিল। দেশের সাংস্কৃতিক উত্থানের মঞ্চে প্রবেশ করছিল সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিমী সভ্যতার নোংরা নর্দমার কৃমিকীট। রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে মার্কিনী গোয়েন্দা দপ্তরের কাল কেউটে ফণা তুলছিল, আর্থনীতিক বিকাশের সিসিফাসীয় পণ্ডশ্রমকে ধীরে ধীরে পাপচক্রে ঘিরে ধরছিল সাম্রাজ্যবাদ একচেটিয়াবাদ ও সামন্তবাদী-অবশেষের ত্রি-শির হাইড্রার নাগপাশ। আর এই অধঃপতনের প্রতিরোধে আসমুদ্র-হিমাচল বারবার ফেটে পড়েছে। পরিমাণমূলকভাবে তিলে তিলে গণতান্ত্রিক শক্তি বল সংগ্রহ করেছে। দক্ষিণপন্থীরাতো এই উত্থানকে সাবভার্টই করতে চেয়েছে। অন্যদিকে মানুষ লড়াই করেছে, মরেছে, আর তাদের মৃত্যু ও আত্মত্যাগের উপরে বনিয়াদ রচিত হয়েছে সাচ্চা গণতান্ত্রিক ও বামপন্থার পাশাপাশি সুবিধাবাদী তথাকথিত বামপন্থার। স্বদেশী পরিস্থিতির ও আন্তর্জাতিক সমস্যার মূল্যায়নের বিভ্রান্তিতে গড়ে উঠেছে নেতিবাগীশ বামমার্গের কোনো কোনো দল। পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীতে এদের জন্ম, পা রয়েছে শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনের পাদপীঠে কিন্তু মাথা বন্ধক দেওয়া আছে বুর্জোয়া চিন্তা-চৈতন্যের সিন্ধুকে। অতিদ্রুত ক্ষমতা লাভের লোভ এদের মত্ত করে। কোনো রকম অসৎ কর্মই এদের কাছে পরিত্যাজ্য বলে বোধ হয় না। যেন তাদের হাতের আপাত-সাফল্যের আমলকীর

কাছে সমস্ত পন্থাই মূল্যবান, অভিপ্রেত ও কার্যকর। যেন হাতের মুঠোয় স্বর্গ, অর্থাৎ মন্ত্রীত্ব। ঠোঁট আর পেয়ালার মধ্যেকার সম্ভাব্য স্খলনের ভীতিতে এই নেতৃত্ব অমানবিক, ঘৃণ্য, নারকীয় পন্থা ব্যবহারে ও মিথ্যা প্রচারে ফ্যাসিবাদীদের হার মানাতে পারে। নামে বাম, কাজে চূড়ান্ত দক্ষিণের বাঁকটাই এঁরা দ্রুত আহ্বান করে আনেন।

অথচ দেশের স্বাধীনতা রক্ষা, প্রসারণ ও স্বনির্ভরতার জন্য প্রয়োজন ছিল ব্যাপক ঐক্যের। শ্রমিক ও কৃষকের মৈত্রীভিত্তিক ব্যাপক ঐক্যে টেনে আনার কথা ছিল মধ্যশ্রেণী ও জাতীয় বুর্জোয়াদের। এক ব্যাপক গণতান্ত্রিক ফ্রণ্টে নওজোয়ানদের সামিল করার কথা ছিল। কিন্তু ঘটলো কি? ১৯৬৭ সালে নির্বাচনের ফলাফল ভারত জুড়ে চিহ্নিত করলো কংগ্রেসী-দলের পুঁজিবাদী আর্থনীতিক বিকাশের প্রতিবাদে গণজাগরণ—যে-জাগরণকে কেবলমাত্র কংগ্রেসবিরোধিতার রাজনীতির মোড়কে ঢেকে চূড়ান্ত দক্ষিণ পন্থীরাও কার্যসিদ্ধি করতে চেয়েছে। অন্যদিকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির যারা বড়াই করেন সেই সব তা-বড় তা-বড় নেতাদের প্রয়োজন ছিল চোখের মণির মতো বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্যকে রক্ষা করা। বরং দেখা গেল, ১৯৬৯-এ যুক্তফ্রট জয়ী হলেও বিভেদের রাজনীতি ঘৃণার রাস্তায় বাঁক নিচ্ছে। প্রতিক্রিয়াকে চূড়ান্ত আঘাত দেবার জন্য উত্থিত প্রগতির বজ্রবাহু প্রস্তরবৎ হলো, এবং তা পাষাণ খণ্ড হয়ে মূলত বিভ্রান্ত ছুটি দলের তথাকথিত বিপ্লবী তরুণের হাত দিয়ে নেমে এলো স্বজন-পরিজনের মাথায়। যে-পশ্চিমবঙ্গে গোটা ভারতের পুঁজিবাদী মূলধনের প্রায় অর্ধাংশ খাটে, যে-রাজ্যে প্রতিক্রিয়া প্রত্যাঘাতের সুযোগ খুঁজছিল, সেখানে অনৈক্যের সুযোগে নেমে এলো চরম দণ্ডের প্রগতিঘাতী খড়্গ। এই ছিন্নমস্তা রাজনীতির মুষল পর্বের নায়কেরা এখনও বুঝছেন না, স্বজনবৈরিতা গোটা ভারতকে রসাতলে পাঠাচ্ছে। শেখবার ব্যাপার যখন ছিল নতুন পরিস্থিতিতে তৃতীয় বিশ্বের সিংহল বা চিলির কাছ থেকে তখন গোটা দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজনীতিতে ঘনিয়ে তোলা হচ্ছে ঘনঘটা। পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্য ভারতকে পথ দেখাতে পারত, ভিয়েতনাম-কম্বোডিয়া-লাওসের সংগ্রামকে দিতে পারত নৈতিক শক্তি, উল্টে আজ দেখা যাচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীলদের উল্লাস। কে-না জানে প্রতিক্রিয়ার হাতের মুঠো শক্ত করে গণতন্ত্রঘাতী সাবভার্সনের শক্তিগুলি। উগ্র বামপন্থাও সেই দক্ষিণপন্থারই সহোদর।

আমাদের দেশের বিভ্রান্ত তরুণদের দোষ দিয়ে পালাবার পথ নেই। একসময় কমিউনিস্ট আন্দোলনের সুস্পষ্ট ও প্রচলিত নীতির বাইরে চীনদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনে অন্তর্ঘাত তৈরি করে। যাঁরা পাল্টা পার্টি বানালেন, তাঁরা দ্রুত বিপ্লবের নামে তরুণকুলকে সত্যমিথ্যায় নানা রণধ্বনি তুলে ডাক দিলেন। ১৯৬৭ সালে 'দিনবদলের পালা'য় রাজনীতির নামে খেউড় আমদানীর কথা বোধহয় এত সহজেই কেউ ভুলে যাননি। কিন্তু কিছুদিন পরেই দেখা গেল, যাদের শোধনবাদী বলে ধ্বংস করার ডাক দেওয়া হয়েছিল, এমন-কি যাদের বলা হয়েছিল প্রতিক্রিয়াশীল, তাদের সঙ্গেই মন্ত্রিত্ব করতে হলো। চীনা বেতার পাল্টা পার্টিকে নয়া শোধনবাদী আখ্যা দিল। যাদের কাছে চীনা কমিউনিস্ট পার্টিকে অভ্রান্ত বলে আহ্বান জানানো হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে সেই অন্ধ রাজনীতির প্রতি নিষ্ঠাবান সৎ নেতা ও কর্মীরা পার্টি ছেড়ে গেলেন। তবুও কি কিছু করার ছিল না?

১৯৬৯ সালে আবার যখন যুক্তফ্রন্ট হলো, পশ্চিমবঙ্গের অবৈজ্ঞানিক ও মান্ধাতা আমলের এবং ঔপনিবেশিক ধাঁচের শিক্ষাবিধি ও পরীক্ষাব্যবস্থা বদলে নতুন কিছুই করা হলো না। কেবল কলেজ-স্কুলের প্রশাসনে দলের লোকজন বসানো হলো। ভূমি আন্দোলনের জন্য আগ্রহী চাষীদের 'শ্রেণীসংগ্রামের' অদ্ভুত ব্যাখ্যার নামে তাঁরা লেলিয়ে দিলেন অন্য কৃষকের দিকে। গ্রামের জোতদারের হাতে রইল ষাট হাজার বন্দুক। ফ্রন্টিয়ার রাইফেল গেল তথাকথিত উগ্রপন্থীদের দমনে। কোনো মন্ত্রী হাঁক দিলেন, উগ্রপন্থীদের দমন করার জন্য দলীয় ছাত্রদের হাতে রাইফেল তুলে দেওয়া হবে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে চলল দলীয় ক্যাডারদের আধাসামরিক কুচকাওয়াজ। চলল শ্রেণীভিত্তিক ফ্রন্টের নামে গুণ্ডাবাজী, হত্যা, পীড়ন। ঐ পার্টির অফিসগুলির সঙ্গে অন্তঃগ্রথিত হলো পুলিশী প্রশাসন। পুলিশও এই বিভেদের অন্ধ রাজনীতির সঙ্গী হয়ে উঠল। রাজনীতির আসরে অন্যতম সাথী হলো পুলিশ। বিচারপতি মুল্লা যাদের বলেছিলেন, 'সংগঠিত গুণ্ডাবাহিনী' তারা এবং পাড়াতুতো সমাজবিরোধী ও গুণ্ডাদের এক অশুভ আঁতাত গড়ে উঠল বিশেষ এক রাজনীতির সঙ্গে; দুর্ভাগ্যের ষোলো কলা পূর্ণ হলো।

গণতান্ত্রিক বামপন্থী ও বিশেষভাবে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী রাজনীতিতে অদীক্ষিত, পেটি-বুর্জোয়াশ্রেণীর শিক্ষিত বেকার ও অর্ধশিক্ষিত তরুণদের সামনে

উগ্র রাজনীতির নেশা লাগল। আমরা এর আগেই বলেছি, সুস্থ স্বদেশপ্রেমী রাজনীতির কথা এদের কাছে শোনাবার কথা ছিল। কিন্তু তা হলো না। প্রয়োজন ছিল বামপন্থী উচ্চ নৈতিকতার আদর্শে এদের উদ্বুদ্ধ করা কিন্তু দলীয়তা ও পার্টি হেজিমনির বলদর্পিতার নীতিহীন নৈরাজ্যে এদের বলী দেওয়া হলো উগ্রপন্থা ও হঠকারিতার পথে। দলত্যাগীদের বিরুদ্ধে বৃহৎ দলীয় নেতারা লড়াইয়ে নামলেন। শুরু হলো হত্যা, বীভৎসতা, মৃত্যু ও অরাজকতা। পশ্চিমবঙ্গে আজ চলেছে সেই হত্যা-প্রতিহত্যা, আঘাত-প্রত্যাঘাতের পালা। বিপ্লব আকাঙ্ক্ষা ক'রে সর্বত্যাগী হতে যে তরুণ প্রস্তুত, সে যে-বামপন্থী বিপ্লবী দলেরই অনুগামী হোক-না-কেন, তাকে ক্ষেপিয়ে তোলা হচ্ছে অন্য রাজনৈতিক দলের অনুগামীর বিরুদ্ধে। আর একদিকে দম্ভী রাজনৈতিক নেতারা তথাকথিত উগ্রপন্থীদের মোকাবেলা করার জন্য যুবকর্মীদের সশস্ত্র হতে ডাক দিচ্ছেন। স্কুল থেকে ছাত্র টেনে বের করে হত্যা করা হয়। এ-ধরনের ছাত্র-হত্যার প্রতিবাদে কোনও বিজ্ঞপ্তি তাঁরা প্রচার করেন না। অবধারিতভাবে ছাত্র-হত্যার পরবর্তী অধ্যায়ে শিক্ষয়িত্রীর উপরে আক্রমণ হলে হরতাল হয়, পার্লামেন্টে প্রশ্নোত্তর হয়। কলেজের স্বদলীয় ছাত্র নিহত হলে সারা কলকাতায় ছাত্র ধর্মঘট হয়। স্বদলের প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধির জন্য সত্যমিথ্যা কোনো পন্থাই পরিত্যজ্য নয়। অন্য পথের পথিক সমস্ত দলের বিরুদ্ধে কালিমা লেপন ও আক্রমণ—এবং প্রতিক্রিয়ায় প্রতিআক্রমণ—বরফের উপরে বরফের বল গড়ানোর মতো ক্রমোস্ফীত বীভৎসা ও সন্ত্রাসের সৃষ্টি ঘটিয়েছে। বিভ্রান্ত যুব-ছাত্ররা ভ্রান্ত রাজনীতিক বিশ্লেষণে পুলিশ হত্যায় তৎপর। ব্যবসায়ী পদস্থ সরকারী কর্মচারীদের প্রতিও তাদের নাকি আক্রোশ দেখা দিয়েছে। পুলিশও জঘন্য প্রতিআক্রমণে প্রতিশোধ নিচ্ছে। হত্যা আর হত্যা নয়! এক কুৎসিত বীভৎসা আসর জমিয়েছে। পুলিশ এখন গোদের উপরে বিষফোঁড়া। উচ্চাভিলাষী প্রবীণ নেতাদেরও মনে রাখা দরকার, সাম্রাজ্যবাদী চক্রীশক্তি নানা বিপ্লবী বুলির আড়ালে প্রতিক্রিয়ার উদ্দেশ্য সাধনে এমন সুবর্ণসুযোগ বিবিধ কায়দায় ব্যবহার করবেই। দেখা যাচ্ছে, বলদর্পী দলীয়তা উগ্রপন্থা ও পুলিশ এই ত্র্যহস্পর্শে দেশের গণতান্ত্রিক-আন্দোলনের মূলোচ্ছেদের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হতে চলেছে।

এ-সত্ত্বেও উজ্জ্বল রূপালী রেখা আছে এই দুর্ভাগ্যের ঘনমেঘাড়ম্বরেও। কৃষক যেখানে জমি, ফসল ও অধিকারের জন্য লড়ছে, শ্রমিক যেখানে বেকারী,

লকআউট, ক্লোজার, শোষণ ও পীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে, সেখানে এই বীভৎসার রাজনীতি বর্তমানে বহুলাংশে অনুপস্থিত। যেখানে পেটি-বুর্জোয়া নেতৃত্ব আছে, সেখানেই এই সন্ত্রাস।

যে তরুণবৃন্দ আজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি ভাঙছেন, তাদের মধ্যে কতজন আদর্শপবিত্র, কতজন-বা সুযোগসন্ধানী আর কতজনই-বা প্রতিবাদ জানাবার জন্য তথাকথিত যুববিক্ষোভসাপেক্ষ হাতিয়ার পেয়েছেন! কৃষি-বিপ্লব বা এ-ধরনের ধ্বনির আর্থনীতিক ও রাজনীতিক তাৎপর্য এঁরা অনেকে সামান্যও বোঝেন না। কিন্তু স্বদেশের তরুণকুলের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে যে প্রাণধারণের গ্লানিসঞ্জাত শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে, অনন্বয়ের নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে মানসিক বাতাবরণে, সে নিম্নচাপ সাইক্লোনই ডেকে আনে। শিল্পবিকাশের অসংলগ্নতা ও একচেটিয়ার চাপ, অসমাপ্ত ভূমি-বিপ্লব, সম্পদ ও দারিদ্র্যের অহেতুক সহাবস্থান, মধ্যযুগীয় ভূ-সমান্তর চিরাচরিত প্রাকৃতিক অর্থনীতি ও সমাজবোধ থেকে জেগে উঠে—ক্ষুধিত গরুড়ের মতো প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি, উদ্বাস্তু জীবনের মূলশূন্যতা, সামাজিক সুবিচারের অভাব, নগর কেন্দ্রিকতা অথচ ব্যাপক বেকারী, বর্তমান শিক্ষা-সংস্কৃতি-রাজনীতির পরিমণ্ডলে অন্তঃসারশূন্যতা ও ভারসাম্যহীনতা, এমন-কি সাম্প্রতিক বিজ্ঞান ও কৃৎকৌশলের বিপ্লব ও তাদের সঙ্গে সম্পর্করহিত ব্যবস্থা সপ্রশ্ন তরুণকূলকে ঝড়ের কেন্দ্রের দিকে ঠেলে দিয়েছে। এক ব্যাপক ও সর্বগ্রাসী বিচ্যুতি, অনন্বয় বা এ্যালিয়েনেশন তাদের ভায়োলেন্ট করে তুলেছে। এ কেবল মধ্যশ্রেণীজাত তরুণের মধ্যেই দেখা দিচ্ছে না, শ্রমজীবী মানুষের মধ্যেও পুঁজিবাদী বিকাশের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ ছটফট করছে এ্যালিয়েনেশনজাত দ্বন্দ্ব। তরুণের এই চূড়ান্ত মানসিক দোলাচলের মধ্যে ইন্ধন পড়ছে উগ্ররাজনীতির বিভ্রান্ত নেতাদের বাক-স্ফুলিংগ। যা কিছু অস্তিত্বকে ধরে আছে, সব কিছুর বিরুদ্ধেই জেহাদ ফুঁসে উঠছে। ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা তাদের ঠেলে দিচ্ছে মূর্তি ভাঙা থেকে, বিদ্যায়তন ভাঙা, পরীক্ষা ভণ্ডুল করা, এমন কি হত্যার দিকেও। বাকুনিনপন্থার ভূত ঘাড়ে চেপেছে। সজীব ও সুস্থ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী চিন্তা ও সংস্কৃতিপ্রস্থান এদের পথ দেখাতে পারত—ঐতিহ্যকে বর্জন নয়, তার মধ্য থেকে মহৎ ব্যাপারগুলির পরিপোষণ ও বিভাসন। কথা ছিল, সংগ্রামী সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির পথে তরুণকুলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, শ্রমজীবী মানুষের সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতিতে সামিল করা। তাদের শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন

ছিল — কেনই-বা স্খলন থাকা সত্ত্বেও তলস্তই লেনিনের চোখে মহৎ ছিলেন, কেনই-বা লেনিন প্রলেটকাল্টের ঐতিহ্য ও অন্যান্য প্রভাবনিরপেক্ষ তথাকথিত সর্বহারা সংস্কৃতির সমর্থক ছিলেন না, কেনই-বা হার্ৎসেন, পিসারেভ, চেরনিশেভস্কি, বেলিনস্কি, ডব্রুলবভ প্রভৃতিকে তিনি শ্রদ্ধার পাত্র বলে গণ্য করেছিলেন। কেনই-বা লেনিন রুশ দেশের মুক্তির ইতিহাসকে ১৮২৫ থেকে ১৮৬১, ১৮৬১ থেকে ১৮৯৫ এবং ১৮৯৫ সালের পরবর্তী এই তিন স্তরে ভাগ করে, শ্রমজীবীদের নেতৃত্বের সংগ্রামকে পূর্ববর্তী দুটি স্তরের ক্রমপরম্পরা বলে ব্যাখ্যা করেছিলেন। কা কস্য পরিবেদনা।

একদা যুক্ত কমিউনিস্ট পার্টির দলভাঙা নায়কেরা রাজনীতি না দিয়ে তরুণকুলকে ডাক দিয়েছিলেন, সশস্ত্র বিপ্লবকে অ্যাজেনডায় রেখে। বিপ্লবও যে দিনক্ষণ দেখে, তারিখ ঠিক করে একটা হঠাৎ ঝড় তোলা নয়—এটাও তাঁরা বুঝিয়ে বলেন নি। বুঝিয়েছেন রাতারাতি হঠাৎ সশস্ত্র ভাবে কিছু ঘটানোর নামই বৈপ্লবিক কাজ, বা বিপ্লব। বিপ্লব যে একটি পরম্পরা, একটি পদ্ধতি — পরিমাণমূলক শক্তি সামর্থ্য অর্জনের চূড়ান্ত স্তরে গুণগত পরিবর্তনের জন্য লাফ দেওয়ায়ই যে বিপ্লব — এটা তাঁরা বোঝান নি। এমন-কি একটা বিদেশী বেতারে কান পেতে, এ দেশে ঘোড়ার আগে গাড়ি জোতার জন্য সাংস্কৃতিক বিপ্লবের জয়গানও গেয়েছেন। ফলে জন্মেছে ডক্টর ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের হাতে গড়া সেই দৈত্য। এবার স্রষ্টারই তারা কেবল গলা টিপে ধরছে না, প্রচণ্ড আবেগের তাড়নায় যা মন চায় তেমনি কিছু তারা করছে। একদা যেমন হিটলারের মুখে শুনেছি, 'হ্যাঁ, আমরা বর্বর, আমরা বর্বরতাই করব'। এরাও বলছে, 'হ্যাঁ। আমরা সমাজবিরোধী, কেননা আমরা এ-সমাজ মানিনা' অর্থাৎ বামপন্থার যজ্ঞস্থলিতে সত্যকেই আহুতি দেওয়া হয়েছে, জন্ম নিয়েছে এক ছিন্নমস্তা কবন্ধ। এমনটি তো হবার কথা ছিল না। সমাজতন্ত্রী সংস্কৃতি মানুষকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বা ইনডিভিডুয়ালিটিতে নিয়ে যায় না, তাকে অভিষিক্ত করে পার্সোনালিটিতে। ব্যক্তির স্বার্থ যেখানে মুখ্য সেখানেই ইনডিভিডুয়াল। সমাজস্বার্থের জন্য প্রগতির সারাৎসার সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ধারণ ক'রে, জীবনে তা প্রয়োগের মধ্যে গড়ে ওঠে পার্সোনালিটি। তরুণকর্মীদের কাছে এটাই প্রার্থিত ছিল। সময় বয়ে যায় নি, লোনা সমুদ্রের এই উজান ঠেলে এখনও আমরা সেখানে পৌছতে পারি। এজন্য তরুণ-কুলের সামনে যথার্থ দেশপ্রেমিক বামপন্থা ও সমাজবাদের দীক্ষা পৌছে দেবার

জন্য কোমর বেঁধে নামতে হবে। অযথা বৈরিতা নয়, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সুস্থতার আদর্শ তুলে ধরেই তাকে শিক্ষিত করতে হবে। এরা আমাদেরই সন্তান, আমাদেরই ভাই। এদের ভবিষ্যতের মধ্যেই দেশের ও জাতির ভবিষ্যৎ নিহিত রয়েছে। এদের কালাপাহাড়ী কাজকে যেমন নিন্দা করতে হবে, কিন্তু কেন নিন্দা করছি তার যুক্তিসঙ্গত বৈজ্ঞানিক কারণ দেখাতে হবে। আবেগ নয়—যুক্তি, সহানুভূতি ও সমবেদনা এদের বিভ্রান্তির ঘূর্ণি থেকে মুক্ত করতে পারে। শ্রমজীবীমানুষের সর্বকলুষহর গণতান্ত্রিক সংগ্রামের গঙ্গাস্নানেই এদের গ্লানিমুক্তি হতে পারে। জাতীয় স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের অসমাপ্ত বিপ্লব সমাপ্ত করার কাজে এদের টেনে আনতে হবে। সেই সংগ্রামের মুক্তধারায় অবগাহন করেই হবে আমাদের সবারই প্রায়শ্চিত্ত।

হয়ত এখনও সময় আছে। বিপ্লবী বুলি, ব্যক্তিসন্ত্রাস ও পুলিশি তাণ্ডবের ঘোলা জলে মৎস্যশিকার নয়, সুস্থ গণতান্ত্রিক আদর্শ ফিরিয়ে আনবার জন্য পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে আবার কোমর বেঁধে লড়তে হবে। সারা ভারতের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গকে রুখে দাঁড়াতেই হবে। বারাসতের অদূরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা আটটি তরুণের শবদেহ, বীভৎসা কতদূর পৌঁছেছে তারই দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করছে। ইতিমধ্যে দেরীতে হলেও কিছু কিছু কাজ শুরু হয়েছে। বিভিন্ন গণতান্ত্রিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। দেশের লেখক ও বুদ্ধিজীবীরা এগিয়ে আসছেন। কিন্তু এ সত্ত্বেও বলব দেশের শ্রমজীবী মানুষের সজীব আন্দোলনই এই আত্মহত্যার পথ থেকে দেশের বিভ্রান্ত তরুণ শক্তিকে ফেরাতে পারে। আমরা তারই প্রতীক্ষায় আছি। আমরাও সে লড়াইয়ে সামিল হব। সম্প্রতি দেশের বুদ্ধিজীবীদের ১১ই নভেম্বর ভারতসভা হলে অনুষ্ঠিত এক কনভেনশনে নিম্নলিখিত ইশ্‌তাহার প্রচার করা হয়েছে। একটি ব্যাপক আন্দোলন গড়ে-তোলার কাজে তাঁরা হাত লাগিয়েছেন। ঘনমেঘের মধ্যে আশার ঝলক চোখে পড়ছে।

"একদিকে সীমাহীন পুলিশী জুলুম অপর দিকে ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক ব্যক্তিগত হত্যাকাণ্ড দুইয়ে মিলে সমগ্র পশ্চিম বাঙলায় আজ এমন এক সন্ত্রাসের আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে যা আমাদের সমগ্র দেশের গণতান্ত্রিক অগ্রগতির পথে একরকম বিপদ হিসাবে দেখা দিয়েছে।

মাত্র গত দু'এক মাসের মধ্যে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার একাধিক রাজনৈতিক

কর্মী পুলিশ হেফাজতেই অথবা পুলিশের সঙ্গে তথাকথিত 'গুলি বিনিময়ের' ফলে প্রাণ হারালেন। ২০ সেপ্টেম্বর ভবানী দত্ত লেন ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনের হত্যাকাণ্ড এর নগ্নতম প্রকাশ।

আবার তারই পাশাপাশি এক রাজনৈতিক দলের কর্মী অপর দলের কর্মী বা সমর্থকদের হাতে নৃশংসভাবে নিহত হচ্ছেন। এবং এই ভ্রাতৃঘাতী হত্যা অভিযান বন্ধ হবার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। কোথাও আবার 'প্রতিশোধ' হিসাবে সাধারণ পুলিশ বা পুলিশ অফিসারদের অতর্কিতে আক্রমণ করে হত্যা করা হচ্ছে এবং এর সংখ্যাও বাড়ছে।

দেশের গণতন্ত্রের পথে বিপজ্জনক সম্ভাবনাপূর্ণ আরও কয়েকটি ঘটনাও আজ অত্যন্ত বেশী গুরুত্ব নিয়ে আমাদের সামনে আসছে। ১৯৩২ সালের কুখ্যাত এণ্ডারসনী আমলের সন্ত্রাসবাদ দমন আইন চালু করা হচ্ছে, রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের গ্রেপ্তারের জন্য সহস্র সহস্র টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হচ্ছে, এবং সর্বোপরি গ্রেপ্তার অবস্থায় রাজনৈতিক কর্মী বিশেষতঃ ছাত্র ও যুবকদের উপর নিষ্ঠুর দৈহিক নির্যাতন করা হচ্ছে। সমীর ভট্টাচার্যের ঘটনাকে হত্যাকাণ্ড বলে পুলিশ কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন।

অন্তরের সমগ্র অনুভূতি ও আবেগ নিয়ে আজ আমরা দেশের প্রতিটি শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ, প্রতিটি দায়িত্বশীল সংস্থার নেতৃবৃন্দের কাছে আবেদন জানাচ্ছি — সমস্ত শক্তি দিয়ে ঐক্যবদ্ধ ভাবে ঘটনার এই অশুভ গতির মোড় ফেরান।"

বিবৃতিতে বলা হয়েছে "ভারতবর্ষের গণতন্ত্র রক্ষা করতে হলে কিছুতেই আমরা পশ্চিমবঙ্গে পুলিশী রাষ্ট্র প্রবর্তিত হতে দিতে পারি না। কৃষ্ণনগর থেকে কলকাতা — পুলিশ বাহিনীর এই প্রতিহিংসাপরায়ণ নরহত্যার অভিযানকে রোধ করতেই হবে। আমাদের তরুণ সম্প্রদায়ের একাংশ বিভ্রান্ত হতে পারেন কিন্তু এদের নির্বিচারে হত্যা করার, চরম দৈহিক নির্যাতন করার কোনো অধিকার পুলিশ বাহিনীর নেই। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের কাছে আমরা দাবি করছি অবিলম্বে এই পুলিশী সন্ত্রাস বন্ধ করুন।

আবার সমান জোর দিয়েই আমরা বলছি বর্তমানে রাজনৈতিক মতপার্থক্য রাজনৈতিকভাবে সমাধান না করে হিংসা ও ব্যক্তিগত হত্যার মাধ্যমে সমাধানের যে প্রবণতা দেখা যাচ্ছে তা অবিলম্বে বন্ধ করতেই হবে। মনে রাখতে হবে যে ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রম তা অন্যদলের রাজনৈতিক কর্মীর

বিরুদ্ধেই হোক বা কোনো সাধারণ পুলিশ কনষ্টেবল বা অফিসারের বিরুদ্ধেই হোক গণতান্ত্রিক অগ্রগতি বা সমাজ-বিপ্লব কোনো কিছুরই সহায়ক হতে পারে না।

সমাজ-বিপ্লবের পথ জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম, বিচ্ছিন্ন সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ নয়। কোনো রাজনৈতিক দলের বা মতের সন্ত্রাসের সাহায্যে জবরদস্ত কণ্ঠরোধ নয়, প্রতিটি রাজনৈতিক দলের মত প্রচারের পূর্ণ স্বাধীনতা; রাজনৈতিক বিতর্কের মীমাংসা ব্যক্তিগত হত্যাকাণ্ডে নয়, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমেই নীতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা — এই হোক সকলের সঙ্ঘবদ্ধ কর্মপ্রচেষ্টার মূল দৃষ্টিভঙ্গী।

বর্তমানে আমাদের দেশে ঘটনার ধারা যে বিপরীত বিপজ্জনক পথে চলেছে তাকে রোধ করতে না পারলে তার ফল হবে সর্বনাশা। কারণ একবার যদি গণতান্ত্রিক জীবন ও আন্দোলনের ধারা সন্ত্রাস পাল্টা সন্ত্রাসের আঘাতে বিপর্যস্ত হয়ে যায় তার পরিণতি হবে চরম প্রতিক্রিয়ার অভ্যুত্থান।

দল ও মত নির্বিশেষে সবাইকে আমরা আহ্বান জানাচ্ছি ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার সাহায্যে এই বিপজ্জনক সম্ভাবনাকে প্রতিহত করুন, জাতীয় জীবনে সুস্থতা ফিরিয়ে আনুন, জাতির অগ্রগতিকে নিশ্চিন্ত করুন।"

ইকবাল ইমাম

পূর্ববঙ্গের দিকে তাকান

পূর্ব বাঙলার মানুষ যখন গণতন্ত্রের স্বাদ পাবে বলে নির্বাচনী সংগ্রামের জন্য তৈরি, সমস্ত বিপত্তি দূর করে যখন জাতীয়তা অর্জনের লড়াইয়ে সামিল, ঠিক তখনই আমাদের চোদ্দো লক্ষ ভাই বোনকে লুঠ করে নিয়ে গেল সমুদ্রের লোনা জলের পর্বতপ্রমাণ উঁচু জোয়ার-কোটালের বান। এমন দুর্দৈব মানুষের ইতিহাসে কতবার ঘটেছে জানা নেই। মানুষ চাঁদে যায়, পরমাণু বিদারণ করে, অথচ প্রকৃতির অন্য অন্ধ শক্তিগুলির সম্পর্কে জ্ঞান তার এখনও সম্যক হয়নি। যদি হতো তবে আমাদের লক্ষ লক্ষ ভাই বোন বাঁচতো। তাহলে চোদ্দো লক্ষ মহাব্রহ্মাণ্ড অকালে নামহীন কবরে পশু ও সরীসৃপের সঙ্গে জড়াজড়ি করে চিরশয্যায় শায়িত হতো না। ভেসে যেত না সাধের সংসার, সোনার ধান, হাসি কান্না ভালোবাসা মমতা। মানুষের পরাজয় হয়েছে

প্রকৃতির অন্ধ দাপটের কাছে। এ পরাজয় থেকে শিক্ষা নেবার আছে। মারণাস্ত্রের প্রতিযোগিতা নয়, জীয়নকাঠি গড়ে তোলবার জন্যই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা কাজে লাগুক। অর্ধোন্নত দেশকে উন্নতদেশের স্তরে তুলে নেবার জন্য আন্তর্জাতিক নিঃস্বার্থ শ্রম, সেবা ও সহায়তা আসুক।

পূর্ববঙ্গের দক্ষিণাঞ্চল জনশূন্য হয়েছে। অন্যান্য রাষ্ট্র এ দুঃখে সমবেদনা জানাতে পারে। কিন্তু আমাদের কথা অন্য। আমাদেরই পরমাত্মীয়রা ভেসে গেছে। জীবিতরা হিরোসিমায় পারমানবিক আক্রমণের পরবর্তী অবস্থার সঙ্গে তুলনীয় দুর্দৈবের মধ্যে অসহায়, দীর্ণ, অনাথ। এইতো ভাইকে বুকে টানার সময়। এইতো ভারত-পাকিস্তানের মানুষের মৈত্রীকে মানবতার মর্যাদায় অভিষিক্ত করার সময়। পশ্চিমবঙ্গের লাখো তরুণকে পূর্ববঙ্গের এই বেদনার দিনে সেবাব্রতী হতে আহ্বান জানাই। পশ্চিমবঙ্গের ঘরে ঘরে বলি, সমস্ত সামর্থ্য দিয়ে জীবিতকে প্রাণ দাও, জীবনে বিশ্বাস দাও, জীবনের প্রতি আবার সে মমতা নিয়ে তাকাক। প্রকৃতির রুদ্ররোষের সম্মুখে এক সঙ্গে দুঃখকে ভাগ করে নেবার মধ্যেই হবে মৈত্রীবন্ধন সার্থক। দাবি জানাই, ভারত সরকারের কাছে এই ভয়াবহ দুর্যোগে আপ্রাণ সহায়তা দিতে। আবেদন করি, দুই বাঙলার মধ্যেকার কৃত্রিম বেড়া অন্ততপক্ষে এবারকার মতো খুলে যাক। পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষকে বলি, অযথা বাধা-নিষেধ দিয়ে সাহায্য ও সমবেদনা জানাবার মধ্যে ভেদপ্রাচীর তুলবেন না। চরম দুঃখের দিনে ভাই চায় ভাইয়ের বুকের আশ্বাস, সহমর্মিতা।

শুভব্রত রায়

প্রতিভার স্ফুলিঙ্গ : বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭০-১৮৯৯ খ্রী) জন্মের পর এক শতাব্দী অতিক্রান্ত হলো। এই স্বল্পায়ু প্রতিভাধর পুরুষের নাম আজ বাঙলা দেশে প্রায় অপরিচিত; অবশ্য তাঁর আরব্ধ কাজগুলির ওপর অকালে যবনিকাপাতই এজন্য প্রধানত দায়ী।

....প্রতিভার স্ফুরণের সঙ্গে প্রথাগত শিক্ষার সম্পর্ক যে অত্যন্ত শিথিল, বলেন্দ্রনাথ তার এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ। প্রবেশিকা পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েই তাঁর প্রথাগত শিক্ষার সমাপ্তি ঘটে; কিন্তু তাঁর মননশক্তির,

স্বচ্ছ চিন্তাধারার এবং সংস্কৃত ও বাঙলা সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন, চারুকলা, সামাজিক আচার প্রভৃতি নানা বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ও অধিকারের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর কর্মজীবনের বিভিন্ন কার্যধারায়।

বাল্যকাল থেকেই বলক্ষয়কর রোগে তিনি পীড়িত ছিলেন, একথা তাঁর শ্রাদ্ধবাসরে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উক্তি (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আশ্বিন ১৮২১ শক) এবং তাঁর মা প্রফুল্লময়ী দেবীর স্মৃতিকথা ('আমাদের কথা' প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৩৭) থেকে জানতে পারা যায় ; এর ওপর তাঁর বাবা বীরেন্দ্রনাথ তাঁর জন্মের আগে থেকেই মানসিক রোগে পীড়িত ছিলেন। এই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও বলেন্দ্রনাথ তাঁর মাত্র ২৯ বছরের জীবনে বহুমুখী কর্মশক্তি ও অভিনব সংগঠনী চিন্তার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর কাজের ধারাকে প্রধানত তিনটি ভাগে বিবেচনা করা যায়—স্বদেশী শিল্পবাণিজ্যের আন্দোলন, আর্য-সমাজ ও ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে মিলনের প্রয়াস এবং বাঙলা সাহিত্যের সেবা।

ঊনবিংশ শতকের শেষদিকে স্বদেশী শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারের যে আন্দোলনটি বাঙলা দেশে রূপগ্রহণ করেছিল, বলেন্দ্রনাথ তার এক উল্লেখ্য যোদ্ধা ছিলেন। শিল্পবাণিজ্যে অনগ্রসর দেশের অর্থনীতি যে দীর্ঘকাল বিদেশীর কুক্ষিগত থাকতে বাধ্য, সে বিষয়ে অল্পবয়সেই তিনি অবহিত হয়েছিলেন। বাঙলা দেশে প্রথম স্বদেশী ভাণ্ডার স্থাপনে তিনি এক মুখ্য অংশ নিয়েছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র সুরেন্দ্রনাথের সহযোগিতায় তিনি স্বদেশী কাপড়ের ব্যবসায়েরও সূচনা করেন ; বলেন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথের শ্রম ও উদ্যমেই এসব স্বদেশী বাণিজ্যচেষ্টা আরম্ভ হয় এবং পরে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং কিছু পরিমাণে এই প্রচেষ্টার সঙ্গে সম্পর্কিত হন। ব্যবসায় হিসেবে এসব প্রয়াস সাফল্যলাভ না করলেও এদেশে স্বদেশী আন্দোলনের বিকাশে অবশ্যই এগুলির যথেষ্ট গুরুত্ব আছে।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র হিসাবে বাল্যকাল থেকেই বলেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়েছিলেন। আদি ব্রাহ্মসমাজের নানা কাজের সঙ্গে তাঁর অল্পাধিক সম্পর্ক ছিল। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো; জীবনের শেষদিকে আদি ব্রাহ্মসমাজ ও আর্যসমাজের মধ্যে মিলন সাধনে তিনি প্রয়াসী হয়েছিলেন। আর্যসমাজের স্বামী দয়ানন্দের 'সত্যার্থপ্রকাশ', 'বেদভাষ্যভূমিকা' ইত্যাদি গ্রন্থ এবং নানা পুস্তিকা ও প্রবন্ধ পাঠ করে বলেন্দ্রনাথ আর্যসমাজের উদ্দেশ্য ও কার্যধারা সম্বন্ধে অবহিত হন ; পাঞ্জাব আর্যসমাজের

সীতারাম শাস্ত্রী প্রমুখ পণ্ডিতরা কলকাতায় এলে তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় বলেন্দ্রনাথ একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠায় আর্যসমাজীদের সংকল্প এবং বেদোক্ত শিক্ষায় তাঁদের আস্থা সম্বন্ধে ধারণা লাভ করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে আর্যসমাজের পণ্ডিতদের ধর্মালোচনার সময়েও বলেন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন। ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের ২১ মে ও ৩১ মে তারিখে যথাক্রমে লাহোরের 'আর্যপত্রিকা' ও 'আর্য মেসেঞ্জার' পত্রিকার সম্পাদককে লেখা দুটি চিঠিতে বলেন্দ্রনাথ আর্য-সমাজের মতবাদ ও পন্থা সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ব্যক্তিদের মতামত ব্যাখ্যা করে উভয় সমাজের মিলনাকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন; চিঠি দুটিতে একদিকে স্বামী দয়ানন্দের আদর্শ ও বক্তব্য সম্বন্ধে এবং অন্যদিকে ব্রাহ্ম সমাজের উদ্দেশ্য, শিক্ষা ও প্রচার পদ্ধতি সম্বন্ধে বলেন্দ্রনাথের জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আষাঢ় ১৮২০ শকাব্দ, পৃ, ৪২-৪৭)। স্বয়ংবর প্রথা, শুদ্ধির সাহায্যে ধর্মান্তরিত ও বিধর্মীদের হিন্দুধর্মে গ্রহণ, বিদেশযাত্রা, 'চৌকা' প্রথা বর্জন, ব্রহ্মচর্যাশ্রম ইত্যাদি সম্বন্ধে দয়ানন্দের প্রস্তাবিত কার্যধারা পাঞ্জাবে কতদূর কার্যকরী করা সম্ভব হয়েছিল, সে সম্বন্ধে বলেন্দ্রনাথ 'আর্যপত্রিকা'র সম্পাদককে অপর একটি চিঠিতে কয়েকটি প্রশ্ন করেন (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, শ্রাবণ ১৮২০ শকাব্দ, পৃ. ৬৩-৬৪); প্রশ্নগুলি পড়লেই বোঝা যায়, হিন্দুধর্মের রক্ষণশীল পুরাতন সংস্কার ও প্রথার নিগড় থেকে জনসাধারণকে মুক্ত করার চিন্তায় বলেন্দ্রনাথ কতদূর উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। বস্তুত বাঙলা দেশের ব্রাহ্মসমাজ এবং পাঞ্জাবের আর্যসমাজের মধ্যে একতাবিধানে তাঁর এই প্রয়াসের পিছনে নিছক ধর্মীয় আন্দোলনই নয়, পরন্তু নানা প্রতিক্রিয়াশীল সামাজিক প্রথা লোপের এবং বাঙলা ও পাঞ্জাবের চিন্তাশীল মানুষের মধ্যে ঐক্যস্থাপন ও মত বিনিময়ের প্রচেষ্টাও উপলব্ধি করা যায়।

অচিরেই বলেন্দ্রনাথের প্রয়াস ফলপ্রসূ হতে থাকে। ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে রাঁচি-আর্যসমাজের বার্ষিক উৎসবে বলেন্দ্রনাথ আমন্ত্রিত হন এবং সেখানে তাঁর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আর্যসমাজীরা তাঁর সঙ্গে রাঁচি ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক উপাসনায় যোগ দেন। এরপর ঐ বছর নভেম্বর মাসে লাহোর আর্যসমাজের ২১শ বার্ষিক সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়ে বলেন্দ্রনাথ লাহোরে পৌছালে তাঁকে স্টেশনেই স্বাগত জানান লালা লাজপত রায়, লালা হংসরাজ, পণ্ডিত সীতারাম শাস্ত্রী প্রমুখ বহু ভারতবিখ্যাত নেতা। দয়ানন্দ অ্যাংলো-বেদিক কলেজ প্রাঙ্গনে, বছোয়ালি আর্যসমাজ মন্দিরে এবং অন্যান্য স্থানে

অনুষ্ঠিত সভায় উভয় সমাজের চিন্তাধারার সাদৃশ্য সম্বন্ধে আলোচনা করে তিনি দুই সমাজের মধ্যে মৈত্রী, ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, অবাধ মতবিনিময় এবং পরিণামে মিলনের আহ্বান জানান। ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের ২৯ নভেম্বর লাহোর পাঞ্জাব ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে বলেন্দ্রনাথের উদ্যোগে যুক্ত উপাসনা সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং উভয় সমাজের সদস্যেরাই যোগ দেন। এরপর ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে একই উদ্দেশ্যে বলেন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার লাহোরে যান, ফেরার পথেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং কয়েক মাস পরে তাঁর মৃত্যু হয়।

পাঞ্জাবে তাঁর প্রচেষ্টা সম্বন্ধে যে কতদূর আগ্রহ ও উৎসাহের সঞ্চার হয়েছিল লাহোরের 'আর্য পত্রিকা'য় প্রকাশিত শোকসংবাদে এবং পাঞ্জাব আর্যপ্রতিনিধি সভায় গৃহীত শোকপ্রস্তাবে তার পরিচয় পাওয়া যায় (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আশ্বিন ১৮২১ শকাব্দ, পৃঃ ১০২)। সে যুগের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দেশের দুই প্রান্তের এবং দুই ধর্মসমাজের লোকের মধ্যে ঐক্যস্থাপনের প্রয়াস নিঃসন্দেহে প্রগতিশীলতার পরিচায়ক ছিল।

বাঙলা সাহিত্যের আসরে—বলেন্দ্রনাথের অবদান সংক্ষিপ্ত হলেও প্রতিভায় ও স্বকীয়তায় উজ্জ্বল। তাঁর বাল্যকালে প্রধানত জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির বালকদের লেখা প্রকাশের উদ্দেশ্যে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদনায় 'বালক' পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়; এই পত্রিকাতেই তাঁর প্রথম মুদ্রিত দুটি রচনা— 'একরাত্রি (বালকের রচনা)' নামে প্রবন্ধটি (বালক, জ্যৈষ্ঠ ১২৯২) এবং 'সন্ধ্যা' কবিতাটি (বালক, ফাল্গুন ১২৯২) প্রকাশিত হয়। ১২৯২ বঙ্গাব্দ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত 'বালক' 'ভারতী ও বালক,' 'সাধনা', 'সাহিত্য,' 'প্রদীপ' প্রভৃতি নানা সাময়িকপত্রে তাঁর লিখিত অনেকগুলি প্রবন্ধ ও কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। এগুলির মধ্যে কিছু কিছু তিনটি পুস্তকের আকারে তাঁর জীবিতকালেই সংকলিত হয়েছিল—'চিত্র ও কাব্য' নামে প্রবন্ধসংগ্রহ (১৩০১ ভাদ্র), 'মাধবিকা' (১৩০৩ বৈশাখ) এবং 'শ্রাবণী' (১৩০৪ আষাঢ়) নামে দুটি কাব্যগ্রন্থ। তাঁর মৃত্যুর পরে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে তাঁর ঐ তিনটি গ্রন্থ এবং মাসিকপত্রে বিক্ষিপ্ত কিছু রচনা নিয়ে 'স্বর্গীয় বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী' প্রকাশিত হয়; পরে ১৩৫৯ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ 'বলেন্দ্র-গ্রন্থাবলী'র আরও সুসম্পূর্ণ একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন।

রবীন্দ্রনাথ বলেন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্মে উৎসাহ ও উপদেশ দানে সাহায্য করেছিলেন। ১৩০৬ বঙ্গাব্দের আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যা 'প্রদীপে' রবীন্দ্রনাথ

লিখেছিলেন : "বলেন্দ্র কোন রচনায় প্রবৃত্ত হইবার বিষয় লইয়া আমার সহিত আলোচনা করিতেন।" এমনকি বলেন্দ্রনাথের অসমাপ্ত একটি প্রবন্ধ তাঁর মৃত্যুর পরে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সম্পূর্ণ করে সেটি প্রকাশের ব্যবস্থা করেন ('শিবসুন্দর, প্রদীপ, ১৩০৬ আশ্বিন-কার্তিক)।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কাছের মানুষ হলেও রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে বলেন্দ্রসাহিত্য অনেক পরিমাণেই মুক্ত ছিল। বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলি পাঠ করলে মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের 'বিচিত্র প্রবন্ধ' দিয়ে প্রবন্ধরচনার যে ধারাটির সূচনা হয়েছিল বাঙলা সাহিত্যে বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধে তারই যেন সফল বিকাশ ঘটেছে। পরিচ্ছন্ন রুচিবোধ, স্বদেশের উৎসব-অনুষ্ঠানে আগ্রহ এবং সৌন্দর্যজ্ঞান সম্ভবত তিনি রবীন্দ্রপ্রভাবের বৃত্ত থেকেই আহরণ করেছিলেন, কিন্তু যে ছন্দময় গদ্য তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য, তিনি স্বয়ং তার স্রষ্টা। রবীন্দ্রযুগে রবীন্দ্রসান্নিধ্যে বাস করেও এই স্বকীয়তার প্রকাশ বলেন্দ্রনাথকে মৌলিক গদ্যশিল্পীর আসনে বসিয়েছে।

বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধের বিষয়বৈচিত্র্য লক্ষণীয়; কাব্য, চারুকলা, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য, হৃদয়বৃত্তি, নিসর্গশোভা, ধর্ম, সমাজ, প্রাচীন সংস্কৃতি, উৎসব, প্রসাধনকলা ইত্যাদি বহু ভিন্নমুখী বিষয়ের আলোচনা তাঁর বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেক-ক্ষেত্রেই ভাষার সংযম এবং বিষয়ানুগ শৈলীর প্রয়োগ লক্ষ্য করার মতো। ভাষায় আড়ম্বরের ভার নেই, অলঙ্কারের বোঝা নেই, অস্বাভাবিক ও অকারণ উচ্ছ্বাস সুষ্ঠু আলোচনার পথে কোথাও বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। যে সংযম গদ্যসাহিত্যের উৎকর্ষের পক্ষে অনিবার্য, তার যথাযথ ব্যবহারে বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলি এক নিবিড় রসঘনত্ব লাভ করেছে, উচ্ছ্বাসের অনুপ্রবেশে বক্তব্যের তারল্য সৃষ্টি হয়নি।

গদ্যসাহিত্যে ভাবোপযোগী ভাষার ব্যবহার বলেন্দ্রনাথের রচনার এক বিশেষ গুণ। কোথাও তাঁর ভাষা গম্ভীর, ঋজু ও স্বচ্ছ, কোথাও ছন্দময়ী, কাব্যধর্মী ও মেদুর, আবার কোথাও-বা সে ভাষা সরসতা ও দৃঢ়তার এক সুসমঞ্জস সমাহার। ভাষার কোথাও জটিলতার লেশমাত্র নেই, মালিন্যের কোনও ছায়াপাত ঘটেনি।

শব্দচয়নে বলেন্দ্রনাথের কৃতিত্ব অবিসংবাদী। তাঁর প্রতিটি শব্দ কানে প্রসন্ন ধ্বনির সৃষ্টি করে, মনে নিখুঁত চিত্রের অংশবিশেষ গড়ে তোলে, ভাষাকে ·ন করে স্বচ্ছন্দ সাবলীল লাবণ্য। তিনি যেন এক ভাষার ভাস্কর, সাহিত্যের

মন্দিরকে যেন তিনি সাজিয়েছেন খণ্ড খণ্ড মনোরম শব্দের, যুগ্ম-ধ্বনির, অনুপ্রাসের অনুপম অলঙ্করণে। তাঁর গদ্যরচনার ছন্দ মূলত এই শব্দসুষমার উপরেই নির্ভর করেছে। তাঁর প্রবন্ধের অবিক্ষত সৌন্দর্য বহু পরিমাণেই এই শাব্দিক সৌকুমার্যের সাহায্যে বিকশিত হয়ে উঠেছে।

তাঁর কতকগুলি প্রবন্ধে কাব্যসমালোচনার প্রসঙ্গে নিরপেক্ষ বিচার, যুক্তিপূর্ণ রসজ্ঞান এবং মতপ্রকাশের নির্ভীকতা পরিস্ফুট হয়েছে। যেমন, 'কালিদাসের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা' প্রবন্ধে বলেন্দ্রনাথ করুণরস ও হৃদয়াবেগের অভিব্যক্তিতে বা হিমালয় ও সমুদ্রের বর্ণনায় কালিদাসের পটুতার অভাব বিনাদ্বিধায় উদ্‌ঘাটন করেছেন, অথচ খণ্ড খণ্ড চিত্ররচনায় কালিদাসের দক্ষতাকে সম্যক স্বীকৃতি জানিয়েছেন; 'জয়দেব' প্রবন্ধে জয়দেবের কাব্যের ভাবদৈন্য যেমন তিনি দ্বিধাহীনভাবে তুলে ধরেছেন; তার শাব্দিক গীতঝঙ্কারও তেমনি তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি।

বলেন্দ্রনাথের বহু প্রবন্ধেই ভারতের অতীত সংস্কৃতি ও গৌরব সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ ও আকর্ষণ দেখা যায়; 'কণারক,' 'খণ্ডগিরি,' 'বারাণসী' প্রভৃতি প্রবন্ধে এর উদাহরণ মেলে। এদেশের উৎসবে অনুষ্ঠানে অন্তরের আদানপ্রদান এবং আতিথেয়তার প্রকাশ সম্বন্ধে তিনি 'শুভ উৎসব' ও 'নিমন্ত্রণ-সভা' প্রবন্ধ দুটিতে সবিস্তারে আলোচনা করেছেন; 'প্রাচ্য প্রসাধন-কলা' প্রবন্ধে দেশীয় প্রসাধনের মনোহারিতা এবং প্রকৃতির সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সম্বন্ধে তিনি সপ্রশংস উক্তি করেছেন। এসব আলোচনা থেকে তাঁর স্বদেশপ্রীতির পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁর একাধিক প্রবন্ধে এদেশের প্রথা ও আচারের অন্তর্নিহিত কল্যাণশ্রী উদ্‌ঘাটনের প্রয়াস দেখা যায়।

তাঁর অল্প কয়েকটি প্রবন্ধে বিজ্ঞানবিষয়ক আলোচনা দেখতে পাওয়া যায়; উদাহরণ স্বরূপ 'অভিব্যক্তির নূতন অঙ্গ,' 'অভিব্যক্তি সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর,' 'কৃত্রিম দাম্পত্য নির্বাচন,' 'ক্রিমিন্যাল মানবতত্ত্ব' প্রভৃতি প্রবন্ধের উল্লেখ করা যায়।

প্রবন্ধের তুলনায় কবিতায় বলেন্দ্রনাথের সাফল্য অপেক্ষাকৃত কম। অবশ্য গদ্যের তুলনায় পদ্যে রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে তাঁর মুক্তি স্পষ্টতর। তাঁর কবিতায় ছন্দ ও ভাষার সৌন্দর্য উপভোগ্য। কবিতার বিষয়বস্তু প্রধানতঃ নানা পারিপার্শ্বিকে কবির মনের ভাব; অনেক ক্ষেত্রেই কবি চিন্তা প্রেম ও প্রেয়সীতে সীমাবদ্ধ। সংকীর্ণ বিষয়বস্তু সত্ত্বেও আন্তরিকতা ও সারল্যের

উষ্ণতার জন্যে বৈচিত্র্যের অভাব বড় অনুভূত হয় না। সনেট, ব্রহ্মসংগীত ইত্যাদিতে কবির সেই উদাস, প্রেমাতুর, অন্তরালবাসী সত্তাটির আবেদন মনকে স্পর্শ করে, বর্ষায় বসন্তে যার অনুরাগের রক্তিমে বহির্বিশ্ব রঞ্জিত হয়ে যায়, যার কল্পনার আলো প্রেমারাধনার শাশ্বত প্রদীপে দীপ্যমান।

তাঁর অধিকাংশ কবিতা বাস্তব জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন, প্রাত্যহিক জীবন তাঁর কাব্যে অনুপস্থিত মানসী ও নিসর্গ সম্বন্ধে তাঁর উচ্ছ্বাস ও ভাবপ্রণতা কিছুটা অসংযত। এক অতৃপ্ত কামনার রেশ তাঁর কবিতায় প্রবহমান।

বলেন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত জীবনে তাঁর প্রতিভার সম্পূর্ণ পরিণতি আশা করা যায় না। কিন্তু তাঁর সম্ভাবনা ছিল। সেই অসম্পূর্ণ সম্ভাবনাকে স্বীকৃতি দেওয়া তাঁর প্রতি শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধার্ঘ্য।

দেবজ্যোতি দাশ

মার্কসবাদের অন্যতম স্রষ্টা ফ্রীডরিখ এঙ্গেলস

বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদের অন্যতম জনক ফ্রীডরিখ এঙ্গেল্‌স্-এর সার্ধশত জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে কলকাতার নাগরিকদের এই সভা* তাঁর স্মৃতির প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা নিবেদন করছে।

কাল্ মার্কস-এর আজীবন সখা ও সহযোগীরূপে ফ্রীড্‌রিখ্‌ এঙ্গেল্‌স্ মানবচিন্তা ও কর্মকে বিপুলভাবে অগ্রসর করে দিয়েছিলেন। তাঁরা উভয়ে মিলে দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ এবং শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত জগদ্ব্যাপী সমাজবাদী সংগ্রামের নীতি পদ্ধতি ও শক্তিকে এগিয়ে নিয়েছিলেন। বিশ্ব ইতিহাসের বর্তমান পর্যায়ে শ্রমিকশ্রেণীর মৌল ভূমিকা এবং তার বিপুলসামর্থ্য ও সম্ভাবনার ব্যাখ্যা মার্ক্‌স্ এবং এঙ্গেল্‌স্ করেছিলেন। ফ্রীডরিখ্ এঙ্গেল্‌স্-এর বিশ্ববিহারী মনীষা সর্বদেশের মানুষের চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে বিচরণ করার শক্তি রাখত। বিশেষ করে প্রকৃতিবিজ্ঞান ও সমরবিদ্যা বিষয়ে তাঁর ছিল অসামান্য ব্যুৎপত্তি। পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, প্রাণিতত্ত্ব সম্পর্কে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের বিধান প্রয়োগে তিনি সার্থকতা অর্জন করেছিলেন।

* ফ্রীডরিক এঙ্গেলসের ১৫০তম জন্ম দিবস ২৮শে নভেম্বর-এ ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে ভারত-গণতান্ত্রিক জার্মানি মৈত্রী সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত কলকাতার নাগরিকদের জনসভায় গৃহীত; অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক উত্থাপিত ও শ্রীত্রিদিব চৌধুরী কর্তৃক সমর্থিত প্রস্তাব।

প্রকৃতি এবং মানব সমাজের ক্ষেত্রে মার্কসবাদকে একমাত্র সুসঙ্গত তাত্ত্বিক প্রকরণরূপে স্থাপিত করার কাজে সহায়তা এসেছে তাঁর বহু গ্রন্থ থেকে, যার মধ্যে উল্লেখ করা যায় "Dialectics of Nature" "পরিবার, ব্যক্তিস্বত্ব ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি" এবং "বানর থেকে নরে বিবর্তনে শ্রমের ভূমিকা।" মার্ক্স্-প্রণীত "ক্যাপিটাল" মহাগ্রন্থের দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের সম্পাদনা এঙ্গেলস্-এর এক অমর কীর্তি, শ্রমিকশ্রেণী এবং সঙ্গে সঙ্গে সর্বজনের মুক্তি প্রয়াসে তাঁর অবিস্মরণীয় অবদান। 'সাম্যবাদী সংস্থা' এবং 'আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন' প্রতিষ্ঠায় মার্ক্স্-এর সঙ্গে ঐকান্তিকভাবে যুক্ত থেকে ভবিষ্যতে শ্রমিকের শ্রেণীসংগঠনের নূতন আদর্শ তিনি সৃষ্টি করেছিলেন। অভিন্নহৃদয় বন্ধু মার্ক্স্-এর সঙ্গে মিলে আজীবন তিনি দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ এবং নৈরাজ্যবাদী দৌরাত্ম্যের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম করেছিলেন।

ইংরেজ এদেশ জয় করার পর্ব থেকে এদেশের অবস্থা উপলব্ধি করার কাজে মার্ক্স্ এবং এঙ্গেল্স্ যে অবদান রেখে গেছেন, তা অমূল্য। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা তাঁরা প্রকাশ করেছেন। ১৮৫৭ সালের সশস্ত্র বিদ্রোহকে ভারতীয় জনগণের জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম বলে জয়জয়কার জানিয়েছিলেন। তিনি অকুণ্ঠে ও সতেজে প্রকাশ করেছিলেন তাঁর পরিপূর্ণ আস্থা যে ভারতবর্ষের জনগণ নিজের মুক্তি সাধন এবং নবসমাজ জয় করে নেবার শক্তি রাখে।

জগতের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় একজন শ্রুতকীর্তি মহাপুরুষ রূপে এঙ্গেল্স্ যুগযুগ ধরে পরিগণিত থাকবেন। তাঁর স্থান মেহনতী মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ মুক্তিসাধকদের সঙ্গে, বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর নেতা হিসাবে তাঁর স্থান হলো সর্বোচ্চ শিখরে। এই সভা বারবার তাঁর অমর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করছে

গামাল আবদাল নাসের

ভি. ভি. বালাবুশেভিচ

এরিখ মারিয়া রেমার্ক

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

কালীপদ পাঠক

জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়

চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন

কে. এন. যোগলেকর

এস. ভি. ঘাটে

পরিচয়-এর পরম সুহৃদ, বিশিষ্ট লেখক, প্রগতিশীল সংস্কৃতিসেবী ও শিক্ষাব্রতী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় অকালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। আমাদের বেদনা জানাবার ভাষা নেই। তাঁর অসংখ্য গুণমুগ্ধের মতো আমরাও শোকার্ত। তাঁর স্বজনপরিজনকে আমরা তাঁর মৃত্যুতে সমবেদনা জানাচ্ছি। আগামী সংখ্যায় প্রয়াত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়-এর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে রচনা প্রকাশিত হবে। সম্পাদক

পরিচয়-এর গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ী বন্ধুদের প্রতি আবেদন

ইতিমধ্যে যাঁদের গ্রাহক-চাঁদা শেষ হয়েছে বা
এ-সংখ্যার সঙ্গে শেষ হচ্ছে
তাঁদের কাছে নতুন করে চাঁদা পাঠাবার জন্য
আবেদন জানিয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে।
শুভানুধ্যায়ী গ্রাহকদের চাঁদা
আসতেও শুরু করেছে।
যাঁদের চাঁদা জানুয়ারি মাসের মধ্যে এসে পৌঁছবে না,
তাঁদের চাঁদা না-আসা-পর্যন্ত
পরবর্তী সংখ্যা পাঠানো স্থগিত রাখা হবে।
অনুগ্রহ করে চাঁদা পাঠিয়ে
পরিচয়ের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন।

ম্যানেজার
পরিচয়
৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলকাতা-৭

Bata
বাটা সানওয়ে
আরো আরামভরা আরো শৌখিন বাটার সানওয়ে
স্যান্ডাল যুগপৎ স্নিগ্ধ বিলাসী ও হালকা।
যেখানে-খুশি যখন-খুশি পায়ে দিন - দেখবেন
কখনো আর পা থেকে খুলতে ইচ্ছে করছে না। এতই
ভালো। স্যান্ডাল পরার এ এক নতুন শৌখিন
সুখ—স্বাচ্ছন্দ্যের এক নতুন আবেশ। আজই পায়ে
গলিয়ে নিন - সানওয়ে—বাটার সর্বাধুনিক স্যান্ডাল :
তার নকশায় সুরুচি নকশায় আরাম।
সানওয়ে ২৭
সাইজ ৪—১০
সানওয়ে ১৮
সাইজ ৪—১০

৪৬নং

চিন্মোহন সেহানবীশ

৪৬নং ধর্মতলা ষ্ট্রীট। ১৯৪১ সাল থেকে ১৯৫৮ পর্যন্ত এই বাড়ির দোতলার কয়েকখানা ঘর জুড়ে ছিল বাঙাদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতি আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র। গণনাট্য সঙ্ঘ, ফ্যাসিবিরোধী লেখক সঙ্ঘ ইত্যাদির সদর দপ্তর ছিল এই ৪৬নং-এ। সাংস্কৃতিক আন্দোলনে আন্তর্জাতিক মনীষার সংযোগের সেতুও রচনা করেছিল ৪৬নং। এই পর্বের বিভিন্ন ক্রিয়াকর্মের ইতিহাস বৈঠকী চালে বিবৃত করেছেন এই আন্দোলনের অন্যতম নায়ক শ্রীচিন্মোহন সেহানবীশ।

দাম: ৬০ পয়সা

মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড

কলকাতা-বারো

Sulekha®
drawing ink
AVAILABLE IN
EIGHT
DIFFERENT
COLOURS.
SULEKHA
WORKS
LTD.
SULEKHA PARK.
CALCUTTA - 32
ardeeyar

পরিচয়
বর্ষ ৪০ । সংখ্যা ৫
অগ্রহায়ণ । ১৩৭৭

সূচিপত্র

উপদেশকমণ্ডলী

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য । হিরণকুমার সান্যাল । সুশোভন সরকার । অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র । গোপাল হালদার । বিষ্ণু দে । চিন্মোহন সেহানবীশ । সুভাষ মুখোপাধ্যায় । গোলাম কুদ্দুস ।

সম্পাদক

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । তরুণ সান্যাল

প্রচ্ছদ

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

পরিচয় প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত ।

এ-নির্বাচনে রণধ্বনি

এক। লোকসভার সার্বভৌমত্বের ক্ষমতায় জোর দিয়ে সংবিধানে মৌলিক প্রগতিশীল পরিবর্তন ;

দুই। মৌলিক কৃষি-সংস্কার এবং চাষীর ফসলের ন্যায্য দাম ;

তিন। শক্তহাতে একচেটিয়া বিরোধী কাজ এবং ব্যাঙ্ক জাতীয়-করণের অনুবর্তী কাজ হিসাবে মূল্যবৃদ্ধি ও বেকারীর নিরাকরণ ;

চার। শ্রমিকশ্রেণীর দাবী মেটানো এবং ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের বিস্তৃতি ;

পাঁচ। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে শক্তিশালীকরণ এবং পশ্চাদপদ ও সংখ্যালঘু অংশের গণতান্ত্রিক অধিকার সুরক্ষণ ;

ছয়। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও ঔপনিবেশিকতা বিরোধী গোষ্ঠীনিরপেক্ষতার বলিষ্ঠ বৈদেশিক নীতি; নয়া ঔপনিবেশিক আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতের জাতীয় স্বার্থ রক্ষা।

পরিচয়
বর্ষ ৪০ । সংখ্যা ৫
অগ্রহায়ণ । ১৩৭৭

বাঙলাদেশের আধুনিক শিক্ষাসঙ্কট

ডক্টর অমূল্যচন্দ্র সেন

ভারতের শিক্ষাসমস্যা সম্বন্ধে অনেক শিক্ষক ও রাজনৈতিক প্রভৃতিরা এ-যাবৎ নানা আলোচনা ও মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের জীবনকালেই ১৯১৭'র Sadler Commission হইতে আরম্ভ করিয়া আরও কত অনুসন্ধান-ফল, মোটামোটা রিপোর্ট প্রভৃতি দেশী-বিদেশী গণ্যমান্য অভিজ্ঞগণ দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে, সর্বশেষ যতদূর স্মরণ হয় ডক্টর কোঠারি-র অধিনেতৃত্বে ১৯৬৪'র মাঝামাঝি হইয়াছিল, এগুলির প্রধান বিবেচ্য ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম-পরিচালনা, গঠন প্রভৃতি বিষয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মূলে থাকে হাই-স্কুল বা মাধ্যমিক শিক্ষা, তাহারও আদিতে থাকে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষা। বাড়ির তিনতলা নির্ভর করে দোতলা একতলা ও ভিতের উপর। সুতরাং নির্মাণ ও সংস্কার উভয় বিষয়েই গোড়া বাদ দিয়া ডগার বিবেচনায় কোনও ফল হয় না। সুতরাং শিক্ষাসমস্যা সম্বন্ধে কিছু বিবেচনা করিতে হইলেই নিম্ন-প্রাথমিক স্তর হইতে আরম্ভ করা উচিত।

বর্তমানের ও আধুনিকের মূল থাকে নিকট অতীতে, এবং তাহার মূল থাকে দূর অতীতে। কোনও কিছুরই মূল একটামাত্র থাকে না, একই মূলের নানা শাখা-প্রশাখা চারিদিকে বিস্তারিত হইয়া যেখানে সরস জমি পায় সেখান হইতে রস সংগ্রহ করিয়া নিজের প্রয়োজন সাধন ও পুষ্টি বর্ধন করে, ইহা যেমন উদ্ভিদের তেমনি সকল প্রাণবানের ধর্ম। আবার শুধু মূল নয়, উদ্ভিদের ডাল-পালাও যেদিকে সূর্যালোক পায় সেদিকে প্রসারিত হইয়া জীবনীশক্তি বাড়াইয়া ফুল-ফল প্রসব করে। ইহাও জীবের ধর্ম। সুতরাং মূল বলিতে কেহ যেন অতিসঙ্কীর্ণ ক্ষুদ্র একটা কিছুর উপরই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন না, নানা পারিপার্শ্বিক অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাত বিবেচনা করিয়া মূলের অনুসন্ধান করিতে হয়।

২

দূর অতীত বা অতি-প্রাচীনের কথা অতএব প্রথমে বিবেচনা করি। ইহার আভাস পাই বেদ-পুরাণ-মহাভারতে। বেদে পাই ছাত্রেরা লোকালয়েই, তপোবনে নয়, গুরুগৃহে গিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিত; পুরাণে কিন্তু পাই লোকালয়ে নয়, তপোবনে গুরুগৃহের কাহিনী—সোম গুরুপত্নী তারাকে হরণ করিলেন—পুরাণের বিবরণে এই গুরুগৃহ বনের মধ্যে, (পড়িলে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না যে তারা-ই নিরীহ সুদর্শন সোমের পিছনে লাগিয়াছিলেন, সোম বেচারির দোষ খুব বেশি ছিল না!); দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র কচ ও দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানী প্রভৃতি কত গল্প, আবার কোনও ছাত্র নিজশরীর দ্বারা ভাঙা আলের জল আটকাইল বা আকন্দপাতা খাইয়া অন্ধ হইয়া গেল ইত্যাদি। মনু প্রভৃতির নানা ধর্মশাস্ত্রে ছাত্রজীবন সম্বন্ধে যত নিয়মাবলির উল্লেখ আছে, তাহাতেও গুরুগৃহে বাসের উল্লেখ দেখা যায়। বিদ্যাভ্যাসের সঙ্গে নানাবিধ কৃচ্ছ্রাভ্যাস এইসব নিয়মাবলিতে প্রাধান্য পাইয়াছে, আবার গুরু অনুপস্থিত থাকিলে গুরুপত্নীর ঋতুরক্ষা ছাত্রের কর্তব্য প্রভৃতিও অনেক কথা আছে। কৃচ্ছ্রাভ্যাসের বিধিনিষেধগুলি শুধু Spartan ধরণের নয়, তাহাতে ascetical ভাব প্রবল, মনে হয় ইহার পিছনে সন্ন্যাসধর্মের আদর্শ ও স্মৃতি ছিল। ছাত্রেরা যে প্রায়ই adult, তাহাও বেশ বুঝা যায়, যেমন গুরুপত্নীর ঋতুরক্ষা, সোম ও কচ-কাহিনী প্রভৃতি হইতে। বৈদিক ব্রাহ্মণদের প্রধান শিক্ষার বিষয় ছিল গুরুমুখে শুনিয়া (পুঁথি হইতে পড়া দূষণীয় বিবেচিত হইত) বেদ কণ্ঠস্থ করা—একটি বর্ণনায় আছে ছাত্রেরা উচ্চৈস্বরে বেদাভ্যাস করিতেছে, শুনিলে মনে হয় যেন একপাল ব্যাঙ ডাকিতেছে। হয়তো এই ছাত্ররা adult নয়, অল্পবয়সী ছিল। কালক্রমে দেখি শুধু বেদপাঠ ছাড়া আরও অনেক বিষয় শিক্ষা করিতে হইত, যেমন ছন্দ জ্যোতিষ ব্যাকরণ প্রভৃতি। অ-ব্রাহ্মণদের ছুতার প্রভৃতি vocational crafts শিক্ষার উল্লেখ দেখা যায়।

মহাভারত পুরাণ প্রভৃতিতে ছাত্রদের তপোবনে বাস খুব ফলাও করিয়া বলা হইয়াছে, তাহা সহরে বা গ্রামে বা তাহার কাছাকাছি নয়, গভীর বনের মধ্যে। রাজা দুষ্মন্ত মৃগয়ায় বাহির হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে কণ্বমুনির যে আশ্রমে শকুন্তলার সাক্ষাৎ পান সেখানে (যদিও কণ্ব তখন সেখানে ছিলেন না) পঠন-পাঠন না হইতেছে এমন বিষয় নাই। ইহাতে নিঃসন্দেহ প্রাচীনকালের স্মৃতি ও উত্তরকালের পরিণতি, দুইই রহিয়াছে। নৈমিষারণ্যে শৌনকের আশ্রম

পুরাণ-মহাভারতে প্রসিদ্ধ। এখানে বয়স্ক মুনি-ঋষিরা মিলিত হইতেন, অল্পবয়স্ক ছাত্রেরা নয়—ইহাও প্রাচীন তথা উত্তরকালের স্মৃতিতে রচিত। প্রাচীনকালের কি স্মৃতি ইহাতে রহিয়াছে তাহা ক্রমে বলিতেছি—উত্তরকালের সন্ন্যাসধর্মী প্রতিষ্ঠানগুলি যে প্রকাণ্ড শিক্ষাকেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে-কথাও পরে বলিতেছি। উপনিষদগুলির রচনাকাল খ্রীষ্টপূর্ব ৫-৩ শতকে অর্থাৎ বেদ রচনা-কালের প্রায় ৬-৮ শতক পরে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বর্ণিত আছে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য সশিষ্যদলে বিদেহরাজ জনকের যজ্ঞে আসিয়া ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া "একসহস্র" গরু উপহার পাইলেন এবং শিষ্যগণসহ সেই গোদল খেদাইয়া নিজের তপোবন আশ্রমে লইয়া গেলেন। ইহা নিশ্চয়ই সমসাময়িক ঘটনার বর্ণনা নয়, ইহাতে অনেক কল্পনা ও প্রাচীন-স্মৃতি জাগরণের প্রয়াস আছে, কারণ অল্প পরেই দেখাইব খ্রীষ্টপূর্ব ৫-৩ শতকে অর্থাৎ মোটামুটি উপনিষদ বা বুদ্ধযুগে তপোবনে শিক্ষাক্ষেত্রের কথা অনৈতিহাসিক।

নেহাৎ প্রসঙ্গক্রমে বলি, রবীন্দ্রনাথ পৌরাণিক তপোবন-আশ্রমের আদর্শে না হউক, কালিদাসের শকুন্তলা নাটকে বর্ণিত কণ্বাশ্রমের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া শান্তিনিকেতনে প্রথমে যে ব্রহ্মচর্যাশ্রম করিয়াছিলেন এবং পরে যাহা বিশ্বভারতী হইয়াছিল, আজ তাহার পরিণতি কি হইয়াছে? কেন্দ্রীয় সরকারের দাক্ষিণ্যে অর্থাভাব দূর হওয়ার পর আজ সেখানে কতটুকু ব্রহ্মসাধনা বা জ্ঞানান্বেষণ বা শিক্ষক-ছাত্রের অঙ্গাঙ্গীভাব বা আশ্রম-তপোবনের বাতাবরণ বিরাজমান? যেটুকু অবশিষ্ট আছে (যদিবা পূর্বে আদৌ কিছু থাকিয়া থাকে!) তাহা symbolical বহিঃশোভা বা ঢং ছাড়া আর কি? বাকি সবই তো নূতন নূতন বড়বড় বাড়িঘর, অন্য যে কোনও কৃত্রিম প্রাণহীন ইউনিভার্সিটিরই মতো নানা ক্রিয়াকাণ্ডময় জটিলতা, বিভ্রাট ও বৈফল্যের বিলাপলীলা মাত্র!

৩

শিক্ষাপ্রসঙ্গ ছাড়িয়া প্রাচীনভারতের খাঁটি ইতিহাস একটু আলোচনা করি। সে-যুগে সারাদেশ বনময় ছিল সত্য। হড়প্পা মোহেঞ্জোদাড়োতে খুব উন্নত ধরণের সহুরে সভ্যতা (urban culture) ছিল। প্রত্নতাত্ত্বিকদের নানাস্থান খননের ফলে আজ আমরা জানি তথাকথিত 'সিন্ধুসভ্যতা' শুধু হড়প্পা-মোহেঞ্জোদাড়োতে বা সিন্ধুনদীর কূলেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তাহার বাহিরে উত্তরপশ্চিম-পূর্বদক্ষিণ সবদিকেই বহুদূর পর্যন্ত বহু ছোটবড় সহরে ইহার বিস্তার হইয়াছিল। কিন্তু

এইসব ছোটবড় সহরের অল্প বাহিরেই যে গভীর বন-জঙ্গল ছিল তাহার প্রমাণ এই—এইসব সহরের অধিকাংশ বাড়িঘর রাস্তাঘাট কূয়া প্রভৃতি পোড়া ইটে তৈয়ারি ; ইটের পাঁজা পোড়াইতে অনেক আগুন কাঠ লাগে, অত কাঠ নিশ্চয়ই বেশিদূর হইতে আনা সম্ভবপর ছিল না, অবশ্যই তাহা সন্নিকটের বন-জঙ্গল হইতে আনা হইত। যে-দেশে বৃষ্টি সামান্য হয় সেখানকার বাড়িঘর পোড়া ইটে নয়, রৌদ্রে শুকানো ইটে বা কাদামাটিতে বানানো হয় ; যে-দেশে পোড়া ইটের প্রচলন সেখানে অতএব বুঝিতে হয় বৃষ্টি বেশি হইত। যেখানে বৃষ্টি বেশি সেখানে বন-জঙ্গলও বেশি হইয়া থাকে, আবার যেখানে বন-জঙ্গল কম বা নাই সেখানে বৃষ্টিও কম হয়, যেমন মরুময় দেশে। হড়প্পা-মোহেঞ্জোদাড়ো এমনকি সমগ্র পঞ্জাব আজ ঊষর অল্পবৃষ্টি দেশ কিন্তু প্রাচীনযুগে সেরূপ ছিল না ; বন-জঙ্গল কাটিয়া ক্রমে নষ্ট করিয়া ফেলায় সুবৃষ্টি দেশ আজ ক্রমে মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে এবং আরও হইতেছে। শুধু পাঞ্জাব নয়, সারা উত্তর-ভারত এমনকি বাঙলাদেশের পর্যন্ত আজ এই অবস্থা হইতে চলিয়াছে। আলেকজাণ্ডারের সময় পর্যন্তও পঞ্জাবে খুব বর্ষা হওয়ার কথা গ্রীক ঐতিহাসিক-দের বিবরণে জানা যায়। হড়প্পা-মোহেঞ্জোদাড়োর বহু sealএ বাঘ হাতি গণ্ডার ও মাছের চিত্র মিলে, এইসব প্রাণী বন-জঙ্গল ও জল ছাড়া হয় না। পুরাণ ও মহাভারতে দেখা যায় সারাদেশে বহু গভীর অরণ্য, সেখানে রাজারা মৃগয়া এবং মুনি-ঋষিরা তপস্যা করিতেন। সে-যুগের কোনও রাজার রাজ্য বহুবিস্তৃত ছিল না, সারাদেশ বহু ছোটছোট রাজ্যে ও রাজত্বে বিভক্ত ছিল। সুতরাং রাজাদের নিজ রাজধানী ছাড়িয়া বহুদূরের বনে শিকার করিতে যাইতে হইত না, নগরের প্রায় উপকণ্ঠেই বনে ঘেরা গ্রাম ও তাহার অবিদূরে পশ্বাদিময় অরণ্য মিলিত। পালি বৌদ্ধসাহিত্যেও দেখি বুদ্ধের যুগে দেশে বহু বন, এমনকি রাজগৃহের মতো বড় সহরের আশেপাশে যত আমবাগান ও বনের বিবরণ আছে, আজ সেখানে দেখি ধানক্ষেত বা শূন্যস্থান। এমনকি ১৬ শতকে পর্যন্ত দিল্লীর উপকণ্ঠে বাবর শাহ গণ্ডার শিকার করিতেন, ঘন জলা-জঙ্গল বিনা গণ্ডার থাকিতে পারে না। আজ সেখানে সব শুকাইয়া খাঁখাঁ করিতেছে। ১২ শতকে বাঙলাদেশে মুসলমানদের প্রথম আক্রমণের যুগে মুসলমান ঐতিহাসিকদের বিবরণে দেখিতে পাওয়া যায় কাটোয়ার কাছে ভাগীরথীর পশ্চিম তীর হইতে গয়া পর্যন্ত গভীর বন ছিল।

অর্ধসভ্য আর্যরা ভারতে আসিয়া "সিন্ধুসভ্যতা" যুগের বহু জনস্থান আগুনে

পুড়াইয়া এবং নদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া জলে ডুবাইয়া নষ্ট করিয়াছিল, ঋগ্বেদের উক্তি হইতেই আধুনিক পণ্ডিতরা এ-কথা অনুমান করিয়াছেন। খাণ্ডব দাহনের গল্প মহাভারতে সুজ্ঞাত, "অগ্নিং তদা তর্পিতং খাণ্ডবে চ।" অগ্নি ছিলেন আর্যদের বড় দেবতা, আর্যদের ধর্ম বা জাতির প্রতীক। শতপথব্রাহ্মণে বর্ণিত আছে পঞ্জাবের সরস্বতী নদী হইতে পূর্বমুখে ক্রমে অগ্রসর হইয়া অগ্নি (অর্থাৎ আর্যরা) সদানীরা নদী (আধুনিক রাপ্তি, গণ্ডকের পশ্চিমে) পর্যন্ত আসিয়াছিলেন এবং সদানীরার অপর বা পূর্বতীরে প্রাচীনকালে কোনও ব্রাহ্মণ (আর্য) যাইতেন না। আধুনিক ঐতিহাসিক মতে এইসব অগ্নিকাণ্ডের অর্থ এই—আর্যরা বংশবৃদ্ধির ফলে যখন পঞ্জাবের পূর্বে ও দক্ষিণে ক্রমে বিস্তারলাভে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন তখন তাঁহারা আগুন লাগাইয়া বন-জঙ্গল নষ্ট করিয়া সেখানে ক্রমে ক্রমে বসতি স্থাপন করিয়া অগ্রসর হইয়া বিস্তারভূমি সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ঘন বন-জঙ্গল কাটিয়া জমি পরিষ্কার করা অপেক্ষা আগুনে পোড়াইলে সে-উদ্দেশ্য বেশি সহজে সিদ্ধ হয়।

অতএব বুঝা গেল দেশময় তখন বহু বনভূমি ছিল। কিন্তু সেখানে বহু তপোবন ছিল, অনেক সাধুসন্ন্যাসীরা সেখানে তপস্যা যাগ-যজ্ঞ কৃচ্ছ্রাদি করিতেন, সেখানকার আশ্রমরাজিতে গুরুরা ছাত্রদের নানাশাস্ত্র পড়াইতেন, ইহার প্রমাণ কি? ঐতিহাসিক যুগে অর্থাৎ বুদ্ধ-মহাবীরের সময়ে (খ্রীষ্টপূর্ব ৬ শতক) তো ইহার কোনই পরিচয় বৌদ্ধজৈনশাস্ত্রে পাওয়া যায় না। বুদ্ধ ও মহাবীর দুজনেই সুশিক্ষিত লোক ছিলেন কিন্তু তাঁহারা তো নিজনিজ জন্মস্থানে নিজগৃহে বা সেই স্থানেই (বনে নয়) গুরুগৃহে অর্থাৎ গুরুর কাছে গিয়া শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন এবং সে গুরুগৃহ যে তপোবনের আশ্রমে ছিল তাহাতো কোথাও লেখা নাই। বুদ্ধশিষ্য সারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়ন অতিসুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহারাও তো তপোবনে গুরুগৃহে বাস করিয়া লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন এইরূপ বলা হয় নাই। বৌদ্ধ-জাতকের (রচনাকাল খ্রীষ্টপূর্ব অনুমান ৪-৩ শতক) গল্পে বিদ্যাপীঠরূপে তক্ষশিলা নগরের উল্লেখ আছে এবং অশোকপিতা বিন্দুসারের যুগে (বৌদ্ধজাতক রচনার প্রায় সমসাময়িক) দেখি তক্ষশিলা প্রকাণ্ড প্রাদেশিক রাজধানী, তাহারও আগে অর্থাৎ বিন্দুসারপিতা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের (তথা আলেকজাণ্ডারের) কালে দেখি তক্ষশিলা বৃহৎ নগর। শ্রাবস্তী-বৈশালী বুদ্ধের যুগে বড় সহর ছিল, সেখানে আলাড় কালাম ও উদ্রক রামপুত্রের কাছে বুদ্ধ ধ্যানযোগাদি শিক্ষা করিয়াছিলেন, তপোবনে গিয়া নয়। বাৎসায়নের কামসূত্রে '৬৪ কলা'র এবং জৈনশাস্ত্রে

অভিজাত নরনারীর '৭২ কলা' শিক্ষার কথা জানা যায়, তাহাও তো তপোবনে গিয়া নয়। বুদ্ধ 'পঞ্চভিক্ষু'র সঙ্গে যে বনে তপশ্চর্যা করিয়াছিলেন তাহা সুবৃহৎ গয়া নগরের উপকণ্ঠস্থ গ্রামসমীপে, যে-গ্রামে ভিক্ষাচর্যা করিয়া তাঁহাদের প্রাণধারণ হইত। তারপর একাকী বুদ্ধ যে বনে ধ্যানসাধনা করিয়া সম্বোধি লাভ করিলেন (আধুনিক বোধগয়া) তাহা গয়ানগরের মাত্র ৬ মাইল বাহিরে, তাহার নিকটেই লোকবসতি ছিল নতুবা সুজাতা তাঁহাকে আহার জোগাইতে পারিত না। অতঃপর বুদ্ধ যেখানে প্রথম ধর্মপ্রচার করিলেন সেই ঋষিপত্তন মৃগদাবকে মুনি-ঋষিদের আশ্রম বা তপোবন বলা চলে কিন্তু তাহাও তো ছিল সুবিখ্যাত বারাণসী নগরের মাত্র মাইল ছয়েক দূরে। পালিশাস্ত্রের আরও কয়েকটি বিবরণে দেখা যায় বুদ্ধ কখনও কখনও শিষ্যদলকে ছাড়িয়া একাকী কিছুকাল নির্জন বনে বাস করিতেন, তাহারও সমীপে গ্রাম ছিল যেখানে তিনি ভিক্ষাটন করিতেন। তাঁহার কয়েকজন সম্পন্ন অবস্থার শিষ্য নির্জনে থাকিবার জন্য একবার কিছুকাল একটা উপবনে (বোধহয় উহাদেরই মধ্যে কাহারও নিজস্ব সম্পত্তি) বাস করিয়াছিল, বাহিরের লোকে আসিয়া যাহাতে বিরক্ত না করিতে পারে সেজন্য উপবন দ্বারে রক্ষক বসাইয়াছিল। ছোটছোট বৌদ্ধ ভিক্ষুমণ্ডলী যে নগর বা গ্রামাঞ্চলের কাছাকাছি বনে কুটীর বাঁধিয়া থাকিত তাহারও বিবরণ আছে। বুদ্ধ নিজেও সশিষ্য নালন্দার আমবাগান, বৈশালীর গণিকা আম্রপালীর আমবাগান প্রভৃতি নগর বা গ্রামের সন্নিকটস্থ বহু বন-উপবনে থাকিয়াছিলেন। মহাবীরও তপস্যাকালে কিছুদিন বনে বাস করিয়াছিলেন, তাঁহার শিষ্যগণেরও অনেকে সেরূপ করিয়াছিলেন। শ্রাবস্তীর সন্নিকটে আজীবিক সম্প্রদায়ের গুরু গোশালও গ্রামাঞ্চলে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। বৌদ্ধ জৈন আজীবিক, ব্রাহ্মণ্য সমাজের বহির্ভূত এই তিন প্রধান শ্রমণ সম্প্রদায় যেমন, তেমনি ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের বানপ্রস্থাবলম্বীদেরও বনবাসের (অবশ্যই নগর বা গ্রামসন্নিকটে) বিবরণ ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রে মিলে। বৌদ্ধশাস্ত্রবর্ণিত রাজগৃহের একটি পাহাড়ের নাম ছিল ঋষিগিরি, লৌকিক বা প্রাকৃত উচ্চারণে ইসিগিলি। লৌকিক ব্যাখ্যায় ইহার অর্থ দাঁড়াইয়াছিল 'যে পাহাড় ঋষিদের (তপস্যারত বানপ্রস্থীদের) গিলিয়া ফেলে,' অর্থাৎ যেখানে গিয়া ঋষিরা আর ফিরিতেন না, অর্থাৎ সেখানেই তাঁহারা আমরণ থাকিতেন। অতএব এই সকল বিবরণ হইতে বুঝা যায় "তপোবনে" মুনি-ঋষি, শ্রমণ বা বানপ্রস্থীরা বাস করিতেন। জৈন-বৌদ্ধ কোনও আখ্যানে গুরু ও ছাত্রগণাধ্যুষিত তপোবনের কথা দেখা যায় না। জৈন-বৌদ্ধ

ও আজীবিকরা ভারতের প্রাচীনতম সন্ন্যাসী সম্প্রদায়। ইঁহাদের উদ্ভব খুব সম্ভবত হইয়াছিল বাণপ্রস্থীগণ হইতে। ইঁহারা বনে বাস করিয়া তপস্যা করিতেন, নানা আধ্যাত্মিক তত্ত্বের চর্চা করিতেন, উপনিষদীয় আত্মা-ব্রহ্মবাদের গুপ্ত "রহস্য" ইঁহাদেরই আবিষ্কার। পালিশাস্ত্রে তক্ষশিলার পর বারাণসী শিক্ষাকেন্দ্ররূপে উল্লিখিত। মহাভারত-রামায়ণে দেখি অযোধ্যা ও প্রয়াগ শিক্ষাকেন্দ্র। এগুলি সবই বন নয়, সহর। Esoteric বা religious সাধনা ও শিক্ষার কেন্দ্র বনে থাকিতে পারে যেহেতু তাহার শিক্ষক ছিলেন সাধু-সন্ন্যাসীরা, কিন্তু secular education-এর স্থান যদি বনে হইত তবে তাহা বুদ্ধের যুগেই সব লুপ্ত হইতে পারে না। Sacred lore শিক্ষাগুরুরাও সকলে সর্বদা সাধু-সন্ন্যাসীও হইতেন না, গৃহীও হইতেন।

আর্যরা যখন ভারতে আসে—ঐতিহাসিক মতে অনুমান খ্রীষ্টপূর্ব ১৪ শতক, তখন তাহারা অর্ধবর্বর semi-nomadic pastoral জাতি, গরু ঘোড়া পুষিত, ঘি-মাখন খাইত, কৃষিকর্মাদি কিছু এবং হাঁড়িকুঁড়ি বানানো প্রভৃতি শিল্পকাজও কিছু জানিত। পেশা ছিল ইহাদের লুঠপাট করা, যুদ্ধ-বিগ্রহ, আগুন লাগানো। প্রকৃতি ছিল ইহাদের অতি নৃশংস। দুটি জিনিস ইহারা জগতে সর্বপ্রথম আয়ত্ত করে—(১) ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া অতর্কিত দ্রুত আক্রমণ, লুঠপাট, যুদ্ধ-বিগ্রহ করিয়া লোকবসতি বিনাশ ও অধিকার, এবং (২) লৌহাস্ত্র ব্যবহার, যাহার তুলনায় অন্য জাতিদের তখন পর্যন্ত জ্ঞাত অন্যান্য ধাতুনির্মিত অস্ত্রাদি দৃঢ়তা ও সংহার শক্তিতে ন্যূন ছিল। ঘোড়ার পরিচয় অন্য জাতিরাও জানিত কিন্তু গাড়ি টানা ছাড়া তাহার অন্য প্রয়োগ জানিত না। বহুদিন আর্যরা অশ্ব-ব্যবসায়ী বলিয়া প্রাচীন এশিয়ার অন্য জাতিদের কাছে পরিচিত ছিল। বংশবৃদ্ধির ফলে বিস্তার আবশ্যক হইলে তাহাদের কয়েক দল উত্তরে ও পশ্চিমে ইউরোপের দিকে এবং কয়েকদল পারস্য ও ভারতাভিমুখে অগ্রসর হইয়া লুঠপাট যুদ্ধ-বিগ্রহ চালাইয়া দেশ অধিকার করিতে লাগিল। যুদ্ধে ঘোড়ার পিঠে চড়ায় তাহাদের mobility অন্যের তুলনায় বহুগুণ বেশি হইত, এবং লৌহাস্ত্র ছিল তাহাদের superior weapon—সকল যোদ্ধারাই জানেন যুদ্ধে quick mobility এবং superiority of arms কত কার্যকর হয়। ইরান ও ভারতে অগ্রসর হইবার আগে পশ্চিম এশিয়ায় তাহারা কয়েক শতক বসবাস করিবার ফলে ইউফ্রেতিস-টাইগ্রিস নদীতীরের প্রাচীন সভ্য জাতিদের অনেক সংবাদ তাহাদের কর্ণগোচর হয় এবং তাহাদের সভ্যতার সঙ্গে কিছু কিছু সংস্পর্শও লাভ হয়।

আর্যদের মধ্যে দুটি সম্প্রদায়ের প্রাধান্য ছিল, প্রথম যাগ-যজ্ঞকারী অগ্নি-উপাসক পুরোহিত বা ব্রাহ্মণ এবং দ্বিতীয় যোদ্ধবর্গ বা ক্ষত্রিয়। সংসার বৈরাগ্য তো দূরের কথা, লেখাপড়া জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা বা বিদ্যাদির সঙ্গে তাহাদের অল্পই সম্বন্ধ ছিল, তাহারা শুধু জানিত শত্রুনাশ ও ভোগসুখ; উভয় উদ্দেশ্যের সিদ্ধিতেই দেবতার কৃপালাভে ব্যগ্র হইত এবং তাহারই প্রয়োজনে প্রাধান্য পাইয়াছিল যাগ-যজ্ঞ এবং তৎসাধক পুরোহিত বা ব্রাহ্মণরা। পঞ্জাবে বেশ কিছুদিন বসবাস করিয়া প্রাগার্য ভারতীয়দের সঙ্গে মিশিয়া, তাহাদের নারীদের সঙ্গে সহবাসদ্বারা প্রভূত বংশবৃদ্ধি করিয়া তাহারা ক্রমে সভ্যতা অর্জন করিল। প্রাগার্য ভারতীয়রা অতি সুসভ্য ছিল, তাহাদের কাছে আর্যরা ক্রমে নানাবিদ্যা জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলাদি শিখিতে লাগিল। ঋগ্বেদের রচনাই (অবশ্যই লিখিত-ভাবে নয়, মুখে মুখে প্রচলিত) আরম্ভ হয় আর্যরা ভারতে আসার প্রায় সমকালে। অলমতিবিস্তরেণ, আজ যতকিছু আমরা আমাদের ধর্মে সমাজে সংস্কৃতিতে "আর্যঋষিদের" কৃতি বলিয়া গর্ব করি, তাহার সাড়ে পনেরো আনা প্রাগার্য ভারতীয় সংস্কৃতি হইতে জাত—যেমন অর্ধসভ্য রোমানরা সুসভ্য গ্রীকদের জয় করিয়া তাহাদেরই প্রভাবে সভ্যতা অর্জন করে, পরাজিত গ্রীকরা রোমানদের হাতে বন্দী হইয়া দাসরূপে বিক্রীত হইল, রোমান বড়লোকেরা বিদ্বান গ্রীকদের দাসরূপে ক্রয় করিয়া নিজ নিজ পরিবারে সন্তানদের শিক্ষক-রূপে নিয়োগ করিয়াছিল।

নানা crafts, arts প্রভৃতি secular শিক্ষা সেকালে সবদেশেই পিতা হইতে পুত্র শিখিত বা apprentice শিক্ষার্থীকে master-craftsman-এর কাছে শিখিতে হইত। সব প্রাচীন দেশেই উচ্চশিক্ষা religion-orientated হইত, শিক্ষাদান পুরোহিত বা ধর্মযাজকদের হাতে ছিল। অন্য নানা লৌকিক বিদ্যাও প্রথমে তাঁহারাই শিখাইতেন। প্রাচীন মিশর ও ব্যাবিলন প্রভৃতি দেশের ইতিহাসে ইহাই দেখা যায়।

"সিন্ধুসভ্যতা"র সুসভ্য প্রাগার্য ভারতীয়রা আর্যরা ভারতে আসিবার আগে প্রায় হাজার দুই বৎসর ধরিয়া এদেশে বাস করিতেছিলেন। তাঁহারা যোদ্ধাজাতি ছিলেন না, শান্তিময় জীবনযাপন করিয়া শিল্প-বাণিজ্যের ব্যবসায় করিতেন, নিম্নশ্রেণীয়রা চাষ আবাদের কাজ করিত। মিশর ব্যাবিলন সুমের প্রভৃতি প্রাচীন দেশের মতো তাঁহাদের দেশ ও সমাজশাসনবিধি পুরোহিত-তান্ত্রিক Theocracy ছিল। এই পুরোহিত সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা বিদ্যাচর্চা

ছিল, যাহা ক্রমে "আর্য" ভারতের সভ্যতার অঙ্গীভূত হয়। অ-পুরোহিতদের মধ্যেও বহু বিদ্বান চিন্তাশীল লোক অবশ্যই ছিলেন। প্রাগার্য পুরোহিতদের অনেকে "আর্য" সমাজের ব্রাহ্মণদের সঙ্গে মিশিয়া গেলেন, অভিজাত ও ধনীরা ক্ষত্রিয়-বৈশ্য এবং নিম্নশ্রেণীয়রা শূদ্র হইল। আর্যদের সমাজে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় মাত্র ছিল, জাতিভেদও ছিল না। জাতিভেদ প্রথার উদ্ভব হইয়াছিল খুব সম্ভবত প্রাগার্য সমাজে—গীতার "চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম বিভাগশঃ" কথাতেই সর্বপ্রথম চারি বর্ণের উল্লেখ দেখা যায় এবং গীতার রচনাকাল খ্রীষ্টপূর্ব ২ শতকের আগে বলিয়া মনে হয় না। ধর্ম সমাজ দর্শন প্রভৃতি সম্বন্ধীয় বহু উন্নত চিন্তাধারার প্রবর্তন প্রথমে প্রাগার্যদের মধ্যে হয়, পরে তাহা "আর্য" চিন্তা বলিয়া পরিচিত হয়। ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে আজ যাহা ব্রাহ্মণ, আরণ্যক অর্থশাস্ত্র তর্ক ধর্মশাস্ত্র ব্যাকরণ ছন্দ জ্যোতিষ নিরুক্ত উপনিষদ স্মৃতি প্রভৃতি নামে পরিচিত, তাহার সবেরই উদ্ভব সম্ভবত হয় প্রাগার্য সমাজে।

প্রাগার্যদের ধর্ম ঠিক কি ছিল তাহা এখনও পুরাপুরি জানা যায় নাই, তবে তাঁহারা যে ঘরে ঘরে Mother Goddess প্রভৃতি figurine পূজা করিতেন, বহুবিধ আচমন-স্নানাদি "আচার"বিধি পালন করিতেন, গীতোক্ত "পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং" দ্বারা ধূপদীপ সহকারে পূজার্চনা করিতেন, আহারাদি সম্বন্ধে বহুবিধ নিষেধ নিয়মাদি মানিতেন, তাহা একরকম ধরিয়া লওয়া চলে, যাহা সবই ক্রমে আর্য-ব্রাহ্মণ্য সমাজে পরিগৃহীত হয়। হড়প্পা-মোহেঞ্জোদাড়ো আবিষ্কারের পরে যে অনুমান করা হইয়াছিল সিন্ধুসভ্যতায় লিঙ্গ-যোনির পূজা করা হইত, তাহাতে আজ সন্দেহের কারণ দেখা গিয়াছে কারণ যাহাকে লিঙ্গ-যোনির প্রতীক মনে করা হইয়াছিল, আজ প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা বলিতেছেন তাহা পূজ্যদ্রব্য নয়, কোনরকমের architectural pieces ছিল যাহা ঠিক কি প্রয়োজন সাধন করিত তাহা এখনও অনির্ণীত। ইহা কিন্তু নিশ্চিত যে, প্রাগার্যরা আর্যদের মতো পশুবধ ও তুমুল হৈচৈসহ হোম-যাগ-যজ্ঞ অনুষ্ঠানে অগ্নি উপাসনা করিয়া ইন্দ্রাদি দেবতার তুষ্টিসাধন করিতেন না। কিন্তু যাহাকে স্মৃতিশাস্ত্র বলা হয়, তাহার অর্থ কি? কিসের "স্মৃতি"? যাহারা লুঠপাট যুদ্ধ-বিগ্রহাদিতে কয়েকশত বৎসর কাটাইয়া সম্প্রতি সভ্য হইয়াছে তাহাদের মধ্যে এমন কি সুসভ্য সামাজিক ব্যাপারের "স্মৃতি" থাকিতে পারে? বাস্তবে মনে হয় ঐ "স্মৃতি" বা প্রাচীন রীতিনীতি অধিকাংশ প্রাগার্যদের সামাজিক আচারাদির। গুরুগৃহে "১২ বৎসর" পাঠসমাপনান্তে ছাত্ররা আনুষ্ঠানিক স্নান-করিয়া স্নাতক

হইয়া স্বগৃহে ফিরিত (সম্-আবর্তন)। দস্যুধর্মী আর্যরা এত বিদ্যাপ্রীতি এবং শীতপ্রধান দেশ হইতে আসিয়া এত স্নান করিতে শিখিলেন কিরূপে? অপরপক্ষে মোহেঞ্জোদাড়োর Great Bath হইতে এবং হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈনদের শাস্ত্রে বর্ণিত প্রাচীন রীতিনীতি হইতে বুঝা যায় ভারতীয়দের মধ্যে স্নান আচমন প্রভৃতি অতি নৈষ্ঠিক ধর্মানুষ্ঠানের অঙ্গ বলিয়া মনে করা হইত, প্রাচীন জৈনশাস্ত্রে দেখা যায় লোকে প্রত্যেক শুভকর্মের আগে "স্নাতঃ কৃতবলিকর্মা কৃতকৌতুকমঙ্গল প্রায়শ্চিত্তঃ" হইত অর্থাৎ স্নানাচমন পূজাদি করিত। আনুষ্ঠানিক আচার হইতে খুবই ভিন্ন জিনিস দার্শনিক চিন্তা। ভারতের প্রাচীনতম দার্শনিক চিন্তা ছিল পুরাতন সাংখ্যে; বৌদ্ধ-জৈন-ব্রাহ্মণ্য সকল দার্শনিক চিন্তার অন্তরালে সাংখ্য-মতবাদের আভাস পাওয়া যায়। সাংখ্যকে জীবাত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী কিন্তু পরমাত্মা বিষয়ে নির্বাক, এমনকি অবিশ্বাসীই বলা যায়; সাংখ্যে ক্রিয়াকাণ্ডের নয়, বিচার-জ্ঞানবুদ্ধির প্রাধান্য এবং সাংখ্য বেদবিরোধী। সাংখ্যের উৎপত্তি অবশ্যই প্রাগার্য। যাগ-যজ্ঞপরায়ণ আর্য-ব্রাহ্মণরা প্রাগার্যদের জ্ঞান-বুদ্ধির সংস্পর্শে আসিয়া বেদের "ব্রাহ্মণ" নামক অংশের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, যখন বৈদিক আর্য ব্রাহ্মণ সমাজে প্রাগার্য সুশিক্ষিত পুরোহিতরা মিশিয়া গিয়াছিলেন—যাহাতে যাগ-যজ্ঞের বিবিধ অনুষ্ঠানগুলিকে আধ্যাত্মিক অর্থে ব্যাখ্যা করা হইয়াছিল। সংসারবৈরাগ্য কৃচ্ছ্র বানপ্রস্থ প্রভৃতির উদ্ভব ভোগসুখী যোদ্ধাজাতির মধ্যে অপেক্ষা যাহারা বহুযুগ ধরিয়া শান্তিময় Settled Life-এর সংসারসুখ উপভোগ করিয়া কিছুটা ক্লান্তিবোধ করিয়া পরকালের চিন্তা করে, তাহাদেরই মধ্যে হওয়া বেশি সম্ভবপর। সুতরাং প্রাগার্যদের মধ্যে সন্ন্যাসধর্মী, বনবাসী বা ভ্রাম্যমান তপস্বী সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব অনুমান করা অযৌক্তিক নয়; ভিক্ষাব্রত ও কৃচ্ছ্রসাধনও ইহাদের ধর্ম হইত; ঋগ্বেদে দীর্ঘকেশশ্মশ্রু বনপ্রান্তরবাসী মুনির উল্লেখ আছে এবং ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ-জৈন শাস্ত্রে বহুবিধ তপস্বী সম্প্রদায়ের কথা দেখা যায়। ইহাদের হইতেই তপোবন আশ্রম প্রভৃতির উদ্ভব কল্পনা করা যায় কারণ ইহাদের অনেকে সংঘবদ্ধ জীবন যাপন করিতেন, ইহারাই বোধহয় ছিলেন আরণ্যক বানপ্রস্থী প্রভৃতি। প্রাগার্যদের যে পুরোহিত সম্প্রদায় সমাজ শাসন করিতেন তাঁহারাই সম্ভবত ছিলেন "ঋষি"-নামবাচ্য; ইহাদের অনেকেই গৃহস্থজীবন যাপন করিতেন। তপস্বীদের কাছে অবশ্যই তরুণরা নয়, অতি-বয়ঃপ্রাপ্তরা তপস্যা শিক্ষা করিতেন এবং তরুণ ও কিশোর-যুবকরা লোকালয়-

বাসী শিক্ষকদের কাছে গিয়া অথবা তাঁহাদের গৃহে (বা ছাত্রাবাসে?) থাকিয়া বিদ্যার্জন করিত। প্রাচীনযুগে সবদেশেই ধর্মযাজক পুরোহিত সম্প্রদায় শিক্ষকতা করিতেন, যেমন মধ্যযুগের ইউরোপে এবং সেদিন পর্যন্ত লামাশাসিত তিব্বতে Monasteryগুলি শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। এই সকলের সংমিশ্রণ হইতে গুরুকুল ঋষিকুল প্রভৃতি কথার উদ্ভব হয়। খুব বড় বড় Monastery মধ্যযুগের ইউরোপ এবং একালের তিব্বতেও ছিল কিন্তু "কুলপতি" শব্দের অর্থাৎ তপোবনবাসী তপস্বী শিক্ষক সম্প্রদায় প্রধানের যে ব্যাখ্যা পরে টীকাকারদের কল্পনায় উদ্ভূত হইয়াছিল, "যিনি দশ সহস্র শিষ্যকে বিদ্যা ও অন্নদান করেন," তাহা অবশ্যই ভারতীয় কল্পনাসুলভ নিতান্ত অত্যুক্তি ছাড়া আর কিছু নয়। হড়প্পা-মোহেঞ্জোদাড়োর পৌর ব্যবস্থায় যে uniformity এবং দীর্ঘকালব্যাপী অপরিবর্তিত rigidity দেখা যায়, তাহা হইতে অনুমান হয় সে স্থানগুলির শাসন নিয়ন্ত্রিত হইত একটা highly centralized authority দ্বারা। প্রাচীনযুগের মানবসমাজ শাসনে রাজবিধি অপেক্ষা অনেক বেশি কার্যকর হইত ধর্মের শাসন এবং সে ধর্মশাসন পরিচালিত হইত কোনও মন্দিরাদি দেবস্থানাশ্রিত ধর্মযাজকমণ্ডলী কর্তৃক। uniformity এবং rigidity দুইই orthodoxy হইতে প্রসূত হয়, যাহার মূলে থাকে পুরোহিত-নিয়ন্ত্রিত (priestly) বিধিব্যবস্থা। আমরা জানি আমাদের সমাজবিধি নিয়ন্ত্রিত হইত "মুনি-ঋষি"দের ব্যবস্থা হইতে। সুমের মিশর ব্যাবিলন প্রভৃতি প্রাচীনদেশে সমাজশাসন হইত দেবস্থান-পরিচালক পুরোহিতকুল দ্বারা। অনেক প্রাচীনদেশে High Priestই ছিলেন রাজা বা রাজাই হইতেন High Priest যেমন গ্রীস-রোমের ইতিহাসেও দেখা গিয়াছিল। আমরাও আধুনিক যুগেও গুরুপুরোহিতের কাছে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতাম। দেবস্থানচ্ছায়াধিষ্ঠিত গুরুপুরোহিতদের কাছে ব্যবস্থা গ্রহণের স্মৃতি হইতেই পুরীমন্দিরের মুক্তিমণ্ডপের পণ্ডিতদের কাছে ব্যবস্থা গ্রহণরীতি প্রচলিত হয় এবং আজও উড়িষ্যার বহুলোক ইহার অনুবর্তন করে।

ঐতিহাসিক যুগে দেখা যায় সংঘবদ্ধ সন্ন্যাসজীবন সমধিক বর্ধিত হইয়াছিল বৌদ্ধ-জৈনদের দ্বারা। "চৈত্য" বলিতে প্রাচীন কালে দেবস্থান বুঝাইত, যেমন জৈনশাস্ত্রবর্ণিত মণিভদ্র প্রভৃতি "যক্ষ"দের আলয় (মন্দির নির্মাণ যখনও আরম্ভ হয় নাই)। বৌদ্ধদের কাছে বুদ্ধের "ধাতু" বা পূতাস্থি-সমন্বিত চৈত্য পূজাস্থান রূপে মান্য হয়, চৈত্যের আশ্রয়ে সংঘারাম বা monastery নির্মিত

হয়, তাহা ক্রমে বিহার বা বিদ্যাচর্চা ও শিক্ষার কেন্দ্র হইয়া উঠে। তক্ষশিলার পর পাটলিপুত্রে চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন বহু বিহার ও সংঘারাম দেখিয়াছিলেন (৪-৫ শতক)। দক্ষিণভারতে অমরাবতী ও নাগার্জুনীকোণ্ডাও এইযুগে প্রসিদ্ধিলাভ করে। ৫ শতকের পর আরম্ভ হইয়া নালন্দার মহাবিহার দেখেন ৭ শতকে হিউয়েন-চাং—নালন্দা ১২ শতক পর্যন্ত বর্তমান ছিল। ভারতের সর্বস্থানে তিনি আরও অনেক বড় বড় বিহার-সংঘারামের কথা বলিয়াছেন। ১০-১২ শতকে বিক্রমশীলা ও উদ্দণ্ডপুর বা ওদন্তপুরী খ্যাতিলাভ করে, সে-যুগে বাঙলাদেশের জগদ্দল ও সোমপুরের (পাহাড়পুর) নাম হয়। পশ্চিমভারতের বলভী, মধ্যভারতের উজ্জয়িনী ও ধারা এবং ক্রমে কাশী মিথিলা নবদ্বীপ প্রভৃতি কত স্থানে বিদ্যাকেন্দ্র গড়িয়া উঠে। এগুলির কোনটিও তপোবন ছিল না। হয় monasteryতে, না হয় গুরুগৃহে (যদি ধনীদের অর্থে পুষ্ট গুরুর সে সামর্থ্য থাকিত), অথবা ধনীদের সাহায্যপ্রাপ্ত ছাত্রদের স্বপরিচালিত ছাত্রাবাসে, কিম্বা আত্মীয়কুটুম্বগৃহে থাকিয়া ছাত্ররা লেখাপড়া শিখিত। কিন্তু ইতিহাসের কি বিড়ম্বনা! কাদম্বরী ও হর্ষচরিত প্রণেতা কবি বাণভট্ট ৭ শতকে বিন্ধ্যপর্বতের বনে প্রকাণ্ড তপোবন-আশ্রম আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন, যেখানে বিপুল ছাত্রদল গুরুদের কাছে হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন সর্বশাস্ত্র চর্চায় ব্যাপৃত! কবিকল্পনার কাছে অসম্ভব কিছুই নাই।

মানুষের ইতিহাসে দেখা যায় প্রাচীনযুগের জিনিস পবিত্র বলিয়া ধার্য হয়—আদিম মানব বনে-জঙ্গলে বাস করিত অতএব বনবাস পুণ্যময়, সে উলঙ্গ থাকিত অতএব তাহা ধর্মবর্ধক, সে ফলমূল খাইত সুতরাং তাহা সাত্ত্বিক (স্বাস্থ্যতত্ত্বের কথা অবশ্য এখানে না তুলিয়া), সে মৃগচর্ম পরিত বা কুশাসনে বসিত শুইত অতএব তাহা পবিত্র; সেলাই করা জামা-কাপড়ের আগে এদেশে সেলাইহীন ধুতি-চাদর প্রচলিত ছিল অতএব শুভকর্মে তাহার ব্যবহার প্রশস্ত ইত্যাদি। এই Atavism মানুষের বহু ধারণা ও বিশ্বাসের মূলে থাকে, যদিও পরে নানা sophistication দ্বারা ইহার rational ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে। দশরথের পুত্রেষ্টি-যজ্ঞের আগুনে ভীষণমূর্তি দিব্যপুরুষের আবির্ভাব ও প্রসাদ দান; সেই যজ্ঞ সম্পন্ন হইয়াছিল যিনি কখনও স্ত্রীলোক দেখেন নাই সেই ঋষ্যশৃঙ্গের তপঃপ্রভাবে, দিব্যপ্রসাদ ভোজনে চার রানীর গর্ভসঞ্চার প্রভৃতি যেমন অলীক কবিকল্পনা, মুনি-ঋষিদের বনবাস, তপোবন আশ্রমে ছাত্রগণের বিদ্যাশিক্ষা প্রভৃতিও মনে হয় সেইরূপই ভিত্তিহীন legend মাত্র।

৪

প্রাচীনযুগের শিক্ষাব্যবস্থার একটা মোটামুটি ধারণা পাইলাম। মধ্যযুগে নানা রাষ্ট্রীয় ওলটপালটের মধ্যে, বিদেশী বিধর্মীদের নানা বিপ্লব সত্ত্বেও শিক্ষার স্রোত সম্পূর্ণ ব্যাহত হয় নাই, যদিও নানাভাবে সঙ্কীর্ণতা ও গোঁড়ামির বৃদ্ধি হইয়াছিল। এককালে এদেশে বিদেশ হইতে কত বিদ্যাবুদ্ধি আহরণ করা হইয়াছে, ৫-৬ শতকেও "যবনাচার্য"দের মত, Alexandriaর জ্যোতির্বিদদের মত, "রোমকসিদ্ধান্ত" প্রভৃতি দ্বারা ভারতীয় জ্যোতিষচর্চা পুষ্ট হইয়াছে; ৭ শতকে চীনা পণ্ডিত হিউয়েন-চাং ভারতের রাজা পণ্ডিত প্রভৃতিদের কাছে কত সম্মান পাইয়াছেন কিন্তু ১১ শতকে ভারতে আসিয়া মুসলমান মহাপণ্ডিত আল্-বেরুনী এখানকার বিদ্বৎসমাজের কি দুর্দশা দেখিলেন! তিনি বলিয়াছেন ইঁহাদের কি অহঙ্কার! কি কূপমণ্ডূকতা! ইঁহাদের নিজ দেশ ছাড়া পৃথিবীতে আর কোনও দেশ বা সুসভ্য জাতির অস্তিত্ব সম্বন্ধে কি উদার ঔদাসীন্য! যত বিদ্যাবুদ্ধি সব ইঁহাদেরই নিজস্ব, বাকি সকলে অনার্য ম্লেচ্ছ হেয় অবজ্ঞেয়! পণ্ডিতের কোনও সম্মান নাই! আল্-বেরুনী সত্যই বলিয়াছিলেন যে দেশ পাণ্ডিত্য ও বিদ্যার সম্মান করে, সে দেশ পণ্ডিত ও বিদ্বানেরও সম্মান করে, যেখানে বিদ্যার সম্মান নাই সেখানে বিদ্বানেরও সম্মান নাই (এবং vice versa)।

তারপর ইতিহাসের স্রোতে কত শক-হূণদল পাঠান মোগল, কত ঘাত-প্রতিঘাত, কত উত্থান-পতন ঘটিল। নূতন আলোক ছাড়িয়া আমরা প্রাচীন বিদ্যা লইয়াই রহিলাম, প্রাচীনের চর্বিত-চর্বণে সহস্র টীকা-টিপ্পনী, decadent কাব্য সাহিত্য ও কামকলার চর্চা (যেমন কোণারক ও খাজুরাহোতে চিত্রিত) চলিতে লাগিল। তবুও পাঠশালা টোল চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত ও বাঙলার, মক্তব-মাদ্রাসায় আরবি-ফারসি-উর্দুর চর্চা চলিয়াছিল, বুদ্ধিজীবী হিন্দুরাও অনেকে আরবি-ফারসি শিখিয়া অর্থ ও মান-সম্ভ্রম, সামাজিক মর্যাদা লাভ করিলেন, চোগাচাপকানে শোভিত হইয়া নূতন ও বর্তমানের সঙ্গে যোগরক্ষা করিয়া বাঁচিয়া রহিলেন। কলাশিল্প, arts and crafts, শুধু যে বাঁচিয়া রহিল তাহা নয়, শিল্পীরা ধর্মে ও সামাজিক ব্যবহারে যত রক্ষণশীলই হউন, আধুনিকের practical প্রয়োজনে নূতনের সঙ্গে সমস্রোতে চলিয়া পুরাতনকে বিসর্জন না করিয়া সঞ্জীবিত রাখিলেন।

তারপর পর্তুগিজ দেনেমার ওলন্দাজ ফরাসি ইংরেজ আসিল, ইংরেজ কায়েমি

হইয়া বসিল। বাণিজ্য ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে, শব্দে ভাষায় বেশভূষায় জীবনযাত্রায় কত নবীনতার সংযোগ হইল, যদিও ইহার অধিকাংশ adoptive, বড়জোর adaptive, অতিকৃচিৎ creative ছিল। মুসলমান শাসনের অবসান হইয়া ইংরেজ রাজত্ব আরম্ভ হইলে দেশে একটা নবজীবনের স্থত্রপাত হইল। তাহার একটা প্রধান কাজ হইয়াছিল Rule of Law প্রবর্তন, বলবানের স্বেচ্ছাতন্ত্রের উচ্ছেদ; দেশের শিক্ষিত লোক একটা নবীন স্থসভ্য প্রগতিশীল আধুনিক বিদেশী জাতির সংস্পর্শে আসিয়া পরাধীনতার গ্লানির পরিবর্তে জাগরণের ও উন্নতির নবা-লোকের সন্ধান পাইল। দেশে স্থবিচার স্থশাসন, দুষ্টের দমন, নূতন নূতন অকল্পনীয় যন্ত্রশক্তির প্রচলন, রাস্তাঘাট রেল ষ্টিমার, ডাক টেলিগ্রাফ অস্ত্রচিকিৎসা ঔষধ প্রভৃতি কত কি অভিনবের প্রবর্তন দেখা গেল। স্বদেশপ্রেমিক অবশ্য চট করিয়া বলিয়া উঠিবেন, না না, এইসব হইয়াছিল দেশের লোকের স্থখের জন্য মোটেই নয়, শাসক সম্প্রদায়ের স্থবিধার জন্য। ঠিক কথাই, কিন্তু আমরা বিবেচনা করিতেছি ইংরেজের উদ্দেশ্য নয়। যে উদ্দেশ্যেই করা হউক না কেন, যাহা করা হইয়াছিল তাহাতে দেশের লোকের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি, তাহাদের ক্রিয়াবলি ও জীবনযাত্রা কিভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল তাহাই আমাদের বিচার্য। অচিরে স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটি হইল, টোল-চতুষ্পাঠী উঠিয়া গেল, দলে দলে তরুণরা প্রাণে গ্রহণ করুক-না-করুক ইংরেজি বিদ্যা (যদিও কেহ কেহ মনেপ্রাণে এই বিদ্যা আকণ্ঠ গ্রহণে পুষ্ট হইয়াছিলেন) শিখিয়া (বেশির ভাগ মুখস্থ করিয়া) চাকুরি ও সসম্মান জীবিকার পথ লাভ করিল। ক্রমে কেরানিগিরি ও সরকারি চাকুরির বাজার মন্দা হইয়া আসিল, ডাক্তারি-ইঞ্জিনিয়ারি-ওকালতি পড়িয়া জীবিকার ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিল, private enterpriseএ অল্প লোকেরই অন্নসংস্থান হইল। নূতন জাতীয়তাবাদের আহ্বানে প্রচলিত শিক্ষাবিধিকে ধিক্কার করিয়া নিজস্ব যে-পদ্ধতিতে ইংরেজিকে পদচ্যুত করিয়া রঙিন আদর্শের জাতীয় শিক্ষার প্রবর্তন হইল, তাহাতে দলে দলে মূঢ়প্রজ্ঞ অজ্ঞানদৃপ্ত অর্ধশিক্ষিতের সৃষ্টি হইল, সঙ্গে সঙ্গে গণ্ডস্যোপরি পিণ্ড হইয়াছিল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবিধ অনাচার—মোড়লদের বংশ-ধরেরা সর্বত্র ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট; কর্তাভজাদের দ্বারা tabulator examiner প্রভৃতির ক্ষেত্রে নানা কারসাজি; প্রশ্নপত্র leak করান; শিক্ষার ক্ষেত্রে favouritism ও nepotismময় dictatorship; বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব বর্ধনে top-heavy Post-Graduate Department খুলিয়া pseudo-research

workএর পথ পরিষ্কার; সঙ্গে সঙ্গে তহবিল খালি; তাহা পূরণের জন্য examination standard কমাইয়া দলে দলে অপোগণ্ডদের পাশ করাইয়া fee fund বর্ধন প্রভৃতি। সরস্বতীমন্দির-দূষণের এই বিষ কলেজ ও স্কুলেও সংক্রামিত হইয়া সর্বত্র শিক্ষার পবিত্রতা ও মান খর্ব করিল। মহাত্মা গান্ধী-প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনে আরও আসিল ইংরেজপ্রবর্তিত শিক্ষাবিধির প্রতি বিস্পৃহা, boycott ও strike। জাতীয় স্বাধীনতা লাভের পর শিক্ষায়তন-গুলির দেশময় কি অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহার বর্ণনা অনাবশ্যক, কারণ তাহা সকলেরই সুজ্ঞাত ও আজ প্রত্যক্ষদৃষ্ট।

সব অনুন্নত দেশেই সর্বপ্রকার progressive বা reform movementএর অগ্রসারিতে থাকে যুবা educated minority। ইহাদের মধ্যে যাহারা সাংসারিক দায়িত্ববান বা জীবিকার্জক, তাহারা অন্যকাজে ব্যাপৃত থাকায় সাক্ষাৎভাবে কোনও movement এ যোগ দিতে পারে না, তাহারা পিছনে থাকিয়া moral support দেয়। কিন্তু ভাবপ্রবণ দায়িত্বহীন তরুণরা কর্মক্ষেত্রে নামিয়া শিক্ষার আহ্বান না শুনিয়া কর্মের আহ্বানে কান দেন। যেখানে আবার revolutionএর মন্ত্র প্রচার করা হয়, proletariatকে বলপ্রয়োগে অধিকার লাভে জাগ্রত করা হয়, যেখানে unemployment problem গুরুতর, যেখানে সমাজধনের ভোগ ও বণ্টনে, মনুষ্যসাধারণের সহজাত অধিকার ভোগে social বা economic অসাম্য ও অবিচার প্রবল সেখানে শিক্ষিত ও ভদ্রশ্রেণীর বুর্জোয়াদের অপেক্ষা ধ্বংসবাদের লীলায় লুঠপাটের প্রলোভনে বেশি কর্মপ্রবণ হয় নিঃস্ব ও anti-social elements, যাহাদের বৈধ-অবৈধ ন্যায়-অন্যায় বিষয়ে নৈতিক বোধ নাই। আজ বাঙলাদেশের যে এই অবস্থা হইয়াছে তাহা অস্বীকার করিবে কে? দেশের বা সমাজের সকল সমস্যা পরস্পর-সম্বন্ধ, যেমন দেহের একস্থানের রোগের চিকিৎসা শুধু local treatment দ্বারাই হয় না। দৈহিক ও মানসিক ব্যাধিও পারস্পরিক সম্বন্ধ। পাঠক স্মরণ রাখিবেন আমরা রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক বা সামাজিক সমস্যার কথা এখানে তুলিতেছি না, আমাদের আলোচ্য শিক্ষাবিষয়ক সমস্যা, যদিও ইহাও অবশ্যই স্বীকার্য যে শিক্ষাসমস্যা অন্যান্য সমস্যা হইতে বিচ্ছিন্ন নয়, তৎ-নিরপেক্ষও নয়।

বর্তমানে চারিদিকে শিক্ষার ক্ষেত্রে যে তাণ্ডব দেখিতেছি তাহার স্বরূপ কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না, তাহার মূল কারণগুলিও এমনকিছু রহস্যাবৃত বা দুর্নির্দেশ্য নয়। রাষ্ট্র-সমাজ-অর্থনীতি-সংস্কারকরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে বা total

revolution, disruption দ্বারা সর্বক্ষেত্রে একযোগে এবং একই উপায়ে যাহা করিতে চাহেন করুন, কিন্তু শিক্ষাব্রতীদের নিজমতানুসারে শিক্ষাক্ষেত্রের কথা ভাবিতে হইবে। যদি শুনি ইহাতে বয়োধর্মে অশীভূত আমাদের করণীয় বা চিন্তনীয় কিছু নাই, নবীনের স্রোত সকল সমস্যার সুবিধান করিবে, তবে ভালই এবং বলিবার কিছু নাই, বিনাশ ও ভাঙনের হাতেই পুনর্গঠনের ভরসায় সব ছাড়িয়া দিতে হইবে। কিন্তু তাহা যদি সম্পূর্ণ না মানি অর্থাৎ বিপ্লবদ্বারাই সকল সমস্যার সমাধান হয় ইহা অথবা বিপ্লবও হওয়া যদি সম্ভবপর বা কাম্য না মনে করি তবে শিক্ষার ক্ষেত্রে করণীয় কি, তাহা আমাদের নিশ্চয় ভাবিতে হইবে এবং সে সম্বন্ধে frank আলোচনাও অবশ্য করিতে হইবে।

অকালকুষ্মাণ্ড বা পূতিকুষ্মাণ্ড উৎপাদনে যেমন কৃষিকার্য বিফল হয়, তেমনি মানুষের মনোরূপ (এবং দেহরূপও) জমিতে মানবোচিত বিদ্যা-বুদ্ধি বল-বিক্রম হৃদয়বৃত্তি ও চরিত্রের বীজ বপন করিয়া সুফল প্রসব করিতে না পারিলে শিক্ষাদান বৃথা হয়।

অত্যন্ত সংক্ষেপে আবার বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার অবস্থাটা স্মরণ করি। ছোট ছেলেমেয়েদের স্কুলে যাইবার ইচ্ছা থাকে, লেখাপড়াও তাহারা কিছুটা শিক্ষা করে, যদিও তাহার অধিকভাগ মুখস্থ করা মাত্র। তারপর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে হাইস্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রতি বিরাগ অশ্রদ্ধা ও বিরক্তি, discipline অসহিষ্ণুতা, শিক্ষকবর্গের প্রতি তাচ্ছিল্য, পঠনীয় ও শিক্ষণীয় বিষয়ে অবিশ্বাস, শিক্ষারীতিতে অনাস্থা, শিক্ষালয়ে মারামারি, গুণ্ডামি, ল্যাবরেটারি নাশ, লাইব্রেরিতে আগুন, শিক্ষক ও শিক্ষালয় কর্তৃপক্ষকে অপমান লাঞ্ছনা ঘেরাও, প্রহার, শিক্ষায়তনের ভিতরবাহির অষ্টপৃষ্ঠে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলীয় মতবাদগত slogan লেখা, সকল বিষয়ে disruption ও বিপ্লবের মনোভাব ক্রমবর্ধিষ্ণু হইতে থাকে। যেটুকু বিদ্যালোচনা নেহাৎ হয় তাহা মুখস্থদ্বারা পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইবার উদ্দেশ্যে মাত্র; সে-পরীক্ষাও আবার কয়েকবার পিছাইয়া অবশেষে হয় নামে মাত্র, কারণ বইপত্র দেখিয়া নির্বাধায় টোকাটুকি, পরস্পরকে জিজ্ঞাসাবাদ, "গার্ড"দের ভয় দেখাইয়া বা পয়সা দ্বারা বশ করা, অথবা কঠিন প্রশ্নের ওজুহাতে পরীক্ষাস্থলে তাণ্ডব বা লঙ্কাকাণ্ড; যদি পরীক্ষা নেহাৎই ঘটে তবে অতঃপর খাতা চুরি ও হারানো, পরীক্ষকদের ও ফলবিবেচকদের ভীতি বা লোভ প্রদর্শন দ্বারা ফলাফল নির্ণয় বিফল করা, ফেল করিলে তাহার বিরুদ্ধে বিক্ষোভাদি করিয়া তাহা উল্টাইয়া ফেলা—ইহাই তো নিত্য দৃষ্ট হয়। যাহারা পাশের

ছাপ লইয়া বাহির হয় তাহারা সেই দাবিতে যে-কাজে যোগ দেয়, সে-কাজ যথাযথ সম্পাদনে তাহাদের ইচ্ছাও থাকে না, যোগ্যতায়ও কুলায় না, অতএব আত্মস্বার্থ সংরক্ষণে আবার কর্মক্ষেত্রে বিক্ষোভ চালাইয়া যাইতে হয়। এই ধারার মোট ফল দাঁড়ায় ছাত্রগণপক্ষে সময় ও শক্তির অপচয়মাত্র, দেশের পক্ষে বৃথা অর্থব্যয় ও মারাত্মক আতঙ্ক। শিক্ষালয়ে ভর্তি হওয়া, শিক্ষাকাল সমাপনান্তে পরীক্ষা দেওয়া, কিছুরই উদ্দেশ্য এখন শিক্ষালাভ বা বিদ্যাচর্চা নয়; উদ্দেশ্য চাকুরির বাজারের জন্য যোগ্যতার কোনওরূপ একটা ছাপ সংগ্রহ। সে বাজারও আবার আজ ভাঙাহাট, সেখানে মেকি মার্কা দেখাইয়াও বেচাকেনা বন্ধ হইবার জোগাড়। ফলে দেশময় যুবকদের বেকারসমস্যা, frustrationজাত ব্যর্থতায় বিক্ষোভের লীলা, বিপ্লবদ্বারা ভাঙনের পর শুষ্কমরুতে সোনা ফলাইবার বাসনা। এইসকলজনিত সমস্যার পরস্পর সংঘাতে অপর ফল হয় যত অভাব ও অসন্তোষবৃদ্ধি তত বিপ্লবেচ্ছার বৃদ্ধি, ভাঙন দ্বারা নবীন পুনর্গঠনের স্বপ্ন। সে স্বপ্নে যাঁহারা ফলবান হইবেন মনে করেন তাঁহারা নিজকর্তব্য করুন কিন্তু আমরা সে-স্বপ্নের সাফল্যে সন্দিহান বলিয়া অপর পথের সন্ধান করিতেছি। বিপ্লব যদি অনিবার্য হয় তবে তাহা অবশ্যম্ভাবী এবং তাহা নিবারণে বা আহ্বানে উৎসাহ আমাদের নাই। আমাদের প্রয়াসদৃষ্টি অন্যবিধ গঠনের উপর।

৫

সাবেকি শিক্ষাব্যবস্থা মৃতকল্প। স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটি যেভাবে চলিতেছিল, বর্তমানের দুর্যোগ কাটিয়া গেলে অল্পাধিক সংস্কার-পরিবর্তন করিয়া সে ধারা আবার চালাইতে পারা যাইবে, একথায় বিশ্বাস হয় না, সে-আশায় নিরাশ হইতে হইবে মনে হয়। টোল-চতুষ্পাঠীর যুগ যেমন বৃটিশ আমলের শিক্ষাব্যবস্থার আরম্ভে বিলীন হয়, বর্তমান ধারায় এখন তেমনি অবসানকাল সমাগত মনে হয়।

যাহাদের অন্নবস্ত্রের চিন্তা নাই বা অল্পে সন্তুষ্ট হইয়া যাহারা জ্ঞানাহরণ বা বিদ্যাচর্চায় আগ্রহী এবং তাহাতে প্রাপ্ত মানযশ ও প্রভাবপ্রতিষ্ঠা লাভেই তৃপ্ত, তাহাদের কথা চিন্তায় প্রয়োজন নাই। অধিকাংশের সে-পথ নয়। অধিকাংশের পক্ষে শিক্ষিত বিদ্যাকে কার্যকরী অর্থকরী হইতে হইবে, আর্থিক লাভজনক প্রয়োগ practical utility করা employment-oriented হইতে হইবে বাস্তবজগতের প্রয়োজন মিটাইতে সমর্থ হইতে হইবে। অর্থবান লোকের নিজসন্তানদের শিক্ষার জন্য নিজব্যয়ে নিজমনোমত শিক্ষালয় গঠন বা শিক্ষাবিধি

প্রবর্তনে কোনো বাধা থাকার আবশ্যকতা বোধ করি না। নিজ নিজ আদর্শে ভবিষ্যতের মানুষ তৈয়ার করায় যেমন সমাজের ও রাষ্ট্রবিধির দায়িত্ব কর্তব্য বা অধিকার আছে, মাতাপিতারও তাহা থাকা উচিত, অবশ্য যদি তাহা সমাজসম্মত আদর্শের পরিপন্থী না হয়।

ভবিষ্যতের মানুষ তৈয়ারির জন্য মাতাপিতা ও পরিবারবর্গের সকলেরই শিশুর জন্মের পূর্ব হইতেই সুস্থমাতার যাহাতে সুস্থ সন্তান জন্মে, সে-বিষয়ে কিছু pre-natal শিক্ষা থাকা আবশ্যক। সন্তানজন্মের পরে post-natal জীবনের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য, উপযুক্ত পদ্ধতিতে লালন-পালন বিষয়ের শিক্ষাও সকলের পক্ষে আবশ্যক। এইসকল বিষয়ে জ্ঞানের অভাববশত আমাদের দেশের শিশুদের পালনে যেসব বহু দোষ হয়, তাহার ফল পরিণত জীবনেও কার্যশীল থাকিয়া ব্যক্তিগত তথা পারিবারিক সামাজিক রাষ্ট্রীয়, সর্বক্ষেত্রে বহু অবাঞ্ছিত মনোবৃত্তি ও ব্যবহার-বিভ্রাট সৃষ্টি করে—এইসকল বিষয় শিশুচিকিৎসক child psychologist, educational psychologist এবং social psychologistগণ বিচার ও বর্ণনা করিয়াছেন, এখানে তাহার উল্লেখ অনাবশ্যক। আমাদের দেশে কয়জন মা-বাপ জানেন বা মনে রাখেন যে, কান্না বা আবদার খোটের ফলে শিশু যদি মা-বাপের অনিচ্ছা ও অসম্মতি সত্ত্বেও নিজের ইচ্ছা একবার মিটাইতে পারে তবে সারাজীবনে তাহার সে-অভ্যাস বদলান যায় না ?

তারপর নার্সারি ও কিণ্ডারগার্টেন শিশুশিক্ষার বয়স। খেলাধূলার মাধ্যমে শিশুদের এই বয়সে হাত-পা-চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার, অন্য অনেকের সঙ্গে একত্র মিলিতভাবে কাজ করা, নিয়মতন্ত্রতা অভ্যাস, শিক্ষাদায়িকাদের নেতৃত্বে এবং নিজেদের মধ্যেও পরস্পরের নেতৃত্বে খেলা ও কাজ শিক্ষা দিতে হয়। শিশুরা নিয়মতন্ত্র শিখিতে ও অভ্যাস করিতে (যেমন queueing up) ভালবাসে, নেতৃত্বের অধীনতা তাহাদের প্রিয়; সেই পথে তাহাদের পরিচালনা করিয়া সম্মিলিত সামাজিক জীবনের রীতি শিক্ষার ভিত্তিস্থাপন করিতে হয়। কোন শিশুর স্বভাব ও মনোবৃত্তি কিরূপ, দোষ-গুণ কি, বুদ্ধিবৃত্তির ন্যূনতা বা প্রাখর্য কিরূপ, রুচি ও ইচ্ছার গতি কোন্ দিকে, এইসকল বিষয় বুঝিবার ও তাহাতে কোনও angularity বা perversity থাকিলে তাহা শোধনের প্রকৃষ্ট সময় এই বয়সে। বর্ণপরিচয় গণন প্রভৃতি বিষয় অতিপ্রাথমিক বিদ্যা ধীরেধীরে, বিনা প্রয়াসে যাহাতে শিশুর হৃদয়ঙ্গম হয় সেদিকে বিশেষ মনোযোগ দিতে হয়, শিক্ষণীয় বিষয়ে জোরজবরদস্তি করিলে শিক্ষাবিষয়ে শিশুমনে ভীতির সঞ্চার

হইয়া বহু কুফল প্রসব করে। এইসকল বিষয়েও শিশুমনোবিদগণ বহুশিক্ষা দিয়াছেন। শিশুশিক্ষার মোটকথা শিশু যেন সানন্দে, নিজসামর্থ্যের অনুরূপ ভাবে, খেলাধূলার মধ্য দিয়া নিজ শরীর ও মনের ব্যবহার বয়োজ্যেষ্ঠ শিক্ষকের নেতৃত্বে অথবা অন্য পাঁচজন সমবয়সীর সঙ্গে একত্র সম্মিলিত ভাবে করিতে শিক্ষা করিয়া সমাজধর্মের সমবায় বা co-operative মনোভাবে সুদীক্ষিত হইতে পারে। ভাঙাচোরায় যেমন তেমনি গড়া বানানো প্রভৃতি কাজেও শিশুরা উদ্যমী হয়; এই পথে constructive ও creative আদর্শে হাত-পা-বুদ্ধি ও মনোভাবের ব্যবহার শিক্ষাদ্বারা শিশুকে বাস্তব জীবনের উপযুক্ত করিতে হয়।

৬

কিণ্ডারগার্টেনের রীতিই প্রাইমারি স্কুলেও শিক্ষার্থীদের সাত-আট বৎসর বয়স পর্যন্ত চলা উচিত। তারপর উচ্চতর পর্যায়ে ১২ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা-বিধিতে বালক ও বালিকাদের জন্য বিভিন্ন স্কুলে বিভিন্ন প্রকারের curriculum আবশ্যক, যাহাতে উহাদের প্রত্যেকের প্রকৃতি ও ভবিষ্যজীবনের প্রয়োজন অনুযায়ী বিষয়-নির্বাচন হইতে পারে। এই বয়সে খেলাধূলার মাধ্যমের পরিবর্তে (খেলাধূলার স্বকীয় প্রয়োজনীয়তা অবশ্য কদাপি উপেক্ষণীয় নয়) crafts বা হাতের কাজের মাধ্যমে সকল বিষয়ে শিক্ষালাভ (basic education) বিধেয়। সে-হাতের কাজ শুধু সখের কাজ নয়; বাস্তব জীবনের নিত্য ও অবশ্য প্রয়োজনীয় নানা জিনিষ কিভাবে উৎপাদন ও নির্মাণ হয়, তাহা নিজের হাতে অভ্যাস করার ও তাহারই মাধ্যমে অপর বহু intellectual বিষয়ে প্রবেশ লাভ করার নাম basic education। এই বিষয় সম্বন্ধে আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকের অনেক ভ্রান্ত ধারণা আছে, তাঁহারা এই শিক্ষাবিধিকে crude বা primitive বা medieval আদর্শ ও মনোভাবজাত মনে করেন। কিন্তু এ-ধারণা অত্যন্ত ভুল। আজকাল সকল উন্নত ও সুশিক্ষিত দেশের শিক্ষাবিজ্ঞানবিদরা হাতের কাজের মাধ্যমে শিক্ষাবিধান প্রবর্ত্তনের পক্ষপাতী। এই রীতি যেমন তরুণ শিক্ষার্থীদের মানসিক ধারার অনুগামী তেমনই গণতান্ত্রিক সোশালিস্ট সমাজের আদর্শে ভবিষ্যতের মানুষ তৈয়ারির পথ। Practical জ্ঞানের অভাবে আমাদের শিক্ষায় দেখা যায় ছেলেপিলে সপ্তর্ষি মণ্ডলের সাতটা নক্ষত্রের নাম মুখস্থ করে কিন্তু আকাশের সপ্তর্ষিমণ্ডল কখনও তাহাদের দেখান হয় না এবং নিজের বাড়ির সামনের গাছ বা তাহাতে বসা পাখির নামও জানে না।

শিক্ষার উদ্দেশ্য মানুষের অন্তর্নিহিত শারীরিক—মানসিক যাবতীয় শক্তি সম্যক উদ্বুদ্ধ ও বিকাশ করা, চিন্তা কল্পনা চরিত্র কর্মশক্তি সৃষ্টিশক্তি প্রভৃতি গুণাবলি যাহার প্রকৃতিতে যেইরূপ আছে, সে-সম্বন্ধে নিজে সচেতন হওয়া এবং নিজের যে-বিষয়ে ন্যূনতা বা দুর্বলতা আছে তাহা পরিহার করিয়া যে-বিষয়ে উৎকর্ষ আছে তাহা অনুশীলন দ্বারা বর্ধন করা। সকলের সব গুণ থাকে না, আবার কোনও গুণই নাই এমন মানুষও হয় না। যাহার যে-গুণ আছে তাহার বর্ধনেই সমগ্র সমাজের কল্যাণ-পরিপুষ্টি হয়।

বিদ্যাবুদ্ধি বিষয়ক অন্য বহু প্রসঙ্গের কথা না বলিয়া শুধু এইটুকু মাত্রই বলা এখানে যথেষ্ট হইবে যে, বাল্যের শিক্ষণীয় বিষয়গুলি নানা বিষয়ের সঙ্গে প্রাথমিক পরিচায়ক হওয়া উচিত—ভাষা ইতিহাস ভূগোল গণিত, নানাবিষয়ক বিজ্ঞান প্রভৃতি। নানা বিষয়ের সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয়ের ফলে শিক্ষার্থীরা নিজনিজ রুচি ও সামর্থ্য বুঝিতে পারিবে এবং অভিভাবক ও শিক্ষকরাও সে-সামর্থ্যের পরিমাণ অনুমান করিতে পারিবেন। রুচি না থাকিলে সামর্থ্য হয় না, আবার রুচি থাকিলেই সামর্থ্যও থাকিবে এমন কোনই কথা নাই। যাহার যে-বিষয়ে রুচি বা সামর্থ্য নাই, সে-বিষয়ে তাহাকে গুঁতানো নিরর্থক।

আমার মনে হয় প্রাইমারি স্কুলে পড়ানো উচিত বয়স অনুযায়ী নয়, সামর্থ্য অনুযায়ী অর্থাৎ যে-বয়সই হউক, যাহাদের যে-বিষয়ে মাথা আছে তাহাদের একত্র সে-বিষয় পড়াইলে প্রগতি দ্রুততর হইবে, যাহারা সে-বিষয়ে slow বা dull তাহারা উহাদের গতিরোধ না করিয়া নিজেদের বুদ্ধি অনুযায়ী ভিন্নভিন্ন ক্লাসে পড়িবে। আরও মনে হয়, পরীক্ষাব্যবস্থায় ত্রৈমাসিক, যান্মাসিক বা বাৎসরিক পরীক্ষার পরিবর্তে প্রতি সপ্তাহে বিভিন্ন বিষয়ে (ঠিক যেন স্কুলে বসিয়া home work করিতেছে, এইভাবে) পরীক্ষা লইয়া সেই অনুসারে সারা বৎসরের ফলাফল নির্ণয় করিলে ভাল হয়, ইহাতে পরীক্ষা সম্বন্ধে ভীতি বা strain নিবারিত হয়। অল্পবয়সীদের পক্ষে বাড়িতে home taskএর চাপ ভাল নয়, বাড়িতে অন্যরকমের কাজ ও পড়ায় উৎসাহ দেওয়া বেশি ভাল। বাৎসরিক ক্লাস প্রোমোশন, পাস-ফেল বলিয়াও কিছু থাকা অনাবশ্যক—পরীক্ষায় ফেল হওয়া, প্রোমোশন না পাওয়া প্রভৃতিতে inferiority complex জন্মিয়া সমগ্র জীবনে নানা অবাঞ্ছিত মনোভাব সৃষ্ট হয়। ১২ বৎসর বয়স উত্তীর্ণ হইলে সকলেই প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষা সমাপন করিবে। এই বয়স পর্যন্ত শিক্ষাবিধি অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক, free and compulsory হওয়া উচিত। তারপর

সকলে বিভিন্ন বিষয়ে নিজনিজ যোগ্যতার পরিমাপক নম্বর বা গ্রেড পাইয়া উচ্চতর স্কুলে পারিলে ভর্তি হইবে অথবা জীবিকা উপার্জনের স্বরুচি ও সামর্থ্যানুযায়ী শিক্ষালাভের পন্থা অনুসরণ করিবে।

বিদেশী পর্যবেক্ষকমাত্রেই—কিবা মহোচ্চশিক্ষিত কিবা সাধারণশিক্ষিত—বলিয়া থাকেন আমাদের শিক্ষাবিধির কয়েকটা গুরুতর দোষ এইগুলি—(১) ইহাতে গোড়াপত্তন হয় খুব কাঁচা গাঁথুনির উপর, ছাত্ররা যে-বিদ্যা সংগ্রহ করে তাহা মুখস্থমাত্র হওয়ায় তাহাদের হৃদয়ে বা মস্তিষ্কে তাহা প্রবেশ করে না এবং বুদ্ধিবৃত্তি বা যুক্তিশক্তির সঙ্গে অঙ্গীভূত হইয়া চরিত্রসৃষ্টিও করে না, (২) যাহা শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা বিচারবুদ্ধিতে গৃহীত না হওয়ায় কার্যত প্রয়োগে অসমর্থ হয়, (৩) এই দুই কারণে লোকের মন বি-এ-এম-এ পাশ করিয়াও logical ও rational না হইয়া বালবৎই অপরিপক্ক ও অস্থির থাকিয়া যায়, ইত্যাদি। বাঙালী তরুণদের intelligence কাহারও অপেক্ষা কম নয়, বরং অনেকের তুলনায় বেশিই, কিন্তু সাধনা, শ্রম, intellectual maturity ও discipline এর অভাবে সে বুদ্ধিবৃত্তি এবং তাহার পরিচালনা অন্তিমে পাশ্চাত্যদের এবং জাপানীদেরও সঙ্গে সামর্থ্য ও নিষ্ঠায় পারিয়া উঠে না। প্রাথমিক শিক্ষার গোড়া পত্তন খুব পাকা হইলে সে-শিক্ষায়ই মানুষ ক্রমে জীবনে সর্বক্ষেত্রের সম্মুখীন হইতে পারে।

৭

তারপর Secondary শিক্ষার কথা বলিব। ১৩ হইতে ১৬ নয়, ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত Secondary বা Higher Secondary শিক্ষার অর্থাৎ হাইস্কুলের সময় হওয়া উচিত। এই সময় হইতেই আজকাল শিক্ষাক্ষেত্রে যে-সব সমস্যার উদয় হইয়াছে তাহার প্রারম্ভকাল এবং সেই সমস্যাগুলি ক্রমে আরও বাড়িয়া হাইস্কুলের পর কলেজ, তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পর্যন্ত কণ্টকিত করিতেছে। দেশের ও বিদেশের শিক্ষা ও ছাত্রজগতের সঙ্গে যাঁহাদের সাক্ষাৎ পরিচয় আছে তাঁহারা একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে বর্তমান কালে আমাদের দেশে যাহারা হাইস্কুলে বা কলেজে বা Universityতে পড়ে তাহাদের অর্ধেকের উপর ঐঐ শিক্ষার অনুপযুক্ত। কথাটি এদেশের অনেকের কাছে খুবই অপ্রিয় হইবে, কিন্তু তাহা হইলেও উহা সত্য। Secondary শিক্ষা শুধু humanities বা sciences নয়, নানাবিধ vocational, technical, commercial প্রভৃতি শাখায়

বিস্তৃতিলাভ করা উচিত। সবদেশেরই লোকের মধ্যে অনেকেরই intelligence থাকে, কিন্তু intellectual শক্তি সে-তুলনায় অনেক অল্পলোকের থাকে। Humanities ও scienceএর শিক্ষা শুধু যাহাদের intellectual মেধার এবং রুচি ও আগ্রহের বল আছে তাহাদেরই জন্য হওয়া উচিত, বাকিদের পক্ষে অন্য বহুতররূপ শিক্ষা ও কর্মের ক্ষেত্রে প্রসারিত হওয়া উচিত। গুঁতাইয়া পিটাইয়া গণ্ডাখানেক প্রাইভেট টিউটার রাখিয়া, বা পরীক্ষা পিছাইবার বা ভণ্ডুল করিবার বহুপ্রয়াসের পর, বা টোকাটুকি খাতাবদল, গার্ডদের হাত প্রভৃতির পর যাহারা ফেল বা কোনক্রমে থার্ড ডিভিশনে পাশ করে, তাহাদের নিজেদের পক্ষে ও সমাজের পক্ষে অনেক বেশি হিতকর হয় যদি তাহারা সে-শিক্ষায় না গিয়া যাহাতে তাহাদের রুচি ও সামর্থ্য আছে, যাহাতে জীবিকার সংস্থান হয় এমন শিক্ষা বা Occupation অনেক আগেই অবলম্বন করে। যাহাদের intellectual চিন্তা মেধা ও সৃষ্টিশক্তি যত প্রবল তাহারা অবশ্যই তত উচ্চ সম্মান ও উচ্চ পারিশ্রমিক লাভের যোগ্য কারণ দেশের ভবিষ্যোন্নতি তাহাদেরই হাতে কিন্তু সমাজসেবায় প্রযোজ্য যাহা অপরদেরও দেয় তাহার সম্মান বা মূল্য কম মনে করা উচিত নয়। হাতের পাঁচটা আঙুলের ক্রিয়া ও আকার বিভিন্ন কিন্তু যে কোনোটির অভাবেই হাতের কর্মশক্তি খর্ব হয়; মস্তিষ্ক না থাকিলে জীবমাত্রেই যতটা বিকল হয়, দেহযন্ত্রের অন্যান্য অংশের অভাবে বৈকল্য সেইরূপই ঘটে।

আমাদের যৌবনকালের একটা গল্প বলি। বাঙলাদেশের কোনও সরকারি কলেজের ইংরেজ প্রিন্সিপ্যাল কলিকাতা ইউনিভার্সিটির সেনেট মীটিংএ আপত্তি তুলেন যে, সব পরীক্ষায় শতকরা ৭০-৮০ জন অযোগ্য ছাত্রকে পাশ করান হইতেছে কেন? উত্তরে সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সাহেবকে প্রশ্ন করেন সাহেব বিলাতের যে ইউনিভার্সিটির যে যে পরীক্ষা পাশ করিয়াছিলেন, সেই সেই পরীক্ষায় সেই সেই বৎসর তাঁহার ইউনিভার্সিটিতে কয়জন ফেল করিয়াছিল? সাহেব ইহার উত্তর দিতে পারেন নাই, কারণ তাঁহার দেশে কদাচিৎ কেহ কোনও পরীক্ষায় ফেল হয়—ইহার কারণ এখনই বলিতেছি—পরীক্ষার্থীরা সকলেই পাশ করে। অতএব প্রমাণ হইল বিলাতী ইউনিভার্সিটির তুলনায় কলিকাতা ইউনিভর্সিটিতে ঢের বেশি উঁচু standard maintain করা হয়, কলিকাতার পরীক্ষা আরও বেশি strict। সাহেবকে এইভাবে নিরুত্তর নির্বাক করিয়া দেওয়ায় আমরা তখন সার আশুতোষকে খুব বাহবা দিয়াছিলাম কিন্তু আজ বুঝি তিনি যে sophistry দ্বারা সাহেবকে নিরুত্তর করিয়া দিয়াছিলেন,

সাহেব সরলবুদ্ধি শিক্ষাব্রতী ছিলেন বলিয়া তাহা তৎক্ষণাৎ ছেদন করিতে পারেন নাই যাহা ধড়িবাজ ব্যবসায়ী বা আইনজীবী হইলে পারিতেন। আশুতোষের যুক্তি ও তুলনায় যে fallacy ছিল তাহা তাঁহার মতো বিজ্ঞব্যক্তির অজ্ঞাত থাকা আশা করা যায় না এবং তাহা এই—বিলাতে প্রাইমারি শিক্ষা সমাপক ছাত্রবৃন্দের ৫০%এর বেশি হাইস্কুলে যাইতনা যাহারা যাইত তাহাদেরও প্রায় ১০%বা ততোধিক হাইস্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত হইবার আগেই, এবং যাহারা আদপেই হাই স্কুলে যাইত না তাহারা অন্য জীবিকায় প্রবেশ করিত বা তদুপযোগী শিক্ষালাভে (apprenticeship) প্রবৃত্ত হইত, আমি অবশ্য যে-যুগের কথা বলিতেছি তখন ইংলণ্ড পুরা ক্যাপিট্যালিস্ট দেশ, ডেমক্রাসি সে-দেশের লোকের আজীবন মজ্জাগত হইলেও এবং লেবার পার্টির লোক পার্লামেণ্টে থাকিলেও কনজারভেটিভ ও লিবারেল, এই যে দুই প্রধান রাজনৈতিক দলে সে-দেশ তখন বিভক্ত ছিল, তাহাদের কেহই সোশালিস্ট মতবাদী ছিল না। সে-তুলনায় পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য দেশে সোশালিস্ট ধারা অনেক বেশি অগ্রসর হইয়াছিল। সে-যুগে বিলাতে হাইস্কুল শেষ হইলে বড়জোর ২০% ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয় অর্থাৎ কলেজে যাইত, বাকিরা অন্য নানা জীবিকামার্গ অবলম্বন করিত, যাহাতে যথাকালে প্রভূত অর্থ প্রতিপত্তি ও মানযশাদিও লাভ হইত। আমাদের দেশে সেযুগে জীবিকামার্গ অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল, তাই দলে দলে ছাত্র স্কুল-কলেজ আচ্ছন্ন করিত। এই প্রসঙ্গে আরও বলা উচিত যে ক্যাপিট্যালিস্ট দেশ হইলেও এবং হাইস্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা মহার্ঘ হইলেও ইংলণ্ডে উপযুক্ত মেধাবী ছাত্রদের হাইস্কুল বা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার কোনও কালে কোনও বাধা হইত না। প্রত্যেক স্কুল ও কলেজে private donarগণের প্রদত্ত এত ছাত্রবৃত্তির ব্যবস্থা ছিল। তারপর অক্সফোর্ড—কেম্‌ব্রিজের মতো নামজাদা aristocratic বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বড়লোকের ছেলেরা প্রবেশ করিত (অবশ্য হাইস্কুলের শিক্ষা তাহারা ফাঁকি দিয়া নয়, সুযোগ্যভাবেই সমাপন করিয়া আসিত) তাহারা কিছুটা লেখাপড়ার চর্চা করিয়া বাকি সময় খেলাধূলা ও সামাজিক জীবনচর্চায় কাটাইয়া ৩-৪ বৎসর পরে পরীক্ষা না দিয়াই (দিলে হয় ফেল করিত, না-হয় নীচ ক্লাস পাইত) বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করিত, কারণ তাহাদের জীবিকাপথের জন্য ডিগ্রিসংগ্রহের প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং যাহারা শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা দিত তাহারা প্রায় সকলেই হাইস্কুল হইতেই স্কলারশিপ পাওয়া মেধাবী ছাত্র, তাহাদের কেহই যে পরীক্ষায় ফেল করিবে না, ইহাতে বিচিত্র কি? অতএব দেখা গেল সার আশুতোষের

ধোঁকা কত ফাঁকা ছিল।

কলিকাতা ইউনিভার্সিটিতে যেমন অকাতরে ছাত্রদের পাশ করান হইত অপর দিকে আবার সেকালে মাদ্রাজ ও এলাহাবাদে, এবং কিছুমাত্রায় কয়েক বৎসর নবস্থাপিত পাটনা ইউনিভার্সিটিতেও, তেমনি অকাতরে ছাত্ররা ফেল করিত, পাশের মাত্রা প্রায় ৩০% ছিল। ইহাতে শুধু উঁচু standard ছাড়া (standard সর্বদা উঁচু থাকাই ভাল) আরও একটা জিনিষ প্রমাণ হয়—অধিকাংশ পরীক্ষার্থীর অযোগ্যতা। অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং যেমন বিপজ্জনক, অনধিকারীকে বিদ্যাদানও সেইরূপ নিরর্থক। এই সূত্রে স্মরণীয়, হিউয়েন চাং বলিয়াছেন নালন্দা মহাবিহারে প্রবেশার্থী হইয়া সারা ভারত হইতে যত ছাত্র আসিত তাহাদের অন্তত ৭-৮ জনকে বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইতে হইত, অর্থাৎ মাত্র ২০-৩০% বাছাই করা ছাত্রই নালন্দায় পড়িবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। অতএব নালন্দার যে এশিয়ামহাদেশব্যাপী সুখ্যাতি হইয়াছিল তাহার একটি কারণ বিদ্যাবিষয়ে বিচার অধিকারী। অতএব বলিতে চাই শিক্ষা-সোপানাবলি যত উপরে উঠিতে থাকিবে তত ছাঁটাই-বাছাই, screening ও sieving দরকার, এবং যাহারা সুযোগ্য তাহাদের পক্ষে উত্তরোত্তর উচ্চশিক্ষা লাভে কোনও আর্থিক বাধা থাকা অনুচিত। যেহেতু আমাদের দেশে শিক্ষায়তনের জন্য private donars প্রায় নাই বলিলেই হয়, সেহেতু যোগ্য ছাত্রদের যাহাতে উচ্চশিক্ষা লাভে আর্থিক বাধা না হয়, সেইজন্য state হইতে ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। পাশ্চাত্যদেশে বিদ্যার্থে কত ধনীরা অজস্র অর্থদান দ্বারা কতরকম Foundation সৃষ্টি করেন; যাঁহাদের তত সামর্থ্য নাই তাহারাও অনেকে নিজেরা যে স্কুলে পড়িয়াছেন সেখানে অনেকে বৃত্তির ব্যবস্থা করেন, অনেকে কর্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণের পর সেই স্কুলে বিনা বেতনে কোনরূপ কাজও করেন—সে spirit আমাদের দেশে দুর্লভ, সেইরূপ নিষ্ঠাময় সেবালাভের যোগ্যতাই বা আমাদের দেশের কয়টা স্কুল-কলেজের আছে?

যে-ছাত্রেরা Primary stage শেষ করিয়া Secondary স্কুলে আসিবে তাহাদের নিজ স্কুলের শেষ পরীক্ষামাত্রের নয়, সমগ্র প্রাইমারী শিক্ষা জীবনের পড়াশুনা ও স্বভাব চরিত্রের record দেখাইয়া সেকেণ্ডারি শিক্ষায় ভর্তি হইতে হইবে। শুধু তাই নয়, যে-সেকেণ্ডারি স্কুলে তাহারা ভর্তি হইতে আসিবে, সেই স্কুলের কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা করিয়া যাহাকে ইচ্ছা ভর্তি করিবেন, যাহাকে ইচ্ছা না হয় করিবেন না। এইরূপে মাত্র যোগ্যকেই ভর্তি করিবার পরও সেকেণ্ডারি

স্কুলের কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের পড়াশুনা আচরণ-ব্যবহারে যখনই অসন্তুষ্ট হইবেন তখনই তাহাদের বহিষ্কার পর্যন্ত ইচ্ছানুরূপ শাস্তিদান করিতে পারিবেন, তাঁহাদের এই অধিকারে কেহ বাধা দিলে State হইতে আইন আদালত প্রভৃতিদ্বারা বাধা-দায়কের সমুচিত শাস্তির ব্যবস্থা থাকা কর্তব্য। শিক্ষাস্রোতের অনাবিল প্রবাহ এই উপায়াবলি দ্বারা বহুল পরিমাণে প্রতিবন্ধকহীন করিলে স্কুলে যে বাতাবরণ সৃষ্ট হইবে তাহাতে ছাত্র ও শিক্ষকের পরস্পর সম্বন্ধ বিষয়ে সহজ ও স্বাভাবিক ধারা চলিতে পারিবে। বলা বাহুল্য শিক্ষকগণেরও অতি সুযোগ্য ব্যক্তি হওয়া প্রয়োজন। যাহার আর কিছুই হইল না সেই ইস্কুলমাষ্টার হইল, ইহা নয়; বেতন ও সম্মান উভয়ই যেন এমন সন্তোষজনক হয় যে শিক্ষকদের টিউশান প্রভৃতি নানা উপায়ে অর্থচিন্তা না করিতে হয়। প্রাইভেট টিউশনির প্রয়োজন শিক্ষাবিধির ব্যর্থতা, ছাত্র ও শিক্ষক উভয়েরই অযোগ্যতা প্রমাণ করে, এইসূত্রে কত দুর্নীতিও যে প্রশ্রয় পায় তাহাও সকলেই জানেন। ভর্তি, পাশ-ফেল, নম্বর দেওয়া প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষকদের বা শিক্ষালয়ের যদি দুর্নীতি বা corruption প্রভৃতির অপ্রবাদ রটে তবে এইবিষয়ে public enquiry হইয়া সমুচিত প্রতিকার-ব্যবস্থা কর্তব্য। দেশের মানুষ তৈয়ারির পন্থা প্রধানত secondary education—সরিষায় ভূত ধরিলে ছাড়াইবে কে?

Humanities, sciences, technology, commercial প্রভৃতি বিষয়াবলির জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্কুল থাকা উচিত। প্রত্যেক স্কুলে ১৩-১৮ বৎসর বয়স্ক ছাত্রদের জন্য ছয়টি ক্লাস থাকিবে এবং কোনও sectionএ ২৫ জনের বেশি ছাত্র থাকিবে না। পড়াইবার method এইরূপ হইবে যেন theory শিক্ষার পর তাহা প্রয়োগের প্রতি বেশি যত্নদৃষ্টি দেওয়া হয়—theoryতে শিখিয়া অনর্গল আওড়াইলাম, কিন্তু practical applicationএর কার্যক্ষেত্রে কিছুই পারিলাম না, পাশ্চাত্যের সকলেই আমাদের দেশের শিক্ষাবিধিতে এই ত্রুটি লক্ষ্য করেন। সকল শিক্ষার এই আদর্শও শিক্ষা দেওয়া উচিত যে তাহা যেন সমগ্র সমাজের হিতবর্ধক হয়, শুধু একজনের বা কয়েকজনের হাতে এইভাবে ব্যবহৃত না হয় যে অন্যকে exploit করিয়া তাহা মাত্র কয়েকজনের স্বার্থবৃদ্ধি করে। খুব প্রকাণ্ড বাড়িতে অজস্র বড় বড় ক্লাসে ছাত্র কিলকিল করার যুগ এখন অতীত। Secondary স্কুলের বয়স হইতেই স্কুলের তথা স্বগৃহপরিবারের ছায়ায় ছাত্রদের কোনরূপ কাজ দ্বারা কিছু কিছু অর্থার্জনের ব্যবস্থা থাকিলে ভাল হয়—এইরূপ productive কাজ যাহাতে নিজ হাতে, প্রয়োজন অনুসারে কিছু যন্ত্রপাতির সহযোগে

কাজ করিতে হয়, যাহা white collar জাতীয় নয়, যাহা শ্রমসাপেক্ষ এবং সমগ্র সমাজের প্রয়োজনে লাগে, যাহার চাহিদা আছে এবং ছাত্রদের ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির প্রয়োগ ব্যবহার ও উৎকর্ষ হইতে পারে। ইহাতে ছাত্রদের মনে স্বাবলম্বন-দায়িত্ব সম্বন্ধে বিবেক-বুদ্ধি জাগ্রত হইবে। এইরূপ জিনিষ উৎপাদন শিক্ষা করা ও কিছু অর্থার্জনও করা কর্তব্য, যে-জিনিষ ধনীদের বিলাসের, সৌখিনের সখের বা শিশুর খেলনা না হইয়া সাধারণ লোকের ব্যবহার্য। ইহাতে ডেমক্রাটিক ও সোশালিস্ট মনোভাব স্পষ্ট হইবে। বুর্জোয়াভাবের অর্থ যেখানে স্বরুচিমত্তা শালীনতা, culture ও refinement, সেখানে তাহা অবশ্য অর্জনযোগ্য, কিন্তু যেখানে ইহার অর্থ শরীরকর্মে বিমুখতা ও লজ্জাবোধ, snobbery, manual বা menial কাজের প্রতি তাচ্ছিল্য উক্তবিধ কর্মীদের প্রতি অবজ্ঞাভাব, সেখানে তাহা অবশ্য নিন্দনীয় ও বর্জনীয়। প্রথম ইংরেজ আমলের একজন লাটসাহেব প্রত্যহ সকালে কলিকাতা ময়দানে morning walk করিতেন, দেখিয়া আমাদের দেশের লোকে সাব্যস্ত করিল নিশ্চয়ই উহার মাথা খারাপ, কারণ লাট-বেলাটদের কি পায়ে হাঁটিয়া বেড়ান উচিত ?

Curriculum সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, সর্ববিধ secondary স্কুলে বেশ কিছু পরিমাণে ব্যবহারিক বাঙলা (মাতৃভাষা) ও ইংরেজি (যাহা সাহিত্যিক শোভার জন্য নয়, যাহা জাগতিক প্রয়োজনে নিত্যব্যবহারে লাগিবে) এবং ইতিহাস ও ভূগোল (প্রত্যেকে ১০০ নম্বর) Compulsary হওয়া উচিত, তাহা ছাড়া উচ্চমানে আরও তিনটি যে-কোনও বিষয়, প্রত্যেকে দুই শত করিয়া নম্বর, সর্বসমেত মোট ১০০০ নম্বর, ইহাই matric বা higher secondary বা school finalএর standard হওয়া কর্তব্য, স্কুল কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক মাসে একটা করিয়া পরীক্ষা লইয়া ছয় বৎসরের পর high standard অনুযায়ী সামগ্রিক ফল নির্ণয় করিবেন, বৎসরের মাঝখানে আর কোনও পরীক্ষা থাকিবে না। পরীক্ষা দিতে বসিয়া যে-ছাত্র কোনরূপ গোলযোগ বা ওজর-আপত্তি করিবে তাহাকে স্কুল হইতে বহিষ্কার এবং আদালত সোপর্দ করা হইবে। যে-ছাত্র কোনও বৎসর ফেল করিবে তাহাকে সে-স্কুল ছাড়িতে হইবে—অন্য স্কুল ইচ্ছা করিলে পরীক্ষা করিয়া তাহাকে ভর্তি করিতে পারিবেন (যাহারা কোনো স্কুলে ভর্তি হইতে পারিবে না তাহাদের কথা পরে বলিতেছি)। লাইব্রেরি ও ল্যাবরেটরির উত্তম ব্যবস্থা ও ব্যবহার হওয়া প্রয়োজন। লাইব্রেরি আজকাল স্কুলের কি কথা, কলেজ ও ইউনিভার্সিটিতেও নিয়মরক্ষক শোভামাত্রে,

দাঁড়াইয়াছে, Postgraduate ছাত্রেরাও text বা prescribed বই ছাড়া অন্য কিছু স্পর্শও করে না, recommended বইএর হয়তো নামও জানে না, অন্য বই চোখেও কখনও দেখে না। লাইব্রেরির ব্যবহার এইভাবে শিক্ষা দেওয়া উচিত যাহাতে ছাত্রেরা শিক্ষকের কাছে শিক্ষণীয় বিষয়াবলির মূলসূত্রে ও মূলতত্ত্বগুলি বুঝিয়া লইয়া বাকি সব তথ্যাবলি নিজেরা নানা বই দেখিয়া সংগ্রহ ও আয়ত্ত করে। পুরাতন তত্ত্ব হইতে কিভাবে নূতন তত্ত্বের উদ্ভব হয়, পুরাতনের ত্রুটি নূতনে কিভাবে সংশোধিত হয়, এই সকল বিষয় নূতন-পুরাতন উভয়বিধ পুস্তকের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় থাকিলে সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়; কোনও বিষয়ের ব্যাপকতাই বা কিরূপ, তাহারও বোধ জন্মে নানা প্রামাণিক বই পাঠে। বই ঘাঁটিতে হইলে যুক্তিপূর্বক বিচার ও লক্ষ্য করিতে হয় কোন্ বইতে নূতন কি যুক্তিসম্মত তথ্য আছে। পঠনীয় বিষয় ছাড়া অন্য নানা বিষয়ক out-books, যেমন ভ্রমণবৃত্তান্ত জীবনী বিজ্ঞান adventures, explorations, বৈদেশিক ইতিহাস ও জীবনযাত্রা, fiction, romance প্রভৃতি—ছাত্রেরা যত পড়ে তত ভাল। বড়বড় লাইব্রেরির বিখ্যাত পুরাতন গ্রন্থাবলীর বহু যে ক্রমে misplaced, not found, not returned প্রভৃতি নানা ভাঁওতার অন্তরালে বাস্তবে বেহাত হইয়া যাইতেছে, তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন।

প্রসঙ্গত মনে হইল—কলিকাতার একটি প্রসিদ্ধ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে একটি সুন্দর Children's Library আছে, উহাতে বৈকালবেলা ছেলেমেয়েরা পড়ে। কিন্তু বৈকালে বদ্ধঘরে কৃত্রিম আলোতে কাটানোই তরুণদের পক্ষে ভাল, না মুক্তবায়ুতে দৌড়াদৌড়ি খেলাধূলাই ভাল? শীতপ্রধান দেশে যেখানে শীতকালে শীতবায়ু বা বরফপাত বা বৃষ্টিতে ঘরের বাহির হওয়া যায় না সেখানে ছেলেদের বৈকালে ও সন্ধ্যায় ঐভাবে কাটানোর ব্যবস্থা থাকে কিন্তু গ্রীষ্মের বৈকালে বা শীতকালে বরফান্তে রৌদ্র উঠিলে কেহ ঘরে বদ্ধ থাকে না। অপর—কিশোরদের সমাজসেবার মনোভাব, স্বাবলম্বন শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের জন্য বিলাতে Boy Scout movement এর সৃষ্টি হইয়াছিল। আমাদের দেশে দেখি উহাতে snobbery, চালিয়াতি ও বড়লোকি ঢংএরই পোষণ হয়। একবার রেলের খুব বড় একটা জংশন স্টেশনে, শীতকালের প্রায় শেষরাত্রে প্লাটফর্মে ট্রেনের প্রতীক্ষায় ট্রাঙ্কের উপর বসিয়া থাকাকালে দেখিয়াছিলাম অবাঙালী বড় একদল বয়স্কাউট অন্য ট্রেন হইতে নামিয়া ঐ প্লাটফর্মে জমায়েৎ হইলে স্কাউটমাস্টার মহাশয় হুকুম দিলেন প্রত্যেকে যেন refreshment roomএ গিয়া এককাপ করিয়া চা

খাইয়া আসে। যে-ট্রেনে তাহারা যাইবে তাহার অনেক দেরি ছিল। বিলাতে হইলে এইরূপ ক্ষেত্রে স্কাউট দল প্লাটফর্মের এক অন্তে গিয়া নিজেদের স্টোভ জ্বালিয়া (কারণ প্লাটফর্মে কাঠকুটা বা কাগজের open fire জ্বালান নিষেধ) নিজেদের কেঁৎলিতে জল ফুটাইয়া নিজেদের চা-চিনি-দুধ নিজেদের enamelled পেয়ালায় খাইত। আর একবার মধ্যভারতে ভ্রমণকালে দেখিয়াছিলাম ex-curtion ফেরৎ একদল কলেজের ছাত্র একটা বড় জংশনে দিনের বেলায় আমার ট্রেনে উঠিলেন, প্রত্যেকের পরিধানে নূতন শার্ট প্যাণ্ট জুতা, প্রত্যেকের সঙ্গে একটি করিয়া দামী চামড়ার আনকোরা নূতন suit-case ও নূতন hold-all। সেই লগেজে দুটা III class যাত্রী Compartmentএর বেঞ্চ মেঝে (upper bunk নয়) ভরাট হইয়া (অর্থাৎ যাত্রীগণের বহু অসুবিধা করিয়া) ছাদ পর্যন্ত পৌছিল, বাবাজীবনরা নিজেরা, যদিও III class ticketধারী, সেকেণ্ড ফার্স্ট যেখানে পারিলেন উঠিলেন। বিলাত হইলে ইহারা excursion উপযোগী অর্ধপুরাতন মোটা জামা-জুতা পরিয়া, পিঠের haversackএ সদাপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লইয়া বাকি জিনিষ মিলিটারিদের মতো পুরু canvas-এর ব্যাগে ভরিয়া অন্য যাত্রীদের অসুবিধা না হয় এমনভাবে গাড়িতে চাপাইয়া থার্ডেই উঠিতেন। আমাদের দেশে সকল জিনিষেরই কিভাবে বিকৃতি ঘটে।

মধ্যবিত্তেরা সকল দেশের সমাজের যেমন মেরুদণ্ড স্বরূপ—কালিদাস যেমন হিমালয়পর্বত সম্পর্কে বলিয়াছেন পৃথিবীর মানদণ্ডের (মাপকাঠি, measuring rod) মতো প্রসারিত হইয়া উহার দুই অন্ত সমুদ্রে নিমজ্জিত রহিয়াছে—সেইরূপ মধ্যবিত্তরা এক অন্ত (অর্থাৎ upper middle class) দ্বারা aristocracyকে এবং অন্য অন্ত (lower middle class) দ্বারা proletariatকে স্পর্শসংযোগ করিয়া সমাজের স্থিতিস্থাপক সাম্য রক্ষা করেন। Class conflict ও class struggleএর শত বাণী প্রচার করিলেও উচ্চ-মধ্য-নিম্নবিত্তের ত্রিগুণাত্মক ত্রিমূর্তি চিরকাল সমাজধর্ম ও সমাজগঠনের প্রতীক হইয়া রহিবে মনে হয়। Middle বা Secondary স্কুলের শিক্ষা তেমনি জাতির চরিত্র ও সামর্থ্যের অস্থি ও মজ্জা স্বরূপ। এই শিক্ষাকে যত দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া যত আলো-বাতাস-সার-জল দিয়া পুষ্ট করা যায়, সমাজপ্রগতি সূচক ভাল ফুল ফল তত বেশি উহাতে প্রসূত হয়। রহস্যচ্ছলে বলি—ভারতীয় দার্শনিক মতে প্রকৃতির ত্রিগুণাত্মক ক্রিয়ার সম্পূর্ণ সাম্য বা undisturbed equilibrium অবস্থায় জগৎ সৃষ্টি হয় না অর্থাৎ সৃষ্টি ক্রিয়া থাকে না বা লোপ পায়—কিন্তু

কোনও সৃষ্টি নাই, প্রকৃতির এমন অবস্থা কি বাস্তবে হইতে পারে? সুতরাং উহা একটা speculative hypothesis বা philosophical fiction মাত্র। অতএব class distinction, মানুষের মধ্যে শ্রেণীভেদে নানাবিষয়ক তারতম্য সমাজ-জীবনে অপরিহার্য; উহার বিলোপসাধন নয়, সকলের মধ্যে বিরোধ না ঘটাইয়া মৈত্রীস্থাপন, co-operational harmonyই অতএব কাম্য। "চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ-কর্ম-বিভাগশঃ" এই শাস্ত্রবাক্য বোধহয় শুধু vested interested সংরক্ষণচেষ্টা বা conservativeness প্রসূতই নয়, বাস্তবজীবনের অভিজ্ঞতাজাতও হইয়া থাকিতে পারে।

আমাদের গরমদেশে সব ঘরবাড়ি-রেল-ট্রাম-বাস air-conditioned কবে হইবে জানি না (পাশ্চাত্যে অমন শীতকালে ঐসবেই heatingএর ব্যবস্থা থাকে)। এইরূপ অবস্থায় দুপুরের গরম ও ঘামের কষ্টের পরিবর্তে সব স্কুল-কলেজ সকালে—এবং residential হইলে বিকালেও কিছু সময়—হওয়া উচিত। ঋতু অনুসারে সময় কিছু কিছু করিয়া আগাইয়া পিছাইয়া দিতে হয়। ইহাতে ক্লান্তি এবং অকারণে শক্তিক্ষয় কম হইবে। প্রত্যহ ৫ ঘণ্টা ক্লাস হইবে, প্রত্যেক periodএর পর interval, মধ্যকালে জলখাবারের আধঘণ্টা ছুটি; সর্বসমেত ছয় period class। গ্রীষ্মের ও পূজার লম্বা ছুটি তুলিয়া দেওয়া উচিত—বিলাতি স্কুলের দৃষ্টান্তে আমাদের দেশে গরমের ছুটির ব্যবস্থা হইয়াছিল কিন্তু বিলাতে গ্রীষ্মের দুই মাসই outdoor খেলাধূলা বেড়ান প্রভৃতি আমাদের অবসর হয়, বাকি সব মাস বৃষ্টি ঝড় মেঘ কুয়াসা বৃষ্টি বরফে indoor জীবনের অনুকূল। আমাদের দেশে উল্টা—শীতের দুইমাসই outdoor বেড়ান খেলা প্রভৃতির সময়। শীতের দুইমাস দুপুরে class হইবে, পড়ানর চাপ কমাইয়া উহাতে আধা-ছুটির ভাব করিয়া outdoor activityতে উৎসাহদান কর্তব্য (সারা বৎসরই সন্ধ্যাবেলায় ঘণ্টাদুয়েক লাইব্রেরি ল্যাবরেটারি workshop machineshop প্রভৃতি খোলা রাখিয়া শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে ছাত্রদের কাজ করিবার ব্যবস্থা কর্তব্য। আমাদের দেশের লোক একলা বসিয়া নির্জনে কাজ করিতে ভয় পায়, নিঃশব্দে কাজ করা বসিয়া কাজ করা অপমানজনক মনে করে। ইহার কারণ যে বাল্যের বদ অভ্যাস, গৃহপরিবারের বাতাবরণ ও দেশরীতিজনিত কতকগুলি মানসিক complexপ্রসূত তাহা শিক্ষকগণ মনস্তত্ত্ববিদদের কাছে সহজেই জানিতে পারিবেন। Teachers trainingএ মনস্তত্ত্ব ও মনোবিশ্লেষণ বিষয়ে শিক্ষকদের শিক্ষাদান কর্তব্য এবং এইবিষয়ে তাঁহাদের জন্য মধ্যে মধ্যে

refresher courseও হওয়া উচিত।

Primary ও Secondary উভয় শিক্ষার Syllabus ও Text book নির্ধারিত হইবে সরকারি শিক্ষা Board দ্বারা। Text book বিষয়ে কত দুরাচার হয় সকলেই জানেন। স্কুলের জলখাবার ছাত্ররা সঙ্গে আনিতে পারে কিন্তু school হইতেও co-operative প্রথায়—contractor দ্বারা নয়—সস্তায় পুষ্টিকর রুচিকর খাঁটি Tiffinএর ব্যবস্থা কর্তব্য, যাহার প্রস্তুতি ও বণ্টন শিক্ষক ও ছাত্রদের হাতেই থাকিবে। নানারূপ extra-curricular ও extra-mural কাজে ছাত্রদের উৎসাহ দান কর্তব্য। ইহাতে ও ক্লাসের শিক্ষায় social ও civic senseএর উপর দৃষ্টি যেন রাখা হয়, চাঁদা তুলিবার উৎসাহ দস্যুবৃত্তির প্রকারান্তর; অবিশ্রাম loud-speaker বাজান বর্বরভাবে আত্মপ্রচারক sadism; কোথাও queue না করিয়া ধাকাধাক্কি ও queue jumping গুণ্ডামি; ট্রামে-বাসে নিজের সীটে অপরকে বসিতে না দিবার চেষ্টা ছোটলোকি, লোকের যাতায়াতের পথ আটকাইয়া দাঁড়াইয়া গল্পগুজব বা হুড়াহুড়ি পশুত্ব—এইসব সম্বন্ধে চেতনার উদ্রেক আবশ্যক। Political indoctrination অপেক্ষা social ও civic বিষয়ক indoctrination অনেক শুভকর মনে করি।

শিক্ষারীতিতে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে home work জাতীয় exercise বাড়াইতে হয়। যাহা শিক্ষা দেওয়া হইল তাহা ছাত্ররা যত বেশি ব্যবহারে প্রয়োগ করিতে শিখে ততই শিক্ষাদান সার্থক হয়। শিক্ষকদের উপর অন্য কাজের ভার এইরূপ লঘু হওয়া উচিত যাহাতে তাঁহারা এই tutorial work সযত্নে পরীক্ষা করিয়া প্রয়োজনমত দোষত্রুটির উপর ছাত্রদের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার যথেষ্ট সময় পাইতে পারেন। ইহাতেই ঠিক পড়াশুনার প্রকৃত ফল হয়।

প্রত্যেক secondary স্কুলে ছাত্রদের ছয় বৎসরের কাজকর্মের ফলাফল বেশ strictly বিবেচনা করিয়া যে-সার্টিফিকেট দিবেন তাহা দেখাইয়া পাশ-ছাত্ররা কলেজে ভর্তির অধিকারী হইবে—অবশ্য প্রত্যেক কলেজ কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করিলে নিজেরা পরীক্ষা করিয়া ছাত্র ভর্তি করিবেন। ইহাছাড়া সরকারি Secondary Education Board নিজস্ব পরীক্ষার আয়োজন করিবেন। যে-ছাত্ররা কোনও স্কুলে ভর্তি হইবে না বা হইতে পারিবে না তাহারা প্রাইভেট টিউটারের কাছে পড়িয়া Boardএর Test পরীক্ষার পর (Standard যেন Schoolএর পরীক্ষা অপেক্ষা কদাপি নিচে না হয়) Finalএ পাশ করিলে কলেজে ভর্তি হইতে পারিবে। স্কুলের পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণরাও Board পরীক্ষা দিতে পারিবে

কিন্তু দুইবার ফেল করিলে কেহই আর পরীক্ষা দিতে পারিবে না। সব স্কুলে অভিভাবক ও শিক্ষকদের ইচ্ছা হইলে কিছু ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিতে পারে। দেশাত্মবোধের শিক্ষা সদা দাতব্য। সর্ববিধ Secondary শিক্ষায় মাতৃভাষা, practical English, ইতিহাস ও ভূগোল Compulsory হওয়ার কথা আগেই বলিয়াছি।

৮

কলেজের শিক্ষা বা Higher Education গবর্মেণ্ট কর্তৃক নির্দিষ্ট Syllabus অনুযায়ী হওয়া উচিত। ভর্তির মালিক হইবেন কলেজ নিজে। পরীক্ষাও করা হইবে University দ্বারা নয় State Higher Education Board দ্বারা। কলেজের attendance percentage তুলিয়া দিতে হইবে, যাহার ইচ্ছা আসিবে ইচ্ছা না হয় আসিবে না কিন্তু আসিয়া কোনও অবাঞ্ছনীয় আচরণ করিলে দণ্ডিত বা চিরতরে বহিষ্কৃত হইবে। পরীক্ষার Standard বেশ উঁচু রাখিতে হইবে। কোনও সরকারি চাকুরির জন্য কাহারও graduate হইবার আবশ্যক নাই, প্রত্যেক প্রকার চাকুরির জন্য গবর্মেণ্ট ভিন্ন স্বতন্ত্র পরীক্ষা করিবেন। স্কুল বা Secondary Boardএর পরীক্ষায় পাশ করিলে সকলেই তাহাতে appear হইতে পারিবে। Universityর নিজেরও Graduation পরীক্ষা থাকিবে, Post-Graduate পড়িতে হইলে তাহাতে পাশ করিতে হইবে। যাহারা P. G. পড়িবে না তাহারাও এই পরীক্ষা দিতে পারিবে। যাহারা Secondary শিক্ষার পর জীবিকার্জনে যাইবে তাহারা যদি Graduation পড়িতে চায় তবে তাহাদের জন্য সান্ধ্য কলেজ থাকা উচিত। Master's Degree ও ডক্টরেট সংক্রান্ত শিক্ষা ও পরীক্ষাদি সম্পূর্ণ Universityর অধীনে থাকিবে। যতদিন উচ্চ শিক্ষিতদের জীবিকার্জনের নানা পথ প্রসারিত না হয় ততদিন উচ্চ শিক্ষাদানের কোনও সার্থকতা না থাকায় তাহাতে কেহ আগ্রহবান হইবে না, কিন্তু ঐবিষয়ক চিন্তা ও ব্যবস্থা শিক্ষাব্রতীদের নয়, অন্য দেশনেতৃবৃন্দের কর্তব্য। প্রত্যেক কলেজকে গবর্মেণ্ট দ্বারা recognised হইতে হইবে।

Undergraduate ছাত্রদের কিছু কিছু part-time কাজ করিয়া অর্থার্জনের দ্বারা নিজনিজ শিক্ষাব্যয় আংশিক বহন করা উচিত। শিক্ষার জন্য গবর্মেণ্টকেও অবশ্য বহু অর্থ ব্যয় করিতে হইবে—যে-দেশ যত উন্নতিকামী সে-দেশে শিক্ষাকার্যে সরকারি দান তত বেশি। যাবতীয় প্রকারের শিক্ষালয়ে শান্তি ও শোভনীয়তা রক্ষা করা শুধু শিক্ষালয় কর্তৃপক্ষের নয়, গবর্মেণ্টেরও কর্তব্য—"রাজরক্ষিতব্যানি

হি তপোবনানি নাম"—শিক্ষালয়ই এইযুগের তপোবন। Recognised কলেজ ছাড়া Unrecognised Coaching Institutionএও Graduation-এর জন্য পড়া যাইতে পারিবে।

যাহা বলিলাম তাহা অনেকের কাছে হয়তো utopian মনে হইতে পারে। তাঁহারা নিজনিজ প্রস্তাব প্রকাশ করিলে ভাল হয়। যাহা বলিয়াছি তাহা শিক্ষকসমাজের বিবেচনার জন্যই, তাহাতে lacuna যাহা যাহা রহিল তাহা তাঁহারাই পরিপূরণ করিতে পারিবেন কারণ কি অভিপ্রায়ে কি বলিয়াছি তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন। চিরকাল বা দীর্ঘকালের জন্য কিছু বলি নাই, যাহা বলিলাম তাহা বৎসর পাঁচেক পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে।

পরিশেষে আরও একটা বিষয় যোগ করা অতি-আবশ্যক মনে করি। Undergraduate কলেজের ছাত্ররা এবং P.G. প্রভৃতি উচ্চতর শ্রেণীর ছাত্ররাও যৌবনোচিত আগ্রহ ও উৎসাহে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আদর্শ বা কর্মের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইবে ইহাতে আশ্চর্য কিছু নাই, সক্রিয়ভাবে তাহাতে যোগ দেওয়া না দেওয়াও তাহাদের নিজ দায়িত্ব। কিন্তু সে ক্রিয়াশীলতার ক্ষেত্র হইবে দলগত রাজনীতিচর্চার নিজনিজ পীঠভূমি, শিক্ষায়তনে নয়। শিক্ষালয়ে কোনও প্রকার দলগত রাজনৈতিক ক্রিয়ার—যদি তাহা নিতান্ত academic natureএর না হয়—পীঠস্থান হওয়া অবাঞ্ছনীয়, সুতরাং উহা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। ছাত্রদের Unionএও শুধু academic জীবনের ছাত্রমঙ্গল বিষয়ক ছাড়া কোনও প্রকার দলীয় রাজনীতির আমদানি হইলে সে Unionকে শিক্ষালয়-কর্তৃপক্ষ ও গবর্মেণ্ট উভয়েরই শাসন করা কর্তব্য। Street urchin হইতে আরম্ভ করিয়া সকল উচ্চগ্রামের ছাত্রদের দ্বারা দলগত স্বার্থবুদ্ধির প্রচেষ্টায় আমাদের রাজনৈতিক নেতারা ছাত্রদের তথা সমাজের মহা অনুপকার সাধন করিয়াছেন মনে করি।

Graduation পরীক্ষায় কোনও বিষয় compulsory থাকার প্রয়োজন নাই। যে-কোনও তিনটি বিষয়—তাহার মধ্যে ইংরেজী ও মাতৃভাষাও থাকিতে পারিবে, সবই অবশ্য high standardএ পাঠ্য হইবে! প্রত্যেক চাকুরি সম্বন্ধীয় পরীক্ষায় high standardএ practical ও মাতৃভাষার test থাকা ভাল।

ডক্টর অমূল্যচন্দ্র সেনের মতামত একান্তভাবে তাঁরই নিজের। এই বিতর্কমূলক রচনাটির বিষয়ে পাঠকদের সুচিন্তিত আলোচনা আহ্বান করছি। সম্পাদক, পরিচয়।

বিদ্যাসাগর ঃ দেড়শ বছর পরে

গোপাল হালদার

১৩৬৭ বঙ্গাব্দে ৩১এ শ্রাবণ কনিষ্ঠ ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নকে লেখা এক চিঠিতে বিদ্যাসাগর ঘোষণা করেছিলেন, 'বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম।' তিনি বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন করেই ক্ষান্ত থাকেননি, একমাত্র পুত্র নারায়ণকে বিধবা-বিবাহ করার ব্যাপারে সম্পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা করেছিলেন। ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র দাদাকে এই বিবাহে বাধা দেবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। কারণ এরপরে বন্ধু এবং আত্মীয়েরা সামাজিকভাবে তাঁদের একঘরে করতে পারেন। বিদ্যাসাগর সেই অনুরোধের জবাবেই এই চিঠিটি লিখেছিলেন। তিনি এই চিঠিতে আরো বলেছিলেন, "আমি বিধবাবিবাহের প্রবর্ত্তক, আমরা উদ্যোগ করিয়া অনেকের বিবাহ দিয়াছি, এমনস্থলে আমার পুত্র বিধবাবিবাহ না করিয়া কুমারী বিবাহ করিলে আমি লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারিতাম না, ভদ্র সমাজে নিতান্ত হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হইতাম। নারায়ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়া আমার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে এবং লোকের নিকট আমার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতে পারিবেক, তাহার পথ করিয়াছে।"

রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর চরিত্রে 'যে অজেয় পৌরুষ এবং অক্ষয় মনুষ্যত্ব' লক্ষ্য করেছিলেন উপরোক্ত চিঠিটি তারই উৎকৃষ্ট প্রমাণ। এখানে তাঁর নিজস্ব কার্যকলাপ এবং মূল্যবোধ সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের নিজস্ব মতামতেরও পরিচয় পাওয়া যায়।

বিদ্যাসাগরের জীবন ও কার্যকলাপকে আমরা প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করতে পারি, (১) সামাজিক সংস্কার—(ক) বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন, (খ) বহুবিবাহের বিরোধিতা, (গ) স্ত্রী-শিক্ষার প্রবর্তন। (২) শিক্ষা সম্পর্কিত কার্যাবলী—(ক) সংস্কৃত কলেজে গঠনমূলক কার্যকলাপ, (খ) শিক্ষার মাধ্যম এবং শিক্ষার জন্য কি কি ভাষা শিখতে হবে সেই সম্পর্কে চিন্তা, (গ) লোকশিক্ষার প্রসার, (ঘ) স্কুল এবং কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং সেগুলির পরিচালনা। (৩) সাহিত্য সৃষ্টি—(ক) উদ্দেশ্য (খ) গদ্যরচনার প্রতিভা।

সামাজিক সংস্কার

(ক) বিধবা বিবাহ

১৮৫৬ সালের ২৫ নং ধারায় হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহ আইনসম্মতভাবে ঘোষিত হোলে উনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে সামাজিক সংস্কার আন্দোলনের ইতিহাসে এটি বৃহত্তম সাফল্য বলে গণ্য হলো। একে কেন্দ্র করে একদিকে রক্ষণশীলদের আপত্তি এবং ঘৃণা অপরদিকে মুষ্টিমেয় প্রগতিশীল হিন্দুর কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা বিদ্যাসাগরের উপর সমভাবে বর্ষিত হয়েছিল। ১৮২৯ সালে সতীদাহ প্রথা নিবারণও এ-রকম আলোড়নের সৃষ্টি করতে পারেনি। এমন কথাও শোনা যায় যে বিধবা-বিবাহ আইন প্রবর্তনের ফলে সিপাহীকুল এবং রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের মধ্যে যে অবিশ্বাস ও সন্দেহের আভাস দেখা যায় তা ১৮৫৭-৫৮ সালের সিপাহী বিদ্রোহে অন্যতম ইন্ধন যুগিয়েছিল। এবং সমসাময়িক কালের সাক্ষ্যে দেখা যায় বিদ্যাসাগর এবং রাজনারায়ণ বসুর মতো যাঁরা বিধবাবিবাহে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন বিদ্রোহী সিপাহীদের হাতে তাঁদের জীবন বিপন্ন হবার সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছিল।

অবশ্য এ-কথা ঠিক যে এ-ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের পূর্বেও কিছু কিছু আন্দোলন ও রচনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ১৮৪২ সালে 'ইয়ং বেঙ্গলে'র মুখপত্র 'The Bengal Spectator'এ বিধবাদের প্রতি সহানভূতি জানানো হয় এবং 'পরাশর সংহিতা'র সেই বিখ্যাত উদ্ধৃতিটি তুলে বিধবা-বিবাহের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়। এই উদ্ধৃতিটি পরে বিদ্যাসাগরের হাতে শক্তিশালী অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। ১৮৫৫খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের মাধ্যমে এই ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের প্রথম আবির্ভাব। এই পত্রিকাতেই বিদ্যা-সাগরের দ্বিতীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় আরও একমাস পরে। এই দুটি প্রবন্ধই পরে প্রচারের জন্য পুস্তিকা হিসাবে বের করা হয়। ইতিমধ্যেই তিনি তাঁর বাবা ও মায়ের সম্মতি যোগাড় করেছিলেন এবং রক্ষণশীল হিন্দুদের যুক্তি ও তর্ক দিয়ে পরাভূত করবার জন্য হিন্দুশাস্ত্র থেকেই বিধবা-বিবাহের স্বপক্ষে উদ্ধৃতি ও প্রমাণ সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি তাঁর সমস্ত ব্যক্তিত্ব, শক্তি এবং দৃঢ়তা নিয়ে শাস্ত্রীয় উদ্ধৃতির বলে বলীয়ান হয়ে বিদেশী শাসকগোষ্ঠীকে এবং দেশীয় সমাজকে প্রভাবিত করার জন্য কাজে নামলেন। পুস্তিকার পর পুস্তিকা প্রকাশিত হতে লাগল এবং রাজা রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে রক্ষণশীল সম্প্রদায়ও পালটা আক্রমণ

হানতে লাগলেন। ঈশ্বর গুপ্ত এবং দাশরথি রায়ের মতো কবিরা বিদ্যাসাগরের সমর্থনে কবিতা ও গান রচনা করলেন এবং কৃষ্ণনগরের তাঁতিরা তাঁদের বোনা শাড়ির ওপর বিধবা-বিবাহ বিষয়ক গান বুনে দিতে লাগলেন। এইরকম উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে ১৮৫৫ সালের ৪ঠা অক্টোবর, 'ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা' স্বাক্ষরিত একটি আবেদনপত্র সরকারের কাছে জমা পড়ল। এতে সরকারকে হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহের ব্যাপারে সমস্ত বাধা অপসারণের জন্য আইন করতে অনুরোধ করা হলো। ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের বাকি অংশেও এই আন্দোলন সাড়া ফেলে দিয়েছিল। মহারাষ্ট্র এবং দক্ষিণ-ভারতের এক প্রভাবশালী অংশ বিদ্যাসাগরকে সমর্থন করলেন কিন্তু বিরোধীদের সংখ্যা ছিল অগণ্য। আর সমস্ত বাঙলাদেশ তখন ঝড়ের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আছে; বিধবা-বিবাহের পক্ষে এবং বিপক্ষে প্রায় ৫০০০০ স্বাক্ষর সমন্বিত ২০টি আবেদনপত্র জমা পড়েছিল। অন্তত ১০০টি প্রচারপুস্তিকা ও আবেদনপত্র জনসমক্ষে প্রচার করা হয়েছে। হিসেব করে দেখা গেছে যে জনসাধারণের শতকরা ১০ ভাগের বেশি লোকের সমর্থন বিদ্যাসাগর পাননি। কিন্তু তাঁর সমর্থকদের মধ্যে ছিলেন নদীয়ার মহারাজা এবং বৈষ্ণব পণ্ডিতদের মতো শাস্ত্রবিশারদেরা। বিদ্যাসাগরের জীবনে এই অধ্যায়টি আসলে 'জয়লাভের মধ্যে পরাজয়' হিসেবে চিহ্নিত থাকবে। তিনি তাঁর সমস্ত প্রভাব ও শক্তি বিস্তার করে বিধবা-বিবাহ আইনসম্মত হওয়ার পর বিবাহযোগ্য তরুণ-তরুণীদের এ-ব্যাপারে প্রভাবিত করতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর সমস্ত বন্ধু এবং সমর্থকদের বিধবা-বিবাহে যোগদানের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এবং রাজা রামমোহন রায়ের পুত্র রাধানাথ রায়ের মতো যাঁরাই এ-ব্যাপারে আপত্তি করেছেন তাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়েছেন। বিদ্যাসাগর নিজের থেকে এ-জাতীয় বিবাহের খরচা যুগিয়েছেন। বর-বধূকে উপহার দিয়েছেন এবং অনেক ক্ষেত্রেই বরপক্ষ কন্যাপক্ষের কাছে যে-সব গহনা দাবি করেছিল সেগুলি নিজেই কিনে দিয়েছেন। একবার যখন এই বদান্যতার কথা প্রচারিত হয়ে গেল তখন আর বিদ্যাসাগর এর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাননি। তাঁকে ঋণ করে বিধবা-বিবাহ দিতে হয়েছে। এবং সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের কথা প্রায়ই জোচ্চোর ও ঠগেরা তাঁর এই মহানুভবতার সুযোগ নিয়েছে। টাকা-পয়সা নিয়ে বিধবা-বিবাহ করবার পর অনেক ক্ষেত্রেই নব-বিবাহিত যুবক তার বধূকে বিদ্যাসাগরের জিম্মায় ফেলে রেখে পালিয়ে গেছে। যখন ভেতর থেকে এ-জাতীয় আক্রমণ আসছিল তখন বাইরে থেকে রক্ষণশীল সম্প্রদায় এই বিবাহ ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে বিদ্যাসাগরের ওপর এবং সাধারণ

ভাবে সমস্ত অংশগ্রহণকারীদের ওপর আক্রমণ কেন্দ্রীভূত করছিল। প্রথম বিধবা বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় ১৮৫৬ সালের ৭ই ডিসেম্বর—পাত্র ছিলেন সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাসাগরের সহকর্মী শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। সমসাময়িক কালের সংবাদপত্র-গুলিতে দেখা যায় যে কলকাতায় এই প্রথম বিধবা-বিবাহ অনুষ্ঠান কালে কি জাতীয় চাঞ্চল্য ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। বিদ্যাসাগরের শত্রুরা তাঁকে লাঞ্ছনা ও প্রহার করবার জন্য গুণ্ডা লেলিয়ে দিয়েছিলেন, এমনকি তাঁর জীবনও বিপন্ন হতে বসেছিল। কিন্তু এ-সমস্তই বিদ্যাসাগরকে আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করে তুলেছিল এবং কিছুতেই তিনি আত্মসমর্পণ করতে রাজী ছিলেন না। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ঘটনাস্রোত পরিবর্তিত হতে শুরু করল। বিধবা-বিবাহ বিদ্যাসাগরকে নৈরাশ্য ও ঋণের বোঝায় জড়িয়ে ফেলছিল। তাঁর বন্ধু ও সমর্থকেরা ক্রমশই সরে যাচ্ছিলেন এবং তাঁর ঋণের বোঝা ক্রমশই বেড়ে চলছিল। এই জাতীয় বন্ধুদের সম্পর্কে তিনি যে কতখানি হতাশ হয়েছিলেন তা প্রখ্যাত রাজনৈতিক নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা ডঃ দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা একটা চিঠিতে জানা যাবে, "আমি ক্রমাগত কয়েকদিনই চেষ্টা দেখিলাম. কিন্তু তোমার কাগজ খোলসা করিয়া দিবার উপায় করিতে পারিলাম না। তুমি বিলক্ষণ অবগত আছ আমি নিজ প্রয়োজনের নিমিত্ত তোমার কাগজ লই নাই। বিধবাবিবাহের ব্যয়নির্ব্বাহার্থে লইয়াছিলাম, কেবল তোমার নিকট নহে, অন্যান্য লোকের নিকট হইতেও লইয়াছি। এ সকল কাগজ এই ভরসায় লইয়াছিলাম যে, বিধবাবিবাহপক্ষীয় ব্যক্তিরা যে সাহায্য দান অঙ্গীকার করিয়াছেন, তদ্দারা অনায়াসে পরিশোধ করিতে পারিব। কিন্তু তাঁহাদের অধিকাংশ ব্যক্তিই অঙ্গীকৃত সাহায্য দানে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন। সেই সকল ব্যক্তি অঙ্গীকার প্রতিপালন করিলে, আমাকে এরূপ সংকটে পড়িতে হইত না।...এইরূপে আয়ের অনেক খর্ব্বতা হইয়া আসিয়াছে কিন্তু ব্যয় পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়া উঠিয়াছে সুতরাং এই বিষয় উপলক্ষে যে ঋণ হইয়াছে তাহার সহসা পরিশোধ করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।...আমাদের দেশের লোক এত অসার ও অপদার্থ বলিয়া পূর্ব্বে জানিলে, আমি কখনই বিধবাবিবাহ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতাম না।..." (চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিদ্যাসাগর, পৃষ্ঠা ২৮৬-৮৭)।

অবশ্য এই হতাশা সত্ত্বেও জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি তাঁর কাজ চালিয়ে গেছেন এবং যাঁদেরই বিদ্যাসাগরের চরিত্র সম্পর্কে ধারণা আছে তাঁরাই জানেন যদি তিনি প্রথম থেকেই বন্ধুদের অপদার্থতার কথা বুঝতে পারতেন তাহলেও

তিনি এই কাজ থেকে বিরত হতেন না। অবশ্য বিশেষ করে বাঙালি অভিজাত ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত পরিবারের লজ্জাজনক নিরপেক্ষতা এবং বিধবা-বিবাহের ব্যাপারে জড়িত লোকদের চারিত্রিক দৈন্য তাঁকে মানসিকভাবে প্রায় বিপর্যস্ত করে দিয়েছিল। শেষ জীবনে তাঁর প্রকাশন ব্যবসার ক্রমবর্ধমান আয় থেকে তিনি তাঁর সমস্ত ঋণ শোধ করতে পেরেছিলেন বটে কিন্তু আমাদের ভদ্র সমাজের আচরণ সম্পর্কে নৈরাশ্যজনক অভিজ্ঞতার ফলে মানুষের মহত্তের প্রতি তাঁর বিশ্বাস শিথিল হয়ে গিয়েছিল।

(খ) বহুবিবাহের বিরোধিতা

বিধবাবিবাহ প্রবর্তন আন্দোলন অন্তত আংশিকভাবে সফল হয়েছিল এবং আইনের স্বীকৃতিও পেয়েছিল। কিন্তু 'কৌলিন্যপ্রথা' এবং বহুবিবাহের বিরুদ্ধে বাঙলাদেশে যে আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল তা এমনকি আইনের স্বীকৃতিও পায়নি। বহুবিবাহ ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল থেকেই ছিল। কিন্তু বাঙলা দেশে বিশেষ করে অভিজাত বাঙালি ব্রাহ্মণদের মধ্যে কৌলিন্যপ্রথার নামে এটি একটি বীভৎস ও ঘৃণ্যরূপ ধারণ করেছিল। এই আইনের ফলে একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর কন্যার সঙ্গে সেই গোষ্ঠীরই পুরুষের বিবাহ দিতে হবে এবং সে-রকম পাত্রের সন্ধান না পাওয়া গেলে কন্যাকে আজীবন অবিবাহিত থাকতে হবে; তথাপি অন্য কোথাও তার বিবাহ দেওয়া যাবে না। এর ফলে কুলীন ব্রাহ্মণেরা অজস্র অর্থ নিয়ে বৃদ্ধা থেকে বালিকা পর্যন্ত বিভিন্ন বয়সের মেয়েদের বিবাহ করে বেড়াত। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রাজা রামমোহন রায় এবং 'ইয়ং বেঙ্গল' সম্প্রদায়ই সর্বপ্রথম প্রতিবাদ জানান।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকেই সর্বপ্রথম কৌলিন্যপ্রথার একটি জীবন্ত এবং বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হয়। এবং এই নাটকের জনপ্রিয়তা প্রমাণ করে যে সে-যুগের জনসাধারণ সামগ্রিকভাবে কৌলিন্যপ্রথাকে অপছন্দ করতে আরম্ভ করেছিল। ১৮৫৬ সালে বিধবা-বিবাহ আইন প্রবর্তনের ফলে বিদ্যাসাগর একই পদ্ধতিতে বহুবিবাহ প্রথার বিলোপ সাধন করতে চাইলেন। ১৮৫৬ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করবার জন্য প্রথম প্রতিনিধিদল সংগঠিত করেন। জনগণের স্বাক্ষর সমন্বিত একটি আবেদনপত্রও তৎকালীন গভর্ণর জেনারেলের কাছে পাঠানো হয়। সরকারী পক্ষ থেকে একটি বিল আনার প্রতিশ্রুতিও এই মর্মে দেওয়া হয়। কিন্তু

১৮৫৭-৫৮ সালে সিপাহী বিদ্রোহ বৃটিশ শাসকদের এদেশের সামাজিক ও ধর্মীয় আচরণগুলির সংস্কার সাধনে নিরুৎসাহী করে। অবশ্য সরকারের অস্বীকৃতি সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর নিরুদ্যম হলেন না। তিনি পুনরায় লেখনী ধারণ করলেন এবং তাঁর বিধবা-বিবাহ বিষয়ক রচনার ১৫ বছর পরে ১৮৭১ সালে বহুবিবাহের বিরুদ্ধে তিনি প্রথম বাঙলা প্রবন্ধ লিখলেন। দ্বিতীয় রচনাটি বেরুল ১৮৭৩ সালে। এছাড়া তিনি অন্তত আরও ৫টি বেনামী রচনা লিখেছিলেন। ব্যঙ্গরচনার এগুলি ছিল অপূর্ব নিদর্শন। কিন্তু শাসকগোষ্ঠীকেও তিনি এর দ্বারা প্রভাবিত করতে পারলেন না আবার জাতীয় ভাবধারাকে তিনি উদ্বোধিত করতেও সমর্থ হলেন না। কারণ, 'বিদেশীদের বিধিবদ্ধ আইনের দ্বারা অনুষ্ঠিত সংস্কারের' বিরোধী মনোভাব তখন সারা দেশে দেখা গিয়েছিল। অবশ্য বিদ্যাসাগর তাঁর দেশের লোকের এইজাতীয় মনোভাবের সঙ্গে একমত ছিলেন না এবং এই ব্যর্থতা তাঁর দেশের লোকের আন্তরিকতা সম্পর্কে তাঁর মনে আরও সন্দেহ জাগিয়ে তুলল।

(গ) স্ত্রী-শিক্ষার প্রবর্তন

সামাজিক পশ্চাদমুখীনতা দূর করবার জন্য অগ্রসর হয়ে বিদ্যাসাগর লক্ষ্য করেছিলেন যে যে-কোনো সংস্কারের জন্য দুটি মূল জিনিষ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। প্রথমত এই উদ্দেশ্যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও সাহিত্য সৃষ্টি করতে হবে এবং দ্বিতীয়ত আইনের সাহায্যে অন্যায় কুসংস্কারগুলি দূর করতে হবে। সুতরাং প্রথম থেকেই স্ত্রী-শিক্ষা প্রবর্তনের ব্যাপারে তিনি সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁর প্রধান প্রচেষ্টাগুলির মধ্যে ছিল, বেথুন স্কুলের দক্ষ সম্পাদক হিসেবে তাঁর কার্যকলাপ (ডিসেম্বর ১৮৫০ থেকে মার্চ ১৮৬৯), বিদ্যালয় সমূহের সহকারী পরিদর্শক (১৮৫৭-৫৮) হিসেবে গ্রামে গ্রামে বালিকাদের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, বীরসিংহ গ্রামে নিজের ব্যয়ে বালিকা বিদ্যালয় পরিচালনা এবং মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার জন্য তাঁর সারা জীবনব্যাপী আগ্রহ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চন্দ্রমুখী বসু প্রথম মহিলা হিসেবে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হোলে বিদ্যাসাগর তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে যে-চিঠি লিখেছিলেন তাতেই তাঁর এই আগ্রহের প্রমাণ পাওয়া যাবে। গ্রামে গ্রামে বালিকাদের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে কর্তৃপক্ষের মনোমালিন্য দেখা যায় এবং এরই ফলে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে তিনি বিদ্যালয় সমূহের সহকারী পরিদর্শকের পদ পরিত্যাগ করেন।

এ-কথা ঠিক যে খৃষ্টান মিশনারীরাই সর্বপ্রথম কলকাতা এবং তার আশে-পাশের অঞ্চলে স্ত্রী-শিক্ষার সূচনা করেন। রাজা রাধাকান্ত দেব ১৮২৯ সালে শোভাবাজার রাজবাড়িতে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। স্যার জে. এস. ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন যখন তৎকালীন শিক্ষাকমিটির সভাপতি ছিলেন তখন ১৮৪৯ সালের ৭ই মে তিনিই 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুলে'র প্রতিষ্ঠা করেন। এবং তার পরেই সরকারের পক্ষ থেকে এ-ব্যাপারে উৎসাহ দেখানো শুরু হয়। ১৮৫১ সালে প্রতিষ্ঠাতার নাম অনুসারে এই বিদ্যালয়ের নাম রাখা হয় বেথুন স্কুল। স্যার ড্রিঙ্কওয়াটার তাঁর স্ত্রী-শিক্ষা প্রবর্তনের কাজে 'ইয়ং বেঙ্গল' (বিশেষ করে দক্ষিণারঞ্জন মুখার্জী) এবং বিদ্যাসাগর ও তাঁর বন্ধুদের কাছ থেকে উৎসাহব্যঞ্জক সমর্থন লাভ করেছিলেন। তিনি বিদ্যাসাগরের মতামত এবং যোগ্যতা জানতেন এবং তাঁকেই ১৮৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁর বিদ্যালয়ের সম্পাদক হবার জন্য আহ্বান জানালেন। বেথুন জানতেন যে বিদ্যাসাগর ছাড়া আর কোনো লোকই সমাজের প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের সমস্ত বাধা বিপত্তিকে অগ্রাহ্য করে স্কুল পরিচালনা করতে পারবেন না। কয়েকমাসের মধ্যেই বেথুন মারা গেলেন কিন্তু ইতিমধ্যেই ডালহৌসির শাসনাধীনে ভারত সরকার এই স্কুলকে আনুকূল্য দেখাতে শুরু করেছিলেন এবং বিদ্যাসাগর ১৮৬৯ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত প্রায় ১৯ বছর ধরে এর সম্পাদকপদে আসীন ছিলেন। অবশ্যই এইসময় বেথুন স্কুলের উন্নতি ও অগ্রগতি অব্যাহত ছিল। এবং বিদ্যাসাগর তাঁর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় হিন্দুদের মন থেকে প্রাচীন এবং রক্ষণশীল ধারণাগুলি দূর করবার চেষ্টা করেছিলেন। যখন বেথুন স্কুলকে মহিলা শিক্ষকদের শিক্ষণ বিদ্যালয়ে পরিণত করবার কথা উঠল তখন তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে বিদ্যাসাগর সম্পাদকের পদ ত্যাগ করলেন। কারণ তিনি মনে করেছিলেন যে বাঙলার তৎকালীন সামাজিক অবস্থায় কোনো বয়স্কা তরুণী এই শিক্ষণ বিদ্যালয়ে ছাত্রী হিসাবে ভর্তি হবে না। বিদ্যাসাগরের এই আশঙ্কাই যথার্থ হয়েছিল এবং ১৮৭২ সালে এই পরিকল্পনা বাতিল হয়ে যায়। পদত্যাগ করা সত্বেও বিদ্যাসাগর বেথুন স্কুলকে যে দৃঢ়ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়ে যান তারই ফলে এটি বাঙলাদেশের প্রথম মহিলা কলেজ হিসেবেও উন্নীত হয় এবং যখন প্রথম দুজন মহিলা ছাত্রী কাদম্বিনী বসু (পরে গাঙ্গুলী) এবং চন্দ্রমুখী বসু ১৮৭৮ সালে এই বিদ্যালয় থেকে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং যখন তাঁরা দুজনেই ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম মহিলা স্নাতক হবার সম্মান অর্জন করেন তখন বিদ্যাসাগর তাঁদের সাদর

অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রমুখী বসু ইংরেজিতে M. A. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে অসুস্থ বিদ্যাসাগর সেক্সপীয়ারের রচনা পাঠিয়ে অভিনন্দন জানান। বস্তুত সেই নৈরাশ্য এবং অসুস্থতার মধ্যে এই সাফল্য তাঁর মনে বিপুল আশার সঞ্চার করেছিল। অন্তত তাঁর একটি প্রচেষ্টা যে সাফল্য লাভ করেছিল এতে তিনি অভিভূত হয়েছিলেন। এইদিক দিয়ে বিচার করলে বিনয় ঘোষের এই মন্তব্য যথার্থ বলেই মনে হয় যে, "স্ত্রীলোকদের অধিকার অর্জন করার সংগ্রাম অপেক্ষা কোনো বস্তুই বিদ্যাসাগরের কাছে প্রিয়তর বা মহত্তর ছিল না এবং স্ত্রীলোকের অধীনতার বিরুদ্ধে তিনি নির্ভীকভাবে যে-সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন আর কোথাও তিনি সেভাবে চালাননি।"

শিক্ষা সম্পর্কিত কার্যাবলী

বিদ্যাসাগর তাঁর জীবনের অনেক ক্ষেত্রে চূড়ান্ত জয়লাভ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে সাফল্যের কৃতিত্ব তাঁর নিশ্চয়ই পাওয়া উচিত। সারা জীবন ধরেই তিনি শিক্ষা বিস্তারকে তাঁর অন্যতম আদর্শ বলে গ্রহণ করেছিলেন। এবং তাঁর সমস্ত কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে তিনি নিজেকে একজন শিক্ষাবিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন।

(ক) পরিচালন দক্ষতা

সে-সময়ে বাঙালিদের সাধারণত কোনো শাসনভারের দায়িত্ব বিশ্বাস করে দেওয়া হতো না, অবশ্য এখনও তাঁদের এ-ব্যাপারে তেমন কোনো খ্যাতি নেই। বিদ্যাসাগর একের পর এক চাকরি ছেড়েছেন এবং অনেক সময়েই 'দলবদ্ধ'ভাবে কাজ করতে অসমর্থ হয়েছেন। কিন্তু একজন পরিচালক হিসেবে তাঁর দক্ষতার প্রশংসা না করে উপায় নেই। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে, বিদ্যালয় সমূহের সহকারী পরিদর্শক হিসেবে, বেথুন স্কুল অথবা নিজের 'মেট্রোপলিটন স্কুল এবং কলেজ', অতুলনীয় দক্ষভাবে পরিচালনায় অথবা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্যান্য যে-সমস্ত সংগঠনের সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন (যেমন 'হিন্দু ফ্যামিলি এ্যানুয়িটি ফাণ্ড', অথবা 'দুর্ভিক্ষ পীড়িত কিংবা রুগ্নদের সাহায্য করার প্রতিষ্ঠান') সেগুলির পরিচালনায় তিনি তাঁর যোগ্যতার যথেষ্ট প্রমাণ দিয়েছেন। এবং প্রত্যেকেই এ-কথা অনুভব করতে পারবেন যে কর্তৃপক্ষ এবং সহকর্মীদের শৈথিল্য, সঙ্কীর্ণতা এবং নির্বুদ্ধিতাই বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁদের সংঘর্ষের জন্য

প্রধানত দায়ী। এ-ব্যাপারে তাঁর ব্যক্তিত্ববোধ এবং দৃঢ়তাকে অথবা ঠাকুর্দার কাছ থেকে তিনি যে 'এঁড়ে' মনোভাব পেয়েছিলেন তাকে খুব বেশি দায়ী করা চলে না। তাঁর শক্তি, সাহস, দৃঢ়তা, পরিপূর্ণ সততা এবং কাজ করার ব্যাপারে অপরিসীম দক্ষতার দ্বারা তিনি সংস্কৃত কলেজের মতো একটি গোলমেলে প্রতিষ্ঠানকে আধুনিক জ্ঞানদানের উপযোগী একটি আধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে পেরেছিলেন; হ্যালিডের জনপ্রিয় শিক্ষা পরিকল্পনাকে অবিশ্বাস্য-রূপে কম সময়ের মধ্যে দেশীয় ও বালিকা বিদ্যালয়গুলিতে তিনি সার্থকভাবে প্রয়োগ করতে পেরেছিলেন এবং একটি মৃতকল্প বিদ্যালয়কে প্রথমে একটি সুপরিচালিত বিদ্যালয় এবং পরে তাকে প্রথম বেসরকারী ভারতীয় কলেজে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই কলেজটি মেট্রোপলিটন কলেজ নামে পরিচিত ছিল (বর্তমানে এর নাম বিদ্যাসাগর কলেজ)। এই কলেজের জন্য তিনি কঠোর পরিশ্রম করতেন। এমনকি অসুস্থ অবস্থাতেও তিনি প্রত্যক্ষভাবে এর শিক্ষাদান এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করতেন। ছাত্রদের তিনি সুশৃঙ্খল করে তুলতে পেরেছিলেন এবং ব্যক্তিগত স্নেহ-ভালবাসার দ্বারা তাঁদের সমমর্মী হয়ে উঠেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো খ্যাতিমান শিক্ষকদের তিনি নিযুক্ত করেছিলেন এবং সতর্ক ভালবাসা ও দৃঢ়তার সঙ্গে তাঁদের সেইযুগের শ্রেষ্ঠ শিক্ষকে পরিণত করেছিলেন। নিঃসন্দেহে তাঁর কলেজ সে-যুগের একটি শ্রেষ্ঠতম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল এবং ভবিষ্যৎকালে অনেক বাঙালি জননায়কের সৃষ্টি এখান থেকেই হয়। শাসন পরিচালনার ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের দক্ষতার এ-হলো এক উৎকৃষ্টতর প্রমাণ এবং তাঁর এই যোগ্যতার কথা সকলকেই স্বীকার করতে হবে।

(খ) শিক্ষা সম্পর্কিত পরিকল্পনা

আমাদের এ-কথা মনে রাখতে হবে যে বিদ্যাসাগর গতানুগতিক পথের পথিক ছিলেন না এবং উদ্দেশ্যহীন কোনো কাজও তিনি করতেন না। তিনি যখনই যা কিছু করতেন তার পিছনে একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা এবং কর্মসূচী থাকতো। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজে যখন তিনি যোগ দেন তখন থেকেই আমরা সমগ্র শিক্ষাজগতের জন্য তাঁর পরিকল্পনার পরিচয় পাই। আমাদের শিক্ষার বিষয়বস্তু এবং পদ্ধতি কিরকম হবে সে-নিয়ে তিনি গভীর চিন্তা করেছেন। গ্রামের মানুষের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য নতুন পদ্ধতির কথা তিনি ভেবেছেন এবং জ্ঞানকে প্রকৃত ফলপ্রসূ করবার জন্য তিনি চেষ্টা করেছেন।

(গ) শিক্ষার বিষয়বস্তু এবং প্রয়োগপদ্ধতি

১৮৪৬ সালে ৩রা মে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদত্যাগ করার কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি যে চিঠি লেখেন তাতেই তাঁর শিক্ষা সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তিনি কলেজের শিক্ষাব্যবস্থার যে-সমস্ত সংস্কার সাধন করতে চেয়েছিলেন তা হলো, "সংস্কৃত এবং ইংরেজী শিক্ষাবিষয়ে গভীর দক্ষতা অর্জনের জন্য ব্যবস্থা করা এই জাতীয় শিক্ষার ফলে যাঁরা শিক্ষিত হয়ে উঠবেন তাঁরা আমাদের মাতৃভাষার সঙ্গে পাশ্চাত্য জগতের জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং সভ্যতাকে মিলিয়ে দেবার পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হবেন" (বিনয় ঘোষ ৩য় খণ্ড পৃষ্ঠা ৩৯)

প্রকৃতপক্ষে এখানেই বিদ্যাসাগরের শিক্ষাসম্পর্কিত ভাবধারার মূল আদর্শটি বিবৃত হয়েছে। তখন বিদ্যাসাগরের বয়স মাত্র ২৫ অথচ তখনই তিনি সংস্কৃত এবং ইংরেজী শিক্ষাকে মেলাতে চাইছেন, মাতৃভাষাকে শিক্ষার উপযুক্ত বাহন করতে চাইছেন এবং শিক্ষণীয় বিষয় হিসেবে পাশ্চাত্য জগতের জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং সভ্যতার ওপর জোর দিতে চাইছেন। অর্থাৎ আমরা যাকে 'আধুনিক জ্ঞান' বলি বিদ্যাসাগর এখানে তার কথাই বলেছেন। বিদ্যাসাগর অনুভব করেছিলেন যে ভারতীয় সমাজের আধুনিকীকরণের জন্য আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান অনেক বেশি প্রয়োজনীয়। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ১২ই এপ্রিল তারিখের 'সংস্কৃত কলেজ সম্পর্কিত বক্তব্যে'র মধ্যে দেখা যাবে যে বিদ্যাসাগর 'যোগ্য' ব্যক্তিদের 'ইউরোপীয় উৎস-স্থল' থেকে শিক্ষাসম্পর্কিত মাল-মশলা আহরণের জন্য বলছেন এবং সেগুলি যে 'সুচারু, প্রকাশযোগ্য এবং প্রবচনমূলক বাঙলা ভাষায়' প্রকাশযোগ্য করে তুলতে হবে তাও বলেছেন। এটাই ছিল বিদ্যাসাগরের শিক্ষাসম্পর্কিত পরিকল্পনার মূল আদর্শ। সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন ছাত্র এই সংস্কৃত পণ্ডিতের ইংরেজী শিক্ষার বৈপ্লবিক ভূমিকা সম্পর্কে 'ইয়ংবেঙ্গল' এবং হিন্দু কলেজের বিদ্রোহী ছাত্রদের অপেক্ষাও অনেক বেশি স্পষ্ট ধারণা ছিল। ঈশ্বরচন্দ্রই প্রথম ভারতের জাতীয় শিক্ষার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে ঘোষণা করেছিলেন—মাতৃভাষাই একমাত্র বাহন হবে।

(ঘ) পরিকল্পনা ও কর্মসূচী

যেহেতু আমাদের আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলি তখনও পর্যন্ত পাশ্চাত্য ভাষা থেকে আধুনিক জ্ঞান আহরণের যোগ্য হয়ে উঠতে পারেনি সেই কারণে

বিদ্যাসাগর ভাষাকে তৈরি করবার জন্য এক বিস্তৃত পরিকল্পনা রচনা করলেন। সংস্কৃত ভাষা ভাল করে শিখলে বাঙালি মাত্রেই বাঙলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করার সুযোগ পাবে এবং মাতৃভাষার মর্যাদাও তারা উপলব্ধি করতে পারবে। দ্বিতীয়ত একই সঙ্গে এই সমস্ত শিক্ষার্থীরা ইংরেজী ভাষাও শিখবে যাতে তারা আধুনিক জ্ঞানভাণ্ডারের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে, এবং এই ভাবেই ভাষা শিক্ষা হলেই মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে সমৃদ্ধ করা সম্ভব। 'সংস্কৃত কলেজ সম্পর্কিত' ঐ বক্তব্যে বিদ্যাসাগর আরও বলেছেন 'যাঁরা সংস্কৃতে দক্ষ নন তাঁদের পক্ষে সুচারু, প্রকাশযোগ্য এবং প্রবচনমূলক বাঙলারীতি' আয়ত্ত করা সম্ভব নয়।

এটা পরিষ্কারভাবেই বোঝা যায় যে মাতৃভাষা যেই মুহূর্তে আমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির স্বাভাবিক বাহন হয়ে উঠবে, সংস্কৃতের প্রয়োজনীয়তা ততই ফুরিয়ে যাবে। কিন্তু ইংরেজী যেহেতু অধিকতর উন্নত ভাষা এবং বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারকে জানার জন্য যেহেতু এই ভাষার একান্ত প্রয়োজন, সেই কারণেই এই জাতীয় ত্রিভাষামূলক শিক্ষা পরিকল্পনায় ইংরেজীর স্থান নির্দিষ্ট হবে মাতৃভাষার পরে। আজকের দিনে এ-কথা বেশ জোর দিয়েই বলা যায় যে আধুনিককালের উপযোগী ভারতবর্ষে জাতীয় শিক্ষা সম্পর্কে বিদ্যাসাগরেরই সর্বপ্রথম একটি পরিষ্কার ধারণা ছিল। ভারতবর্ষের শিক্ষাজগতের ভাষা সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি চেষ্টা করে ছিলেন এবং যদি তাঁর পরিকল্পনা কার্যকরী করবার সুযোগ তিনি পেতেন তাহলে হয়তো এই ত্রিভাষা সূত্র কিছুটা সংশোধনসহ আজকের দিনেও গ্রহণযোগ্য হতো।

১৮৪০ সালের পূর্ব পর্যন্ত কলকাতায় এবং তার সন্নিহিত অঞ্চলসমূহের মধ্যে সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত ছিল। ইংরেজী ছিল এই শিক্ষার মাধ্যম এবং সংস্কৃত পড়ানো হতো টোলে। কিন্তু মাতৃভাষা কিংবা আধুনিক ভারতীয় কোনো ভাষার সেই শিক্ষাব্যবস্থায় কোনো ভূমিকাই ছিল না। আসলে সমস্ত পরিকল্পনাটাই ছিল শাসকগোষ্ঠীর। তাঁরা বিদ্যালয়গুলিকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কিছুটা সহুরে কেরানী উৎপাদন করবার জন্যে। যদি জনসাধারণকে সামগ্রিক ভাবে শিক্ষিত করতে হয় তাহলে তা তাদের মাতৃভাষার মাধ্যমেই করতে হবে বিদেশী ভাষার মাধ্যমে তা করা যাবে না। তাছাড়া সাধারণ মানুষের স্কুলে অবাধ প্রবেশাধিকারের ব্যবস্থা করতে হবে। এইজন্যই বিদ্যাসাগরের শিক্ষা পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হলো গ্রামেগ্রামে বালক এবং বালিকাদের মধ্যে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাবিস্তারের প্রচেষ্টা। হ্যালিডের পরিকল্পনা, 'যা প্রকৃতপক্ষে

বিদ্যাসাগরের সঙ্গে পরামর্শানুসারেই তৈরি হয়েছিল', 'বিদ্যাসাগরের সামনে ১৮৫৪ সাল থেকে ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত একটি সংক্ষিপ্ত সুযোগ এনে দিল এবং বিদ্যাসাগর বাঙলা স্কুল স্থাপন করে তাঁর জনশিক্ষার পরিকল্পনা সফল করতে চাইলেন। এরপরের ঘটনা সকলেরই জানা। আমাদের বৃটিশ শাসক এবং ভারতীয় ভদ্রলোক শ্রেণী মাতৃভাষার মাধ্যমে জনশিক্ষা প্রসারের ব্যাপারে মোটেই আগ্রহী ছিলেন না। বিদ্যাসাগর ক্রমশই শাসন-কর্তৃপক্ষ সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়তে লাগলেন। তাঁর পদত্যাগপত্রে তিনি এই কারণটির কথা উল্লেখও করেছেন।

সুতরাং একটি মহৎ পরিকল্পনা কাজে পরিণত হবার পূর্বেই ব্যর্থ হয়ে গেল। জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনার প্রথম প্রচেষ্টা গুণগত ও পরিমাণগত উভয়ভাবেই বিনষ্ট হলো। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার পেতে বাঙলাভাষার আরো অনেকদিন সময় লেগেছিল এবং বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো মনস্বী ব্যক্তিরা বৃথাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বাঙলাকে স্বীকৃতি দেবার জন্য দাবি জানিয়ে আসছিলেন।

সাহিত্যিক অবদান

১৮৫৮ সালে চাকরী ছাড়ার সময় বিদ্যাসাগর পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে অতঃপর তিনি বাঙলাসাহিত্যের সেবায় আত্মনিয়োগ করবেন এবং দেশবাসীর মধ্যে শিক্ষাবিস্তার ও তাদের জ্ঞানার্জনে সহায়তার জন্য আরও বাঙলা বই লিখবেন। বিদ্যাসাগর কেবলমাত্র 'উদ্দেশ্যমূলক সাহিত্য'ই রচনা করেননি 'জ্ঞানের সাহিত্য'ও রচনা করেছেন। তিনি শিক্ষাবিস্তারের জন্য এবং সমাজ সংস্কারের জন্যই প্রধানত লিখেছেন। কিন্তু তিনি জানতেন যে এরজন্য তার লেখার স্টাইল হতে হবে 'সাবলীল প্রকাশযোগ্য এবং বাগ্‌বৈশিষ্ট্যসম্মত'। এই গুণগুলি থাকার জন্যই তিনি যাই লিখেছেন তাই সাহিত্যিক স্তরে উন্নীত হয়েছে।

১. উদ্দেশ্যমূলক সাহিত্য

বিদ্যাসাগর বিশেষ উদ্দেশ্য ছাড়া প্রায় কিছুই লেখেননি। অবশ্য তাঁর 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' এবং 'আত্মচরিত' এর ব্যতিক্রম। এ-দুটি নিছকই সাহিত্যিক রচনা। তাঁর শিক্ষাসম্পর্কিত গ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে সংস্কৃত উপক্রমণিকা, ঋজুপাঠ, বেতাল পঞ্চবিংশতি (১৮৪৭) স্বচ্ছন্দ অনুবাদ, আর বাঙলার ইতিহাস (১৮৪৮),

জীবন চরিত (১৮৪৯), বোধোদয় (১৮৫১), কথামালা (১৮৫৬), চরিতাবলি (১৮৫৬) মূল ইংরেজী রচনা অবলম্বনে রচিত। কিন্তু শকুন্তলা (১৮৫৪), সীতার বনবাস (১৮৬০) অথবা ভ্রান্তিবিলাস (১৮৬৯) অনুবাদ হিসেবে প্রচারিত হলেও এগুলিকে অনায়াসে মৌলিক সাহিত্যসৃষ্টি বলা চলে। বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহ সম্পর্কিত পুস্তিকাগুলি যুক্তিধর্মী বাঙলা গদ্যরচনার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আবার অতি অল্প হইল (১৮৭৩), ব্রজবিলাস (১৮৮৪), রত্নপরীক্ষা (১৮৮৬) বিদ্রূপাত্মক, কৌতুকধর্মী রচনার উল্লেখযোগ্য প্রমাণ। বিদ্যাসাগরের সাধু গদ্যরীতির সঙ্গে এর রচনাভঙ্গির পার্থক্য প্রচুর। প্রত্যেকটি বই ধরে বাঙলাসাহিত্যে বিদ্যাসাগরের অবদান বিচার করা এখানে সম্ভবপর নয়। তবে এই অবদানের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যেতে পারে।

অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো শিক্ষামূলক গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রেও তিনি একটি বিশেষ যুক্তিসম্মত পদ্ধতি অবলম্বন করে চলতেন। উপক্রমণিকা রচনা করে তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণের মূল সূত্রগুলি সর্বপ্রথম সাধারণ বাঙালির কাছে সহজবোধ্য করে তুললেন। তারপর ধাপে ধাপে লিখিত হলো তিনখণ্ডে বিভক্ত ঋজুপাঠ। প্রথম খণ্ডটি রচিত হয়েছিল পঞ্চতন্ত্র অবলম্বনে, দ্বিতীয়টি রচিত হয়েছিল রামায়ণ ও মহাভারত অবলম্বনে এবং তৃতীয়টির উৎস হলো মহাভারত, হিতোপদেশ ও ভট্টিকাব্য। ব্যাকরণ-কৌমুদী তাঁর রচিত দ্বিতীয় সংস্কৃত-ব্যাকরণ গ্রন্থ, এবং এতে সিদ্ধান্ত-কৌমুদীর সূত্রসমূহের সরলীকরণ করা হয়েছিল এর ফলে ছাত্রদের পক্ষে সংস্কৃত কাব্য ও নাটক অধ্যয়ন করা সহজতর হয়ে উঠেছিল। অভিজ্ঞান শকুন্তলম্, মেঘদূতম্, উত্তররামচরিতম্ ইত্যাদি গ্রন্থের সম্পাদনা করে তিনি সটীক সংস্করণ বের করেছিলেন, এবং এগুলির সম্পাদনা তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টির স্বাক্ষর বহন করে। প্রধানত, তাঁর চেষ্টাতেই সংস্কৃতের সঙ্গে সাধারণ বাঙালির একটি অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল।

বিদ্যাসাগরের প্রথম লক্ষ্য ছিল 'এক সমৃদ্ধ বাঙলাসাহিত্য সৃষ্টি'। উচ্চমানের পাঠ্যপুস্তক, ছাত্রসহায়ক পুস্তক এবং সাধারণ জ্ঞানের পুস্তক রচনা করে তিনি এই লক্ষ্য পূরণের চেষ্টা করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের সর্বাপেক্ষা বড় কৃতিত্ব হলো বিজ্ঞান ও পাশ্চাত্য জগতের সভ্যতা এবং আধুনিক যুগের প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং নৈতিক মূল্য সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করা। তিনি রূপকথা, উপকথা অথবা ধর্মীয় শিক্ষার উপর মোটেই জোর দেননি।

১৮০১ সালে রামরাম বসুর 'প্রতাপাদিত্যচরিত' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই

প্রকৃতপক্ষে বাঙলাগদ্যের সূচনা। ১৮০১ সাল থেকে ১৮৫১ সালে বিদ্যাসাগরের 'বোধোদয়' প্রকাশের মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে মাত্র কিছু কিছু ঘটনা উল্লেখযোগ্য। উইলিয়ম কেরীর 'কথোপকথন' যদি তাঁর নিজের লেখা হয় তাহলে তিনিই প্রকৃতপক্ষে কথ্য বাঙলা গদ্যের প্রথম স্রষ্টা। রামমোহন রায় যুক্তি ও বুদ্ধির ওপর যতটা জোর দিয়েছিলেন স্টাইলের দিকে ততটা দেননি। তার 'রসবোধ' বোধহয় তেমন ছিল না। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার কিছুটা চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু সম্পূর্ণ সফল হননি। অক্ষয়কুমার দত্ত ছিলেন বিদ্যাসাগরের বন্ধু এবং সমসাময়িক। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির মিলও ছিল। তবে অক্ষয়কুমার ছিলেন তীক্ষ্ণদৃষ্টি-বস্তুবাদী। তিনি অত্যন্ত চিন্তাশীল লেখক ছিলেন তবে প্রকাশভঙ্গির বৈশিষ্ট্য বা শিল্পকলা নিয়ে তিনি খুব বেশি মাথা ঘামাননি। তাঁর গদ্যরচনার কোনো স্টাইল ছিল না অবশ্য বিদ্যাসাগরের আর একজন সমসাময়িক টেকচাঁদ ঠাকুর ওরফে প্যারীচাঁদ মিত্রের কথ্যভাষার উপর বেশ দখল ছিল। তাঁর 'আলালের ঘরের দুলাল' দক্ষতার পরিচয় বহন করে। কিন্তু, শিক্ষা সম্পর্কিত গদ্যরচনায় বিদ্যাসাগর আলালীভাষার প্রয়োগ করতে পারতেন না। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে স্বচ্ছ, সরল ও ব্যঞ্জনাধর্মী ভাষায় গভীর জ্ঞানের কথা প্রচার করা। স্বভাবতই তাঁর সাহিত্যরীতি এই পথ ধরেই চলেছিল।

বালক ও তরুণদের জন্য পাঠ্যপুস্তক রচনার ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। বর্ণপরিচয় প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ ১৮৫৫ সালে প্রকাশিত হলো। বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠা ও যুক্তির সঙ্গে ধাপে ধাপে বর্ণমালা শিক্ষার এ-হচ্ছে প্রথম বাঙলা গ্রন্থ। সরল অক্ষর থেকে প্রথাগতভাবে যুক্তাক্ষর শেখা, স্বরবর্ণ থেকে ধীরে ধীরে ব্যঞ্জনবর্ণ শেখার অপূর্ব ব্যবস্থা এই গ্রন্থ দুটিতে আছে। এই বইয়ের প্রথমে রয়েছে সেই অপরূপ ছন্দোময় 'জল পড়ে পাতা নড়ে' যার ধ্বনিমাধুর্যে একদা বালক রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়েছিলেন। তারপর সহজ সংক্ষিপ্ত ছড়ায় রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী এবং সবশেষে অতি বিখ্যাত 'গোপাল অতি সুবোধ বালক' আর 'রাখাল অতি খারাপ বালক' শীর্ষক দুটি নীতিমূলক গল্প। বর্ণপরিচয়কে আজ পর্যন্ত কেউ ছাড়াতে পারেনি এবং পরবর্তীকালে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যে-সমস্ত বই লেখা হয়েছে তাদের প্রায় প্রত্যেকটিরই আদর্শ ছিল এই গ্রন্থ। দ্বিতীয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য তিনি রচনা করেছিলেন কথামালা (১৮৫৬)। ঈশপের উপকথার অবলম্বনে গ্রন্থটি রচিত। তৃতীয় পর্যায়ের

জন্য রচিত হয়েছিল চরিতাবলী (১৮৫৬)। কিছু মহৎ ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত জীবন কাহিনী এই গ্রন্থে আছে। এই পাঠ্যসূচীর পরিণতি ঘটানো হতো ১৮৫১ সালে প্রকাশিত বিখ্যাত বোধোদয় গ্রন্থের সাহায্যে। এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু ইংরেজী ভাষা থেকে সংগ্রহ করা হলেও এর ভাষা, রীতি, প্রকাশভঙ্গি সবই বিদ্যাসাগরের নিজস্ব। বইটিতে অনেক প্রয়োজনীয় জ্ঞানের কথা আছে। এই বইটির দ্বারা লেখক তরুণ পাঠকদের বলতে চেয়েছেন যে 'পৃথিবীকে জান, বস্তুজগৎকে জান'। বিশ্বস্রষ্টা সম্পর্কিত অধ্যায়টি প্রথম সংস্করণে নাকি ছিল না। তবে দ্বিতীয় সংস্করণে কারো কারো অনুরোধে তিনি এই অধ্যায়টি যোগ করেন। অবশ্য এই অধ্যায়টিতে একটি আকর্ষণীয় ব্যাপার আছে। এখানে শিক্ষার্থীদের বলা হয়েছে যে স্রষ্টা কেবলমাত্র 'আকৃতিহীন'ই নন তিনি 'নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ', অর্থাৎ "আকৃতিহীন চেতনা"। বস্তুত অনেকেই মনে করেন ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিগত অনুভূতিরই এটি একটি বিশেষ প্রতিফলন। পরবর্তী কালে বিদ্যাসাগর তিনখণ্ডে বিভক্ত 'আখ্যানমঞ্জরী (১৮৬৫-৬৮) রচনা করেন। এতে প্রায় ৭৮টি ছোট-বড় কাহিনী আছে এবং বিদ্যাসাগরের সাধুভাষার উৎকর্ষতার এ-হচ্ছে জ্বলন্ত নিদর্শন।

২. বাঙলা গদ্যের অন্তর্নিহিত প্রতিভার আবিষ্কার

বিদ্যাসাগরের লেখাতেই সর্বপ্রথম বাঙলা গদ্যের অন্তর্নিহিত প্রতিভার সন্ধান পাওয়া গেল। বেতাল পঞ্চবিংশতি (১৮৪৭) প্রথম সংস্করণে দেখা গেল যে গদ্যের উপর তাঁর দখল তখনও সম্পূর্ণ হয়নি। কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণে (১৮৫০) দেখা গেল যে তিনি সংস্কৃত যুগ্মশব্দের অনাবশ্যক বোঝা ত্যাগ করতে পেরেছেন। 'জীবন চরিত' (১৮৪৯) অথবা 'বোধোদয়' (১৮৫১) থেকে তিনি যা-কিছুই রচনা করেছেন সেগুলির গদ্য স্বচ্ছ, সহজবোধ্য এবং প্রকাশের বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। শকুন্তলা (১৮৫৪) এবং সীতার বনবাসে (১৮৬০) তিনি একটি পৃথক ও উচ্চমানদণ্ডের গদ্য সৃষ্টি করলেন। এই গ্রন্থ দুটির বিষয়বস্তু নীরস ও তথ্যমূলক ছিল না, এগুলি ছিল সাহিত্যধর্মী রচনা, এদের ভাব ও ভাষা অপরূপ সমন্বয়ে গঠিত। তাঁর তর্ক-বিতর্কমূলক প্রচার পুস্তিকাগুলিতে তিনি তৃতীয় আর এক জাতীয় গদ্য রীতির প্রবর্তন করলেন। তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত তাঁর জীবনচরিত বাঙলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম এই জাতীয় রচনার নিদর্শন। রচনার প্রসাদগুণে ও মাধুর্যে এই গ্রন্থ ত্রিশ বৎসর পরে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতির কথা স্মরণ

করিয়ে দেয়। রামমোহন এবং তাঁর অনুবর্তীরা বাঙলাগদ্যের যে মানদণ্ড সৃষ্টি করেছিলেন তার মধ্যেই দীর্ঘকাল বাঙলাগদ্য আবদ্ধ ছিল। বিদ্যাসাগরের হাতেই প্রকৃতপক্ষে সৃজনধর্মী বাঙলাগদ্যের জন্ম, এবং এই সমস্ত গ্রন্থই তাঁর কৃতিত্বের প্রমাণ বহন করছে। ঝাঁঝালো, ব্যঙ্গপূর্ণ রচনাতে তিনি যে কি-জাতীয় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তাঁর বেনামী রচনাগুলি তার নিদর্শন। নির্মলশুভ্র হাস্যরসের সঙ্গে ব্যক্তিত্ব ও ব্যঙ্গের মিশ্রণে এই জাতীয় পুস্তিকাগুলি জীবন্ত ও উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল। আবার, 'প্রভাবতী সম্ভাষণের' মধ্যে মৃত্যু ও নৈরাশ্যের আক্রমণে বিচলিত আবেগপ্রবণ এক অন্য বিদ্যাসাগরের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রভাবতী নামক এক তিন বৎসরের বালিকা এই তেজস্বী পণ্ডিতের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তার অকাল মৃত্যুতে বিদ্যাসাগর যে গ্রন্থ লেখেন সম্ভবত, তাই বাঙলাসাহিত্যের সর্বপ্রথম 'ব্যক্তিগত বা আত্মধর্মী রচনা'।

গদ্য শিল্পী

বিদ্যাসাগরের আগে এবং তাঁর পরে বাঙলাগদ্যের অবস্থা বোঝানোর জন্য দুই যুগের গদ্যরচনা থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিতে পারলেই ভালো হতো। কিন্তু স্থানাভাবের জন্য তা সম্ভব নয়। বাঙলাগদ্যের অন্তর্নিহিত শক্তিটি তিনিই আবিষ্কার করেন এবং তিনিই একে সাহিত্যিক গুণসম্পন্ন করে তোলেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে বিদ্যাসাগর 'বাঙলাগদ্যের প্রথম যথার্থ শিল্পী'। বাঙলাগদ্যের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, 'বিদ্যাসাগরের পূর্বে বা পরে আর কেউ এমন স্বচ্ছ এবং মাধুর্যগুণ সম্পন্ন বাঙলা লিখতে পারেননি।' অবশ্য বঙ্কিম বিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে এখানে নিজের কৃতিত্বের কথা স্বীকার করতে চাননি। কিন্তু একথা মানতেই হবে যে বঙ্কিমের মতো যাঁরা পরবর্তীকালে আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁরা বিদ্যাসাগরের মূল্যবান উত্তরাধিকার থেকেই যাত্রা শুরু করেছিলেন।

বাঙলাভাষার সম্ভাব্য লেখকদের সংস্কৃত ও ইংরেজীতে গভীর জ্ঞান থাকা বিদ্যাসাগর বাধ্যতামূলক বলে মনে করতেন। এই ভাষা দুটির সাহিত্য-সম্পদের জন্য তো বটেই প্রকাশভঙ্গি ও রীতিবৈচিত্র্য শেখার জন্যও একজন মনোযোগী ছাত্রের এই দুটি ভাষা জানা দরকার। নব্য ভারতীয়-আর্য ভাষা গোষ্ঠীর ভাষা হিসেবে বাঙলাকে সংস্কৃতের ওপর সবচেয়ে বেশি নির্ভর করতে হতো। এমনকি প্রথম যুগের উইলিয়ম কেরী ও অন্যান্যেরাও এই সত্য উপলব্ধি করতে

পেরেছিলেন। তারপর থেকে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির প্রচেষ্টায় বাঙলা গদ্য বহুদূর এগিয়ে গিয়েছে, আর এঁরা প্রত্যেকেই ভালো সংস্কৃত জানতেন। ইংরেজী ভাষার চর্চা করেই বোধহয় বিদ্যাসাগর জানতে পারেন যে গদ্যের যথার্থ আদর্শ কি হতে পারে। গদ্য একদিকে যেমন আধুনিক যুগোপযোগি 'জ্ঞানের সাহিত্যের' বাহন হয়ে উঠবে অপরদিকে তেমনি আবার একে 'হৃদয়ের সাহিত্যে'র বাহনও হয়ে উঠতে হবে। প্রথমশ্রেণীর রচনায় বস্তুনিষ্ঠা, স্বচ্ছতা, যুক্তিনিষ্ঠা ও ভারসাম্যবোধ থাকা দরকার আর দ্বিতীয়শ্রেণীর রচনায় এগুলির তো দরকারই আর এ-ছাড়া দরকার হৃদয়ধর্মিতা, কল্পনাপ্রবণতা ও ব্যঞ্জনাসৃষ্টির ক্ষমতা। বিদ্যাসাগরের রচনায় এই দুটিই ছিল। বিদ্যাসাগরের গদ্য হৃদয় ও বুদ্ধির অপরূপ সমন্বয়। তিনিই প্রথম বাঙালি লেখক যিনি সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষার সাহিত্যসম্পদের সমন্বয়সাধন করে সম্ভাবনাপূর্ণ বাঙলাগদ্যরীতির সৃষ্টি করতে সক্ষম হলেন।

বাঙলাসাহিত্য বিদ্যাসাগরের কাছে দুটি প্রত্যক্ষ অবদানের জন্য ঋণী থাকবে। এ-দুটি অবদানই এখন বাঙলাগদ্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তিনিই প্রথম কমা, দাঁড়ি জাতীয় ছেদচিহ্নের ব্যবহার করেন, দ্বিতীয়ত বাঙলাগদ্যের অন্তর্নিহিত ছন্দের ও ধ্বনিমাধুর্যের তিনিই আবিষ্কর্তা। তাঁর বুদ্ধি ও বিচারবোধের দ্বারা, হৃদয়ের উপলব্ধির সাহায্যে তৎসম শব্দ ব্যবহার করে তিনি এই ধ্বনিমাধুর্য সৃষ্টি করেছিলেন। 'শকুন্তলা' ও 'সীতার বনবাসে'র গদ্যে এর বহু নিদর্শন পাওয়া যাবে।

বিদ্যাসাগরের গদ্যের বৈশিষ্ট্য ও বাঙলাসাহিত্যে তাঁর অবদান সম্পর্কে দুটি ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে। বলা চলে দুটি ধারণাই অর্ধসত্য। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে যে বিদ্যাসাগরের কোনো রচনাই মৌলিক নয় এমন ধারণা অনেকেরই আছে। কিন্তু তাঁর পুস্তিকাসমূহ, আত্মচরিত, প্রভাবতীসম্ভাষণ সম্পূর্ণ মৌলিক রচনা। তাছাড়া তাঁর তথাকথিত অনুবাদগুলি আসলে মৌলিক সৃষ্টিরই সমতুল্য। 'শকুন্তলা' এবং 'সীতার বনবাস' সম্পর্কে এ-কথা জোর করে বলা যায়। দ্বিতীয় ভ্রান্ত ধারণাটি হলো 'বিদ্যাসাগরী ভাষা সম্পর্কে। অনেকেই মনে করেন যে এটি হলো দুর্বোধ্য সংস্কৃত শব্দে ভরপুর একশ্রেণীর সাধুভাষা। এ-কথা ঠিক আধুনিক বাঙলা গদ্যের সঙ্গে তুলনা করলে বিদ্যাসাগরের গদ্যকে অনেকটা সংস্কৃত ঘেঁষাই মনে হবে। বঙ্কিমের রীতিও প্রথমে এরকমই ছিল, পরে তিনি 'বিশুদ্ধ বাঙলা' লেখার চেষ্টা করেছেন। বিদ্যাসাগরও তাঁর কোনো কোনো পুস্তিকায় এবং বিতর্কমূলক রচনায় বিশুদ্ধ বাঙলাই লিখেছেন।

বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতি সর্বদাই বিষয়বস্তু অনুযায়ী পরিবর্তিত হতো। তিনি নানা বিষয়ের ওপর কাজ করেছেন তাদের উপর প্রবন্ধ লিখেছেন কিন্তু সর্বদাই স্বচ্ছ এবং সাবলীল গদ্য রচনার চেষ্টা তিনি করে গেছেন, কোথাওই তা দুর্বোধ্য হয়নি। বিদ্যাসাগরের বাক্যের গাম্ভীর্য ও ধ্বনিমাধুর্য প্রকৃতপক্ষে আমাদের মনে ক্লাসিকাল পরিবেশের সৃষ্টি করে। ক্লাসিকাল রীতির গদ্যের এই হচ্ছে চূড়ান্ত নিদর্শন। আর অন্যান্যক্ষেত্রের মতো এ-ক্ষেত্রেও এই রচনারীতির মধ্য দিয়েই পিছনের মানুষটিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। বিদ্যাসাগরের রচনারীতির মধ্য দিয়ে একজন বিজ্ঞাননিষ্ঠ শিক্ষাব্রতী, একজন চিন্তাশীল সমাজসংস্কারক, একজন দয়ার্দ্রচিত্ত কোমল হৃদয়বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং একজন রুচিশীল সাহিত্যপ্রেমিক ও মানবপ্রেমিককে খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁর কর্মব্যস্ত জীবনের সমস্ত কোলাহল ও বাধাবিপত্তির মধ্যেও এই গুণগুলি চিরকাল অম্লান ছিল।

বর্তমান যুগে বিদ্যাসাগরের উপযোগিতা

প্রায় একশ বৎসর পিছনের দিকে তাকিয়ে বিদ্যাসাগরের কর্মময় জীবন ও তাঁর কার্যাবলীকে তিনটি বিভিন্ন দিক থেকে বিচার করে (অর্থাৎ তাঁর সমাজ-সংস্কার, শিক্ষা এবং সাহিত্যজগতে তাঁর অবদান) আমরা আজ নিজেদেরই প্রশ্ন করতে পারি যে বর্তমান যুগের পক্ষে বিদ্যাসাগরের কার্যকলাপ ও অবদানসমূহের কোন কোন অংশ প্রয়োজনীয় এবং এই প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টাও আমাদেরই করা উচিত।

ক. লেখক বিদ্যাসাগর, নিজে হয়তো যা কোনোদিন আশা করেননি, বাঙলা সাহিত্যে উচ্চতম পর্যায়ে স্থায়ীভাবে আসীন। অবিসম্বাদিতভাবেই তিনি বাঙলাগদ্যের স্রষ্টা এবং পরবর্তী লেখকদের অন্যতম পথিকৃৎ। খ. শিক্ষাবিদ বিদ্যাসাগর বোধহয় আজকের দিনের পক্ষে অধিকতর প্রয়োজনীয় হতেন। তিনিই আধুনিক ভারতবর্ষের প্রথম এবং প্রধান শিক্ষাবিদ যিনি প্রথম আধুনিক ধরনের জাতীয় শিক্ষার স্বপ্ন দেখেছিলেন। (১) শিক্ষার বিষয়বস্তু সম্পর্কে তিনি পরিষ্কার নির্দেশ দিয়েছিলেন যে 'পশ্চিমীজগতের বিজ্ঞান ও সভ্যতা সম্পর্কিত জ্ঞান' অবশ্যই অর্জন করতে হবে। (২) শিক্ষাক্ষেত্রে ত্রি-ভাষা সূত্রও তাঁরই দেওয়া। আঞ্চলিক বা জাতীয় ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাপ্রচারের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। এ-ছাড়া আধুনিক জগত ও জীবনকে জানার জন্য ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সাহিত্যকে আয়ত্ত করার জন্য ইংরেজীভাষা ও অতীত ঐতিহ্য এবং আঞ্চলিক ভাষাকে সমৃদ্ধ

করার জন্য সংস্কৃতভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনিই প্রথম ঘোষণা করেন। (৩) বিদেশী সরকারের বিরোধিতা সত্ত্বেও জনশিক্ষার প্রসারের প্রয়াসের নেতৃত্ব তিনিই দিয়েছিলেন। (৪) স্কুল ও কলেজের আদর্শ প্রতিষ্ঠাতা, প্রশাসক ও পরিচালকের ভূমিকায়ও তাঁকে দেখা গিয়েছিল। গ. সবশেষে বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কারগুলির সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও আলোচনা করে নিতে হবে। এই সীমাবদ্ধতার আংশিক কারণ সময়ের পরিবর্তন আর দ্বিতীয় কারণ আমাদের বাঙালি রেনেসাঁসের সঙ্কীর্ণ সামাজিক ভিত্তি। এর প্রভাব আসলে ভদ্রলোক হিন্দুদের মধ্যেই সীমিত ছিল। বিধবাদের পুনর্বিবাহ অথবা বহুবিবাহ নিষিদ্ধ-করণের প্রভাব কেবল তথাকথিত ভদ্রসমাজের উপরই পড়েছিল, অথচ তাঁরা ছিলেন একটি ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। অবশ্য বিদ্যাসাগরের এই দুই প্রচেষ্টাই তাঁকে স্ত্রীজাতির মুক্তির জন্য শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ সংগ্রামী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

কোনো নির্দিষ্ট সমাজসংস্কার বা অবদানের জন্য না হলেও জীবন সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির জন্য, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও সততার জন্য, সাহস ও নিষ্ঠার জন্য, সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে তাঁর অবিরাম সংগ্রামের জন্য, তাঁর আদর্শবোধ এবং পুরুষোচিত গুণাবলীর জন্যই বিদ্যাসাগর আজকের দিনেও স্মরণীয় হয়ে আছেন এবং থাকবেন। বিদ্যাসাগরের 'অজেয় পৌরুষ এবং অক্ষয় মনুষ্যত্বের' এ-সমস্তই বড় প্রমাণ। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর দেশবাসী বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছিল, তৎকালীন জাতীয় নেতারা তাঁকে এড়িয়ে গিয়েছিলেন, উপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী তাঁকে অবহেলা করেছিলেন এবং শেষজীবনে একাকী বিষণ্ণ অবস্থায় তিনি দেহত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর জীবনের এই নৈরাশ্য সত্ত্বেও আমরা অনুভব করতে পারি যে তিনি তাঁর কালের অনেক অগ্রবর্তী ছিলেন এবং আধুনিক যুগের চলমান জীবনস্রোতের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে 'প্রবাসী' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ এইদিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন—"বহমান কালগঙ্গার সঙ্গে বিদ্যাসাগরের জীবনধারার মিলন ছিল, এইজন্যই বিদ্যাসাগর ছিলেন আধুনিক।" (প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩২৯)।

রচনাটি গোপাল হালদার রচিত একটি ইংরাজি নিবন্ধের শ্রীবিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য-কৃত অনুবাদ।

রাণীর কাছে পাঞ্জা

বাণীব্রত চক্রবর্তী

আসলে হয়ত এইভাবে প্রথম কথা বলেছিল মনীশ 'কেমন আছো?' যদিও এই 'কেমন আছো' বলাটার বিরুদ্ধে চিরকালই মনীশ মনে মনে একটা সংঘর্ষ করে এসেছে। ভদ্রমহিলাটি একটা সাড়ে-তিন বছরের মেয়েকে ধমক দিতে দিতে মনীশকে চিনতেই পারল না.এমন গোছের চাউনি রাখে। মনীশ কিন্তু ঠিক চিনতে পেরেছিল। অনেক বদল ঘটেছে সত্যি, তবু সব বদল আর সময়ের একটা টানা বিলম্ব পেরিয়েও তারাকে চেনা যায়। সন্ধ্যের দিকে এ-এলাকায় শেয়াল ডাকে কেউ বলে থাকলে এখন তা সত্যি হয়ে ওঠে। দূরে অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা জনতার মতো গাছপালা হুহু করে হাওয়া ছুঁড়ে দেয়। তারা তবু মনীশকে চিনতে পারেনি। সেটা তারার দোষ নয়। কেননা মনীশের চেহারায় একটা বড় রকমের রূপান্তর ঘটেছিল বটে। তাই মনীশকে নিজের পরিচয় দিতে হলো সাবেকি রীতিতে—'আমি মনীশ।' তারাকে হঠাৎ ঠাণ্ডা হয়ে পড়তে দেখল মনীশ। তারা বাচ্চা মেয়েটির হাত ধরে সামনের বেঞ্চিটায় বসে পড়ল। মনীশও বসল তারার পাশে। এবং সে ভেবে নিতে পারল অনেক দিন পরে তারার পাশে বসলুম।

সাড়েতিন বছরের মেয়েটি একরাশ পাখি ও ফুল আঁকা ফ্রকে, অন্ধকারে, নতুন লোক দেখে লজ্জা পাবেই, হয়ত ভয়টয়ও পেয়ে থাকবে। অথচ আজকাল মনীশের চেহারায় এমন একটা ছাপ পড়েছে যা দেখে করুণা জাগাই উচিত। কিন্তু অতটুকু মেয়ে কি তা বোঝে? তবে কি তারার মনে করুণা জাগল?

তারা বলল, 'পতু, ওনাকে প্রণাম করো। তোমার কাকু।' পতু লজ্জায় আরো জড়োসড়ো, আরো চুপচাপ, আর সেই ফাঁকে পতুর গাল টিপে দিল তার কাকু। মনীশ বলল, 'অনেকদিন পরে কেমন দেখা হয়ে গেল তাই না?' তারা হাসল। তারার নীরক্ত মুখে সেই হাসি কোনো সুন্দর কিছু প্রমাণ করল না। পতুটা বসে বসেই ঘুমিয়ে পড়ল। আর দশটা বছর পরে জীবনে যে এমন বৃহৎ তিনপর্বের ঘটনা ঘটতে পারে সেটার প্রমাণ মিলল তারাকে দেখেই। স্পষ্ট না

হোক কিছু কিছু পূর্বকালের ঘটনা মনীশ মনে রেখেছিল। বহুদিন পর আবার তারাকে দেখতে হলো। কত কিছু পাল্টে গেল। মনীশের বিয়েটাও হয়ে উঠল এই সেদিনই। তারা যেখানে হাতের শাঁখা ভেঙে সিঁদুর মুছে সাড়ে-তিন বছরের মেয়েটাকে নিয়ে অন্ধকারে ফুঁপিয়ে ওঠা হাওয়ায় গাছপালা মাঠ আকাশ ও সৌরলোকে বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা নক্ষত্রের পুঞ্জ দ্যাখে এক অপার বৈধব্য নিয়ে, সেখানে মনীশের বউ প্রথম বাচ্চা পেটে নিয়ে বাপের বাড়িতে।

তারা কোনোকালেই বেশি কথা বলতো না। মনীশ যদি প্রশ্ন করে সে-জবাব সে দেবেই। এরজন্যে এককালে মনীশ কত অভিমান করেছে। পরে বুঝেছিল ওটাই তারার স্বভাব। তেমনি আজকেও। পতুটা ঘুমিয়ে পড়তেই মেয়েকে কোলে টেনে নিল তারা। সময়ের হিসেব রেখে অন্ধকার আসে। একটা সিগারেট ধরাল মনীশ, আর বলল, 'তারা, তোমাকে দেখে আমার অনেক কিছু জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছে।' তারা সেই নীরক্ত হাসি ছড়াল। অন্ধকার, ঘুমন্ত পতুর কষ বেয়ে নাল, মনীশের আঙুলে আঙটি ছিল না শুধু দড়ির মতো শিরারা মধ্যমা অনামিকার দিকে ছুটছে। তারা চুপ করে থাকতে পারল না। তাই বলল, 'বাড়িয়ে যদি বলতে হয় আমি এখন ইতিহাসের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি।'

মনীশ বলল, 'তারা, জীবনে কখনো বা আধখানা দেড়খানা নাটকের অপেক্ষা থাকে। নইলে সারাদিন এ-গাঁ ও-গাঁয়ে পার্টির মিটিং করেছি, আর এক ডাকা-বুকো অন্ধকার মাঠে এই ভিটেতে তোমাকে যে দেখতে পাব তা ভাবিনি।' তারা হাসল। পতু ঘুমোয়।

এবার যেন চারদিকটা ভালোভাবে দেখে নিতে ইচ্ছে হয়। মনীশকে যে-ঘরে থাকতে হবে সেখানে অভাবটাই বড়। একটা লণ্ঠন জ্বলছে। আর দেড়খানা মোমবাতি। দেওয়ালে সাজানো ইঁটের দল অহরহ হাসছে, মেঝেতে সতরঞ্চি, জলের গেলাশ, একগাদা পলিটিক্যাল কাগজ-পত্তর, পোস্টার, রঙ, চায়ের ভাঁড়, কুঁজো, ময়লা বালিশ ও সবুজ চাদর। গরমকাল, তবু ঘরের জানলা দিয়ে অন্ধকার মাঠ থেকে বাতাস আসে। ঘরের মুখেই একফালি বারান্দা। সেখানে বেঞ্চিতে ঘুমন্ত মেয়েকে নিয়ে তারা। পূর্বকালের কিছু ব্যাপার-ট্যাপার মনীশ মনে রেখেছিল। সেই সহায়তায় তারাকে নতুন করে পাওয়ার কোনো পথ মেলে না। দশবছর আগে বড় কাছাকাছি হয়েও তারাকে বরাবর রহস্যময়ী মনে হয়েছে। দুঃখ বা আনন্দ কোনোটাতেই একেবারে বিমূঢ় হয়ে উঠতে তারা শেখেনি। আজ তারাকে দেখে মনীশের পুরোনো ধারণা বদলাল না।

কৌতূহলের প্রবণতা চিরকালই তারার ক্ষেত্রে প্রচ্ছন্ন। তারা চুপ করে বসেছিল। এইভাবে কতকাল সে চুপ করে থাকতে পারে। কিন্তু তারা যেন পালাবার পথ খুঁজছিল। পতুকে টেনে হিঁচড়ে কোলে তুলে বলল, 'তুমি তো আছ, পরে কথা হবে।' মনীশ তখন দেখছিল অন্ধকার মাঠে জনতার মতো গাছগাছালি হাওয়া ছুঁড়ে দিয়ে হুই হুই করে উঠছে।

মেয়েকে নিয়ে তারা ফিরে গেল। 'আমি এখন ইতিহাসের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি' তারার কথাটা এবার যখন মনীশের মনের মধ্যে ফিরল তখন তা হাসি ছড়াল। মনীশ ভাবতে পারেনি তারা এমন আবেগের কথা বলবে। অথচ বলল। হয়ত সত্যি কথাটাই বলেছে তারা। আর সত্যিটা যদি মনের গভীর কোনো অঞ্চল থেকে উৎপন্ন হয় তবে তা কিছুটা আবেগের হবেই। এমন সিদ্ধান্তটা জোগাড় হতেই মনের হাসি অর্থহীন হলো। মনীশ সতরঞ্চির ওপর সবুজ চাদরটা বিছিয়ে দিল। মোম ফুরোতেই বাতি নিবল। লণ্ঠনটা জলছিল। মনীশের প্রসারিত ছায়াটা গাঁথা থাকে দেওয়ালেই। তবে অস্থির, বুক-হাত পাগুলো বেখাপ্পা অনুপাতের। তাই মনীশ ভাবল, আমি কি মানুষ নই? যখন বুঝল ছায়ামাত্রই অমন চরিত্রের তখন মনের মধ্যে আর প্রশ্ন ফিরল না। মাটিতে শুয়ে পড়তেই ছায়াটা হারিয়ে গেল। মনীশ ভাবল নিজের বউয়ের কথা। নীহারকে মনে পড়লেই আর একটা কথা মনে পড়ে। আমাকে বাবা হতে হচ্ছে। যা মনীশকে চট করে ভাবিত করে তোলে।

মনীশের কাছে ঘড়ি ছিল না। ক্ষিধে পেয়েছিল। ভাবল, তারাকে বললেই হয় একটু চা খাব। সে বুদ্ধিটুকু তারার ছিল। ভাবনার মধ্যেই একটা বারো তেরো বছরের মেয়ে চা নিয়েই দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল। মেয়েটা কাঁপছিল। কথা বলল ও কেঁপে কেঁপে, 'আপনার চা।' নীহার বলেছিল, তুমি কি অমানুষ গো। বাপের বাড়িতে ক'টা মাস পড়ে আছি কই একবার তো এলে না। সেটা চিঠির কথা। চিঠির জবাব দিয়েছিল চিঠিতেই। মনীশ লিখেছিল, আমি খুব ব্যস্ত। সামনে ইলেকশন। তারপর নীহার আর চিঠি দেয় না। কাঁদেটাদে হয়ত। গাঁয়ে বসে পেটে বাচ্চা নিয়ে বউ যে-মানুষটার জন্যে কাঁদে সে-মানুষটা তেতে-পুড়ে গাঁয়ে গাঁয়ে মিটিং করে বেড়াচ্ছে। নীহার বলেছিল, 'আমার পেটের বাচ্চা পেটেই মরুক।' দাড়ি কামাবার দিন হয়ত সেদিনটাই। গালে রেজার টানতে টানতে মনীশ বলেছিল, 'যদি মরে আমরা কি করতে পারি নীহার।' নীহার ফুঁসে উঠেছিল, 'হ্যাঁ' তাতো বটেই। এমন জানলে কি আর বাবা তোমার

সঙ্গে আমার বিয়ে দিত।' নীহার তার বাবাকে নিয়ে গর্ব করে। আসলে বাবার বিঘে বিঘে জমি ভরিয়ে ধান পাটের ফলনের দোহাইতে নীহার আইবুড়ো কালটা রাজকন্যার মতো কাটিয়েছে। নীহার কাঁদত। আর তখন মনীশ বলত, 'মিছে কাঁদছ নীহার। তোমার বাবাকে আমি ছোটো করবো কেন। তাঁকে বড় করার যদি কোনো উপায় না থাকে আমি কি করতে পারি। আর সত্যিকে তো ফেরাতে পারি না।' চোখের জল মুছে খাটে শুয়ে সিনেমার কাগজ দেখত নীহার এবং বলত, 'জানি, কথায় তোমার সঙ্গে পেরে উঠব না।'

চট্‌পট্‌ দু-চারটে মশা উড়ল। তারার পাঠিয়ে দেয়া চা-হালুয়া শেষ হয়ে গেল। এই ভিটের মধ্যেই ডেকে উঠল একটা কুকুর। জলছোঁড়ার শব্দ হলো। শন্‌শন্‌ হাওয়া ছুটছে মাঠে। আকাশে চাঁদ জ্বলছিল টিম্‌টিম্‌ করে।

স্বপ্ন দেখার অভ্যেস সব মানুষেরই থাকে। কিন্তু অহেতুক কল্পনার বুনোনে বুঁদ হয়ে থাকাটা মনীশের ক্ষেত্রে কোনোদিনই ঘটেনি। এমনকি কিশোর বেলাতেই সে ঘরে বসে স্বপ্ন-টপ্ন দেখেনি। বরং সে স্বপ্ন তৈরি করেছে বন্ধুর দল নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়িয়ে বন্যা দুর্ভিক্ষ বা মড়ক এমন কোনো দুর্যোগ কাটাবার জন্যে সামর্থ্য সংগ্রহের ভেতর দিয়েই। তাই সে ছোটোবেলা থেকেই একটা প্রাণবন্ত মনোভাব নিয়ে বেঁচে উঠতে শিখেছে। তারা এইদিক থেকেই মনীশকে চিনেছিল। 'আপনাকে বড়-মা ডাকছেন'—আবার সেই মেয়েটি ফিরে এল। এবারো মেয়েটির গলা কাঁপল, কাঁপুনিটা এড়াবার জন্যে হাত বাড়িয়ে লণ্ঠনের নিচে থেকে রেকাবি ও কাপটা তুলে নিল। মনীশ গায়ে চাপাল পাঞ্জাবি। তারপর মেয়েটার পিছু পিছু চলল। দোরগোড়াতেই তারা দাঁড়িয়ে ছিল। এখানে আলোর বহর একটু বেশি যাতে তারাকে পরিষ্কারভাবে দেখতে পাওয়া গেল, তারা মোটা ও ফ্যাকাসে হয়েছে ঠিক। তারা বিধবা হয়ে মনীশের মুখোমুখি হবে তা কোনোদিনই মনীশ ভাবেনি। কাছাকাছি পতু ছিল না। উঠোনে একটা লোক একটা কুকুরকে চান করাচ্ছিল। কুকুরটা ঘেউঘেউ করছিল এবং সেই সঙ্গে জল ছোঁড়ার শব্দ। আর লোকটা কখনো হাসছিল, কখনো গান গাইছিল এমনকি নিজেকেই মাঝেমধ্যে ধমক দিচ্ছিল। মনীশ অবাক হয়ে চেয়েছিল সেদিকেই। তারা বলল, 'পাগলা মানুষের কাণ্ড আর কতক্ষণ দেখবে, ভেতরে এসো।' বারো-তেরো বছরের ভীরু মেয়েটি এরি মধ্যে পালিয়ে গিয়েছিল। মনীশ ঘরের ভেতরে এসে দেখল পতু ঘুমোচ্ছে। পতুর গায়ে সেই ছবিঅলা ফ্রক নেই। খালি গায়ে পতু ঘুমোচ্ছে। পতুর সারা গায়ে ঘামাচি

এ-ঘরটা ওপরের সাঙাৎই বটে। এখানেও দেওয়ালে দেওয়ালে সাজানো ইঁটের হাসি। জানলা দিয়ে এখান থেকে অন্ধকার মাঠটা দেখতে পাওয়া যায় না। মনীশ বলল, 'তুমি যে বনবাসে রয়েছ।' তারার উচিত ছিল নীরক্ত হাসিটুকু ছড়িয়ে দেওয়া। তারা তা মানল না। তারা বলল, 'বনবাস হবে কেন?' মনীশ জবাব দেয়ার সাহস পেল না। তারা বলল, 'বেশ আছি। উনি এককালে দলটল নিয়ে অনেক হইচই করেছিলেন। শেষকালে জেলখানাতেই মারা গেলেন।' এবার তারা নীরক্ত হাসি ছড়ানোর দায়িত্ব মেটাল। মনে মনে আঁতিপাঁতি করেও সে তারাকে খুঁজে পাওয়া যায় না।

একদিন নয় অনেক দিনই রাত্তিরের দিকে নীহার মনীশকে শরীর দেখিয়ে উত্তেজিত করতে চেয়েছে। মা কাঁদতে কাঁদতে সত্যি কাশী না যান, হুট করে মারা গেলে বুকে একটা আক্ষেপ নিয়ে যেতেন। মনীশকে এইসব ভেবেই বিয়ে করতে হলো।

তারাকে দেখে মনে হয় শরীর দেখিয়ে উত্তেজিত করার মতো ক্ষমতা নীহারের আছে। বউ পেটে বাচ্চা নিয়ে বাপের বাড়ি যেতেই মনীশ ঠিক করে ফেলল, সংসারের চেয়ে সমাজ বড় বলেই তাকে দায়িত্ববান হতে হয়।

হাতপাখা নিয়ে বাতাস করছিল তারা। মাছি উড়ছিল। পতু এক কোণে একটা ভাঙা সিঁড়ির ওপর বসে ছিল। তারা বলল, 'যদিও বুকচেপে বলি দিব্যি আছি। তবু পুরোপুরি যে সত্যি বলি না তাতো জানি।' মনীশ স্মৃতি উদ্ধার করল না। কি লাভ। নীহারকেও বারবার মনের মধ্যে টেনে তারার পাশাপাশি দাঁড় করানোই বা কি দরকার। খেতে খেতে মনীশ বলল, 'আমার শরৎচন্দ্রের গল্প মনে পড়ছে। তুমি যা কাণ্ডটা করছো।' তারা বলল, 'তুমি মাছের ঝোল খেতে ভালোবাসো। তবু মাছের ঝোল রাঁধিনি। তবে কি করে তোমার যে শরৎচন্দ্রের গল্প মনে পড়ল বুঝতে পারছি না।' কথাটা শুনে মনীশ এমন জোরে হেসে উঠল যে বাইরে থেকে কুকুরটা চীৎকার করে উঠল। এইবার তারা গলা উঁচু করে কাদের যেন ডাকল। একটা খাকি হাফপ্যান্ট আর কাঁধকাটা গেঞ্জি পরে সেই পাগল মানুষটা এল। তারা হেসেই ফেলল, 'ত্থাখ, নিজের বলতে আছে দেওর রামু, তাও আবার পাগল।' সেই বারো-তেরো বছরের ভীরু মেয়েটি এল। তারা তার দিকে আঙুল উঁচিয়ে বলল, 'বিনুরও কেউ নেই।' ওরা খেতে বসল। মনীশ সজনেডাঁটা চিবুতে চিবুতে তারার গিন্নিপনা দেখল। রামুর এখানে অবাধ্যপনা নেই, শুধু নিজের মনে বিড়বিড় করে বকল এই যা। তারাকে

দেখতে দেখতে মনীশের মনে হলো জীবন যন্ত্রণার সংজ্ঞাটা তার নিজের কাছে একটা বিলাস ছাড়া আর নতুনই বা কি।

ঠ্যাঙ ছড়িয়ে বসে রামুও সজনেডাঁটা চিবোয়, বিনু ভারি লাজুকভাবে জড়োসড়ো হয়ে বসে ভাত খাচ্ছে, তারার কপালে দু-চার গাছা চুল ঘামে সেঁটে আছে, তারার তাকিয়ে থাকাটায় বেশ কিছুটা উদাসীনতা, তবু মনে হয়, মনীশেরই, নিজেকে একটু সখের কাতরতায় মগ্ন।

খাওয়া চুকতেই উঠোনের ধারে ঘটি করে জল নিয়ে এসে তারা বলল, 'হাত পাতো।' উঠোনের মাথায় আকাশ। নির্মেঘ আকাশে পটপট করে রাশিরাশি তারা জ্বলছিল। রুপোলি তারা, নীল এবং সবুজ তারাও ছিল। অন্ধকার মাঠে ফিরে গলা ছেড়ে গান গাইছিল রামু। তারা বলল, 'এ-সংসারে পানের পাট নেই।' পিঁড়ির ওপর কাত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল পতু। তাকে কোলে টেনে নিয়ে চাপড়াতে লাগল তারা।

সেই ঘরে ফিরে এল মনীশ। ততক্ষণে লণ্ঠনের আলোর শিখা কমে এসেছিল, ফলে অন্ধকারটার ছন্নছাড়া চেহারাটা চারদিকে নাচছে। আর মনীশের ছায়াটাকে নিয়ে রাতারাতি কাণ্ড করে সেই অক্ষম আলো।

নীহার বলত, 'তোমার কি দুঃখু যে অমন হন্যে হয়ে মিটিং করে বেড়াও।' এ-সব প্রশ্নের উত্তর দেয়ার অভ্যেস মনীশ কাটিয়ে উঠেছিল। নীহারের এমন অনুযোগ গা-সওয়া হয়ে গেছে। আসলে নীহার যে নিজে থেকে এ-সব কথা বলতে শিখেছিল তা নয়। বাপের বাড়ি থেকেই শিখেছিল। মনীশ বোঝাবার চেষ্টা করেনি। বেনাবনে মুক্তো ছড়িয়ে কি লাভ। নীহার বিয়ের পরও সেই রাজকন্যার জীবন খুঁজতে চায়। তারা বলেছে 'পতুটাকে এইভাবে জঙ্গলে মানুষ করতে চাই না। এখন না হোক আর তিন-চার বছর পরে মেয়েটার জন্যে তো সত্যিই ভাবতে হবে। আমার নিজের বলতে কেউ নেই, এতদিন তাই জানতুম কেননা সত্যি বলতে কি বিয়ের পর থেকে যখন ইতিহাস হাতছানি দিয়েছে আমাকেই, তখন তোমাকে মনে পড়েনি। আজ হঠাৎ এতদিন পরে তোমাকে দেখে একটা ভুল যেন শুধরে ওঠার অবসর পাচ্ছে।' মনীশ এর উত্তরটা দিতে পারেনি। কেননা তারা যেমন দু-দিন আগে মা হয়েছে তেমনি মনীশও তো বাবা হতে চলেছে। হলোই বা দু-দিন পরে।

অন্ধকার মাঠে সারসার গাছপালা দেখে তার জনতার কথা মনে পড়ে। মনীশ লড়াই করে। কায়মনে যুদ্ধ করে যায় মনীশ। অজ গাঁয়ে মিটিং করতে

গিয়ে, ইলেকশনের দিনগুলোতে খাওয়া-দাওয়া জুটেছে আধপেটা, মশা-মাছির অত্যাচারে, শীতের কাঁপুনিতে, গরমে কিংবা তুমুল বর্ষায় কত ঘুমহীন রাতের স্মৃতি। তবু মনে মনে এইভাবে, এমন মত্ততায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠে মনীশ তো স্বপ্ন তৈরি করেছিল। আজ তারার কথা মনীশকে বড় ভাবায়। এতদিন হাত-পা ছুঁড়ে মনীশ মানুষকে যে আশ্বাসের স্বপ্ন দেখিয়েছিল, মা হয়ে, অপার বৈধব্য নিয়ে, তারা যেন সেই দাবি নিয়ে মনীশের মুখোমুখি।

জ্যোৎস্না ফুটেছিল। অন্ধকার ক্রমশ ফুরিয়ে গেলে আকাশে ভাঙা চাঁদা অল্প স্বল্প আলো ছড়াল। রামু কিংবা কুকুরটা মাঠে নেই। মাঠটা অনেকদূর পর্যন্ত ছড়ানো। মাঝে-মধ্যে গাছপালার জটলা। তারা বসে আছে মাঠটাতে। এমন শিথিল ভঙ্গি নিয়ে হয়ত কখনো-সখনো মনীশের পাশাপাশি গড়ের মাঠে তারা বসে থাকত। মনীশের মনে হলো এককালে হয়ত তারার আন্তরিক হয়েছিলুম। সবে কলেজে ঢুকেছিল তারা। সে-সব দিনে সে নিজের ইচ্ছেতেই পার্টিতে এসেছিল। পার্টিতে এমন একজন মেয়ে পেয়ে মনীশ খুশী হয়েছিল। সেদিন কিন্তু সে এতসব কথা ভাবেনি। আজ ভাবল। হয়ত তারার প্রেমে পড়েছিলুম।

তারার মাথায় ঘোমটা ছিল না। কাপড় সাদাসিদেভাবে পরা। মনীশ নিজেকে দোষ দিল। সেই সময় আমার একটু তারার দিকে তাকানো উচিত ছিল। তবে হয়ত তারার এমন অবস্থাটা হতো না। নীহার রাজকন্যাই থাকত। মাঠের গাছপালা কাঁপিয়ে একটা দুরন্ত হাওয়া ছুটে এল। তারার শাদা কাপড় শোকের রুমালের মতো উড়ল। এইভাবে তারাকে দেখার অভ্যেস কোনোদিন ছিল না। দশবছর আগে শেষ যেদিন দেখাদেখি হয়েছে সেদিনও কাজকর্মের কথাবার্তা ছাড়া অন্য কিছু ঘটেনি। সেদিন তারারা চিরকালের জন্যে বাঙলাদেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছিল। বাবার মৃত্যুর পর, লেখাপড়ার পাট ঘুচিয়ে মায়ের সঙ্গে ছোটো-ছোটো ভাইবোনগুলোর হাত ধরে বেঁচে থাকার বন্দোবস্ত প্রস্তুত ছিল বাঙলাদেশের জল হাওয়া থেকে দূরে খাস বিহারে। সেটা তারার মামার-বাড়ির দেশ। মনীশ তারাকে সেদিন যাযা বলেছিল এখনো তা তার নির্ভুল মনে আছে। দশবছর পরে পুরানো কথাগুলো মনীশ নিজের মনে আওড়ে নিল ঃ তারা যে আদর্শকে অবলম্বন করে জীবনে একটা ব্রত উদ্‌যাপনের বিশ্বাস নিয়েছো তাকে অশ্রদ্ধা কোরো না। দেখা আমাদের হবেই। বাপের বাড়িতে যাওয়ার আগের দিন রাত্তিরে নীহার মনীশকে অনেক আদর-টাদর করেছিল

আর নিজেকে অসহায়ের মতো সে-সময়ের জন্যে সঁপে দিতে চেয়েছিল মনীশের কাছেই। 'আজ তোমার যা খুশি তাই কর' নীহারের এমন অনুরক্ত প্রশ্রয় মনীশকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করেনি। নীহারের পেটে যেখানে বাচ্চা তৈরি হচ্ছিল সেদিকে চেয়ে মনীশ নিজের দুর্বলতা টের পেয়েছিল। নীহার বলেছিল, যদি সত্যিই আমার ছেলে হয় তবে আমি তাকে মানুষ করব। বাপের মতন এমন ছন্নছাড়া যাতে না হয় সেদিকে চোখ রাখতে হবে তো।'

জ্যোৎস্নার মাঠে তারা বসেছিল। মনীশ ভাবল, এভাবে দাঁড়িয়ে থেকে আমি কি করব? সিগারেট ধরিয়ে সে শুয়ে পড়ল। তবে কি আমি বিপ্লব চাই? বিপ্লবের ইচ্ছে যদি আমার মধ্যে কোথাও ঠাঁই নিয়ে থাকে তবে হয়ত তা কোনো জীবন্ত মগ্নতায় বেঁচে থাকার ইচ্ছে। আর আমি আদর্শ জীবনবোধের, স্বপ্নের, ভালোবাসার মৌলিকতা ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে এসেছি এতদিন। তারার জীবনটা কেমন ভেঙে চৌচির হয়ে গেল। এমন যদি নীহারের হতো তবে নীহার আত্মহত্যা করত। তারা বুদ্ধিমতী। মনীশ পতুর দায়িত্ব নিক এমন আব্দার সে করেনি। তারা চায় মনীশ যেমন তার কুমারী জীবনে একটা দায়িত্বের টান অনুভব করেছিল তা-ই জাগুক পতুটার জন্যে।

রাত বাড়লে শুধু ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকল। মাঠে হাওয়ার নাচ চলল। আর কখনো বা ডেকে উঠল শেয়ালের দল। দূর থেকেই ট্রেন চলার শব্দ ফিরল। মনীশের চোখে ঘুম এল না। এ-ঘরে যেন আর আলো নেই। এক জাতের উড়ন্ত পোকার গায়ে যেমন আলোর একটা তুচ্ছ দীপ্তি থাকে ঘরের আলোর বর্তমান অবস্থাটা তেমনি। জ্যোৎস্না অল্প-স্বল্পই ছড়িয়ে ছিল বাইরের মাঠটাতে। তারা নেই। মাঠটা ভীষণ ফাঁকা। নিজের ভেতরটাও ভীষণ ফাঁকা। আমি শুধু ভেবেই এসেছি আদর্শের কথা। এই ক্ষমতা নিয়ে মানুষ কি আদর্শবান হতে পারে?

পরের দিন সকালে মনীশের কোনো স্বপ্নের কথা মনে পড়েনি। তারা নিজেই চা নিয়ে এসেছিল। সকাল বেলায় উঠে তারা স্নান করেছিল। মাথার ভিজে চুল জড়ানো ছিল। তারার আঁচলে কোনো চাবির গোছা নেই। নীহারের রঙিন শাড়ির আঁচলে বাঁধা থাকে রূপোর বাহারি রিঙে তেরো-চোদ্দটা চাবি। তারার ঘরে সিন্দুক আলমারি না থাক টিনের তোরঙ্গ বা কাঠের বাক্সও কি নেই? মার্কস সাহেবের তত্ত্ব গিলে মনীশ এতকালে যা বিন্দুমাত্র প্রমাণ করতে পারল না সেখানে মূর্তিমতী দৃষ্টান্ত হয়ে রইল তারাই।

চা খেতে খেতে মনীশ বলল, 'পতু কোথায়?' তারা বলল, 'ঘুমোচ্ছে। কাল

সারারাত ঘুমোয়নি, জ্বালিয়েছে।'

ভারি মিথ্যে হয়ে দাঁড়ায় সব কিছু। মূল্যবোধ তছনছ হয়ে যেতে কতক্ষণ। একেবারে শব্দহীনভায় ফিরে গিয়ে মনকে হাজার প্রশ্ন করলে ও সেখানে শুধুমাত্র নিরুত্তরের অন্ধকার। নিজেকে প্রতারক মনে হয়। মনের জমি খুঁড়ে আকুল হয়ে ওঠে জিজ্ঞাসা, তারা, তুমি কি নিয়ে বেঁচে আছো? এখন পাথরে মাথা ঠুকলে রক্ত ছুটবে কিন্তু পাথর ভেঙে ওলোটপালটের বন্যা তো আসবে না।

তারা বসে রইল মনীশের মুখোমুখি। আর তো রাত্তির নেই। চতুর্দিকে দিব্যি দিনের আলো। মনীশের বুকের ভিতরকার কলকজ্জাসমূহ কি তারা দেখতে থাকল? মুহূর্তে তারার চোখ কি ভারি অলৌকিক প্রতিপন্ন হলো না?

ঘরে টানানো ছিল পতুর বাবার ছবি। চশমার চোখে এক পঁয়তিরিশ বছর বয়সী মুখ। ভাঙা-চোরা গাল। চওড়া কপাল।

ছবি ঘিরে কোনো ভক্তি শ্রদ্ধার ঘটা নেই। চন্দনের ফোঁটা নেই। মালা নেই। তবে ছবিটা যেন সময়মতো পরিষ্কার করা হয় তা বোঝা যায়। মনীশ বিমূঢ় হয়ে ওঠে। ভিন্ন গাঁয়ে বিরাট ন্যাংটা মাঠের ওপরে একটা বুড়ো মন্দিরের মতো তারার আস্তানা, গা-ভরা ঘামাচি নিরে সাড়ে-তিন বছরের পতু, পাগল দেওর রামু, নেড়ি কুকুর, আর এর মধ্যে অলৌকিক মনে হয় তারাকে, তবুও এটুকুতেই তো সব ক্ষান্ত নয়, নীহারের পোয়াতি চেহারাটা বার বার মনীশকে উত্যক্ত করে। পুরোনো দিন আজকের দিনের বিচারে কোনো সম্ভাবিত লক্ষণ নিয়ে হাজির হচ্ছে না। আর এখন সারাটা দিন ফুরোতে অনেক সময় বাকি। এই তো সবে রোদ উঠল। এইতো সবে তারা স্নান করল। তারার মাথার চুল এখনো ভিজে আছে। দূরের থেকে রেলগাড়ি ছুটে যাওয়ার আওয়াজ এল। সকালে শেয়াল ডাকল না। মাঠের গাছগাছালিদের বড় ম্রিয়মান মনে হচ্ছে। মনীশ চা খাচ্ছিল। এই সময় বিন্নুর কোলে চড়ে পতু এল। ঘ্যান্‌ঘ্যান্ করছিল। তারা বলল, 'বিন্নু, তুই যা, জল তুলে ফ্যাল। আমি গিয়ে ভাত চাপাচ্ছি।' তার পর চোখের জলের শুকনো দাগ নিয়ে পতু ঘরের মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসে রইল, শূন্য চায়ের কাপ ঘিরে মাছি ওড়ে, আর যেই পতু বলে উঠল 'কাকু' তক্ষুনি তারা হাসল, আশ্চর্য, পতু ফর্সা, হলুদ, হলুদ, পতুর শরীরে ক'ছটাক রক্ত আছে, মনীশের শরীরে রক্ত ছিল। সব রক্ত জমে ক্রমশ কি পাথর হয়ে যাবে?

এবার কথা বলল মনীশ। অন্তত পাঁচ-সাত মিনিট ধরে সে কথাগুলো সাজিয়েছে। সাজানো শব্দগুলি এবার ঠোঁটনাড়িয়ে উচ্চারিত করে ফেলল

মনীশ, সেই মনীশ, যার কাঁধে একবার দাঙ্গার সময় পুলিশের লাঠির আঘাতে সাপের খোলসের মতো দাগ তৈরি হয়েছে, যে চিরটা কালই 'মানুষের মঙ্গল' নামক শব্দটা নিয়ে ভেবে এসেছে, সেই মনীশ বলল, 'পতুর দায়িত্বটা আমি কিভাবে নেবো ভেবে পাচ্ছি না। আর সত্যি বলতে কি টাকাপয়সার জোর তো আমার নেই।'

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল তারা। পরে সব ঘুচিয়ে তারা বলে উঠল, 'ছি ছি মনীশ, আমি যেন কি। পতুর ভাবনা আমার কাছেই থাকুক।'

পতুর সঙ্গে তারার মিল কতোখানি। পতুর মুখটা ভীষণ নির্বোধ, চোখটা তারার মতোই খয়েরী, ফ্রকের বোতাম নেই। পিঠটা খাঁ খাঁ, ঘামাচি, রোগা কাঁধ থেকে ফ্রকটা একদিকে কাত হয়ে গেছে। মনীশ চিরকালই ছোট ছেলে-মেয়েদের একা পেলে অসহায় হয়ে ওঠে। ভয় এমন থাকে যদি বাচ্চাটা বায়না ধরে। মনীশ খুব অসহায় বোধ করল। পতুর বাবার ছবিটার কাঁচে ময়লা, তারি ওপর দিয়ে সর সর করে আরশোলা ছুটে যাচ্ছে। গতকাল কেন হঠাৎ তারার মুখোমুখি হওয়ার ঘটনাটা ঘটল। তাই মনীশ দেখতে পেল নিজের নড়বড়ে কলকজাগুলো, টলমল অস্তিত্বটা। মনীশ কিন্তু জানতেই পারেনি দিনের পর দিন সে এইভাবে জীর্ণ হয়ে উঠেছে।

নীহার বউ মানুষের গয়নাগাঁটি দেখলে বিড় বিড় করে সোনার হিসেব কষে। কানেরটা পাঁচআনা না কতো। হাতেরটা আদপে সোনার কি না ব্রোঞ্জের। তারার হিসেব অন্যরকম।

মনীশের কাছে ঘড়ি ছিল না। চোখ তুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে মনীশ দেখল সূর্য জ্বলছে। মনীশের কাঁধে একটা ঝোলা। এইভাবে বিদায়বেলার মুহূর্ত রচিত হলো। তারা বলল, 'এখান থেকে টানা কলকাতাতেই তো যাবে।' মনীশ বলল, 'হ্যাঁ, সেইরকমই তো ইচ্ছে আছে।' পতু মায়ের আঁচল জড়িয়ে কাকুর দিকে তাকিয়ে ছিল। এরি মধ্যে হঠাৎ সামনের বটগাছে নেড়ি কুকুরটাকে বেঁধে রামু একটা ছড়ি দিয়ে পিটতে শুরু করে দিল। সে-এক বীভৎস ব্যাপার। জ্বলন্ত রোদ্দুরের মধ্যে চিৎকার করে উঠছে একটা কুকুর। আর সেই সঙ্গে এক পাগল মানুষের উল্লাস। তার রাগ দপ্ দপ্ করছে। সারা গায়ে জ্যাবজ্যাব করছে ঘাম। পতু তো ভয় পাবেই। তারা ঠায় কতোক্ষণ এমন চুপচাপ থাকতে পারে। মনীশ ভেবেই পেল না এই সময় তার কি করা উচিত। তক্ষুনি দড়ি ছিঁড়ে ল্যাজ তুলে কুকুরটা খাঁ খাঁ মাঠের ওপর দিয়ে ছুটে কোথায় যে পালাল। পতুর অবিন্যস্ত

চুল ও রোগা কাঁধের ওপর দিয়ে মনীশের করতল ছুঁয়ে যায়। তখন রামু বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসে। স্থিরভাবে দোরগোড়াতে দাঁড়িয়ে রয়েছে তারা। বার-তেরো বছর আগে মির্জাপুর স্ট্রীটের পার্টি অফিসের ছাদে তারা একবার ফিট হয়ে পড়েছিল। সাধন আর ভুলাল ছুটে গিয়ে নিয়ে এসেছিল এককাপ গরম দুধ। চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিতেই তারার জ্ঞান ফিরে এসেছিল। দুধের কাপ দেখে বলেছিল, 'না, না, দুধ কি হবে। আমার কোনো কষ্ট নেই।' দুলুদা মারা গেছেন। সাধন এখন অষ্ট্রেলিয়াতে। পতু আর তারা!

কুকুরটা পালিয়েছে, রামুটাও। মনীশ মাঠের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। ফাঁকা মাঠ, দূরবিস্তৃত, রৌদ্রময়, তারার দাঁড়িয়ে থাকা, পতুর লাজুক চাউনি, এক আকাশ আগুন, গাছপালার দল আর কি জনতার কথা মনে করায়, মির্জাপুর স্ট্রীটের পার্টি অফিসের ছাদে বারো-তেরো বছর আগে সেই-যে তারা বলেছিল, '···আমার কোনো কষ্ট নেই' তা বুঝি সারা জীবনের জন্যে বলে রাখা কথা। এই বাড়িটার পাশাপাশি আরো দু-তিনটে পরিবারের আশ্রয়। ভাঙাবাড়ি, ঝুলন্ত চটের পর্দা, পাকা বাড়ি নয়, কাঁচা দেওয়ালের গায়ে খড়ি দিয়ে ভূত পেত্নির ছবি আঁকা, 'ওখানে কারা থাকে?' মনীশ জিজ্ঞেস করল। তারা বলল, 'শ্বশুরবাড়ির জ্ঞাতিরা।' নতুন মানুষ দেখার জন্যে চটের পর্দার ফাঁকে, কাঁচা দেওয়ালে চোখের গর্তের মতো জানালায় কৌতূহলী কতক মুখ, সে-সব দেখে তারা বলল, 'ওদের সহানুভূতি নেই, কৌতূহল আছে।' এবং বলেই হেসে ফেলল, 'কথাটা কেমন বইয়ের ভাষার মতো বললুম।'

মনীশ দেখল মাঠ ভেঙে ভূপতি আর মুরারি আসছে। কাল ওরাই মনীশকে এই আস্তানায় পৌঁছে দিয়ে গেছে। তারাও দেখল মাঠ ভেঙে ওদের আসা। মনীশ দূর মাঠের দিকে তাকিয়ে ছিল। রামু বত্রিশ পাটি দাঁত দেখিয়ে 'আমরণ' গোছের হাসি হেসে চলে গেছে। নেড়ি কুকুরটাও পালিয়ে গেছে। শুধু চারদিকে রোদ্দুর জ্বলছে, খরার দিনের মতো, জনতার স্মৃতিরই সেইসব গাছপালা, বট বাবলা যে নামেরই হোক না কেন, সে-সব এখন পাঁচিলের দোসর। বিধাতায় কারই বা বিশ্বাস। তারারও নয়, মনীশেরও নয়। তবু কাল সন্ধ্যেবেলায়, সেই সবে তারার মুখোমুখি, তারার জ্ঞাতি কুটুমের বাড়িতে শাঁখ বাজল, দু-হাত জড়ো করে কপালে ঠেকিয়েছিল পতুই, সাড়ে তিন বছরের পতু, সে কি ভগবানের উদ্দেশে? সম্বিৎ জুটিয়ে দিন-দুপুরে মনীশ দেখল তারাকে, পতুকে, রক্তহীন, আস্তানা, আদ্যিকালের। কাঠ, রোদ্দুর আর রোদ্দুর। খরাকালের মতো হা হা শূন্য মাঠ পেরিয়ে এসেই বললো, 'চলুন, ওরা সব রেডি।'

মাঠের ওপর হাঁটতে থাকল ওরা। মনীশও। মনীশের মাথার চুল ওড়ে। রোদের গনগনে আঁচ দিগ্বিদিক জুড়ে। রগের ওপর দর দর করে গড়িয়ে পড়ে ঘাম। মনীশ পেছন ফিরে তাকাল না।

মানুষ মারলে এখন তদন্ত হয় না

কুশল লাহিড়ী

তার উপর নির্দেশ ছিল যেন সে, শিবু-শিবপদ মুখোপাধ্যায়, ১/১ রামকুমার লেনের কালীচরণ বিশ্বাসকে যত তাড়াতাড়ি, নির্দেশ পাওয়ার পরমুহূর্তে সম্ভব হ'লে তাই, খতম করে। সেই তরল অন্ধকারে হিমতুল্য শীতল বস্তুটি তার হাতে এলে সে পিস্তলস্পর্শের প্রথম অনুভবে ও নিকেশ করার ব্যাপারে যুগপৎ রোমাঞ্চিত ও কাঙ্ক্ষিত, কারণ এই প্রথম সে এমন একটি জিনিষের সঙ্গে, যা নাকি তার কল্পনায় কাঙ্ক্ষিত ছিল, শারীরিক ও মানসিকভাবে জড়িয়ে গেল, অথচ তখুনি শিবু 'কালীচরণকে খতম করবো কেন' এমন প্রশ্নে বিচলিত হয়ে যখন প্রশ্ন করার জন্য উন্মুখ 'প্রশ্ন করা এক্তিয়ারে নেই, শুধু আদেশ পালন, যে কোনও আদেশ' ইত্যাদি মনে পড়ার সঙ্গে কালীচরণের চেহারা তার পুরু গোঁফ ঈষৎ দীর্ঘ জুলফি ঠোঁট আলগা বেচারা বেচারা ভাব ভেসে উঠে মিলিয়ে যেতে 'তোমার পাড়ার, লোডেড্' শুনে বুঝল, শুধু লক্ষ্যের উপর তাগ্ ক'রে ট্রিগার টিপলেই তার কাম ফতে, যদিচ কালীচরণ শিবুর প্রতিবেশী নয়, তবু খুব দূরেও সে থাকে না। তাদের গলি পেরিয়ে যে বড় রাস্তা সেই রাস্তা ধ'রে ডানদিকে শ-খানেক গজ এগুলে বাঁদিকে প্রথম গলির প্রথম বাড়ির গায় আর একটা সরু গলির, অন্ধগলি, মাথায় ছোট্ট বাড়ির ভাড়াটে বা মালিক কালীচরণ একদিন ঐ বাড়ি বা ঐ গলি থেকে কালীকে বেরুতে দেখে এখন তার মনে হয় কালীচরণের বাড়িই ঐটে। কালীচরণের সঙ্গে তার পরিচয় কথাবার্তা হৃদ্যতা কিছুই নেই, অথচ কালীচরণকে তার গোঁফ ও জুলফির জন্য মনে রাখা কঠিন নয়, কারণ এ-ধরনের গোঁফ ও জুলফি সচরাচর কেউ রাখে না, ফলে কালীচরণকে একবার দেখলে ভোলা মুস্কিল। 'কিন্তু কালীচরণ এমন কি করতে পারে যার জন্যে' শিবু ভাবতে ভাবতে দিশেহারা, তখন 'আর ভাববো না' প্রায় মরিয়া হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে কিভাবে কখন কালীচরণকে নিকেশ করা যায় তার পরিকল্পনা ছকতে ছকতে কালীচরণের গতিবিধির উপর কড়া নজর রেখে তার গতিবিধি আচার-আচরণে একটা দুর্বলতা কোনোমতে বের ক'রে বা সঙ্গে সঙ্গে সেই দুর্বলতার সুযোগে

কাজ হাসিল করতে হবে ভাবলে সমস্ত শরীর কেমন চিনচিনাল, গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠতে সে নিজের আবেগকে সংযত করার জন্য 'মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে' ভেবে কিছুটা অসম্ভব হ'লে 'কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায় একজনকে খতম করা কি সম্ভব' প্রশ্ন জাগতে সে আবার বিমূঢ়, তখন তাড়াতাড়ি সমস্ত ভাবনা চিন্তা ঝেঁটিয়ে বিদেয় করার জন্য অসময় বাড়ি ঢুকে কাগজ কলম টেনে নিজের বাড়ি থেকে কালীচরণের বাড়ি পর্যন্ত মোটামুটি একটা ছক আঁকতে চেষ্টা করল, এবং কিছু কাটাকুটির পর ছকটা দাঁড়িয়েছে দেখে মনে মনে খুশি হ'লে হঠাৎই প্যান্টের ডান পকেটে হাত চলে গেল। একটা ঠাণ্ডা বোধ অনেকটা মৃত্যুর মতো ঠাণ্ডা, শিবু অনেকদিন আগে এক বন্ধুর বাবার মৃতদেহ চিতায় তুলতে গিয়ে ছুঁয়েছিল, ঠিক সেই রকম ঠাণ্ডা হিম-হিম পকেটে রাখা পিস্তলের শরীর, যদিও এসময় পিস্তল পাওয়ার পর বহুক্ষণ কেটে গেলেও তা এতক্ষণ পকেটে থাকার ফলে পিস্তলের নল অন্তত ঠাণ্ডা না থাকারই কথা। 'একবার দেখলে কেমন হয়, পিস্তল শুদ্ধ হাত প্রায় বাইরে উঠে এসেছিল' ততক্ষণে কেউ দেখে ফেলার ভয়ে সেই দারুণ কৌতূহল চেপে এখন কি করবে দিশে না পেয়ে ডাকল 'বিশু।' বিলু তার ছোট ভাই, ক্লাশে টেনে পড়ে। কিন্তু বিশুকে ডাকার পর 'কেন ডাকলাম মনে হতে খানিক হাসল, 'থাক্, বিলুর কাছ থেকে কিছু জানা যাবে নিশ্চয়' ভেবে ঘর থেকে পা বাড়াতে বিলু হাজির। বিশুকে দেখে হঠাৎ কি করে বিশুকে কালীচরণের কথা জিজ্ঞেস করবে ঠিক বুঝতে না পেরে ভুম্ ক'রে প্রশ্ন করল, 'কালীদা কি তোদের ক্লাবের মেম্বার ?' তার উত্তরে 'কোন্ কালীদা' শুনে 'সেই রামকুমার লেনের' তখন বিশু 'রামকুমার লেনের ?' বিশুর প্রশ্ন শুনে 'হ্যাঁ হ্যাঁ রামকুমার লেনের। কালীচরণ বিশ্বাস' বিশু তখনও ঠাহর করেনি বুঝে 'আরে কালীচরণ। কালী বিশ্বাস' তার আগেই বিশু 'গুঁফো' বললে বিশুর সঙ্গে শিবু-ও হেসে উঠল। হাসি থামলে বিশু 'বিশ্বাসদা লোক খুব ভালো, কারু-র সাতে পাঁচে থাকে না। আমাদের ক্লাবের একজন একটিভ্ মেম্বার' তখন শিবু 'বিশ্বাসদা করেন কি ?' বিশু-র দৃষ্টি এধার সেধার করলে 'টিচার নাকি ?'-র উত্তরে 'না' শুনে 'তবে কি ?' এমন বিরক্তি প্রকাশ করলে বিশু আমতা আলতা করে 'তাইতো, তাইতো' তখন শিবু 'বিয়ে করেছে ? তার উত্তরে 'না' শুনে শিবু বিশুকে এড়াতে চাইলে বিশু 'খুব চা সিগারেট খান' শুনে 'নাকি' বলার আগেই বিশু 'সর্বদা অলিম্পিয়ায় থাকেন।' বললে 'অলিম্পিয়ায়, সর্বদা' মনে মনে আওড়ালে সে যেন কালী সম্বন্ধে কি একটা পেয়ে যায়, তাই অলিম্পিয়া

রেস্টুরেন্টে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গিয়ে ঠারেঠোরে কালীচরণসংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য তার দৈনিক রুটিন খাওয়া-দাওয়ার লিস্ট বিশেষ কাজ-কর্মের বিবরণ তার চাকরির স্থল ইত্যাদি জানা দরকার, এবং কালী কোনসময় একেবারে একা থাকে সেই সময়টি জানা সবচেয়ে জরুরি, কারণ ঐ সময়ে গিয়ে নিঃশব্দে চকিতে কাজ সেরে সেই ঘরে যেখানে তরল অন্ধকার অস্পষ্ট ছায়াছায়া আলো, গিয়ে বলতে হবে, 'আরও কাজ দিন, একা করার কাজ।' অতএব এবার শিবু বিশুকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে পাশ কাটাবার চেষ্টা করলে বিশু 'হঠাৎ মাস্টার-দার কথা জিজ্ঞেস করলে যে' সে 'মাস্টার-দা' শুনে অবাক হোলে বিশু 'ক্লাবের সবাই বিশ্বাস-দাকে মাস্টার-দা বলে' বলতে সে 'মাস্টার-দা, সূর্যসেন' বলে জানিয়ে দিতে চাইল যে এখন আর তার বিশুকে দরকার নেই, এবং প্রায় ঠেলে বিশুকে সরিয়ে নেমে এলো রাস্তায়।

তারপর নানা জায়গা ঘুরে কয়েকজনের সঙ্গে ঠারেঠোরে বা সরাসরি কথা কয়ে যেমন অলিম্পিয়ার ম্যানেজার জিতেনবাবু ঐ দোকানের বয় মাখন কালীদের পাড়ার একটা দশ-এগারো বছরের ছেলে পেট্রোলপাম্পের বন্ধু ইত্যাদি—সে কালীচরণ সম্বন্ধে যে-তথ্য ও সংবাদ জোগাড় করল তা এই:

কালীচরণ বিশ্বাস স্বর্গীয় রামচরণ বিশ্বাসের দ্বিতীয় পুত্র। রামচরণের জ্যেষ্ঠ পুত্র মাত্র চার-বছর বয়সে ডিপথিরিয়ায় মারা যায়, ফলে রামচরণ ও মন্দোদরীর দারুন আদরে মানুষ হয় কালী। কালীর পর রামচরণের রাধা ও লক্ষ্মী নামে দুটি কন্যা হয়, বর্তমানে উভয়ে বিবাহিত এবং স্বামীর ঘরে বসবাসকারী। রামচরণ ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ করেন, কিন্তু অকস্মাৎ সন্ন্যাসরোগে তাঁর মৃত্যু ঘটে। ফলে রামচরণের বিষয়-আশয়ের সমস্ত কিছুর ভার পড়ে কালীর উপর, কিন্তু কালীর বিদ্যাচর্চার দিকে বিশেষ মনোযোগ থাকায়, সেই অবসরে রামচরণের বিশ্বস্ত কর্মচারীরা ব্যবসায়টিকে লাটে তুলে দেয় অচিরে, কালী তখন ম্যাট্রিক ক্লাসের ছাত্র। কালীচরণের বিদ্যানুরাগ ও বিষয়-আশয়ের প্রতি উদাসীনতা লক্ষ্য করে কালীর মা মন্দোদরী তার বিয়ের ব্যবস্থা করেন, ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েই সে দারপরিগ্রহ করে (এ-ক্ষেত্রে বিশুর খবর ভুল), বর্তমানে সে দুটি সন্তানের জনক।

কালীচরণ লম্বায় পাঁচ ফুট সাড়ে-পাঁচ ইঞ্চি, ওজন একশপঁয়ত্রিশ পাউণ্ড, রঙ শামলা হলেও উজ্জ্বলের দিকে, মিতভাষী এবং সাধারণভাবে আড়ম্বরপ্রিয় নয়। চা ভালোবাসে, তবে সিগারেট একদম খায় না (এ-বিষয়ে বিশুর খবর ভুল), তবে চা-র সঙ্গে আলুরচপ ও বেগুনি খেতে ভালোবাসে, এই দুটি জিনিষ

অলিম্পিয়ায় খুব ভালো তৈরি হয়। আজ পর্যন্ত সে কারুর সঙ্গে ঝগড়া করেনি, তার ব্যবহারও অমায়িক। কালীর বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা নেহাৎ কম, নেই বলাই ভালো। জানা-শোনার সঙ্গে তার বাক্যালাপ 'কেমন আছেন' 'ভালো তো' 'আজ বেজায় গরম' ইত্যাদি মধ্যে সীমাবদ্ধ, কেবল ক্লাব-লাইব্রেরীর দু-একটা ছেলের সঙ্গে মাঝেমধ্যে চপ খায়, নইলে একাই আসে।

কালীচরণ খুব ভোরে প্রায় পাঁচটার সময় ঘুম থেকে উঠে বিছানায় থাকা অবস্থায় শীর্ষাসন ও শবাসন করে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট একঘণ্টা ধরে, তারপর বিছানায় বসে থাকে নিস্পন্দ নিশ্চুপ কিছুক্ষণ, তারপর প্রাতঃকৃত্য সেরে স্নানের পর চলে আসে অলিম্পিয়ায়, কারণ ওদের বাড়িতে চা-র পাট নেই। অলিম্পিয়ায় পরপর দু-কাপ চা ও একটি রুটি কিংবা সার্কাস জাতীয় বিস্কুট খেয়ে কোথায় বেরিয়ে পড়ে তা কেউ সঠিকভাবে বলতে পারে না। কেউ বলে টিউশনিতে যায়, কেউ বলে সে কিসের দালালি করে, তারই ফিকিরে বেরিয়ে পড়ে ঐ সক্কালে। তবে বেলা সাড়ে-নটা দশটায় আবার তাকে দেখা যায় অলিম্পিয়ায়, সেখানে ঘণ্টা দেড়েক দুয়েক কাটিয়ে ফিরে আসে বাড়ি। খেয়েদেয়ে আবার সে বের হয়, কেউ বলে সে সারা দুপুর ঘুমোয়, আবার বের হয়। কিন্তু কোথায় যায় কেউ ঠিকমতো বলতে পারে না, অথচ সন্ধ্যার পর সাতটা সাড়ে-সাতটায় সে ক্লাবে হাজির হবেই হবে ঝড়-জল-শীত-গ্রীষ্ম উপেক্ষা করে, তারপর ন-টায় বাড়ি ফেরে, এখন যে-বাড়িতে থাকে তার সামনের দুটি ঘর কালীদের, বাড়ির বাকি অংশটি এক জ্ঞাতি-কাকার কবলে।

কালীচরণ নির্বিরোধ ভালোমানুষ কারুর সাতেপাঁচে নেই ইত্যাদি বিষয়ে সকলে একমত হওয়ায় শিবু খানিকটা বিমূঢ় ও বিচলিত হয়, কারণ একজনকে খতম করতে গেলে হত্যাকারীর অন্তত রক্ত গরম হওয়ার মতো কিছু কারণ থাকা চাই। অথচ এ-ক্ষেত্রে সংগৃহীত তথ্য ও সংবাদ তন্নতন্ন বিশ্লেষণ করে যে-কটি দুর্বলতা খুঁজে পায় (এক, অত্যধিক চা-পান, দুই, চপ ও বেগুনি ভালোবাসা, তিন, শীর্ষাসন ও শবাসন করা) তার সবকটি একজনকে একটা চড় মারার পক্ষেও যথেষ্ট নয়, কিন্তু দল যখন ভার দিয়েছে এবং এ-পাড়ায় বিশেষ ঐ লোকটিকে বেছেচে তখন নিশ্চয় লোকটি ভালো নয়, এবং তখুনি শিবুর মনে পড়ে 'আচ্ছা কেউ তো বলতে পারলো না কালী কি করে, তবে কি সে টিকটিকি?' সঙ্গেসঙ্গে ধারণাটা তার বদ্ধমূল হোলে 'খতম করো' শ্লোগান সমস্ত রক্তকে চনচনিয়ে দেয়—'দালালকে হালাল করো' 'মারকে বদলা মার, খুন কা বদলা খুন',

শুধু রিভলবার তুলে ট্রিগার টেপার অপেক্ষা। এতদিন সে এই দিনটির অপেক্ষায় ছিল, দলের অনেকেই অ্যাকশানে গেছে, সেও; কিন্তু এবার একা তার মানে 'আমি এখন রেসপনসিবল মেম্বার' এবং তা ভেবে সে আনন্দে শিহরিত হোলে তার যে সম্মান পার্টির অন্যান্য-র কাছে বেড়েছে মনে হতে আবার পুলক বোধ করল। 'হাঁ একটা কাজের মত কাজ, প্রতিক্রিয়ার হাত যারা শক্ত করছে, প্রতিক্রিয়াকে ধ্বংশ করতে হোলে সবচেয়ে দুর্বল জায়গায় ঘা মারতে হবে' ভাবার পর 'কিন্তু কালীচরণকে মেরে কি হবে। দু-একটা খুনেই কি গোটা ব্যবস্থা পালটানো যাবে?' প্রশ্ন উঠলে সে কিছু বিচলিত, কিন্তু ততক্ষণে সমস্ত দুর্বলতা মোচন করে 'লীডার কখনও ভুল করতে পারেন না' এমন সিদ্ধান্ত মনের মধ্যে সজোরে ঢুকিয়ে শিবু হাঁফাতে থাকে, আর হাঁফাতে হাঁফাতে সে একসময় হতাশায় ভেঙে পড়লে অনেক রাতে দু-একজন 'নন্‌কমিটেড' বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা মেরে বাড়ি ফিরে না খেয়ে নিজের শোয়ার ঘরের দিকে পা চালালে 'শিবু, এত রাত হলো যে' মা-র গলা শুনে হতভম্ব ও অবাক, কারণ মা কোনোদিন এত রাত পর্যন্ত জেগে থাকেন না। 'তবে কি মা জেনে ফেলেছেন?' ভাবতেই প্যাণ্টের পকেটে হাত গেলে বস্তুটি যথাস্থানে আছে জেনে নিশ্চিন্ত হয়ে থামকা হাসল, 'এই আর কি।' পাশ কাটাতে চাইলে মা 'তোর চোখ-মুখ যেন কেমন মনে হচ্ছে, নিশ্চয়ই জ্বর কিংবা' বলতে বলতে কাছে এসে কপালে বুকে হাত দিয়ে দেখতে থাকলে 'তোমার যত ভয়' বললে মা 'তবে খেলি না যে বড়' বলতে সে 'ও' এই অব্যয়-ধ্বনিতে মাকে পাশ কাটিয়ে মা-র দুশ্চিন্তা উড়িয়ে দিয়ে রান্নাঘরে ঢুকলো।

এখন সে একা, শোয়ার ঘরে। আবার সে কালীচরণের যাবতীয় কাজকর্ম দৈনিক রুটিন কর্মপদ্ধতি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দুর্বলতা বের করার চেষ্টায় যখন নাজেহাল তখন চকিতে 'পিস্তলটা দেখলে কেমন হয়' মনে হোলে সে ওই বন্ধ ঘরের চারপাশে কেউ আছে কিনা পরীক্ষা করার জন্য খাটেরতলা দেরাজের ভেতর ইত্যাদি সম্ভব-অসম্ভব জায়গাগুলো দেখে নিল, তারপর প্যাণ্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে পিস্তলের হিমহিম ঠাণ্ডা ছোঁয়া পেতে নিমেষে কেমন বদলে যেতে থাকল—এই পিস্তল তার জীবনে প্রথম মর্যাদা বহন করে আনছে, এই পিস্তলের ঘায়ে সে একজনকে ধরাশায়ী করবে, এই পিস্তলের সাহায্যে এতবড় একটা দায়িত্ব সফল ভাবে সম্পন্ন করতে পারলে দলের অন্যান্যদের কাছে তার মর্যাদা হাজারগুণ বেড়ে যাবে। কিন্তু পিস্তল বের করে যে দেখবে তাতে ভরসা পাচ্ছে না, কারণ পিস্তল বের করে দেখার অর্থ নেতৃত্বের প্রতি অনাস্থা জানানো, যেহেতু "অবিশ্বাস করা

শত্রুতার সমান, নেতার নির্দেশ বিনা দ্বিধায় পালন করতে হবে" সেই অমোঘ উপদেশের কথা স্মরণে এলে সে মনেমনেই আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য যুক্তি খাড়া করতে চাইল, অথচ কোনও যুক্তি আপাতত খাড়া করতে পারল না দেখে প্রায় হাল ছেড়ে জামা-প্যান্ট না-বদলে শুয়ে পড়ল। 'পারবো কি ?' সংশয়, এবং সংশয় কাটানোর জন্য নানা চিন্তার চেষ্টা কিন্তু কোনো চিন্তাই দানা বাঁধছে না, অতএব সে বাতি নিবিয়ে দিলে আচমকা অন্ধকার তীব্র হয়ে তরল হয়ে গেল, যেহেতু শোয়ার ঘরের কাচের ভেন্টিলেটার দিয়ে রাস্তার নিঅন আলো ঘরে ছড়িয়ে পড়তে থাকল, এবং সে ঐ অবস্থায় আগামীকাল কাজ শেষ করে সেই ঘরে গিয়ে কি বলবে তার পরিকল্পনা ছকলে 'তাহলে কোনসময় কালীকে খতম করব' মনে হতে উঠে বসেই সুইচ অন করল।

এবার কাগজ-কলম নিয়ে সেই ম্যাপ ও সংগৃহীত তথ্যাদিসহ শিবু গভীর মনোযোগে নিজের বাড়ি থেকে কালীচরণের বাড়ি পৌছতে কত সময় লাগবে ও কোনসময় গেলে সহজে ও অব্যর্থভাবে নিকেশ করতে পারবে তাই পরীক্ষায় রত হলো। কাগজ-কলম না টানলে মাথা খোলে না, অথচ কাগজ-কলম টেনে নিয়ে এত রাতে লাইট জ্বালিয়ে কাজ করলে কেউ সন্দেহ করবে মনে হতে সে একবার বাথরুম যাবার অজুহাতে দরজা খুলে সারাবাড়ি অন্ধকার দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে দরজা বন্ধ করে নিজের পরিকল্পনায় মন দিল। 'এখান থেকে কালীর বাড়ি যেতে ম্যাকসিমাম', শিবু মনেমনে একবার এ-বাড়ি থেকে রামকুমার লেন পাক দিয়ে এলো, 'হাঁ মিনিট পাঁচ-ছ, আচ্ছা দশ মিনিট ধরা যাক', তারপর ঐ দশ মিনিট সময় হাতে রেখে তন্নতন্ন খুঁজে সে দুটি সময় বের করল—এক, স্নান সেরে যখন কালী অলিম্পিয়া যাবার জন্য প্রস্তুত হয়; দুই, যখন সে রাত্রে বাড়ি ফিরে খাওয়ার আগে বিশ্রাম নেয়। এই দুটি সময়ে কালীচরণকে নিশ্চিত ভাবে বাড়িতে পাওয়া সম্ভব, 'আচ্ছা যদি রাস্তায় একলা পাই' লহমায় মনে পড়লে রাস্তায় কাজ সারার বিপদ আছে বুঝে সে সকাল ও রাত্রের সময় দুটিকে যথার্থ সময় ভেবে কিছুক্ষণ আঁক কষে বের করল যে, সকালে যদি যায় তবে পৌনে সাত থেকে ছ-টা পঞ্চাশ মিনিটের মধ্যে, আর রাত্রে গেলে নটা বাজার মিনিট পাঁচেক আগে গেলেই চলে। কিন্তু সকাল ও রাত্রের মধ্যে কোনসময়টা বিশেষ সুবিধের তা ঠিক বের করতে না পেরে সে লটারী করার জন্য দুটো কাগজ ছিঁড়ে একটায় 'স' এবং অন্যটায় 'র' লিখে গুলি পাকিয়ে নিজের সামনে ফেলে চোখ বুজে খানিকক্ষণ গুলি দুটো হাতড়ে একটা তুলেই চোখ মেলল,

কাগজটা খুলে ধরতে দেখা গেল—স। 'আমি যা ভেবেছি ঠিক তাই' শিবু আনন্দে ফুলেফুলে উঠছে, 'কাজটা তাহলে নির্বিঘ্নে শেষ হবে', সে যেন হাততালি দিয়ে জানিয়ে দিতে চাইল, তখন 'সংযম জীবনের শ্রেষ্ঠ মূলধন' মনে হতে একটু দমে গিয়ে আবার ম্যাপের উপর দৃষ্টি সংযোগ করল। 'এই কাজের সাফল্যের উপর আমার ভবিষ্যত নির্ভর করছে' ভাবতে ভাবতে আবার সে হিসেব কষে কষে পাতা ভরিয়ে ফেললে পাতা ওলটানোর সময় নজর পড়ল প্যাণ্টের পকেটে, পকেটটা প্যাণ্টের সঙ্গে যথাসম্ভব মিশে আছে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে হালকা বোধ করল, তারপর হাই তুলে তুড়ি মেরে এবার আরও গভীরভাবে মনঃসংযোগ করার চেষ্টা করল যাতে তিলমাত্র ভুল না হয় সময় এবং কাজের। 'কিন্তু উল্টে কালী যদি আমায় আক্রমণ করে?', শিবু থমকালো, এবং সে এবার নিজেকে দেখল রক্তের স্রোতে ভাসমান একটা শব হিসেবে, যার মাথা বিদীর্ণ হয়েছে, বুক ঝাঁঝরা আর শতশত মাইল বেগে রক্ত বেরিয়ে এসে তার সমস্ত শরীরকে বিকৃত করে দিচ্ছে, শিবুর শরীর বেঁকেবেঁকে দুমড়ে-মুচড়ে নানা জ্যামিতিক আকারে পরিণত হলে, শিবু সেই দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে চোখ বুজে চিৎকার করে উঠবে, তেমন সময় খেয়াল হলো সে নিজের ঘরেই আছে এবং সেখানে কেউ নেই। 'আমি কাপুরুষ, নাহলে এসব ভাবতাম কখনো', নিজেকে চাবুক মেরেমেরে সে চাঙ্গা করতে গিয়ে বুঝল, নেতা হওয়া কি কঠিন ব্যাপার। 'যাকৃগে যাক্', সে কোনোমতে নিজের দুর্বলতা কাটালো এইসব কথা ভেবে 'শ্রেণীশত্রুকে খতম করতেই হবে' 'প্রতিক্রিয়ার হাত যারা জোরদার করে তাদের রেহাই নেই' 'আমরা আনবো নতুন দিন' 'বিপ্লবের অগ্নিশিখায় সবাইকে আহুতি দিতে হবে' ইত্যাদি ইত্যাদি, এবং সে অচেতনেই আবার কাগজে-কলমে মন দিয়ে তার পরিকল্পনা রূপায়ণে ডুবে গেল। বাইরে তখন কড়া নাড়ার শব্দ ও শিবু শিবু ডাক। চোখ মেলে চাইতে ঘরে আলো দেখে 'এত রাত্রে আবার কে' বিরক্তিতে ওঠার সময় অবশ্য খেয়াল করে সে অতিদ্রুত কাগজপত্র তোষকের নিচে চালান দিয়ে ঘুমের জড়তা কাটানোর চেষ্টায় চোখেমুখে দু-তিনবার হাত বুলিয়ে দরজা খুলতেই সামনে মাকে দেখে তার চোখ ছোট হয়ে তীক্ষ্ণ হলো। 'লাইট জালিয়েই রেখেছিলি' তারপর 'একটা ছেলে ডাকছে' তৎক্ষণে শিবুর খেয়াল হলো ভোর হয়েছে, 'ক-টা বাজে মা'-র উত্তরে 'ছ-টা কুড়ি' শুনে সে অতি নিশ্চিন্তে 'এত সকালে আবার কে?' তখন মা 'কে এক রতনবাবু নাকি পাঠিয়েছে' শুনে 'রতনবাবু' বিস্ময়ে শিবু কিছুটা বিচলিত হয়ে সামলে নিল 'ওঃ তাই বলো।'

আসলে সে রতনবাবু নামে কাউকে চেনে না, নিশ্চয় পার্টির কেউ, কারণ গুপ্ত সংস্থার সভ্যদের আসল নাম থাকে না, একএক সময় একএকটা নাম নিতে হয়। অতএব সে ঐ অবস্থায় চলে এলো বাইরের ঘরে। আসার সঙ্গেসঙ্গে ছেলেটি কোনও কথা না বলে একটা কাগজ গুঁজে দিয়েই চলে গেল। কাগজের ভাঁজ খুলে দেখল, অ আ, তার মানে কাজ শেষ করেই দেখা করো। লেখা দেখে সে খানিক বিরক্ত হলো। 'এতো আমারই কাজ, দেশের জন্য দশের জন্য যখন কাজে নেমেছি', আপন মনে বিজবিজিয়ে 'আমাকে তৎপর হতে হবে' এবং তৎক্ষণাৎ সমস্ত বিরক্তি কাটিয়ে চলে এলো নিজের ঘরে তৈরি হবার জন্য, কারণ সাতটার আগেই তাকে রওনা হতে হবে কালীচরণের বাড়ির দিকে। কোনোমতে মুখ ধুয়ে মাকে এড়িয়ে (মা-র সঙ্গে দেখা হলে কথা বলতে হবে অনেক তাই দেরী হয়ে যাবে) কোনোমতে বাবার ঘরে ঢুকে টুক করে ঘড়ি দেখল, 'ছটা পঁয়ত্রিশ।' সে একবার এমনি 'অনন্ত' বলে ডেকে চা পাওয়া যায় কিনা দেখার ইচ্ছায় মুহূর্তখানেক অপেক্ষা করল, এবং অনন্তর উত্তরের অপেক্ষা না করেই নেমে এলো রাস্তায়। আর রাস্তায় নামতেই এবার সে সেই মেজাজ ফিরে পেলো যে-মেজাজে দেশের জন্য দশের জন্য নিজের জীবন বিলিয়ে দেয়া যায়।

তখন তার হাফ প্যান্টের ডানপকেটে, হাতের মুঠোয় পিস্তল, 'আমি একটা কাজের মত কাজ করতে যাচ্ছি, দলের কাজ, নেতার হুকুম,' কিন্তু একটু এগুতে খেয়াল হলো, এভাবে প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে রাস্তায় হাঁটলে লোকের সন্দেহ জাগবে এবং এভাবে যাওয়া শোভন নয় অন্তত এখন। বড়রাস্তায় পড়তে একটা জীপ্ গা ঘেঁসে চলে গেলে সে ডানদিকে পা চালালো। এখন রাস্তা ফাঁকা, ক্বচিৎ দু-একজন পথচারী কাছে বা দূরে আসছে কিংবা চলে যাচ্ছে। শিবু একবার পেছন ফিরে দেখল—দূরে রাস্তার পাশে একটা লরি দাঁড়িয়ে আছে, একটা লোক দোকানের ঝাঁপ খুলছে, তার একটু কাছে একজন লোক তার দিকেই এগিয়ে আসছে। শিবু এবার সামনে তাকাল—দূরে 'আসাম ওএল' লেখা ও তার গণ্ডার, দুজন এদিকপানে আসছে, ডানদিকের দোকান বেয়ে ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ছে রাস্তায়। সে এবার নিশ্চিন্ত হয়ে দৃঢ়ভাবে পা ফেলতে ফেলতে এগুতে থাকল। পীচের রাস্তার সঙ্গে তার জুতোর শব্দ 'বিপ্লব আকাশে বাতাসে' তারপর একটা লরি দুমদাম শব্দে পাশ দিয়ে চলে যেতে 'গ্রামে গ্রামে বন্দরে বন্দরে মানুষের জাগরণ, লক্ষলক্ষ মানুষ' সে তাকাল অর্থহীনভাবে তখনও লরির ধাক্কায় রাস্তা কাঁপছে 'হিংসার বদলে হিংসা, সশস্ত্র বিপ্লব, আমরাই

পৃথিবীকে মুক্ত করবো' দূরে কয়েকটা কাক কা-কা রব তুললে 'শোষণমুক্ত দুনিয়া, স্বাধীন পৃথিবী' ততক্ষণে একজন পথচারীর পাশ দিয়ে চলে যেতে তার চটির শব্দ খসরখস্ 'আমরা নতুন পৃথিবী গড়বো' এবার শিবুর চলার বেগ দ্রুত হলো পীচের সঙ্গে জুতোর শব্দ উঠছে নামছে 'প্রতিক্রিয়ার চক্র চূর্ণ করো, কেউ রুখতে পারবে না আমাদের গতি, আমরা অজেয়' সেই সময় আরও কিছু শব্দ কোলাহল তুলতে সে সেই কোলাহলের উৎসে তাকাতে দেখল, একটা বাচ্চা ছেলে টিন বাজাচ্ছে আর তার সামনে কয়েকটা পাখি। দূরে হর্ণ বেজে উঠতে শিবু সম্বিৎ ফিরে পেয়ে দেখল যে সে রামকুমার লেন পেরিয়ে কয়েকগজ এগিয়ে এসেছে, মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়াতে তার রক্ত যেন ফুটতে থাকল টগবগিয়ে 'হাঁ একটা গুলি' এবং সে বুকে হাত দিয়ে বুকের স্পন্দন স্বাভাবিক করার জন্য কয়েক সেকেণ্ড চুপ দাঁড়িয়ে থাকল গলির মাথায়, তখন একটা 'টুং' শব্দ শুনে সাতটা বাজে ভাবতে চকিতে প্রায় ছুটেই এসে দাঁড়াল কালীচরণের দোরগোড়ায়।

তখন তার বুকের স্পন্দন দ্রুত।

টোকা মারল আস্তে আস্তে।

উত্তর নেই।

একটু থেমে জোরে টোকা মারল, তবু উত্তর নেই। 'তবে কি কালী বাড়ি নেই' একটা আশঙ্কা, এবার টোকাগুলো আগের বারের চেয়ে জোরে।

উত্তর নেই।

শিবুর ভ্রূ কোঁচকালো, বিরক্তি। 'থেকেও খুলছে না নাকি,' এবার শরীর উষ্ণ এবং টোকার পরিবর্তে কড়া নাড়া।

কোনও সাড়া নেই, শব্দ নেই।

তখন শিবুর রক্ত ফুটতে শুরু করেছে, এবং কড়া নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ডাক 'কালীচরণবাবু বাড়ি আছেন, কালীবাবু।'

নিঃশব্দে দরজা খুলে গেল।

শিবুর চোখের সামনেই পুরু গোঁফ ও ঈষৎ দীর্ঘ জুলফি।

'কাকে চাই?'

'আপনাকে।'

'আমাকে।' কালীর স্বরে বিস্ময়, তারপর স্বাভাবিক 'ও', একটু থেমে, 'আসুন আসুন।'

দরজা থেকে কালীচরণ পিছন ফিরে 'বসুন' বলেই চকিতে শিবুর মুখোমুখি

হলো, ততক্ষণে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মতো শিবুর হাত চলে গেল পকেটে।
এবং ততোধিক দ্রুততায় গর্জে উঠল, 'হ্যাণ্ডস্ আপ্।'
বলার সঙ্গেসঙ্গে কালীচরণের হাত উঠে এলো এবং একই সঙ্গে শিবুর পিস্তল ধৃত ডানহাত কালীচরণের দিকে তাগ্ করল।

'দেশের জন্য দশের জন্য আমি আপনাকে—,' শিবুর বাক্য শেষ করার আগেই একটা দারুন শব্দ, গুলির সেই শব্দের সঙ্গে একটা বিরাট চিৎকার আর সেই শব্দ ও চিৎকার ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে মিলিয়ে যাবার আগেই প্রায় রিভলভার থেকে গুলি বেরুবার সঙ্গেসঙ্গে শিবু মেঝের উপর পড়ে গেল সশব্দে, তার হস্তধৃত পিস্তলটা দূরে খেলনার মতোই পড়েছিল আর 'শালা হারামি, জানে না 'এস, বি'-র কাছে সর্বদা মাল থাকে,' একটা ফিসফিসানি ধীরেধীরে উঠে 'মানুষ মারলে এখন তদন্ত হয় না' এমন কোলাহল তুলে শিবুর দেহ ঘিরে উড়ে উড়ে আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়তে থাকল, ততক্ষণে শিবুর দেহ এঁকেবেঁকে দুমড়ে-মুচড়ে রক্তে-ঘামে নানা জ্যামিতিক আকার নিতে নিতে স্থির হয়ে গেছে।

শোকের মধ্যে বাঙলাদেশ

দুর্গাদাস সরকার

রামগতি, ভোলা, বরজব্বর, হাতিয়া আর কই ?
দৃশ্য-দৃশ্যান্তর শুধু চিহ্নহীন, সমান সমান
সব, সমতল জলে হিন্দু, বৌদ্ধ, কে মুসলমান ?
কুটিল ও কালো স্রোতে তা তা থৈ তাথৈ তাথৈ।
কে ছিলি সুপারি বনে ? নারিকেল গাছে ? কে যে কার ?
লুব্ধ দরিয়ার বুকে নেই বৃদ্ধ মাঝিদের পাল।
নিঃশব্দ ক্রন্দসী থেকে বন্দিনীর সামাল সামাল
ধ্বনিতে জলের তলে কাঁদে যেন চোদ্দ লক্ষ হাড়।

তারই জন্যে বুকফাটা শোক। তবু অন্ধকার নয়।
কারণ যা হারাবার ফুরোবার নয়, তা আমার
তা তোমার মধ্যে আছে। একান্ত আপন পরিবার
ভেঙে দু টুকরো হলে এক হয় বিপন্ন হৃদয়
প্রকৃতির ক্রুর হাস্যে ফিরে এলে আবার সঙ্গতি।
সেই দ্বীপগুলি খোঁজে আমাদের সন্তান-সন্ততি।

কবিতা

রবীন সুর

যেখানে সূর্যাস্ত নেই কিংবা রাত্রি নক্ষত্রের অমেয় যৌতুকে
হাজার মাইল ব্যাপ্ত জ্যোতির্ময় আকাশের সীমা
তুমি তার কতটুকু অন্তর্গত রহস্যের ধ্বনিত প্রতীকে
আরোপিত ব্যবহার
সমস্ত দুর্জ্ঞেয়তম পিপাসার ঘুমন্ত কোরক
কতিপয় চিত্রকল্প অনুমেয় শব্দের অভিধা
কতটুকু উন্মোচনে পেয়েছে বিকাশ

কেবা জানে কাকে বলে অভিজ্ঞতা
কার নাম বিষয়ের মৌলিক ধারণা
জীবন যৌনতা মৃত্যু যোগ্যতার উদ্বর্তন আপাতত যার চতুর্দিকে
যে কেবল একা একা
অন্ধকার পার হয়ে কিছুক্ষণ অলৌকিক আলোর সীমায়
তারপর পুনর্বার লোকায়ত দুর্গতির অন্ধকার অস্তের পশ্চিমে

হয়তো সঠিক কোনো শ্রোতা নেই নিকটে বা দূরে
কিংবা তার সমগ্র সংলাপ
উত্তরের অপেক্ষা না রেখে
যখন যে দিকে খুশী ভবঘুরে ইচ্ছার বিলাস

দিগ্বিদিকে কেউ নেই অথবা প্রত্যেকে আছে জ্ঞাত বা অজ্ঞাত
জেনে কোনো লাভ নেই কেবল স্বগত
উচ্চারণে অন্তরঙ্গ অনুভব জানিয়ে যাওয়ার
বীতনিদ্র অভিপ্রায়ে দিনগুলি রাতগুলি শিল্পায়িত ভাষার উৎসার।

আত্মকথন

শিশির সামন্ত

যেজন সাগর চেনে সেই তো ডরায়।
অনেক ভঙ্গুর নৌকা
সময় উজানী স্রোতে, যে সমুদ্র
মুখে ফেণা তোলে, ও তটিনী
তটের সমুখে গড়ে নিপুণ রঙ্গভরা
যে ঢিবি এ শিশুরাই ;
হাসে বুঝি সমুদ্র তা দেখে।

বাঁশের কেল্লাও ভাঙে অবশেষে
সে' তিতুমিরের,

অনেক হাজং ব্যর্থ, কাকদ্বীপে
অনেক অহল্যা মা কাঁদে

আজ এই চিতাশালে উসকিয়ে আগুন
খুঁজে ফিরি
এ ওর স্বামী, এ ওর ভাই ;
গার্হস্থ্য কল্যাণে ছিল
বংশলতিকার মতো সাংসারিক ভিতে।

সময়ের অবিসম্বাদী, আজ এই কোন
উলুধ্বনি, বেজে ওঠে শাঁখ ?
শিব তরায়ের দেশে যে ছলনা
ডেকে নিয়ে গেল তাকে ;
সুমন ফেরে না বুঝি আর।

পাগলিনী কাঁদে অম্বা,
যে যন্ত্রবিভূতি ওই দেখা যায়
বাঁধ,
মুক্তধারাকে বাঁধে ;
অলৌকিক আত্মন্তরী যে প্রবাহ বয়ে যেত
জনস্রোত, অস্তিত্ব উন্মাদ।

ইতিহাস স্থির হয়ে মাঝে মাঝে ঘটায় প্রমাদ।

আর এক সূর্য

মনোমোহন দত্ত

তোমাদের রথ আজ অনায়াসে উড়ে যায় চাঁদের আকাশে ;

তুরন্ত পায়ের চিহ্নে আঁকো সে ধূলায়
পৃথিবীর কোনো কথা ?—
সভ্যতা বনাম
সে কোন নূতন পরিণাম !

যে অশান্ত ঘূর্ণীহাওয়া ছোটে
আট্‌লান্টিক পার হয়ে টংকিং সাগরে—
তারই বেগে উদ্ধত নিশান
উড়াও নিবাত শূন্যে গ্রহ থেকে দূর গ্রহান্তরে।

কী পেলে চাঁদের দেশে ?
কী এনেছ ?—মুঠি মুঠি ছাই ! অনেক সোনার দামে,
ভুখা-মিছিলের মুখে—শেষে তাই দেবে ?—
এ দিয়ে কি থামবে লড়াই !

মরা চাঁদ—হাড়ের খবরে,
থামে না চকোর-কান্না ;
বুকের তৃষ্ণা তার জ্যোৎস্নার গান হয়ে ঝরে।

তোমার অদ্ভুত রথ
আর কত দূর যাবে,
—আর কত দূরে !
পার হয়ে কোন ছায়াপথ
সে-কোন্ সবিতৃলোকে,
কোন্ আলোকের অন্তঃপুরে !

যে ধীময়ী বাণী
ধ্বনিত প্রচেতঃকণ্ঠে,—
তার চেয়ে শ্রেয় কিছু আর
আছে কি তোমার দেয় !—তার কতখানি
মুছে দেবে—অনাদি, অকূল অন্ধকার !

দুর্জয় আগ্নেয় রথচূড়া
হয়তো বা প্রতিঘাতে
একদিন হয়ে যাবে গুঁড়া ;
এ মন্ত্র মন্ত্রিত হবে তখনো আকাশে
অন্য এক আলোর আশ্বাসে ॥

সময় নেই

অমিয় ধর

গুমোট
বাবরি মাথা আকাশ
মাথা ঝাকালেই বৃষ্টি
চড়-বড়, চড়-বড়
এ্যাস্‌ফল্‌টে ভাপ ওঠা গন্ধ
ধুয়ে মুছে সাফ হলে
এঁদিক-ওদিক
হৈ-চৈ
সবকিছু শব্দের ভেতর দিয়ে
স্বস্তির শ্বাস টেনে
স্নিগ্ধতায়
পায়ে পায়ে
প্রগল্‌ভ শহর থেকে
খেয়াঘাটে
স্মৃতি-বিস্মৃতির
আলো অন্ধকার
নৈঃশব্দ্যে
জন্ম-মৃত্যু খেয়া পারাপারে
সুখ দুঃখ বেগবান স্রোতে
একবার
শুধু একবার !
সময় নেই
এক মুহূর্ত থেকে
আর এক মুহূর্তে
উত্তরণে
স্নেহমমতায়

গোনাগাঁথা মুহূর্তগুলো
বেগবান স্রোতে
জন্মমৃত্যু কোলাহলে
একবার, শুধু একবার।
এপারে খেয়াঘাটে
আলো দুল্‌ছে
দুলছে নদী
ঝিঁ-ঝিঁ পোকায় নৈঃশব্দ্য
ফিরব কি ফিরব না
ভাবতে ভাবতে
উঠে দাঁড়াতেই
ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বৃষ্টি!
বেগবান স্রোতে
আলো ঝলমল
নূপুরের শব্দ
ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে
অবিরাম
জন্ম এবং মৃত্যু!
জন্ম এবং মৃত্যু
বীজ থেকে ফলে
ক্রমাগত অনস্তিত্বে
আমাদের যাত্রা
পূর্ণতায়!
সময় নেই
ফেরি ঘাটে
সচকিত বাঁশি
ভয়ঙ্কর নৈঃশব্দ্য
বুকের কাছে দম আটকানো
অস্বস্তি
স্নেহ মমতায় ব্যাকুল প্রিয়জন

ঘরে ফেরার আর্তি
আমার ঘর নৈঃশব্দ্যে
ধূপ আর বেলফুলের গন্ধে
স্নিগ্ধ বিষণ্ণতা!

বাঙলার দ্বৈরথে

শুভ বসু

কী হবে অনেক বেঁচে, এই
বাঙলার দ্বৈরথে, বাঙলায়,
মুখের ভেতরে নাচে প্রেত, কুকুরের পাল,
জঙ্ঘা আলোড়িত যায় মেয়ে
যেন জীবনের সারার্থ বোঝাতে,
বেপথু মনন চায় আত্মকৈবল্যের বোধ
যৌথতার দর্শনের ভানে,
শিশুরা চাঁদের বুকে দেখে রাহুদংশের স্বাক্ষর।
স্পর্শ সমাতুর মনে
তবু লাউসেন, চাঁদ, যেন
চেতনার অতন্দ্র প্রদেশে
বহমান ইছামতী, যোগাযোগ দিবসরজনী।
এ সমস্ত কেন্দ্র করে
অনায়াসে বেড়ে যেত চেতনার বাঙ্ময় পরিধি
শুধু
অলৌকিক ঘুরে যাচ্ছে হাওয়ার নিশান,
"প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানহসি বেদম"
কেউ নেই, ইতিহাস পুরুষের সাথে পাঞ্জা কষে
কেউ নেই, এই চাঁদ-বেহুলার দেশে
নির্বিচারে হেসে যাচ্ছে
গুটিকয় বেহেড শকুন।

রৌদ্রেরও বুকে কিছু গূঢ় কথা আছে

সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

রৌদ্রেরও বুকে কিছু গূঢ় কথা আছে
কাছে পেলে জলভরা একখণ্ড মেঘ
ইন্দ্রধনু ছবি আঁকে
স্মৃতি কিছু স্নিগ্ধ ছায়া আকাশের পটে

দাউ দাউ খরা বুকে রুখু মাটি রিক্ত
কখন আশ্চর্য দেখ
দহনে প্রেমের ফলভারে নত নারী
পত্র পুষ্পে বৃক্ষ মাতা
সীতা মুখে ফাল ফাল মাটি
বিস্তীর্ণ হরিৎ ক্ষেত্র
সুপ্ত বীজ উজ্জ্বল অঙ্কুর মুখ
যেন শিশু হাসে মার কোলে
জটায়ু পাখির বুকে ঝোড়ো হাওয়া
প্রভঞ্জন প্রলয় পাখায়
তবু আশ্চর্য মমতা
আমৃত্যু জীবন পণ রক্ষা করে
মৃত্তিকা মায়ের শিশু
স্নেহ ধন্যা জনক দুহিতা সীতা।

দোহাই তোমার, পতাকাটা আরো একটু শক্ত হাতে…

জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়

দোহাই তোমার
পতাকাটা আরো একটু শক্ত হাতে…

ছেলেগুলো বাঘের মতো লড়ছে
ভাগ্যের কপালে লাথি মেরে

মা-লক্ষ্মীর নাকে বুড়ো আঙুল ছুঁইয়ে
পাহাড়ে আর বনে, বস্তিতে আর গলির মোড়ে
গ্রামের পথে আর চালের আড়তে
ছেলেগুলো বাঘের মতোই লড়ছে।
লড়তে লড়তে লড়তে লড়তে
বাঘের মতো লড়ছে বলেই হয়তো
কাঁটাবনে দা চালাতে চালাতে
দা-এর কোপে রাগের কোপে
তোমার ডালিয়া আর সূর্যমুখী
আমার যুঁই আর বেলফুলের বনেও
এমন কি বুনো শুয়োর ঠেকাবার জন্যে যে বেড়া বেঁধেছিলে
নোনাজলের বান ঠেকাবার বাঁধটাও
আর ওইসব সরস্বতীর বিষয়-আশয়
এমন কি বিদ্যাসাগর-রবীন্দ্রনাথ
না হয় বাদই দেওয়া গেল
তাই দোহাই তোমার পতাকাটা আরো একটু শক্ত হাতে…

মারতে মারতে আর মরতে মরতে
ছেলেগুলো বাঘের মতো লড়ছে
আমি ভাবছি এই তো হলো
এই তো আমি
এই তো জ্বলছে সেই নবযুগের আলো
তারপরেই বিকেল গড়াতে না গড়াতেই
সেই বুনো শুয়োরের দাঁত নোনাজলের বান
ভাঙা বেড়ার ফাঁক দিয়ে ভাঙা বাঁধের সুযোগ নিয়ে
আমি উদ্বিগ্ন হই
পতাকাটার জন্যে দোহাই তোমার
পতাকাটা আরো একটু শক্ত হাতে…

ছেলেগুলো লড়ছে

বাঘের মতোই লড়ছে বটে
ওদের মার এবং ওদের মরা
অস্থির আবেগে আমাকে বিহ্বল করে
তারপর বিহ্বলতা কেটে যেতেই
আমার এবং নিতাই মোড়লের
আমজাদ এবং মিশির ভাইয়ের
ডানহাতটা অবশ হয়ে যায়
অথচ ঠিক তখনই
ভাঙা বেড়ার ফাঁকে বুনো শুয়োরের দাঁত
খোলা বাঁধের বুকে রাশ রাশ নোনাজল
আহ্লাদে আটখানা,
ডানহাতটা এখন বেজায় কাজের হতো
তাই বলছিলাম হে আমার জ্যেষ্ঠ
পতাকাটা আরো একটু শক্ত হাতে…

আসলে আমাদের চারপাশে এখন আলো-আঁধারির যাদু
হঠাৎ কিছুর ঝলকানি চোখ ধাঁধিয়ে দিতেই পারে।
তুমি, আমি এবং আমরা অন্ধকারের গা বেয়ে বেয়ে
কতোদিন ধ'রে কতোদূর থেকে
খানিকটা আলো এনে ফেলেছি আমাদের উঠোনে
অন্ধকার কিছু কেটেছে
তবু ক্লান্ত, বিষণ্ণ আর কাতর মা আমাদের
এখনো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন না দশদিক
আরো কিছু আলো চাই।
উপায় নেই
বাঁ-দিকের খাড়াই পার হয়ে দক্ষিণের সাগর পার হয়ে
মরণ পার হয়েই আনতে হবে আলো।
ততক্ষণ ততদিন
হে আমার জ্যেষ্ঠ দোহাই তোমার দোহাই তোমার
পতাকাটা আরো একটু শক্ত হাতে ধরো।

পড়শী

চিত্তরঞ্জন ঘোষ

ভদ্রলোককে প্রায়ই দেখি। আমহার্স্ট স্ট্রীট ও হ্যারিসন রোডের মোড়ে মহাবীরের পান-বিড়ির দোকান, সেখানে সিগারেট কিনছেন। কোনোদিন খুব ব্যস্ত, কিনেই তাড়াতাড়ি চলে গেলেন। কোনোদিন বা ধীরেসুস্থে একটা সিগারেট ধরিয়ে হাঁটতে লাগলেন। কখনো দেখি হাতে ঝোলা, বাজার করে ফিরছেন। কখনো চলেছেন রিকসায়—রিকসা চড়া যেন এক রোগ—এখান থেকে এখানে যাবেন, তো ওঠো রিকসায়। ফাঁকা ট্রাম পেলে (তখন পাওয়া যেত!) সোজা হাইকোর্ট-ইডেনগার্ডেনের দিকে একটা ট্রামে চেপে বসে খানিকটা ঘুরে এলেন। পরিচ্ছন্ন ধুতি-পাঞ্জাবী শীতকালে জহর কোট, পায়ে হরিণের চামড়ার চটি, উজ্জ্বল রঙ, নাকটা উঁচু ও একটু বাঁকা, চোখে শিক্ষা ও রুচির আলো। দেখেই মনে হয়, আলাদা। চোখে না পড়ে উপায় নেই। বিশেষ করে আমাদের এই হতশ্রী পটলডাঙা পাড়ায় কে এই বিশিষ্ট ভদ্রলোক?

জানা গেল—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

আমাদের পাড়ায়? কোন্ বাড়িতে?

ঐ যে! গলির গলি, তস্য গলি। জলপাইগুড়ির পাট তুলে সিটি কলেজে এসেছেন। বাড়ি ভাড়া নিয়েছেন এই পাড়ায়। তাহলে পটলডাঙার সুদিন কি আবার ফিরে এল! রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের আমলে অনেক নায়ক-নায়িকা পটলডাঙায় বাস করত। সে-সব সত্যযুগের কথা। এখন তারা বোধহয় সব বালিগঞ্জে চলে গেছে। নায়ক-নায়িকা তো দূরের কথা, একটা কাটা সৈনিক্ও পর্যন্ত চোখে পড়ে না। হায় পটলডাঙা, তোমার দিন গিয়েছে—এ-শোক যখন আমাদের রীতিমত সয়ে গেছে, তখন নারায়ণবাবু ঢিলেঢালা পোষাকে সিগারেট টানতে টানতে সরবে সহাস্যে খোসমেজাজে পটলডাঙায় প্রবেশ করলেন। পরে শুনলাম, একা নন। ঐ বাড়িতে এক জোড়া সাহিত্যিক আছেন। নবেন্দু ঘোষ কিছুদিন নারায়ণবাবুর সহবাসী ছিলেন।

পটলডাঙার কপাল ফিরল, কিন্তু আমার নয়। বড়লোক (ধনী ও গ্রেট

দু-জাতেরই) সম্পর্কে আমার অস্বস্তি আছে, তাই এড়িয়ে চলি। বেশ কয়েকজন বড়লোক আমার কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছেন, একটু মাথা ঝোঁকালেই কপাল ফিরতে বা ফুঁড়তে পারত। কিন্তু কোনোক্রমে মাথা বাঁচিয়েছি। নারায়ণ বাবু আমাদের পাড়ায় আসবার আগেই দস্তুরমতো নামজাদা লোক, বড় লোক। সুতরাং নারায়ণবাবুর বাড়িতে আমি যাই নি, তাঁর সঙ্গে পরিচয়ও হয় নি।

অথচ তাঁর সম্পর্কে আগ্রহ নেই এমন নয়। ওঁর লেখা তো আগে থাকতেই পড়ি। তখন বাড়িতে 'ভারতবর্ষ' ও 'শনিবারের চিঠি' রাখা হতো। 'উপনিবেশ' ভারতবর্ষের পাতাতেই প্রথম পড়েছি। পঞ্চাশের মন্বন্তর পেরিয়ে এসেছি। 'আলু খলিফার শেষ খুন' চালের চোরাকারবারীদের বিরুদ্ধে আমাদের ক্রোধকেই যেন প্রকাশ করল। 'বনজ্যোৎস্না,' 'টোপ'—অসহায় মানুষের পীড়নের মর্মান্তিক চিত্র। এমনও হয়?—জিজ্ঞাসা আমাদের। 'স্বর্ণসীতা' 'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী' 'বৈতালিক'—নতুন দিগন্ত, নতুন ভাষা। সে ভাষায় আমরা মুগ্ধ ছিলাম। পরের কথাসাহিত্য-সম্রাট যে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সে বিষয়ে আমার সংশয় ছিল না। সেদিনের কোনো তরুণ সাহিত্যিকেরই ছিল না।

অনেকগুলো বছর নানা ঘটনায় পা দিয়ে দিয়ে হেঁটে—বা ছুটে—চলে গেল। দুই প্রতিবেশীর মধ্যে কয়েকটা বাড়ির ফারাক—সেটা রয়েই গেল। নারায়ণ-বাবুর বাড়িতে ঢোকার সরু গলিটা আমাদের পাড়ার সর্ট-কাট রাস্তা। পাড়ার সবাই ব্যবহার করে এ গলিটা—আমিও। সে গলি আবার গলির শিরোমণি। দুটো লোক সামনাসামনি পড়লে ধাক্কা দিয়ে ছাড়া পেরোনো অসম্ভব। এ গলিতে আমরা উভয়ে বহুবার মুখোমুখি হয়েছি। সে প্রায় সম্মুখ সমরের মত। কিন্তু সসম্ভ্রমে ওঁকে অনাহত অতিক্রম করতে দিয়েছি। কারণ ছোটবেলা থেকে এই গলিরই কল্যাণে আমরা কাত হয়ে চলতে তুরন্ত সুদক্ষ। এরই-মধ্যে আশা দেবী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছেন, দেখি বই-খাতা নিয়ে ঐ গলি দিয়েই ক্লাস করতে যান। একদিন এম্. এ. পাশও করে গেলেন। কিন্তু আমরা যে অপরিচিত সেই অপরিচিতই রয়ে গেলাম।

নৈহাটি কলেজে একবার অধ্যাপক সমিতির বার্ষিক সম্মেলন। যে ট্রেনে সবাই ভোরবেলা চলে গেছেন, সে-ট্রেনটি স্টেশনের কাছে আমার বাড়ি বলে আমি যথারীতি মিস্ করেছি। পরের ট্রেনে যাব—গাড়িতে উঠেছি। উঠে দেখি স্টেশনের কাছের আর একজন ভদ্রলোক গাড়ি ফেল্ করেছেন। তিনি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। পাশে তাঁর আর এক অধ্যাপক। (এঁকে তখন চিনতাম না।

এখন চিনি, সিটি কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জাহ্নবীবাবু) তিন জন একই কামরায় নৈহাটি পর্যন্ত গেলাম। ওঁরা দু'জন সারা ট্রেন গল্প করতে করতে গেলেন। আমি একা—অতএব চুপচাপ। ওঁদের কথাবার্তা সবই কানে আসছে—নারায়ণবাবুই প্রধান বক্তা। কিন্তু কান গলালেও ওঁদের কথার মধ্যে নাক আমি একদম গলাই নি। প্রতিবেশী ও সহযাত্রী—কিন্তু অপরিচিত।

আমার বাড়ির সামনেই একজন উকিল ভদ্রলোক থাকেন। তাঁর নাম মণিবাবু। এঁর বাড়িতে নারায়ণবাবু ও আশা দেবীকে কয়েক দিন ঘনঘন যাতায়াত করতে দেখলাম। কী ব্যাপার? নারায়ণবাবু বাড়ি কিনছেন। এ বাড়ি ছেড়ে দিচ্ছেন। আমাদের পাড়া ছেড়ে তাহলে চললেন নারায়ণবাবু! না, ছেড়ে আর কই! এই বৈঠকখানা রোডে বাড়ি কিনেছেন। না, তাহলে পাড়া-ছাড়া বলা যায় না। আগে ছিলেন পাড়ার কেন্দ্রে, এখন গেলেন পাড়ার সীমান্তে। কিন্তু আগে ছিলেন নড়বড়ে ভাড়াটে এখন একেবারে পাকাপোক্ত পাড়াটে।

বৈঠকখানার এই বাড়িতে নারায়ণবাবুর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ—একজন উভচর বন্ধুর মাধ্যমে। বন্ধুটি পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে বললেন, 'ইনি হচ্ছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।'

'আমি চিনি।' বললাম আমি।

বন্ধুটি আমার পরিচয় দিলেন নারায়ণবাবুর কাছে।

নারায়ণবাবু বললেন, 'বলতে হবে না। আমিও চিনি।'

আশ্চর্য হয়ে বললাম, 'কি করে?'

নারায়ণবাবু দুষ্টু হাসি হেসে আমার সম্পর্কে কয়েকটি তথ্য—লেখা ও চাকরি সংক্রান্ত—বলে গেলেন।

'জানলেন কি করে?'

নারায়ণবাবু এবার জোরে হেসে উঠলেন: 'ম্যাজিক মশাই, ম্যাজিক।'

পরে জেনেছি, এ ম্যাজিক শুধু এই দীন পড়শী সম্পর্কেই নয়, অনেকের সম্পর্কেই ছিল। বহুর খবর তিনি রাখতেন। বিশেষত সাহিত্যিক ও শিক্ষকদের খবর ছিল তাঁর নখাগ্রে।

সূচনা থেকেই 'বিংশ শতাব্দী' পত্রিকার সঙ্গে আমার যোগ ছিল। এই কাগজে প্রতি বছরের বিশেষ নাট্য-সংখ্যাগুলি আমি সম্পাদনা করতাম। অন্যান্য সংখ্যাতেও বিশেষ সহযোগিতা থাকত। স্বনামে-বেনামে নানা লেখাও আমার থাকত। গোড়া থেকেই নারায়ণবাবুর সঙ্গে এই কাগজের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।

এই সম্পর্ক প্রধানত সম্পাদকই রক্ষা করতেন, কিন্তু পড়শী হিসেবে কোনো কোনো সময় সংযোগরক্ষাকারী ছিলাম আমি। 'বিংশ শতাব্দী'-তে স্বনামে ও বেনামে অনেক লেখা বেরিয়েছে নারায়ণবাবুর। বেনামী লেখাগুলি স্বতন্ত্র একটা প্রবন্ধের উপজীব্য হতে পারে। সুতরাং এ প্রসঙ্গটি আপাতত বাদ রাখছি। পরে অন্য কোনো সময় বিস্তৃত করে লেখা যাবে।

এর পরে 'প্রবন্ধ পত্রিকা' বের হয়। ওঁর কাছে গিয়ে পরিকল্পনাটি বললাম।

উনি বললেন, 'দারুণ আইডিয়া। রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা জানাবার নতুন পথ, শক্ত পথ। শুধু প্রবন্ধের একটা মাসিক! শুনি যে এখন সিনেমার-কাগজ ছাড়া আর কিছুই চলে না—আপনার সাহস আছে মশাই। চলবে?'

'চালাতে পারলে চলবে। যত কমই হোক সীরিয়াস পাঠক বাঙলা দেশে আছে। বরং তাদের উপযুক্ত কাগজ নেই। আমাদের সাহায্য পেলে চলবে।'

'বলুন কী সাহায্য চান। এ রকম একটা উদ্যোগে সব রকম সাহায্য দিতে রাজী।'

'টাকা চাই না।'

হেসে উঠলেন: 'খুব বাঁচিয়েছেন। "সব রকম সাহায্য" বলেই ভয় পেয়েছিলাম।'

'প্রতি সংখ্যা একটি করে আপনাকে দিয়ে যাব। গ্রহণ করবেন। কিন্তু গ্রাহক হতে হবে না।'

'বেশ, বেশ, এ পর্যন্ত বেশ ভালই বোধ হচ্ছে।'

'লেখা চাই।'

'নিশ্চয়ই। এ কাগজে লেখা আমার কর্তব্য। তাছাড়া, প্রবন্ধের অনেক বিষয় মাথায় ঘোরে, সেগুলো সময় ও তাগাদার অভাবে, লেখা হয় না। আপনার তাগাদায় এবার সেগুলো করা যাবে।'

'প্রথম সংখ্যাতেই আপনার লেখা চাই।'

'এত তাড়াতাড়ি! হাতেও কাজ রয়েছে, আর প্রবন্ধ তো তাড়াতাড়ি লেখা যায় না।'

'আচ্ছা, তাহলে দ্বিতীয় সংখ্যা।'

'ঠিক আছে।'

'কিসের ওপর লিখবেন ভাবছেন?'

'কমলাকান্তের দপ্তর সম্পর্কে কতগুলো চিন্তা অনেক দিন মাথায় আছে।

একটু লম্বা হবে। "ছোট এ তরী" বলে ফেলে দেবেন না তো?'

'আপনার ফসলটা অন্তত নেব। লম্বা লেখা তো চাই। তাহলে অনেকের কাছে ঘোরার দায় ঘোচে।'

'না, না, অন্যদের বাদ দিয়ে যেন আমারটা দেবেন না। বরং ধারাবাহিক করে দিন। তাতে আমারও সুবিধে। একবারে সবটা লেখা সম্ভব হবে না। প্রতি মাসে লিখব। এটা আসলে একটা বই হবে।'

'আমি তো বর্তে যাই, আপনার একটা ধারাবাহিক লেখা পেলে।'

প্রথম নয়। দ্বিতীয়তেও লিখে উঠতে পারলেন না। তৃতীয় সংখ্যায় (আষাঢ় ১৩৬৭) ওঁর লেখা পেলাম—কমলাকান্তের দপ্তর ও বঙ্কিমচন্দ্র। অসম্পূর্ণ রচনা। নিচে লেখা—ক্রমশঃ।

শুধু কমলাকান্তের ওপর পুরো একটা বই। আমার কাছে কথাটা শুনে অনেকে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু প্রথম কিস্তির ধরতাই দেখে ব্যাপারটা বোঝা গেল। উনি লিখলেন, 'বঙ্কিমের ধর্মলোকের পূর্ণ পরিচয় লাভ করতে গেলে 'কমলাকান্তের দপ্তর'ই প্রথম ও প্রধান পাঠ্যবস্তু। কেন বঙ্কিম এই বইখানিকেই নিজের শ্রেষ্ঠ রচনা বলে বিশ্বাস করতেন সে প্রশ্নের উত্তর এর মধ্যেই পাওয়া যাবে।'

বঙ্কিমের মর্মলোকের পূর্ণ পরিচয় উদঘাটন করতে চেয়েছিলেন নারায়ণবাবু এই লেখাটিতে। প্রথম পরিচ্ছেদে উনি কমলাকান্তর অন্তরালে বঙ্কিমের যে মনটি কাজ করছিল, তার পরিচয় দিয়েছেন। উনি লিখেছেন 'কমলাকান্তের দপ্তর তাঁর জীবনে এক অপূর্ব সন্ধিলগ্নের সৃষ্টি। অনুদ্ভাসিত উষার প্রদোষলগ্ন 'কমলাকান্ত'কে অনিশ্চিত বিষাদে ছায়াচ্ছন্ন করে রেখেছে। পরাভবের সাময়িক গ্লানিতে তাঁর কর্মোদ্যম নিশ্চল—অকাল জরার প্রব্রজ্যা, অরুণবিহীন পূর্বাকাশ কালো মেঘে আবৃত। কিন্তু এই অন্ধ আকাশেও একটি নক্ষত্র দেখা যাচ্ছে —সেটি তাঁর অকৃত্রিম মানবপ্রেম।'

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বলেছেন, ডি কুইনসির সঙ্গে কমলাকান্তের 'শত যোজন ব্যবধান।' তারপর 'আত্মমুখী রচনা'-র একটি ধারাকে দেখাচ্ছেন। মঁতেন সম্পর্কে আলোচনা শেষ করে বলছেন, 'কমলাকান্তের গোমুখী উৎস এইখানেই। কিন্তু আরো বহু ধারা-উপধারার প্রয়োজন ছিল।'

এই পংক্তিতেই প্রথম কিস্তি শেষ। এবং এটাই শেষ কিস্তি। কাজের চাপ, সময়াভাব, ভগ্নস্বাস্থ্য ইত্যাদির জন্যে তিনি এই লেখা আর শেষ করতে পারেন

নি। এই লেখাটির জন্য একটু সময় নিয়ে গুছিয়ে বসা দরকার বলে তিনি মনে করতেন, তা আর হয়ে ওঠেনি।

তিন মাস পরে প্রবন্ধ পত্রিকার শারদীয় সংখ্যা (১৩৬৭) অসম্ভব কাজের চাপের মধ্যেও আমাদের দিলেন 'শরৎচন্দ্র ও ইন্দ্রনাথ'।

পরের বছর ১৩৬৮র শারদীয়তে লিখলেন—'আর্নেষ্ট হেমিংওয়েঃ মৃত্যু-জল্পনা।' হেমিংওয়ের একটি মূল্যায়নের প্রচেষ্টা এই প্রবন্ধটি। ঠিক তার পরের সংখ্যাতেই অগ্রহায়ণ, (১৩৬৮) 'নতুন গল্পের কথা।' এটি 'সমীপেষু' থেকে পুন-র্মুদিত। তখন 'নতুন রীতির' আন্দোলন চলছিল। এ-সম্পর্কে 'বেশ উত্তেজিত তর্ক-বিতর্কও চোখে পড়ল "পরিচয়ে"-এর পাতায়।' এবং এই রীতি প্রসঙ্গে নারায়ণবাবুর মত পাচ্ছি প্রবন্ধটিতে।

১৩৬৯-এর নববর্ষ সংখ্যায় (বৈশাখ) বেরোয় 'অমরেন্দ্র ঘোষ'। এটিও 'সমীপেষু' থেকে নেওয়া; অবহেলিত সাহিত্যিক অমরেন্দ্রবাবুর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা আছে, আছে তাঁর সাহিত্যবিচার। আর আছে পরাভূত অমরেন্দ্রের জন্য মর্মবেদনা: 'অমরেন্দ্র ঘোষ অসমাপ্ত রয়ে গেলেন। কিন্তু সেজন্যে তিনি দায়ী নন। আমরা তাঁকে অন্ন জোগাতে পারিনি, তাঁর ব্যাধির ওষুধ দিতে পারিনি, তাঁর উপবাসী শিশুর কান্না শুনতে পাইনি। তাঁর অপূর্ণতার অপরাধ আমাদেরই। তবুও হয়তো তাঁর উপায় ছিল। যৌনপ্রবৃত্তিকে সুড়সুড়ি দিয়ে; ডিটেকটিভ-মার্কা সিচুয়েশন তৈরি করে, বস্তুবৈচিত্র্যের চমকে তিনি বেস্টসেলারদের দলে মিশতে পারতেন। সাহিত্য নাই হোক, অন্নচিন্তা তাঁর থাকত না। কিন্তু তাতে অমরেন্দ্র ঘোষের প্রবৃত্তি ছিল না। জীবননিষ্ঠ জাতসাহিত্যিকের দায়িত্ব মৃত্যুর পূর্বলক্ষণ পর্যন্ত তিনি পালন করে গেছেন। পরাভূত হয়েছেন, কিন্তু সে পরাভব মহত্ত্বে সমুজ্জ্বল।'

১৩৬৯এর শারদীয় সংখ্যায় বেরোয় 'একটি শব্দের জন্য'। 'কবিতায় হোক, গদ্যে হোক—এক একটি শব্দের কী অসাধারণ ভূমিকা। যথাকালে, যথা-স্থানে তার প্রয়োগ মূল বক্তব্যকে প্রকাশিত করে, গভীর করে, তুচ্ছকে অনন্য করে তোলে।' এই শব্দের অনুসন্ধান কোন লেখকের কী রকম তার ইতিবৃত্ত এই প্রবন্ধটি।

১৩৭০এর শারদীয়তে রয়েছে 'শারদীয় সংখ্যা'। 'মুশকিল এই যে শারদ সাহিত্য ছাড়া লেখকেরও সুযোগ কম।...কিন্তু কুড়িটি গল্প এবং তিনখানি উপন্যাস দেড় মাসের মধ্যে দাঁড় করালে তার ফল কী হয়?' এই প্রশ্নটির মুখো-

মুখি দাঁড়াবার চেষ্টা এই প্রবন্ধে।

পরের সংখ্যাতেই (কার্তিক, ১৩৭০) বেরিয়েছে 'সাহিত্য বিচারে মোহিতলাল'। এটি 'উত্তরকাল' থেকে পুনর্মুদ্রিত। মোহিতলালের সাহিত্যবিচারের মূল সূত্রগুলি দেখাতে চেয়েছেন এই প্রবন্ধে।

একদিন বললেন, 'রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের ওপর একটা বক্তৃতা করেছি। ওটাকে আপনার প্রবন্ধ পত্রিকায় ঠাঁই দেবেন ?'

'পেলে তো বর্তে যাই।'

'আসছে সপ্তাহে আসুন, আপনার বর্তে যাওয়ার ব্যবস্থা করব।'

পরের সপ্তাহে যেতেই হাত উলটিয়ে বললেন, 'ও লেখাটা কাউকে দেওয়ার নাকি আমার অধিকার নেই।'

'কেন ?'

'ওরা বক্তৃতার জন্যে কয়েকটা টাকা দিয়েছিল। সেই সুবাদে রবীন্দ্রভারতী পত্রিকায় ওটি ছাপবার অধিকারও নাকি ওদের ওপর বর্তেছে।'

'কথামালা' পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব গোড়ার দিকে আমার ছিল। শুধু গল্প উপন্যাসের কাগজ, বলতে গেলে নারায়ণবাবুর স্ব-ক্ষেত্র। এখানেও লেখা দেবেন বলেছেন, কিন্তু কাজের চাপে দিতে পারেননি। কিন্তু নিয়মিত পড়তেন ও পরামর্শ দিতেন। বাঙালি লেখকেরা সাধারণত নিজের লেখা ছাড়া আর কারো লেখা পড়ে সময় নষ্ট করেন না, এ-তথ্য সর্বজনবিদিত। নারায়ণবাবু এঁদের মধ্যে উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। 'কথামালা'র অতিনবীন লেখকদের লেখাও পড়তেন। এ-অভিজ্ঞতা বহু তরুণ লেখকের আছে। নারায়ণবাবু তাঁদের লেখা পড়েছেন, আলোচনা করেছেন, উৎসাহ দিয়েছেন, নিজে থেকে প্রকাশকের কাছে নিয়ে বই প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন,—এ রকম ঘটনা বহু রয়েছে।

কথাশিল্পী ছিলেন তিনি, মুখের কথাতেও। দুর্ভাগ্য বাঙলাদেশের, সে কথাগুলোকে কেউ ধরে রাখেনি। লিখতে লিখতে অনুভব করছি, কিছুতেই এ লেখায় তাঁর চেহারাটা খুলছে না, কারণ তাঁর মুখের ঠিক-ঠিক কথাগুলো অনেক আমি হারিয়ে ফেলেছি। জিভের ডগায় তাঁর যেন দীপ্ত সুন্দর কথাগুলো সাজানো থাকত। মুখ খুললেই সজীব সরস সহাস্য বাণীর মালা।

ভাষা শেখার আগ্রহ হয়েছিল শেষ দিকে। ফরাসী ভাষা ভালোই জানতেন। অন্য দু-একটি ভাষার চর্চা ছিল। ঐ কাজের চাপের মধ্যে এত করতেন যে কখন! অসাধারণ পরিশ্রমী ছিলেন মানুষটি। তাঁর সহকর্মীদের মুখে শুনেছি

বিরাট ক্লাস নিয়ে সবাই যখন ক্লান্ত, নারায়ণবাবু তখন বাড়তি ক্লাস নিয়ে ব্যস্ত।

একদিন কথাপ্রসঙ্গে উনি পূর্ববঙ্গের স্মৃতিতে ডুবে গেলেন। হঠাৎ এক সময় যেন জেগে উঠে বললেন, 'আপনাকে বলে আর কী হবে। আপনি ঠিক বুঝবেন না। আপনি তো পশ্চিমবঙ্গের লোক। আপনি তো সে-সব দেখেন নি।'

'সে কি! আপনি যে আমার পরিচয়টা ভুলিয়ে দেবেন।'

'কেন?'

'আমার বাড়ি পূর্ববঙ্গে।'

'কোথায়?'

'ফরিদপুর।'

'ফরিদপুর! তাহলে তো আপনি আমার দ্যাশের লোক।'

'আপনার বাড়ি তো ফরিদপুর নয়।'

'কিন্তু ফরিদপুরে কয়েকটি খুব আনন্দের দিন কেটেছে আমার। আমি আর নরেন (মিত্র) তো ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজে পড়তাম।'

'হ্যাঁ, নরেনবাবুর গ্রাম আমার গ্রাম থেকে খুব দূর নয়। ওঁর 'রস'-এই অবশ্য ফরিদপুর-ফরিদপুর গন্ধ পেয়েছি।'

উনি তখন ফরিদপুর ও রাজেন্দ্র কলেজের নানা স্মৃতি বলতে লাগলেন। আর আমার চোখের সামনে ভাসতে লাগল ফরিদপুরের, আমার সহরের নানা প্রিয় চিত্র। এখন উভয়েরই বিচ্ছেদের বেদনায় যা প্রিয়তর।

ওঁকে একদিন দারুন লজ্জা পেতে দেখেছি। উনি ডি-ফিল হলেন। দেখা হতেই অভিনন্দন জানালাম। উনি ভীষণ লজ্জা পেয়ে বললেন, 'ও কথা থাক। এই বয়সে একটা যাচ্ছেতাই কাণ্ড। ওটা থাক।'

ডি-ফিল পেয়ে এত লজ্জিত হতে আমি আর কাউকে দেখিনি।

উনি হেড একজামিনার। আমি ওঁর অধীনস্থ পরীক্ষক। আমাকে প্রায় অনুনয়ের স্বরে বললেন, 'আমায় একটু সাহায্য করবেন?'

'কী?'

'আমার সঙ্গে স্ক্রুটিনি করুন। "না" বলবেন না। একটু নির্ভরযোগ্য লোক চাই। আর আপনার বাড়িটা খুব কাছে ওটা আমার সুবিধে। যখন তখন আপনাকে পাব।'

'কিন্তু আমি তো ও-কর্ম কোনোদিন করিনি, জানি না।'

'ও কিছু না। একদিনে শিখে নেবেন।'

স্ক্রুটিনির জন্য পরীক্ষকরা প্রধান পরীক্ষকের কাছে উমেদারি করে। আর এখানে প্রধান পরীক্ষক বিনীতভাবে পরীক্ষককে অনুরোধ করছেন! এই বিনীত ভাষণ ছিল তাঁর চরিত্রের ভূষণ। একবার ডক্টর সুকুমার সেন আমার কাছে অন্য এক প্রখ্যাত অধ্যাপকের সঙ্গে প্রতিতুলনায় নারায়ণবাবুকে বর্ণনা করেছিলেন এইভাবে: 'অমুক আর নারায়ণ দুজনেই খুব বিনয়ী কিন্তু তফাৎ আছে। অমুকের বিনয় দেখা মাত্রই বোঝা যায় যে ওটা বানানো। কিন্তু নারায়ণের বিনয় ওর স্বভাবের অঙ্গ।'

পর পর দু-বছর নারায়ণবাবুর কাছে স্ক্রুটিনির কাজ করেছি। এই সূত্রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওঁর বাড়িতে কাটিয়েছি। কাজে এবং অকাজে। এই সময় তাঁকে আরো কাছ থেকে দেখার সুযোগ হলো।

আতিথেয়তার পরিমাণ এমন ছিল যে কাজে এসেছি কি নিমন্ত্রণে এসেছি বুঝতে পারতাম না। আশা দেবী নিজে ভোজ্যবস্তুর তদারক করতেন। বহুদিন নিজে রেঁধেও খাইয়েছেন। ভোজ্য এবং আড্ডার প্রাচুর্যে কাজের বিরক্তিটা গায়ে লাগত না।

প্রধান পরীক্ষকের অন্তত শতকরা পাঁচ ভাগ খাতা দেখার কথা। অনেকে তা দেখেন না, এবং যা দেখেন তা স্ক্রুটিনিয়ারের ব-কলম। কিন্তু এখানেও নারায়ণবাবুর সেই নিয়মনিষ্ঠ পরিশ্রমী মূর্তি। বিকেলে বা কোনো কোনো দিন দুপুরে গিয়ে আমরা কাজে বসে যেতাম। উনি কলেজ-ফেরত আমাদের ঘরে ঢুকতেন।

'কতক্ষণ এসেছেন? অমুক আসেননি? চা-টা খেয়েছেন? ওরে রাম, শীগগির চা দে।'

গৃহভৃত্য রাম ছুটে এল। চা খেতে খেতে খানিকটা গল্প হলো। তারপরে উনি বলতেন, 'আচ্ছা আপনারা কাজ করুন। আমি একটু ওপরে যাচ্ছি। দু-একটা লেখা-পত্তরের কাজ আছে। ঠিক আটটায় নামব।'

ঠিক আটটাতে নেমে আবার: 'কই রে রাম আমাদের একটু চা দিবি।'

একটি সিগারেট ধরিয়ে একটা তাকিয়া বুকের তলায় রেখে ঝুঁকে (এটাই ছিল ওঁর লেখাপড়া করতে বসার প্রিয় ভঙ্গি) খাতা নিয়ে বসে গেলেন। একটানা কাজ। মাঝে মাঝে সিগারেট। আর কোনো কোনো খাতা থেকে দু-একটা মজাদার লেখা দু-এক সময় পড়ে শোনাচ্ছেন। সরস মন্তব্যও দুটো-একটা করে যাচ্ছেন। পাশে এসে 'মিউ' ধ্বনি করল পোষা বেড়ালটি। যতদূর মনে পড়ছে,

বিড়ালটির নাম দিয়েছিলেন উনি 'কেষ্ট'। কেষ্টর অনেক গুণবর্ণনাও আমাদের কাছে করেছেন। 'মিউ'র উত্তরে নারায়ণবাবু বললেন, 'ঐখানে চুপ করে বোসো। এখন কাজ করছি।'

কেষ্ট পরম অনুগতের মতো গুটিসুটি হয়ে বসল এবং একটু পরেই চোখ বুজে ধ্যানস্থ হয়ে গেল।

নারায়ণবাবু মাঝে মাঝে বিরক্ত হচ্ছেন। পরীক্ষার্থীদের ওপর নয়। ছাত্রদের স্বার্থ রক্ষায় সর্বদাই খুব মনোযোগী ছিলেন। বিরক্ত পরীক্ষকদের ওপর। যাঁরা বেশি কড়া, অথবা যাঁরা এলোমেলো অসম মানদণ্ডে খাতা দেখেন, তাঁদের ওপর বিরক্ত। এই ধরনের বহু পরীক্ষককে বহুবার উনি ডেকে পাঠিয়ে আবার সংশোধন করিয়েছেন খাতা। কেউ কেউ তাতে অসন্তুষ্টও হতেন। কিন্তু নারায়ণবাবু ছাত্রদের ক্ষতিটা হতে দিতেন না। সহৃদয় ও বিবেকসম্পন্ন প্রধান পরীক্ষক ছিলেন তিনি।

একবার বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রবীণ প্রভাবশালী অধ্যাপক একটি রোল নম্বর পাঠালেন, তাকে যেন পাশ করিয়ে দেওয়া হয়।

নারায়ণবাবু ব্যাজার মুখে বললেন, 'খাতাখানা বার করুন তো।'

বার করলাম।

'খাতাটা একবার দেখুন তো।'

দেখলাম।

'পাশ করানো যায়?'

'না। পরীক্ষক এ-খাতা খুবই ভালোভাবে দেখেছেন। যথেষ্ট নম্বর দিয়েছেন। আর দেওয়া যায় না। পঁচিশ দেওয়া হয়েছে।'

'মহা মুস্কিল। কী যে করা যায়!'

নিজেও খাতাটা নেড়েচেড়ে একটু দেখলেন।

খানিক বাদে বললেন, 'পঁচিশ পর্যন্ত যত খাতা আছে সব বার করুন। ওরাই বা কী দোষ করেছে! ওদের মুরুব্বি নেই, এই তো! আমিই ওদের মুরুব্বি। পঁচিশ পর্যন্ত সব পাশ করাব।'

বলে বালিশে বুক দিয়ে সব পঁচিশকে পাশ করাতে বসে গেলেন। অনেক রাত পর্যন্ত চলল সেই কাজ। বললেন, 'পাপ যখন করতেই হবে, অন্তত কিছু প্রায়শ্চিত্ত করি।'

স্ক্রুটিনিয়ারদের উপার্জন যাতে সকলের সমান হয়, তার দিকে বিশেষ দৃষ্টি

ছিল। সেইভাবেই তিনি কাজ ভাগ করে দিতেন। একবার এই সমবণ্টনের চরম করে অনেকের বিরাগভাজন হয়েছিলেন তিনি। একজন স্ক্রুটিনিয়ার অসুস্থতার জন্য কম কাজ করতে পেরেছিলেন। তাঁর কাজ অন্যরা করে দিয়ে ছিল। কিন্তু বিল করবার সময় নারায়ণবাবু বললেন, 'সবার সমান করে দি। ও বেচারার অসুখ হয়েছিল, ওর বড়ই কম কাজ হয়েছে। কিন্তু অসুখে ওর খরচও হয়েছে।'

সবাই আমরা সম্মতি দিলাম, কেউ কেউ অবশ্য বিরস মুখে।

দূরের স্ক্রুটিনিয়াররা নটা-সাড়ে-নটা থেকে একে একে বিদায় নিতেন। পড়ে থাকতাম আমি। নারায়ণবাবু বলতেন, 'আরে বসুন, এই তো এখানে আপনার বাড়ি। ওরে রাম, আমাদের দু-কাপ চা দিবি বাবা? বলুন, খবর-টবর বলুন। অমুকের ঐ লেখাটা পড়লেন? কেমন লাগল? তমুক কিন্তু আজকাল তেমন ভাল লিখতে পারছে না, অথচ সুরু করেছিল চমৎকার।'

চা এল। উনি সিগারেট ধরালেন। খাতাগুলো সরিয়ে রাখলেন। কেষ্ট একবার চোখটা অর্ধেকটা খুলে ব্যাপার-স্যাপার দেখে ডিনারের অনেক দেরী দেখে হতাশ দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার চোখ বুজল। ওপরে আশাদেবী ও বাবলুর সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। রামও বোধহয় নৈশ চা দিয়ে একটু গড়াতে গেল। নারায়ণবাবু বললেন, 'এতক্ষণ তো কাজ হলো। এখন একটু গল্প করা যাক। বসুন।'

আমি বললাম, 'আপনার বোধহয় বিশ্রাম দরকার এখন।'

'না, না, বসুন। এই তো বিশ্রাম। আড্ডার মত বিশ্রাম আর কিছু আছে নাকি!'

পরদিন সকালেই হয়তো আবার টেলিফোন এল: 'ভাই, একবার আসতে পারেন? কাল রাত্তিরে আড্ডার মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে করতে একটা কাজ বাকি থেকে গিয়েছে।'

কিন্তু রাত্তিরে ঐ আড্ডাগুলো খুবই জমত। নানা বিষয়ের নানা কথা এলো-মেলোভাবে আসত, যেত। নানা লোকের ঘটত আনাগোনা—কাহিনীতে, ছায়ায়, স্মৃতিতে। দুএকটি লোকের কথা উল্লেখ করি।

মাঝে মাঝে আসতেন একজন নামকরা ছবি-আঁকিয়ে। তাঁর আসার সময় রাত সাড়ে দশটা। তিনি একটু পানরসিক। পান-পর্ব সমাধা করে নারায়ণবাবুর সঙ্গে গল্প করতে আসতেন। মধ্যরাত পর্যন্ত থেকে তারপর উঠতেন।

আমি বলতাম, 'অত প্রশ্রয় দেন কেন ওঁকে। অত রাত পর্যন্ত থাকেন, আপনার কাজের ক্ষতি, শরীরের ক্ষতি।'

ওঁর সহৃদয়তার সুযোগ নিয়ে অনেকে ওঁর বাড়িতে এসে উপদ্রব করত। তাই আমার স্বর হয়তো কিছু উগ্র হয়ে থাকবে।

উনি তাড়াতাড়ি বললেন, 'না, না, অমন করে বলবেন না। ওর মস্ত ক্ষমতা, রীতিমত প্রতিভা। তাছাড়া ওর আধা-মাতাল আধা-শিল্পী কথা শুনতে আমার বেশ ভালই লাগে।'

'আমি ওঁকে বাড়ি থেকে বার করে দিতে বলছি না। একটু সীমার মধ্যে রাখতে পারেন ওঁকে।'

'অসম্ভব। ও একেবারে অসীম। ও তো আমাকেই আমার বাড়ি থেকে একদিন বার করে দিয়েছিল প্রায়।'

'কী রকম ?

'ও, সে-গল্প আপনাকে বলা হয়নি বুঝি।'

ঘটনাটা বললেন নারায়ণবাবু। শিল্পী ভদ্রলোক একদিন যথারীতি রাত সাড়ে দশটার পরে এসেছেন, পান-টান করেই এসেছেন। নারায়ণবাবুর সঙ্গে গল্প হচ্ছে। হচ্ছে তো হচ্ছেই। অনেক রাত হয়ে গেছে। উভয়েই ক্লান্ত। দুজনেরই ঘুম পেয়ে গেছে। অতিথিবৎসল নারায়ণবাবুর পক্ষে কিছু বলা সম্ভব নয়। শিল্পীরও চোখে ঘুম, কথাও আর মুখে আসছে না, ক্লান্ত, খুবই ক্লান্ত। শিল্পীর এখন নিজে থেকেই উঠে বাড়িতে গিয়ে ঘুমোনো উচিত। কিন্তু তেমন কোনোই লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। এইরকমভাবে আরো কিছুক্ষণ চলবার পর শিল্পী বললেন, 'ভাই নারায়ণবাবু, কিছু মনে করবেন না, আমার বড় ঘুম পেয়েছে, আপনি এখন বাড়ি যান, আমি এখন ঘুমোব।'

নারায়ণবাবুর তন্দ্রাচ্ছন্ন ক্ষুদ্র চক্ষু মুহূর্তে ছানাবড়ার আকার ধারণ করল।

আর একদিন এক ভদ্রলোককে খুব শিষ্টতার সঙ্গে কথাবার্তা বলে ওপরে নিয়ে গেলেন। বহুক্ষণ বাদে অত্যন্ত সম্ভ্রমের সঙ্গে তাকে বিদায় দিলেন। পরে আমায় জিজ্ঞেস করলেন, 'লোকটিকে চিনলেন ?'

'না।'

নারায়ণবাবু নামটি বললেন। সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারলাম। বিগত যুগের একজন নামজাদা অভিনেতা। মঞ্চে ও চিত্রে একাধিক নাটকে নায়কের পার্ট করেছেন। একটি বিখ্যাত রবীন্দ্র-উপন্যাসের চিত্ররূপেও নায়ক ছিলেন। কিন্তু

তখন দেখেছি তাঁর অসাধারণ ভালো স্বাস্থ্য। চওড়া কপাটের মতো বুক। উজ্জ্বল বর্ণ। নাক-চোখ চোখা বলিষ্ঠ সুপুরুষ। আর এখন হাড় বেরিয়ে বুকের খাঁচাটা প্রকট। গাল চোখ বসে গেছে। ফলে নাকটা অহেতুক দৈর্ঘ্যের অস্বস্তি ভোগ করছে। রঙটা ময়লা। জামা-কাপড় সর্বত্র দারিদ্র্যের ছাপ প্রকট হয়ে আছে। খোঁচা খোঁচা দাড়ি ছেঁড়া জুতোর ফাঁকে পা। পায়ের আঙুলের ফাঁকে ময়লা। শুধোলাম, 'এমন হলো কী করে?'

'অভিনেতার ভাগ্য। বাজার পড়ে গেছে। এখন দেখতে পান আর কোনো মঞ্চে বা চিত্রে?'

ভিক্ষুকের অবস্থা অভিনেতাটির। পূর্বপরিচয়ের সূত্রে মাঝেমাঝে নারায়ণবাবুর বাড়িতে আসেন। ভিক্ষাপ্রার্থনার সে এক করুণ রূপ। নারায়ণবাবু ওঁকে কিছু চাইতে দেন না। চাওয়ার আগেই বলেন 'আজকে কিন্তু আপনি এখানে খেয়ে যাবেন।' তারপরে ওঁর যাতায়াতের জন্য খুবই সৌজন্যের সঙ্গে 'ট্যাক্সি-ভাড়া' দিয়ে দেন। (আমার অনুমান, এই অভিনেতা ও ঐ শিল্পীর আবছা ছাপ তাঁর, একটি গল্পে ও একটি উপন্যাসে আছে।)

এই রকম অকৃপণ দাক্ষিণ্যের ইতিহাস আরো আছে, বিশেষত ছাত্রদের ক্ষেত্রে। বহু ছাত্র তাঁর কাছে বহু রকমের উপকার পেয়েছে। সে-উপকার সম্পর্কে সর্বদাই বিনম্র নীরবতা পালন করতেন। শুধু একবার একজন ছাত্র (বর্তমানে অধ্যাপক) সম্পর্কে ক্ষোভ ও বেদনা আমার কাছে প্রকাশ করেছিলেন। ছাত্রটি গ্রন্থ, অর্থ, ও অন্নের সাহায্য পেয়েছিল নারায়ণবাবুর কাছে, এবং পরে মিথ্যেকথা বলে ওঁকে ঠকিয়েছিল।

একদিন বহুরূপী প্রযোজিত 'রক্তকরবী'র কথা উঠল। আমি এটিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রযোজনা বলে মনে করি। কিন্তু শুনলাম, নারায়ণবাবুর ভালো লাগেনি। কেন? জিজ্ঞেস করলাম। উনি অভিনয় ইত্যাদির প্রশংসা করলেন কিন্তু একটা যায়গায় ওঁর খটকা লেগেছে। আধুনিক কালের পোষাক পরিয়ে চরিত্র-গুলিকে বড় বেশি বেঁধে ফেলা হয়েছে। ওদের মুখে যখন রক্তকরবীর ঐ অসাধারণ ভাষা বলানো হয়, তখন দুটোকে মেলানো যায় না, অসামঞ্জস্যটা উৎকট হয়ে ওঠে। এটা সারাটা নাটকেই চলতে থাকে, ফলে রসবোধে হানি হয়।

কম্যুনিস্ট পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার সময় দেখেছি তাঁর যন্ত্রণাকাতর মুখ। এটা তাঁর কাছে রাজনৈতিক সঙ্কট তো ছিলই, ব্যক্তিগত সঙ্কটও ছিল।

কারণ উভয়পক্ষেই তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা ছিলেন। দু-দিকের দুই বিপরীতমুখী টানে তিনি দীর্ণ হতেন।

ওঁর বৈঠকখানার বাড়ি ঠিক রাজাবাজারের লাগোয়া। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বা উত্তেজনার সময় এ এলাকায় অশান্তির আশঙ্কা থাকে। এই সময়গুলিতে পাড়ায় যতগুলি শান্তি-উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, নারায়ণবাবু তার অগ্রণী ভূমিকায় ছিলেন। তাঁর বাড়ির লাগোয়া হিন্দু-মুসলমানের একটি মিশ্র বৃহৎ বস্তি ছিল। এইখানকার লোকেদের জন্যে এই উদ্যোগ বিশেষ জরুরী ছিল।

এইরকম অশান্তির সময় অনেক বন্ধু ওঁকে কয়েকদিনের জন্য অন্তত বিপদ-মুক্ত এলাকায় গিয়ে থাকতে বলতেন। কিন্তু উনি কোনো সময়ই তা যাননি। বলতেন, 'না, আমায় মারবে না। আমায় চেনে।'

পটলডাঙা-বৈঠকখানা পাড়াতেই তাঁর জীবনের দীর্ঘতম কাল কেটেছে। এই সূত্রে পটলডাঙা আবার নতুন করে সাহিত্যের পাতায় ফিরে এল। নারায়ণ-বাবুর শিশুসাহিত্যে এ-নামটিকে তিনি স্থায়ী করে রেখে গিয়েছেন। পটল-ডাঙার নামে আমিও অনেক সময় শিশুমহলে খাতির পেয়েছি। যেই শুনেছে আমার বাড়ি পটলডাঙায়, অমনি শিশুদের প্রশ্ন, 'আচ্ছা, পটলডাঙ্গার টেনিদাকে চেনেন? সত্যি টেনিদা বলে কেউ আছে?'

ওদের হতাশ করে বলতে হয়েছে, 'না। টেনিদা পটলডাঙায় নেই। টেনিদা আসলে ছিল নারায়ণবাবুর সৃষ্টিশীল কল্পলোকে। পটলডাঙার মাটিতে উনি তাকে লালন করেছিলেন।'

অনেক সময় তিনি নিজেকে 'পটলডাঙার লোক,' 'উত্তর কলকাতার লোক' ইত্যাদি বলে পরিচয় দিতেন, গর্বের সঙ্গেই বলতেন। একদিন সেই নারায়ণ-বাবু উত্তর কলকাতার বাস তোলবার সিদ্ধান্ত নিলেন। জিজ্ঞেস করলাম, 'কী, আপনি নাকি আমাদের ছেড়ে যাচ্ছেন?'

– 'আপনাদের ছেড়ে যাব কোথায়? তবে বাড়িটা ছাড়ছি। সামনে ঐ কর্পোরেশনের গোখানায় রাত চারটে থেকে ঘড়ঘড় আওয়াজ শুরু হয়। রাতে শুই দেরীতে, ভোররাতে উঠে পড়তে হয়। ঘুম হয় না।'

এ-ছাড়াও অন্য অসুবিধে ছিল, আমি আগেই শুনেছিলাম। সে-সব কথাও বললেন।

বললেন, 'দক্ষিণে যাচ্ছি বলে আপনারা যেন আমায় ছাড়বেন না। যাবেন ও বাড়িতে এখানকার মতোই। আপনার তো চাকরি করতে যাওয়ার পথেই।'

'হ্যাঁ, নিশ্চই যাব।'

কিন্তু জীবনের বহু প্রতিশ্রুতির মতো এটাও রক্ষা করা হয়নি। যাতায়াতের পথে অনেক বার মনে হয়েছে, নামি। কিন্তু নামা হয়নি। দেখা হলে বলেছেন, 'বাড়িতে আসুন একদিন।' আশাদেবীর সঙ্গে দেখা হয়েছে, উনিও বলেছেন, 'নতুন বাড়িতে এলেন না?'

'হ্যাঁ, শীগগিরই যাব।'

সেই গেলাম। কিন্তু বড় দেরীতে। ওঁর মৃত্যুসংবাদ পেলাম পটলডাঙারই এক প্রতিবেশীর কাছে। সন্ধ্যেবেলায় বাড়ি থেকে বেরোচ্ছি, ভদ্রলোক বললেন, 'শুনেছেন, নারায়ণবাবু মারা গেছেন—আমাদের নারায়ণবাবু—সাহিত্যিক নারায়ণবাবু। এইমাত্র রেডিয়োতে বলল।'

পটলডাঙার লোক ওঁকে, নিজেদের লোকই মনে করত, 'আমাদের নারায়ণবাবু।'

পরদিন গেলাম সেই দক্ষিণের বাড়িতে। বহু লোক জড় হয়েছেন। ছাত্র, ছাত্রী, অধ্যাপক, সাহিত্যিক। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার পর লরিতে ফুল দিয়ে সাজিয়ে ওঁকে নিয়ে আসা হলো শেষবারের মতো।

তারপরে আবার যাত্রা, কেওড়াতলার দিকে। আমরাও শোকযাত্রার সঙ্গে গেলাম শ্মশানে।

সেখানে আগে থেকেই অনেকে অপেক্ষা করছিলেন।

এতটা লিখেও মনে হচ্ছে, আসলে লোকটাকে ভালো করে ধরা গেল না। জীবনের স্রোতটা বয়ে চলে গেলে শুকনো নুড়ির ওপর বসে স্মৃতির আঁজলায় কতটুকুই বা ধরা যায়।

স্মৃতিকথার খসড়া

দেবেশ রায়

প্রায় পঞ্চান্ন চলছে এমন একজন প্রিয় কবি স্মৃতিকথা লিখতে স্বরু করবেন শুনে এমন হেসেছিলাম—"আপনি সত্যি বুড়ো হলেন!" যদিও জানতাম তাঁর স্মৃতি-কথা পড়তে আমাদের খুব ভালো লাগবে। তখন কি ভেবেছি আমাকেই স্মৃতি-কথার পালা স্বরু করতে হবে। তখন কি ভেবেছি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় আমার স্মৃতির প্রথম পরিচ্ছেদ হয়ে উঠবেন, এতো তাড়াতাড়ি, আমার এই বয়সে, নারায়ণবাবুর এই বয়সে।

"নারায়ণবাবু" কথাটা লিখবার আগে একটু ভেবেছি। আমি তাঁকে কখনও ডাকিনি। কী বলে ডাকবো সে নিয়েই গোলমাল কাটলো না। আমার ছোটবেলায়, ইস্কুলে তখনো ভর্তি হইনি বা পাড়ার পাঠশালায় মাত্র যাতায়াত করি, তাঁর ভাইঝি আমার খেলার সঙ্গিনী ছিল। মিনু। মিনুর দাদা, সাধন-দা ছিলেন আমার দাদার সহপাঠী ও বন্ধু। তখন তাঁকে বলতাম, আড়ালে, 'মিনুর কাকা' না 'সাধন-দার কাকা'। বি-এ পাশ করা পর্যন্ত তাঁকে আমাদের শহরে পূজোর ছুটিতে নিয়মিত দেখতাম। রাস্তাঘাটে দেখা হোলে তিনি একটু পরিচিত হাসি মুখে লাগিয়ে রাখতেন। আমার ধারণা তাঁর দিকে আমার চাউনি দেখে বুঝি আমাকে চেনা ভাবতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় দেখি উনি আমাকে চিনে রেখেছেন। মানে, ভোলেননি। পরে বুঝেছি ভোলাটা ওঁর স্বভাবে ছিল না, মনে রেখে দেওয়াই ছিল ওঁর ধাত। তখন রীতি অনুযায়ী তাঁকে ডাকার কথা "স্যার"। তাও পারিনি। বোধহয় তাঁকে শুধু মাস্টামশাই আমি ভাবতে চাইতাম না। আমাদের গল্প তখন দু-চারটে বেরয়। কিন্তু উনি কথাবার্তায় আমাদের এমন লেখক বানিয়ে দিতেন, বোধহয় তাঁর সঙ্গে লেখকের সম্পর্কটাই আমার আকাঙ্ক্ষিত ছিল। সে যাই হোক। এতগুলো বছর তাঁর সঙ্গে চেনাজানা সত্ত্বেও, তাঁকে ডাকা হলো না—কি নামে ডাকবো সেটা ঠিক করার আগে তিনি ডাকে সাড়া দেবার বাইরে চলে গেলেন।

"মিন্নুর কাকা" বলে যাঁকে নিজেদের ভেতর বলতাম, ঐ ছেলেবেলায় তাঁকে "কাকা" বলতে অসুবিধে কি ছিল। আসলে ডাকার যে কোনো উপলক্ষই ছিল না। মিন্নুদের বাড়িটা ছিল সাবেকি তিনঘরো। সামনে একটা পোর্টিকোর মতো ঘর, তার দুপাশে দুটো। বাইরের ঘর দিয়ে বাঁদিকের ঘর দিয়ে ভেতরে যাবার দরজা। বাড়ির সামনে বেশ খানিকটা মাঠ, উত্তরমুখো, তারপর রাস্তা, তারপর একটা বড় মাঠ কোণাকুনি পেরলে আমাদের বাড়ি। ছুটোছুটির পথ হয়ে যেত বাড়ি থেকে মাঠ পেরিয়ে মিন্নুদের বাইরের ঘর, মিন্নুর কাকার ঘর দিয়ে, উঠোন দিয়ে, টিনের দরজা দিয়ে আবার মাঠ। ব্যাপারটা দাঁড়াত যেন মিন্নুর কাকাকে পাক দিয়ে আমরা দৌড়তাম। পরে জেনেছি উনি তখন 'উপনিবেশ' লিখতেন। তক্তপোশের সঙ্গে একটা টেবিল লাগানো ছিল। একদিনও আমাদের দিকে ফিরে তাকাননি। একদিনও একটা কথা বলেননি। একদিনও বকেননি। বিকেলে বেড়াতে বেরতেন। সব মনে আছে। কিন্তু তাঁর সঙ্গে কোনো কথা হয়েছে বলে মনেই পড়ছে না। যাঁকে কোনোদিন ডাকতে হয়নি, যার সঙ্গে কোনোদিন কথা বলতে হয়নি, তাঁকে এতো মনে আছে কেন। কারণ, তাঁর অনন্যমনস্কতা, আমাদের একেবারে না-দেখা।

আমার ছেলেবেলায় দেখা সেই অনন্যমনস্কতায় তিনি সবাইকে ছেড়ে চলে গেলেন। আমি যে সেই শহরটাতেই আছি। পুরনো পাড়ার সেই মিন্নুদের বাড়িটা অবিকল একরকম। মাঠটাও। আমরা যে-বাড়িটাতে ভাড়া থাকতাম সেটাও। আমার স্মৃতিতে সেখানে একটা কিছু যে ফাঁকা হয়ে গেল। এতো তাড়াতাড়ি তো আমার স্মৃতিতে ফাঁকা ধরবার কথা ছিল না।

স্কুলে, এইট-নাইনে, সবে গল্প-উপন্যাস সুরু করার বয়সে নারায়ণবাবুর লেখা ছাড়া আমাদের গতি ছিল না। আমাদের পাড়ার লেখক। আমাদের চোখে দেখা লেখক। কিন্তু কখন যেন তিনি আমারই লেখক হয়ে উঠেছিলেন। ঐ বয়সে নারায়ণবাবুর ভাষায় রোমাঞ্চ তো লাগবারই কথা, কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা একটু অন্যরকম। ঐ বয়সে নিজেদের মফঃস্বল শহরের পরিবেশকে একটু-আধটু সবে চিনতে সুরু করেছি ছুটির দুপুরের সীমাহীনতায় বা এমন-কি তখনই, তিস্তার পাড়ের বিকেলে। কনক, পুষ্পেন আর আমি ছিলাম তিনবন্ধু, তাই নিয়ে আমাদের গর্বের শেষ ছিল না, কনক আজ কোন্ দেশি ফার্মের বড় অফিসার। পুষ্পেন জলপাইগুড়িতে চাকরিজীবি। কিন্তু বন্ধু আমরা রয়েই গেছি। তার কারণ শুধু এটাই নয় যে সেই বয়সেই আমাদের বন্ধুত্বটা এতো জমাট বেঁধে

গিয়েছিল যে বাতাস গলবার পথ ছিল না। তার আসল কারণ অন্যত্র। জলপাইগুড়ির করলা নদীর লোহার ব্রিজে—৬৮র বন্যায় ভেসে গেছে—পা ঝুলিয়ে বা এখন বাঁধের মাটিতে চাপা পড়া কিং সাহেবের ঘাটে তখন আমাদের সামনে আর এক জগৎ খুলে গেছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প-উপন্যাসে জলপাইগুড়ির চেনাজানার জগৎ এক অপরূপ চেহারা নিয়ে ধরা পড়েছে। জলপাইগুড়ি শহরের পুরনো কলেজ, রেসকোর্সের মাঠ, পুলিশ লাইন, কিং সাহেবের ঘাট, লোহার ব্রিজ, হাকিমপাড়া, কাছারি—এইসব তখন নারায়ণবাবুর গল্পের পরিবেশ পরিস্থিতি। আমরা সেই গল্পগুলি পড়ে এই জায়গাগুলোকে দেখতাম। মিন্নুর কাকা যেমন কেন্দ্রে বসে থাকতেন, আমরা ছুটোছুটি করতাম, তেমনি, নারায়ণবাবু এই পথগুলোতে বেড়াতেন, বিকেলে,—তাঁর পেছু পেছু আমরাও দুপুরে-বিকেলে। তখন বুঝতে পারিনি। আজ পারি। নারায়ণবাবু যদি জলপাইগুড়ি নিয়ে গল্প না-লিখতেন, দেখতে শিখতাম কি, এই কাছের শহরটিকে।

আর একদিনের কথা। বিশ্ববিদ্যালয়ের পালাও প্রায় শেষ। এক-একদিন এক-একজনের ক্লাশ শেষ হয়ে যাচ্ছে। সে-সবের তোয়াক্কা না করে আমরা চার বন্ধু এক বন্ধুর বাড়িতে তিনদিন তিনরাতের ম্যারাথন আড্ডা দিয়ে যাচ্ছি। বেলা সাড়ে এগারোটায় খেয়াল হলো সেদিন নারায়ণবাবুর শেষ ক্লাশ। বাস ধরে, ট্রাম ধরে, ট্যাকসি পাকড়ে কোনোরকমে বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছনো গেল। ছোটগল্পের ক্লাশ। নারায়ণবাবুর আলোচ্য কী ছিল, আজ মনে নেই। মনে আছে তাঁর সেই অসামান্য ভাষায় ভবিষ্যতের ছোটগল্প নিয়ে বলছিলেন, বাঙলাভাষার ভবিষ্যতের ছোটগল্প নিয়েও।

সেটাই ছিল আমাদের ছাত্রজীবনের শেষ ক্লাশ।

কে জানতো সেটাই হবে আমার স্মৃতিকথার প্রথম খসড়া।

পুস্তক পরিচয়

সামাজিক চুক্তি, জাঁ জাক রুশো, অনুবাদ—ননীমাধব চৌধুরী। সাহিত্য অকাদেমী, মূল্য ছয় টাকা

প্রচলিত উৎপাদনব্যবস্থার মধ্যে যখন নতুন উৎপাদনব্যবস্থার অঙ্কুর মাথা তুলতে শুরু করে, উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটতে থাকে, তখন পুরাতন সমাজে ধরে ভাঙন আর তখনই মানুষের ভাবজগতে জাগে নতুন চিন্তা, নতুন ভাবনা। মনীষী ও বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের নতুন চিন্তা-ভাবনার বন্যা বহিয়ে দেন পুরাতন সমাজের চিন্তা-ভাবনার পঙ্কিল জলায়, মানুষের মনে জাগিয়ে তোলেন নতুন ভাবাদর্শ। নতুন ভাবাদর্শে উদ্দীপ্ত মানুষ অচলায়তন চূর্ণ করে গড়ে তোলে নতুন সমাজ।

ইয়োরোপে সামন্ততান্ত্রিক সমাজে প্রথম ভাঙন ধরে ইংলণ্ডে। নানা কারণে ইংলণ্ডেই প্রথম বুর্জোয়া বা মধ্যশ্রেণী প্রবল হয়ে ওঠে। অভিজাত সামন্তবর্গ এবং তাদের শিরোমণি রাজার সঙ্গে উদীয়মান ধনিকশ্রেণীর প্রচণ্ড সংঘর্ষ শুরু হয়। ক্রমওয়েলের নেতৃত্বে বিপ্লব, রাজা চার্লসের মৃত্যুদণ্ড এবং শেষ পর্যন্ত অভিজাত সামন্তশ্রেণী ও ধনিকশ্রেণীর মধ্যে আপসের মধ্যে দিয়ে এই সংঘর্ষের পরিসমাপ্তি ঘটে। ধনিকশ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতার অংশীদার হয়। ইংলণ্ডে যে-বিপ্লব ঘটেছিল তার ফলে ধনিকশ্রেণী ক্ষমতা লাভ করলেও সামন্ততন্ত্র আপস করে টিকে গেল এবং কালক্রমে ধনিকশ্রেণীরই অঙ্গীভূত হলো। সামন্ততন্ত্র ইংলণ্ডে চূড়ান্ত আঘাতে চূর্ণ হয়ে গেল না, ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার প্রভাব দূরপ্রসারী হতে পারল না।

সামন্ততন্ত্রকে চূড়ান্ত আঘাত হানল ফ্রান্সের মানুষ। ফরাসী-বিপ্লব সামন্ততন্ত্রের মূলোৎপাটন করে প্রতিষ্ঠা করল বুর্জোয়া-গণতন্ত্র, মধ্যশ্রেণী ধনিক-শ্রেণী রূপে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হলো, গড়ে উঠল নতুন সমাজব্যবস্থা যা আমাদের কাছে পুঁজিবাদ নামে পরিচিত। ফরাসী-বিপ্লবের বাণী ছড়িয়ে পড়ল সারা জগতে এমনকি সামন্ততন্ত্র শাসিত ভারতবর্ষেও।

ফরাসী-বিপ্লবের প্রস্তুতিপর্ব শুরু হয়েছিল অনেকদিন আগে থেকেই। লক্ষ লক্ষ ব্যবসায়ী ও বণিকেরা বিরক্ত, রুষ্ট; কারিগর ও কৃষক নিপীড়িত ও ক্ষুব্ধ। ব্যবসা-বাণিজ্যের অবাধ প্রসার পদেপদে ব্যাহত, কৃষকদের জমির ক্ষুধা অতৃপ্ত। বাধা শুধু সামন্ততন্ত্র তাই সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ও বিক্ষোভের আগুন ধূমায়িত হতে থাকল। বুর্জোয়া বা মধ্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বুদ্ধিজীবীরা এই

অসন্তোষ ও বিক্ষোভকে ভাষা দিলেন। আবির্ভূত হলেন ফিজিওক্র্যাট অর্থনীতিবিদরা, মঁতাস্কু, ভলতেয়ার, দিদরো, রুশো, এনসাইক্লোপিডিষ্ট গোষ্ঠী। নতুন ভাবধারা ফ্রান্স তথা সারা ইয়োরোপকে প্লাবিত করল।

২

ফরাসী-বিপ্লবের মতাদর্শগত প্রস্তুতিতে যাঁরা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের তিনটি প্রধান গোষ্ঠীতে ভাগ করা যেতে পারে।

প্রথম গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হলেন, ভলতেয়ার (আসল নাম ফ্রাঁসো মারি আরুয়েত, (১৬৯৪-১৭৭৮) ও চার্লস লুই মঁতাস্কু (১৬৮৯-১৭৫৫)। ভলতেয়ারের তীব্র শ্লেষাত্মক রচনা স্বৈরতন্ত্রের মুখোস খুলে দিয়েছিল, অভিজাত শ্রেণীর বিশেষ সুবিধাভোগের বিরুদ্ধে প্রবল বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল, ক্যাথলিক চার্চের কুসংস্কার ও অন্ধ গোড়ামির বীভৎস রূপকে লোকের চোখের সামনে তুলে ধরেছিল।

মঁতাস্কু সামন্ততন্ত্রের তীব্র সমালোচনা করে শ্রেষ্ঠ সমাজব্যবস্থা হিসাবে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবী জানিয়েছিলেন। ভলতেয়ার ও মঁতাস্কু উভয়েই ছিলেন বৃহৎ ধনিক গোষ্ঠীর প্রতিনিধি। এঁরা কেউই রাজতন্ত্র উৎখাৎ করতে চাননি। এঁদের সাম্যের দাবীর অর্থ ছিল বুর্জোয়া ও অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে সাম্য। স্বাধীনতা বলতেও এঁরা বুঝেছিলেন বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বাধীনতা। কিন্তু এঁদের রচনা অচলায়তনের ভিত্তিমূল টলিয়ে দিয়েছিল।

ভলতেয়ার ও মঁতাস্কুর ভাবাদর্শতে আরও চরমপন্থী রূপ দিলেন দ্বিতীয় গোষ্ঠী। এঁদের মধ্যে ছিলেন জাঁ জাক রুশো (১৭১২-১৭৭৮) এবং এনসাইক্লোপিডিষ্টরা (দিদরো, হেলভেতিউস, হলেমবার্ত প্রভৃতি)। এঁরা ছিলেন মাঝারি ও ক্ষুদে বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি। এঁরা জনগণের সম্মতিক্রমে গঠিত ("সামাজিক চুক্তির" বলে) নির্যাতনহীন ও সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেছিলেন।

তৃতীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হলেন জাঁ মেসলিয়ের (১৬৬৪-১৭১৯) মোরেলি প্রভৃতি। এঁরা ছিলেন গরিব চাষী, শহরের দরিদ্র জনতা এবং মুটে-মজুরদের প্রতিনিধি। এঁরা বিপ্লবের মাধ্যমে শোষণ সমাজব্যবস্থা ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ করতে এবং শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। শোষণ ও গোষ্ঠীর কাল্পনিক কমিউনিজমের ভাবধারাকেই তাঁদের রচনায় প্রকাশ করেছিলেন।

ফরাসী-বিপ্লবের প্রস্তুতিপর্বে নিঃসন্দেহে প্রথমোক্ত দুটি গোষ্ঠীর দানই সর্বাধিক। এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে তিনটি নাম সবার আগে মনে পড়ে, এঁরা হলেন ভলতেয়ার. মঁতাস্কু ও রুশো।

ভলতেয়ার তাঁর অজ্ঞাতসারেই যে অচলায়তনকে টলিয়ে দিয়েছিলেন রুশো সেই অচলায়তনকে পূর্ণ করার কাজ শুরু করেন। একজন বুর্জোয়া ঐতিহাসিক লিখেছেন: "ভলতেয়ার যেখানে শেষ করলেন রুশো সেখানে যেতে আরম্ভ করলেন; শেষোক্ত জন যুক্তির অশ্বদের জুতেছিলেন, প্রথমোক্ত জন শিকল খুলে দিলেন আবেগের ব্যাঘ্রদের।"

অবশ্য সকল বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীই এই ধরনের মত পোষণ করেননি। মরলি লিখেছেন: "চিন্তা-ভাবনা যাঁরা করেছিলেন রুশোই ছিলেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে প্রত্যক্ষভাবে বিপ্লবী। আর বিপ্লব কোনো-না-কোনো সমাধানের দ্বারা যে সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে চেয়েছিল রুশোই প্রথম সাহসের সঙ্গে সেইসব সামাজিক অবস্থার প্রতি মনোনিবেশ করেছিলেন।"

যাইহোক ফরাসী-বিপ্লবের পূর্বাহ্নে রুশোর জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ কঁত্রা সোসিয়াল বা সামাজিক চুক্তি সমগ্র ইয়োরোপে যে অচিন্তনীয় রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করেছিল এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ইতিহাসের দিক থেকে রুশোর তত্ত্ব প্রমাণিত হবে না, তাঁর যুক্তিও সবক্ষেত্রে অকাট্য নয়। স্ববিরোধিতাও তাঁর লেখায় খুঁজে পাওয়া যাবে, কিন্তু সেদিন মানুষ তাঁর বক্তব্যকে পরিপূর্ণভাবেই উপলব্ধি করেছিল, সামন্ততান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্রের টিকে থাকার কোনো অধিকার নেই। মানুষ যে সামন্ততন্ত্রের শৃঙ্খলে বাঁধা রয়েছে তা চূর্ণ করে স্বাধীনতা অর্জনের অধিকার মানুষের রয়েছে। মানুষের সভ্যতার যাত্রাপথে ফরাসী বিপ্লব যেমন চিরস্মরণীয় দিকচিহ্ন হয়ে আছে, মানুষের রাষ্ট্রদর্শনের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসেও রুশোর 'সামাজিক চুক্তি' তেমনই চিরস্মরণীয় দিকচিহ্ন হয়ে রয়েছে।

৩

বাঙলাদেশে ফরাসী-বিপ্লব নিয়ে বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা কিছুটা মাতামাতি করলেও রুশো, ভলতেয়ার, দিদরো প্রমুখ ফরাসী মনীষীদের সম্পর্কে বাঙলা ভাষায় আলোচনা বিশেষ হয়নি, মূল গ্রন্থাদির অনুবাদ তো দূরের কথা। প্রমথ চৌধুরী (বীরবল) ফরাসী ভাষা জানতেন, ফরাসী সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগও

ছিল প্রগাঢ়। তাঁর রচনাতেই আমরা প্রথম ফরাসী রচনাভঙ্গির স্বাদ পেয়েছি। তিনি এবং প্রখ্যাত সমালোচক অতুল গুপ্ত উদ্যোগী হয়ে ননীমাধব চৌধুরীকে কঁত্রা সোসিয়াল মূল ফরাসী ভাষা থেকে বাঙলায় তর্জমা করতে অনুরোধ করেন। দুই বছর কঠোর পরিশ্রম করে অনুবাদক তাঁর কাজ শেষ করেন কিন্তু এই পোড়া বাঙলাদেশে তাঁর প্রকাশক জোটেনি। শেষ পর্যন্ত অনুবাদক নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করে অনুবাদটি অল্পসংখ্যায় প্রকাশ করেন।

এও অনেকদিন আগের ঘটনা। লোকে এই অনুবাদের কথা ভুলেই গিয়েছিল। ইতিমধ্যেই ১৩৩৯ সাল বা তার কিছু আগে 'যশোর খুলনা যুব সমিতি' নামে একটি সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী সংগঠনের অন্যতম নেতা ও 'প্রদীপ' সম্পাদক অতুলকৃষ্ণ ঘোষ 'ফরাসী বিপ্লবে রুশো' নামে একটি চটি বই রচনা ও প্রকাশ করেন। এরও অনেকদিন পরে ১৩৫৪ সালে নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রচিত 'রুশো' প্রকাশিত হয়। বাঙলা ভাষায় (সাময়িক পত্র-পত্রিকাদি বাদ দিলে) রুশো সংক্রান্ত রচনার ইতিহাস বোধহয় এই কয়খানি বইএর মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

এতদিন পরে ননীমাধব চৌধুরী অনূদিত দুষ্প্রাপ্য 'সামাজিক চুক্তি' সাহিত্য অকাদেমী কর্তৃক পুনঃপ্রকাশিত হওয়ায় প্রমথ চৌধুরী, সবুজ পত্র গোষ্ঠী এবং ননীমাধব চৌধুরীর কাছে আমরা ঋণমুক্ত হলাম। এর জন্য সাহিত্য অকাদেমীকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

'কঁত্রা সোসিয়ালে'র মতো দুরূহ গ্রন্থ অনুবাদ করতে ননীমাধববাবুকে কি কঠিন পরিশ্রম করতে হয়েছে তা সহজেই অনুমান করা যায়। তাঁর নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায় ছত্রে ছত্রে। সমালোচকের ফরাসী ভাষায় কোনো জ্ঞান নেই। কিন্তু ইংরেজি অনুবাদের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা গেছে অনুবাদ শুধু সঠিক নয় সাবলীলও বটে। আজকের দিনে তো কিছুটা সেকেলে ঠেকবে, কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে ননীবাবু আজকের তরুণ নন এবং রুশোর ভাষা আজকের ফরাসী ভাষা নয়।

প্রথমেই উদ্ধৃত করি সেই বিখ্যাত লাইনটির অনুবাদ: "মানুষ জন্মে স্বাধীন হইয়া, কিন্তু দেখা যায় যে সর্বত্র শৃঙ্খলে আবদ্ধ"। সমগ্র গ্রন্থটির অনুবাদ এমনই সহজ ও সাবলীলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মূল ফরাসী বাক্যাংশ বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হয়েছে, এতে ফরাসী ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মিলিয়ে দেখার সুবিধে হবে।

অনুবাদে ব্যবহৃত পরিভাষা নিয়ে আজকের দিনে মতভেদ হতে পারে,

কিন্তু অনুবাদের গুরুত্ব তাতে কিছুমাত্র লাঘব হবে না।

রুশোর সংক্ষিপ্ত জীবনী ও রচনাবলীর পরিচয় গ্রন্থের গোড়াতেই দেওয়া হয়েছে। এতে গ্রন্থের মূল্যবৃদ্ধি পেয়েছে, তবে এই অংশ আরও একটু বিস্তারিত হোলে ভালো হতো। গ্রন্থের শেষে প্রতিশব্দের একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে।

পরিচ্ছন্ন ও সুমুদ্রিত এই অনুবাদ গ্রন্থ প্রত্যেকটি গ্রন্থাগারে স্থানলাভ করবে বলে আশা করি। এ-ছাড়া আজ রাষ্ট্রদর্শন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান যখন বাঙলা ভাষাতেও শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে তখন এই সুন্দর অনুবাদ গ্রন্থটি ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্য তালিকাতেও স্থান লাভ করবে। এমন আশা করা বোধহয় অন্যায় নয়। এতে ভিন্ন ভাষার রচনাবলীর জন্য ইংরাজি ভাষার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকার প্রবণতা কমবে।

সুকুমার মিত্র

ধূর্জটিপ্রসাদ : জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী, অলোক রায়। বাগর্থ, পাঁচ টাকা

আমার তরুণবন্ধু অধ্যাপক অলোক রায় সম্প্রতি ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের একটি জীবনচরিত রচনা করেছেন। ধূর্জটিপ্রসাদ ছিলেন লখ্‌নৌ ও পরে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব তথা অর্থনীতির প্রথিতনামা অধ্যাপক, 'রিয়ালিস্ট' (গল্পের বই) ও 'অন্তঃশীলা'র (উপন্যাস) লেখক ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ সঙ্গীত-বিশেষজ্ঞ। মাত্র দুটি বইয়ের নাম করলাম, প্রকৃতপক্ষে তাঁর রচিত বাঙলা ও ইংরাজী গ্রন্থের সংখ্যা কুড়ি হবে। এ-তিনপ্রস্থ বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী হওয়া ছাড়া তিনি দেশী ও বিদেশী বিদ্বৎসমাজে, ছাত্র ও বন্ধুমহলে তাঁর বিস্তীর্ণ অধ্যয়নের জন্য খ্যাতিলাভ করেছিলেন। ইংরাজী বাঙলা নতুন বই বার হোলেই কলকাতা লখ্‌নৌ ও বম্বের প্রসিদ্ধ পুস্তক বিক্রেতারা তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিতেন। স্বয়ং দোকানে গিয়েও তিনি বই সংগ্রহ করতেন। নাটক, উপন্যাস, গল্প, জীবনী, ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, দর্শন, বিজ্ঞান, সঙ্গীত, পুরাতত্ত্ব, আর্ট ইত্যাদি বিষয়ে বই তিনি যা কিনেছিলেন ও উপহার পেয়েছিলেন তাদের সংখ্যা অন্যূন চার হাজার হবে। তাঁর প্রীতিভাজন লেখক, বন্ধু ও ছাত্র সংখ্যা অগণিত হবে। একজন ছাত্র তাঁর সম্বন্ধে লিখেছেন, "D. P.'s greatness as a teacher lay in the fact that he was not merely a teacher ; his influence on most of his students was total". প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন একজন প্রবুদ্ধকারী

শিক্ষক। তেমনি ছিলেন একজন প্রতিভাবান আলাপচারী। প্রতিদিন সকালে সন্ধ্যায় লেখক, শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীর সমাগমে তাঁর বসার ঘর ভরে উঠত।

গুটিকয়েক কারণে আমি শ্রী অলোক রায়ের বইটির সমালোচনা লিখতে সঙ্কোচ বোধ করছি। অনেককাল—ত্রিশ বছরের উপর,—আমি সমালোচনা লিখিনি। এই হেতু আমার প্রধান সঙ্কোচ। দ্বিতীয় কারণ হলো, ঠিক সহপাঠী না হোলেও ধূর্জটিপ্রসাদ ছিলেন কলেজে পাঠকালে আমার সমবর্তী ও আমার পরম শ্রদ্ধেয় অন্তরঙ্গ সুহৃদ। তাঁর অকালমৃত্যুর (১৯৬১) পরেই সন্ত আমি 'অমৃত' পত্রিকায় তাঁর বিয়োগ-প্রশস্তি লিখেছিলাম। তারপর অপেক্ষাকৃত এই অল্প-কালের মধ্যে তাঁর একটি তথ্যসমৃদ্ধ সুরচিত জীবনরচিত প্রকাশিত হলো, আমার কাছে এ এমন আনন্দের বিষয় যে তার সমালোচনা লিখতে সঙ্কোচ বোধ করছি। আধুনিক পাঠকদের কাছে বইটির পরিচয় করিয়ে দেওয়ার ভার আধুনিক কোনো সমালোচক গ্রহণ করলে ভালো হতো। তাছাড়া বইটিতে একাধিক স্থানে গ্রন্থকার আমার নাম উল্লেখ করে আমাকে সম্মানিত করেছেন।

এ-অবস্থায় ঠিক গ্রন্থের সমালোচনা নয়, আমি এখানে বইটির উল্লেখযোগ্য অংশগুলি উপস্থিত করছি।

প্রথমেই পাঠকের কাছে নিবেদন করি যে, ধূর্জটিপ্রসাদের জীবনচরিতটি আমার সবিশেষ ভালো লেগেছে। গ্রন্থকার যথোচিত যত্ন অধ্যবসায় অনুসন্ধিৎসা সহযোগে দরদ ও শ্রদ্ধা দিয়ে তথ্য সম্বলিত করে বইটি রচনা করেছেন। আমার বিশ্বাস যাঁরা বইটি পড়বেন, তাঁরা সকলেই আমার সঙ্গে একমত হবেন।

এখানে একটা কথা উল্লেখের ইচ্ছা করি। আমাদের দেশে অন্য সব রচনার তুলনায় জীবনচরিত লেখা হয় কম। মহৎ-জন, কবি, লেখক, ঐতিহাসিক, দার্শনিক, সমাজসংস্কারক, শিক্ষাব্রতী, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী, গায়ক প্রভৃতির জীবন-চরিত লেখা হয়েছে স্বল্পই। এই স্বল্পসংখ্যার মধ্যে কিছু আত্মজীবনী, কিছু বিদেশীর লেখা জীবনী। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী (১৮৯৮) বাঙলাসাহিত্যের একটি উজ্জলতম রত্ন। বিদ্যাসাগর তাঁর স্বরচিত জীবনচরিত (১৮৯১) সম্পূর্ণ না করলেও যেটুকু লিখেছেন তা একান্ত সুখপাঠ্য। কবি নবীনচন্দ্র সেন পাঁচ খণ্ড-ব্যাপী বিরাট আত্মজীবনী (১৯০৮-১৯১৪) লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম বয়সের আত্মজীবনী লিখেছেন (জীবনস্মৃতি ১৯১২); তাছাড়া তাঁর নানা ভ্রমণ-বৃত্তান্তে তাঁর জীবনের কথা ছড়িয়ে আছে। বুদ্ধজাতক রচনা করেছিলেন বুদ্ধ-শিষ্যরা। অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত এক মহাকাব্য। অশোকের জীবনীকার Vincent

smith। শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনীকার আছেন। রামমোহনের জীবনী লিখেছেন মিস ক'লেট (১৯০০) ও তার পূর্বে নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (১৮৮১)। বিদ্যাসাগরের প্রথম পূর্ণাঙ্গ জীবনী লেখেন তাঁর ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন (১৮৯১), পরে চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়(১৮৯৫) ও বিহারীলাল সরকার(১৮৯৫)। মধুসূদনের জীবনচরিত লেখেন যোগীন্দ্রনাথ বসু (১৮৯৬) ও নগেন্দ্রনাথ সোম (১৯২০)। রমেশচন্দ্রের জীবনী লিখেছেন ইংরাজীতে তাঁর জামাতা জে. এন. গুপ্ত (১৯১১)। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের আত্মজীবনী আছে ইংরাজীতে। 'বাঙলার মহাপুরুষ'— ডাক্তার পশুপতি ভট্টাচার্য রচিত শ্রীঅরবিন্দের জীবনী। বাঙলাদেশে যিনি স্কুল শিক্ষার প্রবর্তন করেন সেই মহামতি ডেভিড হেয়ারের জীবনী লিখেছেন আমাদের বন্ধু রাধারমণ মিত্র। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রচিত রবীন্দ্রজীবনী (চার খণ্ড) শুধু বাঙলাসাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ নয়—অন্য ভাষায় অনূদিত হোলে সে-ভাষারও সম্পদ হবে। কিন্তু সেই সঙ্গেই মনে হয়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ সেন, রজনীকান্ত সেন, প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় (গল্পলেখক), প্রমথ চৌধুরী, মনোমোহন ঘোষ, সরোজিনী নাইডু প্রভৃতি অনেকেরই পূর্ণাঙ্গ নির্ভরযোগ্য জীবনী এখনও লেখা হয়নি। বাঙলাসাহিত্যের এত উন্নতি ও বিবর্তন সাধিত হোলেও জীবনচরিতের স্বল্পতা নিতান্ত পরিতাপের কথা। খতিয়ে দেখলে সব মিলে সংখ্যায় কুল্লে বিশ-পঁচিশটি হবে। এ-হেন ক্ষেত্রে ধূর্জটিপ্রসাদের মতো একজন সর্বপ্রিয় শিক্ষাব্রতী, বিশ্রুত সঙ্গীতজ্ঞ ও বাঙলা কথাসাহিত্যে এক নতুন ধারার প্রবর্তকের জীবনচরিত রচনা করে বাঙালি পাঠকের কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন গ্রন্থকার।

উপন্যাস রচনায় ধূর্জটিপ্রসাদ এক নতুন আঙ্গিকের প্রবর্তক, যাকে বলা হয় চেতনাপ্রবাহ ;—চেতনা ও স্মৃতিপ্রবাহ,—Stream of consciousness। ধূর্জটিপ্রসাদ বলেছেন, এ তিনি নিয়েছেন প্রুস্ত ও উল্‌ফ থেকে। গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু ঠিক অনুকরণ করেননি, কেননা এ-চেতনা ও স্মৃতিপ্রবাহে ধূর্জটিপ্রসাদের আঙুলের ছাপ আছে।

আমি এক সময়ে বলেছিলাম বাঙলা উপন্যাসে এ-ধারা এই প্রথম নয় ; বলা চলে বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণকান্তের উইলে (সুমতি কুমতির দ্বন্দ্ব) ও রজনীতে এ-ধারার উন্মেষ দেখা যায়। সে যাহোক 'অন্তঃশীলা' বার হবার অল্পকালের মধ্যেই এ ধারা আর এক লেখকের এক উপন্যাসে অনুবর্তিত হলো। আধুনিক কালে

বাঙলা উপন্যাস ও গল্পে এ-পদ্ধতি সুপ্রতিষ্ঠিত। এ-আঙ্গিক প্রবর্তনের সুনাম অবশ্যই ধূর্জটিপ্রসাদের প্রাপ্য।

'অন্তঃশীলা', 'আবর্ত', 'মোহানা'—একসূত্রে গাঁথা উপন্যাস-এয়ী। এ-তিনটিকে যদি সম্পূর্ণ এক উপন্যাস বলে ধরা যায় তবে এর সার কথা হলো একদিকে ভাবানুষঙ্গ, অন্যদিকে জীবনধারণের ক্রূরতা জৈবিক আকর্ষণ ও দৈন্য থেকে একজন পরিমার্জিত বুদ্ধিজীবীর মুক্তিসন্ধান। এ-মত ধূর্জটিপ্রসাদের নিজেরই। আমার মনে হয় উপন্যাস-এয়ীর নায়ক খগেনবাবুর মতো ঐকান্তিক বুদ্ধিজীবীর মানসিক সংগ্রামের চিত্র আজ পর্যন্ত অন্যকোনো বাঙলা উপন্যাসে উপস্থিত করা হয়নি।

এই উপন্যাস-এয়ীতে ধূর্জটিপ্রসাদ যে-শৈলী অবলম্বন করেছিলেন, তিনি বলেন তা 'ডায়ালেক্‌টিক'; এবং এ-বিষয়ে তিনি নিজেকে 'Marxologist' আখ্যা দিয়েছিলেন। মার্কসবাদীরা তাঁর এ-দাবী কতদূর সঙ্গত বিচার করে দেখবেন।

শ্রীঅলোক রায় এই উপন্যাস তিনটির প্রসঙ্গে এ-সকল কথা সম্যক আলোচনা করেছেন। তাছাড়া ধূর্জটিপ্রসাদের 'রিয়ালিস্ট' পড়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সমালোচনা সূচক যে-চিঠি লেখেন এবং 'অন্তঃশীলা' পড়ে ১৩৪১ সালে 'চিত্রালী'তে শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী যে-সমালোচনা প্রকাশ করেন ও তার প্রত্যুত্তরে ধূর্জটিপ্রসাদের বক্তব্য গ্রন্থের পরিশিষ্টে উদ্ধৃত করে শ্রী অলোক রায় বই ক'খানির উপর উজ্জ্বল আলোকপাত করেছেন। শ্রীরায়ের মত সমর্থিত করে বলতে ইচ্ছা করি যে আত্মপক্ষ সমর্থনে ধূর্জটিপ্রসাদের ব্যাখ্যা অধিক সারবান।

ভারতীয় সঙ্গীত পদ্ধতি নিয়ে কবিগুরু ও ধূর্জটিপ্রসাদের মধ্যে পত্র বিনিময় হয়। সেগুলি একত্রিত করে 'সুর ও সঙ্গীত' নাম দিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যুগ্মভাবে গ্রন্থাকারে ছাপাবার অসামান্য সৌভাগ্যলাভ করেন ধূর্জটিপ্রসাদ। ছোট আকারের হোলেও নানা কারণে এই বইটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং অলোক রায় বইটি সম্বন্ধে সম্যক আলোচনা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর পত্রাবলীর মাধ্যমে এই কথা স্পষ্ট করতে চেয়েছিলেন যে, ভারতীয় রাগরাগিণী তার সুরসংযোগের নৈষ্ঠিক সমাবেশ, তান বিস্তার, শ্রুতি মিড় প্রভৃতিতে সজ্জিত হয়ে তার কৈশোর যৌবনের সার্থকতা সুসম্পাদিত করে সম্প্রতি কতকগুলি নিয়ম বন্ধনের খাদে পড়ে গিয়েছে। সেখান থেকে তাদের উদ্ধার করে ঐতিহাসিক বিবর্তনের প্রশস্ত খাতে প্রবাহিত করে তাদের

স্রোতস্বতী করতে হবে। এর আগেও কবিগুরু 'সবুজ পত্রে' 'সঙ্গীতের মুক্তি' নামে প্রবন্ধে ভারতীয় রাগরাগিণীর বিশ্লেষণ করে বলেছিলেন, বিশ্বসৃষ্টিতে যে নিত্যরস আছে এতদিন ভারতীয় সঙ্গীত তার বাহক হয়ে এসেছে। এখন সময় এসেছে তাকে মানব-হৃদয়ের বেদনার বাহক করে দেবার। সঙ্গীতে কাব্যের আবেদন সংযুক্ত করতে হবে। এ-কাজ করতে হবে রাগরাগিণীর প্রাথমিক সুর-বন্ধগুলি শুধু বজায় রেখে ও তাদের নতুন করে সুসংযোজিত করে, যাতে মানুষের হৃদয়বেদনা রূপায়িত হয়।

অপর পক্ষে ধূর্জটিপ্রসাদ এই পত্রবিনিময়ের মাধ্যমে ভারতীয় সঙ্গীতের আর একদিকের,—যথা, তার বন্দেশ, আলাপ ও স্থাপত্যের ব্যাখ্যা করে সঙ্গীতের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ও ধূর্জটিপ্রসাদের পত্রগুচ্ছ পরস্পরবিরোধী নয়, সম্পূরক। সঙ্গীত বিষয়ে ধূর্জটিপ্রসাদ আরও দুটি বই লেখেন, যথাক্রমে 'কথা ও সুর' এবং 'Indian Music'। এই বই দুটির কথাও সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন অলোক রায়।

ধূর্জটিপ্রসাদের সমাজতত্ত্ব ও অর্থনীতি সম্বন্ধে বইগুলি, প্রবন্ধ ও বিদেশে প্রদত্ত ভাষণের কথাও গ্রন্থকার বিশদ করে আলোচনা করেছেন। এ-বিষয়ে কোনো মন্তব্য করা আমার সাধ্যাতীত; বিষয়টি আমার এলাকার বাইরে।

ধূর্জটিপ্রসাদের আর একটি গ্রন্থের কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করব। এটি হলো 'Tagore A Study'; তাঁর রচিত ক্ষুদ্র এক পুস্তিকা। যাঁর রচনার ব্যাপকতা সাগরতুল্য, যাঁর সৃষ্টির মহিমা আকাশস্পর্শী তাঁর কথা কি একটা ক্ষুদ্র পুস্তিকায় বিধৃত করা যায়! অথচ ক্ষুদ্রেরও নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার সামর্থ্য থাকতে পারে। রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণের অনতিকাল পরে রচিত পুস্তিকাটি সে-সামর্থ্যের স্পর্ধা রাখে। খুশি হতাম, যদি অলোক রায় পুস্তিকাটি সম্বন্ধে বিস্তারিত কিছু বিবরণ বা রায় দিতেন। বইটি নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন আছে।

'ঝিলিমিলি' ও 'মনে এলো' ধূর্জটিপ্রসাদের দুটি আলোকরশ্মি ঠিকরানো বই; রোজনামচা স্টাইলে লেখা। একটি চিন্তাশ্রিত অপরটি পঠনাশ্রিত। এই বই দুটি সম্বন্ধেও গ্রন্থকার আরও কিছু বেশি করে লিখতে পারতেন।

পরিশিষ্টে ধূর্জটিপ্রসাদের যে-গ্রন্থপঞ্জী এবং গ্রন্থাকারে অসঙ্কলিত রচনার তালিকা সংগৃহীত হয়েছে তা গ্রন্থকারের নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের পরিচয় বহন করে।

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য

হাজার বছরের বাংলা গান : প্রভাতকুমার গোস্বামী সম্পাদিত। সারস্বত লাইব্রেরী, পনর টাকা

'হাজার বছরের বাংলা গান' একটি সঙ্কলন-গ্রন্থ। বিভিন্ন সময়ের গীতকারদের রচিত বিভিন্ন প্রকারের বাঙলা গান এই সঙ্কলনে স্থান পেয়েছে। একসময় এই ধরনের সঙ্কলন-গ্রন্থের খুব চল ছিল। কাঙালীচরণ সেন-এর 'ব্রহ্মসঙ্গীত' সঙ্কলন প্রায় ঘরে ঘরে দেখা যেত। বিভিন্ন গীতকারদের গান নিয়ে বৃহদাকার সঙ্কলন তারপরেও ছড়িয়েছে অনেক। সেগুলো প্রায়শই ছিল সে-কালের জনপ্রিয় গানগুলোর সঙ্কলন—যেমন, রেকর্ড-সঙ্গীত (ঐ নামেই বোধহয় একখানা বইও ছিল), বহুল প্রচারিত ব্রহ্মসঙ্গীতগুলো, শ্যামাসঙ্গীত, রঙ্গমঞ্চের গান, শহুরে পল্লীগীতি, ব্যঙ্গ-তামাসা ইত্যাদি। ফুটপাথে পরোনো বই-এর দোকানে দশ-বিশ-ত্রিশে প্রকাশিত এই ধরনের বই মাঝে মাঝে আবির্ভূত হয়, রসে বসে পাতা উলটে প্রচুর আনন্দ পাওয়া যায়, উপকারেও আসে, অপ্রত্যাশিত-ভাবে দু-একটা দুষ্প্রাপ্য গানের কথা পাওয়া যেতে পারে। এইসব গ্রন্থের সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক ব্যাপারটা হলো গানের সংখ্যা এবং বৈচিত্র্য। এত এত গান একসঙ্গে হাতের কাছে পাওয়াটাই লাভ। স্বরলিপি সমেত যেসব সঙ্কলন প্রকাশিত হয়েছে, বাস্তব কারণে সেগুলোতে গানের সংখ্যা অল্প। গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় বা কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্যই ব্যতিক্রম। তাছাড়া ও-সব বই বোধহয় সঙ্গীতের গম্ভীর ছাত্রদের হাতেই মানায়। আ-পামর বাঙালির আনন্দ প্রাপ্তি ঘটাতে প্রয়োজন, ও যথেষ্ট স্বরলিপি ছাড়া শুধু গানের কথার সঙ্কলন। 'হাজার বছরের বাংলা গান' ঠিক এই ধরনের একখানা বই।

পূর্বে যেসব সঙ্কলন প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলো দুষ্প্রাপ্য। বর্তমান সঙ্কলনটি প্রকাশের সপক্ষে এই একটা যুক্তিই যথেষ্ট। প্রভাতকুমার গোস্বামী অবশ্য আরো কিছু চিন্তা করেছেন। ভূমিকায় বলা আছে 'তা ছাড়া গত হাজার বছরের মধ্যে রচিত বিভিন্ন ঢং এর গানের একটা প্রতিনিধিত্বমূলক সংকলন গ্রন্থের অভাব অনুভব করেছি।' এই দিক দিয়ে পূর্বের সঙ্কলনগুলোর সঙ্গে বর্তমান গ্রন্থের একটা তফাৎ রয়েছে। কাঙালীচরণ সেন-এর সঙ্কলনটি একান্তভাবেই ব্রাহ্ম উপাসনাদির সঙ্গে যুক্ত, বাঙলা গানের প্রতিনিধিত্ব করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। রেকর্ড-সঙ্গীত জাতীয় বইগুলোতে 'জনপ্রিয়' গানগুলোকেই স্থান দেওয়া হতো, গানগুলোর বাণিজ্যিক মূল্যই ছিল বড় কথা। এসবের প্রতিতুলনায় 'হাজার বছরের বাঙলা গান'-এর একটা স্পষ্ট সাঙ্গীতিক উদ্দেশ্য

আছে। ঐটাই বর্তমান সঙ্কলনের গৌরব। অবশ্য উক্ত উদ্দেশ্য শেষ পর্যন্ত কতদূর সাধিত হয়েছে, সেটা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিতে পারে। প্রথমেই তর্ক উঠতে পারে গানের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে। হাজার বছর-ব্যাপী বাঙলা গানের যে বিস্তৃতি তাকে গানের বিষয়-অনুযায়ী (অবশ্যই কথা বা কাব্যের বিষয়, বাঙলা গানের ক্ষেত্রে যার গুরুত্ব খুবই বেশি) ব্যবচ্ছেদ করা হয়েছে। যেমন 'সাধন-ভক্তি-উপাসনা'—এই শিরোনামায় একত্রিত হয়েছে ৭৯টি গান। চাটিল-কম্বলাম্বরের চর্যাপদ থেকে শুরু করে নজরুল-গোপেশ্বরবাবু রচিত ভক্তি ভাবনার গান পর্যন্ত এই পরিচ্ছেদের অন্তর্গত। 'দেশপ্রেম' বিষয়ক ৬২টি গান, 'প্রেম' বিষয়ক ৭২টি, 'ঋতু ও প্রকৃতি' শিরোনামায় ২৭টি গান ইত্যাদি পৃথক পৃথক পরিচ্ছেদে রাখা হয়েছে। বিষয়-অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগের চল রয়েছে বিভিন্ন গীতকারের একক সঙ্কলনগুলোতে। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের 'গীতবিতান' প্রকাশের পর থেকে একক সঙ্কলনের ক্ষেত্রে এইটাই আদর্শ রীতি হিসাবে গৃহীত। এর সপক্ষে যুক্তিও আছে। একক সঙ্কলনের গানগুলো একজন ব্যক্তির রচনা বলেই ফর্ম, মেজাজ ইত্যাদির দিক থেকে তাদের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠতা থেকেই যায়। বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত গীতকারদের রচনার মধ্যে সে ব্যাপারটা না-ও থাকতে পারে। এর ফলে 'মঞ্জু বিকচ কুসুম-পুঞ্জ' এবং 'দীনতারিণী বলে মা ডাকি গো তোরে' এক শ্রেণীতে রাখার উদ্দেশ্যটা সহজবোধ্য হয় না। এদের মধ্যে সাঙ্গীতিক যোগাযোগ খুবই ক্ষীণ, মেজাজের তফাৎ এত বেশি যে 'দুটোই ভক্তিভাবনার গান' বললে কিছুই বলা হয় না। হয়তো এমন বলা যায় যে বিষয়-অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগের সাহায্যে বাঙলা গানের বিষয়-বৈচিত্র্য সহজেই জনসমক্ষে তুলে ধরা যায়। এর প্রয়োজন ছিল না। বাঙলা গানের বিষয়-বৈচিত্র্য এমনিতেই কারো নজর এড়ায় না, বাঙালি সমাজ-সংস্কৃতির এটুকু জটিলতা সম্পর্কে তরুণতম শিক্ষার্থীও অল্পবিস্তর সচেতন। অন্যদিক দিয়ে বরং ক্ষতি হয় বেশি। 'ভবনই গহন গম্ভীর বেগেঁ বাহী' আর 'ওরে ডুব্‌ছে নাও ডুবাইয়া বাও' এদের মধ্যে মিলটা চোখ এড়িয়ে যেতে পারে। আবার 'তাতল সৈকত বারিবিন্দু সম' যদি ভক্তি বিষয়ক গান হয়, 'শ্যাম তব অদর্শনে কাঁদি অহরহ' কেন প্রেম বিষয়ক গান হতে যাবে? সবচেয়ে বিপজ্জনক কাজ হয়েছে 'রঙিলা ভাসুর গো' গানটিকে প্রেমের গান হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করাটা। গানটি পূর্ববঙ্গের সারিগান শ্রেণীর, নৌকাবাইচের গান বলা যায়, যার মধ্যে প্রাণোচ্ছল রঙ্গ-তামাসার আধিক্য ঘটে কোনো কোনো সময়। যাঁরা এ-গান গেয়ে থাকেন, সিরিয়স প্রেমের

গান হিসাবে কখনো তাঁরা এ-গানকে দেখেন না। 'যেদিন হইতে দেখেছি, বন্ধু/তোমায়/মৈষালের বাড়ী' ইত্যাদির সমগোত্রীয় করে দেখলে গানটির প্রতি নিদারুণ অবিচার করা হবে। বিষয়-অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগের ফলেই হয়তো এসব গোলমালের হাত এড়ানো যায়নি। এর চেয়ে প্রয়োজনীয় ছিল কালানুক্রমিক বিন্যাস, এক-একজন গীতকার ধরে এবং একটা অঞ্চল ধরে। এতে বাঙলা গানের হাজার বছর ব্যাপী বিবর্তনের চেহারাটা হয়তো খানিকটা ফুটে উঠত।

এছাড়া তর্ক উঠতে পারে কোনো কোনো গানের অন্তর্ভুক্তি বিষয়ে। 'গীতগোবিন্দ'র দুটি অংশ উদ্ধৃত করার অর্থ কী? ওগুলো কি বাঙলা গানের উদাহরণ? শুধু ভাষার দিক থেকেই নয়, সামগ্রিক চরিত্রের দিক থেকেই একে আলাদা করে বাঙলাদেশের বলে চিহ্নিত করা অনুচিত। গীতগোবিন্দ-রচয়িতা বাঙালি হতে পারেন, এমনকি এও হতে পারে যে বাঙলাদেশে গীতগোবিন্দ খুবই জনপ্রিয় ছিল, বা বাঙলা গানের ওপর এর যথেষ্ট প্রভাব পড়েছিল, কিন্তু গীতগোবিন্দ বাঙলা গানের উদাহরণ নয়। আরো অবাক লাগে 'নমামি মহিষাসুর-মর্দিনী' গানটির উপস্থিতি দেখে। এই গানের রচয়িতা 'গুরুগুহ'র পরিচয় দেওয়া হয়েছে পরিশিষ্টে—'দাক্ষিণাত্যের বিখ্যাত গীতিকার মথুরস্বামী দীক্ষিত 'গুরুগুহ' এই ছদ্মনামে রচনা করেন।' এ-স্থলে রচয়িতাও বাঙালি নন। বাঙলা গানের প্রতিনিধিত্ব এই গান কিভাবে করে বোঝা যায় না। অন্যপক্ষে অনেক গুরুত্বপূর্ণ গান বাদ পড়ে যাওয়াটা বিস্ময়কর। রচয়িতাদের তালিকায় দেওয়ান রঘুনাথ রায় বা গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুপস্থিতি সঙ্কলনের গৌরব অনেকখানি নষ্ট করেছে। বরং যদুভট্টের হিন্দী ধ্রুপদ না থাকলেও চলত। ত্রিপুরার রাজবাড়িতে যেসব গানের সৃষ্টি হয়েছে, বিশেষত ঝুলনোৎসবের গান, তার কিছু নিদর্শন থাকলে অনেক কাজ হতো। টুসু ছাড়া মানভূম অঞ্চলের অন্য শ্রেণীর গান অন্তর্ভুক্ত হওয়াটা খুবই বাঞ্ছনীয় ছিল। সেইসঙ্গে সঙ্কলনের ভালো কাজ হয়েছে উৎসব ও আনুষ্ঠানিক গানের পরিচ্ছেদেই। বিয়ের গানের উদাহরণগুলো অত্যন্ত সুনির্বাচিত।

গ্রন্থের প্রথমাংশে একটি দীর্ঘ পরিচিতি আছে। এ-ধরনের সঙ্কলনের আগে বাঙলাদেশের বিভিন্ন শ্রেণীর গানের পরিচয় প্রদানের পরিকল্পনাটা খুবই প্রশংসনীয়। কিন্তু বর্তমান গ্রন্থে যে-পরিচিতি দেওয়া হয়েছে তাতে একদিক থেকে উদ্দেশ্যহীনতা যেমন প্রকট, তেমনি বহু বাক্যই অত্যন্ত দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে। যেমন 'জয়দেবের সময় বাংলা দেশে যে গীতধারা জনসাধারণের মধ্যে

প্রচলিত ছিল তা অপভ্রংশ বা প্রাচীন বাংলায় গীত হ'ত। এই জন্যই জয়দেবের গানে কিছু প্রাকৃত বা প্রাচীন বাংলার সুর অনুরণিত হয়।' এখানে 'সুর' বলতে কি কাব্যের মেজাজ বোঝানো হচ্ছে? নাকি গানের সুরের কথা বলা হচ্ছে? উভয় অর্থেই এই উক্তি প্রমাণিত করার মতো জয়দেবের সমসাময়িক বা পূর্ববর্তী বাঙলা গানের নিদর্শন যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া গেছে কি? সঙ্কলন থেকে অন্তত সে-রকম মনে হয় না। আবার 'এই কীর্তনের সুরু যদিও চৈতন্যদেবের সময় থেকে' অথবা 'শ্রীচৈতন্যদেব প্রবর্তিত কীর্তনের ধারা বাঙলাদেশে বিশেষভাবে প্রচলিত হয়' ইত্যাদি কথাগুলো বারবার বলার ফলে নরোত্তম দাসের ভূমিকাটা অস্পষ্ট হয়ে গেছে। বস্তুত কীর্তনের ব্যাপারে নরোত্তম দাসের অবদান সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা থাকাটা একান্তই প্রয়োজন ছিল। তথ্যের দিক থেকে গোলমাল সৃষ্টি করে 'এই বাংলা দেশেই প্রায় একশত বৎসর আগে মেটিয়াবুরুজে সেদিনের নির্বাসিত নবাব ওয়াজেদ আলী শাহের দরবারে ঠুংরীর জন্ম হয়।' মেটিয়াবুরুজে আনাগোনা করেছেন এমন অনেক গুণী ঠুংরী গান রচনা করে থাকতে পারেন। ওয়াজেদ আলী শাহ্ স্বয়ং প্রতিভাবান ব্যক্তি ছিলেন; নিজে বহু বিখ্যাত ঠুংরী গান বেঁধেছিলেন। কিন্তু ঠুংরীর মতো বৈশিষ্ট্যপূর্ণ একটি গীতরীতি একজন নবাবের দরবারে একটি বিশেষ সময় সৃষ্ট হয়েছিল, এ-রকম কাহিনী সম্পূর্ণ কাল্পনিক। বস্তুত ঠুংরীর ইতিহাস যথেষ্ট জটিল। একদিকে লোকসঙ্গীতের কিছু কিছু উপাদানের প্রতি দরবারী গায়কদের মনোযোগবৃদ্ধি, অন্যদিকে টপ্পারীতির প্রভাববৃদ্ধি, বরাবর-কি-আস্থাই থেকে পূরব-অঙ্গের বিলম্বিত ঠুংরী—এ-এক দীর্ঘ পথযাত্রা। সময়ের দিক থেকেও কিছু গোলমাল থেকে যাচ্ছে। একদিকে লেখক বলছেন 'প্রায় এক শত বৎসর আগে…ঠুংরীর জন্ম হয়', আবার 'অথচ এর আগে (রবীন্দ্রনাথের জন্মের আগে) বিষ্ণুপুরে ধ্রুপদ এসেছে। এই কলকাতায় মেটিয়াবুরুজে ঠুংরী সৃষ্টি হয়েছে' ইত্যাদি। এসব তথ্যের ভ্রান্তি অনায়াসেই এড়ানো যেত।

দুঃখের বিষয়, পরিচিতি লিখতে গিয়ে অনেকগুলো পাতা খরচ হয়েছে, কিন্তু বাঙলা গানের প্রকৃত সাঙ্গীতিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কোনো ধারণা দেওয়ার চেষ্টা নেই। বাঙলা গানের বৈশিষ্ট্য বলতে ঘুরে ফিরে সেই বাঁধা বুলিই উচ্চারিত হতে থাকে, কাব্যের গুরুত্ব, কথা ও সুরের মিলন ইত্যাদি। বাঙলা গানে টপ্পা-অঙ্গ গৃহীত হলো, অথচ পূরব-ঠুংরীর রঙ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত কেন? বাঙলাদেশের সাংস্কৃতিক জীবনে যাত্রা-থিয়েটার বরাবরই বেশ প্রাধান্য পেয়েছে। বাঙলা

গানের সুরের দিক থেকে যেসব বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়, রাগ-রাগিণীর ব্যবহারে যে-বাঙালিয়ানা নজরে পড়ে, সে-সবের পেছনে যাত্রা-থিয়েটারের ভূমিকা কী? এই ধরনের প্রশ্নগুলোর জবাব পাওয়া যেতে পারে, সামগ্রিকভাবে বাঙলা গানের স্বরূপটি চিনতে পারলে; অথবা, হয়তো এসব প্রশ্নের উত্তর পেলে বাঙলা গানের একটা সামগ্রিক চেহারা পাওয়া যেত।

গ্রন্থের টিকা-টিপ্পনী অংশটি মূল্যবান। 'মিলে সবে ভারতসন্তান' গানটি মূল গ্রন্থে অসম্পূর্ণভাবে রাখা হয়েছে, টিকা-টিপ্পনীতে পুরো গানটি দেওয়া আছে। 'রঙিলা ভাসুর গো' গানটিও অসম্পূর্ণ। এ-রকম আরো বেশ কয়েকটা গান অসম্পূর্ণ আছে। এই ধরনের সঙ্কলনে সম্পূর্ণ গানগুলোই দেওয়া উচিত ছিল, পাঠান্তর সহ। কিছু কিছু পাঠান্তর টিকা-টিপ্পনীতে রয়েছে বটে, কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ পাঠান্তর সম্পর্কে লেখক নীরব আছেন। অনেকেই যেমন 'সোহাগ চাঁদ বদনী' গানটির উদ্ধার সম্পূর্ণ ভুল বলে গণ্য করতে পারেন। অনেক গানের সঙ্গে সুরের উল্লেখ আছে, সেগুলো সম্পর্কে আরো সাবধান হওয়া উচিত ছিল। পূর্বের সঙ্কলনগুলোতে অনেক সময় সুরের নামে ভুলভ্রান্তি থেকে গেছে। সেগুলো এই সঙ্কলনে অন্ধভাবে অনুসরণ না করে সংশোধন করে নেওয়ার সুযোগ ছিল। দু-একটা গানের ক্ষেত্রে অন্য সুরে রেকর্ড বেরিয়ে গেছে, সেখানে স্বরান্তরের উল্লেখ প্রাসঙ্গিক হতো। যেসব গানের প্রকাশিত স্বরলিপি আছে, সেখানে স্বরলিপি গ্রন্থের উল্লেখ থাকলে অনেক শিক্ষার্থীর উপকার হতো এরকম আরো কয়েকটা ছোটখাট কাজের সাহায্যে গ্রন্থটির গুরুত্ব বাড়িয়ে দেওয়া যেত।

পদ্মনাভ দাশগুপ্ত

বিমলচন্দ্র ঘোষের ষাট বছর

এ-বছর বারোই ডিসেম্বর কবি বিমলচন্দ্র ঘোষের ষাট বছর পূর্ণ হলো। আধুনিক বাঙালি কবিদের মধ্যে বিমলচন্দ্র ঘোষ একজন শ্রুতকীর্তি কবি। তাঁর দীর্ঘ কবিজীবনে তিনি প্রগতিশীল কবিতা ও সংস্কৃতি চিন্তাকে তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে অগ্রসর করেছেন। আন্তর্জাতিক মানবমুক্তির সংগ্রামের সঙ্গে জাতীয় মুক্তির সাধনা তিনি একসূত্রে গ্রথিত করতে পেরেছেন। তাঁর 'দক্ষিণায়ন' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বাঙলাদেশের প্রথম সারির কবির মর্যাদায় অভিষিক্ত হন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁকে তাঁর কাব্যসৃষ্টির জন্য আশীর্বাদ জানান, এবং তাঁর কবিতার ক্রমাগত উন্নততর বিকাশের ভবিষ্যদ্বাণী করেন।

আধুনিকতার ব্যাখ্যা নিয়ে নানা বিতর্ক আছে। পশ্চিমী জীবনের অবক্ষয়, শূন্যতা ও ব্যক্তির অনন্বয়ের ফলে জাত ব্যক্তিকেন্দ্রিক কবিতাকে এক অর্থে আধুনিক কবিতা বলা হয়। এ-ব্যাখ্যায় কবি-ব্যক্তিত্ব অনেকখানি সমাজ-নিরপেক্ষ, ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতচ্যুত। আমাদের দেশের আধুনিক কবিদের মধ্যে অনেকেই আধুনিকতা বলতে চূর্ণ-ব্যক্তিত্বের আত্মগত অনুসঙ্গভিত্তিক, এই ব্যক্তিমনস্কতার কথাই মুখ্য বলে মনে করেন।

এ-শতাব্দীর গোড়ার দিকে পশ্চিমী শিল্পবিকশিত দেশগুলিতে ব্যক্তিগত মালিকানা-বিধৃত সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতিসাপেক্ষ উৎপাদনে সঙ্কট দেখা দেয়। সে-সমস্যা নিরাকরণের জন্য তারা প্রথম মহাযুদ্ধ ডেকে আনে। আর মূলধনতন্ত্রের ঐ সঙ্কটে সমাজের অন্তঃসার বিষয়ে অনিশ্চিত ও ধারণাবিহীন মধ্যশ্রেণীর কবিদের মধ্যে বহু প্রশ্ন দেখা দেয়। সেই আত্মিক ও সামাজিক সঙ্কটের মধ্যে সমাজের যথার্থ সত্য সম্পর্কে অনবহিত শিল্পসৃষ্টির এক আন্দোলন শুরু হয়। পুঁজিবাদের অনিয়ন্ত্রিত বিকাশের যুগে এই মধ্যশ্রেণীতে জন্ম নেওয়া কবিদের কাছে জীবন অনেকখানি সুনির্ধারিত ও সুনিশ্চিত ছিল। কিন্তু মূলধনতন্ত্রের সঙ্কটের ফলে সে নিশ্চিন্ততা আর রইল না। নতুন কবিকুল পুরনো পদ্ধতির নিশ্চিন্ত নিসর্গ, ঈশ্বর ও প্রশান্তি বর্ণনাকে চ্যালেঞ্জ করলেন। কিন্তু যে-মূলধনতন্ত্রের জন্য আসলে ব্যক্তিমানুষের জীবনে সঙ্কট দেখা দিল, সে-বিষয়ে মনস্কতা অকৃত্রিম হলো না। এই নতুন কবিতাও 'আধুনিক' কবিতা—আসলে এ-কবিতা অনেকাংশেই 'সমসাময়িক' কবিতা। আমাদের দেশেও এই আধুনিকতার ছাপ পড়েছিল।

এখনও এ-দেশে ঐ সমাজবিচ্ছিন্ন আত্মস্বাতন্ত্র্যভিত্তিক কাব্যপ্রস্থানকেই আধুনিকতা বলা হয়।

কিন্তু সত্যিকারের আধুনিকতা অন্যদিকে ছিল। সমাজের অন্তঃসার ঐ বিশ্বমূলধনের সঙ্কটের সময় ছিল সমাজতান্ত্রিকতার পথে ক্রমোন্মোচিত। ১৯১৭ সালের মহাবিপ্লবে সে-আধুনিকতার জাজ্বল্যমান অভ্যুদয় ঘটলো রুশদেশে, মহাসোভিয়েতে। আর সে-আধুনিকতা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের চেয়ে ব্যক্তিত্বকে বড় করে দেখে। সমাজপরিবর্তনের প্রাগ্রসর শ্রেণী শ্রমজীবীমানুষের মুক্তির লক্ষ্যে গোটা শোষণভিত্তিক সমাজটাকেই বদলে দেওয়ার রাস্তাটাই ছিল সেই আধুনিকতার পথ। আর এ-আধুনিকতা হলো, যাকে বলে প্রগতিশীলতা। ব্যক্তিমানুষ যখন সমাজের এই মুক্তির মূল সারসত্যটি ধরতে পারেন বা ধরবার জন্য অন্বেষণ চালান, এবং সেই অভিজ্ঞতা শিল্পে বিধৃত করেন তখন গড়ে ওঠে শিল্পী-ব্যক্তিত্ব। এক আধুনিকতা বলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কথা। অন্য আধুনিকতা বলে ব্যক্তিত্বের কথা।

বিমলচন্দ্র ঘোষ এই দ্বিতীয় আধুনিকতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। তাই তাঁর কবিতায় স্বদেশের মুক্তিপিপাসু মানুষের সঙ্গে—আন্তর্জাতিক মুক্তিকেও তিনি অঙ্গীকৃত করেছেন। তাঁর 'উদাত্ত ভারত' বাঙলা সাহিত্যে এক বিশিষ্ট অবদান।

সম্প্রতি বিমলচন্দ্র ঘোষ সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের মৈত্রীভিত্তিক রচনা কর্মের জন্য নেহরু পুরস্কার পেয়েছেন। এ-বছর রুশদেশ থেকে প্রকাশিত রুশ তর্জমায় লেনিনের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা বিশ্বের নানা বিশিষ্ট কবির কবিতার একটি সঙ্কলন প্রকাশিত হয়েছে। বাঙালি কবিদের মধ্যে কেবলমাত্র বিমলচন্দ্র ঘোষের কবিতা তাতে আছে। এ তাঁর আন্তর্জাতিক মনুষ্যত্বের পক্ষে সংগ্রামী কাব্যসাধনারই অন্যতম স্বীকৃতি।

বিমলচন্দ্র ঘোষের সম্পাদিত 'এষা' ত্রৈমাসিক পত্রিকাটি বিমলচন্দ্রের কবিতা ও বিচিত্র চিন্তার সাক্ষ্য বহন করে। আমরা বর্ষীয়ান এই কবির দীর্ঘ জীবন কামনা করি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, বিমলচন্দ্র ঘোষের 'ষাট বছর পূর্তি' উপলক্ষ্যে বাঙলাদেশের বিশিষ্ট সংস্কৃতিসেবী, কবি, সাহিত্যিক ও শিক্ষাব্রতীরা একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করছেন। কিছু অর্থসংগ্রহ করে তাঁরা অসুস্থ কবিকে সহায়তা জানাতে চান। লক্ষ্য, তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ।

বিমলচন্দ্র ঘোষ শতায়ু হোন।

তরুণ সান্যাল

সখারাম গণেশ দেউস্কর

বাঙলা তথা ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সামগ্রিক চরিত্র ও দ্বন্দ্ব বিষয়ে আমাদের অজ্ঞানতা অপরিসীম; এবং এই পটভূমিকায় জাতীয় নেতৃত্ব ও তারই পরিমণ্ডলে ব্যক্তিজীবনের যথাযথ বিশ্লেষণেও আমাদের অনীহা অধিকতর। খণ্ডিত এক একটি ঘটনাকে কোনও-না-কোনও আকর্ষণে আমরা মহনীয় করে তুলেছি এবং মূল্যমান বিবেচনায় তারই কর্মযজ্ঞকে দিয়েছি বিসর্জন। তদুপরি একান্ত স্বাভাবিকতায় এবং অ-স্বাধীন চিন্তাচর্চায় বাঙালি তথা ভারতীয় জীবনে তাৎক্ষণিকের মূল্যে জীবন তার সামগ্রিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হতে ক্রমশ পরিণতি পেয়েছে ক্ষণকালের সীমারেখায়। ত্যাগীকে আমরা বরণ করি মাল্যে; বিসর্জিতপ্রাণকে মহত্ব দিই মূর্তি নির্মাণে; কিন্তু সেই মুহূর্তে বিস্মৃত হই সত্তার অপর অস্তিত্বের চলমানতাকে; এবং স্বভাবত তজ্জনিত প্রক্রিয়ায় সেই বিশেষ ব্যক্তিসত্তা জনগণের পূজিত হন, সন্দেহ নেই; পক্ষান্তরে ইতিহাস হারায় বস্তুনিষ্ঠাকে যার অভাবে একজন উৎসর্গিত মানুষের সমগ্র জীবন ও কর্মকাণ্ডই ঐতিহাসিক পটভূমি শেষাবধি হারায়।

উনিশ শতকের শেষ দশকে ভারতবর্ষে ইতালীয় কার্‌বোনারির ছাঁচে গুপ্ত-সমিতি স্থাপনে সর্বপ্রথম চেষ্টিত হন বালগঙ্গাধর তিলক; বলা বাহুল্য তৎপ্রবর্তিত শিবাজী ও গণপতি উৎসবের তাৎপর্য হলো গণচেতনার উদ্বোধন তথা জাতীয়তা-বোধের জাগরণ। প্লেগের দৌরাত্ম্যে ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে শিবাজীর জন্মদিনে উদ্‌যাপিত না হয়ে তাঁর রাজ্যাভিষেক দিনে তা অনুষ্ঠিত হলো। এক হিসেবে এই দিন নির্ধা-রণের বিষয়টিও বলা চলে, অর্থবোধক। উৎসব উপলক্ষে তিলকের সেই ঐতি-হাসিক বক্তৃতা তথা 'কেশরী' কাগজে উক্ত উৎসবের বিস্তৃত বিবরণ এবং উৎসবে পঠিত একটি সংক্রমক কবিতা প্রকাশিত হয় (১৮ জুন ১৮৯৭)। এই ঘটনার চার-দিনের মধ্যে পুনার কালেকটর্‌ র‍্যান্‌ড্‌ সাহেব ও অপর একজন পদস্থ কর্মচারী লেফটেন্যাণ্ট অ্যায়ার্স্ট অতর্কিতে নিহত হলেন চপেকার ভ্রাতৃদ্বয় কর্তৃক। কার্যত শহরের অধিবাসীরা প্লেগের পীড়ন অপেক্ষা প্লেগ নিবারণে নিযুক্ত ইংরেজ সৈনিকদের উৎপীড়নে অধিকতর ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন। ইতিমধ্যে তিলক তাঁর 'মরাঠা'য় এমতো নৈরাজ্যের তীব্রসমালোচনা করেন। যথানিয়মে উক্ত হত্যাকাণ্ডের জন্যে তিলক, পরোক্ষভাবে দায়ী বিবেচনায়, ধৃত হলেন, এবং তিলকের এই দেড় বছরের সশ্রম কারাবাসই সম্ভবত দেশোদ্ধারের জন্যে

প্রথম কারাবরণ। এই ঘটনাতে শুধুমাত্র মহারাষ্ট্রই ক্ষুব্ধ হলো না, সুদূর বাঙলা-দেশেও ক্ষোভ প্রতিধ্বনিত হলো ; তিলকের মকদ্দমা পরিচালনার জন্যে অর্থ-সংগ্রহে বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা তৎপর হলেন। এবং এ-বিষয়ে যে উদ্যোগী পুরুষ বাঙালি চৈতন্যকে সচেতন করলেন তিনিই সখারাম গনেশ দেউস্কর।

সখারাম মহারাষ্ট্রের এক বিদ্যানুরাগী সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান ; তাঁর পৈতৃক বাস ছিল রত্নগিরি জেলায় শিবাজীর মালবন নামীয় দুর্গের নিকটবর্তী দেউস গ্রামে। সখারামের পিতামহ সদাশিব বিট্‌ঠল বিবাহসূত্রে বৈদ্যনাথের নিকটস্থ করোঁ গ্রামটি পান। সদাশিবের ছিল এক পুত্র ও এক কন্যা। পুত্র গণেশ সদাশিব বারাণসীতে বেদাধ্যয়ন সম্পন্ন করার পর গিধোড়ের রাজা জয়মঙ্গল সিংহের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দের ১৭ ডিসেম্বর তাঁর এক পুত্র জন্মগ্রহণ করলেন, তিনিই আমাদের স্বনামখ্যাত সখারাম। মাত্র পাঁচ বছর বয়স থেকেই বলা যায়, তাঁর স্বল্পায়ু জীবনে দুর্মর প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন সংগ্রামের সূত্রপাত। মাতৃবিয়োগের পর তাঁর পিতৃস্বসার তত্ত্বাবধানে তিনি লালিত হন। মরাঠী সাহিত্য ও ইতিহাসে এই বিদুষীর প্রবেশ ছিল ; এবং সখারামের চরিত্রগঠনে তাঁর বুদ্ধিমতী পিতৃস্বসার প্রভাবের কথা বলাই বাহুল্য। উপনয়নের পর সখারামকে কিছুকাল বেদচর্চায় মনোনিবেশ করতে হয় ; তারপর তিনি দেওঘর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন। সখারামের ছাত্রাবস্থায় উক্ত বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক ছিলেন মধুসূদন দত্তের জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসু। যোগীন্দ্রনাথের উৎসাহ ও উদ্দীপনাই বাঙলা ভাষাচর্চায় সখারামের অনুরাগের মূল। ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে এনট্রান্স্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর দেওঘর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যায়তনেই সখারাম সেকেণ্ড পণ্ডিতের পদে, পনেরো টাকা বেতনে কর্মজীবন শুরু করেন (১৮৯৩)। এবং এই সময় থেকেই বস্তুত তাঁর সাহিত্যানুরাগ সম্ভাবিত হয় ; অবসর পেলেই তিনি রাজনারায়ণ বসুর বাসস্থানে যেতেন এবং তাঁর সঙ্গে নানাবিষয়ে আলোচনা করতেন। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ লিখেছেন, রাজনারায়ণের বাড়িতেই সখারামের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হয় (আর্যাবর্ত, অগ্রহায়ণ ১৩১৯)। ইতিমধ্যে সখারাম লিখিত যুগকাল সম্পর্কে শাস্ত্রীয় বিচার বিষয়ক এক প্রবন্ধ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে (১২৯৯)। সখারামের সাহিত্যসাধনা ও ইতিহাসচর্চা সম্ভ্রান্ত সাময়িক পত্রপত্রিকার মাধ্যমে যখন তাঁকে খ্যাতিমান করে তুলছে সেই সময় এক অতর্কিত আবর্তনে তিনি জড়িয়ে পড়লেন। দেওঘরের ম্যাজিস্ট্রেট হার্ড

সাহেবের অন্যায় আচরণ সম্পর্কিত যেসব লেখা 'হিতবাদী'তে প্রকাশিত হয়েছিল সখারামই সেগুলির লেখক অনুমান করে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ (স্কুল কমিটির সভাপতি সেকালে স্বয়ং হার্ড সাহেব) তাঁকে কর্মচ্যুত করলেন। আর নিছক কর্মচ্যুত নয়, অচিরে দেওঘরে বসবাস তাঁর পক্ষে অসম্ভব বুঝেই, সপরিবারে সখারাম কলকাতায় চলে আসতে বাধ্য হলেন ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে; যে-বছরে পূর্বেই বলা হয়েছে, তিলক (যাঁর স্বদেশভাবনা তথা দেশাত্মবোধ সখারামকে যথার্থই প্রাণিত করেছিল) দেশের জন্যে প্রথম কারাবরণ করেন।

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ সে-সময়ে 'হিতবাদী'র সম্পাদক; তাঁর সহৃদয়তা সখারামের সহায়ক হলো। ত্রিশ টাকা বেতনে 'হিতবাদী'র প্রুফসংশোধকের পদে নিযুক্ত হোলেন সখারাম; অবশ্য আপন কর্মদক্ষতায় সে-বেতন বৃদ্ধি পায়। ইতিমধ্যে নানাবিষয়ে সখারাম আপন প্রতিভাকে প্রসারিত করলেন,— বাঙলাদেশে শিবাজী উৎসব প্রবর্তন (১৯০২-৬) এবং তদুপলক্ষে 'শিবাজীর মহত্ব' (১৩১০), 'শিবাজীর দীক্ষা' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শিবাজী উৎসব' কবিতাসহ ১৩১১) ও 'শিবাজী' (১৩. ৩) নামীয় তিনটি পুস্তিকা তিনি বিনামূল্যে বিতরণ করেন; উত্তর কলকাতায় যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসস্থান 'সংলগ্ন ভূমিতে' যে বিপ্লবধর্মী আখড়া স্থাপিত হয় (১৯০২) সখারাম সেখানে নিয়মিত ছাত্রদের বক্তৃতা দিতেন; কার্জনী বিধানে বঙ্গচ্ছেদ কার্যকরী করার সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে কলকাতা তথা সমগ্র বাঙলাদেশে যে উত্তাল বিক্ষোভের জন্ম তার পটভূমিকায় সখারামের সুবিখ্যাত 'দেশের কথা'র (১৩১১) ঐতিহাসিক গুরুত্ব; অনুশীলন সমিতির নেতৃত্ব এবং 'যুগান্তর' গোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য লেখক হিসেবেও সখারাম স্মর্তব্য। স্বাস্থ্যান্বেষণে জাপান যাত্রাকালীন কাব্যবিশারদ নির্দ্বিধায় সখারামের সবল হাতে 'হিতবাদী'র পরিচালনভার অর্পণ করেন; এবং সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় সমুদ্রবক্ষে বিশারদের মৃত্যুর (৪ জুলাই ১৯০৭) পর 'হিতবাদী' কর্তৃপক্ষ মাসিক নব্বুই টাকা বেতনে সখারামকেই স্থায়ী সম্পাদক নিয়োজিত করলেন। কিন্তু ছ-মাস না পূর্ণ হতেই সুরাট কংগ্রেসে (ডিসেম্বর ১৯০৭) নরম ও চরমপন্থীদের মধ্যে বিরোধিতা চরম পর্যায়ে পৌঁছয়; এবং 'হিতবাদী'র সত্বাধিকারীরা সখারামকে চরমপন্থীদের বস্তুত তিলকের বিরুদ্ধে কলমবাজিতে প্ররোচিত করেন। আপন আদর্শকে বেমালুম বিসর্জন দিয়ে গুরুকে সমালোচনা করার অভিপ্রায় আদৌ তাঁর ছিল না; পক্ষান্তরে কর্তৃপক্ষের এমতো অন্যায় অনুরোধে জ্বলে উঠে এই তেজস্বী মরাঠী ব্রাহ্মণ কর্মে ইস্তফা দিলেন।

'হিতবাদী'র সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের পর সখারাম জাতীয় বিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। যদিচ নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ জীবনের স্বাদ সখারাম কোনো-কালেই পেলেন না; 'দেশের কথা' এবং 'তিলকের মোকদ্দমা ও সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত' (১৩১৫) বাজেয়াপ্ত হলে (১৯১০) সরকারের রোষভাজন ব্যক্তিকে নিয়ে জাতীয় পরিষৎ কিঞ্চিৎ বিব্রতবোধ করলেন। অবশ্য অচিরে পরিষদের সংশয় দূর করার জন্য সখারামই স্বয়ং সচেষ্ট হোলেন—অধ্যাপক পদ থেকে আপনাকে অব্যাহতি দিয়ে। তারপর আবার কিছুকাল 'হিতবাদী'র সম্পাদনাকর্মে নিজেকে নিরত করেন তিনি। ইতিমধ্যে পুত্র ও পত্নীকে হারিয়ে হৃতসর্বস্ব সখারাম কলকাতা ছেড়ে করোঁ গ্রামে গেলেন। এবং সেখানে দারিদ্র্য তথা দুরন্ত ব্যাধির দৌরাত্ম্যে ক্ষতবিক্ষত হয়ে ১৯১২ খ্রীস্টাব্দের ২৩ নভেম্বর মাত্র তেতাল্লিশ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করলেন।

বস্তুত সাংবাদিকতার বিরলপ্রাপ্ত অবসরেই সখারাম সাহিত্য ও ইতিহাসচর্চা করতেন; 'এটা কোন্ যুগ?' ব্যতিরেকে তাঁর প্রকাশিত প্রায় সমস্ত গ্রন্থই,—'মহামতি রানাডে' (১৩০৭?), 'ঝাঁসীর রাজকুমার' (১৩০৮), 'বাজী রাও' (১৩০৮), 'আনন্দী বাঈ' (১৩০৯?) এরূপ অবসরকালে রচিত। 'তিলকের মোকদ্দমা' ও 'বঙ্গীয় হিন্দুজাতি কি ধ্বংসোন্মুখ?' (১৩১৭) তাঁর জাতীয় বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা-কর্মে নিরত থাকার সময় লিখিত। ইতিহাস অনুশীলনে তাঁর অনন্যসাধারণ অনুরাগ অনুভূত হয়; আর্থিক অস্বচ্ছলতা সত্ত্বেও সখারাম ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থাদি সংগ্রহ ও সংরক্ষণে যত্নবান ছিলেন। কিন্তু দেশবাসীকে এই প্রবল পরিশীলনের পরিপূর্ণ ফলভাগী করে যাওয়ার অবসর তাঁর মেলেনি; প্রচণ্ড প্রয়াসে তিনি মহারাষ্ট্রের ইতিহাস তথা শিবাজীর বৃহৎ জীবনচরিত রচনার তথ্যাদি সংগ্রহ করছিলেন। আয়াসসাপেক্ষ গবেষণাতেই যে তাঁর অধিকতর আগ্রহ ছিল সে-কথা বলা বাহুল্য। পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনার পরিমাণও সখারামের কম নয়,—'মহারাষ্ট্রীয় ভাষার প্রাচীনত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব' (সাহিত্য, বৈশাখ ১২৯৯), 'যুধিষ্ঠিরের আবির্ভাবকাল' (ভারতী, ভাদ্র ১৩০০), 'শিবাজীর স্বার্থত্যাগ, (ধরণী, ফাল্গুন ১৩০১), 'আফজল খাঁর অভিযান' (সাহিত্য, আশ্বিন ১৩০২), 'বালুকেশ্বর ঃ ১৭৮১ খ্রীস্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের বিলাতযাত্রা' (ভারতী, বৈশাখ ১৩০৪), 'মহারাষ্ট্র ইতিহাসের উপকরণ' (সাহিত্য, পৌষ ১৩০৪), 'বঙ্গীয় শব্দোৎপত্তি রহস্য' (ভারতী, চৈত্র ১৩০৬), 'ঐতিহাসিক কাগজপত্র' (সাহিত্য, কার্তিক ১৩০৭), 'গ্রীকজাতির স্বাধীনতালাভ' (প্রদীপ, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮), 'শিবাজী

প্রসঙ্গ' (সাহিত্য, শ্রাবণ ১৩১২), 'ভারতীয় ইতিহাসের উপকরণ' (বঙ্গদর্শন [নবপর্য্যায়], বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় ১৩১৭), 'বাজী রাও ও মস্তানী : বাজী রাওয়ের কলঙ্কমোচন' (আর্য্যাবর্ত্ত, বৈশাখ ১৩১৭) প্রভৃতি বহু মূল্যবান রচনা আজও বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ছড়িয়ে আছে। সৌভাগ্যক্রমে সম্প্রতি ডঃ মহাদেব-প্রসাদ সাহা সম্পাদিত 'দেশের কথা'র (১৩৭৭) মুখবন্ধ পাঠান্তে পাঠক উৎফুল্ল হবেন : "আমরা সখারামের সমগ্র বাঙলা ও মারাঠী রচনাবলী সংগ্রহ করেছি। এগুলি যথাসময়ে তিন খণ্ডে প্রকাশ করার ইচ্ছা আছে।"

সখারামের সার্থক অবদান 'দেশের কথা' রচিত হয় জাতীয় মহাসমিতির আরব্ধ কাজে সহায়তা করার তাগিদে ; তাঁর ভূমিকা পাঠে আরও জানা যায়, উইলিয়ম ডিগবীর The Prosperous British India, দাদাভাই নৌরজীর Poverty and un-Britsh rule in British India ও রমেশচন্দ্র দত্তের The Economic History of British India প্রধান অবলম্বন হলেও নানাবিধ সরকারী রিপোর্ট এবং গ্রন্থ থেকেও উপকরণ সংগৃহীত হয়েছে। তৎসত্ত্বেও উপরোক্ত বিখ্যাত গ্রন্থগুলির তুলনায় 'দেশের কথা'র বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় : "আমাদের আন্দোলন ভিক্ষুকের আবেদন মাত্র। আমাদিগের দাতার করুণার উপর একান্তই নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিতে হয়।" এ-মতো আবেগকম্পিত মন্তব্যে তাঁর বিপ্লবীচেতনা স্পষ্টতর ; সখারাম বলা বাহুল্য আদৌ নরমপন্থী ছিলেন না। ব্রিটিশ শাসনে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক তথা নৈতিক অধোগতির চমকপ্রদ বিবরণী, সর্বজনবোধ্য ভাষায় তিনি উপস্থাপন করলেন। দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন : "কোন সাধুপুষ্পিত সুন্দর উদ্যান দাবদগ্ধ হইয়া গেলে কিংবা কোন সুদর্শন পরিচিত বন্ধুর হঠাৎ কঙ্কাল দেখিলে মনের যেরূপ অবস্থা হয়, বর্ত্তমান চিত্রে অঙ্কিত ভারতীয় শিল্পবাণিজ্যাদির অবস্থা দর্শনে সেইরূপ একটা ভাবের উদয় হইবে, অথচ দেউস্কর মহাশয় কোন উত্তেজিত বক্তৃতা প্রদান করেন নাই,—কতকগুলি সংখ্যাবাচক অঙ্ক এবং সেন্সাস্ ও ষ্ট্যাটিষ্টিক্ হইতে সমুদ্ধৃত কথা নিঃশব্দে একটি মর্ম্মচ্ছেদী দৃশ্য উদ্ঘাটন করিয়া দেখাইবে।" (বঙ্গদর্শন [নবপর্য্যায়], শ্রাবণ ১৩১১) তারপর পাঁচ বছরের (১৩১১-১৫) মধ্যে 'দেশের কথা'র পাঁচটি সংস্করণে মোট তেরো হাজার কপি মুদ্রিত হয় ; অতএব এরূপ বিস্ময়কর জনপ্রিয়তায় ইংরেজ সরকার সবিশেষ শঙ্কিত হন এবং পূর্বেই বলা হয়েছে, বাজেয়াপ্তকরণে বাধ্য হলেন। 'হিতবার্ত্তা'র নির্দেশমতো সখারাম সরকারী স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে আদালতে বিচারপ্রার্থী হন সন্দেহ

নেই ; কিন্তু শুনানি শুরু হওয়ার আগেই তিনি মারা যান। উল্লেখ করা যেতে পারে যে পরবর্তী সংস্করণগুলিতে 'দেশের কথা'র কলেবর উপর্যুপরি বৃদ্ধি পেলেও সখারাম সাধারণের সুবিধের জন্যে মূল্য হ্রাসেরই পক্ষপাতী ছিলেন।

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের লেখায় সখারামের ব্যক্তিত্বের আর একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়ঃ 'বাঙ্গালার রাজনৈতিক জটিলতাজড়িত স্বদেশী আন্দোলনের বহুপূর্বে রানাডে প্রমুখ অর্থনীতিবিশারদের চেষ্টায় বোম্বাই অঞ্চলে ভারতীয় শিল্পের উন্নতিচেষ্টা হইতেছিল। তখন বোম্বাই অঞ্চলের কলে যে বস্ত্র উৎপন্ন হইত তাহার পাড়ের বর্ণ পাকা হইত না, ··সখারাম সেই মোটা কাপড় ব্যবহার করিতেন। আপনার মতামত কার্য্যে করিতে তিনি কখনও কুণ্ঠিত হয়েন নাই।' (আর্য্যাবর্ত্ত, অগ্রহায়ণ ১৩১৯)

উপসংহারে তাই বলা যায়, বিশ শতকের এই শেষার্ধে আমাদের অস্তিত্বে যখন কর্ম ও চিন্তার ভেদ প্রায় মেরুপ্রমাণ তখন কোনও কর্মযোগীকে উক্তপ্রভেদ ঘোচাতে সর্বস্ব বিসর্জনের প্রয়াসকে আমরা ঘটনা বলে চিহ্নিত করি; কিন্তু ক্রমপরিণতির মূল্যকে কদাচ বিবেচনায় আনি। একজন সখারাম সহজেই জীবনকে মেলাতে পেরেছিলেন কর্মের প্রবহমানতায় এবং চিন্তাকে দিয়েছিলেন যথার্থ মূল্য তারই অংশভাকৃরূপে। তাঁর জীবন ও কর্ম, ব্যক্তিত্ব ও আত্ম-নিবেদন, শ্রদ্ধা ও আহুতিদান সমগ্রভাবে একটি সত্তারই জন্ম ও বিকাশ এবং যার দ্বারা তিনি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন এক বৃহত্তর জাতিকে এক বিশাল যজ্ঞভূমির প্রাঙ্গনে।

সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়

রাষ্ট্রপুঞ্জের ২৫তম জন্মজয়ন্তী

২৪এ অক্টোবর ১৯৭০ রাষ্ট্রপুঞ্জের ২৫তম বার্ষিক দিবস উদ্‌যাপিত হলো। ১৯৪৫ সালে ৫১টি সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে যে-বিশ্ব সংস্থার জন্ম, আজ তার সদস্য সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১২৭। পৃথিবীর সমস্ত পরাধীন দেশ স্বাধীনতা লাভ করলে এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির টানাপোড়েনে দ্বিখণ্ডিত দেশগুলির স্বতন্ত্র রাষ্ট্রিক মর্যাদার ব্যাপক স্বীকৃতি ঘটলে, দুনিয়ার রাষ্ট্রগুলির আনুমানিক সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় ১৫০টিতে। সে-ক্ষেত্রে ১২৭ জন সদস্য নিয়ে আজকের রাষ্ট্রপুঞ্জ নিজেকে একটা প্রায় বিশ্বজনীন সংস্থা বলে দাবি করতে পারে। কিন্তু সারা পৃথিবীর

মানুষদের প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানে রাষ্ট্রপুঞ্জ পরিণত হয়েছে কিনা, প্রশ্ন এভাবে উত্থাপিত হোলে, নিঃসন্দেহে জবাব হবে 'না'। পৃথিবীর মোট লোকসংখ্যা আনুমানিক ৩২০ কোটি হোলে, মনে রাখা দরকার যে, প্রায় ১০০ কোটি মানুষের প্রতিনিধিদের রাষ্ট্রপুঞ্জ বাইরে রেখে দিয়েছে। এই রূঢ় বাস্তবতাকে কোনো হিসেবের কারচুপি দিয়ে চাপা যায় না।

জন্মের পরবর্তী পঁচিশ বছর একজন মানুষের জীবনে যতো গুরুত্বপূর্ণ, তার চেয়ে বহুগুণ বেশি গুরুত্বপূর্ণ একটা সংস্থার জীবনে। সেই সংস্থা যদি আন্তর্জাতিক হয়, তাহলে তার গুরুত্বের ব্যাপকতা ও গভীরতা আরো বেড়ে যায়। স্বভাবতই তখন প্রশ্ন ওঠে, যে-প্রতিশ্রুতি ও সম্ভাবনা নিয়ে এর প্রতিষ্ঠা বিগত পঁচিশ বছরে তার কতোটা পূরণ হলো?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এক চরম সঙ্কটময় পর্বে, জাতিসঙ্ঘের ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে, রাষ্ট্রপুঞ্জের জন্ম হয়েছিল। ফ্যাসিবাদ ও অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে সে-সব দেশ প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিল, তারাই হলো এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। কিন্তু প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে যেহেতু ফ্যাসিবাদ ও অক্ষশক্তিকে পরাজিত করার দায় দায়িত্ব সবার সমান ছিল না, তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিবিরোধী শিবিরের নেতৃস্থানীয় যাঁরা, তাঁদের স্বতন্ত্র গুরুত্ব ও ভূমিকা স্বীকার করে রাষ্ট্রপুঞ্জের জন্ম। এই নেতৃস্থানীয় দেশ ছিল পাঁচটি, যথা—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, বৃটেন, চীন ও ফ্রান্স। এই পঞ্চশক্তি হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ও রাষ্ট্রপুঞ্জের ভরকেন্দ্র। ভবিষ্যৎ পৃথিবীকে যুদ্ধমুক্ত রাখতে, সমস্ত আন্তঃরাষ্ট্র সমস্যার, বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান সম্ভব করে তুলতে এই পঞ্চশক্তির পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতা, বোঝাপড়া, সহযোগিতা হবে মূল বনিয়াদ। তাই এই ধারণার উপরে ভিত্তি করে রাষ্ট্রপুঞ্জের মাধ্যমে যে আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখা হয়েছিল তার প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব হলো বিশ্বশান্তি ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বজায় রাখা।

পঁচিশ বছর পরে রাষ্ট্রপুঞ্জের মূল্যায়ন আজ যখন প্রাসঙ্গিক হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন দেখা যাচ্ছে এই বহু-বিঘোষিত নীতির সঙ্গে বাস্তবের গরমিলটা একটা বিরাট প্রশ্নের আকারে মানুষের সামনে হাজির। কেন এমন হলো এ-প্রশ্ন আজ দেশ-কালের সীমানা ছাড়িয়ে সবখানেই সাধারণ মানুষের মনে দেখা দিয়েছে। রাষ্ট্রপুঞ্জের সক্রিয়তার আন্তর্জাতিক পটভূমির দিকে নজর দিলে এই প্রশ্নের জবাব মিলবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তিতে পঞ্চশক্তির মধ্যে একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই ধনে-জনে, শিল্পে-সমৃদ্ধিতে রয়ে গেল প্রায় অক্ষত ও বিরাট শক্তিমান দেশ। তার উপরে তার হাতে তখন পারমাণবিক ক্ষমতার একচেটিয়া মালিকানা। ফ্যাসিবাদবিরোধী সংগ্রাম, ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র বা দুই পরস্পর বিরোধী সমাজব্যবস্থার যে লড়াই মুলতুবি রাখতে বাধ্য করেছিল, যুদ্ধ শেষে তা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। এবারে দুই প্রতিপক্ষ হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন। পশ্চিম দুনিয়ার বহু বিচক্ষণ যুদ্ধ বিশারদরা দাবি করেছিলেন যে, আমেরিকার একচেটিয়া পারমাণবিক ক্ষমতার সুযোগেই সমাজতন্ত্রের বনিয়াদ রাষ্ট্র সোভিয়েতকে ঘায়েল করা হোক। কিন্তু যুদ্ধ-বিধ্বস্ত পশ্চিম ইউরোপের পক্ষে তখন আর নতুন করে যুদ্ধের উদ্যোগ করা সম্ভব ছিল না। বরং তারা জানতো যে দুর্ধর্ষ লালফৌজ পশ্চিমী মিত্রপক্ষের অনেক প্রতিকূলতার মধ্যেও প্রায় একক শক্তিতে হিটলারের ফ্যাসিবাহিনীকে পরাস্ত করে বার্লিন অবরোধ করেছে, এবারে তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হোলে আমেরিকার আণবিক বোমা কার্যকর হওয়ার আগেই সমগ্র পশ্চিম ইউরোপ লালফৌজের পদানত হবে। আবার পশ্চিম ইউরোপের সক্রিয় সাহায্য ছাড়া, শুধু নিজের শক্তির জোরে সোভিয়েতের মোকাবিলা করার সাহস আমেরিকার ছিল না। তাই সোভিয়েতকে কোণঠাসা করে রাখার নীতি হিসেবে চালু হলো ঠাণ্ডা লড়াইয়ের। এতে পশ্চিম ইউরোপকে আর্থিক ও কারিগরী সাহায্য দেওয়ার নামে সেখানে আমেরিকার ডলার সাম্রাজ্যবাদের বনিয়াদ গড়ে তোলা যাবে, আর যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি এড়িয়ে আমেরিকার শিল্পসমৃদ্ধিকে অক্ষুণ্ণ রেখে ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার নেতৃত্বও করায়ত্ত হবে। তারপর সময় সুযোগ মতো সোভিয়েতের বিরুদ্ধে সুরু করা যাবে যুদ্ধের আয়োজন। তখন থেকেই আমেরিকার নেতৃত্বে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের ভিত্তিতে সোভিয়েতকে কোণঠাসা করে একটা বিপুল সমরায়োজন করাই হয়ে দাঁড়ালো পশ্চিম দুনিয়ার আন্তর্জাতিক নীতি।

রাষ্ট্রপুঞ্জের জন্মকাল থেকে আমেরিকার নেতৃত্বে পশ্চিম-দুনিয়া এই ঠাণ্ডা লড়াইয়ের রাজনীতি একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তীব্র সোভিয়েত বিরোধিতায় অনুসরণ করতে থাকে। যুদ্ধকালীন ফ্যাসিবিরোধী মোর্চা যে-সহযোগিতার কর্মসূচীকে যুদ্ধোত্তর দুনিয়ায় স্থায়ী শান্তির বনিয়াদ বলে গ্রহণ করেছিল, যুদ্ধ শেষে সেই অবস্থার একটা গুণগত পরিবর্তন সূচিত হলো ঠাণ্ডা লড়াইয়ের কার্যক্রমে। বলা বাহুল্য রাষ্ট্রপুঞ্জের সক্রিয়তা এতে ব্যাহত না হয়ে পারেনি। কিন্তু তখন এদিকে

নজর দেওয়ার মতো মর্জি ও মেজাজ মার্কিনী নেতাদের ছিল না। তাঁরা তখন উঠে পড়ে লাগলেন রাষ্ট্রপুঞ্জকে একটা মার্কিনী সংস্থায় পরিণত করে, আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে। পশ্চিম ইউরোপ ও লাতিন আমেরিকার রাষ্ট্রগুলির সাহায্যে সে-কাজ চলতে থাকে ভালোভাবেই। কিন্তু পশ্চিম ইউরোপ ও দুই আমেরিকার বাইরে সারা দুনিয়ার চেহারা তখন বদলাতে সুরু করেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পরাধীন জাতিসমূহের স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রিক মর্যাদা অর্জন, চীন-বিপ্লবের সফল সমাপ্তি, পূর্ব ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার পত্তন, এবং পঞ্চাশের দশকের শেষে আফ্রিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে জাতীয় মুক্তি-সংগ্রাম ও আন্দোলনের সাফল্যে পৃথিবীর রাজনীতির ভারসাম্য দ্রুত বদলে গেল। ১৯৪৫ ও ১৯৬০ সালের পৃথিবীর মধ্যে ঘটল বহু যুগের ব্যবধান। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশিকতাবাদ এই বিরাট পরিবর্তনের সামনে দাঁড়িয়েও প্রাণপণে নিজের স্বার্থের ঘাঁটি আগলে রাখার চেষ্টা করেছে। সমাজতান্ত্রিক মহাচীনকে রাষ্ট্রপুঞ্জে তার ন্যায়সঙ্গত দাবি থেকে আইনের কূট-কৌশলে বঞ্চিত করে, উত্তর কোরিয়া, কোরিয়া, কঙ্গো এবং একালে ভিয়েতনামের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের উপর পৈশাচিক হামলা চালিয়ে বিশ্ব-রাজনীতির পরিবর্তনশীল ভারসাম্য জবরদস্তি করে নিজের অনুকূলে রাখার চেষ্টা করেছে। সাম্রাজ্যবাদীস্বার্থের এই নগ্ন আত্মপ্রকাশের প্রতীক রাষ্ট্রপুঞ্জ। এবং জনসংখ্যার ভিত্তিতে দুনিয়ার এক-তৃতীয়াংশ মানুষের সঙ্গে রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনো যোগই নেই।

রাষ্ট্রপুঞ্জ চেয়েছিল যুদ্ধ বন্ধ রেখে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে। পঞ্চশক্তির যৌথ দায়িত্ব ছিল সেই শান্তি বজায় রাখার পূর্বশর্ত। কিন্তু কার্যত যৌথ দায়িত্বের বিকল্প হিসেবে চালু করা হয়েছিল মার্কিনী প্রভুত্বের কাছে আত্মসমর্পণ, তার তাঁবেদারিত্ব। যুদ্ধের কারণগুলি দূর করার দিকে উদ্যোগ আয়োজনের ব্যাপক প্রস্তুতি রাষ্ট্রপুঞ্জ করেনি, করতে পারেওনি। যুদ্ধ বন্ধ রেখে শান্তি বজায় রাখা অর্থাৎ শান্তি রক্ষার এই নীতিবাচক মানসিকতা যে, যুদ্ধের সম্ভাব্য কারণগুলি দূর করে শান্তি সুনিশ্চিত করা অর্থাৎ শান্তিরক্ষার ইতিবাচক মানসিকতার তুলনায় কমজোরী সে-কথা রাষ্ট্রপুঞ্জের জন্মের পঁচিশ বছর পরে সর্বজন স্বীকৃত। তাই রাষ্ট্রপুঞ্জের বাইরে শান্তি আলোচনা চালাতে হয় রাষ্ট্রনেতাদের বৈঠকে। রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রথম সাধারণ

অধিবেশনে এই আন্তরদুর্বলতা ধরা পড়ে যায়। তারপরেও যে পঁচিশ বছর কেটে গেছে এটা নিছক কোটি কোটি মানুষের শান্তির সপক্ষে সুদৃঢ় মনোভাবের ক্রমবর্ধমান প্রকোপের জোরে। না হলে এলিয়টের সেই বিখ্যাত লাইনের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা যায় যে, "In my beginning is my end" যে-বিশ্ব সংস্থার ললাটলিপি, পঁচিশতম জন্ম বার্ষিকীতে তার মূল্যায়নের কোনো সুযোগই থাকতো না।

বাসব সরকার

'এ. আই. টি. ইউ. সি'র পঞ্চাশ বছর

৩১এ অক্টোবর ১৯৭০ সারাভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হলো।

এই দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরে সারা বিশ্বে ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণী একের পর এক জয়লাভ করেছে, পরাধীন দেশগুলি জাতীয় মুক্তি আন্দোলন মারফৎ স্বাধীনতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে, বিশ্বের এক তৃতীয়াংশে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সমাজতন্ত্র। এই পরিপ্রেক্ষিতে 'এ. আই. টি. ইউ. সি'র পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস অবশ্যই তাৎপর্যপূর্ণ।

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে সস্তা কাঁচামাল, সস্তা মজুরের অফুরন্ত যোগান ও অবিশ্বাস্য মুনাফার সুযোগ পেয়েছিল বৃটিশ পুঁজিপতিরা। এ-দেশে চা, কয়লা ইত্যাদি শিল্পের সূত্রপাত হলো। উদ্ভব হলো ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীর। সিপাহী বিদ্রোহের পর উনিশ শতকের শেষের দিকে বৃটিশ সরকার ভারতের উপর তার কর্তৃত্ব প্রসারিত করল। কুটির ও হস্তশিল্প ধ্বংস করা হলো সুপরিকল্পিতভাবে। জমিদারশ্রেণীর সৃষ্টি হলো। জমিচ্যুত ছিন্নমূল কৃষকের সর্বহারায় রূপান্তর ঘটল। তাছাড়া ভূমি থেকে উৎখাত চাষীদের আড়কাঠির মারফৎ চা-বাগান, কয়লাখনি এমনকি দূর দ্বীপে গিরমিটিয়া কুলী হিসাবে চালান দেওয়া চলছিল। দেশী পুঁজিপতিরাও পত্তন করলেন সূতাকল শিল্পের। শোষণের মাত্রাও বেড়েই চলল। একদিকে সামাজিক অসম্মান অন্যদিকে অস্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রা ও শোষণের চূড়ান্ত চাপের ফলে স্বভাবতই শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বিক্ষোভ দানা বাঁধল। ১৮২৭ সালে কলকাতার বেহারাদের পাল্কী ধর্মঘট ১৮৬২ সালের

হাওড়ার রেল ধর্মঘট ও ১৮৭৭ সালে নাগপুরে সুতাকল শ্রমিকদের ধর্মঘটের মাধ্যমে এই বিক্ষোভের প্রকাশ ঘটল।

ফ্যাক্টরি আইন চালু হলো ১৮৮১ সালে। এই আইনের ফলে কাজের উর্ধতম সীমা নির্ধারিত হলো ও বৃটিশ-শ্রমিকদের অনুরূপ কিছু সুযোগ সুবিধা ভারতের শ্রমিকশ্রেণীও লাভ করলেন। এর পেছনে অবশ্য ভারতীয় বস্ত্র উৎপাদন-কারীদের সঙ্গে খোদ বৃটেনের পুঁজিপতিদের অসম প্রতিযোগিতায় উৎখাতের উদ্দেশ্যই ছিল সক্রিয়, কেননা ভারতীয় উৎপাদনকারীরা কম মজুরী দিয়ে বেশি খাটিয়ে প্রতিযোগিতার বাজারে খোদ বৃটেনের মিল-মালিকদের বেকায়দায় ফেলছিল। অবশ্য ভারতবর্ষে ফ্যাক্টরি আইনের সবগুলো ধারা চালু করা হলো না, শোষণের মাত্রাও কমল না। ১৮৯৫ সালে বজবজের চটকল ও আমেদাবাদের সুতাকল শ্রমিকরা ধর্মঘট করলেন। ১৯০৮ সালে বোম্বাই-এ লোকমান্য তিলকের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ধর্মঘট ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভূমিকার সুস্পষ্ট তাৎপর্যের প্রকাশ। লেনিন এ-ধর্মঘটকে বিশেষ তাৎপর্য দিয়ে লক্ষ্য করেছিলেন।

১৯১৭র অক্টোবর বিপ্লব চরম আঘাত হানল বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদকে। দেশীয় পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষার্থে গঠিত নিয়মতান্ত্রিক, আপোষপন্থী জাতীয় কংগ্রেসেরও চরিত্রের খানিকটা পরিবর্তন ঘটে গেছে ইতিমধ্যে। এবারে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করল কংগ্রেস। আইনসম্মত স্বীকৃতি না পাওয়া সত্ত্বেও সারাদেশে গড়ে উঠল অসংখ্য ট্রেড ইউনিয়ন। শ্রমিক আন্দোলন নিয়মতান্ত্রিকতার ভেতর সীমিত রাখার প্রয়াসে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির উদ্যোগে গঠিত হলো আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন আই. এল. ও। এই সংগঠনে প্রতিনিধি নির্বাচনের প্রশ্নে ৩০এ অক্টোবর ১৯২০ বোম্বাইয়ে ভারতবর্ষের ৬৪টি ইউনিয়নের ১লক্ষ ৪১ হাজার সদস্যের প্রতিনিধিরা মিলিত হলেন। ৩১এ অক্টোবর ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর জাতীয় সংগঠন সারাভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হলো। সম্মিলন থেকে উচ্চারিত হলো সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্বের পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যের শপথ। এই সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন লালা লাজপত রায়।

গত পঞ্চাশ বছরে 'এ. আই. টি. ইউ সি'তে ভাঙন এসেছে বারবার। একদিকে শ্রেণীসমন্বয়কামী নিয়মতান্ত্রিক দক্ষিণপন্থী আক্রমণ ও অন্যদিকে অতিবাম

গোঁড়ামি ও সঙ্কীর্ণতা-দুষ্ট বিভেদপন্থা—এই দুই প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে' এ. আই. টি. ইউ. সি'র নেতৃত্বে ভারতের শ্রমিকশ্রেণী ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের পথে অর্থনৈতিক দাবি ও রাজনৈতিক অধিকার আদায় করেছে, পুঁজিবাদ ও প্রতি-ক্রিয়াকে পর্যুদস্ত করেছে বারবার।

অক্টোবর বিপ্লবের পর পরাধীন দেশগুলিতে সাম্যবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ বুদ্ধি-জীবীরা রাজনৈতিক মঞ্চে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করতে লাগলেন। ভারতবর্ষেও এর ব্যতিক্রম ঘটল না। সংস্কারপন্থীরা স্বভাবতই শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে বাম ও দক্ষিণপন্থীর বিরোধ-এর প্রতিফলন ঘটল 'এ. আই. টি. ইউ. সি'তেও। ১৯২৯ সালে দশম অধিবেশনে বিরোধ বাধল রাজনৈতিক প্রস্তাব নিয়ে। 'এ. আই. টি. ইউ. সি' ভাঙল। ভাঙন আনল দক্ষিণপন্থীরা। এ-রাজনৈতিক বিরোধে বামপন্থীদের পক্ষ নিলেন সুভাষচন্দ্র ও নতুন 'এ. আই. টি. ইউ. সি'র সভাপতি নির্বাচিত হলেন। ১৯৩১ সালে বামপন্থী হঠকারিতা বিভেদ আনল আবার। 'সাচ্চা' কমিউনিস্টরা গঠন করলেন 'রেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস'। ১৯৩২ সালে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকে এই বামপন্থী গোঁড়ামির তীব্র সমালোচনা করা হলো। ১৯৩৫ সালে 'সাচ্চা' কমিউনিস্টরা আবার মূল সংগঠনে ফিরে এলেন।

পরবর্তী ভাঙন এল ১৯৪০ সালে। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের প্রতি শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গির লেনিনীয় নীতির বিরুদ্ধাচরণ করে যুদ্ধের স্বপক্ষে শ্রমিকশ্রেণীকে সামিল করার উদ্দেশ্যে 'ইণ্ডিয়ান ফেডারেশন অব লেবার' গঠন করলেন এম.এন. রায়। এ-সংগঠনের প্রভাব ও অস্তিত্ব দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ১৯৪৭ সালের মে মাসে ভারতের বুর্জোয়াশ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতায় গঠিত হলো 'আই. এন. টি. ইউ. সি'। শ্রমিকশ্রেণীকে সাম্যবাদী আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে রেখে শ্রেণীসমন্বয়ের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে গঠিত এ-সংগঠন স্বাধীনতা-উত্তরকালে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত হয়নি। 'এ. আই. টি. ইউ. সি'র সর্বশেষ ভাঙন ঘটল ১৯৭০ সালে। মাথায় হাঁটা বুকনিসর্বস্ব রাজনীতিবাদীরা 'শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা' করার কাজে শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণীসংগ্রামের হাতিয়ার ট্রেডইউনিয়ন কংগ্রেসকে দু-টুকরো করল। অথচ কর্তব্য ছিল, আরও বৃহৎ ঐক্যবদ্ধ প্লাটফর্মের গড়ে তোলার কাজ। ১৯৩১এর মতো বামপন্থী হঠকারিতার পুনরাবৃত্তি ঘটল। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর বামপন্থী সঙ্কীর্ণতাবাদ ও দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়া এই দ্বিমুখী আক্রমণ সত্ত্বেও 'এ. আই. টি. ইউ. সি'র নেতৃত্বে শ্রমিক

শ্রেণী সমাজতন্ত্রের স্বপক্ষে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে অবিচল থেকেছে। ১৯২১ সালে শ্রমিকশ্রেণী অগ্রণীর ভূমিকা পালন করেছে স্বরাজ-এর দাবিতে প্রস্তাব গ্রহণ করে। ১৯২৩ সালের সম্মিলন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের প্রতি শ্রমিকশ্রেণীর মনোভাব দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছে। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে 'এ. আই. টি. ইউ. সি'র নেতৃত্বে শ্রমিকশ্রেণী যেমন তার যোগ্য ভূমিকা পালনে পশ্চাৎপদ ছিল না তেমনি স্বাধীনতা-উত্তরকালে একচেটিয়া পুঁজি ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামেও যথাযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

১৯৭০এর প্রান্তে যখন সাম্রাজ্যবাদ কোণঠাসা হয়ে মরীয়া হয়ে উঠেছে, সদ্য-স্বাধীন দেশগুলির অধিকাংশ অপুঁজিবাদী বিকাশের পথে যখন সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পথে সংগ্রামরত, জাতীয় ক্ষেত্রে একচেটিয়া পুঁজিবাদের নেতৃত্বাধীন দক্ষিণপন্থীরা যখন জোটবদ্ধ, বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির ঐক্যের প্রয়োজন যখন সর্বাধিক, ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকাও এই সন্ধিক্ষণে অবশ্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ-যুগ সমাজতন্ত্রের যুগ। সমাজতন্ত্রী শিবির, আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণী ও জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে সাম্রাজ্যবাদকে চূর্ণ করার কাজে শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা আমাদের দেশে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গড়ে তোলার উদ্যোগ নিতে অগ্রণী ভূমিকাসাপেক্ষ। সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে অতীতেও বহুবার বামপন্থী গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ হতে বাধ্য করেছে ভারতের শ্রমিকশ্রেণী। এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে তারা যথাযথ ভূমিকাই পালন করবেন। 'এ. আই. টি. ইউ. সি'র পঞ্চাশ বছরের প্রান্তে এ-কথা অনেকটা বিশ্বাসের সঙ্গেই উচ্চারণ করা যায়।

তরুণ সেন

অন্তর্বর্তী সাধারণ নির্বাচন

১৯৭১ সালের মার্চ মাসে সারাভারত জুড়ে লোকসভার অন্তর্বর্তী সাধারণ নির্বাচন ডাকা হয়েছে। এ-নির্বাচনের গুরুত্ব আজ ভারতের জাতীয় জীবনে সর্বাধিক। এই নির্বাচনে ভারতে প্রগতিশীল শক্তি জয়ী হয়ে স্বনির্ভরতার দ্রুত ফলপ্রসূ কাজে হাত দেবে কিনা, অথবা দক্ষিণপন্থা ও প্রতিক্রিয়াশীলতার অন্ধকারের শক্তিগুলি ভারতের রাষ্ট্রক্ষমতা পরিচালনা করার অধিকার পেয়ে

এ-দেশে নয়া ঔপনিবেশিকতার চাপ সৃষ্টি করবে কিনা—এ-দুটি প্রশ্ন আজ নির্বাচনের মুখোমুখি আমাদের সবারই মনে হচ্ছে। আর বিশেষভাবে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনের প্রশ্ন আরো জটিল। এ-রাজ্যে বিধানসভারও অন্তর্বর্তী নির্বাচন একই সঙ্গে হবে মার্চের প্রথম দিকে। এ রাজ্যে বিভেদপ্রবণ তথাকথিত বামপন্থীরা সর্বাত্মক বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্যবিরোধী হয়ে সর্বভারতীয় দক্ষিণপন্থার মদত যোগাচ্ছে। বাঙলাদেশে এখন বামপন্থার মধ্যে সুযোগসন্ধানী ও বিভেদপ্রবণ দলীয় সঙ্কীর্ণতার মতান্ধ দলবাগিশ চণ্ড চমূর অভ্যুদয় ঘটেছে। দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার জোট ও বামপন্থী শিবিরে বিভ্রান্তিকর মোর্চার বিরুদ্ধে এখানে তাই গণতান্ত্রিক এবং প্রগতিশীল দল ও ব্যক্তিদের লড়তে হবে। তাছাড়া সন্ত্রাস ও প্রতিসন্ত্রাসের মধ্যে পড়ে ত্রস্ত নাগরিকের ভোটের অধিকার ব্যবহারের সুযোগ সম্পর্কে নিরপত্তা আনারও বিশেষ প্রয়োজন আছে।

এ-নির্বাচন যখন হতে যাচ্ছে তখন ভারতের রাজনীতি এক উল্লেখযোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ বাঁকে এসে পৌছেছে। ভারতের অর্থনীতিতে একদিকে একচেটিয়া পুঁজিপতি ও সামন্ততান্ত্রিক ভগ্নাবশেষের চাপ রক্ষণশীলতার দিকে দেশের রাজনীতিকে ঠেলে দিতে চাইছে। অন্যদিকে জাতীয় অর্থনীতি বিকাশের জন্য আগ্রহী ও সামন্ততন্ত্রের শেষাংশকে চিরকালের জন্য কবরে পাঠাতে উদগ্র বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি নতুন স্বনির্ভর ও গণতান্ত্রিক ভারত রচনার কাজে ক্রমশ অধিকতর ভূমিকা গ্রহণ করতে উন্মুখ। রক্ষণশীলতার পোষকতায় ও তদ্বিরে সারাক্ষণ উপদেশ ও সহায়তায় সদাপ্রস্তুত রয়েছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। এই দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলতার স্তম্ভস্বরূপ হয়ে আছে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের দলছুট অংশ সিণ্ডিকেটপন্থীরা, স্বতন্ত্র দল ও জনসংঘ। সিণ্ডিকেটপন্থীরা ভারতে একচেটিয়া পুঁজিবিকাশের ও কৃষিতে সামন্ততান্ত্রিক অবস্থা অব্যাহত রাখায় সচেষ্ট। স্বতন্ত্র দল প্রকাশ্যেই বলছে এ-দেশে স্বনির্ভর শিল্পবিকাশের বদলে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী ও বেসরকারী বিদেশী মূলধন ভারতে আমদানী করে অন্তর্বর্তী দ্রব্য উৎপাদনকারী নয়া উপনিবেশের ব্যবস্থা পত্তন করাই 'স্বাধীন শিল্পবিকাশের নীতি' হওয়া উচিত। এজন্য তাঁরা রাঘব বোয়াল ব্যবসায়ী ও সাম্রাজ্যবাদী দেশের ব্যক্তিগত পুঁজির সঙ্গে হাত মেলাতে আগ্রহী একচেটিয়া মূলধন, সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামী ও বড়বড় রাজন্যবর্গের প্রতিনিধি। সম্প্রতি রাজন্যবর্গের ভাতা বিলোপ-কারী কেন্দ্রীয় সরকারের আদেশের বিরুদ্ধে সিণ্ডিকেট, জনসংঘের সঙ্গে এরাই সবচেয়ে হইচই সৃষ্টি করতে চেয়েছে। কেননা এই রাজন্যবর্গ জনগণের উপরে

আরোপিত কর থেকে যে বিপুল পরিমাণ মাসোয়ারা পেয়ে থাকে সেই কর পরিমাণের টাকা দিয়ে বিদেশী বিলাসদ্রব্য ব্যবহার করে, তারা সেই টাকা বিদেশী দ্রব্য আমদানীকারী ভারতের রাঘব বোয়াল ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেবে। মোটা অংশটাই চলে যাবে বিদেশে। তা ছাড়া একচেটিয়া মূলধনের সঙ্গেও গাঁটছড়া বেঁধে এই রাজন্যবর্গ একদিকে দেশে সামন্ততান্ত্রিক বন্ধনের দাপট অব্যাহত রেখে সস্তা কাঁচামাল ও মজুরের যোগানদার হতে চায়, অন্যদিকে পণ্যউৎপাদনে একচেটিয়ার মূলধনে অংশীদারী চায়। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা এ-দেশ লুট করার জন্য ঠিক এমনিধারা কাজই করেছিল। বিপুল পরিমাণ ভূমি-রাজস্ব তুলে, তা দিয়ে একদিকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত থেকে ক্রীত সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ দিত, অন্যদিকে তারা সেই টাকায় এ-দেশী কাঁচামাল কিনে বিলাতে শিল্পদ্রব্যে রূপান্তর করে ফের এ-দেশেই তা বিক্রি করত। ফলে বিধ্বস্ত দেশী শিল্পের শ্মশানে এ-দেশী সামন্তপ্রভুরা চাষীর উপর অমানুষিক খাজনা বাড়িয়ে ক্রমবর্ধমান বৃটিশ রাজস্বের থাঁই মেটাত। সস্তা কাঁচামাল যোগাত খাজনা ঋণ প্রভৃতিতে আষ্টেপিষ্টে বাঁধা চাষী। সিণ্ডিকেট স্বতন্ত্র জনসংঘ মোর্চার মূলনীতিও প্রায় একই। তবে এবার বৃটিশ প্রভু নয়। মার্কিন প্রভুদের উৎপাদিত পণ্যের বাজার এবং স্বল্প দামে শ্রমমূল্য ও কাঁচামাল কেনার বাজার হিসাবে তাঁরা ভারতকে ব্যবহার করতে দিতে উন্মুখ। একদা সিণ্ডিকেট নেতা অশোক মেহতা তো প্রকাশ্যেই বলেছিলেন—ভারতের জরায়ু বিদেশী মূলধনের বীজে গর্ভিনী হতে সদা উন্মুখ রাখা প্রয়োজন। ভারতীয় জনগণের পশ্চাদপদ অংশের মধ্যে যে কুসংস্কার ধর্মান্ধতা প্রভৃতির প্রভাব রয়ে গেছে, তাকে ব্যবহার করে জনসংঘ এই রাজনীতিকে চমৎকারভাবে উগ্র জাতীয়তার নামে প্রয়োগ করে এই নয়া-ঔপনিবেশিক উদ্দেশ্য সাধন করতে চায়। অর্থাৎ বিদেশী পণ্যের স্বদেশী সওদাগর, বিদেশী মূলধনের সঙ্গে দেশী একচেটিয়ার মুনাফা ভাগাভাগির ভাগীদার, রাজন্যবর্গ ও সামন্তপ্রভুদের অনুগত এই দলগুলি ভারতকে আবার নয়া-ঘরানার পরাধীনতার দিকে ঠেলে দিতে উন্মুখ। আর এই ত্র্যহস্পর্শের সঙ্গে যোগ দিয়েছে সম্প্রতি সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দলের সুবিধাবাদী নেতৃত্বের অংশ। এই বাত্-সমাজতন্ত্রীরা অন্ধ কংগ্রেস বিদ্বেষের নামে ভুলেই গেছেন সিণ্ডিকেটও কংগ্রেসেরই সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল ও দলছুট অংশ। এস. এস. পি. দলের মধ্যে শ্রমিক-অভিজাত ও সামন্ততন্ত্রের উচ্চঘরানার সন্ততি যারা বামপন্থী ভেক নিয়েছিলেন, তাঁদের অনেকেই এই নেতৃত্বের অংশীদার।

তাঁরা এখন সাম্রাজ্যবাদ প্রভাবিত খোঁয়াড়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসতে চাইছেন।

গত তেইশ বছর ধরে ভারতের রাজনীতিতে মেরুপ্রস্থান বড় কম হয়নি। ভারতীয় পুঁজিপতিদের রাজনৈতিক সংগঠন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা আসার প্রথম থেকেই পুঁজিপতিদের আভ্যন্তরীন দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করা গেছে। মহাত্মা গান্ধী তো স্বাধীনতার প্রাক্কালেই উপদেশ দিয়েছিলেন, কংগ্রেসের মধ্যেকার রক্ষণশীলতা ও প্রগতিশীলতার দুই শক্তি যথাক্রমে প্যাটেল ও নেহরুর নেতৃত্বে দুটি দলে ভাগ হয়ে গিয়ে পার্লামেন্টারী দ্বি-রাজনৈতিক দল-ব্যবস্থার প্রবর্তন ঘটাক। কিন্তু জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের রাজনৈতিক বিজয়ের অব্যবহিত পরেই নয়া ঔপনিবেশিকতার প্রতি আগ্রহী, একচেটিয়া পুঁজিপতিদের প্রতিনিধিরা জনগণের ক্রোধের ভয়ে পাল্টা দল গড়ে তুলতে পারেননি। তাঁদের বিক্ষুব্ধ দলছুট অংশগুলি একে একে মূলমাতৃদেহ থেকে সরে যেতে শুরু করে। এভাবেই স্বতন্ত্র ও জনসংঘ দলের উদ্ভব ঘটে। দ্বিতীয় দলটির মধ্যে ছিল উগ্র জাত্যন্ধ হিন্দু রক্ষণশীলতার জঙ্গী অংশগুলিও। অবশ্য পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা ও ব্যক্তিত্বের সবল উপস্থিতি একচেটিয়া পুঁজিপতি ও সামন্ত প্রভুদের পাল্টা দলের দিকে চলে যাবার পথে বাধা হিসেবে দাঁড়িয়েছিল। আর এ রাই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বুর্জোয়া নেতৃত্বে প্রবর্তিত ভূমি-সংস্কার আইনগুলিকে অকার্যকরী করে অকেজো করে তুলেছেন, পার্লামেন্ট ও মন্ত্রীসভায় বাইরে ও ভেতর থেকে চাপ সৃষ্টি করেছে মার্কিন ধনকুবেরদের বশংবদ ভৃত্য হবার মনোভাব নিয়ে। ফলে জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে একচেটিয়া পুঁজি ও সামন্ততন্ত্রীদের স্বার্থরক্ষকদের প্রগতিবিরোধিতার চাপেও অনেক ব্যক্তি দল থেকে বেরিয়ে যান ও একাধিক বামপন্থী ও মধ্যপন্থী দল গঠন করেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসদল প্রবর্তিত আর্থনীতিক পরিকল্পনা রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের তাৎপর্যে একচেটিয়া ব্যবসাকে আঘাত করে সাম্রাজ্যবাদকেই আঘাত দিয়েছে। অন্যদিকে পুঁজিবাদবিকাশের ভ্রান্ত নীতি ভারতের আর্থনীতিক বিকাশে জড়ত্ব এনেছে। এবং এই জড়ত্ব আনার মূলে সাম্রাজ্যবাদীদের চাপ, জাতীয় কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়ার শক্তি, জাতীয় বুর্জোয়াদের অনুসৃত কালৌচিত্যহীন আর্থনীতিক বিকাশের পন্থা ও দোদুল্যমানতাই দায়ী।

ভারতের অর্থনীতির বিকাশোন্মুখ চাপের বিরুদ্ধে রক্ষণশীলতার ভঙ্গুর বর্ম আজ শেষ প্রতিরক্ষায় ব্রতী। উৎপাদন সম্পর্ক ও উৎপাদনশক্তির বিরোধ আজ

তুঙ্গ শীর্ষে। শিল্প অর্থনীতিতে ব্যাপক জাতীয়করণবিধৃত সুশৃঙ্খল পরিকল্পনা মাফিক উৎপাদনের দিক এবং বেকার মানুষের কাজের আকাঙ্ক্ষাকে অবরুদ্ধ করে রাখতে চাইছে একচেটিয়া পুঁজি। উৎপাদনশক্তিকে ধরে রাখতে চাইছে উৎপাদন সম্পর্ক। কিন্তু বিস্ফোরণ ধূমায়িত হতে শুরু করেছে। কৃষির ক্ষেত্রেও তাই। একচেটিয়া ভূমিমালিকানা ও অ-আর্থনীতিক বন্ধনের বিরুদ্ধে ভূমিসংস্কারের সংগ্রাম, আড়তদারী মহাজনী জোতদারী ও জমিচুরির বিরুদ্ধে ব্যাপক কৃষক আন্দোলন, বিকাশোন্মুখ উৎপাদন শক্তি ও মান্ধাতা আমলের অথচ পরিবর্তমান ভূমি সম্পর্কের মধ্যে লড়াই তীব্র শীর্ষে পৌঁছেছে। আর এ পরিপ্রেক্ষিতেই প্রতি-ক্রিয়া ও প্রগতির মধ্যে তীব্রতম দ্বন্দ্ব চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে। এই বিপুল চাপের ফলে জাতীয় বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক দল জাতীয় কংগ্রেস খাড়াখাড়ি-ভাবে দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে, এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও দলছুট কংগ্রেস যথাক্রমে স্বনির্ভর জাতীয় অর্থনীতি ও মার্কিন প্রভাবিত বশংবদ নয়া ঔপনিবেশিক অর্থনীতির মৌল দ্বন্দ্বে প্রকাশ্যভাবে উভয়ের সম্মুখীন। এ দ্বন্দ্বগুলির চিহ্ন কিছু দিন ধরেই ভারতের রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছিল। ভি. ভি. গিরির রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ ও রাজন্যভাতা বিলোপের আদেশ ক্রমাগত এই সংকটকে প্রকাশ্য ফাটলে রূপান্তরিত করেছে। অনেকে এই চিহ্নগুলিকেই ব্যক্তি স্বার্থের সংঘর্ষের ফলে সৃষ্ট ব্যাধি বলে ভ্রম করছেন। আসলে যে বিরোধ একচেটিয়াবিরোধী ও একচেটিয়াপন্থী বুর্জোয়াদের বিভক্ত করছে, সেটাই কংগ্রেস দলের আভ্যন্তরীন দ্বন্দ্বের মূলভিত্তি, উল্লিখিত চিহ্নগুলি তারই ব্যাধিলক্ষণ মাত্র।

সারাভারত জুড়ে বুর্জোয়া বিকাশের দ্বন্দ্ব—বেকারী, দারিদ্র্য, সামাজিক নিরাপত্তার অভাব ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে বামপন্থী শিবিরেও আঘাত করেছে। বামপন্থী শিবিরে যেমন ঐক্য গড়ে উঠেছে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে গণতান্ত্রিক শক্তি-গুলির ঐক্যকে গড়ে তোলবার রাজনৈতিক রণনীতি বহুক্ষেত্রে পথভ্রষ্টও হয়েছে। এবং বুর্জোয়াদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব বিষয়ে অনীহ হয়ে অবৈজ্ঞানিকভাবে ভারতের আর্থনীতিক তাৎপর্য সম্পর্কে বিশ্লেষণ ক'রে, শ্রমিকশ্রেণীর বকলমে সঙ্কীর্ণতাবাদী 'কমিউনিস্ট'দের নেতৃত্ব ব্যতীত আর ফ্রন্ট গঠন অসম্ভব বিবেচনা ক'রে, কমিউ-নিস্টদের মধ্য থেকে দলছুট একাংশ পাল্টা কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করে। ভারতের যে-সব অঞ্চলে মধ্যশ্রেণীগুলির আর্থনীতিক ভূমিকা খর্ব হচ্ছে, সেই সব অঞ্চলে পেটি বুর্জোয়াশ্রেণীর যুবকদের মধ্যে দ্রুত ক্ষমতা দখলের সম্ভাবনার কথা প্রচার

ক'রে এবং এই মুহূর্তেই সশস্ত্র বিপ্লব জয়ী হতে পারে এমত রণকৌশলের কথা বলে, তাঁরা নানাধরণের বাক্‌-স্ফুলিঙ্গের সহায়তায় দলভারী করতে চেয়েছেন। কখনো বা পরিস্থিতির চাপে বাধ্য হয়ে ব্যাপক যুক্ত ফ্রন্টের সামিল হয়েও তাঁরা অতঃপর পার্টি আধিপত্য বিস্তার করার প্রচেষ্টা চালবার ফলে ফ্রন্টের পায়ের তলা থেকে মাটি সরিয়ে দিয়েছেন এবং রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যেকার রক্তক্ষয়ী সরিকী সংঘর্ষকে তাঁরা শ্রেণীসংগ্রাম বলে দাবি করেছেন। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্করহিত এই পার্টি, ব্যক্তি ও দলসন্ত্রাসের মধ্যদিয়ে পশ্চিমবঙ্গে আজ সন্ত্রাস, হত্যা ও চণ্ড রাজনীতির আমদানী ঘটিয়েছেন। এবং কিছুদিন ধরে স্বদলত্যাগী তরুণকুলের উপরে চড়াও হয়েছেন। এই দলত্যাগীরা ঐ পার্টির বিপ্লবী বাক্‌স্ফুলিঙ্গের বিচ্ছুরণে মুগ্ধ হয়ে একদা পতঙ্গের মতো ঝাঁপ দিয়েছিলেন। শেষে দেখা গেল, গর্জনই আছে বটে, কিন্তু শরত মেঘের মতো তা বর্ষণহীন ও সম্ভাবনা শূন্য। এখন এঁরা দলছুট হয়ে অন্য দল গঠন করায়, বিপ্লবের ঠিকাদার ঐ পার্টির জঙ্গীবাহিনী এই তরুণদের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে। বাঙলাদেশের এই সন্ত্রাস ও পাল্টা সন্ত্রাসের চাপে রাজনৈতিক জীবন বিঘ্নিত হতে চলেছে। বামপন্থী শিবিরে বিভ্রান্তিকারী এই পার্টি ভারতের রাজনীতির তাৎপর্য বুঝতে অক্ষম। কোথাও সিণ্ডিকেটের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে, কোথাও রাজ্যসঙ্কীর্ণতার ধুয়ো তুলে এঁরা ভারতের রাজনীতির ঘূর্ণিজল ঘুলিয়ে তুলছেন।

এ অবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তরুণ উগ্রপন্থীদের নৈরাজ্যবাদী তাণ্ডব। এঁদের রাজনৈতিক কর্মপন্থা এখন সন্ত্রাস ও হত্যার পথে পা বাড়িয়েছে। আর এই উগ্রপন্থাকে ইন্ধন দিচ্ছে পুলিশ ও পাল্টা 'কমিউনিস্ট' পার্টির যুগপৎ আক্রমণ ও সন্ত্রাস। এঁদের নেতৃত্বের ক্যাডারদের প্রতি নির্মমতা এবং প্রয়াত জাতীয় নেতা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিক্ষব্রতী, অপর রাজনৈতিক দলের কর্মী এবং দেশের শ্রেণী অবস্থান ও রাষ্ট্রশক্তি এবং আন্তর্জাতিক তাৎপর্য সম্পর্কে ভ্রান্ত ও অন্ধ মূল্যায়ণ এঁদের এক অন্ধগলির পথে নিষ্ফলা আত্মহননের দিকে ঠেলে দিয়েছে। এর ফলে সৃষ্ট রাজনীতিহীন পাশব প্রতিহিংসা দেশে দক্ষিণপন্থী শক্তি ও বিভেদপন্থী 'বামপন্থার' হাতই শক্ত করছে।

আজ তাই স্পষ্টভাবে রাজনীতির নতুন করে মূল্যায়ন করার প্রয়োজনীয়তা আছে। "দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার শক্তিগুলি দ্রুত সংহত হয়ে সিণ্ডিকেট, জনসংঘ ও স্বতন্ত্র পার্টির মহাজোটে সামিল হয়েছে। এই প্রাতক্রিয়াশীল জোটের লক্ষ্য

হলো কেন্দ্রে ক্ষমতা দখল—যা কিনা এদেশে গণতান্ত্রিক প্রগতির চূড়ান্ত পরিপন্থী। একচেটিয়া পুঁজিপতি, ভূ-স্বামী ও রাজন্যবর্গের জঘন্য প্রতিক্রিয়াশীল অংশ আর তাদের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ এই প্রতিক্রিয়াশীল মোর্চাকে মদত দিচ্ছে।" আর এই পরিপ্রেক্ষিতেই ভারতে মধ্যবর্তী সাধারণ নির্বাচন হতে চলেছে। সুতরাং "এ নির্বাচনে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে পরাস্ত করতে হবে যাতে তারা কেন্দ্রক্ষমতা দখল করতে না পারে। নতুন লোকসভায় বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক মতাবলম্বীদেরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে হবে।" একচেটিয়া পুঁজি ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে এবং অন্যান্য সামাজিক ও আর্থনীতিক সংস্কারের প্রয়োজনে সংবিধানে বদল আনতে হবে। এজন্য ব্যাপক ঐক্যের প্রয়োজন। কেবল বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক দলগুলির প্রতিনিধি-সংখ্যা বৃদ্ধি নয়, এমন কি ভারতীয় জাতীয় সংগ্রামের মধ্যেকার গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল ব্যক্তিদেরও এই বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির ঐক্যবদ্ধ মোর্চায় আনতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া ও সুবিধাবাদী জোটগুলির সঙ্গে কংগ্রেসের মধ্যেকার প্রতিক্রিয়াশীলদেরও এ নির্বাচনে পরাস্ত করতে হবে। পরাস্ত করতে হবে সিণ্ডিকেট-স্বতন্ত্র-জনসংঘ চক্র। খর্ব করতে হবে বামপন্থী শিবিরে বিভ্রান্তিপন্থী দলবাগিশ ট্রোজান হর্সদের যারা দুই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াই করার নামে আসল লড়াই কেন্দ্রীভূত করছে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে, ঝুঁকে পড়ছে দলছুট নিজলিঙ্গাপ্পাপন্থীদের দিকে। দলছুটে ও দলছুটে এক অশুভ সুবিধাবাদী ঐক্য গড়ে উঠছে। এস. এস. পি'র প্রভাবশীল নেতৃত্বাংশতো দক্ষিণপন্থী শিবিরে গিয়ে সবার সামনে মাথা মুড়িয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গে মার্চ মাসে লোকসভা ও বিধানসভার অন্তর্বর্তী নির্বাচন। এরাজ্যে একই সঙ্গে প্রগতিশীল শক্তিকে লড়তে হবে, দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল মোর্চা ও বামপন্থী দলবাগিশ সুবিধাবাদী রাজনৈতিক সন্ত্রাসপন্থীদের বিরুদ্ধে একযোগে। আমরা আশা করব বিপ্লবমুখী, বিপ্লবী রক্তসূর্য বিকচোন্মুখ সময়ে প্রগতিই জয়ী হবে। বাঙলাদেশে আট পার্টির জোট সেই ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের সৈনিক। আমরা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আশা রাখব ব্যাপক বামপন্থী ও প্রগতিশীল শক্তিগুলির ঐক্য—প্রতিক্রিয়া ও অশুভ দক্ষিণপন্থার বিরুদ্ধে।

শুভব্রত রায়

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

বিশ শতকের প্রথমদিক থেকেই বাঙলাদেশের গ্রামগুলি নগর-কেন্দ্রিক সভ্যতার প্রবল টানে ভেঙে পড়তে থাকে। দারিদ্র্যে অনুৎপাদনে ও সামন্ত-তান্ত্রিক শোষণে গ্রামের অর্থনীতিতে প্রচণ্ড বিপর্যয় দেখা যায়। স্বভাবতঃই এই বিপর্যয় সামগ্রিকভাবে জাতীয় সঙ্কটের আকার নিয়ে আসে ও সমাজ কল্যাণবোধে উদ্‌বুদ্ধ মানুষেরা গ্রামে প্রত্যাবর্তনের আন্দোলন শুরু করেন। গ্রাম-পরিত্যাগের অকাল সঙ্কটের দিন থেকে কুমুদরঞ্জন মল্লিক একটি মুগ্ধ হৃদয় ও উষ্ণ আসক্তি নিয়ে তাঁর চিরকালের বাস্তুভিটে ও আজন্মের গ্রামজীবনকে সবল মুষ্টিতে আকর্ষণ করে কবি-কণ্ঠে গ্রামে প্রত্যাবর্তন করার আবেদন প্রচার করে আসছিলেন। সুপ্রবীণ বয়সের মৃত্যু এসে এই পল্লীপ্রেমিক কবিকে আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

সত্যেন্দ্রনাথ, করুণানিধান, যতীন্দ্রমোহন ও কালিদাস রায়ের মতো কুমুদ-রঞ্জনও রবিশস্যে লালিত কবি। পরন্তু প্রাচীন বাঙলা কাব্যসাধনার ঐতিহ্যটি তাঁর মধ্যে সযত্নে প্রবাহিত ছিল। তাঁর কাব্যের বাদী সুর পল্লীজীবনের প্রীতি ও মাধুর্য প্রচার এবং সংবাদী সুর প্রাচীনভারতীয় ইতিহাস পুরাণ শাস্ত্র ও সংস্কৃতির সশ্রদ্ধ পরিবেশনা। বস্তুত তাঁর কাব্যে তেমন কোনো গভীর জীবনদর্শন, অনুভূতির সূক্ষ্ম প্রকাশ বা সুমহান জীবন প্রত্যয়ের পীনদ্ধ বেদনা নেই। 'খানিকটা বাউলের মত বৈরাগ্য, গৃহীর মত আসক্তি, বৈষ্ণবের মত বিনয়, শাক্তের মত মাতৃব্যাকুলতা, শিশুর মত মুগ্ধতা, প্রৌঢ়ের মত ধ্যানস্থ দৃষ্টি এবং কবির মত রসতন্ময়তা'—এ সব মিলিয়েই ছিলেন কুমুদরঞ্জন। নাগরিকতা তাঁকে ঈষন্মাত্র বিচলিত করেনি, বিশ্বসাহিত্যের ব্যাপকতা সম্পর্কে তিনি ছিলেন অনাগ্রহী, ভাষা ও ছন্দের কারুকাজে তিনি বিব্রত ছিলেন না। স্বাদেশিকতা তাঁর নামাবলী, কিন্তু বিশশতকের অহিংস আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদ বা উত্তেজক দেশভক্তিবাদের দ্বারা তিনি তাঁর স্বাজাত্যবোধকে দীক্ষিত করেন নি। যা কিছু দীন ও বিরলসৌষ্ঠব, অপাংক্তেয় ও বিনীত, সে মানুষই হোক বা সামান্য পদার্থই হোক, তার প্রতি কবি সুগভীর আত্মীয়তা বোধ করেছেন। জটিল জীবনাচার ও আন্তর্জাতিক চিন্তার তপ্ত প্রবাহ থেকে নিজেকে নিঃসম্পর্কিত রেখে এরকম পরিতৃপ্ত পল্লীমুগ্ধ জীবনপ্রেমের নম্র সাধনা বাঙলা সাহিত্যে যে বর্তমান কালেও সম্ভব, কুমুদরঞ্জন তারই সাক্ষী। ১৯০৬ থেকে তিনি কাব্যরচনায় নিমগ্ন ছিলেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলির নাম শতদল, বনতুলসী, উজানি, একতারা, বীথি, বনমল্লিকা, নূপুর, রজনীগন্ধা, অজয়, তূণীর, চূনকালি ও স্বর্ণসন্ধ্যা। তাঁর মৃত্যু বাঙলা কবিতার একটি অধ্যায়কে ম্লান উপান্তে টেনে নিয়ে এল।

অমিতাভ দাশগুপ্ত